

গেল, ইংহারা সকলেই শিল্পী। ময়রার যেমন সন্দেহে অরুচি হয়, তেমনি ইংহাদের গানে অরুচি ধরিয়েছে। তাই হইবে। নাইবা থাকিল দাঁড়ি, ইংহাদের মধ্যেই হয়তো এমন সব গুণী আছেন, যাঁহাদের পদখলি পাইলে কলিকাতার বড়ো বড়ো ওস্তাদ ধন্য হইয়া যান। ভজহারি পুঙ্খিত হইয়া উঠিলেন। 'সহসা মনে হইল এরূপ ক্ষেত্রে অনুমতি না লইয়া পুরুষের পক্ষে এভাবে দাঁড়াইয়া থাকা বোধহয় ভদ্ররীতিসম্মত হইতেছে না। তিনি গলা খাখারি দিলেন।

এখানে বলা আবশ্যক ভজহারির চেহারাটা ঠিক কবিক্রোড়িত নয়। মাথাটা লম্বাটে, পুরু, ঠোঁটে পানের ছোপ কালচে হইয়া আছে, তাহার মধ্য হইতে বড়ো বড়ো লাল লাল দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। গোফের দুই পাশ চাছা, অতিরিক্ত নস লওয়ার ফলে নাসিকা-গহবরের পরিধিটা অস্বাভাবিকরূপে বড়ো। অর্থাৎ সে মূর্তি দেখিয়া প্রথম দর্শনেই কাহারও প্রেমে পড়িবার সম্ভাবনা নাই, তাহার ব্যাকব্রাশ করা চুল, সিন্ধের পাঞ্জাবী এবং চুনটকরা ধতি সত্ত্বেও না। কিন্তু ভজহারির সে কথা বোধহয় জানা ছিল না। এক সপ্তে দশ বারো জোড়া কমল নয়নের বিস্মিত দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইতে দেখিয়া তিনি বিস্ময়মাত্র বিচলিত হইলেন না, বরং আনন্দে বিহবল হইয়া মুখ-গহবরের ফাঁক আরও বাড়াইয়া দিলেন। এক গাল হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আমি একটু আসতে পারি?"

ভদ্রমহিলাদের বিস্ময় সীমা ছাড়াইল। সেতারবাদিনীর সেতার থামিল, তাস-ক্রীড়া-নিরতাদের তাস থামিল, গল্পপ্রবণদের গল্প থামিল। মিনিটখানেক সকলেই নিস্তব্ধ। তারপর একজন মহাবয়সী ভদ্রমহিলা সাহস করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কে? কাকে চান?"

ভজহারি বিগলিত হইয়া বলিলেন, আমি কে তার পরিচয় কী দেব? আমি শ্রুশ্রু। আর কাকে চাই, তাই বা কি করে বলি? হয়তো আপনাদের সবাইকেই চাই। আপনারা গুণী, কত সভায় আপনারা পূজা পেয়েছেন, আমি পুরুষ বলে কি আমাকে কৃপা করবেন না? আমি আপনাদের সকলের কাছে করজোড়ে ভিক্ষা চাইছি।—

একজন স্থূলকায় মহিলা সেতারবাদিনীর পিছনে শাইয়া অধোরে ঘুমাইতেছিলেন, তিনি ভজহারির গলার শব্দে হঠাৎ খড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়াছিলেন। সব কথা তাহার কানে যায় নাই, তাই বলিয়া তিনি থামিবার পারতী নন। বলিলেন, "ভিক্ষা চাইতে তেতলায় উঠেছ কি করতে বাছা? কি রকম আক্কেল তোমার? নীচে চাকর দরোয়ানরা দর কাছে বললেই তো পারতে? ভিক্ষা কি, রোবান্দে আসতে

হাসি পাইল, ইংহারা তাহাকে সাধারণ ভিখারী মনে করিলেন নাকি শেষ পর্যন্ত? তিনি সব কয়টি দাঁত বাহির করিয়া বলিলেন, "আমি সে ভিখারী নই, আমি রসপিপাসু, শ্রুশ্রু।" স্থূলকায় মহিলা বলিলেন, "তাই বলে! তা তুমি কার শব্দর বাছা? কুটুম মানুষ, একটা খবর দিয়ে আসতে হয়। আমরা এই বেলা তিনটেয় রান্নাখাওয়া সেরে এঘরে একটু গাড়িয়ে নিচ্ছিলাম এমন সময়ে কুটুম এসে ঘরে ঢুকে তাকি জানি? হ্যাঁগা বোঁমারা, তোমাদের কার বাবা গো? নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসোওগে না?" একজন বধু একটু ঘোমটা টানিয়াছিলেন তিনি চাপা গলায় বলিলেন, "ঠানদি যেন সং, কি শোনেন, কি বোঝেন!" আর একজন অল্প-বয়স্কা মহিলা বলিলেন, "শব্দর নয় ঠানদি,



‘ওড়ব খাড়ব, সব জানি।’

ও শ্রুশ্রু। ও যে সে ভিক্ষে নেবে না, রসের কথা বলছে। আমাদের সবাইকে চায়! ভিক্ষে দেবে?"

ঠানদি একখিল পান বাটা হইতে লইয়া মুখে পুরিলেন, বলিলেন "তোরা থাম না, আমি কথা বলছি। বলি হ্যাঁগা, এ বাবসা কদিন ধরে? এই উচ্চা বয়েস, লোকের বাড়ির মধ্যে ঢুকে মেয়েদের দিকে নজর দাও. তোমার তো আপর্ধা কম নয়। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা? কান বাড়ি ঢুকেছ তা জানো?"

ভজহারি দেখিলেন, তাহার কথার ভুল অর্থ হইতেছে। বলিলেন, "আমি গান শুনতে এসেছি। আপনাদের কথা আমি সব জানি। উনি তো হীরাবাসী বরোদকার। ওঁর বাবা ছিলেন মুসলমান গায়ক, মা ছিলেন হিন্দু গায়িকা। কথা ছিল ছেলে হ'লে মুসলমান হবে, মেয়ে হ'লে হবে হিন্দু।"

সেতারবাদিনীর হাত হইতে সেতার পড়িয়া গেল; তিনি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বলিলেন, "ওমা কি ঘোমা, আমি কি বাঁজী?"

ভজহারি দিমিলেন না। বলিলেন, "আমি কি তাই বলেছি। বাঁজী আর বাই কি এক হ'ল? আপনি কি যে সে সুরশ্রু, ভারতবর্ষে আপনার নাম কে না জানে? দেখুন, আমি গান গাইতে ভালো পারি না, কিন্তু কান আমার তৈরী আছে। ওড়ব-খাড়ব সব জানি। পরীক্ষা করে দেখুন।"

একটি ভদ্রমহিলা গালে হাত দিয়া বলিলেন, "ওমা কি হবে? এ যে বংশ পাগল?"

আর একজন বলিলেন, "পাগল না আরও কিছ? বদমাইস; কলকাতায় আজকাল এরকম অনেক হয়েছে। দিব্বি ভদ্রলোকটি বেজে দিন-দুপুরে লোকের বাড়ি গিয়ে ঢোকে, সুবিধে পেলে ছাতাটা, জুতোটা, আরসিটা, দামী বইটা, সাইকেলটা—যা পায় সরায়। ধরা পড়ে এখন পাগল সাজছে।"

গোলমাল বতই বাড়িতেছিল, ভজহারির মোলোয়েম হইবার চেষ্টা ততই বাড়িয়া যাইতেছিল এবং ফলে তাহার আরও সুদীর্ঘ দলতপংক্তি ততই বিকশিত হইতেছিল। একটি যবতী সহসা সেইদিকে চাহিয়া শিহরিয়া তাহার পার্শ্ববর্তিনী মহাবয়স্কা ভদ্রমহিলাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "উঃ, কি ভয়ানক দাঁত! কি হবে ছোড়াদি. যদি কামড়ে দেয়?"

ভজহারি জিভ কাটিয়া বলিলেন, "ছি ছি, সে কি কথা; আপনারা বাকি ভয় পাচ্ছেন? আচ্ছা, এই আমি মুখ বন্ধ করলাম। এইবার নিন বাজনা আরম্ভ করুন।" ভজহারি দরজা সম্পূর্ণ খুলিয়া ভিতরে আসিয়া ঢুকিলেন।

যিনি সাহস করিয়া প্রথমে কথা কহিয়াছিলেন, তিনি বিবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দরজার দিকে জেঁড়ল দেখাইয়া বলিলেন, "বাজনা আর হবে না, আপনি বেরিয়ে যান। আর এক মুহূর্ত দেরী করলে দারোয়ানদের ডাকব।"

তিনি বিনীতভাবে বলিলেন, "দেখুন, আপনাদের মধ্যে ভয় পাবেন না। আমি কোন মন্দায় নিয়ে আসিনি, আমাকে এক মল্লুক এই বাড়িতে গান-বাজনা শোনবার নিষেধ করছিলেন। অন্য কাউকে পেলাম না, তাই আপনাদের ঘরে ঢুকিলাম। তা আপনাদের যদি আপত্তি থাকে, তবে আমি না হয় অন্য ঘরেই যাচ্ছি। পুরুষদের ব্যবস্থা কোথায় হয়েছে বলে দিন দয়া করে। আলাউদ্দীন খাঁ কি এসেছেন? বৃন্দা খাঁর সারেঙ হবে নাকি? ডেরাকওয়ার তবলা? বিসমিল্লার শানাই পাটি পৌছেছে।"

এক ভদ্রমহিলা বসিয়া বসিয়াই পিছ হটিতে হটিতে জানালার কাছে পৌঁছিয়াছিলেন,

তিনি হঠাৎ এক দিকের জানালা দিয়া মুখ বাড়িয়া চাইলেন। আর কবিরলেন—“চোর, চোর, বাড়ির মধ্যে চোর ঢুকেছে। ফতে সিং, গজধর, দুর্বল সিং, রণবাহাদুর, জলদি আও।” বাস, ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগিয়া গেল। সাহস পাইয়া পনেরো বৎসর হইতে ষাট বৎসর বয়সের দুই বারোটি অবলা কণ্ঠ তারস্বরে চীৎকার করিয়া দিল—“বড়দা, ছোট্ট, ও রে ও নিতাই—রণবাহাদুর! ওরে তাড়াতাড়ি আয়, জলদি আও।” “ওরে চোর আয়া, ডাকু আয়া, ছটকে আয় নারে সবাই। চোর চোর।”

ভজহরির অতিমাত্রায় বিরক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি ধৈর্য হারাইলেন না। বলিলেন, “আপনারা আমার প্রতি অন্যায় করছেন, আমি ভুল্লোকের ছেলে। আপনাদের বাড়িতে আমি আসিনি, আমাকে গান শুনতে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, তাই এসেছি। অকারণ অপমান করবেন না।

“গান শুনতে এসেছেন, না আরও কিছু। সাহসিকা ভদ্রমহিলা ধর্মক দিয়া বলিলেন, “চুপ করুন, চোর নাকামি করেছেন। ওতে আমাকে ভোলাতে পারবেন না। আপনাকে যদি আমরা পুলিসে দিই?”

ভজহরি এইবার রাগিলেন। বলিলেন, “দিন না পুলিসে? আমি তো কোন অন্যায় কাজ করিনি, কি করবে আমার পুলিসে?”

হুজুমত করিয়া দশ বারোজন একসঙ্গে ঘরে ঢুকিলেন। ‘বড়দা’ অর্থাৎ বাড়ির কর্তা এবং ছোট্ট অর্থাৎ তাহার যুবক ভাগিনেয় সকলের আগে, তাহাদের পিছনে রামচরণ, গোবর্ধন, গদাধর, নিতাই প্রভৃতি চাকরের দল এবং রণছোড়, রণবাহাদুর, গজধর, দুর্বল সিং প্রভৃতি দারোয়ানের দল। চক্ষুর পলক পড়িতে না পড়িতে কেহ ভজহরির হাত ধরিল, কেহ ভজহরির গলা টিপিয়া ধরিল, কেহ ভজহরিকে পিছন হইতে জাপটাইয়া ধরিল, কেহ ধরিবার মতো অন্য কোন স্থান না পাইয়া কান এবং চুল টানিয়া ধরিল। ভজহরির চোখ কপালে উঠিল, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

বড়দা ওরফে গৃহকর্তা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, “ব্যাপার কি, কে লোকটা?” সাহসিকা ভদ্রমহিলা হাত নাড়িয়া বলিলেন, “তা তুমিই জানো। ও তো বলছে তোমরা নানি ওকে নৈমন্ত্য করে এসেছ গান শুনতে। আচ্ছা নাকি বাইজী উনি রসের কথা শোনাচ্ছে?”

বড়দা অবাক হইয়া বলিলেন, “আমি তোমাকে গান শুনতে নৈমন্ত্য করছি? চালাকি করবার জায়গা পাওনি তুমি রাস্কল? নৈমন্ত্য করছি, দাঁড়াও। রণছোড়, দুর্বল সিং দাঁড়িয়ে দেখছ কি? বাঁধা ব্যাটাকে।”

হাতের কাছে আর কিছু পাওয়া গেল না, পালঙ্কে বিছানার চাদর ছিল, তাহাই পাকাইয়া ভজহরিকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধা আরম্ভ হইল। ভজহরির গলা এবং কান ছাড়া পাইয়াছিল; তিনি আপত্তি জানাইয়া বলিলেন, “আপনিও যে দেখছি মেয়েমানুষের বেহুন্দ। দেখলেন না, শুনলেন না, এসেই একেবারে পরের কথায় বাঁধা ব্যাটাকে?” ছোট্ট, হুস্কার ছাড়িল, “চোপ! রও, কথা বলেছ কি থাম্পড় খেয়েছ।”

গৃহকর্তা বলিলেন, “আর দেখে-শুনে কাজ নেই, যা দেখছি তাতেই যথেষ্ট হয়েছে। আমি বলে তাই প্রাণে বেঁচে গেলে, আমার ভায়েরা কেউ উপস্থিত থাকলে আজ তোমাকে জ্যান্ত পুতে ফেলত। ভুল্লোকের বাড়ির তেতলায়



দুর্বল সিং বলিল, ‘চল’ শব্দে’

উঠে মেয়েদের কাছে ইয়াকি করতে এসেছ শূয়ার। মুখ ঘসে হিড়ৈ দেব, জানো না?” কম্পিত কণ্ঠে ভজহরি বাধা দিয়া বলিলেন, “তবে যে তিনি বললেন, এ বাড়ির তেতলায় জলসা হবে? দারোয়ানেরা বললে, যান, গান আরম্ভ হয়ে গেছে। ওদেরই জিজ্ঞেস করুন।”

গৃহকর্তা দারোয়ানদের দিকে চাইয়া বলিলেন, “তোমরা বলেছিলে? তা ছাড়া তোমরা সবাই নীচে থাকতে একটা উটকো লোক তেতলায় এসে ওঠেই বা কি করে? বসে বসে আঙা দেবার আর ঘুমোবার জন্যে আমি তোমাদের মাইনে দিই? নিমকহারামের দল সব!”

রণছোড় হাতজোড় করিয়া বলিল, “হুজুর, হামাদের কি কসুর হইয়েসে? উ বলল, বাবদুর সোশ্বে কোথা আসে; তিনতলাতে যাবে

হামিলোক ভাবলাম, হোবেওবা। পুছল, বাজা শব্দ, হইয়েসে কি না? দিদিমণি তোখনে বাজা বাজাচ্ছেন, বোললাম, হইয়েসে। হামরা কি জানি শালা ডাকু আছে, ভাবলাম বাবদুর দোস্ত হোবে, তাই রাস্তা ছেড়ে দিগেসি হুজুর।

“এবার থেকে আমার হুকুম না নিয়ে আমার বাবাকেও রাস্তা ছাড়বে না।”

“জী হুজুরা—”

ঠানদিদি এতক্ষণে কথা কহিবার সুযোগ পাইলেন। বলিলেন—“ও যে কার শব্দ হইয়া বলছিল। বৌমাদের কারো বাবা টাবা নয় তো? দেখিস বাপু, শেষে আবার মাফ চাইতে না হয় কুটুমকে অপমান করে।”

আর একজন ভদ্রমহিলা বলিলেন, “না না, শব্দ হইলেন, বলছিল শব্দে।” “ঐ হোলো উড়েরা শব্দকেই সুড়সুড় বলে।” বড়দা অবাক হইয়া বলিলেন, “হে আবার কি?”

এতক্ষণে একটা প্রকাণ্ড দাড়ি আসিয়া পেঁপীয়াছিল। ভজহরির বন্ধন সম্পূর্ণ হইয়াছিল, তাহার নিশ্বাস পাইতে কষ্ট হইতেছিল; তিনি বহুকষ্টে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মরিয়া হইয়া বলিলেন, “আমার অপরাধ আমি গান শুনতে ভালোবাসি। তার জন্য যথেষ্ট অপমান আপনরা আমাকে করেছেন। ইচ্ছে হয় পুলিসে দিতে পারেন; কিন্তু কাজটা ভালো করছেন না। ভুল্লোকের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয়, তা আপনরা জানেন না।”

গৃহকর্তা বলিলেন, “তোমার কাছে ভালো-মন্দ কাজের জবাবদিহি দেবার বা সদৃশদেশ নেবার এখন আমাদের সময় হবে না, জেলখানাতে এর ভালো ব্যবহার পাবে বলেও মনে হচ্ছে না। দুর্বল সিং ওকে নীচে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখো, আমি থানায় ফোন করছি, এখনি লোক এসে পড়বে।” ঠানদি বলিলেন, “আহা কার বাজারে, বসে তো বেশী নয়। সাথে থাকতে কেন এমন, শব্দে রোগটি বাধিয়েছিলে বাবা? শব্দে চোর হলে বাবুরা না হয় ক্ষমা-ঘেন্না করত!” মেয়েরা হাসিয়া উঠিল।

দুর্বল সিং ভজহরির পিঠে একটি গোত্তা মারিয়া বলিল—“চল’ শব্দে।” ভজহরি যন্ত্রণায় কোঁক করিয়া একটা অস্ফুট শব্দ করিলেন। সেতরাদিনী যুবতী এতক্ষণে গৃহকর্তাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, “বাবা, ওকে পুলিসে দিয়ে দিও কি হবে; দু’এক ঘা দিয়ে ছেড়ে দিন। কিছু ক্ষতি তো করতে পারেন।”

গৃহস্বামী বলিলেন, “না মা, ও রকম লোকের একটু ভালো রকম শাস্তি হওয়া দরকার।”

ঠানদি হাসিয়া বলিলেন, “আহা, শব্দে আমাদের দয়ার প্রাণ; মারছে দেখে অমনি দয়া হয়েছে।”



বৌদি টিপ্পনী কাটিয়া বলিলেন, “হবে না, কম সম্মানটা দিয়েছে ওকে।” ঠানদি বলিলেন, “হ্যাঁ হ্যাঁ, মোটেরকর না কি বলছিল?” “বয়োদকার।”

থানার ভারপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর রায় ভজহরির দাদা অধ্যাপক ভট্টাচার্যকে চিনিতেন। তাঁহার চিঠি পাইয়া সদাশিব যখন থানায় পৌঁছিলেন, ততক্ষণে ভজহরির অবস্থা সংগীণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দারোয়ানের প্রথমত দুই-চারিটা গুঁতগাতি দিয়াছে। বাড়ির দরজার বাহিরে ‘ভঙের চোর ঢুকিয়াছে’ শুনিয়া এক বিরাট জনতা সমবেত হইয়াছিল, ভজহরিকে কোমরে দড়ি বাঁধিয়া পদুলিস যখন থানায় লইয়া চলিল, তখন তাহারা চাঁদা করিয়া মাথায় চাঁটি এবং পিঠে ধ্বংসি মারিতে মারিতে কিছুদূর পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। পদুলিসের নিষেধ সত্ত্বেও মারটা ভালো রূপেই হইয়াছিল। তাহার উপর আরও মাঝে মাঝে এক একজন পিছন হইতে এমন ল্যাং মারিতেছিল যে, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মৃৎ খুবড়াইয়া পড়া ছাড়া গতি ছিল না, ভজহরির নিত্যন্ত দর্জিপাড়ার ছেলে বলিয়াই প্রত্যেকবারই সামলাইয়া গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার সিস্কের পাঞ্জাবী ছিঁড়িয়াছিল, শান্তিপূরের ধূতি ছিঁড়িয়াছিল। তাঁহার মাথার চিরসুর্বিনাস্ত তোড়ি বিপর্যস্ত, বেশবাস প্রস্তুত, চক্ষুঃস্বয় রক্তবর্ণ, তাঁহাকে অধ্যাপক ভট্টাচার্যের ভাই বলিয়া ইন্সপেক্টর বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, সুতরাং কোমরে দড়ি-বাঁধা অবস্থায় তাঁহাকে কোমরেই বসাইয়া রাখা হইয়াছিল। সদাশিব পৌঁছিবাব পূর্বেও পদুলিসের নির্ঘাতনও বোধ হয় কিছু হইয়া থাকিবে, ভজহরির বাদপ্রতিবাদ বার্থে বড়িয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া শেষ পর্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। ইন্সপেক্টরের সম্মুখে নিজ ভ্রাতাকে তদবস্থায় উপবিষ্ট দেখিয়া চিরসহিষ্ণু সদাশিবেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি স্থান-কাল ভুলিয়া চাঁৎকার করিয়া বলিলেন, “তুই নিশ্চয় নেশা করেছিস।” ভজহরির মৃদুস্বরে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, “না, দাদা। আমি গান শুনতে—” সদাশিব অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিয়া বলিলেন, “তুমি ন্যাকা, গান শুনতে পরের বাড়ির দেউতালয় ওঠো। তোর কোন কথা আমি শুনতে চাই না। হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া, বাদির। আমাদের বংশের মৃৎ পোড়ালি। তুই, আমার উঁচু মাথা হেঁট করে দিলি। ভন্দর-লোকের বাড়ির দেউতালয় উঠে মেয়েদের সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে গেছলি হতভাগা? তোর এত বড়ো অসম্পর্ক। কোন আঞ্জলে তুই অজানা অচেনা লোকের বাড়ি—”

ইন্সপেক্টর রায় বলিলেন, “কিন্তুই আপনার ভাই তাহলে? আমার কে?” ইচ্ছল

না।” সদাশিব বলিলেন, “কি আর বলি বলুন, ভাই নয়—আমার সাত্ত জন্মের শত্রু। আচ্ছা, কোনরকমে একে জেল থেকে বাঁচানো যায় না? অবশ্য একেবারে যদি বে-আইনী হয়, তাহলে বলি না, তবে যদি পথ থাকে?”

ইন্সপেক্টর রায় বলিলেন, “আপনার ভাই যখন, তখন চেষ্টা করে দেখতেই হবে। আমি ভদ্রলোককে ফেনে ডাকাছি, দেখি তিনি যদি অভিযোগ তুলে নিতে রাজি হন।”

সদাশিব বলিলেন, “দেখুন চেষ্টা করে। না হয় আমাকেও দেবেন একবার ফোনটা। ও-হতভাগাকে দিয়ে না-হয় পারে ধরিয়ে মাফ চাওয়াব।”

পূর্বোন্নিখিত গৃহকর্তাকে টেলিফোনে ডাকা হইল। তিনি প্রথমত আসিতে চাহেন নাই, তারপর সদাশিবের অনুরোধে আসিতে সম্মত হইলেন, কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাড়ির মোটরে করিয়া আসিতেছেন বলিয়া সংবাদ দিলেন। সদাশিব একটু নিশ্চিত হইয়া বলিলেন, “দেখুন, সত্যি বলতে কি, এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে, ও কোন মন্দ অভিপ্রায় নিয়ে কারো বাড়ি ঢুকোঁছিল।”

এক ভদ্রলোক ইন্সপেক্টর রায়ের পাশে একটা চেয়ারে বসিয়া একতরফ খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, তাঁহার দিকে কাহারও লক্ষ্য পড়ে নাই। তিনি ইন্সপেক্টর রায়ের বন্ধু অজনবাবু। সদাশিববাবুর শেষ মন্তব্য শুনিয়া হঠাৎ তিনি মাথা তুলিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, ঠিকানার কোন গোলমাল হয়নি তো? রে স্ট্রীটের একটা বাড়িতে আজ রাতে একটা বিরাট জলসা আছে। আমার এক বন্ধু সেখানে যাবার মুখে আমাকে এখানে নামিয়ে দিয়ে গেলেন। রে স্ট্রীট শুনতে গ্রে স্ট্রীট শোনেন নি তো আপনার ভাই? কত নম্বরের বাড়ি বলুন তো?”

ভজহরির নিজের উপর বিশ্বাস হারাইয়া-ছিলেন। কম্পিত কণ্ঠে বাড়ির নম্বরটা বলিতেই অজনবাবু বলিয়া উঠিলেন, “আরে সেও ঐ নম্বর তো! কি সর্বনাশ! আপনি নিশ্চয় শুনতে ভুল করেছেন। এই দেখুন তাদের ছাপানো নোমস্বরের চিঠি, এই দেখুন নম্বর।” অধ্যাপক ভট্টাচার্যের মৃৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, ইন্সপেক্টর রায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। ততক্ষণে গ্রে স্ট্রীটের গৃহকর্তা রজনাতথবাবু আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। অধ্যাপকের মুখে ভজহরির সংগীতচর্চার আনন্দপূর্ণিক ইতিহাস শুনিয়া তাঁহার ক্রোধ পড়িল, অজনবাবুর মুখে ‘রে স্ট্রীটের’ জলসার খবর পাইয়া তাঁহার সন্দেহ ঘুচিল, তিনি আনন্দিত হইয়া বলিলেন, “তাহলে তো বড়ো অন্যায্য হয়ে গেছে! আমারও তখন মেয়েদের কথা শুনে ভীষণ রাগ হয়ে গেল, ওঁর কথা ভালো করে শুনলুম না। তা যাই বলুন আপনার ভাইটির মাথায় ছিট আছে একটু মশাই।”

সদাশিব বিনীতভাবে স্বর্গ করিলেন, “একটু নয় মশাই, ‘বিলক্ষণ।’” রজনাতথবাবু অভিযোগ তুলিয়া লইয়া ক্ষমা চাহিয়া বিদায় লইলেন। ভজহরির সম্মানে হাঁটুতে মৃৎ গুঁজিয়া বসিয়া রহিলেন, কথাও কহিলেন না, মৃৎও তুলিলেন না।

ফরিয়াদী পক্ষ অভিযোগ প্রত্যাহার করিলেও আসামী সহজে নিষ্কৃতি পাইয়া না। থানার ছোট-বড়ো সমস্ত কর্মচারী খুঁশি করিতে হইল; ইন্সপেক্টর ভদ্রতা করিয়া অবশ্য নিজে কিছু লইলেন না। রাতি আটটার সময় থানাপর্ব শেষ করিয়া অধ্যাপক ভট্টাচার্য যখন ভজহরিকে লইয়া ট্যান্ডি করিয়া বাড়ি পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার মনিবাগ শূন্য; ভজহরির মেজদা আসিয়া ট্যান্ডির ভাড়া মিটাইয়া দিলেন।

বাড়ির লোক সকলেই খুব সহানুভূতি দেখাইল। বড়বৌদি একটা জামবাটি করিয়া সর্বপ তৈল লইয়া আসিয়া বলিলেন, “ছোট-ঠাকুরপো, বন্ড লেগেছে কি? একটু তৈল মাশি কর দেব?”

মেজবৌদি হটবাগে জল ভরিয়া আনিয়া বলিলেন, “তার চেয়ে একবার হটবাগ দিয়ে দাখো বরং। ব্যথার ওপর তাপ পড়লে ভারী আরাম হবে।” সকলেই যেন ভজহরির আগমনের জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিল, সকলেই ডাক্তার।

সেজবৌদি চুপ-হলুদ গরম করিয়া আনিয়াছিলেন, বলিলেন, “পাখা মারতে এর তুল্য জিনিস নেই। আহা এই দুখের বালককে এমন করেও মারে মানুষ? তাদের বাড়িতে কি ছেলেপুলে নেই গা? তা হ্যাঁ ছোট-ঠাকুরপো, যে মেরোট সেতার বাজাচ্ছিল তার সঙ্গে বাকি তোমার ভাব হয়েছিল? আহা রাতনেই রতন চোনে।”

ভজহরির বাড়িতে পৌঁছিয়াও তেতালার ছাদে সমানে হাঁটু মৃৎ গুঁজিয়া বসিয়া-ছিলেন। উত্তর হইয়া বলিলেন, “আঃ, আমাকে একটুখানি ছেড়ে দাও না তোমরা। কারো কি কোন কাজ নেই?”

বড়বৌদি বলিলেন, “কাজ আর নেই? তাবলে।” রা এমন পাষণ নই যে তুমি পড়ে পড়ে ছটফট করবে আর আমরা সংসারের কাজ নিয়ে সেরে থাকব। হ্যাঁ ছোট-ঠাকুরপো, বন্ড ব্যথা করছে কি? দিই না একটু মেরি মাশি করে?”

না, তঁরা। তা গেছলে গেছলে বেশ করে-ছিলে, দিন-দুপুরে এরকম কাটখোটার মতন যায়? ধরা পড়েই তো মাটি করলে তা না হলে এ অবস্থা হত না। আমাদের পরামর্শ তো নাও না! আগে যদি বলে যেতে তাহলে কি এরকম সেজবৌদি কথার জের টানিয়া বলিলেন, “জানো তো ভাই, চুরিবিদ্যে বড়ো বিদ্যে যদি

কান্দে হয়? নাও এখন কোথায় ব্যথা বোলা, একটু চুপ-হলুদ দিয়ে দি।" বলিতে বলিতে একথাবলা গরম চুপ-হলুদ তাঁহার হাতে মাখাইয়া দিলেন। ভজহারি 'উঃ' করিয়া শিহরিয়া মৃদু তুলিলেন। ছোট বোন ধীরা একটা কাঁচের মেজর গ্লাসে করিয়া জলের মতো কি খানিকটা লইয়া বসিয়াছিল, বলিল, "এই আর্কিটাকটুকু খেয়ে নাও তো ছোড়দা, কাল তাহলে একদম ব্যথা হবে না।"

ভজহারি প্রথমত রাগ করিয়া গ্লাসটা শূন্য

টানিয়া ফেলিয়া দিতে বাইতৌছিলেন, হঠাৎ সুবৃষ্টির উদয় হওয়াতে আর্কিটাকটা মৃদুতর মধ্যেই ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, "স্বা-স্বা ফ্যাচ ফ্যাচ করিস নে। সবাই মিলে কি পেরোছিস আমাকে।"

মেজবোর্দি একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বালাইতৌছিলেন, একসরা লবণ এবং দুইটি ন্যাকড়ার টুকরাও সংগৃহীত হইয়াছিল। বলিলেন, "সত্যি বাপু এ তোমাদের ভারী অনায়াস; ও বলে মরছে নিজের জ্বালায়, এখন

তামাসা ভালোই লাগে না। হ্যাঁ ছোট্ট ঠাকুরপো বড় ব্যথা করছে বুঝি? একটু নুনের পুন্টস দেব?"

ভজহারি সহসা খাড়া হইয়া উঠিলেন। "তোমাদের কাউকে কিছু করতে হবে না আমার জন্যে, দয়া করে তোমরা বিদেয় হও।" বলিয়া উঠিয়া গিয়া তিনি নিজের ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দরজায় খিল দিলেন। সে রাতে বাড়ি-শূন্য লোকের সহস্র অনুরোধে-উপরোধেও দরজা আর খুলিলেন না।

## দেশীয় রাজ্য প্রজাপরিষদ

(গোয়ালিয়র অধিবেশন)

মণীন্দ্র গহ্ব

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব লোপ পাইবে। কাজে কাজেই স্বাধীন হইবার বাসনা অনেক দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের মনে জাগিয়াছে। হায়দরাবাদ, ত্রিবাংকুর প্রভৃতি রাজ্য স্বাধীন হইবার কথা ঘোষণাও করিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, এই স্বাধীনতা কাহার? দেশীয় রাজ্য-সমূহের রাজন্যবর্গের না তথাকার জনসাধারণের?

রাজনৈতিক চেতনা ও জনজাগরণে দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণ ভারতের অবশিষ্টাংশ হইতে কখনও পশ্চাৎপদ নহে। তাহারাও চায় স্বাধীনতা ও জনগণের মৌলিক অধিকার। নিখিল ভারত গান্ধী মহাসভার ন্যায় দেশীয় রাজ্য লোক-পরিষদেরও সৃষ্টি হইয়াছিল প্রথমে শাসক ও শাসিতের ভিতরে অপোষরফা, ও আবেদন নবেদন রক্ষা করার জন্য। সেই জনাই ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে এই দেশীয় রাজ্য প্রজা পরিষদের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন একজন দেওয়ান দেওয়ানবাহাদুর রামচন্দ্র রাও। কিন্তু আজ ইহা সম্পূর্ণ এক সংগ্রামশীল জীবনী প্রতিষ্ঠান।

উদয়পুরের অধিবেশনের ১৫ মাস পর ভারতের দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণ সম্মিলিত হইয়াছিল গোয়ালিয়রে। এখানে অনেক কিছু ভাঙাগড়া হইয়া গিয়াছে। দেশীয় রাজ্যের দশ কোটি জনের উপর দিয়া অনেক কষ্ট, অনেক দুঃখ ও অনেক নির্যাতনের ঝড় হিয়াছে। এমন কি সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি—কাম্বোজের বাঘ শেখ আব্দুল্লাহ রাজ্য কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।

১৯৪৮এর জুন মাসের পর ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের পর দেশীয় নৃপতিগণকে কি সেই গতানুগতিক ও সামন্ততান্ত্রিক শাসন চালাইয়া যাইতে দেওয়া হইবে? ভারতের বড় একটা অংশ যাহা দেশীয় রাজ্য নামে খ্যাত তাহার অধিবাসিগণ কি স্বাধীন ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই স্বৈরাচারী শাসনের অধীন থাকিবে? এ প্রশ্ন আজ সকলকেই চিন্তান্তবিত করিয়া তুলিয়াছে।

তাই এই যুগসন্ধিক্ষণে নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা পরিষদের বাৎসরিক অধিবেশন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিভিন্ন দেশ হইতে প্রতিনিধি, দর্শক ও কর্মীবৃন্দের উপস্থিতি এবং প্রকাশ্য অধিবেশনের বিপুল জনসমাগম অন্যান্যবাদের অধিবেশনের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। কাম্বোজ জম্বু হইতে ত্রিবাংকুর কোচিন এবং গুজরাট কাথিওয়ার হইতে ভারতের পূর্ব শেষ প্রান্ত সীমানার মণিপুর খাসি স্টেট প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন ধর্মের ও বিভিন্ন ভাষার অনেকেই মিলিত হইয়াছিল একই উদ্দেশ্যে। পূর্বের কোন পরিচয় নাই বা কোন আলাপ নাই—অনেকেরই অনেকে সঙ্গ, এমন কি আচার-ব্যবহার, চলাফেরা সকল বিষয়েই পার্থক্য। কিন্তু ব্যবহারে মনে হইত কর্তাদনের পরিচিত, কত আপনাতর লোক। সবচেয়ে মধুর ও আকর্ষণীয় হইত ভোজনকালীন দৃশ্য। কাম্বোজের প্রতিনিধি গোলাম মহম্মদ সাবিক পাশাপাশি বসিয়া খাইতেছেন খাসি স্টেটের প্রতিনিধি মিঃ অ্যাণ্ডের সহিত। পোষাক

পরিচ্ছদ, আহার ও ভাষায় একে অন্যের বিপরীত। আলাপ চলিতেছে গণপরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচন সম্পর্কে জগতের অতি সাধারণ ভাষা মানে জগত্তরঙ্গী সাহায্যে, কেননা একে অন্যের ভাষা বুঝিতে অক্ষম। "এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে"—কিবকিবর সেই ভারত-তীরের সত্যিকারের রূপ যেন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। দুই বা বহু জাতির পরিকল্পনা তাহাদের মনে কখনও জাগিয়াছিল কি না জানি না, তবে অন্ততঃ গোয়ালিয়রে যত সময় ছিলাম এরূপ ভাবের কোন প্রকাশ দেখিতে পাই নাই। ভূপালের প্রতিনিধি দলের সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা হইল। মুসলমান নবাবের শাসনাধীন স্টেট। নরেন্দ্র মন্ডলের সভাপতিও তিনি। জনসাধারণের কি ইচ্ছা? কি তারা চায়? ইত্যাদি শ্রুতিবার ও জানিবার আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক, ভূপাল স্টেট কংগ্রেসের সভাপতি মোলানা তাজিমাহারিকের সহিত অনেকক্ষণ পর্যন্ত আলাপ করিলাম। অন্যান্য প্রতিনিধিগণ বিশেষতঃ সাকিরালী সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। জনসাধারণের সেবা, অপূর্ণ সাহস ও বাস্তবতার জন্য তাহার মৃদু দেশবাসিগণ "শের-ই-ভূপাল" উপাধি দিয়াছেন। সাকিরালী সাহেবকে সেই বহুচর্চিত প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনাদের শাসনকর্তা মুসলমান, আপনারা অনেকেই মুসলমান। এই কংগ্রেস প্রভাবান্বিত দেশীয় রাজ্য লোক পরিষদের সহিত যুক্ত না থাকিয়া বরং মুসলিম লীগের সহিত যুক্ত থাকিলে আপনাদের পক্ষে বেশী লাভজনক হইত না কি? এই প্রশ্নে মোলানা সাহেব এতই বাগিয়াছিলেন যে, তাহাকে একটু ভ্রমতর মাত্রা বর্জন করিতে হইল। খুব জোরের সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহা বুঝিবার মত বুঝি আমার মগজে আছে কি? সাকিরালী সাহেব হাসিয়া বলিলেন, মোলানা সাহেব, এরা প্রতিনিধি অনেক কিছুই জিজ্ঞাসা করিবে যেমন কখন? কিছুদিন

হয় ভূপালের নবাব তাঁহার মস্টিমণ্ডলীর মধ্যে একজন মুসলিম লীগের, একজন হিন্দু মহাসভার ও একজন কংগ্রেসের মধ্য হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের সহিত জনসাধারণের সম্পর্ক কি? আর সেই মস্টিমণ্ডলীর কতটুকু বা ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন? লর্ড লিনলিথগো যেরূপ এই যুদ্ধের সময় কয়েকজন ভারতীয়কে শাসন পরিষদের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু জনমতের সমর্থন কি তাঁহারা পাইয়াছিলেন? ভূপালের নবাবের নতুন শাসনাধিকার ঘোষণা সম্পর্কে এই প্রশ্নের জবাব দিয়াছিলেন মোলানা মাসারিক সাহেব। গোয়ালিয়রের মহারাজার প্রদর্শনী গ্রাউন্ডে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অদূরেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গোয়ালিয়র দুর্গ। এই দুর্গেই হইতেই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরগণ শেষ প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন। সংগ্রামের অন্যতম নেত্রী স্বামসীর রাণী লক্ষ্মীবাসীর সমাধি এই দুর্গের নিকটেই অবস্থিত। সম্মেলনের স্থানকেও লক্ষ্মীবাসী নগর রাখিয়া অভ্যর্থনা সমিতি বিশেষ সমরোৎসবগামী কাজ করিয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং মূল সভাপতি ডাঃ পটুভি সীতারামিয়ার অভিভাষণের পর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রথম দিনের প্রকাশ্য অধিবেশনে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহাকে শুধু এই দেশীয়রাজ্য প্রজাপরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি বলিলেই শেষ হয় না। আজিকার এই বিরাট মহীরহের অন্যতম নবজন্মদাতা তিনি। অপর দিকে অন্তর্বর্তী সত্ত্বাকরের নায়ক। কাজেই শুধু যে রাজনৈতিক দিক হইতে পণ্ডিত নেহরুর ভাষণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাহা নহে, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নেতা হিসাবে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য প্রায় দু'লক্ষের উপর লোকের ভীড় হইয়াছিল। গণপরিষদে যোগদানে নৃপতিবৃন্দের অস্থিরতা সম্পর্কে যখন বক্তৃকর্মে তিনি ঘোষণা করিলেন, “এখনও যারা গণপরিষদে প্রবেশ করে নাই নবজাগ্রত ভারত তাহাদের শত্রুরূপেই চিনিয়া রাখিবে।” বিরাট জনসমুদ্রের ভিতর তখন কি যে আলোড়ন হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। বিষয় নির্বাচনীসমিতি এবং পরে প্রকাশ্য অধিবেশনে যে সকল প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছিল, একটি বাদে আর সকলকে মামুলী বলা যায়ইতে পারে। মামুলী বলি এই জন্য যে, দেশীয়রাজ্য প্রজা আন্দোলন দমন, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ প্রভৃতির নিন্দাসূচক যত প্রস্তাবই উত্থাপিত হইয়াছিল এ সম্পর্কে আপত্তি থাকিতে পারে কারার?

কিন্তু পণ্ডিত নেহরু ও নরেন্দ্রমণ্ডলের সভাপতির মধ্যে যে সাময়িক চুক্তি হইয়াছিল, তাহা এই সম্মেলন মানিবে কিনা ইহাই ছিল একমাত্র বিতর্কমূলক প্রস্তাব। সাম্যবাদী দল ও অন্যান্য বামপন্থী দল কর্তৃক বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছিল কতকটা। কিন্তু প্রকাশ্য অধিবেশনে এই প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে।

হিন্দু মহাসভা মাঝে মাঝে বিক্ষোভ প্রদর্শনের চেষ্টা করিত। নেহরু ফিরিয়া যাও, শেখ আব্দুল্লা নিপাত যাউক এই ছিল বিক্ষোভকারীদের ধ্বনি। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন সকালে পণ্ডিত নেহরু যখন টাউন হলে মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিক সম্বর্ধনা গ্রহণ করিতে যাইতেছিলেন, তখন কতিপয় বিক্ষোভকারী পণ্ডিতজীর গাড়ীর উপরে ইষ্টক নিক্ষেপ করে। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে একজনকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম— দেশীয় রাজ্যগুলি যাহাতে অধিকসংখ্যায় গণপরিষদে যোগ দেয় ততই ভাল, তবু কেন তাহারা এরূপ করিতেছে? তাহাদের আপত্তি সেখানে নয়, কাশ্মীর হিন্দু নৃপতির শাসনাধীন। বর্তমানে কাশ্মীরের আন্দোলনের জন্য হিন্দু নৃপতির শাসন চলিয়া গেলে মুসলমানের অধীন হইবে। কংগ্রেসের তোষণ-নীতিই মুসলিম লীগের বর্তমান প্রতাপের অন্যতম কারণ। পণ্ডিত নেহরু পতৌদির নবাবের প্রজাদের নির্যাতনের সময়ে সেখানে না গিয়া কাশ্মীরে গেলেন কেন? দ্বিতীয় দিনের প্রকাশ্য অধিবেশন যখন চলিতেছিল, তখন মণ্ডের নিম্নে এবং প্রতিনিধিবর্গের বসবার সম্মুখে হঠাৎ একটা পটকার বিস্ফোরণ হয়। কিছু গোলমাল ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। পণ্ডিতজী তাড়াতাড়ি মাইক্রোফোনের সম্মুখে আসিয়া শান্তিতে বসিতে সকলকে অনুরোধ করিলেন। তিনি রহস্য করিয়া বলিলেন, যে পটকার একটা মাছও ধ্বংস করিতে পারে নাই, তাহা দেখিয়া ভয় করিলে আণবিক বোমার যুগে চলিবে কেন? আজ একথা সত্য যে দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের মধ্যে তিনটি দলের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমটি জয়পুর, যোধপুর, কোচিন, বরোদা, বিকানীর, পাতিয়ালা দল। ইহারা জন-জাগরণ উপলব্ধি করিয়াছে। কাজেই সময়ের তাগিদে চলিবাব জন্য কংগ্রেসের সহিত আপোষ-রক্ষা করিতে উদ্বীর্ণ। দ্বিতীয় দলকে গণ-পরিষদবিরোধী দল বা মুসলিম লীগদল বলা যায়ইতে পারে। নরেন্দ্রমণ্ডলের সভাপতি

ভূপালের নবাব এই দলে নেতৃত্ব করেন প্রচ্ছন্ন-ভাবে। তৃতীয় দলটি হইয়াছে জাম সাহেবের দল। ত্রিষাকুর, মহাশয়, কাশ্মীর ইত্যাদি এই দলভুক্ত। ইহারা এ দিকও নয়, ও দিকও নয়। ইংরাজ চলিয়া গেলে ইহারা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাজ্যের শাসনকর্তা হইতে চান।

সভাপতি ডাঃ পটুভি সীতারামিয়ারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তিন কেন গণপরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচন সম্পর্কে রাজন্যবর্গের সহিত আধা ভাগাভাগিতে রাজী হইয়াছিলেন? স্বভাববিসম্মত রসিকতায় তিনি উত্তর দিয়া-ছিলেন,—মস্ত্রী মিশনের ঘোষণা অনুসারে গণপরিষদে তিন পক্ষের সৃষ্টি হইয়াছে, কংগ্রেস ও অন্যান্য একপক্ষ, মুসলিম লীগ ও রাজন্য-বর্গ। গণপরিষদে যদিও কংগ্রেস অনন্য-সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়াছে, মুসলিম লীগ এখন পর্যন্ত অনুপস্থিত। কাজেই রাজন্যবর্গও যদি অনুপস্থিত থাকে তবে গণপরিষদের একাংশ পক্ষাঘাত গ্রস্তের ন্ত মনে হইবে। কাজেই যে কোন প্রকারে রাজন্যবর্গকে একবার গণপরিষদে উপস্থিত করান দরকার। দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে জনসাধারণের দাবীই সর্বদা উচ্চ স্থান লাভ করিবে। রাজা, মহারাজা বা নবাবগণের নহে। আমাদের পক্ষে একজন থাকিলেও আমার বিশ্বাস সে একাই জনমতকে সংগে আনিতে পারিবে। এ চুক্তি দ্বারা আমাদের কোন ক্ষতি হয় নাই, বরং লাভ হইয়াছে বেশী। ইংলন্ডের শ্রমিক দলের ভূতপূর্ব নেতা পরলোকগত জর্জ ল্যাস্‌সবেরী মহামতি লেনিনকে ব্রেস্ট লিডভিনস্কের চুক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—আপনি কেন এরূপ অসম্মানজনক চুক্তিতে সম্মতি দিয়া-ছিলেন। লেনিন বলিয়াছিলেন, এ ভিন্ন আমাদের কোন উপায় ছিল না। যদি বিশেষ অন্তঃসজ্জিত দস্যু আসিয়া আপনার সম্মুখে দাঁড়ায়, তখন আপনি কি করেন? প্রতিবাদ করিতে যাওয়া মানে মৃত্যু। ধনদৌলত ছাড়িয়া দিয়া ইহাদের বিনাশের চেষ্টা করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা, বরং ব্রেস্টলিডভিনস্কের চুক্তির জন্য শিশু সোভিয়েট সরকার তখন শক্তিবৃন্দের সুযোগ পাইয়াছিল। অদৃষ্টিতে যদিও গণপরিষদের সদস্য নির্বাচন নৃপতিবৃন্দ প্রজাবর্গের সহিত আধা-আধি ভাগে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন। কিন্তু রাজন্যবর্গের সেই কয়জন মাত্র প্রতিনিধি বি-জাগ্রত জনগণের দাবী চাপিয়া রাখিতে পারিবে? এ ঘোষণাজোয়ার রুখিবে কে?

# যাত্রিদল

## শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

উনবিংশ অধ্যায়

সে দিন অপরাহ্ন। বেলায় যুগবাণী অফিসে অসিত একাকী চুপ করিয়া বসিয়াছিল। যুগবাণী সাপ্তাহিক কাগজ। আজ কাজের ভিড় ছিল না—তাই অন্যান্য যে কয়জন সম্পাদক, সহসম্পাদক ইত্যাদি তাহারা ইতিপূর্বেই যে যাহার বাসায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন। অসিত সামান্য কয়েকটি খুঁটিনাটি কাজ তখনও করিয়া শাইতেছিল। কিন্তু মন তাহার আজ মোটেই ভাল ছিল না। সে ফাইল ও কাগজপত্র বন্ধ রাখিয়া চুপ করিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিল। সেদিনের বাদলা এখনও কাটিয়া যায় নাই—আজও সারাদিন ধরিয়া কখনও কম কখনও বেশী করিয়া বৃষ্টিধারা বরিয়া পড়িয়াছে—এখনও একখণ্ড অত্যন্ত ঘনকৃষ্ণ মেঘ আকাশের দক্ষিণ-প্রান্তে কাল ধরিয়া ধীরে ধীরে উর্ধ্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছিল—হয়তো এখনই আবার বৃষ্টিধারা একেবারে চাপিয়া আসিবে। এই মেঘের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া অসিত কত কি ভাবিতেছে। সেই যে মৃণালিনী সেদিন কল্যাণীকে সব কথা জানাইতে উপদেশ দিয়া-ছিলেন—সে কথা সে এ কয়দিন দিনরাতি ভাবিয়া চলিয়াছিল—কিন্তু কি ভাবে কেমন করিয়া তাহাকে বুঝাইবে তাহার কোন কুল-কিনারা না পাইয়া অবশেষে গতরাতে সে সমস্ত কথা কল্যাণীকে খুলিয়া বলিয়াছে। কল্যাণী কিন্তু একটা কথাও বলে নাই—কোন প্রকার তর্কও তোলে নাই—সে শুধু নিষ্পলক দৃষ্টিতে পাষাণ মূর্তির মত চুপ করিয়া বসিয়াছিল। গুরুত্ব যে কতখানি—দরকার হইলে কতখানি যে তাহাকে বিসর্জন দিতে হইবে, হয়তো তাহার পরিমাপ করিয়া উঠা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল। সেই নিষ্পন্দ মূর্তি হইতে যথার্থ বাধা বরিয়া বরিয়া পড়িতেছিল। অসিত বেশীক্ষণ সেই দিকে তাকাইয়া থাকিতে পারে নাই—দুই চোখ বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া শাইয়াছিল কেন? এমনি করিয়া কখন যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঘণ্টা দুই পরে হঠাৎ ঘুম তাহার ভাঙিয়া যাইতেই দেখিতে পাইল কল্যাণী সেই যে খাটের পাশের দেওয়ালের উপর হেলান দিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল ঠিক তেমনিভাবে বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘরে তখনও আলোটি উজ্জ্বল হইয়া

জ্বলিতেছিল—সেই আলোকে অসিত দেখিতে পাইল যে দুই ফোটা চোখের জল তাহার দুই চোখের কোণ বাহিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছিল—তাহার দাগ এখনও মলাইয়া যায় নাই। অসিত অতি সন্তপণে দুই হাতের ভিতরে তাহাকে টানিয়া লইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিতেছিল—স্পর্শ পাইয়া কল্যাণী জাগিয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু একটা কথাও না কহিয়া চুপ করিয়া বিছানায় একেবারে অসাড়ের মত পড়িয়া রহিল। অসিত তাহার পর আর সারারাত ঘুমাইতে পারে নাই। আজ সারাটা দিন ধরিয়া শুধু সেই কথাই ভাবিয়া চলিতেছে। ইতিমধ্যে কখন দক্ষিণের সেই কালো মেঘখানা একেবারে মাথার উপর আসিয়া পড়িয়াছে এবং তাহা হইতে অজস্রধারে জলধারা বরিয়া পড়িতেছে—অসিত সে খেয়াল করে নাই। হঠাৎ জামা কাপড় ভিজাইয়া মধুকর ঘরের ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছাতাটি একপাশে রাখিয়া মাথাটি কোঁটার কাপড় দিয়া মুছিয়া লইয়া যখন তিনি অসিতের পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন—অসিতের তখনও বাহাজ্ঞান ছিল না।

তিনি অসিতের পিঠে হাত দিয়া ডাকিলেন—অসি!

অসিত চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—দাদা!

এমন চুপ করে বসে কেন ভাই? কিন্তু অসিত কোন জবাব দিল না।

দুইজনে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকার পর মধুকর বলিলেন—এতো ভাল নয় ভাই?

—কি দাদা!

—এই হৃদয়বেগ—এই ভাবপ্রবণতা। এমনি ভাবপ্রবণতা মনকে যে বড় কোমল করে দেয় অসি! যতই ভাববে ভাবনা যে ততই বেড়ে যাবে—তাইতো যারা বিংশবী তাদের দৃঢ়হস্তে সংসারের সকল মায়া, সকল বন্ধন ছিন্ন করে হাসতে হয়, মনকে করতে হয় নিরম্ম কঠিন।

অসিত সহসা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল—তাই হবে হয়তো দাদা! কিন্তু এতদিন ধরে আমার একটা মিথ্যা ধারণা ছিল—সেদিন মৃণালদাদিও সেই ধারণাকেই দিলেন শতগুণে বাড়িয়ে, কিন্তু এখন দেখছি সব ভুল সব মিথ্যে।

মধুকর জিজ্ঞাসা করিলেন—কি ধারণা অসি!

—ভেবেছিলাম আপনার কঠিনতা শুধু বাইরের জিনিস, অন্তরের সঙ্গে এর কোন-খানেই একটুও যোগ নাই। কে কোথায় খেতে পেলে না সেই দুঃখে আপনি কেঁদে আকুল হয়ে ওঠেন—কে কোথায় বিনা চিকিৎসায় মারা গেল তা আপনি ভাবতে পারেন না। এসব হয়তো আমরা ভুল করে মনে করি এ আপনার দরদ—প্রেম। কিন্তু আজ ভাবছি কি দাদা, হয়তো আপনার ঐ দীর্ঘ বলিষ্ঠ রুদ্ধ দেহটার মধ্যে একবিষদুঃস্বপ্ন কোথাও অবশিষ্ট নেই, সব শক্তিরে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছে। আপনি শুধু দুই চোখ দিয়ে দর্শনই করেন—হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেন না! মৃণালদাদিও আমারই মত ভুল করেছেন। এমন করে পাষণে বুক কেমন করে বাঁধলেন দাদা! মধুকর একটা কথাও কহিলেন না। দিনান্তের সূর্য তখনও মেঘের আড়ালে হয়তো একেবারে বিনয় লইয়া যায় নাই, তবু ইহারই মধ্যে সমস্ত আকাশ কাল হইয়া উঠিয়াছে। বাহিরের সেই আধ-অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া তিনি বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। সহসা সেই বিশাল পাষাণ দেহ ভেদ করিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসার মধুকর এবং অসিত উভয়েই লম্ভিত করিয়া ফেলিল। সেই নিষ্পন্দ মূর্তির দিকে তাকাইয়া অসিতের সহসা মনে হইল হয়তো কিছুই সে জানে না—যাহা সে এইমাত্র বলিয়া গেল—হয়তো সকলই তাহার একেবারে ভুল।

সে বলিয়া উঠিল—কি হয়েছে দাদা! আমি মাপ চাইছি দাদা, মন আমার সত্যিই ভাল নাই—কি বলতে কি বলে আপনাকে আঘাত করেছে!

মধুকর শান্ত কণ্ঠে বলিলেন—কিছুই তো অনায়াস বলনি ভাই—সত্যিই যে হৃদয় আমার একেবারে শক্তিরে কাঠ হয়ে গিয়েছে—মারা মমতা বলে কিছুই তো কোথাও আর অবশিষ্ট নেই!

পরে পুনরায় কিছুক্ষণ নীরবে কাটাইয়া বলিলেন—একটা গম্প শোন অসি!

সে অনেকদিনের কথা—দীর্ঘাকর গুরুত পিতার মৃত্যুর পর অগাধ পৈতৃক বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু ধনের সঙ্গে সঙ্গে নানা উপসর্গ এসে দেখা দিল এবং মরবার সময় পুত্র স্বেচ্ছাকরকে দিয়ে গেলেন বিপুল ঋণভার এবং পিতামহের জীর্ণ খড়ের ঘরওয়াল্য একখানি বসত বাড়ি। স্বেচ্ছাকরের বয়স তখন মোটে পনের ষোল—সংসারে আপনার বলতে আর বেউ নাই—এদিকে দেনার দায়ে বসত ভিটাটিও নীলাম হয়ে গেল। অগত্যা সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে একদিন তিনি পুত্রকে সম্বল করে পথে বোঁরিয়ে

পড়লেন। নিতাই মন্ডল ছিল দিবাকরের গোমস্তা—শুধু গোমস্তা নয়, সর্বময় কর্তা বললেও চলে। কর্তার এই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার সুযোগ নিয়ে যখন নানা জনে নানা সুবিধা করে নিচ্ছিল তখন তিনিও এদিকটায় একটু বিশেষ মনোযোগী হয়ে উঠলেন এবং নিজের ও পুত্র পৌত্রাদির ভবিষ্যত ভেবে কিছু মোটা রকমের পাকা ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু যখন মনিব পুত্র এমনি কাঙাল হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলো তখন তার মনেও একটু বাধলো। তাই পথের পরিবর্তে নিতাই মন্ডলের বৈঠকখানায় সুধাকর গুরুত্বের স্থান হলো। সুধাকর সামান্য লেখাপড়া যা জানতেন তাই দিয়েই নিতাই মন্ডলের বৈঠকখানা ঘরে পাড়ার নমঃশূর ছেলেদের নিয়ে পাঠশালা খুলে বসলেন, কিন্তু এরই ফাঁকে ফাঁকে কখনো কখনো নিতাইয়ের হালের গরুটা সরিয়ে দিতে হতো—হয়তো দুই পাক লাগলখানা ধরে নিতাইয়ের চাকরটাকে তামাক খাবার জন্যে একটুখানি অবসরও করে দিতে হতো। বৎসর তিনেক এমনি গেল। কিন্তু ষাড়ে বেশীদিন এরূপ ব্যবস্থা না সহ্য হওয়ায় আর একদিন উদ্দেশ্যহীনভাবে তিনি পথে নেমে পড়লেন। কিছু দিন পরে একদিন এক স্বজাতির বাড়ি গিয়ে উঠলেন—বাড়ির কর্তা গিন্নী তাকে পরমানন্দে গ্রহণ করলেন। কর্তাটি ছিলেন কবিবাজ—সুধাকর তাঁর কাছে চিকিৎসা বিদ্যা শিখতে লাগলেন—কিন্তু গুরুদ্বি বিশেষ কিছু জানতেন না—কাজেই শিষ্যও কিছু শিখলেন না। অবশেষে একদিন গুরুর ময়ের সংগে হলো শিষ্যের বিয়ে। কিন্তু অনটনের সংসার নানা কারণে খিটখিট লাগতে লাগলো, অবশেষে স্বশূর গেলেন মারা—সম্বন্ধীদের সংগে বিবাদ করে সুধাকরের সে বাড়িতে আর বাস করা চললো না। অবশেষে আবার সেই নিতাই মন্ডলের বাড়ি এসে তাকে ধরে একখানা ঘর নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে সেখানে এসে বাস করতে লাগলেন। সুধাকর এখানে এসে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করলেন। কিন্তু দুই চার টাকা যা পেতেন তাতে ভাল করে দুই-জন প্রাণীরই আহার জুটতো না। এই দুঃখ কষ্টের মধ্যেই আমি জন্মগ্রহণ করলাম অসি! অসিত একেবারে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল—আপনি দাদা!

—হ্যাঁ ভাই, এই আমার কুল পরিচয়। এমনি করে আমার আরো একটি ভাই, একটি বোন হলো। নিতাইকে বাধ্য হয়ে কত সময় কত ভাবে আমাদের সাহায্য করতে হয়েছে। আমার মনে আছে অসি—কর্তাদিন নিতাইয়ের স্ত্রীর কাছ থেকে আমরা ভাত চেয়ে খেয়েছি—জাতের কথা সেখানে ওঠেনি ভাই! মার আমার দুঃখের জলে সময়ে সময়ে বুক ভেসে যেতো। বাবা আশ্রয় চেষ্টা করেও আমাদের দুঃখের অন্ন জোটাতে পারতেন না।

বেঁকে বসলো—বাধ্য হয়ে তার বাড়ি থেকে উঠে আসতে হলো নিজেদের গ্রামে। গ্রাম নিজেদেরই বটে—তবে নিজেদের বাড়ি বলতে তো কিছু ছিল না। বাবার দূরসম্পর্কীয় এক ভাইয়ের পরিত্যক্ত বাড়িতে গিয়ে নিলাম আমরা আশ্রয়। কিন্তু এখানে আর এক নতুন বিপদ এসে উপস্থিত হলো—স্বজাতিরা আমাদের একঘরে করে রাখলেন। এতদিন আমরা নমঃশূর বাড়িতে ছিলাম—তাদের জল খেয়েছি, ভাত খেয়েছি। তবু দিন কাটতে লাগলো—কেমন করে যে কাটলো তার সব কথা আজ আমি বলতেও পারবো না—শুনেও তোমার কাজ নেই অসি—শুনলে তুমি স্থির থাকতে পারবে না ভাই। এমনি করে আমার জীবনের বারটি বছর কাটল। এবার যেন সকলে মিলে সত্যি সত্যি অনাহারে মরবো এমনি মনে হতে লাগলো। মা আমার এক একবার দুই তিন দিন শুধু জল খেয়ে কাটিয়ে দিতেন।—কর্তাদিন অনাহারে দুর্বল শরীর তাঁর জ্ঞানহারা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে—আমরা চোখে মূখে জলের ছাঁট দিয়েছি আর পাশে বসে কেঁদেছি। পরে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মধুকর পুনরায় আরম্ভ করলেন—জীবনে কিছুই পাইনি ভাই—কিন্তু পেয়েছিলাম মাতৃস্নেহ, সেই স্নেহধারায় সেই বয়সেই বৃদ্ধি আমার সারা মনপ্রাণ একেবারে ভরে নিয়েছিল অসি! আজও আমার দেহের কানায় কানায় সেই মাতৃস্নেহই বিরাজ করছে। সেই আমার সব কাজে সহায়—সেই আমার একমাত্র সম্বল। কিন্তু এই স্নেহও আমার কপালে বেশীদিন সহিলো না। আমাদের গ্রামের কাছাকাছি মিশনারী সাহেবদের আস্তা ছিল। সাহেবরা মানুষের অভাবে সাহায্য করতেন—সহানুভূতি দেখাতেন কিন্তু সে ছিল তাদের খৃষ্টান করবার প্রধান অস্ত্র। এখন যখন আমাদের বাড়ি দিয়ে রাখবার আর কোন পথই রইলো না তখন বাবা, মা কি সব পরামর্শ করে আমাকে এই মিশনারীদের হাতে তুলে দিলেন। মা আমাকে বৃকে জড়িয়ে ধরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন—জ্ঞান হলে পর কেঁদে কেঁদে বলছিলেন—মধু যেখানেই থাকিস বাবা, আর তো এমনি করে না খেয়ে শুকিয়ে মরবি না—আমি এই ভেবে সব দুঃখ সহ্য করবো বাবা যে তুই ভাল আছিস, তুই খেয়ে পরে বেঁচে আছিস। মা বাবাকে ছেড়ে, ভাই বোনদের ছেড়ে কাদতে কাদতে মিশনারীদের সংগে চলে এলাম অসি! মধুকরের কণ্ঠ বাস্পরূপে হইয়া গেল মধু দিয়া আর একটা কথাও বাহির হইতে চাহিল না।

পুনরায় বলিতে লাগলেন—কয়েকদিন পরেই মিশনারী সাহেবরা আমাকে বাঁকড়া জেলায় নিয়ে গেলেন। আমার খৃষ্টান নাম হলো এ্যালফ্রেড। এক বড়ী মেম সাহেব ছিলেন আমাদের অভিভাবক—কি তার কড়া মেজাজ—

একটু এদিক ওদিক হলে কি তার গালাগালি! বড়ী মেম সাহেব যখন গাউন পরে মূখে পাউডার মেখে, হিল্-উ-হু জুতো পায় দিয়ে খট খট করে ঘুরে বেড়াত—তখন আমার মায়ের কথা মনে পড়তো। মনের মধ্যে ভেসে উঠতো আখ ময়লা টকটকে লাল পেড়ে শাড়ী পরা আমার মায়ের মূর্তিখানা—মুখখানা তাঁর শুকিয়ে গিয়েছে—মমতায়, করুণায় দুই চোখ উঠেছে ছল্-ছল্ করে। ভাবতে ভাবতে আমি কেঁদে ফেলতাম। সব সময় ভাবতাম কেমন করে এদের এই জাল থেকে মুক্তি পাব! তবু বছর দুই আমার এদের সংগে কেটে গেল। অবশেষে একদিন এদের কাছ থেকে পালিয়ে মাস তিনেক ধরে পথে পথে ঘুরে দেশে এসে উপস্থিত হলাম। দেশে এসে দেখলাম কেউ সেখানে নেই, লোকে বন্ধে বাবা সবাইকে নিয়ে রাজসাহী জেলার কোন্ এক জমিদারের কাছারীতে চাকুরী করতে গেছেন। আরও মাস দুই গেল খোঁজ করতে—খুঁজে তাদের বের করলাম অসি! কিন্তু আমার মাকে আর আমি পেলাম না ভাই—তারই মাস দুয়েক আগে মা আমার সকল জমালার শেষ করে স্বর্গে চলে গেছেন। আমি সোঁদীন সারাটা দিন ধরে মাটিতে পড়ে পড়ে শুধু কাদলাম। যে মাকে দেখবার জন্যে এত কষ্ট করে এত পথ ছুটে এলাম—তাকে আর দেখতে পেলাম না! আমার যে দুঃখে সে দুঃখে শুধু অন্তর্যামী ছাড়া আর কাউকে বলবো না ভাই! বাবা এক জমিদার বাড়িতে পায়নের কাজ করতেন—ছোট ভাইটি তাঁর কাছেই ছিল—বোনটিকে শুনলাম নিকটে কোন গ্রামে বিয়ে দিয়েছেন—সে নাকি সুখে আছে! আবার পথে বেরিয়ে পড়লাম—মন আমার আর যেন স্থির হয়ে থাকতে চাইল না—সব সময় মনে পড়তো মায়ের সেই সজল বিষম মূর্তি। অবশেষে কলকাতায় এসে উপস্থিত হলাম। এবার আমার ভাগ্য প্রসন্ন হল, বিধাতা মধু তুলে চাইলেন—এখানে এসে বার আশ্রয় পেলাম তিনি আমাকে হৃদয়ের সমস্ত স্নেহমমতা দিয়ে কোলে তুলে নিলেন। লেখাপড়া শিখলাম—দেশকে চিনলাম। তাঁরই করুণায় ইউরোপের নানাদেশ ঘুরে এলাম। তিনি আর কেউ নয়, আমাদের সমিতির কর্ণধার, মিঃ মুখার্জি। এই যে তুমি একটু আগে বাকি ছিলে অসি, যে আমার হৃদয় একেবারে পাষণ হয়ে গিয়েছে—তোমার সে কথা অক্ষরে অক্ষরে ঠিক ভাই! দুঃখের সত্যিকারের যে কি ছাঁচ! তা আমি জানি—আমাদের দেশের সত্যিকারের অবস্থা বলতে যে কি বোঝায় তাও আমার বৃকে একেবারে দাগ কেটে বসে আছে।—আমার মায়ের মতো শত সহস্র মা যে আজও দেশের ঘরে ঘরে অনাহারে শুকিয়ে মরছে—এই সবই যে আমি দুই চোখ ভরে দেখতে পেয়েছি ভাই—আর এরই চাপে হৃদয়ের যত স্নেহ, ভালবাসা যত কোমল বৃত্তি, সব বিশ্ববের বিবে

একেবারে জঞ্জীরিত হয়ে পাষণ হয়ে গিয়েছে। মধুকর চুপ করিলেন—কিছুক্ষণ পূর্বে তাঁহার দুই চক্ষু ছাপাইয়া যে অশ্রুধারা দরবিগলিত ধারে বহিয়া যাইতেছিল তাহা এতক্ষণে শুকাইয়া গিয়া সেই চক্ষুই আবার কি একটা হিংস্র উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতে লাগিল কিন্তু অন্ধকার ঘরে অসিত ইহার কিছুই বদলিয়া উঠিতে পারিল না।

### বিংশ অধ্যায়

রাতি তখন দশটা বাজিতে অল্প কিছু বাকী ছিল। মধুকর ও অসিত গড়ের মাঠের পশ্চিম দিকের একটি কোণায় চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। মাঠের মাঝে দূরে দূরে দুই একটি উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল। এদিকটার বেশ খানিকটা অন্ধকার, কাছাকাছি কোথাও জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। আরো কিছুক্ষণ এমনি কাটিবার পর মধুকর দেয়াশালীয়া জুলালিয়া পকেট হইতে খড়ি বাহির করিয়া সময় দেখিলেন।

অসিত জিজ্ঞাসা করিল—কয়টা বাজে ?

মধুকর বলিলেন—দশটা বাজতে পনের মিনিট বাকী—এখন ওঠো!

বলিয়া দুইজনেই উঠিয়া দাঁড়াইল। আরো খানিকটা পশ্চিম দিকে আগাইয়া একেবারে গঙ্গার পাশ দিয়া যে রাস্তাটি গিয়াছে তাহার উপর আসিয়া দুই জন দুই দিক ধরিয়া চলিল। মধুকর সোজা দক্ষিণে এবং অসিত আরো একটু উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া একটি বটগাছের নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। গাছটি একেবারে গঙ্গার পাড় ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অসিত আসিয়া গাছটির পিছনে আত্মগোপন করিয়া বসিয়া পড়িল। স্থানটি যেমন অন্ধকার তেমনি নির্জন। সে তেমনি ঠায় সেই অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া দুই চোখের দৃষ্টি রাস্তার দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া যেন কাহার আগমন প্রত্যাশা করিতে লাগিল। প্রায় আধঘণ্টা এমনি করিয়া কাটিবার পর দূরে একটা মূর্তি ভাসিয়া উঠিল—মূর্তিটি আরো খানিকটা কাছে আসিলে দেখা গেল লোকটি একজন ইউরোপীয়ান সাহেব। সাহেবটি গাছের কাছাকাছি আসিয়া কয়েকবার শিস্ দিল। অসিত ধীরে ধীরে সেই অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া একেবারে সাহেবের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—গুড্ নাইট সাহেব! সাহেব ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, গুড্ নাইট।

সাহেব তাহার পেণ্টুলনের দুই পকেটে হাত ঢুকাইয়া দুইটি 'রিভলবার' বাহির করিয়া অসিতের হাতে দিল। অসিত তাড়াতাড়ি 'রিভলবার' দুইটি নিজের কাপড়ের ভিতরে লুকাইয়া ফেলিয়া পকেট হইতে খানকয়েক দশ টাকার নোট বাহির করিয়া সাহেবের হাতে গুঁজিয়া দিল। সাহেব পনেরায় আর একবার বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া যে পথে আসিয়াছিল—

সোজা সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। অসিত পনেরায় মাঠের ভিতর আসিয়া ঢুকিল এবং পূর্বের সেই স্থানটিতে আসিয়া অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরই মধুকর ফিরিয়া আসিলেন। অসিতের পাশে বসিয়া পড়িয়া কানের কাছে মুখ লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি হলো অসি! অসিত জবাব করিল—হ্যাঁ, পেয়েছি, দুটো! আপনি?

—সাহেবটি এসেছিল, সে একটা খুব ভাল জিনিস দিয়েছে—'মোজাইক' পিস্তল' খুব ভাল কাজ হয়। কিন্তু চারটারে সেই খালাসীটা এলো না আগাম টাকাদুলো ফাঁকি দিয়ে নিলে দেখছি!

অসিত বলিল—তার জাহাজও তো কাল এসে ভিড়েছে!

হ্যাঁ, পরের দিন রাত দশটায় এসে দেওয়ার কথা—নাঃ এ লোকগুলোকে আরো একটু সতর্ক হয়ে টাকা পয়সা দিতে হবে দেখছি। চল আর দেবী কবে কাজ নেই—ভূমি আগে ট্রামে গিয়ে ওঠো, আমি পরে আসছি।

বাসায় আসিয়া মধুকর পিস্তল কয়টি ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল—সাহেব বেটা তোমাকে ঠকিয়েছে অসি! এটা যে 'অটোমেটিক' (খেলনা) পিস্তল!

অসিত আশ্চর্য হইয়া বলিল—কিন্তু আমি তো চিনতে পারিনি দাদা!

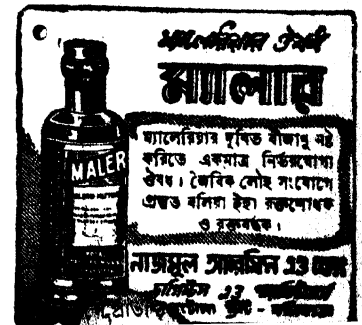
মধুকর হাসিয়া বলিলেন—অমনি হয়ে থাকে অসি!—ও নিয়ে মন খারাপ করে লাভ নেই।

কিছুদিন হইল ইহাদের সমিতির কে একজন ইউরোপের নানা দেশ ঘুরিয়া নানা প্রকার বোমা তৈরীর কৌশল শিখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি অন্য একজনকে সঙ্গে লইয়া বিক্ষাচলের এক খোলার ঘরে কিছুদিন ধরিয়া নানা জাতীয় বোমা তৈরী করিতেছিলেন। সেদিন ঐ বোমা-গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য মধুকর এবং অসিত হাওড়ায় আসিয়া বিক্ষাচলের টিকেট কাটিয়া ট্রেনে চাপিয়া বসিলেন। পরের দিন বিক্ষাচলে পৌঁছিয়া আহোর ও বিপ্রাম করিয়া বিক্ষা পাহাড়ের উপর উঠিয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন। ইচ্ছা, লোকালয় হইতে অন্তত ৪৫ মাইল দূরে যাইয়া বোমাগুলির শক্তি পরীক্ষা করিবেন। চারিজনে দ্রুতপদে পাহাড়ের উপর দিয়া পথ অভিক্রম করিতে লাগিলেন। ঘণ্টা তিনেক এমনি চলিবার পর তাহারা যে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন সে স্থানটির অন্তত ৭৫ মাইলের মধ্যে কোন লোকালয় নাই। বড় বড় পাহাড়ী গাছে ও একপ্রকার কাটা ঝোপে স্থানটি অত্যন্ত দুর্গম। এইটাই পরীক্ষার স্থান নির্দিষ্ট হইল। অতি ঘন সমিষিষ্ট কতকগুলি বৃক্ষের মধ্যস্থানে কয়েকটি স্বল্পশক্তি বিশিষ্ট বোমা ছুড়িয়া

মারিয়া পরীক্ষা করিবার পর একটি অত্যন্ত শক্তিশালী বোমা ছুড়িয়া মারা হইল। বী ছুড়িয়া মারিলেন—তিনি ভিন্ন আর সকলে অনেকটা দূরে দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন। ছুড়িয়া মুহূর্ত মধ্যে ভীষণ শব্দে সারা পাহাড় যে দুলিয়া উঠিল—কানের পরদা ফাটিয়া যাইবা উপক্রম হইল—ধূমে চারিপাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ধূম একটু কমিতেই সমুদ্রের দিকে চাহিয়া সকলেই একেবারে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল—যিনি বোমা ছুড়িয়া মারিয়াছিলেন তিনি একেবারে লুটাইয়া পড়িয়া ছটক করিতেছেন। তিনজনেই ছুটিয়া গেলেন। মধুকর তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিলেন—কি হলো যোগেন?—কোথায় লেগেছে?

যোগেন কিন্তু কোন কথা কহিতে পারিলেন না—কানে তাহার কোন কথা প্রবেশ করিল কিন তাহাও বৃষ্টিতে পারা গেল না। সকলে তাতা বৃক্ষের দিকে তাকাইয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিলে—একি? সারা বৃক্ষ যে একেবারে রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে। মধুকর তাড়াতাড়ি তাহার গায়ে জামা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন—দেখা গেল বোমার টুকরা লাগিয়া বৃক্ষের খানিকটা অংশ পাজির সমেত একেবারে ভাঙ্গিয়া ভিতরে বসির গিয়াছে—ভিতরে ফুসফুস কি হৃদপিণ্ড ছিঁড়িয়া গিয়া সেই ক্ষতমুখ দিয়া তীব্রবেগে রক্ত ছুটিতেছে। কাহারও মুখ দিয়া আর একটু কথাও বাহির হইল না—বৃষ্টিতে আর কাহারও বাকী রহিল না যে কোন চেষ্টাই কাজে লাগিল না—সমস্তই এখনই শেষ হইয়া যাইবে যোগেনের দুই চোখের তারা বিক্ষারিত হইয়া যেন একেবারে উধাংদিকে নিবন্ধ হইয়া যাইতে চাহিতেছিল—ইহারই মধ্যে জিহ্বা, কণ্ঠ হয়তে তাহার শুকাইয়া একেবারে কাঠ হইয়া উঠিয়াছিল। তাই বৃষ্টি এই শেষ সময় হা করিয়া জল চাহিল।

মধুকর চীৎকার করিয়া বলিলেন—অসিত ভাই, দেখতো জল কোথাও আছে কিনা—যোগেন



জল খেতে চাচ্ছে। কিন্তু জল তো নিকটে কোথাও ছিল না—অসিত ও অন্য লোকটি ভিটিয়া দাঁড়াইয়া ইতস্তত দৃষ্ট নিক্ষেপ করিল, কিন্তু কোথায় যাইবে, কোথা হইতে জল আনিবে ভাবিয়া পাইল না। করেক মিনিটের মধ্যেই জলের প্রয়োজন শেষ হইল—যোগেনের দুই চক্ষুর তারকা উধ্বদিকে একেবারে স্থির হইয়া রহিল একটুও আর নড়িল না। মৃৎবিবর বন্ধ হইয়া দুই পাটী দাঁতের মধ্যে জিহ্বা তাহার আটকাইয়া গেল।

মধুকর বলিলেন—দরকার নাই অসি—জলের আর দরকার নাই—যোগেন চলে গেছে। অসিত ও অন্য দু'বকটি অসহায়ভাবে পাথরের উপর বসিয়া পড়িল। মধুকর তখনও তাহার বৃকের ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। তখনও তাহার দুই হাতের ফাঁক দিয়া জীবন্ত, রক্তধারা উপুচাইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। মধুকর ভেমান করিয়া ধরিয়াই নিষ্পন্দ পাথরের মত বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে হাত যখন টানিয়া লইলেন রক্তধারা তখন বন্ধ হইয় গিয়াছে, ক্ষতের চারিপাশে লাল রক্ত জমাট বাঁধিয়া একেবারে কাল হইয়া উঠিয়াছে।

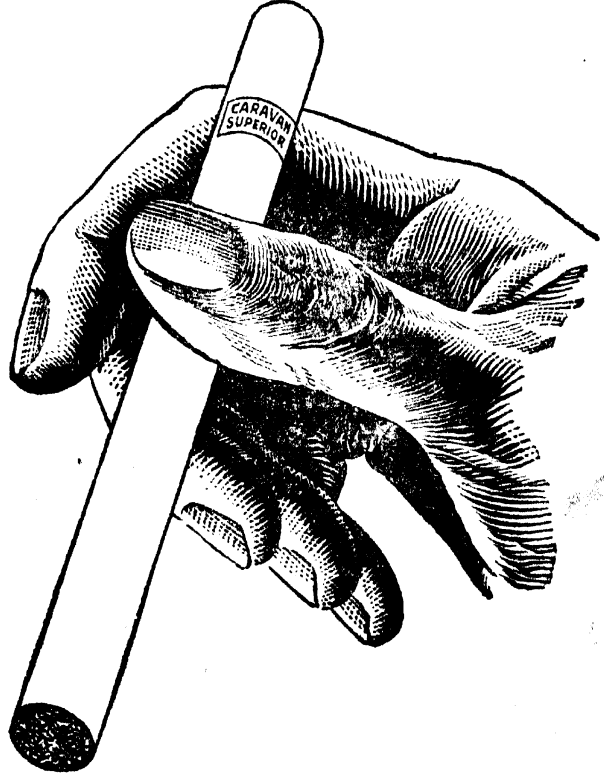
মধুকর যোগেনের মৃৎখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—যাও ভাই, যাও। হে বিপ্লবী বীর তোমাদের মৃত্যু দুঃখের বলে মানবো না—কিন্তু শেষ সময় যে তোমার মৃৎখ একটু জল পর্যন্ত দিতে পারলাম না—এ যে ভুলতে পারবো না ভাই! কিন্তু দুঃখ করিবারও সময় ছিল না। নিকটে একটি শূন্য বরগার খাদ পাহাড়ের গা কাটিয়া দূরে গগয়া গিয়া পড়িয়াছিল। তাহার একস্থানে একটি অপ্রস্তুত গর্ত ছিল। যোগেনকে ধীরে ধীরে পরাধরি করিয়া আনিয়া তাহারই মাঝে শোয়াইয়া দিয়া ছোটবড় অসংখ্য পাথর আনিয়া তাহার উপর সমাধি রচনা করা হইল। নিকটে কতকগুলি ফুলগাছের ঝোপে অসংখ্য নাম না জানা পাহাড়িয়া ফুল ফুটিয়াছিল। তিনজনে হাত ভরিয়া সেই ফুল তুলিয়া যোগেনের সমাধির উপরে শেষ ভালবাসার অর্থ অর্পণ করিয়া বিদায় লইল। অল্প কিছুক্ষণ পূর্বে সূর্য অস্ত গিয়াছে। আজ পূর্ণিমা তিথি। পূর্ব আকাশে পূর্ণচন্দ্র হাসিয়া উঠিয়া সারা পাহাড়ের রম্বে রম্বে জ্যোৎস্নালোক ছড়াইয়া দিতেছে। ফাল্গুন মাস শেষ হইয়া আসিয়াছে। দক্ষিণা বাতাস থাকিয়া থাকিয়া দম্কা ভালে বহিয়া যাইতেছে—মহুয়ার গাছে গাছে ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে—সমস্ত আকাশ বাতাস একেবারে গন্ধে তুলিয়াছে মাতাল করিয়া। দুই একটি নাম-না-জানা পাখী ডাকিয়া উঠিতেছে। ময়ূর উড়িয়া যাইতেছে—দূরে দূরে দল বাঁধিয়া হরিণ ছুটিয়া পলাইতেছে। সমস্ত পাহাড় যেন রূপলাবণে স্নান করিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই উপেক্ষা

করিয়া তিনটি প্রাণী মশ্বরগতিতে বিম্বাচল শহরের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। মধুকর সকলের আগে। দুই হাত তার তখনও যোগেনের রক্তে মাখান—তিনি হাত দুইখানি নিজের বৃকের উপরে চাপিয়া ধরিয়া মনে মনে বলিতে

লাগিলেন—হে সর্ব দুঃখের নিরস্তা, হে কঠিন, হে কোমল—আজ যে ফুলটিকে এমনি করে ছিন্ন করে দিলে তাকে তোমার পায়ে স্থান দিও প্রভু—এই আমার একান্ত প্রার্থনা।

(কুমার)

## কারাভ্যান সিগারেট নিয়তই আপনি পান করিতে চাহিবেন



# CARAVAN

## কারাভ্যান এয়ার-কন্ডিশন করা সিগারেট

ভাষামান চৌব্যাংকো কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড  
A.C.I.C. 40

# ভারতের আদিবাসী

শ্রীসুবোধ ঘোষ

১০

(৩) পরিচ্ছদ ধারণের অভ্যাস—ধূতি শাড়ি  
জামা।

মিঃ এলুইন চান না বে, আদিবাসীরা সাধারণ ভারতীয়ের মত (অথবা যুরোপীয়ের মত) ধূতি শাড়ি বা কোট প্যাটালুন ইত্যাদি আধুনিক পরিচ্ছদ পরিধান করে। তিনি আদিবাসীদের চিরন্তন কৃষ্ণচর্মের নগ্নতায় সজ্জিত (the eternally dressed nakedness of the brown skin) দেখতে চান। তিনি দৃষ্ট করেছেন—জংগলের জীবন থেকে মুরিয়া আর ওরাও ছেলেরা যখন প্রথম প্রথম আসে তখন তাদের দেখতে কী সুন্দর! কোঁকড়া চুল, গলার উজ্জ্বল হার বা হিন্দুলি, চুলে পালক ও ফুল গোঁজা! কিন্তু স্কুল মাষ্টার মশাই তার চুলের পালক ও ফুল তুলে ফেলেন, তার কোঁকড়া চুলকে ছেঁটে ছোট করে দেন আর গলার অলংকারকে ঘণা করতে আরম্ভ করেন। এর ফলে আদিবাসী ছেলের মাথায় দেখা দেয় একটা গোল টুপি, গায়ে একটা নোংরা কোট ও নোংরা খাকি হাফপ্যান্ট। আদিবাসীরা কাপড় পরে, এই সভ্য পরিচ্ছদ তাদের সংস্কৃতির পক্ষে নাকি ক্ষতিকর এবং এর ফলে আদিবাসীদের মধ্যে চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে—মিঃ এলুইন এই যুক্তি দেখিয়েছেন।

নোংরা কাপড় পরলে এবং স্নান শৌচ ইত্যাদি স্বাস্থ্যরক্ষার (Hygiene) প্রাথমিক নিয়মগুলি পালন না করলে চর্মরোগ হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? আদিবাসীদের মধ্যে যদি চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব হয়ে থাকে, তবে সেটা নোংরা কাপড় পরার জন্যই হয়েছে। কাপড় নামক সভ্য পরিচ্ছদটিকে এর জন্য প্রধান অপরাধী মনে করা উচিত নয়। আদিবাসী সমাজের মধ্যে যারা শিক্ষিত হয়ে ভারতের সাধারণ ভদ্রলোকের মত স্নান ও কাপড়কাচার নিয়মিত আচরণটি পালন করেন, তাদের মধ্যে চর্মরোগ আছে কি? আসামের খাসিয়া সমাজ যুরোপীয় পরিচ্ছদ গ্রহণ করেছে, তাদের মধ্যে চর্মরোগ কি খুবই প্রবল?

জুয়াং নামে অতি অনগ্রসর একটি আদিবাসী

গোষ্ঠীর মেয়েরা গাছের পাতা দিয়ে তৈরী পোষাকে অঙ্গ আচ্ছাদন করে। এর থেকে প্রমাণিত হয়, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে একটা লজ্জাবোধের সংস্কার তাদের মধ্যে আছে। দৈহিক নগ্নতা আদিবাসীর একটা সাংস্কৃতিক ভিত্তি নয়। শূদ্ধ লজ্জাবোধের সংস্কারই নয়, শীতাতপের অঙ্গুণ থেকে শরীর রক্ষা করার প্রয়োজনও আদিবাসীরা অনুভব করে, নইলে শীতের সময় অগ্নিকুণ্ডের পাশে তাদের রাত কাটাবার প্রয়োজন হতো না। গৃহ নামে জিনিসটাও একটা পরিচ্ছদ, শীতাতপ থেকে শরীর বাঁচাবার উপায়। আদিবাসীরা গৃহেই বাস করে। সভ্যতার নিয়মে যারা গৃহী হয়েছে, তারা পরিচ্ছদও ধারণ করবেই। শীতকালে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমালে আদিবাসীর স্বাস্থ্য বেশী নষ্ট হবে, না ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে সারারাত ধোয়ার মধ্যে ঘুমালে বেশী স্বাস্থ্য হানি হবে? মিঃ এলুইন হয়তো এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইবেন না, কারণ আদিবাসীর প্রত্যেকটি অজ্ঞতা ও কুসংস্কারকে তিনি জীবনচর্যার পদ্ধতি (way of life) বলে প্রমাণ করবার জন্যই ব্যস্ত।

মিঃ গ্রিগসন বলেন—“পাহাড়ী মারিয়ারা সমভলবাসী (হিন্দু) জনসমাজের সংস্পর্শে এসে স্নান কেশচর্চা ইত্যাদি দৈহিক পরিচ্ছদতার নীতি শিক্ষা করেছে এবং তাদের পুরাতন সংস্কার ছেড়ে দিয়েছে। (১)

ডঃ হাটনের (Hutton) আপত্তি হলো—আদিবাসী সমাজকে ‘অকালে সভ্য পরিচ্ছদ’ (premature civilised clothing) পরিধান করানো উচিত নয়। এই অভিভূতের মধ্যে কিছুটা যৌক্তিকতা আছে। যেক্ষেত্রে আদিবাসীর উপযুক্ত পরিমাণ জামাকাপড় কেনবার সামর্থ্য নেই, যেক্ষেত্রে আদিবাসীর মনে সাধারণ স্নান শৌচ ও বস্ত্র প্রক্ষালনের ‘হাইজিন’ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই—সেক্ষেত্রে হঠাৎ কাপড় পরিয়ে দেওয়ার অবশ্য কোন অর্থ হয় না। এরকম করলে নগ্নদেহ আদিবাসীকে বিভীষিত করাই

(1) The Maria Gonds of Bastar—Grigson,

হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সমস্যাটা ঐ কাপড়-পরার সমস্যা নয়—শিক্ষা এবং আর্থিক সমস্যা। যেহেতু আদিবাসীরা বর্তমান অবস্থায় অশিক্ষিত এবং আর্থিক অভাবে পীড়িত, সেহেতু কি তাদের কাছে নগ্নতার আদর্শকে চিরন্তন করে রাখতে হবে?

১৮৭২ সালে উড়িষ্যার জনৈক পলিটিক্যাল এজেন্ট এক দরবার আহ্বান করেন এবং সেখানে জুয়াং মেয়েদের পল্লব পরিচ্ছদ বর্জন করা জন্য আবেদন করেন। এজেন্ট সাহেব নিজেকে টাকা খরচ করে কতগুলি ম্যাগেণ্টার শাড়ী কিনে এনেছিলেন। জনৈক মহিলা এক একটি জুয়াং মেয়ের পাতার পোষাক ফেলে দিয়ে ঐ শাড়ি পরিয়ে দেন। পাতার পোষাকগুলিকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়। রিজলি সাহেব তা গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন—‘এইভাবে একটা বিচিত্র প্রাচীন আচার (পাতা পোষাক) সৈদন শেষ হয়ে গেল’ (thus ended a picturesque survival)। (২) কিন্তু সত্যি কি শেষ হয়েছে? রিজলি সাহেবে মন্তব্য সত্য নয়। সৈদনের অঙ্গুণসবে কয়েকটি জুয়াং মেয়ের পাতার পোষাক ভস্মীভূত হয়েছিল সত্য, কিন্তু তারপর? তারপর আবার তা পাতার পোষাক পরেছে এবং আজও পরে আছে তাদের আর শাড়ী পরবার সুযোগও হয়নি সামর্থ্যও নেই। ঘটনা থেকে এইটুকু সত্য প্রমাণিত হয় যে জুয়াং মেয়েরা শাড়ী পরতে চায়, যদি পাওয়া যায়। চিরন্তন নগ্নতাবাদ মিঃ এলুইনের খিওরী সত্য নয়।

মধ্য প্রদেশে চন্দা জিলায় জনৈক ফরেস্ট অফিসারকে বাঘে আক্রমণ করে। একজন মারিয়া গন্ড ফরেস্ট অফিসারকে রক্ষা করে। এই সাহস ও মানবতার পুরস্কারস্বরূপ গভর্নমেন্ট ঐ গন্ড যুবককে ‘আলবার্ট মেডাল উপহার দেন গভর্নর মেডালটি নিয়ে গন্ড যুবকটির পরিচ্ছদ পিন দিয়ে ঐটে দেবার জন্য হাত তুলেই দেখে যে, মেডাল পরিয়ে দেবার কোন উপায় নেই—কারণ গন্ড যুবকটির গায়ে কোন পরিচ্ছদ ছিল না, মাত্র একটা বেঁটি। (৩) অবশ্য, এই ঘটনা কথা স্মরণ করেও মিঃ এলুইন বোধ হয় তাঁর নগ্নতাবাদ পরিভাগ করতে চাইবেন না।

(৪) হিন্দী ভাষার প্রভাব

হিন্দী ভাষা শিক্ষা করে আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক অধঃপতন হচ্ছে, মিঃ এলুইন এই আর একটা অভিযোগ। মাতৃভাষা ছাড়া দ্বিতীয় একটি ভাষা শিক্ষা সাংস্কৃতিক উন্নতি পদ্ধতিরপেই প্রত্যেক সভ্যদেশে স্বীকৃত হয়েছে। দ্বিতীয় একটি ভাষায় শিক্ষিত হলে পারলে মাতৃভাষারই ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। কিন্তু মিঃ এলুইন বলেন—‘হিন্দী ভাষা

(2) People of India—Risley.  
(3) Report, C. P. & Berar 1931



শিক্ষা করে গন্দদের নাকি 'একটা নিজস্ব কাব্য ও রূপকথার জগৎ' (a whole world of poetry and legend) নষ্ট হয়ে গেছে। হিন্দী স্কুলে পড়ে গন্দ ছেলে নাকি গোষ্ঠীর আদি পুরুষ লিংগের সুন্দর গাথাগুলি আবৃত্তি করতে পারে না, আর আদিবাসী নরনারী তাদের নিজস্ব মনবিমোহন দাদারিয়া সংগীত ছেড়ে দিয়ে অশ্লীল তামাসার চর্চা করে।

গন্দদের রূপকথাগুলি এমন কি গোষ্ঠীর মহাপুরুষ লিংগের গাথাও হিন্দুভাবে ভরপুর, একথা মিঃ এলুইন জেনেও বোধ হয় চেপে গেছেন। তা ছাড়া আর একটা কথা। লিংগের গাথাটি কি সত্যিই এমনই উচ্চ সাহিত্য যার তুলনায় হিন্দী কাব্য একেবারে তুচ্ছ? মোটেই নয়। হিন্দী কাব্য গীতিকা সংগীত এবং রূপকথার ঐশ্বর্যের তুলনায় গন্ডি লোকসংগীত এবং রূপকথা কিছুই নয়। সুতরাং হিন্দী ভাষা শিক্ষা করে গন্দদের কাব্য-সাহিত্য অবনত হবে, এটা একটা নিছক অপবাদ প্রচারের জবরদস্তি মাত্র।

#### (৫) হিন্দু সংস্পর্শ ও আদিবাসীর গোষ্ঠীগত শিল্পকলা।

গন্দ সমাজের অবস্থা দেখে মিঃ এলুইন মন্তব্য করেছেন যে, হিন্দু সংস্পর্শের ফলে গন্দেরা শিল্পকলাহীন হয়েছে। আলংকারিতার প্রতি আকর্ষণ ও সুন্দর শিল্প-সৃষ্টির ক্ষমতা (Love of decoration and power to create beautiful things) নষ্ট হয়ে গেছে।

মিঃ এলুইনের এই উক্তি বস্তুতঃ তাঁর নরম অজ্ঞতার দৃষ্টান্তরূপে ধরা যেতে পারে। হিন্দু সংস্কৃতি কি শিল্পে বা কারুকলায় একেবারে রিস্ত? না, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকলার আধার? জলের সংস্পর্শে এসে কেউ পুড়ে যায় না, এবং শিল্পোন্নত হিন্দু-সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসলে কেউ শিল্পরুচিহীন হয় না। যেসব গন্দ হিন্দু-সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসেন অর্থাৎ পাহাড়ী গন্দেরা মস্তবড় শিল্প-কলার ওস্তাদ হয়ে রয়েছে কি? ফরসাইথ ও রল্টন বলেছেন, পাহাড়ী গন্দদের শিল্পকলা প্রত্যন্ত স্থলে এবং তারা এ বিষয়ে নিত্যন্ত আগ্রহসর। (১)

(1) "Their 'art' is of the rudest character, suited, in fact, to the mental calibre of a people scarcely yet emerging from mere fetishism"—Forsythe.

"The hill Gonds appear to be very backward in arts. An artisan of their own race is rarely met with, but like other tribes they have availed themselves of the services of low ryan craftsmen who live with them, commodiate themselves to Gond abits of immurity, and in return for scanty means of subsistence do all the weaving and pottery required".—Ralton (Descriptive Ethnology of Bengal).

মিঃ এলুইন জোর করে একটা প্রাচীন শিল্পকলাময় গন্দ সংস্কৃতি কম্পনা করে নিয়েছেন, সেই কারণে তাঁর সমস্ত অভিযোগ-গুলিই অলীক। হিন্দু সংস্পর্শের বিরুদ্ধে আতঙ্ক প্রচার করার প্রেরণা তাঁকে মনগড়া অভিযোগের আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। হিন্দু সভ্যতার প্রভাবিত রাজ গন্দেরা প্রাচীন রীতির গহনা বর্জন করার জন্য আন্দোলন করেছিল। মিঃ এলুইন এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন যে, হিন্দুদের প্রভাবে গন্দসমাজে শিল্পবোধ অবনত (deterioration in artistic sense) হয়ে যাচ্ছে। হিন্দুরা কত অলংকারপ্রিয় এবং হিন্দু নরনারীর পরিচ্ছদে কী বর্ণপ্রাচুর্য বৈশিষ্ট্যের পশ্চাতি কী সৌন্দর্য আছে, সেটা মিঃ এলুইন নিশ্চয় জানেন। হিন্দু সভ্যতাও খুবই বিচিত্র ও রঙীন সভ্যতা। এর প্রভাবে কেউ বেরঙা হয়ে যায় না। গন্দদের প্রাচীন পশ্চাতির অলংকারগুলি যেমন স্থূল, তেমনি ভারি ও কারুশোভাহীন ছিল। (২) রাজগন্দেরা গহনা নামে পরিচিত এই স্থূল ধাতুর বোকা বর্জন করে সত্যিকারের কারুশিল্প সম্পন্ন হালকা ধাতুর গহনা গ্রহণের জন্য আন্দোলন করেছিল। তাতেই মিঃ এলুইন ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং ব্যাপারটাকে গন্দদের সৌন্দর্যবোধের (Aesthetic Sense) ওপর আক্রমণ বলে বর্ণনা করেছেন।

#### (৬) আদিবাসীর নৃত্য ও সংগীতের সমস্যা

এলুইন বলেন শিল্পিত হওয়ার ফলে আদিবাসীদের নৃত্য ও সংগীতের অধঃপতন হচ্ছে। তাঁর মন্তব্য হলো—“শিল্পার সবচেয়ে ভয়ানক ফল হলো আদিবাসীর নৃত্য ও সংগীতের ওপর প্রতিক্রিয়া”

(“Perhaps the most harmful result of education is its effect on singing and dancing.”)

খৃষ্টান মিশনারীরা আদিবাসীদের গোষ্ঠীগত সংগীত ও নৃত্যের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, একথা সত্য। কিন্তু যেসব আদিবাসী গোষ্ঠী হিন্দু লাভ করেছে এবং যারা আংশিকভাবেও হিন্দু সংস্কৃতির সংস্পর্শে বা প্রভাবে এসেছে, তাদের মধ্যে নৃত্য ও সংগীত বিনষ্ট হয়নি, বিনষ্ট হবার কারণও নেই। হিন্দু নিজেই অত্যন্ত সংগীতপরাগ, বারমাসে তের পার্বণে সে গান গায়। হিন্দুর প্রতি কুটীরে রত্নের ছড়ার আবৃত্তি। বহুশ্রেণীবিন্যাস্ত হিন্দু সমাজের বহু শ্রেণীর মধ্যে নৃত্যের চর্চা আজও সামাজিক আচাররূপে রয়েছে। হিন্দু তার কীতানে নাচে, হিন্দু মেয়েরা তার রত্ন উৎসবে নৃত্য করে। হিন্দু সমাজের নিন্মশ্রেণীর অনেকের মধ্যে অতি

(2) "Quantity rather quality is aimed at; and both arms and legs are usually loaded with tiers of heavy rings.... Ear and nose rings and heavy necklaces of coins or beads are also common."—Forsythe.

দারিদ্র্যও তার নাচগান বন্ধ করতে পারেনি। হিন্দু সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকনৃত্য সুপ্রসিদ্ধ। আদিবাসীর মত বহুদের গান ও নাচ হিন্দু সমাজের বহু শ্রেণীতেও সামাজিক অনুষ্ঠানরূপে রয়েছে। তা ছাড়া শিক্ষিত হিন্দু সমাজের মধ্যেও নৃত্য চর্চার প্রসার হয়ে চলেছে। নটরাজের ভক্ত হিন্দুর মধ্যে সামাজিকভাবে নৃত্যবিরোধিতার গোড়ামি নেই। সুতরাং আধুনিক শিক্ষা অথবা হিন্দুর সংস্পর্শ, কোনটাই আদিবাসীকে নৃত্যচর্চায় নিরুৎসাহ করেনা। তবুও মিঃ এলুইন এই সম্পূর্ণ কাম্পনিক অভিযোগ প্রচার করতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করেননি।

#### (৭) ফৌজদারী আইন ও আদিবাসীর সংস্কৃতি

ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ফৌজদারী আইন ও দণ্ডবিধি আদিবাসীর সংস্কৃতিকে বিড়ম্বিত করেছে বলে মিঃ এলুইন অভিযোগ করেছেন। তাঁর অভিমতঃ ভারতবর্ষের অন্যান্য সভ্য সমাজের জন্য যে আইন খাটে, আদিবাসীর জন্য সে আইন খাটে না, ফৌজদারীই হোক আর দেওয়ানীই হোক।

উত্তরে বলা যায়, দেওয়ানী আইন (Civil Laws) সম্বন্ধে মিঃ এলুইনের এই যুক্তি যতখানি খাটে ফৌজদারী আইন সম্বন্ধে ঠিক ততখানি খাটে না। আদিবাসীদের জন্য ভূমিসংক্রান্ত, সম্পত্তি ঘটিত ইত্যাদি বিষয়ে সামাজিক ঐতিহ্য এবং শ্রোতাগণের দিকে লক্ষ্য রেখে অন্যথাই দেওয়ানী আইনের কিছুটা রক্ষণের হতে পারে এবং সেটাই বিধেয়। কিন্তু অপরাধ (crime) নামে কথিত কোন হিংস্র আচরণকে কোন ধর্ম বা সংস্কৃতির অজুহাতে প্রায় দেওয়া সম্ভব নয়। উচিতও নয়। মানুষ তার প্রাচীন সংস্কারকে চিরস্থায়ী করে উন্নত হয়নি, প্রাচীন সংস্কারকে পুনঃ পুনঃ সংস্কৃত করে ও পরিবর্তন বা বর্জন করে সে তার সভ্যতার প্রগতি অব্যাহত রেখেছে। আদিবাসী সমাজ মানবিক সভ্যতার এই সাধারণ নিয়মের বাইরে যেতে পারে না। কিন্তু মিঃ এলুইন বস্তুতঃ সেই রকমেরই দাবী করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর এক একটা মন্তব্য শুনলে হতভম্ব হতে হয়। এক জায়গায় (“The Aborigines” দ্রষ্টব্য) তিনি মন্তব্য করেছেন :

“কেউ অস্বীকার করবে না যে আদিবাসীদের জীবনে নানা রকম স্থূল কুসংস্কার ও কুপ্রথা আছে। দৃষ্টান্ত, কোন কোন নাগ সমাজ (যুরোপের অতি অগ্রসর জাতিগুলির মত) মৃদুশিকার ও নরবলির চর্চা করে। একমাত্র পার্থক্য হলো বেচারার আদিবাসী দেবতার নামে একটি দুর্দৃষ্টি নরবলি করে থাকে, আর বড় বড় নেশনগুলি সাম্রাজ্য ও সভ্যতার নামে লক্ষ লক্ষ নরবলি করে।”

মিঃ এলুইনের এই মন্তব্যের মধ্যে যে ধরনের যুক্তি ও বিদ্রূপ পরিবেশন করা হয়েছে, তাতে সন্দেহ হয় উদ্ভুলোকের কি সত্যিই নৃতাত্ত্বিক বা সমাজ বিজ্ঞানীর উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর ছিটে ফেটাও আছে। নাগা সমাজের নরবালি প্রথা ও যুরোপের সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলির বৃদ্ধি বিগ্রহের পিছনে কি একই রকম মনস্তত্ত্ব রয়েছে? এত শিথিল উক্তি কোন নৃতাত্ত্বিকের পক্ষে শোভা পায় না। যে কুসংস্কারের প্রভাবে নাগা মন্ডলিকার করে যুরোপের নেশনগুলি নিশ্চয় সেই কুসংস্কারের প্রেক্ষায় বৃদ্ধি করে না। বৃদ্ধি ব্যাপারটাকে যদি মন্ডলিকার বলে ধরে নেওয়া হয়, তবুও মিঃ এলুইনের মন্তব্যের কোন অর্থ হয় না। নাগার মন্ডলিকার চর্চা এবং যুরোপীয় নেশনগুলির মন্ডলিকার চর্চার মধ্যে উদ্দেশ্যের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। নাগার মন্ডলিকার এবং সাম্রাজ্যবাদী বৃদ্ধি—দুটোই গর্হিত ব্যাপার, কিন্তু তা বলে দুটোই একই ব্যাপার নয়।

আদিবাসীদের মধ্যে আর একটা হিংস্র প্রথা পূর্বে খুবই প্রবল ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে—ডাইনী পোড়ানো। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ফৌজদারী আইন এই প্রথা দমন করেছে। মিঃ এলুইনের মতে এটাও আদিবাসীর সামাজিক অধিকারে হস্তক্ষেপের ব্যাপার। তিনি বলেন, শিক্ষিত সমাজও ডাইনী সংস্কার আছে। আমরাও তবুও খাঁড়ের স্বীকার করি—আছে। কিন্তু তার জন্য ডাইনী পোড়ানো কাজটাকে একটা সামাজিক সদাচার বলে গ্রহণ করতে হবে?

জোর করে মেয়ে ধরে নিয়ে বিয়ে করা (marriage by capture)—এই আঙ্গরিক বিবাহ পদ্ধতির বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইন কেন বাধা দেয়, এটাও এলুইন সাহেবের আর একটা ক্ষোভ। আদিবাসী সমাজের প্রতি দরদের আধিকো উদ্ভুলোকের যুক্তি ও মন্তবা-গুলিও প্রলাপে পরিণত হয়েছে। নরবালি মন্ডলিকার ডাইনী পোড়ানো ইত্যাদি, হিংস্র প্রথাগুলির বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবে কোন প্রতিবাদ করতে পর্যন্ত তিনি নারাজ। তিনি বরং স্পষ্টভাবে উল্টো কথাই বলেছেন :

“The aborigines were faced with a serious crisis when British administrators insisted on the cessation of such obviously evil practices as human sacrifice, head hunting and murder for witchcraft.”

ব্রিটিশ রাজকর্মচারীরা যখন মন্ডলিকার, নরবালি, ডাইনী পোড়ানো প্রভৃতি কুপ্রথাগুলি বন্ধ করার জন্য জোর চেষ্টা আরম্ভ করে, তখন আদিবাসীরা একটা মন্ত সংকটে পড়েছিল।

কিসের সংকট? মিঃ এলুইনের মতে বোধ হয় আদিবাসীর সভ্যতার সংকট। এই সব হিংস্র কুপ্রথাগুলিকেও হয়তো তিনি আদিবাসীর জীবনচর্যার পদ্ধতি (Way of

life) বলে মনে করেন। নইলে সংকটের কথা আসে কোথা থেকে?

#### (৬) আদিবাসী অঞ্চলে আধুনিক সড়ক— আদিবাসী সংস্কৃতির হানি

আদিবাসী অঞ্চলে রেল পুন্ড ও সড়কের আবির্ভাবে মিঃ এলুইন ব্যথিত হয়েছেন। দেখা যাচ্ছে বৈগাদের সংগে কয়েক বছর মেলা মেলা করে উদ্ভুলোক বৈগাদের একটি কুসংস্কারও আয়ত্ত করে ফেলেছেন। লাঙ্গল দিয়ে মাটি চাষ করার মত, রেল সড়ক হলে ধীরেই মাতা বাধা পাবেন—মিঃ এলুইন বোধহয় বৈগাসুলভ এই মনোভাবের পোজ দেখাবার জন্যে আপত্তিটা তুলেছেন। লোকে মনে করবে—আহা! এই নৃতাত্ত্বিক সাহেবটি কত আদিবাসী দরদী! একেবারে প্রাণে প্রাণে বৈগা হয়ে গেছেন।

মিঃ এলুইনের বক্তব্য, আদিবাসী অঞ্চলে রেল পুন্ড সড়ক ইত্যাদি আদিবাসীদের সামাজিক সংহতি (Tribal Solidarity) নষ্ট করে। অর্থাৎ, রেল বা সড়ক বহিজগতের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করে, যার ফলে উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শ ও প্রভাব আদিবাসী সমাজের ওপর উপদ্রবের মত দেখা দেয় ও তাদের গোষ্ঠীগত সামাজিক সংহতিতে ভাঙন ধরে। তিনি বলেছেন—

“The souls of the people are soiled and grimy with the dust of passing motor buses.”

অর্থাৎ সড়ক দিয়ে ধাবমান মোটরবাসের ধুলোয় আদিবাসীর সত্তা মিলন ও বিরস হয়ে গেছে। সমাজ বিজ্ঞানের আলোচনায় এ ধরনের কাব্যময় হেয়ালি দিয়ে কোন তত্ত্ব প্রমাণিত হয় না। ধাবমান মোটরবাসের ধুলোয় লোকের সত্তা সব দেশেই মিলন হয়, তার জন্য কোনও সামাজিক সংহতি ভেঙে পড়ে না। সড়ক ও মোটরবাসের আনাগোনার ধুলোয় যদি কোন সমাজের সংহতি ভেঙে পড়ে বা সত্তা মিলন হয়ে যায়, তবে বুঝতে হবে সেই সমাজটি নিজেই নিতান্ত ঠুনকো হয়ে আছে এবং সত্তাটিও নেহাৎ কাঁচা। ভগ্নুর বলেই এত সহজে ভেঙে যায়।

কিন্তু মিঃ এলুইনের অভিযোগটি মূলতঃ সত্য নয়, সড়কের জন্যে কোনও আদিবাসী সমাজ ভেঙে পড়েনি। তিনি বলতে পারেন, সড়ক হলে আদিবাসী অঞ্চলে বাইরের ব্যবসায়ী ও মহাজনের আবির্ভাব সহজ হয়ে পড়ে এবং তার ফলে আদিবাসীদের আর্থিক শোষণও সহজ হয়। এভাবে বিচার করলে, কিছুটা সত্য কথা বলা হয়। কিন্তু যারা আর্থিক শোষণ করে থাকে সেই সব মহাজনের পস্থা শুদ্ধ পাকা সড়কই নয়, নিতান্ত মেঠো বা বুনো হাট্টিরে পথে তারা আনাগোনা করার যোগ্যতা রাখে। এ বিষয়ে সড়কহীনতা আদিবাসীর পক্ষে সার্থক রক্ষাকবচ নয়। সমগ্র ছোটনাগপুর অঞ্চল সুন্দর

পাকা সড়কে সমাকীর্ণ, কিন্তু এই অঞ্চলের আদিবাসী সমাজের সত্তা দুর্গম জংগলের আধিবাসীর সত্তার চেয়ে বেশী মিলন হয়নি। মিঃ এলুইন সোজা বলে ফেলেছেন—আসাম সীমান্তে মণিপুর পর্যন্ত যে নতুন কার্ট রোড (Cart Road) তৈরী হয়েছে, তার ফলে বেশ্যাবৃত্তি বেড়ে গেছে। পৃথিবীতে অনেক জায়গায় বেশ্যাবৃত্তি আগের তুলনায় বেড়েছে, কিন্তু সেখানে কোন নতুন সড়ক হয়েছে দেখা যায় না। খোয়া পাথর আর পাঁচচালাই সড়ককে বেশ্যাবৃত্তির কলঙ্কের জন্যে দায়ী করা উচিত নয়। সড়কে ঠিক মত চলতে না জানলে অবশ্য অনেক কলঙ্ক হবারই কথা। কোন কোন আদিবাসী অঞ্চলে এরকম ব্যাপার হয়তো হয়ে থাকবে; কিন্তু সেজন্য পথের দোষ না দিয়ে পথচলার রীতিকেই দোষী করা উচিত। বেশ্যাবৃত্তির মূল অর্থনৈতিক কারণটি অনস্বস্থান না করে, একটা সড়ককে তার জন্যে দায়ী করলেই সেটা ঠিক আদিবাসী দরদী হয়ে ওঠে না, এবং কোন যুক্তিও হয় না।

#### (৯) গোষ্ঠীগত প্রথাকে আইনে পরিণত করা

মিঃ এলুইন মনে করেন, ভারতীয় দেওরানী ও ফৌজদারী আইন আদিবাসীর সম্বন্ধে প্রয়োগ করা উচিত নয়। আদিবাসীদের মামলা বিচারের পদ্ধতিও (Judiciary) ভিন্নভাবে গঠিত হওয়া উচিত। তিনি বলেন, আদিবাসীদের মনে সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, দেনা ইত্যাদি বিষয়ে যে ধারণা ও সংস্কার আছে, সেটা ঠিক সাধারণ ভারতীয়ের ধারণা বা সংস্কারের মত নয়। আদিবাসীদের বিবাহ প্রথাও ভিন্ন ধরনের, যৌননীতি ও রুচি ভিন্ন ধরনের—সুতরাং এসব ব্যাপারে ভারতীয় আইন অথবা সভা জাতির উপযোগী কোন আইন আদিবাসীদের পক্ষে উপযোগী নয়।

সুতরাং তাঁর মতে আদিবাসীদের সামাজিক প্রথাগুলিকেই বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত (Codifications of Customs) পরিণত করতে হবে। তাঁর প্রস্তাব, একদল নৃতাত্ত্বিককে নিয়োগ করে আদিবাসীদের প্রথা সম্বন্ধে প্রামাণ্য বিবরণ সংগ্রহ করে, সেগুলিকে আইনে পরিণত করা হোক।

মিঃ এলুইনের দৃষ্টিভঙ্গীর অন্য বেসব উদাহরণ আমরা পেয়েছি। তাতে তাঁর পক্ষে এই ধরনের দাবী করা বিস্ময়ের কিছু নয়।

প্রথাকে মানুুষের চেয়ে বড় বলে যারা মনে করেন তাদের পক্ষেই এ ধরনের প্রস্তাব করা সহজ। প্রথার জন্য মানুুষ নয়, মানুুষের জন্যই প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু প্রথাকে যদি বিধিবদ্ধ করা হয়, তবে সমাজের দেহ ও প্রাণকেই স্তম্ভ করে রাখা হবে। প্রথা বিধিবদ্ধ হলে গোষ্ঠীগত পদ্ধতিতে শাসনের পদ্ধতিও নিতান্ত বন্ধন (Mechanical) হয়ে যাবে। গোষ্ঠীগত সর্দারও প্রাথমিক যতখানি স্বাধীনতা পাবেন

বিস্তার করতে পারেন, তখন তার পক্ষে সে দুঃখও থাকবে না। কেন না বিধিবদ্ধ প্রথা-মূলি তার ওপরেও সাবভৌম হয়ে উঠবে, এটা মিঃ এলুইনের প্রিয় গোষ্ঠীগত সংস্কৃতির বিরোধী।

এলুইন ভাষ্যের যতগুলি স্ত বিবৃত করা হলো, তার সকলগুলির মধ্যে মূলতঃ একটি দাবীই রয়েছে। সেটা হলো—আদিবাসীকে আধুনিক সভ্য-সংস্পর্শ (culture-contact) থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে, প্রত্যেকটি গোষ্ঠীগত প্রথা সংস্কার ও রীতিনীতিকে কোনভাবে পরিবর্তন না করে, যেমন-ছিল-তেমনই অবস্থায় চিরকালের মত সাজিয়ে রাখা। এই দাবীই শেষ পর্যন্ত ন্যাশনাল পার্ক দাবীতে পরিণত হয়েছে।

#### ন্যাশনাল পার্ক

পরিকল্পনাটি হলো—অরণ্য ও পাহাড় অঞ্চলে এক একটা সুবিস্তৃত এলাকা আদিবাসীর উপনিবেশের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। এই এলাকার মধ্যে আদিবাসীরা তাদের চিরপুরাতন পদ্ধতিতে অবাধে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে। কোন শুল্ক বা সড়ক এখানে হতে পারবে না। কোন মিশনারী আসতে পারবে না। আবগারী আইন, জঙ্গল আইন, ভূমি আইন—কোন কিছুই থাকতে পারবে না। আদিবাসীরা অবাধে বন্য চাষ করবে এবং সর্দারের দ্বারা পরিচালিত হবে। বর্তমান বস্তার রাজ্যে আদিবাসীদের জন্য একটা নির্দিষ্ট এলাকায় যে-ধরণের উপনিবেশ করা হয়েছে, মিঃ এলুইন তার সঙ্গে কতকটা সামঞ্জস্য রেখে অর্থাৎ বস্তার মডেল অনুসারে এই ন্যাশনাল পার্ক পরিকল্পনা প্রচার করেছেন। তার উদ্দেশ্য হলো—আদিবাসীরা এইভাবেই নির্দোষ ও সুখী জীবন যাপন করুক, বতকণ না বর্তমান সভ্যতা ও বৈজ্ঞানিক যুগ এদের ক্ষতি না করে উন্নতি করার ঠিক পদ্ধতি আবিষ্কার করার মত যোগ্যতা ও জ্ঞানলাভ করে—

“Innocence and happiness for a while till civilisation is more worthy to instruct them and untill a scientific age has learnt how to bring development and change without causing despair.”

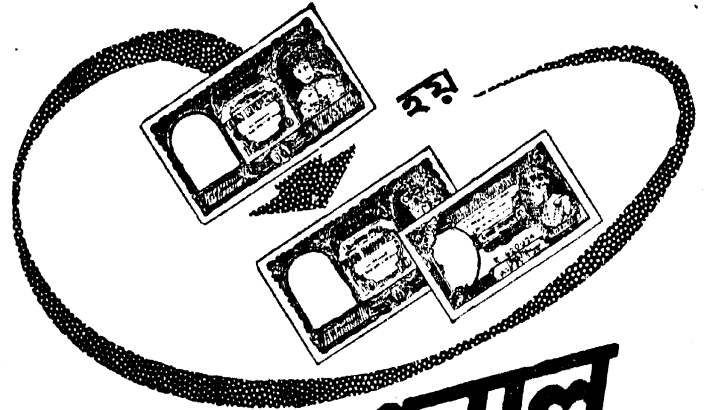
উটোপিয়া (Utopia) নামে একটা কাল্পনিক স্বর্গরাজ্য বা সব-পেয়েছির দেশ আছে। এই উটোপিয়ার পরিকল্পনার মধ্যে যতই আবাস্তবতা থাকুক, এটা একটা চরম সুখী জীবন ও পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা স্বরাই গঠিত কম্পিত আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি হলো পিজি-টিভ, নীচ থেকে উঠে।

মিঃ এলুইনের ন্যাশনাল পার্ক পরিকল্পনা হলো একটি বিশুদ্ধ নেগেটিভ আকাঙ্ক্ষার দ্বারা গঠিত—উধে থেকে নীচে, বর্তমান ছেড়ে অতীতে, পরিবর্তনের বদলে স্থিতি, গতি

ছেড়ে দিয়ে স্তব্ধতা। সুতরাং মিঃ এলুইনের পরিকল্পনাকে আবাস্তব উটোপিয়ার সঙ্গে তুলনা করা উচিত হবে না। এটা হলো তার বিপরীত—আবাস্তব অথচ অধোমুখী—কুটোপিয়া।

ভারতের আদি সন্তান দুঃখী আদিবাসীকে নিয়ে এক একটি সখের নৃতাত্ত্বিক মিউজিয়াম তৈরী করার এই পরিকল্পনা সখের ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছু নয়।

(ক্রমশঃ)



# ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেটস

এই সার্টিফিকেট সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং বছরে টাকা ও মূলধন গড়মেট কর্তৃক গারান্টিযুক্ত। যাঁরা বছরে প্রত্যেকটি সার্টিফিকেট-এর মূল্য পতকরা ৫০ টাকা হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তার ফলে ১২ টাকার ১০০ টাকা পাওয়া যায়। সরকারী সিকিউরিটির মধ্যে এ-থেকে বেশি রকম আর কিছুতে পাওয়া যায় না।

বছরে উপর ইন্ডিয়ান ট্যাক্স দিতে হয় না। বাকের আর কম তারার চার আনা, আট আনা কিংবা ১০ টাকা হারের সেভিংস সার্টিফিকেট কিনতে পারেন। এই সার্টিফিকেট ও স্ট্যাম্প পাওয়া যায় পোস্ট অফিসে, গভর্নমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত এজেন্টদের কাছে অথবা সেভিংস ব্যাংকে।

বর্তমানে  
টাকা  
খাটেব্য  
সার্টিফিকেট উপায়



## শ্রীপ্রমথনাথ বিনী

৫

বু প, বৃপ, বৃপ। সারাদিন অবিরাম

বৃষ্টি, এমন আজ তিন দিন ধরিয়। চলিতেছে। ভলে মাঠ ঘাট খাল বিল ভরিয়। গিয়াছে। নদীতে পদ্মার ঘোলা জল প্রবেশ করিয়াছে। প্রবল স্রোতে কচুরিপানার রাশ ভাসিয়া চলিয়াছে, ছোট ছোট আবর্ত চোখ পাকাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, দেশ দেশান্তর হইতে ছোট বড় মাঝারি নৌকা মাস্তুলের শিং তুলিয়া ঘাটে দণ্ডায়মান, পালতেলা নৌকাগুলি পালের জোরে স্রোতের টানে দ্রুত ছুটিয়াছে, ইলিশ মাছ ধরা ছোট ছোট ভিগগগুলি মস্ত জালের বেড় টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। কিন্তু এই দুর্যোগে ঘাটে স্নানার্থী নাই বলিলেও চলে। এই দুর্যোগে মাঠে কৃষক নাই, গোচরে গোরু নাই, পথে পথিক বিরল, দু-একটা গোরু, গেয়াল ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিল, এখন মন্ডের মতো পাড়াইয়া ভিজিতেছে, তাহাদের গা বাহিয়া জল কারিতেছে, সমস্ত গ্রাম যেন ঘরের দাওয়ায় সাপা গড়াইয়া পড়িয়া আছে কিন্তু বৃষ্টির দাপট হইতে আশ্রয় না করিতে পারিয়া একান্ত অসহায় অনুভব করিতেছে। আকাশ মেঘে লেপা, ইতস্তত ধূসর মেঘপুঞ্জ রাশীকৃত মলিন বাস্তবের মতো পড়িয়া আছে। জোর বাতাস থাকিলেও বৃষ্টির ধারা কখনো কখনো শিথিল হয়—কিন্তু বায়ুমণ্ডল যেন রক্ত, বৃষ্টির একটানা একঘেয়ে শব্দ ছাড়া আর কিছুই নাই। কেবল দিগন্তজোড়া ভেকের ঠিকানা আছে কিন্তু নিতান্ত মনোযোগ না করিয়া শুনিলে তাহাও শোনা যায় না। বিম্ব বগতের একমাত্র শব্দ বৃপ, বৃপ, বৃপ!

বনতলীর হাট হইতে খান দুই মাইয়ের গাড়ি জোড়াদীঘিতে ফিরিতেছে। সম্ভ্রান্ত মনোবৃত্তি উদ্ভীর্ণ। গাড়ি দুইখানা জোড়া-দীঘির বাজারের ব্যবসায়ীদের। গ্রামের হাটের ন বাদে তাহারা আশেপাশে গায়ের হাটে স্নানার্থী করিতে যায়, বৃষ্টিতেও যায়,

শীতেও যায়, রেদেও যায়, হাটুরে লোকের হাতু বিচার করিলে চলে না।

গাড়ি দুইখানা অতিশয় কমে চলিতেছে। পথটাকে পথ না বলিয়া কদমাস্ত খাল সমন্বিত উচু নীচু একটা নিরীক বলিলেই চলে। মাইয়ের কোমর অবধি ভূবিয়া যায়, আবার কোন রকমে টানিয়া তোলে, কখনো গাড়ি ডান কাত হয়, কখনো বাঁ দিকে। গাড়োয়ান হাঁকে হুশিয়ার বাঁ দিক চেপে, আরোহীরা বাম দিকে দেহের ভার অপর্ণ করে, কখনো বা গাড়োয়ানের নির্দেশ মতো ডান দিকে। গাড়ির একটা ছই আছে বটে কিন্তু না থাকিলেও দাঁতি ছিল না, এমন প্রবল বৃষ্টি রুগিবার ক্ষমতা তাহার নাই। জলে আরোহীদের সর্বাঙ্গ সিস্ত।

আরোহী দুইজন জোড়াদীঘির বাজারের ভজহারি দাস এবং উক্ত গ্রামের মাণিক খুড়ো। ভজহারি ব্যবসায়ী, এমন বাদলেও তাহার বাহির না হইয়া উপায় নাই, কিন্তু মাণিক খুড়ো কেন বাহির হইতে গেল। এই প্রশ্ন তোমার আমার মনে সন্দেহভর্য উঠবে, কিন্তু জোড়াদীঘির কাহারো মনে হইবে না, কারণ তাহারা সকলেই মাণিক খুড়োর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। মাণিকের চরিত্রের একটি মাত্র দর্বলতা মৎসাপ্রিয়তা। অলস্য তাহার প্রসিদ্ধ বাঙ্গাপোষখানা ধরিলে দর্বলতা দুইটা। এমন মৎসাপ্রিয় ব্যক্তি সে অশুলে আর নাই। বাজারের সেরা মাছটি সে কিনিবেই, বাবুয়াও পারিয়া ওঠেন না। সে হাট লাগিবার অনেক আগে বাজারে গিয়া ভজহারির দোকানে বসিয়া তামাক টানিতে আরম্ভ করে, গম্পগম্প করে, হঠাৎ দেখিলে মনে হইবে আসার জমানো ছাড়া অন্য কাজ তাহার নাই। কিন্তু যেমনি মেছানিরা মাছের ডালা নামাইয়াছে, যেমনি সবল সুদৃশ্য মাছটি দৃশ্য-গোচর হইয়াছে, অর্নি অর্থ সমান্ত বাকাটি শূন্যে ঝুলাইয়া রাখিয়া খুড়ো টপ করিয়া মাছটি তুলিয়া লইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া

আবার বিলীয়মান বাক্যাংশকে ধরিয়। ফেলিল। এই কাজে অর্থাৎ মাছটি সংগ্রহ করিতে তাহার আধ মিনিটও লাগিল না। ঝড় বৃষ্টি অশ্রুপাণ ভূমিকম্প যাহাই হোক না কেন খুড়োর প্রতিদিন মৎস্যময় চাই। জোড়াদীঘির হাট সন্তাহে দুই দিন, বাকি পাঁচ দিন সে আশেপাশের গায়ের হাট হইতে মৎসা সংগ্রহ করিয়া থাকে। সামান্য বৃষ্টি বাদল দুর্যোগের কর্ম নয় খুড়োর পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা। অনেকে বলিত, খুড়ো অবস্থা বিবেচনা করে মাছ কিনতে হয়, তোমার কি মাছের জন্য এত খরচ করা উচিত? মাণিক বলিত, অবস্থা বিবেচনা করে খেতে গেলে সারাজীবন কচু খেচু খেয়েই কাটাতে হয়, এক মুঠো চালও ভাগ্যে জোটে না। হিসাব কিতাবের আমার বাকি নেই। ইহার পরে আর উত্তর চলে না। এইবার বুঝিতে পারা যাইবে এমন দুর্যোগে, শ্মশানভরীরাও যখন যাই কি না যাই ভাবে, মাণিক খুড়ো কেন হাটে গিয়াছিল।

গাড়ির মধ্যে ভজহারি ও মাণিক জোড়াসড়ো হইয়া বসিয়া আছে, সদ্য ক্রীত গোটা দুই ইলিশ শেষোক্তর পাশে ন্যস্ত। মাতা যেমনভাবে পুত্রের দিকে তাকায়, প্রণয়ী যেমনভাবে প্রণয়িনীর দিকে তাকায় তেমনভাবে সত্বক নেত্রে রহিয়া রহিয়া মাছ দুটির দিকে তাকাইতেছে, এই যৌগন্ধকারও তাহার সজল দৃষ্টি মাছের গায়ে গিয়া বেন হাত বুলাইতেছে। মাছ দুটি মৃত নতুবা এই লুপ্ত দৃষ্টির আলোতেই মরিত।

ভজহারি বলিল—আবার তো নতুন করে লাগলো।

এমন সময়ে বৃষ্টি চাপিয়া আসিল।

খুড়ো বলিল—লাগলোই তো বটে। নাঃ কিছুর আর বাকি থাকবে না।

ভজহারি বিস্ময়ে বলিল—বাকি? সব যাবে।

মাণিক বলিল—জোড়াদীঘি ভেসে যাবে। ভজহারি বলিল—তালুক মালুক সম্পত্তি ক্রমিকারী কিছুই থাকবে না।

মাণিক শূন্যবাক্য—বৃষ্টিতে?

ভজহারি বলিল—কি মুস্কিল! মামলায়।

মাণিক বলিল—তাই বলো, আমি ডাব-ছিলাম ভূমি বৃষ্টির কথা বলছ?

ভজহারি বলিল—কি গো? বৃষ্টির কথা কেন? আমি বলছিলাম বাবুদের মামলা আবার নতুন করে শুরু হল। মতো একবার শুনলাম যে আপোষ হবে, মনটা খুঁশি হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখছি—কি তার বলবে! কারো কিছু থাকবে না।

মাণিক বলিল—কি তো ও-সবের খোঁজ খবর রাখি না?

ভজহারি বলিল—শিখ না, তবে

থাকি বাজারের মধ্যে অনেক কথাই কানে আসে। শুনছি নাকি দুই শরিফেই নানা জায়গা থেকে লেঠেল সংগ্রহ করছে। ছোটবাবু নাকি বলেছেন—এবরে একবার শেষ পরীক্ষা করে নেবেন!

মাণিক বলিল—ওই বুদ্ধি মাথার চাপলেই বুঝতে পারা যায়—সত্যিই শেষ না হয়ে যাবে না।

তারপরে একটু থামিয়া বলিল—এতো সবই জানা কথা! যেদিন ঋষি বাক্য অবহেলা করে বুড়ো অশ্বথের গায়ে হাত দেওয়া হয়েছে, সেই দিনই জমিদারী পরমায়ু ফুরিয়েছে। আর শূন্য জমিদারী কেন—গায়ের কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। দেখো না কেন নদীতে জল এলো প্রাণ মাসের শেষে! আগের আমলের কথা মনে আছে তো! আষাঢ়ের প্রথমেই জল আসতো!

ভজহারি বলিল—তাও যে অর বেশি দিন আসবে মনে হয় না! ধুপোনের মোহানা পর্বত-প্রমাণ উঁচু হয়ে উঠেছে। মহকুমার হাকিম নাকি বলেছেন তিন চার বছরের মধ্যেই জল আসা বন্ধ হয়ে যাবে!

—যাবেই তো, যাবেই তো, এ সমস্তুই জানা কথা! মাণিক উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে গারোয়ান হাকিম—ডান দিকে চেপে!

দুইজনে ডান দিকে বুকিয়া বসিল, গাড়ী হুড়ং করিয়া কাদায় পড়িয়া গেল। আর উঠিতেই চায় না, তখন গাড়িতে গাড়োয়ানে মরিষে এবং অরোহীন্দ্রয়ে অনুন্নয়, বিনয়, প্রণয়, অভিনয়, মান-অভিমান, ভর্জন-গর্জন কত রকম সে চলিল, কতক্ষণ ধরিয়া যে চলিল—তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু কর্ণের রথচক্রের মতো গাড়ির চাকা দুটিকে ধরিয়া কিছুতেই ছাড়িল না। মরিষ দুটা কাদায় অর্ধ প্রোথিত হইয়া হাঁপাইতে লাগিল।

ভজহারি বলিল—রাতটা বৃষ্টি এখানেই কাটাইতে হয়।

মাণিক বলিয়া উঠিল—না, না, তাও কি হতে পারে! এখানে পড়িয়া থাকিলে মৎস্য দুটির যথাকার্য করা যাইবে না, ইহাই তাহার আপত্তির তাৎপর্য।

গাড়োয়ান বলিল—দাশ মশাই, আপনারা না হয় এগোন, আমি দেখি গাড়ি ভুলতে পারি কি না। তখন অগত্যা ভজহারি ও মাণিক কাপড় গুটাইয়া মাথায় ছাতা দিয়া হাটিয়া রওনা হইল। সেই ভীতি ঘোর অন্ধকার, সর্বপ্রকার দীপ্তিহীন, কেবল মাণিকের হাতে দোদুলমান মাছ দুটির চকিত শূভ্রতা আতঙ্গ কাচের মতো অন্ধকারে বিক্ষিপ্ত আলোককণকে সংহত করিয়া এক একবার মলকিয়া উঠিতে লাগিল।

দুঃশখনা অগ্রসর হইয়া না হইতেই তাহারা পথের কিংবা হারাইয়া পড়িতে মাঠ ও পথ সমান কণ মাজ, কণ সম্ভব নহে, চতুর্দিক, উর্দ্বা, অন্ধকার কাজেই

দিকপ্রম স্বাভাবিক, নিতান্ত না চলিলে নয় বলিয়াই তাহারা চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ চলবার পরে মাণিক বলিল—এ কেমন হল দাশ, গ্রাম দশ মিনিটের পথ, এখনো পৌছাতে পারলাম না, পথ ভুল হল নাকি

ভজহারি বলিল—হুসুমত কি?

মাণিক বলিল—কিন্তু কই গায়ের একটা আলোও তো দেখা যায় না! বুড়ো অশ্বথ ছিল গায়ের নিশানা, সেটাও তো গিয়েছে।

—আর থাকলেই কি এই অন্ধকারে দেখতে পেতে? নাও, পা চালিয়ে চলো!

মাণিক বলিল—কিন্তু পা যে আর চলতে চায় না।

মাণিকের কথা সত্য। পদে পদে পা হাটু অবধি পুণ্ডিয়া যায়। কটে টানিয়া তুলিলে সেই গর্তে চারিদিকের জল গড়াইয়া আসিয়া ঝির ঝির শব্দে পড়ে, আর শব্দ বিরামহীন বৃষ্টির

বুদপ বুদপ বুদপ। জগতে আর কোন শব্দ নাই, না একটা পাখীর পাখার ঝটপটি, না একা শিয়ালের ডাক।

মাণিক বলিল—দাশ, আমার কেমন যে মনে হচ্ছে জোড়াদাঁঘি নাই, তাই 'আমর পৌছতে পারছি না, যেন আমরা পনেরো, কুঁ বৎসর সময় এগিয়ে গিয়েছি, সেদিনে শূন্যতাকে আজ প্রত্যক্ষ দেখছি।

ভজহারি বলিল—এই যে সামনে একা ফরসা জায়গা, বোধ করি পথের নিশা আবার পাওয়া গেল। কিন্তু একি—বলিয়া চমকাইয়া উঠিল, দুজনেই ধামিল, অন্ধকার পরস্পরের দিকে তাকাইল এবং একটি অক্ষর দুইজনে করিল। পথ ভুলিয়া দুইজনে জোড়াদাঁঘির শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

মাণিক বলিল—লক্ষণটা ভালো নয়, ভাই



প্রকাশ ও অপ্রকাশের আলোছায়ায়  
পাওয়া ও না-পাওয়ার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব  
কামনা ও কবিতার টানা-পোড়েনে  
যে রহস্যজাল রচিত হয়েছে তা তুলন্ত কারুশিল্প

শচীন্দ্র  
মজুমদার



উপজ্ঞাসের আঙ্গকে কাব্যের রস পরিবেশন করলে তার আবাদ কত মধুর হতে পারে এ-বইয়ে তার নিঃসংশয় পরিচয় মিলবে। সংস্কৃত কাব্যের গাভীর ও বৈষ্ণব পদাবলীর লালিত্য এর প্রতি ছুটে উৎসারিত। আধুনিক সমাজ ও আধুনিক নর-নারী এ-উপজ্ঞাসের উপজীব্য, কিন্তু বিষয় সেই চিরন্তন—সেই পরকীয়া-প্রেম। ইন্দ্রিয়াতীত হয়েও যা ইন্দ্রজালের অতীত নয়। আধুনিক কালের প্রসঙ্গে পরকীয়া-প্রেমের এমন সম্মোহনী কাহিনী বাংলা সাহিত্যে আর দেখা হয়নি। দাম তিন টাকা।



সিগনেট প্রেসের বই

১০/২ এলগিন রোড, কলিকাতা ২০

সিগনেট প্রেসের বই \* সিগনেট প্রেসের বই \* সিগনেট প্রেসের বই

সিগনেট প্রেসের বই

সিগনেট প্রেসের বই

সিগনেট প্রেসের বই

গ্রাম লক্ষ্য করে চললাম, এসে শৌহলান শ্মশানে।

ভজহারি বলিল—আমাদের দোষ নেই, নদীর জল ফেঁপে উঠে শ্মশানটাই গ্রামের কাছে এগিয়ে এসেছে!

মাণিক বলিল—রাম নাম করো ভাই, রাম নাম করো। এই বলিয়া তাহারা দুইজনে শ্মশানটাকে পাশ কাটাওয়া দ্রুতপদে গ্রামের দিকে চলিতে লাগিল।

তখন সেই বর্ষণ মুখারিত অশ্বকারে, নভো-ব্যাপী নিস্ততশ্চায় মনে হইতে লাগিল মহেশ্বরের নন্দীভূষণী যেন সিন্ধু বস্ত্রখণ্ড দিয়া বিম্বপট হইতে জোড়াদীঘর কালো বিস্মৃটিকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া দিয়াছে! সজল পদধ্বনি তুলিয়া পথিকবয় কোন শুনাতার মুখে চলিতেই লাগিল।

( ষষ্ঠ খণ্ড সমাপ্ত )

### সপ্তম খণ্ড

১

বৈশাখের অপরাহ্নে ঈশান কোণের আকাশে ছোট একখানা মেঘ ভাসিয়া ওঠে, কাহারো নজরে পড়ে না। সকলের অজ্ঞাতসারে দিগন্তের ধার ঘেঁষিয়া মেঘ জমিতে থাকে, নিঃশব্দে। ক্রমে স্তরে স্তরে মেঘের স্তূপ ভিড় বাঁধে, তারপরে আকাশের সে দিকটা দৈত্যের মাংসপেশী বহুল দেহের কৃষ্ণ-সমারোহ বিকাশ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মেঘ যত বেশী জমে, বাতাস তত পড়িয়া আসে, বায়ু-মণ্ডলে ভাটার টান লাগে—ক্রমে বায়ুমণ্ডলে বাতাসের একটি তরঙ্গও আর থাকে না। ধীরে ধীরে দু'একটি বিদ্যুতের ল-ফলা আকাশে চমক দেয়।

প্রথমে মেঘের এই অতর্কিত সমারোহ চোখে পড়ে মাঠের রাখালগণের। তাহারা এ ওকে ডাকিয়া নীরব তর্জনীতে আকাশটা দেখায়। তারপরে চোখে পড়ে নদীর মাঝদের। তাহারা একবার ভালো করিয়া দেখিয়া লইয়া নৌকার পাল নামাইয়া ফেলে; যে নৌকাখানা ঘাটে বাঁধা আছে, আরও একটা অতিরিক্ত কাছ দিয়া তাহাকে বাঁধে।

দিগন্তের রেখাটা ক্রমে স্থলতর হইয়া ওঠে, দিগন্তের ধারে কালো ছায়া পড়ে, নদীর দুই কলে কালো তুলি বুলাইয়া যায়, চণ্ডল পুষ্টির দল অজ্ঞাত আশংকায় গভীরতর জলে গিয়া প্রবেশ করে—মাছরাঙাটি শিকার সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া আকাশের অবস্থা দেখিয়া উড়িয়া চলিয়া যায়, বিদ্যুৎ-কপিল-প্রান্ত মেঘের পটে বেলে হাঁসের পাখার সঞ্চার চমক মারিতে থাকে, কাকের দল বৃক্ষচূড়ে বসিয়া কক্কশ শব্দ করে,—তারপরে তাহাও ধামিয়া যায়; পৃথিবী

যেন জীর্ণা। হঠাৎ বিদ্যুতের আকাশব্যাপী একটা সুদীর্ঘ ল-ফলা খেলিয়া যায়—আর একটা তীব্র কক্কশ গর্জন, আকাশের ধূসর পর্দা খানাকে কে যেন এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত অবাধ সশব্দে ছিড়িয়া ফেলিল। তারপরে ঘন ঘন বিদ্যুৎ, ঘন ঘন গর্জন, আকাশে বাতাসে গাছের মাথায়, ইতস্তত নিশ্চিন্ত মৃতপ্রায় কাকের দেহে—সে এক ছুটোছুটি কাণ্ড। জটায়ু যেন রাবণের টুটি ধরিয়া আছাড়ি পিছাড়ি মারিতেছে। তখন চারিদিকে রাম রাম, থাম থাম রক্ষা করো, ধনি উঠিতে থাকে। কাল বৈশাখীর বড়! মড় মড় করিয়া ডাল ভাঙে, পট পট করিয়া চালের বাঁধ হেড়ে, চাল উড়িয়া যায়—খুঁটি হেলিয়া পড়ে। হঠাৎ আকাশ যেন নিজীব। কিন্তু নিশ্বাস ফেলবার সময়টুকু যাইতে না যাইতেই আবার দমকা, আবার গর্জন। অবশেষে বাতাসের পক্ষিরাজে সোয়ার হইয়া ছোটবড় শিলাখণ্ডের লোম্বে নিক্ষেপ করিতে করিতে বৃষ্টি দেখা দেয়। নারিকেল শূপারি গাছগুলি মাথা নাড়িয়া ক্রমাগত বলিতে থাকে—না না! আম জাম কাঁঠাল বাতাসের প্রচণ্ড তালে তালে সবুজ পল্লবের আবরণ খুঁচাইয়া ডালপালার বস্কম রেখা উন্মাদিত করিয়া মেঘ ও বিদ্যুতের লীলা প্রকাশ করে। এমনিভাবে কিছুক্ষণ চলে। তারপরে যেমন অতর্কিতে আসিয়াছিল, তেমনি অকস্মাৎ চলিয়া যায় কাল বৈশাখীর ধংসকাণ্ড। তখন চারিদিকে ভগ্ন বৃক্ষ, ছিন্ন পল্লব ভাসিয়া আসা খড় কুটা, ধ্বস্ত গ্রাম আর উৎপাটিত বৃক্ষের ব্যাদিত গহ্বর পড়িয়া থাকে। ইতস্তত মুমূর্ষু পাখীর দেহ তখনো কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে থাকে অতীত অভিজ্ঞতার আশংকায়—আর মানুষ নানা অপ্রত্যাশিত স্থান হইতে বাহির হইয়া চারিদিক দেখিয়া ভয়ে নিস্তম্ভ হইয়া থাকে। বৈরাগ্যের শান্ত মহিমায় জলস্থলে তখন শ্মশানঘর শূন্য শূন্য। তখন সেই বৃষ্টিধোত সম্ভার ক্রান্তিময় প্রহরগুলি প্রতি-ধ্বনিত করিয়া কিষ্কির বাউল দল যুদ্ধের নিশ্ফলতার অবসানে বৈরাগ্যের শান্তিমগ্ন পাঠ করিতে থাকে। মেঘান্তহিত আকাশের প্রান্তে কৃত্যার চন্দ্রকলা করণ হাসি হাসে।

২

কালবৈশাখীর অতর্কিত সমারোহে জোড়া-দীঘর দর্শান ও ছআনি চরম শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ইহার পূর্বে যে-সব মারমার হইয়াছে সমস্তই গ্রামের মাঝে; বাহির হইতে লাঠিয়াল আনিবার প্রয়োজন হয় নাই, এবারে উভয় পক্ষই দূর দূরান্তর হইতে লোক আনিতে লাগিল। এই সব লাঠিয়ালরা বংশানুক্রমে জোড়াদীঘর বাবুদের পোষা। সেকালে ইহাদের পূর্বপুরুষ লাঠির জোরে বাবুদের সম্পত্তি অর্জন করিয়া দিয়াছে এবং

তাহার পুরুষের স্বরূপ জোত জমি পাইয়া এখনকার কালে লাঠির প্রয়োজন বড় হয়। লাঠি এখন হাকিমের তর্জনীতে ও উকীলের মুখে জন্মান্তর লাভ করিয়াছে। সেকালে লাঠিয়ালদের উত্তর পুরুষদের অনেকই পৌরী বিনা ভুলিয়া চাষ বাস করে, চিনির কারখানা কাজ করে, আর যে দু'চার কলম লেখা প শিখিয়াছে সে মফঃস্বল আদালতের স্ট্যাম্পে ভেণ্ডার করিয়া দুর্লভ মানব জন্ম অতিবাহিত করে। বাবুদের কাজে আর তাহাদের বড় ড পড়ে না।

দর্শান ও ছআনি দুই পক্ষ হইতেই। সব পুরাতন সেবকদের সম্বন্ধে লোক বা হইল। লাঠিয়াল বংশের যাহারা গ্রামেই থা বাবসায়ানতর এখনো গ্রহণ করে নাই, তাহ অপ্রত্যাশিত এই সৌভাগ্যে নাচিয়া খাড়া হই তাহারা নিজেরদের মধ্যে বলাবলি কার লাগিল—বাবুরা দেখছি আবার জমিদারী মন দিয়েছে, আমাদের বৃদ্ধি আবার সূচী ফিরলো! এই বলিয়া কেহ আলাপকে ধন্যবাদ টি কেহ বা কালীকে; এবং সকলেই একে এ দিনে দিনে, কেহ বা একাকী, কেহ বা সান, কালবৈশাখীর মতো জোড়াদীঘর ভাগ্যাক আসিয়া উদর হইতে লাগিল।

একদিন ভোরবেলা মালগির বড়ো আসিয়া কীর্তিনারায়ণকে সেলাম করি দাঁড়াইল।

কীর্তিনারায়ণ বলিল—কি সেখ বে আছে? একেবারে বড়ো হয়ে গেলে যে।

সেখ বলিল—কর্তা, আমরা কি আজ মানুষ! বড়ো কর্তার আমলের লোক আমরা হজুরকে দেখেছি এই এতটুকু। তা ছাড়া আ কাল কাজ কর্ম নেই, চুপচাপ বসে বসে হ পায়ে মগচে ধরে গেলো। হজুরের দস্তা জঁ জমা আছে তাই খেতে পাচ্ছি, তা না হলে এ দিন না খেয়েই মরতে হ'ত।

কীর্তিনারায়ণ বলিল—বেশ তো, এব মনের মতো কাজ পাবে! পারবে তো? সে ল্যা জোর আছে তো?

সেখ বলিল—কাজের সময়ে ঢে নেবেন, সেখ বড়ো হয়ে পড়েছে কি ন কীর্তি বলিল—আচ্ছা যাও, এখন বিং করগে। আর শোনো, এখন তুমিই হলো সদ সকলকে বেশ তালিম দিয়ে নিয়ো।

সেখ সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

লোকটার নাম সকলে ভুলিয়া গিয়াছিল সকলেই তাহাকে মালগির সেখ বলিয়া ডাখি কেহ কেহ তাহাকে বড়ো সেখও বল লাঠিয়াল এ অঞ্চলে নাই। তাহাদের বং লাঠিয়ালের, কত লোক যে তাহারা মারিয় আর তাহাদের বংশেরও কত লোক যে ল্যা ঘামে প্রতীতি তাহা হই নাই।

তারপরে আসিল যদু মল্ল। সে দশানির বহুকালের প্রজা। লোকটা যেমন চাঙা, তেমনি কুশ, দূর হইতে একটা চলমান ঠাঙা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একবার লাঠি ধরিলে—ভয়েই বিপক্ষের লাঠি খসিয়া পড়ে। যদু মল্লের ডান বাম দুই হাত সমান চলে। লাঠি খেলবার সময়ে তাহাকে দৌঁধলে বোধহয় দুই খানা লাঠি যেন চরকির মতো ঘুরিতেছে, বোধহয় একখানা লাঠি আর একখানা লাঠিকে ঘুরাইতেছে। লোকে তাহাকে যদু মল্ল বা চাঙা যদু বলিত।

যদু মল্লের সংগেই আসিল পশু শেখ, একই গ্রামে দু'জনের বাড়ি। লোকটা ঢালী, গা-ভরের চামড়ার প্রকাণ্ড একখানা ঢাল হাতে করিয়া সে আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকটার একটা হাত কোন এক দাগায় কাটা গিয়াছে। পশুকে হাতের ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিলে আনোপানত বলিয়া মস্তব্য করে যে—হাতটা গিয়াছে বালাই গিয়াছে। আরে ভাই যে দিনকাল লোকে একটা হাতের মলাই দিতে চায় না, দুটো হাত থাকা নেহাৎ বাজে খরচ। তারপরে বলিত, আমার চাচাকে ছোট বেলাতে দেখেছি, বেশ মনে আছে তার দুটা হাতই কাটা গিয়াছিল, মাথা দিয়া চুঁ মারিয়া দুখমন কাঁ করিয়া ফেলাই তাহার অভ্যাস ছিল। চাচা বলিত হাত দুটা না যাওয়া অবধি মাথার মূল্য বৃদ্ধিতে পারি নাই।

শ্রোতার আদ্যক হইয়া তাহার কথা শুনিত। পশু বলিত, যখন দুই হাত ছিল তখন এক হাতে ধরতাম ঢাল এক হাতে শড়কি। এক হাত গেলে—শড়কি ছাড়লাম। যদি খোদা কখনো দয়া করে এ হাতটাও নেন তবে চাচার মতো মাথা চালাবো আরম্ভ করবো, দেখি সম্মুখে দাঁড়ায় কে? তারপরে আশ্চর্য্যাবশ্য করিয়া বলিত, বাবা

কৈবর্তগাঁতির শেখদের মাথা বড় শক্ত। একেবারে পাথর কেটে গড়া।

পরের দিন সোনারাজুর কলিমুদ্দিন পরামাণিক আসিল। লোকটা খোঁড়া। ওইখানেই তাহার জিং। প্রতিপক্ষ তাহাকে দর্বল মনে করিয়া অসাবধান হইবামাত্র কলিমুদ্দিন লাঠির ঘায়ে তাহাকে কাঁ করিয়া ফেলে। কলিমুদ্দিন বলে, প্রথম যখন পা খোঁড়া হল কতই না কেঁদেছি—কিন্তু তারপরে বুঝলাম আল্লা হাকিম বড়ই সুবিচার করেছেন। দু'পাওয়ালা লোকের যে পথ চলতে দু' ঘণ্টা লাগে, আমি বেড় পায়ে তা দেড় ঘণ্টায় মেরে দিই। লগি দিয়ে যেমন নৌকা ঠেলে তেমনি আমার খোঁড়া পাখানা আস্ত পাখানাকে ঠেলেতে থাকে—আর আস্ত বেটা হন হন করে এগিয়ে চলে! দু'খানা পা আস্ত থাকলে কি চলতে পারতাম! এই বলিয়া সে খোঁড়া পা খানার উপরে একবার চাপড় মারিয়া বলে—বাবাসু।

ইহারা সকলেই দশানির বাড়িতে উঠিল। সকলেই দশানির প্রজা, বহুকালের চাকরান ভোগী লাঠিয়াল।

ছ'আনির আড়ম্বরও কিছু কম নয়। দূর দূরান্তর হইতে একে একে ক্রমে ক্রমে ছ'আনির চাকরান ভোগীর দল জুটিতে লাগিল।

প্রথমেই আসিল বড়ো নইমুদ্দিন মিঞা। মাথায় টাক, বলিষ্ঠ শরীর, বেঁটে খাঁটো লোকটা। নাকটা তাহার এমন বাঁকা যেন একটা আস্ত টিয়া পাখী সেখানে বাসা বাঁধিয়াছে। নইমুদ্দিনের মতো এমন বিপর্যয় টেরা চোখ কদাচিৎ দেখা যায়। তাহার দুই চোখের দুই দৃষ্টি সপক্সীয়ের মতো সম্পূর্ণ বিপরীত পথগামী। ওই টেরা চোখই তাহার প্রধান সম্পদ। লাঠালাঠির সময়ে তাহার চোখের দৃষ্টি

দেখিয়া প্রতিপক্ষ বুদ্ধিতে পারে না সে কোন-দিকে তাক করিতেছে। হঠাৎ বিদ্রোহ বিপক্ষের ঘাড়ে লাঠি আসিয়া পড়িয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া দেয়। নইমুদ্দিনের সঙ্গে আসিল তাহার লায়েক পুত্র। নইমুদ্দিন ছ'আনির সর্দার লাঠিয়াল।

আর আসিল নাদুস গোপাল। তাহার আসল নাম অজ্ঞাত। নামটা বোধহয় তাহার দেহাত্মক। লোকটা শান্ত শিষ্ট গোল গাল, রঙ ফর্সা, যেন একতাল খোয়া ক্ষীর। কথাগদ্যলিও তাহার মিষ্ট। সবসম্প্রদে মিলাইলে নাদুস গোপাল নামটা তাহার উত্তম বর্ণনা বলিতে হয়। সে বলে—আরে রাম লাঠি সেটা নিয়ে লড়াই করা কি ভদ্রলোকের কাম! ভদ্রলোকের অস্ত্র হচ্ছে এই—বলিয়া সে ছোট ছোট উড়ো শরিকগুলি দেখায়। লড়াইয়ের সময়ে সে শান্তভাবে উড়ো শড়কির শতপের পাশে দাঁড়াইয়া ডান পায়ের দুই আঙুলে শড়কি টিপিয়া ধরে, ধরিয়া সজোরে সম্মুখের দিকে নিক্ষেপ করে। সে শড়কি প্রতিরোধ করাও যেমন কঠিন, গায়ে বিঁধিলে প্রাণরক্ষা করাও তেমনি দুরূহ। বিনা ধনুকের তীরের মতন অব্যর্থ, তীরের চেয়েও মারাত্মক! এক পশু শেখ ঢালী ছাড়া কেহ তাহার তীর রুখিতে পারে না।

ইহা ছাড়া আসিল বৃদ্ধ কৈদার সর্দার। আর আসিল নালু, কালু যমজ ভাই, এ অঞ্চলের বিখ্যাত ঘোড়সোয়ার। ইহারা সকলেই ছ'আনির তরফের লোক। এইসব নাম-করা সর্দারগণ ছাড়া আরও কত যে অজ্ঞাত লোক লুটের আশায় পুরুস্কারের লোভে আসিয়া দুই পক্ষে যোগ দিল তাহার লেখাজোখা নাই। এই সব ছোট-বড় কটা কালো মেঘের ভায়ে জেঁড়দাঁড়ির আকাশ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। (ক্রমশঃ)

### নিখিল ভারত সাহিত্য সংম্মেলন

আগামী ৩০শে, ৩১শে আগস্ট এবং ১শা, ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে নয়াদিল্লীতে উক্ত সম্মেলনের অধিবেশন হবে। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, পশ্চিম বঙ্গের প্রাধিকার, ডাঃ রঞ্জনপ্রসাদ, মৌলানা আজাদ প্রমুখ মনীষী বিভিন্ন শাখা-সমূহের উপস্থাপন করবেন। ভারতবর্ষের সব ভাষা ও সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ও প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ পাঠান হচ্ছে। সম্মেলনের উদ্দেশ্য এটিকে নিখিল ভারতীয় সাহিত্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যাতে সব প্রদেশের সাহিত্যিকগণ একত্র হয়ে ভাষার আদান-প্রদান করতে পারেন। ফলে সব সাহিত্যেরই শ্রী ও গতিবেগ বৃদ্ধি হবে। সাহিত্যিকদের সুবিধা ও স্বাধীনতা নির্দেশ করে দেওয়ারও চেষ্টা করা হবে।

সম্মেলনের কার্যকরী সমিতিতে বাঙালী সাহিত্যের প্রতিনিধি নিৰ্বাচিত হয়েছেন শ্রীযুক্ত শ্বেশচন্দ্র দাস আই সি-এস। ১৩৫০ সনে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী সাহিত্য সংম্মেলনের সমিতি অধিবেশন

## সাহিত্য সংবাদ

কৃত্তিক কতখানি ছিল তা আমরা দেখেছি। তিনি বিশেষভাবে সকল বাঙালী সাহিত্যিককে আবেদন জানিয়েছেন যাতে তারা সদস্য সম্মেলনে যোগদান করেন। বাঙালী সাহিত্যের জন্য যে ত্যাগস্বীকার ও সাধনা করেছে তার উপলব্ধি করবারা রক্ষা এই প্রতিষ্ঠানেও হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সম্মেলনের অধিবেশন ও প্রতিনিধিদের বাস ও আহারের ব্যবস্থা হয়েছে নয়াদিল্লীতে Constituent Assembly গৃহে। সেখানে প্রতিনিধিরা বিনা খরচে অভ্যর্থনা সমিতির আতিথি হবেন। যারা যেতে ইচ্ছুক তারা শ্রীযুক্ত দাশের সঙ্গে ১নং ওল্ড মিল রোড, নয়াদিল্লী, এই ঠিকানায় সঘর পত্র ব্যবহার করুন।

### ছোট গল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতা

সাহিত্য-সংসদ, কাগপুত্র, পরিচালিত "ছোট গল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতা"র জন্য নতুন লেখক

লৌকিকাগণের নিকট হইতে ছোট গল্প ও কবিতা ৪ই আগস্ট (১৯৪৭) পর্যন্ত গৃহীত হইবে।

ছোট গল্প—১। যে কোন বিষয়বস্তু লইয়া রচিত হইতে পারে; ২। গল্প সম্পূর্ণ মৌলিক হওয়া চাই। অনুবাদ রচনা গ্রাহ্য হইবে না। ৩। ফলাফল পৃষ্ঠার ১ পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। ৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সমাপ্ত হইবে।

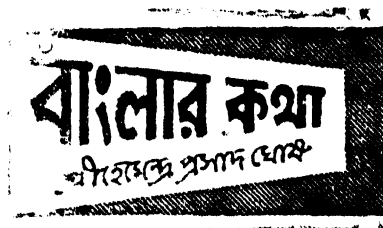
কবিতা—১। ফলাফল কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে। ২। "মৃত্যু" সম্বন্ধীয় হওয়া প্রয়োজন।

প্রতি বিভাগে দুইটি করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে এবং শ্রেষ্ঠ বিবেচিত রচনাগুলি আগামী ২২শে শ্রাবণ 'রবীন্দ্র তিরোধান' দিবসে সংসদ সাহিত্য অনুষ্ঠানে পঠিত হইবে। 'সাহিত্য সংসদ' মনোনীত বিচারকমণ্ডলীর উপর বিচারভার দেওয়া হইবে। পুরস্কারপ্রাপ্ত ও অতিরিক্ত পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক লেখিকাগণকে পত্রের দ্বারা ফলাফল জানান হইবে। রচনা পাঠাইবার ঠিকানা—শ্রীমণি বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্যাব্যক্ষ, "সাহিত্য-সংসদ দপ্তর", ৭, সেনস হাটা (করাতীখানা), কানপুর (ইউ, পি)।

বাঙলাকে পূর্ব ও পশ্চিম দুইভাগে বিভক্ত করা হইবে, স্থির হইয়াছে। এখন বিভাগ করণ হইবে, তাহা সীমা নির্ধারণ কমিশন স্থির করিবেন। মুসলমান পরিচালিত সংবাদ-পত্রগুলিতে প্রস্তাবিত পূর্ব-পাকিস্তান দেখাইয়া যে সকল মানচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, সে সকল অধ্যয়ন করিলে কলিকাতায় এখনও যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা চলিতেছে, তাহার কারণ বুঝিতে পারা যায়। মুসলিম লীগ কলিকাতার একাংশের যে দাবী উপস্থাপিত করিবেন, তাহা সমর্থনের জন্য গত ১৬ই আগস্ট—“প্রত্যক্ষ সংগ্রামে” ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল এবং এখনও সেই ব্যবস্থা চলিতেছে, বলা যায়। খাস কলিকাতায় সার্কুলার রোডের পূর্বাংশে অত্যাচারের ও ভয় প্রদর্শনের দ্বারা হিন্দুশূন্য করা চলিতেছে; হিন্দুর সঙ্গে সঙ্গে যে দেশীয় খৃষ্টানদিগকেও (বোধ হয় অ-মুসলমান ‘অপরাধে’) সে অঞ্চল ত্যাগ করিতে বাধ্য করিবার জন্য চেষ্টাও হইতেছে। ১৬ই আগস্ট যখন বাঙলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মিস্টার আক্ৰাম খানের গৃহের সম্মুখস্থ গৃহে তাহার পরিচিত প্রত্নবৈদ্যকে হত্যা করা হয়, তখন তিনি কিরূপ ভাব দেখাইয়াছিলেন ও কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা করিলেই এ বিষয় অনুমান করা সহজসাধ্য হইবে। এখনও ঐ অঞ্চল হইতে অ-মুসলমান বিতাড়ন চলিতেছে। দীর্ঘ দশ মাসেও সেই অঞ্চলে অ-মুসলমানের বাস সরকার নিরাপদ করিতে পারিলেন না দেখিয়া—এখনও তান্ত্র গৃহে ফিরিতে না পারায় যাহারা গৃহ বিক্রয় করিতে চাহিতেছে, মুসলমান ক্রেতার। সে সকল কিনিয়া লইতেছে। বলা বাহুল্য, এ সকল ক্রয়বিক্রয় আইনসংগত বলিয়া বিবেচিত হইবে কিনা, সে বিষয় পশ্চিমবঙ্গের ভাবী সরকারকে স্থির করিতে হইবে। যদি সার্কুলার রোডের পূর্বভাগে মুসলমানের আধিকা ঘটে এবং তাহার পূর্বে খালের পরপারে মুসলমানদিগের কারখানা প্রতিষ্ঠা স্থাপিত হয়, তবে তাহা পাকিস্থানের জন্য দাবী করা হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্মতলা স্ট্রীট হইতে মীরজাপুর স্ট্রীট পর্যন্ত পাকিস্থানী বড়বাজার অঞ্চল করিয়া গঙ্গা পর্যন্ত “করিডোর” দাবী করা হইবে—সেই জন্য প্রথমেই কলকটোলা, ক্যানিং স্ট্রীট (মুর্গাহাটা) প্রতিষ্ঠিত অঞ্চল হিন্দুশূন্য করিবার ব্যবস্থা হয়।

কলিকাতায় যে হাঙ্গামার নিবৃত্ত হইতেছে না—ইহা কি তাহার অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া মনে করা অসংগত?

বাঙলা বিভাগের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা যাহাতে—



(১) আপনাদিগের প্রাপ্য লাভ করেন এবং

(২) প্রাপ্ত অংশ রক্ষার উপায় করিতে পারেন, তাহাই প্রথম লক্ষ্য হওয়া প্রয়োজন।

এইজন্য বাঙলার নানাস্থানে সভাধিবেশন হইতেছে। প্রথম সভা আসানসোলে হইয়া গিয়াছে। তাহা পশ্চিমবঙ্গে সমগ্র প্রেসিডেন্সী বিভাগ এবং মালদহ, দিনাজপুর ও ফরিদপুরের হিন্দুপ্রধান অঞ্চল ও সমগ্র জলপাইগুড়ী ও দার্জিলিং জিলা দুইটি যুক্ত করার দাবী উপস্থাপিত করা হয়। তাহার পরে কান্দীর (মুর্শিদাবাদ) সভা হইয়া গিয়াছে। সমগ্র কান্দী মহকুমা হিন্দুপ্রধান। কিন্তু কান্দীর সভায় কেবল কান্দীকেই পশ্চিমবঙ্গ-ভুক্ত করিবার দাবী না করিয়া আসানসোলের দাবীর অনুরূপ দাবীই করা হইয়াছে।

রাণাঘাটে নদীয়া-মুর্শিদাবাদ-যশোর বঙ্গীয় সম্মিলন নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। যশোহরেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল। অর্থাৎ পাকিস্থানী ব্যবস্থায় লোকমতের কণ্ঠস্বরের ব্যবস্থা হইল।

রাণাঘাটের সম্মিলন নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। তাহাতে গ্রীষ্মকৃত নরেন্দ্রকুমার বসুর সভাপতিত্ব করিবার কথা ছিল। তিনি বঙ্গ-বিভাগ সম্পর্কে এক বিবৃতি দিয়াছেন। তাহাতে তিনি লর্ড মাউন্টবাটেনের প্রস্তাব যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার ত্রুটি দেখাইয়া বলিয়াছেন—

ভারতবর্ষে (ইংরেজের ন্যে) গণতন্ত্র—সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-ব্যবস্থা! আরার মুসলমানদিগকে অতিরিক্ত অধিকার প্রদান জন্য অমুসলমানদিগের জন্য ২৮৮,০০০ লোকের জন্য ব্যবস্থা পরিশেষে একজন ও মুসলমানদিগের জন্য ২৩৫,০০০ লোকের জন্য একজন প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বাঙলার প্রান্তবক্ষ্য অধিবাসীর সংখ্যা—

মুসলমান—শতকরা ৫১ জনের কিছু অধিক  
হিন্দু—শতকরা ৪৮ জনের কিছু অধিক  
অথচ নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা—

মুসলমান—শতকরা ৪৭ জনের কিছু অধিক  
হিন্দু—শতকরা ৩২ জন

বাঙলার লোকসংখ্যা মেটামুটি—

হিন্দু—২৭৫ লক্ষ বা শতকরা ৪৫ জন

মুসলমান—৩৩০ লক্ষ বা শতকরা ৫৫ জন  
বাঙলার জমি-পরিমাণ ৭৭ হাজার বর্গমাইল।  
বাঙলাকে পূর্ব ও পশ্চিম দুইভাগে বিভক্ত করিতে হইলে উত্তর হইতে দক্ষিণে রেখা টানিয়া যদি স্বাভাবিক সীমা-নির্ধারণ করা হয়, তবে তাহাই ‘সংগত’ হয়—

তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মা নদী কমটির সীমা ধরিয়া বিভাগ করিলে ভারতীয় রাষ্ট্র-সংঘের পূর্ব-সীমা গঙ্গা হয়। তাহাতে দুই অংশে জনসংখ্যাও প্রায় সম্প্রদায়ানুরূপ হয়।

আমরা মনে করি, এই প্রস্তাব বিশেষভাবে বিবেচ্য।

মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, অধিবাসী বিনিময় অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। এখনও কলিকাতার নানাস্থানে যেভাবে মুসলমানাতিরিক্ত অধিবাসী দিগের উপর অনাচার অনর্দিত হইতেছে, তাহাতে পূর্ববঙ্গ পাকিস্থানে পরিণত হইলে তথায় মুসলমানাতিরিক্ত অধিবাসীদিগের কিরূপ ব্যবহার পাইবার সম্ভাবনা তাহা বিবেচ্য। কাজেই সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিয়া পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব-বাঙলার মুসলমানাতিরিক্ত ব্যক্তিদিগের জন্য স্থান সংগ্রহ করিতে হইবে।

বাঙলার পশ্চিমভাগ কিছুর্তেই কলিকাতার একাংশও ছাড়িতে পারে না। মুসলিম লীগের কলিকাতার একাংশের দাবীই যে কেবল অসংগত তাহা নহে; পরন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলিকাতা হইতে অদূরবর্তী বারাসত মহকুমার দাবীও কখন গ্রাহ্য হইতে পারে না।

কলিকাতা সম্পর্কে মুসলিম লীগের “মাথা-বাণায়” তাহার। বোধ হয়, যুরোপীয় ব্যবসায়ীদিগের সহানুভূতি লাভ করিবেন। কারণ, যুরোপীয়রা কলিকাতায় বৈরূপ প্রবল হইয়াছেন, সেরূপ আর কোথাও নহে। কলিকাতার যুরোপীয় ব্যবসায়ীদিগকে লক্ষ্য করিয়াই লর্ড কার্জন বলিয়াছিলেন—এদেশে বৃটিশ শাসন দুইভাগে বিভক্ত—শাসন ও শেষণ; সরকার শাসন ও যুরোপীয় ব্যবসায়ীরা শেষণ করেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিশেষে যুরোপীয় দলের দলপতি মিস্টার গ্রিফিথস বিলাতে গিয়াছেন। তিনি নাকি কলিকাতায় কি হইবে, সেই আলোচনা করিতেই গিয়াছেন।

বাঙলা দুইভাগে বিভক্ত হইতেছে। যেভাবে পশ্চিমবঙ্গ হইতে ধনা রপ্তানি হইতেছে, তাহা আশংকাজনক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এবার পশ্চিমবঙ্গেও চাষের অবস্থা আশাপ্রদ নহে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ হইতে যদি বাহিরে ধানা রপ্তানি করা হয়, তবে বিশেষ বিবেচনা করিয়া সে কাজ করা প্রয়োজন। তাহা হইতেছে বলিয়া মনে হয়, না। কারণ, যুরোপীয় মুসলিম লীগ সচিব, প্রতিনিধি ও পাবলিশার যাহাতে



সুবিধা হয়, সে বিষয়ে অবহিত হওয়ার বিম্বয়ের কারণ থাকিতে পারে না।

বঙ্গ-বিভাগ নির্ধারিত হইবার সঙ্গে লগ্নেই বর্তমান সচিবসংস্থের অবসান ঘটান কর্তব্য ছিল। পশ্চিমবঙ্গের লোকের অনাস্থা-ভাজন হইয়াও যে মিস্টার সুরাবর্ণী বলিতে লক্ষ্য বা কুণ্ঠা অনুভব করেন নাই যে, তাহার না হয় হোপাজী সচিব সংস্থারূপেই অবস্থিতি করিবেন, তাহাতে অনেকের একটি গল্প মনে পড়িবে। একবার্ত্তি বেকার অবস্থায় রাজার নিকট চাকরী প্রার্থনা করে এবং কোন চাকরী খালি নাই জানিয়া বলে—সে বিনা বেতনে চাকরী করিতেও চাহে। তাহার আবেদনে বিরক্ত হইয়া রাজা আদেশ করেন—সে ঘাটে বসিয়া নদীর তরণ গণনা করিবে। সে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া যাইয়া নদীর কূলে বসে এবং কোন নৌকা দেখিলেই নদীর তরণ ভাঙ্গিবে বলিয়া নৌকার গতি রূপ করে। এইরূপে সে নৌকা প্রতি কিছু কিছু আদায় করিয়া লাভবান হইতে থাকে। বর্তমান সচিবসংস্থা যে কয়দিন বহাল থাকিবেন, সেই কয়দিনেই অনেক অনিষ্ট-সাধন করিতে পারেন। ইতিমধ্যে এমন অভিযোগও শুনা যাইতেছে যে, তাহার—

(১) ইসলামিয়া কলেজে কয় লক্ষ টাকা পূর্বমঞ্জুরী বলিয়া—দিতোছেন;

(২) চাকরীতে লোক নিয়োগও চলিতেছে। দেখা যাইতেছে, এখনও পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম লীগের সহিত সম্মিলিত সচিবসংস্থা গঠনের এবং অনুপযুক্ত লোকও নিযুক্ত করিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

এমনকি যে সকল লোক এককালে সচিব লাভের লোভ সম্বরণ না করিতে পারিয়া কংগ্রেসের নিয়ম ও নির্দেশ অমান্য করিয়াছিল, সে সকল লোককেও “শুদ্ধি করিয়া” গ্রহণের কথা হইতেছে। সেরূপ লোকের প্রতিশ্রুতির মূল্য কি তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

বঙ্গ-বিভাগের ফলে কংগ্রেসের দায়িত্ব কিরূপ বর্ধিত হইয়াছে, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। সেদিন ভারত সভায় সম্বন্ধনাকালে, কংগ্রেসের সভাপতি আচার্য কৃপালনী বলিয়াছিলেন—

তিনি ইতিহাস অধ্যয়নকালে বুঝিয়াছেন—ক্ষমতা মানুষকে দুর্নীতি দুষ্ট করে; কিন্তু বাঙলায় তিনি যাহা দেখিতেছেন, তাহাতে

বোধ হয়, তাহাকেই সবপ্রথম লিখিতে হইবে—ক্ষমতাপ্রাপ্তির সম্ভাবনাও মানুষকে অধঃপতিত করে।

এই তীব্র তিরস্কারের কারণ আমাদের অজ্ঞাত নাই।

সেইজন্য আমরা বলি, কংগ্রেসকে দায়িত্ব বিবেচনা করিয়া বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান দুর্দশার মূল কারণ—সেচের অসুবিধা। যিনি মিশরে সেচের ব্যবস্থা পরিবর্তন করিয়া তাহাকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন সেই সেচ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এঞ্জিনীয়ার স্যার উইলিয়াম উইলকিন্স কয় বৎসর পূর্বে বাঙলায় আসিয়া অবস্থা পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন—সেচের সুব্যবস্থা করিলে পশ্চিমবঙ্গ আবার “সোনার বাঙলা” হইবে। কি উপায়ে সে ব্যবস্থা করা যায়, তাহাও তিনি দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু এতদিনেও তাহা হয় নাই। সে ব্যবস্থা করিতে হইলে সমগ্র প্রেসিডেন্সী বিভাগ পশ্চিমবঙ্গে থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

বাঙলা সরকারের দস্তরে—“মোর স্কীম” প্রভৃতি কতকগুলি পরিকল্পনা রহিয়াছে—সেগুলির কার্য অগ্রসর হয় নাই। মিশরের কৃষকরা সেচের সুব্যবস্থা হইলে বলিয়াছিল—এত জল নহে, ইহা সুবর্ণধারা। তাহাই বটে। বাঙলার নদীনালা আবার সেচের জলে পূর্ণ করিতে হইবে; তাহার পরে প্রয়োজনানুসারে বর্তমান বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সেচের ব্যবস্থা করা সহজসাধ্য হইবে। বাঙলার সেচের বাঁধ ও পুষ্কারিণীর সংস্কারসাধনও প্রয়োজন হইবে।

বাঙলার উন্নতিসাধনের জন্য অর্থের প্রয়োজন। লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সঠিক না হইলে কিরূপে সরকার অতিরিক্ত রাজস্ব পাইবেন? লোকের পেটে ভাত নাই, পরনে কাপড় নাই, রোগে ঔষধ পথ্য নাই—তাহারা কিরূপে অতিরিক্ত রাজস্ব যোগাইবে।

সেচের সুব্যবস্থা হইলে সঙ্গে সঙ্গে লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে। কোন কোন স্থানে সেচের অভাবে কৃষির দুর্দশা ঘটিয়াছে এবং ম্যালেরিয়া-জীর্ণ কৃষকরা আর পূর্ববং চাষ করিতেও অক্ষম হইয়াছে।

আর লোককে শিক্ষিত করিতে হইবে। কেবল যে কিতাবতী শিক্ষা—প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করাই প্রয়োজন, তাহা নহে। প্রচারকার্যের দ্বারা লোককে স্বাস্থ্য, কৃষি, পশু পালন প্রভৃতি সম্বন্ধে নানারূপ শিক্ষা প্রদান করা প্রয়োজন। সরকারের

প্রচারবিভাগের পরিবর্তন, পরিবর্তন ও পরিবর্তন করিতে হইবে।

লর্ড কাজল যে উদ্দেশ্যে এ দেশে সমবার বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন—বিভাগ সেই উদ্দেশ্যপ্রসূত হইয়া বৃন্দ জল যেমন অনিষ্টকর হয়, সেইরূপ অনিষ্টকর হইয়াছে। তাহার আমল সংস্কার প্রয়োজন। আয়লন্ডে স্যার হোরেস শ্লাম্বেট যেভাবে সমবার প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া আয়লন্ডের পুনর্গঠন সম্ভব করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের অবিদিত থাকিবার কথা নহে।

সে বিষয়েও বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বাঙলার জাতীয় সরকারকে অন্ধকারে আলোক দিতে হইবে, দুর্ভিক্ষের স্থানে প্রাচুর্য আনিতে হইবে, বাঙলাকে স্বস্থ ও বাঙালীকে সুস্থ করিতে হইবে। সে কাজেই জাতীয় সরকারের সাধকতা হইবে।

কাজেই বাঙলার কংগ্রেসের দায়িত্ব আমরা অসাধারণ বলিয়া বিবেচনা করি।

বাঙলার সরকারকে দেশের সকল সম্প্রদায়ের সকল শ্রেণীর লোকের কেবল সহানুভূতি নহে—সক্রিয় সহযোগও লাভ করিতে হইবে। তুচ্ছ তৃণগুচ্ছ যখন একতাবদ্ধ হয়, তখন তাহার দ্বারা মত্ত হস্তীকেও বৃন্দ করা যায়। দেশের সমবেত গণশক্তি অনায়াসেই অসাধ্য সাধন করিতে পারিবে। কাজ নগর অপেক্ষা গ্রামে অধিক। তাহা বিকিয়া অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত গ্রামকেই কেন্দ্র করিতে হইবে।

বাঙলার সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা প্রয়োজন। পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাহা কার্যে পরিণত করিতেই হইবে।

বাঙলা আজ বড় আশায় নতুন ব্যবস্থা লক্ষ্য করিতেছে। তাহার ভাগ্যে যাহাতে—“আশায় নিরাশা ফলে” না হয়, তাহা কংগ্রেসকে করিতে হইবে। বাঙালীর মননীয়া সুপ্রযুক্ত হইয়া বাঙালীর কল্যাণ সাধিত করিবে—ইহা মনে রাখিয়া কাজ করিতে হইবে।

কংগ্রেস ত্যাগমস্তে দীক্ষিত। কংগ্রেসকে আন্তরিক চেষ্টিয়া সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহার অতীতের অভিজ্ঞতা, বর্তমানের প্রয়োজন ও ভবিষ্যতের আশা তাহাকে কর্তব্যে প্ররোচিত ও প্রণোদিত করিবে।

দেশ আজ প্রস্তুত—সে যে নেতৃত্বের প্রতীক্ষায় আছে, কংগ্রেসকে সেই নেতৃত্ব প্রদান করিতে হইবে।

# প্রেমের নিখিলতা

শ্রীমতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভক্ত সাধক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একবার একজন ভক্ত দেখা করিতে আসেন। এই ভক্তিটি ছিলেন একেবারে ভক্তির রসে ভরপুর। তবু তিনি ইহা অনুভব করিতে ছিলেন, যে পরিমাণে তাঁহার জীবনে ভক্তির চক্কনাসের প্রাচুর্য, সেই পরিমাণে তাঁহার সাধনা পূর্ণাঙ্গ ও জীবন্ত হইতে পারিতেছে না। পূর্ণাঙ্গতা সামঞ্জস্য (Harmony) ও শক্তি-শালী জীবন যাহাতে সাধনার মধ্যে থাকে, সেই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে সাবধান ছিলেন। তাই তিনি রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইলে তাঁহার সাধনাও পূর্ণাঙ্গ ও জীবন্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে সমাগত ভক্তিটির সঙ্গে দুই-একজন শিষ্যও ছিলেন। এক সময় সমাগত ভক্তিটি জল খাইতে চাহিলে তাঁহারই একজন শিষ্য তাহাকে পানীয় জল আনিয়া দিলেন। গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, জলটি ভাল করিয়া স্তম্ভপূত অর্থাৎ ছাঁকা হইয়াছে কিনা। শিষ্য হহিলেন, “ছাঁকিবার বস্ত্রখণ্ড পথে কেথায় পড়িয়া গিয়াছে, নূতন জায়গায় বস্ত্রখণ্ড এখনও সংগ্রহ করা হয় নাই।” গুরু বলিলেন, “এমন অশুদ্ধ জল পান করিলে দেহশুদ্ধি থাকে না, এই জল ফেলিয়া দাও।” অগত্যা শিষ্য গুরুর জন্য আনিত সেই জল ফেলিয়া দিলেন। তাহাদের কথা শানিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, “এখানে চাহিলেই তো বস্ত্রখণ্ড খুঁজে পাইতে পারিতো।” এই বলিয়া তিনি ঊল ছাঁকিবার বস্ত্রখণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। জল স্তম্ভপূত না হইলে তাহা অশুদ্ধ। জৈনগণ তা সেইরূপ অশুদ্ধ জল কোনমতেই ব্যবহার করেন না, অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও ব্যবহারত জল স্তম্ভপূত না হইলে তাহা পান করেন না।

অভ্যাগত ভক্তিটি জল পান করিলে রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, “স্বাথোর ও আচারের জন্য জল বস্ত্রপূত আমরা যতটা সাবধান, ততটা যদি আমরা আমাদের সাধনার বিষয়ে সাবধান হইতাম, তাহা আমাদের সাধনাও সম্পূর্ণ ও জীবন্ত হইত, তপস্যা শক্তিশালী হইত।” ভক্তিটি কথাটা শুনিয়া বলিলেন না। তখন রবীন্দ্রনাথ কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিবার জন্য বলিলেন, “জলকে যেমন বস্ত্রের মধ্যে দিয়া ছাঁকিয়া পবিত্র করিতে হয়, আমাদের ভক্তি-প্রেমকেও তেমনি সবা ও কর্মের মধ্যে দিয়া ছাঁকিয়া পবিত্র করিয়া লইতে হয়। যে প্রেম-ভক্তি সেইভাবে দৃঢ়ীকৃত না হয়, তাহার দ্বারা সাধনায় জীবন

ও শক্তি অগ্রসর হয় না। সেবাকর্মের ন্যায় যে ভক্তিতে নাই, তাহা সহজেই গাঁজিয়া পচিয়া উঠে। যে নারী পতিপ্রেমে ভরপুর হইয়া পতির সংসারে প্রবেশ করে, সে পতির পরিজনকে নিরন্তর সেবা করিয়া আপনার প্রেমকে বিশুদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লয়। নহিলে তাহার পতিপ্রেমও অসংযত হইয়া পচিয়া গাঁজিয়া উঠিতে পারে।

এই কথাটাই একবার ভক্ত কবীর বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছিলেন, “রস যতক্ষণ ইক্ষু র মধ্যে আঁশগুলির ফাঁকে ফাঁকে থাকে, ততক্ষণই রস থাকে সংযত ও মধুর। আঁশগুলিকে বাধা মনে করিয়া যখন ইক্ষুকে যত্নে পেষণ করিয়া রস-টুকু আলাদা করিয়া বাহির করিয়া লওয়া হয়, তখন সেই রসকে পচন হইতে বাঁচাইয়া রাখা হয় কঠিন সমস্যা। তখন সেই রসকে বিশুদ্ধ রাখিতে গিয়া বার বার তাপে জ্বাল দিতে হয়। আমাদের প্রেম-ভক্তিও যখন আমাদের কর্মের সঙ্গে মাঝমাঝিভাবে থাকে, যখন পত্নী আপন পতিকে সংসারের নানা কর্মের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে একটু একটু পায়, তখনই প্রেমরস-টুকু বিশুদ্ধ থাকে। প্রেমরসকে নিরন্তর পাইবার লোভে সেই সব দায়িত্বের বাধাগুলি ইক্ষুর আঁশের মত দূর করিয়া দিলে তখন তাহাকে বিশুদ্ধভাবে রসও করা কঠিন হয়। তখন রস যাহাতে পচিয়া না উঠে, এইজন্য বার বার রসকে তাপে সংযত করিয়া ফাটাইয়া লইতে হয়। প্রেম-রসকেও তেমনি বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য চাই নিরন্তর তাপ বা তপস্যা। প্রেমের সর্ববিধ দায়িত্ব স্বীকারের নমুই যথার্থ তপস্যা। এই দায়িত্ব স্বীকার করিলেই সেই তপস্যার তাপে প্রেমের সব বিকার দূর হইতে থাকে।

সাধনার পথে যাহাতে প্রেম ও ভক্তি একটা ভাবোচ্ছাস মাত্র না হইয়া উঠে, সেদিকে সাধক সাধকদের সব সময়ই সতর্ক দৃষ্টি থাকা চাই। এরূপ সতর্কতার ভাব-বিভাগিতাকে ভারতের মহাসমস্যাও অতি তীব্র ভাষায় মিলিয়া করিয়াছেন। তাহাদের মতে ইহাও এক প্রকারের কামাভ্যাস বা পন্থার ইন্দ্রিয়গত ব্যাঘাট। বাহ্যিকের বিভক্তিরে ধীনতা ও মিলনতা সকলেরই দৃষ্টিতে ধরা পড়ে বলিয়া তখন বরং সংশোধিত হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু ভাব-ব্যাঘাটের নীচতা লোকের কাছে ধরাই পড়ে না। অনেকে আবার এইরূপ চিন্তগত কামাভ্যাসকে উচ্চাঙ্গের সাধনা বলিয়াই মনে করেন। তাহাতেই ঘটে আরও সর্বনাশ।

জলকে ছাঁকিয়া পবিত্র করিতে হইলে যেমন চাই বস্ত্রখণ্ড, প্রেমকে ছাঁকিয়া পবিত্র করিতে হইলে তেমনই চাই সেবা। এইজন্যই প্রেম যদি প্রকৃতিস্থ থাকে, তবে সে সর্বদাই সেবার সুযোগ খুঁজিয়া বেড়ায়। সাধনী সতী প্রাচীন নারীর গৃহে আসিয়া স্বামীর পরিজনের সেবার আপনাকে ঢালিয়া দিয়াই বাঁচিয়া যান। এমনকি প্রণয়কে অগ্রসর করিবার জন্যও অনেক সময় লজ্জাকাতী নারীরা সেবাকেই আবরণ ও আশ্রয়রূপে ব্যবহার করেন।

সাধকেরাও তাই সাধনার ক্ষেত্রে চাহেন সেবার সুযোগ। নারীরা যেমন পতির পরিজনকে সেবা করেন, সাধকেরা তেমনি জীব-মাত্রকেই সেবা করেন; কারণ জীবমাত্রেরই যে ভগবানের পরিজন। আসলে সেই একই প্রিয়তম প্রভু জীব জীবের অনেক রূপ হইয়া আমাদের সেবার সুযোগ দেন (দাদু, দয় নির্বেরতা অঙ্ক ১৮), তেমনই তাঁর দয়া। দাদু বলেন, সব জীবই তো তোমার আপন, তোমার সহোদর ভাই, সর্ব জীব লইয়া এক প্রেম পরিবার।

আত্ম ভাই জীব সব এক পেট পরিবার। (দাদু, দয়া নির্বেরতা অঙ্ক ১৯) এই কায়ার মধ্যে তো তোমার স্বল্প সংকীর্ণ স্বরূপ। তোমার মহৎ স্বরূপ যদি দেখিতে চাও, তবে খুঁজিয়া দেখ সর্বজীবের মধ্যে। যখন সেই আপনার মহত্তর স্বরূপের মহা-উপলব্ধি হইবে; তখন দেখিবে সকল জীবই তোমার ভাই।

জব প্রাণ পিতৃমান আপ কেণী আত্ম সব ভাই। (ঐ, ১৬) “ভাই” বলিয়াও ভক্ত দাদুর মন ভুস্ত হইল না, দাদু বলিলেন, “সর্বজীবের তাহাকেই তো চাই, তিনিই পরিপূর্ণভাবে বিরাজিত আছেন সর্বজীবের। ইহাট তাঁহার পরিপূর্ণ বিগ্রহ। সব পর-ভাব দূর করিয়া এই আত্ম-স্বরূপ পূর্ণ গ্রহকে লও চিনিয়া এবং সর্ব-জীবের মধ্যে বিরাজমান তাহাকে সর্বভাবে সেবা কর।”

দাদু পূর্ণ গ্রহ বিচারিলে দূতীহার করি দূর। সব ঘটে সাহিব দেখিবে রাম, রহা ভরপুর। (ঐ ১৭) “সর্বজীবের মধ্যে আত্মরমকে উপলব্ধি করিয়া দেখ, ঘটে ঘটেই বিরাজমান সেই দয়াময়। হে দাদু সর্বজীবকে কর পরিতৃপ্ত, সব জীবকে কর পালন ও সেবা।”

আত্ম রাম বিচারি করি দৃষ্টি দৃষ্টি দের দয়াল। দাদু সব সন্তোষে সব ভীড়ী প্রতিপাল। (ঐ ১৬)

“চোদ্দশবনে বা তিনলোকে পর বলিয়া কেহ নাই। সবাই সেই প্রভুরই স্বরূপ, সকলকেই সুখ ও সন্তোষ দান।”

সাহিব চোদ্দশবনে দাঁড়ি সন্তোষে। দাদু চোদ্দশবনে চৌদশ লোক। (ঐ ১৪)

“পরকে যদি দুঃখ দেও, তবে সেই দুঃখ প্রভুকেই দেওয়া হইবে, সকলের মধ্যে সুখ-দুঃখের গৃহীতা তাই তিনিই। সকল জীবের সেই একই আত্মা, দ্বিতীয় আর তা কেহই নাই।”

কাহ্নে কৌ দুঃখ দীর্ঘজীবী সাই হৈ সব মাহি\*।  
দাখ একে আত্মা দজা কোই নাহি\*॥

(এ ১৩)

“ঘটে ঘটেই সেই একই আত্মারাম, তবে আর কেন ব্যথা পরকে দুঃখ দেওয়া? সেবার দ্বারা সকলকে তৃপ্ত করাই হইল সাধুর কাজ।”

কাহ্নে কৌ দুঃখ দীর্ঘজীবী ঘটি ঘটি আত্মরাম।  
দাখ সব সন্তোষবিষে যহ সাধু কা কাম॥

(এ ১২)

“সর্ব ঘটে যে আত্মোপলব্ধি, তাহাই হইল সার। পরের মধ্যে যদি আপনাকে চিনিয়া থাক, তবেই পাইয়াছ প্রয়াতমের দেখা।”

সব ঘটি একে আত্মা জানৈ সো নীকা।  
আপন পর মে চানিহ লে দর্শন হৈ পীত্বকা॥

(এ ১১)

“শত্রুতা কর কার সঙ্গে? পর বলিয়া যে কেহই নাই! তুমি আসিলে যাহা হইতে তিনিই বিরাজিত সবার মধ্যে।”

কিস সোণী বৈশী হৈব রম্যা দজা কোই নাহি\*।  
জিসকে অংশ ধৈ উপজ্ঞে সেই হৈ সব মাহি\*॥

(এ ১০)

এইসব মহাবাহী বিস্মৃত হইয়াছ বলিয়াই আজ জগৎ জড়িয়া এমন মারামারি হানাহানি চলিয়াছে। অথচ ধর্মের নামে আজকার দিনে প্রেম ও ভাবোচ্ছাদনের অভাব কোথাও নাই। কিন্তু সেই প্রেম প্রয়োজনানুরূপ সেবা ও কর্মের দায়িত্বের মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া লওয়া নহে। ‘বন্দপুত’ নহে বলিয়া এই প্রেম ও ভক্তির সাধকদের পক্ষে গ্রহণের অযোগ্য। আমাদের প্রেম-রস যন্তো-নিষ্কাশিত ইচ্ছা রসেরই মত দোঁহাতে দেখিতে পাঁচিয়া গাঁজিয়া উঠে। তাই চাই নিরন্তর সেবার ও কর্মের তপস্যা। এই দুর্গতি আজ কেবল আমাদের ধর্মের মধ্যেই আশ্রয় নহে, আমাদের রাজনীতিতে, সমাজ-জীবনে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে, সবটাই রসের উচ্ছাদন প্রচুর; কিন্তু তাহা “বন্দপুত” নহে, তাহা দায়িত্বের তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া বিশুদ্ধ ও পবিত্র হয় নাই।

ভক্তরা তাই নানাভাবে সেবার সুযোগ প্রার্থনা করিয়াছেন। ভক্ত রবিদাস বলিয়াছেন, পতি-প্রেম যেমন শুদ্ধ হয়, পতির পরিজনদের সেবায়, হরির প্রতি যে প্রেম, তাহা পরিশুদ্ধ হয় তেমনই হরির জনের সেবায়। কেবল সাধুরই হরির জন নহেন বা তথাকথিত নিম্ন-শ্রেণীরাই হরির জন নহেন, মানুষ মাত্রেই তাহার জন। হরিকনকে না সেবা করিলে হরিকে পাইবার দাবী হয় কেমন করিয়া? তাই সাধক বলেন,

পতি ভজৈ তজন ভজৈ জানি হৌ প্রেম বিচার।  
হরি হজৈ তজন ভজৈ না অসার॥

“পতি ও ভজিত পতি-জনকে

স্বীকার করিব না, ইহা তো প্রেমের বিকৃত রূপ মাত্র। হরিকে ভজিব অথচ হরির জনকে ভজিব, তাহা তো অতি অসার ও তুচ্ছ মতবাদ মাত্র।”

যখন মানুষের মধ্যে দুঃখ-দুর্গতি ঘনাইয়া আসে, তখনই সাধকেরা সেবার ও কর্মে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া জীবনকে ও সাধনাকে পবিত্র ও ধন্য করিবার সুযোগ পান। আজকার দিনে জগতে মানুষের যে যোর দুঃখ-দুর্গতি চলিয়াছে, তাহাতে সাধকদের পক্ষে বিচলিত হইবার কথা নয়। তাহারা এই আগুনে আপনাদের সাধনাকে দগ্ধ করিয়া খাটি সোনার মত পবিত্র করিয়া তুলিবার সুযোগ পাইবেন। প্রয়োজন হইলে এই আশ্রিতে তাহারা নিজের জীবনকেই আহুতি দিবেন, তবু এই দুঃখ-দুর্গতিকে তাহারা কোনমতেই অস্বীকার করিবেন না।

এই সব কথা যে কেবল পৃথিবীতে কথা বা মুখের বলি নয়, তাহা যে ভারতের সাধনার জীবনে সত্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা দেখাইবার জন্য তখনকার দিনের একটি চিত্র দিতে চাই। এখনকার দিনে যেমন দুঃখ-দুর্ঘ্যোগের মধ্যেই মানুষের যথার্থ মহাত্মা ধরা পড়ে, তখনও মানুষের মহাত্মা দুঃখের দুর্গতির মধ্যেই ধরা পড়িত।

এই রকম একটি ভয়ংকর দুর্যোগ প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে পশ্চিম ভারতে ঘটিয়াছিল। সেই দুর্গতির কারণ ছিল মানুষের আয়ত্তের অতীত। দৈব-কারণই সেই দুর্গতির হেতু। ১৪৬৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৪৭৫ পর্যন্ত এই সাতটি বৎসর পশ্চিম ভারতে ভীষণ অনাবৃষ্টি ও দর্ভিক্ষ হয়। এই দর্ভিক্ষে মহারাষ্ট্র দেশ একেবারে তেরবার হইয়া যায়। এই সময়ে মহারাষ্ট্রে যেসব ভক্ত প্রাদুর্ভূত হন, তাহারা তাহাদের জীবন ও সর্বস্ব পণ করিয়া মানব সেবায় নিজদের সাধনাকে ধন্য করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন।

ভক্ত দামাজী পংক্ত ছিলেন বাদশাহের সুরদার। রাজকর্মচারী হইলেও তিনি ছিলেন একজন মহাভক্ত। তাহার হাতে রাজকীয় শস্যাগারগুলি ছিল। লোকের দুঃখ-দুর্গতি দেখিয়া তিনি সেগুলির দ্বারা বহু লোকের প্রাণরক্ষা করেন। এজন্য তাহাকে ভয়ংকর বেগ পাইতে হইয়াছিল। আজ এই লেখার মধ্যে দামাজীর কথা আলোচনা করিব না। আজ সেই যুগের আর একজন মহারাষ্ট্রীয় ভক্তের পরিচয় দিব। তাহার নাম ভক্ত ভানুদাস। ইহাদের বংশে বহু ভক্ত জন্মিয়াছেন। ভানুদাসেরই বংশে মহাত্মা একনাথের জন্ম। একনাথজী ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ঐ দর্ভিক্ষের প্রায় ৬৫ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন।

এক বিকৃত্ত্ব খণ্ডেদৌর্য্য বংশে ভানুদাসের জন্ম। সেই দেশে বিষ্ণুকে বিস্ট বা বিঠল বলে। ইহারা ছিলেন বিধ্বল ভক্ত।

অল্পবয়সে কঠোর তপস্যা করিয়া ইনি সিংহ হন এবং ‘ভানুদাস’ নাম প্রাপ্ত হন। এই ভানুদাস নামেই তাহার পূর্বনাম চাপা পড়িয়া গেল। যথাকালে ভানুদাস বিবাহও করিলেন। ছেলোপালেও হইল। সংসারে অর্থের প্রয়োজন অথচ ভানুদাস উপার্জন করিতে শেখেন নাই। আত্মীয়েরা তাহাকে কিছু অর্থসাহায্য করিয়া কাপড়ের ব্যবসয়ে প্রবৃত্ত করিলেন।

ভানুদাস গ্রামেই দোকান খুলিলেন, চারিদিকের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়াও বিক্রয় করতেন। কিন্তু তাহার কেনাবেচার মধ্যে দর-দস্তুর ছিল না। তিনি একদরে অতিশয় সাচ্চা ও সাধুভাবে ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চারিদিকের ব্যাপারীরা সব ধূর্ত ও অসাধু। তাহারা বিপদ গণিয়া সকলে মিলিয়া এমন অকথা করিয়া তুলিল যে, ভানুদাসের ব্যবসায়ে প্রথম প্রথম খুব লোকসান হইতে লাগিল। কিন্তু প্রথম লোকে তাহার সাধুতা বৃদ্ধিতে পারিল এবং ব্যবসায়ে তাহার খুব শ্রীদামি হইল। তিনি খুবই ধনী হইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি ভক্ত, তাই সম্পদের সমগ্রও তাহার দামিষ তিনি বিস্মৃত হন নাই। চারিদিকের দীন-দুঃখীদের দুঃখ যথাসাধ্য তিনি মোচন করিতেন। পাঠে ধ্যানে জপেও তাহার মনোযোগ ছিল। ব্যবসায়ে ভানুদাস প্রচুর উপার্জন করিলেও চারিদিকের দুঃখী-দুর্গতদের সেবার তিনি নিজের মত হস্তে বাগ করিতেন। লোকসেবার দ্বারা তাহার ভগ্নস্বরূপে যে তিনি পবিত্র করিয়া জাইতেন, ইহাই ছিল ভানুদাসের সাধনার বিশেষত্ব। দুঃখ-দুর্ভিক্ষেরও শেষ নাই, তাহার সাধনারও বিশ্রাম নাই।

পান্ডুরপুর ঐ দেশের একটি মহাতীর্থ। নানা দেশের সব সাধু-সন্ত ও ভক্তগণ মাঝে মাঝে সেখানে আসিয়া সমবেত হন। এখানে শ্রীমা নদীর মধ্যে চন্দ্রভাগা নদী আসিয়া সংগত হইয়াছে। এই ভীমা আবার পরে পড়িয়াছে কৃষ্ণা নদীতে। এখানে পান্ডুরগণ-বিশেষ ও বিঠল প্রভৃতি নামে নারায়ণ পূজিত হন। এখানকার মন্দিরটি দেবগিরির যবন রাজগণের রচিত। প্রতি শনি ও বুধবার দর্শনার্থীরা এই তীর্থে যান। একাদশীতেও এখানে খুব ভীড় হয়। বিশেষ করিয়া ভক্ত জনসমাগমে ঘটে আষাঢ়ী ও কার্তিকী একাদশীতে।

এখনও দেখা যায় সেই সব উৎসব-দিনে পান্ডুরপুর একেবারে সরগরম। সেই সময়ে কথোতে কীর্তনে দেব-মাতার ও নানাবিধ উৎসবে স্খলনটি উৎসবময় হইয়া উঠে। ভীমা নদীর বিস্মৃত বালুকাময় চড়াগের মধ্যে দলে দলে সব লোক কীর্তন শুনিতে বাসত। পুরুষ-নারী রাহুণ-শূদ্র নানা রকমের কীর্তন গায়কই সেখানে দেখা যায়। তুকারামের পদই বেশী শোনা যায়। কবীর নামদেব প্রভৃতির পদও গান হয়। এইখানেই তখনকার দিনে উৎসব

[illegible]

# মপরাহ

## শ্রীঅপূর্বকুমার মিত্র

আট

বাঁ ডিতে এখনো কেউ জানে না যে মোমাছির চাবনী নেই, সে হাছা করেছে সত্যীর জন্য জয়গা খালি করে দিয়েছে যাতে সত্যী আবার বিবাহ না করে স্বামীমতাবর জীবন কাটতে দিতে পারে। ভোরের বেলা পাড়াত সব জননি দৃগুপঞ্জীর নহাং বেজে উঠেছে, অখোম, অখোমগা অখখাং সহসা মনে পড়লো চাবনী আর নেই, স্বাধীন সে, আর অফিস করতে হবে না, দশের চোখ মাড়ুট করে আর তাকে অর্থ উপার্জনে বেরুতে হবে না। সে আবার পড়া শোনা সুরু করবে। এম-এ পড়বে সামনের বহর অর্থনীতিতে, তারপর ইতিহাসে, তারপর ইংরাজীতে—একটা কিছু নিয়ে থাকবে সে।

দেশের রাজনীতির আলয়ে বর্তমান অবস্থায় নতুন কিছু করবার হাছা তার নেই। উৎসাহও নেই। সাতুলায় মোটে আবার একটা ঘর ভাড়া করে পুত্রোদ সেই মাসিক পত্রিকা নতুন একটা নাম দিয়ে লেখ করবে। কি নাম দেবে? “ক্ষুণ্ণিত ভারত?” না! “স্বাধীন?” না! “শোষণ সমাচার?” ঘাং! “মরমোটি?” না, বরং “পাড়ামাটি” নামটা মন্দ নয়। কাগজ-কাগজ পায়ে কোথায়? সুবোধদার চেটায়। তা না হয় হল। কিন্তু ছাপাখানা? লক্ষ্মী প্রেস এবার আর ভার নিতে চাইবে না, সেবারের দাবুই এখনও সাতু চারপো টাকা পারে। তবে উপায়? “বিজ্ঞাপন”—সে হবে—নন্দারালো কেনের অনেক রঙের সত্বে তার আলাপ আছে, যারা শতকরা পঁচিশ টাকা কমিশনে অনেক বিজ্ঞাপন এনে দেবে। কিন্তু উপাশ্রুত ছাপাখানার টাকাই আসল, ঘর বাড়া, অফিস খড়া কোথায় পারে এত টাকা। সুপরিচয় নিজের এখন ইংরাজী একখানা দৈনিক কলম কিনেছেন, বাড়লো মাসিক গরুর গ্রাহ্যই করবেন না। উপায়?

“দিদি, চানা ঠাকুর দেখে আসি? আমি একখানা শব্দ সেবেছি। দাদা কুমারেরি, হেঁশ পায়ীর সব কটা ভরিয়েটাল ঠাকুর দেখে এস। আমাকে বুই কিছু দেখাও না। চানা ট্রামে কাই? ফানি?”

মোমাছি চিন্তামোটে বাধা পেয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। নহাং ভোরের অক্ষুট বেদনা জড়িত সুর দশমীর দিন কেমন একপ্রকার আনন্দ-মিশ্রনো কৃষ্ণ ভাষায় তার মনে। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে—“যাও যাও?”

“হ্যাং, হ্যাং!”

তারপর ঘুমের একটা পুজার আমোদের সেরামো পুজা মিল। ঘরের নানা জায়গা থেকে নতুন জুতা, স্ক, লাল স্না আলতা

বেরিয়ে পড়লো। মোমাছির এই উৎসাহ পিতা-মাতার কাছে এত সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, প্রানন্দটা আজ ছোঁরাচে যোগের মতন সবার মধ্যেই ছড়িয়ে পড়লো।

সেদিন সকালে উনুন ধরলো না। চা হোল না। তেলেরমো সবাই বাসি মুখে স্নো পাউডার, মেখে ট্রামে চড়ে বসলো। ভবানীপুর অঞ্চল কয়েক-খানা ঠাকুর দেখা হলো। হারিশ মৃধাজি রোড দিয়ে খুব খানিকটা অকারণে ঘুরে বেড়ান হলো। তারপর খেয়াল হলো—চল সবাই ইডেন গার্ডেনে বাহ।

তারপর শরতের রোড্রোজুল প্রভাতে ইডেন গার্ডেনের ভিতর সবাই হেঁটে করে ছুটে বেড়াতে লাগলো—মা সাবধান করে দিতে লাগলেন, খুকীরা যেন জলের ধারে না যায়। মোমাছি গুনগুন করতে করলে খুব উন্মনা হয়ে একটা প্যাগোডার দিকে এগিয়ে গেল, তারপর নীচু হয়ে একটা উল্টোনে নৌকার চারিপাশে কি খুঁজতে লাগলো। কৃষ্ণ হ্রদের এধার থেকে মা জিজ্ঞেস করলেন—“মিন্, কি হারিয়েছিস?”

“চুলের কাটা।”

তারপর হারান পদার্থ খুঁজে পেয়ে হাতের মৃঠার মধ্যে অনেকক্ষণ সতর্পণে রাখলে, ট্রামে উঠবার পূর্বে রাউজের ভিতর টপ করে ফেল দিলে অকিঞ্চবকর একটা ভিসদ।

অনেক বেলাতে, অনেক ঘুরে, অনেক কেনা-কাটির পর, সবাই বাড়ি ফিরে নিজ নিজ সাবানের বাসে, বিছানার তলায়, আয়নার পিছনে, আলমারীর উপর, রবারের বেলনে, লেবনচুর, নতুন ফাসানের প্রিবরাজিত নেতাঙ্গী মাৰ্বেল, তয়ান্দ লাটু, লুকিয়ে রাখলে। মোমাছিও তার খাটের তলায় সিনের বাসের ভিতর অনেক বই ও শাড়ীর নীচে চারদিনের বাসি শূকনো এক থোকা অশোক ফুল ক্ষিপ্ৰহস্তে অবহেলায় নিষ্কপ করেই তালো বন্ধ করলো।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। মোমাছির তখন ঘুম ভাঙলো। বাড়ি তখন ফাঁকা। প্রতিমা সব একে একে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। বিসজ্ঞনের সন্ধ্যা, সখের ফোজের ব্যান্ড অপৌরাণিক অনেক রবম আধুনিক জয়ধ্বনিতে শহর মুখরিত হয়ে উঠেছে।

মোমাছি বাঁ হাতে অনেকটা ফিটকার মিশ্রনো খড়মাটি নিয়ে স্নানাগারে প্রবেশ করলো, বেরিয়ে যখন এল, তখন রঙের খুব জোলুস না থাকলেও বেশ মিষ্টিসুন্দর দেখাচ্ছিল অতি সাধারণ সাবানের ক্ষীণ একটা কঠালি চাঁপার নিঃস্বাস তার চুলে, মুখে, গামছায়, স্নেনের জলে ছিল। স্নো একটু, মেৰ্বেছিল, আয়নার সামনে এসে, মৃখটা একটু ফসী মনে হতেই

লক্ষ্যায় দু’হাতে জোরে জোরে মুছে ফেললো। তাতে আশানুরূপ ফল হলো না বরং মুখে এসে অনেক রক্ত জমে লক্ষ্যারান্ডা করে তুলেছিল। পে’য়াজি রঙ-এর করণা শাড়ী “খচ্ছুরকারদিন” মরে অনুরোধে পরতেই হলো কাটাছাতার রাউজ দিয়ে।

চিবকটা তুলে মা বলেন—“দেখি মিন্,!”

“ছিং, আজ যেন নতুন দেখচো আমাকে।”

“কোথায় যাচ্ছিস এখন?”

“একটু ঘুরে আসি।”

“তাড়াতাড়ি আসিস ফিরে, ওকে প্রণাম করতে হয় নতুন কাপড় পরে।”

“তোমাকে করলে তো হলো”—এই বলে মিনতি মায়ের পায়ের উপর দু’ আঙুল দিয়ে একটা টিপি দিল যেমন করে দাতব্য চিকিৎসালয়ে কত বাহীন ডাক্তাররা পেট টিপি লিভার দেখে।

“কি আশীর্বাদ করলাম বলতো মিন্?”

“আমার চাকরীতে উন্নতি হোক।”

“পারলি না—অন্য একটা কিছু—”

“এ রামঃ যাও! তুমি যেন একটা কি! আমি শুনতে চাই না।”

মোমাছি দশহরার ভিড়ের মধ্যে নিজকে হারিয়ে ফেলতেই যেন ট্রামে উঠলো— আজ তার মনের মধ্যে সেই চাকুরে মেয়ের ভীরা, তা ছিল না, নিজেকে সে ভাবতে লাগলে যেন পোস্ট গ্রাজুয়েটের ক্লাসে চলেছে, কলেজ স্ট্রীটের বাড়ী সে কদিন পরেই হাতে থাকবে বইখাতা, রাউজের ভিতর কুলিয়ে রাখবে কলম, ট্রামে চলতে পাশের মেয়ের সঙ্গে কথা বলবে নিভয়ে, কারণ আত্মপরিচয়ে তখন আর বাধা থাকবে না—কোন মেয়ে যদি বলে খার্ড ইয়ারে পড়ি, সেও বলবে—ফিক্‌থ্ ইয়ার!

মোমাছির চিন্তাধারা বাধা পেল ট্রামটা যখন ভবানীপুরে পৌঁছলো। এখানেও অনেক ভিড়, আদি গম্ভায় অনেক ঠাকুর ভাসায়—ভক্তি দেখাতে সে বিসর্জন দেখতে আসেনি, এসেছে এমনি তামাসাটা দেখতে, সমরটা কাটাতে, দুপুরের দীর্ঘ ঘুমের পর জড়তা কাটাতে, হারিশ মৃধাজি স্ট্রীট দিয়ে সোজা গড়ের মাঠে গিয়ে একটা বেগুতে বসে খুব খানিকটা চোঁচিয়ে গান ধরবে নরতো আবাস্তি করবে একা একা। আজ তার মনে পড়লো রবীন্দ্র-নাথের একটা কবিতা—“দীন।” কবিতা একদিন ছিল তার কাছে শব্দ, ঘুমপাড়ানো ছড়ার মতন। শব্দে মৃগস্থ করেছে, তারপর একটা বয়েস এসেছিল যখন আবাস্তি করে ইঙ্কুলে প্রাইজ পেয়েছে—“চোঁচিয়ে বলে গিয়েছে, হাত পা দু’সিয়েছে, ফলাফল নির্ভর করেছে স্নোতাদের ও দশকদের উপর। তারপর প্রথম যৌবনের বিকাশ পদ্ম ছিল তার কাছে শব্দ, সগুণের আনন্দ যেমন মেয়েরা হেলো নিজ নিজ খেলাঘরে সগুণ করে, মাৰ্বেল, তেঁতুলের বিচি, পুতুলের জন্য টুকটাকি রঙিন ছিট কাপড়।

হঠাৎ দেখলে আজ “দীন।” রবীন্দ্রনাথের পদ্য নয় কবিতা নয় তার শরীরের মনের ভিতরকার এক্সরে-ফটোগ্রাফ্। এমন হয় সারাজীবন কবিতার দুটি লাইন স্মৃতিশক্তি দিয়ে বহন করে একদিন তার রূপ অর্থ আসো সব স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

“যে কথা সে চেয়েছে বলিতে

তাইতে হয়েছে পূর্ণ এ আমার জীবন অঞ্জলি

তবু সত্য করে বলি

বাধা লাগে বৃকে

যখন সহসা আসি তোমার সম্মুখে”.....

সমস্ত বাড়ীটা অন্ধকার।

তাপস অসময়ে নিদ্রাপন্ন। রাজপথ আলোকিত,

মুখ্যরত। চারদিকে এত হাসি, এত আনন্দ যে, ডান্টাবনের কাছে লোমহীন কুকুরগুলো পর্যন্ত আপন আপন কলারপাতা বিনা ঝগড়ায় লেহন করে চলেছে। তাপসের মিন্তা তখন উপস্যার চাইতেও গভীর।

“এই শুনছেন?”

“উঃ!”

“এই শুনছেন?”

“হুঃ!”

“উঠুন না বাপু! এই কি শোবার সময়?”

“এ্যা!”

“আমি মিনতি,—ভয় পাবেন না, সুইচ কোন দিকে?”

“কে?”

“মিনতি, আলোর সুইচ কোন দিকে?”

“হাতের মুঠোর!”

“টিপুন!”

মিনতি যা আশা করেছিল, তা হলো না, একটুখানি পাতলা সবুজ আলো হলো ছোট্ট একটা সবুজ দাগিতে। মুখের উপর এখন বাস্তবতার রুঢ়তা থাকে না, রঙের দাগ, গানের উপর শত রঙ্গ, হস্ততঃ তিল, জটু, অঁচিল সব মিলিয়ে থাকে, সবই মৃদু মায়াময় মনে হয়। মিনতির মুখখানিতে ও পেয়াতায় রঙের শাড়ির উপর মধুর একটা সবুজ অম্পটতা ছিল, তাপস চোখ দিয়ে ধরতে পারলো না। পুরুষের ঘুমভাঙ্গা চোখে মাদকতা থাকে না মেয়েদের মতন; কিছূ যাদ থাকে সেটা নিতান্ত শিশুদের কাটা ঘুমের বিমূঢ়তা।

“শুনুন কাজের কথা আছে তানেক—শুধু শুধু আসিনি।”

“সে তো বুঝতেই পারছি।”

“কিসে বুঝলেন?”

“তোমার শাড়িই প্রমাণ।”

“ভাব! রঙিন বলে বলছেন?”

“কোথায় যেতে হবে বল।”

“বলছি—আগে আলো জ্বালান, আরো আলো, মাঝে আলো!”

“ভয় করছে?”

“না অন্য ঘরে চলুন—এটা আপনার শোবার ঘর।”

তাপস উঠে বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ফিরে এল।

“চলুন নীচের ঘরে গিয়ে বসি, নয়তো একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়ি। হাটতে হাটতে কাজের কথা ভিত্তি বলা যাবে।”

“বেশ একটা স্বপ্ন দেখছিলাম তুমি আসবার আগে, ভেঙে গিয়ে এত কষ্ট হচ্ছে—শেষটুকু দেখতে পেলাম না।”

“চলুন হাটতে হাটতে বাকীটুকু দেখবেন।”

তাপস হাসলে। বলল—“মিনতি, সব চারদিকই নাতাল নয় যে, হাটতে হাটতে ভাঙা স্বপ্নের বাকীটুকু দেখবে রাজপথে। যাক সে সব কথা, তোমার কাজের কথাটা কি বলতো এবার শুনি?”

“শুনুন, আমি চাকরী ছেড়ে দিয়েছি।”

“উত্তম!”

“আশ্চর্য হচ্ছেন না?”

“একটুও না।”

“কেন বলুন তো।”

“নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি বলে।”

“হয়তো তাই। শুনুন আমি আবার পড়ুবা, সেইজন্যই বলাচ্ছিলাম—”

“বুঝছি। শোন মিনতি, এম এ ক্লাসের মেয়ে পড়বার ধৈর্য ও দরবেলতা আমার নেই।”

“সে জন্য নয়—না শুনেনই ওরকম মন্তব্য প্রকাশ করবেন না।”

“বল তবে।”

“অনেক সময় হাতে আছে, একটা মাসিক পত্রিকা বের করবো।”

“নতুন কিছু নেই। শিক্ষিতা মেয়েদের মাসিক পত্রিকা, আর দুটো পরমা হলেই পুরুষের ব্যাংক খোলা একটা নেশা—তা মন্দ নয়, আমায় কি করতে হবে বল?”

“বেড়াতে বেড়াতে বলবো, চলুন বাইরে।”

“কন্দু যেতে হবে?”

“গঙ্গার ধারে, ইডেন গার্ডেনে, চাঁদপালে, আউটরাম ঘাটে, চলুন না—”

তারপর মাসিক পত্রিকা “পোড়ামাটির” প্রতিষ্ঠান চলতে চলতে উভয়ের কল্পনায় গড়ে উঠতে লাগল। গঙ্গার ধারে তারা এসে পেঁছতে—প্রকাণ্ড একখানা দুর্গাপ্রতিমা দশ জোড়া ঢাকের আগুজের মধ্য দিয়ে তাদের দিকেই এগিয়ে এল। তাপস দু’হাত তুলে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করে হেসে বলল—

“যা দেবী সর্বভূতেষু হোয়ালী রূপেণ

সংস্থিতা

নমস্তস্মৈ: নমোনমঃ”

তৎক্ষণাৎ মৌমাছি বাঁ হাত দিয়ে তার সমস্ত শরীরের ভার ঝুলিয়ে দিলে তাপসের প্রণামরত জোড়া হাতের উপর; বলল—“ছি, ঐ রকম করে ঠাকুর প্রণাম কর! লোকগুলো আমাদের পাড়াগাঁয়ে ভাবলে নিশ্চয়ই।”

“ভাবুক গে! আমি সে শ্রেণীর হিন্দু নই যারা নেকটাই টুপি পরে, ট্রামে চলতে চলতে ঠনঠনে কালাঁবাড়ীর সামনে চুপি চুপি চোখ দুটো বন্ধ করে কাজ সেরে নেয়। প্রণাম করলে তো প্রকাশ্যে পৌরাণিক কায়দায়, নয়তো পাশ কাটিয়ে চলে যাবো বউবাজারের তিড়ির স্রোতের মতন।”

“রক্ষে করুন—আর বস্তিমে সহ্য হয় না। দুর্গার কাছ কি প্রার্থনা করলেন?”

“বললাম—মা! তোমার দশ হাতের একখানা হাত দিয়ে অন্তত মিনতির চোখের মোহ কাটিয়ে দাও; ওকে বুঝতে দাও এ সংসার শুধু মায়া—দারাপুত্রপরিবার তুমি কার কে তোমার। চির-রহস্যচারণী হয়ে থাকুক জন্মে জন্মে, কাউকে যেন ভালবাসতে না পারে, যতদিন পৃথিবীতে আমার সত্য বুগ ফিরে না আসে, তারপর একদিন জুটিয়ে দিও মৃগয়ায় এমন একটি রাজপুত্র যে দেবতার শাপে হাঁতপুত্র স্ট্রীলোক চোখে দেখেনি পর্যন্ত—তাকেই যেন মিনতি করমালা দেয়।”

“যাবা, আর কোনদিন কোন কথা জিজ্ঞেস করবো না। খুব আক্সেল হয়েছে আমার—চলুন বাগানের ভিতর যাই।”

“সম্ভার পর ঐ ফিরিঙ্গী বাগানের ভিতরে কি বিসদৃশ হবে ভাবো না একবার।”

“তা হোক চলুন।”

“খুব দরকার জটিল কোন সমস্যার কথা আছে? সেই হাঁরশ মুখাঙ্গি স্ট্রীট থেকে এতদূরে তো হাঁটিয়ে এনেছো—কেন?”

“চুপটি করে এখানে বসুন। ভাবতে চাই অনেক কথা বস্তুতে যা বলতে পারিনি বিজয়ায় তা বলতে পারবো কিনা।”

তাপস হাসি চাপতে গিয়ে পকেটে হাত দিয়ে রুমাল না পেয়ে বিচিত্র ভাবে একখানা টেন বের করে নাক মুখ থেকে হাসতে লাগলো। মৌমাছি জোষ দেখিয়ে কাগজখানা টান মেরে কঠিন হৃদয় জলে ফেলে দিল।

“কি করলে বলতো? ওটা যে এই সপ্তাহের বিচিত্র ভারত, জলে ডুবে গেল।”

“ভাবুক, সুনীল জলধি হতে বিচিত্র ভারত আবার না হয় উঠবে স্থান করে নতুন কোন ডি এল রায়েসের সুরে। শুনুন, আপনি হবেন আমার মাসিকের সম্পাদক—”

“আর তুমি?”

“আমি শুধু লিখে যাবো, মতামত দেবো, রাজি?”

“মাসে তো একখানা কাগজ বেরবে, বাকী উনিশ দিন বলকাতায় বসে বসে কি হবে শুনি?”

“কোথায় যাবো তবে?”

“তুমি বল।”

“না আপনিই বলুন।”

“ঘাটশীলা নয়তো অন্য কোথাও—যেখানে বল তুমি সেইখানেই যাবে।”

“যেখানে বলবো? আচ্ছা সুবর্ণরেখা নদীর দেশ কতদূর জানেন? জামসেদপুর আমার এক মামা থাকেন, তাঁর কাছে যখন ঐ সব দেশের গল্প শুনতাম বেশ লাগতো। আমরা ঐ সব জায়গা কেমন নেশার মতন টানে অগচ্চ দেখিনি, জানি না তবু সব কল্পনায় গড়ে রেখেছি।”

“কি রকম কল্পনা?”

“বলবো—হাসবেন না তো? শুনুন তবে বলবো—আজ। সেই সুবর্ণরেখা নদীর পাড়—শালবন, মহুয়া, মাদন বাজিয়ে বাদলের গান, সাঁওতালদের তাঁর ধনুক, শ্রাবণের বৃষ্টি আমাদের ছোট একটা বাড়ী নয়তো একটা ছোট ডাকবাংলো উঠানে পাকা কুল করমচা, জামরুল আর কিসমিসের গাছ, তাই ভাবুকের ভয় রাখে। সুন্দর সুন্দর পাহাড় উঁচু নীচু রাস্তা, গোলা পাথরের রঙিন নুড়ি কোনোটো আলুর মত দেখতে, কোনোটো নারায়ণের মতন। আমাদের দেখে লোকের মন্থ চলে যাবে শালবনের ভিতর, বাকী শিংতোলা ছোট হরিণ ধরে সাঁওতালরা ডাকবাংলোয় বিক্রি করতে আসবে, আপনি খুব সস্তায় দশ টাকা দিয়ে কিনে নেবেন। শুনুন, ডাকবাংলোর বারান্দায় রাত বেশী না হতেই তোলা উন্মুনে ভাত আর ডিমের ডালনা রাঁধবে—”

“ডিমের ডালনা?”

“কেন তুমি ডিম খাও না?”

“খাই, ডিমের পাটিসাপটা থাকে বলে অমলেট।”

“আচ্ছা—তাইই করবো তোমার জন্য।”

“কিন্তু কি বুঝি তোমার। ডাকবাংলোর বারান্দায় শূই, আর মাঝরাতে ভাগ্যুক এসে টেনে নিয়ে যাক। তখন পোড়ামাটির সম্পাদকের মতো নতুন সম্পাদিকা হবে ফলাও করে লিখে কাগজের কটীত বাড়াবে, এই তো মতলব?”

“হিঃ, মুখে আর কিছু বাধে না।”

“তবে শোর কোথায়?”

ছোট ডাকবাংলোতে বুঁকি আর ঘর থাকে না, আমাকে এতই পোকা পেয়েছে? কাম্প খাট পড়লো ঘরের ভিতর।

“ঘরের দূ কোণে দুটো খাট?”

“হ্যাঁ।”

“বতক্ষণ ঘুম না আসে বেশ গল্প করা যাবে।”

“কোরো।”

“আচ্ছা সেই সময় রাস্তা দিয়া মাক রাতে যদি মড়া নিয়ে যায় দড়ির খাটিয়ায় করে—এক লগো চোঁচিয়ে উঠবে—রাম নাম সত্য হায়।”

“মাগো গায়ে কাটা দিয়ে বাকি।”

“জবাব্দ্রীতিতঃ

“ঠিক একটা ষি রাখবো মেনেতে আমার খবতে কাছেই শোবে।”

“সারা রাত ষি জেগে পাহারা দেবে তো?”

“মাইনে বেশী দেবো, থাকবে জেগে।”

“ছাই থাকবে! ভগবানের অতবড় বিশ্বাসী জগদ্রত দরোয়ান বিবেক পশ্চত সূর্যোদয় পেলো ছুঁয়ে পড়ে, তুমি তো রাখবে ঠিকে ষি। সাত্তালি নাক ডাকবে, বোলায় ধরবে, সারা রাত কাশবে ঘন ঘন, আমাদের দুজনেরই তখন ঘুম আসবে না।”

“কি জানি বাপু, তুমি যা ভাল বোঝো তাহা কোরো।”

“উপস্থিত ও হলে মাসিক পত্রিকার কি হবে?”

“জাপানবাসীর যন্ত্রপাতিগুলো তুমি নিজে দেখে শুনবে কিনে আনো, কম্পোজিটর কতক ভর্তি কর, কোর্টে গিয়ে নিয়মবান্দনের ঠাট বডায় রেখে এস একদিন।”

“সেবন না হয় করবো, কিন্তু তিজেস করি, এই ঘাটশালায় থাকার কথা বলতেই কি মিনতি এতরাত আমাকে ফিরিখী বাগানে নিয়ে এসেছ?”

“হ্যাঁ, এনোই বেশ করেছি।”

“টেলিফোনে বয়েই তো পারতে মিনতি। সাহিত্যসংস্রাব্য আর সহশর্মশী এক কথা না মিনতি। তোমাকে হয়তো গড়ে পিটে সাহিত্যিক করে নেওয়া যায়, কিন্তু সহশর্মশী হবার উপযুক্ত কি তুমি? ভেবে দেখেছ?”

“চাইনা ভাবতে, আশি কিছুই চাই না, রাত হয়েছে এবার আমি বাড়ী যাবো।”

“তার আগে চল, যেখান থেকে আমাকে নিয়ে এসেছ সেইখান পৌঁছে দেবে চল।”

“পারবো না আমি, পারবো না—আমি এক্ষণি ট্রামে চলে যাবো।”

“চল আমিই তবে পৌঁছে দিই।”

“দরকার নেই। আমাদের বাড়ীতে হালকা আপনাব কোন দরকার নেই।”

“কেন, ভয় করছে আমার সঙ্গে যেতে?”

“হ্যাঁ ঠিক তাই।”

“সত্যি কি আমি চরিত্রহীন?”

“ভেবে দেখলেই পারো। তোমার কথাগুলি স্রোতস্রাবের মতন। অজ্ঞান করে তুমি মানুষকে কেটে দু'আধখানা করতে পারো, তবু অজ্ঞ বিজয়া বলে দাঁড়া আমার কণ্ঠস্বর করে যাই।”

অতীত অবস্থার সচিত্র মৌমাছি তাপসের পায়ে কাছ ভাল করে হাততী নীচু করতে না করতেই উঠে সোকা ট্রাম করতে ইতেন গাড়ীনের বাইরে চলে এল। যত ইচ্ছা দিয়ে পিড়নে মুখ না ছুঁয়ে মৌমাছি নিশ্চিন্ত ছিল, তাপস তাকে অনুসরণ করে চলেছে নীরবে। শরৎকালের জ্যোৎস্না, চৌরশীর রক্তিন আলো, আইসিটিম, অনি-লুই চাকের বাজনা, ভবানীপুর স্ক্রাবের ডাব, মৌমাছির খোঁপা, পেঁয়াজী বাড়ী, কার্শন পাকের মরশুমি ফুলের বিধান একটা রক্তিন মরতুমি সৃষ্টি করেছিল তাপসের মনের ভিতর।

নয়

কোজাগরী পূর্ণিমা  
আদানসোল

তোমার বিশ্বাস কাঙ্ক্ষা আর চরমিকা পড়ে আমার মত একটা মেয়ে সারা জীবন কিছ না করে কাটিয়ে দিতে পারে। সংসার করবার দরকারই করে না। আজ দু'বাই হলো তোমার সঙ্গে যোগ-সুত্র ছিন্ন হয়েছে, তবু ধরকারের স্মৃতি অতিমান করলে চলবে। বানের ম... র ভেঙ্গে

এনে ভাসিয়ে দিয়েছি। শোন কি হয়েছে আমার। বি এ পাশ নাস' এ দেশের লোক দেখিনি তাই প্রবীণ হাসপাতাল-কর্মটির সেক্রেটারী চেয়ে তরুণ আই-সি-এস মহকুমার হাকিম পর্যন্ত কেনন একটু; সমীহ করে, মর্দা রাখে কথা বলেন যা কেরানীদের ভাগ্যে জোটে না। কাকামি আজ কলকাতা থেকে এসেছেন। তাঁর কাছেই জানতে পেলাম তুমি নাকি চাকরী ছেড়ে দিয়েছো, আবার নতুন একটা কি মাথায় ঢুকেছে। সেটা যে তোমার কি, তা জানবার আদিকার আছে বলেই চিঠি লিখছি। আমাদের সেই সংকল্প যতদিন যায় ততই যেন দৃঢ় হচ্ছে—আমার এবং দলের সবার। অতএব নিশ্চিত হতে পারি যে, চাকরী ছেড়ে গহনা পরে চাকরানী হতে যাছ না, তবু তিজেস করি তোমার এ খেয়াল কেন বগতে পারো?

কাকামির কাছে সংবাদটা শুনলে অবধি মন ছুটুফুট করছে জানবার জন্য, তবু এ কদিন হাসপাতালের কাজে এত ব্যস্ত ছিলাম যে, লিখতে পারি নি। মো! এত তাড়াতাড়ি প্রতিজ্ঞাটা ভুলে গেলে চলবে কেন? কথা ছিল জীবনের বাকি বাকি কেউ কাউকে কিছ না জানিয়ে করবো না, কিন্তু কি এমন সূর্যোদয় এল যে, তোমার লাবীদিকে একচিরাব না জানিয়ে মোটা মাইনের চাকরীটা ছেড়ে ঘরে এসে বসেছো? জান তোমার অর্ধেক মাইনার ওনা মানভূম জেনার এই সীমানায় এসে কি কতটা কবাই একা একা।

গেল দু' বছর ৭৩০টা দিন আমার একভাবে জেল একটু, বিচিত্রতা বড় পেলাম না, শুধু যে সপ্তাহে রাত তিনটি সে সপ্তাহে দিনে ঘুমোই—ন্যাতো ঠিক তাব উঠো—হাসপাতালের রোগী-গুলোও ঠিক এক রকমের। হয় রেলের, ন্যাতো আশেপাশের চাকরানার, হয় হাতপা জখম, ন্যাতো মাথা ফাটা, হয় মদ খেয়ে ন্যাতো লোহার চাকায় লেগে আহত। অনেকদিন পরে একটা কেস্ আজ কদিন হলো পেরোই, পূর্ব জন্মের সঞ্চিত পাপ না থাকলে এমন রোগী কেউ পায় না। অজ্ঞান শিশুর মত কথা বলে আর জান কিরে এলে অযাচিত পড়িতের মত উপদেশ দেয়, অথচ ডাক্তারের আদেশে আমাকে সবই সহ্য করতে হয়।

জন্মের মনে হলো একবারে বেহীস্। থামো-মিটার দিয়ে মুখ নীচু করে পরীক্ষা করছিলাম, কতবার মিনতিতে রেস্‌পিটেশন হচ্ছে—রুগীটি বলে উঠলো বিকারের প্রথম দিন—“আপনার মুখখানা ঠিক পৃথিবীর মতন—না ঠিক।”

“চুপ্ করুন এটা হাসপাতাল, কাব্য করবার জায়গা নয়।” বাথায় কাতরাত বসে—“মাগো, আর পারছি না। জামি তা এটা হাসপাতাল নইলে বলতাম মুখখানা আপনার চাঁদের মতন, ফুলের মতন ইত্যাদি।”

“থাক আমার রূপের তুলনায় দরকার নেই, হা করুন ঔষধটা ঢেলে দিই।”

ঔষধটা ঢোক গিলে খেয়ে আমার দিকে এমন করে মুখ ভেঙিয়ে তাকালে যে, গালে হয় একটা অসংখ্য গারলো চড় মারতে হয় ন্যাতো নাকটা ধরে মুখটা উত্তর মুখে ঘুরিয়ে দিতে হয়। নাস' হয়েছি, সবই সহ্য করতে হয়।

আর একদিন অনেক রাত্রে ডিউটিতে কিছুচ্ছি, হঠাৎ কানের কাছে কে বলে—“খোতে দিলেন না কেন? আজ বুঝে থিড়ে পেয়েছে যে?”

চমকে, চেয়ার ছেড়ে উঠে রুগীটিকে ধবে ফেললাম, বিছানায় নিয়ে শুষিয়ে দিয়ে বললাম—“আজ কিছু নয় ডাক্তার বারণ করে গিয়েছে, কাল সকালে আপনার ওষুধের ছাঁকি তোলা হবে।”

জবাব দিল—“আপনিও কেন এই সূর্যোদয়ে

আপনারও একটা ছাঁকি তুলে দেখুন না।”

“কি প্রয়োজন?”

“ঘুমন্ত রুগীকে অনেক রাত্রে আদর করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে গালের উপর নিঃশ্বাস ঢেলে দিয়ে এলে, কেস্ বিপদজনক বৃদ্ধিতে হবে।”

এক এক সময় মৌমাছি কেনন যেন হয়ে বাই, জানি এটা সাময়িক তবুও যেন ব্যর্থতা মনকে এমনি করে ছেয়ে ফেলে যে, মনে হয় পৃথিবী শূন্য লোকের কোন দৃষ্টি নেই, আমরা কেবল জনকয়েক সকলের দৃষ্টি মিশ্রিচ্ছি হাহুতাশ করে বেড়াচ্ছি সারাজীবন। ভাবি কেন?

পেটের ছাঁকি দেখে ডাক্তার বলে, অপারেশন এখন চলতে পারে না, কণ্ট হয় তবু দেখলে যখন বাথায় অজ্ঞান হয়ে যায়।

\* \* \* আমার ডিউটির শেষ রাত। চতুর্দশীর চাঁদ মেঘেই ঢেকে রইল অনেক রাত পশ্চত, তারপর রুপু রুপু বৃষ্টি। শীত শীত করতে লাগলো। সমস্ত হাসপাতালটা নিদ্ৰামগ্ন নিস্তব্ধ, মেথরটা বারান্দার শেষপ্রান্তে গুটিস্‌টি মেয়ে ঘুমচ্ছে—একটা রাশিয়ান উপন্যাসের নামটাই কেবল বারে বারে পড়তে লাগলাম, তাইতে যেন সব বইটা পড়া হয়ে গেল—আমার জীবনের সঙ্গে হুবহু মিলে যেতে লাগলো, মনে মনে বারে বারে বহুবার নাম বলতে লাগলাম—নারীকে ডব্লু নদী বয়ে যায়। জানালা দিয়ে অদূরের লাদকাটা ঘরটা দেখা যায়, পাতলা কি ষি পোকের আত্মাচর্চা মিলিয়ে বায়, ব্যুটির রুপু বাপ শব্দের সঙ্গে লোহার খাট, লাগ কশলা, এলোমেলো মশারি, মিট্ মিটে, আলো, বারান্দায় ব্যুটির ছাঁকি, অকাতর সব রুগীদের ঘুম—সব জড়িয়ে সোঁদন আমার ননকে না বহরের মেয়ে করে তোলে ভয়ে, তবু স্বপ্নটা আসে যোল বছরের মেয়েদের মতন, সেই নিভৃত অকথায় একটা দুঃস্বপ্ন এল অতি সহজভাবে একবারে চেলের মায়ের মত। চারিদিকে সবই নৈমিত্ত্য দেখলে হয়তো এই রকমই হয়। সোঁদা জি খাটের কাছে এসে বললাম—“ঘুমালেন।”

জবাব দিল—“না।”

“কাল আপনাকে ডিস্‌চার্জ করবে, কোথায় যাবেন?”

“কলকাতায়।”

“সেখানে কি করবেন?”

“কিছই না। তবে এবার থেকে করবো, সোঁদন কিনে আনলাম বোম্বাই থেকে, কিছু লোক নিযুক্ত করে এবার থেকে রাত্তিরে কাজে নামবো, দেরি হয়ে গেল খুব। টেন আসতে আসতে হঠাৎ অসুখ হয়ে আর এই বাথার জন্য আসানসোলে নামতে বাধ্য হয়েছিলাম।”

“যশের পর কি এইরকম ছোটখাটো কলকাতাখানা ভাল চলবে?” জিজ্ঞেস করলাম।

বলে—“যশের পরই বাক্ষুধু ভাল চলবে।”

“বড় হেঁয়ালী করা স্বভাব আপনার, কিপের কারখানা?”

“বললাম তো বাক্ষুধু—নতুন একখানা বাংলা মাসিক পত্রিকা আমরা বের করছি।”

এক সেকেন্ডের এক সহস্র কথা সময়ের ভিতর ভেবে ঠিক করে ফেললাম আমার নতুন সংকল্প—

তৎক্ষণাৎ বললাম—“আমায় নিয়ে চলুন, এ চাকরী ছেড়ে দিচ্ছি। দোঁখি পারি কিনা।”

“পারবেন না।”

“কেন?”

“জানি যশে সকলভাবে পরাজয় না হোলে এ দেশের মেয়েরা নাস' হয় না।”

“আমাদের এটা সম্মানজনক সংগ্রাম, আপনি হয়তো বুঝবেন না।”

“বেশ কৃষি, তবু আপনি পরাজিতা, নীরব সংগ্রামের ঐশ্বর্য ও একাগ্রতা আপনার নেই।”

“কি করে বুঝলেন?”

“একদিন আপনাকে দেখেই—ইচ্ছা হয়েছে ঘুমের ভাণ করে আরো পড়ে থাকি, কিন্তু আর তার দরকার নেই, এমন নিশ্চিন্ত বর্ষাসজল রাতে যখন চুপ করে বই পড়ে ডিউটি দিয়ে রাত কাটাতে পারেন নি, তখন বুঝলাম অভাব আপনার অনেক—সংগ্রামের শক্তি কুলিয়ে উঠতে পারবেন না, আপনার কপালে অনেক দুঃখ আছে, পালান! পালিয়ে যান! এই নীরবতার কাছ থেকে।”

“কোথায় যাবো?”

“লোকের ভিতর।”

“সেখানেও যে একা থাকবো!”

“তবু ভাল, যদি হারান, মানুষের মধ্যে হারাবেন; রুচিহীন বলে একটা জিনিস আছে, কিন্তু এখানে এই সব পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর হারালে একেবারেই হারাবেন।”

তারপর সারারাত কাছে নিয়ে আমাকে কত কিছু বোঝালে, সব কথাই লেখা যায় না, কিন্তু বোঝাবার যে একটা স্পর্ধাহীন সাহস দরকার, তা তার আছে।

ভেবে না চাকরী ছেড়ে দেবার সাহস তোমারই শব্দ আছে মোমাছি—আজ আমিও পেয়েছি, শীগুগিরই রুগীর সঙ্গে রোগ সারাতে যাচ্ছি তোমাদের কলকাতায়।

কাজ কি হবে আমার জান? সাকুলার রোডে যেখানে তোমার সেই মাসিক পত্রিকা বেরতো,

আবার সেইখানেই নতুন নামে একটা কালজ বেরবে আমার রুগী যাবেন সম্পাদক। তাও শুনছি এক দিনের জন্য মাসে, ব্যাকী উদ্বিগ্ন দিন আমারে চালাতে হবে সব কাজ, তিনি হয়তো সেই অবসরে তার প্রিয়জনকে নিয়ে সেই সময় কাটা সোম খুঁজবেন সুখেরেখা নদীর পাড়ে, নয়তো ঘাটশীলার শালবনে—আরো ঐ রকম কত বিপাগলের মতন স্বপ্নাবশেষ বলে যান।

কলকাতায় পৌঁছেই দেখা করবো তোমার সঙ্গে আমার মনিবটিকে যদি পারি একদিন দেখাবে তোমাকে বন্ধ অথবা মনিব—দাসীর কথা একদিনও শুনতে দেখলাম না। ভালবাসা নিঙ। ইতি—তোমার লালীদি।

(আগামী সংখ্যা সমাপ্ত)

**জনকল্যাণে সোভিয়েট বিজ্ঞান** :—শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পুস্তকালয়, ২৯ বাদুড়বাগান রো, কলিকাতা। তিন টাকা।

শ্রিতীর মহাদুঃখ আণবিক বোমার ব্যবহার দেখিয়া বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রতি সাধারণ লোকের মনে একটা আতঙ্ক ও ভ্রাসের ভাব সৃষ্টি হইয়াছে। বিজ্ঞানের এই বিদ্রোহী রূপ ছাড়া যে ভাবের একটা কল্যাণী মূর্তিও আছে জিতেন্দ্রবাবু আলোচ্য পুস্তকে সুনিপুণভাবে তাহাই দেখাইয়াছেন। যে বিদ্রোহী ভূখণ্ড নইয়া আজ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র গঠিত উহার আধিকাংশ অঞ্চলের অধিবাসীরাই বলশেভিক বিপ্লবের পূর্বে আমাদের দেশের লোকের চাইতেও শিকা সংস্কৃতি এবং শিল্পের দিক দিয়া অগ্রগত ছিল। সোভিয়েট গণমণ্ডল বিজ্ঞানের সাহায্যে সেইসব অগ্রগত অঙ্গসকল কিরপে অপ্রত্যাশিতভাবে রূপান্তরিত করিয়াছেন এবং জনসাধারণের জীবনে কিরূপ নতুন আনন্দধারা প্রবাহিত করিয়াছেন লেখকের মানসে ভাবায় তাহাই সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভারতের জাতীয় জীবনও আজ রূপান্তরিত হইতে চলিয়াছে। প্রত্যেকটি ভারত-বাসীই মুখে যদি হাসি ফুটিয়া তুলিতে হয়, তবে বিজ্ঞানের সাহায্যেই এই দেশের কঠোর দারিদ্র্য এবং দাশক্ষা-কুশিক্ষা দূর করিতে হইবে। সুতরাং সোভিয়েট দেশে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্বন্ধে আমাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে। লেখক খেচ শ্রম স্বীকার করিয়া আলোচ্য পুস্তকখানিতে যে জাতব্য বিষয় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। লেখক বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনায় সিংহহস্ত। সেইজন্যই সম্প্রদায় তিনি বহু তথ্য পরিবেশন করিতে পারিয়াছেন। মস্কো-ভগা খাল, কৃষিসম্পদ, জন-বাস্থ্য প্রভৃতি অধ্যায়গুলি পড়িতে পড়িতে মনে য়, কবে আমাদেরও দেশে এইরূপ কৃষিগর রচনার নটা হইবে।

এক কথায় পুস্তকখানি খুবই সময়োপযোগী ও লাবান হইয়াছে। সঙ্গে খানকয়েক ছবি দেওয়ার ব্যবস্থা অধিকতর আকর্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। স্তবকের অঙ্গসৌষ্ঠবে উন্নত রচিত পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ যে পাঠক মহলে সহজেই সমাদৃত হবে তাহা না বলিলেও চলে।

**ত্রিবেণী—সুশীল রায়। এস্ সি সরকার এন্ড সন্স লিমিটেড, ১সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।**  
লা ২৫।

## পুস্তক পরিচয়

ইংরেজ কবি রাউটিন মানব জীবনে প্রেমের স্মৃতির দ্বন্দ্বিতা অনুভূতিকে রূপ দিচ্ছেন “The moment made eternity” এই চমককার কথা কবিতার মধ্যে। সুশীল রায়ের নবতম উপন্যাসটি পড়তে পড়তে এই কথা কবিতাই আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে ফিরাছিল। ত্রিবেণীর লেখক প্রেমানুভূতির সেই বিশেষ মুহূর্তকেই চিরন্তনতার পর্যায়ে টেনে তোলার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। তাঁর সেই প্রচেষ্টা সর্বাবশে সার্থক হয়েছে এমন কথা জের দিয়ে বলতে পারি না। ওলে তাঁর প্রচেষ্টা যে অভিনব ও প্রশংসনীয় সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

‘ত্রিবেণী’ মূলত প্রেমময়ী উপন্যাস। এ উপন্যাসে প্রেমই সবচেয়ে বড় সমস্যা। এ উপন্যাসের নায়ক কবিদের জীবনে অন্যান্য সমস্যার অস্তিত্ব নেই এমন নয়—ওলে প্রেমের সমস্যা তাদের আর সব সমস্যাকে ছাপিয়ে গেছে। প্রেমের চিত্র অক্ষনে ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ লেখক অশ্রুত দরদ ও শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রেমের জন্যে পুত্রের ও নারী দুজনেরই প্রয়োজন হয়। কিন্তু সুশীলবাবুর নারী চরিত্রের প্রতি দরদী পক্ষপাতই যেন বেশী পরিমাণে ফুটে উঠেছে। তাই করতোয়ার বাথ প্রেমের চিত্র যে পরিমাণ সজীবতা নিয়ে ফুটে উঠেছে, দুর্জয়ের চিত্র সে পরিমাণ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি। তেমনিই সাহিত্যিক শঙ্কুতলার তাঁর প্রেমানুভূতির কাছে বিদগ্ধগামী এজিয়েটর দিল্লীপের প্রেমানুভূতির চিত্র পরিস্ফুট। এর একমাত্র ব্যতিক্রম ডাক্তার উৎপল মিত্র। তাঁর চরিত্র স্বীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। দিল্লীপ, দুর্জয়, অপূর্বদের ভীড়ের মধ্যে আমরা উৎপল মিত্রকে হারিয়ে ফেলি না। নারী চরিত্রগুলোর সম্বন্ধে কিন্তু আদৌ একথাটা খাটে না। প্রত্যেকটি নারী চরিত্রই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও হৃদয়ানুভূতির বিচিত্রতায় পরস্পর থেকে আলাদা। করতোয়া, কাবেরী, জতা এবং শঙ্কুতলা—এদের প্রত্যেকটি চরিত্রই জীবন্ত এবং নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে ভাস্কর্য। নারীচরিত্র-প্রধান এই উপন্যাসে প্রকৃত নায়ক কাউকেই বলা চলে না। তবে প্রতিটি নারী চরিত্রই জীবন্ত বলেও

করতোয়াকেই আমার এ বইয়ের নায়িকা বলে মনে হয়। তার কারণ তার কথা উপন্যাসে খুব বেশী পরিমাণে স্থান না পেলেও তার জীবনে প্রেমের ট্রাজেডিতে গোটা বইটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

সুশীলবাবু ইতিপূর্বে একাধিক উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন। ‘ত্রিবেণী’ তাঁর পূর্ব খ্যাতি বাড়াবে বই কমাতে না। তাঁর সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ভাবের তীক্ষ্ণ স্বভাব ও রচনাশৈলীর নীলগন্ধা পাঠকপাঠিকাদের মনে সবচেয়ে রেখাপাত করে। উপন্যাসমূল্যবিত বাঙলা সাহিত্যে ‘ত্রিবেণী’ নিজের স্থান করে নিতে পারবে বলেই আমার বিশ্বাস। —গোপাল ভৌমিক

**তরঙ্গ (নাটক)—শ্রীদিগেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।**  
পুস্তকালয়, ২৯, বাদুড়বাগান রো, কলিকাতা। দুই টাকা।

লেখকের কোন রচনা ইতিপূর্বে পড়িবার সুযোগ হয় নাই, এজন্য এই নাটকখানিতে প্রথম পরিচয় হইল। বাঙলা নাটক বা নাট্যমণ্ডল সম্বন্ধে আমি খুব উৎসাহী নই। কাব্যপ্রধান নাটক রচনা বাঙলায় এ পর্যন্ত নিষ্ফল হইয়াছে। কিন্তু বাস্তব-জীবন বা সমাজ-সংসার কতকগুলি নাটকে নাটকোচিত রসরূপ লাভ করিয়াছে। এইজন্য মনে হয় বাঙালীর নাটক রচনা অভিশয় বর্তমান বা প্রত্যক্ষ বাস্তবকে ধীরে ধীরে সাফল্য লাভ করিবে। এখানে তাহার কল্পনাদৃষ্টি সংহত ও সংহত হয়—কথার ভাবব্যাপক কিছু কঠিন বা জমাট হইয়া উঠে; শব্দই ভাবের রসাবেগ নয়—জীবনের শক্তির দিকটাও সে অপরাধক করে; এই শক্তির নানারূপই নাটকের উপজীব্য। আলোচ্য নাটকখানিতে লেখক সেই শক্তিরই একটা রূপ দেখাইতে পারিয়াছেন। এজন্য নাটকখানি স্থাপত্য হইয়াছে। ইহার ঘটনাবলী লেখককে কল্পনা করিতে হয় নাই বটে, কিন্তু ঘটনোত্তর লেখকের বাস্তবদৃষ্টির দৃঢ়তার পরিচয় আছে। কিন্তু এই রচনায় লেখকের যে প্রকৃত শক্তির প্রমাণ পাইতেছি তাহা ঐ চরিত্রগুলির নিখুঁত চিত্রণে; প্রত্যেকটি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে বাস্তবিক আকার লাভ করিয়াছে। নাটকের action-ই হয়ত যথার্থভাবে সমাপ্ত হয় নাই (এ বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে) কিন্তু উহাতে গতি আছে, তাপ আছে, স্ফূর্তি আছে। মোটের উপর, নাটকখানি পড়িয়া আমি খুশী হইয়াছি।

নাটকে যে পূর্ববর্ণের গ্রাম্য কথা ব্যবহার করা হইয়াছে উহার উত্তীর্ণ সরস আছে—এ ভাষা এ নাটকের পক্ষে বড় উপকারী লাগিয়াছে।  
শ্রীদিগেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



সহজ চিত্রাঙ্কনা—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।  
বিশ্বভারতী, ৬৩ স্মারকানাথ ঠাকুর সেন,  
কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

পঁচাত্তর বৎসর আয়ুষ্কালের প্রাপ্তে পৌঁছে,  
তার সুদীর্ঘ শিল্পী-জীবনের অভিজ্ঞতা নিষ্ঠুর  
আচার্য অবনীন্দ্রনাথ 'সহজ চিত্রাঙ্কনা' গ্রন্থটি রচনা  
করেছেন। বলম তুলির টান টেনের (টোন=  
Tone) রহস্য, আকৃতির ছাঁদ ও বাঁধ, অংকা  
জোঁকার তাল-মান, ছবি অংকার এই হল আদি  
প্রকরণ। ভাবে ভঙ্গীতে, রঙ চঙে, আলো-অঁধারের  
সীমাসংগঠনে ক্রমে ছবিতে হয় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। শিল্পী-  
হৃদয়ের ছবিটি মাত্র প্রকরণে শিল্পের ছবিটি মূল  
অংশের গোপন গ্রন্থ মেনে করেছেন বালক  
বালিকাদের উপযোগী সহজ ভাষায় ও সরল  
উপমায়। অঞ্চল চর্চা বাঁদের এতদিন ছড়ি হাতে  
শেখাতে হয়েছে তাঁরাও কিছু কম শিক্ষা লাভ  
করবেন না এই ছোট্ট বইটি থেকে। শিল্পের রস  
ও রহস্য শৃঙ্খল তুলির মধ্যে নয়, রাস্তার ধারায় যখন  
সঞ্চারিত হয়ে জীবনসত্যে পরিণত হয় সেই দৃষ্টি  
মুহুর্তেই ভাষা এমন স্বচ্ছ সরস নবীনতা লাভ  
করে, প্রকরণ বিচার এমন সহজ সজীবতা স্পর্ষিত  
হয়ে ওঠে।

এ যুগের ছেলেমেয়েদের কী সৌভাগ্য অবনীন্দ্র-  
নাথ এদের জন্য লিখে গেছেন অ-আ-ক-খ শেখার  
“সহজ পাঠ”, অবনীন্দ্রনাথ লিখলেন ছবি অংকার  
অ-আ-ক-খর বই এই “সহজ চিত্রাঙ্কনা”। নন্দলাল  
বসুর মতো শিল্পী একে দিচ্ছেন পাতায় পাতায়  
ছবি। বলতে ভুলে গেছি, সহজ চিত্রাঙ্কনার  
চিত্রাবলী আচার্য অবনীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা  
অনুসারে একেছেন তাঁর স্বনামধন্য শিল্পশিষ্য  
শ্রীনন্দলাল বসু। একেই কি বলে না মণিকাম্বন  
যোগ!

এক টাকা নাম মাত্র মূল্যের তেত্রিশ পৃষ্ঠায়  
সমাপ্ত “সহজ চিত্রাঙ্কনা” বইখানি চিত্রবিন্যাস  
সোনার কাঠির সন্ধান দেবে ছেলেমেয়েদের তো বাটেই,  
মাস্টারদেরও। মরা সোনার বাজারী যাদু কাঠি  
এ নয়, সত্যতা বিচারী ড্রইং-বইএর সংসাজা নকলে  
যাদের জন্ম। এ সোনার কাঠি সেই শিল্পী  
যাদুঘর-এর নিষ্কর হাতে গড়া যিনি একদিন  
এই বাঙলা দেশের বৃক বসে সারা ভারতের শিল্প-  
রাজ্যে মরা গাড়ে বান তাকিয়েছিলেন। সেই রঙের  
বানে ভারতবাসীর দুঃখের আজো রঙীন হয়ে  
রয়েছে, রূপসোবের নিতা তাঁদের সন্ধানে আজো  
সে তীর্থপথিক।

অবনীন্দ্রনাথের দেওয়া এই সোনার চাপি-  
কাঠিটি হাতে নিয়ে দেশের ছেলেমেয়েরা শিল্পের  
তীর্থযাত্রা করে বলে বোঝিয়ে পড়ুক, এই কামনা  
করি। সংগে চলুন শিল্পকে দল। শিল্প জ্ঞান  
মন্দিরের দ্বার খুলে, প্রবেশ ঘটেবে অবিলম্বেই।

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আকাশ রাণী—শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্তী প্রণীত।  
প্রাপ্তিস্থান—আমাদের সাহিত্য ভবন, ১২৩বি,  
গ্রেড সেন, বালীঘাট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।  
‘আকাশ রাণী’ মোট কুড়িটি কবিতার সমষ্টি।  
অধিকাংশ কবিতাই আকাশকে অবলম্বন করিয়া  
রচিত। আকাশের নামের প লেখক শিল্পীর মত  
বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ছন্দ প্রায় সর্বত্রই  
হুটীপুট।

৩০/৪৭

রেশমেরকসান (লিও টলস্টয়) :—অনুবাদক—  
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রকাশক—ইউ. এন. ধর এন্ড  
সন্স লিঃ, ১৫, বঙ্কিম টাচার্জ স্ট্রীট, কলিকাতা;  
মূল্য ৩/ টাকা; পৃষ্ঠাসংখ্যা—২৫৬।

লিও টলস্টয়ের “রেশমেরকসান” বিশ্ব-সাহিত্যে  
প্রসিদ্ধ উপন্যাস। উপন্যাসখানি রুশ ভাষায়  
প্রকাশিত হওয়ার পরই পৃথিবীর নানা দেশের  
নানা ভাষায় ইহা অনূদিত হয়। এমন একখানি  
প্রসিদ্ধ উপন্যাস ইংরেজি বাঙলা ভাষায় অনূদিত  
হয় নাই। অনুবাদক গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ  
করিয়া বাঙালী পাঠক সমাজের যথেষ্ট উপকার  
সাধন করিয়াছেন। অনুবাদের ভাষা স্বচ্ছ, সরল,  
সাবলীল। গ্রন্থখানির প্রচ্ছদ, মূদ্রণ চিত্তাকর্ষক।

৩১/৪৭

আজাদ হিন্দ নওজোয়ান :—শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ  
দাস প্রণীত। ‘খিকাস’ সার্কেল হইতে শ্রীযতীশ  
দাশগুপ্তা কর্তৃক ১৯৫৫ হাঁসপুকুর ফার্ম লেন,  
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।  
কতকগুলি দেশপ্রেমমূলক উদ্দেশ্যবিশিষ্ট কবিতার  
সমষ্টি। কিন্তু ছন্দের উপর লেখকের দখল না  
থাকার দরুন কবিতাগুলি স্থপাঠ্য হয় নাই।

১৪/৪৭

রাষ্ট্র ও রাশিফল :—১ম বর্ষ—১৩৫৪। ১৩৫৫  
বঙ্গাব্দের বিষয় পঞ্জিকা হইতে উদ্ভূত। শ্রীনির্মল-  
কান্ত ভারতীভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে রাষ্ট্র ও  
রাশিফল এবং শুভদিনের নির্ধারিত ইত্যাদি কয়েকটি  
বিষয় বর্ণিত আছে।

১৬/৪৭

নতুন সংস্করণ  
সুকুমার রায়ের

আবেল  
গীর্জা

দুটাকা মাত্র মাত্র  
সিগনেট প্রেসে

যে  
১২  
সত্য গৃহে  
রাখা উচিত!

শিশিরকুমার আচার্য চৌধুরী সম্পাদিত “বাংলা বর্ষালিপি—১৩৫৪”

বর্ণিত আকারে প্রকাশিত হইল—মূল্য দুই টাকা, ডি. পি ২১০।

ভারতবর্ষ, শিল্পক, সাহিত্যিক, ব্যবসায়ী, সাধারণ গৃহস্থ স্ত্রী-পুরুষ সকলেই তাঁহাদের  
দৈনন্দিন জীবনে এই পুস্তকখানির অশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবেন। ১৩৫৩ সালে  
ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটিয়াছে, সে বিষয়ে অবহিত থাকা প্রত্যেক  
শিক্ষিত বাঙালীর অবশ্য কর্তব্য। সাধারণ পাঠকবর্গ বাহ্যিক সমস্ত তথ্য অনুয়াসে বৃত্তিতে পারেন,  
সেজন্য গ্রন্থখানি যত্ন সহক ভাষায় লেখা হইয়াছে। ১৩৫৪ সালের সংক্ষিপ্ত দিনপঞ্জী সম্বলিত।  
পুস্তকখানি যে পুস্তক মূল্যবান হইয়াছে ও প্রতি ঘরে ঘরে থাকা উচিত এ বিষয়ে  
বাংলার সমস্ত সংবাদপত্র একমত :

অন্যান্য গ্রন্থ : ডাঃ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—নির্জন মন—২১০।

অধ্যাপক উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—চারশ বছরের পাঠ্যতা দর্শন—২১০।

কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী—ইংগিত—১১০।

সুনীল বিশ্বী ও অসিত রায়—ক্রয়েড ও মনঃসমীক্ষণ (২য় সং সংস্করণ)



সংস্কৃতি বৈঠক, ১৭ পার্ভিত্যা প্লেস, কলিকাতা ২৯

কলিকাতা পরিবেশক :

জিজ্ঞাসা, রাসবিহারী এডেন্‌স, কলিকাতা ২৯

### হাঙ্গেরি বিনা খরচে পড়ার ব্যবস্থা

রামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোমের সহ-সেক্রেটারী জানাইতেছেনঃ—২০নং হারিনাথ দে রোডস্থ প্রিয়ারাম-কৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্টস্ হোমের মেধাবী দরিদ্র ছাত্রদিগকে বিনামূল্যে পাঠ্যক্রম কলেজে পড়ান হয়। পূর্ণ বা আংশিকভাবে ব্যয় বহন করিয়াও কতক ছাত্র এখানে থাকিতে পারে। এ বৎসর যাহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছে, শূন্য তাহাদেরই আবেদন বিবেচিত হইবে। সেক্রেটারীর নিকট টেস্ট পরীক্ষার নম্বর ও তিন পয়সার ডাক টিকিট সহ আবেদন করিতে হইবে।

## বিদেশী সংবাদ

২৩শে জুন—সোভিয়েট সরকারী নিউজ এজেন্সী “টাস” ঘোষণা করিয়াছেন যে, ফ্রান্স ও বর্ত্তন ইউরোপকে সাহায্য করা সম্পর্কে রাশিয়ার পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য যে

আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন, রাশিয়া সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। সোভিয়েট গভর্নমেন্ট ২৭শে জুন প্যারিসে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব সন্মেলন আহ্বান করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

২৫শে জুন—চীনা গভর্নমেন্ট অদ্য ঘোষণা করেন যে, ডেইরেন ও পোতাখারীর পরিদর্শনকম্পে চীনের পক্ষ হইতে সম্প্রতি যে কমিশন নিয়োজিত হইয়াছিল, সোভিয়েট গভর্নমেন্টের অসহযোগিতা-হেতু উহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ায় উক্ত বন্দর দুইটিতে যে কোন সময় সৈন্য প্রেরণের অধিকার চীনা গভর্নমেন্টের আছে।

২৭শে জুন—সমগ্র ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় শ্রমীপপঞ্জের জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় অন্তর্ভুক্তি গভর্নমেন্ট গঠনকম্পে ডাচ গভর্নমেন্ট গত ২৭শে মে তারিখে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ইন্দোনেশীয় সাধারণতন্ত্রের সভাপতি ডাঃ সুকর্ণো উহার মূল বিষয়গুলি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ফলে তিন মন্তব্যবাপী যে সংকট চলিতেছিল, তাহার

অবসান হইল। প্রেসিডেন্ট ডাঃ সুকর্ণো প্রধান মন্ত্র ডাঃ শারীর-এর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন। ডাঃ শারীর সশস্ত্র সংঘর্ষের পথ পরিহারের চেষ্টা হেলায়ডকে সুযোগ সুবিধা দানের নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সব কয়টি মধ্য প্রজাতন্ত্রবাস বামপন্থী রাজনীতিক দল তাহার বিরোধিতা করা তিনি পদত্যাগ করেন।

২৮শে জুন—লন্ডনের সংবাদে প্রকাশ, ভারত দুইটি ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠাকল্পে ২৫ খারা সম্মিলিত ইণ্ডিয়া বিলটি ৭ই জুলাই হইতে ১০ই জুলাই-এ মধ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পেশ করা হইবে।

২৯শে জুন—চীনা গভর্নমেন্টের সরকার গেলোতে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি জেনারেল মাও সে তুং-এর প্রস্তাবের আদেশ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে বে-আইনি রাজনৈতিক দল সংগঠন এবং চীনের নিয়মতান্ত্রিক গভর্নমেন্টের পতন ঘটাধার জনা বিদ্রোহের প্ররোচনাদানের অভিযোগ আনা হইয়াছে।

## ক্রিকেট

ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দলের প্রথম টেস্ট ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। ঐ খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকা দল উন্নতর নৈপুণ্য প্রদর্শন করে ও ইংল্যান্ড দলকে “ফলো অন” পর্যন্ত করিতে সক্ষম হয়। ইহাতে অনেকেরই ধারণা হয়, দক্ষিণ আফ্রিকা দল দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড দলকে আরও বেগ দিবে। কিন্তু ফলতঃ তাহা হয় নাই। ইংল্যান্ড দলই দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় মোচনীয়ভাবে ১০ উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকা দলকে পরাজিত করিয়াছে। ক্রিকেট খেলার ফলাফল সকল সময়েই অনিশ্চিততার মধ্যে থাকে। সুতরাং ফলাফল ধারণাতীত হইলেও আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকা দল যদি প্রকৃতই ইংল্যান্ড দল অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হয়, তাহা হইলে ঐ খেলায় পরাজয়ের সম্ভবিত প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে।

### খেলার উল্লেখযোগ্য ঘটনা

ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচেও নতুন রেকর্ড ও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে। নিম্নে ঐ রেকর্ড ও ঘটনার তালিকা প্রদত্ত হইলঃ—

(১) ইংল্যান্ড দলের এডরিচ ও কম্পটন প্রথম ইনিংসে তৃতীয় উইকেটে একত্রে ৩৭০ রান সংগ্রহ করেন। ইতিপূর্বে কোন টেস্ট খেলায় তৃতীয় উইকেটে এত রান সংগৃহীত হয় নাই।

(২) কম্পটন এই ইনিংসে ২০৮ রান করেন। টেস্ট খেলায় কম্পটনের ইহাই প্রথম শতাবধিক রান।

(৩) দক্ষিণ আফ্রিকা দলের অধিনায়ক মেলভিন দ্বিতীয় টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসেও শতাধিক রান করিয়াছেন। প্রথম টেস্ট খেলায় পর পর দুই ইনিংসে শতাধিক রান করেন। ইহার ফলে মেলভিন টেস্ট খেলায় পর পর তিন ইনিংসে শতাধিক রান করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইতিপূর্বে ১৯৩৯ সালে মেলভিন টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শতাধিক রান করেন। ফলে মেলভিন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় পর পর চারিবার শতাধিক রান করিবার গৌরব অর্জন করিলেন। ইতিপূর্বে অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট খেলোয়াড় কিংগলটন এইরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

(৪) ইংল্যান্ড দল এই খেলায় প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ৫৫৪ রান করিয়া ডিক্রেডাড করে।

# খেলা খুলা

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড দলের ইহাই সর্বাধিক রান।

### খেলার বিবরণ

ইংল্যান্ড দল প্রথম ব্যাটিং লাভ করে। দ্বিতীয় দিনের মধ্যাহ্ন ভোজের পর পর্যন্ত খেলিয়া ৮ উইকেটে ৫৫৪ রান করিয়া ডিক্রেডাড করে। দক্ষিণ আফ্রিকা দল প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। দিনের শেষে ২ উইকেটে ১৬৭ রান দবে। মেলভিন ১৬ রান করিয়া নট আউট থাকেন। তৃতীয় দিনে দক্ষিণ আফ্রিকা দলের প্রথম ইনিংস ৩২৭ রানে শেষ হয়। ইংল্যান্ড দল ২২৭ রানে অগগণত থাকিয়া দক্ষিণ আফ্রিকা দলকে ফলো অন করিতে বাধ্য করে। দক্ষিণ আফ্রিকা দল দিনের শেষে ২ উইকেটে ১২০ রান করে। চতুর্থ দিনে দক্ষিণ আফ্রিকা দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৩২ রানে শেষ হয়। ইংল্যান্ড দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিয়া কেহ আউট না হইয়া প্রয়োজনীয় ২৬ রান সংগ্রহ করে ও খেলায় ১০ উইকেটে বিজয়ী হয়। খেলার ফলাফলঃ—

ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসঃ—৮ উইঃ ৫৫৪ রান (কম্পটন ২০৮, এডরিচ ১৮৯, ওয়াসল্‌ক ৬৫, টাকট ১১৫ রানে ৫টি উইকেট পান।)

দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম ইনিংসঃ—৩২৭ রান (মেলভিন ১১৭, লিলে ৪৬, নর্স ৬১, ডসন ৩৬, হারিস ৩০, রাইট ৯৫ রানে ৫টি, কম্পটন ০২ রানে ২টি উইকেট পান।)

দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ইনিংসঃ—২৫২ রান (মিলে ৮০, নর্স ৫৮, ডসন ৩৩, রোয়ান নট আউট ৩৮, রাইট ৮০ রানে ৫টি, এডরিচ ৩১ রানে ৩টি উইকেট পান।)

### অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণকারী ভারতীয় দল

অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা শেষ হইয়াছে। খেলোয়াড়গণ কিন্তু এই পর্যন্ত এক্ষণ খেলিবার সুযোগ পাইলেন না। গত বৎসর শোনা গিয়াছিল ইহাদের বৈদেশিক শিক্ষকের অধীনে রাফিয়া নিয়মিতভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে। আশ্চর্য্য হইতে হয়, তাহার কোনই

ব্যবস্থা এই পর্যন্ত হয় নাই। অস্ট্রেলিয়া যাত্রার পূর্বেই হইবে তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। ভারতীয় খেলোয়াড়গণ কিরূপে অস্ট্রেলিয়ার ন্যায় শক্তিশালী দলের সহিত সমপ্রতিস্থানিতা করিবেন, আমাদের কল্পনা হয় না।

### ব্যাডমিন্টন

মালয়ের ব্যাডমিন্টন খেলা সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনিয়াছি। কেহ কেহ বলেন মালয়ের ব্যাডমিন্টন স্ট্যান্ডার্ড এত উন্নতর যে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা চলে। ইহাদের খেলা দেখিবার সৌভাগ্য শীঘ্রই হইবে বলিয়া জানা গেল। দার্জিলিং ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় মালয় হইতে খেলোয়াড় পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা হয়। মালয় ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশন যে, তাহার দুইজন খেলোয়াড় পাঠাইবেন। ঐ প্রতিযোগিতায় যদি মালয়ের খেলোয়াড়গণ সত্য সত্যই যোগদান করেন, অনেকেই মালয়ের খেলার স্ট্যান্ডার্ড সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারিবেন।

### সস্তরগ

বাঙলার সস্তরগ পরিচালকগণ এতদিন নীরব ছিলেন। দীর্ঘকাল নীরবতার জন্য অনেকেরই ধারণা হইয়াছিল যে, ইহাদের অসুস্থতাই বোধ হয় লোপ পাইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি দেখা গেল ইহারা একটু, সচল হইয়াছেন। ইহা খুবই সুখের বিষয়। তবে কিছুদিন পূর্ব হইতে একটু কমেও দিকে দৃষ্টি দিলে বাঙলার উৎসাহী সাতারগণ নিয়মিত অনুশীলনের সাহায্যে কিছুদূর অগ্রসর হইবার মত শক্তি লাভ করিতেন। এতদিন অনুশীলন না করিয়া হঠাৎ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে ভাল ফল প্রদর্শন করিতে পারিবেন কি না ইহাই হইতেছে আমাদের আশংকা? যদি অল্প সময়ের মধ্যে সাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন, তাহাতে সত্যি চমকিত হইবে হইবে। বাঙলা ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী। সেই স্থানের উপযোগী কৃতিত্ব বহির্নিষ্ঠ ভারত সস্তরগ প্রতিযোগিতায় প্রদর্শন করিতে না পারে, সকলেই পরিচালকগণকে দোষী করিবেন এই বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। কাজের ভায় লইব অথচ কাজ করিব না, শূন্য পাণ্ডিগরি করিব এই সব আর চলিবে না। আমাদের সন্তোষে নখন প্রকৃত কর্মী পাইবে সম্মান, প্রায়ঃব্যবস্থা করিবে কর্মীকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী পরিচালক।

# ধবল ও কুষ্ঠ

যায়ে বিবিধ বর্ণের দাল, পল্লীশািতহীনতা, অস্পষ্ট  
ক্ষীভ, অস্পষ্টতার বহুতা, বাতরত, একজিহ  
সে'রায়োসিস ও অন্যান্য চর্মরোগাদি নিবেদন  
আরোগের জন্য ৫০ বর্ষোৎসবের চিকিৎসাকার

## হাওড়া কুষ্ঠ কুটার

সর্বাপেক্ষা নিত'রযোগ্য। আপনি আপনাত  
রোগালক্ষণ সহ পত্র লিখিয়া বিনামূল্যে  
বাবল্খা ও চিকিৎসাপুস্তক লউন।

—প্রতিষ্ঠাতা—

পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ

১নং হাফব ঘোষ লেন, বৃহদ, হাওড়া।

ফোন নং ৩৫১ হাওড়া।

বাংলা ০৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

(পূর্ববী সিনেমার নিকটে)

## চর্মকুষ্টি

ভিজল "আই-কিওর" (রৌজঃ) চর্মকুষ্টি এবং  
সর্বপ্রকার চর্মরোগের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ।  
যিনা অস্তে ঘরে বসিয়া নিরাময় সর্ব  
সুযোগ। গ্যারাণ্টী দিয়া আরোগ্য করা হয়।  
নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া পৃথিবীর সর্ব  
আদরণীয়। মূল্য প্রতি লিটা ৩ টাকা, মাশুল  
৫০ আনা।

কমলা ওয়ার্কস (দ) পাটপোতা, বেঙ্গল।



সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত  
'সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য' প্রণীত

## পুত্রোহিত-দর্পণ

বিশাল হিন্দুধর্মের ত্রিকার্মপন্থাত সম্বন্ধে  
বিরাট ও নিখুঁত প্রামাণ্য বাগলা পুস্তক  
মূল্য—কাপড়ে বধাই—১০ টাকা  
সাধারণ " ১ টাকা

প্রকাশকঃ শ্রীমদ্র, লাইব্রেরী,  
২০৪, কণ্ঠওয়ালীশ খাট, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থানঃ—সত্যনারায়ণ লাইব্রেরী,

৩২নং গোপীকৃষ্ণ পাল লেন।



খোস, একজিসা, হাডা, কোটা, মা  
সোড়া ঘা তালী ঘা, যুস্কুতি চুলকাণি,  
ও চুলকাণি যুক্ত সর্বপ্রকার চর্মরোগে  
অব্যর্থ

এবিয়ান বিসার্চ ওয়ার্কস  
সি. ১৩ চিত্তবর্তন এভিনিউ (নর্থ)  
কলিকাতা

## ফাউন্টেনপেন

"ফোন্টেন" (ইংলিশ) অটোফো—১৫।

"গোল্ডেন প্যাটিগ্'নাম"—৩/০

এস, এম, কোং, ৬৫এ-১, নিমতলা, কলিঃ।

(সি ১৩৫৭)

প্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত

## ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু

তৃতীয় সংস্করণ বর্ধিত আকারে বাহির হইল।

বাংলা হিন্দু এই চরম দর্শনে

প্রফুল্লকুমারের পথনির্দেশ

প্রত্যেক হিন্দুর অব্যর্থ পাঠ্য।

মূল্য—৩

—প্রকাশক—

শ্রীসুরেন্দ্রমজুমদার।

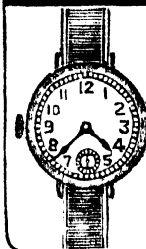
—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীগোরাঙ্গ প্রেস, কলিকাতা।

ও

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

## পুরস্কার



উচ্চ গুণীর হাত ঘড়ী  
চামড়ার মুটেকসু  
প্রভৃতি পুরস্কার  
দেওয়া হইবে।  
নিয়মাবলীর জন্য  
পত্র লিখুন  
এন.পি. হাউস  
(পোর্ট ব্ল্যান্ড: ১১৪৫৮)  
কলিকাতা

## কাশি ও সদ্দিব সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ঔষধ



পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহৃত হয়

## WANTED AGENTS

Throughout India to secure orders  
for our most beautiful and attractive  
calendars. Rs. 200/- can be easily  
earned monthly without investment  
or risk. Ask for our terms, literature  
and samples.

Oriental Calendar Mfg. Co.

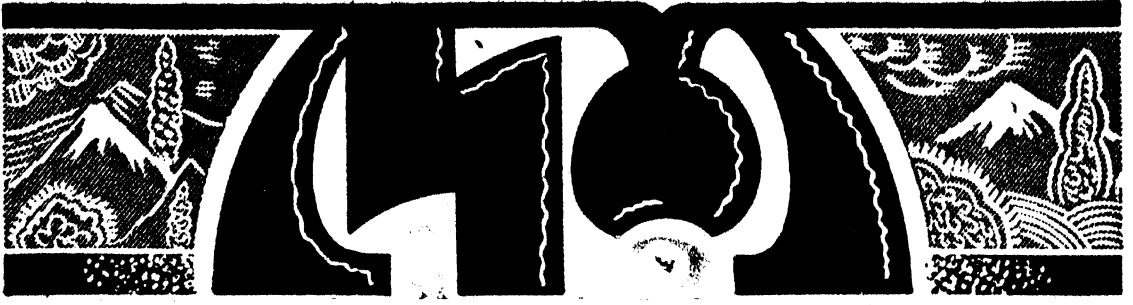
Sec. (23) Moti Jheel

Dum Dum (Bengal)

C.—1347

শ্রীরামপ্রাণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিত্তবর্তন দাল লেন, কলিকাতা, শ্রীগোরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক ও পরিচালকঃ—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্ধা খাট, কলিকাতা।



সম্পাদক : শ্রীবাংকমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ | শনিবার, ২৭শে আষাঢ়, ১৩৫৪ সাল।

Saturday, 12th July, 1947. | ৩৬শ সংখ্যা

### ব্রিটিশের ভারত ত্যাগ

গত ৪ঠা জুলাই পাল্লামেণ্টে ভারত স্বাধীনতা দিল উত্থাপিত হয়। এ সম্পর্কে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ক্লইয়া গয়াছেন। এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া মনে গিয়াছে যে, ২০শে জুলাইয়ের মধ্যে এই বল স্বাধীন হইবে। এই বিধান অনুসারে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারত এবং পাকিস্থান এই দুই রাষ্ট্রকে দুইটি ডোমিনিয়ন বা স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারলব্ধ দেশ বলিয়া স্বীকার করিয়া ইহেন এবং ১৫ই আগস্টের মধ্যে পূর্ণ শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তর করিবেন। ডোমিনিয়ন স্টেটস ৪৪ স্বায়ত্তশাসনাধিকার ঠিক স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীদের অনেকের মনে এজন্য এই ব্যবস্থায় কিছু অসন্তোষের কারণ থাকিয়া যাইবে। সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী একটি জুতায় ইহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, স্বাধীনতা কোন জাত অপর কোন জাতকে দান করিতে পারে না। সুতরাং ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারত যোগ করিবার সময় আমাদের আশা দিয়া গিয়াছে। এইরূপ স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িয়া দিয়া গাইবেন, এমন আশা একান্তই অব্যবহৃত। সুতরাং প্রকৃত পূর্ণ স্বাধীনতা ভারতবাসী নজদের উদ্যোগে এবং সাধনার বলে নিজেরাই প্রতিষ্ঠা করিবে। ডোমিনিয়ন ক্ষমতা পূর্ণ স্বাধীনতার পরিণতরূপ নহে, কিন্তু ডোমিনিয়ন ক্ষমতালভের সঙ্গে পূর্ণ স্বাধীনতার চুনা হইল। এতদ্বারা স্বাধীনতা লাভের পথে আমাদের যেসব বাধা-বিঘ্ন ছিল, সেগুলি সম্পূর্ণ করিবার ক্ষমতা আমাদের নিজেরই হইতে আসিল। সদর প্যাটেল এই দিক হইতে সদিন ভারত স্বাধীনতা বিলের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে অতঃপর ভারত ডোমিনিয়ন যে-কোনদিন ইচ্ছা করিলে ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারিবে। সে পথে

## সাময়িক প্রসঙ্গ

বাধাদানের আইনগত কোন আধিকার ব্রিটিশের থাকিবে না; সুতরাং ভারত স্বাধীনতা বিলে ভারতের সার্বভৌমত্ব সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং এতদিন পরে ব্রিটিশকে ভারত শাসনের কৃত্ত্ব পরিচায়ক করিয়া যে যাইতে হইল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথ একদিন ব্রিটিশের এই ভারত ত্যাগের অবশ্যম্ভাব্যতা উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভাগ্যচক্রের আবর্তনে একদা ব্রিটিশকে ভারত ত্যাগ করিতে হইবে; কিন্তু সেদিন ভারতকে তাহারা যে অবস্থায় রাখিয়া যাইবেন, তাহা তাহাদের পক্ষে গৌরবের বিষয় হইবে না। কবির নাথী সর্বাংশেই সত্য হইয়াছে। ব্রিটিশ ভারতবর্ষকে দুর্বল, অক্ষম এবং অনেক দুর্বল করিয়া রাখিয়াই আজ বিদায়ের পথ দেখিতেছে। অশ্বত্থ, ঐক্যবন্ধ, সংহত ভারতের আদর্শ আজ বিমলিন। বলা বাহুল্য, এজন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। তাহারা অতিশয় নিষ্ঠা এবং নীতি চাতুর্যের সঙ্গে দীর্ঘদিন ভারতে ভেদবাদকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। ভারত হইতে বিদায়ের কালে তাহারা নিজদের নীতিই কার্যে পরিণত করিয়া যাইতেছেন; বস্তুত ভারত বিভাগ ব্রিটিশের ভারত সম্পর্কিত নীতির অবশ্যম্ভাব্য পরিণতি। এজন্য তাহারা আজ মুখে যেসব আক্ষেপ করিতেছেন, সেগুলির কোন মূল্যই নাই। তাহারা ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছিলেন এবং আজ সেই আগুন অশান্তিক্রমে উদ্দীপিত করিয়াই ভারত হইতে বিদায় লইতেছেন। ব্রিটিশ এই বিধান অনুসারে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান নামে দুইটি স্বতন্ত্র ডোমিনিয়নের সৃষ্টি হইবে।

এ তারিখে পূর্ব বাঙলা ও পশ্চিম পাঞ্জাবের মধ্যে সীমা নির্ধারণ কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে এলাকা থাকিবে, তাহা পাকিস্থান এবং পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাঞ্জাব লইয়া যে দুইটি নতুন প্রদেশ হইবে, তাহা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে। বেলুচিস্থান ইহার মধ্যেই পাকিস্থানে যোগ-দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং গ্রীহট্ট পাকিস্থানে যোগ দিবে, কি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, গণভোটের ফলে তাহা নির্ধারিত হইবে। ব্রিটিশের পরিত্যক্ত ভারত এই ভাবে বিভক্ত এবং বিখণ্ডিত। বলা বাহুল্য, জাতীয়তাবাদী কোন ভারতবাসী এই অবস্থাকে সর্বভাষা স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। বস্তুত ব্রিটিশ চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতাকামী সংগ্রামের সংগ্রামের এখনও অবসান হয় নাই। পূর্ণ আদর্শে পৌঁছিতে তাহাদিগকে আরও বন্ধুর পথ অতিক্রম করিতে এবং এখনও কি পরিমাণ শোণিত বিসর্জন করিতে হইবে একমাত্র ভবিষ্যৎই তাহা বলিতে পারেন। তবে ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করিতেছে, সাম্রাজ্যবাদীদের কটনীতিপূর্ণ শোষণের জগদ্বল পাথর আমাদের বুক হইতে অপসৃত হইতেছে। কংগ্রেসের 'ভারত ত্যাগ কর' এই দাবী কার্যত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহাই স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর নিকট বড় কথা। আশায় বুক বাধিয়া আজ আমাদের অশ্বত্থ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ উন্মোচনে নবীন উদ্যমে অগ্রসর হইতে হইবে।

### স্বৈরাচারের সূচনা

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারত ত্যাগ করিবার পূর্বে তাহাদের ভেদনীতির কান্ডা পাকিস্থানওয়ালাদের হাতি এবং স্বৈরাচারের খুন্সী দেশীয়রাজ্যে প্রাণিত করিয়া যাইতেছে। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে

সামন্ত রাজ্যগুলির সম্পর্কে ব্রিটিশের ভারত জাগ সম্পর্কিত নীতি ইহার মধ্যেই অনেক সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে। ভারত স্বাধীনতা বিলের বিধান অনুসারে ব্রিটিশের ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখ হইতে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির উপর সন্ন্যাসের আর সার্বভৌম ক্ষমতা থাকিবে না এবং দেশীয় নৃপতিগণের সহিত ঐ তারিখ হইতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের এ পর্যন্ত যত চুক্তি ছিল সব বাতিল হইয়া যাইবে। সন্ন্যাসের সার্বভৌম ক্ষমতার অবসান ঘটিলে সেই ক্ষমতা পুনরায় দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের হাতে ফিরিয়া যাইবে, এমন কথা বিলে নাই; কিন্তু ভারতীয় স্বতন্ত্রাঙ্গ উত্তরাধিকার সূত্রে সে ক্ষমতার অধিকারী হইল এরূপ নির্দেশও তাহাতে নাই। দেশীয় নৃপতিদের মধ্যে কেহ কেহ এই বিশ্বাসের সুযোগ লইয়া ব্রিটিশ প্রভুর অপসারিত হইলে তাহারা ই স্বয়ংসিদ্ধ প্রভু হইয়া বসিবেন, এইরূপ মনে করিতেছেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণার ধ্বনি তুলিয়াছেন। গত ১৫ জুলাই গান্ধীজী এ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি ভারত স্বাধীনতা বিলের আলোচনা করিয়া বলেন, “দেশীয় রাজ্যের অবস্থা বিশেষ অসন্তোষজনক রহিয়াছে। এক্ষেত্রে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নীতিতে সাহসের অভাব দেখা গিয়াছে এবং এই ব্যাপারে ব্রিটিশের মানসম্মান বিপন্ন হইয়াছে। রাজস্বের অধিকার সমস্যা লইয়া যদি কোনরূপে বিপদ দেখা দেয়, তবে ব্রিটিশই সেজন্য দায়ী সাপেক্ষ হইবে; বিলে বিপজ্জনক অবস্থার কোন প্রতীকার বিহিত হয় নাই।” আমাদের মতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে দোষী। তাহারা এতদিন প্রত্যক্ষভাবে দেশীয় রাজস্বমতে ঐক্যচারকে প্রশ্রয় দিয়াছেন এবং জনমত দলনে রাজাদিগের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। কিন্তু আজ যেরকম দেশীয় করিয়াই আমরা নিশ্চুতি পাইব না। ব্রিটিশ প্রভুর ভারত হইতে অপসৃত হইবার পর দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পর্কিত সমস্যার সঙ্গে ভারতীয় স্বতন্ত্রাঙ্গের গভর্নমেন্টকে ভুক্তি হইতে হইবে এবং ঐ সব থানের জনগণের স্বাধীনতার কর্তব্যও ইহাদের উপরই আসিয়া পড়িবে। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যেমন ব্যবস্থায়ই করুন, কংগ্রেস এক্ষেত্রে তাহার চিরন্তন আদর্শ ক্ষয় করিবে না। কংগ্রেসের সুদীর্ঘ সাধনার বলে যাত্রত স্বাধীনতা লক্ষ্য ভারতের জন-তের কাছে স্বেচ্ছাচারী দেশীয় নৃপতিদিগকে তি স্বীকার করিতেই হইবে এবং অবস্থা নীকিয়া যদি তাহাদের স্বাধীনতার উদয় না হয়, যে নিজেদের পরিগণমর্দিতার জন্য গর্হাধিকারকেই বি-সৃত হইতে হইবে। ইহা নিশ্চিত যে, ভারত মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাচারিতা

আর চলিবে না এবং প্রজাদের মা-বাপগিরির দিন শেষ হইয়াছে।

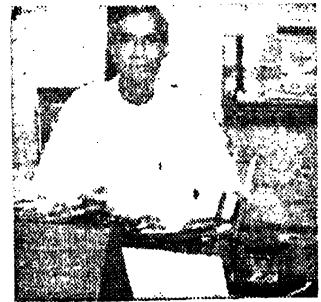
#### গলদ কোথায়

পুলিশ বিভাগে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি সূরাবদী মন্ত্রিমণ্ডলীর সবচেয়ে বড় অপরাধ। বস্তুতঃ মিঃ সূরাবদী সাম্প্রদায়িকতার দিক হইতে কলিকাতা শহরে পুলিশ নিয়োগের পর হইতেই শহরের অশান্তি সমাধিক জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। অশান্তি দমনের অজুহাতে পাজাব হইতে মুসলমান পুলিশ ফৌজ আমদানী করা হইয়াছিল, তাহারা কিভাবে শহরে শান্তিরক্ষায় সহায়তা করিতেছে, শহরের অবস্থা হইতেই তাহা সুস্পষ্ট। কলিকাতায় এই পাজাবী পুলিশের অবস্থানই আমাদের মতে শান্তিভঙ্গের অন্যতম প্রধান কারণ। এই পুলিশবাহিনী কলিকাতার রাজপথে আবিস্কৃত হইবার পর হইতেই গুন্ডার দল সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। সূরাবদী মন্ত্রিমণ্ডলের কৃপায় এই সাম্প্রদায়িকতার নীতি সকল দিকে সম্প্রসারিত হইয়াছে। কলিকাতার অশান্তি ও উপদ্রবের বিবরণ হইতে স্পষ্টই দেখা যায়, শহরের উত্তর ও মধ্য অঞ্চলে এই সব উপদ্রব বেশী সংখ্যায় ঘটিতেছে। কোন প্রণেয়ী গুন্ডারা এই সব দৌরাখা করিতেছে, ঘটনাগুলির ধারা দেখিলে তাহা বাকিতেও বেগ পাইতে হয় না। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পুলিশ যদি আন্তরিকতার সঙ্গে গুন্ডাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিত, তবে বহুদিন আগেই এই সব অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইত। কিন্তু তাহা হইতেছে না; কারণ কি? কলিকাতার উত্তর এবং মধ্য এই দুইটি বিভাগের কর্তৃকই সূরাবদী মন্ত্রিমণ্ডল সাম্প্রদায়িকতার জন্য কৃত্যত দুইজন মুসলমান অফিসারের উপর নাস্ত করিয়াছেন। সূরাবদী সাহেবের আস্থা-ভাজন দুইজন মুসলমান ডেপুটি কমিশনার আজ পর্যন্ত এই অঞ্চলগুলিতে শান্তি ফিরাইয়া আনিতে পারিলেন না এবং ইংহারা যে নীতিতে কাজ করিতেছেন, তাহাতে কোন-কালে ইংহারা শান্তি স্থাপন করিতে পারিবেন বলিয়াও মনে হয় না। ইংহাদের অক্ষমতার ফলে হিন্দু পল্লীগুলির শান্তিপ্রিয় জনসাধারণ অতিশয় হইয়া উঠিয়াছে। এই সব কর্মচারীর অযোগ্যতা একান্তভাবেই প্রতিপন্ন হইয়াছে, অথচ যেমন জিদের সঙ্গে হিন্দু অফিসার-দিগকে সরিয়া ইংহাদিগকে এই সব হিন্দু-প্রধান অঞ্চলের কর্তৃক নিযুক্ত করা হইয়াছিল, তেমনই জিদের সঙ্গেই যেন ইংহাদের অযোগ্যতা স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও ইংহাদিগকে নিবাস্ত নিলক্ষ্যভাবে কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাখা হইতেছে। পশ্চিম-বঙ্গের নতুন মন্ত্রিমণ্ডলের দৃষ্টি আমরা এই

দিকে আকৃষ্ট করিতেছি। কলিকাতায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে পুলিশ বিভাগ হইবে এই সাম্প্রদায়িকতা বোধকে তাহাদিগকে সর্বপ্রাণে নিশ্চয় করিতে হইবে। তাহারা যি যথাযথভাবে ইহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কলিকাতায় শান্তি স্থাপনে বিলম্ব ঘটিবে না। কলিকাতা সাধারণ নাগরিক এবং নিরীহ জনসাধারণ কেহই অশান্তি চাহে না। এমন কি, পাকি স্থানের দায়েও নহে, বস্তুতঃ দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সমস্যা সাম্প্রদায়িক সেক্ষিতভাবে অনেকটা উপশমিত করিয়া ফেলিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে একপ্রণেয়ী গুন্ডাই শান্তি প্রতিষ্ঠা বিষয় ঘটাইতেছে এবং পুলিশের পক্ষপাতিত্ব পূর্ণ দৃষ্টি এবং তত্ত্বানিত অযোগ্যতাই শান্তি পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে।

#### শান্তি প্রতিষ্ঠায় নতুন মন্ত্রিমণ্ডল

পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেসী দলের নেত নিবাসিত হইবার অব্যাহত পরেই উক্ত প্রফরচার মোঘ এক বেতার বক্তৃতায় শান্তি স্থাপনের জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন করেন। ইহার পর পশ্চিম বঙ্গে প্রধান



ডাঃ প্রফুল্ল মোঘ

মন্ত্রীরূপে তিনি সর্বপ্রথম হাওড়ার হিন্দু ও মুসলমানদের এক সম্মিলিত সভায় যে বক্তৃত করেন, তাহাতেও তিনি আন্তরিকভাবে সকলের নিকট সেই আবেদনই করিয়াছিলেন। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও কলিকাতার অবস্থার এতাদৃশকাল পর্যন্ত কোনরূপ উন্নতি ঘটে নাই বর উত্তরোত্তর অনর্থ বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং গুন্ডাদের দুঃসাহসের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে গত ৬ই জুলাই রাববার উত্তর কলিকাতা জেল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সম্বর্ধন সভায় অভিনন্দনের উত্তরে উত্তর ঘোষ শহরের অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন,—“যে অবস্থা কলিকাতায় চলিয়াছে, সে অবস্থার পরিবর্তন সাধিত না হইলে আমরা কোন কাজই করিতে পারিব না। আজ দশ মাস হইতে কলিকাতায় এই অবস্থা সমানে চলিয়াছে ইহা মধ্যে কিছু করিতে পারিব বলিয়া মনে হইতেছে না; তবে ১৫ই আগস্টের পর পূর্ণ

ক্ষমতা হাতে আসিলে কাজ করিতে পারিব, এই আশা করি। আজ কলিকাতার বাৎসাব্যঞ্জি অচল। বাড়ি হইতে বাহির হইয়া ঠিক সময়ে না ফিরিলে চিন্তা হয়, বাঁচিয়া আছি কি না; হয়ত থানায় খোঁজ লইতে যাইতে হয়। এই যে অবস্থা, ইহার মধ্যে জাঁতির কোন উন্নতি করা অসম্ভব। উত্তর ঘোষের এই উক্তিতে শহরবাসীদের অন্তরের ভাবই অভিব্যক্ত হইয়াছে। তিনি আমাদেরকে এই সংগে আশ্বাসের বাণীও শুনাইয়াছেন এবং জানাইয়াছেন যে, মন্ত্রণ গ্রহণ করিবার পর হইতেই পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডল কলিকাতা শহরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। উত্তর ঘোষ উত্তর কলিকাতার সভায় এই চেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, 'দুই একদিনের মধ্যেই অবস্থা ফিরানো সম্ভব নয়। বাহির হাতেই ক্ষমতা আসুক না কেন, যে জঞ্জাল জমিয়াছে, এত শীঘ্র তাহা পরিষ্কার করা যায় না।' উত্তর ঘোষের এই উক্তি যথেষ্টকতা আমরা সম্পূর্ণই উপলব্ধি করি। আমরা জানিতে পারিয়াছি, পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রণ গ্রহণ করিবার পর তিনি কলিকাতা এবং হাওড়ার সাম্প্রদায়িক অশান্তি সম্পর্কে বাঙলা গভর্নমেন্টের নীতির প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং বাঙলা সরকারের এতৎসম্পর্কিত বর্তমান নীতি সমর্থন করিতে পারেন নাই। এই অশান্তি দমন করিবার জন্য উত্তর ঘোষ তাহার মন্ত্রিমণ্ডলীর পক্ষ হইতে কতকগুলি প্রস্তাবও উপস্থিত করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায়। উত্তর ঘোষের এই সব প্রস্তাব সম্পর্কে সুরাবর্দী মন্ত্রিমণ্ডল, বিশেষভাবে গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ কর্তৃক মনোভাব অবলম্বন করিবেন, শহরবাসী সৈজনা আগ্রহান্বিত রহিয়াছে। গভর্নর নিজেই সেদিন বেতার বক্তৃতায় আমাদেরকে শুনাইয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলের দ্বারা নির্ধারিত নীতিই কলিকাতা অঞ্চলে বলবৎ হইবে। শহরের অশান্তি দমনে সুরাবর্দী মন্ত্রিমণ্ডলীর সাম্প্রদায়িক নীতির দোষা আমরা অনেক সহ্য করিয়াছি, গভর্নর অবিলম্বে সে সব বাতিল করিয়া দিয়া উত্তর ঘোষের প্রস্তাবসমূহ কার্যে পরিণত করুন ইহাই আমাদের দাবী। এক্ষেত্রে অন্যথাচরণের কোন অজুহাতই আমরা মানিয়া লইব না।

#### সহরে শান্তিরক্ষার প্রহসন

গত ২৫ জুলাই সোমবার কলিকাতা সহরের বৃকের উপর নরবাতী গাংড়াদের যে ডাঙব লীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে গত

বৎসরের আগস্ট মাসের রক্তাক্ত স্মৃতিতে অনেকেই শিহরিত হইয়া উঠিয়াছেন। ইহার পূর্ব দিবস মুচিপাড়া থানার একজন পুলিশ কর্মচারী গুলারী আঘাতে নিহত হন, তাহার শবদেহ লইয়া মিছিল সম্পর্কেই সহরে বিভীষিকার রাজত্ব বিস্তৃত হয়। বিশেষ সম্প্রদায়ের হাজার হাজার লোক এই মিছিলে যোগদান করে এবং উত্তেজিত অবস্থায় নৃশংস নরবাতী লীলা চালায়। কলিকাতার বহুসংখ্যক পুলিশ কর্মচারী এই মিছিলে ছিলেন এবং সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এই শব্যাগার মিছিলে যোগদান করে। ইহাদের উপস্থিতি সত্ত্বেও উদ্ভূত গাংড়ারা মিছিল হইতে ট্রামবাস আক্রমণ করিতে থাকে, বোমা ছুড়িয়া এবং ছুরি চালাইয়া অফিস হইতে গৃহে প্রত্যাগমনোদ্যত নির্দোষ পথচারীদের মধ্যে বহু লোককে খুন এবং জখম করে। পাকিস্তানি হইতে বহুবাজার পর্যন্ত এই দীর্ঘ পথের মধ্যে পুলিশ ইহাদিগকে সংহত করে নাই। দুর্বৃত্তেরা দোকান-পাট লুণ্ঠ করে এবং ইহারা কতকগুলি লোককে অপহরণ করিয়াও নিভুতে নিজেদের পৈশাচিত প্রবৃতি চিরিতার্থ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সহরের শান্তি রক্ষার জন্য সুরাবর্দী মন্ত্রিমণ্ডলের সজাগ দৃষ্টি থাকিলে এবং পুলিশ সৈজনা সচেষ্ট থাকিলে এই ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারে কি? বস্তুতঃ উক্ত মন্ত্রিমণ্ডলের কোন কথারই যে মূল্য নাই এবং সহরের শান্তিরক্ষার কার্য নিছক সাম্প্রদায়িক এই মন্ত্রিমণ্ডলের মূঢ়তা এবং অবিবেচনায় যে প্রহসনেই পরিণত হইয়াছে, সোমবারের অরাজক ডাঙবে, ইহা নিঃসংশয়িতভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। সহরে এখনও ১৪৪ ধারা প্রবর্তিত রহিয়াছে বলিয়া আমরা শ্মিত্তে পাই এবং তদনুযায়ী সভা বা মিছিল করা এখানে নিষিদ্ধ। ইহা সত্ত্বেও হাজার হাজার উচ্ছৃঙ্খল জনতার এইরূপ অভিযান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এইরূপ মিছিলের অনুমতি কাহারো দেয়? আমরা দোষীরাছি। কিছুদিন পূর্বেও অন্য একটি ক্ষেত্রে সহরে ১৪৪ ধারা জারী থাকা সত্ত্বেও দাংগা সম্পর্কে নিহত দুইজন পাঞ্জাবী মুসলমান পুলিশের শবদেহ লইয়া সাম্প্রদায়িক উদ্ভাসনায় আবিষ্ট জনগণকে মিছিল করিতে দেওয়া হইয়াছে। সহরের বর্তমান উপদ্রুত আবহাওয়ার মধ্যে এই ধরনের মিছিল করিতে দেওয়ার পরিণতি কি হইতে পারে, গত সোমবারে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। যদি বে-আইনীভাবে সোমবারের এই মিছিল বাহির হইয়া থাকে, তবে এই মিছিলে

যেসব পুলিশ কর্মচারী যোগ দিয়াছিলেন এবং মিছিল পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া ছিলেন, তাহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে, আমরা ইহা জানিতে চাই। আমরা জিজ্ঞাসা করি, সাম্প্রদায়িক অশান্তি মনোবৃত্তি তৃপ্ত করিবার দ্বারা শহরবাসীদের জীবন লইয়া সুরাবর্দী মন্ত্রিমণ্ডল এবং তাহাদের আগ্রহিত পুলিশদের এইরূপ নিষ্ঠুর এবং নির্মম খেলা আর কতদিন চলিবে? যদি বাঙলা দেশকে বাঁচাইতে হয়, তবে যেমন করিয়াই হোক এমন অরাজকতার মূলচ্ছেদ করিতে হইবে এবং যদি সহরের পুলিশ ব্যবস্থা সাম্প্রদায়িক সুরাবর্দী মন্ত্রিমণ্ডলের আওতায় পড়িয়া সংশোধনের সতাই অযোগ্য হইয়া থাকে, তবে পশ্চিম বঙ্গ মন্ত্রিমণ্ডলীর দ্বারা সে বিভাগ সংস্কৃত না হওয়া পর্যন্ত সহরের শান্তিরক্ষার ভার সেনাদের হাতে দেওয়াই আমরা সমীচীন বলিয়াই মনে করি। পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী উত্তর প্রফুল্লচন্দ্র বোষ অনন্যমনা হইয়া সহরের শান্তি প্রতিষ্ঠার কার্যে আত্মনিয়োগ করিবেন; তিনি আমাদেরকে এই আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। আমরা আশা করি, সহরের শান্তিরক্ষার ব্যাপারে সুরাবর্দী মন্ত্রিমণ্ডলের সকল রকম কর্তৃত্বের যাহাতে অবিলম্বে নিঃশেষে অবসান ঘটে তিনি দৃঢ়তার সংগে তেমন ব্যবস্থা করিবেন। বস্তুতঃ লীগ মন্ত্রিমণ্ডলের গাংড়া পৈষিণ করিবার নীতির অবসান না ঘটিলে জাঁতির নিস্তার নাই। বাঙলার রাজধানী আজকাল বর্বারের লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে, ইহাদের দৌরাঘো বাঙলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির শেষ চিহ্ন। পর্যন্ত বিলুপ্ত হইবে।

#### বঙ্গের সীমানির্ধারণ

গত ১৫ জুলাই বুধবার হইতে সীমানির্ধারণ কমিশনের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। আমরা কিছুদিন হইতেই দেখিতেছি, মুসলিম লীগ এই সীমানির্ধারণ ব্যাপারে তাহাদের চিরাচরিত নীতি অনুযায়ী নানারূপে উল্টট এবং উল্টট দাবী উপস্থাপিত করিতেছে, শুধু তাহাই নহে, তাহাদের নির্দেশ যাহাতে বজায় থাকে, সেজন্য গাংড়ামির হুমকি দেখাইতেছে। চারজন ভারতীয় বিচারপতি লইয়া সীমানা কমিশন গঠিত হইয়াছে আমাদের বিশ্বাস আছে তাহারা লীগ ওয়ালাদের এইসব দাবীর অর্থাত্তিক সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তের পথ হইতে বিচলিত হইবেন না।



সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু সত্য  
কতিপয় সাক্ষ্য  
পতিমহেশ্বর মন্দির।



প্রাচীন শপথ গ্রন্থ  
কর্তৃক নতুন মন্দির  
সমসংগত।



পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ শপথ গ্রহণ করিতেছেন।



সেক্রেটারিয়েটে ভবনে পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রিবর্গ।



## বুকার টি ওয়াশিংটন

পৃথিবীতে সাদা চামড়ার কাছ থেকে কালো চামড়া বেশী সম্মান লাভ করেনি; যে করেজন পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমই নাম করতে হয় বুকার টি ওয়াশিংটনের। বুকার টি ওয়াশিংটনের জন্মস্থানটিতে তাঁর স্মৃতিস্মারক করবার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার এমন এক অভাবনীয় ব্যবস্থা করেছেন, যা বোধ হয় কোনো সাদা চামড়ার জন্যই করা হয়নি। মার্কিন যুক্তরাজ্য এক নতুন অর্থডলরের মুদ্রা বাজারে চালু করেছেন এবং এই মুদ্রা চালু করবার জন্য এক বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে হয়েছিল। মুদ্রাটির পরিকল্পনা করেছেন একজন নিগ্রো ভাস্কর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রণালয় তিনিই প্রথম নিগ্রো-পরিকল্পনাকারী; তাঁর নাম আইজ্যাক স্কট হ্যাথওয়ে। মন্ত্রণালয় একদিকে আছে বুকারের প্রতিমূর্তি এবং লেখা আছে “বুকার টি ওয়াশিংটন জন্মস্থান স্মৃতি-গ্রাফিক্যাল কার্টিউ জার্জিনিয়া—ভগবানে আমাদের বিশ্বাস আছে



বুকার টি ওয়াশিংটন

—স্বাধীনতা।” অপর পিঠে একটি কাঠের ও একটি মন্দিরের মাকে লেখা আছে “কীতনদের কুটীর থেকে যশের মন্দিরে। এই মুদ্রা অর্থ-ডল্লার অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যে বিক্রয় করা হবে এবং এই অতিবিক্রম অর্থ বুকার টি ওয়াশিংটনের জন্মস্থান সেই কুটীরটির জায়গায় নিগ্রো ছেলেরের জন্য একটি শিল্প বিদ্যালয় নির্মাণ কার্যে ব্যয়িত হবে।

বুকার টি ওয়াশিংটনকে বলা হয় নিগ্রো জাতির কর্মবীর। স্বেচ্ছক ইনস্টিটিউট তাঁর এক বিরাট কীর্তি যে নিগ্রোরা আজো



অবহেলিত হতো, যারা ছিল মূর্খ, যারা মনুষ্য নামক জীব বলে পরিগণিত হতো না, তাদের মানুষ্যের মতো বাচতে শেখাতে বুকার টি ওয়াশিংটন আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। মাত্র চল্লিশটি নিগ্রো বালক নিয়ে তিনি ট্যাসেকজি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন, আজ সেখানে ৩,৫৫০ একর জমির ওপর ১৩৩টি অট্টালিকা, যেখানে নিগ্রো ছেলেরা ৩৮ রকম বাবসা শিখতে পারে।

একজন কৃষকায়ের সম্মান প্রাপ্ত আমদের আনন্দের কারণই হয়।

### ইনসাইড ইউ এস এ

একদিকে যখন মার্কিন সরকার একজন নিগ্রোকে সম্মানিত করছেন, অপর দিকের একটি সংবাদ তখন কৌতূহলের উদ্রেক করে। ইনসাইড ইউরোপ, ইনসাইড এশিয়া ও ইনসাইড ল্যাটিন আমেরিকা গ্রন্থের প্রণেতা জন গান্থার আর একখানি ইনসাইড গ্রন্থ লিখেছেন, যার নাম ইনসাইড ইউ এস এ। মার্কিন মন্ত্রকে নিগ্রোদের সম্বন্ধে তিনি লিখছেন, আমেরিকার তেরো লক্ষ নিগ্রোর মধ্যে ছয় লক্ষ নিগ্রোর দেহে শ্বেতাঙ্গের রক্ত আছে এবং এজন্য দক্ষিণ অঞ্চলের মার্কিনদের নিগ্রো রক্ষণ



### বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

প্রীতিই দায়ী। আটলাণ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপকেরা কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যাপকদের সঙ্গে যথেষ্ট পার্থক্য রক্ষা করেন। হোটোলে কৃষ্ণাঙ্গদের নিকট লিফ্ট ব্যবহার করতে হয়। জর্জিয়ায় একজন শাসনকর্তা যখন ডক্টর বেজামিন মেজ নামক একজন বিখ্যাত অধ্যাপককে পায় লিখেছিলেন, তখন তাঁকে

কেবলমাত্র ‘বেজামিন’ বলে সম্বোধন করে-ছিলেন। ‘ডক্টর’ অথবা ‘মিস্টার’ বলে সম্বোধন করার শিষ্টাচারটুকু নিষ্প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল। মিসিসিপিসি বেসে নিগ্রোদের ক’ পদী দিয়ে আলাদা করে রাখা হয়। গত ২৬ বৎসরের মধ্যে ২,৫২২ জন নিগ্রোকে ‘লিগ’ করে মারা হয়েছে। লিগ করার কারণ যে, শ্বেতাঙ্গিনীর ওপর অত্যাচার, গান্ধার এই প্রচলিত বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেননি।

### ভারতের কন্যা

‘নেবেল’ বিজয়িনী গুড আর্থের লেখিকা পল্লী বাক ইউনাইটেড নেশানস্ ওয়াশিংটন নামক পত্রিকায় বিজয়লক্ষ্মীর উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। বিজয়লক্ষ্মী যখন সার্মালিত রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনে নিউইয়র্কে বাস করছিলেন সেই সময় পল্লী বাক তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। তিনি বিজয়লক্ষ্মীকে অনেকবার তাঁর নিজের পল্লীভবনে নিয়ে গিয়ে-ছিলেন, আবার নিউইয়র্কে বিজয়লক্ষ্মীর বাস-ভবনে এসেও তিনি সাক্ষাৎ করেছেন। বিজয়লক্ষ্মীর সঙ্গে যে সমস্ত কথাবার্তা হয়ে-ছিল, সে সমস্ত পল্লী বাক একখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। এই প্রকার আরও কয়েকটি পুস্তক পল্লী বাক লিখেছেন। যেমন জেমস্ হুয়েনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে চীনের বিষয় ‘টেঙ্গ দি পিপল’ নামে একখানি বই লিখেছেন, মাশা স্কটের সঙ্গে কথাবার্তার ফলে প্রকাশিত হয়েছে ‘টব্ অ্যালাউট পাশিয়া’, অর্থাৎ ফন পুস্কাও এর সঙ্গে নাংসী জার্মানীর অভ্যুত্থানের বিষয় যে কথাবার্তা চলোঁছিল, তার ফলে প্রকাশিত হয়েছে ‘টব্ ইউ ইয়োপেনস্’। এই প্রবন্ধে আরও প্রকাশ পেয়েছে যে, বিজয়-লক্ষ্মী একখানি আত্মজীবনী লিখছেন।

এই প্রবন্ধে পল্লী বাক বিজয়লক্ষ্মী সম্বন্ধে একটি অজানিত ঘটনা প্রকাশিত করেছেন। পল্লী বাক লিখছেন :

ভারতীয় উপকণ্ঠ আছে, যার কোনো সর্প দাম্ভিত অথবা উপবিষ্ট ব্যক্তির মস্তকে ফণা ধারণ করে, তাহলে জানতে হবে যে এই ঘটনা সেই ব্যক্তির শব্দ সূচনা করছে। মাদাম পণ্ডিত আমাকে বলেছেন যে, একদিন আমি বাগানে ঘাসের ওপর শুয়ে বই পড়ছি, বাবাও কাছেই একটি আরাম কেরসরায় বসে পড়ছেন। সহসা আমি শব্দলব্ধ তিনি শক্তিক কণ্ঠে আমাকে নড়তে নিবেদন করছেন। আমি একটা বিপদ অনুভব করলাম এবং ইচ্ছা সত্ত্বেও নড়তে পারলাম না। প্রায় এক মিনিট পরে দেখলাম একটি বিষমর গোখরো সাপ আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। বাবার কাছে শব্দলব্ধ, সাপটি নাকি আমার মাথার ওপর ফণা ধরেছিল। যদিও আমি খুবই ভয় পেয়েছিলুম, তবুও মনে মনে খুবই পুলকিত হয়েছিলুম, জবাবী বড় একটা কিছুর আভাস পেয়ে।

# যাত্রিদল

## শ্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ

একবিংশ অধ্যায়

আরও কয়েকটি বৎসর অতীত হইয়া গেল।

ইহার মধ্যে নানা অবস্থায় নানা আবেশটনীর মধ্যে আসিতের দিন কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে দেশে নানাস্থানে রাজনৈতিক ডাকাতি এবং কয়েকজন দেশী ও ইউরোপীয় সরকারী কর্মচারী এই বিপ্লব সমিতির হাতে নিহত হইয়াছে। এই কয়টা বৎসরে গভর্ণমেণ্ট, পুলিশ এবং গোয়েন্দা পুলিশ দলকে অতিরিক্ত শক্তিশালী করিয়াছেন। কয়েকটি স্থানে আততায়ী স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে—যাহারা পলাইয়া গিয়াছে—তাহাদেরও কেহ কেহ ধরা পড়িয়া নানা নিগ্রহ ভোগের পর বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইয়াছে—। ইতিমধ্যে ৩৮৪ জনের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে, ৮১০ জনের দ্বীপান্তর হইয়াছে। যুগবানী পত্রিকার উপরেও তীব্র রাজসরোব পড়িয়া বাধা হইয়া উহার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে।

১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাস। ইতিপূর্বে ইউরোপে মহাযুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ সরকার এই যুদ্ধে বিশেষভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। নানা কারণে বর্তমানে ইহাদের সমিতির সম্মুখে নানা গুরুতর সমস্যা আসিয়া পড়িয়াছে। তাই আজ ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের ২১১ জন করিয়া বিপ্লবী নেতা কলিকাতায় আসিয়া সম্মেলনের পরে মধুকরের সেই বাগান বাড়িতে সমবেত হইয়াছেন। অত্যন্ত সঙ্গোপনে এই সভার আরোজন করা হইয়াছে। যাহারা যাহারা এই সভায় আসিয়া যোগদান করিয়াছেন—তাহারা অধিকাংশই পুলিশের সন্দেহভাজন ব্যক্তি। মধুকর পূর্বে হইতেই যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। গেটের কাছে দুইজন দুইটি রিভলবার লইয়া এবং প্রাচীরের উপরে গাছের অশ্বত্থাল লকাইয়া দুইজন রাইফেল ধরিয়া পাহারা দিতেছিলেন। কোন-প্রকার অতর্কিত আক্রমণ হইলে এই চারিজন প্রাণ দিয়া শত্রুকে ঠেকাইবেন এবং সেই অবসরে ভিতরের সভাগণ অন্য পথে পলাইয়া যাইবেন, সে ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছিল। ঘরের ভিতরে একটি ক্ষীণালোকের সম্মুখে সতর্কভাবে উপরে পনর জন লোক চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। পাহারা হইতে আসিয়াছেন কতক, সিং, মহারাষ্ট্রের চিমায়ার, বোম্বের মিঃ যোশী,

মাদ্রাজের মিঃ জিনজাইয়া ও রামন নায়ার, যুক্ত প্রদেশের অতীন্দ্র মুখার্জি, বিহারের রজেন্দ্র শত্ৰুঘল এবং বাঙলার নলিনাক্ষ সেন, মধুকর ও অসিত, কিন্তু ইহারা যেন উৎকণ্ঠিত হইয়া কাহার আগমন প্রতীক্ষায় চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। অসিতের আজ কৌতূহলের অন্ত ছিল না—এই কয়টি বৎসর ধরিয়া এই সমিতির সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকিলেও কখনও এমন করিয়া ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের বিপ্লবী নেতাদের সহিত পরিচিত হইবার তাহার কোন-দিন সৌভাগ্য হয় নাই। বিশেষত যিনি সমস্ত সমিতির কণ্ঠধার যাহার নির্দেশ অবিচলিত চিহ্ন সমস্ত প্রদেশের প্রত্যেক বিপ্লবী নেতাই অসমত মস্তকে প্রতিপালন করেন, সেই মিঃ মুখার্জির আজ এই সভায় যোগদানের কথা। তাহার প্রতীক্ষাই ইহারা করিতেছিলেন। তিনি বাঙালী হইলেও একটা দিনের জন্যও অসিত তাহাকে দর্শন করিতে পারে নাই। ইহার সম্মুখে সে কত না গুরুত্ব শুনিয়াছে। অশ্রুত তাহার সাহস—অশ্রুত তাহার রিভলবার আর রাইফেলের হাত, পৃথিবীতে এমন কোন ভয়ঙ্কর বিপদের নামই নাকি আজ পর্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় নাই। যাহা তাহার মনে এক মূহুর্তের জন্য সিব্ধা বা সঙ্কেচ আনিতে পারে। এক নিমিষের মধ্যে তাহার কতব্য ঠিক হয়—আজ পর্যন্ত কোন কার্য তিনি বিফলকাম হন নাই। মানুষ চিনিলার ক্ষমতা তাঁর অসীম—যে কোন লোকের মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার সারা অন্তরের কথা এক নিমিষে বুঝিয়া লইতে পারেন।

গভর্নমেন্টের খাতায় তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের পর অভিযোগ জমিয়া আছে—একবার ধরিতে পারিলেই হয় দ্বীপান্তর বা ফাঁসী তাহার একেবারে নিশ্চিত হইয়া আছে। সরকার হইতে বারে বারে ঘোষণা করিয়া দেওয়া আছে যে এই লোকটিকে জীবন্ত বা মৃত ধরিয়া দিতে পারিলে তাহাকে পচি হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে—কিন্তু তবুও এই অশ্রুত মানুষটি দিনের পর দিন ভারতের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়া নগরে গ্রামে সমিতির শাখা প্রশাখার প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। তাহাকে গ্রেপ্তার তো দূরের কথা কেহ তাঁর টিকিটিও আজ পর্যন্ত দর্শন করিতে পারে নাই। অসিত আজ সর্বক্ষণ ধরিয়া শুধু তাহারই কথা ভাবিয়া

যাইতেছিল। রাতি বৃত্ত বাড়িতে লাগিল ঘরের লোকগলিও ততই বিচ্ছিন্ন হইয়া উঠিলে লাগিল। তিনি যে কোথা হইতে আসিবেন—সে বোম্বাই কি মাদ্রাজ পাহাৰ কি আসাম তাহা কেহই জানিতেন না। রেল গাড়িতে চড়িয়া কি হাঁটিয়া আসিবেন তাহাও অজ্ঞাত। শুধু যে আশা রাতি ১০টার মধ্যে তমসিয়া পৌঁছিবেন—এইটাই জানা ছিল এবং আজকার এই সভাও তাহারই নির্দেশেই স্থির করা হইয়াছিল। এমন সময় সম্মুখের রাস্তাটি দিয়া একজন মুস্কিল আসানের ফকির চেরাগদানী হাতে জ্বালাইয়া কি সব ছড়া কাটিতে কটিতে আগাইয়া আসিয়া একেবারে বাগান বাড়ির গেটের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। যে দুইজন গেটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল তাহারা কাপড়ের নিচে শস্ত করিয়া রিভলবার চাপিয়া ধরিয়া সম্মুখে আসিয়া বাধা দিয়া দাঁড়াইল। ইঠাৎ ফকিরের মুখে একটি হাসি খেলিয়া গেল এবং মধুকর দিয়া কি একটা সাস্থ্যকর শব্দ বাহির হইতেই যত্নে দুইজন মাথা নত করিয়া শ্রদ্ধা জান ইয়া সরিয়া গেল। ফকির সাহেব সোজা বাগান বাড়ির ভিতরের ঘরটিতে ঢুকিয়া একপাশে তাহার প্রদীপটি নামাইয়া নিভাইয়া রাখিয়া হাসিমুখে পুনরায় সেই সাস্থ্যকর শব্দ উচ্চারণ করিতেই ঘরের সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া শ্রদ্ধা জান ইলেন। মধুকর আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—কখন এলেন! ততক্ষণ ফকিরের বেশের ভিতর হইতে যে লোকটি বাহির হইয়া আসিলেন অসিত নিম্নিমেষ নেত্র তাহারই দিকে তাকাইয়া রহিল। ইনিই মিঃ মুখার্জি। তাহাদের সমিতির সর্বময় কর্তা!

মিঃ মুখার্জি হাসিয়া বলিলেন—এই তো আসছি, মধুকর। তোমরা সব ভাল তো?

তারপর সমবেত সভাদের দিকে একবার চক্ষু বুলাইয়া লইয়া হাসিয়া বলিলেন—এই যে আপনরা সকলেই এসেছেন দেখছি—বলিয়া তিনি তাহার জন্য নির্দিষ্ট ভরসে বসিলেন।

মহারাষ্ট্রের মিঃ চিমায়ার বলিলেন—মিঃ শান্তনাম আসতে পারেননি। তাঁর খুব শস্ত অসুখ—জীবনের আশা নাই।

মিঃ মুখার্জি হাসিয়া বলিলেন—আপনি বোধ হয় এক সন্ত হু আগের খবর বলছেন—অমনি পরশু তাঁকে দেখে এসেছি, আর কোন ভয় নেই, ক্রাইসিস কেটে গেছে।

অসিত অধিক হইয়া গেল—এই ক্ষুদ্রকার ব্যক্তির সমস্ত দলের উপরে কি না প্রভাব! গভর্নমেন্ট ইহাকে ধরবার জন্য এত ব্যস্ত! কিন্তু তাহার দুই চক্ষুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অসিত যেন বিহবল হইয়া গেল—এত তীব্র দৃষ্টি, এত জ্যোতিতে ঝলঝল করা চোখ তো সে কখনও দেখে নাই—যে যেন একজোড়া টর্লাইট।

ভারপর রাতির বহুক্ষণ ধরিয়া নানা আলো-  
লাস পর স্থির হইল—বর্তমান ইউরোপের এই  
মুখে ইংরাজ সরকার বিশেষ করিয়া জড়িত  
হইয়া পড়িয়াছেন—সুতরাং এই সুবর্ণ সুযোগে  
ভারতবর্ষময় বিদ্রোহ করিতে হইবে।

মাস ছয়েক পরে একটি দিন স্থির হইল—  
এ দিনে যুগপৎ ভারতের সর্বত্র—সমস্ত গভর্ণ-  
মেন্ট প্রতিষ্ঠান দখল করিতে হইবে। সৈন্যদের  
ভিতরে বিদ্রোহ করিতে হইবে—রেল ও  
স্ট্রীমারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে  
হইবে ইত্যাদি। সভার পরে সেই রঙেই প্রত্যেক  
নিজ নিজ প্রদেশে রওনা হইয়া গেলেন। ইহার  
পরের দিন কোন একটি নিরালা বাড়ির এক  
কক্ষে বসিয়া কয়েকজন পরামর্শ করিতেছিলেন।  
মিঃ মুখার্জি, মধুকর, নলিনাক্ষ, অতীন ও  
কর্মসত এই পাঁচজন ছিলেন উপস্থিত।

মিঃ মুখার্জি মধুকরের দিকে ফিরিয়া  
বলিলেন—তোমার সাতা মানুষ চিন্তার ক্ষমতা  
আছে মধুকর।

পরে অসিতের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—  
দেখ ভাই অসি—মধুকরকে যেন কোনদিন  
অপ্রস্তুত করে দিও না। তুমি সংসারী মানুষ,  
আমাদের দলে যারা তাদের সাধারণত সংসারী  
হওয়া আমরা পছন্দ করি না। স্ট্রী-পুত্রের ময়া  
মানুষকে অনবরত পিছনে টানতে থাকে—তুমিই  
আমাদের একমাত্র বাস্তবিক, এ ময়া কিন্তু  
তোমাকে কাটাতে হবে ভাই। অসিত তাহার  
সমীকটে বসিয়াছিল—সে কোন কথার জবাব না  
দিয়া মিঃ মুখার্জির পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া  
লইল।

আজ একটা গুরুতর বিষয়ের আলোচনা  
ছিল। কয়েক দিন পরে কলিকাতা হইতে কিছু  
দূরের একটি বন্দর হইতে কিছু বন্দুক রাইফেল,  
পিস্তল ও গুলি গোলা কয়েকখানি গরুর  
গাড়ীতে বোঝাই হইয়া নৈন্য পাহারায়  
কলিকাতার দিকে আসিবে জানিতে পারা  
গিয়াছে। সেইগুলি পথিমধ্যে হইতে চিনাইয়া  
আনিতে হইবে। অত্যন্ত শক্ত কাজ। অন্তত  
১০১২ জন খুব ভালভাবে প্রস্তুত হইয়া এই  
কাজে নামিতে হইবে। কাহকে এই কাজে অধি-  
নায়ক করা হইবে? কে সমস্ত বাধা অস্বীকার  
করিয়া জীবনের সমস্ত আশা পরিত্যাগ করিয়া  
ঐশ্য না হারাওয়া এই কাজ সম্পন্ন করিতে  
পারিবে? অনেক আলোচনার পর অবশেষে  
স্থির হইল মধুকর স্বয়ং অসিত ও আরো দশ-  
জন সংগীত এই কাজে অবতীর্ণ হইবেন।  
মধুকরের সহিত অসিতও হাসিমুখে এই ভার  
গ্রহণ করিয়া বসায় ফিরিয়া আসিল।

#### স্বাধীন অধ্যায়

ইহারই দিন পনের পরে একদিন রাত্রিবেলা  
অসিত তাহার মৃণালিনীর বাসায় গিয়া  
উপস্থিত হইল। বাড়ির ভিতরে ঢুকিতেই  
মৃণালিনীর স্তম্ভিত দেখা হইয়া গেল।  
মৃণালিনী যেন ইহারই অপেক্ষা করিতেছিলেন

এমনিভাবে অসিতকে নিজের ঘরে টানিয়া  
লইয়া গিয়া বিছানায় বসাইয়া প্রশ্ন করিলেন—  
তোমাদের খবর কি অসি?

অসিত কোন জবাব না দিয়া বিহবলের মত  
শব্দে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।  
মৃণালিনী দর্শিলেন অসিতের মুখ যেন  
একেবারে ছাইয়ের মতো সাদা হইয়া গিয়াছে—  
দুই চোখ গিয়াছে বসিয়া—মাথার বন্ধ চুল-  
গুলি এলোমেলো হইয়া উঠিয়াছে।

মৃণালিনী পুনরায় ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন  
করিলেন—কি হয়েছে, অসি? মোমাছি  
কোথায়?

তিনি ধরা পড়েছেন দিদি।

ধরা পড়েছেন?

—হাঁ।

মৃণালিনী সেইখানেই মাটির উপর  
কতক্ষণ বসিয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে  
বলিলেন—আমি সব জানি ভাই। মোমাছি  
কয়েকদিন আগে আমাকে সব বলে গিয়েছেন।  
কিন্তু এমন অঘটন কেমন করে ঘটলো অসি?  
সব খুলে বলা তো ভাই!

অসিত বলিতে লাগিল—আমরা হিলাম  
বারতুন। বিশ পাঁচশ জন দশস্র সৈন্য গরুর  
গাড়ী দুইখানা পাহারা দিয়ে চলছিল। গাড়ী  
দুইখানিতে বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল, গুলী-  
গোলা বোঝাই। আমরা পথের বাঁকে গা ঢাকা  
দিয়ে তাদের অপেক্ষা করছিলাম—অতর্কিতে  
তাদের অস্ত্রমগ্ন করলাম, প্রথমে আমরা তাদের  
পা লক্ষ্য করে গুলী ছাড়ি—তারাত্ত গুলী  
ছড়লো, আমাদের ভিতরে একজন আহত হয়ে  
পড়লো। মধুকরদা তখন আদেশ দিলেন পায়ে  
নয় বৃকে গুলী কর। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে  
জনদুই তাদের মাটিতে লুটিয়ে পড়লো বাকী  
সবাই প্রাণভয়ে পালাল। নিকটে গঙ্গার ঘাটে  
দুইখানা ছোট নৌকা বাধা ছিল। আমরা ৮১০  
জনে কিছু অস্ত্রশস্ত্র গুলীগোলা নিয়ে সেই  
নৌকায় চড়লাম। নৌকায় উঠে মধুকরদা বলে  
উঠলেন, অভয় কই? অভয় প্রথমেই আহত  
হয়েছিল—কিন্তু আঘাত তার হয়তো তেমন  
গুরুতর নয় এই ছিল আমাদের ধারণা। অন্য  
সবাইকে নৌকায় রেখে মধুকরদা তার আমি  
অভয়কে খুঁজতে গেলো। জোয়ান্মা রাতি  
কিছুদূর এসেই দেখি রাস্তার পাশে অভয়  
পড়ে আছে। ডান হাতের এক পাশ দিয়ে  
বৃকের দিক হতে তার অস্ত্র রক্ত করে  
পড়ছে। মধুকরদা কোন কথা না বলে অভয়কে  
কচি ছেলের মত কোলে তুল নিয়ে নৌকার  
দিকে দ্রুতপদে ছুটতে লাগলেন—আমি চললাম  
পাশে বিভ্রান্ত হাতে করে। তখন চাঁর পাশে  
সাড়া পড়ে গেছে। দূরের কুলীংসিতগুলিতে  
হৈ চৈ অরুম্ব হইছে। নৌকায় এসে দেখি  
গঙ্গার দুই পাশ লগ্নে আর নৌকায় ঘিরে  
ফেলবার উপক্রম করেছে। নৌকা আমরা ছেড়ে  
দিলো। অভয় কিন্তু মধুকরদার কোলের মধ্যেই

শেষ নিশ্বাস ফেলে একেবারে চূপ করে  
রইলো। গঙ্গার স্রোতে তাকে ধীরে ধীরে  
ভাসিয়ে দিয়ে তিনি আদেশ দিলেন, দাঁড় টান।  
একখানা নৌকায় সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করা  
হয়েছিল—আর একখানাতো ছিলো অমরা ও  
জন পিস্তল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে। আমরা বারদুই  
ফাঁকা আওয়াজ করলাম, কিন্তু কোনই ফল  
হলো না—লগ্নে নৌকায় আমাদের ঘিরে  
ফেলতে লাগলো—‘সার্চ লাইট’ ফেলতে  
লাগলো—পালাবার আর কোন পথই রইলো  
না। তখন তিনি বলে উঠলেন—আমার সঙ্গে  
মরতে রাজী অহ কে?—আমরা চারজনই  
অমরী আগ্রহে রাজী হলো, কিন্তু তিনি বেছে  
নিলেন অবিনাশকে—বাকী সবাইকে বন্ডেন  
তোমরা অন্য নৌকায় গিয়ে চারজোড়া দাঁড়  
টেনে পালাও—আমরা বহুক্ষণ পারি এদের  
হাটকে রাখবো। সবাই একে একে অন্য নৌকায়  
গিয়ে উঠলো—আমি তবুও দাঁড়িয়েই রইলাম।  
মধুকরদা বন্ডেন—যাও অসিত!

আমি বললাম—হাঁদ মরতেই হয় দাদা,  
অমিও আপনার সঙ্গেই দাঁড়িয়ে মরবো।  
তিনি ধমকে উঠে বন্ডেন—রাজে তর্ক করো না  
বলছি—শিগগির যাও। তবুও আমি দাঁড়িয়ে  
রইলাম—এবার তিনি আমার বৃকের উপরে  
রিভলভার ধরে বন্ডেন—সৈনিকের অবধ্যতার  
শাসিত কি জান? যাও বলছি—তোমাকে  
বাঁচতে হবে।

আর একটি কথাও না বলে অন্য নৌকায়  
উঠে গেলো। আমাদের নৌকা তীরবেগে  
কলকাতার দিকে ছুটে চললো।

নিজেরদের চেখে তো কিছুই দেখি নি  
দিদি—বহুতে যেতে অনেকবার রিভলভারের  
শব্দ শুনেছি—অনেক চেঁচামেচি শুনেছি।  
অবশেষে আমরা নিরাপদে সংস্কৃত স্থানে  
পৌঁছলাম। অস্ত্রশস্ত্রগুলো নিরাপদ স্থানে  
এনে রাখলাম। আজ দিনের বেলায় শব্দ এই  
খবরটুকু জানতে পেরে বুঝি যে হয়তো  
নৌকা তাদের বন্দকের গুলী লেগে ডুবে  
গিয়েছিল। চার পাশ থেকে নৌকা আর লগ্ন-  
গুলো বিশেষ করে ঘিরে না ফেললে কখনও  
তাকে ধরতে পারতো না। ধরা পড়েছেন একা  
তিনি, অবিনাশের কি হলো কিছুই জনা যায়  
নি।—হয়তো লগ্ন থেকে তাদের লক্ষ্য করে যে  
গুলী ছড়েছিল তারই আঘাতে সে মারা  
গেছে—নদীতে ভেসে গেছে তার দেহ। তার  
তো কিছু জানিনে দিদি! এতক্ষণ অসিত  
মৃণালিনীর দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইল  
তাহার সারা দেহখানি যেন একেবারে পাথর  
হইয়া গিয়াছে—মুখে একটা কথা নাই—দুই  
চোখের পাতা স্থির, নিশ্বাস বহিতেছে কি  
বহিতেছে না। অসিতের কোন কথা যে তাহার  
কানে গিয়াছে, কোন কথা যে যায় নাই  
তাহা কে বলিবে?

অসিত ডাকিল—দিদি!

সহসা যেন চমক ভাঙিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—কি অসি?

—দুঃখ করে তো কোন লাভ নেই দিদি। যার জন্যে এই দুঃখ তাকে তো আমাদের অসহ্য দশজনের মতো বিচার করা যায় না। যখন আমি নৌকায় তাঁর কাছ থেকে কিহুতেই চলে আসতে চাইনি—তখন সেই জ্যোৎস্নালোকে দেখতে পেলাম তাঁর দুই চোখ উঠেছে জ্বলে—মুখের ভাব হয়েছে কি ভীষণ কঠোর—সেই দিকে তাকিয়ে যেন মনে হলো এ লোকটার কাছে এক সংসারে কত বাই বুঝি একমাত্র সার বস্তু—দয়া, মায়া, স্নেহ, ভালবাসা সব তাঁর উপলক্ষ মাত্র। সে দেয়ও যেমন, মেপে নেয়ও তেমন। মৃণালিনী হঠাৎ স্বর স্বর করিয়া কাদিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন—না, না এ তোমার ভুল ভাসি! তুমি আঘাত পেয়েছ ভাই—তাকে রক্ষা করতে পার নাই, তাই অমনি ভুল করে ভাবছো। নইলে সত্যি করে যদি ভাবতে—দেখতে পেতে—তাঁর সারা অন্তর যে স্নেহ, ভালবাসায় একেবারে ভরপুর। সে কতটুকু নিতে পারে জানিনে ভাই—কিন্তু দিতে যে পরে ওস্তাদ তাঁর সাক্ষীর তো অভাব নেই অসি! পাশের ঘর হইতে মাঝে মাঝে একটা অব্যক্ত বেদনার শব্দ ভাসিয়া আসিতোছিল—অসিত এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই—এবার কানে যাইতেই বলিয়া উঠিল—ও কিসের শব্দ দিদি! মৃণালিনী মুখ তুলিয়া বলিলেন—আজ আমার বিপদের অন্ত নাই ভাই—দুইদিন হলো বাবার নিউকোনিয়া হয়েছে।—চলো তো যাই দিদি, দেখে তিনি কেমন আছেন? অসিত রাত্রি সামান্য কিছু খাবার করিয়া আসিয়া গাঙ্গুলী মশাইয়ের দোগশয্যার কাছে বসিল।

মৃণালিনী বলিলেন—তোমার মুখ চোখ শুকিয়ে গিয়েছে—অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছে, তুমি শ্রুতে যাও অসি। অসিত বিছানায় আসিয়া শুইল বটে, কিন্তু ঘুম তাহার চোখের সীমানা দিয়াও গেল না। শূইয়া শূইয়া আজ কত চিন্তাই না তাহার মাথার ভিতরে কিলবিল করিতে লাগিল। মৃণালিনীকে সব কথা সে এই কিছুক্ষণ আগে ভাগিয়া বলিয়াছে। কিন্তু তাহার নিজের দিক দিয়া কত কথা যে বলা হয় নাই—কে তাহা বুঝিবে? তাহার নিম্নলিখিত দুই চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল সেই দুইখানা গরুর গাড়ীর চারিপাশে সৈনিকের দল। মধুকর আদেশ দিলেন—পায়ে নয় বুক লক্ষ্য করে গুলী ছোড়। অসিতের ঠিক সামনে ছিল যে হতভাগ্য দাঁড়াইয়া অসিত তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই রিভলভার ছড়িল। মৃহুত মগ্নে লোকটি লাফাইয়া কয়েক হাত উপরে উঠিয়া একেবারে রাস্তার উপরে গড়াইয়া পড়িল। সে উত্তেজনার মৃহুত ফিরিয়া তাকাইবার সময় ছিল না—তবুও কয়েকবার সেইদিকে দৃষ্টি ফিরাইতেই দেখিতে পাইয়াছিল

তাহার বৃকের একটা পাশ হইতে ফিনিক দিয়া রক্তধারা ছটিয়া বাহির হইতেছে। লোকটি সঙ্গে সঙ্গেই মরিয়াছিল কি কিছুক্ষণ বাঁচিয়াছিল সে জানে না—মন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছিল কি বাকশক্তি একেবারে সঙ্গে সঙ্গেই রুদ্ধ হইয়াছিল দেখিবার সময় হয় নাই। সে বাঙালী কি পাঞ্জাবী, পেশোয়ারী কি গুর্খা তাহাও জানে না—কিছু জানিবার বা ভাবিবার মত মনের অবস্থা তখন তাহার ছিল না। কিন্তু নরহত্যা করিয়াছে সে, নিজ হাতে গুলী করিয়া একটা জ্যান্ত মানুষকে এক মৃহুতের মধ্যে এ পৃথিবীর সকল দেনা-পাওনা শোধ করিয়া দিয়াছে। নিজের বন্ধুবান্ধবের বশন হইতে আত্মীয়স্বজনের স্নেহভোর হইতে এক মৃহুত তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। হয়তো ঘরে তাহার আছে স্ত্রী—সে স্ত্রী হয়তো কল্যাণীর মতই—তাহাকে ভালবাসে—হয়তো—আছে অঙ্গুষ্ঠের মত পুত্র। হয়তো কোন প্রদেশের কোন অজানা গৃহে তাহারা তাহারই উপজন্মের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া আছে। হয়তো হয় মাস কি এক বৎসর পরে কোন একটা দিনে তাহারই দর্শন আশায় সেইদিনটি তাহারা বসিয়া বসিয়া গুহিতেছে কিন্তু তাহার স্ত্রীপুত্রের সকল আশা সকল ভরসা এমনি করিয়াই শেষ হইয়া গেল। অসিতের দুই চোখের কোণ বাহিয়া অশ্রু ধারা গড়াইয়া যাইতে লাগিল। কতক্ষণ পরে দুই হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া মনে মনে বিভিড়ি করিয়া বলিতে লাগিল—হত্যাকারী—নরহত্যা-কারী—সে! জীবনে তাহার প্রথম জীবহত্যা—প্রথম নরহত্যা! পাশের ঘর হইতে গাঙ্গুলী মশাইয়ের একটানা অব্যক্ত মন্ত্রণাধ্বনি ভাসিয়া আসিতোছিল—মাঝে মাঝে দেওয়ালে একটা টিকটিক টিকটিক করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল উঠানের একধারে একটা কিংকর পোকা অনবরত সূর ভাঁজিতেছে—ইহার প্রত্যেকটি শব্দ ভাসিয়া আসিয়া অসিতের হৃদয় আরো চাপিয়া ধরিতে লাগিল। সারারাত্রি এমনি ছটফট করিয়া শেষ রাত্রির দিকে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। যখন ঘুম ভাঙিল তখন অনেকখানি বেলা হইয়া গিয়াছে—বিছানার উপর উঠিয়া বসিতেই হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেলঃ—

“যঃ এনং বোঁত হস্তারং বস্টেনং

মনাতে হতম্।

উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং

হন্ত ন হনাতো ॥”

—তাইতো একথাটি তো আজ দুইদিনের মধ্যে সে একবারও ভাবিয়া দেখে নাই—কেউ তো কাহারও স্মার্য হত হয় না—কেউ তো কাহাকেও হত্যা করিতে পারে না। সে পুনরায় মনে মনে বলিতে লাগিল—

“ন জায়তে য়িততে বা কদাচি-

মায়ং ভুবা ভবিতা বা ন ভুয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরুষো ন হনাতো হনামানে শরীরে ॥”

—সত্যি তো আখ্যা চিরজীবী—শরীরের বিনাশে তো তাহার বিনাশ নাই? এতক্ষণে তাহার মনে প্রশান্তি নামিয়া আসিল। সেই বিছানায় বসিয়াই অনেকক্ষণ ধরিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিয়া শয্যাভ্যাগ করিল।

বাহিরে আসিয়া দেখে মৃণালিনী ঘরের বারান্দায় একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। পাশের ঘরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল গাঙ্গুলী মশাইয়ের কাছে চৌদ্দ পনের বৎসরের একটি ছেলে বসিয়া শূদ্র্য করিতেছে। মৃণালিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—ঘুম ভাঙল ভাই!

—হ্যাঁ দিদি, উনি কেমন আছেন!?

—ভাল নয় ভাই হয়তো এ যাত্রা আর ঠকে ফেরতে পারবে না?

—অসিত শিষ্যক হইয়া বলিল—কিন্তু ডাক্তারকে তো তাহলে এখনই একবার ডেকে পাঠান দরকার দিদি!

মৃণালিনী ঘরের ভিতরের ছেলোটিকে নির্দেশ করিয়া বলিলেন—অতুল তো এইমাত্র ডাক্তারের কাছ থেকে এলো—একটু বাদে তিনি আসবেন। অসিত হাত মুখ মুছিয়া গাঙ্গুলী মশাইয়ের নিকটে গিয়া বসিল।

ডাক্তার আসিলেন—রোগী দেখিলেন, কিন্তু তাহার কথাবার্তায় কোন ভরসার লক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। এমনি করিয়া আরো দিন-তিনেক ধরিয়া অবস্থা তাহার অত্যন্ত সঙ্কটের ভিতর দিয়া কাটিয়া অবশেষে চতুর্থ দিনে গাঙ্গুলী মশাইয়ের দিন শেষ হইয়া আসিল—শেষ বেলায় তিনি মারা গেলেন। পাড়ার একদল যুবক অত্যন্ত উৎসাহ করিয়া সমস্ত বাস্পা করিয়া সম্ভার পুর্বেই মৃতদেহ গঙ্গার ঘাটে লইয়া গেল। মৃণালিনী পিতার শেষ কাজ করিবার জন্য শ্মশানে গেলেন। অসিতের এমনি করিয়া বাহিরে যাওয়া উচিত নয়—মৃণালিনী সেইজনাই তাহাকে বাড়ি পাহারায় ছলনায় রাখিয়া গিয়াছেন। সম্ভার পুর্বেই ঘরের বারান্দায় একা একা চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া অসিতের হৃদয় যেন কিসে চাপিয়া ধরিতেছিল। সেদিনের ঘটনার পরে ছয়টা দিন চালায় গিয়াছে—ইহার ভিতরে আরো কত লোক সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার হইয়াছে—কতজনকে পলিশ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—সে তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই। মিঃ মুখার্জি তাহাকে কয়েকটা দিন এখানে আসিয়া লুকাইয়া থাকিতে নির্দেশ দিয়াছেন, সেই নির্দেশই সে পালন করিতেছে। পলিশ তাহাকেও খুঁজিয়া বেড়াইতেছে কিনা—কর্তাদিন তাহাকে এমনি অজ্ঞাতবাসীতে দিন কাটাইতে হইবে সে জানে না। কথা শুনে যতদিন না

তাহাকে এখান হইতে অন্যস্থানে বাইবার আদেশ হয় ততদিন তাহাকে এখানেই থাকিতে হইবে। মধুকরের কথা মনে আসিতেই তাহার মন একেবারে চণ্ডল হইয়া উঠিল—যে লোকটি এমন করিয়া দেশকে ভালবাসিয়াছে—নিজের ভাবনা চিন্তা বলিতে এ জগতে যাহার কিছুমাত্র নাই—সেই সর্বভাগী লোকটির পরিণাম কি হইবে? সেদিন গঙ্গাবক্ষে রাশের অশ্বকরে আরো দুই একটা লোক নাকি গুরুতর আহত হইয়াছে। তারপর রাস্তার উপরে যে দুইটি লোক মারা গিয়াছে—একটি তাহার গুলীতে আর একটি মধুকরের গুলীতে—তাহার সমস্ত মোক্ষাই হয়তো একা মধুকরের উপর গিয়া পড়িবে—এই সব প্রমাণ হইলে বিচারে তাহার চরম দণ্ড একেবারে নিশ্চিত।

আরো দিন দুই পরে একদিন সম্ভাব্যে লমিঃ মুখার্জির নিকট হইতে খবর আসিল—অসিতকে কলিকাতায় যাইতে হইবে—পুলিশ তাহাকে কোন সন্দেহ করে নাই—ভয়ের কোন কারণ নাই। বিবায় লইবার জন্য মৃণালিনীর ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া অসিত দেখিতে পাইল তিনি বিজ্ঞানায় পড়িয়া ফুপাইয়া ফুপাইয়া কদিয়া চলিয়াছেন। অসিত ধীরে ধীরে তাহার পাশে বাসিয়া ডাকিল—দিদি!

মৃণালিনী কিছুক্ষণ পরে খানিকটা শান্ত হইয়া চোখ মুছিয়া বলিলেন—কেন ভাই?

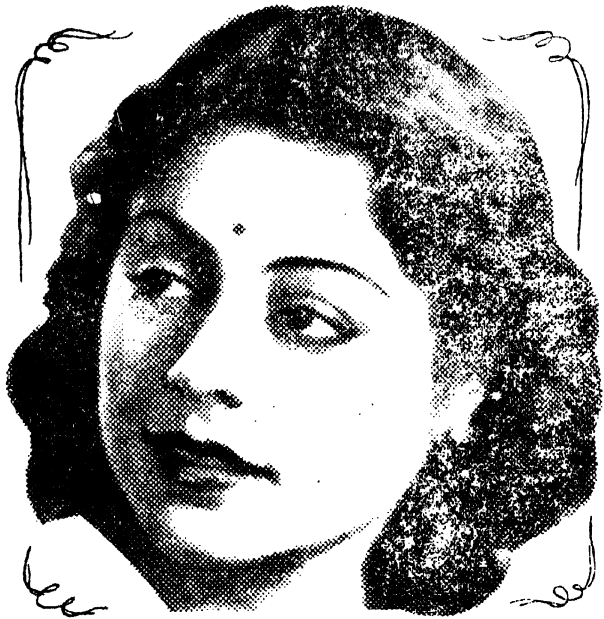
—আমি তো চলে যাচ্ছি দিনি—যাবার আদেশ এসেছে যে।

—কিন্তু মোমাঝির কি হবে ভাই! কে তাকে আনবে ফিরিয়ে—কে তাকে করবে রাজদণ্ড থেকে রক্ষা! বলিয়া পুনরায় তিনি ফুলিয়া ফুলিয়া কাদিতে লাগিলেন। এই রহস্যময়ী নারীকে অসিত মোটেই জানে না—মধুকরের আসন যে তাহার হৃদয়ের কতখানি জড়িয়া শিশুত—কি যে তাহার ইতিহাস ইহার কিছুই সে জ্ঞাত নহে—তবু ইহা যে কত গভীর—মধুকর যে তাহার হৃদয়ের কতখানি জড়িয়া বাসিয়া আছেন—তাহা বুঝিতে আজ তাহার একমুহূর্তও লাগিল না। অসিতের নিজের মনও কয়দিন ধরিয়া অনবরত মধুকরের জনাই হাহাকার করিতেছিল—সে সহসা ইহার কোন জবাব দিতে পারিল না—তাহারও দুই চোখ বাহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে অসিত বলিতে লাগিল—মিঃ মুখার্জি কলকাতায়ই আছেন, মধুকরদার বিচার শেষ না হলে হয়তো তিনি আর কোথাও যাবেন না। তাঁর ক্ষমতা তো আপনার অজানা নয়—তাঁর সেই ক্ষমতায় হতখানি সম্ভব হয়, তার তো চুটি হবে না দিদি! মৃণালিনী উদাস ভাণ্ডিতে বলিয়া উঠিলেন—চুটি হতো হবে না ভাই—কিন্তু আমার মন বড়ই এসি—এবার তাকে তোমরা কেউ রক্ষা করতে পারবে না—আমরা হয়তো

আর তাঁকে দেখতে পাবো না ভাই, তাহার কথার ভিতর হইত যেন হতাশার সুর বরিয়া বরিয়া পড়িতেছিল—তিনি পুনরায় বলিলেন—তোমাদের নেতাকে আমি কখনও চোখে দেখিনি ভাই—তবু আমার অনেক কথাই—তিনি জানেন—আমার হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করো এখন আমি কি করবো! আর সমিতির হাজার দুই টাকা আছে আমারই কাছে গচ্ছিত, এগুলো ফিরিয়ে নিয়ে আমাকে মুক্তি দিতে বলো ভাই! আমার সমস্ত শক্তি সমস্ত উৎসাহ আজ একেবারে শেষ হয়ে গেছে অসি!

অসিত জবাব দিল—কিন্তু আগে থাকতে এমনি করে ভেঙ্গে পড়া তো উচিত নয় দিদি! বিচার হবে—ভাল উকিল, ব্যারিস্টারও আমাদের অভাব হবে না। এমনও তো হতে পারে—প্রমাণের অভাবে শাস্তি তাঁর মোটেই হবে না। —কিন্তু এ বুধাই আমার তোমায় সান্ধনা দেওয়া অসি—তোমার কথার পিছনে তোমার নিজের মনই যে সায় দিচ্ছে না—সে কি তুমি বুঝতে পারছো না ভাই! কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিবার পর অসিত বিদায় লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। (ক্রমশঃ)

## কানন দেবী তাঁর স্বকৃ নির্মল ও কমণীয় রাখেন লাক্স টয়লেট সাবান মেখে...



এই জনপ্রিয় গায়িকা-তারকা তাঁর মন্বণ, নির্মল স্বকের কদর বোঝেন, এবং সর্বদা তাঁর বিশেষ যত্ন নেন, — তিনি জানেন যে স্থায়ী স্বকৃসৌন্দর্য নিয়মিত সৌন্দর্য চর্চা দ্বারা অর্জন করা যায়। সেইজন্যই কানন দেবী সর্বদা লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করেন। আপনারও উচিত এই বিশুদ্ধ

সুস্বাদু সাবান ব্যবহার করা। আপনি দেখবেন ইহার সুবাসিত সক্রিয় ফেনা আপনার স্বকৃকে কোমল, উজ্জ্বল ও নির্বৃত রাখবে।

পারগনির প্রোডাক্টনের "চন্দ্রশেখর" চিত্রে কানন দেবীর সাংস্কৃতিক অভিনয় ইার পুরাতন ভক্তদের আনন্দদান করবে ও অনেক নতুন ভক্তের দলও সৃষ্টি করবে।



লাক্স টয়লেট সাবান  
চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য সাবান!

LTS. 163-50-49 BG

LEYER BROTHERS (INDIA) LIMITED

# নাম ও পদবী

## শ্রীপরিমল দত্ত

চিরকলে চেনা, সাদামাটা বাঁধগাথ  
বাঙালি পদবীর উপর আমার চির-  
কালের আকোশ। নতুন বাঙালি ভদ্রলে কের  
সঙ্গে পরিচিত হতে গেলেই ভয় হয়, ইনি  
কিস ঘোষ মিত্র, চাট্‌ঘোষ বাঁড়ুঘোষ, মুখুয্যে,  
সেনগুপ্ত, দশগুপ্ত বা সেন—এরই মধ্যে  
একটা-না-একটা কিছু হবেন-ই! কেবল এই  
জনাই আলাপিত জনতার মুখ নাম বিশেষ  
করে, কিন্তু পদবী বহু চোটা করেও, মনে  
হাতে পারি না। স্বল্পপরিচিত, অর্ধপরিচিত  
প্রশ্নোক্তের পদবী ভুলে যাওয়া সম্পর্কে আমার  
প্রতিভা তপসিরসীম, চাই কি এটাকে প্রতিভাও  
লিখে পেরেন। আসল কথা হল এই, বাঙালি  
বর্ণহিন্দুর পদবীর ক্ষুদ্রপরিমল বড়ই  
বীমবন্ধ—তা একঘেয়েমিরই শামিল, মর্মগতিক  
বরজিকর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রি-  
কুলের ফলাফল, মোটাকের ধাঁধার উত্তর,  
প্রারম্ভীয় কন্সাইন্ড সিভিলিস্টি, আনন্দবাজারে  
কোশিত বাঙালি রজবদীর ফিরিঙ্গি যদি  
দখা আপনার অভ্যাস থাকে—তবেই বন্ধবেন  
নামর এই অভিযোগ সত্য কিনা? চাট্‌ঘোষ  
ভিড়ুঘোষ মুখুয্যে, বোস ঘোষ মিত্র, সেনগুপ্ত  
শিগুপ্তের শেষহীন মিছিল দেখতে দেখতে—  
গাথ ভেঙ্গে আসে, মন ক্রান্ত হয়, গা বমি বমি  
রে। উপমার আশ্রয় নিয়ে বলতে হয়—আমি  
ন বাঙলা দেশের বর্ষার গহন মফঃস্বলের এক  
টে বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে, আর সমনে  
পছনে ডাইনে বাঁয়ে, দেয়ালে বারান্দায় খুঁটিতে  
লে, বেয়ে বেয়ে কেমনে উঠছে। চারিদিকে  
কোয়ার কুচকাওয়াজ, কেমোর আর্মাডা।  
ইবেলবর্ণিত নিরানন্দ নাক্সরজনক Crawl-  
ing Thingsএর মতো—এই গতানুগতিক  
হিন্দু বাঙালি পদবী আমাকে বিরত ও  
রক্ত করে। আমি ত ভাবি বাঙালির উপর  
বাঙালিদের জাতক্রেম আর আকোশের এক-  
ট কারণ হল এ পদবী। স্বাধীন হিন্দুস্থানের  
বহু পটভূমিকায় বাঙালিকে নতুন করে  
নিপ্রিয় হতে হলে পদবী বর্জনের আশু  
য়োজন। আর দেখুন এ বিষয়ে মুসলমান  
র অ-বাঙালিদের কী অবধ স্বাধীনতা।  
গিলদর পরসাদের ছেলে হাভেলীরাম তার  
লে ঘরভরন সিং—কিন্তু চাট্‌ঘোষ ছেলে

চাট্‌ঘোষ, ঘোষের পো ঘোষ। বাস্তব-স্বাধীনতার  
মতো সময় থাকতেই পদবী স্বাধীনতার জন্য  
আন্দোলন করা দরকার।

বাঙলার ছেলে উদয়শংকর, ভারতের নাচ  
দেখিয়ে পৃথিবীকে মুগ্ধ করেছেন;—তার এত  
জনপ্রিয়তার কারণ—নামের শেষে বাঙালি  
পদবীর নেজুড় নেই। পশ্চিমের ঋষি ঠিক  
এই কারণে অজ্ঞ শ্রীঅরবিন্দ। চণ্ডীদাস,  
চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ কিম্বা বিবেকানন্দ বাঙালি  
পদবীর মায়া না কাটালে—নিখিল ভারতীয়  
মানুষের মতো মানুষ হতে পারতেন কি?  
রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে আমরা শ্রী-বর্জন  
করেছি। পদবী বর্জন করে কেবল নামধন্য  
হওয়ার বাধা কি ও কোথায় জানি না। ইতি-  
হাসের নিজের টেনে দেখাতে পারি, রজারাজড়া,  
নবাববাদশা এঁরা বংশানুক্রমিক পদবী ব্যবহার  
করেন না। বাঙালি পদবীর ক্রমিকনবর্জিততা  
বোধ করি, প্রচ্ছন্ন বোধ প্রভাব ছাড়া আর  
কিছুই নয়। বাঙালি না ছাড়লে নামের পিছনে  
পদবীর লেজুড়, না মাথায় চড়ালে তাজ;—তার  
আটাকা মাথা ও নাম আর বিশেষ করে  
পদবীতেই মালুম সে বাঙালি।

তৎসম নাম ছাড়া বাঙালির নাম প্রায় একটা  
হয় না কেবল ব্যতিক্রম বোধ হয় প্যারীচাঁদ মিত্র,  
লাড়লীমোহন ঠাকুর আর বোকেন চট্টো।  
শেষের নামটির মানে যিনি আমায় বুঝাতে  
সক্ষম তাঁকে আমি শিরোপা দিতে রাজী।  
দুটি ভারতীয় খৃস্টান মেয়ের নাম (নাম ত  
নয় রয়) একদা আমি উদ্ধার করেছিলাম, তারা  
যথাক্রমে মেরিগোল্ডবাসিনী আর লিলিগোল্ড-  
হাসিনী। পূর্ব আর পশ্চিম যে এক হয়ে  
মিলবে না, একথা এরপরও কি অবিশ্বাস করা  
চলে? নামের ব্যাকর্থ বা denotationই  
যথেষ্ট, তার জাতার্থ বা connotation নিয়ে  
বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। তবুও অর্থহীন  
কিম্বা অনর্থক বাঙালি নাম নেই বললেই চলে।  
যদি নাম অনিলকুমার তিনি কখনই নিজেকে  
পবননন্দন হনুমানের সহোদর বলে মনে করেন  
কি? যে মেয়ের নাম নিভাননী (ব্যাকরণ  
গোল্লায় দিয়ে) তাকে প্রশ্ন করতে সাধ যায়—  
তুমি কি ননীর মত নয়? জিস্টিস অঙ্কর-

রামকে প্রশ্ন করে দেখতে পারেন, তিনি তাঁর  
নামের মানে নিয়ে নিশ্চয়ই মাথা ঘামান না।

শেকস্পিয়ার বলেছেন : নামে কী অণু-  
যায়? গোলাপ ফুলকে যে নামেই ডাকো সে  
তেমনি সুগন্ধ বিলাবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ  
বাস্তবিকর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন  
কাব্যের উপেক্ষিতা উর্মীলাকে তিনি প্রতীকীত  
বা মাণ্ডবী নাম না দিয়ে উর্মীলা নামকরণ  
করেছিলেন, কেবল এই জনাই। রবীন্দ্র  
হাওলাদার মায়ারদু কারফর্ম নাম কচিৎসংসদের  
দোদুল দে শিহরণ সেন, লালিমা পাল (পদুং)—  
জাতীয় এলায়িত কবিতাগম্ভীর এবং হাস্যবহ  
না হলেও, রীতিমতো bizarre বলে মনে হয়  
প্রশ্বেয় রাজশেখর বসু ম'শায়, নাম সম্বন্ধে  
একটি মন্তব্য করেছেন যে নাম মাত্রের খানিকটা  
গরদঘোর গুণ থাকে দরকার। এককথায়  
সংসারে ধূলো ও খাজায় নাম যেন আমরে না  
যায়, নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য,  
জীবনযুদ্ধে হটে না যায়।

পোষাকী তোলা নামের সঙ্গে ঘরোয়া ডাক-  
নামের কোনো তুলনাই হয় না। যাকে ভালবাসি  
তাকে হাজার নামে ডাকতে ভালবাসি। আর  
তার নাম ভাল কি মন্দ তা নিয়ে ভাবাব্যতীত  
পরিভ্রমণ তর্ক করতে উৎসাহ পাইনা।  
আপনাদের মতামত আর ভোট কোন তরফে  
জানি না—থুঁকি আর থুঁকির মাকে অনেক  
সময়ে, অনেক নামে ডাকতে ভালবাসি আর  
কবির সঙ্গে এ বিষয়ে আমি একমত।

“একজনেতে নাম রাখবে কখন অম্প্রাশনে,  
বিশ্বসুন্দর সে-নাম নেবে ভারি বিষম শাসন এ।  
নিজের মনের মতো সবাই করুন কেন

নামকরণ,—

বাবা ডাকুন চন্দ্রকুমার, থুঁড়ে ডাকুন রামচরণ।  
ধরের মেয়ে তার কি সাজে সংস্কৃত নামটা ওই  
এতে কারো দাম বাড়ে না অভিধানের

দামটা বই।

আমি বাপু ডেকেই বসি যেটাই মুখে

আসুক না

যারে ডাকি সেই তা বোঝে, আর সকলে

হাসুক না।”

আমার এক বন্ধুর বোয়ের নাম ঠাণ্ডু, আর  
অন্য বন্ধুর বোই হলেন খুঁসি। ঘনঘন চিঠিপত্র  
লেখার পক্ষে বা নামের নেশায় বারে বারে  
ডাকার পক্ষে দু' অক্ষরের ছোট প্রাকৃত নাম  
কেবল পছন্দসই নয়, একান্ত আবশ্যিক।  
মানুষের পছন্দ আর গর-পছন্দের সীমারেখা  
নির্ধারণ করা মূর্শকিল। কে কি ভালবাসবে  
আর কেন ভালবাসবে এ নিয়ে রুচির তর্ক  
বড়ো গোলমালে। কেন রবীন্দ্রনাথ বনজ্যোৎস্না  
তলাপাত্রকে প্রীতির চোখে দেখেন নি আর  
কেনই বা কবি জীবনানন্দ দাশের নাটোরের  
বনলতা সেন-কে এত ভাল লাগে—এ রহস্যের

নিরসন করবে কে। সুইফটের স্টেলা-পদ্মাবলী আর প্রিয়তমাকে নানা নামের প্রণয়-সম্ভাষণ দেখে কে বলবে তিনি মেয়েদের ভালবাসতেন, না—মেয়েদের নাম, না দুই-ই?

আধুনিক বাঙালি নামের অভিযান্ত্রিক দেখা দিয়েছে। সেকলে বাঙালির নামে দেবদেবীর প্রদর্ভাব ছিল প্রবল, তাছাড়া মধ্যপদে চন্দ্র, নাথ, কুমার, শংকর, প্রসাদ এ না হলে চলত না। হালের মধ্যপদলোপী গ্রীষ্মজিত কাটাছাটা সংক্ষেপিত নামের দৌরাখো বৃক্ষে উঠা দায় নামের মালিক মেয়ে না পুরুষ? নালিনী, নীহার, শিশির, শতদল, কামিনী, কানন ইত্যাদি ছাড়াই নাম লুপ্তপদের জন্য স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলের হতে পারে। উপরের খে-কোন একটি বা সমবেত নাম দাঁড়ি কামাতে, পায়ে আলতা দিতে, আপিস যেতে, চুল বাঁধতে, কানপাশা পরতে, ফুটবল খেলতে, শাড়ি ধুতি কিস্বা লুপ্ত পরতে পারে—চাক্ষুষ পরিচয় না থাকলে বুঝে ওঠা দায় তিনি বা তাঁহারা শাড়ির অধিকারিণী না ধুতির অধিকারী। এ বিষয়ে আমাদের ব্যাকরণও অপারগ—সংস্কৃত হিন্দী ইংরেজির মতো বাঙালয় স্ত্রী ও পুরুষবাচক সর্বনাম নেই। খাঁটি তত্ত্ব মেয়ে-নাম রাণী ও বেলা—যার শেষে কুমার, প্রসাদ বা কান্ত জুড়ে পুরুষালি নামে দাঁড় করানো অসম্ভব। যে শব্দ স্বতঃই স্ত্রীবাচক সেগলি 'কেবল মহিলা-দিগের জন্য' বলে ছেড়ে দেওয়া দরকার। বিদেশী ডলি লিলি নেলী, লিজি একাধারে বাঙালি মেয়ে আর বিলিতি কুকুরের বহুল প্রচলিত প্রিয় নাম। ইংরেজ ভারতবর্ষ ছেড়ে গেলেও এই ইংরেজি নাম—কমলি আমাদের নিশ্চয়ই ছাড়বে না। ঘরোয়া দেশজ (?) ডাক-নাম মণ্টু, বন্দু, রণু, শাণ্টু, এণ্টু, আণ্টু নাটু, সাধারণ খোকাখুকুর নাম; আর সে খোকা-খুকুরের খোকাখুকু হলেও সে-নামের বদল ঘটে কি? নান্দ, বন্দ, মন্দ, ঘন্টু—এই উৎকরাশিতক আদরসূচক ঘরোয়া ডাকনামের ব্যাপ্তিগত ব্যাখ্যা কি চিরদিন অজানা রইবে? উদীয়মান ভবিষ্যতের ভাষাতত্ত্ব বিশারদগণ কি এ বিষয়ে নীরব রইবেন, কখনো কি অবহিত হবেন না?

দিল্লীর এদিকে—কেবল দিল্লী কেন—আসাম, উড়িষ্যা আর মান্দ্রাজ বাদ দিলে—সারা ভারতবর্ষে বাঙালিকে অ-বাঙালিরা দাদা বলে ডাকে। যেমন শিখ হল সদারজী, হিন্দুস্থানী গ্রাহণ পণ্ডিতজী, মুসলমান খাঁ সাহেব—বাঙালির সাবজননী ডাক নাম দাদা। এই দাদা ডাক ভ্রমার একান্ত অপজন্মের, আমার কানে বড়ো বেসরো হয়ে বাজে। পারিবারিক সিন্ধ ঘরোয়া আবহাওয়ার মধ্যে দাদা ডাকের সংগে বাহির বিশ্বের এই ডাকের তফাৎ অনেক। আমার 'অহম্'-এ কোথায় কেমন বাধে, মোটেই

স্বচ্ছন্দ বোধ করি না। 'অশীতিপর গঙ্গাবাত্রী বৃন্দে'রও আমি দাদা, আবার সবে গোফ-উঠা, ইক্ষুল থেকে সোজা গড় গড় করে আপিসে ঢোকা ছোকরারও আমি দাদা। The Indian Year Book and Who's Who থেকে দাদা শব্দের অর্থ উদ্ধার করা গেল। Grandfather (Paternal), Elder brother, Venerable person, Bombay Slang—Hooligan boss. দাদাভাই নয়াজীও দাদা, ভ্রমার বোম্বাই অঞ্চলের গুন্ডাসদারও দাদা। হয়ত অক্সফোর্ড অভিধানে একদা দাদা শব্দমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে, আর যাবতীয় মানে দেওয়ার পরে এও লেখা থাকবে—দাদার অর্থ বাঙালি। জাতি হিসাবে বাঙালির দাদাগিরি সাহিত্যে অটো, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, রাজনীতিতে দাসত্ব স্বাধীনতায়, দল পাকানো আর দল ভাঙানোতে সারা ভারতবর্ষে স্বীকৃত। আধুনিক ভারতীয় কাব্যে Dadaiism যদি কোথাও মেলে সে একমাত্র বাঙলাদেশ।

আনাকোরা প্রায় অচলিত বা অল্প প্রচলিত পদবীর পর আমার পক্ষপাত আছে। ঢাক, ঢোল, বাগ, সরখেল চাকী, পর্বত, দাম, পান জানা মাজি হোড়—খাঁটি বাঙালী পদবী হলেও এদের প্রচার ও প্রসার বড়ো কম—আর এইজন্য মনে হয় এই উপাধিওয়ালাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতিবন্ধ। হর্ষনাথ পাকডাশিকে আমি যে এত পছন্দ করি সেটা কেবল এই নয় যে ম্যাথু আনন্ডমাকী তাঁর চারিত্রিক 'মাধু' ও আলোর জন্য? তাঁর পদবী যদি পাকডাশি না হত তাকে ভালবাসতে পারতুম কি? প্র-না-বি বা প্রমথনাথ বিশি ম'শায় G. B. S-এর 'পঞ্চদশম কার্বন' কপি়র বাসনা ছাকা সত্ত্বেও বাঙলা সাহিত্যে রীতিমত মৌলিক এবং অনন্য—সেটার জন্য দারুণ সাহিত্য নয়, পদবী।

সাহিত্যের ধারের চেয়ে তাঁর পদবীর ভার দাঁড়ি-পাল্লার ভার আর কেবল এই আশ্চর্য পদবীর অনন্যতার জন্য তিনি বাঙলা সাহিত্যের মর্মর রচিত ভ্রমর আলয়ে, একটি সুসজ্জিত কক্ষের অধিকারী হবেন। কালের অধীশ্বর যদি কৃপা করেন, শেষ পর্যন্ত আমার সেখানে যদি কোনো দিন স্থান হয়—সম্পূর্ণ একটি কামরা নিজের বলে দাবি করতে পারব না। সেখানে মেঘনাদ বৃন্দে'র অমর রচয়িতা থেকে শুরু করে আপনা-দের সাপ্তাহিক প্রবন্ধ লিখিয়ে ইন্দ্রজিত মশায়ও উপস্থিত থাকবেন আর কেবল অক্ষয়-কুমার দত্তকে বাদ দিলে দত্ত কুলোন্তব কবিদের সেখানে ভিড়। মাইকেল মধুসূদন যে ঘরের একচ্ছত্র সাহিত্যসম্রাট, সেখানে আর যাই হোক কথার চিড়ে ভেজানো মৃশিকিল। ভারতীয় ধর্মসম্প্রদায়, বস্তুবিচার ছাড়া যে ক্লাইড স্ট্রীটের চাঁদ বা ওটরামঘাটের জাহাজের বাঁশির উপর চিত্তাকর্ষক লিরিক প্রবন্ধ লেখা চলে একথা সাহিত্যাচার্য অক্ষয়কুমারকে বে বুঝাবে?

লোককে পদবী বর্জনের উপদেশ দিলেও নিজের পদবী সম্পর্কে আমি সচেতন। গর্ব করা উচিত নয়, এ পদবী বনেদি নামকরা, এ পিছনফেরা ঐতিহ্য অনেক দিনের। পথেঘাটে মাঠে চাটুঘো বাড়ুঘো মধুঝো, বোস ঘোষ মিত্তের ভিড়ে দুটি কি একটি দত্ত দেখতে পাওয়া যায়—তিনি কবিককেন চন্ডীর ভাড় দত্তই হন বা হালের রজনী পাম দত্ত। তার একটা সম্বন্ধিক দিক আছে তা কেবল উজ্জ্বল নয়, রীতিমত দেদীপমান। সামন্ত রাজ বসন্ত সেনের পায়ে মাথা নুইয়ে, জাত খুইয়ে সে জায়ে ওঠেন, এই কি তার মৌলিকতার যথেষ্ট প্রশংসাপত্র নয়?

**শক্তি**

**সারিবাধ্যারিষ্ট**

শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা-পরিমোক্ষক ও টেলিক

অধ্যক্ষ মথুর বাবুর

**শক্তি ঔষধালয় • ঢাকা**

ভারতের শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম আত্মশিক্ষার প্রতিষ্ঠান • স্থানীয় ১৯০১



## ত্রিপ্রমথনাথ বিনী

(৩)

দুই পক্ষের লাঠিয়ালের নিঃশব্দ আবির্ভাবে গ্রামে যে অবস্থার উদ্ভব হইল ইউরোপীয় ইতিহাসের ভাষায় তাহা 'armed neutrality' বা সশস্ত্র শান্তি। সৈন্য প্রস্তুত অস্ত্র প্রস্তুত, অথচ সে-সমস্ত ব্যবহৃত হইতেছে না, এমন অবস্থা ইউরোপের ইতিহাসে বারংবার ঘটিয়াছে—এবং তাহার পরিণাম ভয়াবহভাবে বারংবার আত্মপ্রকাশ করিলেও রাষ্ট্রদূত-রক্ষণগণের কিছুমাত্র শিক্ষা হয় নাই। তলোয়ারের দ্বারা সীমান্ত রচনা করিয়া শান্তিতে বাস করিবার চেষ্টা আর বালির বাঁধ রচনা করিয়া বন্যা প্রতিরোধ একই জাতির পণ্ডিত্রম। তলোয়ার, বর্শা, বস্ত্রম, সংগীন দ্বারা শান্তির সীমান্ত রচনা করা আর বিদ্রোহীর হাতে দেশের কর্তৃত্ব অপর্ণ—একই ক্তথা! যাহাদের উপরে ভার দিতেছে—প্রথম সুযোগেই তাহারা ভোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বসিবে! মানুষ নিতান্ত নির্বোধ বলিয়াই ভাবে যে অস্ত্র তাহার পোষমানা নিজীব পদার্থ। মানুষ যখন অস্ত্র শান দিতে থাকে, তখন ভাবে ওই নিঃপ্রাণ ইম্পাতখানার সেই কর্তা! কিন্তু সে ভাবিতেই পারে না যে যখন সে একখানা তলোয়ার গাড়িতেছে, তখন বস্তুত দুইখানা তলোয়ার নির্মিত হইতেছে। মানুষের শান দিতেছে, ইম্পাতে আবার ইম্পাত শান দিতেছে অস্ত্র-নির্মাতা মানুষকে। কঠিন ইম্পাত তলোয়ারের পরিণত হইতেছে, আর মানুষটা হইতেছে হিংস্র পশুতে পরিণত। তলোয়ার শান পাইয়া হিস্ হিস্ করিতেছে, আবার তলোয়ারের সংঘর্ষে মানুষটার মনে হিংসার শিখা দগ্ন দগ্ন করিয়া ক্রমে উজ্জ্বলতর হইতেছে। যোদ্ধা যখন তলোয়ারখানা মৃদুস্তব্ধ করিয়া বাহির হয়—তলোয়ারখানাও যে তখন তাহাকে মৃদুস্তব্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। মানুষ তখন নিতান্ত অসহায়ভাবে তলোয়ারের কন্ডায়ণ্ড, সে মানুষটাকে অভীষ্পত্ত পথে চালিত করে।

যোদ্ধা তলোয়ারের আলোতে একটা শত্রু নিপাত করিল—কিন্তু তলোয়ারখানা যোদ্ধাকে দিয়া একটা মানুষ মারিয়া ফেলিল—দুই রকমভাবেই এই ভাবটিকে প্রকাশ করা চলে। তলোয়ার নিজীব নহে, তাহার তীক্ষ্ণ শত্রুতা শয়তানের বিজয়ের স্মিত, কামানের কণ্ঠে শয়তানের হৃৎকার, বোমার বিস্ফোরণ শয়তানের জয়ের উল্লাস। অস্ত্রের ষড়শস্ত্রের সম্মুখে মানুষ একান্ত অসহায়। সে অস্ত্রের ক্রীড়নক মাত্র।

জোড়াদীঘিতে এখন সশস্ত্র শান্তির পর্ব চলিতেছে। কেহই প্রকাশ্যে অপরের বিরুদ্ধাচরণ করে না, দেখা হইলে মৃদু বাক্যের পরিবর্তে মার্জিত হাসির দ্বারা পরস্পরকে অভিনন্দিত করে—ইম্পাতসুলভ মার্জিত হাসি। কিন্তু প্রত্যেকেই ঘরে অপরের বিরুদ্ধে মানসাস্ত্রে শান দিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর শত্রু মানসাস্ত্রই নয়। ছ'আনি ও দশানির পুরানো কালের অস্ত্রশস্ত্র বাহির হইয়াছে। পুরাতন কিরীচে যেমন ধার দেওয়া হইতেছে, তেমনি নতুন বন্দুক, গুলী-বারুদও সংগৃহীত হইতেছে। পাকা বাঁশের লাঠির কথা না হয় নাই ধরিলাম। গ্রামে নিত্য নতুন লোক আসিয়া জড়টিতেছে, গ্রামের জনসংখ্যায় জোয়ার জলের স্ফীতি দেখা দিয়াছে। জোয়ারের জল উধ্ব সীমায় পেঁচিলে যেমন থমথমে ভাব দেখা দেয়,—গ্রামে এখন তেমনি একটা থমথমে ভাব।

গ্রামে অস্বাভাবিক জনবৃদ্ধি—তবু যেন গ্রামখানি নিজনি! এত লোক তবু যেন কোলাহল নাই। সমস্ত জনপদে কেমন একটা ছায়াবাজির অপদাৰ্থতা। ভয়াবহ ভবিষ্যৎ ইতিমধ্যেই পূর্বগারিনী ছায়া নিঃস্রপ করিয়াছে। মাঠের রাখালের তার-বর যেন ধূনির ত্রিশূলে আকাশকে বিশ্ব করিতেছে। রাত্রির অন্ধকার জগন্মল শিলার ভার বহন করিয়া দেখা দেয়, দিনের আলো অতল গছবৃক্ষের শূন্যতাকে প্রকাশ করে, হাসির

শূন্যতা দিকে দিকে মৃত্যুর শ্বেতবস্ত্র প্রসারিত করিয়া দেয়, আর দিবসান্তের গোখলি যুদ্ধক্ষেত্রের রক্তময় পরিণাম আকাশে অঙ্কিত করিতে থাকে।

গ্রামের কাহারো মনে শান্তি নাই—অথচ অশান্তির কারণও কেহ নির্দেশ করিতে পারে না। বৃদ্ধেরা রাত্রি জাগিয়া ইষ্ট-নাম জপ করে, সন্ত-শিশু স্বপ্নে কাঁদিয়া ওঠে! মনে হয় গ্রামের পথে নিশীথ রাত্রে কাহারো যেন শ্বেতবস্ত্র পরিয়া যাতায়াত করিতেছে শেষ রাত্রে কাহারো যেন অজ্ঞাত ভাষায় গৃহস্থের নাম ধরিয়া ডাক দিয়া যায়। বিজন শ্মশানে হঠাৎ ক্রন্দনের রোল ওঠে! গৃহস্থ গৃহে রুদ্ধ থাকিয়াও শঙ্কা ভুলিতে পারে না। নানা রকম ভয়াবহ জনশ্রুতি গ্রামে প্রচারিত হইতে লাগিল। কেহ বলিল—রাতে বিলের ধারে শত শত আলো জ্বলিতে নির্ভিতে দেখিয়াছে, কেহ বলিল—কাণ্ড গভীর রাত্রে দক্ষিণপাড়ার বিলে কাহারো ফেঁ পলো দিয়া মাছ ধরিতেছিল। একদিন হরি বাড়িতে ছিল ছাগমুণ্ডে আবিষ্কৃত হইল পরদিনে কালীর বেদীতে শ্বেতক্রন্দনের দাগ দেখা গেল!

একদিন মাণিক খুড়ো আসিয়া বাজারের মধ্যে গল্প করিল যে, সে নাকি পরশু, সম্মুখ দশানির ভাঙা বাড়ির পাশ দিয়া আসিবার সময়ে এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়াছে। সকলে উৎসুকা প্রকাশ করিলে খুড়ো বলিল—হঠাৎ কার কামা শূনে এদিকে ওদিকে চাইলাম কই কাউকে দেখতে পাইনে—অথচ কামার শব্দ স্পষ্ট, কানের ভ্রম নয়। এমন সময়ে ভাঙা দালানের উপর নজর পড়তেই—সর্বনাশ। এই বলিয়া সে থামিল।

সকলে কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া শূদ্বাইল—কি দেখলেন?

খুড়ো বলিল—বললে কি বিশ্বাস করব? প্রথমে দেখে আমিও বিশ্বাস করতে পারিনি। দেখি যে দশানির কঠী একখানা ছেঁড়া ন্যাকড়া পরে বসে গালে হাত দিয়ে কাঁদছেন।

একজন শূদ্বাইল—তোমাকে দেখে কি করলেন?

মাণিক বলিল—আমি কি আর অপেক্ষা করলাম! অমনি ছুটে চলে এলাম।

তারপরে ছোট্ট একটি মন্তব্য করিল—পরিণাম শূদ্ব নয়।

তখন ভজহারির দিকে তাকাইয়া বলিল—সেদিন রাতে যে বিপদে পড়েছিলাম, মনে আছে তো?

ভজহারি মৌন সম্মতির দ্বারা জানাইল—সে বিপদ ভুলিবার নয়।



গায়ের লোকের বিশ্বাস হইয়া গেল যে, পানির কঠোর ইতিমধ্যে কাশী পাইয়াছেন, যদিও বিশ্বাস, খবরটা প্রকাশ করেন নাই। আর গ্রামের শোচনীয় পরিণাম স্মরণ করিয়া কঠোর ঠাকুরাণী বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া গ্রামে আসিয়া রোন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন।

পরিদর্শন হাটবার। হাটের মধ্যে আসর জমাইয়া শশাঙ্ক গলপ করিতেছে। সে শ্রোতাদের লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে—ভাই, জীবনে এমন বিপদে পড়িনি। কাল রাতে, তা একটু অধিক রাত্রি হয়েছিল বই কি, টোলে ফিরছি, এমন সময়ে যেমন সেই বটগাছের তলে উপস্থিত হয়েছি হঠাৎ পায়ে যেন কি একটা বাধলো, আছাড় খেয়ে পড়লাম! ভাবলাম—উহু, এমন তো হ'বার কথা নয়, আমি একজন মস্তাফিস্থ ব্যক্তি, হঠাৎ পদস্থলন। এ কি রকম হল। মনে হল কোন লতায় পা বেধে গিয়েছে। হাত দিয়ে লতাতা তুলে দেখি—সর্বনাশ, এখনো গায়ে কাটা দিচ্ছে!

সবাই সম্মুখে বলিল—কি দেখলে ঠাকুর?

শশাঙ্ক বলিল—যা দেখবার তাই দেখলাম।

লতা নয়, যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। জটা?

—কার জটা?

শশাঙ্ক বলিল—কার জটা তাও কি নাম করে বলে দিতে হবে? যে মহাপুরুষ ওই বটগাছে থাকেন—ওঁরই জটা! তখন তিনি গঙ্গা-স্নান সেরে এসে জটা শুকোচ্ছিলেন—সেই জটায় গিয়েছে পা বেধে। এমন ক্ষেত্রে পদস্থলন তো অনিবার্য!

সকলে শূদ্রাইল সমস্যাসীকে দেখলে?

শশাঙ্ক বলিল—অবশ্যই দেখলাম! উপরে মূখ তুলে দেখি তাঁর চোখ দুটো আগুনের হস্কার মতো জ্বলছে। আমি জোড় হাত করে প্রণাম করলাম। তিনি একটু হাসলেন। বৃদ্ধলম যে নিতান্ত আমি বলেই মাপ করে দিলেন, অন্য কেউ হলে তফাৎ—

সবাই শূদ্রাইল—কি করতেন?

শশাঙ্ক বলিল—কি করতেন তাও কি স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে? তুমিই বলো না হরিচরণ, তুমি তো প্রাচীন লোক।

হরিচরণ খুশী হইয়া বলিল—ওই জটায় পাক দিয়ে তাকে মেরে ফেলতেন—এ তো সহজ কথা! এই তো সেবার ছিদ্র হাড়িকে সকাল বেলায় ওখানে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। শ্রোতারা শশাঙ্ক শিহরিয়া উঠিল। কেবল আশুগারি দোকানদার মনে মনে হাসিল। ছিদ্র তাহার একজন প্রধান খরিদদার ছিল। আর শশাঙ্ক ঠাকুর যে গডকলা দুইমাত্রা মোতাত খরিদ করিয়াছে সে কথা আর কেহ না জানুক—সে তো জানে।

সবাই শূদ্রাইল—কি হবে ঠাকুর?

শশাঙ্ক বলিল—সে আলোচনার ক্ষেত্রে এখনো নয়। কাল সকালে পাঁচটা পান, পাঁচটা সূপদ্রা

আর সোয়া পাঁচ আনা পয়সা সঙ্গে করে আমার গৃহে যেরো, বলে দেবো, সব আমার নথ্যে!

(৪)

সমস্যাসীর জটা, দশানির ক্রন্দন প্রভৃতি অনৈসর্গিক বস্তুতে শশাঙ্ক পুরাপুরি বিশ্বাস করে কিনা বলা শক্ত, কারণ তাহার কাণ্ডজ্ঞান অতি মটায় সজ্জ। হয় তো বিশ্বাস করে, হয়তো করে না, হয়তো সংস্কারের দ্বারা বিশ্বাস করে, হয়তো বুদ্ধির দ্বারা বিশ্বাস করে না—এমনি মিশ্র ধাতুতে তাহার চরিত্র গঠিত। সে কিছু কিছু কাক-চরিত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চা করে। গ্রামের লোকের ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া দিয়া তাহাদের নিকট হইতে টাকাটা সিকোটা কলা মলা প্রভৃতি আদায় করে—কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎকে বিম্ব-বৃক্ষে উপবিষ্ট রচিত্র বায়সের ডাকের উপরে বা আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের উপরে ছাড়িয়া দিয়া সে কখনো নিশ্চিত হয় নাই। সে নিশ্চয় করিয়া জানে যে—পুরোহিত মন্তস্ত্রে অশ্বিনবাস করিলেও কিছু আসে যায় না—যজ্ঞমানের বিশ্বাস ও অর্থের উপরেই পূজাপার্বণের সফলতা নির্ভরশীল।

গ্রামের যে একটা অমণ্ডল আসন্ন তাহা সে বুঝিত, কিন্তু তাহার জন্য কোন প্রকার অনৈসর্গিকের সাহায্য লইতে তাহাকে হয় নাই—কাণ্ডজ্ঞানের বলেই এই সতো সে উপনীত হইয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল যে, একটা বড় রকমের দারামার আসন্ন এবং তাহার ফলে কতক লোকের প্রাণহানিরও সম্ভাবনা তাহাও সে জানিত। ইহাতে সে বিচলিত হইয়াছিল। গ্রামের সাধারণ লোকের অনেকেই তাহার খাতক এবং মরিবার বেলায় তাহারাই মরিবে। আসন্ন দাণ্ডগতে ছ'আনির জয় হোক কি দশানির জয় হোক শশাঙ্ক ঠাকুরের পক্ষে দুই-ই সমান, যেহেতু ছ'আনি দশানি নির্বিশেষে তাহার খাতকের দল। তাহার অভিজ্ঞতা বলে যে জীবিত খাতকের নিকট হইতেই পাওনা টাকা আদায় করা কঠিন, কিন্তু সে একবার মরিলে কাজটা সম্ভাবনার সম্পূর্ণ বাহিরে চলিয়া যাইবে। তখন সে উপায়ান্তর না দেখিয়া টাকা আদায়ের জন্য খাতকদের উপরে চাপ দিতে আরম্ভ করিল। সকলে শূদ্রাইল—ঠাকুর, এত তাগাদা কেন?

শশাঙ্ক বলিল—ভাই, একবার গঙ্গাস্নানে যাবো, তাই কিছু টাকা।

কেহ কেহ বলিল—ঠাকুর গঙ্গা স্নানে এত টাকা নিয়ে গেলে যে চোর জুয়েচোরের হাতে পড়বে, তার চেয়ে আমাদের হাতে থাকলে মন্দ কি!

শশাঙ্ক মনে মনে ভাবিল—চোর জুয়েচোরের হাতেই তো পড়িয়াছি। প্রকাশ্যে বলিল—ভাই,

বিদেশে টাকাই বন্ধ। একজন বলিল—কিন্তু বিদেশে অধিক টাকা শত। এমন কাজের মধ্যে বেয়ো না, ঠাকুর।

ফলে ঠাকুর বৃদ্ধিতে পারিল টাকা সহজে কেহ দিবে না। তাই সে নালিশের ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিল।

তখন তাহার দেনদারগণ একত্রে শলা-পরামর্শ শুরুর করিল। সেই দলে হিন্দু ছিল, মুসলমান ছিল, কোন প্রকার জাতিবৈষম্য ছিল না। যাহারা বলে যে, হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য সম্ভব নয়—তাহারা ইতিহাস জানে না। পলাশীপ্রসঙ্গে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও জৈন কেমন জোট বাঁধিয়াছিল। আবার বর্তমান প্রসঙ্গে কেমন হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! তবে তেমন তেমন উপলক্ষ্য চাই। ভারতউদ্ধার অতি অবাস্তব উপলক্ষ্য! এই সামান্য ব্যাপার লইয়া হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য আশা করিলে অন্যায় হইবে।

শশাঙ্ক ঠাকুরের খাতকের দলে কান্দু ঘোষ ছিল, বিজয় বৈরাগী ছিল, শ্রীচরণ রজক, রহিম খোঁড়া প্রভৃতি অনেকেই ছিল।

রহিম বলিল—ভাই আর তো সহ্য হয় না। ঠাকুর বেঁচে থাকতে টাকা না দিয়ে উপায় নেই।

শ্রীচরণ বলিল—তবে কি ঠাকুরকে—

রহিম বলিল—হাঁ, হাঁ, সেই ভালো। কে আর আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। সবাই যে ওর খাতক।

তখন স্থির হইল যে, কালীবাড়ীর মাঠ এই সব কাজের অতি প্রশস্ত স্থান। একবার সন্ধ্যার সময়ে ওখানে ঠাকুরকে লইয়া ফেলিতে পারিলে তাহাকে সাধনোচিত ধামে প্রেরণ করা কঠিন হইবে না।

রহিম খোঁড়া বলিল—মা কালী এমন বলি অনেকদিন পাননি, খুব খুশী হবেন।

শ্রীচরণ বলিল—কিন্তু ঠাকুরকে ওখানে নেবার উপায় কি? সে যেতে চাইবে কেন?

সে একটা সমস্যা বটে! কিন্তু তাহার সমাধানও বিশেষ সময় লাগিল না। সকলেই শশাঙ্কর সহিত বাদলির প্রণয়ের ব্যাপারটা জানিত। কান্দু ঘোষ বলিল—বাদলির নাম করে ঠাকুরকে খবর দিলেই চলবে, যে কাল সন্ধ্যায় ওখানে দেখা করো।

সকলে কান্দুর বৃদ্ধিতে বিস্মিত হইয়া গেল।

শ্রীচরণ বলিল—বাবা, কান্দু না হলে এমন বন্দাবনী লীলা আর কারো মাথায় আসে?

রহিম বলিল—পালাও ভাই পালাও, এখনি কান্দুর হাসি শুরুর হবে।

কিন্তু এমন হাসির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও কান্দুর আজ হাসি পাইল না। তখন সকলে পরামর্শকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য প্রস্থান করিল।

কথাটা শশাঙ্কর কানে পেঁপীছবার আগেই বাদলির কানে পেঁপীছিল। সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার জন্য একটা নরহত্যা ঘটবে! সে স্থির করিল যেমন করিয়াই হোক—ইহা বন্ধ করিতে হইবে। শশাঙ্ক ঠাকুরের প্রতি সে কিছুমাত্র অনুকূল নয়—বরঞ্চ তাহাকে প্রতিকূল বলাই চলে, কিন্তু তাই বলিয়া শশাঙ্ক যে নিহত হইবে তাহা সে কখনোই ইচ্ছা করে না। সে এই নৃশংস ষড়যন্ত্র পণ্ড করিয়া দিবে স্থির করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে সে শশাঙ্ক ঠাকুরের সহিত দেখা করিল। ইহা এক নতুন ব্যাপার। বাদলি তাহাকে বলিল—ঠাকুর আমাকে একখানা শাড়ী কিনে দাও!

শশাঙ্ক এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে কান-একটা-করা হাসি হাসিয়া বলিল—বাদলি, আমি আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম।

বাদলি বলিল—সে কথা পরে হবে। এখন দেখে কিনা শুন।

শশাঙ্ক বলিল—এ আর বলতে? আমি এখনই মোঁথরার হাটে রওনা হাঁছি। কিন্তু সেখান থেকে ফিরতে যে রাত হয়ে যাবে। কাল সকালের আগে তোমাকে পেঁপীছে দিতে পারবো না।

বাদলি বলিল—তা হলেই হবে। এই গুলিয়া সে বিদায় লইতেছিল। এমন সময়ে শশাঙ্ক তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া বলিল—কিন্তু কাল সম্মায়া তো তুমি আমাকে বলে পাঠিয়েছিলে আজ সম্মায়া কালীবাড়ীর মাঠে তোমার সঙ্গে দেখা করতে, কি জরুরী কথা বলবে।

বাদলি বলিল—সে খুব জরুরী কথাই বটে কিন্তু—এই বলিয়া একটু ম্চকি হাসিল, বলিল—কিন্তু শাড়ী না পেলে বলছি না।

শশাঙ্ক ঠাকুরের মাথা ঘুরিয়া গেল। সে আর বাদলিকে ধরিয়া রাখিল না, বলিল—আমি এখনই হাটে রওনা হাঁছি, কাল ভোরেই শাড়ী পাবে।

শশাঙ্ক মোঁথরার হাটে রওনা হইয়া গেল—তাহার সন্দেহিত আততায়ীর দল তাহা জানিতে পারিল না।

সম্মায়া হইবা মাত্র বাদলি একাকী কালীবাড়ীর মাঠে গিয়া পেঁপীছিল। বৃষ্টি সে আগেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। মাঠে অনেকগুলি কলা গাছ ছিল। একটি কলাগাছের উপরে একখানি শাদা কাপড় জড়াইয়া দিল, অন্ধকারের মধ্যে তখন সেটাকে স্বেভাসে পরিহিত একটা মানুষের মতই দেখিতে মিলে। তারপরে সে অদূরে একটা গাছের ডাঙলে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। অল্প এক প্রহর অতীত হইলে সে দেখিতে পাইল জনকরেক মানুষ সোঁদকে আসিতেছে। বাদলি দেখিল—তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইল।

সে যেমন কল্পনা করিয়াছিল, ঘটনা তেমনি গড়াইতে থাকিল। সে দেখিতে লাগিল—যে গোটা দুই মনুষ্য মূর্তি পা টিঁপিয়া টিঁপিয়া সেই কলাগাছটার দিকে অগ্রসর হইতেছে। পর মূহুর্তেই তাহাদের হাতের লাঠির আঘাতে কলাগাছটি ম্চ করিয়া ভাঙিয়া পড়িল। লোক দুটা বিভ্রান্ত হইল, এমন সময়ে তাহাদের কানে একটা খিল খিল হাসির শব্দ প্রবেশ করিল। এই হাসির শব্দে তাহারা আরও বিভ্রান্ত হইল, এবং মূহুর্ত-কাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া পর মূহুর্তেই হাতের লাঠি ফেলিয়া দৌড় মারিল। বাদলি দেখিল সেই খাবমান লোক দুটিকে অনুসরণ করিয়া বাকি লোকগুলিও ছুটিল। তখন বাদলি গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল।

সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া সে অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিতেছিল—এইবারে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিল। আঘাতের মালতী-লতা যেমন ফুলের ভারে নুইয়া পড়ে, হাসির ভারে তেমনি সে বসিয়া পড়িল। কিন্তু হাসির বেগ থামিতে না থামিতে এ কি? আঘাতের মালতীলতা বাতাসে দুর্লিয়া উঠিতেই ফুলে পলবে সগিঁত বৃষ্টির জল যেমন ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়ে তেমনি তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইতে থাকিল। হাসির ভারে সে বসিয়া পড়িয়াছিল, এবারে চোখের জলের ভারে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। সে কাঁদিল, কিন্তু কান্নার কারণ বৃষ্টিতে পারিল না। কেন সে কাঁদিল? নারীর মনের কথা কে বৃষ্টিবে? স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাও বৃষ্টিতে অক্ষম। তাই বৃষ্টি সৃষ্টিকর্তা গ্রহা বিবাহ করেন নাই, মহাদেব বিবাহ করিয়াও সংসার ভাগ্য করিতে বাধা হইয়াছেন, আর কোতুলী বিষকূল নারীর মনের কথা বৃষ্টিবার আশায় মোহনীর মূর্তি ধারণ করিতে হইয়াছিল! বৃষ্টি বাদলির মাতৃহীন শৈশবের কথা মনে পড়িল, বৃষ্টি প্রণয়ীহীন কৈশোরের কথা মনে পড়িল, বৃষ্টি ভর্তৃহীন আসন্ন যৌবনের

কথা মনে পড়িল, বৃষ্টি শশাঙ্ক ঠাকুরের কথা মনে পড়িয়া তাহার বিবম রাগ হইল। কান্না শেষ করিয়া যখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল মাথার উপরে রজনী তখন ঘোর অন্ধকার, চারিদিকে নিবৃষ্টির নিস্তব্ধতা। তাহার বড় ভয় করিল, সে দ্রুত গ্রামাভিমুখে রওনা হইল।

পরদিন শশাঙ্ক ঠাকুর শাড়ী হস্তে তাহার কুটীরে পেঁপীছিল বাদলি তাহাকে বাকিয়া তাড়াইয়া দিল, বলিল—কেন সে শাড়ী আনিয়াছে? কে তাহাকে আনিতে বলিয়াছিল?

শশাঙ্ক ঠাকুর বিস্মিত হইয়া পূর্ব দিনের ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দিতে চেষ্টা করিলে—বাদলি বলিল—ঠাকুর তুমি গজা খাও জানতাম, গুলী খাওয়াও ধরেছ নাকি? এক্ষণি পালাও এখান থেকে।

বিস্মিত শশাঙ্ক সরিয়া পড়িল। সে ডাবিল শাড়ীখানা কিছু চড়া দামে অপর কাহাকেও বেঁচিয়া দিবে। লাভের আশায় তাহার প্রণয় নিষ্ফলতা একটা নতুন সঙ্কল্পনা পাইল। শশাঙ্ক ঠাকুর প্রণয়ী বটে, কিন্তু ব্যবসায়ী ততোধিক।

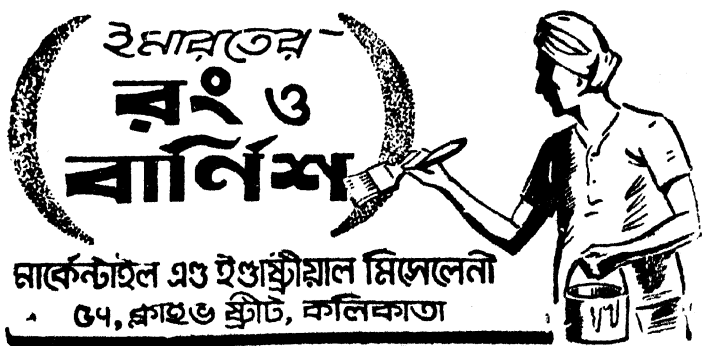
শশাঙ্ক চলিয়া গেলে মোঁতির মা আসিয়া বাদলিকে বলিল—শাড়ীখানা নিলেই পারতিস, ভালো জিনিস। সে অন্তরাল হইতে সবই দেখিয়াছে, সবই শুনিয়াছে।

বাদলি রাগিয়া বলিল—তুমি নাওগে যাও। মোঁতির মা বলিল—ওসব আমরাও জানিবে বাদলি, দিনের বেলা যাকে ফিরিয়ে দিল, রাতে তাকেই দরজা খুলে দিবি।

বাদলি তাহার কথার উত্তর না দিয়া ঘরে ঢুকিয়া দুম করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মোঁতির মা নিজে মনেই বলিতে লাগিল—সব বৃষ্টির সব বৃষ্টি। ওই বয়স আমাদেরও ছিল।

মোঁতির মা-দের নিশ্চিত বিশ্বাস সংসারের সমস্ত রহস্যই তাহারা বৃষ্টিয়া ফেলিয়াছে।

(জমশ)



# ভারতের আদিবাসী

শ্রীমুখার্জি ঘোষ

(১১)

## আদিবাসীর ভাষা

মহাশূর রাজ্যের সেন্সাস সুপারিন্টেন্ডেন্ট ১৯৩১ সালের রিপোর্টে বলেন যে, সেখানকার আদিবাসীদের গোষ্ঠীগত ভাষা লুপ্ত হতে চলেছে এবং আদিবাসীরা নতুন ভাষা (স্থানীয় সাধারণ ভাষা) গ্রহণ করছে।

মধ্যভারত এজেন্সীর সেন্সাস সুপারিন্টেন্ডেন্ট জানিয়েছেন—“যদিও মধ্যভারতে বহুসংখ্যক আদিবাসী আছে, কিন্তু এই সব গোষ্ঠীর অনাথ ভাষা লুপ্ত হয়ে আর্থ/ভাষা প্রচলিত হয়েছে। এ ব্যাপারটা নতুন নয়, বহুদিন আগে থেকেই এই ভাষা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হয়ে আসছে। রেওয়া রাজ্যের কোল বৈগা ও মন্ডা, বৃন্দেলখণ্ডের সৌর, মালওয়া ও গোয়ালিয়রের সাহারিয়া—এই সব আদিবাসী গোষ্ঠীদের বর্তমানে কোন নিজস্ব ভাষা নেই। তারা স্থানীয় আর্থ/ভাষা গ্রহণ করেছে। ভীলদের কোন নিজস্ব ভাষা ছিল কি না আমরা জানি না। হয়তো কোনকালে এরা মন্ডার ভাষায় কথা বলতো, কিন্তু বর্তমানে এদের ভাষা সম্পূর্ণভাবে আর্থ/ভাষার রূপ গ্রহণ করে ফেলেছে। .....রেওয়ার গদেদরা যে ভাষায় কথা বলে সেটা বস্তুত স্থানীয় বাঘোল ভাষারই একটা অপভ্রংশ। নর্মদা উপত্যকার অল্পসংখ্যক কোরকু যারা আছে, তারা নিজস্ব ভাষা ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণভাবে মাল্ভি ভাষা গ্রহণ করেছে।”

বরোদা রাজ্যের সেন্সাস কমিশনার জানিয়েছেন—“স্থানীয় ডুব্‌লা তালবিয়া প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ভীল ভাষা ছেড়ে দিয়ে গুজরাটী ভাষা গ্রহণ করছে। ডুব্‌লা ও তালবিয়ারা গুজরাটী ভূস্বামীদের অধীনে মজুরি করে। কিন্তু যেসব গোষ্ঠী আর্থিক বিষয়ে অপেক্ষাকৃত স্ব-নির্ভর, তারা গোষ্ঠীগত ভাষা হারায়নি—দুশালত চোদ্দা গোষ্ঠী।

পূর্ব-ভারতের বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে আদিবাসীরা হলো জনবহুল সমাজ। এদের মধ্যে ভাষা-লুপ্তির ব্যাপার কমই হয়েছে। আর একটা কথা, এই অঞ্চলের বহু আদিবাসী গোষ্ঠী হিন্দু সংস্কৃতির দ্বারা খুবই প্রভাবিত

হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুর ভাষা (আর্থ ভাষা) গ্রহণ করে গোষ্ঠীগত ভাষাকে পরিত্যাগ করেনি। দেখা যাচ্ছে যে, যেসব অঞ্চলে আদিবাসীরা জনবহুল সমাজ হিসাবে আছে এবং যেখানে তারা আর্থিক বিষয়ে কিছুটা উন্নত বা আত্মনির্ভর, সেখানে তাদের গোষ্ঠীগত ভাষাকে তারা বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। যেখানে তারা সংখ্যাগ অল্প, সেখানেই তাদের ভাষার সজীবতাও টিকে থাকতে পারেনি।

একটা ব্যাপার আদিবাসীরা ভারতের সমতলবাসী জনসাধারণের থেকে বিশিষ্ট। সেটা হলো তাদের দ্বিভাষিতা (Bilingualism)। অধিকাংশ আদিবাসী, যারা নিজস্ব গোষ্ঠীগত ভাষায় কথা বলে, তারা স্থানীয় সমতল অঞ্চলের আর একটা সাধারণ (Non-Aboriginal) ভাষায় কথা বলবার ক্ষমতা রাখে। একটি গোষ্ঠীগত জাতীয় মাতৃভাষা এবং একটি শহরবাজারের বিজাতীয় ভাষা—আদিবাসীর মুখে এই দ্বিভাষিতার ব্যাপার দিন দিন বেড়ে চলেছে।

শুধু কি দ্বিভাষিতা? মধ্যপ্রদেশের সেন্সাস সুপারিন্টেন্ডেন্ট বলেছেন—“দক্ষিণ চন্দা জিলায় একজন গন্দ শিকারীকে দেখেছি, যিনি হিন্দী, তেলগু, মারাঠি ও গোন্দ ভাষায় সমান দক্ষতার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। আদিবাসী পুরুষ ও নারী সকলেই দ্বিভাষী। সেওনি জেলায় দেখেছি যে, গন্দ পরিবারের কোলের ছেলেও দুটো ভাষায় কথা বলতে পারে।”

আদিবাসীদের ভাষা পরিবর্তনের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াটি কিভাবে হয়ে আসছে, ভাষাতত্ত্ববিদ গ্রীয়ারসনের (Sir George Grierson) একটি মন্তব্য থেকে তার ধারণা হতে পারে। তিনি লিখেছেন—“মধ্যপ্রদেশে নিহাল নামে একটি আদিবাসী গোষ্ঠী রয়েছে। এরা পূর্বে মন্ডার ভাষায় কথা বলতো। পরে এরা দ্রাবিড় প্রভাবে আসে এবং তার ফলে এদের ভাষা মন্ডা ও দ্রাবিড় ভাষা মিশিয়ে একটা মিশ্র ভাষা হয়ে ওঠে। এর পর আবার এরা আর্থ/ভাষার প্রভাবে আসে এবং বর্তমানে এরা প্রায় একটা আর্থ/ভাষা গ্রহণ করে ফেলেছে।”

বিহার-উড়িষ্যার সেন্সাস সুপারিন্টেন্ডেন্ট বলেন—বিহার ও উড়িষ্যার আদিবাসীদের মাতৃ-ভাষা অক্ষুণ্ণ আছে; যদিও দ্বিভাষিতা এদের মধ্যে খুবই প্রবল। মাত্র ভূমিজদের মধ্যে এক তুরীদের মধ্যে গোষ্ঠীগত ভাষার হানি দেখতে পাওয়া যায় যারা গোষ্ঠীগত ভাষা ছেড়ে স্থানীয় সাধারণ ভাষাকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করছে।

বাঙলার সেন্সাস রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে: এই অঞ্চলে মন্ডারভাষী লোক অনেক আছে, কিন্তু এক্ষেত্রে তারা বস্তুত গোষ্ঠীগত পরিপাক্ষের বাইরেই রয়েছে (‘out of environment’). সেই কারণে বাঙলার মন্ডারভাষীদের মধ্যে ভাষা-লুপ্তি কিছুটা ঘটেছে। মাল্ভু ভাষারও হানি হয়েছে। দ্রাবিড়ীয় কুরুখ অর্থী ওরাও ভাষার হানি হয়নি। তিব্বতী-মগোলীয়ভাষী আদিবাসীদের ভাষাও অক্ষুণ্ণ আছে।

আসামের সেন্সাস সুপারিন্টেন্ডেন্ট স্থানীয় আদিবাসীর ভাষার সজীবতা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—

“We can say definitely that the indigenous hill languages are as vigorous as ever and show no sign of erosion.”

“গ্রামের স্পষ্টভাবে বলতে পারি যে, পাহাড়ী আদিবাসী গোষ্ঠীর ভাষাগর্ভি আগের মতই সজীব হয়ে আছে। ধ্বংস হয়ে যাবার কোন লক্ষণ দেখা দেয়নি।”

আসামের আদিবাসীদের মধ্যে দ্বিভাষিতা বেড়ে চলেছে। আসামের সেন্সাস রিপোর্টে বলে: আসামের আদিবাসীদের পক্ষে বাঙলা বা হিন্দুস্থানী শেখবার কোন সুযোগ নেই। অসমীয়া ভাষাও খুব কম আদিবাসীই জানে। কিন্তু একাধিক গোষ্ঠীগত ভাষায় কথা বলতে পারে, এর কম আদিবাসীর সংখ্যা অনেক।

“There are small villages where the children grow up fluent in five languages each of which would puzzle a Dutchman to learn a little in two years.”

ছোট ছোট অনেক গ্রাম আছে, যেখানে আদিবাসীরা ছেলেবয়স থেকেই এমন পাঁচটি বিভিন্ন (আদিবাসী) ভাষায় অবাধে কথা বলতে পারে, যার একটির সামান্য কিছু শিখতেও কোন ডাচ ভদ্রলোকের পক্ষে দু'বছর সময় লাগবে।

## ভাষা বিভাগ

(ক) আঞ্চলিক মূলভাষা

(১) খাসি শাখা

আসাম

(২) মন্ডার শাখা

(ক) খেড়োয়ারি (সাঁওতাল,

হো, মন্ডা, ভূমিজ,

আসার (কোরোয়া) আসাম, বাঙলা,

বিহার, উড়িষ্যা,

মধ্যপ্রদেশ

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| (খ) কোরু                                   | মধ্যপ্রদেশ, বেরার                    |
| (গ) খারিয়া                                | বিহার, উড়িষ্যা                      |
| (ঘ) শবর                                    | মধ্যপ্রদেশ                           |
| (ঙ) গড়াবা                                 | মাদ্রাজ                              |
| (খ) তিব্বতী-চীন মূলভাষা                    | মাদ্রাজ                              |
| (১) হিমালয় শাখা                           |                                      |
| (ক) মুরমি                                  | বাঙলা, সিকিম                         |
| (খ) মগরি                                   | বাঙলা, আসাম, সিকিম                   |
| (গ) লেপ্চা (রোং)                           | বাঙলা, সিকিম                         |
| (২) উত্তর আসাম শাখা                        |                                      |
| (ক) আবোর                                   | আসাম                                 |
| (৩) বোড়ো (Bodo) শাখা                      |                                      |
| (ক) বোড়ো (সমতলবাসী কাছাড়ী ভাষা) আসাম     |                                      |
| (খ) গারো                                   | আসাম                                 |
| (গ) টিপরা (মুরং)                           | বাঙলা, আসাম                          |
| (৪) মিকির শাখা                             |                                      |
| (ক) মিকির                                  | আসাম                                 |
| (৫) নাগা শাখা                              |                                      |
| (ক) আংগামি                                 | আসাম                                 |
| (খ) সেমা                                   | আসাম                                 |
| (গ) আও                                     | আসাম                                 |
| (ঘ) তাংখুলা                                | আসাম                                 |
| (ঙ) নাগা (unclassified)                    | আসাম                                 |
| (৬) কুকি-চিন শাখা                          |                                      |
| (ক) মণিপূরী                                | আসাম                                 |
| (খ) থাডো                                   | আসাম                                 |
| (গ) লুসাই                                  | আসাম                                 |
| (ঘ) কুকি                                   | আসাম, বাঙলা                          |
| (গ) দ্রাবিড় মূলভাষা                       |                                      |
| (১) অর্ধদ্রাবিড় শাখা (Intermediate Group) |                                      |
| (ক) কুরুখ বা ওরাও                          | বিহার, উড়িষ্যা                      |
| (খ) মালতো                                  | বিহার, উড়িষ্যা                      |
| (গ) গন্দি                                  | মধ্যপ্রদেশ, মধ্য-ভারত এজেন্সি বেরার  |
| (ঘ) কন্দি বা কুই (খন্দ)                    | মাদ্রাজ, বিহার, উড়িষ্যা             |
| (ঙ) কোলামি                                 | মধ্যপ্রদেশ, বেরার                    |
| (ঘ) হিন্দ-ইরোপীয় মূলভাষা (Indo-European)  |                                      |
| (১) পূর্ব-হিন্দী শাখা                      |                                      |
| (ক) ভাঁলি                                  | বোম্বাই, মধ্য-ভারত এজেন্সি রাজপুতানা |

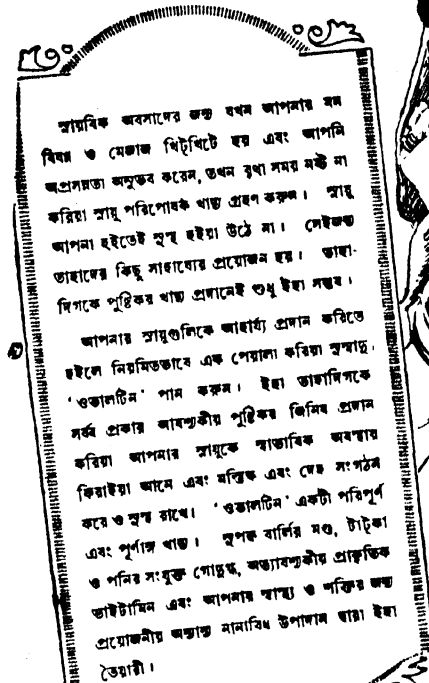
দক্ষিণ ভারতের অতি অনগ্রসর আদিবাসী গোষ্ঠীগণের ভাষার ঐতিহাসিক পরিচয় এখনো ঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি। এরা মানুষ জাতিরই প্রাচীনতম নিদর্শন। ডাঃ হাটন ১৯০১ সালের সম্ভাস রিপোর্টে বলেছেন:

“ভারতের আদিবাসীদের ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে

আমরা যেটুকু জ্ঞান লাভ করেছি, তার মধ্যে একটা বড় ফাঁক রয়ে গেছে। দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী উপজাতীয় গোষ্ঠীগণের ভাষা সম্পর্কে অনুসন্ধান ভালভাবে হয়নি। মন্ডারি ভাষা অতীতে কখনো ভারতের শেষ দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল কি না, তা বলা

অসম্ভব। ভারতে যে ভাষাতাত্ত্বিক সার্ভে (Linguistic Survey) হয়েছিল, তার মধ্যে দক্ষিণ ভারতকে ধরা হয়নি।.....সুতরাং দক্ষিণ ভারতের কাডার, কুরুমান, পল্লিয়ান, পানিয়ান প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠীর ভাষাগণের পরিচয় এখনো অনাবিস্কৃত রয়ে গেছে।” (ক্রমশঃ)

## মামুয় উপায় পীড়ন করিয়েন না আপনার মুখ ও শাস্ত্র নর্থ করিয়েন না।



উত্তম স্নায়ুর জন্য গাঢ় সূনিদ্রারও  
প্রয়োজন। রাগিতে শূইবার পূর্বে  
এক পেয়লা 'ওভালটিন' সেবনে  
সূনিদ্রার আবেশ হইয়া থাকে এবং  
ভোরে ঘুম ভাঙ্গিলে শরীর  
সুস্থ ও সতেজ মনে হয়।



## ওভালটিন

OVALTINE বলকারক পানীয় (খাদ্য)

পরিবেশক—গ্রেহাম স্ট্রোং কোং (ভারতবর্ষ) লিঃ  
৬, লায়ন্স রোড, কলিকাতা এবং বোম্বাই, করাচী ও  
মাদ্রাজ।

কিছুদিন পূর্বে ভারতবাসীর স্বাধীনতা-লাভের চেষ্টা প্রহত করিবার জন্য ইংরেজ অন্য কোন দেশে প্রচলিত শ্বেতশাসন প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। কার্টিশ নামক এক ব্যক্তি সেই অসম্ভবকে ভারতবর্ষের পক্ষে সম্ভব করিবার ভার লইয়াছিলেন। কিন্তু সেই শ্বেতশাসন যখন আর প্রচলিত রাখা সম্ভব হয় নাই, তখন আর এক নূতন পদ্ধতি প্রবর্তিত করা হয়। আজ আমরা তাহার বিষয় আলোচনা করিব। ইংরেজ বলিতেছেন, তাহারা ভারতবাসীকে ভারত শাসন-ভার প্রদান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিবেন—তাহার পূর্বে আমাদিগকে ডোমিনিয়নসমূহে প্রচলিত শাসন দিবেন। ডোমিনিয়নসমূহে যে শাসন প্রচলিত তাহা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না হইলেও তাহার সন্নিহিত। যখন প্রথম জার্মান যুদ্ধকালে ইংরেজ আশ্বাস দেন, ভারতবর্ষে ক্রমে ক্রমে “দায়িত্বশীল” শাসন প্রবর্তনই এদেশে ইংরেজের অভিপ্রেত তাহার অব্যবহিত পরেই ইংরেজ রাজনীতিকরা “দায়িত্বশীল” কথায় ব্যাখ্যা কি তাহা জিজ্ঞাসা করেন। অথচ লর্ড কার্জন অত্যন্ত সুপটুর্পে বলিয়াছিলেন—তিনিই ঘোষণায় ঐ শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং উহা তিনি পার্লামেন্টারী শাসন অর্থে প্রয়ুক্ত করিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক ঐ শব্দের অর্থ জানিবার জন্য বড়লাট লর্ড আরউইন বিলাতে গমন করেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি ঘোষণা করেন—বিলাতী সরকারের মত এই যে, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের যে ঘোষণায় “দায়িত্বশীল” শাসনের কথা বলা হইয়াছিল, তাহাতেই বন্ধা যায়—ভারতবর্ষে ডোমিনিয়নসমূহে প্রচলিত শাসন প্রবর্তনই ব্রিটিশ সরকারের অভিপ্রেত। তাহার পরে দীর্ঘ ১৬ বৎসর অতীত হইয়াছে এবং এই সময়ের মধ্যে ভারতবাসী সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-লাভের জন্য অকাতরে তাগতস্বীকার করিয়াছে। সুতরাং এতদিন পরে যদি ভারতবর্ষ ডোমিনিয়নসমূহে প্রবর্তিত শাসনাধিকার লাভ করে, তবে তাহার পক্ষে তাহাতে সন্তুষ্ট হইবার কোন কারণই থাকিতে পারে না। তবে বলা হইয়াছে, ডোমিনিয়নসমূহের শাসন স্থায়ী হইবে না—অস্থায়ী ব্যবস্থামাত্র। কিন্তু এই ১৬ বৎসর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাহারা ভারতবর্ষে মুসলমান সম্প্রদায়কে যেভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদিগের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান বলিয়া পরিচিত মুসলিম লীগ বলিয়াছেন—মুসলমানরা স্বতন্ত্র জাতি এবং তাহারা ভারতবর্ষে মুসলমানাতিরিক্ত সম্প্রদায়ের সহিত এক রাষ্ট্রে বাস করিতে পারেন না। ইংরেজ যখন বলিয়াছেন, তাহারা ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দিবেন, তখন গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে তাহাদিগের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে শাসন-পরিচালনভার দিয়া

## বাংলার কথা

শ্রীহরেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

কংগ্রেসকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের সহিত মীমাংসা করিতে দেওয়া সঙ্গত ছিল। কিন্তু তাহারা যে তাহা করেন নাই, তাহা ভেই তাহাদিগের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় অন্যায়সে ব্যক্তিগত পারা যায়। ভারতবর্ষকে আপাতত দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দুর্বল করা হইল—দুইভাগে বিভাদ চলিতে থাকিবে—পারিলে তাহারা ভারতবর্ষকে তিনভাগে বিভক্ত করিতে চাহেন—হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, রাজস্থান। পাকিস্তান ডোমিনিয়ন হইয়া ইংরেজের অনুগত করিবে।

যে যুক্তিতে মুসলিম লীগ ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিতে চাহিলে ইংরেজ সাগছে “তথ্যস্তু” বলিয়াছেন—সেই যুক্তিতে তাহারা পাজাব ও নাওলা বিভাগ অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তবে তাহা সহজে স্বীকারও করেন নাই। সেজন্য অন্য যুক্তিরও প্রয়োজন হইয়াছিল; সে যুক্তি—রক্তপাত, নরহত্যা, নারীনির্ধাতন, গৃহদাহ।

বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু বাহাদিগের অন্যায় ও অত্যাচারে বিভাগ অনিবার্য হইয়াছে সেই সচিবসংঘকে বিদায় দেওয়া হইল না—তাহাদিগের সম্বন্ধে স্নেহপরবশ শাসক তাহাদিগকে শাসনভার দিয়া রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্থানাতিরিক্ত অংশের জন্য “ছায়া-সচিবসংঘ” গঠিত করিলেন।

বাঙলা গভর্নর ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারা জারি করিয়া স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ না করার জন্য যুক্তি দিয়াছেনঃ—

(১) শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে তিনি এক-জনের হস্তে শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার বিরোধী।

(২) যখন ভারতীয়দিগকে শাসনক্ষমতা প্রদান করা হইবে, তখন তাহাদিগকে সে ক্ষমতায় বঞ্চিত করা অশোভন।

ভারতসচিব লর্ড মর্গি পূর্ববঙ্গের পদ-তাগকারী ছোটলাট স্যার ব্যামফাইন্ড ফুলারের সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন—“আমি রেলের এঞ্জিন চালাইতে যেমন অযোগ্য, ফুলার পূর্ববঙ্গের মত প্রদেশের শাসনকর্ম পরিচালিত করিবার তেমনই অযোগ্য।” স্যার ফ্রেডারিক বারোজ যে বাঙলার মত প্রদেশের শাসনকার্য পরিচালিত করিবার অযোগ্য তাহার

পরিচয় আমরা অনেক পাইয়াছি। ফুলার আপনার অযোগ্যতা ব্যক্তিগত পারেন নাই; বারোজ, বোধ হয় ব্যক্তিগত তাহা গোপন করিয়াছেন। তিনি বাঙলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাহার নির্ধারিত কর্তব্য পালন করেন নাই বা করিতে পারেন নাই—অথচ পদত্যাগও করেন নাই। যে সচিবসংঘের অন্যায়ের বাঙলা জর্জরিত তিনি সেই সচিবসংঘের অবসান ঘটান নাই। আর তিনি সেই সচিবসংঘকেই শাসনভার দিয়া রাখিয়া অতিরিক্ত একটি সচিবসংঘ গঠিত করিলেন! আর কোন দেশে কোনকালে এমন ঘটে নাই।

ব্যবস্থা হইয়াছেঃ—

“বাঙলার বর্তমান (মুসলিম লীগ) সচিবসংঘ বিভিন্ন বিভাগের ভারবহন করিবেন—কিন্তু তাহারা কোন নীতির পরিকল্পনা করিলে, তহা পশ্চিমবঙ্গের সচিবরা তাহাতে সম্মত না হইলে, কেবল পূর্ববঙ্গে প্রবর্তিত হইবে।

“পশ্চিমবঙ্গ সংক্রান্ত সকল কার্যে পশ্চিমবঙ্গের সচিবদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। দুই দলে মতভেদ ঘটিলে বিষয়টি গভর্নরসহ সমগ্র সচিবসংঘ কর্তৃক বিবেচিত হইবে। পশ্চিমবঙ্গের সচিবগণ যে কোন বিষয়ের নিখপত্র চাহিয়া সে সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে পরিবেন এবং দৃষ্টান্তে তাহাদিগের প্রস্তাব পরীক্ষা করিতে নির্দেশ দিতেও পারিবেন। কেবল পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে তাহারা নীতি প্রবর্তন করিতেও পারিবেন এবং তাহারা যে নীতি প্রবর্তন করিবেন তদনুসারে কাজ হইবে।”

এখনও মুসলিম লীগ সচিবসংঘের পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে নীতি পরিকল্পনার অধিকার রহিল—পশ্চিমবঙ্গের সচিবসংঘ তাহাতে আপত্তি করিতে পারিবেন এবং সে বিষয়ে শেষ নির্ধারণ সগভর্নর সমগ্র সচিবসংঘের থাকিবে।

এই ব্যবস্থায় যে অসুবিধা ঘটিবে, তাহা বলা বাহুল্য। তবে ইহা মীমাংসার সোপান হিসাবে হইয়াছে।

বাঙলার কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—“কংগ্রেস কাহাকেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজে বাধ্য করার বিরোধী। বিশেষ আপনার স্বদেশ-বাসীর সহিত ব্যবহারে মীমাংসা করিয়া লওয়াই প্রথমে আদরণীয়।”

কিন্তু মুসলিম লীগ যে কংগ্রেসকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করিয়াছেন, তাহা কি তিনি অস্বীকার করিতে পারিবেন? আর মুসলিম লীগ যখন মুসলমানদিগকে স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া দেশ বিভক্ত

করিতেছেন—তখন দেশবাসীর কথা কি হাস্যোদ্বীগকই হয় না?

সে যাহাই হউক মীমাংসায় যে ক্ষমতা পাওয়া গিয়াছে, তাহা গ্রহণ করিবার সংকল্প করিয়া বাঙলায় কংগ্রেসী দলের দলপতি উষ্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ গভর্নরের আহবানে সচিবসংঘ গঠিত করিয়াছেন। কে কোন বিভাগের নিকে লক্ষ্য রাখিবেন, তাহাও স্থির হইয়াছে—

উষ্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ—স্বরাষ্ট্র ও উন্নয়ন

উষ্টর বিধানচন্দ্র রায়—অর্থ, গণস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যশাসন

শ্রীনিজুবিহারী মাইতি—শিক্ষা, সেচ ও জলপথ ইত্যাদি

উষ্টর নুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বাণিজ্য, শিল্প ও শ্রম

শ্রীরাধানাথ দাস—দেশাস্ত্রিক সরকার

শ্রীমোহনীনোহন বর্মণ—বিচার ও আইন

শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর—কৃষি, বন ও মৎস্য

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়—রাজস্ব, ভূমি ও কল্যাণ

শ্রীকমলরক্ষা রায়—সমন্বয়, সাহায্য ও ঋণ

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ—পুর্ন

শ্রীযশোবন্ত পাল —

বিধানসভা এখন বিশেষ। তিনি প্রত্যাহত না হওয়া পর্যন্ত যাদবশ্রবণ, তাহার স্থলে কাজ করিবেন। বিধানসভা প্রত্যাহত করিলে বিভাগের ভার সম্বন্ধে নতুন ব্যবস্থা হইবে। প্রধান সচিবরূপে উষ্টর প্রফুল্লচন্দ্র যে বিসর্জিত প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, তিনি উষ্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সচিবসংঘে যোগ দিয়া তাহাদের সহিত সহযোগ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। শ্যামাপ্রসাদবাবু সম্মত হইতে পারেন নাই। তিনি কোন আহবান প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদবাবু এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—

মুসলিম লীগ সচিবসংঘ যতদিন শাসন-কার্য পরিচালিত করিতে পারিবেন, ততদিন নতুন সচিবসংঘ দেশবাসীর কোন উপকার করিতে—তাহাদিগের আশা—পূর্ণ করিতে পারিবেন না। অঞ্চ লীগ সচিবসংঘের করণ হইতে বাঙলাকে বিশেষ কলিকাতাকে রক্ষা করাই বর্তমানে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কার্য। এখন জনগণের দুইটি দাবী করা প্রয়োজন—

(১) যে স্থলে দুই সচিবসংঘের মতান্তর ঘটবে সেই স্থানেই পশ্চিমবঙ্গ সংসদীয় ব্যাপার গভর্নরকে পশ্চিমবঙ্গের সচিবসংঘের মতান্তর হইতে হইবে। নতুন সচিবসংঘের কর্মচারী নিয়োগের ও বন্দী করিবার অধিকার থাকিবে। ইহা সচিবসংঘের অধিকার এবং ইহার অভাব তাহাদিগের আত্মসম্মানবিরোধী।

(২) যতদিন বর্তমান ব্যবস্থা থাকিবে,

ততদিন পশ্চিমবঙ্গের সচিবসংঘের পূর্বসংঘের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রস্তাব করিবার অধিকার থাকিবে।

উষ্টর শ্যামাপ্রসাদ তাহার বিবৃতির উপ-সংহারে বলিয়াছেন—

বাঙলায় যে শোচনীয় নাটকের অভিনয় হইয়াছে, তাহার প্রধান অভিনেতা মিষ্টার সুরাবর্নীকে মধ্যবর্তীকালের জন্যও প্রধান সচিব রাখা আপত্তজনক। তিনি ও তাহার সহসচিবগণ পশ্চিমবঙ্গের আস্থা হারায়াছেন—তাহাদিগকে প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত রাখা অসম্ভব। নতুন সচিবসংঘকেই প্রকৃত ক্ষমতা দিতে হইবে। কংগ্রেসও স্বীকার করিতেছেন, কংগ্রেস যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহা “ছায়া সচিবসংঘ” পাওয়া যায় নাই।

নতুন সচিবসংঘ সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য করা হইয়াছে, তাহারা কি নিম্নলিখিত কাজগুলি করিতে পারিবেন?—

(১) পাজাবী পুলিশ দূর করা এবং কলিকাতার সমস্ত অধিবাসিগণের নিরাপত্তার জন্য আনোপাস্ত পুলিশের পরিবর্তন সাধন।

(২) ১০০ নং হারিসন রোডের মামলায় আপীল করা।

(৩) অন্তত কলিকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গে “সুয়ো” সম্প্রদায়ের যে সকল লোককে তাড়াহাড়ি চাকরী দেওয়া বা চিকানার করা হইয়াছে, তাহাদিগের নিয়োগ অগ্রাহ্য করা

(৪) বিহার হইতে তাহাদিগকে আনা হইয়াছে, তাহাদিগকে বিহারে প্রেরণ করা।

(৫) কলিকাতা, হাওড়া ও পশ্চিমবঙ্গের সকল স্থান হইতে গুডাবিগকে বাহ্যিক করা।

(৬) লীগ সচিবসংঘের সমর্থক ও মনোনীত ব্যক্তিগণকে মোটরযানের (ট্যাক্সী ও বাস প্রভৃতি) জন্য নতুন লাইসেন্স বন্ধ করা বা প্রত্যাহার করা।

সন্দেহ, সংশয়, আশা—এই সকলের মধ্যে কংগ্রেসীরা এই সচিবসংঘ গঠন করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের লোক যে এই সচিবসংঘকে আবশ্যক সহযোগ প্রদান করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অবস্থা সেরূপ তাহাতে তাহারা কতদিন কিভাবে কাজ করিতে পারিবেন, তাহাই দেখিবার বিষয়।

উষ্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ জানাইয়াছেন, তিনি উষ্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সচিব হইয়া সহযোগ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকেও অনুরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন কিনা, তাহা তিনি বলেন নাই। তাহা জানিতে বাঙলার লোকের কৌতূহল অনিবার্য। বাঙলার আজ বড় দুর্দিন। বাঙলার উপর অমরকটের ছায়া ঘনীভূত হইয়া দর্ভিকের আকার ধারণ করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ হইতে চাউল পূর্ব-বঙ্গে রপ্তানী হইতেছে এবং রহা হইতে যে

চাউল বাঙলার আমাভাব মিটাইবার জন্য আমদানী করা হইয়াছে, তাহাও মুসলিম লীগ সচিবসংঘের নির্দেশে, চট্টগ্রামে গিয়াছে, বাঙলা নানারূপে দুর্দশাগ্রস্ত। এই সময়ে যদি পশ্চিমবঙ্গে স্বতন্ত্র সচিবসংঘ গঠিত হইত, তবে যে সুব্যবস্থার আশা করা হইত, সে সুব্যবস্থা নতুন সচিবসংঘ করিতে পারিবেন কিনা, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। তবে নতুন সচিবসংঘ দেশবাসীর শূভেচ্ছা লইয়া কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। যদি তাহাদিগকে সংগ্রামই করিতে হয়, তবে তাহাতে তাহারা কাতর হইবেন না; কারণ, স্বাধীনতা যে বিনা সংগ্রামে ও বিনা ত্যাগে অর্জন করা যায় না, তাহা তাহাদিগের বিশেষ জ্ঞান আছে।

ছয় সপ্তাহে হারত তাহারা দেশবাসীর কোন উল্লেখযোগ্য উপকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু তাহারা যদি এই সময়ে দেশবাসীর অপকার গ্রহণ করিতে ও পরবর্তীকালের জন্য কল্যাণকর কার্যের পরিকল্পনা করিতে পারেন, তবে তাহাও পশ্চিমবঙ্গবাসীরা পরম লাভ বলিয়া মনে করিয়া সেজন্য তাহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

বাঙলাকে বাঙলা ও পার্শ্বস্থানে বিভক্ত করিবার ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য সমিতি গঠিত হইয়াছে—

সভাপতি—সার দিল্লি রাউলফ। ইনি বিলাতে বড় ব্যারিস্টার।

সদস্য—হিন্দু—হাইকোর্টের জজ শ্রীচন্দ্র-চন্দ্র বিশ্বাস ও শ্রীবিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায়; মুসলমান—হাইকোর্টের জজ মহম্মদ আজাম ও রহমান।

এই সমিতি উভয় বঙ্গের সীমা নির্দিষ্ট করিবেন। সীমা নির্ধারণ সম্বন্ধে নানাস্থানে সভা হইতেছে এবং যে স্থানেই পারিতোষ্যে, মুসলিম লীগ সচিব সংঘের অধিনস্থ কর্মচারীরা সভাপ্রবেশন নিষিদ্ধ করিতেছেন। নদীয়া রাণাহাটে শ্রীনরেশকুমার বসুর সভাপতিত্বে ও যশোহরে শ্রীমতী সুচেতা কৃপাঙ্গনীর সভাপতিত্বে সভা হইবার কথা ছিল—সভা নিষিদ্ধ হইয়াছে। ফরিদপুর গোপালগঞ্জের ব্যাপার আরও উল্লেখযোগ্য। মুসলিম লীগের দল শোভাযাত্রান্তে সভা করিবার পরেই ১৪৪ ধারা জারী করিয়া হিন্দুদিগের সভা বন্ধ করা হইয়াছে। কলিকাতায় মেয়রের আহবানে দুর্দিনবাপী সভায় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে—কলিকাতার, প্রেসিডেন্সী বিভাগের, রাজমহলী বিভাগের, ঢাকা বিভাগের ও বর্তমান বিভাগের প্রতিনিধিদলের সভায় বাঙলার দুই অংশের সীমা যথাসম্ভব নদী করা হউক। কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সংঘ হইয়া ভারতীয় রাষ্ট্র-সংঘে যোগদানের জন্য নানাস্থানের হিন্দুদিগের আগ্রহ যে অত্যন্ত সঙ্গত ও স্বাভাবিক

বলা বাহুল্য। - বাঙালার মুসলীম লীগের "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" ঘোষণাবাধি—এই প্রায় এক দশককাল আমরা কলিকাতা হইতে নোয়াখালি পুন্ড্রা প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলীম লীগের যে আত্মচার ও অত্যাচার ভোগ করিয়া আসিতেছি, তাহাতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, পাকিস্থান বাঙালয় সংখ্যালঘিষ্ট হিন্দুদিগের দ্বারা আরও অত্যাচারিত থাকিবে না।

মিষ্টার জিয়া বলিয়াছেন, অধিবাসী-বিনিময় সহজসাধ্য। তাহা সহজসাধ্য হউক না হউক বাধ্য হইয়াই বোধ হয়, হিন্দুদিগকে পাকিস্থান হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিতে হইবে। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গে আবশ্যিক ভূমি থাকা প্রয়োজন। বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হইবার প্রায় সংগে শ্রীনরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী সর্বপ্রথম এই কথা বলিয়াছিলেন। স্বতীর্ণন যাইতেছে, ততই সেই দাবী সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। দেখা যাইতেছে, ইতোমধ্যেই পূর্ববঙ্গে কোন কোন স্থানে মুসলমানরা নবোদ্যমে হিন্দুদিগকে নির্বাসিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে—এমন কথাও বলিয়াছে যে, পূর্ববঙ্গ পাকিস্থান—হিন্দু হইয়া তথা হইতে চলিয়া যাইক, নহে ত মুসলমান হউক। বাস্তবিক নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমানদিগের দ্বারা হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করা মুসলমানদিগের প্রাথমিকায়ীভাবই হইয়াছে। বাঙালার কোন কোন স্থানে ও গ্রীহটে মুসলমানদিগের সংখ্যাধিক্যের তাহাই কারণ।

উত্তর শিব চট্টোপাধ্যায় নদী ধরিয়া যে সীমা নির্ধারণ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতে সামান্য পরিবর্তন করিয়া শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু যে পরিকল্পনা প্রচার করিয়াছিলেন—কলিকাতার মেয়রের আহ্বানে অনুষ্ঠিত সভায় তাহার সামান্য পরিবর্তন করিয়া সীমা এইরূপ করিতে বলা হইয়াছে:—

দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জিলার পূর্ব সীমা হইতে করতোয়া ও আত্রাই ধরিয়া দিনাজপুরে আসিয়া তথা হইতে নুরগোবাদের নিকটে ফকিরগাঁও পর্যন্ত অংশ এবং তাহার পরে বৈরাণী হইয়া পদ্মা ধরিয়া মেমনা হইয়া নয়াদাঙ্গগাঁও হইয়া আড়িয়াাল খালের পরে বরিশালের নদী হইয়া বড়শিবরের পথে হরিণঘাটা হইয়া বগোপসাগর।

কলিকাতা যে পশ্চিম বঙ্গের রাজধানী হইবে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। আন্তর্জাতিক আইনের মতে কোন রাষ্ট্রের রাজধানীর ৫০ মাইলের মধ্যে অন্য রাষ্ট্রের সীমা হওয়া অসঙ্গত। বিমান বাহুর আরম্ভ হইবার ফলে এই দূরত্ব আরও বর্ধিত করা ই সম্ভব। বাংলা দুই ভাগে বিভক্ত হইলে পশ্চিম বঙ্গের রাজধানী কলিকাতার উপকণ্ঠেই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের সীমা থাকা বিপজ্জনক। সত্য বটে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সীমায়

কেবল সীমা নির্দেশক স্তম্ভ আছে; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে:—

(১) কোন রাষ্ট্রেরই রাজধানী তাহার নিকটে নহে;

(২) দুই দেশে বিবাদ নাই, কেহ কাহারও ভূমি আত্মসাৎ করিতে চাহে না।

গত ১৬ই আগস্ট হইতে বাংলায় এবং তাহার পরে পাঞ্জাবে আমরা যাহা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই যে, বাংলা দুই ভাগে বিভক্ত হইলেই মুসলমানগণ আর হিন্দুর উপর অত্যাচার করিবে না। এ বিষয়ে পুনরুদ্ধার আবশ্যিক যে, পশ্চিম জওহরলাল নেহরু ও গ্রীকফ সিংহ উভয়েই স্বীকার করিয়াছেন, কলিকাতায় বহু বিহারী বসতি হইবার ফলে বিহারে হিন্দুদিগের মনে যে বিদ্বেষভাবের উদ্ভব হইয়াছিল, নোয়াখালিতে নারী নিগ্রহের সংবাদ তাহাই মুসলমানদিগকে আশ্রমণে হিন্দুদিগকে প্ররোচিত করিয়াছিল এবং মুসলিম লীগ যে বিহারে মুসলমানদিগের দুর্দশার বর্ণনাদি দ্বারা হাজারহাজা (উত্তর পশ্চিম সীমান্তে) মুসলমানদিগকে উত্তোষিত করিতে চাতি করে নাই, তাহারও প্রমাণ আছে। তাহার পরে সর্গর বলদেব সিংহ বলিয়াছেন, পাঞ্জাবে হিন্দু ও শিখদিগের প্রতি মুসলমানগণ যে অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহা নোয়াখালিতে তাহা-দিগের অত্যাচারকেও নিষ্প্রভ করিয়াছে। কাজেই আশঙ্ক্য করিতে হয়, ভারতীয় রাষ্ট্র-সংঘের পূর্ব সীমান্তস্থিত পশ্চিমবঙ্গকে মুসলমান রাষ্ট্র পাকিস্থানের আশ্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যাহারা যুদ্ধকালে নহে—শান্তির সময়ও পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার হীন উদ্দেশ্যে নারী হরণ, নারী নিগ্রহ, ধর্মান্তরকরণ এই সকল বর্ধিত কার্যের দ্বারা স্বীয় সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে চাতি হয় না, তাহাদিগের সম্বন্ধে সতর্ক থাকাই প্রয়োজন।

লর্ড কার্জন যখন বাংলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি দুইটি রাষ্ট্রের কথা মনেও করিতে পারেন নাই। রাজনীতিক ও শাসন-বিষয়ক উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি তাহা করিয়াছিলেন। তখন তিনি পশ্চিম বঙ্গকে যে ভূভাগ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও বর্তমানে বিবেচ্য। এবার যে বিভাগ হইতেছে, তাহাতে পশ্চিম বঙ্গের দাবী যদি উপেক্ষিত হয়, তবে যে আবার অশান্তির উদ্ভব অনিবার্য হইবে, তাহা অনায়াসে বলা যায়।

বাংলার মুসলমানদিগের অধিকাংশই কোন না কোন কারণে ধর্মান্তরিত হিন্দু। মুসলিম লীগের প্রয়োজন্য তাহারাও কিরূপ ব্যবহার করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা পাইয়াছি। সেই জন্যই পশ্চিম বঙ্গের পক্ষে

আশঙ্ক্যকার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন।

বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের ভূমির উর্বরতা পূর্ববঙ্গের ভূমির উর্বরতা অপেক্ষা অল্প। সে কারণে পশ্চিম বঙ্গ তাহার বর্তমান ও পূর্ব-বঙ্গভাগী অধিবাসীদিগের জন্য অধিক ভূমি দাবী করিতে পারে।

তাহার পরে বাংলার নদীর কথা। বাংলার নদীসমূহের বৈশিষ্ট্য আছে। পশ্চিম ও মধ্য-বঙ্গের নদীগুলি গঙ্গার সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভাজিত। গঙ্গার স্রোতের অবনতির সংগে সংগে মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গ যে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে এবং বিশেষজ্ঞ স্যার উইলিয়াম উইলকিন্স তাহা বিশেষভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞান-সম্মত গবেষণার ফলে বাংলার নদীগুলির প্রবাহের পুষ্টি ও উন্নতিসাধন প্রয়োজন। সেজন্য গঙ্গার প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। যদি বাংলায় গঙ্গার প্রবাহ পথের কেন্দ্র স্থান পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে না পড়ে, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে ঈশ্বিত কার্য সাধন যেমন অসম্ভব হইবে, পূর্ববঙ্গ সরকারের পক্ষে তেমনই তাহার অনিষ্টসাধন সহজসাধ্য হইবে। হরিশ্চন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া নানাস্থানে গঙ্গার জল লওয়ায় যে বাংলায় গঙ্গার প্রবাহ দূর্বল হইয়াছে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য। সেই কারণে বাংলায় গঙ্গার প্রবাহ সম্বন্ধে বর্তমান ভারত সরকারের বিশেষ দৃষ্টিতে আছে এবং বাংলাকে হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানে বিভক্ত করিবার সময় তাহা গণ্য পক্ষে সেই দৃষ্টিতে মনে রাখিয়া কাজ করা সম্ভব। গঙ্গার প্রবাহের উন্নতি সাধিত না হইলে ২৫ বৎসরের মধ্যে কলিকাতার নিম্নে স্থানসমূহ কৃষিকার্যের তথ্যোগ্য হইবে এবং ১০।১৫ বৎসর পরে আর বড় জাহাজ কলিকাতা বন্দরে আসিতে পারিবে না। এই সকল বিষয়ই সীমা নির্ধারণ সমিতির বিবেচনার বিষয়।

বর্তমান ভারত সরকার বোধ হয়, দুইটি প্রতিষ্ঠানের মতেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করিবেন—ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ও অধিকাংশ ভারতবাসীর একমাত্র রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস এবং সম্প্রদায়বিশেষের ও সংখ্যালঘিষ্ট মুসলমানগণের একাংশের প্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ। বিশেষ মুসলিম লীগ সম্বন্ধে তাহার অনেক স্থলে বিশেষ দৌর্বল্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মুসলিম লীগের দাবী যেমন ব্যাপক, তেমনই অসঙ্গত। মুসলিম লীগের খাস দাবী প্রকাশিত হইবার পূর্বেই একদিকে মিষ্টার সুদারশর্মা ও অপর দিকে মিষ্টার আকাম খানের পত্র—বাংলায় মুসলিম লীগের এই মুখপত্ৰদ্বয় যে সকল দাবী উপস্থাপিত করিতেছেন, সে সকল "ছোয়া-

পূর্বগামিনী" মনে করিয়া বিচার। যদিও লর্ড পোথকলরেন্সও বলিয়াছিলেন, কলিকাতা কখন পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তথাপি মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে কলিকাতা পর্যন্ত যে দাবী করিবার সম্ভাবনা আছে, তাহা পূর্বোক্ত সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে কলিকাতার কোন কোন অঞ্চলে হিন্দুদিগকে বিভাগিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় কলিকাতা—অভাবে কলিকাতার একাংশ দাবী করিবার অভিপ্রায় মুসলিম লীগের ছিল এবং সেই অভিপ্রায়ানুযায়ী কাজই করা হইয়াছে। নোয়াখালি ত্রিপুরা অঞ্চল হিন্দুশূন্য করিবার যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহাও যে পরিকল্পনানুযায়ী সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। কিভাবে বাংলায় মুসলিম লীগ সচিব সত্ত্বের প্রধান-সচিব মিষ্টার সুরাবদী একদিকে সংবাদপত্রের কঠোর ও অন্যদিকে মুসলিম লীগের কৃত অনাচার ও অত্যাচারের প্ৰবন্ধ গোপন করিয়াছেন এবং অলস গবর্ণর তাহার সরকারের প্রদত্ত বিবরণে বিশ্বাস স্থাপন

করিয়া বিলাতে অথবা সংবাদে অবস্থার গুরুত্ব অব্যবহার করিয়াছেন, সে সকলের আলোচনা আজ আর আমরা করিব না। কিন্তু পাকিস্তানে হিন্দুদিগের—মুসলমানানিতিরূপের অবস্থা বিবরণ হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করিবার জন্য সে সকল স্মরণ রাখা প্রয়োজন। হিন্দুরা এদেশের অধিবাসী, সেইজন্য হিন্দুদিগের নিবাসিত বিবরণই অধিকমান; কিন্তু খৃষ্টানরাও—মুসলমান নহে বলিয়া এদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হইবার পূর্বে কিরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিত তাহা হুগলীতে যুরোপীয়দিগের লাঞ্ছনা জানা যায়।

পাকিস্তানে হিন্দুরা কিরূপ ব্যবহার লাভ করবে, তাহার দৃষ্টান্ত ইতিমধ্যেই সিন্ধু প্রদেশে পাওয়া যাইতেছে।

মুসলিম লীগের পক্ষে অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্যদের অন্যতম সদস্য আবদুর রব নিম্নতর কিতাবে পাকিস্তানে টেলিগ্রাফের ও টেলিফোনের যন্ত্রপাতি সরাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিলে মনে হয়, অন্য কাহারও স্বার্থ তাহারিদের অধীনে অক্ষুণ্ণ থাকিবার সম্ভাবনা অতি অল্প।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্যার বদুনাথ সরকার

বাংলার বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন—উত্তরে দার্জিলিং হইতে আশ্রম করিয়া দিনাজপুর জিলার পরীতলা পর্যন্ত এবং দক্ষিণে রাজসাহী আত্রাই নদী ধরিয়া রাজসাহী জিলার বিদ্যাপুরের নিকট হইতে বহির্গত শিব নদী দিয়া মান্দা বিল পর্যন্ত এবং তাহার পরে আরও দক্ষিণে কুমারী বিল হইতে পদ্মা নদী পর্যন্ত পশ্চিম বাংলার সীমারেখা টানিতে হইবে।

কংগ্রেস যে সমস্বয় সমিতি গঠিত করিয়াছেন, সেই সমিতিতে এই সকল প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া সীমা-নির্ধারণ সমিতির নিকট আপনাদিগের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে হইবে।

আমাদিগের বিশ্বাস, সমিতি লোকমতের মর্মাদা রক্ষা করিবেন।

বাংলার সীমা-নির্ধারণের উপর বাঙালীর—(মুসলমানগণ আপনাদিগকে স্বতন্ত্র জাতি ও অভ্যন্তরীণ বলেন) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, শ্রম, সংস্কৃতি সবই নির্ভর করিতেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ কার্যের ভার আমাদিগের উপর অর্পিত হইয়াছে। আমাদিগের নিকট বাঙালী অনেক আশা করে।

## সাহিত্য সংবাদ

### প্রথম, জীবনী ও চিত্র প্রতিযোগিতা

কোড়হাট তরুণ সন্থ পরিচালিত উপরেক্ত প্রতিযোগিতার দিন পরিবর্তিত করিয়া আগামী ১ই শ্রাবণ, ইংরাজী ২৬শে জুলাই, ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে হইয়াছে। যোগদানোচ্ছ প্রতियোগীদের বিষয়গুলি সম্পাদক শ্রীহরিসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, কোড়হাট, আন্দুল মোড়ী হাওড়া এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। বিষয়গুলি সম্পূর্ণ মৌলিক হওয়া চাই। কলঙ্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিতে হইবে, পাঁচ পৃষ্ঠার বেশী নহে। বিষয়গুলি নিজস্ব এই মর্মে প্রধান শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অধ্যাপকের সহি করাইয়া লইতে হইবে। ছবি জুইং পেন্সিলে আঁকা চাই ১২"x৮" সাইজ।

### বিষয়ঃ—

#### প্রথমঃ—

- ১। ভবিষ্যৎ ভারতের স্বাধীনতার রূপ। (১০ম শ্রেণী ১ম ও ২য় বার্ষিক ছাত্র ও ছাত্রীদের)
- ২। রবীন্দ্রনাথকে ভালবাসি কেন? (৭ম ও তাহার নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের)

#### জীবনীঃ—

##### নেতাজী সুভাষ

(৭ম ও তাহার নিম্ন শ্রেণী ছাত্র ও ছাত্রীদের)

#### চিত্রঃ—

রবীন্দ্রনাথ (বার্ট) অথবা  
মারিকেল গাছ  
(ছাত্র ও ছাত্রীদের)

### আলোচ্যঃ—

#### যে কোন বিষয়

(ছাত্র ও ছাত্রীদের)

কর্ম মন্দির কর্তৃক

#### কবিতা ও গল্প প্রতিযোগিতা

কর্ম-সাহিত্য বিভাগের উদ্যোগে গল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাতে সকল স্কুলের ছেলেমেয়েই যোগদান করিতে পারিবে। প্রত্যেক প্রতিযোগীকেই নিজ নিজ নাম, ঠিকানা, ক্লাস, স্কুলের নাম, ঠিকানা ও বসস উল্লেখ করিতে হইবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল বা অমনোনীত লেখা ফেরৎ চাহিলে সঙ্গে উপরে টিকিট দেওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেক বিষয়ে দুইটি করিয়া পুরস্কার ও ১২ বৎসরের নিম্ন বয়স্কদের জন্য একটি বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইবে। লেখা ১৫ই শ্রাবণের মধ্যে নিম্নের যে কোন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবেঃ—

(১) ইন্দুচরণ চক্রবর্তী,

৫-এ, কৃষ্ণচর লেন,  
কলিকাতা—২৬

(২) সম্পাদক,

কর্ম-মন্দির,  
পারুলিয়া, ঢাকা।

#### প্রথম প্রতিযোগিতা

পঞ্জীয়নগত সমিতি (সাহিত্য বিভাগ) কর্তৃক নিম্নলিখিত যে কোন কটি বিষয়ের উপর প্রথম আহ্বান করা যাইতেছে—কোন প্রবন্ধ মূল্য নাই।

#### বিষয়ঃ—

- (১) শরৎচন্দ্রের জীবনী সম্বন্ধিত সমালোচনা-মূলক রচনা

(২) পরিকল্পনা (planning) ও ভারতীয়

জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে উহার প্রয়োজনীয়তা

(৩) ভারতের বর্তমান সমস্যা সমাধানের উপায়

(৪) বর্তমান বাংলার স্টাটীশিকা ব্যবস্থা।

যোগদানের শেষ তারিখ ৩১শে আগস্ট, ৪৭। বিশেষ বিবরণের জন্য দ্বয় পরসার স্টাটীকটসহ লিখুন—সুভাষ সরকার, ২২১৩, চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, ভবানীপুর, কলিকাতা—২৫।

বঙ্গীয় যুব-শক্তি সন্দের উদ্যোগে রচনা

### প্রতিযোগিতার ফলাফলঃ

ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি—বাঙলা (১ম)

শ্রীমতী কমলাদেবী চক্রবর্তী, ভবানীপুর, কলিকাতা। (২য়) শ্রীগৌরীশঙ্কর রায় চৌধুরী, কালীঘাট, কলিকাতা।

ইংরাজী (১ম) শ্রীশ্রীগোবিন্দ ভট্টাচার্য, খরুট

রোড, হাওড়া। (২য়) শ্রীঅশোকমোহন রায়, আনন্দ রায় রোড, ঢাকা।

ভারতীয় শিক্ষা—বাঙলা (১ম) শ্রীদীপকুমার

দাশ ঈশ্বরদী, পাবনা। (২য়) কুমারী লাবণ্য চট্টোপাধ্যায়, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

ইংরাজী (১ম) কুমারী লাবণ্য চট্টোপাধ্যায়, শ্যামবাজার, কলিকাতা। (২য়) শ্রীঅমলকুমার মিত্র, দেহাটী আসাম।

পরীক্ষক—ইংরাজী—অধ্যাপক হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়। বাঙলা—সহসচিবিত্তক প্রমথনাথ বিশ্বা।

ইং ২৭শে জুলাই, রবিবার ১৯৪৭ বেলা ৩টায় ১৬২নং বহুবাজার স্ট্রীটে (দোতলার) পুরস্কার বিতরণী সভা বসিবে। প্রতিযোগিতাগুলির উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।





## কোষ্ঠবদ্ধতা না মানের ভুল

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য ডি টি এম

**উপবন্ধতা** প্রধানত এক রকমের অনুভূতিমূলক অসুস্থতা। অর্থাৎ মলত্যাগ যে আশানুরূপ হলো না, এইটে অনুভব করেই আমরা এক এক প্রকারের শারীরিক ও মানসিক অস্বাস্থ্য বোধ করতে থাকি। যারা কঠিন কথনো এই প্রকারের অসুস্থতা অনুভব করে, তারা এই নিয়ে খুব বেশি কাতর হয় না, কিন্তু যারা বারো মাস যাবৎ এটা অনুভব করে, তারা প্রত্যহই এর কারণে দারুণ অশান্ত ভোগ করতে থাকে। অথচ এই জাতীয় শারীরিক অস্বাস্থ্যের অনুভূতিটুকু ছাড়া অন্য কোন প্রত্যক্ষ বাহ্যিক লক্ষণ নেই।

এই রকম বারোমাসে কোষ্ঠবদ্ধতায় কষ্ট পায় কারা? প্রধানতঃ তারা সভ্য এবং শিক্ষিত, সকল রকমের অনুভূতির ক্রিয়া যাদের মধ্যে অতি-মাত্রায় সূক্ষ্ম, অর্থাৎ যারা সমাজের উচ্চস্তরে থাকে এবং আয়েশের জীবন যাপন করে, তারা। এটাকে তারা নিজেদের একটা যাপ্য ব্যাধি হিসেবেই গণ্য করে নেয়।

লোকে বলে যে, এটা বর্তমান সভ্যতারই একটা বিশিষ্ট রকমের কুফল। কিন্তু বাস্তব-পক্ষে সেকথা ঠিক নয়। যেচক, বিরোচক, জোলাপ প্রভৃতির ব্যবস্থা মনুষ্যসমাজে বহুকাল আগের থেকেই প্রচলিত আছে। কোষ্ঠ পরিষ্কারের জন্যে মানুষ যুগে যুগে কত রকমেরই উপায় উদ্ভাবন করে এসেছে, তার বিস্তারিত কাহিনী প্রত্যেক দেশেরই ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া যায়। ইচ্ছানুরূপ মলত্যাগ হয়ে থাক, এটা যে কেবল আজকালকার লোকেই কামনা করে থাকে তা নয়, বহু পুরাকালের লোকেরাও ঠিক এমনিভাবেই এ কামনা করতো। অশ্র-ধোঁতির যে প্রক্রিয়াকে আমরা আজকাল ছুঁন নেওয়া বা এনিমা নেওয়া বলে থাকি, এটা নিতান্ত বর্তমান যুগের আবিষ্কার নয়। আমাদের রামায়ণ-মহাভারতের আমলের অনেক আগেই এর আবিষ্কার হয়ে গেছে। ফারাওদের আমলের অতি প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার যে ইতিহাস ভূগর্ভ থেকে সম্প্রতি খুঁজে বের করা হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে তখনকার কালের পাণ্ডিত্য এই অন্তর্ধোঁতির উপকারিতা সম্পর্কে অনেক রকমের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করে গেছে। তারা বলতো যে, মানুষের পরমায়ু কয়ের একমাত্র কারণ হলো অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া, আর তার একমাত্র প্রতিকার হলো খাবার যে অস্বাস্থ্য

পদার্থগুলিকে শরীর মল হিসেবে বর্জন করতে চায়, সেগুলি যখন আপন সম্যকরূপে নিগত হয় না, তখন সেগুলিকে নিয়মিত অন্তর্ধোঁতির দ্বারা নিগত করে দেওয়া। এক জাতীয় লম্ব-চণ্ডু পাখীর উদাহরণ দিয়ে তারা বলতো যে, এই চনৎকার অন্তর্ধোঁতির উপায় তারা ঐ পাখীর কাছ থেকে শিখেছে। তারা লক্ষ্য করেছিল যে, ঐ জাতীয় পাখী তার লম্বা চণ্ডু দিয়ে মুখের মধ্যে খানিকটা জল টেনে নেয়, তারপরে মলম্বারে চণ্ডু প্রয়োগ করে সেই জল দিয়ে তারা নিতাই নিজেদের অন্ত ধোলাই করে মলত্যাগ করে থাকে। তারই অনুকরণে তখনকার মিসর দেশের সুসভ্য এবং অবস্থাপন্ন লোকেরা অনেকেই নিজেদের কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করার জন্যে এই প্রক্রিয়াট অভ্যাস করে নিয়েছিল। তারা খাবার সময় যথেষ্ট পরিমাণেই খেতো এবং পবে অন্তর্ধোঁতির দ্বারা নিত্য নিজেদের কোষ্ঠ পরিষ্কার করে নিতো। প্রাচীন রোম রাজ্যেও ধনী রাজনবর্গের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে কোষ্ঠ পরিষ্কার করে নেবার রীতি ছিল। ভোজে নিমগ্নিত হয়ে তারা যখন রাজপ্রাসাদে যেতো, তখন নিমগ্নিতদের বাতে যথারীতি বিরচন হয় এজন্য ভোজ্যবস্তুর সংগে প্রচুর বিরোচক ঔষধ সরবরাহেরও নিয়মিত ব্যবস্থা থাকতো। এই সকল বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, যখনই মানুষ বর্বরতা থেকে অপেক্ষাকৃত সভ্যতায় উন্নীত হয়েছে, তখনই তার আপন শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে অনুভূতিগুলো স্থূলতর থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে উঠেছে, আর তখনই আপন আদর্শনিযায়ী শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়ে এই কোষ্ঠবদ্ধতার গ্লানি সম্পর্কেও সে সচেতন হয়েছে। এ শব্দ আজ নয়, সর্বকালে সর্বদে-দেলে এমনিই চিরদিন ঘটে এসেছে। বর্বর মানুষের কোষ্ঠবদ্ধতা হয় না, আর হলেও তারা তাই নিয়ে আমাদের মতো এমন কষ্ট অনুভব করে না। এটা তারা গ্রাহ্যের বিষয় বলেই বিবেচনা করে না। মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীবের কখনো কোষ্ঠবদ্ধতা হয় না, আর হলেও তাতে তাদের অনিষ্ট হয় না। কেবল মানুষ, আর বিশেষ করে সভ্য জগতের মানুষেরাই এতে যখন তখন কষ্ট পায়।

কোষ্ঠবদ্ধতা যে আমাদের কেন হয় তাই নিয়ে ইতিপূর্বে অনেক রকমের বিচার বিবেচনা ও গবেষণা হয়ে গেছে। কেউ বলেন এটা খাবার প্রকারভেদে হয়ে থাকে কেউ বলেন

খাবার পরিমাণের ইতর্যবিশেষে এটা হয়, কেউ বলেন আমাদের খাদ্য প্রস্তুতের রীতির দোষেই এমন হয়, আবার কেউ বলেন স্থানীয় জল-হাওয়ার দোষেই হয়। এ বিষয়ে নানা লোকের নানা মত এবং বলা বাহুল্য কারো সঙ্গেই কারো মতের মিল হয় না। শব্দু তাই নয়, কোষ্ঠ-বদ্ধতায় যারা ভোগে, তাদেরও আবার নিজের নিজের এক একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত মত আছে। কোন রকমের খাদ্য খেলে যে কোষ্ঠবদ্ধতা হবে আর কোন রকমের খেলে হবে না, এ সম্পর্কে প্রত্যেকেই মূখে মূখে এক একটা তালিকা প্রস্তুত করে নিতে পারে। প্রত্যেকেরই ধারণা যে, এ বিষয়ে তার অভিমতটাই অকটা।

কিন্তু এখনকার যে যুগ, এটা হলো খাঁটি বৈজ্ঞানিক যুগ। এ যুগে নিজেদের মনের ধারণা অনুযায়ী কোন মীমাংসাই করা উচিত নয়। এতকাল পর্যন্ত তাই করতে গিয়েই আমরা বহুবার অনেক রকমের ভুল করে এসেছি, বিজ্ঞানই আমাদের সেই চিরকালের ভুলগুলোকে সংশোধন করে নিয়েছে। কোষ্ঠবদ্ধতা সম্পর্কে আমরা এখনও বহু রকমের ভুল করে থাকি, একমাত্র বিজ্ঞানের সাহায্য নিলেই তার সম্যক সংশোধন হতে পারে।

শারীরিক বিজ্ঞান থেকে আমরা এইটুকু জানি যে, পাকস্থলীতে আমরা যে সকল খাদ্য প্রেরণ করে থাকি, সেইগুলোই সমগ্র অন্ত্রনালী অতিক্রম করতে করতে মলে পরিণত হয়ে শেষ পর্যন্ত মলবীরে গিয়ে উপস্থিত হয়। খাবার এই গতিপথে পাকস্থলীর পরে পাড়ে ক্ষুদ্র অন্ত্রাদি, তারপরে পাড়ে বৃহৎ অন্ত্রাদি। পাকস্থলী থেকে শব্দু করে ক্ষুদ্র অন্ত্রাদি পর হয়ে বৃহৎ অন্ত্রের মূখে এসে পৌঁছতে খাবার মোটামুটি হিসেবে প্রায় ছয় ঘণ্টা সময় লাগে। কোনদিন কোন প্রকার খাবার পক্ষে যে কতখানি সময় লাগবে, তার অবশ্য কোন নিশ্চয়তা নেই, আমরা এটা নিতান্ত মোটামুটি হিসেবেই বলছি। বৃহৎ অন্ত্রটি ডান দিকের তলপেটের কাছ থেকে উদরগহনকে পৃথক করে বামদিকের তলপেটের কাছ পর্যন্ত ঘুরে যেতে দুটি বড়ো বড়ো বাক নিয়ে তিনভাগে বিভক্ত হয়েছে। এর এক একটি বিভাগকে অতিক্রম করে যেতে খাবার মোটামুটি প্রায় ছয় ঘণ্টা থেকে নয় ঘণ্টা পর্যন্ত সময় লাগে। অবশ্য তার বেশিও লাগতে পারে, আবার কমও লাগতে পারে। তখন আর তা খাদ্য নেই, সেটিই পরিপাক জীর্ণ মলে

পরিণত হয়েছে। অতঃপর সেটি সমস্ত অল্পপথ অতিক্রম করে মলভাণ্ডে গিয়ে জমা হয়। এই মলভাণ্ডকে বৈজ্ঞানিক ভাষাতে বলে সিগ্ময়েড। মোটের উপর বলা যায় যে, চব্বিশ ঘণ্টা পরে খাদ্য মলে পরিণত হয়ে মলভাণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হবে, অর্থাৎ আজ যে খাদ্য খেয়েছি, কাল সেটি মলরূপে নির্গত হবার জন্য তথায় গিয়ে প্রস্তুত থাকবে। অবশ্য এর কোন নিশ্চয়তা নেই, চব্বিশ ঘণ্টার জায়গায় কখনো কখনো তার আটচল্লিশ ঘণ্টাও লেগে যেতে পারে। সেটা সম্পূর্ণই নির্ভর করে খাদ্যের প্রকৃতির উপর, আর অশ্বসমূহের সাময়িক ক্রিয়ার উপর। তবে সাধারণত এর জন্যে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না। কয়েকবারের খাদ্যের মল এমনিভাবে উপযুক্তপরি মলভাণ্ডে এসে জমা হলে তার পরে আসে নিকাশের বেগ।

মলভাণ্ডের পরেই যে অংশ, তার নাম মলনালী; যাকে বৈজ্ঞানিক ভাষাতে বলে রেক্টাম। এই দুই অংশের গঠন আর ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণই পৃথক রকমের। মলনালীতে অনেক চৈতন্যবহা শিরাসমূহ আছে, কিন্তু মলভাণ্ড তা নেই। সেইজন্য মলনালীর যে স্ফূর্ত প্রকারের অনুভূতি শক্তি আছে, মলভাণ্ডের তা নেই। সুতরাং মলভাণ্ডে প্রচুর মল এসে জমা হয়ে থাকলেও সেটা আমরা কিছুমাত্র অনুভব করতে পারি না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেটি মলনালীর গািডের মধ্যে এসে উপস্থিত না হয়। মলভাণ্ড ও মলনালীর সংযোগস্থলে একটি কবচটম্বার আছে। উপর থেকে ঠেলা পেয়ে ঐ কবচটম্বার উন্মুক্ত হয়ে গেলেই মলগুলি এসে মলনালীতে প্রবেশ করে, আর সঙ্গে সঙ্গে তার চেতনা জেগে ওঠাতে আমাদের মলত্যাগের বেগ এসে উপস্থিত হয়। সেটা সাধারণত প্রত্যহই একবার ঘটে থাকে।

আমরা যে সকালে ঘুম থেকে উঠেই মলত্যাগ করতে যাই, তার কারণ রাতে ঘুমের মধ্যে মলগুলি মলভাণ্ডে এসে জমা হয়ে থাকে, ঘুম ভেঙে উঠলেই নড়াচড়ার ফলে সেগুলি কবচটম্বার ঠেলে মলনালীর সীমানার মধ্যে এসে পড়ে। কারো কারো পেটে সকালবেলা কিছু খাদ্যের চাপ না পড়লে ঐ বেগ আসে না। যার যেমন অভ্যাস। আবার কোন কোনদিন খাদ্যের চাপ পড়লেও তেমন কোন বেগ আসে না। অর্থাৎ সেদিন মলভাণ্ডে তখনও পর্যন্ত এমন কিছু মল এসে জমা হয়নি, যাতে সেটা কবচটম্বার ঠেলে মলনালীতে এসে তার ক্রিয়া সম্বন্ধে চেতনা জাগতে পারে।

মলত্যাগের বেগ এলেই আমরা তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বসে কুশল করতে থাকি। অর্থাৎ পেটের মাংসপেশীগগুলির ও মধ্যজ্ঞার (ডায়াফ্রাম) চাপের দ্বারা এমনভাবে মলনালীকে নিষ্পেষিত করতে থাকি, যাতে সেটি উপর থেকে নীচের দিকে উপযুক্তপরি সংকোচনের দ্বারা তার

ভিতরকার মলগুলিকে নিষ্কাশন করে দেয়। এই কুশলনের দ্বারা কেবল যে মলনালীর ভিতরকার সদ্যাগত মলগুলিই নিষ্কাশিত হয়ে যায়, তা নয়। জায়গা ফাঁক পেলেই তখন কবচটম্বার খোলা থাকতে আরো কিছু মল মলভাণ্ড থেকে সেখানে নেমে আসে, তখন উপরকার মলও আরো কিছু পরিমাণে সেই সঙ্গে নিষ্কাশিত হয়ে যায়। এমনিভাবে কুশলনাদির দ্বারা তখন দুই তিন দফাতে মলনালী ও মলভাণ্ডের অনেকটাই মল নির্গত হয়ে যায়। কিন্তু মলত্যাগের বেগ আসবার একটা বিশিষ্টতা এই যে, সেই বেগ আঁত অল্পক্ষণ মাত্রই স্থায়ী হয়। তারই মধ্যে যদি প্রস্তুত হয়ে নিয়ে উপযুক্ত কুশল প্রয়োগ করতে না পারা যায়, তাহলে বেগটি স্থগিত হয়ে গিয়ে সমস্ত মল আবার কবচটম্বার দিয়ে মলভাণ্ডে ফিরে চলে যায়। তখন আর কুশল প্রয়োগ করে কোনো ফল হয় না। কারণ কুশলনের দ্বারা আমরা কেবল মলনালীকেই চালনা করতে পারি, মলভাণ্ডের চালনা করা ও উপরে কখনই সম্ভব নয়। অতএব মলনালীতে পুনরায় নির্দিষ্ট রকমের বেগ না আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতেই হয়।

সাধারণতঃ প্রতি চল্লিশ ঘণ্টার অন্তরেই একবার করে আমাদের মলত্যাগের বেগ এসে থাকে। এইটেই আধিকাংশ লোকের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু কোনো কোনো লোকের অন্তের গতি অপেক্ষাকৃত মন্দর। খাদ্য তাদের পক্ষে মলরূপে পরিণত হয়ে আঁত ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে, আর আঁত অল্প পরিমাণেই তা মলভাণ্ডের মধ্যে এসে জমা হতে থাকে। তাদের পক্ষে সেটা দুই তিন দিন যাবৎ যথেষ্ট পরিমাণে জমা হবার পরে ভালেই মলত্যাগের বেগ উপাদান করতে পারে। যাদের এমন হয়, তাদের দুই তিন দিন অন্তরে ছাড়া প্রত্যহ তেমন মলত্যাগই হয় না। তবুও তারা সম্পূর্ণই সুস্থ থাকে। এতেই দেখা যায়, মলভাণ্ডের মধ্যে মল এসে কিছুকাল পর্যন্ত সেখানে জমা হয়ে থাকারটা এমন কিছু মারাত্মক নয়। মল যে কোনো বিলম্ব পদার্থ এবং তা মলভাণ্ডের মধ্যে কিছুকাল জমা হয়ে থাকলে সেই বিষ রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে শরীরের মহা অনিষ্ট করতে পারে, এমন প্রকারের ধারণা করা নিতান্ত অমূলক। প্রথম কথা এই যে, সুস্থ মানুষের নিজের মল কিছুকাল সঞ্চিত থাকলেও তা নিজের পক্ষে কখনই অনিষ্টকারী নয়। আর দ্বিতীয় কথা এই যে, মলভাণ্ডের ভিতরকার আশায় এমন কোনো ঝুঁকি নেই, যার দ্বারা সে জল ছাড়া মল মদ্যপ অন্য কোনো দূষিত বা অদূষিত পদার্থকে নিজের মধ্যে শোষণ করে নিতে পারে। মল হারই খারাপ পদার্থ হোক তা ঐ অংশের মধ্যে একবার এসে পড়লে তখন

যেমন অবস্থাতে এসেছিল, তেমন অবস্থাতেই থেকে যায়। আর তার কোনো পরিণতি ঘটে না। সুতরাং সেখানে মলের কিছু বিলম্বিত অবস্থানে কোনোই ক্ষতি হতে পারে না। মলগুলিকে কিছুকাল ধারণ করে রাখবার জন্যই মলভাণ্ডের সৃষ্টি। প্রকৃতির মধ্যে কোথাও এমন কোনো নিয়ম নেই যে, চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর প্রত্যেককে নিশ্চিত মলত্যাগ করতে হবে, নতুবা তার অনিষ্ট হবে। বরং এ বিষয়ে কিছু ব্যক্তিগত স্বাভাবিকতা থাকারটাই স্বাভাবিক। সেইজন্য কেউ বা দিনে দুইবার পায়খানা যায়, আবার কেউ বা দুই দিনে একবার যায়। উভয় প্রকার চরিত্রই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

এই হলো আমাদের মলত্যাগ সম্বন্ধে মোটামুটি শরীরবৃত্ত বা সাধারণ ফিজিওলজি। যেখানে এমন সুন্দর ব্যবস্থা করা আছে, সেখানে কোনো একটা বিশেষ কারণ ব্যতীত এমন কোনো কোষ্ঠবন্দিতা ঘটতে পারে না যা স্বস্থতার পক্ষে হানিকর। অবশ্য কয়েকটি কারণ থাকলে প্রকৃত কোষ্ঠবন্দিতা ঘটা সম্ভব। যেমন, মলম্বারে (মলনালীর প্রান্তভাগে) যদি কোনো ক্ষত থাকে, কিংবা মলনালীতে যদি আর্শ থাকে, অথবা মলনালীর ভিতরে কিছু বিকৃতি ঘটে থাকে (ক্যান্সার বা টিউমার প্রভৃতি হয়ে থাকে) তাহলে ভিতরে তার জন্য প্রদাহ বা আক্ষেপ হতে থাকলে নিশ্চয়ই তার থেকে কোষ্ঠবন্দিতা এসে পড়বে। কিন্তু সেগুলি অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরীক্ষায় নিশ্চয় ধরা পড়ে যাবে। যেখানে সে সকল কারণ কিছুই বর্তমান নেই, অথচ কোষ্ঠবন্দিতাও কিছুতে দূর হয় না, সেখানে নিশ্চয়ই সেটা দ্রাস্তি।

কোষ্ঠবন্দিতা আমরা কাকে বলি? পূর্বেই বলা হয়েছে এটা সম্পূর্ণই একটা অনুভবের ব্যাপার। যদি দেখা যায় যে, মলনালীতে ঘণ্টা মল এসে উপস্থিত হয়েছে তার সামান্য মাত্রই নির্গত হলো, আর বাকিটুকু রয়ে গেল, তবে তাকে বলা যাবে কোষ্ঠবন্দিতা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয় না। প্রকৃতির অলংঘা আইন অনুসারে মলনালীতে মল এলে নিশ্চয়ই তার বেগ আসবে, আর কুশলনের দ্বারা তার সবটুকুই নির্গত হয়ে যাবে। তবে তার উপরকার মলভাণ্ডের মধ্যে অপরিস্রুত মল সঞ্চিত হয়ে থাকতেই পারে, আর কেউই সেখানকার মলের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে না, কিংবা কুশলনের দ্বারা নির্গত করতেও পারে না। এমন কি ডুস বা এনিমার দ্বারা অল্পক্ষণিৎ কবলেও মলভাণ্ডের সমস্ত মল নির্গত হয়ে আসে না, সেখানে তবু কিছু পরিমাণ থেকে যায়।

আরো একটা ব্যাপারকে আমরা কোষ্ঠবন্দিতা বলে থাকি। যদি দেখা যায় যে, প্রত্যহই অনেক পরিমাণের খাদ্য খেয়ে যাচ্ছি, অথচ তার

অনুপাতে খুবই কম পরিমাণের মল প্রস্তুত হচ্ছে এবং নির্গত হচ্ছে, তখন তাকেও বলা যে কোষ্ঠবন্দিতা। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ ক্ষেত্রে এমন অবস্থা হয় না, কিন্তু যদিও তাই হয় চাচ্ছে ক্ষতি কি আছে? মলের পরিমাণ যে নির্ভর করে কেবলমাত্র খাদ্যের পরিমাণের উপর, তা নয়। সেটা অনেকাংশে নির্ভর করে খাদ্যের প্রকারের উপর আর প্রত্যেকের ব্যক্তিগত শরীর-বদানের উপর। মলের পরিমাণ বৃদ্ধিকারী খাদ্যই যে সকলের খাওয়া দরকার এমনও কিছু নয়। খোসাযুক্ত আর ছিব্বাডেযুক্ত খাদ্য খেলেই মলের পরিমাণ বাড়ে। কিন্তু যারা তেমন খাদ্য পছন্দ করে না বা খায় না, তাদের মল কম পরিমাণে প্রস্তুত হলেই কি তাতে স্বাস্থ্যের কোনো অনিষ্ট হবে? বস্তুত মলের পরিমাণের কমবেশিতে কি আসে যায়? যেদিন যেমন প্রকারের খাদ্য খাচ্ছি, শরীরও সেদিন তারই উপযুক্ত মল প্রস্তুত করছে। এই জেনেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। মলের দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের বৈশিষ্ট্য খানা বেছে নিতে হবে, এমন ধারণা করা নিতান্তই ভুল। এই একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে নিত্য খাদ্য বাছাই করতে থাকি মনের বাস্তব ছাড়া আর কিছুই নয়। খাদ্যমাত্রই উপকারী, শরীরের মধ্যে তার প্রত্যেকটিই কিছু না কিছু প্রিয়া আছে। আমার পক্ষে যা উপযুক্ত খাদ্য তা অন্যের থেকে কিছু স্বতন্ত্র হবে, এমন মনে করাও ভুল। খাদ্যমাত্রই সকলের পক্ষে যেমন, আমার পক্ষেও তেমন।

প্রত্যাহই যথেষ্ট পরিমাণে মলত্যাগ হওয়া চাই, নইলে মহা অনিষ্ট হবে, এমন একটা ধারণা আমাদের মনে বাল্যকাল থেকেই বন্দমূল হয়ে আছে। সেই ভয় এবং দৃষ্টিশক্তি থেকেই কোষ্ঠবন্দিতা নামক অনুভূতির সূচনা। অভিজ্ঞতাবাদের শিক্ষার দোষেই এটা হয়ে থাকে। ছেলেবেলাতেই দেখি যে তারা এই নিয়েই সর্বদা উদ্বেগ থাকে, আর একটু কোষ্ঠ-কাঠিন্য দেখলেই অমনি নানাবিধ বিরূপ প্রয়োগ করতে থাকে। অবশ্য কখনো কখনো আমাদের পার্গেটিভ নেবার প্রয়োজন হয় তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐ উদ্বেগটাই হানিকর, আর ঐ উদ্বেগটাই সংক্রামক। ছেলেবেলা থেকেই ঐ উদ্বেগটা আমাদের মনে এই সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ উদ্বেগের ভিত্তিস্থাপন করে দিয়ে যায়। পরে এমন হয় যে শরীর একটু অসুস্থ হলেই আমরা ডাকি, কোষ্ঠবন্দিতাই তার একমাত্র কারণ। একটা পার্গেটিভ নিলেই মনের সেই অশান্তি দূর হয়ে যায়, আর সগেগ সগেগ শরীরও সুস্থ বোধ করতে থাকে। এতেও বিশেষ ক্ষতি নেই, কিন্তু সকলের পক্ষে এ সৌভাগ্য হয় না। অনেকের পক্ষেই এটা স্থায়ী ও অশান্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষার দোষেই আমাদের এমনও বন্দমূল

ধারণা যে মল অতি বিবাক্ত আর দূষিত পদার্থ, নইলে তার এমন দুর্গন্ধ হতো না। বাস্তবপক্ষে কিন্তু তা মোটেই ঠিক নয়। মলের যে বিশিষ্ট প্রকারের গন্ধটাকে আমরা দুর্গন্ধ বলে নাকে কাপড় দিয়ে থাকি, তার কারণ ইনডল ও স্কেটল নামক দুটি রাসায়নিক পদার্থ যা মলের মধ্যে প্রস্তুত হয়। ঐরূপ দুর্গন্ধ হলেও শরীরের পক্ষে তা আদৌ অনিষ্টকারী নয়। মলভাঙের মধ্যে আমরা প্রত্যেকেই স্বাভাবিক নিয়মে নিত্য ঐ সকল পদার্থ বহন করে থাকি। অতএব কোষ্ঠবন্দিতা ঘটলেই যে সঞ্চিত দুর্গন্ধ মল থেকে কিছু সর্বনাশ হবে এমন মনে করা উচিত নয়। এ সম্বন্ধে আগেকার যুগের চিকিৎসকেরাও আমাদের মনে অনর্থক কতকগুলো বিভীষিকার সৃষ্টি করে দিয়ে গেছেন। তাঁরা বলতেন যে কোষ্ঠবন্দিতায় আরুক্ষ্য হতে পারে, শরীর বিবাক্ত হয়ে অকালবার্ধক্য আসতে পারে, ডিসপেপসিয়া ও নিউরাইন্থিয়া আসতে পারে, গ্যাস্ট্রিক আলসার হতে পারে, আরও কত কি। সমস্তই ভুল কথা। মল তাগের পরিমাপের উপর সুস্থতার পরিমাপ নির্ভর করবে এর মতো অযুক্তি আর কিছুই নেই। অথচ এই অযুক্তিটাই লোকে মনে মনে পোষণ করে।

এখানে আরো একটি বিশেষ কথা বলবার আছে। আজকাল আমাদের মধ্যে শতকরা প্রায় আশিজন লোকই বলে থাকে যে তাদের বংশগত বা ধাতুগত কোষ্ঠবন্দিতা আছে। কিন্তু সেটা কি যথার্থ? পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, তার মধ্যে শতকরা আশি জনেরই ধারণা নিতান্ত অমূলক। এটা তাদের ব্যক্তিগত একটা ধারণা কিংবা অনুভূতি ছাড়া অন্য কিছুই নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোষ্ঠবন্দিতাকে আমরা আমাদের পেটের এবং মলম্বারের সাময়িক অনুভূতির জবানি অনুযায়ী সাবাস্ত করে নিয়ে থাকি, কখনো সেটা চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করি না। কিন্তু অনুভূতিকে কখনো বিশ্বাস করা উচিত নয়। আমাদের শরীরের চেতনাবহা স্নায়ু বা শিরাসমূহ অনেক সময়েই মিথ্যা কথা বলে থাকে। বিশেষ করে আমাদের পেটের যন্ত্রগুলির মতো এত বড়ো মিথ্যাবাদী শরীরের আর কোনো অঙ্গই নয়। পেট এবং মলম্বার আমাদের মন রাখবার জন্যে প্রায়ই মিথ্যাকথা বলে, আর আমরাও তার থেকে ধরে নিই যে মলত্যাগ খুব সামান্যই হলো। এই প্রকার অনুভূতিমূলক কোষ্ঠবন্দিতা যারা শহর অঞ্চলে থাকে আর ড্রেন পাইথানায় বা কুয়া পাইথানায় যারা মলত্যাগ করে, অধিকাংশ স্থলে তাদেরই হয়। যারা মাঠে ঘাটে মলত্যাগ করে কিংবা যারা কমেড ব্যবহার করে, তাদের এতটা হয় না। তার কারণ তারা স্বচক্ষে দেখতে পায় যে, প্রত্যেকবারে কতখানি মল নির্গত হলো। বস্তুত অনুভূতির সঙ্গে

বাস্তবের কখনই মিল হয় না। পরীক্ষা করে দেখলে এটা প্রত্যেকেই বুঝতে পারবেন। আগে অনুভব করে দেখুন যে কতটা মল নির্গত হলো বলে বিশ্বাসনা হচ্ছে, তার পরে মলের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝবেন যে, ষটটা বোধ করেছিলেন তার চেয়ে বেশিই হয়েছে। দেখবেন যে, মলম্বারের অনুভূতির দ্বারা মলের পরিমাণ অনুমান করতে গেলে প্রায়ই তাতে ভুল হয়। কোষ্ঠবন্দিতা আরোগ্য করবার পক্ষে এই একটি অতি চমৎকার উপায়, এমন স্থানে মলত্যাগ করা যাতে স্বচক্ষে দেখা যায় যে, তার কতখানি পরিমাণ হলো। দেখলেই প্রত্যেকবার নিজের ভুল সংশোধন হয়ে যায়, হাসপাতালের ডাক্তারেরাও এই ব্যবস্থাই করে থাকেন। রোগীর কথায় তাঁরা বিশ্বাস করেন না, বেডপ্যান প্রভৃতিতে রাখতে বলে স্বচক্ষে দেখে নেন যে কোন রোগীর কেমন দাস্ত হয়েছে।

কোষ্ঠবন্দিতা নিবারণের আরো একটি সহজ উপায়, বেশিক্ষণ পর্যন্ত পাইথানায় বসে বসে কুণ্ঠন প্রয়োগ করতে না থাকা। তাতেই আরো কোষ্ঠবন্দিতাজাপক অনুভূতিটা এসে যায়। এর কারণ আর কিছুই নয়, আসল কথা মলনালীর ভিতরকার ঝিরিও অতি সূক্ষ্ম প্রকৃতির, আর সেখানকার চেতনাবহা স্নায়ু-শিরাগুলিও অতি সূক্ষ্ম প্রকৃতির। সেখানে অনেক কুণ্ঠন প্রয়োগ করেও উপকার মল-ভাঙের মলকে কিছুতেই না নিয়ে আনা যায় না, অথচ বারে বারে অমন নিষ্ফল কুণ্ঠন প্রয়োগ করায় ঐ সমস্ত স্নায়ুশিরাগুলিকে উত্তেজিত ও চঞ্চল করে তোলা হয়। তখন তাঁরই দরুণ সেখানে একপ্রকার ব্যাধি আক্ষেপ (Spasm) হতে থাকে। সেই আক্ষেপের কারণেই আমরা ভুলক্রমে অনুভব করি যে, মলনালীতে যখন চাঞ্চল্য রয়েছে তখন নিশ্চয়ই সেখানে মলও রয়েছে, অথচ তা নির্গত হলো না। কিন্তু বাস্তবিক তখন সেখানে মল নেই, অতিরিক্ত কুণ্ঠনের দ্বারাই সেই মিথ্যা অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে। শূদ্ধ তাই নয়, বেশিক্ষণ কুণ্ঠনের দ্বারা ভিতরে অর্শের সৃষ্টি হয়, তার থেকেও কোষ্ঠবন্দিতা এসে পড়ে। তার কারণ মলনালীতে আক্ষেপ হতে থাকলেই তার উপরকার কবচাবার সংকুচিত থেকে যায়, স্বাভাবিকভাবে সহজে আর উন্মুক্ত হতে চায় না। সুতরাং কুণ্ঠনের থেকে কোষ্ঠবন্দিতা, আর কোষ্ঠবন্দিতা থেকে আরো বেশি কুণ্ঠন, এমনি অস্বাভাবিক ব্যাপার উপযুক্তরূপে চলতে থাকে। কিন্তু অধিকক্ষণ কুণ্ঠন না করলে এ সমস্ত আর কিছুই হয় না। মলনালীতে যে মল এসে উপস্থিত হয়েছে, প্রথম কয়েকবারের কুণ্ঠনেই তা নির্গত হয়ে যায়, তার পর আর ঐ প্রচেষ্টার কোনো প্রয়োজন নেই। যখন কুণ্ঠন সত্ত্বেও আর কিছু নির্গত হচ্ছে না, তখন বুঝেই নিতে হবে যে

আর কিছু নিগত হবার মতো নেই। তখন আর বিলম্ব না করে পাইখানা থেকে উঠে পড়তে হবে। দশ মিনিট সময় মলত্যাগের পক্ষে যথেষ্ট সময়, তার বেশি অপেক্ষা করে বসে থাকা অনর্থক। নিতান্তপক্ষে পনেরো মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা বসে থাকা যেতে পারে, কিন্তু তার বেশি কিছুতেই নয়। প্রয়োজন হয়তো অন্য সময় পুনরায় একবার চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু সেবারে আর নয়। পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে যে মলত্যাগ শেষ করে নিতে পারে, তার সহজে কোষ্ঠবন্ধতার ঐ প্রকার অশান্তিকর অবস্থা ঘটেতে পারে না।

আমরা বুদ্ধিতে পারছি যে এই সব সহানুভূতিশীল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হয়তো ভুক্তভোগীদের পক্ষে কোনোই কাজে লাগবে না। তারা চান অস্বস্তিতাকে দূর করে আশু স্বস্তি অনুভব করতে। কেবলমাত্র ব্যাখ্যার দ্বারা তা সম্ভব নয়। সারাজীবনের একটা বন্ধমূল ধারণা কিংবা বহুকালের একটা অভ্যাস একদিনের ব্যাখ্যাতেই দূর করে দেওয়া যেতে পারে না। কথাগুলি সত্য হলেও মন তাকে সহজে মানতে চাইবে না। অনেকেই হয়তো যলবেন যে, তার সমস্যাটা আরো স্বতন্ত্র রকমের, মল তাদের কিছুমাত্র নিগত হয় না, বেগ মোটে আসেই না, ইত্যাদি। কিন্তু প্রত্যেকেরই সমস্যা অজ্ঞতা ও উদ্বেগ থেকে তাদের নিজস্বেরই সৃষ্টি। প্রথম কথা, নিজে অনুভব করতে থাকলেও প্রকৃত কোষ্ঠবন্ধতা অনেকেরই নেই। আর দ্বিতীয় কথা, কোষ্ঠবন্ধতা কিছু থাকলেও তাতে শরীরের কোনো হানি নেই। এই কথাগুলি আগে উদ্ভিন্নরূপে উপলব্ধি করাই প্রয়োজন। অজ্ঞতা আর ভুল ধারণা দূর

করে দেবার উপকারিতা একটা নিশ্চরই আছে। কোষ্ঠবন্ধতার অস্বস্তি শরীর থেকে নয়, মন থেকেই দূর করে দেওয়া দরকার।

ঔষধদ্রব্য দ্বারা কৃত্রিম উপায়েও কোষ্ঠবন্ধতার কষ্ট দূর হতে পারে, কিন্তু সেটা সাময়িক। যে-কোনো ঔষধই ব্যবহার করা হোক, কিছুকাল পরেই অভ্যাসের ফলে সেটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, তখন আর তার দ্বারা কোনোই কাজ হয় না। পার্গেটিভ মাত্রই কঠিন ব্যবহারের পক্ষে উপযুক্ত, কোনোটাও নিত্য ব্যবহারের জন্য নয়। বিরচক দ্রব্যের নিত্য ব্যবহারে মিনে অস্ত্রে আর মলনালীর ঝিল্লিতে একটা নিত্যকার আক্ষেপ উৎপন্ন হয়, তাতেই আরো বেশি কোষ্ঠবন্ধতা এনে ফেলে। তখন এমন অবস্থা হয় যে একটা কিছু না খেলে আর মলত্যাগই হয় না। এই সকল ক্ষেত্রে পেটে যে বায়ু হয় তাও যখন তখন ঐরূপ আক্ষেপেরই কারণে। আক্ষেপের দ্বারা অস্ত্রের নালী কিংবা কনায়ার এমন সংকুচিত হয়ে যায় যে সেখান দিয়ে আর বায়ু চলাচলও হতে পারে না। সুতরাং যে বায়ু অজ্ঞাতসারেই সঞ্চিত চলাচল করতে থাকে, নিগমনের পথে বাধা পেয়ে পেটের ভিতর তার প্রকোপ বেড়ে উঠতে থাকে এবং নিগমনের প্রয়াস করতে থাকে। তারপরে কোনো সময় পথ উন্মুক্ত হলেই সেটা সশব্দে নিগত হয়ে যায়। কিন্তু আক্ষেপ না থাকলে এ সকল কিছুই হয় না। হারা পার্গেটিভ ব্যবহার ছেড়ে দিয়ে দেখবেন তরাই এটুকু বুদ্ধিতে পারবেন। তারা প্রথম কয়েকদিন হয়তো খুবই কষ্ট পাবেন, তার পরে সমস্তই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।

মঙ্গের পরিমাণবিশিষ্ট জল কিংবা মল-ত্যাগ সহজ করবার জন্য কোনো কিছুই নিত্য-নিয়মিত ব্যবহার করা উচিত নয়। অনেকে ইসবগুল ব্যবহার করে থাকেন। তাতেও ঐ একই অবস্থা ঘটে। অনেকে আবার বারোমাস বেল খান। তাঁদের ধারণা যে, এটা তো ঔষধ নয়, একটা ফল মাত্র। কিন্তু তার ব্যবহারটা হয় ঔষধ হিসেবেই। বেলের সময়ে অবশ্যই বেল খাবেন, কিন্তু যখন তা দুঃপ্রাপ্য তখন অনেক দাম দিয়ে কিংবা কাঁচা অবস্থাতেই পুড়িয়ে খাবার কোনো হেতু নেই। ফল যদি খেতেই হয় তবে যখন প্রকৃতি যে ফল সহজে উৎপাদন করে তখন সেই ফলই খাওয়া উচিত। একটিমাত্র ফলই যে উপকারী এমন কথা নেই।

নিতান্তই যাদের কৃত্রিম উপায়ের সাহায্য নেবার দরকার, নতুবা যাদের শরীরে প্রত্যক্ষ কোনো রোগ এসে পড়ে, কিংবা ব্রাডপ্রসার বেড়ে যায় কিংবা অন্য কোনো গুরুতর উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাদের পক্ষে একটিমাত্র ঔষধের নাম করা যেতে পারে,—তিস্ত ক্যাস্কারার আরক, যা সাধারণ ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। নিত্য ব্যবহারেও এই ঔষধটি কাজ করতে থাকে, অথচ এর দ্বারা তত বেশি অনিশ্চয় হয় না। আর একটি উপায় আছে অশ্রদ্ধা করা, অর্থাৎ এনিমা নেওয়া। এতেও যে একেবারেই কিছু কুফল নেই তা নয়, তবে ঔষধ ব্যবহার অপেক্ষা এ ব্যবস্থা অনেক ভালো। তবে এই সকল ব্যবস্থা কেবলমাত্র ব্যতিক্রম পর্যায়ে অস্ত্রভুক্ত কতকগুলি অসুস্থ লোকের জন্য, এ ব্যবস্থা সকলের জন্য নয়। অধিকাংশ লোকের কোষ্ঠবন্ধতা মনের ভুল মাত্র, এবং তা নিজের চেষ্টাতেই সংশোধিত হবে।

## রাতের ঝড়

আদিত্য ওহদেয়ার

সমুদ্র-তেউ সঙ্গীত নিয়ে সাথে  
এসেছে রাতের ঝড়।

নেমেছে এপারে নদীর কিনারে  
ঝাউবনে।

শোন সাঁ সাঁ সুর আকাশের মূখে লকলকে—  
সাপেরা ছুটেছে ফণা তুলে।

তোমার কুটির ফুরোনো তেলের দীপ জেরলে  
চোখ বৃজে মিছে পড়ে থাকে।

সম্মুখ তোলা রজনীগন্ধাগুচ্ছে বৃথা

কোলে টানো।

ডানা ঝাপটিয়ে নিজেরে সবল করে তেলঃ

শোন আকাশের ডাক।

রাতের ঝড়ের গান শোন।

মেলে দাও পাখা অসীমে আধারে  
ঝড়ের ঝাপটে বৃক বেধে।

আধার পাখার সঁতারিয়ে চলে

আর চেয়ে দেখে কতো দূরে

ভোরের আলোর রঙ ধরে॥

# অন্ধকার

## শ্রী অনিলকুমার ভট্টাচার্য্য

রাশিটর অন্ধকার থম্‌থম্‌ করছে।  
মৃত্যুর মতন এই অন্ধকার রাশি। এই  
অন্ধকারের প্রত্যাশিত ছায়ায় নিরন্তর মৃত্যুকে  
অবলম্বন করে যারা বেঁচে থাকে লক্ষ্মীমণি  
জাদেরই একজন।

রাশিটর এই নিরন্তর অন্ধকারের সঙ্গে  
জীবনের পরিচয় তার বহুবিনয়ের। দীর্ঘ  
আটাশটি বছর তার এমনি প্রেতপুরীতে জীবন  
কেটেছে। বন্ধ ঘরের অবরুদ্ধ বাতাসে,  
নোঙরা জীবনের কদম্ব নোঙরামিতে অন্ধ  
রাশিটর অন্ধকারায় নিরন্তর সে মৃত্যু যন্ত্রণাকে  
অনুভব করেছে। শূন্য লক্ষ্মীমণি কেন,  
বাঙলা দেশের এমন কত মেয়ের জীবনই এমনি  
মৃত্যুমুখী সে কথা ভাববার তাদের অনুভূতি  
কোথায়? অন্ধ গলির আবছানায় জীবনের  
চেতনা মৃত। এই মৃত চেতনায় অসাড় জীবন-  
যাত্রা বন্ধ জলাশয়ের মতনই গতিহীন।  
লক্ষ্মীমণি এই পরিবেশের মাঝেই মানব  
হয়েছে। জীবনে যারা সর্বোদয় দেখেন,  
প্রাণস্পন্দনকে অনুভব করেন—তাদের স্নায়ু-  
তন্ত্রটিতে বিরোধের উচ্চ রক্তস্রোত প্রবাহিত  
হয় না। আর তার জন্যে তাদের সত্যিকারের  
বিক্ষোভও নেই।

বিক্ষোভ জগলো সৈদিন—সৈদিন কমানার  
অত্যুগ্রনেশায় অপমানের লাঞ্ছনায় লক্ষ্মীমণি  
জীবনকে বিশেষণ করে দেখলে। সৈদিন  
লক্ষ্মীমণির সর্বপ্রথম মনে পড়লো—এ জীবনের  
অর্থ কি? বিদ্রোহিনী লক্ষ্মীমণি সেইদিনই  
অনুভব করলো মৃত্যুকে। রাশিটর এই অন্ধকারা-  
চ্ছন্ন মৃত্যু, এই অবচেতনময় মৃত্যু! এই  
মৃত্যুর মাঝে জীবন কোথায়?

বিবাহের পূর্বের কথা লক্ষ্মীমণির মনে  
পড়ে।

সে জীবনও ছিল লাঞ্ছনাময়, শতধিকৃত।  
তবুও স্নেহ-রমতার ক্ষণিক উচ্চ স্পর্শ সেখানে  
পাওয়া যেত।

নোঙরা অন্ধকার ইটবাঁধনো গলির নেনা-  
ধরা দেওয়ালে জীবনের জীর্ণতা ধুসে পড়ে।

অজস্র ফটলে দারিদ্র্যের রেখা। দরিদ্র নিম্ন-  
মধ্যবিত্ত অভিশপ্ত একটি বাঙালী পরিবার।  
সেই পরিবারে জন্মগ্রহণ করে লক্ষ্মীমণি।  
অর্ধাহার জীবনের জাবর কেটে দিন চলে।  
অসহায়তার অজস্র পাশে জীবন কলঙ্ক-মলিন।  
সেই মলিন অন্ধকারে জীবনের চেতনা তার  
জাগ্রত হতে পারেনি। অদৃষ্টকে বড় জের  
মাঝে মাঝে সে শিকার দিয়েছে। আশপাশের  
জীবন-যন্ত্রের মাঝেও কোন প্রাণ-স্পন্দন ছিল  
না। সুতরাং লক্ষ্মীমণির বিক্ষোভের কোন  
কারণ নেই।

প্রভাত হতে রাশি, রাশি হতে প্রভাত—জীবন  
চলেতে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার মাঝে।

ছোট ভাইবোনদের মানব করা, নিত্য  
সংসারের ফাই-ফরমাসেস খাটা—বিনিময়ে  
অর্ধাহার, বস্তাভাব এবং সেই সঙ্গে চুটি,  
বিহাতির সত্ত্ব ধরে অজস্র লাঞ্ছনা আর  
তিরস্কার। তবুও এর মাঝে কিছুটা ছেন ছিল।

মা যখন আদর করে চুল বেঁধে দিয়ে কুমারী  
মেয়ের কপালে লাল দিগ্বরের চিপটি একে  
দিতেন, অফিস ফেরৎ বাবা যখন কখনও কখনও  
থুড়কে ডুরে শাড়ি কিনে আনতেন লক্ষ্মীমণির  
জনন—ছোট ভাইবোনরা যখন আদর করে  
দিদির গলা জড়িয়ে ধরতো—লক্ষ্মীমণি তখন  
জীবনকে অনুভব করতো বৈকি!

অনুভব করতে বৈকি জীবনের সেই  
বাসন্তী সন্ধ্যাকে—নোনোখরা দেওয়ালের অজস্র  
ফটলে যখন রামধনু রঙের রেখা স্বপ্নায়িত  
হয়ে উঠতো!

আসন্ন সংগ্রাম শম্ভবদানিতে মরা গলিটা  
ক্ষণিকের জন্যে জীবনের ছন্দে গুঞ্জরিত যখন—  
যৌবনের রঙে তখন চোখে স্বপ্নের মোহ—  
মানসতা একে দেয়!

লক্ষ্মীমণি ভেবেছে। ভেবেছে কত বিনিদ্র  
রাশিটর অন্ধকারে। দেখেছে অন্ধকারের দিগন্ত-  
রেখায় কোন নব উদয়ের নতুন আলোক বিকিরণ।

লক্ষ্মীমণির দেহ-মনে সে কিরণের স্পর্শ  
জগে বৈকি!

কিন্তু সে অনুভূতির দাম কতটুকু?

কতটুকু সময় সে রঙের আমেজ, রঙিন হয়ে  
থাকার স্পর্শ রাখে বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে?  
লক্ষ্মীমণির জীবনের রঙ মুছে যায়। বিবাহিতা  
জীবনের এক মাসের মধ্যেই সে অনুভব করে  
সেই মৃত্যুকে। রাশিটর অন্ধকারে মলিন মৃত্যু;  
অবচেতনার গাড়ি নিজীবতায় স্পন্দনহীন মৃত্যু!

শূন্য দারিদ্র্যের সঙ্গে সংঘাত নয়, শূন্য  
অভাব-অভিযোগের নিত্য সংগ্রাম নয়—অদৃষ্টের  
নিষ্ঠুর পরিহাস আরও তীব্র। আরও  
জ্বালাকর। আরও বেদনাময়।

অন্ধকার গলির টিনের ঘরে জীবনের কদম্ব  
নোঙরামি। মাতাল স্বামীর কণ্ঠলগ্না হয়ে  
জীবনের শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে।

তবু দিন কাটছিল। ভাগ্য-দেবতার পথে  
নিয়ত মৃত্যু কামনায় মৃত্যুমুখী জীবন তবুও  
কাটছিল।

এলো মহাঅন্ধ। বিধতার অভিগাণ নিয়ে  
এলো দার্ভিক, বন্যা, মহামারী।

লক্ষ্মীমণির মতন কত মেয়ে ভোম গেল  
জীবনের মহাবন্যায়। দার্ভিকের করাল গেসে  
কত মেয়ে নগরের এই ইট বারকরা গলিপথেই  
বরণ করে নিলে মহা-মৃত্যু। পেটের জ্বলায়  
ছটফট করে যারা মরেছে, যারা মরেছে কোলের  
শিশুকে বিতরণ করে, যারা মরেছে স্বামী, পুত্র,  
পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে—তাদের মৃত্যু-  
যন্ত্রণাকে লক্ষ্মীমণি স্বচক্ষে দেখেছে। দেখেছে  
তার দিয়ে ঢাকা তার জানালা দিয়ে।

সে মৃত্যুর আহ্বান তার জীবনকেও ডাক  
দিয়েছে। ডাক দিয়েছে ক্ষুধিত শয়তানের মত  
হিংসে বাহু সম্প্রসারিত করে। ভয় লক্ষ্মীমণি  
শিউড়ে উঠেছে। ভাগ্য-দেবতার কাছে  
অজ্ঞানতার মেহে যে মিনতি সে জানিহেছিল  
—আত্ম-ধিক্সরের প্রায়শ্চিত্ত সে মিনতিকে  
ফিরিয়ে নিয়েছে সে।

বাঁচতে সে চায়। সহস্র দুঃখের মাঝে,  
নিরন্তর মৃত্যুর অন্ধকারেও বাঁচতে সে চায়।  
বস্তহীন তপে নিলস্ক জঞ্জায় নগ্নতার  
মাঝেও সে বেঁচে থাকতে চায়। এবং এই বেঁচে  
থাকার জন্যে যে মূল্য তাকে দিতে হয়েছে সে  
বেদনাময় ইতিহাসের কথা লক্ষ্মীমণি এখন  
আর ভাবতে পারে না!

যুগের সে কালা বড় থেমে গেছে। থেমে  
গেছে জীবনের সেই ঘূর্ণী হাওয়া। বিস্তৃত  
দুর্ভোগের মেঘ এখনও থম্‌থম্‌ করছে সারা  
আকাশে। পৃথিবীতে নতুন বৃষ্টি সরু  
হয়েছে। সমাজ-জীবনে দেখা দিয়েছে নতুন  
চেতনা। টিনের ঘরগুলির জীবনে এখন নব  
সম্ভাবনা। ধনতান্ত্রিকতার উচ্ছেদে সমাজ-  
তান্ত্রিকতার প্রচণ্ড সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম  
জয়ী হবে টিনের চালের অধিবাসীরা। জয়ী  
হবে ক্ষুধার্তের দল।

নগরের প্রাসাদে-প্রাসাদে যে অজস্র

পর্যাপ্ততা—তা থেকে ভাগাভাগির পালা এখন থেকেই উপলব্ধি করা যাচ্ছে। ধনসেপড়া মাটির দেওয়ালগুলি আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

লক্ষ্মীমণির স্বামী যে কারখানায় কাজ করে—সেখানে সদ্রুদ হোল স্ট্রাইক! মাতাল স্বামী মদের নেশায় গৃহে অকথা অত্যাচার করলেও বাইরের জীবনে তাকে শৃংখলা মেনে চলতে হয়। ইউনিয়নের সে একজন আত্মবাহী সৈনিক!

এই জীবনের আওতায় লক্ষ্মীমণি দেখে নতুন সূর্যালোক। বিদ্রোহী কারখানার কর্মীরা হোল জয়ী।

লক্ষ্মীমণির স্বামীর মাহিনা হোল শ্বিগদুণ। ছেঁড়া হাফপ্যান্ট ছেড়ে সে খোপ-দোরস্ত পোষাক ধরেছে। তাড়ি থেকে আবার সে মদ খেতে আরম্ভ করেছে। রাতে অধিকাংশ দিন এখন আর সে মোটে বাড়িই ফেরে না।

কিন্তু লক্ষ্মীমণির জীবনের কোন পরিবর্তন ঘটলো না কেন, ছেঁড়া মলিন শাড়িতে অপমানিত জীবনের কলঙ্ক-চিহ্ন অনশনের বেদনায় পেটের নাড়িগুলি টনটন করে ওঠে।

আটাশটি বছরের স্তিমিত গ্লানি একদিনের অগ্নি-স্কলিংগ দাউ দাউ করে জ্বললে উঠলো। সে আগুনের শিখায় শিখায় মৃত্যুর রঙ। তবুও সে মৃত্যুর মাঝে আছে চেতনা—আছে জীবন।

সেই জীবনের দাহকে লক্ষ্মীমণি এবার অনুভব করবে। নিরস্ত্র অশ্বকারের মাঝে জীবনের অত্যাগ্র আলোককে সে প্রাণভরে দেখবে। চোখ তার ঝলসে যাক—দেহ পড়ে ছারখার হয়ে যাক—তবুও অসহায়তার নিলুঙ্ঘ বেদনার হাত থেকে সে বাঁচবে।

লক্ষ্মীমণি যাবে জীবনের সেই জ্বলন্ত কামনার অগ্নিকুণ্ডে। যে আগুনের নেশায় তার নেশাতুর স্বামী বিভোর—সেই নেশাকে এবার লক্ষ্মীমণিও উপভোগ করবে।

অর্থপশাচ বাড়িওয়ালাকেও জীবনের নেশায় যখন দেখা গেল অর্থা উপচারের নৈবেদ্য সাজাতে—লক্ষ্মীমণির লোভী মন তখন নেশাতুর হয়ে উঠলো।

কথাটা প্রথমে মনে করতে গা তার শিউরে উঠেছিল, অগ-প্রত্যগে সে শত বশিচকের জ্বালা অনুভব করেছিল, ইচ্ছে করেছিল আঁশ বর্গট্টা দিয়ে সে ওই পাপিষ্ঠের জিঁটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে দেয়; কিন্তু লোভই শেষকালে জয়ী হোল।

ভদ্রতার আবরণে ঢাকা শয়তানের চেহারা লক্ষ্মীমণি ইতিপূর্বে অনেকদিনই বাড়ি-ওয়ালার ভেতর দেখেছে। ঘণায় সে বহুবার মূখ ফিরিয়ে নিয়েছে, শত উৎকোচের ডালায় পদাঘাত করেছে, কিন্তু বিনিময়ে সে পেয়েছে কী?

যদিও এক ছটাকও চালের দানা নেই। মাতাল অপদার্থ স্বামীর তার জন্যে এতটুকু চিন্তার অবকাশকেও খুঁজে পাওয়া গেল না। তিনিদিন প্রায় অনাহারে কেটেছে লক্ষ্মীমণির। কিন্তু সে জন্যে সমবেদনা কোথায়? তিনিদিন পরে স্বামী ঘরে ফিরে ভাত না পেয়ে যে অকথা লাঞ্ছনা করলে লক্ষ্মীমণির উপর—তা তার নিত্য গা-সওয়া হলেও আজ আর সে নির্বিবাদে হজম করলে না।

বাড়িওয়ালার এসেছিল ভাড়ার টাকা আদায় করতে। টাকার খলিটা তার ফেঁপে উঠেছে। বাইরের সদর রাস্তায় গাড়ি, সঙ্গে লাঠিধারী দরওয়ান।

লক্ষ্মীমণি বেরিয়ে এলো—নিরাভরণ অগ্নি লাঞ্ছনার চিহ্ন নিয়ে। বাড়িওয়ালার থমকে দাঁড়িয়ে গেল। হাতের খলি থেকে টাকাগুলি তার বন্ধন করে গড়িয়ে পড়লো মেঝের উপর।

লক্ষ্মীমণি সেদিকে প্রলম্ব দৃষ্টি রেখে বললে—আপনার তো অত টাকা। কী করবেন অত টাকা দিয়ে? তিনিদিন আমি খেতে পাইনি। দিননা আমায় কিছু খেতে!

বাড়িওয়ালার দৃষ্টিতে কিসের আগুন যেন দাউ দাউ করে জ্বললে উঠলো। এপাশ ওপাশ তাকিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে সে লক্ষ্মীমণিকে হাতছানি দিয়ে ডাকলে।

—একটা টাকা কেন, আমার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে তুমি। চলো আমার সঙ্গে। কিসের অভাব তোমার? তোমার জীবন রয়েছে অমন জ্বলজ্বলে, কেন তুমি এমনি করে মরছো?—বাড়িওয়ালার কণ্ঠে সমবেদনার বেদনাপ্রসূ করে পড়ে।

লক্ষ্মীমণি জীবনে এমন সমবেদনার সুর কখনও শোনেনি। মিথ্যা হোক, হোক কপটতায় ভরা, জঘন্য পার্থক্য স্বার্থবৃত্তি তাতে থাকুক জড়িয়ে—তবুও এমন কথা লক্ষ্মীমণিকে আজ পর্যন্ত কেউ বলেনি। স্থির দৃঢ়কণ্ঠে সে প্রশ্ন করলে—জীবন কোথায়?

লম্বা বাড়িওয়ালার গদগদ কণ্ঠে উত্তর দিলে—চলে এসো আমার সঙ্গে। অজস্র জীবন-প্রাচুর্যে আমি ভরিয়া রাখবো তোমাকে। কিসের অভাব তোমার?

—বেশ, আজ রাতে আপনি আসবেন, অপেক্ষা করবেন আপনার মোটর নিয়ে।

—সত্যি, সত্যি বলছে। তুমি?

—হ্যাঁ, বেশি কথা বলবার এখন সময় নেই। আশ-পাশের লোকেরা শব্দে ফেলতে পারে।

বাড়িওয়ালার গদগদ হয়ে টাকার খলিটি লক্ষ্মীমণির পায়ের কাছে রেখে দিয়ে বললে—যত ইচ্ছে তুমি খেয়ে।

লক্ষ্মীমণি টাকার খলিটি ফিরিয়ে দিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে জবাব দেয়—এখন নয়। আপনার বাড়ি গিয়ে প্রাণভরে খাবো।

থমথমে রাত্রির অশ্বকারে বাড়িটি প্রেত-পুরীর মতন অশ্বকারাচ্ছন্ন। জীবনের মৃত্যু এমন গাঢ় অবচেতনার ঢাকা।

এই মৃত্যুর মাঝখান থেকে বাঁচতে চায় লক্ষ্মীমণি। আটাশটি বছরের ক্ষুধার্ত জীবন তার বাঁচতে চায় প্রচুর পর্যাপ্ততার মাঝে। পাপ? কিসের পাপ? অন্যায়? কিসের অন্যায়? শত লাঞ্ছনার মধ্যে মৃত্যুময় জীবন অপেক্ষা কামনার জ্বলন্ত বহিঃ-শিখায় জীবনোৎসর্গ অনেক প্রিয়। তবুও সে বাঁচবে। জীবনের অজস্র পর্যাপ্ততার মাঝে সে বেঁচে থাকবে।

বাইরে সদর রাস্তার মোড়ে মোটরের হর্ণ শোনা গেল। জীবনের ইঙ্গিত ডাক দেয়।

লক্ষ্মীমণি উঠে দাঁড়ায়।

চারিদিকে অশ্বকার। মৃত্যুর মতন গাঢ় অশ্বকার। এই অশ্বকার মৃত্যুর কবল থেকে সে বাঁচতে চায়।

কিন্তু পা দুটো থর থর করে কাঁপছে কেন? কড়ের হাওয়ায় যেমন করে কাঁপে গাছের পাতা, ভূমিকম্পে যেমন করে কাঁপে মাটি, ঘর-বাড়ি।

একী! লক্ষ্মীমণি এক পাও এগিয়ে চলতে পারে না। পারে না সে মৃত্যুর অশ্বকারকে অতিক্রম করে এক পাও এগিয়ে চলতে।

সদর রাস্তার মোড়ে গ্যাসের আলোয় নিরস্ত্র অশ্বকার রাত্রির বিভীষিকা নেই—সেখানে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িওয়ালার দামী মোটরখানি। সেই মোটরখানি লক্ষ্মীমণিকে নিয়ে যাবে শহরের প্রশস্ত রাজপথের সুরমা অট্টালিকার আলোকিত কক্ষ। কিন্তু অল্প গলির মৃত্যুময় অশ্বকার যেন লক্ষ্মীমণিকে আঁকড়ে ধরে আছে। সাধা কী তার এক পাও সে এগিয়ে চলে।



## মম'র মৃতি

ভ্যালেরি হুসফ

সি... কেটে চুরি করার অভিযোগে লোকটির এক বছর বারাদাও হল। অভিযোগের বিবরণ শুনে এবং আদালতে বৃশ্ণের ব্যবহার দেখে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। ওর সঙ্গে আলাপ করার একটা আগ্রহ হল। একটা অনুমতিপত্রও সংগ্রহ করলাম। কিন্তু লোকটা আমাকে একেবারে উপেক্ষা করল—এমন কি আলাপ করতেও সম্মত হল না। আমিও নাছোড়বান্দা—অনেক করে ওর জীবনের সবটুকু কাহিনী জেনে নিলাম।

“ঠিকই বলেছেন আপনি”, একটু বিতর্কের পর বৃশ্ণ আরম্ভ করল, “সুখের মুখ আমিও দেখেছি। চিরকাল এমন বাউন্ডলে আমি ছিলাম না। সুশিক্ষা আমি পেয়েছি, ভাল ইঞ্জিনিয়ার বলে নামও কিনেছিলাম। যৌবনে অর্থ উপার্জন করেছি প্রচুর, স্মৃতিও করেছি অফুরন্ত! প্রত্যেকদিন সন্ধ্যা হলেই যেতাম পার্টিতে অথবা বল-নাচে; আর ফিরতাম মাতাল হয়ে। সেদিনগুলির কথা আমি আজও ভুলিনি, প্রত্যেকটি মুহূর্তের কথা আমার এখনও মনে আছে। কিন্তু তবুও আমার স্মৃতির মণি-কোঠায় কোথায় যেন ফাঁক রয়েছে—যা পূর্ণ করতে আমার এই লক্ষ্যমীছাড়া জীবনের সবটুকুই হয়ত ঢেলে দিতে হবে—এমন কি নীনার জন্য পৃথক করে রাখা অংশটুকু পর্যন্ত।

“নাম তার নীনা। হ্যাঁ, নীনা। এতে কোন সংশয় নেই। তার স্বামী ছিলেন রেল-কোম্পানীর একজন অধস্তন কর্মচারী। অবস্থা তাঁদের ভাল ছিল না। কিন্তু দারিদ্র্যের মাঝে বাস করেও সে আপনাকে হারিয়ে ফেলেনি। আপনার জীবনের মার্জিত এবং সুকুমার দিকটা উসাতই রেখেছিল। রাস্তা সে নিজ হাতেই করতো কিন্তু হাতে তার দাগ লেগে থাকতে পারত না। জীর্ণ পোষাকেও তাকে দেখতে অপূর্ব। হ্যাঁ দৈনন্দিন পৃথিবীর সমস্ত কিছু তার সংস্পর্শে হয়ে উঠত অপূর্ণ। তার সঙ্গে দেখা হলে আমি যেন নতুন মানুষ হয়ে যেতাম। জীবনের সমস্ত দুঃখ কষ্ট পন্দপরে পড়া জলের মত সহজেই ঝেড়ে ফেলতে পারতাম।

“আমায় ভালবেসেছিল বলে ভগবান নিশ্চয় তাকে ক্ষমা করবেন। নীনার জীবনে ছিল না কোন শ্যামলতা। তাই আমাকে ভালবাসা ভিন্ন তার বাচার আর কোন আনন্দ ছিল না। আমি ছিলাম তরুণ, সুন্দর আর

আমার হৃদয় ছিল কবিতায় ভরা। তাই আমার মাঝে পেরে সে জীবনের সাথ'কতা। কবে, কি করে যে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, আজ আর তা মনে নেই। এখন শুধু বায়োস্কোপের ছবির মত বিগত দিনের কাহিনীগুলি আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। দেখি আর ভাবি সেদিনগুলোর কথা।

“একদিনের কথা মনে হয়। দু'জনে অভিনয় দেখতে গেছি। অভিনয় আরম্ভ হতে তার কি আনন্দ। নাটকের প্রতিটি বাক্য যেন সে গিলছে। আর আনন্দে ফুটে উঠেছে স্মিত হাসি।...সে হাসি আমি আজও ভুলিনি। অভিনয় শেষে, দু'জনে মিলে যেখানেই হোক গিয়েছিলাম। আমার দিকে একটু ঝুঁকে ভাব-বিহীন কণ্ঠে ও বলল: ‘আমি জানি, আমার এ’ সুখ চিরকাল থাকবে না, কিন্তু তাতে দুঃখ নেই। কারণ আমার আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই।’ কথাগুলো আমার মনে আছে। অন্তরের কথা কিনা তাই! কিন্তু তারপর কি ঘটল, নীনার সঙ্গে থাকতেই এসব ঘটল কিনা, আজ আর তা বলতে পারব না।

“অবশ্য, আমিই তার সঙ্গ প্রথম ত্যাগ করেছিলাম। এ খুব স্বাভাবিক বলে মনে হয়। আমার বৃশ্ণুরাও তাই করেছিল: তারা হয়ত কোন বিবাহিত তরুণীর সঙ্গে ফ্লাট করত, তারপর কিছুক্ষণ পরেই তাদের ত্যাগ করে চলে যেত। সবাই যা করত, আমিও তাই করেছিলাম এবং এ যে অন্যায় আমার তা মনে হয়নি। চুরি করা, ঋণশোধ না করা, গুস্তচর হওয়া—এসবই খারাপ কাজ, কিন্তু প্রেমিকাকে ত্যাগ করে চলে যাওয়া হচ্ছে জগতের রীতি। আমার সমুখে ছিল এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, ভূয়া এই রোমান্টিক প্রেমে আমি নিজেকে বেঁধে রাখতে পারি না। এ হয়ত কষ্টকর, খুবই বেদনাদায়ক, কিন্তু আমি নিজেকে বেঁধে রাখতে পারি না। এ হয়ত কষ্টকর, খুবই বেদনাদায়ক। কিন্তু আমি নিজেকে জয় করেছিলাম, আর আমার বেদনা ভুলতে সাংসারিক অনাসক্তির কথাও চিন্তা করেছিলাম।

“পরে শুনছি নীনা তার স্বামীর সঙ্গে দক্ষিণে চলে গেছে। এর কিছুদিন পর ওর মৃত্যু হয়। কিন্তু নীনার স্মৃতি আমায় যেন দংশন করত, তাই আমি সর্বদাই তার সংবাদ এড়িয়ে যেতাম। তার কোন সংবাদ না নিতে চেষ্টা করলাম। তার চিন্তাও মন থেকে ঝেড়ে

ফেলে দিতে চেষ্টা করলাম। ওর কোন ফটে আমার কাছে ছিল না। চিঠিপত্র যা ছিল তা ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। পারস্পরিক পরিচয় আর কোন বাধন ছিল না, তাই ধীরে ধীরে নীনার মূর্তি আমার হৃদয় থেকে মুছে গেল। বুঝলেন তো, মশায়! আমি নীনাকে ভুলে লাগলাম তার মুখশ্রী, তার নাম, তার প্রেম-অর্থাৎ তার সব কিছু। মনে হল: সে যেন সচি আমার প্রাণের ডারে কোনদিন অবতর করেনি।...কিন্তু, এমনি ভাবে ভুলতে পার পুরুষের জীবনে কলঙ্ক বিশেষ!

“বছরের পর বছর কাটতে লাগল। আমি ‘জীবনের সাফল্য লাভের’ ইতিহাস আমি আপনাকে আর বলব না। এখন আর নীনা না আমি স্বপ্ন দেখতে লাগলাম ঐশ্বর্যের...প্রচুর অর্থ আমার করতলগত হল। বিদেশ ভ্রম আমার পক্ষে সহজ হল। বিয়ে করলাম, ছেলে মেয়ে হল। কিন্তু তারপর ঢাকা ঘুরে গেলে আরম্ভ হল অধঃপতন: যে কাজ সুরু করে ছিলাম তা ফেল পড়ল। স্বাী মারা গেলেন শিশুগুলিকে পাঠিয়ে দিলাম আত্মীয়স্বজনকে নিকট। তারপর, ভগবান আমার ক্ষমা করুন! আজ তারা বেঁচে আছে কিনা কিছুই জানি নে। নিজেকে নিয়ে মেতে উঠলাম। মদ ধরলাম সঙ্গে জুয়া।...একটা এজেন্সি নিলাম, তাতেও লা হল না। শুধু তাই নয়, আমার সমস্ত পুঁজি কর্মশক্তি আর উদ্দীপনা নিঃশেষে ফেলে লাগল। জুয়া খেলে অবস্থা ফিরাতে চেষ্টা করলাম। ফলে জেলে যাওয়া নিশ্চিত হো দাঁড়াল। অনেক কষ্টে বাঁচলাম, কিন্তু বৃশ্ণ সব শত্রু হয়ে উঠল।

“তারপর ধীরে ধীরে কোথায় এে দাঁড়িয়েছি তাতে দেখতেই পাচ্ছেন। সচি বলতে কি, আমি সভ্যজগৎ থেকে ছিটকে গভীর খানে পড়ে গেছি। এমনি জীর্ণ-পোষাক পরা-মাতাল আমি আর কোথায় বা স্থান পেয়ে পারি? মদ ধরবার আগে মদসের পর মাস কে কারখানায় কাজ করেছি। কিন্তু মদ খেে শিখেই আর ওখানে না গিয়ে যেতে শুরুর করলাম কদম্ব পল্লীতে আর চোরের আন্ডার ঐ লোকগুলোকে কিন্তু আমি দু'চোে দেখতে পারতাম না। তখনও স্বপ্ন দেখতাম আমার ভাগ্য যেন ফিরে গেছে—আমি ধন হয়েছি। ভাবতাম: কারো সম্পত্তি আী উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। কিন্তু আমি

শ্রদ্ধার ভেতন কোন আশা নেই তাই আমি তাদের মনে-প্রাণে ঘৃণা করতাম।

“হ্যাঁ, একদিন শীত ও ক্ষুধায় কাঁপতে কাঁপতে, কোন জ্ঞান না এক ভদ্রলোকের আঙিনায় ঢুকে পড়লাম। আমাকে দেখে বাড়ির রাধুনি হঠাৎ চীৎকার করে বলল, ‘এই, তুমি তালা মেরামত করতে জান?’ ‘হ্যাঁ, জানি’, জবাব দিলাম আমি। রাইটিং টেবিলের তালাটা ঠিক করার জন্যে ওরা লোক খুঁজছিল। আমাকে পেয়ে যেন বর্তে গেল। সোনালী কাজ করা, সুন্দর ছবি টাঙানো একটা প্রশস্ত পড়ার ঘরে ও আমাকে নিয়ে গেল। সেখানে বসে আমি কাজ করলাম। গিন্নী আমাকে এক সুবল নজরী দিলেন। টাকা নিয়ে চলে আসব হঠাৎ ক্ষুদ্র শ্বেত মণ্ডোপরিস্থিত একটি মর্মরের আবক্ষমূর্তির উপর আমার দৃষ্টি নিপতিত হল। ওটা দেখেই আমার মূছার উপক্রম হল। কেন তা ঠিক বলতে পারব না। আবার তাকালামঃ মনে হোল নীনা! কিন্তু তবু বিশ্বাস হচ্ছিল না।

“আমি বলছি মশাই, নীনার কথা আমার আদৌ স্মরণ ছিল না। অকস্মাৎ তার সূত্রী আনন আমার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র অনুভূতি, স্বপ্ন, চিন্তা, অতল সমুদ্রে ডুবে থাকার মত যা আমার হৃদয়ে ছিল সুপ্ত তা হোল জাগত..... জীবন্ত!.....আমি কাঁপতে কাঁপতে ওই মর্মর মূর্তির দিকে তাকালাম। জিজ্ঞাসা করলামঃ ‘এ মূর্তিটি কার, দয়া করে বলবেন?’ ‘ওটা?’ বললেন মহিলাটিঃ ‘ওটা অত্যন্ত দামী জিনিস। পচিশত বছর আগে পঞ্চদশ শতকে তৈরী হয়েছিল এ মূর্তিটি।’ ভাস্করের নামটিও তিনি বললেন, কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না। তাছাড়া তিনি আরও বললেন যে, তার শ্বাস্ত্রী ইতালি থেকে এ মূর্তিটি এনেছেন। এজন্য ইতালি ও রূশ মন্ত্রিসভার মধ্যে অনেক কূটনৈতিক পত্র আদান-প্রদান হয়েছে। কিন্তু, ভদ্রমহিলা বললেন, ‘মূর্তিটি তোমার ভাল লাগছে না বোধ হয়? তোমার রসজ্ঞান তারিফ করার মত! কানদুটো দেখেছ? ওদুটো ঠিক জায়গায় নেই, আর নাকটাও কেমন যেন বেথাপ্পা, না?’ বলে তিনি চলে গেলেন।

“আমার দম বৃদ্ধ হয়ে আসতে লাগল। আমি ছুটে বেরিয়ে পড়লাম। মনে হলঃ ওটা যেন প্রতিমূর্তি নয়, আসল মূর্তি। না, না, তাও নয়, তার চেয়ে বেশী—এ যেন মর্মরের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। বলতে পারেন পঞ্চদশ শতাব্দীর ভাস্কর কোন অলৌকিক উপায়ে ঠিক ঐ ছোট ছোট কানদুটি, যা আমার কাছে এত পরিচিত, এমন বাক্যভাবে তৈরি করেছে? তৈরি করেছে ঠিক সেই চোখদুটি, যা একটু, টারিঃ; ঐ খাদ্য নাক, আর ঐ উঁচু কপাল—সব মিলিয়ে হয়েছে মনোরম মুখশ্রীর সৃষ্টি? কোন বাদ্যমণ্ডলে একই নারী বেঁচে থাকতে পারে

পঞ্চদশ শতাব্দীতে আর আমাদের যুগেও?

“মূর্তিটি দেখার পর থেকেই আমার জীবনের ঢাকা আবার ঘুরে গেল। আমার অতীতের বাবহারের সমস্ত হীনতা আর আমার অধঃপতনের গভীরতা আমি উপলব্ধি করলাম। বুঝলাম ভাগ্যদেবী নীনাকে পাঠিয়েছিল আমার কাছে দেবীরূপে—আমি তাকে চিনতে পারিনি। কিন্তু অতীতকে যে আর কিছুতেই ফিরে পাওয়া যাবে না। তবু.....তবু আমি চর্ণবিচর্ণ বহুমূল্য পাত্রের টুকরোগুলির মত কুড়াতে লাগলাম নীনার স্মৃতি-চিহ্ন! কিন্তু সে যে অতি সামান্য! শত চেষ্টা করলেও পরিপূর্ণ কিছু পেলাম না। সবটুকুই তার অসমাপ্ত.....ভাঙ্গাংশ। তবু যতটুকু তার নতুন করে পেয়েছি তাতেই আনন্দে হৃদয় আমার উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। এই হারিয়ে যাওয়া জিনিস খুঁজে পেয়ে, তাদের স্মরণ করে, আমি কাটিয়েছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দেখে লোকে হাসে, কিন্তু আমি পাই আনন্দ। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, নতুন করে জীবন আরম্ভ করার অবসর আর আমার নেই। তবু আমি আমার মন থেকে মূছে ফেলতে পারি কদর্য চিন্তা, সংগীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ আর ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ। নীনার পবিত্র স্মৃতি আমার দিয়েছে সেই ক্ষমতা।

আর একবার ঐ প্রতিমূর্তিটি দেখবার ভয়ানক ইচ্ছা জাগলো। কিন্তু সে বাড়িতে প্রবেশাধিকার আমার নেই। বাড়িটার চারধারে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি, মূর্তিটা দেখতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। কারণ জানালা থেকে মূর্তিটা ছিল অনেক দূরে। সন্ধ্যারাত ঐ বাড়িটার সম্মুখে কাটিয়েছি। বাড়ির লোকদের সবাইকে আমি জানতাম। ঘরগুলিও আমার অপরিচিত ছিল না। ক্রমে একজন চাকরের সংগেও খাঁতির জমালাম। গ্রীষ্মকালে বাড়ির

গিন্নী দেশে চলে গেলেন। শ্রুত্রে আর আমি আমার আকাঙ্ক্ষাকে দমিয়ে রাখতে পারলাম না। ভাবলাম, আর একবার যদি নীনার সেই মর্মর মূর্তিটি দেখতে পারি, তবে তার সব কথা আমার মনে পড়বে। আমি তা সব্বন্ধে গেঁথে রাখব আমার মনে। সেই হবে আমার পরম আনন্দ। আমার সে ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়েই আমি আজ কারারুদ্ধ। কিন্তু জানেন বোধ হয়, আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। হল-ঘরে আমি ধরা পড়ে গিয়েছি। বিচারে প্রকাশ পেল, আমি তালা-মেরামতকারী বলে একবার এই ঘরে ঢুকেছিলাম। পরে আমাকে ঐ বাড়ির চারদিকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছিল। আমি দীন-ভিখারী, তালা ভেঙেই ঘরে ঢুকেছিলাম। থাকগে, আমার কথা শেষ হয়ে গেছে।”

সহানুভূতিতে আমার মনটা ভরে উঠেছিল। সহৃদয় কণ্ঠে বললাম,—“আমরা তোমার জন্য আপীল করব। নিশ্চয় তুমি খালাস হবে।”

“কি প্রয়োজন তাতে?” বাধা দিয়ে বৃদ্ধ বললঃ “আমার কারাদণ্ড হয়েছে বলে কেউ দুঃখিত নয়। তা ছাড়া কেউ আমার জামিনও হবে না। কারাগার আর কুপন্নী—আজ আমার কাছে এক কথা। আমি একান্তে নীনার কথা চিন্তা করতে পারব। কি বলেন?”

কি যে জবাব দেব ভেবে পেলাম না। বৃদ্ধ অকস্মাৎ অশ্রুত এক স্নান দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললঃ “একটা সমস্যা আমার আজও সমাধান হয়নি। যদি নীনার কোন অস্তিত্বই না থাকবে, তবে ঐ ক্ষুদ্র মাৰ্বেলের মূর্তিটি দেখার পর যে প্রেমের গল্প আমি রচনা করেছিলাম, সে কি শব্দে আমার দুর্বল মস্তিষ্কের সৃষ্টি!”

অনুবাদক—শ্রীমতীজয় রায়

এক মাসের জন্য

**অর্দ্ধ মূল্যে কনসেসন**

এ্যান্ড প্রভু 22K<sup>1</sup> মেট্রো

রোল্ডগোল্ড গহণা

—গ্যারান্টি ২০ বছর—

চুটি-বড় ৮ গাছা ০০ ম্মলে ১৬, ছোট—২৫, ম্মলে ১০, নেকলেস অথবা মফচেইন—২৫ ম্মলে ১০, নেকচেইন ১৮ একছাড়া—১০ ম্মলে ৬, আংটি ১টি—৮ ম্মলে ৪ বোতাম এক সট ৪ ম্মলে ২, কানপাশা, কানবালা ও ইয়াররিং প্রতি জোড়া ১ ম্মলে ৬। জার্মলেট অথবা অন্ত এক জোড়া ২৮ ম্মলে ১৪। ডাক মামূল ৫০, একচে ৫০, অলস্কার লাইলে মামূল লাগতে না।

**নিউ ইণ্ডিয়ান রোল্ড এণ্ড কারেট গোল্ড কোং**

১নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।





# মপরাহ

শ্রীঅপূর্বকুমার মিত্র

দল

"না!"

"এই যে বাবা! ঘুমের ফল! এতদিন পরে গরীব মার কথা মনে পড়লো?"

"ছিলাম না যে কলকাতায়। মোমাছি কোথায় যা?"

"মোমাছি কে বাবা?"

"ও! ভুলে গেছি, মিনাতি?"

"মিনু? এল বলে, তুমি একটু বোস, আমি ন করে আনি ততক্ষণ; উনিও এলেন বলে, পাক বড়োতে গিয়েছেন। তুমি একটু বোস পালিয়ে শওনা যেন সেবারের মতন।"

তাপস আজই হাজারাবাগ থেকে এসে পাঁছেছে। মাসাধিককাল কলকাতায় ছিল না। রীর অনেকটা শীর্ণ হয়েছে। ক্লান্তজনিত দুর্বলতা কেবল মনের বল দিয়ে দমন করে ঘরে বাড়ায় কাজে অকাজে। বিকেলের দিকটায় পাক হলেমেরো বেড়াতে যাওয়ায় বাড়িটা নিখুঁত। মোমাছির ছোট্ট ঘরের চোকীর উপর তাপস কাত রে এগারো বছরের পুরানো একখানা মাসিকের গাভা উল্টোতে উল্টোতে এক সময়ে এলিয়ে শুয়ে দেছে কপাল খেয়ে উঠেছে, তারই ফোঁটা ফোঁটা ম গলা বেয়ে বালিসে পড়ে বালিস ভিজিয়ে দিচ্ছে। মনি সময় মোমাছি ঘরে ঢুকে অপ্রত্যাশিত মনেদ খমকে দাঁড়ালো। তারই বিছানায় শোয়া রখে খসী হলো কিনা বোঝা গেল না, তবে গম্ভীর হয়ে গেল। অনেক কিছু ভেবে অভিমান ছাড়িয়ে রাখে এমনি অমল হয়ে উঠলো যে, তার ইচ্ছা হলো মলে উঠিয়ে দেয়। তারই বাড়িতে এতটা সাহস স কিসের জোর পেয়েছে যে বলা নেই, কওয়া নেই অবিহা হত একটা মেয়ের ঘরে ঢুকে, অকাতরে মনোনা হে। শীর্ণকায় চেহারা ঘমান্ত কলেবরে ঠাভবে অসময়ে শোয়া দেখে তাকে নিতান্ত কুপার গ্ত মনে করে মোমাছি ঘর ছেড়ে রান্নাঘরে চলে গল।

"মা! ও কতক্ষণ এসেছে?"

"জটখানেক। চা নিয়ে গিয়েছিলাম। উনি জেনে ঘুমন্ত লোককে উঠিয়ে এখন চা নাইবা দিলে, গাই ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি। রান্নার জোগাড় করছি দিখ আজ রাতে না খেয়ে কেমন করে যার।"

তাপসের ঘুম কেউ ভাগ্যালে না, রান্নাঘরে লল গরমমশলা বাঁটা, মাংসে দই মাখানো। ষগত্যা মোমাছিকেও কিস্মিসের বেটা ছাড়তে সতে হলো, চাটনি হবে, কালিয়াটা উনুন থেকে নামলেই। কিন্তু মন ষার সঙ্গে ঝগড়া করতে ষ, শতাই হোক আর মিঠাই হোক, নারী হোক বা দুঃখ হোক তার সামিগে যেতে চায়। সেইজন্যই নতারা ছোট্টন কাউন্সলে, উকিলবা ছোট্টন কাছারি,

ছেলো ছোট্ট মাঠে, "শুনচো" বলে মহিলার ধাক্কা দিয়ে ঘুমন্ত লোককে ওঠায় ঝগড়া করতে, হারাজিওর খেলা করতে—স্বভাব!

দুটি একটি কিস্মিস্ টপ টপ মুখে দিতে দিতে মোমাছি রান্নাঘর থেকে ফাঁকি দিয়ে উঠে এল, তারপর নিজের ঘরে এসে ঘুম ভাঙাতে তাপসের মুখে একটা কিস্মিস্ দু আঙুলে দিয়ে পুরে দিলে।

তাপস ধড়ফড় করে উঠে থু থু করে ফেলে দিল, নিজের গায়ের চাদরের প্রান্ত দিয়ে ঘুম মুছে সলজ্জ হাসিতে মোমাছিকে কাছে ডাকলে—"এত দেরী হলো কেন? কোথায় গিয়েছিলে?"

"সে খোঁজে আপনার দরকার কি?"

"সুখের মধ্যে কি দিলে, বালি কিসকির করছে?"

"ভয় নেই, বিষ নয়।"

"তবু কি অমৃত শুনি?"

"কিস্মিস্—খেলেন না কেন?"

"খেরোছি।"

"তারপর, হঠাৎ কি মনে করে এসেছেন বলুন।"

"এসেছি তোমার সঙ্গে পরামর্শ আজে—প্রথম কথা শরীরটা আমার ভাল নেই। ছুটি নিরোছি। সব কাজের থেকে তোমায়ও ছুটি দিলাম।"

"অর্থাৎ বলতে চান পত্রিকা অফিসে আমার আর কোন কাজের দরকার নেই?"

"সত্যিই তাই। এমন একজনকে জোগাড় করছি যার কাজ এবং উৎসাহ দেখলে মনে হয় আমাদের দুজনের অভাবটা সে একাই পূরণ করতে পারবে।"

"সুতরাং বলতে চান—মোমাছি, আর তোমাং স্থান নেই কোথাও।"

"ও কথা কেন বলছো? তোমার পরিকল্পনা, কল্পনা সবই মৃত হয়ে উঠবে এবার। স্থান তোমার ছাপাখানার, অফিসে নয়। সেই সুবর্ণরেখা নদীর পাড়ে, শোন মিনু, আর নয়, সত্যিই এবার ঘাটশীলা যাবে। সত্যিই একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকবো.....শরীরটা বড় দুর্বল লাগছে কিছদিন থেকে—তোমার বাবার কাছে অনুমতি নিই, কেমন? চল?"

"কিসের অনুমতি? তাপসবাবু! এটা কি আপনার সংসাহস ও রুচির পরিচয়? অবিহা হত মেয়েকে সঙ্গে করে হাওয়া পরিবর্তন করতে চান, হাসপাতালের নার্সের সাহচর্য পেয়ে পেয়ে বিরক্তি ধরেছে, এখন কেটু রুচির পরিবর্তনের দরকার বোধ করছেন?"

"মোমাছি!"

"হ্যাঁ, ঠিক! যা বলছি তার একটা কথাও

ফেরত নেবো না। অনেক নিচুতে নেবে গেলেন, আর নয়।"

"মিনু! উঠবার আগে একটা কথা বলে যাই। শিক্ষা আর সংস্কার চাপে তোমার আদর্শ মেঘের মধ্যে নিশে গিয়েছে। আগুন ফেলে তুমি আকাশের বিদ্যুৎ নিয়ে কাজ করতে চাও। হয় না তা মিনু, যাতে পোড়ে তাইতে পোড়াও, নইলে যোবনের সেই বাঁধনহারা স্বপ্ন তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে চিরদিনই যদি পৃথিবীর সবাইকে খুব সতর্ক চোখে যাচাই করতে যাও। আর শোন, ভালবাসা কথাটাই হয়তো মিথ্যা, তবু ভুল করে, চং করে, দুর্বলতায়, ছলনায়, মোহে, ক্রান্তির উচ্ছ্বাসে জীবনে যারা একদিন একটিবারও বলতে পারলো না তারাও এক রকমের পশু ও পাষণ ঈশ্বরের সৌন্দর্যদূত নয়, কেবলমাত্র সৃষ্টির রক্তাধার, মুক বধির ও অশ্ম! চলো মোমাছি!"

মিনুর পিতা আস্তে আস্তে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন, বলেন—"এবার ঘুমটা ভাঙলো? অসময়ে আর ঘুমিওনা বাবা, ওঠো।"

উঠে বসে তাপস কপিত হতে দুই একখানা বই নাড়াচাড়া করে সলজ্জ হাসিতে তাকে ঝটের উপর বসতে অনুগ্রহ করলে ও নিজে উঠে দাঁড়ালো।

"তুমি এবার কাপড়টা ছাড়ো। মিনু, একখানা কাপড় এনে দে।"

"সে কি! কেন বলুন তো?"

"আজ তোমাকে না খাইয়ে ওরা কিছতেই ছাড়বে না।"

"কিন্তু আমার যে অশোচ।"

"সে কি!"

"হ্যাঁ, বাবা কদিন হলো—"

"ও তাই তো, এতক্ষণ কক্ষ করিনি!"

সকলেই একটু হতবাক হয়ে গেল। কোন রকম ভাবের আতিশয্য প্রকাশ না করে তাপস আস্তে আস্তে রান্নাঘর নেমে হাটতে শুরু করলে। রান্নাঘরের দরজার সামনে বিমর্ষ মনে না হলুদ-গরম-মশলার হাতখানা কাপড়ের আঁচলে ওড়াভাড়ি মুছে তাপসের না খেয়ে যাওয়ার কারণটা জানবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন।

মোমাছি বসে ছিল তার ঘরেই চুপ করে, মনটা তখন তার একখানা সাদা ফলস্কেপ কাগজের মতন • বুক শেঁটে ছিল, ভাব ভাষার কোন অভিযুক্ত ছিল না।

কিছু পরে বিছানায় উপড় হয়ে পড়লো, এগারো বছরের পুরানো মাসিক পত্রখানা চেপে ধরে। পাশের বাড়ির রেডিও তখন আকাশে বাতাসে বিষ ছড়িয়েছে—

"ফিরানু! যার সে কি আসে ফিরে

বসন্ত সমীরণে ফল হয়ে..."

\* \* \*

—থাইসিস্ স্যানিটোরিয়াম

আলমোরা

শারদীয়া ষষ্ঠী

প্রিচরণকমলেশ,

মোমাছি, তোমার বিয়ের নেমতন্ন-চিঠি শ্যাম-বাজারের ঠিকানা কেটে পাঠিয়ে দিয়েছে, আজ ভোরে চিঠিখানা পেলাম। সুখের দিনে কতদিন পরে তোমার ছোট বোনকে মনে পড়েছে। সুখী হও; আর হিসে কর না কাউকে। শেষ পর্যন্ত যদি তুমিও বিয়ে করতে পারলে কি করে জানবার আগ্রহ আর নেই। আবার বিয়ে বাড়ির ছবি মনে পড়েছে। জীবনে হয়তো কলকাতার মুখ দেখতে

পথে না, মনের পটে টালিগঞ্জ থেকে শ্যামবাজারের ট্রামের রাস্তা ঘরবাড়ি কত সব ছবি উল্লেখ্য হয়ে আছে আজও। আবার কত কিছু খোঁজা হয়ে ফাকাশে হয়ে দূরে চলে গিয়েছে। হোস্টেলের দিনগুলো এখনও ভাসে চোখের উপর—কোথায় সেই বাইশজন ছিটকে পড়োঁছ ভাবতে আজ চোখে জল আসে, চিত্রার আত্মহত্যা দেখলাম, আই সি এসের বউ হয়েছে কণিকা তবু খন্দর ছাড়লো না। ছায়া-চিত্রে চলে গেল প্রমীলাদেবী—এককালে এত আত্ম-ছিল যে খন্দরের পদায় উত্তরের জানালা ঢেকে যেমে উঠতো তবু বিভূষণ স্ট্রীটের চায়ের দোকানে ক্ষুটিশ চাচ কলেজের ছেলেরদের মুখ পর্যন্ত দেখতো না, যেন হিটলারের সঙ্গে ইহুদীদের সম্বন্ধ। শুনতেও বোধ হয় সেই ডাঁল, বড় বড় চোখ, যে একদিন কি একটা ছুঁড়ে আমেরিকান মিলিটারী জাইভারকে মেরেছিল, একটা কালো কদাকার সিংহলী ফিরিঙ্গীকে বিয়ে করে সিগাপুরে চলে গেছে। তুমি হয়তো জান লাবী নার্স হয়েছে, তোমার আর সব বন্ধুদের মধ্যে লীট ভেলে হতে মরে গিয়েছে আর্ভুডে হার্ট ফেল করে।

এখানে আসবার মানসুই আগে একদিন পথে মনোহরপুরের রোডের মধ্যে মিলিকে দেখেছিলাম। পাড়ার ছেলেরা তাকে ফ্রোপিয়ে তড়াক করে নিয়ে চলেছে। একবারে উম্মাদিনী। তবু পরনে ভাল শাড়ী। চুলে একটু জট হয়েছে তবু চুলের ঝকড়া সেই সুন্দর ঘন কালো তুলোর বাউটা এখনও একবারে যারিনি। তার খুব কাছে এসে ডাকলাম—মিলি! এই মিলি! চিনতে পারিস? আমাকে? সে আপন মনে চলতে চলতেই জবাব দিল—ঘাটে পাড়ি, মরে যা, মরে যা—বদেশী হ'লো যা—জয় হিন্দু, এক দুই তিন—ভারত স্বাধীন! এগারো বারো—ভারত ছাড়ো।

এবার নিয়ে কতবার তোমার বিয়ের চিঠিটা পড়লাম। সুখের দিনে সুখী হও দিদি, এতদিনে তবু তোমার কল্যাণবন্দি হয়ে গেছে। ঠিকই তো নারী যখন তুমি, জানবে ফুল হয়ে জন্মেছো, সৌরভ দাও, কবিরাজী পাচন হয়ে হাড়িত আর সিঁধ হবে না, দেশের কাজ এখনও তুমি করতে পাবে ভয় কি? মনের থেকে সব বাধা ঘাচিয়ে ফেল।

আমার কথা জানতে চেয়েছো। জান দিদি, আমাদের চিঠি লিখতে কত কষ্ট হয়, তবু লিখছি বিছানায় শুয়ে কাত হয়ে পেনসিল দিয়ে—এই দিন আজ আমার জ্বর নেই, আজ লিখতে পারবো, ভাবই আছে।

একদিন কত ঠাট্টা করেছ তোমরা হোস্টেলের সবাই—আমি এত পাতলা ছিপিছিপে, দেখলো যেন আমার পরগাছা, চলতে গেলে সাদা সোয়েডের হিলতোলা জুতো বোঁকিয়ে যাবে, প্যারাসোল ছাতি আমার আঙুলের ফাঁক দিয়ে পড়ে যাবে। চলে তেল না দিয়ে ফুলিয়ে রাখতাম দেখে সবাই ঠাট্টা করেছ “আর্ভুড থেকে যেন উঠেছি একুশ দিনের কামান দিয়ে”। কতদিনের কত ঠাট্টা আমার এই রূপ নিয়ে তোমরা করেছ। দিদি তুমিই একদিন বালির মোহনভোগ খাওয়াবে বলেছিলে চিনেবানাম খাইনি বলে। স্বাধীনতাভাবসে কাগলের নিশান আঁটা দিয়ে লাগাইনি বলে আমার আঙুলগুলো চেপে আঙুরের রস বের করে ওমরখায়ের মতন সুরাপান করবে, এই রকম কত টিপনি কেটেছ। তবু এত সব ঠাট্টা সহ্য করে গর্ব ছিল মনে মনে আমি স্টাইলিস্ট মেয়ে, ভীক্ষু আমার রুচি। হোস্টেলের বিপিন ঠাকুরের আধাসিঁধ ভাত, কলাই ডাল আর পুইশাক তোমাদের মতন হাঙ্গস্-হুঙ্গস্ করে খেতে পারতাম না বলে বলতে টালিগঞ্জের স্টার হবে তাই না খেয়ে শরীর পাতলা করছে। তোমরা

যখন দাঁত দিয়ে নখ খুঁটেতে আমি ফ্যান্সি টেট দিয়ে নখ খুঁচলো করে রঙের পাশল করছি, বিলিতি আর দিশি স্টাইল এক করে আমার দেহটাকে কলকাতার দোকানের প্রথম শো-কেসের পুতুল করে গর্ব বোধ করছি—ঠাকুরমার পরসাগুলো কত রকমে উড়িয়েছি পথ না পেয়ে, তার বদলে পেয়েছিলাম তোমাদের কাছে লাঞ্ছনা, ঠাট্টা, উপহাস, হয়তো ঘৃণা। জীবনটা যে কি ভাবে শেষ পর্যন্ত গড়ে উঠতে কে জানে। এমন একটা চরম পরিবর্তনের দিনে, তুমি একটা ছেলেকে গভীর এক রাত বর্ষাতি পারিয়ে মেয়ে হোস্টেলে নিয়ে এলে। ঘুগায় ইচ্ছা হয়েছিল সুপারিন্টে-ডেন্টকে বলে দিই, তোমার শাস্তি হোক।

কত কৌতুহল নিয়ে সে রাত তোমার ঘরে কান পেতেছিলাম, শুনলাম তোমার কান্না শুধু—উঁক দিয়ে দেখলাম তার পা ধরে মেরেতে বসে আছে। বলছে—দাদা পচিশো টাকা আমি গরীব মানুষ কোথায় পাবো! সে বললে, না যেন যেমন করে পারো এই রাতই লোগাড় কর নীলে সবাই এক জায়গায় প্রোতার হয়ে যাবে, কেউ গা ঢাকা দিয়ে পালাতে পারবে না। তুমি উঠে পড়লে তার পা ছেড়ে। আমি ব্যর্থমনোরথ হয়ে দৌড়ে এসে নিজের ঘরে শুয়ে পড়লাম।

অকাতরে ঘুমের ভাণ করলাম, তবু তুমি ছাড়লে না, দরজা যেন ডেডে ফেটেও চাপ, তারপর আর সবই তো জান, সেই বৃষ্টি-বাদল রাতে জানালার গরাদে টাণ্ড-অফ-ওয়ারের দাঁড়ি ঝুলিয়ে তিনজনের নিকুম্ব রাতে বসে পড়া, অতরতে শ্যামবাজারে দিদিমার কাছে মিথ্যা কান্নাকাটি করে পচিশো টাকা নিয়ে তোমার সেই দাদাকে দেওয়া।

আজও জানি না কেন, বা কি জন্য, কাকে বা কি কারণে সেই টাকা তুমি খরচ করেছিলে। তারপর থেকে তোমার জেলে যাওয়া পর্যন্ত শুধু এই স্যানিটরু পেয়েছিলাম, তোমাদের দলের সব মেয়েই আমাকে একটু সুন্দর করে দেখতে লাগলো। আজ হয়তো একটু আলাপ করতে পারি অকালে এই মৃত্যুশয্যায়—কিন্তু দিদি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হয়, তোমার অনেক সময় বাইরের রূপটা দেখেই অনেককে বাইরে রাখ, তাকে শব্দ, বলও মনে কর, তাতেই তোমরা শত্রুর সংখ্যা বাড়ায়। বলতে পারো, আমাকে কেন টেনে নিলে না? যে আঙুলগুলো পিয়ানোর উপর নেচে বেড়ায় সেগুলো এনে তোমরা চরকার লাগাও না, কারণ পিয়ানো দেখেই তোমরা ভয় পাত। যে মেয়ে মঞ্চমলের টিট পরে রাতে শোবার আগে ঘুমের আশায় কত সাধ্যসাধনা করে, তাকে আদর করে অলিতে-গলিতে নিয়ে যাও না কেন? সবাই কি দেশের দুঃখটা মোটরের জানালা দিয়ে দেখতে পায়? তাদের কেন নিয়ে যাওনি যেখানে সিগারেটের পরিভাষা টিনে ফ্যানজাল নিয়ে মা শিশুকে খাইয়ে বাচাতে চেষ্টা করছে।

যার আছে তার কাছে তোমরা যাও না, যার নেই তার কাছে গিয়ে ভিক্ষা করে তাকে রাখা দাও। দিদি, এই যুগের সংগ্রামে দেখতে পাই গরীবকে বাচাতে তোমরা মধ্যবিত্তের স্বার্থস্থ হয়েছ, কিন্তু জান না দিদি, তারাও যে আজ নিঃসম্মল, শিক্ষা আর জ্ঞানের অভিশাপে তাদের দারিদ্র্য লঙ্ঘনাত মাথায় শতভাবে ভারও চাকতে চেষ্টা করছে। তোমার পরোনাই হাতের পর ধারা মেনে দেশের আপনজনকে বিলাসী, বিস্ত্রভোগী, অশ্ব, স্বার্থপর বলে দূরে রেখেছ। চোখ তুলে চেয়ে দেখ দিদি, সব তোমার আপনজন হয়ে গিয়েছে, সে তোমার বন্ধুধারা পুরষই কোক আর শব্দ করে চুলছাটা বাঙালী মেমই হোক। যেমন একদিন পুতুলপরা বলি আমাকে দূরে রেখেছিলো তেমন

আজও কত নারীপুরুষকে বড়লোকের আঙুরের মধ্যে, গোলামখানার গাড়ীর ভিতর রেখে, অকর্মণ্য স্বার্থাধি, দেশদ্রোহী মনে করে ত্যাগ করছে।

খুব ক্রান্ত বোধ করছি। আজ থাক, এই পর্যন্ত, দিদি—কাল এই চিঠি পাঠাবো, নিজের দুটো কথা তোমাকে জানাতে চাই।

\* \* \*

শারদীয়া সন্তমী!

আজ নিশ্চয় শরতের মেঘ ভেঙে কলকাতার অলিতে-গলিতে ছাদে কানিসে সেই মন-কেমন-কদা আলো ভেঙের বেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। পাকের পাকে নারকেলের দণ্ডি বেঁধেছে, পুজো-মন্ডপের সামনে মেরুপুরুষদের আলোনা করে প্রতিমা দেখাতে। আলমোরার আকাশে বাতাসে, খাউ, দেবদারু, ত্রিপুরামেরিয়া, ন্যাসপাতি গাছে পাখীর কলকাকলী হয়তো আছে ঢাকের বাজনার পরিবর্তে; কিন্তু হাসপাতালের দেয়াল ভেদ করে সে সব আর আমাদের কানে পৌঁছায় না, শুনবার আগ্রহও নেই। আমরা যারা এখনো জীবনমরণের সর্দ কার্ণিসের উপর দিয়ে টলে টলে হাটি তাদের কাছে এই পৃথিবীর আর কোন মূল্য নেই। ঝড়, পর্ব, দোল-দুর্গোৎসব এমন কি দেয়ালের কালেশ্রাবের কোন খবর রাখ না। জৈকের ব্যর্থতার কখনও দেবতা কখনও রাক্ষসী হই। সুস্থ বলবান সুপুরুষ ডাক্তার নার্স আমাদের সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কখনো ভাবি সুন্দর ঐ ডাক্তারটা সূর্যী ঐ নান্দটাকে কেন ভালবেসে বিয়ে করে চাকরী ছেড়ে হাসপাতাল ছেড়ে চলে যায় না। এমন রাক্ষসী! মন এক সময় পেয়ে বসে যখন অভিশাপ দিই, ভগবান, এই কাল রোগ সব সুন্দরী বাঙালী মেয়েদের দাও, আমার দুঃখ তাতে অনেকটা হ্রাসবে—ঐ মেনকা নার্সটার এই রোগ হয় না কেন? দস্যুর মত শক্তি রাখে, ঘাটে খুব আর হয় না কেন? ওয়ার্ডমার আট দণ্ডা দৌড়ে দৌড়ে ঘুরে বেড়ায়। বিয়ে দিলে আটটা ছেলেমেয়ের মা হোলোও হয়তো একটুও ভাববে না, কিন্তু আমরা এ-কি করলে ভগবান! মৃত্যু দাও, হঠাৎ অন্তিম চলে যাই; বুকুর বাতাস বন্ধ করে বীভৎস যন্ত্রণায় যেন পাগল করে দিওনা, গভীর রাতে জ্বরের মধ্যে যেন সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলি, ভয় পেয়ে শেখাবিষায়ের কামার যেন সময় না পাই।

তোমার শূভদিনে আমার বাথার কাছিনী শুনিয়ে তোমাদের আনন্দমুখর দিন ভারসাম্য করবে না দিদি—আজ আমার সকালাই জ্বর আসতে ব্যত পড়িছি। যেদিন জ্বর আসে সেদিন পৃথিবীকে একভাবে দেখি, সবই যেন বিরাটময় মৃত্যু যেন শ্বাসে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে তবু আচর্ষ এই দেহ এই মন, উপরি উপরি তিন-চার দিন জ্বর না আসলেই কত আশা এসে বুকুর মধ্যে গাসা নাঁধে, ডাক্তারকে অনুরোধ করি—দিন না আজ ফ্রুস্কন্স থেকে সব জল আর পুঁজ বের করে। পার্শ্ব বড় ডাক্তার সাহেব ওয়ার্ডে এলে হাসতে চেষ্টা করি, দুঃস্থাত তুলে নাকার করে অনুরোধ জানাই—দাও-না ডাক্তার সাহেব এখ কোর্স গোল্ড ইনজেক্শন করে, অনেক ভাল হয়ে উঠেছি, দাও এবার চিকিৎসা শেষ করে। নিরি-বিলিতে মেনকা নার্সকে জিজ্ঞেস করি—আজ মেনকাদি, কতদিন এক নাগড়ে জ্বর না এলে, রয় না পড়লে তোমরা ডাক্তারী মতে আমাকে নিরোগ মনে করবে?

হাসে কেবল, খুব ভরসা দেয়, তবু সঠিক জবাব দেয় না। দেবার দরকারও হয় না, সত্যিই যেতে না যেতেই বিকেলের দিকে নিম্মশাট আবার গরম বোধ হয়। এত পাকা হরো! ধারমোমিটার আর দরকার হয়না দেখতে।



হাসপাতালে এসবের কিসের প্রয়োজন, বেখানে তিলে তিলে সুনিশ্চিত মৃত্যুর প্রহরটি দিনের পর দিন গুণে চলছে। কেন জগতের সব সুখ থেকে চিরবাণীত হয়ে চলে যাওয়া চির অশুকারে—

কিসের আশায়? কার জন্য? মরার হয়ে উঠলাম, দুঃস্বপ্নে বিশেষত মন তোলপাড় করে উঠলো, কোথায় আমার বাবা? এ পৃথিবী জাতি! ছায়া, একদিন তো পরিচয় ছিল ওদের অনেকের সঙ্গে। একটু ভ্রূর ইসারায় ওদের ব্যাডমিন্টনের পালকের বলের মত কত মারাজালের উপর দিয়ে ঘোরানো-ফিরানো যায়। প্রিন্স ওয়ার্ডের বন্ধু আমার। চন্দ্রগ্রহের রাহু তোমাকে আক্রমণ হতেই হবে, চাই যে তোমাকে চায়।

একটু শব্দে নিই, বসে বসে চিঠি লেখা অভ্যাস অনেকদিন নেই, আজকেও তোমার চিঠি ডাকে দিতে পারলাম না।

শরীর দুর্বল থাকলে সকলভাবে দেখালা

প্রকাশ পায়। সারাটা দিন যত্নের স্বেচ্ছা কল্পনাতে চরম আত্মতৃপ্তি দিই, তববার বৃষ্টি ধড়মড় করে ওঠে। তারপর নির্দিষ্টকালে লাগে প্রকৃতিস্থ হতে—খুন আসামীর মত দুঃস্বপ্নে কল্পনা করে—পারলে। প্রতীক্ষায় কি উগ্র আনন্দ জীবনে একদিনই কেবল অনুভব করেছি, কল্পনার কি হোলি খেলা, রঙের নেশার কি বিপুল আয়োজন করেছি। যদের পরী হয়ে রাণী ওয়ার্ডে ভলকা গাড়ী, শব্দকল্যাণ হয়ে সিগারেটের তালগাছের তলায় পদ্মপাতা। ছড়িয়ে বিজ্ঞান করেছি, বোধে যুগের অভিসারিকা হয়েছি, কিন্তু কিছু ভাবতে গেলেই বুক দুঃ দুঃ করে ওঠে। অনাদিন নার্সগুলো একটু আঙা দিয়ে কোথায় যে চলে যায়, সারারাত টের পাই না, কিন্তু সেই রাত এক পাল নার্স প্রাণথলে আঙা দিতে লাগলো আমাদের ওয়ার্ডে। এত বিরক্ত হই মনে মনে, তবু মুখে বলতে পারি না, রাতও যেন বেশী হতে চায় না।

খুঁটি খুঁটি করে সুরকীর রাস্তায় আওয়াজ হল। মুখ তুলে দেখলাম—মামুলি ব্যাপার! মেথরের বউ চলেছে রোগীদের ডিস্ক-কুজোনা খাবার নিয়ে। কিন্নু কিন্নু খট খট—বাং! নিন্তা-কার মামুলি ব্যাপার, বড়ো মনস্কামন কম্পাউন্ডার ডাক্তারখানা বন্ধ করে নিজের কোয়ার্টারে চলেছেন।

জানালার তলেই থস্ থস্ আওয়াজ। বাস্! লাক দিয়ে উঠলাম। বকের ভিতর ঢেঁকির পাড় পড়তে লাগলো। দাঁড়তে কষ্ট হতে লাগলো। তবু, মুখ নিচু করে জানালা দিয়ে দেখলাম রাতকানা একটা পাহাড়ি গরু, ফুলগাছের পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছে, হাসপাতালের গোয়াল থেকে দাঁড় ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে।

ঘুম আর আসে না। বসতেই পারলাম সে আসবে না, আমাকে ফাঁকি দিয়েছে। রাতের রেন্স-গাড়ি বাঁশি বাজিয়ে অনতিদূরের স্টেশন পার হয়ে চলে যায়। একটু একটু শীত, বাঁশির আওয়াজ, চাকার আওয়াজ, সারি সারি জেনাকীর আলো অতীতের কত ভ্রমগাহিনী মনে করিয়ে দেয়—তোমাদের সঙ্গে দল বেঁধে দেওর বাওয়া, পুতী যাওয়া, শীতের মধ্যে কম্বল হারালাম, বাইশ কাপ চা খেয়ে সন্ধ্যাত উপহার পেয়েছিলাম, ইয়ার্কি করে রেলগাড়িতে সিগারেট খেতে গিয়ে বমি করে মাথা ধরে প্রায় মরে যাই, তুমি চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে বকল—যত হাসি তত কান্না—

সেই উল্লাস, সেই শরীর ও হোবন, সেই দিন কোথায় যে সব হারিয়ে গেছে ভাবতে লাগলাম। তবু রাণী ওয়ার্ডের জানালা ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম,

কর্তাদিন পরে সারা পরেছি, বডিস্ বেঁধেছি, বেড় বহুর এসব স্টুডেন্টের একপাশে পড়ে ছিলাম। কেবল একদিন পরেছিলাম মনে পড়ে এখনে হাসপাতালের সব রোগীর মিলে একটা থিয়েটার করেছিল দেখতে গিয়েছিলাম। সবাই থিয়েটারে বাস্, এমন সময় হৈ চৈ পড়ে গেল প্রিন্স ওয়ার্ডে আগুন। আগুন! সবাই হাঁপাতে হাঁপাতে এলাম থিয়েটার ফেলে—দেখেছিলাম ঠিক ঐ তিন নম্বর কেবিনেই একটা ছেলে সারা গায়ে ফেটোভের স্পিরিট মাখিয়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করেছে। জানতে পেলাম ছেলেটা নাকি কলেজে থাকতে খুব ভাল থিয়েটার কোরতো। সেই দুঃখটাই সাময়িকভাবে তাকে পাগল করে দিয়েছিল।

কিন্তু আমি একি পাগল হতে চলেছি। খাটের নিচ থেকে স্টুডেন্ট টেনে দশ টাকার একটা নোট ব্রাউজের ভিতর সন্তপণে রেখে ব্যালদায় নেমে এলাম। ফুট ফুটে জোৎস্না চারধারে, বাইরে সদর রাস্তা দেখা যায়, স্টেশনের পথ দেখা যায় দু'দিকে বিজলী ব্যতির দীপালী যতদূর চোখ যায়, তারপর সিগনালের লাল নীল আলো ঘড়ায় ঘড়ায় করে সারা রাত মাসগাড়ীর সাইটিং চলে। দু' পা এক পা করে সুরকীর রাস্তায় অবশেষে নেমে পায়চারি করলাম। মাথায় সব ব্যুধি ঘুরিয়ে যায়, রুতে নিজের মশারীটা খাটের উপর ভাল করে ঝাটুয়া দিয়ে বাই হ্রাস্তায়।

তারপর একবার তিন নম্বর কেবিনের জানালার পাশ দিয়ে রুটে যেতে যেতে ডাকলাম—এই! আমার ডাকলাম—এই শব্দে নেমে!

বুক এবার আর ধড়মড় করলো না আমার। জানালার কাছে এসে বসে—মাঝি একটু পরে একটা বইতে এমন সমাপ্তিস্থ হয়েছি যে আপনার জনের নোমেন্টস একবারে ভুলে গিয়েছিলাম।

বেশ মানুষ যা হোক, আর আমি সেই সন্ধ্যা থেকে বসে আছি—

জল নিয়ে? “শুধুই কি তাই” বলে হাসলাম। এখানে দাঁড়িয়ে আর নয়, আপনার মশারীটা ফেলে নেমে আসুন।

কোথায়?

চলুন গেট পার হয়ে স্টেশনের প্লাটফর্মের একটু পায়চারি করে আসি অনেকদিন পরে। আপনিও চলুন একটা সিগারেট খানেন, আমি তো জরুরি গন্ধ ভুলে গেছি। আজ জরুরি দিয়ে চার খিলি পান একসঙ্গে খাবো। কখনো? চলুন।

“সে মন্দ হয় না কিন্তু রাত্রে গেটের বাইরে যাওয়া? আর তা ছাড়া খুঁচুরা পরসো আমার নাই কাছে? সব টাকাই অফিসে জমা রাখি।”

“সে ভালতে হবে না, আসুন তো নেবে, আমি সব জোগাড় করেছি।”

“ও, আপনি একবারে প্রস্তুত।”  
“আপনার মত নই কথা শিখি কথা রাখি না।”  
“বললাম তো, বই পড়ছিলাম।”

গেট পার হয়ে যাত্রার সময় দুজনেরই ভয় ভয় করছিল। কর্তাদিন পরে চাইলে আসলাম হাটতে শব্দ করোছি, অসুখের কথা সব ভুলে গেছি, স্টেশনে পৌঁছানোর আগেই ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার কি নিলজ্ঞ চেহারা। নিজেকেই তিরস্কার করতে ইচ্ছা হল—ভিঃ দেহায়া মেরেমান-যে, সংখ্যে না বাবু-ক সংস্করেও তো বাবা উচিত, কি করছি।

জিজ্ঞেস করলে,—“হাটতে বাকি কষ্ট হচ্ছে? ওরকম করছেন কেন?”

“লজ্জার ওর হাত ছেড়ে দিলাম: কাঁচা সুপারী

দিয়ে পান খাবার আগেই কান লাস হয়ে উঠে ব’ হাতে কপালের ঘাম মুছে বললাম—

“না চলুন, বেশ পারবো হাটতে, আশে সপ্তে আছেন ভয় কি।”

“খুব নিরাপদ আশ্রয়, না?”  
মুখে বললাম—“নিচুয়াই”, কাটলাম ওর হা একটা সীতা-চিমটি, যার মানে—“বাখা” না তোমায়। স্নানর ভাবায় বা বলতে চাই নাও, কোনদিন ও কেউ মুখ ফুটে বলতে পারেনা।”

নিশির ডাকে যেন চলতে চলতে দুই প্লাটফর্মের উত্তে এলাম। সে চার হাটতে, “আরো হাটবো, কর্তাদিন এরকম হাটিনি।” আ চাই বসতে, কর্তাদিন এই মুহূর্তের জন্য স যৌবনটা অপেক্ষা করেছিলম কাহে বসতে, নি আশ্রয়ে কঠিন বাহুর আলিঙ্গনে।

তাকে সিগারেট খাওয়ার কথা ভুলে গেল নিজেও পানে জরুরি অরুচি এস। কেট একবারে নিরিবিলি অত রাত্রে দু’ এক এদিকে ওদিকে ময়লা কাপড় ঢাকা দিয়ে ল আছে। স্টেশন মাস্টারের ঘরে একটানা চমি ঘাড়ের আওয়াজ আর টেলিগ্রাফের টের-টকা। ল ঘুমন্ত, মাঝে মাঝে এক আতঙ্কন কুসী অর্থে পাশ্চাত্য গানের সুর ধরে, বাড়ি টেনে আমা পাশ কাটিয়ে চলে যেতে লাগলো। তাইদেই এ জনকে বললাম—“এই কুসী, ওয়েটিং রুমটা খ দাও।” জবাব না দিয়ে অন্য একজন কুসীকে দৌঁ চলে গেল। তাকেই ঘুম থেকে তুলে বললাম “খোল ওয়েটিং রুম।”

“নেই জি। আমি হুকুম নেই হায়।”  
শাড়ির আঁচল থেকে দশ টাকার নোট বের করে তার মুখের কাছে ধরে বললাম—“দাও, যা বলছি শোন।”

কুলাটিও যেমন হতব্যক্ হয়ে পৈতায় চাবীটা বের করলে, সেও অবাক হয়ে ব “করবেন কি দ—শ—টা—কা! কেন বক দিচ্ছেন শব্দ শব্দ। চলুন পান সিগারেট কোথায় দেখি খুঁজো।”

দুঃস্বপ্নের আবদার করে, অভিমান দে চরম নাটকান্ডিনয় করে হাত ধরে ওয়েটিং নিয়ে এলাম।

“কি হয়েছে আপনার বলুন তো? খ খারাপ লাগছে?”

“আপনিই পরীক্ষা করে বলুন দেখি, সিগারেট দেবো।”

পাখাটা খুলে দিলাম, কপাল দিয়ে ঘাম প লাগলো, হাত পা কাঁপতে লাগলো। প্লাটফর্ম আলোই যথেষ্ট উগ্র, আর ঘরের ৩ টিপ্লাম না।

তখন হয়তো আমার চোখের চাটনি স্ভাভ ছিল না। সেই ভয় পেয়ে আমার ধরে ফেলে ব “সাঁতা করে বলুন শরীর খারাপ লা এদের কাউকে ডাকবো একটা গাড়ি এনে চলে যাই হাসপাতালে ফিরে।”

“দুপ” বলে ধমক দিয়ে ওর মুখে হাতটা চাপ দিলাম। ওর মুখ এত গরম জানতাম মনে হল গরম বেগুনির উপর রয়েছে। সে আর নামাইনি।

“কেন। কেন চলে যাওয়া, আমার কি তুমিই তো সাহস দিয়েছো, কাস রাত্রে বর বক্ষ্যারোগীর নীতিবোধ! সমাজ! কেউ বচিবো না, তুমিও না, আমিও না, দেখেছো এ হাসপাতালে এসে বচিতে—শব্দ অপেক্ষা-বাখতা। কিসের ধর্ম ভয় তুমি আমাকে দে

দশ ঈশ্বর আমি মানি, পাপকে ভয় করি, তবু  
কালি আমারে তিহি এত কষ্ট দিচ্ছেন এ জীবনে  
যে মরবার আগে আজকের এইটুকু অন্যায় তিনি  
কমা করবেন। অন্যায় কি করা হচ্ছে বলতো, আজ যদি  
আমরা দুজনতে সুস্থ শরীরে কলকাতায় থাকতাম  
আমাকে কি তুমি বিয়ে করতে পারতে না—মরবার  
আগে কার জন্য তুমি আমার শ্রুতিটা বাঁচাতে চাও?  
বল কি বলতে চাও আমাকে? তুমি এমন পাথরের  
মতন চূপ করে বসে থেকে না—বল? কই বল না?  
এই!”

“নামটা পর্যন্ত জানি না, কি বলে ডাকবে?”

“ডাকো আমাকে যে নাম ধরে ডাকতে তোমার  
কাল লাগে।”

“রাণী ওয়ার্ডে থাকেন যখন, রাণী  
বলেই ডাকি?”

“ডাকো, যত ইচ্ছা ডাকো, মিষ্টি কথায়  
ফাঁকি দিলে শুনবে না।”

“ফাঁকি দেবোনা বলেই এখনও তোমাকে  
এমন করে কাছে নিয়ে বসে আছি। শোন রাণী,  
তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোট। এই কাল অসুস্থ  
থাকে তাতে কি? এমন বেপারোয়া হয়ে উঠেছা  
যেতে তাই বলে? এই বৃকটা তোমার কামারের  
হাঙ্গরের মতন যতক্ষণ উঠবে নামবে ততক্ষণই  
তোমার, আমার, সবার—চাওয়া, পাওয়া আর  
হাসানোর শেষ নেই। একটু বিশ্রাম দেও এখন।  
উপোস করলে যেমন শরীরের যন্ত্রগুলো বিশ্রাম  
পায়, মনের এই চাওয়া-পাওয়া—হাসানোর বিশ্রাম  
আছে ইন্দ্রিয়গুলোকে একটু উপোস করিয়ে  
রাখলে। আজ সন্ধ্যা থেকে এই কথাটাই হঠাৎ বই  
পড়ে আবিষ্কার করছি, ভাবি এমন সহজ কথাটা  
লোকে বোঝে না কেন।”

“কি তোমার সহজ কথাটা?”

“মরবার সময়টা যখন নিকটে এসেছে—মনের  
কাজ বন্ধ করে দাও, কিছু চাইবে না, আশা  
করবে না, হারানো বলে হাহুতাশ করবে না।”

“কি হবে তা হলে?”

“সেই দেবে তোমার মনের দরজা বন্ধ করে,  
তোমার ইন্দ্রিয়গুলো দেখবে সব শিশুর মত  
তোমার চারিপাশে কাত হয়ে চিৎ হয়ে, উপড়  
হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে—এ জীবনের লাভ ক্ষতি  
তখন হিসাব করতে ইচ্ছা হবে না, কারণ  
লাভের অংশটা ঘাড়ে করে মৃত্যুর ওপারে নিয়ে  
যেতে পারবে না।”

“ওসব কথা শুনতে চাই না, আমার লাভের  
অংশ থাকবে পাপ, একটা দিনের জন্য। তা আমি  
ঈশ্বরের দয়াকে নিয়ে হাজির করবো, শাস্তি বা  
হয় নেবো। ছোটবেলায় কালীঘাটের দোকানে  
এক রকম ছবি বিক্রি করতে দেখতাম। তাতে  
কি রকম পাপ করলে কি রকম উপাড়ুন যমরাজ  
করবেন তার ভয়াবহ দৃশ্য আঁকা থাকতো।  
পাড়োগায়ে অশিক্ষিতা মেয়েদের পক্ষে সেগুলো  
বেশ কাজ করত। দেখো, আমি যেকোনো ধর্ম-কথা  
আমাকে বন্ধিয়ে লাভ নেই। আজ আমার তুচ্ছ  
মিটিয়ে যদি যমরাজ আমার মৃত্যুদেহটা এক মণ  
তেলের কড়াইতে পুড়িয়ে কোন আমোদ পান  
পাবেন, তাহলে আমার দমেই নেই, ওসব দশ পরস  
নামের পাপের ছবি সুস্থ সবল তীর্থযাত্রীর জন্য,  
হাসপাতালের মরণযাত্রীর জন্য নয়।”

“কিস্তু রাণী, এমন সুযোগ পাবে কোথা—  
সারা জীবনের যত পাপ তুমি ক্ষেড়ে ফেলে দিতে  
পারো যদি মৃত্যুর পূর্বে মনটা একটু স্থির করে

সেই বিরাট অবোধা, অচিন্তা, অনাদি অনন্ত  
নিরাকার শক্তির কাছে তোমার “ভূমিকে” ছেড়ে  
দাও। আমি অধিক হয়ে যাই রাণী, এমন জটিল  
সংসারে, শেষ দিনের জন্য এত সরল সহজ পথ  
ঈশ্বর রেখেছেন তবু কেন লোকে মরতে ভয়  
পায়।”

“হয়তো দৈহিক কণ্টের জন্য।”

“দৈহিক কণ্ট কতটুকু হয় কেউ জানে না, তবে  
তুমি ভাব হয়তো মরতে খুব কষ্ট রোগীর পাশে  
দাঁড়িয়ে যখন নাতিশ্রবাস দেখো, তাই না? শোন  
রাণী, এই সৌরজগৎময় একটা সামঞ্জস্য আছে,  
দিন যেমন আছে, তেমনি রাত আছে, আকাশ  
যেমন আছে তেমনি পাতালও আছে; সুখ যেমন  
আছে অনুভূতির একটা দিক, দুঃখ তেমনি আছে  
আর একদিক। মরু যেমন আছে, সাগর তেমনি  
রেখেছে বায়ু যমন আছে আগুনও তেমনি আছে, কেউ  
এরা ছোট বড় নয়, উভয় দিকে সমান সমান।  
ডান যদি থাকে, বামও আছে, পূর্ব থাকলে পশ্চিম  
নিশ্চয়ই আছে, বিষ্ণুরাচরে এই সামঞ্জস্য, এই  
জ্যামিতির হিসাব, এই স্থাপত্যের সমরেখা আছে,  
প্রতিটি অণু-পরমাণুর চন্দ্রভাগির সমতাল আছে।  
অতুড়ে মায়ের গর্ভ থেকে যে ছন্দে যে প্রসব ব্যথায়  
শিশু মরায় নামে, সেই শিশু তার মৃত্যু দিবসে  
মৃত্যু যন্ত্রণায় সেই ব্যথার তাল ভঙ্গ করে না।  
অন্তঃসত্তা আর গভ্যায় ব্যথার কণ্টে সমছন্দ না  
থাকলে প্রকৃতির এই সুন্দর রহস্যময় সামঞ্জস্য  
এত বিকৃত হত যে, হয়তো নদী উল্টো দিকে  
বইতো, চন্দ্র সূর্য এক আকাশে একই সময়ে এসে  
বগড়া করতো, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের সব শৃংখলা  
ভেঙে যেতো। রাণী, জীবনের এই অপরাধে  
লক্ষ্মী ভাই আমার, আর কটা দিন ভক্তি তোমার  
অচল রাখো।”

“এত শাস্ত তুমি পড়লে কোথেকে?”

“বোকা মেয়ে, শাস্ত পড়বার আর সময়  
কোথায়? গান্ধীজীর লেখা গীতার পাঠা আজ  
কদিন ধরে উল্টাচ্ছি। এমন অনেক মানুষ আছে  
সারা জীবনে মদও ছুঁলো না, গীতাও স্পর্শ করলো  
না, আমি যে সেই দলেরই ছিলাম এতদিন। হঠাৎ  
একটা স্বাদ পেয়ে গিয়েছি। জগলে কাঠ কাটতে  
এসে গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়ার মতন। আর কি  
ছাড় রাণী! আমার পথ বের করে ফেলেছি, এত  
সহজ! এত সরল! সময় পেলেই সূতো কাটবো  
যতক্ষণ চাকা ঘোরে চরকার বা তকলির, ততক্ষণ  
সৃষ্টির বীজমন্ত্র আমি মনে মনে স্মরণ করি,  
সুদর্শন চক্রে এই শব্দের সংগে মিলিয়ে নিই  
সূর। কে জানতো গান্ধীজী চারশো লাখ  
ভারতবাসীকে এমন করে ফাঁকি দিয়ে আসল কাজ  
করিয়ে নিতে চান। হাতে জপের মালা তুলসীর  
মালা পাছে ফেলে দিই সেইজন্য সূতাকাটার ছলে  
সেই পাথসারথীর চিন্তায় ভাবিয়ে দেন; ইহলোকের  
সুখ, দেশ, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি সব ভুলে যাই,  
ইংরাজ, ইহুদী, মুসলমান সব ভেদাভেদ ভুলে যাই,  
তবু সূতো কাটি। বা হাত আমার উল্টো উঠ যায়  
আর সামনে ঘোরের কাঠের চাকা সমস্তে, সকল  
জ্ঞানের অতীত সেই চিরস্মরণের অভয় আশ্বাস-  
বাণী সदा হাসামুখে বলে সেই চরকার আড়ালে—  
সর্ব ধর্মান পরিভ্রাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।  
রাণী, আর আমি মিছে ঘোরাঘুরি করবো না,  
সময় পেলেই সূতো কাটবো, সময়ের শেষে অন্তিম

সেই সর্বশক্তিমানের শরণাপন্ন হব সারাজীবনের পাপ  
খুঁলসাং হয়ে যাবে মুহূর্তে।”

মৌমাছি! কি আহত, কি অপমানিত  
হলাম। জঞ্জার বাকরোধ হয়ে গেল। ওকে একটা  
ধাক্কা দিয়ে উঠে পড়লাম, ঠান্ডা একটু জলের  
আশায় আলো না জ্বেলোই বাধরমে ছুটে গেলাম,  
চোখে মুখে জল দিতে দিতে ভাবলাম, একালে  
এদেশে এখনো আমাদের তরুণের দলে এমন সুন্দর  
পুঁকি মাটি আছে যা দিয়ে দেবতা গড়া যায়।  
দাঁদি, সময়ে এই সব মাটি যদি তোমরা পেতে,  
তাহলে কি-না করতে পারতে।

অচিল দিয়ে চোখমুখের জল মুছতে মুছতে  
ওর কাছে ফিরে এলাম। হাত বাড়িয়ে পায়ের ধুলো  
নিত নিতে বললাম—“চলুন ফিরে যাই, অনেক রাত  
হয়েছে। অন্যায় যদি করে থাকি রাগ করবেন না  
ছোট বোনের উপর।”

পঃ

\*বিজয়া দশমী।

দিদি, আজ ভোরে সেই তিন নম্বর কোবনের  
ছেলেকটার ঘরে লোকে লোকারণ্য, সেই ঘটনার পর  
আর ওর সংগে একটা দিনও দেখা হয়নি। স্যাণ্ডেল  
পায়ে দিয়ে প্রিন্স ওয়ার্ডের সামনের বারান্দার  
সিঁড়িতে উঠে উঁকি দিয়ে দেখলাম, যে চাদর দিয়ে  
আমরা প্রায় সব সময় কোমর পর্যন্ত ঢেকে রাখি  
তাই দিয়েই নার্সরা মাথা পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছে।  
পাশের টেবিলের উপর হাত-ঘণ্টা আর সেই কারণ  
কাউকে ডাকবার আর প্রয়োজন হবে না।

ওয়ার্ডমাস্টার এসে নোটবুক পেপিসল বের  
করে মেনকা নার্সকে বললে—“বলুন, তিন নম্বরের  
কি কি নিজের জিনিস অফিসে জমা দেবেন—”  
মেনকাদি বলল যেহেতু লাগলো—“ফাউন্টেন  
পেন একটা, গীতার গান্ধীভাষ্য একখানা, মাফলার  
একটা, আংটি একটা—”

“কিসের আংটি?”

“কিসের আবার! সোনার, মিনে করা।”

একটু আগ্রহ নিয়ে কোবনের চৌকাত পর্যন্ত  
এসে দাঁড়িলাম, দেয়ালে তখনো ওর টিকিটখানা  
ঝুলছে। ভাল নামটা জানবার ইচ্ছায় যতবার  
তাকাতে যাই চোখ ঝাপসা হয়ে যায়, তবু অচিল  
দিয়ে চোখ দুটো মুছতে মুছতে লক্ষ্য করলাম  
অস্পষ্টভাবে কোন এক নার্সের কাঁচা হাতে বাঁদিকে  
কাত করে ইংরাজীতে লেখা—তাপস মজুমদার।

আমার প্রণাম নিও

ইতি,

স্বপ্না

এগারো

অনেক রাতে ঘোষ সাহেব পিজামা পরে,  
বর্মা চুরট মুখে দিয়ে মৌমাছির টেবিলের খুব  
কাছে এসেন।

“চল রাত হয়েছে, ঘুমবে না?”

“হাই, তুমি যাও না শোওগে, আমি যাচ্ছি  
একটু পরে।”

“তোমার বান্ধবীর চিঠিখানা খুব বড় মনে  
হচ্ছে। কিসের খবর মিনু? জন্মের? না  
বিবাহের? না প্রেমের? না মৃত্যুর?”

পাখানের পশুর মতন মুখটা তুলে বললে—  
“প্রেমের মৃত্যু।”

(সমাপ্ত)

# বিজ্ঞানের কথা

## প্রতিফলকহীন কাঁচ

হিমাংশু সরকার

ঘরের মধ্যে বসে কাজ করছি—এমন সময় চোখের ওপর এক ঝলক আলো এসে পড়ল। মাথাটা তুলেই দেখি সামনের বাড়ির ছোট ছেলেটা একটা আয়নার কাঁচের ওপর সূর্যের আলো ফেলে খেলা করছে। তার আয়নার ওপরকার প্রতিফলিত আলোটাই আমার মূখের ওপর এসে পড়ছে। ছেলে বেলায় আমরা অনেকই মাকে লুকিয়ে আয়না নিয়ে এরকম খেলা খেলেছি। ছেলেটা আমার কাছ থেকে অনেকটা দূরে থাকতে কিছু বলবার উপায় না পেয়ে সামনের যে জানলাটার ভেতর দিয়ে আলো এসে পড়ছিল সেটা বন্ধ করে দিয়ে আবার কাজ করতে লাগলাম।

এটা না হয় ধরে নিলাম যে, ছেলেটা ইচ্ছা করেই বা অনিচ্ছায় আমার মূখের ওপর প্রতিফলিত আলোটা ফেলছিল। আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যে এমন অনেক সময় হয় যে, কোন কাঁচের ওপরের প্রতিফলিত আলো আমাদের চোখের ওপর পড়ে আমাদের কাজের বহু অসুবিধা ঘটায়। এমন দেখা যায়—মোটর চালক রাস্তা দিয়ে গাড়ী চালিয়ে চলেছে, একটা মোড় ঘুরতেই সূর্যের আলোটা তার গাড়ীর সামনের কাঁচের ওপর এমনভাবে প্রতিফলিত হয়ে পড়ল যে তার পক্ষে গাড়ী চালান তখন একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। ছুটির দিনে খেয়ে দেয়ে আরাম করে বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজটা পড়তে গিয়েই দেখি সামনের শাশিটির ওপরে প্রতিফলিত আলোটা এমনভাবে চোখে

এসে পড়ছে যে, হয় মাথাটা ঘুরিয়ে শব্দে হয় না হলে উঠে গিয়ে খড়খড়িটা বন্ধ করতে হয়। ফটোগ্রাফারের কাছে গিয়ে খুব যত্ন করে ছবি তুললে আনতে গিয়ে দেখি—ওঃ হরি চশমার কাঁচের ওপর আলো পড়ে চোখ দুটো একেবারে ঝাপসা দেখাচ্ছে। ফটোগ্রাফারকে কিছু বলা চলে না কারণ সে ছবি তোলাবার সময় বার বার এ সমস্যা সাবধান করেছিল।

বিগত যুদ্ধে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে অনেক অস্ত্র সম্পূর্ণভাবে কিংবা আংশিকভাবে কাঁচ ব্যবহারের দরকার হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল যে, এইভাবে সাধারণ কাঁচ ব্যবহারে অনেক ক্ষেত্রে এমন অসুবিধা ঘটাতো যে, যার জন্য যুদ্ধের গতি যে রকম হওয়া উচিত ছিল তা না হয়ে বিপরীত হয়ে দাঁড়াতো।

এখানে কতগুলো সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যাক। যুদ্ধের সময় এক পক্ষ চেষ্টা করে যে, নিম্নোক্ত ওপর থেকে শত্রুপক্ষের আস্তানার ছবি তুলে নিয়ে সেগুলোর সাহায্যে তাদের আক্রমণের একটা খসড়া তৈরী করবে। শত্রুপক্ষের গোলা গুলির মধ্যে দিয়ে বৈমানিক কোনরকমে শত্রুপক্ষের আস্তানার ওপর হাজির হয়ে শত্রুগুলো পারল ছবি তুলে নিল। তারপর নিজের ঘাঁটিতে ফিরে এসে ছবিগুলো সাজাতে গিয়ে দেখলো যে, ক্যামেরার লেন্সের ওপর সূর্যের আলো এমনভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যে, কয়েকটা ছবি ভাল করে বোঝাই যাচ্ছে না। এত করে এই হল যে, শত্রুর আস্তানার

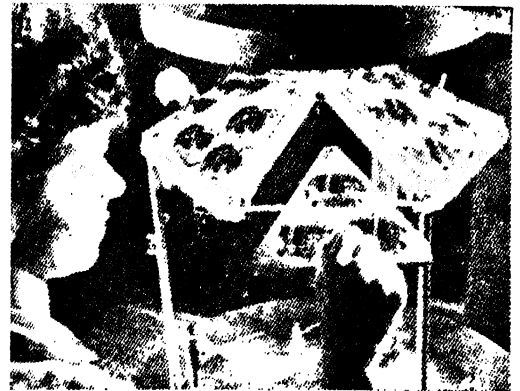
সম্পূর্ণ একটা ধারণা ছবিগুলো সাজিয়ে আর করবার কোন উপায়ই রইল না।

আকাশে দু'পক্ষের বৈমানিকের মধ্যে যুদ্ধ চলেছে—কোন পক্ষের এক চুল ডুল হলেই অপর পক্ষ তাকে ঘারেল করবে। এমন সময় হঠাৎ বিমানের কাঁচের প্রতিফলিত আলো এসে কোন একপক্ষের চালকের চোখে এক মুহূর্তের জন্যে পড়ে তার চোখ এমনভাবে ধাঁধিয়ে দিল যে তার শ্রেন দৃষ্টি কয়েক মুহূর্ত আর কোন কিছুই দেখতে পেল না—আর এই সুযোগেই অপর পক্ষ তাকে গুলিবর্ষ করে বিমান শব্দ ঘারেল করে বসলো।

সরু পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে মিলিটারী কনভয় চলেছে—একটার পর একটা। রাস্তা এত সরু যে চালকের একটু এদিক ওদিক হলে নীচের অতলস্পর্শী খাদে গিয়ে পড়বে। হঠাৎ পেছনের গাড়ীর কাঁচের প্রতিফলিত আলো অথবা গাড়ের ফাঁক দিয়ে আলো এসে চালকের সামনের কাঁচের ওপর পড়ে এমনভাবে প্রতিফলিত হোল যে সে আর রাস্তা কয়েক মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেল না। আর সেই মুহূর্ত কটি তার গাড়ী রাস্তা ছেড়ে খাদে পড়বার পক্ষে যথেষ্ট।

সাধারণ কাঁচ ব্যবহারের দরুন আলো প্রতিফলিত হয়ে অসুবিধা সৃষ্টির আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যায়।

অদৃশ্য এটা ঠিক যে প্রতিফলিত আলোর একটু অদলবদল করলে অনেক ক্ষেত্রে এই



হরি তোলার সময় কাঁচের ওপর আলো পড়ায় চোখ দুটো ঝাপসা দেখাচ্ছে

কাঁচগুলোতে মাগ্নেটিক কোরাইডের প্রলেপ লাগানোর পর কাঁচগুলো র্যাক থেকে নিয়ে রং পরীক্ষা করা হচ্ছে

অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

সেই জন্য কাঁচ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লোকেরা প্রথম কোন ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করতে লাগল যাতে কাঁচের ওপর আলো প্রতিফলিত না হয়। এরা পরীক্ষা করে দেখলেন যে, যদি কাঁচের ওপর এক ধরনের রাসায়নিক দ্রবের পাতলা প্রলেপ লাগান যায়, যাতে ঐ কাঁচের নিজস্ব গুণ নষ্ট হবে না—তবে ঐ কাঁচের ওপর কোন রকম আলো প্রতিফলিত হবে না।

প্রায় সব কাঁচের ওপরই আলো যে প্রতিফলিত হয় এটা আমরা সচরাচর দেখি, কিন্তু কেন যে হয় তা অনেকেই জানি না।

মাটির ওপর অথবা দেওয়ালের গায়ে রবারের বল জোরে ছুড়ে মারলে বলটা আবার ঠিকরে ফিরে আসে। আয়নার বা কাঁচের ওপর সূর্যের আলো পড়লেই আলো, ঠিকরে আর এক জায়গায় গিয়ে পড়বে। এই রবারের বল অথবা আলোর এই রকম ঠিকরে যাওয়াকে প্রতিফলন (reflection) বলা হয়। এখন মাটিতে অথবা দেওয়ালে বলটা যে রকমভাবে ছোঁড়া যাবে যথা সোজা অথবা বাঁকাভাবে তাহলে বলটা ঠিকরে আসবার সময় সেই রকমভাবেই আসবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বলটা ছোঁড়বার সময় যে রকম কোণ সৃষ্টি করে দেওয়ালে লাগবে ঠিকরে আসবার সময়ও ঠিক সেই রকম মাপের কোণ করে ফিরে আসবে। আলোও ঠিক এই একই নিয়মে চলে। যে রকম কোণ থেকে আলো এসে কোন কাঁচ অথবা চকচকে জিনিষের ওপর পড়বে, প্রতি-

এর আগে আমরা বলছি যে, কাঁচের ওপর যে আলো পড়ে তার কিছুটা অংশ কাঁচ চূষে নেয় এবং বাকি অংশটা প্রতিফলিত হয়। তাহলে আমরা সাধারণভাবে এটা বলতে পারি যে, আলোর যে অংশটা চূষে নেয় বলছি সেটা হচ্ছে আলোর তরঙ্গ যেকোনো কাঁচের ভেতর দিয়ে



গম্ভীৰ্জ কাঁচের আধারের মধ্যে কাঁচগুলো রেখে ম্যাগনেট্রিয়াম ক্লোরাইডের বাষ্প দেওয়া হচ্ছে

চলে যায় এবং বেগগুলো বেতে পারে না, সে-গুলো কাঁচের ওপর প্রতিহত হওয়ার দরুনই প্রতিফলিত হয়। আর আলোর প্রায় শতকরা বাট ভাগই নষ্ট হয়ে যায় প্রতিফলনের দরুন।



মোটরের কাঁচের ওপর আলো প্রতিফলিত হচ্ছে

ফলিত হবার সময় ঠিক সেই মাপের কোণ সৃষ্টি করে প্রতিফলিত হবে।

আর একটা জিনিস এখানে বলা যায় যে, বলটা যত জোরে ছোঁড়া যায় ঠিকরে আসবার সময় ঠিক তত জোরে আর আসে না। আলোর সম্বন্ধে ঠিক এই একই কথা। যতটা আলো কাঁচের ওপর পড়ে তার সবটাই প্রতিফলিত হয় না—কিছুটা আলো কাঁচ চূষে নেয় এবং বাকিটা প্রতিফলিত হয়।

বৈজ্ঞানিকরা এমন একটা উপায় বার কর- বার চেষ্টা করলেন যাতে আলোর বেশীর ভাগ তরঙ্গগুলো তপ্রতিহতভাবে কাঁচের ভেতর দিয়ে যেতে পারে এবং যার জন্য আর কাঁচের ওপর আলো প্রতিফলিত হবার সম্ভাবনা থাকে না। তারা পরীক্ষা করে বার করলেন যে, আলোর কোনও নির্দিষ্ট তরঙ্গগুলি যত লম্বা হবে তার চার ভাগের এক ভাগ আন্দাজ পুরু কোনও রাসায়নিক প্রলেপ যদি কাঁচের গুয়ে

লাগানো যায়, তাহলে ঐ কাঁচের ওপর আলো আর প্রতিফলিত হয় না, কারণ আলোর রশ্মি-গুলি সাধারণ কাঁচে যে রকম প্রতিহত হয় ঐ প্রলেপ থাকার দরুন প্রতিহত না হয়ে কাঁচের ভেতর দিয়ে সোজা চলে যেতে পারে।

কাঁচের ওপর যে প্রলেপটা লাগান হয় সেটা খুবই পাতলা—মাত্র এক ইঞ্চির ৪/১০০০০০০ ভাগ ঘন। এই প্রলেপের হাজারটা স্তর যদি পরপর সাজান যায়, তাহলে বোধ হয় এই পাতার সমান পুরু হবে না।

যুদ্ধের সময় এই প্রক্রিয়াটি সামরিক ব্যবহারের জন্য সাধারণের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সর্বসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে সুবিধার জন্য এটি আর গোপন রাখা হয় নাই। এখন এই প্রলেপওয়ালা কাঁচের সব চেয়ে বেশী ব্যবহার হয় চশমার জন্য। চশমাতে এই ধরনের কাঁচ ব্যবহার করলে আর আলো প্রতিফলিত হয়ে কাজের সময় বিরক্তি ঘটতে পারে না।

বর্তমানে আমেরিকার বিখ্যাত চশমার কাঁচ বিক্রেতা বস্‌ এন্ড লম্ব কোম্পানী এই প্রলেপ লাগানো কাঁচ বিক্রয়ের পথপ্রদর্শক। অবশ্য আমাদের দেশে খুব সম্ভব এই কাঁচের এখনও প্রচলন হয় নি।

জার্মানীর কার্ল জাইস এন্ড কোম্পানী অবশ্য অনেক দিন আগে এক ধরনের কাঁচ বাজারে চালু করেছিল যেটা হচ্ছে ক্যামেরার লেন্সের জন্য এক ধরনের ফিলটার কাঁচ। এই ফিলটারের ওপর সূর্যের আলো পড়ে প্রতিফলিত হোত না। এই জাতীয় ফিলটার কাঁচ আমাদের দেশেও ক্যামেরা বিক্রেতাদের নিকট এই যুদ্ধের আগেও কিনতে পাওয়া যেত। অবশ্য এই ফিলটার কাঁচ কিন্তু প্রলেপ লাগান কাঁচ নয়—এ আর এক ধরনের কাঁচ। খুব সম্ভব জার্মানীর এই ধরনের কাঁচ আবিষ্কার করার জন্যই পরে আমেরিকা এই ধরনের কাঁচ যে তৈরী করা যায় সেটার সুবিধা নিয়ে তাদের নিজেদের গবেষণার সাহায্যে বর্তমান যুদ্ধে ব্যাপকভাবে প্রলেপ লাগান কাঁচের প্রয়োগ করতে পেরেছিল।

চশমার কাঁচে এই ধরনের প্রলেপ লাগানর আগে চশমা বিক্রেতা চোখের পাওয়ার অনুযায়ী কাঁচকে ঘষে পালিশ করে প্রলেপ লাগানর কারখানায় পাঠিয়ে দেয়। কারণ সাধারণ চশমার লেন্সে প্রলেপ লাগানর সরঞ্জাম থাকে না।

তবে এমন দিন খুব সম্ভব আসবে যখন আমরা আমাদের মোটর গাড়ীর জানলা, ঘরের সার্শ, ছবির কাঁচ সবই অপ্রতিফলিত কাঁচ হিসাবে ব্যবহার করতে পারবো।

এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে কোন রাসায়নিক পদার্থ লাগলে কাঁচগুলোর ওপর ম্যাগনেট্রিয়াম

ক্লোরাইড নামক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ লাগান হয়। প্রলেপ লাগানোর প্রণালীটিও একটু নতুন ধরনের। যে সমস্ত কাঁচে প্রলেপ লাগান হবে, সেগুলো রাসায়নিক ওপরে রেখে একটা বায়ুশূন্য গম্বুজাকৃতি কাঁচের আধার দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এরপর ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড এর গরম বাষ্প আস্তে আস্তে দেওয়া হয়, তখন কাঁচগুলোর ওপর ঐ ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডের বাষ্পকণাগুলো লেগে গিয়ে একটা প্রলেপ পড়ে যায়। প্রলেপের ঘনত্ব অবশ্য

অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মাপা যায়, কিন্তু প্রলেপের কারখানার অভিজ্ঞ কারিগরেরা কাঁচের ওপর প্রলেপ লাগার দরুন কাঁচের যে রং বদলায় তাতেই তারা বুঝতে পারে যে, কাঁচের ওপরের প্রলেপের স্তরটি প্রয়োজন মত ঘন হয়েছে কি না। প্রলেপ লাগার দরুন কাঁচের রং বদল হতে হতে শেষ পর্যন্ত কাঁচগুলোর ওপর লালচে রংএর একটা আভা দেখতে পাওয়া যায়। আর ঐ রঙিন কাঁচগুলোকেই আমরা তখন বলব প্রতিফলক হীন (non-

Reflecting) কাঁচ।

এই গবেষণা বর্তমানে সম্পূর্ণ নতুন সেই কারণে এ সম্বন্ধে কোন সঠিক মতামত প্রকাশ করা বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এটা দেখা গেছে যে, অনেক কম্পানী যাদের এ সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা নেই তারা কাঁচে প্রলেপ লাগাতে গিয়ে কাঁচ নষ্ট করে ফেলেছে। সেই কারণে দামী কাঁচে প্রলেপ লাগাবার আগে কম্পানীর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ভাল করে জেনে নিয়ে তবে কার্যে অগ্রসর হওয়া ভাল।

## আফ্রিকাবাসীর আনন্দানুষ্ঠান!

আপনারা জানেন গত এপ্রিল মাসে ফরাসী রাষ্ট্রের সভাপতি মঁসিয়ে ভিৎসেণ্ট অরিয়ল ফরাসী অধিকৃত পশ্চিম আফ্রিকার রাজ্যটি পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। তাঁর সম্মানে ফরাসী আফ্রিকার কাক্সী প্রজারা নানা রকম আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল বলে জানা গেছে। কাক্সীদের আনন্দানুষ্ঠানে রকমারী খেলাধুলা, নাচগান, দ্বন্দ্ববন্দু

প্রভৃতি সেরেই ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু সেগুলো নাকি অত্যন্ত অশুভ ও সময় সময় ভীতি-প্রদ বলে মনে হয়েছিল—ফরাসী সভাপতি মঁসিয়ে অরিয়লের কাছে। কত অশুভ যে সে আনন্দানুষ্ঠান হয়েছিল তার নমুনা দেখতে পাবেন—এই পাতায়

• আফ্রিকা বা সীদে র  
রণপা চেপে নাচের  
ছবিটি দেখলেই।  
নাচছে দুটি মেয়ে—  
ভেবে দেখুন ঐ  
নর্তকীদের নৃত্যকে  
সুকুমার কলা আখ্যা  
দেওয়া যাবে কি?



কাহিনী নয়  
খবর

ব্যবস্থাই নিখুঁত এবং যান্ত্রিক। বিদেশী সৈনিকদের ফেলে বাওয়া অব্যবহৃত পাইপগুলি স্ফুট, স্ফুট হওয়ার আজকাল আমাদের দেশের অনেকের মনেই



পাইপ দেখছি। তাঁদের জন্যই এ খবরটা দিলাম—কারণ এরপর ঐ সেকেন্ডে পাইপগুলি টানতে গেলে হয়তো তাঁদের লজ্জাও হতে পারে।

## জন্মদিনের উপহার!

ইংল্যান্ডের রাজকন্যা এলিজাবেথের জন্মদিন কিছদিন আগে সাড়ম্বরে উদ্‌যুক্ত হয়েছে—এ খবরটা হয়তো কাগজে নিশ্চয়ই পড়ে থাকবেন, কিন্তু জানেন কি তাঁর জন্মদিনের উপহারগুলি কত সামান্য। না জানলে জেনে রাখুন। তিনি তাঁর বাবা সম্রাট যশ্বে জর্জের কাছ থেকে এবারের জন্মদিনে লাভ করেছেন অর্গাইল ও সাদারল্যান্ড হাইল্যান্ডার্স নামে সৈন্যদলের কর্ণেল বা সেনাপতির মর্যাদা। ব্রিটিশ সরকার তাঁর বাৎসরিক ভাতা বাড়িয়ে ৮৪ হাজার টাকা থেকে ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করে দিয়েছেন—এইটাই সরকারী উপহার। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রজাদের কাছ থেকে পেয়েছেন চরমো হীরের টুকরো, যার দাম প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা। আর ইংল্যান্ডের তাঁর ৫ লক্ষ গার্স-গাইড বন্ধুর দল প্রত্যেকে আধ পেনী করে দিয়েছেন—রাজকন্যাকে জন্মদিনের উপহার হিসাবে। পাঁচ লক্ষ আধ পেনীতে কত পাউন্ড, শিলিং, পেনী হবে সেটা অন্ধ কণ্ঠে বার করার ভার আপনাদেরই দিলাম।

## যান্ত্রিক ধূমপান!

ধূমপান কথাটা পেখেই চমকে উঠবেন না—ওটা বিস্ময়কর কায়দায় ধূমপানের যন্ত্র ‘পাইপ’ শব্দটির পরিভাষা। তা না হয় বুঝলেন—কিন্তু সেটা যান্ত্রিক হলো কি করে? সম্প্রতি আমেরিকার প্রসিদ্ধ মেকানিক রিচার্ড কার্ণহেইজার ধূমপান

করবার জন্য অশুভ এক ধূমপান বা পাইপ উপহার পেয়েছেন। এই পাইপটিতে আগুন নেভাবার ব্যবস্থা—আগুন জ্বালাবার জন্য ফিলটার কয়েল, তামাকের ছাই বার করার দরজা এবং মূখের লাল পাইপে যাতে না জমে তার জন্য ট্যাপলাগানো সরু নালী এবং একটি ছোট বালতিও আছে। পাইপটি সাধারণ পাইপের চেয়ে কিছু বড়—কিন্তু সমস্ত



## টেনিস

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতা “উইম্বলডন” শেষ হইয়াছে। আমেরিকান খেলোয়াড়গণ প্রতিযোগিতার সর্বাধিক কৃতিত্ব ও সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। আমেরিকা বর্তমানে টেনিস খেলায় যে পৃথিবীর শীর্ষস্থানের অধিকারী তাহা এই প্রতিযোগিতায় প্রমাণিত হইয়াছে। আমেরিকার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত জ্যাক ক্রামার প্রতিযোগিতায় পুরুষদের সিংগলস ও ডাবলসের বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়াছেন। মহিলা বিভাগের সিংগলস ও ডাবলসের চ্যাম্পিয়ান হইয়াছেন ‘আমেরিকান মহিলা খেলোয়াড়গণ।’ মিক্সড ডাবলসেও বিজয়ী দলে ছিলেন আমেরিকান মহিলা খেলোয়াড় মিস লুইসী ব্রাউ। ইহার সহযোগী ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা খেলোয়াড় জন ব্রমউইচ।

উইম্বলডন প্রতিযোগিতা ইংলণ্ডের প্রতিযোগিতা অঞ্চল এই প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডের কোন খেলোয়াড় সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। একমাত্র টনি মোর্রাম ডাবলসের ফাইনালে উঠিয়া একেবারে সৌভাগ্য লাভ করেন। তবে এই সৌভাগ্যের জন্য তিনি তাহার সহযোগী অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় বিলি সিডওয়েলের নিকট ঋণী। প্রকৃতই বিলি সিডওয়েলের অপূর্ণ দৃঢ়তা পূর্ণ খেলা ইহাদের ডাবলস ফাইনালে উঠিতে সাহায্য করে।

### অজ্ঞাত খেলোয়াড়দের কৃতিত্ব

আমেরিকান অজ্ঞাত ভরণ খেলোয়াড় বাজ-পেট্টি এই প্রতিযোগিতায় সকলকেই চমকিত করিয়াছেন। ইনি পুরুষদের সিংগলসে সেমি-ফাইনালে উঠিতে সক্ষম হন। ইহার পূর্বে ইনি পর পর জন ব্রমউইচ (অস্ট্রেলিয়া) ও ডুবলীকে (চেকোস্লোভাকিয়া) পরাজিত করেন। ব্রমউইচ অস্ট্রেলিয়ার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ও ডুবলীও ইউরোপের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলিয়া পরিচিত। এইরূপ দুইজন বিশিষ্ট খ্যাতনামা খেলোয়াড়কে পরাজিত করা কন কৃতিত্বের কথা নহে। বাজ পেট্টিকে আমেরিকান লন টেনিস এসোসিয়েশন মনোনীত করেন নাই। তিনি নিজ ব্যয়ে প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। আমেরিকার টেনিস পরিচালকগণ ইহার পর ইহাকে দেশের বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের মধ্যে স্থান দিতে আশ্বস্ত করিবেন না।

এই বাজ পেট্টি আঁতি অস্পষ্ট জনা ভারতের উৎসাহী ভরণ খেলোয়াড় মানমোহনের নিকট পরাজয় হইতে অন্যাহীত পান। কৃতীয় রাউন্ডের এই খেলা যাহারা দেখিয়াছেন তাহারাও এককাকো স্বীকার করিয়াছেন মানমোহন নেহাৎ দৃঢ়তাগ-বশত পরাজিত হইয়াছেন। এই খেলায় বিজয়ী হইলে তিনিও প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে হাফোনা উঠিতে পারিতেন। বাজ পেট্টি ব্রমউইচ ও ডুবলীকে পরাজিত করিয়া যে সুপ্রাতি লাভ করিতেন তাহাতে তাহাকে ভবিষ্যতে নিজ দেশের বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের মধ্যে স্থান লাভে সাহায্য করিবে। বিশেষ মানমোহনের ভাগ্যে সেইরূপ কিছুই আশা করা যায় না। তাহা না হইলে নিখিল ভারত টেনিস প্রতিযোগিতায় মানমোহন চেক খেলোয়াড় ডুবলীকে অন্যাসে পরাজিত করা সত্ত্বেও নির্বাচকগণ তাহাকে বাদ দিয়া প্রবীণ প্রথম শ্রেণীর খেলায় খেলিতে অক্ষম এইরূপ খেলোয়াড়দের ভারতীয় দলে মনোনীত করিলেন। মানমোহন, উইম্বলডন ও ইংলণ্ডের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহার পর যদি ভারতীয় দলে তাহাকে স্থান না দেওয়া হয় তাহা হইলে সাধারণ ভ্রূড়ামোদিগণ আর

# খেলাধুলা

নীরবে ইহা সহ্য করিবেন না, তাঁর প্রতিবাদ করিবেন। প্রয়োজন হইলে সারা দেশব্যাপী আন্দোলন করিবেন।

### বৈদেশিক খেলোয়াড়গণের ভারত ভ্রমণ

নিখিল ভারত টেনিস সংঘের বিজ্ঞাপিত হইতে জানা যায় যে, আগামী ডিসেম্বর মাসে সুইডেন খেলোয়াড় লেনার্ট বাজলান ও টরস্টেন জোহানসন ভারতের বিভিন্ন স্থানে খেলিবার জন্য আসিবেন। ইহার পরবর্তী সংবাদে জানা গেল গত বৎসরের উইম্বলডনে চ্যাম্পিয়ান ফরাসী খেলোয়াড় আইডান পেট্রী ও অপর বিশিষ্ট খেলোয়াড় মার্শাল বার্নার্ড এই সময় ভারতে আসিতে সম্মত হইয়াছেন। এতদুপাধি বৈদেশিক টেনিস খেলোয়াড় ভারতে পদাৰ্পণ করিবেন ইহা খুবই সুখের বিষয়। তবে ইহাদের সহিত সমপ্রতিবন্ধিতা করিতে পারে এইরূপভাবে ভারতীয় খেলোয়াড়দের তৈয়ারী করবার জন্য কি ব্যবস্থা হইতেছে জানিতে ইচ্ছা করে। বৈদেশিক খেলোয়াড়গণ আসিবেন ও অন্যাসে বিভিন্ন খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড়দের পরাজিত করিবেন ইহা দৌখণার জন্য আমরা একেবারেই প্রস্তুত নাই।

### উইম্বলডন প্রতিযোগিতার ফলাফল

মিসেস উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতার খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

### পুরুষদের সিংগলস

জ্যাক ক্রামার (আমেরিকা) ৬—১, ৬—৩, ৬—২ গেমে টম ব্রাউনকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

### মহিলাদের সিংগলস

মিস মার্গারেট ওসবর্ন (আমেরিকা) ৬—২, ৬—৪ গেমে মিস জোন্স হার্টকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

### পুরুষদের ডাবলস

জ্যাক ক্রামার ও রবার্ট ফালকেবার্গ (আমেরিকা) ৮—৬, ৬—৩, ৬—৩ গেমে টনি মোর্রাম (গ্রেট ব্রিটেন) ও বিলি সিডওয়েলকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

### মহিলাদের ডাবলস

মিস জোন্স হার্ট ও মিসেস প্যাট্রিসিয়া টড (আমেরিকা) ৩—৬, ৬—৪, ৭—৫ গেমে মিস মার্গারেট ওসবর্ন ও মিস লুইসী বাউকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

### মিক্সড ডাবলস

জন ব্রমউইচ (অস্ট্রেলিয়া) মিস লুইসী ব্রাউ (আমেরিকা) ৪—৬, ৬—৪, ৬—২ গেমে কালিন লং ও মিসেস ল্যান্সী স্টোন্টনকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

## ফুটবল

দীর্ঘকাল পরে আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলীর সভাগণ মিলিত হইলেন, আশা হইল প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলা সম্পর্কে তাহারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। কিন্তু ফলত তাহা হইল না। তাহারা গত ২৪শে ফেব্রুয়ারীর প্রস্তাবের কিছু পরিবর্তন করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। একটি উপ-সমিতি বা সাব-কমিটিকে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলা সম্পর্কে মহামত দুই সপ্তাহের মধ্যে জানাইবার জন্য নির্দেশ দিলেন। সূত্রাং ইহা হইতে বলা চলে না যে, শীঘ্রই কলিকাতার মাঠে

প্রতিযোগিতামূলক খেলাসমূহ অনুষ্ঠিত হইবে ফুটবল উৎসাহী ও খেলোয়াড়গণ গত এক মৈত্রী ধরিয় বসিয়া আছেন, আরও দুই থাকিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে ইহা মধ্যে পরিচালকগণ প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলার অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেনই ইহাই-বা জোর করিয়া করূপে বলা চলে। কলিকাতার অবস্থা মাঝে যেরূপ স্বাভাবিক ইহা উঠিয়াছিল বর্তমানে তাহা আর নাই। খেলা অনুষ্ঠিত হইবে না ধরিয় লইলে বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত হইবে।

## অলিম্পিক

১৯৪৮ সালের লন্ডন বিশ্ব-অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষ যোগদান করিবে বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। এই সংবাদ যে সঠিক সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোনই কারণ নাই। বিশ্ব-অলিম্পিক পরিচালকমণ্ডলী যোগদানকারীর যে তালিকা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা হইতেই জানিতে পারা গিয়াছে। নিখিল ভারত অলিম্পিক কমিটির সভা ইতিমধ্যে কবে অনুষ্ঠিত হইল এবং কবে যে এই সিদ্ধান্তে গৃহীত হইল কিছুই আমরা জানিতে পারি নাই। আমাদের বিশ্বাস ছিল ভারতবর্ষ এইবারে অনুষ্ঠানে যোগদান করিবে না। কারণ ইতিপূর্বে নিখিল ভারত অলিম্পিক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক অনুষ্ঠানে যোগদানের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করিয়া-ছিলেন। তিনি পশ্চিমে বলিয়াছিলেন “ভারত যোগদান করিয়া সম্পূর্ণ নৈরাশ্যের পরিচয় দিবে। কোন একটি বিষয়েও প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় উপরে উঠিতে পারিবে না।” তাহার যুক্তির সমর্থনে তিনি অনেক-কিছই বলিয়াছিলেন। সূত্রাং ইহার পরেও ভারতবর্ষ যোগদানের সিদ্ধান্ত কিরূপে গ্রহণ করিল বুঝিতে পারি না। কোন কোন বিষয়ে ভারতবর্ষ প্রতিবন্ধিতা করিবে জানিতে পারিলে সুখী হইব।

## জাতীয় খেলাধুলা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের পরিচালকগণ বাঙালার স্বা-পূর্বস্বানির্বাধে সকলের কর্মক্ষমতা ও স্বাস্থ্যসম্প্রদিত্তির জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত তাহা তাহাদের কার্যকলাপ হইতেই উপলব্ধি করিতে পারা যাইতেছে। দেশের অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে সকলে যখন দিশহারা তখন তাহারা একের পর এক নূতন কার্যকারী ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিতেছেন। সম্প্রতি ইহারাই মহিলাদের এক ব্যায়াম শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই কেন্দ্রে অনেকগুলি ছাত্রী, শিক্ষয়িত্রী ও মহিলা যোগদান করেন। চার্মিনবাপা এই কেন্দ্রে তাহারা সাধারণ ব্যায়াম, খালিহাতে ব্যায়াম, রতচারী, সামরিক কুচকাওয়াজ, লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, তীর-ধনুকের ব্যবহার, বগগটন প্রভৃতি শিক্ষা দেন। ইতিপূর্বে বাঙালার কোথাও এইরূপ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য অনেক মহিলা, ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রী নাম দিয়াও যোগদান করিতে পারেন নাই। তাহারা পরে খুবই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। পরের কেন্দ্রে যোগদান করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। পরিচালকগণ পুনরায় আর একটি কেন্দ্র বুলিবার বিষয় চিন্তা করিতেছেন। এই কেন্দ্রের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। সুখের বিষয় অর্থের অভাব হয় নাই। অনেকই কার্যকলাপ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। প্রকৃত ভাস কাজ করিলে অর্থের যে অভাব হয় না, ইহা হইতেই প্রমাণিত হইল। দেশবাসী জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘকে সর্ববিধের সাহায্য করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

# জহব আয়লা

ডেড কোমিক্যাল ওয়াকস  
৯২, মাদার্স ট্রিভেন্স রোড, কলিকাতা

# ফাউন্টেনপেন

“ফ্রন্টমোর” (ইংলিশ) অটোক্রো—১৫।

“গোল্ডেন প্ল্যাটিং নাম”—৩/০

এস, এম, কোং, ৬৫এ-১, নিমতলা, কলিকাতা।

(সি ১৩৫৭)

কেশ বিন্যাসে

# স্নোহিনী

কেশ তৈল

ওরিয়েন্টাল ইণ্ডিবিজ কলিকাতা



রিমঝিম বৃষ্টিতে ধারা প্রানের আনন্দ কে না পেতে চায়? বৃষ্টির দিনে গ্রামের মেয়ে-ছেলে-বো আজও এ আনন্দ থেকে বঞ্চিত নয়। কিন্তু শহরবাসীদের ধারা প্রানের ক্ষোভ মেটাতে হয় যান্ত্রিক উপায়ে—শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে। তবে ভালো সাবান মেখে শাওয়ারের নিচে বা কলতলায়

প্রান করে তৃপ্তি যে বড় কম তা নয়। ‘রেণু’ সাবান—যেমন তার মিষ্টি গন্ধ, তেমনি সুপ্রচুর তার ফেনা—মেখে প্রান করলে শরীর এমন স্নিগ্ধ ও পরিচ্ছন্ন মনে হয় যে প্রানের আনন্দ যায় শতগুণ বেড়ে। তার ওপর সাবানটি সুলভ। তাই ‘রেণু’ গায় মাথায় বিলাস আছে, বিলাসিতা নেই।



SRK 2

সোল সোলিং এজেন্টস:—ওরিয়েন্টাল মার্কেটাইল কোম্পানী লিমিটেড, ২৬এ ও বি প্রতাপাদিত্য রোড, কলিকাতা। ফোন নং সার্ভিস ৮৬৪। ২ লাইন

জা র মে ক্স



কিনুন হাতে হাতে ফল পাবেন

বী জা নু না শ ক  
ম ল ম

লিটল্‌স্‌ ওরিয়েন্টাল বাম অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস্‌ লিমিটেড্‌  
পোস্ট বক্স নং ৬৭, মাদ্রাজ

D.J.K. 24.

কাশি ও সাদিব  
সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ঔষধ



পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহৃত হয়

ধবন ও কুষ্ঠ

গায়ে বিবিধ বর্ণের দাগ, প্লাম্পাভীনতা, অঙ্গলি  
ক্ষীত, অঙ্গলিদিগ্নির বক্রতা, বাতরক্ত, একজিহ্ব  
সেরোসিস, ও অন্যান্য চর্মরোগাদি নিবারণ  
আরোগোড়ি জন্য ৫০ বর্ষোৎসবকালের চিকিৎসালয়

হাওড়া কুষ্ঠ কুটার

সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুরবোগ্য। আপনি আপনায়  
রোগলক্ষণ সহ পঠ লিখিয়া বিনামূল্যে  
ব্যবস্থা ও চিকিৎসাপত্র লউন।

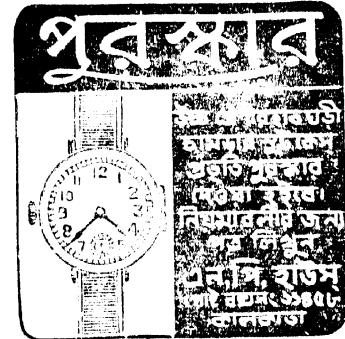
—প্রতিষ্ঠাতা—

পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা কবিরাজ

১নং মাধব ঘোষ লেন, বয়েট, হাওড়া।

ফোন নং ৩৫১ হাওড়া।

শাখা : ৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা  
(পুরবী সিনেমার নিকটে)



প্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত

ক্ষা যযুও হিন্দু

কৃত্রিম সংস্করণ বর্ধিত আকারে বাহির হইল।  
বাংলা হিন্দু এই চরম দুর্দিনে  
প্রফুল্লকুমারের পুণ্যনির্দেশ  
প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য পাঠ্য।

মূল্য—০.

—প্রকাশক—

শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার।

—প্রতিষ্ঠান—

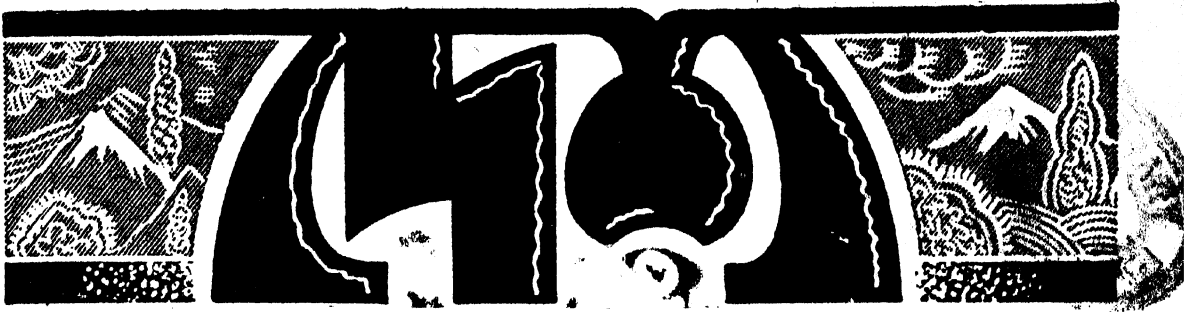
শ্রীগোরাঙ্গ প্রেস, কলিকাতা।

ও

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

শ্রীরামশদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ১নং চিত্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগোরাঙ্গ প্রেসে প্রদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক :—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।



সম্পাদক : শ্রীবাংলাচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ] শনিবার, ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪ সাল।

Saturday, 19th July, 1947.

[ ৩৭শ সংখ্যা

মিঃ জিন্নার আশ্বাস-বাণী—

মিঃ জিন্না পাকিস্থানের গভর্নর-জেনারেল নিবন্ধিত হইয়াছেন। কোন দেশের জনমান্য রাজনীতিকেরা সাধারণত এইভাবে চাকুরী গ্রহণ করিতে রাজী হন না। কিন্তু কারো আজম জিন্না সাহেব এতদিনে ইংলণ্ডের রাজার চাকুরী গ্রহণ করিলেন। বস্তুত সাম্প্রদায়িকতাবাদী ধর্মসংস্কারে অন্ধ অনুগতদিগকে পাকিস্থানী উম্মাদনায় চাঙ্গা করিয়া তোলা এবং লীগ নীতির উপর নিজের অবিসংবাদিত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাই যে মিঃ জিন্নার এই চালের মূলে রহিয়াছে, ইহা স্পষ্টই বোঝা যায়। কারণ, ইহার ফলে পাকিস্থানের গণপরিষদ যে শাসনতন্ত্রই রচনা করুক না কেন, লীগের কারো আজম এবং গভর্নর-জেনারেল একই ব্যক্তি হওয়াতে মিঃ জিন্না তাহার সর্বময় কর্তৃত্ব সর্বত্র অবাধে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবেন। মিঃ জিন্নার এই পদ লাভে আমাদের আপত্তির কিছুই নাই; কিন্তু তাহার শাসনাধীন পাকিস্থানে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে আপাততঃ ইহাই আমাদের, চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। মিঃ জিন্নার রাজনীতির মূলে আমরা এতদিন পর্যন্ত কোন বৃহদাংশের পরিচয় পাই নাই। আমরা দেখিয়াছি, মানবতা, উদারতা, স্বদেশপ্রেম কিংবা স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ স্বীকারের প্রবৃত্তি এবং বীরবলের অকুতোভয়ত্ববর্ণ বিকাশ জিন্না সাহেবের রাজনীতিতে এসব বস্তু সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয়। সাম্প্রদায়িকতাই তাহার প্রধান সম্বল এবং সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে অনাদর কোঁশল প্রয়োগেই ভারতের রাজনীতির কুটিল গতিপথে পাকিস্থানী ডিক্টেটরের কর্মকুশলতা এবং নীতি-দক্ষতার পরিচয়

## সাময়িক প্রদর্শ

পাওয়া গিয়াছে। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এবং মিঃ জিন্না গভর্নর জেনারেলের গদীতে আসীন হইলে তাহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রম ঘটিবে কি? গত ১৩ই জুলাই জিন্না সাহেব দিল্লীতে সাংবাদিকদের এক সম্মেলন আহ্বান করিয়া আমাদিগকে গণতান্ত্রিকতার অনেক বড় বড় কথা শুনাইয়াছেন। তিনি তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন পাকিস্থানে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ধর্ম বিশ্বাস, তাহাদের জীবন ও সম্পত্তির নিরপত্তা সম্বন্ধে আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য মিঃ জিন্নার এইসব উক্তি সত্যে পরিণত হইলে আমরা সুখী হইব; কিন্তু তাহা সম্ভব কি? মানুষের চরিত্র এবং তাহার মানসিকতা একটা দিচ্ছিন্ন বস্তু নয়, ফলতঃ সমগ্র জীবনকে জড়াইয়া তাহা সত্য হইয়া গড়িয়া উঠে। লীগের সর্বময় কর্তা মিঃ জিন্নার চরিত্র আমরা কোনদিনই গণতান্ত্রিকতার পরিচয় পাই নাই। বস্তুত মুসলিম লীগের সমগ্র নীতি-নিয়ন্ত্রণে তিনি গণতান্ত্রিকতাকে দলিত করিয়া স্বেচ্ছাচারী শক্তি প্রয়োগেরই সর্বত্র পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আজ পাকিস্থানের প্রভুত্ব পাইয়াই তিনি তাহার এতাব্যকাল অবলম্বিত জীবনের ধারা পরিত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ খলিফা আব্দু বকরের বৈরাগ্য কিংবা ওমরের উদারতার উত্তরাধিকারী হইবেন, মানুষের মনোবস্তির বিচারে ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। মহাত্মা গান্ধীও এদম্বন্ধে সন্দিহান। তিনি সেনিন নয়াদিল্লীর প্রার্থনামূলক সভায় জিন্না-সাহেবের এতৎসম্পর্কিত উক্তির সমালোচনা

করিয়া বলেন,—“কোন নেতা আন্তরিকভাবে কোন কিছু বলিলেই তাহা দ্বারা তদনুসারে কাজ হইতেছে, ইহা বোঝা যায় না। দেশ বিভাগ হওয়া স্বত্বেও নানা স্থান হইতে ছুরিকাঘাত, নরহত্যা, লুণ্ঠন, ও অগ্নিসংযোগের সংবাদ পাওয়া বাইতেছে। যোগদিল্লীর নিবৃত্তি নাই।” গণতান্ত্রিকতার দিক হইতে মিঃ জিন্না এবং তাহার অনুগামীদল মাঝে মাঝে মুখের কথা আমাদিগকে অজস্র শুনাইয়াছেন; কিন্তু এগুলি বন্ধ করিবার জন্য কাজে কি করিতেছেন? কলিকাতা সহরে বাহা ঘটতেছে সে কথা তুলিব না। কিন্তু সম্প্রতি আখাউড়িতে কি ব্যাপার ঘটিয়া গেল? তিন চার হাজার লীগ গুন্ডা জড় হইয়া নিরোষ হিন্দুদের উপর অত্যাচার-অনাচারের অনুষ্ঠান করিল, লীগের পক্ষ হইতে এ পর্যন্ত ইহার প্রতিবাদটা পর্যন্ত হইয়াছে কি? মিঃ জিন্না তো লীগের সর্বময় কর্তৃত্বপদে এখনও প্রতিষ্ঠিত আছেন। পাকিস্থানে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সর্ববিধ স্বার্থ নিরাপদ থাকিবে, ধর্ম-বিশ্বাস লইয়া সেই পূণ্যভূমিতে কোন নীতি-বৈষম্য অবলম্বিত হইবে না বলিয়া মিঃ জিন্না আশ্বাস দিয়াছেন, কিন্তু পূর্ববঙ্গে তাহা কিভাবে প্রতিপালিত হইবে, আখাউড়ার অনুষ্ঠিত লীগ গুন্ডামাীতেই তাহার সূচনা দেখা যাইতেছে। এই অবস্থার প্রতীকার কোথায়? বাস্তবিক পক্ষে জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ সংকট সম্মুখীন উপস্থিত হইয়াছে। নিজেদের বৃহৎ আদর্শকে উজ্জ্বল রাখিবার জন্য তাহাদিগকে সর্বদা সজাগ থাকিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে জাতীয়তার সেই আদর্শকে অন্ধুর রাখিবার জন্য জীবন দিতে হইবে। নতুবা সাম্প্রদায়িকতার যে বিষ ভারতে পরিণত হইয়াছে, তাহা হইতে জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিবার অন্য পথ নাই।

## পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিমণ্ডলীর কৰ্তব্য—

একপক্ষকাল হইল পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলী শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। শাসনভার হস্তে পাইয়া তাহারা কলিকাতা নগরীর জীবনযাত্রা শান্তি ও শৃঙ্খলার স্বাভাবিক পথে ফিরাইয়া আনিতে বশ্চর্যকর হন। কিন্তু তথ্যটি আজ পর্যন্ত সহরে গুণ্ডাদের নরঘাতী ডাউবলীলার নিবৃত্তি ঘটে নাই। শৃঙ্খল তাহাই নয়, শান্তি প্রতিষ্ঠায় সংঘবদ্ধ পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও 'এই জুলাইয়ের নৃশংসলীলা অন্তিমিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলী ইহার প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হন নাই। বলা বাহুল্য, এই জুলাইয়ের এই ব্যাপারকে আমরা গুণ্ডাদের আকস্মিক উদ্ভাটনা বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি না। বস্তুতঃ এ সত্য বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাঙলা গভর্ণমেন্টের পুলিশ বিভাগের প্রধান অফিস হইতে মুচিপাড়া থানার নিহত মুসলমান পুলিশ কর্মচারীর শবদগমনেচ্ছ, পুলিশদের উদ্দেশ্যে শোভাযাত্রা কোন কোন পথ দিয়া যাইবে এবং কোথায় গিয়া শেষ হইবে তাহার সংবাদ সম্বলিত ইস্তাহার পূর্বাহ্নেই প্রেরিত হইয়াছিল এবং সহরে ১৪৪ ধারা প্রবর্তিত রহিয়াছে, ইহা জানা সত্ত্বেও এইসব উদ্যোগ সম্পন্ন হয়। এইভাবে আইন-শৃঙ্খলার অভিব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে আইন অমান্য করিয়া শব-শোভাযাত্রা করে; শৃঙ্খল তাহাই নহে, তাহাদেরই চোখের সামনে গুণ্ডারা ছোরাছুরি চালাইয়া সহরের রাজপথ নির্দেশ পথচারীর রক্তে সিক্ত করে। মিছিলের সুদীর্ঘ পথে এমন নরঘাতী দৌরাত্মা চলা সত্ত্বেও মিছিল হ্রতভগ্ন করিয়া দেওয়া হয় নাই। এরূপ অবস্থায় শবদগম্য পুলিশদের যে গুণ্ডাদের কার্যে সম্মতি ছিল, এ কথা স্বীকার করিতেই হয়। আইন ও শান্তি রক্ষার ভার যাহাদের উপর, সাম্প্রদায়িক বিবেচনা যে শাসনে তাহাদিগকে এমনভাবে কৰ্তব্যব্রত হইতে সুযোগ প্রদান করে, কিংবা সেজন্য সাহস অবলম্বনের মনোবৃত্তিকে প্ররোচিত করিতে উপযোগী প্রতিবেশ গড়িয়া তোলে, সেখানে আইনভঙ্গে অভ্যস্ত রুধিরপিপাসু গুণ্ডাদিগকে আর কি দোষ দেওয়া যায়? পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলী সহরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন এবং এজন্য তাহারা সহরের পুলিশ-ব্যবস্থারও কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন; কিন্তু আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট নহি। তাহাদের কাছে আমাদের আজ দাবী এই যে, আইন ও শান্তি-রক্ষকের উদ্যোগ পরিমাণ যাহারা প্রকাশ্যভাবে আইন ভগ্ন করিয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে যাহারা বাঙলার রাজধানীতে ১৬ই আগস্টের পুনরাবৃত্তি ঘটাইয়াছে, আগে পদমান নির্বিশেষে

তাহাদিগকে সাজা দিতে হইবে। গুণ্ডারা দোষী সন্দেহ নাই, আমরা দিবারাজ তাহাদের মণ্ডপাত করিতেছি কিন্তু নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে যাহারা আইন ও শান্তি রক্ষার নামে গুণ্ডাদিগকে প্ররোচনা দেয়, তাহারা গুণ্ডাদের চেয়েও বেশী ঘৃণিত অপরাধী। বস্তুতঃ বাঙলা দেশের অশান্তি ও উপদ্রব কিংবা কলিকাতা সহরের অরাজকতার জন্য শৃঙ্খল গুণ্ডারাই দায়ী নহে। নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য যাহারা সাম্প্রদায়িকতার কুটিলতা বাঙলার রাজনীতিকে নিষ্ঠুর হিংস্রতার সঙ্গে নির্দোষ নরনারীর রক্তপাতের পথে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে এই কথাই বলিব যে, তাহারা ইহাদের যত সব পৈশাচিক নিষ্ঠুর ও নৃশংস কার্যের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। প্রকৃতপক্ষে গুণ্ডার দল ইহারা ইজিয়ায়া রাখিতেছে এবং ইহারা গুণ্ডাদের অশ্ব হিংস্রতাকে নিজেদের দুর্ভিক্ষমিথি চরিতার্থ করিবার জন্য প্রয়োগ করিতেছে। বাঙলার বিশেষভাবে সহরের পুলিশ বিভাগ সমগ্রভাবে এই দলের দুর্নীতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলী যদি সহরে অবিলম্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, তবে আইনভঙ্গকারী পুলিশদিগকে তাহারা আগে আদর্শ দণ্ডে দণ্ডিত করুন। আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতেছি, তাহাদের তেমন ব্যবস্থা গুণ্ডাদের মনস্তাত্ত্বিক-তায় অমোঘভাবে ভীতিপ্রদ প্রভাব বিস্তার করিবে। গুণ্ডারা সুনিশ্চিতভাবে এই সত্য উপলব্ধি করিবে যে, তাহাদের অব্যবহার্য চালাইবার দিন শেষ হইয়াছে এবং শক্ত লোকদের হাতে পড়িয়া আজ সত্যই ন্যায়ের দণ্ড রুদ্ররূপে জাগিয়া উঠিয়াছে।

## শান্তি প্রতিষ্ঠার সোজা পথ—

আমরা আগাগোড়াই বলিয়া আসিতেছি যে, সহরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে নরঘাতী আততায়ীদিগকে নির্মম এবং কঠোর হস্তে দলন করিতে হইবে। সুরাবদী মন্ত্রিমণ্ডল মুখে শান্তির কথা আমাদিগকে অনেক শুনাইয়াছেন; কিন্তু কার্যতঃ তাহারা গুণ্ডা দলনে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন নাই। সেক্ষেত্রে তাহারা সর্বদা সঙ্কোচবোধ করিয়াছেন। আমরা এই কথাই বলিব যে, আজও সে সঙ্কোচ তাহাদের রহিয়াছে এবং ইহার কারণও আছে। মিঃ সুরাবদী উচ্চাভিলাষী পুরুষ এবং তিনি সুচতুর ব্যক্তি। প্রতিপক্ষদলকে হটাইয়া নব গঠিত পূর্ব পাকিস্থানে প্রতিষ্ঠালাভের আশায় তিনি উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছেন এবং এ সত্য তাহার বুদ্ধিতে বাকী নাই যে, একমাত্র তাঁর সাম্প্রদায়িকতার নীতির জোরেই তাহার পক্ষে ভেদন

প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব হইবে। মিঃ সুরাবদী কৌশল খাটাইয়া নিজের প্রতিষ্ঠা বাড়াইবার দায়েই স্বাধীন বণ্ণের ধূয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ফলে পাকিস্থানী সাম্প্রদায়িকতাবাদী মহলে তিনি কতকটা অপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন। এখন সাম্প্রদায়িকতার উপর জোর দিয়া এই নষ্ট মান পুনরুদ্ধার করা তাহার পক্ষে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই জুলাইয়ের ব্যাপার সম্পর্কে গুণ্ডা দমনে পুলিশ দলের একান্ত অহিংস মনোবৃত্তি মিঃ সুরাবদীর এই নীতি-চাতুর্য হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত বলিয়া আমরা মনে করি না। বস্তুতঃ সাম্প্রদায়িকতাবাদী বিশেষ সম্প্রদায়কে মিঃ সুরাবদী ও তাহার মন্ত্রিমণ্ডল যে এখনও আগুলাইয়া রহিয়াছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সুরাবদী মন্ত্রিমণ্ডলের সেই সনাতনী মহিমা ক্ষয় হয় নাই, সেদিনকার রক্তপাতবহুল শোচনীয় ব্যাপারে ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা ছিল। অবশ্য ইহার পর পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিমণ্ডল পুলিশ ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। মিঃ নটন জোন্সকে সহরের এডিশনাল কমিশনারের পদে বহাল করা হইয়াছে। মধ্য-কলিকাতার কুখ্যাত ডেপুটি কমিশনার খান সাহেব আবদুল গফুরকে বদলী করিয়া তাহার স্থলে পোর্ট পুলিশের ডেপুটি কমিশনার রায় সাহেব সরসীকুমার ব্রহ্মচারীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া কয়েকটি থানার ভারপ্রাপ্ত কয়েকজন কর্মচারীরও অদল-বদল সাধিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা এই সব ব্যবস্থাতেও সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না। মিঃ নটন জোন্স আমাদের অপরিচিত নহেন। আগষ্ট মাসে বিভাগিকার যুগে তিনিই পুলিশ কমিশনার মিঃ হার্ডউইকের সহকারী স্বরূপে লালবাজারে ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। আজও মিঃ হার্ডউইকই কলিকাতার পুলিশ কমিশনার রহিয়াছেন। জোন্স সাহেব তাহার অধীনে নূতন কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবেন, এমন আশা আমাদের নাই। আমাদের মতে পুলিশ কমিশনার হার্ডউইক সাহেবকেই সর্বাগ্রে অপসারণ করা আবশ্যক ছিল। অন্য কোন গভর্ণমেন্ট হইলে ১৬ই আগস্টের ব্যাপারের পরই তাহাকে বিদায় গ্রহণ করিতে হইত। মিঃ সুরাবদীর কৃপায় তিনি বাঁচিয়া গিয়াছেন। এই জুলাইয়ের ব্যাপারের পর পাকিস্থানী নীতির একান্ত অনুরক্ত এই পুলিশ অফিসারকে একদিনের জন্যও সহরের শান্তি রক্ষার দায়িত্বপূর্ণ পদে রাখা উচিত নয়। সুরাবদী সাহেবের গোষাপত্র পাঠান পুলিশেরাও নাকি কলিকাতা সহর হইতে পাকিস্থানী রাজত্ব যাইবার ভয়ে ১৫ই আগস্টের পূর্বেই বিদায় গ্রহণ করিতে

চাহিতেছে। আমাদের মতে দরকার হইলে এক মাসের মাহিনা অগ্রিম দিয়াও ইহাদিগকে পাজাবে ফেরৎ পাঠাইবার ব্যবস্থা করা উচিত। বস্তুত সহরে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সুদ্রাবন্দী মন্দিরগুলির সংগে আপোষ-মীমাংসা বা জোড়াতালির পথে কিছুতেই তাহা সম্ভব হইবে না। দুইয়ের পথ ভিন্ন, পশ্চিম-বঙ্গের মন্দিরগুলিকে একথা সোজাসুজি বুঝিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের শাসন-সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে সুদ্রাবন্দী মন্দিরভার অতঃপর কোন রকম হাত থাকা চলিতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সমগ্রভাবে পশ্চিমবঙ্গ শাসনের কেন্দ্র-শক্তিকে করায়ত্ত করিয়াছেন, আমরা ইহাই দেখিতে চাই।

### কলিকাতার ভবিষ্যৎ

'লড়কে লেগে পাকিস্থান'—এতদিন লীগ-ওয়ালাদের মুখে আমরা এই জিগীর শব্দটিতে পাইয়াছি; কিন্তু গত এই জুলাই মন্দিরপাড়া থানার দারোগার শব্দাত্মা মিছিল সম্পর্কে লীগের অনুরাগী নরঘাতক গুণ্ডাদের মুখে কলিকাতাও তাহারা লড়াই করিয়া লইবে, এই ধ্বনি শুন্য গিয়াছে। বলা বাহুল্য, বাঙলার মুসলিম লীগের হাইকমান্ড বা উচ্চ-পদাধিকারিগণই এই উৎকট দাবীকে প্রণয় দিয়াছেন এবং এই দাবীর অর্থোত্তিকতা উপলব্ধি করিয়াও সাম্প্রদায়িকতাকে উৎসাহিয়া লীগের বাহুবল প্রকট করিবার উদ্দেশ্যেই এই দাবীকে সমর্থন করিয়াছেন। এই-ভাবে তাহারা শহরের অশান্তিতে গৃহহর্ষিত প্রদান করিয়াছেন এবং এখনও তাহাদের এই প্রচেষ্টার নিবৃত্তি ঘটে নাই। গত ১৪ই জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয় স্বাধীনতা বিলের আলোচনাকালে পাকিস্থান-ওয়ালাদের কলিকাতা দাবী সম্পর্কে পরোক্ষ-ভাবে একটি প্রশ্ন উঠিয়াছিল। উক্ত প্রশ্নের উত্তরে সহকারী ভারতসচিব মিঃ হেন্ডারসন বলেন, "ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কলিকাতাকে নিরপেক্ষ বন্দরে পরিণত করিবার কথা চিন্তা করেন নাই; কারণ কলিকাতা বর্তমান বাঙলা প্রদেশের যে অংশে পড়িয়াছে, সেই অংশে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।" মিঃ হেন্ডারসনের এই উক্তি জটিলতা কিছুই নাই এবং কলিকাতা শহরের উপর পাকিস্থানওয়ালাদের দাবীর কোন যৌক্তিকতা যে নাই, ইহা বুঝিতে আইনজ্ঞের সূক্ষ্ম দৃষ্টিরও প্রয়োজন হয় না। পাকিস্থানীরাও ইহা জানে। বস্তুত লীগ-ওয়ালাদের লক্ষ্য হইল, কলিকাতা শহর যদি তাহারা হাতে না পায়, তবে কলিকাতা শহরকে বিপন্ন অবস্থায় রাখা এবং সেখানকার বাবসা-বাণিজ্যের সুত্র পাকিস্থানী কর্তৃক আওতার মধ্যে যাহাতে থাকে, এমন ব্যবস্থা যে কোন

উপায়ে বাগাইয়া লওয়া। সীমানা নির্ধারণ কমিশনের কাছে পশ্চিমবঙ্গের দাবী উপস্থিত করিবার বেলা এই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা বিশেষভাবে প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কলিকাতা এবং তৎসংলগ্ন বাণিজ্যপ্রধান অঞ্চলের নিরাপত্তা প্রথমে আবশ্যিক। কমিশনের বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে ইহাকে মূখ্য করিয়া তুলিতে হইবে।

### গণভোটের প্রহসন

গত ১৬ই জুলাই বড়লাটের দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হয় যে, গণভোটের ফলে গ্রীহট্ট পাকিস্থানে যোগদান করিয়াছে। গ্রীহট্টের গণভোটের এই পরিণতিতে ভারতের জাতীয়তাবাদী মাত্রেই দুঃখিত হইয়াছেন। আমরাও দুঃখিত হইয়াছি; কিন্তু বিস্মিত হই নাই। গ্রীহট্ট জেলায় মুসলমানই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়; কিন্তু বাস্তব স্বার্থের দিক হইতে গণভোটের এই ফল তথাকার মুসলমানদের পক্ষেও অনিষ্টকর হইবে। গ্রীহট্টের মুসলমান সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যে এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন, এমন নয়; কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও মোসলেম লীগের দলবল গুণ্ডামির দ্বারা জনমতকে চাপিয়া মারিয়াছে। ধর্মের কুসংস্কার ছড়াইয়া তাহারা মুসলমান জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। ইহার উপর ভোট-শাটোর চূড়ান্ত অভিনয় এই গণভোটের ব্যাপারে ঘটিয়া গিয়াছে। বাঙলার লীগওয়ালাদের পাল্লায় পড়িয়া গ্রীহট্টের মুসলমান জনসাধারণ কোথায়ও স্বাধীনভাবে তাহাদের ভোটাদিকার প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। এই কারণে বাঙলায় লীগ-চম্ সত্ত্বেও গ্রীহট্ট জেলাকে দক্ষুরমতে রণভূমিতে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিল। গ্রীহট্টের নিরীহ নরনারী এই সব গুণ্ডার বিরুদ্ধে কিছু করিতে সাহস পায় নাই। গভর্নমেন্টও লীগ দলের এই উচ্ছৃঙ্খল তাণ্ডব হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে অসামর্থ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার উপর বড়লাটের কলমে এক খোঁচা গ্রীহট্টের চা-বাগান অঞ্চলের ১২ হাজার গ্রামিককে ভোটের অধিকার হইতে পূর্বেই বঞ্চিত করা হইয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় মধ্যে ও গ্রীহট্টের মোট ভোটাদিকার প্রান্তরে মধ্যেও শতকরা ৪০ মাত্র পাকিস্থানের পক্ষে ভোট দিয়াছে, কংগ্রেসের পক্ষে সেখানকার জনমত কিরূপ জাগ্রত, ইহা হইতে সে পরিচয় পাওয়া যায়। ন্যায়বিচারের দিক হইতে গণভোটের এই ফলকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তস্বরূপ গ্রহণ করা উচিত নয় এবং ভোটের ফলে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই যে গ্রীহট্টবাসীর সুনিশ্চিত অভিমত, ইহা স্বীকার করাও সমীচীন হয় না। কিন্তু ন্যায়ের অনুকূলে এই যুক্তি এদেশে কতদূর টিকিবে, সন্দেহ আছে। তদুপরি

আমরা গ্রীহট্টবাসীদিগকে নিরাশ হইতে বলি না। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ঘোষণার ১৩ দ্বারা নির্দেশ অনুসারে গ্রীহট্ট বিভাগের জন্য নির্ধারিত সীমা নির্ধারণ কমিটি গ্রীহট্ট জেলা এবং তৎসংলগ্ন জেলাগুলির মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করিয়া দিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা আছে। এই চিহ্নিত একালাগুলিই পূর্বপাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং অবশিষ্ট এলাকা আসামের মধ্যেই থাকিবে। এই ব্যবস্থা কার্যে পরিণত হইলে গ্রীহট্ট জেলায় অন্তত আটটি থানা যে আসামের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সীমা নির্ধারণ কমিশনের এই কার্যে যাহাতে পাকিস্থানীরা বিভ্রম সৃষ্টি করিতে না পারে, সেজন্য আমাদের সকল রকম চেষ্টা প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

### বাঙলায় দৃষ্টিভঙ্গির আভাস

বাঙলার সর্বত্র খাদ্যসঙ্কট গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে। আগামী দুই মাসের মধ্যে পুনরায় ভীষণ দৃষ্টিভঙ্গি দেখা দিবে, অনেকের মনে এমন আভাস ইহার মধ্যেই দেখা দিয়াছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বাঙলা গভর্নমেন্টের কুব্যবস্থা এবং অব্যবস্থাই এজনা প্রধানত দায়ী। বাঙলা গভর্নমেন্টের খাদ্য এবং বস্ত্র ব্যবস্থার এই দুটির কথা সম্প্রতি খাদ্যবিষয়ক ডিরেক্টর-জেনারেল মিঃ হার্টলীর একটি বিবৃতিতেই প্রকট হইয়াছে। মিঃ হার্টলী স্বীকার করিয়াছেন যে, গভর্নমেন্টের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য নাই এবং এজন্যই তাহাদিগকে রেশনিংয়ের সেক্কেট সাধন করিতে হইয়াছে; কিন্তু গভর্নমেন্টের হাতে যথেষ্ট খাদ্যশস্য ন থাকিবার কারণ কি? বাঙলা গভর্নমেন্টে গৃহমন্ত্রে সংগৃহীত চাউলের ঘাটতি পড়ে কেন ইহার কারণ দিতে গিয়া মিঃ হার্টলী বলিয়াছেন—“সমগ্র প্রদেশ হইতে গভর্নমেন্ট যে চাউল সংগ্রহ করেন, তাহার অধিকাংশই কলিকাতা এর চতুঃপার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলের লোকেরা খাইয় নিঃশেষ করে। কিন্তু ইহা কি ঠিক? বিহার পোষণের জন্য কত চাউল নিঃশেষ হইয়াছে তাহার হিসাব মিঃ হার্টলী দিবেন কি? লীগে শক্তিকেদু কলিকাতার কুখ্যাত গুণ্ডাবাসি লালাবাগান, রাজাবাজার ও কলাবাগানে প্রতি মাসে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা হিসাবে এ পর্যন্ত প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার খাদ্যবস্তু বিতরণ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। মিঃ হার্টলী ইহা প্রতিবাদ করিতে পারিবেন কি? ইহা সত্ত্বে যদি বলা হয় যে, কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে লোকেরই বাঙলা সরকারের খাদ্যভান্ডার নিঃশেষ করে, তেমন অভিসন্ধিপূর্ণ উক্তিকে কেহই স্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে না।

## হরেন্দ্রলাল ঘোষ

(জনৈক বাসাবন্ধুর শ্রদ্ধাঞ্জলি)

শে শ্রাবণ হরেন্দ্রলালের সহিত সংযোগে  
যাঁহারাই আনিয়াছেন, যাবজ্জীবন  
তাঁহাদের নৌহাদ্য গাঢ়তর হইয়াছে, হরেন্দ্র-  
লালের চরিত্রের মাহাত্ম্য ও মাধুর্যের ইহাই সম্যক  
পরিচায়ক। অমায়িক ও যিশ্টভাষী, একাধারে  
দুঃখ, সখা ও শান্তবৃদ্ধি সহায়ক হরেন্দ্রলাল  
গম্য ভূ-ভারতে বিশিষ্ট যশোপার্জন করিয়া-  
ছেন ভারতের সর্বপ্রথম নৃত্য ও নাট্য শিক্ষা-  
কলার মহিমা বিকাশকারী ইম্প্রেসারিওরূপে।  
ভারতীয় কৃষ্টিমূলক অনাবিল আনন্দদায়ক  
নৃত্যনাট্যের অমৃত ও বৈচিত্র্যময় রূপ বিকাশের  
আয়োজনে অক্লান্তকর্মী হরেন্দ্রলালের সার্থক  
সেবোজনা শিল্পী-জগতে অমর হইয়া থাকিবে।  
তাঁহারই প্রচেষ্টায় ভারতের সর্বত্র ও দূরদেশে  
ভারতের কলাকৃষ্টির মাহাত্ম্য ও দৌন্দর্য বিকাশ  
ও প্রচার সম্ভবপর হইয়াছে। ভারত-কলা-  
কৃষ্টির অনবদ্য বৈচিত্র্য ও গৌরব হরেন্দ্রবাবুর  
প্রচেষ্টায় যুরোপ ও লন্ডনে প্রকৃষ্টভাবে  
প্রচারিত হইয়াছে। এই বিশাল কর্মজীবনের  
ভিত্তিতে হরেন্দ্রলালের দেশসেবার ও ভারতীয়  
কলাকৃষ্টি গৌরবে আত্মপ্রতিষ্ঠার মহৎ  
প্রচেষ্টাপ্রসূত অপূর্ব আত্মনিবেদনের সার্থক  
পরিচয় ভারতীয় কলাজগতের ইতিহাস চিরদিন  
সম্বলিত করিবে।

আধুনিক চিত্তবিকার ও মতিচ্ছন্নতার  
দুগ্ধে হরেন্দ্রবাবুর সদৃঢ় সংকল্প ও কৃতিত্বের  
প্রতিষ্ঠা তাঁহার ব্যক্তিগত-গৌরবই শুধু বর্ধিত  
করে না, তাঁহার জীবনী সকলেরই শিক্ষাদায়ক।  
কৃত বাধ্য, কত বিরাট, কত প্রতিকূল অবস্থার  
ভিত্তিতে তিনি স্বীয় চরিত্র ও কর্তব্যনিষ্ঠাবলে  
কতী হইয়াছিলেন, তাঁহার বিশদ বিবরণ এই  
বঙ্গপত্রিসর প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়।

বোম্বাইর স্কুল ও হেয়ার স্কুলে বাংলা-  
শিক্ষার পর তিনি কয়েক মাস বিদ্যাসাগর  
কলেজে অধ্যয়ন করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে  
প্রবেশ লাভ করেন। ১৯২১ সালে তিনি  
বাসায় ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ইতিমধ্যে তিনি  
হেয়ার স্কুল ম্যাগাজিন-এর প্রতিষ্ঠা করেন এবং  
“অফুর” নাম দিয়া একটি গল্প-পুস্তক  
প্রকাশ করেন। ১৯১৯ সালে বাঁকুড়া দার্ভিক  
সাহায্যে স্বেচ্ছাসেবী দলের সহিত গমন  
করিয়া তাঁহার আশ্চর্য সংগঠন-ক্ষমতার বিশিষ্ট  
পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৯২২ সালে তমলুক  
সমাপনীভিত্তির সাহায্যে স্বেচ্ছাসেবী সংঘের  
শিক্ষিত ক্যান্টেন-রূপে গিয়াছিলেন। ১৯২৪

১৯০৪ সালে বিহারের ভূমিগুপ্তপত্রের পর  
সাহায্যসেবীদিগের অন্যতম অগ্রণী ছিলেন—  
হরেন্দ্রলাল।

বাসায় ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তিনি  
১৪০নং কর্পোরেশন স্ট্রীটে “সেন্ট্রাল অটো-  
মোবিল স্টোর্স” নাম দিয়া কারবার আরম্ভ



হরেন্দ্রলাল ঘোষ

জন্ম :  
জিসেন্দ্র, ১৮৯৫

মৃত্যু :  
৯ই জুলাই ১৯৪৭

সালে চাঁদপুর কুলী-চালান হাঙ্গামায়  
হরেন্দ্রবাবু পুনরায় অগ্রসর হইয়া  
কংগ্রেসকর্মীদিগের যথেষ্ট সহায়তা করেন।  
মহাত্মা গান্ধীর সহিত অসহযোগিতা  
প্রবর্তনের সময় তিনি বহুস্থল ঘুরিয়া অর্থ-  
সংগ্রহ কার্যে প্রচুর সহায়তা করিয়াছিলেন।

করেন। মোটরগাড়ি বিক্রয় ও ভবনাবিগগক পেট্রল  
ও সরঞ্জাম সরবরাহের নিমিত্ত এই কারবার।  
কিন্তু হরেন্দ্রবাবুর ব্যক্তিগত ও চরিত্র-মাধুর্যের  
প্রভাবে এই ১৪০নং ঘরটিতে শহরের শিল্পী,  
বাবদায়ী, কলাকৃষ্টিসেবী, সাহিত্যিক প্রভৃতি  
সকল প্রকার বিভিন্ন রীতি ও রুচির ব্যক্তি-

সম " হইত। সকলকেই তিনি সুহৃৎসুলভ অমায়িকতায় আপ্যায়িত করিতে চেষ্টা করিতেন না এবং এই বিভিন্ন রুচিসংগত আলাপ-আলোচনার অনর্গল প্রবাহের প্রত্যেকটি স্তরে তাহার বিশিষ্ট অবদান থাকিত। কলিকাতা শহরে এই "১৪০নং" ঘরটির বহুল খ্যাতি এখনও বোধ হয় সকলেরই স্মৃতিপথে আছে।

কিন্তু এই আশ্চর্য বৈচিধ্যময় কর্ম-তৎপরতার ভিতরেও হরেনবাবু নিজের ব্যবসায়-কর্তব্যে কখনও চ্যুতি করিতেন না। তাহার বিচক্ষণ কর্মতৎপরতায় তাহার নাম মোটর-বাবনায়ীদিগের মধ্যে প্রধান স্থান লাভ করিয়াছিল। এই সময় "কোর্ড" মোটরগাড়ীর বিক্রয়-ব্যবস্থাপনার কার্যে তিনিই অগ্রণী ছিলেন।

১৯২৬ সালে হরেনবাবু প্রথমে বিলাত গমন করেন। এই সময়ে তিনি বহু ব্যবসায়ীর সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া এবং দেশোদ্ভূত সাহায্যমূলক ব্যবসায়-ব্যবস্থার বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বিলাত যাইবার পূর্বে নাট্যকলা চর্চার সহায়ক তাহার সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা সংঘটিত হইয়াছিল। তাহার মাতুল, ধীরেন মিত্র মহাশয় লিখিত "শকুন্তলার" ইংরেজি নাটক কলিকাতায় হরেনবাবুর বন্ধু শ্রীযুত অরুণ সরকার মহাশয়ের সাহায্যে অভিনীত হয়।

১৯৩০ সালে হরেনবাবু নাট্য ও নৃত্য-চর্চার প্রকৃষ্ট প্রচারকল্পে সমগ্র ভারত পর্যটনকারী শিল্পী সংঘ কর্তৃক রসামোদীর চিহ্নবিনোদনার্থে বিরাট আয়োজন কার্যে অঙ্গসর হইলেন। এই সময় তাহার ব্যবসায়-সমৃদ্ধ শরীফস্থানে পেঁচিয়াছিল। এই সময় (১৯৩০) শ্রীযুত উদয়শঙ্করের সহিত তাহার পরিচয় হয়। উদয়শঙ্করের অপূর্ব নৃত্যকলার সাক্ষাৎ পরিচয় হরেনবাবুরই উদ্যোগে এই দেশে রসামোদী সন্মিলন লাভ করে। ১৯৩০ সালে উদয়শঙ্করের দ্বিতীয় অভিযান হরেনবাবুর ব্যবস্থাপনায় সংঘটিত হয়। এই সময় 'ইম্প্রেসারিও'র অভাবে নাট্যকলা চর্চার সন্মিলন দেশব্যাপী প্রচার ও প্রসিদ্ধির অসুবিধা সম্পর্কে হরেনবাবু সর্বপ্রথম সচেতন হন। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া অজ্ঞাত ক্ষেত্রে নামিতে হইলে সংসারী মধ্যবিত্তের যথেষ্ট সাহস ও বিবেচনার প্রয়োজন। কিন্তু জাতীয় কৃতি বিকাশে যাহারা রতী, নাট্যমোদীর সেবা তাহাদের অলঙ্ঘনীয় কর্তব্য। রূপমণ্ড ও সিনেমাই আধুনিক নাট্যবিকাশ ক্ষেত্রের পরিধি। উভয় দিকেই হরেনবাবুর বিচ্যুত তৎপরতা ইতিপূর্বেই কার্যকরী হইয়াছিল। বিলাত হইতে ফিরিয়া তিনি "আর্থ কমিস" নামীয় সিনেমা প্রতিষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিলেন। "বুদ্ধের যোদ্ধা" ও "অগ্নিবাণী" দুইটি

চিত্রও প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত হরেনবাবুরই উদ্যোগে শ্যামবাজারস্থ সুবিখ্যাত "চিত্রা" প্রেক্ষাগৃহের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। "ছবিঘর" সম্বন্ধেও তাই। সুতরাং হরেনবাবুর পক্ষেই "ইম্প্রেসারিও"র কার্যভার গ্রহণ সম্ভব ছিল, যেহেতু নাট্যচর্চা দ্বারা সাধারণের চিত্ত-বিনোদনের ব্যাপক ব্যবস্থাপনা হরেনবাবু ছাড়া অন্য কেহই সেসুপ করেন নাই।

সুতরাং যখন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ দেশপ্রাণী সুধিবৃন্দ "ইম্প্রেসারিও" সহযোগে দেশের কৃষ্টি গৌরব প্রচার দ্বারা দেশগৌরব সংরক্ষণের সুমহান কর্তব্য সম্বন্ধে হরেনবাবুকে উপদেশ দিলেন, দেশপ্রেমিক হরেন্দ্রলাল অবিলম্বে কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। তিনি স্বাধীচিন্তা পরিচালনা করিয়া লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা ব্যবসায় ছাড়িয়া "ইম্প্রেসারিও"র কর্মক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক হইলেন। ১৯৩০ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদিগকে লইয়া ভারতের কতিপয় প্রধান শহরে অভিযান করিয়াছিলেন।

১৯৩৪ সালে তিনি দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধা "ভারতনাট্যম"-নৃত্যশিল্পী বালা সরস্বতীকে কলিকাতায় আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই সময় কলিকাতায় গভর্নমেন্ট-উদ্ভোধিত "শিক্ষা-সংস্থার" তত্ত্বাবধান কার্যে হরেন্দ্রবাবু লিপ্ত ছিলেন। নৃত্যচর্চা শিক্ষার উচ্চাঙ্গীভূত, এই সর্বদেশস্বীকৃত সত্য এদেশে তখনও সমাকভাবে গৃহীত হয় নাই। হরেনবাবুর উৎসাহ ও উদ্যোগে শ্রীমতী বালা সরস্বতীর নৃত্যায়োজন কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের "সেনেট" হল-গৃহে অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৩৫, ৩৬ ও ৩৭, এই তিন বৎসর, হরেনবাবু শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী গঠিত শিল্পী সংঘের ভারত পর্যটনের সন্মিলন আয়োজন করেন। ১৯৩৫ সালে উদয়শঙ্কর সদলে ভারত হইতে আমেরিকা চলিয়া যাইবার পর, উদয়শঙ্করের ভগ্নী কণকলতা ও উদয়শঙ্করের দক্ষিণ দেশীয় "কল্যাকলি" নৃত্যগুরু শঙ্করশ্রী নন্দী মহাশয়কে লইয়া একটি ছোট দল গঠন করিয়া হরেনবাবু তাহাদেরও ভারত পর্যটনের ব্যবস্থা করেন।

এই সময়ে আরও দুইটি শিল্পী হরেন্দ্রবাবুর সাহায্যে ব্যাপকভাবে নৃত্যায়োজনের সুবিধা লাভ করেন। তাহারা—শ্রীমতী এনাকী রমা রাও ও শ্রীমতী সাধনা বোস। কণকলতাও ১৯৩৭ সালে অপর একটি দল করিয়া কতিপয় শহরে পর্যটন করেন। এই সময় "নিমা হারা" নামীয় রুশীর জনৈক

নর্তকীও হরেনবাবুর সাহায্যে নৃত্যোভিযান করেন।

১৯৩৯ ও ১৯৪০ সালে হরেনবাবু বিখ্যাত "অগ্নিপুত্রী" নৃত্যের ব্যাপক প্রচারা যোজনে বিশিষ্ট শিল্পী সমন্বিত নৃত্য পদ্ধতি ভারতের বহু স্থানে দেখাইয়াছিলেন তৎপূর্ব মানভূম প্রদেশান্তর্গত সেরাইকেলা বিখ্যাত "ছউ" নৃত্যের অভিনব আমোজ হরেনবাবুর উৎসাহে ও সেরাইকেলার রাজ কুমার (অধুনা স্বর্গত) শূভেন্দ্রকুমারে সহযোগিতায় সুসম্পন্ন হয়। হরেনবাবু এ নৃত্যশিল্পী সংঘটির তত্ত্বাবধায়ক হই ইহাদের যুরোপ ও ইংল্যান্ড লইয়া গিয়া ছিলেন।

১৯৪২ হইতে ১৯৪৪ সালে হরেনবাবু নৃত্যশিল্পী জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন। এই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় সৈনিকদিগের স্বাচ্ছন্দ্য চিহ্নবিনোদনার্থে সামরিক কর্তৃপক্ষ কয়েক ক্ষুদ্র নৃত্যশিল্পীসংঘ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়া সংকল্প করিলেন। স্বভাবতই এই কার্যে তাহার হরেনবাবুর উপর সংশ্রুতি কল্পে হরেনবাবুর অপরিমিত সংগঠন প্রতি পুনরায় সাফল্য লাভ করিল। হরেনবাবু প্রয়োজনায় অনেকগুলি নৃত্যশিল্পীর দল সমগ্র ভারতবর্ষ এবং সুদূর ইরাক, ইরান পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিয়াছিল। এই সম্প্রদায় হরেনবাবুর নিকট বিদেশীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের অঙ্গ প্রশংসাপত্র হইতে জানা যে, ভারতীয় নৃত্য সম্বন্ধে তাহাদের যে বিকৃত ধারণা ছিল তৎপরিবর্তে হরেনবাবু অনুষ্ঠিত নৃত্য সম্প্রদায়ের স্বাধীনতায়ে ভারতীয় নাট্যকলার গৌরবমতিমা সম্বন্ধে বিশ্বাসের নবচেতনা লাভ। ভারতীয় কলাকৃষ্টির গৌরবপট্রে হরেনবাবু এই অভিনব অবদান ইতিহাসে অক্ষয় রূপে হরেনবাবুর শেষ জীবন নাট্যকলাচ উন্নতিকল্পে বিরাট আয়োজনে অতিব্যাহীয়াছে। এই সময় তিনি "ন্যাশনাল থিয়েটার" সম্পর্কিত একটি বিরাট পবিত্রতাকে ব্যাপক দেওয়ার প্রচেষ্টায় নিরতিশয় পণ করিতেছিলেন। এই পরিকল্পনা ত জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। বিশ্ব মানবের কৃতি ও ললিত কলার উন্নতি পন্থা মানবের নবসংগঠনে নাট্যকলাচর্চার নি প্রয়োজন জগতের সর্বত্রই স্বীকৃত হইল। এই জন্যই সর্বদেশেই জাতীয় কলার সমারক ও বিশ্বমানব কতিপয় সন্মিলন পথ "ন্যাশনাল থিয়েটার" সংগঠিত হইতে হরেনবাবুর পরিকল্পনা। এই দরবারে ও ভারতীয় "ন্যাশনাল থিয়েটার" সম্পর্কে



সংগঠনানুষ্ঠান। তাহার সমস্ত আগ্রহ ও কর্মতৎপর সাহায্য সূচনার একান্তিক সমাবেশে তিনি এই সদৃশদেশ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই মহাদৃশ্যে বাহাতে বিলোপ প্রাপ্ত না হয়, হরেনবাবুর স্মৃতি-রক্ষার্থে আমাদের সকলেরই এই বিষয়ে সমাক অবহিত হওয়া কর্তব্য। হরেনবাবু, ইদানীং তাহার এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে কয়েকটি পত্রিকায় প্রচার কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন।

হরেনবাবু সুলেখক। সাহিত্য-চর্চা ও সাহিত্যিক-সংগে তাহার অতি প্রিয় ছিল। ১৯৩৫ সালে তিনি “ফোর আর্টস এ্যান্ড স্ট্রীট” প্রকাশ করেন। কলাজগতে এই পুস্তকটি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছিল। পরবর্তী বৎসরেও “এ্যান্ডালার্টির দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর, নানা কারণে, পুনঃপ্রকাশ সম্ভব হয় নাই। এতদ্ব্যতীত, “ছন্দা” নামে একটি সাপ্তাহিক, নাটকলা জগত কেন্দ্র করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল হরেনবাবুর উদ্যোগে। “ছন্দা”র পুনঃপ্রকাশ সম্বন্ধেও হরেনবাবু শেষ জীবনে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। হরেনবাবু, সিনেমা সম্বন্ধে চিরদিনই আগ্রহী ছিলেন। তাহার “আর্থ” ফিল্মস্ পরিকল্পনা বাঙলায় ছায়া-চিরাশিল্পের যুগাগ্রগামী, ইহা উন্মিথিত হইয়াছে। বাহারা বাঙলায় ছায়াচিত্রের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিকল্পে উদ্যোগী তাহার সকলেই হরেনবাবুর বিশিষ্ট বন্ধু। সকলেরই সহিত তাহার অমায়িক সদৃশ চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। কেন না—হরেনবাবু, স্বাভাবিকতঃ ছিলেন শিক্ষণীয়, বাবসায়ী নহে। মৃত্যুর কিয়দ্বিবস পূর্বে পর্যন্ত ছায়াচিত্রশিল্পে তাহার শেষ প্রচেষ্টা, শ্রীযুক্ত মনোজ বসুর “সৈনিক”, বাহাতে সমাপ্ত হইতে পারে সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছিলেন।

রংগমঞ্চ-সংক্রান্ত আনন্দায়োজনে তিনি ছিলেন অপ্রতিস্বন্দ্বী। তাহার পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে মাদ্রাজ, আদায়র-অবস্থিত “কলাক্ষেত্র”-প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীযুক্ত:

রুক্মিণী দেবীর কলিকাতা অভয়ান, উদয়-শঙ্করের কৃতবিদ্যা শিষ্য ও শিষ্যা, জোহরা ও কামেশ্বর প্রতিষ্ঠিত “জোহরেশ নৃত্য শিক্ষায়তন”-শিক্ষণী সমন্বিত অভয়ান, “কথা কলি”র নবরূপ বিধায়ক দাক্ষিণ্যে গোপীনাথের নৃত্য-পদ্ধতি এবং “ভারত নাট্যম্” নৃত্যে অপূর্ব পারদর্শিনী শ্রীমতী শান্তার নৃত্যায়োজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

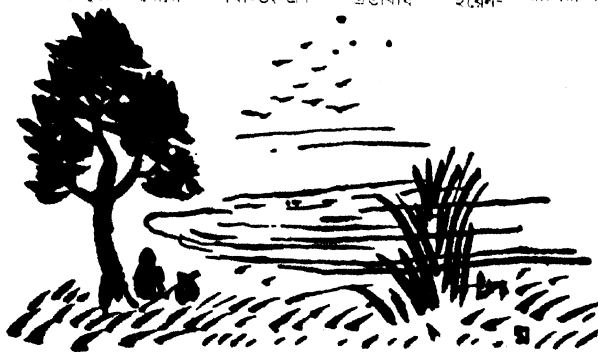
অতঃপর, ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত “এশিয়ান কনফারেন্স”এ সিরাইকেলার নৃত্য প্রদর্শনায়োজন হরেনবাবুর নাট্যজগতে শেষ অবদান।

ইহার পর তিনি “ন্যাশনাল থিয়েটার” সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং ভারত হইতে একটি বিশিষ্ট, সংগঠিত এবং ভারতীয় নাটকলা-কৃষ্টির সমূহ পরিচায়ক নৃত্য-সম্প্রদায় লইয়া আমেরিকা প্রভৃতি দূর দেশে যাত্রায়োজনে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি শ্রীমতী সাধনা বসু এবং তদনুষ্ঠিত “নিউ এজ ডান্সার্স এ্যান্ড ম্যাজিশিয়ানস্” পরিকল্পিত নৃত্য-পদ্ধতির সমাক সংগঠনান্তে ভারত এবং দূরদেশে পর্বটনের আয়োজনে উদ্যোগী হইয়া-ছিলেন।

হরেনবাবুর কর্মবহুল জীবনের পরিণতি যে বীভৎস শোচনীয়তায় সংঘটিত হইয়াছে, তাহা একাধারে অপ্ৰত্যাশিত এবং সমগ্র কলা জগতে অপূরণীয় ক্ষতিকারক। তাহার অক্লান্ত সেবায় দেশোন্নতিমূলক কলার্কৃষ্টির সহজ সমাবেশের সূচনামাত্র হইয়াছিল, নাটকলা-মোদীমাগেরই এখন আগ্রহশীল হওয়া কর্তব্য বাহাতে এই মহদুরতের সুসংগতি অদূর-ভবিষ্যতে সম্ভবপর হয়। তাহার অন্তিম-দশা হৃদয়-বিদারক। বিগত ১লা জুলাই তিনি সিমলা হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। ৭ই জুলাই হইতে সাম্প্রদায়িক হত্যা বিভীষিকার সূচনা হইতে তিনি কর্মস্থলে যাইতেন না। তাহার অফিস ছিল চনং ধর্মতলা স্ট্রীটস্থ “ওয়াচেল মোয়ে” বিল্ডিং-এ। এতাবধি হরেন-

বাবুই ঐ বাড়ীতে কেবল একমাত্র হিন্দু ভাড়টিয়া ছিলেন। বৃধবার, ৯ই জুলাই তারিখে, সকাল ১০-৩০ মিঃ সময়ে তিনি অফিসে বাইতে উদ্যোগ করেন। পঞ্চমধ্যে আত্মীয়, স্বজন ও পরিচিত প্রত্যেকের অনুনয় অগ্রাহ্য করিয়া তিনি অফিসে যান। বেলা ১১টা হইতে ১১-৩০ পর্যন্ত তাহাকে জীবিত দেখা গিয়াছে। অতঃপর সম্ভা প্রায় ৬ ঘটিকায় তাহার দেহ টুকরা টুকরা একটি বাস্কে ভরা অবস্থায় “পার্ক স্ট্রীট থানার এলাকা” “রডন স্ট্রীটে” কোন জায়গায় পাওয়া যায়। সেইদিনই রাত্রিকালে তাহার শব সনাক্ত হইলেও শুক্রবার বেলা ২টা হইতে ২-৩০এর মধ্যে তাহার শব অন্তোষ্ঠীকরণার্থে পাওয়া যায়। হাঙ্গামার ভয়ে কোন শবদাহী শোকযাত্রার অনুমতি পাওয়া যায় নাই। “হিন্দু সংস্কার সমিতি”র মোটর ট্রাকে সুসজ্জিত পালকে তাহার খণ্ডবিখণ্ড দেহ পুষ্পোচ্ছাদিত হইয়া ক্ষিপ্ৰগতিতে নিম্নতলার শ্মশানে আনা হয়। মোটর ট্রাকের সহিত ইংরাজ সৈনিক-সমন্বিত যুদ্ধসজ্জায় প্রস্তুত সেনানীবৃন্দ একটি “টাংক” লইয়া অনুসরণ করে। অন্যান্য শ্মশানযাত্রীগণও মোটর সংযোগে অনুসরণ করেন। সম্ভার পূর্বে হরেন্দ্রলালের কবিতা দেখখণ্ডগুলাকে চিতাশ্র কল্পিয়া অগ্নিসংযোগ করা হয়। দেশের ও দশের আনন্দবিধানে অক্লান্তকর্মী ও অপূর্ব ক্রতী হরেন ঘোষের এই নিদারণ জীবন-পরিণতি নিমিত্ত কোন গঢ় ইঞ্জিত বহন করিয়া আসিয়াছিল মহামান শোকবিধ্বস্ত চিত্ত তাহার ইয়াত্রা অদ্যপি করিতে পারে না। আমরা সকাতে প্রার্থনা করি জগন্মুক্তিদাত্রী মহীয়সী শক্তিস্বরূপা হরেনবাবুর আত্মার শান্তিবিধান ও শোকান্ত পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজন ও অর্গণিত বন্ধুবান্ধবের শোকাপনোদন করুন।

মৃত্যুকালে হরেনবাবুর বয়স ৫২ বৎসর হইয়াছিল। তিনি স্ত্রী, ছয় পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।



# রিফ বিদ্রোহ

## ৩ আবদুল করিম

### প্রিন্সিপাল জেনারেল

অতি সম্প্রতি রিফ বিদ্রোহের নির্বাসিত নেতা আবদুল করিমের ফ্রান্সে যাবার পথে পোর্ট সৈয়দে অবতরণ ও মিশরের রাজা ফারুকের কাছে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ নিয়ে বিশ্বের রাজনৈতিক মহলে বেশ চাঞ্চল্যের সত্তাপাত হয়েছে। বিশেষ করে স্পেনের ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের ত দৃষ্টান্তবানার অন্ত নেই। আবদুল করিমকে এইভাবে আশ্রয় দেওয়া নিয়ে যদি মিশরের সঙ্গে ফ্রান্সের মৈত্রীর সম্পর্ক ছিল হয়ে যায়, তবে বিস্মিত হবার কিছু থাকবে না। ভারত মহাসাগরের রি-ইউনিয়ন স্বীপে সুদীর্ঘ ২১ বৎসকাল এই বিদ্রোহী রিফ নেতাকে নির্বাসিত রাখার পর ফরাসীরা তাঁকে নিয়ে চলেছিল নিজদের দেশে। পৃথিমধ্যে এমন আকস্মিকভাবে তিনি তাদের ফাঁকি দিয়ে বে মিশরের রাজার আতিথ্য গ্রহণ করবেন—একথা তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। আর মিশরের রাজা ফারুকও এই ৬৫ বৎসরের প্রবীণ

বিদ্রোহী নেতাকে নিজের রাজ্যে সসম্মানে আতিথ্য দিতে একটুও কুণ্ঠিত হননি। তিনি তাঁর ব্যবহারের জন্যে নিজের একটি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে দিয়েছেন এবং আবদুল করিম ব্লাউ প্রেসারে ভুগছেন বলে মিশর গভর্নমেন্টের খরচে তাঁর চিকিৎসার সকল ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। জেরুজালেমের গ্রান্ড মসজিদকে আশ্রয়দানের ব্যাপারে রাজা ফারুক যে সংসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, এক্ষেত্রেও আমরা তাঁরই পরিচয় পেয়েছি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে আফ্রিকার মরক্কো দেশের রিফ বিদ্রোহের গৌরবময় কাহিনী আজ অনেকেই ভুলে গেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে পরাধীন জাতির জাগরণের ইতিহাসে এটা একটা স্মরণীয় ঘটনা। একটা পার্বত্য উপজাতির এই বিদ্রোহ প্রায় ৬ বৎসর কালের জন্যে একই যোগে স্পেনীয় ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে দৃষ্টান্তগ্রস্ত

করে তুলেছিল। বর্তমান প্রবন্ধে আমি সংক্ষেপে এই রিফ বিদ্রোহের কাহিনীই বর্ণনা করব। কিন্তু তার পূর্বে এই বিদ্রোহের পটভূমিকারূপে পরাধীন মরক্কোর কিঞ্চিত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। উনবিংশ শতাব্দীতে এশিয়া ও আফ্রিকায় এমন কোন দেশ ছিল না যার দিকে পাশ্চাত্যের ধনাত্মিক সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির দৃষ্টি পড়েনি। কাচামাল সংগ্রহ ও নিজেদের উৎপন্ন পণ্য বিক্রী করার লোভে তারা পৃথিবীর সর্বত্রই নিজেদের প্রভাব বিস্তারের প্রয়াসী হয়ে উঠেছিল। এ নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যেও পারস্পরিক ভেদবিশেষ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের অন্ত ছিল না। আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম কোণের সমুদ্রতীরবর্তী মরক্কো রাজ্যটিও বহুকাল ধরে পাশ্চাত্যের জাতিপুঞ্জের লোভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এদের মধ্যে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ছিল বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী ও স্পেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা মিশরে বৃটেনের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া, বৃটেনও মরক্কোকে ফরাসী প্রভাবিত অঞ্চল বলে স্বীকার করে নেয়। জার্মানী কিন্তু এতে ভয়ানক রেগে যায় এবং ১৯০৫ সালে জার্মান সম্রাট কাইজার মরক্কোর উপর তাঁর দাবী জানানোর জন্যে সদলবলে মরক্কোর বন্দর তাজিয়ায়ে গিয়ে হাজির হন। ইতিহাসে এর নাম হল প্রথম মরক্কো সঙ্কট। যাই হোক, ঘটনাক্রমে এ সঙ্কট ঘনীভূত হয়ে উঠতে পারেনি। ১৯০৬ সালে আলজিয়ার্সে এ সম্বন্ধে কয়েকটি রাষ্ট্রের



রাজা ফারুকের আতিথ্যে আবদুল করিম (মধ্যস্থলে); ডানদিকে তাঁর ভ্রাতাকে (রিফ বিদ্রোহে ইনিও যোগ দিয়েছিলেন) এবং বামদিকে মিশরের প্রধান মন্ত্রী নোকরশি পাশাকে দেখা যাইতেছে।

সে সম্মেলন হয়, হাতেও কাইজার তাঁর দাবীর স্বাক্ষর পান না। এই সম্মেলনে স্থির হয় যে, মরক্কোতে বাবসা-বাণিজ্যের জন্যে সকল জাতিরই সমানোষিকার থাকবে। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী কাইজার এতে সন্তুষ্ট হতে না পেরে মরক্কো সম্পর্কে ফ্রান্সের সঙ্গে একটি পারস্পরিক অর্থনৈতিক চুক্তি করার প্রয়াস পান। তাঁর প্রয়াসও ব্যর্থ হয়ে যায় এবং ১৯০৯ সালে ফ্রান্স মরক্কোর রাজধানী ফেজ্ দখল করে নেয়। প্রতিবাদে জার্মানীও মরক্কোর আগাদির বন্দরে জার্মান গানবোট প্যাথারকে পাঠায়। ইতিহাসে এর নাম হল দ্বিতীয় মরক্কো সংকট। কিন্তু বৃটিশ রাজশক্তি ফ্রান্সের অনুরোধ থাকায় কাইজার সুবিধা করে উঠতে পারেন না। এই দ্বিতীয় সংকটের সময় বৃটিশ মন্ত্রী লয়েড্ জর্জ্ সোষণা করেছিলেন যে, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় জার্মান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা বৃটেন নীসবে মেনে নেবে না। ফলে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া উঠলেও ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে একটি আপেক্ষ মীমাংসা হয়ে যায়। জার্মানী মরক্কোর উপর ফরাসী আধিপত্য মেনে নেয় এবং প্রতিদানে ফরাসীরা ফরাসী কণ্ঠেতে জার্মানীকে যথেষ্ট সুবিধা দেয়।

এইবার আসে মরক্কো নিয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে স্পেনের দ্বিবিবাদে পালা। সূত্থের বিষয় আপোষ মীমাংসার পথে এ পালারও অবসান ঘটে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নবেম্বর ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে যে চুক্তি হয় তার ফলে স্পেন মরক্কোর সমুদ্রতীরপর্ন্ত ১৩ হাজার বর্গ মাইল স্থানের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। রিফ্ হল এই স্পেন-অধিকৃত অংশের একটি পার্বত্য অঞ্চল এবং এ অঞ্চলের অধিবাসীরা হল স্বাধীনতাকামী রিফ্ ক্যাবিল নামক একটি মুসলমান ধর্মাবলম্বী উপজাতি। আবদুল করিম হলেন তাদেরই জাতীয় নেতা। ১৯২৬ সালে আবার এই মরক্কোতেই আন্তর্জাতিক শাসনামলই ব্যাপ্তিয়ার অঞ্চলের সৃষ্টি করা হয়েছিল। যাই হোক মরক্কোর অধিকাংশই ফরাসীদের অধীন। নামে এই রাজ্যটি স্প্যানিশের শাসিত হলেও কার্যত উভয় অঞ্চলের ফরাসী ও স্পেনীয় রেসিডেন্টই সর্বমুখ্য কর্তা। সুতরাংকে এদেরই নির্দেশমত চলতে হয়।

রিফ্ অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করে স্পেনীয় সাম্রাজ্যবাদীরা ভেবেছিলেন যে অতি সহজেই তারা দেখানো তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে। কিন্তু ভিতরে ঢুকেই তারা দেখতে পেল বিপরীত দৃশ্য—দেখতে পেল যে ও অঞ্চলের স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণ সহজে সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে মাথা নোয়াতে সম্মত নয়। তাই তারা সাম্রাজ্যবাদী কটেকেশলের সাহায্যে জনগণকে বিভক্ত করার প্রয়াস পেল। অর্থলোভ, চাকুরীর লোভ প্রভৃতি

দেখিয়ে তারা জনগণের একটা প্রভাবশালী অংশকে কিনে নেবার প্রয়াস পেল। কিন্তু তাদের সে প্রয়াস সফল হল না।

১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর স্পেনের জাতীয় অর্থনীতিতে দেখা দিল একটা বিরাট সংকট। সেই সংকটের হাত থেকে মুক্ত হবার জন্যে স্পেন তার অধীন সাম্রাজ্যের সর্বত্র অনায়াস রকমের কর বসাতে শুরু করল। জাতীয়তাবাদী রিফ্দের উপরেও তাদের বর্ধিত করভার চাপানোর প্রয়াস চলল। তার ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে তিক্ততার সম্পর্ক গেল আরও বেড়ে। এই পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের বহু ঘাটা করেও তারা নিজদের বশে আনাতে পারেনি। এই নতুন কর চাপানোর ফলে এদের মধ্যে ব্যাপক ভিত্তিতে দেখা দিল গণজাগরণ। তারা একযোগে কর দিতে অস্বীকার করে বসল। এদের ঝান্ডায় যাত্রা করার জন্যে স্পেনের পক্ষে এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। ১৯২১ সালে আনওয়ার নামক স্থানে উভয় পক্ষের লড়াই হল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে উপজাতিদের তুলনায় স্পেনের সমরসজ্জা বহুক্ষেণে বেশী এবং অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক হওয়া সত্ত্বেও স্পেন এ যুদ্ধে হেরে গেল এবং তার ফলে বিশ্বের দরবারে তার পদনামস্ গেল অনেক নীচুতে নেমে।

আনওয়ারের যুদ্ধ পর্যন্ত রিফ্ বিদ্রোহের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তাদের কোন কেন্দ্রীয় আন্দোলন ছিল না। বিভিন্ন উপজাতীয় দলগুলি নিজেদের সর্বস্বত্বের অধীনে থেকে সংগ্রাম করত। কিন্তু এর পরেই রিফ্ বিদ্রোহের ইতিহাসে একটা বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটল। রিফ্দের বিভিন্ন উপজাতীয় দলকে সংঘবদ্ধ করে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং সকলকে একই নিয়ন্ত্রণাধীনে এনে আধুনিক সমরসজ্জায় সজ্জিত করার গুরুদায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এলেন গাজী মহম্মদ বিন আবদুল করিম। রিফ্দের হয়ে স্পেনের বিরুদ্ধে ঋতবৃদ্ধ করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না—তাঁর উদ্দেশ্য ছিল স্পেনের হাত থেকে মাতৃভূমিকে উদ্ধার করা। আবদুল করিমের জন্ম হয়েছিল ম্যালিলা নামক স্থানে এবং সেইখানেই তিনি তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছিলেন। রিফ্ উপজাতি অঞ্চলে তাঁর পিতা ছিলেন একজন প্রভাবশালী বাবসারী। আবদুল করিম শিক্ষা ও কারোপালক্ষে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে বহুবার গিয়েছিলেন। তিনি মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিগ্রীলাভ করেছিলেন। রিফ্ উপজাতিদের মধ্যে বিদেশী প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলেন তিনিই প্রথম। তিনি বেশ কিছুকাল ধরে স্পেনের অধীনে রাজকার্যও করেছিলেন।

কিন্তু তাঁর মধ্যে যে স্বদেশপ্রেম ছিল তাই তাকে শেষ পর্যন্ত দেশের ঐকান্তিক সেবায় উৎসাহ করে তুলেছিল। ১৯২১ সালে আনওয়ারে রিফ্ বিদ্রোহীদের বিস্ময়কর বিজয়লাভ দেখে তিনি বুঝতে পারেন যে, এদের সংঘবদ্ধ করলে স্পেনের হাত থেকে তাঁর দেশকে মুক্ত করা আদৌ কঠিন হবে না। তাঁর দেশের জনগণের উপর সাম্রাজ্যবাদী স্পেনীয়দের যে অকথা অত্যাচার তিনি দেখেছিলেন, তাই তাঁকে করে তুলেছিল স্পেনের শ্বেতাঙ্গ রাজশক্তির চরম শত্রু।

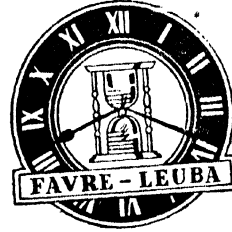
সাম্রাজ্যবাদী স্পেনের শাসন ও শোষণে রিফ্দের তো দুর্দশার স্রোত ছিলই না—তার উপরে এই শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীরা জাতগণের মিথ্যা ঔষধে এদের জাতীয় সম্মানের প্রতিও কোন মর্যাদা দেখাত না। আবদুল করিম যখন স্পেন সরকারের অধীনে কাজ করেন, তখন একদিন ম্যালিলার রাজপথ দিয়ে যাবার সময় দেখেন যে উন্মুক্ত রাজপথের উপর একজন স্পেনীয় সার্জেন্ট একজন রিফ্কে নির্দয়ভাবে চাবুক মেরে চলেছে। এই দৃশ্য দেখে তিনি আর আশ্বস্বরূপ করতে পারলেন না। তিনি দাঁড়িয়ে পাড় জ্ঞানতে চাইলেন ও হতভাগাকে কেন ওভাবে চাবুক মারা হচ্ছে। ককর্ষ ভাষায় শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্ট জবাব দিলঃ “এই বোকা গাধা আমার গা ঘেঁষে পথ চলছিল।” তিনি উত্তর শুনে রেগে লাল হয়ে উঠলেন কিন্তু তবু তিনি মিষ্ট ভাষায় সার্জেন্টকে প্রশমিত করার প্রয়াস পেলেন। সে লোকটি তাঁর কথায় কান না দিয়ে সেই রিফ্ লোকটিকে চাবুক মেরেই চলল। আবদুল করিম স্থির করলেন যেমন করেই হোক এর প্রতিকার করতে হবে—তাঁর স্বদেশবাসীকে এই বর্বর শ্বেতাঙ্গের হাত থেকে উদ্ধার করতেই হবে। তিনি ভখনই স্থানীয় কমান্ডারের কাছে গেলেন এবং সমস্ত কাহিনীটি বিবৃত করে উক্ত সার্জেন্টকে শাসিত দিতে হবে এই দাবী জানালেন। এরকম অত্যাচার চলতে থাকলে রিফ্ জনমানসে কি বিরাগ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে—সে সম্ভাবনার ইংিতও তিনি দিলেন। উত্তরে স্পেনীয় কমান্ডার তাকে বললঃ “তুমি কি জাননা যে, স্পেনের যে-কোন লোক—সে যে শ্রেণীরই হোক—এদেশের প্রভু?” আবদুল করিম এই কথা শুনে একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন এবং এই কথা কয়টি বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেনঃ “এই চাবুক মারার জন্যে স্পেনকে কি অপারিসমী মূল্য দিতে হবে—তা তুমি জানো না!” পরাধীনতার এই মর্ম জনসা যে কি বস্তু আমরা ভারতবাসীরা তা মর্মে মর্মে জানি। সেইদিন থেকে আবদুল করিম হয়ে উঠলেন বিপ্লবী—স্পেনের রাজশক্তির উচ্ছেদকামী।

১৯২১ সালে রাজকার্ব ছেড়ে দিয়ে আবদুল করিম রিফ্ বিদ্রোহীদের সংগঠনে মন দিলেন। তিনি প্রথমে তাঁর বিশ্বস্ত ১০ জন বন্ধুকে নিয়ে একটি ছোট প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন এবং তাঁদের কাছে স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন। তাঁরাও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রস্তাবে সায় দিলেন এবং সর্বশক্তিতে তাঁকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাঁরা সঙ্গে ১০টি বন্দুক ও কিছু সংখ্যক কাতৃজ নিয়ে রিফ্ এলাকার দুর্বল পার্বত্য মূল্যে যাত্রা করলেন। স্পেনীয়দের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দখলের সামান্যতম সুযোগ পেলেও তাঁরা তা হারাতে না। এইভাবে তাঁরা তাঁদের সামগ্রিক শক্তি ও দলগত সংখ্যাভীক্ষ করে চললেন। তাঁদের উদাত্ত দেশপ্রেমের আহবানে সাড়া দেবার মত লোকের অভাব হল না। প্রথম প্রথম স্পেনের শাসক-কর্তৃপক্ষ এঁদের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি—তাঁরা এঁদের ধরে নিয়েছিলেন দস্যুদলরূপে। কিন্তু শীঘ্রই তাঁদের সে মোহ ভগ্ন হল। প্রাথমিক উদ্যোগ আয়োজনের পর আবদুল করিম ম্যালিলা আক্রমণ করলেন এবং স্পেনের সাম্রাজ্যবাদীদের পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করলেন। এইবার স্পেনের শাসকরা ভাবিত হয়ে উঠলেন এবং তাঁরা আবদুল করিমকে অনেক প্রলোভন দেখিয়ে তাঁদের পক্ষে টেনে আনার প্রয়াস পেলেন। কিন্তু আবদুল করিমের মনে উচ্চ আদর্শবাদ ও জবলন্ত স্বদেশপ্রেম থাকায় তাঁদের সকল প্রয়াস ব্যর্থ হল।

দীর্ঘকাল ধরে স্পেনের অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি রিফবাসীদের মনে যে ঘৃণা ও অভিযোগ পূর্ণাঙ্গীভূত হয়েছিল ১৯২১ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন স্পেন-বিরোধী সংগ্রাম হল তারই প্রত্যক্ষ ফল। নিজের দেশকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত করাই ছিল আবদুল করিমের একমাত্র বৃত্ত। স্পেনের রাজা আলফন্সো রিফ-বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন বটে—কিন্তু তাঁর পক্ষে বিদ্রোহ দমন সহজ হল না। আবদুল করিম ঘোষণা করেছিলেন যে, বিদেশীদের তাড়িয়ে দেবার পর তাঁর দেশে রিপাব্লিক বা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন। এই আহবানে জনগণের মনে অভূতপূর্ব সাড়া জেগেছিল। তারা আবদুল করিমের সূযোগ্য নেতৃত্বে অকাতরে রণক্ষেত্রে প্রাণ দেবার জন্যে প্রস্তুত হল। রিফদের এই মরণঞ্জয়ী সাহস ও তাদের দুঃসাহসী নেতা আবদুল করিমের সূক্ষ্ম রণকৌশলের বলে তারা প্রাচ্য প্রতিটি যুদ্ধেই জয়লাভ করতে লাগল। আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়েও সংখ্যাধিক স্পেনীয় বাহিনী রিফদের এঁটে উঠতে পারল না।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে স্পেন কর্তৃপক্ষ একজন দূর্ধর্ষ হাইকমিশনার নিযুক্ত করে তাঁকে কঠোরহস্তে বিপ্লব দমনের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। কিছুকাল পর স্পেনের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি-

মণ্ডলী গেলেন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ রামসে ম্যাকডোনাল্ডের কাছে এবং তাঁকে রিফ ও স্পেনের বিরোধের একটা মীমাংসা করে দেবার জন্যে অনুরোধ করলেন। এতেও কোন লাভ হল না। তার কারণ, স্বাধীনতাকামী রিফরা



## দেখিতে সুন্দর নিভুল সময় রক্ষণে আদ্বতীয়

ফেব্র-লিউবার ঘড়িতে আপনার কাম্য সকল কিছুই পাইবেন। ইহা দেখিতেও সুন্দর, দীর্ঘদিন কাজ দেওয়া এবং স্থায়ী সময় রক্ষক হিসাবে ইহা শিল্পী জগতের এবং সাফল্যের চরম নিদর্শন। আমদানী অত্যন্ত কম, কিন্তু এমন দিন শীঘ্রই আসিতেছে, যখন ফেব্র-লিউবার শ্রেষ্ঠ ঘড়ি পাইয়া আপনি আনন্দিত না হইয়া পারিবেন না।

# FAVRE-LEUBA

ফেব্র-লিউবা এন্ড কোং লিঃ  
বোম্বাই \* কলিকাতা



পরিপূর্ণরূপে বৈদেশিক শাসন-মুক্তি ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করতে সম্মত হইল না। স্পেনও তার নিষেধাতনের নীতি সমানে চালিয়ে চলল।

১৯২১ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে বিরোধ খুব গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে নি। একদিকে স্পেনের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সংকট ও অপর দিকে রাজতন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রী-দের মতবিরোধ স্পেনকে দুর্বল করে তুলেছিল। ১৯২৪ সালে প্রজাতন্ত্রীদের সাময়িক বিপর্যয়ের পর স্পেন সহিত শক্তি নিয়ে রিফ বিদ্রোহ দমনে মনোনিবেশ করল। রিফ বিদ্রোহ দমনের জন্যে বহুসংখ্যক 'রংগুদ' সংগ্রহ করে তারা মরক্কোতে পাঠাল। প্রবল সংখ্যাশক্তি সত্ত্বেও স্পেন কিন্তু জাতীয়তাবাদী রিফদের দমন করতে পারল না। মজা এই যে, এই সব যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পর পর কয়েকটি বিস্ময়কর সাফল্যলাভ করল এবং তার ফলে স্পেনের রাজশক্তি বিশ্বের দরবারে অবজ্ঞাত হয়ে উঠল। নিয়মিত সম্মুখ সংগ্রামেই হোক আর গোঁরলা যুদ্ধেই হোক বিদ্রোহীদের সঙ্গে স্পেনের সৈন্যরা এঁটে উঠতে পারত না। স্পেনের পলায়নপর সৈন্যদের লক্ষিত অস্ত্রশস্ত্র দখল করে বিদ্রোহীরা ভাবী সংগ্রামের জন্যে নিজেদের আরও ভাল করে প্রস্তুত করত। গুলী ছোঁড়ায় তাদের যে অব্যর্থ লক্ষ্য ছিল তার ফলে বহু খাতনামা স্পেনীয় সৈন্যাদ্যক্ষকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। এই অবস্থায় স্পেনের পক্ষে ক্রমাগত পশ্চাদপসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। স্পেনের পক্ষ থেকে আবার গোপনে আপোষের চেষ্টা চলল। বিদ্রোহীদের অধিনায়ক আবদুল করিম সম্মানজনক সর্তে আপোষ করার জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। তবে আপোষের পক্ষে তার অপরিহার্য সর্ত ছিল রিফদের পূর্ব স্বাধীনতা। অপরপক্ষে স্পেন দাবী করল যে, আবদুল করিমকে প্রথমে আত্মসমর্পণ করতে হবে—পরে আপোষ-আলোচনা হবে। বলা বাহুল্য যে, এরূপ হীন সর্তে কোন স্বাধীনতাকামী জাতি আপোষ করতে পারে না। তাই আবদুল করিম আপোষ প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন।

এইবার স্পেন-রিফ বিরোধে হস্তক্ষেপ করল এসে ফ্রান্স। পূর্বেই বলেছি যে, মরক্কোতে ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ গভীর-ভাবে নিহিত আছে। রিফ স্পেনের প্রভাবিত অঞ্চল হলেও মরক্কোরই একটি অংশ। স্পেনের সঙ্গে ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকায় ফ্রান্স এতদিন রিফ বিদ্রোহে স্পেনের দৃঢ়তা দেখে মনে মনে বেশ সন্তুষ্ট হয়েছিল। কিন্তু রিফ বিদ্রোহ ক্রমশ শক্তিশালী হওয়ায় ও বিস্তৃতিলাভ করায় সাম্রাজ্যবাদী ফরাসীরাও এবার বিপদ গণল। তারা বুঝল যে, এ বিদ্রোহ দমন করতে না পারলে ভবিষ্যতে এর ফলে মরক্কোতে তাদের

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থও বিপন্ন হতে পারে। তাই ফরাসীরা রিফ বিদ্রোহের নেতা আবদুল করিমকে তাদের প্রধান শত্রু বলে ঘোষণা করল এবং ফ্রান্সের পত্রপত্রিকাগুলিতে আবদুল করিমের বিরুদ্ধে জঘন্য প্রচারণা-জা আরম্ভ হল। স্পেনের চেয়ে ফ্রান্সের সামরিক শক্তি ছিল বেশী। পৰিঘটিত পরিস্থিতিতে আবদুল করিমের বিদ্রোহী দলেও ভাঙন আরম্ভ হয়েছিল। বিভিন্ন উপজাতীয় উপদলের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাতই তার কারণ। এই সব কারণে শেষ পর্যন্ত আবদুল করিম সশস্ত্র বিদ্রোহের অবসান ঘটতে এবং ফরাসীদের হাতে আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। সে হল ১৯২৭ সালের কথা। ফরাসীরাও তাকে বন্দী করে সপারিবারে নির্বাসিত করল ভারত মহা-সাগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ রিইউনিয়নে। সেই থেকে অতি সম্প্রতি তাঁর আকস্মিক মুক্তির পূর্ব পর্যন্ত তিনি নির্বাসিত জীবনই যাপন করেছেন।

সুদীর্ঘ ২১ বৎসরকালের নির্বাসনেও আবদুল করিমের জ্বলন্ত স্বদেশ প্রেম একটুও হ্রাস পায় নি। আজ তাঁর বয়স ৬৫ বৎসর। তিনি কানে একটু কম শোনে এবং শারীরিক অসুস্থতাও তাঁর আছে। কিন্তু তাঁর স্বদেশ-বাসীরা আজও স্পেনের অধীন—এ মর্মব্যথা এখনও তিনি ভুলতে পারেন নি। এই পরি-বর্তিত বিশ্বপরিস্থিতিতেও তিনি সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে মরক্কো থেকে বিদেশের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উচ্ছেদ সাধনের স্বপ্ন দেখেন। অসুস্থ অবস্থার মিশরের হাসপাতাল থেকে তিনি রয়টারের মারফৎ যে বাণী প্রচার করেছেন তাতে শুন বসেছেন: “ফ্রান্স যদি অত্যাধিকার সনদ প্রতীতি আন্তর্জাতিক চুক্তি ও আইনের কোন মূল্য না দেয়, তবে আমরা শক্তিপ্রয়োগ করতে বাধ্য হব। তবে তার কতখানি অনুযায়ী সে যদি উত্তর আফ্রিকার সমস্যা সমাধানে মনোযোগী হয় ও জাতীয়তাবাদীদের আকাশক্ষার বিরোধিতা না করে, তবে অবিলম্বেই বলপ্রয়োগ বন্ধ হয়ে যাবে। আমি সব সময়েই যুক্তিসংগত উপায়ে আপোষের পথেই বিরোধ মীমাংসার জন্যে চেষ্টা করছি। আমি এ পর্যন্ত যা কিছু করেছি তা আমি করতে বাধ্য হয়েছি নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে। উত্তর আফ্রিকায় এ পর্যন্ত যা-কিছু ঘটেছে তার সমস্ত দায়িত্ব আমার মতে ফ্রান্স ও স্পেনেরই ঘাড়ে গিয়ে পড়ে। রক্তপাত যদি আমার দেশের স্বাধীনতার পক্ষে অপরিহার্য না হয়, তবে আমি আর রক্তপাতের পক্ষপাতী নই। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই যদি প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তবে আমিই সর্বপ্রথমে সে যুদ্ধে যোগ দেব।” ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধ আবদুল

করিমের মূখের এই তেজোদ্ভাস্ত উক্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, স্বদেশ ও স্বজাতির জন্যে স্বাধীনতালাভের স্পৃহা আজও তাঁর হৃদয়েকে সমানভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

মিশরে তাঁর আকস্মিক আশ্রয় গ্রহণের সংবাদে মরক্কোর রিফদের মনেও বিপুল সাড়া জেগেছে। একজন রিফ প্রতিনিধি আমেরিকার লেকসাক্সেসে গেছেন সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে তাঁদের স্বাধীনতার দাবী পেশ করতে। তিনি বলেছেন যে, গাজী আবদুল করিমের মৃত্যু সংবাদে তাঁর দেশবাসীদের মনে আশা হয়েছে যে, এই মৃত্যুযুদ্ধের বীর সেনাপতি শীঘ্রই এসে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন এবং তাদের বিজয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। তরুণ রিফরা তাঁর সম্মানার্থে নিতা নতুন রণসংগীত রচনা করে চলেছে। আবদুল করিম আর স্বদেশে ফিরতে পারবেন কিনা জানি না। তবে এই সুকোশলী স্বাধীনতার বীর সৈনিকের ভাবী কার্যক্রম সম্বন্ধে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। এইটুকু শুদ্ধ বলা যায় যে, তিনি আমরণ তাঁর স্বদেশের মুক্তির জন্যে প্রাণপণ প্রয়াস করে যাবেন—তা তিনি মিশরেই থাকুন আর মরক্কোতেই ফিরে যান। এই বিদ্রোহী নেতার ভাবী কার্যক্রম জানার জন্যে বিশ্ববাসীরা উন্মুখ হয়ে থাকবে।

দেশ ও জাতি শত্রুর  
আগ্রত করুন..

স্বাধীন দূর্বলতা, মাথা-  
ঘোরা, মাথা ধরা, চোখে  
ঝাপসা দেখা, সর্বাঙ্গীন  
দূর্বলতা, অতিশক্তি হ্রাস,  
অনিদ্রা, ক্ষমাহীনতা প্রভৃতি  
উপসর্গ।

**ভাইটিন**



ওষধ শিখানীল

**হোমিও রিপার্ট লেবরেটরি**  
হোমিওপ্যাথি, ঢাকা শাখা ১৯৪১ সাল থেকে কলিকাতা



## শ্রীপ্রমথনাথ বিনী

( ৫ )

ম শব্দ শান্তির উদ্যোগপর্ব যখন চলিতেছে তখন হঠাৎ একদিন

দাঙ্গার কারণ ঘটয়া গেল। বারুদের স্তূপের উপরে গৃহ নির্মাণ করিলে এইরূপই হইয়া থাকে। একদিন সকাল বেলা হঠাৎ রটিয়া গেল, কে রটাইল কেহ নিশ্চয় করিয়া জানে না, জানিবার চেষ্টাও কেহ করিল না, রটিয়া গেল যে, দশানির পেয়াদারা শ্রীচরণ রজককে বল-পূর্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া দেউড়িতে তুলিয়াছে এবং নাকি জুতা-পেটা করিতেছে। কিছ্রক্ষণের মধ্যেই এই সম্ভেদবাক্যে নাকি শব্দটা ঝড়ের মুখে চালাধরের মতো উড়িয়া গেল। দশানির পেয়াদার হাতে শ্রীচরণের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ দর্শকের বর্ণনার অভাব দূর হইল। শ্রীচরণকে জুতা-পেটা করিতে স্বেচ্ছা দেখিয়াছে এমন সব সাক্ষী জটিয়া গেল। তাহারা একব্যাক্যে বলিল যে, তাহারা এখনি দেখিয়া আসিয়াছে যে, পাঁচ-জন পেয়াদা মিলিয়া নাগরা জুতা মারিতে মারিতে শ্রীচরণকে ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। একজন বলিল—শ্রীচরণ এখনো জীবিত আছে। অপর জন বলিল—কিন্তু আর বেশীক্ষণ থাকিবে না, কারণ তাহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতেছে। তৃতীয় আর একজন বলিল যে, শ্রীচরণ বাবাগো, মাগো বলিয়া আত্নানাদ করিতেছে। চতুর্থ প্রত্যক্ষদর্শী বলিল যে, শ্রীচরণ কাঁদিতেছে আর বলিতেছে—ওগো, তোমরা কেউ গিয়ে ছ'আনির বাবুকে খবর দাও, আমি তাঁর নুন খেয়ে মানুষ্য! খবর পেলে এখনই তিনি পেয়াদা পাঠিয়ে এই মোড়ো ভুতগুলোকে শিক্ষা দেবেন। পঞ্চম সাক্ষী বলিল—আমি সেই কথা শুনেই ভাই খবর দেবার জন্যে দৌড়ে এসেছি।

তাহার এই অসমীচীন বাক্যে পূর্বোক্ত সাক্ষীদের একজন বলিল—তুই আবার কোথেকে এলি, তুইতো বাজারে গিয়েছিলি দুধ বেচতে। আমিই তো সকলের আগে এসে খবর দিলাম।

সে ব্যক্তি বলিল—ওই একই কথা হ'ল।

শ্রীচরণের কথাটা শুনে বাজারে গিয়েছিলাম হাতের দুধটা বেচতে। হাত খালি হলে তবে তো লাঠি ধরতে পারবো।

তাহার কথায় দুর্ভাগিন জন একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—তাহলেই হয়েছে! তুমি লাঠি ধরবে, আর সেই লাঠি দিয়ে শ্রীচরণকে উদ্ধার করে আনা হবে। তা হলেই হয়েছে!

একজন বলিল—তুই গোরু চরাগে। তোর লাঠিতে তার বেশ আর কি হবে?

তখন প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে গোলমাল বাধিয়া উঠিল এবং কলহের রস দিয়া প্রত্যক্ষ দুটি ঘটনার অসামঞ্জস্য বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল।

তাহা দেখিয়া উপস্থিত জনতার একজন বলিল—ওসব বাজে কথা এখন থাক। চলো সবাই মিলে শ্রীচরণকে উদ্ধার করে আনি।

উপস্থিত সকলে উৎসাহের সহিত স্বীকার করিল বর্তমানে তাহাই একমাত্র কর্তব্য। কিন্তু সরাসরি দশানির বাড়িতে না গিয়া আগে ছ'আনির বাড়িতে যাওয়াই কর্তব্য বলিয়া স্থির হইল। সকলে ছ'আনির বাড়িতে ছুটিল।

নবীননারায়ণ জনতার কোলাহলে আকৃষ্ট হইয়া বাহিরে আসিল। তাহাকে দেখিয়া জনতা কখনো রোষে, কখনো দ্বন্দ্বভে, কখনো কারিয়া, কখনো হাসিয়া মানে অভিমানে মিশাইয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। নবীননারায়ণ সমস্ত শুনিয়া বলিল—তাহলে এখনি গিয়া শ্রীচরণকে উদ্ধার করে আনতে হয়।

জনতা উল্লাস প্রকাশ করিয়া তাহার প্রস্তাব সমর্থন করিল।

নবীন নৈমুদ্দিকে ডাকিয়া হুকুম করিল—এখনি তুমি যাও, শ্রীচরণকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে।

নৈমুদ্দি বলিল—হুকুম ওদের লাঠিয়াল আছে। খুন জখম হতে পারে। তারপরে সে ব্যাখ্যা করিয়া বলিল—খুন জখমকে আমি যে ভয় করি তা নয়, তবে হুকুমটা চাই।

নবীন বলিল—খুনজখমের দায়িত্ব আমার।

নৈমুদ্দি নবীনের হুকুম পাইয়া শব্দ একবার সেলাম করিল। তখন নবীন নৈমুদ্দিকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিল—কিন্তু খবরদার, কীর্ত্তিবাবুর গায়ে যেন হাত দিও না। তার কিছ্র হলে আমার মাথা হেঁট হয়ে যাবে।

তারপরে অনেকটা যেন নিজ মনেই অখর নৈমুদ্দির কণ্ঠগোচর স্বরে বলিল—খবরদার! কীর্ত্তিবাবু খুড়িমার একমাত্র সম্তান। আমি তার চোখে জল দেখেছি—পাক্কীর প্রফুল্ল আলোর মধ্যে। তার গায়ে যেন হাত দিও না।

নৈমুদ্দি আর একবার সেলাম করিয়া সরিয়া আসিল।

তখন নৈমুদ্দি সদর মালকোঁচা মারিছে কোনোর গামছা বাঁধিয়া লাঠি হাতে করিয়া কাহারার প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়া হাঁহি ছাড়িল। দেখিতে দেখিতে ছ'আনির লাঠিয়ালগণ আসিয়া সমবেত হইল।

প্রথমেই সোনা সদর আসিল, স্বরূপে মৃত্যুতে তাহার বুকে এখনো শেল বিধির আছে, তাহার হাতে স্বরূপের লাঠি। নান্দুস গোপাল আসিল, এক হাতে ঢাল, অন্য হাতে শড়কি, তাহার প্রোজবল ভূড়ি দাঙ্গার উল্লাসে মনে মনে তরাংগত হইতেছে। নান্দু কাল দুইভাই ঘোড়ায় চড়িয়া হাজির হইল—যমর ভাই, হঠাৎ একজন হইতে অপরজনকে পৃথক করিয়া চিনিতে পারা যায় না। বৃন্দ কেবল সদর আসিল।

আর আসিল ছ'আনির অনুরক্ত প্রজা দল। উজীর আসিল, কালু আসিল, রহি খোঁজা আসিল, একটা মৃগুর হাতে করিয়া কান্দু গোয়ালো আসিল। একজন বলিল—কান্দু তোর হাতে ওটা কি? গিরি গোবর্ধন নাকি? কান্দু তখন হাতের মৃগুর দেখি হাসিতে হাসিতে তাহার দিকে ছুটিল। গোপাল হইল।

আর একজন বলিল—কান্দু এবার শিশু পাল বধ করবে।

আর একজন কে বলিল—শিশুদুপা নয় রে, পুতনা রান্ধসী!

কান্দু কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে ধরিবে সে তখন সকলকে ধরিবার আশা ত্যাগ করি মাটিতে গড়াগড়ি খাইয়া হাসিতে লাগিল এ নিজের বুকে ক্রমাগত চড় চাপড় খাই লাগিল!

সিঙ্গর বৈরাগী তামাসা দেখিতে আসি ছিল, কান্দুর অবস্থা দেখিয়া বলিল—বা কান্দু, অমন করে বুথা মরে লাভ বি তারেয়ে দশানির লেটেল চেপে মরিস! বা ঘটোৎকচ বধের বৃত্তান্ত জানিস তো!

কান্দু লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—তবে

বেটা বৈরাগী! দাঁড়া আজ বকাসুর বধ করবো।

বিজয় ছুটিল, পিছে পিছে কান্দুও ছুটিল।

এদিকে নৈমন্দ সদীর সমবেত লাঠিয়াল-গণকে সম্বোধন করিয়া বলিল—ভাই সব, আল্লা বলো, কালী বলো, হরি বলো! আজ বড় সুদিন! আজ মর্দানবের মর্দনের শোখ দিতে হবে।

নৈমন্দ বলিতে লাগিল—কারো এক বিন্দু মর্দন যদি খেয়ে থাকে—তবু তা শোখ করতে হয়। আর মর্দনের মর্দন কত পুরুষ ধরে সবংশে খাচ্ছি সাতপুরুষ ধরে মরলেও যে তার স্বপ্ন শোখ হয় না! আজ আল্লার কৃপায়, কালীর কৃপায় মর্দন শোখের বড় সুযোগ এসেছে! আমরা মুখবু মানুষ্য! তবু এই মোটা কথাটা বুঝি!

এই বলিয়া সে হুঙ্কার ছাড়িয়া লাঠি লইয়া লম্বাইয়া উঠিল এবং পর মুহূর্তেই বহু প্রাঙ্গণের মধ্যে পাক খাইতে সুরু করিল। তাহার পিছনে তাহাকে অনুসরণ করিয়া বিচিত্র অস্ত্রধারী সেই জনতাও পাক খাইতে লাগিল। সকলে নীরব, সমস্ত নিস্তব্ধ! জনতার নীরবতা অতিশয় ভয়ঙ্কর—তাহা অজগরের শিকারবালীন নিস্তব্ধতা। কুণ্ডলিত অজগরের মতো সেই নীরব জনতা চক্কা করে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ এক সময়ে সরল রেখায় পরিণত হইয়া যেমন শিকারের উদ্দেশ্যে ঝপ প্রদান করে—কুণ্ডলিত সেই জনতাও তেমনি হঠাৎ সোজা হইয়া সদীরকে অনুসরণ করিয়া লক্ষ্যমুখে প্রধাবিত হইল। নৈমন্দকে অনুসরণ করিয়া জনতা মুহূর্তেই ডাক ভাঙিতে লাগিল! সেই শব্দে গ্রামে বিয়ম আতঙ্ক উপস্থিত হইল, শব্দে কোতাহলী গৃহস্থও স্বেদ বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইল।

সকলে চলিয়া গেলে শ্রীচরণ রজক আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দশানির একজন লাঠিয়ালের সঙ্গে সকাল বেলায় মাঠের দিকে গিয়াছিল। সে ঘটনার কিছুই জানিত না। এখন আসিয়া শুনিল যে, ছ'আনির একজন প্রজাকে দশানির দেউড়িতে তুলিয়া মারিতেছে। তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য ছ'আনির লাঠিয়াল গিয়াছে। নিজের বিলম্বের জন্য ধিক্কার অনুভব করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবার সঙ্কল্পে শ্রীচরণও ছুটিল!

শ্রীচরণকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীচরণ চলিল!

এইভাবেই ইতিহাস রচিত হয়। ইতিহাসের কুটিল গতি যাহারা জানে তাহারা বিস্মিত হইবে না। কল্পনা, গুজব, কিম্বদন্তী, রূপ-কথা, মোতাত, জাতীয় দম্ভ, বেদ, বারদ, রক্ত, অদৃষ্টের ফাঁস, নির্বোধতা, ভ্রান্তি, অহমিকা—একট মিশ্রিত হইয়া মরক্কো চামড়ায় বাধাই হইলে স্বর্ণাক্ষরে নাম লিখিত হইয়া স্থলোকার ইত্যাদি খণ্ডে প্রকাশিত হইয়া নগদ চল্লিশ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইলে—তাহাকেই ইতিহাস

বলে। সেই ইতিহাসই নাকি জাতির ভাগ্যের নিয়ামক!

যে-জাতির ইতিহাস নাই, সেই জাতিই সুখী!

৬

এদিকে দশানির বাড়িতে সংবাদ পেঁাছিল যে, ছ'আনির লোকে বাড়ী লুণ্ঠিতে আসিতেছে, অর্থাৎ দশানির লোকজন আসিয়া সশব্দে দেউড়ি বন্ধ করিয়া দিল, অতিরিক্ত দুটা অর্গল তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছিল, সে দুটাও লাগানো হইল। হরু সেখ দশানির একজন প্রধান প্রজা। সে লাঠিয়াল নয়, কিন্তু সামরিক বিভাগভূক্ত না হইলেও সকলের উপরে এক-প্রকার সদীরি সে করিত। সবাই জানিত, বাদর হুদুম সেইরূপ।

হরু সেখ মালগির বড়ো সেখকে বলিল, সেখের বেটা, এ দেউড়ি ভাঙা ছ'আনির ব্যাঙাচিদের কর্ম নয়, কাজেই এখানে আর থাকবার দরকার দেখিলে, তার চেয়ে চলো সকলে গিয়ে তোষাখানা রক্ষা করিগে, যদি বেটারা দেউড়ি খুলতে না পেরে অন্য কোন দিকের প্রাচীর ভিঙিয়ে ঢোকে। ওদের লক্ষ্য নিশ্চয় তোষাখানার উপরই হবে।

তারপরে গলার স্বর খাটো করিয়া বলিল—সম্প্রতি পরগণা থেকে অনেক টাকা এসেছে—এছাড়া বাবুদের যা কিছু সোনারপোর জিনিষ সব তো ওখানেই।

মালগির সেখ বলিল—পরামাণিক তোমার কথাই ঠিক। এখানে আর থাকবার দরকার দেখিলে। চলো ওঁকেই যাই।

তখন তাহার হুকুমে সকলে তোষাখানার আঙিনার দিকে চলিল।

এখানে দশানির বাড়ির ভূগোল একটু জানা আবশ্যিক।

দেউড়ি দিয়া প্রবেশ করিলেই বড় একটি আঙিনায় পেঁাছানো যায়। সম্মুখেই উপর দিকে কাছারীর দালান। পূর্বদিকে বড় একটি পুকুরিণী। দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ দেউড়ির পাশে আর একটা লম্বা একতলা দালান, আমলা, গোমস্তা ও পাইক পেয়াদার থাকিবার স্থান, আর পশ্চিম দিকে দোতারা বৈঠকখানা, বাড়ী। বৈঠকখানার পাশ দিয়া আর একটি আঙিনায় ঢুকিতে পারা যায়। এ আঙিনাটাও প্রশস্ত। এই বিস্তারিত প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে সুবহু মন্ডপের দালান, পশ্চিম দিকে তেতাল্য আর একটি দালান। নীচের তলাতে কাছারীর কাগজপত্র থাকে—এটি দস্তরখানা নামে পরিচিত। দোতারা কেই তোষাখানা বলা হয়। এখানে টাকারিড় ও সোনারপার জিনিষপত্র সঞ্চিত। পূর্বদিকে বৈঠকখানা বাড়ি—দুই আঙিনায় তাহার দুই মুখ। আর আঙিনার উত্তর দিকে একটি পাকা দালান, উৎসবাদি

উপলক্ষে সেখানে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আহারাদি করিয়া থাকেন। তোষাখানা ও মন্ডপের মাঝখান দিয়া সরু একটি পথ আছে—সেই পথে অন্তঃপুরের আঙিনায় ঢুকিতে পারা যায়। আপাততঃ আমাদের বহির্বাটির ভূগোলে মাত্র প্রয়োজন।

হরু সেখ ও মালগির সেখ লাঠিয়াল ও বিশ্বস্ত প্রজাদের লইয়া আসিয়া তোষাখানার নীচের তালায় সমবেত হইল।

হরু বলিল—সেখের বেটা, লাঠিই বলো আর বন্দুকই বলো, আসল জোর হাতে নয়, আসল জোর বুদ্ধির পাটায়!

পশু সেখের একটিমাত্র হাত। সে বলিল—আমি তো সেই কথাটাই এতদিনেও বুঝিয়ে উঠিতে পারলাম না! আমার দেখো একখানা মাত্র হাত, কিন্তু আমি কেন শালা দুই হাত-ওয়ালার চেয়ে কম!

হরু হাসিয়া বলিল—আমার কথা তোমরা বুঝতে পারোনি! আসল কথা কি জানো—আসল কথা হচ্ছে এই—

এই বলিয়া টাঁক হইতে ছোট একটি গাঁজার কণ্ঠে বাহির করিল।

এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়া সকলেই একবারো স্বেপীকার করিল—হাঁ, পরামাণিকের কথাই ঠিক!

হরু সেখ স্বরিত কণ্ঠে সাজিয়া 'যায়-প্রাণ-থাকে-মান' করিয়া টান মারিল। আচ্ছা কষিয়া কয়েক টান মারিয়া কণ্ঠেটা মালগির সেখের হাতে দিল। সে টান দিয়া পরবর্তী হাতে দিল—এমনিভাবে কণ্ঠে হস্তান্তর হইতে হইতে বহুদূরবর্তী হাতে গিয়া পেঁাছিল। কণ্ঠের প্রভাবে সকলের ভাব ও ভাষার পরিবর্তন ঘটিল!

হরু বলিল—দেখি ব্যাঙাচি কটা দেউড়ি খোলে কিভাবে? বাবা! ও দেউড়ি কি আজকালকার চেলো কাঠে তৈরি? যে শাল কাঠ দিয়ে তৈরি বন্যায় ভেসে এসে লেগেছিল এই ঘাটে! পশুশজন লোক লাগিয়ে বাবু, তুলেছিল টেনে! তাই দিয়ে ও দেউড়ি তৈরি! এসব শুনেনি আমার বড় বাপের কাছে! ওই দেউড়ি খাড়া দাঁড়িয়ে আছে আজ দু'শ বছর! কত বড়-ঝপটা, কত দাম্পা-হাঙ্গামা—একটা রাগও পড়েনি! ও হচ্ছে গিয়ে বড়ো রোস্তমের বুদ্ধের পাটা!

পশু সেখ বলিল—আরে দেউড়ি না খুললে, আমি নৈমন্দ বড়োর উরমুজি মাথাটা ফাটাবো কেমন করে? সেদিন সকাল বেলাতেই আমার সঙ্গে দেখা! দেখেই বেটা মুখ ফেরালো। বলে কিনা ঠুটোর মুখ দেখে উঠলাম—আজ দিনটা কেমন বাবে কে জানে? বেটা টেরা চোখ দৃশম! সেইদিন তাই প্রতিজ্ঞা করেছি—ওর টেরা চোখ দুটো উপড়ে ফেলবো, ওর দাঁড়ি ছিড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দেবো—আর

আমার এই একহাতি লাঠির ঘারে ওর হুজুর টাকে তরমুজের মতো ফাসাবো—ফটাস্—

তাহার কথায় সকলে হাসিয়া উঠিল!

তেওয়ারি বলিল—ওরা কতজন?

হুজুর বলিল—তবেই হয়েছে তেওয়ারি! আগেই তুমি ভয় পেলে।

তেওয়ারি বলিল—ভয় পাবো কেন? তবু কত লোক জানলে বন্দাবস্ত করা যেতো!

রামজুজ তাহাকে সম্বাদন করিয়া বলিল—সে কথা তো ঠিক! কতজন না জানলে কয়েদখানায় ধরবে কিনা কেমন করে জানাবো?

মালাগির সেখ বলিল—কয়েদ আবার কি? একি কোম্পানীর বিচার নাকি? সবকটার মাথা নিতে হবে! কেউ যেন ফিরে গিয়ে ছোটবাবুকে না জানাতে পারে যে, হুজুর ও বাড়িতে গিয়ে পেঁছেছিলাম!

দুর্গাদাস সদর নায়েব। কলমের ঘায়ে সে বেচারী সত্যকে চোখের জলে নাকের জলে করিতে অভ্যস্ত, কিন্তু লাঠিসোটাতে তাহার বড় ভয়! সে ভাবিয়াছিল, দুই পক্ষে উদ্যোগ পূর্ব পর্যন্তই চলিবে—ততোধিক অগ্রসর হইবে না। কিন্তু এখন সত্যসত্যই লাঠিলাঠির সূচনা দেখিয়া নিতান্ত ভীতি চিত্তে কাছারীর মধ্যে বসিয়া রহিল। সে নিশ্চিত জানিত, কাছারীতে কেহ আসিবে না, কারণ শূন্য কাগজপত্রের উপরে এক অশ্লীল ছাড়া আর কাহারো লেভ নাহি। তাহা ছাড়া, কাছারীতে অনেকগুলো কাঠের বড় বড় বাস্ক ছিল, তাহাদের একটাকে সে খালি করিয়া রাখিয়াছিল, বেগতিক দেখিলে সেটার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া প্রাণরক্ষা করিবে এই ছিল মতলব। অন্যান্য কর্মচারীর আগেই সরিয়া পড়িয়াছিল—তাহার সে উপায় ছিল না, একে সদর নায়েব, তার উপরে সে বিদেশী লোক, গায়ের মধ্যে এখন বর্ষার হওয়া বৃষ্টিমানের কাজ নয়—কি জানি, যদি দৈবাৎ ছ'আনির লোকজনের সম্মুখেই পড়িয়া যায়।

তোষাখানার আঙিনায় আসর বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। এমন সময় কীর্তিনারায়ণ ভিতর বাড়ি হইতে বাহিরে আসিল। সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাহাকে সেলাম করিল!

কীর্তী শুধাইল, ব্যাপার কি? হরু সেখ বলিল—হুজুর ব্যাঙাচিগুলো নাকি বাড়ি লুণ্ঠতে আসছে?

কীর্তী এ সমস্তর কিছুই জানিত না। সে শুধাইল—হঠাৎ?

হুজুর বলিল—হঠাৎ আবার কি হুজুর? 'পিপলিকার পাখা ওঠে মরণের তরে' তাই আর কি?

কীর্তী বলিল—সদার তোমরা প্রস্তুত তো? সদারের উত্তর দিবার অবসর হইল না, এমন সময়ে রব উঠিল, দেউড়ি ভাঙিয়াছে, কেহ

বলিল—দেউড়ি খুলিয়াছে। কেহ বলিল—তাও কি সম্ভব?

কাছারীর আঙিনায় বিষম কলরব শোনা গেল! ফল কথা, দেউড়ি ভাঙিয়াই থাকুক, আর খুলিয়াই থাকুক, অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে! ছ'আনির লোক বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছে!

তখন দশানি পক্ষে সাজ সাজ, ধর ধর, লাঠি কই, বন্দুক কই, আমার বস্ত্রমথানা কোথায় গেল প্রভৃতি রব পড়িয়া গেল! হরু সেখ দূরবর্তী মোতামির হাত হইতে চট করিয়া কয়েকটা লইয়া টাকে গুজিয়া ফেলিল! কাছারীতে দুর্গাদাস শূন্য বাস্কটার নিকটে গিয়া দণ্ডায়মান হইল! তোষাখানার আঙিনায় তখন লাঠিতে লাঠিতে ঠকাঠক আওয়াজ উঠিয়াছে!

৭

ছ'আনির লোকজন দশানির দেউড়ির সম্মুখে আসিয়া থামিল। দেউড়ি বন্দ। একসঙ্গে অনেকগুলি মৃগের হাতুড়ি, বাঁশ, কাঠ যে বাহা পারিল দেউড়ির কপাটে ঠুকিতে লাগিল। দেউড়ি অচল। হরু সেখ মাথা বলিয়াছিল, নিতান্ত মিথ্যা নয়। সেজন শব্দ কাঠ, তেমনি কারিগরি। নীল রং করা শাল কাঠ বহুকালের স্পর্শে একপ্রকার কঠিন আভিজাত্যলাভ করিয়াছে, এত অসামান্যেও কিছুমাত্র টলিল না। অনেকক্ষণ আঘাত করিবার পরে সকলে রান্ধ হইয়া থামিল।

দেউড়ির দুই মানুষ উকু কঠিন কাঠের পাল্লার উপরে নিপুণ কারিগরিতে এক জোড়া ময়ূর খোদিত, তাহার সফীত বস্ত্র পরস্পরকে দৃষ্টে আহ্বান করিবার ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান। দু'দিকের দেয়ালে কিস্তি দুইটা কিলর পাথরে পাখা ঝাপটিয়া উড়িয়া চলিয়াছে। তাহার নীচে একটি গম্বুজ তন্ময় হইয়া বাঁশের বাজাইতেছে। বেচারীর নিম্নাঙ্গ অনেকদিন হইল খসিয়া পড়িয়াছে—তবু তাহার প্রক্ষেপ নাহি; নিজের তানে সে নিজেই মৃগধ। দু'দিকের দেয়ালে কতকালের কত বর্ষা নীলাভ শেওলায় শ্যামল ইতিহাস রচনা করিয়াছে। দেয়ালের স্থানে স্থানে ফাটলের স্ফুট চিহ্ন, তাহাতে সবুজ শাম্বলের অভা, দু'চারটা গুপ্ত অঙ্গকার বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছে। প্রকৃতির স্পর্শ না পাইলে মানুষের শিল্প কৌলীনালাভ করে না। কে একজন কাটা অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে 'হরি', রঙের শূন্যটা নিরীক করিয়া দেখিলে তবে চোখে পড়ে। দেয়ালে ফাটল ধরিয়া কালের চিহ্ন পড়িয়াছে কিন্তু কাঠের দরজায় কাল দণ্ডা বসাইতে সক্ষম হয় নাই। এতগুলো আঘাত—তবু কি একটাও চিহ্ন পড়িল?

ক্ষণকাল বিশ্রামের পরে ছ'আনির যোম্ভার দল আবার আঘাত সুরু করিল। এক একবার সমস্ত দরজাটা কাঁপিয়া ওঠে, কিন্তু খুলিবার

নাম করে না। দু'যোম্ভারের বুকের ছাড়ির মতো দম্ভী শ্বাস অচল, অটল! এমনি 'ছ' আনির লোকেরা বাহুবলের সঙ্গে বাক্যবল যোগ করিল। খোল, খোল ভাঙ ভাঙ রব উঠিল। কেহ মালাগির শেখকে স্পর্ধা করিয়া ডাকিল, কেহ হুজুরকে কেহ পশু শেখকে, কেবল নৈমুন্দি সদার কোন কথা বলিল না, কিম্বা দরজাতে আঘাত করিল না।

তখন কে একজন বলিল—ভাই, সহজ উপায়টাই মনে পড়ে নি। এক কাজ করো, কোন রকমে একবার কান্দুক হাসিয়ে দাও; ওর হাসির দাপটে দরজা খুলে যাবে।

ইহা শুনিয়া আর একজন বলিল—সাজা কথা! অনেক দরজা আছে যা আঘাতে খোলে না, হাসিতে খোলে।

কিন্তু কান্দুক আর চেষ্টা করিয়া হাসাইতে হইল না। তাহাকে হাসাইয়া দিয়া দরজা খুলিবার অশ্রুত প্রস্তাবে সে হোঃ হোঃ হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। অন্যান্য সকলকে হাতের বাহিরে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সে হাসির তেজ সামলাইতে না পারিয়া দেউড়ির দরজার উপরে গিয়া পড়িয়া কিল চড় লাগি ঘূষি বাহা হাতে ও পায়ে আসিল তাহাই মারিতে লাগিল এবং অনতিকালের মধ্যে বেশ বৃষ্টিতে পারিতেছিল বলিলে কথাটা কেহ বিশ্বাস করিবে না, দরজার কাটা পাল্লা খুলিয়া গেল। প্রাচীন-কালের দেউড়ির দরজার একটা অংশ কাটিয়া ছোট একটা দরজার মতো করা হইত। রাত্রিবেলা সমস্ত দরজা খুলিবার পক্ষে অনেক বিষয়। অসময়ে কেহ আসিয়া পড়িলে তাহাকে এই ক্ষুদ্র শ্বারটি খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করানো হইত। হঠাৎ কাটা পাল্লা খুলিয়া গেলে সবাই অবাক হইল—বলা বাহুল্য, সবচেয়ে বেশ অবাক হইল কান্দু নিজে। সে কখনো ভাবিতে পারে নাই তাহার হাসির এমন অর্গল মোচন ক্ষমতা।

কিন্তু ভিতরে এ কে?

শ্রীচরণ রজক না? তাহাকে ভিতরে দেখিয়া কাহারো আর অবিশ্বাস রহিল না যে, সত্য সত্যই তাহাকে দেউড়িতে তুলিয়া প্রহার করা হইয়াছে। কেহ শুধাইল কি চরণ খুব লেগেছে নাকি? কেহ বলিল 'আহা বেঁচে যে গিয়েছে' এই যথেষ্ট, কেহ বলিল—চলু এবারে বেটাদের শিক্ষা দিয়ে আসি। এই বলিয়া সকলে শূন্য কাছারীর আঙিনা পরিভ্রমণ করিয়া বাধাঙা জলসোতার মতো তোষাখানার আঙিনার দিকে ছুটিল এবং অনতিকাল মধ্যে দুইপক্ষের লাঠির ঠকাঠক আওয়াজ উঠিল। সে শব্দ আমরা আগেই শুনিয়াছি।

এবারে শ্রীচরণ রজকের দশানির বাড়িতে প্রবেশের ও দেউড়ি খুলিবার রহস্য পরিষ্কার করিয়া দেওয়া আবশ্যক। আগেই বলিয়াছি যে, শ্রীচরণ কিছু পরে রওনা হইয়াছিল। পথের



কিছু একজনের সাক্ষাৎ পাইয়া শূদ্রাইল দলবল কতদূর? সে লোকটা বলিল যে, সবাই গিয়া দেউড়ি ভাঙিতে চেষ্টা করিতেছে। শ্রীচরণ জানিত দেউড়ি ভাঙিয়া ফেলা সম্ভব নহে। তাই সে দরজা খুলিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। সে জানিত কাহারও পিছন দিকের প্রাচীরের পাশে একটা বেল গাছ আছে। সে দেউড়ির দিকে না গিয়া খানিকটা দূরিয়া সেই বেলগাছের তলায় গিয়া দাঁড়াইল। বেলগাছে উঠিল। বেলগাছ হইতে প্রাচীরের উপরে উঠিয়া দেখিল আঙিনার একটিও জনপ্রাণী নাই। তখন সে প্রাচীর হইতে নমিয়া এক দৌড় দেউড়ির কাছে গেল। কিন্তু সে ভৈরব দেউড়ি একজনের পক্ষে খোয়া অসম্ভব। সে দেউড়ি খুলিবার আশা পরিত্যাগ করিয়া ছোট কাটা পাল্লাটি খুলিয়া দিল। জনতা সেই পথে অন্যায়সে বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িল। সবাই যখন তাহাকে শূদ্রাইল লাগিয়াছে কিনা প্রশ্নটাকে সে অপ্রাসঙ্গিক মনে করে নাই, যেহেতু বেলগাছে উঠিতে এবং দেয়াল হইতে লাফাইয়া নামিতে সে অসম্ভবপণ আঘাত পাইয়াছিল বটে।

( ৮ )

তোষাখানার আঙিনায় দুই দলে বিঘম লাঠালাঠি বাধিয়া গেল। মুহূর্তকাল মধ্যে শত্রুশত্রু মিশিয়া গেল, এক হইতে অপরকে চিনিবার উপায় থাকিল না। বেবল লাঠির শব্দ আর হুঙ্কার। যেন কারোবোখারি বড়ের গর্জনের সহিত মিশিয়া কাঁচের শাসিতে শিলাপাতের শব্দ উঠিতেছে। কেহ বলিয়া খোঁচা খাইল, কাহারো মাথা লাঠি পড়িয়া আহত হইল, তাহার দুই চোখে রক্তের কুয়াশা, এক হাতে রক্ত মূর্তিতে না মূর্তিতে আর একটা প্রবলতার আঘাত আসিয়া পড়ে। অন্য একটা খানি স্থানের মধ্যে দুইপক্ষের শত্রুত্ব লোক-ভিড় এমন নিবিড় যে, বিবেচনা করিয়া লাঠি চালানো সম্ভব নহে। ফলে নিজপক্ষের লাঠির ঘায়ে অনেক বসিয়া পড়িল, অনেক পলাইল। বহুক্ষণ সকলের চোখে লম্বা সব লাঠিই তাহার ঘাড় আসিয়া পড়ে, নাদুস গোপাল সবচেয়ে বে'টে—তাহার মাথা সহজেই বিচিয়া যায়। শ্রীচরণ রক্ত তাহার জাত বাবসায়ের টেকনিকে একটা রোগা লোককে কাপড় বাঁচবার ভংগিতে পা ধরিয়া শূন্য তুলিয়া ফেলিল। আর কান ঘোষ দুইখানি মৃগের ঘরাইতে ঘরাইতে অগ্রসর হইল। এই দৃশ্য দেখিয়া গায়ে সে কি হাসি। সে বলিল—ও ভাই কান্দু, এ তো লাঠা-লাঠি নয়—এসে যাত্রা পাল্লা। ভূই বড়ে ভীম জেলেজিস! শ্রীমন্ত অধিকারীর দলে গিয়ে ভর্তি হ'। মিঃজিমেই দেউড়ির দৃশ্য ভিন্নসের জল মিশিয়ে ধর্ম নষ্ট করিসনে।

গাবুর কথা কানুর কানে প্রবেশ করা আর তাহার হাসির তড়ফা উপস্থিত হইল। সে মৃগের ফোঁলিয়া দিয়া নাদুস গোপালের নখর ভূঁড়িতে বাপান্ত প্রাণান্ত বলে এক ঘৃণি মারিল। নাদুস গোপাল ওজনে ভারি, সে ধরাশায়ী হইল না বটে, কিন্তু কাবু হইল, বলিল—একি ভাই, আমি যে ছ আনির লোক। গাবু বলিল, তাতে কি হয়েছে ঘটোৎকচ মারবার সময়ে কুরু পাণ্ডব বিচার করে চাপা দিয়েছিল?

তোষাখানার সিঁড়ির গোড়ায় মালিগির শেখ ও নৈমুদ্দিন সর্দারে বিঘম লাঠালাঠি বাধিয়া গিয়াছে। দুইজনে দুইপক্ষের সর্দার। তাহাতে আবার সমান শিক্ত। কেহ কাহাকেও কাবু করিতে পারিতেছে না, কেবল লাঠি দটা ঠকাঠক শব্দে বাহবা দিতেছে। সেনা সর্দার তাহার জাতবৃত্তার জ্বালা ভুলিতে পারে নাই। লড়াইয়ে তাহার মন নাই—সে নিঃশব্দে জাত-হস্তকে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে।

ইতিমধ্যে নাদুস গোপাল কানুর ঘৃণির চোটে সামলাইয়া লইয়া একান্তে দাঁড়াইয়া পায়ের আঙুলের সাহায্যে উড়ে শড়ক নিক্ষেপ করিতেছে—আর কানুর দাঁড়াইয়া পঞ্চ শেখ ঢাল দিয়া সেগুলিকে নিরস্ত করিতেছে। যেমন শড়কিওয়ালা তেমনি ঢালী। একটা ফস্কাইলেই পঞ্চ শেখ এফোড় ওফোড় হইয়া যাইবে—কিছুতেই রক্ষা নাই।

এমন সময়ে কীর্তিনারায়ণ বন্দুক হাতে করিয়া ঠেকমানার বারাদায় বাহির হইল। গোলমালে কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না, কেবল সেনা সর্দারের চোখ এড়াইল না। সে সবলে ভিত্তি মেলিয়া ফৌদকে অগ্রসর হইতে লাগিল—আজ সে জাতবৃত্তার শিরোপাত করিয়া প্রতিশোধ লইল। তাহার হাতে মিলন সর্দারের নতুন দাগোড়ানী লাঠি। কীর্তিনারায়ণ তাহাকে দেখিতে পায় নাই, কিংবা পাইলেও তাহার অভিসন্ধি ব্যবহাতে পারিল না। অতর্কিত কীর্তির কথা লক্ষ্য করিয়া সেনা যেমন প্রচণ্ড লক্ষি তুলিয়াছে, নৈমুদ্দিন সর্দার তাহা দেখিয়া হেলিল। সে চীৎকার করিয়া উঠিল, রাখ রাখ, ধান ধান এবং মুহূর্ত মধ্যে সব সে ছুটিয়া গিয়া সেই আসন্ন মৃত্যু-ভীম আঘাতের তুল নিক শির পাতিয়া দিল। কীর্তি বাঁচিল, কিন্তু সেই মারাত্মক আঘাতে নৈমুদ্দিন অচেতন হইয়া ঠেকমানার সিঁড়ির উপর পড়িয়া গেল। মিলন সর্দারের বহুকালের তফাৎ লাঠি আজ রক্ত বিনিতে কাহার রক্ত পান করিল।

সর্দারের বিপরীত টোরা চোখ দুটি কোটার হইতে ঠিকরিয়া ছুটিয়া একত্রে পড়িল। তাহাদের এককালের হেরকের এককালের

পরস্পরকে অনুসন্ধান আজ বৃষ্টি মৃত্যুর পরে মিটিল?

নৈমুদ্দিন মৃতদেহের দিকে তাকাইয়া কীর্তিনারায়ণ ভাবিল, বেটার গেমেন কর্ম তেমনি ফল হইয়াছে!। কীর্তি ভাবিতে লাগিল, বেটা ভাবিয়াছিল নিজে আমার মাথা ফাটাইয়া বাবুর নিকটে বখশিস পাইবে! বেটার উচিত শিক্ষা হইয়াছে—অভিলোভে সব নষ্ট হইল। মানুষে যখন অপারের মনস্তত্ত্ববিশারদ সাজিয়া বসে, তখন এইরূপ সিদ্ধান্তই করে বটে। যদি কীর্তিনারায়ণ জানিত যে, ওই অশিক্ষিত লাঠিগালটা তাহাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই আসিয়াছিল, তাহাকে বাঁচাইতে গিয়াই নিজে মরিল, যদি কীর্তি জানিত যে নৈমুদ্দিনের কানে নবীর সেই সতর্ক বাণী তখনো ধ্বনিত হইতেছিল—কীর্তিদাদা খুঁড়িমার একমাত্র সন্তান! খবরদার তাব গায়ে যেন হাত দিসনে! তাহলে আমার মাথা হে'ট হইয়া যাইবে। খুঁড়িমার চোখে পাশ্চাত্য প্রচলিত অন্ধকারে আমি জল দেখেছি। সাবধান! ডুলিস না!—এসব কথা জানিতে পারিলে কীর্তি কি ভাবিত? এসব কথা জানিতে পারিলে কীর্তি কিংবাস করিত না। কীর্তি ভাবিল, বেটা শিরোপার লোভে প্রাণ হারাইল।

এই ঘটনার পরে শত্রুশত্রু অস্ত্র সম্বরণ করিয়া দাঁড়াইল। কেমন করিয়া কি ঘটনা গেল তাহাই অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশ্যে! হরু সেখ কীর্তিনারায়ণের কাছে আসিয়া বলিল, হুজুর একবার ভিতরে যান। আমরা দেখনি দৃশ্যমানের সাহস কত? হস্তব্রের উপরে লাঠি তোলে এত বড় আত্মপরা!

কীর্তি কি ভাবিল, বলিতে পারি না। সে ভিতরে রওনা হইল! ভিতরে যাইবার আগে সে একবার নৈমুদ্দিন মৃতদেহের দিকে তাকাইল। যেখানে বিচ্ছিন্ন আগেও তাহার দুটি চোখ ছিল। এখন সেখানে রক্তিম তরল দুটি জবাফুল ভাসিতেছে—আর ঘণা, ব্যঙ্গ, করুণা ও ধিকার মিশ্রিত দৃষ্টিতে ঠিকরিয়া পড়া চক্ষু দুটি যেন নিম্পলকভাবে কীর্তিনারায়ণের দিকে চাহিয়া আছে। কীর্তি শিররিয়া উঠিল। জীবিত মানুষকে সে ভয় করে নাই—কিন্তু মৃতের দৃষ্টিকে সহ্য করিতে পারিল না। জীবিত মানুষ কিংব হইতে বিচ্ছিন্ন, সে মরিবামাত্র পঞ্চভূতের সামিল হয়—তখন বিশ্বব্যাপী রহস্য অঙ্কুর তজনী তুলিয়া তাহার পশ্চতে আসিয়া দাঁড়ায়। তাহাকে ভয় না করিবে কে? ভীত কীর্তিনারায়ণ অস্ত্রপরে প্রবেশ করিল।

তখন আবার দ্বিগুণ বেগে মারামারি করিল। (চমক)

বিশ্ব-সাহিত্যে আমেরিকার দান খুব বেশী নয়। সাবেক যুগে এমার্সন, তার-ণর হুইটম্যান, সিনক্লেয়ার লিউইস—আর টল্লেথযোগ্য কাউকে পাওয়া যায় না। কিন্তু এ যুগে ইউজিন ও'নীল ও স্টেনবকের হাত দিয়ে আমেরিকা বিশ্ব-সাহিত্যে যে বস্তু পরিবেশন করেছে, তা বিশ্বায়ের জিনিস বৈকি। আমার আজকের আলোচনা স্টেনবকের নিয়ে। জন স্টেনবকে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ গল্প-লেখক। কিন্তু আজ তাঁর খ্যাতি অতলান্তিক মহাসাগরের দুই তীরে পরিব্যাপ্ত। ইউরোপ ও আমেরিকার নিজস্ব সমালোচকদের নিরপেক্ষ মত এই রায় দিয়েছে যে, ছোট গল্পে এখন স্টেনবকের প্রতিদ্বন্দ্বী দুই মহাদেশের মধ্যে আর কেউ নেই বললেই হয়। পৃথিবীর নাট্য-সাহিত্যে আজ ও'নীলের যে স্থান, কথা-সাহিত্যে স্বকীয় প্রতিভাবলে স্টেনবকে সেই গৌরবময় স্থান অধিকার করেছেন এবং অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই অসম্ভব রকমের জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। অথচ তাঁর খ্যাতি ও প্রতিভার যথার্থ মূল্য নিরূপণ তথাকথিত জনপ্রিয়তার মানদণ্ডে হতে পারে না। কারণ, গোড়া থেকেই স্টেনবকে একজন জনপ্রিয় লেখক হতে চাননি। তিনি গল্প লিখেছেন নাগরিক সভ্যতার আবর্জনাশূন্যের মধ্যে বসে নয়, কিম্বা এর কৃত্রিম পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থেকে নয়। তাঁর সাহিত্য-সাধনার গতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে পরে আমরা দেখতে পাই, এই স্বল্পভাষী, শান্ত প্রকৃতির মানুষটি সাহিত্যিক হিসাবে আমেরিকার অন্যান্য সাহিত্যিকদের থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র জাতের। এই স্বাভাব্য এত বেশী যে, একমাত্র ও'নীল ছাড়া সাহিত্যিক জাতি ও গোত্র নির্ণয়ে আর কারো সঙ্গে স্টেনবকের তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। আকারে ও প্রকারে ও'নীলের সাহিত্য-জগতের সঙ্গে স্টেনবকের সাহিত্য-জগতের যেমন একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তেমন একটা সূক্ষ্ম সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় উভয়ের সৃষ্টি চরিত্রগুলির মধ্যে। হুইটম্যানের বলিস্ততা দু'জনার লেখার মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে আশ্চর্য রকমে। পৃথিবীর যারা সেনা গল্পলিখিয়ে দেখা যায় স্টেনবকে কোনও কোনও বিষয়ে যেন তাঁদের সবাইকে অতিক্রম করে গিয়েছেন। একটা দৃষ্টান্ত দিই। মেয়েদের মন ও চরিত্র, তাদের অন্তরের কামনা ও বাসনাকে (sex and passion) কেন্দ্র করে

আজ পর্যন্ত যারা সাহিত্য-সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ গল্প লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে জেলা, মোপাসাঁ, সেক্‌হব, লরেন্স কুপ্রিন এবং সমাসেটি মম—অনেক কিছুই বলেছেন এবং এঁদের মধ্যে লরেন্স ও মম যে গভীরতায় নেমেছেন, ঠিক সেই গভীরতার পরিচয় আছে স্টেনবকের এই ধরণের প্রত্যেকটি গল্পে। তাঁর “মাপ” নামক গল্পটির তুলনা পৃথিবীর কথা-সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ এই গল্পটিকে শেষের দিকে স্টেনবকে ইচ্ছে করলে খুব একটা উত্তেজক, মূখরোচক এবং জনপ্রিয় গল্পের ‘ফিনিস’ দিতে পারতেন। তাঁর প্রতিভার মৌলিকতার প্রথম পরিচয় পাই আমরা এই গল্পটিতে।



স্টেনবকে

সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যাবে, কথা-সাহিত্যের অধিকাংশেরই মেয়াদ দু'চার দিনেই ফুরিয়ে যায়, কিছুদিন পরেই তাদের চেহারা পুরানো খবরের কাগজের মতোই ধূলি-ধূসর হয়ে পড়ে। দশ বছর আগে যেন-নভেল অতলান্তিকের এপার-ওপারে বহু লক্ষ নর-নারীর হৃদয়ে ঢেউ তুলেছিল, আজ তার নাম কে মনে রেখেছে! এক-একটা নভেল তুবড়ীর মতো হঠাৎ জ্বলে উঠেই নিঃশেষে ফুরিয়ে গেলো, এ আমরা কভবারই দেখলাম। চক্‌চকে আনকোরো অবস্থায় যার জেজ্ঞায় চোখ ধাঁধায়, কত সহজেই যে তা বাঁস ও বিস্মৃত

হ'য়ে যেতে পারে, সে-কথা ভাবলে সমগ্র গদ্য-সাহিত্যে সম্বন্ধেই একটা সঙ্করূপ সহনশীলতার ভাব মনের মধ্যে জন্ম নেয়। অন্য পক্ষে দু'দশ পাতার একটা ছোট গল্প তার স্বচ্ছ স্বল্প দেহটুকু নিয়ে অনায়াসে হাজার বছর পার হ'য়ে এলো। ইতিহাসের রংগমঞ্চে রুচি পরিবর্তনের নাট্যলীলা বারে বারে অভিনীত হ'য়ে গেলো, কিন্তু তার সদ্যোজাত অঙ্গানতাকে কখনোই স্পর্শ করতে পারলো না। এইখানেই সত্যিকারের ছোট গল্পের একটা মস্ত বড়ো বৈশিষ্ট্য। কালসমূহে বৃষ্টিবৃষ্টির মতো তা মিলিয়ে যায় না। সে ক্ষণদেহ, কিন্তু ক্ষণ-জীবী নয়। তার আয়ুষ্কাল বহুদূর প্রসারিত হ'তে পারে এবং এককাল থেকে আর এককালও তার প্রাণস্পন্দন প্রবলভাবেই অনুভব করা যায়। স্টেনবকের প্রত্যেকটি গল্প ঠিক এই জিনিস। সৃষ্টিধর্মী কল্পনা থেকে এদের সৃষ্টি বলেই এই গল্পগুলির পাঠকের আঙ্গুরের অমরতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ।

একদিন ইউরোপের, বিশেষ করে ফরাসী ও ইংল্যান্ডের গর্ব ছিল যে, একটা পরিণত সভ্যতার অধিকারী হিসেবে সাহিত্য যেন একমাত্র তাদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি। একথা বলেছিলেন গিলবার্ট মারে: “Art is the monopoly of mature civilisation” এবং তাঁর এই দাম্ভিক উক্তি আর অনেক দিন বাদে আমেরিকার সাহিত্যে যখন ও'নীলের আবির্ভাব হলো, তখন থেকে মার্কিন-সাহিত্যে বিশ্ব-সাহিত্যে আর অপাঙক্তেয় হ'য়ে রইলো না। পরবর্তীকালের একাধিক ইউরোপীয় সমালোচক শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিলেন যে,

“America that once stood low in the historic hierarchy of nations, has now produced art of a vigorous order. She has now created a school of thinking and writing which, because of its roots run deep into the beginning of human life, must survive.” (Shaw).

স্টেনবকের সাহিত্য-জগতের অভিনব ও বিস্ময়কর উপাদান (যা তিনি অবোধগম্য, অবজ্ঞাত ও অবহেলিত সমাজ-জীবন থেকে সংগ্রহ করেছেন) তার অন্তর্নিহিত ছন্দের শাখায় ভর করে ইণ্ডিগোভর ভাবমণ্ডল পার হ'য়ে চিরকালকে আজ জয় করে নিয়েছে। তাঁর গল্পে সেই মানুষই কথা বলেছে, যে মানুষ ঈর্ষা, প্রেম ইচ্ছা আশা সুখে-দুখে জড়িয়ে আমাদের সকলেরই ইন্স-

করা জামার তলায় ধুকধুক করছে। কাজেই স্টেনবেকের আবির্ভাবের পর মার্কিন কথা-সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যে যে আর অপাঙ্কত নয়, সে-কথা আজ চড়াবর্তরূপে প্রমাণিত হয়ে গেছে।

হুইটম্যানের বীলম্ভ চিন্তার উত্তরাধিকার বহন করেই মার্কিন-সাহিত্যে স্টেনবেক আত্ম-প্রকাশ করেন ১৯৩৬ সালে। তখনো তিনি আমেরিকার নবাবগত লেখকদের মধ্যে একজন হিসেবেই পরিগণিত। প্রথমে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-পত্রিকা “দি এ্যাটলান্টিক”-এ তার একটা গল্প প্রকাশিত হয়। গল্পটির নাম ছিল “দি প্রমিস্” (The Promise)। সেই গল্পটি প্রকাশ করবার সময় পাদদেশে যে সর্বাঙ্গীকৃত সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিল, তার মধ্যে একটি লাইনে লেখা ছিল:

“I have read this story four times. In selecting this story from the pen of an unknown author, can almost feel his creative impulse in every word of it that will stand the test of time.”

তখন থেকেই স্টেনবেকের ওপর শিক্ষিত পাঠকের দৃষ্টি পড়লো। ১৯৩৮ সালে তাঁর প্রথম গল্প-সংকলন “The Long Valley” বইখানা যখন বেরুলো, তখন আমেরিকার উল্লেখযোগ্য এমন কোনো সাহিত্য-পত্রিকা ছিল না, যাতে এই বইখানি সম্প্রদায় এবং এর লেখকের প্রতিভা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা না বেরিয়েছে। তারপর প্রকাশিত হোসো স্টেনবেকের বহু-খ্যাত উপন্যাস “On Mice and Men” এবং “The Grapes of Wrath” এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিভার ও শক্তির স্বভঃপ্রগোদিত স্বীকৃতি এলো ইউরোপ থেকে। লন্ডনের প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সমালোচক জেমস ইস্টউড, সিরিল কনোলা এবং রেমন্ড এন্ডার্সন প্রভৃতি সকলেই একবারো মার্কিনের এই নবীন প্রতিভাকে প্রশংসা জানালেন। উপন্যাসিক মম্বা এক সদীর্ঘ প্রবন্ধে স্টেনবেক সম্বন্ধে লিখলেন:

“How eloquently and with what understanding Steinbeck loves his people. His characters are of the earth. They are lowly of spirit and they are also entirely human... He is great among the greatest short story writers of the world.”

এই কথা বলেছেন মম্বার মতো সাহিত্যিক এবং এর থেকেই আমরা বুঝে নিতে পারি স্টেনবেক কত উচ্চতরের শিল্পী।

স্টেনবেকের গল্প বা উপন্যাস এমন জিনিস নয়, যা গড়ে নিবিড় আনন্দের স্ফুলভ রোমাঞ্চ অনুভব করা যায়। তাঁর গল্পের কালজয়ী স্থায়িত্বের কারণ খুঁজতে হলে খুব সাবধানতার সঙ্গে প্রবেশ করতে হবে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য জগতের অন্তঃপরে, পৃথিবী যেখানে আজও তার আদিমযুগ অভিজ্ঞ

করেনি, অথচ যুগ-সভ্যতার প্রথম আলো যেখানে গিয়ে পৌঁছেছে; যেখানকার মানুষের সঙ্গে সভ্যজগতের মানুষের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না; আবার এরই পাশাপাশি যেখানে দেখতে পাই এই সভ্য পৃথিবীর সদস্য মানুষকে যে-মানুষ আজও নিজে থেকে পুরোপুরি জেনে উঠতে পারেনি। চরিত্রচারণ, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, এমন কি যে-সমাজে যে-সময়ে বেঁচে আছি তার সুস্পষ্ট আলোচনা চাইতে গেলে অন্য কারো গল্প পড়ুন, গল্পপড়ার নিজস্ব আনন্দ পাবেন। কিন্তু যে-জীবন প্রত্যক্ষভাবে আপনার অভিজ্ঞতার বাইরে, যদি সেই জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে চান, তবেই স্টেনবেক পড়বেন এবং দেখতে পারেন স্বভাব-ক্ষণিক কথা-সাহিত্য যে-যে উপায়ে যুগ-যুগান্তরের মানবমনে স্থায়ী অর্জন করতে পেরেছে (যথা চরিত্র-সৃষ্টি), স্টেনবেকের সৃষ্টি সে-পথ অনুসরণ করেনি অন্যদিকে আমাদের প্রতিদিনের পরিচিত জীবনের সম্পূর্ণ এবং যথার্থ মর্মে অনুভূতির জড়িমা ভেদ করে মনের দৃষ্টিতে কেন্দ্র করে ধরা পড়ে যদি দেখতে চান, স্টেনবেক পড়ুন। তারাই মহৎ শিল্পী, তারাই বড়ো লেখক যারা প্রতিদিনের জীবনের অচেতন অভিজ্ঞতার ভূনাংশরাশিকে বেছে, গুঁড়িয়ে, সম্পূর্ণ করে মনের সচেতন স্তরে তুলে ধরেন। তারাই সৃষ্টিধর্মী লেখক যারা আপন দেশ-কালের পরিবেশনীতে বিবর্তমানের প্রাণ-স্পন্দন সঞ্চারিত করেন। স্টেনবেক এমনি একজন মহৎ শিল্পী—তার গল্পগদ্য এই শ্রেণীর রচনা।

খৃষ্টীয় সভ্যতার ওপর বাইবেলের প্রত্যক্ষ প্রভাব আজও রয়েছে এবং ওদেশের সাহিত্যের ওপরে এই গ্রন্থখানির পরোক্ষ প্রভাব আজও একেবারে অন্তর্হিত হয়নি। সাহিত্যের এলাকা থেকে বাইবেলের অনুশাসনকে অর্ধচন্দ্র প্রদর্শন করবার স্পর্ধা দেখিয়েছেন আনাতোল ফ্রান্স এবং তারপরে ইবসেন, জয়েস, লরেন্স ও বার্ণার্ড শ’। আমেরিকাতে অবশ্য বহু আগেই প্রথম যে লোকটির রূপগায়ক বাইবেল-বিরুদ্ধ সুর ঝংকৃত হলো তিনি হুইটম্যান। তারপর এলেন স্টেনবেক। ধর্মের অনুশাসন, ধর্মশাস্ত্রের কল্পিত স্বর্গ নরক ইত্যাদি মানুষের চিন্তাকে কিভাবে পঙ্গু করে রেখেছে তা উপলব্ধি করেই “দি গ্রেস অব রাথ” উপন্যাসের নায়কের মুখ দিয়ে স্টেনবেক পরিষ্কার বিবাহীন কণ্ঠে বলিয়েছেন:

“On earth there is nothing divine beside humanity... No man is guilty of sin, for sin is part and parcel of life.”

স্টেনবেকের নীতিশাস্ত্র একটিমাত্র পাপের

উল্লেখ আছে—নীচতা অর্থাৎ meanness এবং সভ্যতার রম্ভে রম্ভে আজ যে ঘন ধরেছে তার একমাত্র কারণই হোলো শিক্ষিত মানুষের এই চারিত্রিক দৈন্য—নীচতা। স্টেনবেক তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস “মাইস গ্যাড মেন”-এ এই তথ্যটিকেই রূপায়িত করে তুলেছেন অত্যন্ত চর্চা দক্ষতার সঙ্গে। এই উপন্যাসের নায়ক “স্লিম”, নিজে একজন নগণ্য ও সমাজের নীচের স্তরের লোক হয়েও, এই তথাকথিত সভ্য সমাজের উপর-তলার মানুষের নীচতাকে যেভাবে ঘণার চক্ষে দেখেছে, এবং তাদের সমস্ত রকমের নীচতার বিরুদ্ধে সে যেসব কথা বলেছে, মনে হয়, স্টেনবেকের আগে মানবচারিত্রের এই জঘন্য দিকটাকে এমনভাবে আর কেউ উন্মোচিত করে দেখাবার প্রয়াস পান নি।

স্টেনবেকের সৃষ্ট প্রত্যেকটি চরিত্রের সঙ্গে মাটির সম্পর্কটা এত নিবিড় যে “গ্রেস অব রাথের” টম, আল, পা কোর্সি; “মাইস গ্যাড মেনের” লেনি, ক্যাডি ও স্লিম; “টরটিল্লা ফ্লাটস”-এর ড্যানি, এমন কি “দি মুন ইজ ডাউন”-এর মেয়রটি পর্যন্ত—মাটি ছাড়িয়ে তারা কখনো কৃষ্ণ স্বর্ণের দিকে, বাইবেলের প্রতিশ্রুত স্বর্গভূমির দিকে পা বাড়ায়নি। তাই না সমালোচকরা বল থাকেন:

Steinbeck's heroes are of the land, bound to it by love invincible... all are earthly and cherish radical ties. All his noble characters are a sermon in the immortality of the people.

সাহিত্যে স্টেনবেক যে-বিশ্বব এনেছেন, দৃষ্টিভঙ্গীর যে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, তার আসল কারণটা হোলো এই। জীবনের ঝড়-ঝাঝ থেকে মনের মধ্যে একটা কল্পিত রহস্য লোক গড়ে নিয়ে তার মধ্যে নিরাপদ দূরত্ব বাস করার যে স্পৃহা আজকালকার মানুষের মধ্যে তাদেব জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে দেখা দিতে শুরু করেছে, এই মহৎ শিল্পী তারই বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম উচ্চতম সুরে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। যন্ত্রযুগ মানুষকে শূন্য যন্ত্রই করে তোলেনি তাকে একদিকে করেছে ভূমিচ্যুত, আরেকদিকে করেছে পরিবার বা গোষ্ঠী থেকে বিচ্যুত—এরই ফলে পৃথিবীর নারী-সন্তার মধ্যে যে বিকৃতি অনিবার্যভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে, স্টেনবেক, ভবিষ্যন্তর মতোই আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে তা দেখিয়ে দিয়ে বলেছেন—‘Life is so unreal’! সভ্যতার প্রতি যে থিঙ্কারবাণী তিনি উচ্চারণ করেছেন, স্টেনবেকের সাহিত্য-জগতের প্রত্যেকটি নর-নারীর মনের মধ্যে আমরা সেই দৈব-বাণীরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই।



বুয়োর × হটেনটট। হটেনটট বংশকণা প্রবল

ইউরোপের বুয়োর (Boer) ও আফ্রিকার হটেনটট (Hottentot) জাতির সংমিশ্রণ হইয়াছে।

১৯০৮ খৃঃ ফিশার রেহোবোত যাত্রা করিলেন। সেখানে কয়েক বৎসর থাকার পর পুনরায় জার্মানীতে ফিরিয়া আসেন। তথাকার গবেষণার ফল পুস্তকাকারে ১৯১৩ খৃঃ প্রকাশিত করেন। তাহার গবেষণার ফল হইল—মেন্ডেলের নিয়ম গাছপালা পশুপক্ষী এবং মানুষের বেলায় একইরূপে প্রযোজ্য।

ফিশারের এই গবেষণা বিদেশে, বিশেষ করিয়া ফরাসীদেশে ও ইটালীতে, আদরে গৃহীত হইল বটে, কিন্তু জার্মানীর তৎকালীন পুণ্ডিতেরা সহজে মানিয়া লইতে চাহিলেন না। ইন্দুর, বাদরে ও মানুষে একই নিয়ম খাটেবে? ফিশার ইহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। ফিশারের চরিত্রের সর্বাপেক্ষা বড় গুণ হইল তাহার অদম্য সাহস ও উৎসাহ। তিনি তাহার মতবাদ ভালরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ফ্রাইবুর্গের ব্রাইসগাও (Breisgau) অঞ্চলে জার্মানজাতির মঙ্গল কামনায় একটি সমিতি স্থাপন করিলেন। তাহার গবেষণার ফল এমনই সুদৃঢ়ভাবে গঠিত ছিল যে, তিনি ইহার দ্বারা জার্মান-জাতির মধ্য হইতে বংশানুক্রমিক ব্যাধি ও বিকারগুলি দূর করিতে কৃতসংকল্প হইলেন এবং উত্তরকালে তাহারই চেষ্টায় বংশানুক্রমিক ব্যাধি ও বিকারগ্রস্ত লোকদের প্রজনন বন্ধ করিয়া দিবার আইন প্রবর্তিত হয়। এইরূপ অন্তরায় না থাকিলে জাতির ধ্বংসের পথই উন্মুক্ত হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি জার্মানীর একদল বৈজ্ঞানিক ফিশারের গবেষণার ফলাফল ভাল চক্ষে দেখেন নাই, কিন্তু ১০ বৎসর পরে যখন

রোডেনডাল্ড (Rodenwald) মালয়ের সংমিশ্রিত জাতিদের উপর গবেষণা করিয়া ফিশারের মত সমর্থন করিলেন তখন আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। এই সময়ে তিনি ফ্রাইবুর্গ হইতে ভুরৎসবুর্গে (Wurzburg) প্রফেসরের পদে উন্নীত হইয়া চলিয়া যান। কিন্তু কয়েক মাস পরেই তাহার স্বীয় গুরুদেবের পদ অলংকৃত করিবার জন্য পুনরায় ফ্রাইবুর্গ হইতে ডাক আসে। অতঃপর ফিশার ভিডারশাইমের স্থান অধিকার করেন। এই সময়ে প্রথম মহামুখ্য আরম্ভ হয়। তখন গবেষণা ছাড়িয়া ফিশার যুদ্ধাহতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

১৯২৬ খৃঃ ফিশারকে বার্লিনে মনুষ্য বংশানুক্রম বিজ্ঞানের জন্য একটি স্বতন্ত্র গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের জন্য বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাক আসে। বার্লিনের ডালহেম (Dahlem) পল্লীতে অন্যান্য বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থলে নৃতত্ত্বের গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। ডালহেমে প্রত্যেক বিজ্ঞানের জন্য বিভিন্ন গবেষণাগার আছে এবং ইহাদের সবগুলিরই খরচ Kaiser Wilhelm Gesellschaft বহন করেন। ১৯৩৩ খৃঃ ফিশার বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর হন। ১৯৪২ খৃঃ ফিশার কাইসার উইলহেলম ইনস্টিটিউট হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় মহাসমরে ডালহেমের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই বটে, কিন্তু ফিশারের সাধের ফ্রাইবুর্গ ১৯৪৪ খৃঃ বোমার আঘাতে একপ্রকার বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। অধুনা ডালহেমের নৃতত্ত্বের গবেষণাগার মার্কিন সেনানিবাসে পরিবর্তিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় মহাসমরের মধ্যে আর ফিশারের কোন সংবাদ লওয়া সম্ভব হয় নাই। ১৯৪৬ খৃঃ জার্মানীর সহিত পৃথক বিনিময় স্থাপিত



বুয়োর × হটেনটট। ইউরোপীয় বংশকণা প্রবল



বুয়োর হটেনটট। হটেনটট বংশকণা প্রবল

হইলে ফিশারের সহিত পুনরায় যোগাযোগ করিতে পারিয়াছি। বৃদ্ধ এই বয়সেও কর্মরত এবং দুর্ভাগ্যবশত মার্কিন অধিকৃত এলাকার পড়িয়া গিয়াছেন। খাদ্যাভাব এতই প্রবল যে বৃদ্ধ লিখিয়াছেন—

“Sie wurden sich wundern, uns zu sehen, da wir alle sehr schlank und mager geworden sind.”

অর্থাৎ—“তুমি আমাদের দেখিলে আশ্চর্য হইয়া যাইবে যে আমরা সকলে কিরূপে রোগা ও দুর্বল হইয়া গিয়াছি।” তথাপিও বৃদ্ধের আশা প্রবল। ইহার পরেই লিখিতেছেনঃ—

“Ich hoffe, das deutsche Volk wird sich durch Arbeit und Fleiss seinen Platz unter den Völkern in Frieden wieder erobern.”

“আমি আশা করি যে, জার্মান জাতি কর্ম ও নিষ্ঠা দ্বারা শান্তিপূর্ণ জাতিদের মধ্যে পুনরায় তাহাদের আসন ফিরিয়া পাইবে।”

বার্লিনে দ্বিতীয় মহাসমরের ঠিক অব্যবহিত পূর্বে ফিশারের সহিত বংশানুক্রম গবেষণার এক বৎসর কাল ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম এবং পরে তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এই মহাজনের অসীম প্রতিভা, অদম্য উৎসাহ, মধুর স্বচ্ছ সরল ব্যবহার, প্রভৃতির সহিত সাধারণের তুলনা হয় না। এমন দূরস্ত লোক খুব কম দেখা যায়—যেমন বিজ্ঞানের নিরস গবেষণায়, তেমনই নাচেগানে, শিকারে, আত্মপস পর্বতে স্কী করিতে। এই ফিশার দিনের বেলায় গবেষণার রত আর রাতে রেষ্টোরায়ে অথবা নাচের আসরে বিয়ারের বোতলের পর বোতল শেষ করিতেছেন। এক বৎসর ইহার সান্নিধ্য লাভ করিয়া যেটুকু শিক্ষালাভ করিয়াছি সারা জীবনে তাহা ভুলিতে পারিব না। দুর্ভাগ্য যে, এই মহামানবের সহিত আরও কিছুকাল কাটাইতে পারিলাম না।

# যাত্রিদল

## শ্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ

চরমোবিশ্ব অধ্যায়

মা স দুই কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে মধুকরের বিচারের জন্য ৩ জন বিচারক লইয়া একটি বিশেষ বিচার সভা গঠিত হইয়াছে। অন্যান্য যাহারা আসামী ছিল তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া পুলিশ মামলা তুলিয়া লইয়া তাহাদিগকে মুক্তি দিয়াছে। মাস কয়েক হইল মিঃ মুখার্জির নির্দেশমত অসিত কলিকাতায় ছোট্ট একখানা বাসা ভাড়া করিয়া সেখানে মৃণালিনীকে আনিয়া রাখিয়াছে। মধুকরের জন্য সমিতি হইতে কলিকাতার অত্যন্ত নাম করা কয়েকজন ব্যারিষ্টারকে নিয়োগ করা হইয়াছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই—আজ বিচারকগণ একমত হইয়া মধুকরকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। সন্ধ্যাবেলা অসিত তাহাদের সেই “বুগ বাণী” অফিসের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহার মন হাহাকার করিয়া ঘুরিতেছিল। শেষে মধুকরের মত লোকেরও ফাঁসি যাইতে হইবে। যে কোন স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করিলে যাহার হয় তো একদিন পৃথিবী-জোড়া নাম হইত—তাহাকেই আজ এই দুর্ভাগ্য দেশে একজন দস্যুর মতো একজন সাধারণ নরঘাতকের মতো অকালে প্রাণ হারািতে হইবে।

মিঃ মুখার্জির আদেশে অসিতকেই যাইয়া মৃণালিনীকে এই সংবাদ দিয়া আসিতে হইয়াছে। মৃণালিনী সমস্ত শুনিয়া একটা কথাও কহে নাই—সারাক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শুধু অসিতের বিদায়ের সময় বলিয়াছিল—অসি, যা হবার তা তো হবে জানি—এদেশে আমি আর থাকবো না—শুধু যে কয়টা দিন সে বেঁচে থাকবে সে কয়টা দিনই আছি ভাই। তোমার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ ভাই তার শেষ সময়ের খবর তার অন্তিম ইচ্ছা যদি কিছু থাকে তবে আমাকে জানিও অসি। অসিত সমস্ত স্বীকার করিয়া সেখান হইতে বিদায় লইয়া আসিয়াছে। অসিত ইহাদের পর্বতন কোন সম্বন্ধই জানে না, কিন্তু এটা সে নিশ্চিত করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে যে, এ সংসারে মধুকরকে এমন একান্ত করিয়া এমন প্রাণগণ করিয়া আর কেহই মঙ্গল কামনা করে না। তাহাদের প্রাণ ও ভালবাসাও হয়তো তাহার কাছে স্থান হইয়া যায়, এই নারীটি আজ দুই মাস ধরিয়া কলিকাতার একটি ক্ষুদ্র কক্ষে বন্দী হইয়া দিনের পর দিন অতর্কিত আগ্রহে এই দিনটির প্রতীক্ষা করিয়াছেন, দিন

দুই পরে অনেক চেষ্টা করিয়া অসিত মধুকরের সহিত দেখা করিবার অনুমতি লাভ করিয়াছিল। জেলের ক্ষুদ্র একটি “সেলে” ছিলেন তিনি বসিয়া। অসিত দেখিয়া অবাক হইয়া গেল—সম্মুখে তার একখানা গীতা রহিয়াছে খোলা—তিনি তাহারই মাঝে যেন ধ্যানমগ্ন স্বপ্নের মতো একেবারে ভুবিয়া গিয়াছেন। চোখে মুখে ভাঁহার না নামিয়াছে কোন বিষাদ বা আতঙ্কের ছায়া—না হইয়াছে তাহার স্বাভাবিক জ্যোতি এতটুকু স্থান। কয়দিন পরে যাহাকে ফাঁসি যাইতে হইবে—জোর করিয়া এই পৃথিবীর সহিত যাহার সকল সম্বন্ধ শেষ করিয়া দেওয়া হইবে তাহার মনে এমনি শান্তি কোথা হইতে আসিল? তিনি অসিতের দিকে মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিলেন—কে অসি? অসিত একটা কথাও না বলিয়া শুধু বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া সেইখানেই চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। তিনি পুনরায় মুখ তুলিয়া বলিলেন—যা হবার বেশ হয়েছে অসি—এ নিয়ে তোমরা দুঃখ করো না। মৃণালের সমস্ত ভার নিশ্চয় তুমি নিয়েছ—তাকে বলা সেও যেন এ নিয়ে দুঃখ করে নিজের অশান্তিকে আরো বাড়িয়ে না তোলে। এ জগতের পরে যে স্থান আছে সেখানে গিয়ে নিশ্চয় আবার একদিন আমাদের দেখা হবে—সেই আশায় যেন সব দুঃখে সে ভুলে থাকে। অসিত যে কথা বলিতে আসিয়াছিল এবার অত্যন্ত সংক্ষেপে তাহাই আরম্ভ করিল—কিন্তু দাদা প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে রাজার কাছে আবেদন করলে হয়তো সে আবেদন মঞ্জুরও হতে পারে। মধুকর কিছুক্ষণ দুই চোখের দৃষ্টি অসিতের দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া বলিলেন—ছিঃ অসি, এ কথা কি তোমার বলা ঠিক হলো ভাই! বলতো ভিক্ষা করা প্রাণ নিয়ে আমি কি করবো? এ পৃথিবীতে তার আর কি প্রয়োজন থাকবে? বেঁচে থাকাই তো বড় কথা নয় ভাই—শুধু বেঁচে থাকতেই যদি মানুষ পৃথিবীতে আসতো তা হলে মানুষের আর পশুতে ভেদ রইতো কি? অসিত আর কোন কথা বলিতে সাহস করে নাই। নিজের মনে যে এমনই স্থিতি পাইত, তাহার কাছে সকল যুক্তি সকল কথা যে আপনি চুপ মারিয়া যায়। সেদিন সারাটা দিন ধরিয়া অসিত বারে বারে নিজের মনে ভাবিতে লাগিল—ভাই তো যে মধুকরের মতো এমনি করিয়া সর্বস্ব পণ করে নাই—জীবন ও মৃত্যুর সত্য-কারের পরিচয় যে জানে নাই—অন্তরে অন্তরে

এমনিই সর্বভাগ্যী সম্যাসী হইয়া উঠে নাই—সে তো প্রকৃত বিপ্লবী হইতে পারে নাই। এই শেষ সাক্ষাতে এই শিক্ষাই তো মধুকর তাহাকে দিয়া গেলেন। এই শিক্ষাই তো তাহাকেও সারা অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—এমনি করিয়া প্রাণের সমস্ত মামা পরিভাগ্য করিয়া হয়তো একদিন মরণের পথে আগাইয়া যাইতে হইবে। ইহার দিন দশেক পরে মধুকরের ফাঁসি হইয়া গেল। অসিত সেদিন শ্বিপ্রহরে সমস্ত খবর সংগ্রহ করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল। ইতিপূর্বে তাহাদের দলের কোন একজন কর্মী এই জেলে ছিলেন, জেলের জনৈক সিপাহীকে কিছু টাকার লোভে বশীভূত করিয়া সেই কর্মীটির নিকট হইতে সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে। তিনি সিপাহীর হাত দিয়া যে চিঠিখানায় সমস্ত জানাইয়াছিলেন—অসিত এতক্ষণে সেখান। খুলিয়া পড়িতে বসিলঃ—

“আজ ভোর বেলা মধুকরদার ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। আমি তখন নিজের “সেলে” আবেশ। তাহারই ভিতর হইতে যতদূর দৃষ্টি চলে তাকাইয়াছিলাম—একবার যেন মনে হইল তিনি আর কয়েকজন লোকের সঙ্গে ফাঁসি-মণ্ডের দিকে আগাইয়া গেলেন। তারপর নিজে আর কিছুই জানি না। অন্য লোকের ওদের নিকট হইতে যাহা যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, লিখিতেছি—দুই ভাগিতে তিনি নাকি ফাঁসি-মণ্ডের দিকে আগাইয়া গিয়াছিলেন—কোন প্রকার ভয় বা চিন্তার লেশমাত্র তাহার মুখে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল অন্তিম সময়ে তাহার কোন কর্মনা আছে কি না?

—তিনি জবাব দিয়াছিলেন—জগতের সমস্ত অত্যাচারের অবসান হোক ইহাই একমাত্র কামনা।

তারপর নিজের হাতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরাইয়া দিয়াছেন—কয়েক মহুতের মধ্যে সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে।” চিঠিতে আর কিছুই নাই—আর জানিবারই বা কি থাকিতে পারে। একদল কলেজের ছাত্র মধুকরের মৃতদেহ শোভাযাত্রা করিয়া শ্মশানে লইয়া গিয়াছে। অসিত বা তাহাদের দলের অন্য কেহ নানা কারণে এই দলে যোগ দেয় নাই। এতক্ষণ হয়তো দেহ তার পুড়িয়া একেবারে ছাই হইয়া গিয়াছে। অসিত চোখ বুজিয়া বসিয়া বসিয়া শুধু ইহাই ভাবিয়া চলিয়াছিল। বিকাল বেলা মিঃ মুখার্জির নিকট হইতে নির্দেশ আসিল সন্ধ্যার সময় তাহাকে যাইয়া মৃণালিনীকে সমস্ত খবর জানাইয়া আসিতে হইবে। এই ভয়ই সে করিতেছিল। তাহার কাছে যাইয়া কেমন করিয়া সে এই নিদারুণ সংবাদ শুনাইবে—কি বলিয়াই বা তাহাকে সান্ত্বনা দিবে। সন্ধ্যাবেলা অসিত যখন মৃণালিনীর বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হইল তখন পা দুইখানি তাহার কে যেন পিছন

ইতে টানিয়া টানিয়া ধরিতে লাগিল। সে নর্ণাণ্ড বাহিয়া উপরে উঠিয়া দেখে খরের দরজা খোলা রহিয়াছে—ভিতরে জমাট অন্ধকার। সে ঐকান্ত মনে বারান্দা হইতে সেই অন্ধকারের দিকে উর্গিক মারিয়া দেখিল, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দৃষ্টি গোচর হইল না। বাহিরে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল—দিদি কি ঘরে আছেন?

ভিতর হইতে মৃণালিনী বলিলেন—কে অসিত? এসো ভাই!

তাড়াতাড়ি দিয়াশলাই জন্মালিয়া বাহিরে ধরাইয়া পুনরায় বলিলেন—ভিতর এসো অসি!

অসিত কৃষ্ণত পদে ভিতরে ঢুকিয়া চুপ করিয়া মেঝের উপরে একপাশে বসিয়া পড়িল। আজ যে ফাঁসির নির্দিষ্ট দিন তাহা মৃণালিনীরও অজ্ঞাত ছিল না। এতক্ষণ হয়তো তিনি বিছানায় পড়িয়া পাড়িয়া কান্দিতে ছিলেন—স্নান আলোতে তঁহাকে অতি অদ্ভুত দেখাইতেছিল—অসিতের মনে হইতেছিল শব্দ দেখানাই বৃষ্টি তাহার সম্মুখে বসিয়া আছে—মনপ্রাণ কোন সূদূরে উধাও হইয়া গিয়াছে। কতক্ষণ পরে তিনি অসিতের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন—শেষ হয়ে গিয়েছে তো ভাই?

অসিত ধীরে ধীরে নিজের পকেট হইতে সেই চিঠিখানা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল—এই চিঠিখানায় তার সব কথা লেখা আছে, দিদি!

চিঠিখানা অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজের চোখের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন—দঃখ আমি আর করবো না ভাই—এই দুই মাস ধরে নিজের হৃদয়কে একেবারে পাষণ করে তুলেছি। সেদিন তোমায় বলেছিলাম—আমি এদেশে আর থাকবো না। তেমাকে কিন্তু ভাই কয়েকটা দিন আমার জন্য কষ্ট করতে হবে—আমাকে সংগে করে কাশী রেখে আসতে হবে—কালই যেতে চাই—ভাই!—

—আপনার সংকল্পে আমি বাধা দেবো না দিদি, কিন্তু আপনার চলবে সেখানে কি করে, সে সম্বন্ধে মিঃ মুখার্জির সঙ্গে একটা কথাবার্তা বলে নিতে চাই।

—তুমি ভেবো না অসি। বিশেষবরের রাজ্যে কেউ অদ্ভুত থাকে না যেমন করেই হোক দিন নিশ্চয়ই কাটবে।

দিন চরেক পরে কাশীর বাঙালীটোলার একটি অল্প পরিষর ঘরের মধ্যে মৃণালিনীর সম্মুখে অসিত বসিয়াছিল। তাহার টেনের সময় হইয়া আসিতেছিল—এখনই বিদায় লইতে হইবে।

মৃণালিনী বলিতেছিলেন—তোমার এই অদ্ভুত দিদিটিকে তুমি কি চক্ষু দেখেছ, আমি জানিনে, কিন্তু তোমার মনের কোণে যদি

কোথাও কোন সংশয় থাকে ভাই তা আর রেখে না। কোন দিন কোন অন্যার তোমার এই দিদিটি করে নাই ভ্রম। এতে আমার গর্ব কিছু নাই ভাই—এ তোমার সেই সন্যাসী দাদার শিক্ষা। এ জগতে আমাদের কি সম্বন্ধ ছিল কিছুই তার হয়তো তোমরা জান না—কিন্তু এ জগতে জোর করে সে কথা তো বলতে পারবো না ভাই। যদি পরলোকে আবার আমরা মিলতে পারি—সে কথা তখনই বলবো। জানি সেখানে কেউ আমাদের আর বাধা দিতে পারবে না। শব্দ এই কথাটি মনে রেখো ভাই জগতে আমাদের দুজনার কারুর মধ্যে এতটুকু কালিমা—এতটুকু মলিনতা স্পর্শ করে নাই। অসিত তাত্তর পায়ে ধলা মাথায় তুলিয়া লইয়া বলিল—খোঁসন আপনাকে দেখেছি দিদি—সেই দিনই অত্যন্ত অদ্ভুত ঠেকেছে—সেদিন এও ব'কি এ জগতের আর দশজনের মতো আপনার বিচার করা যায় না। সেই দিন থেকে কোন দিনই সে চোটা করি নি শব্দ মনে মনে ভাঁজ করেছি—পুজো করেছে। মৃণালিনী অসিতের মাথাটি নিজের কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া কয়েকবার ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া বলিতে লাগিলেন—সত্যি তুমি আমার ছোট ভাই অসি! কিন্তু আজ এই বিদায় বেলা তোমাকে কি বলে আশীর্বাদ করতে হয় তা তো জানিনে ভাই! অসিত স্নান হাসিয়া বলিল, কিন্তু আমাদের আপনাই তো আশীর্বাদ করতে জানেন দিদি—যে আশীর্বাদ অন্য কারুর মুখ থেকে বেরবে না—সে আশীর্বাণী যেন আপনার মুখ থেকেই বেরতে পারে।

মৃণালিনী মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—কিন্তু তুমি বিপ্লবী হ'লেও যে আমার ভাই অসি—তোকে যে আমি সে আশীর্বাদ করতে পারবো না। বলিয়া তিনি বর বর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। অসিত বলিল—না পারলে তো চলবে না দিদি—মনে মনে শব্দ এই আশীর্বাদই করুন আপনার এই ভাইটি যেন তার মধুদাদার উপায় শিখাই হতে পারে—আর কিছু এ জগতে তার কামা নাই। অসিত পুনরায় তাহার পায়ের ধলা মাথায় লইয়া পা বাড়াইয়া বলিল—এবার যাই দিদি!

—আর কি দেখা হবে না ভাই?

অসিত চলিতে চলিতে জবাব দিল—না, এই হয়তো আমাদের শেষ দেখা দিদি!

পথে নামিয়া তাহার চোখ ভরিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু একবারও আর পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল না।

#### চতুর্বিংশ অধ্যায়

কিন্তু বিপ্লব আরম্ভের নির্ধারিত দিনের পূর্বেই গভর্নমেন্ট সব কথা জানিয়া ফেলিলেন। কোন একটি রাজনৈতিক ডাকাতের মামলার আসামী আই বি পুলিশের নিকট সমস্ত খুলিয়া বলে এবং ইহাদের দলের সিংগাপুরের

কোন এক ডাক্তারও দলের সমস্ত গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া দেয়, সুতরাং হঠাৎ একেবারে ব্যাপকভাবে ভারতবর্ষের সবত্র খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তার চলিতে লাগিল এবং ৫।৭ দিনের মধ্যে বহুসংখ্যক কর্মীকে গ্রেপ্তার ও অনেক গুপ্ত দলিলপত্র হস্তগত করিয়া ফেলিয়া গভর্নমেন্ট অত্যন্ত সতর্ক হইয়া উঠিলেন। কাজেই ভারতবর্ষীয় এই যে একটা বিরাট বিপ্লবের সম্ভাবনা তাহা একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। গুপ্ত সমিতি হইতে ইস্তাহার বিলি করিয়া নির্ধারিত দিনকে বাতিল করিয়া দেওয়া হইল। মাস দুই পরে পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া কলিকাতার কোন জনবহুল অঞ্চলের একটি বাড়ির তেতলায় আবার একদিন রাতে এক গুপ্ত সভা বসিল। এ সভায়ও যথাসম্ভব ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশের বিপ্লবী নেতাগণ আসিয়া যোগ দিলেন এবং ছয় মাস পরে পুনরায় অন্য একটি দিন বিপ্লবের জন্য স্থির হইল। সভার পর অন্যান্য প্রদেশের নেতাগণ বিদায় লইলে মিঃ মুখার্জি অতীত ব্যানার্জি, নলিনাক্ষ সেন ও অসিত অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা বলিতেছিলেন। ইতিপূর্বে বিদেশ হইতে কোন ব্যাংকের মারফত ইহাদের হাতে যথেষ্ট অর্থ আসিত। এখন সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়ায় তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। অথচ যথেষ্ট অর্থ দরকার। এই লইয়াই এখন এই তিনজনের মধ্যে আলোচনা চলিতেছিল। প্রত্যেক প্রাদেশিক নেতাদের উপরে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহের ভার দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহা পর্যাপ্ত নহে। আরও প্রায় ৫।৭ লক্ষ টাকা দরকার। মিঃ মুখার্জি নিজে বড় বড় জমিদারদের নিকট হইতে ৪।৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন আশা করেন। বাকী ২।৩ লক্ষ টাকা বাঙলা দেশ হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। ইতিপূর্বে বাঙলা দেশের অর্থশালী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ হইতেছিল, কিন্তু এখন গভর্নমেন্টের এই বিরুদ্ধ মনোভাবে কোন ব্যক্তিই আর পূর্বের মত অর্থ সাহায্য করিতেছে না এবং বিপ্লবীদের সঙ্গ যথাসাধ্য পরিহার করিয়া চলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুতরাং বড় বড় কয়েকটি ডাকাতি ভিন্ন যে আর এই অর্থ সংগ্রহের অন্য কোন উপায় নাই তাহা বৃদ্ধিতে কাহারও বিলম্ব হইল না এবং এই পথই স্থির হইল। কলিকাতা হইতে মাইল ৫০।৬০ মাইল দূরে একটি জেলার সহরের টেজারী লুণ্ঠের পরিকল্পনা হইল। দিন পনের পরে ষোল মাসের শেষে টেজারীতে ষোল কিস্তির খাজনার টাকা আসিয়া জমিবে, সুতরাং সেই সময় অন্ততপক্ষে ২।৩ লক্ষ টাকা নিশ্চয়ই সেখানে জমা থাকিবে। সুতরাং পনের দিন পরে ষোল সহরের টেজারী লুণ্ঠের পরিকল্পনাই স্থির হইল। জেলার সদরে দশদশ পাহারার ভিতরে গিয়া টেজারী লুণ্ঠ অত্যন্ত দ্রুত কার্য—

কাজেই অত্যন্ত বোধ্য লোকের দরকার। মিঃ মুখার্জী, নলিনাক্ষ সেন ও অসিতের অধীন আরও পনের জন বিপ্লবীকে এই কার্যের ভার অর্পণ করিলেন। সে পনের জনের নামও তিনিই স্থির করিয়া দিলেন। দশজনের নিকট বন্দুক ও রিডলবার থাকিবে, বাকী সাতজনের নিকট প্রধানত থাকিবে লোহার সিঁদুক ও তাল। জাগ্রতার জন্য হাতুড়ী, ছেনি ও একপ্রকার কিছু উপায়াসিত মাথা খারা লোহা ও সীসা গলাইয়া ফেলা যায়। কোমরে অবশ্য তাহারও এক একটি পিণ্ডতল ঝুলাইয়া লইবে—দরকার হইলে, যাহাতে শত্রুর সম্মুখে সতেরজনই মুখিয়া দাঁড়াইতে পারে।

এই পন্যাদিন অসিতের এক অশ্রুতভাবে কাটিতে লাগিল। ইতিপূর্বে দুই-একবার তো সে সাহসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এবার কেন কোন থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ মনের ভিতরে তাহার দোলা দিয়া উঠিতেছিল। কেন যেন মনে হইতেছিল এই হয়তো শেষ—কি অশ্রুত যেন এবার ঘটিয়া যাইবে। বারের বারের সে নিজের মনের প্রতি চোখ রাখিয়াই উঠিত—বারের বারের মনকে শুনাইত বিপ্লবীর এ দুর্ভাগ্য সাজে না—বিপ্লবী হইবে পাথরের মতো হৃদয়হীন—ঝড়ের মত দুর্বীর। জীবন-মরণের প্রশ্নকে আজও সে এত বড় করিয়া দেখিতেছে?—ছি! তাহার যিনি গুর, সেই মধুকরের মধ্যে সেদিন মরণের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়বার সময়ও কি অপরূপ জ্যোতিঃ সে দেখিতে পাইয়াছিল। তাহারই শিষ্য হইয়া এ দুর্ভাগ্য সে হৃদয়ে স্থান দিবে না। এমনি করিয়া বারের বারের অসিত নিজের মন হইতে সমস্ত দুর্ভাগ্যতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতে চাহিল।

সেদিন বিপ্রহরে আত্মবাস্তে চুপ করিয়া নিজের বিভ্রামায় শব্দইয়াছিল—দুই চোখের পাতা তাহার বন্ধ থাকিলেও মন তাহার উড়িয়া উড়িয়া ঘেঁড়াইতেছিল—ঘুমের লেশমাত্র চোখে বা মনে কোথাও ছিল না। ঘরের একপাশে অজয় তাহার খেলনা লইয়া একমনে কি যেন একটা অতীত জবরী কবে মনোনিবেশ করিয়াছিল। সেই এতটুকু অজয়—আজ সাত বৎসরের অজয়। অসিতের অর্ধেকমিলিত চোখের পাতার ভিতর দিয়া অজয়ের মর্তিখানি বারের বারের ভাসিয়া উঠিতেছিল—তাহার মাথায় কালো কোঁকড়ান চুল, পাটোল-চেরা চোখ, টিকালো নাক—সর্বোপরি কাঁচা সোনার মত রং তাহাকে এক অপূর্ণ সুসমায় ভরিয়া গিয়াছে। সেই এতটুকু অজয় কেমন করিয়া যে দিনের পর দিন এমন করিয়া এত বড়টি হইয়া উঠিয়াছে—কবে এমন অপূর্ণ শোভার তাহার সারা দেহ ভরিয়া গিয়াছে—তাহার কোন স্বপ্নই তো অসিত রাখে নাই।

সেই যে যখন অজয় কোলে কোলে ফিরিত—যখন গ্রাম ছাড়িয়া তাহার কলিকাতায় আসিয়া বাসা বাঁধিল, তাহার পর হইতে তো সে যথাসাধ্য পুঠকে এড়াইয়া চলিয়াছে। হয়তো পূর্বের মত আদর করিয়া আর একটি দিনও কোলে করে নাই—নিজের বৃকের উপরে তাহাকে দুই বাঁহু দিয়া চাপিয়া ধরিয়া স্নেহস্রসে নিজের অন্তরকে ভরিয়া লয় নাই। কল্যাণীর দৃষ্টি ইহা এড়ায় নাই—সে কতদিন ইহা লইয়া কত অনুযোগ করিয়াছে—অভিমান করিয়াছে। কিন্তু অসিত যে কত অসহায় তাহা তো সে জানিতে পারে নাই। সে যে বিপ্লবী—এ পৃথিবীর স্নেহ মমতাকে যে তাহাকে যথাসাধ্য পরিহার করিয়া চলিতে হইবে। না হইলে স্নেহের বশ্বন কবে কোন দুর্বল মুহূর্তে তাহাকে কোথায় টানিয়া নামাইয়া দিবে তাহা কে জানে? কতদিন অজয় আসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আদর করিয়া তাহার আধ আধ স্বরে বলিয়াছে—বাবা, বাবু! অসিত হয়তো মুখে একটি কথাও কহে নাই—কখনও হয়তো অল্প একটু কোলে তুলিয়া লইয়া নামাইয়া দিয়াছে। অভিমানী বালক মুখ ভার করিয়া ঘরের এক পাশে ঘাড় ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়াছে। এমনি কত কথা আজ অসিতের একে একে মনে পড়িতে লাগিল। এমনি করিয়া অবহেলায়—অন্যদরে ছেলে তাহার পর হইয়া গিয়াছে। সে যেমনি তাহাকে তাহার দিক হইতে ঠেলিয়া দিয়াছে—তেমনি অমিয় লইয়াছেন তাহাকে একেবারে নিজের বকে তুলিয়া—তাই আজ আর অজয়ের তাহার জ্যাঠামণি না হইলে চলে না। সে সকালবেলা জ্যাঠামণির কাছে বোধোদয় লইয়া পড়িতে বসে—শ্রমপ্রহরে তাহার সহিত বসিয়া আহার করে—সন্ধ্যাবেলা জ্যাঠামণির কোলের মধ্যে বসিয়া জ্যাঠামণির মুখে কত রাজ্যের গল্প শোনে এবং গল্প শুনিতে শুনিতে তাহারই কোলের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়ে। অসিতের নিরাসক্ত বিপ্লবী মনের চাপে স্নেহবৎসল পিতৃহৃদয় কোথায় একেবারে ধোঁয়া হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। অসিতের দুই চোখ ভরিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া সে সহসা ডাকিয়া উঠিল—অজয়—অজয়মণি! অজয় ছুটিয়া আসিয়া দুই হাত দিয়া অসিতের গলা জড়াইয়া ধরিয়া মুখের কাছে নিজের মুখ লইয়া বলিল—বাবা!—বাবু!—বাবামণি! অসিতের বুক ভরিয়া ক্রন্দনের রোল ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িতে যাইতেছিল। সে কিছুক্ষণ অজয়কে বৃকের উপর চাপিয়া ধরিয়া নিজের মনকে খানিকটা স্থির করিয়া লইয়া বলিল—কিছু নয় বাবা—যাও খেলা করগে যাও! অজয় কিন্তু নড়িবার নামও করিল না—পুনরায় তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া বলিল—তবে ডাকলে কেন? কি বলবে বল না বাবা—এই তো আমি এসেছি। অসিত আর একটি কথাও

কহিল না—ধীরে ধীরে শব্দাত্যাগ করিয়া অজয়কে কোলে লইয়া বৃকের উপরে চাপিয়া ধরিয়া বাহিরে বারান্দার আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু দূর আকাশের দিকে তাকাইয়া পুনরায় তাহার দুই নয়ন অঝোরে ঝরিতে লাগিল।

অজয় বলিল—কেন কাঁদছো বাবা?

অসিত এবার জোর করিয়া কৌচোর খুঁটে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া অজয়ের মুখ চুম্বন করিয়া কহিল—আর কাঁদবো না বাবা! পাশের খোলা জানালার ভিতর দিয়া কল্যাণী ছিল এদিকে তাকাইয়া—অজয়কে কোলে করিয়া কেন এমন করিয়া অসিত কাঁদিতেছে—ইহার কোন কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া এক অজানা আশঙ্কার তাহার মন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। এমনি করিয়া পনেরটি দিন কাটিয়া গেল। দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ঘাটে দুইখানা নৌকা ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছে—সেই নৌকা করিয়া তাহার নিজেরা গঙ্গা উজাইয়া দিন তিনেকের মধ্যে কৃষ্ণনগরের কাছে গিয়া পৌঁছাবে। সেখান হইতে ৭৮ মাইল পথ হাঁটিয়া তবে গিয়া কৃষ্ণনগর শহরে উপস্থিত হইতে হইবে। সম্ভার পর দক্ষিণেশ্বর হইতে নৌকা ছাড়িবার কথা। অতকাল অসিত কবে যে বাসায় থাকিত, আর কবে থাকিত না, এ লইয়া কেহ মাথা ঘামাইত না—কারণ এই বর বৎসর ইহা একরূপ গা সহ্য হইয়া গিয়াছিল। আজ সকালের দিকে সে একবার কল্যাণীকে কয়েকদিনের জন্য বাসায় থাকিবে না জানাইয়াছিল। কল্যাণীও বিশেষ কিছু আর জানিতে চাহে নাই। সম্ভা তখনও হয় নাই—অসিত নিজের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল—নিজের জামাকাপড় পরিয়া লইয়া কয়েক মুহূর্ত যেন কি ভাবিয়া শুনামনে চুপ করিয়া ঘরের মেঝের দাঁড়াইয়া বহিল। সহসা যেন মন তাহার হু হু করিয়া উঠিল—মনে হইল, এ ঘরে হয়তো আর কোনদিন ফিরিয়া আসিতে পারিবে না। ঘর হইতে যখন বাহির হইল, তখন কল্যাণী দরজার পাশে দাঁড়াইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি তাহাকে বলিল—চলো কল্যাণী!

কল্যাণী বলিল—ফিরবে কবে?

—ঠিক করে তো বলতে পারি না।

একটু তাড়াতাড়ি ফিরো।

অসিত মাথা নাড়িয়া বলিল—আচ্ছা।

সিঁড়ির পাশে অমিয়র ঘর। সেখানে তখন অজয়মণি তাহার জ্যাঠামণির কোলের উপরে মাথা রাখিয়া একমনে গল্প শুনিয়া বাইতেছে—আর মাঝে মাঝে নানা প্রশ্ন করিয়া তাহাকে বিবৃত করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের কথা অসিতের কানে আসিয়া বাজিতেছিল—সিঁড়ি দিয়া নামিবার আগে চুঁরি করিয়া সেই দিকে খানিকটা তাকাইয়া লইল। তারপর ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া একেবারে রাস্তার আসিয়া দাঁড়াইল।

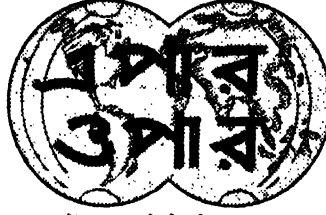
(ক্রমশঃ)

## দক্ষিণ মেরু অভিযান

আপনাদের সকলের জন্য আছে যে, নানা বিষয়ে পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করবার জন্য কয়েকটি দেশ দক্ষিণ মেরুতে অভিযাত্রী দল প্রেরণ করেছে, এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দলটি গেছে আমেরিকার যুক্তরাজ্য থেকে। এই দলে অনেক বিশেষজ্ঞ আছেন; কেউ যুদ্ধে, কেউ খনিজ বিদ্যায়, কেউ আবহাওয়াতত্ত্বে আর কেউ অন্য কিছুতে। আধুনিক সব কিছুতে সজ্জিত হয়ে এতবড় অভিযাত্রী দল দক্ষিণ মেরুতে আর যায় নি। এই দলের সর্বাধিনায়ক হলেন অ্যাডমিরাল ব্যাডার্ড, যিনি দক্ষিণ মেরু সম্পর্কে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

এই অভিযাত্রী দলের পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের ফলাফল ও তার বিবরণী কিছু কিছু প্রকাশিত হচ্ছে। এই সমস্ত বিবরণী থেকে জানা যায় যে দক্ষিণ মেরুকে যুদ্ধকালীন ঘাঁটি ছাড়া আর কোনও কিছুতে ব্যবহার করা যায় না। দক্ষিণ মেরুর কোনও কোনও স্থানে জাহাজের ঘাঁটি করলে দক্ষিণ আটলান্টিকে শত্রুপক্ষের জাহাজকে বেশ বাধা দেওয়া যাবে। সম্ভূত গত মহাযুদ্ধের সময় জার্মানরা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ৫০০ মাইল দক্ষিণে দক্ষিণ মেরুর ডিপেনসান বে নামক উপসাগরে একটি ভূগো জাহাজের ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। এই ঘাঁটি থেকেই সম্ভবত বিখ্যাত গ্রাফ স্পি নামক জাহাজখানি মিত্রপক্ষের জাহাজগুলিকে পর্যবেক্ষণ করেছিল। আপনাদের স্মরণ থাকতে পারে যে ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে এই জাহাজখানি মণিভিভিয়ার অনতিদূরে নিজেকে ধ্বংস করে।

• দক্ষিণ মেরুতে আর একটি ব্যবসা চলতে



পারে; সেটি হলো তিমি শিকার ও তার চর্বি ও তেল-নিষ্কাশন করে বিক্রয় করা। এ ব্যবসা লাভজনক।

দক্ষিণ মেরুতে খনিজ পদার্থ অবশ্য পাওয়া যায়, যেমন কয়লা, তামা, ম্যাগনেজ, টিন ও মলিবিডিনাম, কিন্তু তা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নয় এবং এ নিয়ে ব্যবসা করাও অসম্ভব। ইউরেনিয়াম অথবা আয়টম বোমা তৈরী করতে কাজ লাগে এমন কোন খনিজ পদার্থ অথবা ধাতু দক্ষিণ মেরুতে পাওয়া যায় না। তবে এখানে একটা কথা বলা দরকার যে, দক্ষিণ মেরুর অপর কোথায় কি কি পাওয়া যেতে পারে তার সম্পূর্ণ জরিপ হয়নি এবং সে রকম জরিপ

করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, কষ্টকর, বিপজ্জনক এবং লাভজনক নয়। ভীষণ শীতের কথা আর না-ই বা উল্লেখ করা গেল। শূন্যের চেয়ে ৮০° ত্রিগ্রী নীচে নেমে যায় শীতের মাত্রা।

মেরু প্রদেশে খাদ্যদ্রব্য সংগৃহীত করে রাখবার একটা প্রস্তাব অনেকে করেছিলেন, কিন্তু হিসেব করে দেখা গেছে যে, তাও লাভজনক হবে না, কারণ তার থেকে অল্প ব্যয়ে স্বদেশে হিমকক্ষে খাদ্যদ্রব্য রক্ষা করা যায় এবং পরিশ্রম ও খাদ্যদ্রব্য আনা নেওয়ার বিপদের আশঙ্কাও অনেক কমে।

## এড্রিচ ব্রাদার্স

আপনাদের মধ্যে যারা ক্রিকেট ভালবাসেন তারা সকলেই এড্রিচের নাম শুনেছেন। তিনি একজন খুব ভাল খেলোয়াড় এবং টেস্ট ম্যাচে ইংল্যান্ড দলের ভবিষ্যৎ ক্যাপ্টেন। কিন্তু এই এড্রিচের আরও তিনজন ভাই আছে, তারাও বেশ নাম-করা ক্রিকেট খেলোয়াড়।

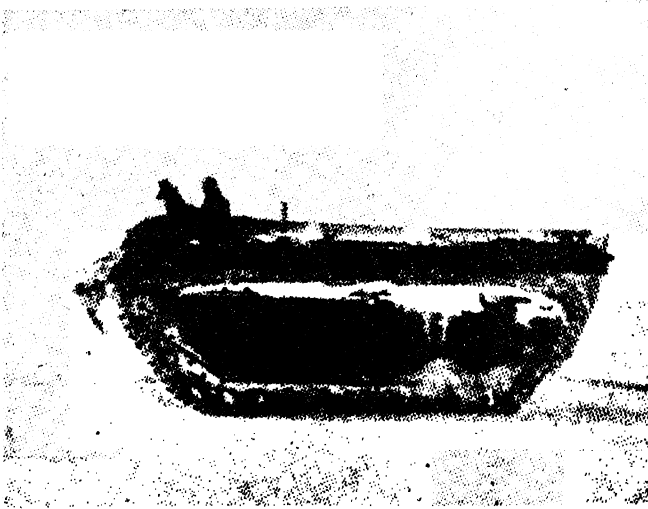


চার ভাই এড্রিচ, বিল, জিওফ্রে, এরিক ও রায়ান

এদের নাম হল জিওফ্রে, ব্যাটে বলে চেকস খেলোয়াড়; এরিক, উইকেটরক্ষক আর রায়ান, বাঁ হাতে ব্যাট করে কিন্তু বল দেয় ডান হাতে। স্বনামখ্যাত বিল এড্রিচ এদের বড়ো ভাই, সে খেলে মিডলসেক্স দলে, পরের দুই ভাই ল্যাঙ্কাশায়ার আর ছোট ভাই কেন্টে। এই চর ভাই ছাড়া এদের কাকা ও খুড়ততো ভাইদের নিয়ে এগারোজনের একটি পুরো দল তৈরী করা যায়। অনেক দিন আগে ইংল্যান্ডের উল্টার্স দলে সাত ভাই-ফস্টাররা খেলত, তখন অনেকে এই দলকে ফস্টার্সশায়ার বলত।

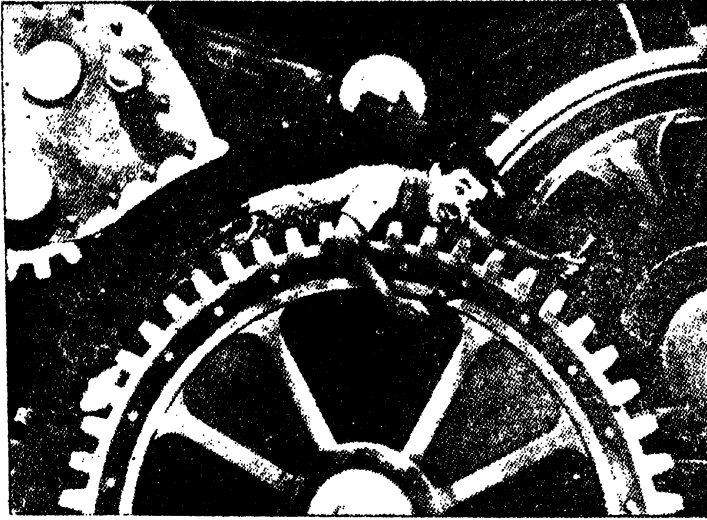
## হিটলারে গাড়ি

ফিনল্যান্ডের ভূতপূর্ব সভাপতি মার্শাল ম্যানারহাইমের ৭৫ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তিতে হিটলর তাঁকে একটি বর্মাকৃত মাসিঁডজ বেঞ্জ গাড়ি উপহার দিয়েছিলেন। গাড়ি বিশেষভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল, এর ইঞ্জিন ২৮০



দক্ষিণ মেরু অভিযানে ব্যবহৃত অ্যান্টিট্রাক নামক যান





চিনতে পারেন? মডার্ন টাইমসে চার্লি

অশ্ব-শক্তি মিশ্রিত এবং ঘণ্টায় ১২০ মাইল বেগে যেতে পারত। এই গাড়িখানি বিক্রয় করবার জন্য স্ট্রাইডেনের রাজধানী স্টকহোমে আনা হয়েছে এবং মূল্য ধার্য করা হয়েছে ৪২ হাজার ক্রাউন অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চব্বিশ হাজার টাকা।

### খাকসার আন্দোলন

খাকসার দল ভেঙে দেওয়া হয়েছে। প্রায় ১৫ বৎসর অগ্রে এই দল গঠন করা হয়েছিল। এই দলের প্রতিষ্ঠাতার নাম আল্লামা ইনায়েতুল্লাহ মাসুরিক। সংক্ষেপে আল্লামা মাসুরিক, পাঞ্জাব, কেন্দ্রীয় ও প্যারিস বিশ্ব-লয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি বহু বৎসর ইন্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসে চাকরী করেছেন। খাকসার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের সংস্কার করা, কিন্তু পরে তা ঘাটস্টদের অনুরূপ হয়ে দাঁড়ায়। খাকসার কথার অর্থ হল “মাটির মতো” অথবা নম্র। এই দলের একটি প্রতীক হল খন্ডা। সামরিক নিয়ম অনুযায়ী দলটি গঠন করা হয়েছিল। ১৯৩১ সালে খাকসারদের নাম প্রথম শোনা যায় যখন তারা লক্ষ্মী শহরে সিয়া-সুয়াদের বিরোধ মীমাংসায় সালিশীর কাজ করে। হৃত প্রদেশের সরকার এই আন্দোলনকে বে-আইনী ঘোষণা করেন এবং খাকসারদের নেতা এই আদেশ অমান্য করার জন্য তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু কমা প্রার্থনা করার তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৪০ সালে লাহোর পুলিশদের সঙ্গে খাকসারদের এক সংঘর্ষ হয়, লাহোর পুলিশ দলের দুজন কনস্টেবল মারা যায়। পাঞ্জাব সরকারও খাকসার দলকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করেন, আল্লামা মাসুরিককে দিল্লীতে

গ্রেপ্তার করেন এবং প্রায় চার বৎসর তাঁকে জেলে রাখা হয়। সেদিনও দিল্লীতে মুসলিম লীগ কন্ডেমিনেশনের মিটিং খাকসাররা ব্যর্থ করার চেষ্টা করেছিল। আল্লামা মাসুরিক একজন জবরদস্ত নেতা। দলের কেউ দোষ করলে সর্বসমক্ষে তাকে চাবুক পর্যন্ত মারা হত।

### চার্লি চ্যাপলিন প্রতিযোগিতা

চার্লি চ্যাপলিনের নাম শোনেনি এমন লোক খুব কম আছে। বহু দিন আগে তিনি একটি প্রতিযোগিতা করেছিলেন যে, তাঁকে যে অনুকরণ করতে পারবে সে একটি রূপার কাপ পাবে। এই প্রতিযোগিতায় চার্লি নিজেও কাউকে না জানিয়ে যোগদান করেছিলেন, কিন্তু প্রথম স্থান অধিকার করতে পেরেন নি, তিনি হারিয়েছিলেন দ্বিতীয়।



কোরে

সত্বর বাথ বেদনা নিরাময় করে

কোরে ইংল্যান্ডে প্রস্তুত বেদনানাশক একটি মহৌষধ। এই জাতীয় অন্যান্য ঔষধের চেয়ে ইহা শতকরা ৫০ ভাগ বেশী ফলপ্রসূ। সন্তোষ ব্যাথা-বেদনার অস্ত্রান্ত হইলেই সত্বর ফলপ্রসূ কোরে



ইহার বদলে অন্য কিছু লইবেন না। চিত্রে প্রদর্শিত-নরূপ প্যাকেটে কোরে বিক্রীত হয়। অন্য কোন জিনিষ ইহার মত ফলপ্রসূ নহে।

ট্যাবলেট ব্যবহার করিয়া শীঘ্র নিরাময় হউন। মাথাধরা, প্লাম্বেপ্রদাহ, বাত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কটিবাত প্রভৃতির নথ্য বেদনা ঈষৎ লাল বর্ণের একটি ট্যাবলেট ব্যবহারের কয়েক মিনিট পরই উপশম হয়। ৬টি ট্যাবলেটের একটি প্যাকেটের মূল্য দুই আনা। ৩০ ট্যাবলেটের একটি প্যাকেটের মূল্য দশ আনা। সমস্ত সম্ভ্রান্ত ডীলারের নিকট পাওয়া যায়।

### কোরে লিমিটেড

২৫, হ্যান্ডোভার কোয়ার্টার, লন্ডন, ডারিউ ১ ভারতবর্ষস্থিত প্রতিনিধি : জি এডারটন এন্ড কোং লিট, কলিকাতা ও বোম্বাই।

# মৌসুমী

শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

এ কেবারে মধুমুখি দাঁড়ালো দুজনে।  
প্রথমে ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারেনি  
গীতা। দীর্ঘ বিশ বছর, হ্যা, তা হবে  
বৈকি, এত বছরে সব কিছু কেমন বদলে যায়।  
লোকটিকে কিন্তু খুব চেনা লাগলো তার।  
ঘাড় ফেরাতে আর কোন সন্দেহই রইলো না।

: একি অশোকদা, তুমি।

ফুটপাথের ওপর ছড়ানো নানাজাতের  
টুকটাকি জিনিস। রঙীন চিরুণী আর  
ঝিনুরের বোতাম থেকে সরু করে ছুরি চামচ  
সুতো আর বাঁশডল। লড়াইয়ের ক'বছর প্রায়  
চোখেই দেখা যেত না এসব জিনিস। হাতের  
পেটলাটা নামিয়ে রেখে ঝিনুরের বোতাম দর  
করাইছিলো অশোক। অনেকটা সস্তাও হয়ে  
এসেছে। লোকে বলছে এসব নাকি আরো  
সস্তা হয়ে বাবে।

আচমকা ডাকে সোজা হয়ে দাঁড়ালো  
অশোক তারপর একেবারে মধুমুখি দাঁড়ালো  
দুজনে। একটু অস্পষ্টতা প্রথমে, জমাট  
স্মৃতির স্তর ভেদ করে চোখ দুটো কুঁচকে  
অনেক দূরের কিছু দেখার ভাব তারপর আর  
চিনতে বিশেষ অসুবিধা হলো না।

: তুমি—তুমি—গীতা!

গীতাই তো। সেদিনের তম্বী চটুল  
গীতা মেদ আর বলিরেখায় আজ যেন সম্পূর্ণ  
নতুন হয়ে গেছে। চেয়ে চেয়ে দেখলো  
অশোক। শুধু ওই গভীর কালো দৃষ্টি চোখ  
আর কথা বলার সপ্রতিভ ভংগী, এই দুটি  
সংকেত চিহ্ন ধরে দীর্ঘ বিশ বছর পার হয়ে  
যেতে হয়। পুরানো দিনের গীতার কথা এরাই  
মনে করিয়ে দেয়।

: তবু ভালো, চিনতে পেরেছো এতক্ষণ,  
যেভাবে চেরেছিলে, আমি ভাবলাম ভুলেই গেছো  
নিশ্চয়।

: চিনতে না পারার আর দোষ কি বলো?  
চেহারাটা যা করে তুলেছো।

: খুব মোটা হয়ে পড়েছি, না? সত্যি,  
তুতল হবার পর থেকেই বিস্তীর্ণ মোটা হয়ে  
পড়েছি—মুখের একটা সলজ্জ ভাব করলো  
গীতা। অনেকদিন আগে কিন্তু এই ভংগীতে  
ভারি মনোরম দেখাতো গীতাকে। মনে পড়ে  
গেলো অশোকের—গীতার বাম্ববী সবিভা  
এই অশোকের নাম নিয়েই কি একটা পরিহাস  
করেছিলো একদিন। লজ্জায় রাঙা হয়ে  
উঠেছিলো গীতার মুখ। আঙুলের খুঁটে

শাড়ীটা জড়াতে জড়াতে সে চুপি চুপি পালিয়ে  
এসেছিলো। বারান্দায়। কাঁপানো গলায়  
বলেছিলো : না, ভাই—তুমি ভারী ইয়ে।  
ঠিক এমনি সময়ে একেবারে অশোকের সংগে  
মধুমুখি দেখা হয়ে গিয়েছিলো। লজ্জায়  
গীতা মুখই তুলতে পারেনি। দুহাতে মুখ  
ঢেকে বারান্দার রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে  
পড়েছিলো।

: তুমিও কিন্তু অনেক বদলে গেছো  
অশোকদা। এরই মধ্যে বুড়ো হয়ে গেছো।  
ওমা, কপালের দুপাশে পাক ধরেছে চুলে।

কপালের কাছটায় আলতো একবার হাত  
বুলালো অশোক : তা চুল পাকবার বয়স হল  
বৈ কি। মেঘে মেঘে বেলা কিন্তু বেশ হয়ে  
গিয়েছে।

: সত্যি, বুড়ো হয়ে যাচ্ছি ভারতেই যেন  
কেমন লাগে, না অশোকদা? মনে হয় এই  
যেন সেদিন ছাড়াছাড়ি হয়েছে আমাদের।

বিরত হয়ে পড়লো অশোক। ছাড়াছাড়ি?  
হ্যাঁ, ছাড়াছাড়ি বৈকি একরকম। বাপকে  
লুকিয়ে চুপি চুপি হাওয়া স্টেশনে অশোককে  
তুলে নিতে এসেছিলো গীতা। ইন্টারের টাস-  
বোঝাই যাত্রীদের দৃষ্টি উপেক্ষা করে অশোকের  
পাশে বসে পড়েছিলো।

প্রথমে কোন কথা বলেনি অশোক। বাইরে  
প্ল্যাটফর্মের খড়ির দিকে চেয়েছিলো। আর  
মিনিট পঁচাত্তর দেরী গতি ছাড়বার। একবার  
প্ল্যাটফর্মের আওতা ছেড়ে গেলেই যেন সব  
কিছু নগালের বাইরে চলে যাবে নে। গীতা  
আর তার কবোফ প্রেমের আবেষ্টনী থেকে  
অনেক দূরে।

: তোমার ভাবনা কি গীতা : খুব নরম  
গলায় বলেছিলো অশোক : তোমার বাবা মা  
রয়েছেন, অজস্র বাম্ববী রয়েছে এখানে ওখানে,  
তার ওপরে রয়েছেন মনোজবানু, সমুদ্রপারের  
মাটির সোঁদা গন্ধ এখনও গায়ে লেগে রয়েছে  
তার।

অশোকের দুটো হাত জোরে চেপে  
ধরেছিলো গীতা : তুমি এমনি করে আমাকে  
আঘাত করবে অশোকদা, তুমি বলবে এই সব  
কথা!

এধারে ওধারে চেয়ে বিস্তীর্ণ লেগেছিলো  
অশোকের। জানলার ধারে বসে বোঁটি ঘোমটা  
তুলে সকলতুকে চেয়েছিলো ওদের দিকে।  
এদিকে পেটমোটা মাড়োয়ারীটা কাপড়ের

পুটলীর ওপরে পা দুটো তুলে দিয়ে গৌফ  
দুটো মচকে কেমনভাবে হাসছিলো। তাছাড়া  
গাড়িমুখ লোক যেন উপভোগ করছিলো  
দৃশ্যটা।

গীতার হাত ধরে নামিয়ে এনেছিলো  
অশোক। প্ল্যাটফর্মের এক কোণে তাকে  
নিয়ে গিয়ে বলেছিলো : ছি, একি ছেলে-  
মানুষী করছো গীতা। নিজের পায়ে না  
দাঁড়িয়ে মুখ দেখাবো না তোমাদের। মানুষ  
আমাকে হ'তেই হবে। তোমার লাভ করার  
যোগ্যতা আমায় অর্জন করতেই হবে। যদি  
পারো তো অপেক্ষা করো, আমি তোমার কাছেই  
ফিরে আসবো।

এসব কথা ভাবতে আজ যেন কেমন মনে  
হলো অশোকের। অনেকদিন পবিত্র অপেক্ষা  
করেনি গীতা। মাস ছয়কের মধ্যে বারিস্টার  
মনোজ সেনের সংগেই বিয়ে হয়েছিল। তার।  
অবশ্য ছ মাস বড়ো কম সময় নয় একটা মেয়ের  
জীবনে। আর তাছাড়া অপেক্ষা করলে কিই বা  
হ'ত পারতো। অশোক রায় কি কোনদিন  
হ'ত পারতো মনোজ সেন!

মুচকে হাসলো অশোক : তোমরা  
কলকাতার বাইরে কোথায় আছো, না গীতা?

: হ্যাঁ, এলাহাবাদে। কি বিস্তীর্ণ যে লাগে  
কি বলবো তোমার অশোকদা। কলকাতা  
ছাড়া আরও থাকা চলে নাকি কেবোও।  
বম্বার ধার আর সিভিল লাইন্স—বাস এই  
জীবনের গতি!

: তাই নাকি, আমাদের কিন্তু ভারি  
একঘেয়ে লাগে কলকাতা। জমাট ভীড়ে যেন  
জেগে যার প্রণ হাঁপিয়ে উঠে। কেবল চলা  
আর চলা—একটু থামা নেই, গতিরিত নেই  
কোথাও।

: সত্যি? কলকাতা ভালো লাগে না  
তোমার। তুমি ঠিক আগের মতনই আছো  
অশোকদা—অন্তত মনের দিক দিয়ে। কবিতা  
লেখো বুঝি আজও?

ভারি অস্পষ্ট বোধ করলো অশোক।  
আশে পাশে বেশ একটু ভীড় জমে গিয়েছে।  
জিনিস কেনবার ছলে, বাস ধরবার ছুতোয়  
উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ওদের দিকে। একটু  
দূরে একটি বুড়ো ভরলোক হাতের  
খবরের কাগজ আড়াল দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে  
রয়েছে দুজনের দিকে।

: চলো গীতা, ওই দিকটায় যাই।

: কোন দিকে? কেন এখানে কি হলো  
অশোকদা? একটু যেন ইতস্ততঃ করলো  
গীতা।

সত্যিই এবার হাসি পেলো অশোকের।  
মাত্র বছর বিশেক আগে যে ওর হাত ধরে

পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেতে বিধা করতো না একটু, আজ সে ওর পাশে পাশে দু'পা এগিয়ে যেতে ভয় পায়।

হাসলো অশোক : ভয় করছে নাকি ?

: কি বে বলো তর ঠিক নেই। তিন ছেলেমেয়ের না, আমার আবার ভয়। কীচ খুঁকী আছি নাকি আগের মত ?

তা ঠিক। খড় আর কুটো দিয়ে সুদৃঢ় নীড় গড়ে তুলেছে মাটি থেকে অনেক উঁচুতে পঙ্কজিত এক শাখায়। আজ অর ভয় নেই।

একটু এগিয়েই এক চিলতে পাক। কয়েকটা কুম্ভচূড়া আর বিলিতি সুন্দুরী পাখের সার। ছায়ার আঁচড় এখানে ওখানে। একটা বেগুণ বসে পড়লো অশোক। পেটীলাটা পাশে রাখলো।

: বসো; দাঁড়িয়ে কেন ?

বসতে একটু দেরী করলো গীতা। ওই ময়লা বেগুণ বসলে দামী শাড়ীটার পদার্থও থাকবে না। ত ছাড়া কাঠের বেগুণ অশোকের পাশাপাশি বসতে কেমন যেন লাগলো তার। খোঁচাখোঁচা দড়ি, ময়লা জামাকাপড় আর পেটীলা সব কিছু মিলে কেমন যেন কুণ্ডলিত একটা আবহাওয়া। ভালো লাগলো না গীতার। অন্যায়সেই এড়িয়ে যাওয়া চলতো একে। বাসের জানালা দিয়ে দেখে হঠাৎ লালিষে নেমে পড়বার মত এমনকি রয়েছে লোকটার মধ্যে? রাজপথের হাজার জনতার সঙ্গে সহজেই মিশে যেতে পারে অশোকনা—চেনবার উপায় থাকবে না, মোড়বার উপায় থাকবে না, কোন বৈশিষ্ট্য নেই এর মধ্যে। অশোকনা আজকাল কি করছে কে জানে!

: তুমি এখন কাজকর্ম কিছু করছো অশোকনা, না আগের মতন ফ্রম-ডাইয়ে রয়ছো ?

ছমছাড়া! গীতা বলতে পারলো এই কথা। কথাটার মধ্যে কোথায় যেন খোঁচা ছিলো একটা। অশোকের ত্বকে গিয়ে বিখলো তার ধারলো দিকটা।

: খুব ছমছাড়া ছিলাম বাকি আগে ?

: ওমা, ছিলে না আবার। দেশ উন্মাদ করার কি হুজুগে। মনে আছে অশোকনা আমাদের বাগানে নিশান পুতে রাজের ড্রাইভার চাকর, মালীদের জুটিয়ে লেকচার দেওয়ার কি ধুম! ভাগো তোমরা, মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। এ দেশের প্রত্যেক ইঞ্চি মাটিতে আমাদের জন্মগত অধিকার। তোমাদের দাবী জানাও মাথা উঁচু করে : কথার সঙ্গে হাসির ধমকে লুটিয়ে পড়লো গীতা। হাসির চোটে চোখে জল এসে গিয়েছিলো। রুমাল দিয়ে চেখের কোণদুটো মুছতে মজ্জত বললো : উনি বলেন এ সব বাক্সে সেন্টিমেন্ট। কালের পাতায় এর দাম নেই কোন।

: কে বলেন? খব্দু হয়ে উঠলো অশোক।

: উনি মানে, ইয়ে, বেবীর বাবা বলেন।

বেবী আমার বড়ো মেয়ে—সঙ্গে সঙ্গে যোগ করে দিলো গীতা।

হাসলো অশোক। খুব আশ্চর্য বললো : উনিশ শো বিয়াল্লিশও কি একটা বাক্সে সেন্টিমেন্ট তোমার মনোজবাবুর কাছে? অত আলো আর আগুনে কোনদিনই কি একটু চমক লাগেনি তোমার বেবীর বাবার মনে? খুব নিরুদ্বেজ গলার স্বর অশোকের কিন্তু কোথায় যেন লুকানো রয়েছে একরাশ স্বাভাবিক।

: এক ব্যাপারে তুমি কিন্তু আগের মতনই আছো অশোকনা। কি তবুই করতে পারো! মাথা নেই, মূর্খু নেই, কেবল তর্ক! যাক গে আমার কথাটা কেবল এড়িয়ে যাচ্ছে তুমি।

: কি কথা? মূর্খটা তুললো অশোক।

: কি করছো বলো না আজকাল।

: একটা কাগজে কাজ করাছি।

: কাগজ, মানে খবরের কাগজ? ভুঝু দুটো যমসম্ভব উঁচুতে তুললো গীতা : সে তো বিক্ৰী কাজ। নাইনেও তো বন্ড কম শুনোছি সেখানে।

: সকলে আরিটারী করার মত বিদ্যা আর বুদ্ধি নিয়ে কি আর জন্মায়?

কথাটার খোঁচাটার দিকে লক্ষ্যও করলো না গীতা। অসমী দয়া আর অপরিসমী দমতার ও তরল হয়ে এলো। ভারি কষ্টে তা হাল্কা আছে তো অশোকনা। এই চিন্তার পাশাপাশি আর একটা চিন্তা উর্কিঝুঁকি দিলো ওর মনে। যৌবনের কোঁকে এই অশোকদার হাত ধরে চলতে সুরু করলে কোথায় শেষ হতো সেই চলার। ধূসে পড়া দেয়াল, জীর্ণ বিবর্ণ ঘরের এক কোণে গোটা কয়েক বৃন্দ অর্ধ নগ্ন ছলে-মেয়ের পাল—এই হতো ওর জীবনের পরিধি। সত্যি, কি ভীষণভাবে খিঁচিলে গেছে ও এই জন্মদা অপমানের হাত থেকে। রুমাল ছুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে সুরু করলো গীতা। গরমটা গরম। গাছের ছায়াতে বসেও যেমনে উঠছে। ঘাড় আর চিবুকের খাঁজে কেমন একটা চটচটে ভাব।

বেবী আর তুতুল হয়তো চুপচাপ বসে আছে হোটেলের জনলাব ধারে ওরই প্রতীক্ষায়। সজিত আসে নি। ওর বাপকে কি অসম্ভব ভালোবাসে ছেলেটা, কিছুরেই আসতে চাইলো না মায়ের সঙ্গে। কি দুঃস্টই হয়েছে তুতুলটা। ঠিক ওর বাপের মত কথা হয়েছে চেখের তারা দুটো আর কেমন হাসে কথায় কথায়।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো গীতা। আড় চোখে তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলো অশোক। দামী শাড়ী, রক্ত, স্নো, পাউডারে যৌবনকে ধরে রাখার কি হাসাকর প্রচেষ্টা। আভিজাত্যের খোলসের চাপে ওর মনও ছোট হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু একদিন কত আশাই না সে রেখেছিলো এই গীতার ওপর।

প্রথম দিনের দেখার কথা আজও শক্ততার মত জ্বল জ্বল করছে ওর মনে। মেয়েদের কি একটা মিটিং। প্রচুর ভীড় হয়েছে। সভার ঘর ছাঁপিয়ে জনতার স্রোত পথের ওপর এসে পড়েছিলো। পাথের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দেখার চেষ্টা করেছিলো অশোক। অনেকক্ষণ চোখ ফিরাতে পারেনি। বাসন্তী রংয়ের খন্দরের শাড়ী আর সেই রংয়ের স্ট্রাইপে অপব্রূপ দেখিয়েছিলো গীতাকে। গানের কথা-গুলো আজ আর ভালো মনে নেই অশোকের কিন্তু হাত তোলার ভঙ্গীটুকু আর টানা কালো দুটি চোখ আজও মনে গেঁথে আছে। অনেক কিন্তু বদলে গিয়েছে গীতা। কথায় বাতায়, চালচলনে আগের দিনের কিছুই কি অবশিষ্ট নেই!

: তুমি অনেক দিন পর কলকাতায় আসলে, না গীতা : কথার মোড় ফেরাবার চেষ্টা করলো অশোক।

: হ্যাঁ, বাবা মারা যাবার পর আর আসি নি। বাবার সঙ্গে তোমার আর দেখা হয়নি অশোকনা?

আবার দিক্‌ভাঙ্গে বাকি ফিরলো কথার স্রোত। ঠিক যে দিকটা এড়িয়ে চলতে চায় অশোক, সেই দিকটা বাব বার খুঁচিয়ে সামনে তুলে ধরে গীতা। এ সব তো অনেক দিনের কথা। কি দরকার এমনি করে জল ফোলাবার। পুরানো কেসে কথাগুলো ঘুরপাক খেয়ে এখন উঠে আসবে ওপরে। পাকি আর কাদায় নেংটা হয়ে উঠবে সব কিছু। কিন্তু ছাড়লো না গীতা।

: না, আর দেখা হয়নি গীতা। দেখা করার মত সাহস সংগে করে উঠতে পারিনি। তা'ছাড়া তোমার ম' মারা যাবার পর থেকে শব্দেছিলম যে দিনরাত তিন মনে ভুলে থাকবো না। মারা গেলে 'ত' জিভারের বেগে ?

: হ্যাঁ, একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো গীতা। সত্যি, থাক এ সব কথা।

: মনোজবাবুর সঙ্গে শেষ সময়ে তোমার বাবার দেখা হয়েছিলো নাকি ?

মাথাটা নাড়লো গীতা : না, ওর সঙ্গে কিছুদিন ধরে মন কষাকষি একটা চলেছিলো। উনি এদিকে ভারি কড়া লোক। নিজের আদর্শকে সব চেয়ে বড় বলে মনে করেন। ওর আদর্শকে আড়াল করে দাঁড়ালে কারুর নিষ্ঠার নেই।

হাসি পেলে অশোকের। মনোজ সেনের আদর্শ। ওর ইতিহাস অজানা নেই তার। বিধবার একমাত্র মেয়েকে অশেষ আশ্বাস দিয়ে তারই পরসায় বিলত ঘুরে আসা থেকে সুরু করে এগাবে এসে তাকে না চেনার ভান করে এড়িয়ে যাওয়ার খুঁটিনাটি সব কিছুই জানে।

এই মনেজের সম্বন্ধে একদিন কি ধারণা ছিলো। গীতার সে কথাও মনে পড়লো। কিন্তু আজ আর এ সব কথা বলা চলে না। ওর শিরা-উপশিরা ছড়িয়ে আছে মনোজ সেনের সত্তা। একই শিকড় থেকে যেন দুটি লাভ করছে দু'জনে। ওরা অবিচ্ছিন্ন।

একেবারে অন্য কথা আরম্ভ করলো অশোক : মনোজবাবু এসেছেন নাকি সঙ্গে ?

: না, ওর কোথাও বেরোনো ভারি মূর্খবল। কাজের চাপে নিঃস্বাস ফেলবারই অবসর নেই তা ছাড়া সভাসমিতি লেগেই আছে। দু'দণ্ড আমার সঙ্গে কথা বলবারই কি ফুরসৎ আছে ?

: সত্যি? হাসার চেষ্টা করলো অশোক : তোমার তো তা হলে ভারি কষ্ট। একেবারে একলা কাটাতে হয় সারটা দিন।

: পাগল নাকি তুমি? গল্প করে কাটানোর সময় আমারই আছে নাকি একটুও। সকাল থেকে বেবী আর সন্ধ্যাতের স্কুল যাবার তাড়ায় সারাক্ষণ নৌ-কাঁপ করতে হয়। তারপর ছোট মেয়ে তুলল, কি অসম্ভব দৃষ্টে হয়েছে মেয়েটা। তুমি ব্যস্তনাও করতে পারবে না অশোকদা। আয়া থাকলে কি হবে, সেই আমকেই চান বরাতে হবে খাওয়াতে হবে, ঘুম পাড়াতে হবে, সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে।

চেয়ে চেয়ে দেখলো অশোক। ওর ঠাস-বুনান সংসার যন্ত্রায় একটু ফাঁক নেই, অবসর নেই একান্ত। সংসারের সহস্র প্রয়োজনে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে গীতা, নিশ্চয়ই হয়ে গেছে।

: আজ তোমার সময় হবে অশোকদা? গীতার আচমকা প্রশ্নে একটু থতমত খেয়ে গেলো অশোক। সময়? কি জানি ওরও হয়ত সময় নেই!

: কেন বলো তো?

: চলো না আমার সংগে, বেবী আর তুতুলকে দেখে আসবো।

: এ বেলা নয়, বড় কড়া রোদ উঠে গিয়েছে। বিকালের দিকে চেষ্টা করে দেখবো না হয়।

সত্যি খুব কড়া রোদ উঠে গিয়েছে। বেশীক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না পিচ ঢালা রাস্তার দিকে। কি বিদ্রী, গরমই পড়েছে কতদূর থেকে। ষটখটে আকাশ, মেঘের চিহ্ন-মাত্রও নেই। অন্য বছর এমনি সময়ে কিন্তু বৃষ্টি নামে দাঁক পশলা। এদিক ওদিক থেকে চাপ চাপ কালো মেঘ জমে আর কালবৈশাখী হঠাৎ বর্ষণ শুরু হয়। এখানে বসলে ভিজে মাটির সৌন্দর্য পান্ডা যায়। এ বছর কিন্তু বৃষ্টির নামমাত্র নেই। চিড় খেয়ে ফেটে ফেটে গেছে পাকের মাটি,—শুকনো ঘাসের চাবড়া এখানে ওখানে।

ওর সম্ভ্রান্ত সংসারের মধ্যে অশোককে

নিয়ে যেতেই চায় গীতা। নিটোল সংসার আর স্বাপ্নাঙ্কজল সন্তানসন্ততির মাঝখানে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করুক অশোক, ও আজ কত সুখী। সেদিনের সে উত্তেজনার কোন দামই নেই ওর জীবনে।

: তুমি কতদিন পরে ফিরলে অশোকদা?

: কোথা থেকে? প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারলো না অশোক।

: ওই যে দিল্লী না কোথায় গিয়েছিলে?

: দিল্লী পর্যন্ত আর পেঁছাতে পারলাম কোথায়।

: কেন?—সোজা হয়ে বসলো গীতা। এক বলক রোদ এনে পড়েছে কাঁধের ওপর। অশোকের দিকে আর একটু সরে বসলো।

: সে এক বিদ্রী ব্যাপার হয়ে গিয়েছিলো। সে আর নাই শুনে তোমি,—এঁড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলো অশোক।

: না, না, শুনিয়ে না। তোমার যদি বলবার ইচ্ছা না থাকে তো অন্য কথা। আমার শোনার জন্য জেদ করা অবশ্য ঠিক হবে না। একটু বেন প্রচেষ্টা অভিমান, পুরানো আবদারের ভংগী।

: না, সেরকম গোপন কিছুই নয়। তবে বেলা হয়ে গেছে, তোমার সময় নষ্ট হবে মিছামিছি।

: কি আর এমন বেলা হয়েছে। তা ছাড়া, হলোই বা একটু বেলা। কতদিন পরে তোমার সংগে দেখা বলা তো অশোকদা।

কথা আর বাড়লো না অশোক : আমাদের গাড়ীতে একটি ভদ্রলোক উঠেছিলেন তাঁর মেয়েকে নিয়ে। যাবেন বেনারস পর্যন্ত। কথায় কথায় আলাপ হলো। ভদ্রলোক অবনত নিয়োগে চাকরী থেকে। পরিবার নেই। মেয়েকে তার মামার বাড়িতে রেখে তাঁর পথটিকে বেরোবেন এই ইচ্ছা।

: ছোট মেয়ে বাম? রোজটা সরে এসেছে একেবারে গীতার চোখের ওপর। কক কক করে জ্বলে উঠলো তার চোখদুটো। এবার কিন্তু আর সরে বসলো না সে।

: বিশেষ ছোট আর কই। এই বছর যোল সত্তরো হবে, অন্ততঃ তাই তো মনে হ'লো। যাক, মোগলসরাই স্টেশনে পেঁছলাম যখন, তখন মেয়েটির ভারি তেঁতা পেয়েছে। সংগের জল শেষ হয়ে গেছে। ভদ্রলোক কুঁজো হাতে করে নিজেই নামলেন স্টেশনে। উনি আবার কারোর জোঁয়া জল খাবেন না। বাস, যা হবার তাই হ'লো।

: মানে, কি হ'লো তাই বলো : সোজা হয়ে বসলো গীতা। গাড়ীর অটলটা মূর্খো করে ধরলো। কুণ্ডিত হ'লো কপালের ঝলকো।

: গাড়ী ছাড়বার সময় হ'লো, এদিকে ভদ্রলোকের দেখা নেই। মেয়েটিও চণ্ডল হয়ে

উঠলো। ঠিক গাড়ী ছাড়বার সংগে সংগে দেখা হলো ভদ্রলোককে—প্রাণপণে ছুটে আসছেন। গাড়ীর হাতলটা ধরেওছিলেন ঠিক, কিন্তু হঠাৎ কি হলো। পিছলে গেলো হাতল আর ভদ্রলোক একেবারে গাড়ীর তলার।

: ওমা, কি সর্বনাশ,—নিজেকে আর চাপতে পারলো না গীতা। বেগের হাতলটা শক্ত করে ধরলো। ওখ সারা শরীর কেঁপে উঠলো। যাবার সময়ে খুব সাবধান হয়ে যেতে হবে। তুতুলটা জানলা দিয়ে কি বিদ্রীভাষে ঝুঁকতে চায়। বারণ করলেও শোনে না। আর বেবীকেও 'প্ল্যাটফর্মে' একেবারে নামতে দেওয়া হবে না। চাকরের সংগেও না। কিছু একটা হয়ে গেলে মনোজের কাছে মুখ দেখানো হবে না কি। কতো রাগরাগি করে তবে, আসছে দিয়েছে কপকপাতায়।

: পুলিশ, হাসপাতাল, মর্গ সমস্ত পার হয়ে দাঁড়িলাম মেয়েটির পাশাপাশি। আশে পাশে আর বিশেষ কাউকে দেখা গেলো না। বুঝতেই পারছো অবস্থা। মেয়েটিকে নিয়ে বেনারস যাওয়া ছাড়া আর কোন পথই রইল না।

: তোমার আবার সবততে বাড়াবার অশোকদা। কেন এত বড় মেয়ে একলা থেকে পারতো না বুঝ?

চেয়ে চেয়ে দেখলো অশোক। রক্ত আর পাউডারের প্রলেপ উঠে গিয়েছে জায়গায়, জায়গায়। কুঁচকে এসেছে চোখের দু'পাশ। এত ছোট চোখ নাকি গীতার? সমস্ত প্রসঙ্গিত রূপসজ্জার ফাঁক দিয়ে বয়সের কালো ছায়া উঁকি দেয়। সীমান্তরেখায় এসে পেঁছেছে গীতা,—ওপারে জরার দেশ।

: বেনারসে গিয়ে এক বিপত্তি। ওর মামা কোন ঝাঁকই ঘাড় নিতে চাইলেন না। এমন কি আমার সংগে যাওয়াতে মন্তব্যও করলেন দু'কটা। এত বড় মিৎগী মেয়ের কোন ভার তাঁরা নিতে পারবেন না। সাতজন্মে খোঁজ নেই, বিপদকালে মামা! প্রায় মূখের ওপরই দরজা বন্ধ হয়ে গেলো।

: তারপর?

: মেয়েটি বললো, ছেড়ে দিন আমাকে। গঙ্গার জলে আমার আশ্রয় মিলবে।

: তাই দেওয়াই উচিত ছিলো। ও সব মেয়ের তো এই কাজ। তারপর বোঝা যাউ থেকে নামালে কি করে তাই বলো?

কথার কোন উত্তর দিলো না অশোক। পেটলিটি হাতে তুলে নিলো : অনেক বেলা হয়ে গেলো তোমার গীতা। খাওয়া দাওয়া করতে খুব বেলা হয়ে যাবে।

: না, না, বেলা আর কি, তবে মেয়ে দুটো বাসে থাকবে আমার অপেক্ষায়, এই যা।

: তুমি কদিন থাকবে এখানে?

: সর্বনাশ, কদিন থাকবো মানে? কালই

হেতে হবে। তিনি না হলে বস্তু রাগ করবেন। কিছুতে কি আসতে দেন। সত্যি, কি বলবো তোমায় অশোকদা, এত বড় ব্যারিস্টার হ'লে কি হয়, আমার কাছে একেবারে শিশুর মত অসহায়। তবু ভালো, তোমার সংগে দেখা হ'য়ে গেলো। তোমার কথা মাঝে মাঝে বলাবলি করতাম আমরা।

: তাই নাকি, বলাবলি করতে তোমরা? কি রকম?

: বলাবলি মানে উনি বলতেন আর কি। কোন স্বদেশী মিছিল টিছিল গেলে বাড়ির সামনে দিয়ে, উনি ঠাট্টা করে বলতেন, দেখোনা ভালো করে খুঁজে, তোমার অশোকদা হয়ত আছেন এর মধ্যে। আচ্ছা, এসব হুজুগ তুমি একেবারে ছেড়ে দিয়েছো না?

এ কথা আর কোন উত্তর দিলো না অশোক। এগোতে এগোতে বললো: দুলার বারান্দা থেকে মিছিল দেখতে কিন্তু বেশ লাগে না গীতা? স্বামী আর সন্তান পাশে নিয়ে সিনেমার রূপালী পর্দায় জমাট ছবি দেখার মত?

: তোমার অত হেঁয়ালী বৃদ্ধি না বাপু। চলো যাওয়া যাক।

পাকের গেট পার হ'য়ে রাস্তার ওপর এসে দাঁড়ালো দু'জনে। ভালো করে লক্ষ্য করলো এবার গীতা। অশোকের পাঞ্জাবীটা অনেকখানি ছেঁড়া ঘাড়ের কাছে। পরনের কাপড়টাও বিশ্রী ময়লা। তবুও না বলে পারলো না গীতা: আজ বিকালে যাচ্ছে তো অশোকদা। দশ নম্বর ঘর, সোজা উঠেই বাঁ হাতি। ম্যানেজারকে বরং জিজ্ঞাসা করে নিও, মিসেস সেন কোন কামরায় রয়েছে। একবার মনে হ'লো গীতার এ কথাটাও যোগ করে দেয়: আজ আরও দু'একজন দেখা করতে আসবে। ও'র এখানকার মাদ্রাসারী মক্কেল-বাড়ির মেয়েরা। তাদের জড়োয়া গহনা আর জমকালো শাড়ীর পাশে খেমানান ঠেকবে ছেঁড়া বস্ত্রের জামা-কাপড় আর অসংস্কৃত চেহারা। কিন্তু অনেক ভেবে এ কথাটা আর বললো না গীতা: যেও কিন্তু, বিকালের দিকে—জরুরী কোন কাজ না পড়ে গেলে থাকার চেষ্টা করবো।

: কিন্তু আজ বিকালে কি যেতে পারবো গীতা।

: কেন?

: কথাটা আমার মনেই ছিলো না। আজ বিকালে আবার আমার বড় মেয়েটিকে দেখতে আসার কথা: গঙ্গার আওয়াজে গান্ধীরেণ রেশ।

: তোমার বড় মেয়ে? দেখতে আসবে তাকে, মানে, তুমি বিয়ে করেছ নাকি? আগ্রহে যেন ফেটে পড়লো গীতা। একটা হাত দিয়ে ঝোঁকের মাথায় চেপে ধরলো অশোকের ময়লা

পাঞ্জাবীর হাতা: কই, কিছুই তো জানি না। কোথায় বিয়ে করেছে?

: জানাজানি করার মত ঘটা করে বিয়ে অবশ্য করিনি। যে মেয়েটির কথা বলছিলাম, তাকেই বিয়ে করেছি। তোমার কাছে বলতে আমার আপত্তি নেই, প্রথম নজরেই মেয়েটিকে কেমন বেন ভালো লেগে গিয়েছিলো।

তর্জনীর ইংগিতে সগর্জনে থেমে গেলো একটা দুল্লা বাস। পাদানীর ওপর উঠে ডিড়ের মধ্যে আবশ্য হয়ে গেলো গীতা। বিদায়সম্ভাষণ করারও অবসর পেলো না অশোক।

রাস্তার ওপারে লাল বাড়িটার পিছনে কালো মেঘের সার জমাট বেঁধেছে আকাশে। ভীষণ জোর বৃষ্টি নামবে। কিংবা নাও নামতে পারে বৃষ্টি। কালবৈশাখীর ঝোড়ো

হাওয়ায় অন্য দিনের মত এখনি হয়ত এদিকে ওদিকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়বে মেঘের টুকরো। ধুলোর কাপটায় চারদিক অন্ধকার হয়ে যাবে।

গ্যাসপোস্টে হেলান দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো অশোক। অনেক দূরে চলে গেছে দুল্লা বাসটা। দেখা যায় না ভালো করে। আশ্চর্য, এই মেয়েটার জন্য সারাটা জীবন সে নষ্ট করলো। এরই জন্য ওর ঘর আজও শূন্য—হয়ছাড়া বাযাবরী জীবনযাত্রা। বেশীক্ষণ কিন্তু দাঁড়াতে পারলো না অশোক। পেটলাটা বুকে তুলে নিলো। ঠাণ্ডা হাওয়ার বলক আসছে। কি জানি, হঠাৎ যদি বৃষ্টি এসে যায়, সমস্ত কাগজপত্র ভিজে যাবে। ইন্তাহারগলো আজই দিয়ে আসতে হবে সংঘের অফিসে।

কালি ও সর্দিতে

সিরোলিন

রাতি

পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহৃত হয়

## পরলোকে হরেন ঘোষ

গত ৯ই জুলাই বুধবার কলিকাতার সুবিখ্যাত গীতিনাট্য ও নৃত্যশিল্পের প্রযোজক শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষ অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় মারা গেছেন।

তার এই আকস্মিক অকালমৃত্যুতে বাঙলা তথা ভারতের কলা-শিল্পের যে অপূরণীয় ক্ষতি হল সে বিষয়ে সন্দেহের কণামাত্র অবকাশ নেই। স্বদেশে ও বিদেশে ভারতীয় নৃত্যশিল্পের প্রচার ও প্রসারের জন্যে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। আমাদের জাতীয় জীবনের শিল্প-সংস্কৃতির অন্যান্য বহু বিষয়ের মত জাতীয় নৃত্যশিল্পের পুনরুজ্জীবন ও সম্প্রসারণে রবীন্দ্রনাথের দান অবিস্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নৃত্য বিষয়েও সুটিমূলক প্রতিভা ছিল। হরেনবাবু সে প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। তবে নতুন নৃত্য-প্রতিভা আবিষ্কারে ও তার প্রচারে তাঁর দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। অনেক সময় এমন হয় যে, যাদের মধ্যেই প্রতিভা ও সম্ভাবনা থাকে, তাবও উপযুক্ত সুযোগ ও স্বীকৃতির অভাবে অবহেলিতই থেকে যায়। উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা পেলে তাদের প্রতিভারও সম্যক বিকাশ হতে দেখা যায়। হরেনবাবু ছিলেন খ্যাতি জুড়রী। যাদের মধ্যে নৃত্য-প্রতিভা আছে এবং তাঁরা সম্ভাবনা সূত্রে হয়ে আছে তাঁদের তিনি খেঁজে বের করতেন এবং জনসমাজে পরিচিত করিয়ে দিতেন। আজকের দিনে সারা ভারতে এমন অনেক খ্যাতনামা পুরুষ ও স্ত্রী নৃত্য-শিল্পী আছেন, যাদের সূত্রে শক্তির বিকাশ ও খ্যাতি লাভের পিছনে হরেনবাবুর প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষ দান ছিল।

নৃত্যশিল্পের প্রয়োজনকে হরেনবাবু ব্যবসায় ও জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করছিলেন সত্য; কিন্তু নিচক পেশাদারী বুদ্ধিই তার পিছনে একমাত্র অনুপ্রেরণা ছিল না। ভারতের দীর্ঘস্থায়ী ঐতিহ্যে পরিপুষ্ট নৃত্যশিল্পকে তিনি প্রকৃতই প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন এবং ভারতীয় নৃত্যের বিচিত্র শিল্পরূপকে জন-সমাজের কাছে পরিচিত করার একটা মহত্তর প্রেরণাও তাঁর মধ্যে ছিল। ব্যবসায় বুদ্ধির সঙ্গে প্রকৃত কলারসিকের শিল্প-প্রীতি তিনি একত্র সম্মিশ্রিত করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি নৃত্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করতে পেরেছিলেন।

ভারতীয় নৃত্যশিল্পের সম্প্রসারণে হরেন ঘোষের দান দুটি দিক থেকে বিশেষ স্মরণ-যোগ্য। প্রথমতঃ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ও দ্বিতীয়তঃ ভারতের অন্তর্ভাগে। উন্নয়নশীল ও অন্যান্য ভারতীয় নৃত্য সম্প্রদায় নিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় একাধিকবার ভ্রমণ করে তিনি যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তা সর্ব-

# বঙ্গভাষা

জনবিধিত। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন শহরে দিনের পর দিন যে সাফল্যের সঙ্গে এই সব নৃত্যকলার অনুষ্ঠান হত, তার পিছনে যেমন ভারতীয় নৃত্যশিল্পীদের নৃত্য-নৈপুণ্য ছিল, তেমনই ছিল হরেনবাবুর প্রয়োজনা-কৌশল ও প্রচার-নৈপুণ্য। ভারতের অভ্যন্তরেও তিনি প্রদেশ থেকে প্রদেশান্তরে বিভিন্ন ধারার নৃত্য প্রযোজনা করে বেড়াতেন। আমাদের জাতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনে ও শ্রীলঙ্কা সাধনে এই জাতীয় নৃত্যানুষ্ঠান কম প্রেরণা জোগায়নি। বাঙলার নৃত্যশিল্প দেখে যেমন বোম্বাইর নৃত্যশিল্পীরা প্রেরণা পান, তেমন দক্ষিণ ভারতের কণাকলি বা ভায়ত-নাট্যম দেখেও বাঙলার নৃত্যশিল্পীরা নতুন নতুন শিল্পরূপ উদ্ভাবনে প্রেরণা পেয়ে থাকেন। হরেনবাবুর উদ্যোগে কলিকাতাবাসী কলা-রসিক সম্প্রদায় প্রায় প্রতি বৎসরই এই মহা-নগরীতে ভারতের কোন-না-কোন প্রদেশের বিশিষ্ট নৃত্যকলা দেখার সুযোগ পেতেন। হরেনবাবুর শোচনীয় মৃত্যুতে কলিকাতার কলা-রসিক সম্প্রদায়ের অপূরণীয় ক্ষতি হল।

বাঙলার চর্চাচিত্র শিল্প এবং সাংবাদিকতাও হরেনবাবুর দান থেকে বঞ্চিত ছিল না। নির্বাচ-সঙ্গে বাঙলার ছাত্রাচারি জগতের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তারপর নৃত্য প্রযোজনার কাজে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ায়, তিনি ছাত্রাচারি জগৎ থেকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু চিত্র জগতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বা প্রীতির ব্যত্যয় হয়নি। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে যিনি পুনরায় চর্চাচিত্র জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে-ছিলেন। সাংবাদিক জগতে তাঁর আবির্ভাব দেখি আমরা মগ্ন ও পন্দর সুখিত। সাংবাদিক 'নাচঘর' পরিবার অন্যতম পরিচালকরূপে। সর্বপ্রকার সুকুমার শিল্পের চর্চা ও আলোচনাই ছিল 'নাচঘর' প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। সাংবাদিক, পাক্ষিক ও মাসিকরূপে এই পরিবারখানি অনেক দিন বাঙলার শিল্প রসিক জনসমাজের কাছে নন্দাদূত ছিল।

তাঁর বহুমুখী চরিত্রের অনেক দিনের কথা বললেও পরিপূর্ণ মানসচিত্রের কথা থেকে যায় অপূর্ণ। তাঁর সম্পর্কে আমার সুযোগ যদিও হয়েছিল, তাঁরই শব্দ জানেন মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন কত উজ্জ্বল। এমন আদর্শবাদী, অমায়িক চরিত্র, সন্মোখী বক্তৃতা সহজলভ্য নয়। তাই শিল্পী সাংবাদিক যারাই একবার তাঁর সম্পর্কে আসছেন তাঁরই তাঁর প্রতি গভীর আস্থা অনুভব করতেন। গায়ক, নৃত্যশিল্পী, অভিনেতা-অভিনেত্রী সকলেরই তিনি ছিলেন

বিশ্বাস ও প্রাণের পাথর। গভীরভাবে তার সম্পর্কে এসেছিলাম বলে তাঁর মৃত্যুতে আত্মীয় বিয়োগের ব্যথা অনুভব করা হল সেও অতৃষ্ণ হয় না। অদূরভবিষ্যতে বাঙলার তাঁর মজ বা তাঁর চেয়েও বড় নৃত্য-প্রযোজকের সংখ্যা আমরা পেতে পারি—কিন্তু মানুষ হরেন ঘোষকে আমরা আর আমাদের মধ্যে ফিরে পাব না। ভারতীয় কলাশিল্পের ক্ষতির কথা স্মরণ করে অশ্রুভারাক্শত চিন্তে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

## স্টুডিও সংবাদ

একটি সংবাদে প্রকাশ যে, নারায়ণ প্রডাকশন্স নামক একটি চিত্র-প্রতিষ্ঠান "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন"কে কেন্দ্র করে একটি চিত্র নির্মাণে হাত দিয়েছেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন আমাদের দীর্ঘস্থায়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। তা ছাড়া এই কাহিনীর মধ্যে চিত্রোপযোগী নাটকীয় মাত্রা-মশলাও যথেষ্ট আছে। এদিক থেকে নারায়ণ প্রডাকশন্সের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই! কিন্তু সংগে সংগে আর একটা কথাও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনা বেশী দিনের পুরনো নয়। যারা এই দুঃসাহসিক বৈশ্বাসিক প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের কয়েকজন এখনও আমাদের মধ্যে জীবিত আছেন। সুতরাং নারায়ণ প্রডাকশন্সের এই প্রচেষ্টাকে বাস্তবায়ন ও সফল করে তুলতে হলে এঁদের রসিক সাহায্য ও সহযোগিতা সহযোগিতা আমরা অপরিহার্য বলে মনে করি। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার শ্রীযুক্ত অম্বিকা চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত অনন্ত সিং ও শ্রীযুক্ত গণেশ ঘোষের একটি নিবৃত্তিতে প্রকাশ যে তাঁরা নারায়ণ প্রডাকশন্সের আলোচ্য প্রচেষ্টার সম্পর্কে কিছুই জানেন না। আমরা আশা করি নারায়ণ প্রডাকশন্সের কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সজাগ হবেন এবং তাঁদের হাতে পড়ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কাহিনী যাতে শেষ পর্যন্ত প্রহসনে না দাঁড়ায় তার জন্যে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

\* \* \* \* \*

শ্রীযুক্ত নীতিন বসুর পরিচালনায় এস-বি প্রডাকশন্সের "দৃষ্টি দান" চিত্রের কাজ নিউ থিয়েটারের ২নং স্টুডিওতে যথারীতি এগিয়ে চলছে। রবীন্দ্রনাথের "দৃষ্টিদান" গল্পটির সঙ্গে বাঙলার পঠক-পাঠিকারা যথেষ্ট পরিচিত। এই গল্পটিকে চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত করেছেন শ্রীমজুমদার দাস। অমিতবরণ ও সুনন্দা দেবী নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করতেন। আমরা আরও কেমন সুখী হলাম যে, এই প্রতিষ্ঠানটি বঙ্গমহাশয়ের প্রখ্যাত উপন্যাস "দেবী-চৌধুরণীকে" চিত্রে রূপান্তরিত করার প্রয়াস পাচ্ছেন। চিত্রনাট্য রচনার ভার পড়েছে

শ্রীসজনীকান্ত দসেরই উপর। “দেবী-চৌধুরাণী”র নাম ভূমিকায়ও অভিনয় করবেন সুন্দরী দেবী।

কে সি দে প্রডাকসনের “পূর্ববী” নামক চিত্রের চিত্রগ্রহণ কার্য অতি দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন চিত্ত বসু এবং নারিকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন সন্ধ্যাংগী। আধুনিক ও মার্গ সংগীতের মধ্যবর্তী বিরোধকে কেন্দ্র করে এই গীতিচিত্রের কাহিনী গড়ে উঠেছে বলে প্রকাশ। কাহিনীকার “সংগ্রাম-খাত নিতাই ভট্টাচার্য”।



ক্যালকাটা টাকজের ‘মার্জিত বংশধর’ নারিকার শ্রীমতী গীতিগ্রী

শ্রীকালীপ্রসাদ ঘোষের পরিচালনায় তারানাথকরের ‘খাতী-দেবতার’ চিত্রগ্রহণের কাজ দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন ছায়া দেবী, অঞ্জলি রায়, শম্ভু মিত্র প্রভৃতি। কয়েকজন নবগত অভিনেতা অভিনেত্রীকেও আমরা এই চিত্রে দেখতে পাব বলে প্রকাশ।

সুপ্রসিদ্ধ পরিচালক ও প্রযোজক শ্রীপ্রমোদ বড়ুয়া বিমার্যোগে জড়ন যন্ত্রা করেছেন। ইংল্যান্ডের চিত্রগ্রহণ কেন্দ্রে কি আধুনিকতম যন্ত্রাণ ব্যবহার করে তার সঙ্গে পরিচিত হওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। যুক্তোত্তর ইংল্যান্ডে ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রচার ও প্রসারের অবকাশ আছে কিনা সে সম্বন্ধেও তিনি অনুসন্ধান করে দেখাবেন। তাঁর সাধু উদ্দেশ্য সফল হলে বাংলা চলচ্চিত্র জগৎ তার দ্বারা লাভবান হবে বলে আশা করা যায়।

গত ১লা জুলাই থেকে ন্যাশনাল সার্টিফিকেটে মহামায়া চিত্রপাঠের “মা আর মাটি” নামক চিত্রের কাজ আবার এগিয়ে চলেছে। এই চিত্রটি পরিচালনা করছেন নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই এঁদের চিত্রগ্রহণ কার্য সমাপ্ত হবে বলে কতৃপক্ষ আশা রাখেন।

বেঙ্গল ন্যাশনাল সার্টিফিকেটে শ্রীউৎপল সেনের পরিচালনায় ধূপছায়া লিমিটেডের হিন্দী চিত্র ইন্দ্রাবীর চিত্রগ্রহণ পুনরায় আরম্ভ হয়েছে। নারায়ণ, কৌশল্যা, উর্মিলা, ভানু, বামনজি, রবি রায়, মিহির ভট্টাচার্য প্রভৃতি এই চিত্রে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন।

গোমতীর খাতনন্দী চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী লীলা চিত্রনন্দীর মত্ববিয়োগ হয়েছে। শ্রীমতী

লীলার মাতা শ্রীযুক্তা তারাবাই নাগরকর একজন আদর্শ চরিত্রবতী মহিলা ছিলেন। প্রায় ২১ বৎসর পূর্বে তাঁর পিতা অধ্যাপক বলবন্ত রাও নাগরকরের মৃত্যুর পর থেকে তাঁর মাতাই পুত্রকন্যাদের মানুষ করে তুলেছিলেন।

খাতনন্দা চলচ্চিত্র প্রযোজক শ্রীমদ মধু বসুর আবেদনক্রমে হাইকোর্ট থেকে তাঁকে তাঁর পত্নী খাতনন্দী চলচ্চিত্র শিল্পী শ্রীমতী সাধনা বসুর সঙ্গে পৃথক থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। শ্রীমদ বসু তাঁর পত্নীর বিরুদ্ধে উপর্যুপরি স্বামী-স্ত্রী, নির্দয় ব্যবহার প্রভৃতির অভিযোগ এনেছিলেন। বিচারপতি তাঁর আবেদন মঞ্জুর করার সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিয়েছেন যে, শ্রীমদ মধু বসু তাঁর পত্নী শ্রীমতী সাধনা বসুকে মাসিক ৩০০ টাকা মাসোহারা দেবেন।

শ্বেত-গোলাপের

চেয়েও শুভ্র

বাথগেটের  
টুথপেস্ট

আপনার দাঁত মজবুত ও ধবধবে শাদা রাখতে হলে বাথগেটের টুথপেস্ট ব্যবহার করুন। এর নিয়মিত ব্যবহার মড়ী শক্ত করবে এবং দাঁত অক্ষত রাখবে। খুব অল্পমতই কাজ চলে।

আজ থেকেই এই মাজন ব্যবহার করুন।

**Bathgate & Co. Ltd.**  
CALCUTTA BOMBAY LONDON



# খেলাধুলা

## ক্রিকেট

ইংল্যান্ড দল তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা দলকে ৭ উইকেটে পরাজিত করিযাছে। পর পর দুইটি টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ড দল জয়ী হইয়া প্রকৃতই ক্রিকেটের পরিচয় দিয়াছে। তবে এই কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ইংল্যান্ড দলের এই সাফল্য সাহায্য করিয়াছেন তিনজন খেলোয়াড় এডরিচ, কম্পটন ও রাইট। ইহাদের মধ্যে এডরিচের কৃতিত্ব সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় কারণ তিনি ব্যাটিং ও বোলিং উভয় বিষয়ে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ইংল্যান্ড দল পর পর দুইটি টেস্ট খেলায় বেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিল ইহার পর নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, “রবার” ইংল্যান্ডেরই থাকিবে। দক্ষিণ আফ্রিকা দল কোনরূপেই পরাজয়ের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে না।

### খেলার বিবরণ

দক্ষিণ আফ্রিকা দল প্রথম ব্যাটিং করিবার সৌভাগ্য লাভ করে ও প্রথম ইনিংস ৩৩৯ রানে শেষ করে। ডিল জোয়েন মাত্র ৭ রানের জন্য নিজস্ব শতরান পূর্ণ করিতে পারেন না। ইংল্যান্ড দলের এডরিচের বোলিং বিশেষ কার্যকরী হয়। পরে ইংল্যান্ড দল খেলিয়া ৪৭৮ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। এডরিচ ও কম্পটন উভয়ে শতাধিক রান করেন। দক্ষিণ আফ্রিকা দল ১৩৯ রান পশ্চাতে পড়িয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। অধিক রান তুলিবার আশ্রয় চেষ্টা করে। কিন্তু এডরিচ ও রাইটের বোলিং মারাত্মক হওয়ায় রান বেশী করা সম্ভব হয় না। দক্ষিণ আফ্রিকা দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২৬৭ রানে শেষ হয়। ইংল্যান্ড দল পরে খেলিয়া ৩ উইকেটে প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে ও খেলায় ৭ উইকেটে জয়ী হয়।

### খেলার ফলাফলঃ—

দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম ইনিংসঃ—৩৩৯ রান (ডোয়ার ৬২, মিলেস ৮০, ডিলজোয়েন ৯৩, এডরিচ ৯৩ রানে ৪টি, কানইন ৬৪ রানে ২টি, ল্যাডউইন ৫৮ রানে ২টি উইকেটে পান।)

ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসঃ—৪৭৮ রান (এডরিচ ১৯৯, কম্পটন ১১৫, ইয়ার্ডলী ৪১, টাকেট ১৪৮ রানে ৪টি, শ্লিমসল ১২৮ রানে ৩টি উইকেটে পান।)

দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ইনিংসঃ—২৬৭ রান (নর্স ১১৫, মেলভিন ৫৯, ডিলজোয়েন ৩২, এডরিচ ৭৭ রানে ৪টি, রাইট ৩২ রানে ৩টি উইকেটে পান।)

ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসঃ—৩ উইঃ ১২৯ রান।

### ভারতীয় ক্রিকেট দলের অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ

ভারতীয় ক্রিকেট দলের অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ সম্পর্কে সম্প্রতি নানা প্রকার আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল আলাপ-আলোচনা অনেকের মনে অনেক প্রকারের আশংকা সৃষ্টি করিতেছে। কেহ কেহ যা ধারণা করিয়াই লইয়াছেন যে, ভ্রমণ ব্যয়স্থা বাতিল হইয়া যাইবে। আমরা কিন্তু এইরূপ আশংকা করিবার কোনই কারণ খুঁজিয়া পাই না। এই সকল আলাপ আলোচনা সম্পূর্ণ অসার ও ব্যর্থবী। ইহা আমাদের কোনরূপ সংসহ নাই। চ্যাম্পিয়ান ক্রিকেট কনফারেন্স যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে, তাহা বাতিল বর্তমানে হইতে পারে না। তাহা ছাড়া ভারতীয় দল যে সকল খেলোয়াড়গণ দ্বারা



উইলিয়াম ডন চ্যাম্পিয়ান জ্যাক ক্রামার উইলিয়াম ডন কাপ গ্রহণ কারবার পর প্রিন্সেস এলিজাবেথের সহিত কর্মসূচী করিতেছেন।

গঠিত হইয়াছে তাহার মধ্যে দুই একজন ছাড়া বাহারও উপর পাকিস্থানী কর্তৃপক্ষের কোন হাত নাই। এই দুই একজন খেলোয়াড়কে দল হইতে বাদ দিয়া অন্যায়সে ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়া বাহিতে শারে। অগামী আগস্ট মাসে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভা হইবে। বোর্ডের সভাপন আলাপ আলোচনার বশবর্তী হইয়া বর্তমানে ভ্রমণ ব্যয়স্থা বাতিল করিবেন ইহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না।

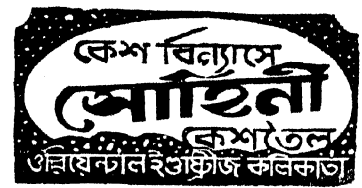
## টেনিস

ভারতীয় ডেভিস কাপ দলের খেলোয়াড়গণ ইংল্যান্ড ও ইউরোপের অনেকগুলি প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া বিশেষ সন্মান অর্জন করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি জানা গেল, ঐ দলের তিনজন খেলোয়াড় কয়েকটি হিলে আমেরিকান টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার জন্য আমেরিকা যাত্রা করিতেছেন। সাফল্যভাষ্য করিবেন না ইহা নিশ্চিত; সুতরাং অভিজ্ঞতা লাভের জন্য যাইতেছেন। ইংল্যান্ড ও ইউরোপের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বহু আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড়ের সহিত, এমন কি আমেরিকার বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের সহিতও খেলিবার অথবা তাহাদের খেলা দেখিবার সৌভাগ্য সকলেরই হইয়াছে। ইহার পর সুদূর আমেরিকায় বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কেবল অভিজ্ঞতার জন্য যাইবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না। আমেরিকার প্রতিযোগিতায় যোগদান না করিয়া খেলোয়াড়গণ যদি কোন বিশিষ্ট আমেরিকান টেনিস শিল্পকের অধীনে কিছুদিন ক্রীড়া কৌশল শিক্ষা করিয়া আসেন খুবই ভাল করিবেন।

## নর্দিক্‌বৃন্দ

পৃথিবীর হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান মর্টি-বোথো জো লুই দীর্ঘ ১০ বৎসর নিজ অজিত গোঁবর অক্ষর রাখিয়াছেন। এই পর্যন্ত ২৩ বার জো লুইকে সম্মানচ্যুত করিবার জন্য প্রতিশ্রুতী খাড়া করা হইয়াছে—প্রতিবারই লুই প্রতিশ্রুতীকে ভূতলশায়ী করিয়া প্রচণ্ডা বার্থ করিয়াছেন। সম্প্রতি মর্টিবৃন্দ প্রবর্তকরা স্থির করিয়াছিলেন, জো বাক্সী নামক একটি নিগ্রো মর্টিবোথাকে লুইর প্রতিশ্রুতী হিসাবে দাঁড় করাইবেন। কিন্তু বাক্সী সম্প্রতি সুইডেন চ্যাম্পিয়ান ট্যান্ডবোর্গের

নিকট শোচনীয় পরাজয় বরণ করিয়াছেন। মর্টি-বৃন্দ প্রবর্তকগণ ইহার ফলে এক বিরাট সমস্যায় সম্মুখীন হইয়াছেন। ট্যান্ডবোর্গ ও বাক্সীর লড়াইর পূর্বে সকলেরই ধারণা ছিল বাক্সী অন্যায়সে বিজয়ী হইবেন। কিন্তু ফলতঃ তাহা হইল না। জো লুইকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি ট্যান্ডবোর্গের সহিত লড়াইতে প্রস্তুত আছেন কি না? জো লুই স্পষ্টভাবে কিছু না বলিলেও প্রকারান্তে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। অপর দিকে ট্যান্ডবোর্গকে লুইর কথা বলা হইলে তিনি বলেন, “জো লুই আমাপেক্ষা অনেক বড়। তাহার পরিবর্তে ইউরোপ চ্যাম্পিয়ানশিপের জন্য উড় ককের সহিত লড়াইতে প্রস্তুত আছি।” ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় ট্যান্ডবোর্গ জো লুইর প্রতিশ্রুতী হইতে সাহসী নন। এই সমস্যার সমাধান কিরূপে হইবে আমরা জানি না। তবে আমাদের ধারণা জো বাক্সীকেই প্রতিশ্রুতী খাড়া করা হইবে। দেখা যাক কি হয়।



## চন্দ্রকানি

ডিজল “আই-কিওর” (রেজিঃ) চন্দ্রকানি এবং সর্বপ্রকার চন্দ্রকোণের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ। বিনা অস্ত্র ঘরে বসিয়া নিরাময় সুবর্ণ সুযোগ। গ্যারাণ্টী দিয়া আরোগ্য করা হয়। নিশ্চিত ও নিষ্ঠুরশোণা বীলসা পৃথিবীর সর্বত্র আদরণীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৩ টাকা, মাশুল ৫০ আনা।

কমলা ওয়ার্কস (দ) পাটপোতা, বেঙ্গল।



**দুলালম্ সোসাইটি**  
৩৩ কোম্পানী ওয়ার্কস  
১৩, মধ্য-মেরু-রোড, কলিকতা



প্রথা পরমিতমারী ওয়ার্কস



## প্রতিটি ক্যারাব্যান সিগারেটই পূর্ণ তৃপ্তি দায়ক



# CARAVAN

ক্যারাব্যান এয়ার কন্ডিশন করা সিগারেট

ডাশনাল টোব্যাকো কোম্পানী লিমিটেড  
ACI.C.41

## পাঁকা চুল

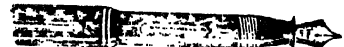
কলপ ব্যবহার করবেন না। আমাদের  
আয়ুর্বেদীয় সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করুন এবং ৬০  
বৎসর পর্যন্ত আপনার পাকা চুল কলো রাখুন।  
আপনার দৃষ্টিশক্তি উন্নতি হইবে এবং মাথায়  
সারিয়া যাইবে। অল্প সংখ্যক চুল পাকিলে ২১০  
টাকা মূল্যের এক শিশি, বেশী পাকিয়া থাকিলে  
৩১০ মূল্যের এক শিশি, যদি সবগুলিই পাকিয়া  
থাকে, তাহা হইলে ৫ টাকা মূল্যের এক শিশি  
তৈল ক্রয় করুন। বার্থ হইলে স্বিগ্ধে মূল্য ফেরৎ  
দেওয়া হইবে।

## শ্বেতকুষ্ঠ ও ধবল

শ্বেতকুষ্ঠ ও ধবলে কয়েক দিন এই ঔষধ  
প্রয়োগের পর আশ্চর্যজনক ফল দেখা যায়। এই  
ঔষধ প্রয়োগ করিয়া এই ভয়াবহ ব্যাধির হাত  
হইতে মুক্তলাভ করুন। সহস্র সহস্র হাবিম,  
ডাক্তার, কবিবাজ বা বিজ্ঞাপনদাতা কর্তৃক বার্থ  
হইয়া থাকিলেও ইহা নিশ্চয়ই কার্যকরী হইবে।  
১৫ দিনের ঔষধের মূল্য ২১০ আনা।

বৈদ্যরাজ অখিলকিশোর রাম  
নং ১০৪, কাতরীসরাই, গয়া।

পাকার, শেফারস্, এডারশার্প  
নির্মিত মূল্য অংশক অনেক মূল্য



| পৃথিবীখ্যাত কলম            | নির্মিত মূল্য | বিভিন্ন মূল্য |
|----------------------------|---------------|---------------|
| পাকার '৫১' গোল্ড ক্যাপ     | ৬০,           | ৫৭,           |
| এ '৫১' সিলভার ক্যাপ        | ৫০,           | ৪৫,           |
| এ রু ডায়মন্ড              | ৩৭,           | ৩৪,           |
| শেফার্স গোল্ড ক্যাপ ডিলার  | ৭০,           | ৬৮,           |
| এ ভ্যামেটিক ডিলার          | ৭০,           | ৭০,           |
| এ গোল্ড ক্যাপ ফ্লেট        | ৬০,           | ৬০,           |
| এ লাইফটাইম ডায়াল          | ৫০,           | ৫০,           |
| এ এ ফেটদম্যান              | ৪২,           | ৪০,           |
| এ মিডিয়ম                  | ২৭,           | ২৪,           |
| এ স্ট্রিয়র                | ২১,           | ১৯,           |
| এডারশার্প, নন-লাইফটাইম     | ১৮,           | ১৬,           |
| এ লাইফটাইম                 | ২৪,           | ২০,           |
| এ লাইফটাইম গোল্ড ক্যাপ     | ৪৫,           | ৩০,           |
| এডারশার্প নং ৫১৫           | ২৪৫০          | ২০,           |
| সায়ান, সেলফ্ ফিলার        | ১০১০          | ১২,           |
| এ সুপিরিয়র, রেগুলার       | ১৬,           | ১৪,           |
| টাট-ফোর্ড রিজেন্সি         | ৭,            | ৫১০           |
| এডারশার্প (টিউলেস্)        | ৬,            | ৪১০           |
| রেগুলার, সুপিরিয়র টিউলেস্ | —             | ৬,            |

ইউ এস এ চীপ ডায়ালিটিক পেনস্

অর্ডিনারী ০. গোল্ড স্লেটেড নিবসহ ৪১০.  
সুপিরিয়র ৬১০ এবং নীট সোনার নিবসহ ৭.  
ফ্রুট কোম্পালিটী ৯১০; ডাক-আ ৫০; চীপ  
ডায়ালিটিক ৬টি পেন একত্রে লইলে শতকরা  
১২১০ টাকা কমিশন দেওয়া হইবে।

ইয়ং ইন্ডিয়া ওয়াচ কোং,  
পোস্ট বক্স ৬৭৪৪ (ডি/২), কলিকাতা।

# ভারতের আদিবাসী

শ্রীমুখার্জি ঘোষ

( ১২ )

ধর্মবিশ্বাসের ইতিহাস

আদিবাসীদের ধর্ম কি?

এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। হিন্দুধর্মের মতই আদিবাসীদের ধর্ম বহু মত-বিশ্বাস-প্রথা-সংস্কার নিয়ে গঠিত। হিন্দুসমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মমত বৈচিত্র্যের মত আদিবাসীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীরও ধর্ম ধর্ম পৃথক পৃথক ও বৈচিত্র্য।

বর্তমান আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস এবং হিন্দুর বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস—উভয়ের ইতিহাস খুঁজতে গেলে আমরা এমন কতগুলি তথ্যের সম্মুখীন হই, যেনগুলি বস্তুতঃ মানুষ জাতিরই ধর্মবিশ্বাসের ইতিহাস। নৃতত্ত্বিক যেমন বর্তমান মানবজাতির বিভিন্ন দৈহিক গঠন ও রূপের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে সুপ্রাচীন কালের কয়েকটি মূল নরবংশের ধারা আবিষ্কার করেছেন, তেমনি বর্তমান সভ্য মানুষের ধর্মবিশ্বাসের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে কতগুলি মূল ধর্মবিশ্বাসের ধারা আবিষ্কার করা যায়। মূল নরবংশগুলির দেহের শোণিতের মত এই মূল ধর্মবিশ্বাসের ধারাগুলিও যুগ যুগ ধরে দেশ হতে দেশান্তরে প্রবাহিত হয়েছে। এক ধারার সঙ্গে অন্য ধারার মিলন ও মিশ্রণ হয়ে নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছে।

বর্তমান আদিবাসীদের ধর্মবিশ্বাস বস্তুতঃ মানুষ জাতির সেই মূল ধর্মবিশ্বাসের ধারাগুলিরই নিদর্শন। মানুষ জাতির ধর্মবিশ্বাসের শৈশ্বরূপ বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় যে, প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের মূল সংস্কারগুলি মানুষের মনোভার দ্বারা মার্জিত হয়ে অথবা একটা সভ্য পরিচ্ছদ ধারণ করে আজও সভ্যসমাজে প্রচলিত রয়েছে। আদিবাসীদের সম্বন্ধে বলা যায় যে, ঐ একই ধর্মসংস্কার তাদের মনের ওপর আদিম রূঢ়তা নিয়ে রয়ে গেছে, বিবর্তনের পথে বেশী অগ্রসর হতে পারেনি।

বর্তমান ভারতের হিন্দু ধর্মকে অনেকে

আর্যধর্ম বলে থাকেন। কিন্তু তার চেয়ে আর্য প্রভাবিত ধর্ম বললে বোধ হয় সত্য কথাটা বলা হয়। আর্য আগমনের পূর্বেও ভারতবর্ষে মানুষ ছিল এবং তাদের ধর্মও ছিল। আর্যেরা এসে ভারতের সেই বনিয়াদী ধর্মকে বিনষ্ট করতে পারেনি এবং আর্যধর্ম নিজেও বিনষ্ট হয়নি। আর্যধর্ম ও আর্যধর্মের সংমিশ্রণই হলো হিন্দুধর্ম—এক বিচিত্র ব্যাপক প্রদারণশীল ও আহরণপ্রবণ ধর্ম।

প্রায়-হিন্দুধর্ম (Proto-Hinduism)

ডাঃ হার্টন একটা কথা ব্যবহার করেছেন—‘প্রায়-হিন্দুধর্ম’ (Proto-Hinduism)। আর্য আগমনের পূর্বে ভারতের বহু বিভিন্ন সমাজ জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে যে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস প্রচলিত ছিল, সেই সব ধর্মবিশ্বাস গুলিকেই তিনি ‘প্রায়-হিন্দুধর্ম’ আখ্যা দিয়েছেন। এই প্রায়-হিন্দুধর্ম বিশেষ একটা বিশ্বাস বা সংস্কার ছিল না—বহু বিভিন্ন বিশ্বাস বা সংস্কারের সমাবেশ।

আজ যে হিন্দুধর্মের মধ্যে সংস্কার ও বিশ্বাসের বহুই আমরা দেখতে পাই, সেটা বস্তুতঃ প্রায়-হিন্দুধর্মেরই ঐতিহ্য। আর্যধর্ম ছিল বিশেষ একটা জাতিগত ধর্ম। সুতরাং তার রূপ বিশেষভাবেই স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট ছিল, তার মধ্যে বহুই এবং বিভিন্নতার কোন প্রশ্ন ছিল না। অধিকাংশ বিজ্ঞানী একমত যে, বর্তমান হিন্দুর সমাজগত কাঠামো বা গঠন হলো আর্য ষ্টাইলের, কিন্তু বর্তমান হিন্দুর ধর্মগত কাঠামো বা গঠন হলো বেশী প্রাচীন, প্রাগার্য যুগের।

একটি থিওরী অনেক পণ্ডিত প্রচার করেছেন—আর্যেরা একটা উন্নত ধর্ম নিয়ে ভারতে এসেছিল। এ থিওরীর সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় করার অনেক যুক্তি আছে। আর্যেরা আসবার সময়েই একটা উন্নত ধর্ম সংগে করে নিয়ে এসেছিল, অথবা ভারতে বসতি করার পর উন্নত ধর্ম সৃষ্টি করেছিল—এর মধ্যে কোনটা সত্য? পণ্ডিতদের মধ্যে এবিষয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। ভারতে সিদ্ধ সভ্যতার

(মহেঞ্জোদাড়ো) নিদর্শন আবিষ্কৃত হবার পূর্বে আর্য সভ্যতাকে ভারতের ‘প্রথম’ সভ্যতা জ্ঞান ‘উন্নততর’ সভ্যতা বলে মনে নিতে পারা যায় না।

আর্য আগমনের বহু পূর্বে ভারতে বিভিন্ন জাতি বা নরবংশের আগমনের প্রমাণ পাই। নৃতত্ত্বগত সূত্র অনুসারে আর্য অথবা আর্যভার্য জাতি হলো হিন্দ-ইউরোপীয় (Indo-European) নরবংশ। হিন্দ-ইউরোপীয় আগমনের পূর্বেই, অতি দূর অতীতে, ভারতে ন্যেগ্রিটো, প্রায়-অস্ট্রেলীয় ও মেডিটারেনীয়ান নামে কথিত নরবংশগুলির ভারত আগমনের প্রমাণ পাই, কোটি কোটি ভারতীয়ের বংশ কুরোটি, চিবুক, কেশ ও নার্সিকার রূপ ও গঠনের মধ্যে তার জীবন্ত সাক্ষ্য বর্তমান।

ন্যেগ্রিটো, প্রায়-অস্ট্রেলীয় ও মেডিটারেনীয়ান নরবংশগুলি নিশ্চয় ধর্মহীন ছিল না। এক্ষেত্রে ধর্ম বলতে বস্তুতঃ মানসিক সংস্কারই বুঝায়। সুপ্রাচীনকালের এই মূল নরবংশগুলির মানসিক সংস্কারগুলিই হলো মূল ধর্মবিশ্বাসের ধারা। আজকের দিনের রুঢ়ি অনুসারে বিচার করতে গেলে এই মূল ধর্মবিশ্বাসের রূপ নিত্যন্ত রুঢ় ও অমার্জিত মনে হবে। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য হলো, মানুষ জাতির মানসিক ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই অমার্জিত শিশু-ধর্ম বিবর্তিত হয়ে বর্তমানের উন্নত দর্শনে পরিণত লাভ করেছে। পৃথিবীর যেসব জাতির মধ্যে মন বৃদ্ধি ও চিন্তার এই বিবর্তন সম্ভব হয়েছে তারাই উন্নত দর্শন বা ফিলসফির অধিকারী হয়েছে এবং তারাই ‘সভ্য’ জাতি। যেসব জাতির বৃদ্ধি, মন ও চিন্তা বিবর্তনের পথে অগ্রসর হতে পারেনি তারাই সম্ভবতঃ তাদের সেই শিশু-ধর্ম নিয়েই রয়ে গেছে এবং তারাই হলো নৃতত্ত্বিকের ভাষায় আদিম (Aborigines) জাতি।

ভারতের আদিবাসী সমাজের দৈহিক রূপের ইতিহাস আলোচনা করে আমরা দেখছি যে, তারা প্রধানত ন্যেগ্রিটো (Negrito), প্রায়-অস্ট্রেলীয় (Proto-Australoid), ও মংগোলীয় (Mongoloid) নরবংশের মানুষ। সুতরাং এই তিন নরবংশের পুরাকালীন ধর্ম বা মনের সংস্কার যা ছিল, ভারতের আদিবাসী সমাজের ধর্ম প্রধানত তাই দিয়ে রচিত।

মেডিটারেনীয়ান নরবংশ আর্য আগমনের পূর্বে ভারতে এসেছিল। প্রাগার্য যুগে ভারতে প্রাবল্য সভ্যতা নামে যে একটি উন্নত সভ্যতা ছিল, তার মৌলিক উপাদান ও ভিত্তি হলো মেডিটারেনীয়ান মানুষের ধর্ম, সংস্কার ও সভ্যতা।

সুতরাং আর্য আগমনের পূর্বে ভারতের মানুষ-সমাজের ধর্মগত রূপ কল্পনা করে

আমরা পাই প্রধানত দুটি ধর্মের অস্তিত্ব—  
(১) মেডিটারেনীয়ান ধর্ম-প্রধান দ্রাবিড় ধর্ম,  
এবং (২) নিগ্রোবটু ও প্রায়-অস্ট্রেলীয় ধর্ম-  
প্রধান আদিবাসী ধর্ম।

(১)। নিগ্রোবটু নরবংশের ধর্মগত  
সংস্কারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—বৃক্ষপূজা  
(বট, অশ্বথ বা ডুমুর গাছ), পাথর পূজা ও  
উর্বরতা-পূজা (Fertility cult)।

(২) প্রায়-অস্ট্রেলীয় নরবংশের ধর্মগত  
সংস্কার হলো—টোটোম-পূজা (কেন অদৃশ্য  
শক্তিকে তুষ্ট করার জন্য) এবং কোপ-শান্তির  
(Propitiation) সংস্কার।

(৩) এশিয়া মাইনর অঞ্চল হইতে মেডি-  
টারেনীয়ান নরবংশের মানুষেরা যে ধর্ম নিয়ে  
আসে, তার প্রধান প্রধান সংস্কারগুলি ছিল—  
আত্মা-পদার্থ (Soul Matter) বিশ্বাস,  
উর্বরতা পূজা, বলি দ্বারা কোপ শান্তির প্রথা  
ও সাকার দেবতার (Personified Deity)  
কল্পনা। এই এশিয়া মাইনরের মানুষেরাই  
নিয়ে আসে লিঙ্গরূপী পাথর পূজার পদ্ধতি,  
রাজক বা পুরুষোত্তম প্রথা, আকাশের নক্ষত্র  
ইত্যাদির রূপকথা ইত্যাদি। তা ছাড়া, আর  
একটা ধর্মগত সংস্কার তারা নিয়ে আসে—এক  
মহা-মাতার (Great Mother) আঁসতরে  
বিশ্বাস এবং জন্মান্তরে বিশ্বাস।

এই তিনটি নরবংশের মনের সংস্কারগুলির  
সম্মিষ্টবেই ডাঃ হার্টন প্রায়-হিন্দুধর্ম (Proto-  
Hinduism) আখ্যায় দিয়াছেন। এই প্রায়-  
হিন্দুধর্মের ভূমিকার উপর পরবর্তীকালে  
আর্যধর্মের সংস্কারগুলি আবির্ভূত হয় এবং  
উভয়ের সংমিশ্রণেই বর্তমান হিন্দুধর্ম।

কিন্তু এই সংমিশ্রণের ব্যাপার সমগ্র-সম্পূর্ণ  
(Total) ব্যাপার নয়। যে যে ক্ষেত্রে অর্থাৎ  
যে যে আর্থ এবং অনার্থ সমাজের মধ্যে নবগত  
আর্যধর্মের সংস্কার ও প্রায়-হিন্দুধর্মের অন্যান্য  
সংস্কারের সম্পূর্ণ সংমিশ্রণ হয়েছে, সেটাই  
হিন্দুধর্ম। অপরদিকে কোন কোন  
প্রায়-হিন্দুধর্ম সম্পন্ন আদিবাসী অনার্য  
সমাজ এই সংমিশ্রণ প্রক্রিয়ার বাইরে  
পড়ে রইল এবং তারাই তৎকাল তাদের  
আর্যপূর্বকালের সুপ্রাচীন ধর্ম নিয়ে রয়েছে।  
সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে—

বর্তমান আদিবাসীর ধর্ম = অনার্য প্রায়-  
হিন্দুধর্ম।

বর্তমান হিন্দুধর্ম = আর্যধর্ম + অনার্য প্রায়-  
হিন্দুধর্ম।

বর্তমান হিন্দুধর্মের মধ্যে বর্তমান আদি-  
বাসীর ধর্মের সংস্কারগুলি স্থানলাভ করেছে,  
কিন্তু বর্তমান আদিবাসীর ধর্মে আর্য-  
সংস্কারের স্থান নেই। অর্থাৎ ধর্মের দিক দিয়ে  
বর্তমান আদিবাসী এবং বর্তমান হিন্দু উভয়ের  
মধ্যে একটা মৌলিক মিল রয়েছে—উভয়ের  
মধ্যে প্রায়-হিন্দুধর্মের সংস্কার বর্তমান।

অমিলের মধ্যে এই যে, বর্তমান হিন্দুর  
মধ্যে উপরলুপ্ত আর একটা সংস্কার রয়েছে—  
আর্যসংস্কার। বর্তমান আদিবাসীর মধ্যে  
আর্যসংস্কার নাই।

বর্তমান হিন্দুসমাজ ও আদিবাসী  
সমাজের মধ্যে এই মূলগত ঐতিহাসিক সাদৃশ্য

ও একোর ভিত্তিটি দেখতে পেয়েও ডাঃ হার্টন  
নিজেই আবার বিস্মিত হয়েছেন—হিন্দুধর্মের  
প্রতি আদিবাসীদের এত আকর্ষণ কেন? এবং,  
আদিবাসীরা দীর্ঘকাল ধরে কেন হিন্দুসমাজে  
একটা না একটা জাত হিসাবে প্রবেশ করে  
আসছে? ভোরয়ের এলুইনের মত বৈজ্ঞানিক(?)



পৃথিবীর সর্বত্র কোটা কোটা গৃহে কি কারণে 'ওভালটিন'  
নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হইতেছে? ইহা অতি সজ্ঞ পক্ষ।  
'ওভালটিন' সকলেরই উপভোগ্য এবং শিশুদেরই বিশেষ প্রিয়বস্তু  
নহে,—ইহা অতীত পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যোত্তমিকর।

'ওভালটিন' এই প্রকার যে সুস্বাদু ও পুষ্টিগত প্রাকৃতিক বাজ  
নিহিতমান তাহা সুগন্ধ ব্যতির মণ্ড, পানির সংযুক্ত টাটকা গোছের  
অত্যাবশ্যকীয় প্রাকৃতিক ভাইটামিন এবং অস্বাদু নান্যপ্রকার  
উপাদানের সমন্বয়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সমস্ত বিভিন্ন  
উপাদানের কণ্ডাই ইহা পরিপূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ বাজ বলিয়া পরিগণিত।  
'ওভালটিন' আপনার গৃহে স্বাস্থ্যমত্ত পরিবেশন করুন এবং নিশ্চয়  
করিয়া জানিয়া রাখুন যে আপনার সমস্ত পরিবার শক্তি, স্বাস্থ্য ও  
জীবনশক্তি গঠন ও সংরক্ষণের জন্য যথেষ্টমূল্য হুনির্ভারিত  
পুষ্টিকর বাজ পাইতেছে। সর্বপ্রকারে ইহার ব্যবহার করুন।

উপস্থাপক—গ্রেগরি টেবিল কোম্পানী  
(ভারতবর্ষ) লিমিটেড।

৬ নং লায়ন্স রোড কলিকাতা  
এবং বাদলার বোম্বাই  
করাচী।

**ওভালটিন**  
OVALTINE বৈলকারক পানীয় (স্বাদু)

এইরকম বিস্মিত হতে পারেন, কারণ হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের ঐতিহাসিক পরিচয় তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি। কিন্তু ডাঃ হাটন সব জেনে শুনেও আদিবাসীদের হিন্দুপ্রীতিকৈ বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখতে পারেননি, এটাই আশ্চর্য।

নিগ্রোবটু, প্রায়-অস্ট্রেলীয় এবং এশিয়া মাইনর থেকে আগত মেডিটারেনীয়ান নরবংশের ধর্মগত সংস্কারের বিষয়গুলো আমরা লক্ষ্য করবো, কারণ এই নিয়েই হলো প্রায়-হিন্দুধর্ম অর্থাৎ বর্তমান আদিবাসীর ধর্ম।

বৃক্ষপূজা, পাথরপূজা, মহামাতার কল্পনা, বলিদান প্রথা, দেবত্বাধি বা দেবতার কোপশাস্তি প্রথা, সাকার দেবতার কল্পনা, টোটেম পূজা, উর্বরতা পূজা, মৃত পূর্বপুরুষের পূজা..... প্রধানত এইগুলি হলো আর্যপূর্ব ভারতের তথাকথিত প্রায়-হিন্দুধর্মের প্রধান সংস্কার ও আচার। প্রশ্ন উঠবে, প্রাচীন মানুষের এই ধর্মচারের মধ্যে কি কোন দার্শনিক তত্ত্ব ছিল না?

ছিল। এই ধর্মচার ও সংস্কারগুলির বিশ্লেষণ করে আমরা আদিম মনের একটি মূল ভিজ্যাসার সূত্র পাই—সৃষ্টির রহস্য। মানুষ থেকে মানুষ জন্ম নিচ্ছে, পশু থেকে পশু, এবং বীজ থেকে শস্য। কেমন করে হয়, কিভাবে এই সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে? এটা হলো বস্তুত মানুষের মনের কাছে প্রথম রহস্য, সূত্রায় প্রথম প্রশ্ন। এ প্রসঙ্গে আমরা বিস্মিত বৈদিক ঋষির প্রশ্নটাও স্মরণ করতে পারি—কুতো ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।

এই ভিজ্যাসার সূত্রে একটি তত্ত্ব আবিষ্কৃত হলো—নিশ্চয় এমন কিছু একটা সারবস্তু আছে, যা সব জন্মশীল বস্তুর মধ্যে থেকে এই সৃষ্টিকার্য করিয়ে চলছে। এই সারবস্তুটি কি?

#### আত্মাবস্তু ও উর্বরতাবাদ

এই সারবস্তুটিই হলো আত্মাবস্তু (Soul-matter) বা জীবন-সার (Life-essence)। বৈজ্ঞানিকেরা অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের ভাষা থেকে একটি কথা গ্রহণ করে নিজেদের পরিভাষা করে নিয়েছেন—‘মানা’ (Mana)। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের ‘মানা’ অর্থ হলো এই জীবন-সার বা আত্মাবস্তু।

আদিম মানুষের ফিলসফিতে ‘মানা’ বা আত্মাবস্তু বা জীবন-সার সত্তা স্বীকৃত হলো। এই বিশ্বাসের সূত্রে সপ্তে সপ্তে আর একটা তত্ত্ব এসে পড়লো। মানা বা জীবনসার থাকে বলেই মানুষ, জন্তু বা বৃক্ষ নতুন মানুষ, নতুন জন্তু ও নতুন বৃক্ষ সৃষ্টি করতে পারে। যার মধ্যে মানা বা জীবনসার নেই সে সৃষ্টি করতে পারে না, সে অনূর্বর। সকল উর্বরতার মূল হলো মানা বা জীবনসার অথবা আত্মাবস্তু।

আদিম মনের মনীষার দ্বারা আর একটা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো—যাকে বলা যায় উর্বরতা থিওরী (Fertility theory)।

আদিম মানুষের ধর্মসংস্কারের দার্শনিকত্ব বলে যদি কিছু থাকে, তবে এই দুটি তত্ত্বই হলো তার প্রধান ভিত্তি—(১) মানা (জীবন-সার বা আত্মাবস্তু) থিওরী এবং (২) উর্বরতা থিওরী।

এই থিওরী দুটি দ্বারাই আদিম মানুষের তথা বর্তমান আদিবাসী সমাজ ও হিন্দুসমাজের বহু ধর্মচারের রহস্য ব্যাখ্যা করা যায়।

#### পাথর পূজা

পৃথিবীর সর্বত্র প্রাচীন মানুষের সংস্কৃতির মধ্যে পাথরের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন মানুষের সভ্যতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা পাথর পূজার বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভাগ করেছেন। যথা, নৃহৎ প্রস্তর (Magalithic) সভ্যতা, এক-প্রস্তর (Monolithic) সভ্যতা ইত্যাদি। অনুমান করা যায়, প্রথম প্রথম মৃত ব্যক্তির সমাধির ওপর একটি পাথর স্থাপন করে দেবার রীতি প্রচলিত হয়। মৃত ব্যক্তির মানা বা আত্মাবস্তু ঐ পাথরের আশ্রয় গ্রহণ করবে, এই সংস্কার থেকে প্রস্তরীয় সভ্যতার (Lithic culture) উৎপত্তি। এর মধ্যে উর্বরতা থিওরী রয়েছে। মৃতব্যক্তির মানা যদি অন্যত্র চলে যায় তবে সমাজ ও ভূমির উর্বরতা কমে গেল, এই ধর্মের আশঙ্কা থেকেই পাথর প্রতিষ্ঠার দ্বারা আত্মাবস্তুকে ধরে রাখার পদ্ধতিই একটা ধর্মচারের রূপ গ্রহণ করে। আত্মাবস্তু সম্বন্ধিত এই পাথর সাধারণ পাথর নয়, শ্রম্ভেয় পবিত্র পাথর। এই প্রসঙ্গে তুলনা হিসাবে হিন্দুর প্রেতশিলায় কথা মনে পড়বে। মেনহির (Menhir), ডোলমেন (Dolmen) ইত্যাদি বিভিন্ন গঠনের ও বিভিন্ন মূর্তির পাথরের যেসব নিদর্শন আজও দেখা যায়, সেসবই আত্মাবস্তু ও উর্বরতা সংস্কারের প্রতীক এবং বস্তুত লিঙ্গ প্রস্তরের প্রথম রূপ।

এই আত্মাবস্তু সম্বন্ধিত পাথর উর্বরতার প্রতীক হিসাবে আরও সুস্পষ্ট হয়ে লিঙ্গ-প্রস্তর রূপ গ্রহণ করেছে। পাথরের দ্বারা উর্বরতা পূজা আরও স্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায় যোনি-লিঙ্গ প্রস্তরের কল্পনায়। মহেঞ্জো-দাড়োতে আবিষ্কৃত সিদ্ধ-সভ্যতার নিদর্শনের মধ্যে পাথরের তৈরী যোনি-লিঙ্গ (Phallic Symbol with a ring) পাওয়া গেছে। খাসি অধিবাসী সমাজেও এই ধরনের প্রস্তর পূজার বিধি আছে, যেটা বস্তুত যোনি-লিঙ্গ পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। একটি স্তম্ভাকার প্রস্তরের ওপরে আর একটি গোলাকার প্রস্তর স্থাপন করা হয়ে থাকে।

মন্ডী ও সুক্রেত ইত্যাদি নিম্নহিমালয়ের রাজ-পুত্র রাজ্যগুলিতেও এই প্রথা আছে। রাজ-পুত্রানা, কাথিয়াবার ও চম্বা রাজ্যের বহু রাজ-পুত্র সমাজে মৃতের সমাধিস্থানের ওপর প্রস্তর স্থাপনের প্রথা আজও প্রচলিত।

পাথর পূজা একটি বহু প্রচলিত ধর্ম এবং পাথরের প্রতি একটা ধর্মীয় সংস্কার হিন্দু-জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা যায়। যে কোন জন্মভূত গঠনের পাথর পাওয়া গেলেই সেটা একটা বিগ্রহ হয়ে ওঠে। ১৯২৯ সাল ২৫শে এপ্রিল কলিকাতা হাইকোর্টে একটি মামলার বিচার হয়—জয়পুর পাথরের মামলা।

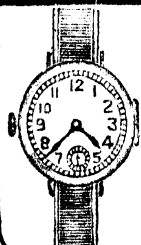
জনৈক ব্যক্তি জয়পুর থেকে প্রাপ্ত একটা কানো রঙের স্লেট-পাথর ১০ হাজার টাকায় আর এক ব্যক্তিকে বিক্রয় করে। পাথরটির মহিমা সম্বন্ধে প্রবাদ ছিল, এর পূজা করলে সন্তান লাভ হয় (very efficacious in the matter of getting a son)। কিন্তু যে ব্যক্তি পাথরটি খরিদ করে সে ফল না পেয়ে বিক্রয়তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।\*

মোকদ্দমাঘটিত এই পাথরটির কেনাবেচার ইতিহাসেও দেখা যাচ্ছে যে, উর্বরতার সংস্কার রয়েছে, পাথরের কৃপায় সন্তান লাভ হবে এই সংস্কার।

প্রাচীন মানুষের প্রস্তরীয় (Lithic) সংস্কৃতি আর একভাবে আর একটা প্রথা পরিণতি গ্রহণ করেছে। মৃতের সমাধির ওপর পাথর স্থাপন করা হতো আত্মা-বস্তুকে আশ্রয় দেবার জন্য। এই প্রথা আরও উন্নত হয়ে বৃক্ষাধি ইত্যাদি মূর্তি-প্রতীক (Effigy) স্থাপনের প্রথা পরিণত হয়। তখন শব্দ আর পাথর নয়, মাটি ধাতু ও কাঠের মূর্তি প্রতীক স্থাপনের প্রথা প্রচলিত হয়। অর্থাৎ আত্মা-পাথর রূমে আত্মা-মূর্তিতে (Soul Figure) পরিণতি লাভ করে। ছোটনাগপুরের মন্ডা সমাজে এবং আসামের আদিবাসী সমাজে এইভাবে আত্মা-মূর্তি স্থাপনের প্রথা প্রচলিত

\* The Religion & Folklore of Northern India.—Crooke.

## পুরস্কার



উচ্চ গ্রেডের হাতচড়ী  
চামড়ার ব্র্যাকেটস  
প্রতি পুরস্কার  
দেওয়া হইবে।  
নিয়মাবলীর জন্য  
পত্র লিখুন  
এন.পি. হাউস  
(পাই বক্স নং ১১৪৫৮)  
কলিকাতা

আছে। দক্ষিণ ভারতের হিন্দু মালায়ালীরা ধাতুর তৈরী আত্মা-মূর্তি স্থাপন করে মহাশ্মশুরের হাশি-যোগী সমাজ মাটির তৈরী আত্মা-মূর্তি স্থাপন করে। বর্তমান হিন্দুর মধ্যেও ব্যকাস্ট কৃষ্ণপুতলিকা ইত্যাদি মূর্তি-প্রতীকের প্রথা প্রচলিত আছে।

আত্মা-পাথর মূর্তি গ্রহণ করলো। দেখা যাচ্ছে যে, আত্মা-বস্তু আর বস্তু মাত্র না থেকে মাকার মনুষ্যরূপ গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ আত্মা-বস্তু প্রায় আত্মা-পুরুষ রূপ গ্রহণ করেছে। আদিবাসী গোষ্ঠীদের কল্পনায় আত্মা বলতে সাধারণত এই ধরনের একটি ক্ষুদ্র পুরুষ বোঝায়, যার অধিষ্ঠান হলো প্রত্যেক মানুষের মাথায় ("Soul in a tribal sense is a manikin situated in the head" —Hutton)।

#### পূর্বপুরুষ পূজা

যে সংস্কার থেকে আত্মা-পাথর স্থাপনের প্রথা প্রচলিত হয়েছে, তা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। অর্থাৎ মৃতের আত্মা-বস্তুকে নিজেরদের কাছে ধরে রাখার চেষ্টা, যাতে নিজেরদের উর্বরতা কমে না যায়। স্বভাবত এই সংস্কার থেকে প্রাচীন মানুষের মনে মৃতের সম্বন্ধে ধারণা থেকে কতগুলি সংস্কার জন্মলাভ করে (Cult of the Dead)। এবং এর স্বাভাবিক পরিণতি হলো পূর্বপুরুষ পূজা (Ancestor Worship) প্রথা।

মৃতের প্রতি সংস্কার এবং পূর্বপুরুষ পূজার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব হলো উর্বরতাবাদ। গজাম জেলার শবরেরা মৃত ব্যক্তিকে দাহ করে, কিন্তু তার উদ্দেশ্যে একটা আত্মা-মূর্তি বা ব্যকাস্ট তৈরী করে রাখে। ক্ষেত থেকে ফসল তোলার সময় এই ব্যকাস্ট ফেলে দিয়ে মৃতের উদ্দেশ্যে একটি এক-প্রস্তর (Monolith) স্থাপিত হয়। দেখা যাচ্ছে যে, ফসল তোলার সম্বন্ধে সংস্কার আর মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে সংস্কার—উভয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে। অন্যান্য অঞ্চলের শবরের মৃতদেহ ভূপ্রাণিত করার প্রথা আছে। তারা সারা বছরের মৃতদেহ-গুলিকে একটা জায়গায় ভিষ করে সিরিয়ে রাখে। বীজ-বপনের সময় এলে সব মৃতদেহগুলিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভূপ্রাণিত বা সমাধিস্থ করা হয়। মৃতের আত্মা-বস্তু যথাসময়ে মাটির মধ্যে প্রবেশলাভ করলো, ফলে মাটির উর্বরতা বা শস্যপ্রসূতা নিশ্চয় বাড়লো। বীজ বপনের পূর্বে মৃতের আত্মা-বস্তুর দ্বারা ভূমিকে যেন উর্বর করে নেওয়া হলো—শবরের শব-সংস্কারের প্রথার মধ্যে এই উর্বরতার সংস্কার সুস্পষ্ট দেখা যায়।

ক্ষেতে শস্যের শিষ যখন দেখা দিয়েছে, ছোটনাগপুরের ওরাঁওরা সে সময় মৃতদেহকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমাধিস্থ করে না। ভিষ একটা জায়গায় সাময়িকভাবে পড়ে রাখে।

পরের বছর, ক্ষেতে শস্যের শিষ দেখা দেবার আগে মৃতদেহকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমাধিস্থ করা হয়। এটাও আত্মা-বস্তুকে অপচয় থেকে রক্ষা করার ও সার্থক করার সংস্কার। শস্যের শিষ যখন দেখা দিয়েই ফেলেছে তখন আত্মা-বস্তুকে মাটিতে মিশিয়ে অকারণ উর্বরতা প্রতিষ্ঠার কোন প্রয়োজন নেই। বীজ বপনের সময়ই ভূমিকে উর্বর করার জন্য আত্মা-বস্তুকে ভূমিশ্রিত করা প্রয়োজন।

এটা হলো একটা দিক, মৃতের আত্মা-বস্তু ও ভূমির মধ্যে উর্বরতাগত সম্পর্ক। মৃতের প্রতি প্রাচীন মানুষের আর একটা সংস্কার হলো জলের সম্পর্ক। সাঁওতালেরা মৃতের অস্থি দামোদরের জলে নিক্ষেপ করে, হিন্দুরা গঙ্গার জলে ফেলে, কাহাড়ীরা কপিলি নদীর জলে ফেলে এবং পানোরার আদিবাসী নর্মদার জলে মৃতের অস্থি নিক্ষেপ করে।

রংগামা নাগারা মৃতের সমাধির ওপর ক্ষুদ্র একটা জলাধার রচনা করে। প্রায় প্রত্যেক আদিবাসী গোষ্ঠী মৃতের সমাধির ওপর জল ছিটায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শবসংস্কারের সঙ্গে মাটির মত জলেরও একটা সম্পর্ক রয়েছে। এটাও যে উর্বরতাবাদের সংস্কার সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। মাটির মত জলকেও আত্মা-বস্তু দ্বারা উর্বর করার প্রক্রিয়া। অন্যভাবে বলা যায়, ব্যক্তিকে আহ্বান করার প্রক্রিয়া, যাতে শস্যের ফলন বৃদ্ধি পায় বা অক্ষুণ্ণ থাকে।

জলের সঙ্গে উর্বরতার সংস্কার খুবই ঘনিষ্ঠভাবে মিশে আছে। জল উর্বরতার প্রতীক। বৈদিক গর্ভাধানের অনুষ্ঠানে দেখা যায় যে স্বামী হাতে দুর্বা নিয়ে স্ত্রীর নাকের ওপর জল ছিটিয়ে দেয়।

(ক্রমশ)



হীলর, বড় ভারতীয় গোলাপ যখন জ্যোৎস্না-লোভিত আকাশ মন-ভুলানো মিষ্টগন্ধে মাতিয়ে তোলে — তখন ভিনোলিয়া হোয়াইট রোজের কি স্বত্বিই না তারা জাগায়! আপনার সৌন্দর্য-বর্ধনের পক্ষে এর চেয়ে ভাল এবং উৎকৃষ্ট নিষয় সাবান আর হ'তে পারে না। কোমল, ফেনময় ভিনোলিয়া সবচেয়ে নরম ত্বক্কে মোলায়েম ভাবে পরিষ্কার করে...এবং এর সুগন্ধি কেনা আপনাকে মিষ্ট সৌরভে মগ্নিত করে।

## ভিনোলিয়া হোয়াইট সাবান

FOR SALE BY

VINOLIA COMPANY LIMITED, LONDON, ENGLAND

## পাকা চুল

কলপ ব্যবহার করিবেন না। আমাদের আয়ুর্বেদীয় সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করুন এবং ৬০ বৎসর পর্যন্ত আপনার পাকা চুল কালো রাখুন। আপনার দৃষ্টিশক্তির উন্নতি হইবে এবং মাথাধরা সারিয়া যাইবে। অল্প সংখ্যক চুল পাকিলে ২০ টাকা মূল্যের এক শিশি, বেশী পাকিয়া থাকিলে ৩০ টাকা মূল্যের এক শিশি, যদি সব-গুলিই পাকিয়া থাকে, তাহা হইলে ৫ টাকা মূল্যের এক শিশি তৈল ক্রয় করুন। বাথ হইলে শ্লিগণে মৃদু ফেরৎ দেওয়া হইবে। জগৎ হিষ্টমী ঔষধালয়, নং ১১১, পোঃ কাতরীসরাই (গয়া)।

## এম্ব্রয়ডারী মেশিন

নূতন আবিষ্কৃত। কাপড়ের উপর সুতা দিয়া অতি সহজেই নানা-প্রকার মনোরম ডিজাইনের ফুল ও দৃশ্যাদি তোলা যায়। মহিলা ও বালিকাদের খুব উপযোগী। চারিটি সূচ সহ পূর্ণাঙ্গ মেশিন—মূল্য ৩০ ডাক খরচা ১৮০।

ডীন ব্রাদার্স; আলীগড়, নং ২২।



# দেহরক্ষা

মানুষের দেহরক্ষা করে আপনার নিজের—এর রক্তস্রাব পড়া।  
পিছানোসারল, দৃষ্টিও পদার্থ শোষণ প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা। আপনার  
নিজেকে রক্ষা করে ও শক্তিশালী করে কুমারেশ। এই কুমারেশ  
যে শব্দে নিজের ও পেটের যে কোন পীড়া নিশ্চিতরূপে আবেশ  
করে তাই নয়—যে কোন রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করে আপনার  
স্বাস্থ্যকে রক্ষা করে।

ও, আর, সি, এল, লিং।

সালিকদা : : হাওড়া

## নির্ভীক জাতীয় সাম্প্রতিক

“দেশ”

সাম্প্রতিক বিজ্ঞাপন

৪, টাকা প্রভি ইণ্ডি প্রভি বার

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ  
হইতে জানা যাইবে।

## প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নিয়ম

পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে  
প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাময়িক  
গৃহীত হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠার কাটিয়া  
লিখিবেন। কোন প্রবন্ধের সহিত ছবি দিতে হইলে  
অনুগ্রহপূর্বক ছবি সঙ্গে পাঠাইবেন, অথবা ছবি  
কোথায় পাওয়া যাইবে জানাইবেন।

অমনোনীত লেখা ফেরত লইতে হইলে সপ্তা  
উপযুক্ত ডাক টিকিট দিবেন। লেখা পাঠাইবার  
তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে যদি তাহা ‘দেশ’  
পত্রিকায় প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে লেখাটি  
অমনোনীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অমনোনীত  
লেখা ছয় মাসের পর নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।  
অমনোনীত কবিতা টিকিট দেওয়া না থাকিলে এক  
মাসের মধ্যেই নষ্ট করা হয়।

সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক  
দিতে হয়।

ঠিকানা:—আনন্দবাজার পত্রিকা

১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

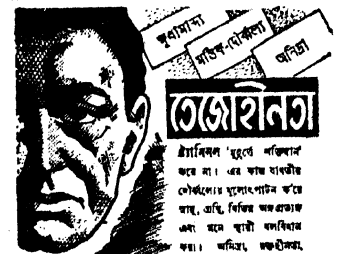
ভূবর্ণ কাশ্মীরের পৃথিবীবিখ্যাত ওলার ত্বকের  
খাঁটি

## পদ্মমল্ল

প্রকৃতির প্রেচ্ছ দান এবং যাবতীয় চক্ষুরোগের  
স্বভাবজ মনোবোধ। জাম শিশি ২। ৩ শিশি  
৩০। ৬ শিশি ১১। ডাক মাল্শল পৃথক।  
উত্তম—২২ টাকা। মাল্শল ফ্রি।

ডি. পি. মদ্যার্জি এন্ড কোঃ

৫৬ এ-৩৪, শিবপুর রোড, শিবপুর, হাওড়া (বেঙ্গল)



## তেজোহীনতা

ট্রান্সমিট 'হুয়ে' পত্রিকার  
করে না। এর কবি বাস্তবিক  
কৌশল্যের দুসংগঠন করে  
না, এটি, বিভিন্ন অঙ্গভাষা  
এবং মনে দৃষ্টি কল্যাণের  
করা। অমিতা, মনোহরতা

এই মাস, 'স্বাস্থ্য-রক্ষা', স্বাস্থ্য-রক্ষা ওলার মিলিত  
কৃত করে। স্বাস্থ্য-রক্ষা এবং ট্রান্সমিট ও বাস্তবিক  
অঙ্গভাষা। অমিতার ট্রান্সমিটের তেজ-সম্বন্ধে প্রবন্ধ।  
হীরা স্বাস্থ্য ও তেজ জীবনের জ্যেষ্ঠ আনন্দ  
মূল্য—ট্রান্সমিট ৩০। পদ্মমল্ল শিশি ৩০। একমুখি ট্রান্সমিট  
পদ্মমল্ল শিশি ৩০। পিঃ হাঃ লিংক না। সকল কল্যাণ-বাহিনী  
সকল মাস। অমিতা শিশি—পাই ১০০, কলিকাতা।

## স্ট্যামিনল

অমিতা তেজ ও শক্তি সম্বন্ধে  
Damon & Sons Limited.

# নতুন রেকর্ড

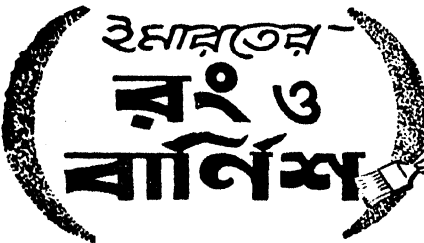
|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| কৃষ্ণচন্দ্র দে (অঙ্ক গায়ক) |              |
| সকালে চলিলি যমুনা সিনানে    | P 11881      |
| বুঝাও আবারে কেন গো মলিন     | কীর্তন       |
| কুমারী মুখিকা রায়          |              |
| আমি গানের পাখি              | N 27686      |
| তুধু তোমারে পেয়ে           | আধুনিক       |
| পরিমল কুশারী                |              |
| এই বকুলের বন ছায়ায়        | N 27687      |
| কেন গো তুমি এলে             | আধুনিক       |
| মৃণালকান্তি ঘোষ             |              |
| যদি তোর আধার ঘরে            | N 27688      |
| ওমা তোর চরণ ছুঁটি           | শ্রীমা সংগীত |
| কুসুম গোস্বামী              |              |
| নিরালায় বসিয়া গো          | N 27689      |
| মোহন বংশী বাজায়ে           | পল্লী-গীতি   |
| রঞ্জিত রায়                 |              |
| কিলিমি হাওয়া               | N 27690      |
| প্রগতির শুভো                | বঙ্গ-গীতি    |

## “হিজ মাস্টার্স ডয়েজ”



দ্রি গ্রামোফোন কোম্পানি লিমিটেড  
দমদম, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর

HVK 35



মার্কেটাইল এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিলেলেটী  
৩৭, ব্রহ্মপুত্র স্ট্রীট, কলিকাতা



## জহব আয়লা

ডেড কোমিক্যাল ওয়াকস  
২২, মহাশি দেবেন্দ্র বোহা, কলিকাতা

## ফাউন্টেনপেন

“মেন্টমোর” (ইংলিশ) অটোম্যাট—১৫।  
“গোল্ডেন প্যাটিগনাম”—৩/০  
এস, এম, কোং, ৬৫এ-১, নিমতলা, কলিঃ।  
(সি ১৩৫৭)

(গভঃ রেজিঃ)

## হাঁপানীর চিত্রকূট পাহাড়জাত বনৌষধি

শ্রী মহাশয় ১০৮ এস পি দানজী কর্তৃক  
প্রস্তুত। এক মাত্র হাঁপানী নিঃশেষে আরোগ্য  
হয়। ২-৮-৫৭ তারিখ পূর্ণিমায় সেবা। ইংরেজীতে  
চিঠিপত্রাদি লিখুন। দ্রষ্টব্যঃ—বড় বড় ডাক্তার ও  
সম্রাজত ব্যক্তিদের প্রশংসাপত্রাদি দেখুন।

ম্যানেজার,

শ্রীচিত্রকূট দমনাশক আয়ুর্বেদিক

সিস্থ সেবা আশ্রম,

পোঃ চিত্রকূট (বান্দা), ইউ পি।

(এম ৮—১০।৭)

## ধবল ও কুষ্ঠ

গায়ে বিবিধ বর্ণের দাগ, স্পন্দনবিহীনতা, অস্বাভাবিক  
ক্ষীত, অঙ্গুলারির বক্রতা, বাতরক, একাধিক  
সারারোসিস ও অন্যান্য চর্মরোগাদি নিঃশেষে  
আরোগ্যে। মাত্র ৫০ বর্ষোন্মুখকালের চিকিৎসাজ্ঞা

## হাওড়া কুষ্ঠ কুটার

সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। আপনি আপন  
রোগলক্ষণ সহ পত্র লিখক। বিনামূল্যে  
ব্যবস্থা ও চিকিৎসাপত্রক লউন।

—প্রতিষ্ঠাতা—

পরিচিত ব্রাহ্মপ্রাণ শ্রমী কবিরাজ

১নং মাধব ঘোষ লেন, ব্রহ্মপুত্র হাওড়া।

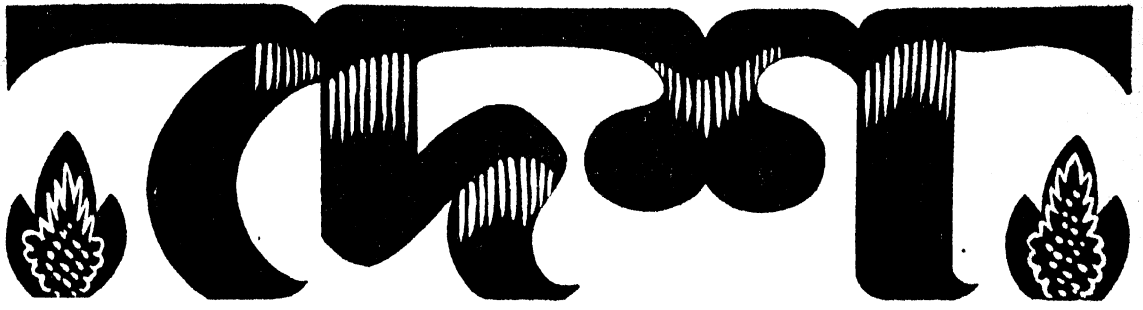
ফোন নং ৩৫১ হাওড়া।

বাখা - ৩৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

প্রেমবী সিনেমার মিলেটে।

শ্রীমামদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃকঃনং চিত্রমাণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগোবিন্দ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্বাধিকারী ও পরিচালকঃ—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্ধন স্ট্রীট, কলিকাতা।



সম্পাদক : শ্রীবাংকিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ ।

শনিবার, ৯ই শ্রাবণ, ১৩৫৪ সাল।

Saturday, 26th July, 1947

[ ৩৮শ সংখ্যা ]

### স্বাধীন ভারতের সাধনা

গত ১৮ই জুলাই ভারতীয় স্বাধীনতা বিল রাজকীয় স্বাক্ষর লাভ করিয়াছে এবং যথারীতি আইনে পরিণত হইয়াছে। ইহার ফলে ভারতবর্ষ শ্বিধা বিভক্ত হইয়া পাকিস্থান এবং ভারতীয় সংঘ—এই দুইটি স্বতন্ত্র ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকারসম্পন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হইল। ইংলন্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী এবং ভারতসচিব লর্ড লিস্টোয়েল এতদপক্ষে আমাদিগকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন। লর্ড লিস্টোয়েল বলিয়াছেন, 'অতঃপর ইংরেজ এবং ভারতবাসী সমান মর্যাদার অধিকারী হইল। স্বাধীন রাষ্ট্রনিচয় পরস্পরকে যেমন সম্মানের দৃষ্টিতে নিবীক্ষণ করে, আমরা অতঃপর পরস্পরকে সেইরূপ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিব।' কথাগুলি শ্রুতিতে বেশই ভালো; কিন্তু ব্রিটিশের শ্রুতচ্ছার মূলা আমরা জানি; অতীতের সেই পটভূমিকায় ভারতবাসী সমগ্র অন্তর দিয়া ভারত-সচিবের এই অভিনন্দনকে গ্রহণ করিতে পারিবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ভারতবাসীরা আজ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করিয়াছে সত্য; কিন্তু স্বাধীনতাকামী ভারত সে অধিকারকে উপেক্ষার দৃষ্টিতেই দেখিয়াছে এবং কোন-দিনই তাহাকে রাষ্ট্রীয় সাধনার সর্বোচ্চ অধিকারস্বরূপে গ্রহণ করে নাই। পঞ্চাশতরে ভারতের সহস্র সহস্র বীর সন্তান স্বাধীনতার পরিপূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আত্মদান করিয়াছেন। ততদিন সেই অধিকার আমরা লাভ না করিব এবং ব্রিটিশ পতাকা ভারতভূমি হইতে অপসারিত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত আমরা সন্তুষ্ট হইব না। কিন্তু ইহার চেয়েও আমাদের বৃক্কে বড় বেদনা রহিয়া যাইতেছে। ১৮৫৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র প্রথম

## সাময়িক

সংগ্রাম—সিপাহী বিদ্রোহ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪২ সালের আগস্ট বিপ্লব পর্যন্ত ভারতের জাতীয়তাবাদী সন্তানগণ অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার আদর্শের জন্যই অকুণ্ঠভাবে শোণিত বিসর্জন করিয়াছেন। আমরা একথা কিছতেই কিম্বত হইতে পারিতোছি না যে, আমাদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আজ ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছে সত্য; কিন্তু দুইশত বৎসরকাল ভারতে স্বার্থ শোষণের শিকড় চালাইয়া তাহারা ভারতের জাতীয় জীবনকে বিখণ্ডিত করিয়া যাইতেছে। ব্রিটিশ পরিত্যক্ত ভারত অসহায় এবং দর্বল। এরূপ অবস্থায় আমাদের পক্ষে বড় আশার কথা শ্রুত এই যে, ব্রিটিশ ভারতকে যেরূপ অবস্থায় রাখিয়া যাউক না কেন, তবু তাহারা যাইতেছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যগণ ব্রিটিশের এই ভারত-ত্যাগকে স্বেচ্ছাকৃত এবং ভারতবাসীদের নতুন রাষ্ট্র-মর্যাদা লাভকে ব্রিটিশের উদারপ্রসূত দান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই দানের জন্য প্রকাশ্যে ধোঁর বোধ করিয়াছেন। আমরা বলিব, তাহাদের এই বর্ণ নিতান্তই বৃথা। পরন্তু ব্রিটিশের ভারত-শাসনের সমগ্র ইতিহাস তাহাদিগের কলঙ্ককর স্মৃতিই বহন করিবে। ইংরেজ ভারতবাসীদিগকে স্বাধীনতার পথে স্বেচ্ছায় কোন অধিকার প্রদান করে নাই। প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসীকে অজস্র রক্তপাত করিয়াই সে অধিকার অর্জন করিতে হইয়াছে। নিষ্ঠুর সাম্রাজ্যবাদী শত্রুদের গুলী বৃক্ পাতিয়া লইয়া ভারতের বীর

সন্তানগণ আদর্শ সিঁধির অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন। ব্রিটিশ আজ ভারত ত্যাগ করিলেও তাহাদের দুষ্ট শাসন-নীতির বিষক্রিয়া ভারতের রাজনীতিক জীবনকে আড়ষ্ট করিয়া তুলিয়াছে, আমরা একথা কিছতেই ভুলিতে পারি না। চতুর্দিকে চাহিয়া ভারতের দিক-চক্রবাল এখনও অন্ধকারে অচ্ছন্ন দেখিতোছি। এই অন্ধকারের ভিতর দিয়া আমাদিগকে পথ করিয়া চলিতে হইবে। আমাদের সম্মুখে গুরুতর দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং ব্রিটিশের শাসন-নীতির কট্টকোশলে সম্প্রসারিত সাম্প্রদায়িক ভেদবিভেদের বিষক্রিয়া হইতে সমগ্র ভারতের সমাজ-জীবনকে মুক্ত করিয়া অখণ্ড রাষ্ট্রের ভিত্তিতে এই পুণ্য ভূমিকে সংহতিবদ্ধ করিতে হইবে। ব্রিটিশের ভারত ত্যাগের ফলে আমাদের এই কর্তব্য সম্পাদনের পথ সুগম হইল সন্দেহ নাই।

### পুলিশের দায়িত্ব

গত ১৯শে জুলাই বাঙলার পুলিশে বার্ষিক কৃচকাণ্ডরাজ সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে বাঙলার গভর্নর, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমন্ডলের পক্ষ হইতে ডক্টর শ্রীমত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং মিঃ সুরাবদী পুলিশকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করেন। বলা বাহুল্য, পুলিশের এই বার্ষিক অনুষ্ঠানে শাসকদের পক্ষ হইতে পুলিশের কর্তব্যপরায়ণতা সম্বন্ধে মামুলি প্রশংসিত ছাড়া বিশেষ কিছু থাকে না। কিন্তু বর্তমান বৎসরের এই অনুষ্ঠানের কিছু বিশেষ ছিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রিস্বরূপে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের বক্তৃতা এই বিশেষত্বের কারণ। বাঙলার শাসন বিভাগের দায়িত্ব লইয়া কংগ্রেসের পক্ষ হইতে পুলিশের দলের নিকট এইভাবে বক্তৃতা এই প্রথম এবং সমগ্র বাঙলার পুলিশের নিকট এ বক্তৃতা সৈদিক হইতে



শেষ বক্তৃতা বলা যায়। কারণ ইহার পর বাঙলার পুলিশ দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের শাসনকার্যে পৃথক হইয়া পড়িবে। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র বোস পুলিশকে তাহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সমাকরণে অবহিত করিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে স্পষ্ট ভাবেই এই কথা বলিয়া দিয়াছেন যে, জনসাধারণের সেবকম্বরূপেই তাহাদিগকে কাজ করিতে হইবে এবং শান্তিরক্ষা করাই তাহাদের কর্তব্য, পরন্তু শান্তিভংগ করা নয়; অতঃপর তাহারা যেন ইহা ভাল করিয়াই" বুঝিয়া চলে। শান্তিরক্ষার এই দায়িত্ব সম্পর্কে ডক্টর ঘোষ পুলিশ বিভাগকে সাম্প্রদায়িক আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সুদীর্ঘ লীগ-শাসনের আমলে নৈতিক আদর্শের দিক হইতে পুলিশ বিভাগের যেরূপ শোচনীয় অবনতি ঘটিয়াছে, তাহাতে ডক্টর ঘোষের বক্তৃতার মৌলিকতা সকলেই উপলব্ধি করিবেন। আমরা জানি, পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রিকম্বরূপ শ্রীযুত ঘোষ আইন ও শান্তিরক্ষার দায়িত্ব লইয়া পুলিশ বিভাগকে লীগ-শাসনের সাম্প্রদায়িক দৃষ্ট নীতি হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহার ফলে শহরের শান্তি অনেকটা সুবাসিত হইয়াও আসিয়াছে এবং সুবাসদীর্ঘ শাসনে পুলিশ বিভাগে যে অন্যার চলিতেছিল, তাহা ইহার মধ্যে অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। বক্তৃত শান্তিরক্ষার নামে শান্তিভংগ করা এবং দোষীকে সাজা দেওয়ার নামে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিবলে নির্দোষের লক্ষ্যনার যে দুঃপ্রবর্তি আমরা এতদিন পুলিশ বিভাগে লক্ষ্য করিয়াছি, পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা লাভের পর তাহা সংশোধনের লক্ষ্য রূমেই স্পষ্ট হইতেছে। ডক্টর ঘোষের বক্তৃতার পরিপ্রেক্ষিতে সেদিনকার পুলিশ প্যারেডে সুবাসদী সাহেব যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার বিচার করিলে পার্থক্য কোথায় সহজেই বোঝা যায়। অবশ্য বাঙলার লাট বারোজ সাহেবের বক্তৃতাও আছে; কিন্তু তাহার বক্তৃতাকে আমরা কোন মূল্য দেওয়া প্রয়োজন মনে করি না। ফলত বাঙলার শাসন-ব্যাপারে স্যার ফ্রেডারিক বারোজ কিছুমাত্র ব্যক্তিগত পরিচয় দিতে পারেন নাই। তিনি সুবাসদী মন্ত্রিমণ্ডলের নির্দেশ মান্য করিয়াই কৃতার্থ-সম্মত হইয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মিঃ সুবাসদী পুলিশের কর্তব্য সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। তাহার মতে সে সম্বন্ধে পুলিশকে বলিবার কিছুই নাই। তাহারা যোগ্যতার সঙ্গোই যথাযথভাবে কর্তব্য পালন করিয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে জনসাধারণই দোষী, কারণ তাহারা এমন সুযোগ্য পুলিশের কার্যেও দোষ ধরে এবং সংবাদপত্রগুলি অধিকতর দোষী; কারণ

অন্যভাবে পুলিশের কার্যের সমালোচনা করে। গত কয়েক মাসে বাঙলার একদল পুলিশ শান্তিরক্ষার কার্যে যেভাবে অকর্মণ্যতার পরিচয় দিয়াছে এবং বহু ক্ষেত্রে তাহাদের সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বের যে সব প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা জানিয়া সুদীনরাও পুলিশকে এই ধরনের সার্টিফিকেট প্রদান করা যে চূড়ান্ত নিলম্বিতার পরিচায়ক, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু মিঃ সুবাসদী সেজন্য চিন্তিত নহেন। তিনি এই জুলাইয়ের পুলিশী অনাচারকেও বেমালুম চাপিয়া গিয়াছেন। পুলিশের প্রশংসা কিংবা জনসাধারণকে নির্দা করিতে গিয়া সে নিষ্ঠুর পৈশাচিক লীলার স্মৃতিও তাহার বিবেককে বিন্দুমাত্র আহত করে নাই। মিঃ সুবাসদীর এই বক্তৃতা পূর্ব-বঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সাম্প্রদায়িক মনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে, তিনি তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন কি? ইতিমধ্যেই মোসলেম লীগের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিগত শাসনে তথাকার সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সাম্প্রদায়িক মনে বিশেষভাবে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে আইন ও শান্তিরক্ষার দিক হইতে সাম্প্রদায়িকতাকে কোনভাবেই প্রায় দেওয়া হইবে না এবং পুলিশের নীতিতে তেমন দুঃপ্রবৃত্তিকে দৃঢ় হস্তে দলন করা হইবে, পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সাম্প্রদায়িক পক্ষ হইতে সর্বাগ্রে এমন প্রতিশ্রুতি প্রদান করা প্রয়োজন। মিঃ সুবাসদী মুখ ফুটিয়া সেকথা বলিতে পারেন নাই। লীগ-নেতৃবৃন্দের প্রতিযোগিতার মধ্যে তেমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া সমীচীন হইবে না এবং সাম্প্রদায়িকতার বাসনায় তাহাকে মিছা পড়িতে হইবে; সম্ভবত এই ভয়েই তিনি সংকুচিত হইয়াছেন। বক্তৃত নেত গিরিই ইহাদের অনেকের কাছে বড় এবং ক্ষমতার লোভই অধিকাংশ লীগ নেতাকে প্রমত্ত করিয়া দিয়াছে। সেই নেতাগিরি পাইবার জন্য সাম্প্রদায়িকতাকেই ইহারা সর্বতোভাবে ভাঙাইতে বাস্তু। তাহার ফলে নির্দোষের রক্তপাত প্রভূতি যত অনর্থই ঘটুক না কেন, বিবেকবিহীন ইহাদের বিবেচনার মধ্যে আসে না। বাঙলার লীগ-শাসনের ইতিহাসে এ তথ্য অস্বস্তভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। এ অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলকে যতদিন তাহাদের হাতে ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তর না হয়, ততদিন পর্যন্ত শহরের শান্তিরক্ষার কার্যে অধিকতর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শহরের আতঙ্কের কারণ এখনও দূর হয় নাই; আমরা এই কথাই বলিব। সেই সপক্ষে পূর্ববঙ্গের নেতৃবৃন্দের কাছেও আমাদের এই অনুরোধ যে, তাহারা দেশের শৃঙ্খলমুখে সাম্প্রদায়িক

দৌরাত্ম্যের প্রতিকূলে সংহত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হউন।

#### পূর্ববঙ্গের সমস্যা—

পূর্ববঙ্গ পরিষদের কংগ্রেসদলের নেতা এবং পাকিস্থান গণপরিষদের সদস্য স্বরূপে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় সম্প্রতি সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। রায় মহাশয়ের এই বিবৃতির কয়েকটি অংশ বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,—“মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের মনোভাব হইতেই শান্তিপূর্ণ হউক না কেন এবং মুসলিম লীগ দলের সরকারী কর্মসূচী যাহাই হউক না কেন, সাধারণ মুসলমানদের ধারণা হইয়াছে যে, ১৫ই আগস্টের পর পাকিস্থানের হিন্দু অধিবাসীদের বাড়ি ঘর এবং জমাজমিও আপনা হইতেই মুসলমানদের অধিকারে চলিয়া আসিবে এবং পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের হিন্দুগণ তথাকার মুসলমানদের অধীন হইবে। ধর্মোন্মত্ত মুসলমানগণ পাকিস্থানী-কম্পনা কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবে বলিয়া বিশেষ-ভাবে আশঙ্কা হইতেছে। আমার এঁবরণে সন্দেহ নাই যে, এখন হইতে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হইলে মুসলিম লীগ মুসলমান জনতাকে সংযত রাখিতে পারিবে না। মিঃ জিয়ার বিবৃতির জন্য তাহাকে আমি অভিনন্দন জানাইতেছি; কিন্তু শৃঙ্খল বিবর্তিতে কাজ হইবে না। লীগের অনুগামীদের মধ্যে ব্যাপক উচ্চাখলতা নিবারণ করার আতঙ্কিত অভিপ্রায় লীগ নেতাদের সত্যি যদি থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের জেলাসমূহে সফর করিয়া মুসলমানদিগকে শান্ত থাকিবার জন্য আবেদন জানাইতে হইবে।” রায় মহাশয় খোলাখুলি কথা বলিয়াছেন, তাহার উক্তিতে একটু অতিরঞ্জন নাই। বক্তৃত সাম্প্রদায়িক সংস্কার মানদ্বকে অশ্ব করিয়া তোলে। অথচ মুসলিম লীগ মধ্যযুগীয় এই অশ্ব সাম্প্রদায়িকতাকে মূখ্যভাবে অবলম্বন করিয়াই তাহাদের নীতি পরিচালন করিয়াছে এবং সাম্প্রদায়িকতার দিক হইতেই পাকিস্থানীয় মহিমা বাড়িয়াছে। মুসলিম লীগের প্রচারের ফলে মুসলমান জনসাধারণের যুক্তিবোধ তলাইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের কাছে সাম্প্রদায়িকতাই হইয়াছে বড়। শৃঙ্খল হইতে সদুপদেশ বর্জিত করিয়া সাম্প্রদায়িক বিশ্বব-প্রসূত এই মনস্তাত্ত্বিক সত্যকে অস্বীকার করিলে চলিবে না। লীগ নেতারা সত্যি যদি পূর্ববঙ্গে শান্তি কামনা করেন তবে, কার্যত তাহাদিগকে সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে এবং তেমন দুঃপ্রবৃত্তিকে নিশ্চিত করিতে হইবে। লীগ-নেতাদের উপদলীয় স্বার্থের চক্রান্ত এবং

তাহাদের প্রভু প্রতিষ্ঠার লীলাখেলায় পূর্ব-বঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাহাদের চিরন্তন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে কিছুতেই বিপন্ন হইতে দিবে না। পরন্তু লীগের দুর্নীতির ফলে তাহাদের মধ্যে সংঘর্ষই স্বেচ্ছা হইয়া উঠিবে। সে শক্তি সামান্য নয়, একথা যেন লীগ-নেতারা স্মরণ রাখেন। বাঙলার অতীত স্বাধীনতা-সংগ্রামের বৈশ্বিক ইতিহাস এসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনে তাহাদিগকে সাহায্য করিবে।

### পাকিস্থান লাভে উল্লাস

লড়কে লেগে পাকিস্থান—পাকিস্থান এখন লীগওয়ালাদের লাভ হইয়াছে কিন্তু লীগের সাম্প্রদায়িক আবেগে অন্ধ একদল উৎকট অনু-রাগীর মধ্যে লড়াইয়ের প্রবৃত্তির তথাপি নিবর্তি ঘটে নাই। আখাউড়ার ঘটনা সে পক্ষে প্রমাণ। তাহার পরও আমরা পূর্ববঙ্গের নানা স্থান হইতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শব্দাহ, কীর্তন প্রভৃতি ব্যাপারে লীগ দলের অনুরক্ত ভক্তদের গুণ্ডামীর নানারকম সংবাদ পাইতেছি। পথে ঘাটে চলাফেরা করিতে ইহারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া হীনতাসূচক মন্তব্য করিতেছে। ইহাদের এই ধারণা হইয়াছে যে, পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা হওয়াতে পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাহাদের গোলামের পর্যাভুক্ত হইয়াছে। ইহারা স্কুল কলেজের মেয়েদের লক্ষ্য করিয়া অশ্লীল উক্তি ও ইঙ্গিত করিতেছে, ইহার ফলে অনেক স্থলে মেয়েদের পথের বাহির হওয়া ছাড়িতে হইয়াছে। সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জে কয়েকজন মুসলমান যুবক তিনটি হিন্দু ছাত্রীকে পথের মধ্যে দাঁড়াইতে বাধ্য করিয়া তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের ফটো তুলিয়া লয়। লীগের সাম্প্রদায়িক বিবেচনামূলক প্ররোচনার পরিণতি একটা সমাজকে কিরূপ উচ্ছ্বল এবং ভদ্ম রক্তচর্চায় বিরোধী করিয়া তুলিতে পারে এই সব ব্যাপারেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সেদিন স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ হিন্দু রাষ্ট্র হইবে না, ফলত ইহা হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েরই রাষ্ট্র এবং জাতীয়তাবাদই এই রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হইবে। লীগ-নায়ক মিঃ জিন্না কিবা তাহার অনুগতগণ এ পর্যন্ত খোলাখলি এমন কথা বলিতে পারেন নাই। সেদিন মিঃ জিন্না এই কথা মাত্র বলিয়াছেন যে, পাকিস্থান বিশেষ ধর্মের অনুশাসনানুসারে রাষ্ট্র হইবে না; কিন্তু এভাবে কথা নিতান্তই অস্পষ্ট। নারায়ণ-গঞ্জের মুসলিম লীগ স্কুল ছাত্রীদের ফটো তোলা ব্যাপারে প্রতিবাদ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিবাদই যথেষ্ট নয়। তাহাদের মনেপ্রাণে এই সত্য উপলব্ধি করা উচিত যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি যদি পাকিস্থানের উৎকট অনুরাগীরা এইভাবে অনাচার ও উপদ্রব

চালাইতে থাকে, তবে সত্তা সমাজে পাকিস্থান-ওয়ালাদের মূখ্য রাখবার স্থান থাকিবে না এবং শৃঙ্খলা তাহাই নয়, পাকিস্থানী রাষ্ট্রের সামাজিক এবং অর্থনীতিক জীবনও গঠন করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। লীগের এইসব উৎকট অনু-রাগীরা যেন স্মরণ রাখে যে, মধ্যযুগীয় বর্ষারতর দিন শেষ হইয়াছে, এখন পাকিস্থানী উল্লাসের বশে যদি তাহাদের সমাজ জীবনে ধর্মাত্মতার দৃষ্টপ্রবর্তি জাগিয়া উঠে, তবে দুইদিন পরে নিজেদের সম্প্রদায়কেই তাহা আঘাত করিবে। সুতরাং পাকিস্থানী উল্লাসের মধ্যে কোনস্থানে যদি সাম্প্র-দায়িক অসংযত প্রবৃত্তি প্রস্রাব পায়, লীগ-নেতাদের নিজেদেরই স্বার্থের দায়ে তাহা কঠোরহস্তে দমন করা কর্তব্য। লীগওয়ালারা অবিলম্বে এই সত্য সুনিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করুন যে, নৈতিক ভিত্তি লঙ্ঘন করিয়া কোথায়ও রাষ্ট্রজীবন গঠিত হইতে পারে না। ফলত নীতিহীনতা রাষ্ট্রকে ও সমাজকে দুর্বল করিয়াই ফেলে, গুণ্ডাদের ছুরির জোরে কোন রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠিত রাখা যায় না এবং এখানেও যাইবে না। মানুষ পশুত্বের কাছে নতি স্বীকার করে না। ফলত পশুর দোরাখ্যা সাময়িক মাত্র, পরিশেষে মানুষের কাছে পশু-বৃত্তিকে নতি স্বীকার করিতেই হয়।

### ব্রহ্মে বিভীষিকা

গত ১৯শে জুলাই ব্রহ্মের জনমান্য তরুণ নেতা ও ব্রহ্ম গভর্নমেন্টের ভাইস-প্রেসিডেন্ট জেনারেল আউগ সান এবং তাহার সহকর্মী আরও পাঁচজন মন্ত্রী আততায়ীর আক্রমণে নিহত হইয়াছেন। পরদিন আরও দুইজন আহত মন্ত্রীও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদে শৃঙ্খল ব্রহ্ম বা ভারত নহে, সমগ্র ভগ্ন স্তম্ভিত হইয়াছে। ব্রহ্ম আজ স্বাধীনতার দ্বারদেশে পৌঁছিয়াছে, এই সময় জেনারেল আউগ-সানের নাম জাতির স্বাধীনতাকামী বীর যোদ্ধার এই শোচনীয় মৃত্যু ভারতবাসীর চিত্রে গভীর বেদনা জাগাইয়া তুলিয়াছে। জেনারেল আউগ-সান ব্রহ্মের ফ্যাসিস্টবিরোধী গণস্বাধীনতা সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বিগত মহাযুদ্ধের সময় ব্রহ্মের স্বাধীনতাকামী এই বীর সন্তান প্রথমে জাপানীদের সঙ্গে যোগ দিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, পরে জাপানীদের পররাজ্য গ্রাস নীতির পরিচয় পাইয়া তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে গরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ব্রহ্মের স্বাধীনতাকে তিনি তাহার জীবনের লক্ষ্যস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। জেনারেল আউগ-সানের এই হত্যাকাণ্ডের কারণ রাজনীতিক বলিয়াই মনে হয়। ব্রহ্মের একদল উগ্রপন্থী তাহার মতের সমর্থক ছিল না। ইহার কারণ এই যে, তিনি ইংরেজের সঙ্গে কতকটা আপোষ-নিষ্পত্তি সূত্রে উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের

পথে দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। জেনারেলের উদ্দিষ্ট ব্রহ্মের সেই স্বাধীনতা দূরবর্তী ছিল না। তিনি ব্রহ্মের পূর্ণ স্বাধীনতা আঁচরে প্রতিষ্ঠা করিতেই সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। জেনারেল আউগ-সান বস্তুত নিয়মতান্ত্রিক নীতিকে কোন দিনই সমর্থন করেন নাই। কিন্তু তথাপি ব্রহ্মের একদল তাহার নীতিতে সন্তুষ্ট ছিল না। উগ্রপন্থীরা এখনই পূর্ণভাবে ব্রিটিশের সম্পর্ক ছিন্ন করিবে, ইহাই দাবী করে। ইহা ছাড়া, ব্রহ্মের আর এক দল রাজনীতিক জেনারেল আউগ-সানের সমর্থক ছিলেন না। তাহার সমাজতান্ত্রিক নীতির সঙ্গে ইহাদের বিরোধ ছিল। মোটের উপর রাজনীতিক উপদলীয় চক্রান্তে কিছুদিন হইতেই ব্রহ্মের রাজনীতিক জীবনে একটা আলোড়ন উঠে এবং ক্ষমতালালী নেতারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। জেনারেল আউগ-সানের মনীষা এবং প্রতিভা-বল এই সব বিবর্তমান দলের মধ্যে কতকটা সংহতি আনিতে সমর্থ হইয়াছিল; কিন্তু ক্ষমতালোভীদের ঈর্ষানল সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। ব্রহ্মের সাম্প্রতিক শোচনীয় ব্যাপারের মূলে এই ধরণের উপদলীয় চক্রান্ত রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। বস্তুত দলীয় বিবেচ্যেরই ইহা জঘন্য পরিণতি। রাজনীতিক উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য হত্যাকাণ্ডকে পদ্ধতিস্বরূপে গ্রহণ করিবার ব্যর্থতা সব দেশেই প্রমাণিত হইয়াছে। ব্রহ্মের ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিবে। যাহারা আউগ-সানের নাম নেতাকে বিবেচনায় হত্যা করিল, তাহাদের উপদলীয় সংকীর্ণ স্বার্থমূলক উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হইবে এবং সাময়িক বিভীষিকা এড়াইয়া স্বাধীন ব্রহ্মের অভ্যুদয় ঘটিবে, এই আশা অন্তরে লইয়া আমরা জেনারেল আউগ-সান এবং তাহার দেশপ্রেমিক সতীর্থগণের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ নিবেদন করিতেছি।

### সীমান্তের গণভোট—

উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের গণভোটের ফল ঘোষিত হইয়াছে। গত নির্বাচনে কংগ্রেসী দল বিপুল ভোটাধিক্যে এই প্রদেশে মন্ত্রিস্থের আসন অধিকার করে। সাম্প্রতিক এই গণভোট কংগ্রেসীদল প্রাতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে নাই। সুতরাং লীগদল একতরফা বিনা বাধ্য যত ইচ্ছা ভোট জাল করিয়াছে এবং ভোট শাঠ্য চালাইয়াছে। কিন্তু তথাপি ভোটের ফলে দেখা যায় যে, পাকিস্থানের পক্ষে সমগ্র ভোটসংখ্যার মাত্র ৫০-৪৯ ভোট মিলিয়াছে। সুতরাং ভোট-দাতাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক পাকিস্থানে যোগদানের পক্ষে নয়। সীমান্তের গণভোটের ব্যাপারে এইরূপ ভোটের মূল নীতি ফলে তথাকার সমস্যা মিটিল বলিয়া মনে হয় না।



পাকিস্তান



১৫

শিল্পী : শ্রীবিনয়ক মলোজী

# মহানগরীর পথ

আশরাফ সিদ্দিকী

এখানে নিশ্চুত রাতে শম্শম হিমেল বাতাসে  
কাঁদের শহীদ প্রাণ শূন্য যেন কাঁদছে তির্যাসে  
কাঁদের রোদন ধ্বনি শূন্য যেন ভেসে ভেসে আসে  
কাঁদের পায়ের শব্দ শূন্য যেন বাজে মোর পাশে.....

এক দুই তিন চার শত শত হাজার হাজার  
কারা যেন বৃষ্টিপাত দিকে দিকে তোলে হাহাকার  
কারা যেন দল বেঁধে চুপিচুপি ডাকছে আমার  
জমাট রক্তের ঘাড়ে ঘুম ভেঙে যায়.....

মনে পড়ে পঞ্চাশের বৃষ্টিপাত কংকাল মিছিল  
পার হয়ে কত পথ পার হয়ে কত প্রান্তর  
দুঃখের সন্তান বৃকে এইখানে পথের উপর  
দুঃখের অম্লের তরে তারা সব পেতেছিল হাত  
দুঃখের অম্লের তরে কত সত্যী দেহের বেসাত  
এইখানে করে গেছে—এইখানে সে সব কংকাল  
নীরের কবর হতে উঠে এসে তোলে ফরিয়াদ  
রাতের বাতাস সনে তারা সব করে আতর্নাদ.....

ভুলি নাই বাহ্যের রক্তের প্লাবন  
আরেক কারবালা ঝড় : আরেক অস্ত্রের বনবন  
নিজের বিক্রয় করে পশুর মতন বেঁচে থাকা  
জুলুমের অস্ত্রোপাশে মৃত্যুর মতন বেঁচে থাকা  
ব্যথার জিন্জীর পায় যুগ যুগ এই বেঁচে থাকা.....  
তাদের কোমল চোখে জানি জানি এনিছিল নীর  
তাদের কোমল বৃক জানি তাই রহে নাই স্থির  
মানুষের দাবী ল'য়ে তারা সব করেছিল ভীড়.....

তাদের বৃকের রক্ত তাহাদের অন্তিম নিশাস  
লিখে লিখে রেখে গেছে আরেক কারবালা ইতিহাস.....

বেয়নেট বেঁধা বৃক বৃলেট বিক্ষত কলেবর  
এইসব রাজপথে তারা সব তোলে আত্মবর  
নিশীথের বৃক চিরে তারা শূন্য তোলে আহাজার  
শহীদের তাজা খুন চেয়েছিল এর প্রতিকার.....

কার রক্তে নিলে ভাই আজ তার প্রতিশোধ তুমি  
কার রক্তে কলংকিত হলো পুনঃ এইসব ভূমি  
অভিশাপ কোন শতাব্দীর, অভিশাপ কোন সভাতার  
এ কোন ব্যাধের শরে কেঁপে মরে লাখো লাখো নিজীব শিকার—

জবাব যে দেবে—

ভোরা বিম্ব দেহ তার লুটায় পড়েছে এই ভূমে  
জবাব যাহার কণ্ঠে সেই বীর পড়ে আছে মরণের ঘূমে.....  
এখানে নিশ্চুত রাতে শম্শম রাতের বাতাস—  
কান পেতে শুনো তুমি রূপিরক্ত আশ্রয় রক্তন :  
এক দুই তিন চার শত শত হাজার হাজার  
তারা সব দল বেঁধে এ রক্তের চায় প্রতিকার  
তারা সব দল বেঁধে এ রক্তের চায় সুবিচার  
তারা সব দল বেঁধে অবিরাম করে ইন্তেজার :

জৈহাদের বাণ্ডারোলে কেঁপে ওঠা আর এক ভোর  
শতাব্দীর কারাবারে তীর হানা আর এক ভোর  
এজিদের লাল খুন রেঙে ওঠা আর এক ভোর.....

এইসব রাতজাগা শহীদের কাতর কাঁদনে  
আজিও রক্তিম ঝড় জাগেনি এখানে—

## হেনা

শ্রীকল্যাণী মিত্র

ওরে মোর আঁধারের হেনা  
তোরা সাথে চেনা  
আকস্মিক।  
দিক হতে দিক  
অমাবস্যা অন্ধকারে  
শ্রাবণ মেঘের ভায়ে  
লুপ্ত যবে,  
সুপ্ত যবে  
গৃহকোণে ক্লান্ত দীপশিখা।  
সুদীর্ঘ সৌরভের লিখা  
বৃষ্টিপাত ছন্দে মিশি  
ব্যাকুল করিল নিশি  
সুদীর্ঘ ছন্দে গাঁথা সুচিকণ কবিতার মত।  
বৃষ্টির দৃশ্য ছিল যত,

ঝটিকায় ভেঙে পড়া আশা,  
তমসায় মিশে যাওয়া ভাষা—  
সব কিছুর ধন্য হোল মোর  
রূপ তোরা  
অন্ধকার কুজবনে  
জোনাকিরা ক্ষণে ক্ষণে  
দেখাতে না পারে;  
শূন্য বারে বারে  
সিস্ত বায়ু পাঠাইল গন্ধের লিপিকা  
সকল প্রাণের গীতিকার—  
নাহি-পাওয়া চুম্বনের মদির আভাস  
এনে দিল কুসুমসুধাস  
আনন্দের ঘোরে  
নিদ্রা নিল হরে॥

## ইন্ডিয়া অ্যাক্ট

ভারতবর্ষ বিষয়ক শেষ আইন ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট (ভারতীয় স্বাধীনতা আইন) গত ১৮ই জুলাই সম্পূর্ণ আইনে পরিণত হয়েছে। ৩১শে ডিসেম্বর ১৬০০ খৃষ্টাব্দে রাণী এলিজাবেথ ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানীকে প্রথম সনন্দ দান করেন, এই সনন্দ দ্বারা একমাত্র এই কম্পানী প্রাচ্যদেশে একচেটিয়া ব্যবসা করবার অধিকার লাভ করে। ধরতে গেলে ভারতবর্ষ বিষয়ে ইংরেজদের এইটিই প্রথম সনন্দ। এর পরে রাজা প্রথম জেমস, প্রথম চার্লস, দ্বিতীয় চার্লস এবং দ্বিতীয় জেমসের পর পর সনন্দ দ্বারা ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানীকে প্রদত্ত ক্ষমতা ও অধিকার আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং কম্পানীর কর্মচারীদের জন্য কয়েকটি আইন প্রণয়ন করা হয়, তাছাড়া ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানীকে মদ্রা প্রস্তুত করবার ক্ষমতাও দেওয়া হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যুদ্ধ ঘোষণা এবং শান্তি স্থাপনেরও অধিকারী তাঁরা হলেন। ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে একটি সনন্দ দ্বারা বোম্বাইয়ের কর্তৃত্ব ভার ও ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানীকে দেওয়া হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে কম্পানী বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন। তারপর ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে গুরুত্বপূর্ণ আইন রেগুলেটিং অ্যাক্ট ইংল্যান্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থ বিধিবদ্ধ করেন; এই আইন দ্বারা ভারতে বিজিত দেশসমূহের ওপর ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানীর অধিকার মেনে নেওয়া হয়, কিন্তু কম্পানীর নীতি ও শাসনপদ্ধতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাল্যামেন্টে তদারক করবেন এই রকম ব্যবস্থা হল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই কিন্তু রেগুলেটিং অ্যাক্টের কয়েকটি দৃষ্টি ধরা পড়ল, তখন ইংল্যান্ডের প্রধান মন্ত্রী ছোট উইলিয়াম পিট ১৭৮৪ সালে একটি নতুন আইন বিধিবদ্ধ করলেন। এই আইন পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নামে পরিচিত। এই আইন দ্বারা ভারত সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে ইংল্যান্ডের মন্ত্রিসভার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'ল, কিন্তু গভর্নর জেনারেলকে তার কাউন্সিলের মুখ্যপক্ষী থাকতে হ'ত আর সুপ্রীম কোর্টের তর্কিতকরণও অনিশ্চিত রইল। পরে ১৭৮৬ সালে পিট আরও একটি আইন দ্বারা এই দৃষ্টি সংশোধন করেন। ১৭৯৩ সালে আর একটি

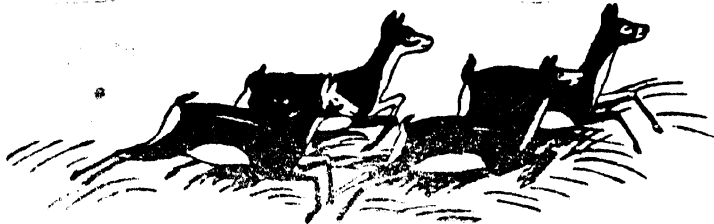


সনন্দ দ্বারা কম্পানীকে আরও বিশ বৎসরের জন্য ভারতবর্ষে বাণিজ্য ও রাজ্য শাসন করবার অধিকার দেওয়া হয়। এই বিশ বৎসরের মেয়াদ শেষ হতেই ১৮১৩ সালের সনন্দ দ্বারা ভারতবর্ষে ইংল্যান্ড রাজ্যের সার্বভৌম অধিকার ঘোষিত হল। কিন্তু শাসনভার আরও বিশ বৎসরের জন্য কম্পানীর হাতেই রয়ে গেল, তবে একচেটিয়া ব্যবসা করবার অধিকার আর দেওয়া হলো না। আরও বিশ বৎসর গেল, এল ১৮৩৩, কম্পানীকে দেওয়া হলো আবার একটি নতুন সনন্দ। এই সনন্দ দ্বারা উইলিয়াম বেন্টিনক প্রথম গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হলেন। সনদের বুদ্ধি আর শেষ নেই, ১৮৫৩ সালে আবার একটি সনন্দ! যার দ্বারা অন্যান্য পরিবর্তনের সঙ্গে বাঙলার শাসনভার একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের ওপর দেওয়া হয়। তারপর ভারতে কম্পানীর শাসনের শতবর্ষ পূর্ণ হলো, হলো সিপাহি বিদ্রোহ, প্রথম জনজাগরণ, কম্পানীর হাতে আর শাসনভার রাখা যায় না; তাই ১৮৫৮ সালে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টের সৃষ্টি হলো। মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করলেন। ১৮৬১ সালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট প্রণীত হলো। এই আইন দ্বারা বাঙলা, বোম্বাই, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হলো। ১৮৯২ সালে আরও একটি ইন্ডিয়া কাউন্সিল অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হলো। এর দ্বারা বড়লাটের ও প্রাদেশিক শাসন পরিষদের সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হলো। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদগুলি ভারত সরকার কৃত আইনের সংশোধন করবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হলো আর অর্থনৈতিক ও শাসনকার্য সম্বন্ধে গভর্নমেন্টকে প্রশ্ন করবার ও নিজ মত ব্যক্ত করবার অধিকার ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যদের দেওয়া হলো। ১৯০৯ সালে যে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল

অ্যাক্ট চালু করা হলো তা মর্লে-মিটো রিফর্ম নামে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। এই আইনের দ্বারা সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হলো। বড়লাট মিটোর ইচ্ছাতে আগা খাঁ মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে এই পৃথক নির্বাচন দাবী করেন। প্রথম মহাত্মা গান্ধীর পর প্রবর্তিত হলো মর্লে-মিটো-চেমসফোর্ড রিফর্ম অথবা ১৯১৯ সালের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট। এই আইনের দ্বারা ভারত শাসনের নানারূপ সংস্কার করা হলো, যাতে দেশবাসী খুশি হলো না। ফলে ১৯২৭ সালে সাইমন কমিশন বসল, গোলচৌকল বৈঠক এবং আরও একটি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট (১৯৩৫) লাভ হলো। এই আইনের দ্বারা প্রাদেশিক আয়-কর্তৃত্ব প্রবর্তিত হয়। এই আইন অনুযায়ী ভারতে যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু গঠিত হয়নি। ১৯৪৭ সালের শেষে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অথবা ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট দ্বারা ভারতে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা হলো, যুক্ত ভারত ও পাকিস্থান।

### লেখক উইনস্টন চার্চিল

কিছুদিন পূর্বে ইংল্যান্ডের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রীর শরীরে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল, সেজন্য চিকিৎসকেরা তাঁর কার্যক্রম অনেক কমিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু লেখার অভ্যাস এবং সময় কোনোটা ই চার্চিল সাহেব ছাড়তে অথবা কমাতে পারেন নি। তিনি গত মহাবুদ্ধি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একখানি বই লিখেছেন। এই বই রুমশ প্রকাশ করবার জন্য কোনো একটি মার্কিন প্রকাশক তাঁকে আড়াই লক্ষ পাউন্ড দিতে রাজি হয়েছেন তবে দু'থের বিষয় এই যে, চার্চিল সাহেব তা থেকে বিশ হাজার পাউন্ডের বেশী পাবেন কিনা সন্দেহ। আয়কর ও অতিরিক্ত কর দিতেই বেশীর ভাগ টাকা চলে যাবে; তবে লেখকদের অনুকূলে আয়কর আইনের একটি ধারা হয়ত চার্চিল সাহেবকে কিছু সহায়্য করতে পারে। কিছুদিন আগে 'লাইফ' পত্রিকায় বিলাতের পার্লামেন্টের গুরুত্ব অধিবেশনে প্রদত্ত তিনিই বক্তৃতা প্রকাশিত হয়েছিল। চার্চিল সাহেব বলেছিলেন তা থেকে তিনি যা অর্থ পেয়েছেন তাতে তাঁর বাকি জীবন বেশ কেটে যাবে। প্রথম মহাবুদ্ধির সময় ইংল্যান্ডের প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ সাহেবও 'যুদ্ধের-স্মৃতি' পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।





# অশুখের অভিশাপ

শ্রীপ্রমথনাথ বিনী

(১)

দুর্দশানির বাড়ির আঙিনায় যখন দুইপক্ষে যায় প্রাণ থাকে মান করিয়া লড়াই লিভেছিল জোড়াদাঁঘির অধিবাসীদের উপরে গহার প্রতিক্রিয়া বিচিত্রভাবে দেখা দিতেছিল। গঙ্গা শব্দ হইয়াছিল বেলা দশটা এগারোটায়— নামে তখনো মধ্যাহ্নভোজনের সময় নয়, জাড়াদাঁঘিতে কাহারো আহার হয় নাই। আর এই অতিক্রান্তভাবে হাংগামা শব্দ হইয়া গেলোতে সে বেলা অনেক বাড়িতেই মধ্যাহ্ন-ভোজন অসমাপ্ত রহিয়া গেল। যাহারা প্রাত্যহিক যত্নে যত্নে নয়—নিজ নিজ স্বার্থ ও নোভাব অনুসারে তাহারা উৎসুক ও চণ্ডল ইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

জাঠিয়াজগণ চলিয়া গেলে নবীননারায়ণ বঠকখনার মধ্যে একাকী পায়চারি করিতে গিলিল—আর বারংবার চুলের মধ্যে আঙুল চালনা করিয়া তাহাদিগকে যথাসম্ভব অধিনাস্ত করিতে থাকিল। ওই তাহার দুশ্চিন্তার মূদ্রা-দাঘ। চিন্তা করিবার সময়ে, উদ্বেগের সময়ে ন স্থির হইয়া বসিতে পারে না। যদি বা গম্ভীর বোধ করিয়া এক আধবার বসে, তখনই মবার উঠিয়া স্বিগুণে বেগে দ্রুততর গতিতে উয়চারি আরম্ভ করে। তাহার দেহটা যখন নয়মিততালে নিয়মিতভাবে সন্তরণ করিতেছে, নটরও তখন বিশ্রাম নাই, বেচারী চিন্তার জিজ-কাটা নিরিখ ধরিয়া আপন নিয়মে লিয়াছে।

নবীননারায়ণ পায়চারি করিতে করিতে একবার থামে—জনতার একটা আওয়াজের স্কা তাহার কানে প্রবেশ করে, তাহার অর্থ দুখিয়ার চেষ্টায় নবীনের কপাল কৃণ্ডিত হইয়া ওঠে, আওয়াজ কমিয়া আসে, সে সন্দেহবচক মাঙলের ভঙ্গী করিয়া আবার পায়চারি শব্দ ধরে। সেদিন সে যে বিসর্জনের বজনার কথা লিয়াছিল—তাহার মনে হইল এই দাঙা সেই বসজনের বিবাদময় উৎসবেরই একটা অঙ্গ— দুখি বা প্রধানতম অঙ্গ! নবীন একবার করিয়া ডায়, কান পাতিয়া শোনে, দীর্ঘনিঃস্বাস ফলিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করে।

মুক্তামালা তখন সবে স্নান সারিয়া বাহির ইয়াছে। তখনো তাহার প্রলম্বিত কেশরাশি ইতে জল পড়িবার বিরাম হয় নাই, তখনো

তাহার চোখের পাতা জলের ভারে ভারি, চোখের কোণ ঈষৎ রাঙা, তখনো স্নানের আয়াসে বক্ষ ঘন ঘন দুলিতেছে, এমন সময়ে দাঙার শব্দ ও দাসীদের মুখে তাহার সংবাদ যুগপৎ তাহার কানে আসিল। সে জানলার কাছে গিয়া দাঁড়াইল—ভাবিল পরিণাম দেখিয়া প্রসমানে যাইবে। কিন্তু কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বুদ্ধিল ব্যাপার শীঘ্র মিটিবার নয়। সে চুল আঁচড়াইবার জন্য প্রকাণ্ড আয়নার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু একি! আয়নায় প্রতিবিম্ব কেই? দুর্দীনবার ভালো করিয়া চাহিতে অবশেষে প্রতিবিম্ব যখন তাহার চোখে পড়িল—সে নিজের ছায়াকে নিজে চিনিতে পারিল না। একি তাহার ছায়া? এমন মলিন কেন? অনেকক্ষণ সূর্য-লেকের দিকে তাকাইয়া থাকিবার ফলে যে এমন ঘটিতে পারে সে কথা তাহার মনে আসিল না। তাহার চোখে সমস্ত জগৎ আজ মলিন হইয়া গিয়াছে। কোন রকমে প্রসাধন সারিয়া সীমন্তে সিঁদুর টানিয়া সে জানলার কাছে ফিরিয়া আসিল—এবং দুই হাতে জমলার লোহার গরাদ ধরিয়া দশানির বাড়ির অভিমুখে বুকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দুশ্চিন্তার সময়ে নবীনের পায়চারির অভ্যাস আর মুক্তামালার অভ্যাস নিশ্চল দাঁড়াইয়া থাকা। স্থানবৎ দাঁড়াইয়া থাকিতে তাহার শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, সময়জ্ঞান নাই, সন্নিব নাই—সে যেন পাষণী হইয়া যায়। তাহার বকের চপে লোহার গরাদ তপ্ত হইয়া উঠিল তবু তাহার সন্নিব ফিরিল না। এক একবার জগার মা আসিয়া ডাকিয়া যায়—বোমা—এসো একটু জল খাও! কখনো বা সে আসিয়া বলে—বোমা, চিন্তা করো না, জমিদারদের ঘরে অমন হাঙ্গেরি থাকে! আমরা কত দেখলাম। কিন্তু আজ তাহার কথাব কেহ উত্তর দেয় না!

জগার মার কথা আংশিক মাত্র সত্য! মুক্তামালার দুশ্চিন্তা কি কেবল তাহার পরিবারের আর্থিক পরিণামের জন্য? স্বপক্ষের কয়েকটি লোকের প্রাণনশের আশঙ্কায়? ততোধিক কিছু নহে কি? তাহার সন্ত মলিন সরোবরের মতো নিম্পলক দুটি নেত্র হইতে যে অপরিমেয় করুণা ক্ষরিত হইতেছে তাহা কি

মাত্র দশানি ছ'আনি দাঙা প্রশমনের জন্য? সে ঘনীভূত ধারায় যে বিশ্বের সমুদায় আধি-নিবারিত হইতে পারে! পুরুষে গোরব করিয়া থাকে যে ধর্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সে বকের রক্ত সমর্পণ করে! কিন্তু আরও একটা হিসাব আছে। সে হিসাব কেহ করুক আর না করুক মনুষ্যের ডান্ডারী কখনো তাহা বিস্মৃত হন না। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে পুরুষে যত রক্ত ঢালিয়াছে নারীর উৎসর্গ চোখের জল কি তাহার চেয়ে অল্প? যে জলে মরু হাসিতে পারিত, পুরুষ তাহার প্রকৃত ব্যবহার জানে না, অকারণে সেই জলধারা সমুদ্রে গিয়া পড়িতেছে, তাহার অধিকাংশই সংসারের কাজে লাগিতেছে না। যেটুকু কাজে লাগিতেছে তাহাতেই না মরুভূমির ওষ্ঠাধর প্রান্তে স্মিত লেখা? তাহাতেই না পুরুষ দেবত্বের সীমান্ত স্পর্শ করিবার আশ্পর্শ করে?

মুক্তামালা কাহারো প্রশ্নে কোন সাড়া দিল না, মাথার উপর দিয়া বেলা গড়াইয়া গেল—সে পাষণবৎ নিশ্চল দাঁড়াইয়াই রহিল! পাষণে এত করুণা? নহে কেন? হিমালয়ের কথা চিন্তা করিয়া দেখো।

নীলাম্বর ঘোষ কল্পনা করিতে পারে নাই যে এত শীঘ্র সেই পরমবাঞ্চিত দাঙা বাধিয়া উঠিবে। সকালবেলায় সে শূপারির বাগান তদারক করিতে গিয়াছিল, এমন সময়ে সংবাদ পাইল যে দশানির বাড়িতে দাঙা বাধিয়া গিয়াছে। অমনি সে দ্রুত বাড়িতে ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়াই একখানি শূদ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া, গায়ে নামাবলী জড়াইয়া নবনির্মিত পাকা বাড়িটির বারান্দায় একখানা আসন টানিয়া লইয়া বসিল। এই বাড়িটি এখনো অসম্পূর্ণ। বারান্দাটা মাত্র শেষ হইয়াছে—কিন্তু এখনো অন্য অংশের ছাদ দেওয়া হয় নাই। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যদি দেব দ্বিজে তাহার ভক্তি সত্য হয়, যদি গীতা অভ্যস্ত হয়, তবে ছাদের ব্যবস্থা হইবার আগে জমিদারদের দাঙা কখনো মিটিতে পারে না।

নীলাম্বর ঘোষ আসনের উপরে বসিয়া ভক্তি গদগদ কণ্ঠে গীতা পাঠ আরম্ভ করিয়া দিল।

“ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ  
মামকাঃ পাণ্ডবাস্চৈব কিমকুবন্ত সজয়া।”

সম্মুখে এবং পশ্চাতে শরীর কিণ্ডৎ দুলাইতে দুলাইতে করজোড়ে তাহার গীতা-পাঠ দেখিলে নিতান্ত নাস্তিকেরও প্রত্যয় না জন্মিয়া পারে না যে পাঠক মহাশয় একজন সাধু পুরুষ। যাহারা ধর্মকে সাংসারিক প্রয়োজনের অতীত মনে করে নীলাম্বর তাহাদের দলের নয়। যে বলিয়া থাকে যে ধর্ম যদি আমার সামান্য প্রয়োজনটুকু মিটাইতে না পারিল তবে তাহার মাহাত্ম্য কোথায়? তবে সে রূপ ধর্মের জন্য মানুষ কেন দুঃখ সহ্য করিবে?

তাহার বাড়ীর ছাদ পাকা হইবার আগেই যদি জমিদারদের লড়াই মিটিয়া যায়, তবে শাস্ত মিথ্যা। জোড়াদাঁঘির ভ্রাতৃযুদ্ধের সকল পরিণতিতে মহাভারতের ভ্রাতৃযুদ্ধের বিবরণ কপিৎ সন্ধ্যা করিতে পারে ভাবিয়া সে গীতা পাঠ আরম্ভ করিয়াছিল—সে আবৃত্তি করিতেছিল—

দৃষ্টদা তু পাণ্ডবানীকং বুঢ়ং দুৰ্যোধনসুদতা।

আচার্য মূপসংগম্য রাজা বচনমবধায়।

বাস্তবিক গীতার এমন ফলিত ব্যবহার কমজনের দ্বারা সম্ভব হয়।

দুর্যোধন পাণ্ডব পক্ষের বীরগণের নাম দ্রোণাচার্যকে বলিতেছেন—

অস্ত্রশূরা মহেশ্বরা ভীমার্জুনসমা যুধি  
যুধাধানো বিরাটচ দ্রুপদশ মহারথঃ॥

নীলাম্বর মুখে এই শ্লোকটি পড়িল—  
আর মনে চিন্তা করিতে লাগিল—হাঁ, বর্তমান ধর্মক্ষেত্রেও নৈমিষ, পঞ্চ, যদুময়, মালপ্তির শ্রেণ প্রভৃতি বিখ্যাত যোদ্ধাগণ সমবেত হইয়াছে। হঠাৎ তাহার কানে একবার সমবেত যোদ্ধাদের তুমুল হুংকার প্রবেশ করিল, অমনি মনে পড়িয়া গেল—

ততঃ শৃংখাচ ভেষ্যিচ পণবানক-গোমুখাঃ।

সহসৈবাহান্যত শ শব্দস্তুমুলোহভবৎ॥

না! গীতা সত্য না হইয়া যায় না। নতুবা সেকালের পৌরাণিক ঘটনা ও একালের বাস্তব ঘটনায় এমন মিল কি করিয়া হয়? নীলাম্বরের গীতার প্রতি ভক্তি বাড়িয়া যায়—সে দুঃলিয়া দুঃলিয়া পাঠ করিতে থাকে—এবং এক একবার খোলা ছাদের দিকে তাকাইয়া সেটা গাথিয়া তুলিতে কত খরচ পড়িবে মানসাত্মক কথিয়া লয়। নীলাম্বরের তৎকালীন মনস্তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে ভারত যুদ্ধের প্রাক্কালে মাতুল শকুনির মনোভাব খানিকটা বুঝিতে পারা যাইবে।

জগদ সুরকারের দোকানে জগদ নিজে, ঘাড়টান পশ্চান, যোগেশ নায়েব ও বদিনাথ বাসিয়া মদ্যস্বরে আলাপ করিতেছিল। যদুযন্তকারীদের অভীষ্ট সিদ্ধি নিকটবর্তী—এখন আর তাহাদের করিবার কিছু নাই—কেবল বিধাতার কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া। কিন্তু বিধাতার কাছে প্রার্থনা কিভাবে কি ভাষায় করিতে হয় সে বিষয়ে জ্ঞান তাহাদের অত্যন্ত অস্পষ্ট—কাজেই তাহারা সে দুঃহ চেষ্টা না করিয়া এই দাঙ্গার পরিণাম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল!

একজন শূরাইল—শশাংক ঠাকুর কোথায়? বদিনাথ বলিল—যেখানে রাই, সেখানে কেউ।

সকলে হাসিল।

জগদ বলিল—ঠাকুরকে অত সহজ ভেবে না! কদিন থেকে দেখছি ঠাকুরের বন্দাবনের চেয়ে মথুরার চিন্তা বেশি হয়েছে।

সকলে আবার হাসিল।

ঘাড়টান পশ্চান বলিল—মথুরাও নয়, বন্দাবনও নয়, ঠাকুর এবার বাঁশী ছেড়ে ভারত যুদ্ধের সারথি হয়েছেন।

সকলে আর একবার হাসিল। নির্বোধেরা তিনবার হাসে।

কিন্তু কেহই শশাংক ঠাকুরের সম্ভান বলিতে পারিল না।

ভজহারি দাসের দোকানে ভজহারি ও মাণিক খড়ো বাসিয়া কথা বলিতেছিল। মাণিক মাছ কিনিতে আসিয়াছিল। এমন সময়ে দাঙ্গা বাধিয়া গেল। জেলের দল মাছ বিক্রয়ের চেয়ে দাঙ্গায় যোগদান অধিকতর লাভজনক মনে করিয়া বাজারে না আসিয়া দশানির বাড়ীর দিকে ছুটিল। মাণিকের ভাগ্যে আর মাছ জুটিল না। সেই ক্ষোভ তাহার কিছুতেই মিটিতেছিলনা। সে বলিতেছিল—

দেখো দাস, আমি বললাম এ গায়ে কারো ভাত ভিক্ষে মিলবে না।

নিজের ভাবিষ্যবাণীতে নিজে উৎসাহিত হইয়া সে বলিতে লাগিল—আরে মিলবে কি করে? যে গায়ের জেলেরা মাছের চুপড়ি ফেলে লাঠি ধরে তাদের সর্বনাশ ঠেকায় কে? কি বলো?

দাস কোন উত্তর করিল না।

—আরে বাপু চুপড়ি কটা বাজারে ফেলেই না হয় যা! না! ততটুকু সবুর সহিলো না। দেখো এগায়ের ভিটেয় একখানা ঘর থাকবে না।

তবু দাস উত্তর করিল না। ভজহারি তখন বিষম মনে বাবুদের অববেচনা ও গ্রামের ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিল।

গ্রামের অধিকাংশ সমর্থ পুরুষ কোন-না-কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়া দাঙ্গায় যোগ দিয়াছিল। কেবল স্থানীলোক, বৃদ্ধ, শিশু এবং অকর্মণ্য ও ষড়যন্ত্রকারীর দল এই আবর্তের বাহিরে ছিল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই স্থানে স্থানে দল পাকাইয়া মদ্যস্বরে দাঙ্গার বিষয়ে আলোচনা করিতেছিল। সমস্ত গ্রামখানি নীরব। দাঙ্গার তুমুল ধ্বনির পাটে সেই নীরবতা অতি অপার্থিব আকার ধারণ করিয়া ঘৃণ, মন্দ কণ্ঠ রবকে শ্রুতিগম্য করিয়া তুলিয়াছিল।

তখন শরৎকাল। আকাশের নীলাভ ক্ষুদ্রতম মেঘবিন্দুহীন। রৌদ্রের বিগলিত প্লগে জল স্থল অন্তরীক্ষ একপ্রকার অলৌকিক লঘুতা লাভ করিয়াছে। আর এই শূদ্র সুন্দর নিমগ্নের এক প্রান্তে একদল মানুষ পরস্পরের রক্ত-পিপাসায় অধীর হইয়া পশুবৎ আচরণ করিতেছিল।

( ১০ )

দশানির আঙিনাতে তখন বিষম দাঙ্গা চলিতেছে। কীর্তিবাবু, বাড়ির ভিতর চলিয়া গেলে দশানির লাঠিয়ালেরা প্রভুর অপমানে ভীমতর বেগে ছ'আনির লোকের উপরে গিয়া

পড়িল। ছ'আনির দল আত্মরক্ষার আবেদনে সচেতন হইয়া উঠিল। দুই পক্ষই পরিণাম বিস্মৃত হইয়া লাঠি, শড়কি, বল্লম চালনা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই শত্রু-মিত্র সমানভাবে মিশ্রিত হইয়া গেল। তখন সকলের সম্মুখে একমাত্র লক্ষ্য থাকিল অপরের মস্তক। মাথার কালো চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া সকলে লাঠি চালাইতে থাকিল। তাহাদের বস্ত্র ছিঁড়িয়া গেল, গায়ে কালশিরার পাশে পাশে রক্তের দ্বারা দেখা দিল, বল্লমের আঘাতে ছিন্নভিন্ন ক্ষতস্থান রক্তবর্ণ চক্ষু মেলিয়া মানুষের এই পার্শ্বিক উল্লাস দেখিতে লাগিল। তখন মনে হইল, ইহারা আর মানুষ নহে, কেন্ গৃহবাসী আদিম শ্বাপদসমূহ। মুখে তাহাদের শ্বাপদের শব্দে হাসি, চক্ষুতে শ্বাপদের হিংস্র জ্বালা, মুখে শ্বাপদের চাপা গর্জন। ইহারা এক-প্রকার মানব-পশু। দীর্ঘকালের অভ্যাসের ফলে তাহাদের উপরে মানুষের যে সূক্ষ্ম এনামেল পড়িয়াছিল—অনেকক্ষণ তাহা উঠিয়া গিয়া ভিতরকার জন্তব স্বরূপটা বাহির হইয়া পড়িয়া নখে দন্তে, অকারণ হিংস্র উল্লাসে উদ্ভাস হইয়া উঠিয়াছে। লাঠির আঘাতে কেহ পড়িয়া গেলেও অপরে তাহার দিকে তাকায় না, মিত্র মিত্রকে পদদলিত করিয়া অপরের প্রতি দাবমান। কে কাহার মিত্র! শ্বাপদের আবার মিত্রতা কি? ইহারা কি জনা এমন প্রাপণ করিয়া লাড়িতেছে? প্রভুর জনা? আত্মসম্মানের জনা? অপমানের প্রতিশোধের জনা? না। এমন কি, অর্থের জনাও নহে। বহুবাহিত সুদর্ভব ধ্বন্দের অবকাশ পাইয়াছে বলিয়াই তাহারা লাড়িতেছে। আদর্শের জন্য কে লাড়িয়া থাকে? সৈন্যবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া প্রাণ দেয়—সে কি আদর্শের অনুরোধে? নূতন উজ্জ্বল তকমা চাপরাশ প্রভৃতি ইউনিফর্মের অনুরোধেই মাত্র সৈন্যদল মারামারি করিয়া মরে। ওই ইউনিফর্ম ঘুচাইয়া দাও, দেখবে মরা দূরে থাকুক কেহ নড়িয়াও বাসবে না। মানুষের গায়ে পশু-চর্মের বৈচিত্র্য নাই, ইউনিফর্ম সেই বৈচিত্র্য দান করে। ইউনিফর্ম পরিধান করিবামাত্র মানুষ আপাদ-মস্তক পশুতে পরিণত হয়। ইউনিফর্ম পরিহিত যে সৈন্যকে একটা জাদরেল হানিবল বা সিজার মনে হয়, ইউনিফর্ম টানিয়া খুলিয়া লইলে সে একটা পালক-ছাড়ানো মুরগীর মতো অর্থহীন এবং অসহায়। মানুষের মানুষ্য ইউনিফর্মের ত্রীতদাস!

লড়াই অনেকক্ষণ চলিতেছে—হতাহত হইয়া সকলে নিঃশেষ না হওয়া অবধি নিশ্চয় চলিত, কিন্তু এমন সময়ে এক ঘটনা ঘটিল। গ্রীচরণ রজক চাঁৎকার করিয়া উঠিল—চিল ছোঁড়ে কে? কালু অম্ব বলিল—ওরে ভাই, শালারা ছাদের উপর থেকে চিল ছুঁড়ছে। এ যে নূতন কৌশল!

সতাই কয়েকখানা চিল তাহাদের গায়ে

পড়িল। কিন্তু এক দশানির ঢিল? তবে তাহাদের গায়েই বা পড়িবে কেন? একখানা বড় খান ইটের আঘাতে বদম্ভ প্রধারায়ী হইল। একরাশ পলস্তারা ছুটিয়া আসিয়া মালপ্তর শেখের মাথার পড়িল! এ যে নিরপেক্ষ ঢিল। নতুবা শত্রু-মিত্রনির্বিশেষে আঘাত করিবে কেন? তখন দুই পক্ষই বলিয়া উঠিল—দেখো, দেখো, ছাদের উপর হইতে কে ঢিল ছুড়িতেছে? ক্ষণকালের জন্য তাহারা অস্ত সম্ভরণ করিয়া উপরের দিকে চাহিল। এক! এক! সকলে আতঁনাদ করিয়া বলিয়া উঠিল—দালান কাঁপে কেন? লড়াই থামাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইতেই তাহাদের মাথা ঘুরিয়া উঠিল—পায়ের তলার মাটি কাঁপতেছে। কেহ আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, অসহায়ের মতো বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মাটি চাপিয়া ধরিল। এ সময়ে যে পালানো আবশ্যক—সেই অবশ্য-কর্তব্যটাও তাহাদের মনে পড়িল না। তখন আর সন্দেহ মাত্র রহিল না যে, বিষম ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়াছে। বড় বড় করিয়া ইট খসিতে লাগিল, বড় বড় করিয়া চূণ-বালি খসিতে লাগিল, ঝপাৎ ঝপাৎ করিয়া বড় বড় পলস্তারার চাপ খসিতে লাগিল—আর উভয় পক্ষে এতক্ষণ যাহারা নিজেদের ভীষ্ম-দ্রোণ শৌরাব-রোহিত্য মনে করিয়া বীরত্ব প্রদর্শন করিতেছিল, তাহারা অসহায় শিশুর মতো উপস্থরে আল্লা, কালী, খোদা, হরি বলিয়া হাঁকিতে লাগিল। সকলে হাঁকিতে লাগিল—ভগবান! রক্ষা করো! ভগবান রক্ষা করো! হায় ভগবান তুমি বিপদের প্রাণকর্তা মাত্র, সম্পদের কেহ নহো!

এমন সময়ে একটা দালান খসিয়া পড়িবার শব্দে সকলের সংজ্ঞা হইল—কে একজন বলিয়া উঠিল—ভাই সব পালো! পালো! এখনি চাপা পড়বে। সকলে উঠিয়া পলায়নের জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু এক! আঙিনার চত্বর হইতে বাহিরে আসিবার একটিমাত্র সরু গলিপথ ছিল—বৈঠকখানার তেতলা খসিয়া পড়িয়া সেই পথ কখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আর পালাইবার পথ নাই। চারিদিকে পর্বতপ্রমাণ দোতলা, তেতলা অট্টালিকা। সেসব অট্টালিকাও কাঁপতেছে। সকলে বুঝিল আজ এইখানেই চাপা পড়িয়া সকলকে সমাহিত হইতে হইবে—শত্রু-মিত্রের সকলের জন্য এক সমাধি—কেহ রক্ষা পাইবে না।

সময় আসন্ন বুঝিয়া হারু সেখ কাঁদিয়া উঠিল—আল্লা—মৃত্যুকালে ছেলেটাকে দেখতে পেলাম না!

শ্রীচরণ বলিল—মা কালী, তোমার মনে শেষে এই ছিল—মুখে আগুন হল না, কবরে গেলাম।

নাদুস গোপাল বার বার দাঁড়াইতে চেষ্টা করিয়া পড়িয়া গিয়াছে—সে এবারে উঠিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া সোজা শুইয়া

পড়িল। কাল ঘোষ বৃক চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। সোনা বলিল—আমার লাঠিতে সদর মরেছে, সেই পাগেই এই ভুই দোল! সে মাথার চুল ছিঁড়িতে লাগিল।

আঙিনাতে বীরপুংগবদের যখন এই দশা, তখন চারিদিকের দালান কাঁপতেছে। কাছারীতে ঝাড়গুলা দুর্লভেছে, কোথাকার একটা টিনের ঘরের চাল বনবন শব্দে কাঁপতেছে। পুকুরের জল দুর্লভেছে, নারিকেল গাছগুলি মাথা নীচু করিয়া ধূলা ঝাঁট দিবার চেষ্টায় নিরত, ঝাঁকঝাঁকি কাকের দল উড়িতে উড়িতে কাঁপতেছে, পায়রার দল কাঁপিশ ছাড়িয়া মাটিতে বসিয়া চোখ বন্ধিয়া দুর্লভেছে। বন বন বনাং। একটা ঝাড়-লণ্টন শব্দে রুর অট্টহাসির প্রতিধ্বনি করিয়া ভাঙিয়া গেল। গ্রামের মধ্যে কাসির-ঘণ্টা শব্দধ্বনি উঠিল—হরিধ্বনিতে আকাশ মুহূর্মুহু কাঁপিতে লাগিল।

যে-অট্টালিকা মানুষের বাসস্থান, বিপদে মানুষ যাহার কৃষ্ণিতে গিয়া আশ্রয় লইয়া নিরাপদ বোধ করে—কোন দৈবের বিজ্ঞানয় তাহার সেই চিরদিনের আশ্রয় আজ বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে। বিস্মততম আজ কৃতঘাতম। যে-অট্টালিকা এতকাল মানুষকে সম্মুখে আশ্রয় দিয়াছিল—সে আজ এক-একখানা করিয়া ইট খসাইয়া তাহার মাথায় নিষেধ করিতেছে। আর যাহারা এতক্ষণ পরস্পরকে শত্রু মনে করিয়া বধ করিবার জন্য উদাত ছিল, তাহারা পরমতম মিত্রের মতো পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতেছে। পরস্পরের ক্ষত-স্থান মুছাইয়া দিতেছে। এই তো মানুষের জীবন! মানুষ ভালোও নয়, মন্দও নয়, মানুষ অমৃত! তাহাদের বিপরীত ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া কে যেন খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিল—না, আর একটা ঝাড়-লণ্টন চর্ণ হইবার শব্দ। সকলে ভীত বিস্ময়ে শূন্যল—কোন সুগভীর হইতে একটা গুরু, গুরু, ধ্বনি উঠিতেছে। আল্লা, হরি, কালী, খোদা, তাহাদের এই আতঁ আবেদনের প্রত্যুত্তরে হুড়-মুড় হুড় করিয়া তোষাখানার একটা অংশ খসিয়া পড়িল। সকলে দেখিতে পাইল, শিবের মন্দিরের উর্ধ্বোখিত ব্রিশূলটা ঘন ঘন কাঁপতেছে। পরক্ষণেই বজ্রের গজেন তুলিয়া সমস্ত মন্দিরটা ক্ষুদ্র জানকীর মতো ভূগর্ভে ঢুকিয়া পড়িল। আল্লা, খোদা, হরি, কালী, রক্ষা করো! বাঁচাও! না, আজ আর রক্ষা নাই। আকাশে, বাতাসে, অন্তরীক্ষে, জলে স্থলে, এমন কি, স্বর্নামিত অট্টালিকা শ্রেণীতে কোথাও আজ দয়ার আভাস মাত্র নাই। হুড়-মুড় হুড়। বুঝি অন্দের মহলের দালান খসিতেছে। সকলে ভাবিল এবারে মন্ডপটা খসিয়া পড়িলেই হোল কলা পূর্ণ হয়। সকলে আশামিশ্রিত আশঙ্কায় মন্ডপের দিকে চাহিল। মন্ডপের গায়ে খোদিত মূর্তিগুলো

কম্পমান। হ্যাঁ, পুতনা রাক্ষসীটার আর উপযুক্ত সুযোগ বটে—তাহার ব্যাদিতবদ ক্রমশ বিস্মৃততর হইতেছে। গোপীদের দুঃখ আর ঘৃচিবার নয়—বন্দসমাম্বিত কদম্ব তরুটী ধুসিয়া পড়িয়া গেল। কুক্ষের নিম্নাংশ পলস্তারা খসিয়া অন্তহিত হইল। কাঁপিশ আলিসা উলিতেছে, নেশধরা কাকগুলো কিমাইতেছে, আকাশে আর উড়িবার তাহাদে শক্তি নাই, কাকে পায়রায় মিলিয়া নিস্তম্ভ—কে বলিবে তাহারা মিত্র নয়। গ্রামের উচ্চ শব্দধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া শৃগাল কুকুর ও গো-মহিষ আতঁনাদ করিতেছে হাতীশালে হাতী ডাকিতেছে, ঘোড়াশালে ঘোড়া ডাকিতেছে, ঘরে ঘরে মানুষ ডাকিতেছে—রক্ষা করো ভগবান, রক্ষা করো! উর্ধ্ব মুখ তুলিয়া উপস্থরে সকলে ডাকিতেছে—রক্ষা করো, রক্ষা করো, ভগবান!

কিন্তু সেই তিনি কোথায়? ওই যে চির জীবনের বিস্মত হমা ঢিল ছুড়িতেছে—তিনিই কি? কে বলিবে নয়? ভূমি স্বাভিক সত্ত্ব হইতে যদি তিনি অপ্রত্যাশিত মূর্তিবে আবির্ভূত হইতে পারেন—তবে এই ভূমি অট্টালিকার ফাটল হইতে তাহার অভাবি আবির্ভাব কি এতই অসম্ভব? সকলে হাঁকিতেছে—রক্ষা করো! রক্ষা করো!

এমন সময়ে সকলে শূন্যে পাইল উঠ হইতে, কোন অট্টালিকার শীর্ষ হইতে কাছা আতঁকণ যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিল—রক্ষা করো! রক্ষা করো! বাঁচাও। বাঁচাও।

সকলে চমকিয়া উঠিল। উপরে তাকাইল পাশে তাকাইল। কে? কাহার ওই বিকৃত স্বা প্রার্থনা যাক্স করিতেছে। তবে কি ছাদে উপরে কেহ ছিল?

আবার রব উঠিল—রক্ষা করো!

নীচ হইতে একজন বলিল—মানুষের দ্বারা রক্ষা সম্ভব নয়। একমাত্র ভগবানই রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহাকে ডাকো।

উপরের সেই স্বর বলিল—বাপ সকল ও সকল ফাঁকি আমিও জানি। ভগবানের দোহাই দিয়া রোজগার করাই আমার ব্যবসা ভগবানের নাম দিয়ে মানুষ ঢাল-কলা খায় দক্ষিণা আদায় করে। আমি ও-ফাঁকিতে ভুলাই না। তাই বলি বাপ সকল একমাত্র তোমরাই আমাকে রক্ষা করতে পারো। এখান থেকে আমাকে নামিয়ে নিয়ে যাওনা ভগবানের বাপেরও অসাধা। তোমরা কেউ উঠে এসো।

একজন বলিল—সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসো উপরকার বিপদ কষ্ট বলিল—সিঁড়ি কোথায়? সিঁড়ি ভাঙ পড়ে গিয়েছে। সিঁড়ি থাকলে কি আর তোমাদের ডাকি? ভগবানকেই ডাকতাম। শীগগির উঠে এসো।

নীচে সকলে পরস্পরকে শূন্যইল—উপরে লোকটা কে?



# ভারতের আদিবাসী

শ্রীযুগার্ধ্ব ঘোষ

(১০)

রাজা-পূজার সংস্কার

পূর্বপুরুষ-পূজার সংস্কার থেকে রাজা-পূজার সংস্কারের উদ্ভব স্বাভাবিক নিয়ম বলেই মনে হয়। রাজা সাধারণ জীব নহেন, বিশেষ শক্তিমান জীব। কি করে তিনি এত শক্তিমান? তিনি নিশ্চয় বিশেষ ও বেশী পরিমাণে আত্ম-বস্তু ধারণ করেন। তিনি বিগত পূর্বপুরুষদের আত্ম-বস্তুর উত্তরাধিকারী, তাই তিনি বিশেষভাবে শক্তিমান ও বিশেষভাবে শ্রদ্ধেয়। রাজা-পূজার (Deification of king) আৰ্য সংস্কার নয়, অশ্বৈদে রাজার সম্পর্কে দেবত্ব আরোপের সংস্কার পাওয়া যায় না। রাজা-পূজা হলো সূর্যমুখী জাতির সংস্কার (langden)।

মাতৃদেবতার পরিকল্পনা

পূর্বে বলা হয়েছে যে, এশিয়া মাইনর থেকে আগত মেডিটারেনীয়ান নরবংশ যেসব ধর্মসংস্কার নিয়ে আসে তার মধ্যে একটি হলো 'মহা মাতার' (Great Mother) অস্তিত্বে বিশ্বাস। আত্ম-বস্তু আসছে কোথা থেকে? কে এর প্রসূতি? সেই মহাপ্রসাবিনী হলেন মহা-মাতা। এই মহা মাতার কল্পনাই পরবর্তীকালে শক্তিতত্ত্বে পরিণত হয়েছে এবং এটা অশ্বধর্মের সংস্কার নয়। রমাপ্রসাদ চন্দ বলেছেন—শক্তি, বিষ্ণু ও শিবের কল্পনা মধ্যবর্তীমাসী আৰ্যদের চিন্তা থেকে সৃষ্ট হয়নি। \* মাতৃ-কল্পনার মধ্যেও উর্বরতাবাদ ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে। জীব-প্রসাবিনী শক্তির পূজা, যার প্রসাদে শক্তি লাভ হবে। শক্তি অর্থই উর্বরতা, জীবসৃষ্টির ক্ষমতা।

মেডিটারেনীয়ান ধর্ম সংস্কারের এই মাতৃ-কল্পনাটি ভারতের অন্যান্য নরবংশ অর্থাৎ প্রায়-অস্ট্রেলীয় নরবংশজাত মন্ডা প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠীর দ্বারা গৃহীত হয় এবং তাদের ধর্ম সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত হয়। বৈগা সমাজের কথা আগে খ্যা হয়েছিল—তার পৃথিবীকে মাতারূপে কল্পনা করে থাকে, সেইজন্য মাটিকে আঘাত করে লাগল-চাষ

করতে চায় না। হিন্দুধর্মের মধ্যেও একটা সংস্কার রয়েছে। হিন্দুর অশ্বব্রূচীর তাৎপর্য হলো—আত্মা নক্ষত্র পৃথিবী রজস্বলা হয়ে থাকেন, সূতরাং সেইদিন হলকর্ষণ নিষিদ্ধ, মাটীতে দাগ পর্যন্ত দিতে নেই, কারণ পৃথিবী ব্যথিতা হবেন। উর্বরতাবাদের সূক্ষ্মপট্ট উদাহরণ।

মেডিটারেনীয়ান জাতি মাতৃ-কল্পনার সঙ্গে আনুষঙ্গিক আর একটা প্রথা ভারতে নিয়ে আসে—দেবদাসী প্রথা। দ্রাবিড় সভ্যতায় এই দেবদাসী প্রথা প্রবল হয়ে ওঠে। দেবদাসী প্রথাও উর্বরতা বাদ থেকে উদ্ভূত। অপরের কাছ থেকে আত্ম-বস্তু বা জীবন-সার আহরণ করে নিজ শরীরে সঞ্চারিত করা—এই হলো দেবদাসীর বহুপুরুষ পরিচর্যার দার্শনিক ভিত্তি। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে পূর্বের শত্রুকেই সূক্ষ্মপট্টভাবে আত্মবস্তু বা জীবন-সারের প্রতীক রূপে মর্ষাদা দেওয়া হচ্ছে।

পৃথিবীর বহু আদিমজাতির মধ্যে একটা প্রথা আজও প্রচলিত আছে—স্ট্রী বা আত্মীয়ের দ্বারা অতিথিকে সঙ্গম দান করবার প্রথা। এটাও অতিথির কাছ থেকে আত্মবস্তু বা জীবন-সার আহরণ করে উর্বরতা (তথা শক্তি) বৃদ্ধি করার সংস্কার। ভারতের আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে সাধারণত এই সব প্রথা নেই, কয়েকটি অতি-অনগ্রসর গোষ্ঠীর মধ্যে আছে।

জীব-বলি ও নরবলি

জীব-বলি ও নরবলি—এ দুটোই উর্বরতা-বাদের আচার। বলি আৰ্য সংস্কারেরও একটা বড় বিষয়—গো-মেধ, অশ্বমেধ প্রভৃতি। কিন্তু আৰ্য সংস্কারের এই দুটি আচারই, হিন্দুধর্মে স্থান লাভ করতে পারেনি। অশ্বমেধ আজ আর কোথাও নেই। দেখা যায়, আনামের গারোদের মধ্যে অশ্ববলির প্রথা রয়েছে। আদিবাসী গারো সমাজ প্রাচীন আৰ্যের কাছ থেকে এই প্রথা নিয়েছিল কিনা কে জানে? আৰ্য-সভ্যতার গো-বলির আদর্শ ভারতে টিকতে পারেনি; কারণ আৰ্যপূর্ব ভারতের (যাকে প্রায় হিন্দু-ধর্ম আত্মা দেওয়া হয়েছে) মেডিটারেনীয়ান-প্রভাবিত ধর্মে গরু পবিত্র জীবরূপে মর্ষাদা লাভ করেছিল। মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতার নিদর্শনে 'শিব' এবং 'বৃষের' মূর্তিকে দেব-বিগ্রহরূপেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

বাই হোক, বলি প্রথা সকল ধর্মের মধ্যেই ছিল—ভারতে আগত প্রায়-অস্ট্রেলীয়, মণোলীয়, মেডিটারেনীয়ান এবং হিন্দু-আৰ্য ইত্যাদি প্রত্যেকটি নরবংশের ধর্মচারে বলি প্রথা একটা প্রধান স্থান অধিকার করে ছিল।

এই বলি প্রথাও উর্বরতাবাদের সংস্কার থেকে উদ্ভূত। বর্তমান অস্ট্রেলীয়ার আদিম আদিবাসীদের কাছ থেকে এই সংস্কারের সঙ্গে তার একটা লজিকও পাওয়া যায়। নিহত জীব হত্যাকারীর মধ্যে প্রবেশ করে এই হলো বলির দার্শনিক (?) ভিত্তি। ("Killed enters the Killer"), জীবের আত্মবস্তু বা জীবন-সার হত্যাকারীর মধ্যে প্রবেশ করে, ফলে হত্যাকারী শক্তিশালী করে অর্থাৎ উর্বরতা লাভ করে।

আসামের নাগা সমাজের মন্ড-শিকার প্রথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শত্রু বধ করে একটি মন্ড নিয়ে না আসা পর্যন্ত কোন নাগা যুবক বিবাহের যোগ্য বলে গণ্য হয় না, কারণ সে উর্বরতা লাভ করেনি, সন্তান সৃষ্টির ক্ষমতা সে অর্জন করেনি। মারিয়া খন্দদের মধ্যে এতকাল যে নরবলির প্রথা ছিল, তার মধ্যেও উর্বরতার সংস্কারই প্রধান বিষয়। হিংসার বশে নয়, নরমাংস খাবার লোভে নয়—বিশুদ্ধ একটা জনকলাণের আদর্শ নিয়েই নরবলি দেওয়া হতো। অর্থাৎ ভূমি শস্যপ্রসূ হবে, সমাজ সন্তানপ্রসূ হবে ইত্যাদি আদর্শের জন্য নরবলি দিয়ে তার আত্মবস্তুকে গ্রহণ করা হতো।

নাগাদের মধ্যে নরমন্ড শিকারের (Head Hunting) প্রথা এখনো প্রচলিত রয়েছে। অতীতে ভীলোরা শত্রুর মন্ড এনে গাছে ঝুলিয়ে রাখতো (Rajputana Census Report 1931)। ১৮৮২ সালে খন্দেরা বিদ্রোহ করে, কারণ ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাদের 'মারিয়া' বা নরবলি প্রথা বন্ধ করে নেন। সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় যে, বিদ্রোহী খন্দেরা সরকার পক্ষের কয়েকজনকে হত্যা করে লিফাট নামক একটি গ্রামে গাছের ওপর মন্ড ঝুলিয়ে রেখেছিল।

কোন কোন ক্ষেত্রে নরবলির প্রথা বস্তুত ফসল-পূজার রূপ গ্রহণ করেছে। ভূমি দেবতাকে সন্তুষ্ট করা অর্থাৎ আত্মবস্তু দিয়ে মাটীকে উর্বর করার অনুষ্ঠান। যাকে বলি দেওয়া হলো, তার আত্মবস্তু মাটীকে উর্বর করে ফসল ফলিয়ে দেবে—এই উদ্দেশ্য। মারিয়া খন্দেরা নরবলি দিয়ে, তার মাংস টুকরো টুকরো করে ক্ষেতের ওপর এবং নিজেদের শস্য-ভান্ডারে ছড়িয়ে দিত।

খন্দদের নরবলির পদ্ধতি ছিল—একটা তাজা গাছের ফাটলের মধ্যে উৎসর্গ মানুষটিকে চেপে মেরে ফেলা। বলির মানুষটির চোখ থেকে রক্ত বেশী জল পড়বে, ততই বেশী বৃদ্ধি হবে, এই বিশ্বাস।

আশ্চর্যের বিষয় জীব-বলির কয়েকটি বিশুদ্ধ বৈদিক পদ্ধতি ও আসামের নাগাদের

\* "these originates among a people of different ethnic origin from the midlandic Aryans" — Non-Vedic Elements in Brahmanism.

জীব-বলির পদ্ধতির মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়, অথচ বর্তমান হিন্দুদের মধ্যে এ ধরনের জীব-বলির পদ্ধতি নেই। গারোদের অশ্ব-বলির কথা পূর্বে বলা হয়েছে। গহ্য-সূত্রে যে 'শূলগাব' বা শূলবিশ্ব করে গো-বলির অনুষ্ঠান দেখা যায়, বর্তমান আংগামি নাগাদের 'সেহেরংগি' নামক বলির পদ্ধতিও তাই। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে 'পশুশারদীয় শব' নামক যে বলির অনুষ্ঠান কথিত আছে, তার সঙ্গে নাগাদের 'সেহেরংগি' নামে বলির পদ্ধতির আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে।

#### নরমাংস ভক্ষণ বা ক্যানিবালাজম্

অতি দূর অতীতে এবং অতি অসভ্য বন্য দশাতেও মানুষ ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য মানুষের মাংস খেয়েছে, এমন প্রবৃত্তির প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাঘ বাঘের মাংস খায় না—এটাই জীব-জগতের প্রবৃত্তিগত নিয়ম। কিন্তু তবুও ক্যানিবালাজম্ নামে একটা কথা প্রচলিত আছে, মানুষ কর্তৃক মানুষ খাওয়ার প্রথা।

মানুষ মানুষের মাংস খায়—এ প্রথা পূর্বে ছিল এবং এখনো তার নানারকম রেশ নানা সমাজে আছে। কিন্তু এটা ক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যাপার নয়। এটাও একটা ধর্মগত সংস্কার ও আচারের অনুষ্ঠান। বলপ্রদত্ত মানুষের মাংস প্রসাদ হিসাবেই খাওয়ার নিয়ম ছিল। এটাও উর্বরতাবাদের সংস্কার। যার মাংস খাওয়া হচ্ছে, তারা আত্মবিস্মৃতিও সঙ্গে সঙ্গে খাদকের সত্তার মধ্যে ঢুকে পড়েছে—এই হলো থিওরী। এর ফলে শক্তি ও উর্বরতা লাভ হবে, এই বিশ্বাস।

শুসাইদের মধ্যে প্রথা ছিল—শয়তানকে হত্যা করে তার রক্ত জিহবা দ্বারা লেহন করা এবং শোণিতলিপ্ত বস্ত্রের ডগা থেকে রক্ত চাটান। খাডো কুকিদের মধ্যে প্রথা ছিল, শত্রু হত্যা করে শোণিতরঞ্জিত হাত না ধুয়ে, সেই হাতে শ্বাবার খাওয়া। ইন্দোনেশিয়ার ও ওশেনিয়ার আদিম জাতিদের মধ্যে নরশোণিত পানের প্রথা আছে। ১৯৩০ সালে নাসিকের কুখ্যাত ডাকাত নানা ফেরারী ধরা পড়ে। মামলায় প্রকাশ পায় যে, সে হত্যা করার পর তার শোণিতলিপ্ত ছুরি কপালে ছুঁইয়ে তিলক পরতো এবং ছুরির ডগা জিহবা দিয়ে স্পর্শ করতো। এই সব আচরণের পেছনে ঐ এক মূল সংস্কার রয়েছে—আত্মবিস্মৃতে আহরণের পদ্ধতি। নিহত বস্তুর শোণিত বা মাংস কিঞ্চিৎ পরিমাণে উদরসাৎ করে তার আত্মবিস্মৃতে নিজের মধ্যে গ্রহণ করা। কোন কোন রাজপুত্র রাজবংশের মধ্যে এখনো একটা প্রথা আছে, অভিযেকের সময় কোন ভীলের রক্ত নিয়ে তিলক ধারণ। যে ভীলের শরীর থেকে এই তিলকের জন্য রক্ত হেওয়া হয়, সাধারণের ধারণা, সেই ভীল অস্পিকালের মধ্যে মারা যাবে। অর্থাৎ যার আত্মবিস্মৃত বদলি হয়ে যায়, সে আর কতদিন বাঁচবে?

ক্যানিবালাজম্ হলো জীবন্ত মানুষের মাংস

ভক্ষণ। আর একটি প্রথা দেখা যায় যেটা ক্যানিবালাজম্ গোছের ব্যাপার—মৃত মানুষের মাংস ভক্ষণ। এটাও আত্মবিস্মৃত আহরণের সংস্কার থেকে উদ্ভূত। এবিষয়ে অঘোরপদ্ধতি-দের আচরণগুলি উল্লেখযোগ্য।

মৃতের দেহের মধ্যেও আত্মবিস্মৃত থাকে, এ ধারণা থেকেই মৃতকে সংস্কার করা সম্পর্কে নানারকম সংস্কারের উদ্ভব হয়। এ বিষয়ে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মৃতদেহকে বীজ-বপনের সময় সমাধিস্থ করার প্রথাও উল্লেখ করা হয়েছে। মৃতদেহের অভ্যন্তরস্থ মানা বা আত্মবিস্মৃত মাটিতে মিশে গিয়ে উর্বরতার সৃষ্টি করবে, এই হলো মূল বিশ্বাস, ভারতের অনেক আদিবাসীর মধ্যে এই বিশ্বাস থাকলেও, এই প্রথাটা মৃতের মাংস ভক্ষণে পরিণত হয়নি। এই প্রথা বরং হিন্দু ধর্মের অঘোরপদ্ধতি সমাজের মধ্যে দেখা যায়। ১৯৩১ সালে বাকুড়ায় একাটি মামলায় অনেক রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ও জনৈক মহা-ব্রাহ্মণের কারাদন্ডের আদেশ হয়। এরা একাটি মৃত শিশুর মাংস রান্না করে খেয়েছিল।

রাঢ়ী আর একটি মামলার কথা জানা যায়—কয়েকজন গুরুও সমাধি থেকে এক য়ুরোপীয়ের মৃতদেহ খুঁড়ে নিয়ে চলে যায়। মামলায় জেরার সময়ে তারা বলে যে 'সাহেবের হাতি দিয়ে ভাল যাদুর কাজ হবে।' গুরুও-দের যুক্তি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, বেহেতু য়ুরোপীয় সাহেবদের শরীরে আত্মবিস্মৃত বেশী অথবা উচ্চস্তরের, সেই হেতু তার হাড় দিয়ে উচ্চস্তরের যাদু সম্ভব হবে।

#### যাদুতন্ত্র

ম্যাজিক বা যাদুতন্ত্রের ভিত্তি হলো আত্মবিস্মৃত ও উর্বরতার থিওরী। যার মধ্যে আত্মবিস্মৃত নেই, অথবা কমে যাচ্ছে, তার মধ্যে আত্মবিস্মৃত সঞ্চার করিয়ে দেওয়াই হলো যাদুতন্ত্র।

যাদুতন্ত্রের ভেতর দিয়ে মানুষ জন্মিত তার প্রথম গুরু, যাজক বা পুরোহিতকে পেয়েছে। যাদুতন্ত্রের ভেতর দিয়েই মানুষ জাতি তার প্রথম ডাক্তার লাভ করেছে। আর একটু পরিষ্কার করে বলা যাক।

আত্মবিস্মৃত হানি এবং ক্ষয়, এই তো সকল ক্ষতির কারণ। আত্মবিস্মৃত কমে গেলেই রোগ হয়, মৃত্যু হয়। আত্মবিস্মৃত হানি হলোই অনুর্বর হয়, সন্তান হয় না। আত্মবিস্মৃত হানি হলে বা কমতি পড়লে ক্ষেতে ফসল হয় না, বৃষ্টি পড়ে না। সুতরাং যেখানে আত্মবিস্মৃত প্রয়োজন, সেখানে তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদি প্রক্রিয়ার দ্বারা আত্মবিস্মৃতকে আহ্বান ও সঞ্চার করাই হলো ম্যাজিক বা যাদু। যিনি এই অতি কল্যাণকর কাজ করতে পারেন, তিনিই তো গুরু।

আদিবাসী সমাজে যাদুতন্ত্রা সোখা বা ওঝারাই গুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত।

যাদুতন্ত্রার ঠিক বিপরীত হলো ডাইন ও ডাইনী। যাদু হলো পজিটিভ আদর্শ। এর বিপরীত একটা শক্তির কম্পনাও দেখা দিল, যার ফলে মড়ক লাগে, অকালে মৃত্যু হয়, ফসল হয় না ইত্যাদি। অর্থাৎ আত্মবিস্মৃতকে লুপ্ত করে বা ক্ষয় করে দেওয়ার শক্তি। এই শক্তির প্রক্রিয়া হলো নেগেটিভ অর্থাৎ এটা একটা অপশক্তি। যারা এই অপশক্তির তত্ত্বে পারদর্শী তারাি হলো ডাইন ও ডাইনী।

আদিবাসী সমাজে এই আদিম সংস্কার প্রবলভাবে বিদ্যমান এবং এখনই সমাজে একটা খারাপ ক্ষতিকর বা শোকাবহ ঘটনা হয়, তখনই সকলের সন্নিবন্ধ মনে একটি প্রশ্ন জেগে ওঠে—ডাইনের কাজ? কে এই ডাইন? তার সম্ভান দেবে কে?

গোষ্ঠীর সোখা ওঝা বা দেবকলি ইত্যাদি নামে কথিত গুরুপদবাচ্য ব্যক্তিরাই এ বিষয়ে সম্ভান ও চূড়ান্ত রায় দিয়ে থাকেন। তার বিচারে যাকে ডাইন বলে মনে হয়, তাকে সমাজ থেকে নিবাসিত করা হয়, না হয় পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়।

বর্তমানে ডাইনী পুড়িয়ে মারার ঘটনা খুবই বিরল হয়ে এসেছে, কারণ ভারত গভর্নমেন্টের ফৌজদারী আইন এ বিষয়ে সোখার কড়ক ও বিচারবৃদ্ধির সম্মান রাখতে পারেনি। ডাইনীতে বিশ্বাস শুধু আদিবাসী সমাজের সংস্কার নয়, বৃহৎ হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে এই সংস্কার অস্পষ্টতর প্রচলিত।

#### টোটেম তত্ত্ব

সাধারণতঃ আদিম জাতিসমূহের মধ্যে টোটেম সংস্কার ব্যাপকভাবে প্রচলিত। কোন জীব বা বৃক্ষ এক একটি গোষ্ঠীর টোটেম। টোটেমের নাম অনুসারে গোষ্ঠীর নাম হয়ে থাকে। কারও টোটেম ভালুক, কারও শূকর, কারও বাইসন এবং কারও বা শালগাছ ইত্যাদি বৃক্ষই হলো বংশগত টোটেম। দেখা যাচ্ছে টোটেম হলো একাধারে আদিম জাতির আদি-পুরুষ এবং গোত্রের পরিচয়। যে গোষ্ঠীর টোটেম ভালুক, তার কাছে ভালুক হলো পবিত্র জীব। ধারণা, ভালুকই তাদের আদি-পুরুষ। ভালুকের কাছ থেকেই সে তার আত্মবিস্মৃত পেয়েছে এবং তাদের আত্মবিস্মৃতও ভবিষ্যতে ভালুকের মধ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করবে।

সৌরাস্ট্রের রাগারা হনুমান বংশীয় বলে দাবী করেন। তাদের পরিচ্ছদে লেজ ধারণের পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল।

টোটেম সংস্কার ইতিহাস আলোচনা করে বিখ্যাত সমাজবিদী জেমস ফ্রিজার একটা মূল কারণ আবিষ্কার করেছেন। তাঁর এই থিওরী 'গর্ভ সংস্কার' থিওরী ('Conceptional Theory') নামে পরিচিত। নারী কি কারণে গর্ভবতী হয়, এ সম্বন্ধে আদিম মানুষের মনে বাস্তবসম্মত ধারণা ছিল না।

নরনারীর যৌন সংস্রবের ফলে যে নারী গর্ভ-বর্তী হয়, এ ধারণা এখনো অনেক আদিম জাতির মধ্যে নেই। আসামের নাগাদের কোন কোন গোষ্ঠীর মধ্যে এই ধারণা নেই। নারীর দেহাভ্যন্তরে আর একটি প্রাণময় শরীরের আবির্ভাব কি করে সম্ভব হলো? কোথা থেকে এই আত্মা-বস্তু আসে? এই প্রশ্ন থেকেই স্বভাবতঃ আদিম মনে একটা ধারণা জন্মলাভ করে। ধারণাটা হলো, কোন জীব বা বৃক্ষ থেকেই এই আত্মাবস্তু নারীর শরীরে প্রবেশ করে। এইভাবে এক একটি জীব বা বৃক্ষ আত্মাবস্তুর আধার বলে কল্পনা করা হয় এবং এই সব জীব বা বৃক্ষই হলো এক একটি গোষ্ঠীর টোটেম। টোটেম জীবকে হত্যা করা নিষিদ্ধ এবং টোটেম বৃক্ষের ফুল ফল বা পল্লব ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

#### জন্মান্তর—পুনর্জন্ম—আত্মাবস্তুর অক্ষয়ত্ব

আত্মাবস্তু ও উর্বরতাবাদের যে সকল উদাহরণ ব্যাখ্যা ও বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত হলো, তার ভেতর থেকেই কতগুলি তত্ত্বের আভাস আমরা দেখতে পাচ্ছি। এ তত্ত্বগুলি হলো—

- (১) আত্মাবস্তুর দেহান্তর (transmigration of soul matter)
- (২) পুনর্জন্ম বা পুনর্দেহধারণ (Reincarnation)
- (৩) আত্মাবস্তুর অক্ষয়ত্ব (Indestructibility of soul matter)

নরনারী বা জীববালি এবং টোটেম সংস্কারের মধ্যে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে, আত্মাবস্তু এক দেহ থেকে অন্য দেহে চলে যায়, এই বিশ্বাস আদিম মানুষের মনে স্থান লাভ করেছিল।

ক্ষেত্রার সাহেবের গর্ভসংস্কার খিওরী অনায়াসী টোটেম তত্ত্বের মূলকথা হলো— আত্মাবস্তু নতুন দেহ ধারণ করে মাতৃগর্ভ থেকে আবার ভ্রমিষ্ঠ হয়। এটা স্পষ্টতঃ পুনর্জন্মবাদের সংস্কার।

আদিবাসীদের মধ্যে ভূইয়া গোষ্ঠীর ধারণা হলো—নবজাত শিশুরা হলো মৃত আত্মায়ের নতুন দেহ। লুসাইদের মধ্যে বিশ্বাস আছে, মৃত ব্যক্তি ভীমরুলের দেহ ধারণ করে তাদের চারদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। কুবি গন্দ গোষ্ঠীর মধ্যে একটা সংস্কার আছে—কোন ব্যক্তির মৃত্যুর অল্প কিছুক্ষণ পরেই তারা স্রোতের ধারে মাছ এবং পোকা অব্বেষণ করে। তাদের ধারণা মৃত ব্যক্তির আত্মাবস্তু এই মাছ ভক্ষণকার দেহে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

মানা আত্মাবস্তু জীবনসার—আদিম মানুষের চিন্তায় দু'ধাটে এই 'সত্তা' এক দেহ থেকে অন্য দেহে বালি হতে পারে, নতুন দেহ ধারণ করে জন্মলাভ করতে পারে। সুতরাং এই বিশ্বাসের মধ্যে আর একটা তত্ত্ব স্বীকৃত হচ্ছে—আত্মাবস্তু অক্ষয়।

এই প্রসঙ্গে একটা প্রথার উল্লেখ করা

যেতে পারে। এটাও বালি প্রথা, কিন্তু নরবালি নয়, জীববালিও নয়—আত্মবালি প্রথা।

#### আত্মবালি প্রথা

মিঃ ফরসাইথের পুস্তকে (Highlands of Central India) এ বিষয়ে কতগুলি ঘটনার উল্লেখ আছে। ১৮৮২ সালে জনৈক আদিবাসী যুবক মান্দাতা পাহাড়ে একটা ৯০ ফুট উঁচু পাথরের ওপর থেকে লাফিয়ে মৃত্যুবরণ করে। পলিটিক্যাল অফিসার ক্যাপ্টেন ডাগলাস নিজে দাঁড়িয়ে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে তার উদ্দেশ্য ছিল—মৃত্যুবরণ করার পর সে কোন রাজবংশে পুনরায় জন্ম লাভ করবে। গিরিচূড়া থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করার প্রথা আমেরিকার কোন কোন আদিম গোষ্ঠীর মধ্যে একটা ব্যাপক প্রথারূপে বর্তমান ছিল।

আত্মবালির প্রথাই আবার নানারকম কৃচ্ছ্র-সাধনার রূপ গ্রহণ করেছে। নিজ দেহকে পীড়িত করার প্রথা ধর্মচারণের রূপে বহু জাতির মধ্যে এবং বর্তমান হিন্দু সমাজের মধ্যেও রয়েছে। আত্মবালি বা আত্মনিগ্রহ প্রথার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা সংস্কারের উদ্ভব দেখতে পাওয়া যায়। পুণ্যের সংস্কার আত্মবালি দিলে বা আত্মনিগ্রহ করে এমন একটা শক্তি লাভ নিশ্চয় হয়, যার বলে উন্নত জীব বা মনুষ্যরূপে পুনর্জন্ম লাভ হবে—এটা পুণ্যবলের সংস্কার ছাড়া আর কি?

হিমালয় সংলগ্ন ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে একটি বাঘাবর শ্রেণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, বাদের জীবিকা হলো দড়ি-নাচ (Rope Dancing)। কলকাতা সহেরও এরা দড়ি-নাচ দেখাতে মাঝে মাঝে আসে। এরা বেদা নামে পরিচিত এবং এরা আর একটা কৌশল দেখায় যেটা 'বেদ্যার্ত' নামে পরিচিত—দড়ির সাহায্যে উচ্চস্থান থেকে সবেগে নীচে নেমে আসা (Rope Sliding)।

বর্তমান এই দড়ি-নাচ ও দড়ি-নামা প্রথা দু'টি একদল বাঘাবর লোকের জীবিকার বৃত্তিরূপে অবশ্য পরিণত হয়েছে। কিন্তু এর একটা ঐতিহাসিক পরিচয়ও আছে। দড়ি-নামা প্রথাটি বস্তুতঃ প্রাচীন কালের উচ্চস্থান থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যার প্রথারই ভিন্ন একটা রূপ। এখনও ভারতের কোন কোন গ্রামাঞ্চলে ক্ষেত্রে বীজবপনের পূর্বে 'বেদ্যার্ত' অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বেদা দৃঢ় স্মান করে নববস্ত্র পরিধান করে, ক্ষেতের ওপর ঘুরে আসে, তারপর অনুষ্ঠান দেখায়—লম্বমান দড়ি ধরে উঁচু স্থান থেকে সবেগে নীচে নেমে আসে। তারপর বেদার চুল এবং ঐ দড়ির টুকরো ক্ষেতের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। দেখা যাচ্ছে যে, বেদার চুল এবং নাচের দড়িকে যাদুপুত্র বস্তু বলে মনে করা হচ্ছে—যার মধ্যে উর্বরতা বিধায়ক গুণ আছে। বস্তুতঃ ক্ষেতকে শস্যপ্রসূ করার জন্যই এই অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের মধ্যে উর্বরতাবাদ,

আত্মাবস্তু এবং যাদুতন্ত্র—সব সংস্কারগুলিরই সাক্ষা পাওয়া যাচ্ছে। বেদা আত্মহত্যার অভিনয় করে যে শক্তি (পুণ্য?) লাভ করলো তার জোরে সে আত্মাবস্তুকে দড়ি ইত্যাদি বস্তুর মধ্যে সঞ্চার করেছে এবং সেই যাদুপুত্র আত্মাবস্তু-সমন্বিত পবিত্র বস্তু ক্ষেতের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে উর্বরতা সাধন করা হলো।

নট নামে ভারতবর্ষে যে-যাঘবর গোষ্ঠী আছে, তাদের পুরুষদের জীবিকা হলো দড়ি-নাচ এবং মেয়েদের বেশ্যাবৃত্তি। সুপ্রাচীনকালের শস্যোৎপাদন সম্পর্কে যেসকল উর্বরতা-অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল নটদের মধ্যে যেন সেই অনুষ্ঠানগুলির ঐতিহ্য রয়ে গেছে।

#### নৃত্য—একটি উর্বরতা অনুষ্ঠান

নৃত্য প্রথমে যাদুতন্ত্র হিসাবেই দেখা দেয়। নৃত্য আত্মাবস্তু আহরণ ও সঞ্চার করার একটি পদ্ধতি। প্রতি আদিম জাতির ফসল উৎসবের সঙ্গে নৃত্যের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এই তত্ত্ব প্রমাণ করেছে। নৃত্যও একটি উর্বরতা অনুষ্ঠান (Fertility rite), নৃত্যের দ্বারা আত্মাবস্তুকে ভূমিতে শস্যে ও নিজ দেহে আহরণ ও সঞ্চার করা হয়।

নৃত্য সম্বন্ধে নাগাদের একটা সংস্কার উল্লেখযোগ্য। নাচের সঙ্গে উঁচু লাফ দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো শস্যের শিয়াকে ওপর দিকে বাড়িয়ে তোলা। নাচ যত ভাল হবে ধান তত ভাল হবে। স্পষ্টতঃ দেখা যাচ্ছে যে শস্যবৃদ্ধির যাদু হিসাবে নৃত্য সামাজিক আচরণ পরিণত হয়েছে।

গন্দদের জন্তু-নৃত্যও উল্লেখযোগ্য। অরণ্যের জন্তুর মাংস গন্দদের একটা প্রধান খাদ্য, জীবন ধারণের উপাদান। সুতরাং হরিণ নীলগাই খরগোশ ইত্যাদির গতিভঙ্গীর অনুকরণ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে জন্তুর মুখোশ পরিধান করে যে ধরনের নাচ প্রচলিত আছে, সেটাও উর্বরতা বাদের ম্যাজিক—অর্থাৎ জগলে জন্তু বৃদ্ধি করা।

#### শিকার-উৎসব

নৃত্য নামে যাদুতন্ত্রের অনুষ্ঠানটি ঋতু উৎসবের রূপ গ্রহণ করেছে, তেমন শিকারও যাদুতন্ত্রসম্মত ঋতু-উৎসবের রূপ গ্রহণ করেছে। রাজপুত্র সমাজের আহেরিয়া, বিহার অঞ্চলের জুড়শীতল, ছোটনাগপুরের বসন্তকালের শিকার, আংগামি নাগার সেক্রেংগি শিকার—এ সবই সামাজিক সমীচিৎগত শিকারের অনুষ্ঠান। বিশেষ ঋতুতে দলবদ্ধভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই ঋতু-শিকারোৎসবের উদ্দেশ্য হলো—আগামী বৎসরের জন্য শক্তি সঞ্চার করা। দলবদ্ধভাবে উৎসবের রূপে শিকার করে বহু জন্তু বধ করা হয়। তার ফলে জন্তুর আত্মাবস্তু সমাজের সকলের দেহে সঞ্চারিত হলো। বৎসরের আরম্ভেই জীবনকে নতুন শক্তিতে শক্তিমান করে তোলার উৎসব। ঋতু-শিকারোৎসব যে উর্বরতাবাদের যাদুতন্ত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। (ক্রমশ)

# যাত্রিদল

## শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

সন্ধ্যার সময় আসিয়া দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে পৌঁছিল। তখনও সকলে আসিয়া পৌঁছে নাই। নৌকা দুখানায় সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল। আধ ঘণ্টার মধ্যে সকলেই আসিয়া পৌঁছিল। নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ক্রমাগত দুই রাত্রি ও দুই দিন ধরিয়া দাঁড়ি বাহিয়া ও গুণে টানিয়া নৌকা তাহাদের সৈন্য শ্রেণি বেলায় নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। রাত্রি ৯।১০টা পর্যন্ত আহাতি ও বিশ্রাম করিয়া কাটাওয়া যে যাহার অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া সহরটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল—একজন রহিল নৌকা পাহারায়। স্থানীয় একজন কর্মী ছিলেন পথ প্রদর্শক। চৈত্র মাস, শকুণপক্ষের কি একটা তিথি। কিছুক্ষণ হইল চন্দ্র আস্ত গিয়াছে—না আলো না তাম্বুকের সারা পথ প্রান্তর ভরিয়া গিয়াছে। চৈত্র মাসের কঠিন ভূমির উপর দিয়া তাহারা পথ অতিক্রম করিতেছিল। সম্মুখে চার পাঁচ মাইল ব্যাপী একটি বিরাট প্রান্তর—তাহার পর যে রাস্তাটি সেইটি নাকি একেবারে সোজা সহরে গিয়া মিশিয়াছে। সুতরাং অন্ধকার বাড়িবার আগেই যাহাতে সহরটিতে গিয়া পৌঁছান যায়—সেই উদ্দেশ্যে তাহারা দ্রুত পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। কখনও শব্দ মাটির ঢেলায় পা বাধিয়া তাহারা হোঁচট খাইতেছিল—কখনও পতিত জমিতে কি একপ্রকার কাটাগাছে তাহাদের কাপড় পিছন হইতে টানিয়া ধরিতেছিল—মাঠের মাঝে ছোট বড় খেজুরগাছ উদ্ভব মাথা তুলিয়া এক একটি দৈত্যের মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মাঝে মাঝে এক এক আশ্চর্য বড়ো হাওয়া—শোঁ শোঁ করিয়া ভাসিয়া আসিতোছিল—খেজুরগাছের ডেগেয় আর পাতায় ঝির ঝির করিয়া একপ্রকার অদ্ভুত শব্দ হইতেছিল। বহু দূরের কোন গ্রাম হইতে চৈত্রপূজার ঢাকের শব্দ ভাসিয়া আসিতোছিল। কিন্তু এই যোলটি প্রাণীর কোনদিকে কিছুমাত্র দৃকপাত ছিল না—কেবল সম্মুখের দিকে অপূর্ব উদ্ভাসনার ছাটিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু ঘণ্টাটিনেক এমনি করিয়া চলিয়াও সে রাস্তাটি আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। এই তিন ঘণ্টায় তাহারা

অন্ততঃ ৮।৯ মাইল পথ নিশ্চয়ই অতিক্রম করিয়াছে তবু কোথায় রহিল সে পথ। যিনি পথ প্রদর্শক এবার তিনি অনেকখানি ঘাবড়াইয়া গেলেন। গঙ্গা হইতে সোজা পূর্ব-দিকে আসিবার কথা কিন্তু এখন সকলে মিলিয়া মাঠের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আবিষ্কার করিল যে, সোজা পূর্বদিকে না যাইয়া তাহারা দক্ষিণ পূর্বদিক ধরিয়া চলিতেছে। সুতরাং সে পথটি তাহারা নিশ্চয় ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে। পথ প্রদর্শকটি এবার নির্দেশ দিলেন যে, এখন সোজা উত্তরে যাইয়া যে স্থানটিতে রাস্তাটি উত্তরদিক হইতে আসিয়া বাঁক ঘুরিয়া সোজা পূর্বে চলিয়া গিয়াছে সেইস্থানটিতে গিয়া পৌঁছিতে হইবে—তবে সে বাকি এখন হইতে কত দূর তাহা পূর্ব হইতে তাহার পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নহে। সুতরাং পুনরায় উত্তরমুখী যাত্রা করিতে হইল এবং আরো ঘণ্টা দুই হাট্টিয়া অবশেষে রাস্তা-চিহ্ন সন্ধান মিলিল। কিন্তু রাত্রি তখন ওটা বাজিয়া গিয়াছে—সহরটিতে পৌঁছিতে আরও ঘণ্টাখানেক লাগিবে—তারপর কাজ সারিয়া পুনরায় নৌকায় আসিয়া পৌঁছিতে আর রাত্রিতে থাকিবেই না, বেলা অনেকখানি হয়তো হইয়া যাইবে; এ অবস্থায় কি করা যে কতব্য তাহাই একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু ইহা লইয়া বেশীক্ষণ তাহারা সময় নষ্ট করিল না—ঠিক হইল যাহাই ঘটুক তাহারা কিছুতেই পশ্চাদ্গত হইবে না।

প্রথম অগ্রমণে জনদুই পাহারাওয়ালাকে আহত করিতে হইয়াছিল—অন্য বন্দুকধারী যে কয়জন পাহারায় ছিল—তাহারা প্রাণভয়ে গিয়াছিল পলাইয়া। আশ্চর্যের ভিতরে কার্য সমাধা করিয়া বহু পরিমাণ অর্থ লইয়া যখন তাহারা গঙ্গার ঘাটের অভিমুখে সেই রাস্তা ধরিয়া রওনা হইল তখন পর্যন্তও কোন বাধা আসে নাই। কিন্তু আরও খানিকটা আসিতেই বৃষ্টিতে পারিল—সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী দল বাঁধিয়া সহর ও গ্রামের জনতা মিলিয়া তাহাদের পিছু লইয়াছে—চারিপাশ হইতে তাহাদেরই অস্পষ্ট কলরব তাহাদের কানে আসিতে লাগিল। রাত্রি তখন আর নাই—অন্ধকার মল্লয়া চারিপাশ ক্রমে ঢোখের

সম্মুখে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে—ভোরের পাখী উঠিয়াছে কলধনি করিয়া জাগিয়া। তখন তাহারা সেই পথের বাকি আসিয়া পৌঁছিয়াছে—ইহার পরেই সেই মাঠ। কিন্তু এখানে আসিয়া দেখে—দুইপাশ হইতে পুলিশবাহিনী ও গ্রামবাসী মিলিয়া বন্দুক ও লাঠি লইয়া তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। সুতরাং এখানে তাহাদের থামিয়া পড়িতে হইল। পাঁচজন উত্তরে ও পাঁচজন দক্ষিণে মুখ করিয়া বন্দুক ধরিয়া দাঁড়াইল। পর পর কয়েক রাউন্ড ফাঁকা আওয়াজ করিবার পর জনতা ভয়ে পলাইয়া গেল। তারপর এই দীর্ঘ মাঠ; তাহারা প্রাণ-পণে দৌড়াইতে লাগিল। কোথায়ও কাটাগাছে লাগিয়া পা ছিঁড়িয়া গেল কোথায়ও চৈত্রের চষা মাটির ঢেলায় উপরে কে কতবার পড়িয়া চোট খাইল এসব কেহ ফিরাইয়াও দেখিল না। সূর্য তখন পূর্বাকাশে দেখা দিয়াছে—সমস্ত প্রান্তর তাহারই আলোয় ভরিয়া গিয়াছে। মাঠের চারিপাশ হইতে তাহাদেরই দিকে অভিন্ন দূরে দূরে বহুসংখ্যক লোক ছুটিয়া আসিতে লাগিল—তাহার ভিতরে পুলিশ আছে—সাধারণ কৃষক আছে; সহরের কুলিমজুর আছে, ভদ্রলোক আছে; কিন্তু তবুও এই যোলটি প্রাণী কোনদিকে দৃকপাত না করিয়া দ্রুতপদে আগাইয়া চলিল। নৌকায় আসিয়া যখন তাহারা পৌঁছিল, তখন গঙ্গার ধারে ধারে অসংখ্য লোক বন্দুক, ফালা, লাঠি প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। নৌকা যেমন চলিতে লাগিল—তীরের লোকজনও তেমন তাহাদের সাথে সাথে দৌড়াইতে লাগিল। একস্থানে দেখা গেল যে, কতকগুলি বন্দুকধারী পুলিশ নৌকায় উঠিবার উপক্রম করিতেছে। তাহারা সকলেই বৃষ্টিতে পারিল এবং আর নৌকা করিয়া যাওয়া চলিবে না। নলিনাক্ষ আর আসিত এই দলের অধিনায়ক।

নলিনাক্ষ বলিলেন—নৌকা পশ্চিমপাড়ে নিয়ে চল, আর নৌকায় নয় এবার হেঁটে রওনা হতে হবে।

নৌকা তাদের গঙ্গার পশ্চিম তীরের দিকে আগাইয়া চলিল। এদিকে পুলিশবাহিনীর নৌকাও তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। নলিনাক্ষ পুনরায় দলের সকলকে সন্মোদন করিয়া বলিল—হুঁ! সত্যি আজ সত্যিকারের সাহসের পরিচয় দিচ্ছি—ধরা আমরা দেবো না—তার চেয়ে সম্মুখ প্রাণ দেব, সেও ভাল।

তিন দিন রাত্রি ধরিয়া তাহারা নৌকা বাহিয়া আসিয়া পৌঁছিয়াছিল—ভাল করিয়া আহাতি জুটে নাই—নিদ্রা যায়—তারপর আত্মসরাটা রাত্রি এমনি করিয়া কিছুটা করিয়াছে—

শরীর তাহাদের অবসাদে ভাঙিয়া আসিতেছে—  
তবু যোলটি প্রাণী নলিনাক্ষের কথার প্রতিধ্বনি  
করিয়া বলিয়া উঠিল—“ধরা আমরা দেব না,—  
বৃন্দ করে মরবো।”

নৌকা আসিয়া ভীরে লাগিল। এপাড়ে  
অনেকদূর পর্যন্ত চড়া—প্রায় মাইলখানেক এই  
চড়া ভাঙিয়া গেলে তবে গ্রাম পাওয়া যাইবে।  
চড়ার উপরে চৈত্রে খর রোদ্রে বালি যেন  
একেবারে ফুটিয়া রহিয়াছে—তাহার ভিতরে  
পা বসিয়া যায়—জুতার ভিতরে বালি ঢুকিয়া  
পড়ে। বালির উপরে মাঝে মাঝে যেসব স্থানে  
কিছু কিছু পলি জমিয়াছে, সেই সেই স্থানে  
কিছুটা স্থানব্যাপিয়া বড় বড় নটা কোপ সতেজে  
গজাইয়া উঠিয়াছে। দুই একস্থানে এই কোপ-  
গুলি এত ঘন সন্নিবিষ্ট যে, সমস্ত চড়াটাই  
একটা নটাবন বলিয়া ভ্রম হয়। সৌভাগ্যের  
বিষয় এ পাড়ের গ্রামগুলি খুব দূরে দূরে  
হওয়ায় এবং চড়ার উপরে কোন ফসল না  
ধাকায় নিকটে কোথাও লোকজনের সাড়াশব্দ  
ছিল না। কিন্তু এক অভাবনীয় বিপদ আসিয়া  
উপস্থিত হইল। হঠাৎ তাহাদের ভিতরের  
যতীন নামে ছেলটি একেবারে জ্ঞান হারাইয়া  
বালির উপরে লুটাইয়া পড়িয়া গেল। যতীন  
দলের মধ্যে সকলের চেয়ে ছোট বয়স তাহার  
পনর বোলর বেশী হইবে না। এই কয়দিনের  
অভ্যাস—তারপর গত রাত হইতে এ পর্যন্ত  
অবিশ্রান্ত পরিশ্রম তাহাকে একেবারে ধৈর্যের  
শেষ সীমায় আনিয়া ফেলিয়াছিল। সমস্যা  
দাঁড়াইল—কি করা যাইবে যতীনকে লইয়া?  
সকলে দাঁড়াইয়া কর্তব্য স্থির করিতে লাগিল।  
অসিত ততক্ষণ যতীনের পাশে বসিয়া তাহার  
মাথাটি পরম স্নেহে নিজের কোলের উপর  
তুলিয়া লইয়াছে। কিন্তু রোগীক্ষণ ভাবিলে  
তো চলবে না। পুলিশ বাহিনী এতক্ষণে হয়  
তো এপাড়ে আসিয়া পড়িল আর কি? নলিনাক্ষ  
আদেশ করিলেন—যতীনকে যখন আর সংগে  
করিয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব নয়—তখন তাহাকে  
এখানেই হত্যা করিয়া নটা কোপের আড়ালে  
ফেলিয়া রাখিয়া যাওয়া হউক। এই নির্মম  
আদেশে সকলেই একেবারে আতঙ্কিত হইয়া  
উঠিল। অসিত প্রতিবাদ করিয়া বলিল—সে  
হবে না—সে আমি কখনও হতে দেবো না।

নলিনাক্ষ বলিলেন—কিন্তু কি করবে  
শুন?

বিশ্ববীরের নিজের প্রাণেরও মায়া করতে  
নাই—পরের প্রাণেরও না। অসিত পুনরায়  
প্রতিবাদ করিয়া বলিল—কিন্তু আমি  
মরবো না—আপনারা সন্ধ্যা হয়ে যান—আমি  
যতীনকে নিয়ে এখানে বসে থাকবো। আপাতত  
নটাকোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকি—তারপর  
সন্ধ্যা হলেই বাহ্যিক হওয়া হয় করবো বলিয়া  
তাহার নিশ্চয় যতীনের কোমর হইতে

পিঙ্গল দুইটি তুলিয়া নলিনাক্ষের হাতে তুলিয়া  
দিল। সময় আর ছিল না সুতরাং সকলেই  
এই সিদ্ধান্তে রাজী হইল। সেই বালির চুড়ার  
অসিত ও যতীনকে পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের  
বাহিনী পশ্চিম দিকে আগাইয়া চলিল। অসিত  
ধীরে ধীরে যতীনকে দুই হাত দিয়া কোলের  
ভিতরে টানিয়া তুলিয়া নিকটস্থ একটি নটা  
কোপের ভিতরে প্রবেশ করিল। উপর হইতে  
বাঁধের জল গড়াইয়া আসায় এই স্থানটি  
অনেকখানি গর্ত হইয়া গিয়াছিল তাহার উপরে  
বড় বড় নটাকোপ গজাইয়া স্থানটি একেবারে  
লোকচক্ষুর অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছিল।  
অসিত এই গর্তের ভিতরে যতীনকে শোয়াইয়া  
নিজে তাহারই পাশে বসিয়া পড়িল। মিনিট  
পনর পরে সশস্ত পুলিশ বাহিনী তাহাদেরই  
সম্মুখের পথ দিয়া মার্চ করিয়া চলিয়া গেল।  
ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই যতীনের জ্ঞান ফিরিয়া  
আসিল—সে চোখ মেলিয়া হা করিয়া জল  
চাহিল। কিন্তু এখনই বাহির হওয়া ঠিক  
হইবে না—গগণারঘাট হয় তো এপাড়ে ওপাড়ে  
কিছু লোকজন থাকিতে পারে ভাবিয়া অসিত  
যতীনের কানের কাছে মুখ লইয়া যথাসম্ভব  
গলা খাটো করিয়া বলিল—কিছুক্ষণ অপেক্ষা  
করতে হবে ভাই—নইলে তো জল দিতে পারবো  
না। চারপাশে যে এখনও লোকজন আছে—  
আমরা পালিয়ে আছি। যতীনের মাথা হয়তো  
তখনও ঘুরিতেছিল। সে আর কোন কথা না  
কহিয়া পুনরায় চোখ বুজিল। বেলা যত  
বাড়িতে লাগিল—এই বালুকারাশি ততই উত্তপ্ত  
হইয়া উঠিতে লাগিল। ঘণ্টা দুই পর একবার  
অতি সন্তর্পণে নটাকোপের আড়াল দিয়া নদীর  
ভিতরে নামিয়া অসিত নিজে পেট ভরিয়া  
জলপান করিয়া এবং নিজের কাপড় ভিজাইয়া  
যতীনের জন্য জল লইয়া আসিয়া পুনরায় সেই  
গর্তের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। সেই  
সঙ্কীর্ণ গর্তের ভিতরে দুইটি প্রাণী উপড়  
হইয়া পড়িয়াছিল—উপরে মধ্যাহ্ন সূর্য সেই  
বালুকারাশিকে তন্তকটাহের বালুকার ন্যায়  
উত্তপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। মাঝে মাঝে সেই  
তন্ত বালি আর বাতাসে মিশিয়া যেন এক একটি  
অনলস্রোত বহিয়া যাইতেছিল এমন করিয়াই  
সারাদিন কাটিবার পর অবশেষে বেলা গড়াইয়া  
সন্ধ্যা নামিয়া আসিবার উপক্রম হইল। অসিত  
বলিল—এবার ওঠো যতীন। যতীন অসহায়ের  
মত বলিল—কোথায় যাবো দাদা—চেতায় যে বুক  
একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। —আগে  
নদীতে নেমে পেটভরে জল খেয়েনি—তারপর  
চল গ্রামের দিকে যাই—যা থাকে অদ্যেই হবে—  
এমন করে তো এখানে বসে থাকলে চলবে না?  
তারপর নদীতে নামিয়া জলপান করিয়া হাত  
মুখ ধুইয়া গ্রামের উদ্দেশ্যে তাহারা রওনা হইল।  
তাহাদের দল ও পুলিশ বাহিনী সোজা পশ্চিম

দিক ধরিয়া গিয়াছিল। তাহারা নদীর সোজা  
খানিকটা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ ধরিয়া চলিতে  
লাগিল, কোন গৃহস্থের বাড়িতে গিয়া রাত্রের  
মত অতিথি হইতে হইবে—সারাটা দিন কিছই  
আহার হয় নাই—শরীর ও মন দুইই একান্ত  
অবসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। অসিত ও যতীন  
পাশাপাশি সেই বালুকা রাশির উপর দিয়া পথ  
চলিতে লাগিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে—  
বালুকারাশির আর সে উত্তাপ নাই—ঠাণ্ডা হওয়া  
তাহাদের গা জুড়াইয়া দিতেছিল। লোকের  
কাছে কি বলিয়া আশ্বপরিচয় দিতে হইবে—  
কোথা হইতে আসিল—কোথায় যাইবে এইসব  
দুইজনে ঠিক করিয়া লইতে লইতে তাহারা পথ  
অতিক্রম করিতে লাগিল। মাইল দেড়েক পরে  
একখানা গ্রামে আসিয়া প্রবেশ করিল। সম্মুখেই  
একখানা বড় বাড়ি—তাহারা কি জাতি—হিন্দু  
কি মুসলমান—তাহা তো জানা দরকার। পথে  
একজন কৃষক শ্রেণীর লোকের সংগে দেখা হইয়া  
গেল। অসিত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া  
লইল—এ গ্রামের নাম চরপাড়া—বাড়ির মালিকের  
নাম অশ্বকা মিত্র। বাড়ির প্রাঙ্গণে ঢুকিয়া  
ডাকাডাকি করিতে যিনি বাহির হইয়া আসিলেন  
তিনিই অশ্বকা মিত্র। একটি হারিকেনের বাতি  
উঁচু করিয়া অসিতের মুখের কাছে ধরিয়া  
জিজ্ঞাসা করিলেন—কি চাই?

অসিত জবাব করিল—আজ্ঞে আজ রাতে  
অতিথি থাকতে চাই।

—কোথা থেকে আসছেন?

—কুষ্টিয়া থেকে।

—যাবেন কোথায়?

—আজ্ঞে নব্বাবীপে যাব।

অশ্বকা মিত্র কিছুক্ষণ কি চিন্তা  
করিলেন—তারপর বলিলেন—আমার সংগে  
আসুন।

তাহার সংগে তাহারা যে ঘরে গিয়া  
উপস্থিত হইল সেটি একতলা দালান—  
বৈঠকখানা। ঘরের ভিতরের খাটের উপরে  
তাহাদের বসিতে বলিয়া সম্মুখে আলোটি  
রাখিয়া অশ্বকা মিত্র পুনরায় প্রশ্ন আরম্ভ  
করিলেন—আপনারা?

অসিত বলিল—আজ্ঞে আমার কায়স্থ।

পুনরায় প্রশ্ন হইল—আপনার নাম?

অসিত বলিল—আমার নাম যোগেশ  
বিশ্বাস। এটি আমার ছোট ভাই—নাম  
সতীশ বিশ্বাস।

—আপনাদের নিবাস?

—কুষ্টিয়া মহকুমায়—কুষ্টিয়া থেকে  
১০।১২ মাইল দূরে।

—নব্বাবীপে যাবেন কেন?

—চাকুরীর চেষ্টায়।

—হেঁটে এলেন কেন?

—হাতে পয়সা ছিল না।

—কিন্তু এদিক দিয়ে এলেন কেন? এটা তো পথ নয়।

—পথ চিনি—ভুল করে ফেলেছি।

কিন্তু অনিতের কোন জবাবই তাহার মনে পড়ত হইল বলিয়া যেন মনে হইল না।

পরে ঘরের বাহির হইয়া চাঁৎকার করিয়া ডাকিলেন—হারাণ—ও হারাণ—ব্যাটা মরেছে নাকি?

কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর হারাণ আসিয়া উপস্থিত হইল। হারাণ সম্ভবতঃ বাড়ির চাকর—মসত বড় লম্বা-চওড়া জোয়ান চেহারা। হারাণের কানের কাছে যেন অম্বিকা মিত্র কি ফিস ফিস করিয়া বলিলেন। হারাণ আসিয়া ঘরের দরজার সম্মুখে বসিয়া পড়িল। অম্বিকা মিত্র আসিতদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—আপনারা বসুন, আহারের বন্দোবস্ত করে আসি। অনিতের এই লোকটিকে ভাল লাগতেছিল না—তাহার প্রত্যেক প্রশ্নের ভিতর দিয়া যেন একটা দারুণ অবিশ্বাসের ভাব ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। হারাণকে ডাকিয়া দরজার সম্মুখে কি তাহাদের পাহারা দিবার জন্য বসাইয়া রাখা হইল?

অসিত পুনরায় ভারিল—হয়তো এ তাহার মনের ভ্রম।

অপরিচিত লোককে ভাল করিয়া না জানিয়া শুনিয়া কে রাগি করিয়া স্থান দিতে চাহে?

যতীনের কিন্তু এত ভাবনা চিন্তার অবসর ছিল না—এই কয়টা দিনের অবিশ্রান্ত আত্যাচারে সে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এইসব কথাবার্তার কোন ফাঁকে সে খাটের উপরে শুইয়া পড়িয়া নিশ্চিন্ত ভরসায় কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অসিত নিজেও জোর করিয়া মনে হইতে সমস্ত সংশয় কাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া নিজেদের সমস্ত মগ্নলামগ্ন অদৃষ্টের হাতে সর্পিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার নিজেরও সমস্ত শরীর শান্তিতে ও ক্ষুধায় ভাঙিয়া আসিতেছিল—ইচ্ছা হইতেছিল সেও যতীনের মত তাহারই পাশে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। কিছুক্ষণ পরে অম্বিকা মিত্র পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া আসিতদের সঙ্গে করিয়া বাড়ির ছত্রে লইয়া গিয়া আহাৰ করাইয়া পুনরায় এই ঘরে লইয়া আসিল। এই ঘরটির পাশে আর একটি ছোট কুঠুরী ছিল সেখানে বিছানা করিয়া তাহা-নিগকে শুইতে দিল। অসিত ও যতীন পাশাপাশি শুইয়া পড়িল। যতীন কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িল। আহারের পর দারুণ আলস্যে আসিতের দুই চোখও ঘুমে ভাঙিয়া আসিতেছিল। কিন্তু মনে তাহার দারুণ উৎকণ্ঠার বারে বারে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। এই ঘরের একটি মাত্র দরজা—দরজাটি ভেজান ছিল। তাহার মনে হইল কে

যেন বাহির হইতে দরজাটির শিকল তুলিয়া দিল। একি সত্য না তার মনের ভ্রম—সে ব্যক্তিরা উঠিতে না পারিয়া বিছানার উপরে উঠিয়া বসিল। ধীরে ধীরে পা টিপিয়া দরজার নিকটে আগাইয়া গিয়া অতি সন্তপণে দরজা ধরিয়া টান দিল—কিন্তু একি! সত্যি ত দরজা বাহির হইতে কে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মুহূর্ত মধ্যে তাহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। দুই কানের ভিতর দিয়া যেন আগুন ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। ঘরটি হইতে বাহির হইবার আর দ্বিতীয় পথ নাই—চারিপাশে পাখা দেওয়াল সুতরাং খাচায় আবদ্ধ পশুর মত উদ্ধারের সমস্ত চেষ্টাই যে একেবারে নিষ্ফল তাহা সে স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারিল। কিন্তু এত দুঃখ কষ্টের পর শেষে এমনি করিয়া তাহাদিগকে ধরা দিতে হইবে? কিন্তু কি ইহাদের উদ্দেশ্য? কেন ইহারা তাহাদিগকে আটক করিতে চায়? সকালবেলা তাহাদের দলের কথা পুলিশ বাহিনীর অনুসরণের কথা হয়তো ইহারা জানিয়াছে। সেই সন্দেহই করে নাই তো? না—এমনি করিয়া ধরা দেওয়া চাইবে না—সে দরজা ধরিয়া প্রাণপণে নাড়া দিতে লাগিল—কিন্তু সেই দৃঢ় দরজা ভাঙিয়া বাহির হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। ঘরের আশপাশে দুই চারিটি লোকজনের অস্পষ্ট কথাবার্তা শুন্য যাইতেছিল। অসিত বুকিল এগারো আর রফা নাই; সে ধীরে ধীরে আসিয়া বিছানায় বসিয়া পড়িল—সমস্ত শরীর দিয়া তাহার ঘাম ছুটিতেছিল। পাশে যতীন অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল—একবার ভাবিল তাহাকে ডাকিয়া তুলিয়া সমস্ত জানাইয়া দেয়—কিন্তু পুনরায় ভাবিল অচা বেচারী সমস্ত দিনের পরিগ্রামের পর এতক্ষণে নিশ্চিন্ত নিভয়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে যতটুকু পারে শান্তিতে ঘুমাতে। এই হয়তো জীবনের শেষ শান্তি এমনি করিয়া কয়েক ঘণ্টা অসিত চুপ করিয়া বসিয়া কাটাইয়া দিল। বাহিরের গাঙগোল ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। হঠাৎ এক সময় যতীনের ঘুম ভাঙিয়া গেল—অসিতের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে তাড়াতাড়ি বিছানার উপরে উঠিয়া বসিয়া প্রশ্ন করিল—এমনি চুপ করে বসে আছেন যে দাদা? অসিত ধীরে ধীরে তাহাকে সমস্ত ব্যাপার ভাঙিয়া বলিল। সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া যতীন কয়েক মুহূর্ত একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর হঠাৎ যেন একেবারে উদ্ভয়ের মত ছুটিয়া গেল দরজার দিকে। অসিতকে বলিল—এমনি চুপ করে পরা দেওয়া হবে না দাদা। আসুন দরজা আমরা ভেঙে ফেলি, বলিয়া দুই হাতে দরজার কপাট ধরিয়া যথাসাধ্য নাড়া দিতে লাগিল। কিন্তু সে রুদ্ধ দরজা খুলিবার কিছু-মাত্র লক্ষণ দেখা গেল না। অসিত তাহার নিকটে আসিয়া স্লান হাসি হাসিয়া বলিল

ও কপাট খুলবে না যতীন—সে চেষ্টা আঁক করে দেখেছি।—কিন্তু কি হবে দাদা?—মি আর হবে ভাই। নিজেদের ভবিষ্যতের চিন্তা করে তো বেরুই নি—যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে। দুইজন পুনরায় বিছানায় আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে অসিত বলিল—ভয় করছে যতীন?

যতীন তাহার দিকে চোখ তুলিয়া বলিল—আপনি কি আমায় সন্দেহ করছেন দাদা!

অসিত বলিল—সন্দেহ নয় ভাই—কিন্তু তুমি অমানি করে মুখে পড়লে কেন?

যতীন জবাব দিল—প্রাণের ভয় আমি করিনে দাদা—কিন্তু ভাবছি, যে রাত নিয়েছিলাম কিছই তো তার করে যেতে পারলাম না।

অসিত মৃদু হাসিয়া বলিল—ফলাফলের চিন্তা যে আমাদের করা নিষেধ ভাই। “কর্মণ্যে বাধিকারসন্তে মা ফলেশু কদাচন”—ফল দেবার মালিক যিনি তিনি যদি না দেন সে নাশিণ তো জানাবার আর স্থান নাই ভাই।

যতীন খানিকক্ষণ ভাবিয়া লইয়া বলিল—ঠিক বলেছেন দাদা—এতক্ষণ নিজের জীবনটাকে খুব বড় বলে ভেবেই তো লাভ ক্ষতির হিসেব নিকেশ করতে যাচ্ছিলাম—সে ভুল আমার ভেঙে গেল। কতক্ষণ পরে বাহির হইতে অনেকগুলো বুটের মস মস শব্দ ভাসিয়া আসিয়া একেবারে তাহাদের ঘরের কাছে আসিয়া থামিল।

অসিত বলিল—বুকেছ যতীন, পুলিশ এলো!

যতীন বলিল—হাঁ বুটের শব্দ শুনা যাচ্ছে। তারপর পুলিশের হাতে পড়িলে তাহারা কি বলবে না বলবে সে সম্বন্ধে নিজেরা পূর্বে হইতেই সূচি করিয়া রাখিল। রাগি আর নাই—বাহিরে দিনের আলো ফুটিয়া উঠিতেছিল—ঘরের দরজা জানালার ফাঁক দিয়া তাহারই আভাস দেখা যাইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ শব্দেব ঘরের দরজা খুলিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল একদল পুলিশ সঙ্গে তাদের একজন ইউরোপীয় সাহেব উপরওয়াল। সাহেবটির হাতে একটি পিস্তল। ঘরে ঢুকিয়াই বিনা বাক্যবাহ্যে কয়েকজন পুলিশ অসিত ও যতীনকে পিঠ-মোড়া করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। অসিত বা যতীন কেহই কোন প্রতিবাদ করিল না—একটুও বল প্রকাশ করিল না। ভাল করিয়া বাঁধিয়া যতীনকে কয়েকজন পুলিশ ধরিয়া পাশের অন্য একটি কক্ষে লইয়া গেল। কয়েকজন পাহারা আসিতের নিকটে বসাইয়া পুলিশ সাহেবটিও পাশের কক্ষে চলিয়া গেল। দুই হাতে মাঝে মাঝে নানাপ্রকার কথাবার্তার ভাসিয়া আসিতে লাগিল। অসিত বুদ্ধিতে বুঝিল—পুলিশের নানা প্রশ্নবাণ যতীনের মাথায় ঝুটত হইতেছে। কিন্তু তাহাতেই মনে মনে ই

পাইল না। একটু পরেই কিল, ৩৬, ঘর্ষিত, বেটনের আঘাত যে নির্বিচারে তাহার উপর বর্ষিত হইতেছে অসিত তাহা স্পষ্টে বুঝিতে পারিল। সমস্ত ইন্দ্রিয় রুদ্ধ করিয়া অসিত যেন একেবারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। পাশের ঘরে প্রহারের শব্দ কিন্তু একটুও না করিয়া বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এমনি চলিবার পর হঠাৎ এক সময়ে প্রহারের শব্দ একেবারে থামিয়া গেল।

কয়েকজন বলিয়া উঠিল—জল, জল আনুন শিগগীর অম্বিকাবাবু। অম্বিকাবাবুই হঠাৎ ঘর হইতে জল আনিবার জন্য ছুটিয়া বাহির হইল—অসিত সে শব্দও শুনিত পাইল।

যতীন কি অজ্ঞান হইয়া পড়িল?—তাহাই হয়তো হইবে। বেচারী এই কয়দিনের অত্যাচারে একেবারে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল—তাহার পর এই অমানুষিক প্রহার সহ্য করিতে পারিলে কেন? রাগে ও দুঃখে অসিতের দুই চোখ জ্বালা করিতে লাগিল। ঘণ্টাখানেকের ভিতরে আর পাশের ঘর হইতে প্রহারের শব্দ আসিয়া আসিল না। অসিত মনে করিল হয়তো যতীন এতক্ষণে পুনরায় খানিকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। বেলা তখন অনেকখানি হইয়া গিয়াছে। এমন সময় একজন দেশী পুলিশ কর্মচারী সহিত অম্বিকা মিত্র আসিয়া অসিতের ঘরে ঢুকিল। অম্বিকা মিত্রের এক হাতে একখানা খাবারের থালা অন্য হাতে জলের গ্লাস। অম্বিকা মিত্র পুলিশ কর্মচারীর নির্দেশমত অসিতের সম্মুখে খাবারের থালা ও জলের গ্লাসটি নামাইয়া রাখিল। থালার নানাপ্রকার মিষ্টান্ন সাজান রাখিয়াছে। পাশের সিপাইটি অসিতের হাতের বাঁধন খুলিয়া দিল। পুলিশ কর্মচারীটি অসিতকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—আপনি ততক্ষণ কিছু খেয়ে নিন। আমরা বাইরে অপেক্ষা করছি। অম্বিকা মিত্রের হাতে খাবারের থালা নৈশিখ তাহার সমস্ত মন একেবারে রাগে ফাটিয়া পড়িতেছিল। এই বিশ্বাসঘাতকের একরাশির অস্বাভাবিকতা তো ভাল করিয়াই শোধ করিয়াছে। আবার তাহার খাবার মূখে তুলিলে?

অসিত লাগি মারিয়া খাবারের থালা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল—সমস্ত খাবার ঘরঘর ছড়াইয়া একাকার হইয়া গেল। অসিত গাফিয়া উঠিয়া বলিল—ওর খাবারে বিষ—ওর ভালে বিষ—ও ছুঁলেও পাপ হয়। পুলিশ অফিসারটি গোয়েন্দা বিভাগের পাকা সৈন্য তিনি ইগিতো অম্বিকা মিত্রের হাতে খাবারের থালা নৈশিখ তাহার সমস্ত মন একেবারে রাগে ফাটিয়া পড়িতেছিল। এই বিশ্বাসঘাতকের একরাশির অস্বাভাবিকতা তো ভাল করিয়াই শোধ করিয়াছে। আবার তাহার খাবার মূখে তুলিলে?

আমরাই খাবার এনে দেবার যোগাড় করছি। কি আপনার নাম জানি না। তবে আপনারাও তো ভর সন্তান। নিজেরা যে কেন এইসব কাজ করেন তাহা বুঝি—নিজেদের স্বার্থের জন্য তাহা আর নয়—দেশের জন্য—দেশের মঙ্গলের জন্যে। আমরা মশাই সরকারের চাকর—কি করি বলুন—মন কি আর এসব করতে চায়—তবু তো পেটের দায়ে না করে পারিনে—নইলে আমরাও কি মনে মনে কম স্বদেশী মশাই! পরে নিজের উপরস্থ ইউরোপীয় কর্মচারীটিকে ইগিতো বলিলেন—ওরা মশাই ইংরেজ—ওরা আমাদের সব দুঃখের কথা কি বুঝবে—তবে আপনি যদি আমার কথা শোনেন কিছু উপকার আমি আপনার করতে পারি। অসিত কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া তাহার দিকে শব্দ ভাবিয়া রহিল। পুলিশ কর্মচারী সেপাই দুইটিকে ইগিতো ঘরের বাহিরে নাইতে বলিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন—আপনার সংগীটি সব স্বীকার করেছেন মশাই। ভেদেমানুষ যা করেছে—ভালই করেছে। আমি বলছি আপনিও একটা স্বীকারপত্র লিখে দিয়ে আপনারদের সংগে আর কে কে ছিল তাদের নামগুলো বলে দিন। আপনি রাজসাক্ষী হবেন সেকন্ডের খালাস পাবেন। ইংরম্যান—সামনে কত ভবিষ্যত পড়ে রয়েছে—নিজে

আবার মৃত্ত মানুষ হয়ে সংসার মন দিন।

অসিত নিভাত বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল—তার মানে—কাদের নাম—আর কাদের রাজসাক্ষী?

পুলিশ কর্মচারীটি মুখের একটি বিশেষ ভঙ্গি করিয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া বলিল—ওরা প্রকাশ হয়ে গেছে মশাই।

কাল রাত্রে ডাকাতের কথা আপনার সংগীটি সব প্রকাশ করে দিয়েছেন। তিনি যখন সমস্ত স্বীকার করে বেঁচে যাচ্ছেন আপনিই বা কেন সারাজীবন জেলে পড়ে মরবেন, বলুন তো? আর তিনি যখন সব বলে দিয়েছেনই তখন আপনি না বললে তো আমাদের কোন অসুবিধা হবে না—তবে আপনার ভালর জন্যেই বলছিলাম কি না? সরকারী কাজ করলেও বতরু দেশের লোকের উপকার করতে পারি—সেটা তো করা উচিত—তবু তো মনে ভাবতে পারবেন—না একটা লোককে যথাযথ উপকার করেছে। অসিত কিন্তু আর একটা কথাও কহিল না। সে বুঝতে পারিল ইহাও গোয়েন্দা পুলিশের বহুপ্রকারের কৌশলের একটা কৌশলমাত্র।

কিন্তু অসচল এপর্যন্ত অসিতকে প্রহার করা তো দুইয়ের কথা একটা কড়া কথা পরিত্র কেহ বলিল না। অবশেষে বেলা গোটা দশেকের

# ‘অ্যাসপ্রো’

## পাওয়া যাচ্ছে!



জাল জিনিস নিয়ে প্রতারণা হবেন না। প্রত্যেকটি বড়ির উপরে ‘অ্যাসপ্রোর’ নাম লেখা আছে কিনা দেখে নেবেন। ‘অ্যাসপ্রো’

দশ মিনিটের মধ্যেই ব্যথা বেদনা ও জ্বর বন্ধ করে।  
বুকের বা পেটের গন্ধে ক্ষতিকর নয়।



‘অ্যাসপ্রোর’  
নিয়ন্ত্রিত মূল্য  
এক আনায় ৩টি বড়ি  
দশ আনায় ৩০টি বড়ি

পরিবেশক :

ডে. এল. বরিন, সব আত্ম বোদ্ধ  
(ইতিহাস) সি: : পোষ্টবক্স ৩৩৭ কলিকাতা,  
• টেলিফোন Calcutta 798

‘অ্যাসপ্রো’  
সব দোকানেই পাওয়া যাবে

সময় অসিত ও যতীনকে হাতকড়া দিয়া কোমরে দড়ি বাঁধিয়া একখানা গরুর গাড়ীতে চাপাইয়া লইয়া পল্লিশ বাহিনী সহরের দিকে ব্রতা করিল। প্রহারের ফলে যতীনের হাটিয়া বাইবার আর কোন উপায়ই ছিল না। বিকাল বেলা তাহাদের কৃষ্ণনগর গেলে লইয়া যাওয়া হইল এবং ইহারই পরের দিন আরো বারজনকে পল্লিশ গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া আসিল। নীলনাথ এবং আরও দুইজন নানা কৌশলে পল্লিশের চোখে ধূলি দিয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন। এদিকে গোয়েন্দা পল্লিশ দিনের পর দিন জেল হইতে তাহাদের হেফাজতে লইয়া গিয়া নানা অত্যাচার উৎপাদন করিয়াও যখন কাহারও মৃত্যু হইতে অন্য কাহারও নাম সংগ্রহ করিতে পারিল না তখন অগত্যা এই চৌদ্দজনের নামেই মানসলা আরম্ভ করিয়া দিল।

#### ষড়বিংশ অধ্যায়

সেদিন বিকালবেলা কল্যাণী চুপ করিয়া নিজের ঘরে বসিয়াছিল। গৃহকর্ম সারা হইয়া গিয়াছে—অঙ্গর পাদশের বাড়ির ছেলেদের সহিত সন্নিহিত ছোট্ট পাকটিতে খেলা করিতে গিয়াছে—অনির এখনও অফিস হইতে ফেরেন নাই। কল্যাণীর মনে এ কয়দিন কেন যেন মোটেই ভাল লাগিতেছিল না—অসিত আজ আটদিন বাড়ি নাই। এই আটদিন সে কোথায় গিয়াছে—কি করিতেছে তাহার একটা খবর পশ্চাত জানা যায় নাই। তাহার সম্মুখের মেঝে জানালার ভিতর দিয়া একফালি নীল আকাশ দেখা যাইতেছিল—কল্যাণী সেই সমুদ্রের আকাশের দিকে একদৃষ্টে চুপ করিয়া চাহিয়া ছিল। হঠাৎ কেন যেন তাহার দুই চোখ চাপাইয়া অকারণে ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আজ প্রায় সাত বৎসর তাহার শ্রান্তের বাড়ি ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়াছে—এই সাতটি বৎসরের মধ্যে অসিত ক্রমে ক্রমে তাহার একেবারে নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। এই কয় বৎসর তাহাদের দুইজনের ভিতরে যে ব্যবধান সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে—তাহা কোন দিক দিয়াই যেন কাহারও আর আঁতুহ্ন করবার সাধ্য নাই। অসিত দ্বিপ্রহরে আহ্বার করিয়া কোথায় বাহির হইয়া যায় আবার গভীর রাত্রে ফিরিয়া ঢাকা দেওয়া খাবার খাইয়া শুইয়া পড়ে। সংসারের কোন চিন্তায় কোন কাজে সে নাই—একান্ত নিশ্চিন্তের মত সে কোন দিকে ফিরিয়াও চাহে না। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কল্যাণীর সহিত তাহার বাক্যলাপ হয় না। অজ্ঞকেও বড় একটা কাছে ডাকে না, দুটি কথা বলিয়া একটু কোলে লইয়া আদর করে না। দিনের পর দিন তাহার নিকট হইতে—পত্রের নিকট হইতে স্বামী তাহার এমনি দূরে সরিয়া বাইতেছে ইহা কল্যাণী কেমন করিয়া সহিব? সে বলে সে দেশের সেবা করে—সে ব্রত

নিয়াছে। কল্যাণী দেশ বুঝে না—আর দশজন বাঙালী মেয়ের মত সে চাহে ভালবাসা—চাহে ধন—চাহে ঐশ্বর্য—চাহে পরিপূর্ণ সংসার। কিন্তু সুখ সৌভাগ্য এসবের প্রশ্ন তো তাহার মনে হইতে অনেকদিনই চলিয়া গিয়াছে—সে কামনা আজ আর করে না। আজ শুধু এক আশংকায় তাহাকে অহরহ শঙ্কিত করিয়া রাখে। অসিত একদিন বলিয়াছিলেন—তাহারা অস্তুশস্ত লইয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে মৃত্যু করিয়া তাহাদিগকে এদেশ হইতে তাড়াইয়া দিবে—সেই শব্দই তাহারা এখন সংগ্রহ করিতেছে। এইতো দেশে কত স্বদেশী ডাকতি—আরও কি সব ছোটখাট পল্লিশ আর দেশের লোক লড়াই হইয়া গেল—পরে অপরাধীরা ধরা পড়িয়া কেহ গেল ফাঁসি কেহ গেল জেলে—এই সবই তাহার স্বামীকে পাইয়া যেন নাই তো। তাহার কোন কাজের কোন খবরই সে কল্যাণীকে বলে না। কল্যাণী প্রথম প্রথম কত প্রশ্ন করিয়াছে—কিন্তু কোন প্রশ্নেরই চিকমত জবাব সে পায় নাই—আজকাল তাই অতিমানে চুপ করিয়া সমস্ত দীর্ঘবেলা সহ্য করে—নিজের মনে নিজেই ভাবিয়া মরে। শুধু এক আশংকায় আজকাল সন্দিগ্ধ তাহারকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে—কেন কোন অশুভ মহাত্মে হয়তো কোন অসম্মানের বাণী তাহাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়া একেবারে তরলহৃৎয়ের মত স্তম্ভ করিয়া দিবে। হঠাৎ দুই নাম করিয়া মিড়ি ভাঙ্গিয়া অঙ্গর কোথা হইতে ছুটিয়া একেবারে মায়ের কোলে ঝাপাইয়া পড়িল। মাকে সে কোন প্রশ্নের অবকাশ না দিয়া প্রশ্ন করিয়া বসিল—শুনোতো মা, ওদের বীরু কি বলে?

কল্যাণী বলিলেন—কি বলে?

—বলে কি মা, বাবা নাকি চাকুরী করে না—কিসের মত যেন বলে—ইহু মনে হচ্ছে না হ্যাঁ হয়েছে “ভাণ্ডাপাণ্ডের” মত এখানে সেখানে কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। আর ওর নানা তিনশ টাকা মাইনের নাকি খুব বড় চাকুরী করে—তাই ওর বাবা বড়।

আমি বললাম কি জানি মা—আমার বাবা খুব লেখাপড়া জানে খুব বড় বড় ইংরেজী বই পড়ে—খুব বড় বড় কাজ করে।

বীরু বলল, কিন্তু চাকুরী তো করে না।

আমি বললাম—আমার জ্যাঠামণি চাকুরী করে তো।

বীরু বলল—জ্যাঠামণি চাকুরী করলে কি হয়, তোর বাবা তো চাকুরী করে না!

আচ্ছা মা, বাবা খুব বড় চাকুরী করে না কেন?

কল্যাণী পুত্রের গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—হ্যাঁ অগ্রদূত, গুরুজনের সম্বন্ধে ওদব আলোচনা করতে নেই বাবা!

—কেন করতে নেই মা? তবে “ভাণ্ডাপাণ্ডের” কাকে বলে আমি জানি না। মা—বাবা বাড়ি এলে তার কাছে জিজ্ঞেস করবো—হাঁদ খারাপ কিছুর হয় মা, তবে বীরুর দুই গালে ঠাস ঠাস করে দুটো চড় কসে দেবো—হ্যাঁ।

কল্যাণী বলিল—কিন্তু বীরুকে মারামি শুনলে যে তিনি রাগ করবেন অজ্ঞ!

—বাবা হাঁদ রাগ করেন, আমার নিষেধ করেন তবে মারবো না মা।

কল্যাণী এবার হাসিয়া বলিলেন,—আর আমি হাঁদ নিষেধ করি তা হলে বৃষ্টি শুনবি নে অজ্ঞ?

অগ্রদূত মায়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া বলিল—কেন শুনবো না মা—তুমি তো নিষেধ করনি।

কল্যাণী জোর করিয়া অজুর মুখ নিজের বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া চুমু খাইয়া বলিল—না বাবা, সত্যি কারু সাথে মারামারি কখনও করাবি নে।

অগ্রদূত মাথা নাড়িয়া জানাইল—করবে না।

পরক্ষণেই সে পুনরায় তাহার পূর্ব কথার সূত্র ধরিয়া বলিয়া উঠিল—কিন্তু তুমি তো বলো না, বাবা কেন চাকুরী করেন না?

কল্যাণী কিছফন কি যেন ভাবিয়া লইয়া বলিল—তিনি চাকুরীর চেয়েও যে বড় কাজ করেন বাবা!

অগ্রদূত এবার পরম উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া বলিল—আমিও তো ওদের তাই বলছি মা, যে আমার বাবা চাকুরীর চেয়েও বড় কাজ করেন কিন্তু কি কাজ করেন তা বলতে পারিনি—বলোই মার কাছ থেকে শুনো এসে বলবো। বন না মা, বাবা কি করে!

কল্যাণী বলিল—যাতে দেশের দশজনের উপকার হয়—গরীব দুঃখীর দুঃখ ঘোচে তিনি সেই কাজই করেন, অজ্ঞ।

—কান আমি ওদের বলবো মা—আমার বাবা কত বড়!

—না বাবা ওদের কিন্তু কিছু বলিস নে।

অগ্রদূত মুখ ভার করিয়া বলিল—কেন বলবো না মা?

—ওরা যে সব ছোট বাবা, বড় কাজের কথা তো ওরা বুঝতে পারবে না।

অগ্রদূত স্বীকার করিল সে বলিবে না।

কিন্তু পর মহাত্মে বলিয়া উঠিল—আচ্ছা মা, দেশের সর্বত্রই গরীব দুঃখীর দুঃখ দূর করলে খুবই বড় বৃষ্টি? লোকে খুব ভাল বলে বৃষ্টি?—হ্যাঁ!

কল্যাণী বলিল—হ্যাঁ, খুব নাম হয়।

—তবে আর আমার দুঃখ নেই মা—কোন কথা আর আমি ওদের গায়ে মাখবো না—আমার বাবা তো সত্যি বড়!—হ্যাঁ মনে আমি তাঁকে ভালবাসবো।





## ছাবলামো

সম্প্রতি কিছুদিন আমি একটা অত্যন্ত স্বভাববিরোধী কাজে লিপ্ত ছিলাম। দলে আমার মন মেজাজ বিষম বিগড়ে গিয়েছিল। সেজনা পর পর তিন সপ্তাহ আমি লেখা গঠাতে পারি নি। কাজটা মাথায় একটা ব্যথার মতো চেপে ছিল। বোকা খালাস করে কথা বোমালুম ফাঁকা করতে না পারলে ইন্দ্রজিতের লেখার হালকা সুড়টা ঠিক বেরোয় না। আমার এ সব লেখা যে প্রবন্ধ কিম্বা রচনা তৃতীয় জিনিস নয় তা আপনারা এতোদিনে নিশ্চয় বুঝে নিয়েছেন। এগুলো অনেকটা আপন মনে কথা বলে যাওয়ার মতো অর্থাৎ লেতে পারেন এগুলো ইন্দ্রজিতের স্বগতোক্তি। কিন্তু গত তিন সপ্তাহ আমি এতো বাস্তব জগতের, অপরের সঙ্গে তো দূরের কথা আপন মনে কথা বলারও ফুরসৎ ছিল না।

প্রতি সপ্তাহে লেখা পাঠাব বলে আমি সম্পাদকমশায়ের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সে অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারিনি বলে আমি দুর্ভাগ্যবান এবং লজ্জিত। সহৃদয় পাঠকবর্গের কাছে জবাবদিহির তেমন কোন প্রয়োজন বোধ হয় নি। তার কারণ তিন সপ্তাহ ইন্দ্রজিতের খাতা না পড়ে তারা নিশ্চয় শোকে কাতর হয়ে পড়েন নি। বরং আমার মনে হয় বহু সপ্তাহ ধরে এক ধাঁচের লেখা পড়ে পড়ে পাঠকদের যখন হাঁপ ধরে আসে তখন কিছু দিনের বিরাম লেখকের পক্ষেও স্বাস্থ্যকর পাঠকদের পক্ষেও। পাঠকরা অবশ্য বলতে পারেন, তা হলে ধাঁচটা বদলালেই হয়। কিন্তু লেখার ধাঁচ বদলানো অল্প লেখকের স্বভাব বদলানো এক কথা। সমস্যা সব কিছুই অদল বদল সম্ভব, কিন্তু স্বভাব বদলানো অসম্ভব।

এ ছাড়া ইন্দ্রজিতের আর এক ফ্যাসাদ। সেটা বিষয় নির্বাচনী ফ্যাসাদ। আমরা সকলেই বিষয়ী লোক, বৈধিক আমাদের মন। কাজেই বিষয় নির্বিশেষে কথা বলতে গেলে অনেকেরই মন ওঠে না। বিশেষ করে আমাদের দেশ নৈয়ায়িকের দেশ। এখানে সবাই চুলচেরা তর্ক করে কথা বলেন। নায়শাস্ত্রকে বাদ দিয়ে কথা বললেও যে অনায়াস কথা বলা হয় না সে কথা এদেশের লোককে বোঝানো শক্ত। আমার মতে লজ্জাকে বাদ দিলে তবেই কথা বলার আর্ট স্বতঃস্ফূর্তি লাভ করে। গুরুদ্বন্দ্বীর বিষয় ছেড়ে নেহাৎ আমরা যাকে বলি কথার কথা তাই নিয়ে ঝাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন, তাঁরা বথার্থই উচ্চ দরের শিল্পী। ইংরেজী সাহিত্যে চার্লস ল্যাম্ব থেকে শুরু করে জি কে



চেম্ফারটন পর্যন্ত অনেকে এ ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করে যশস্বী হয়েছেন। আমাদের ভাষায় ছদ্মনাম খ্যাত বীরবল এ জাতীয় সাহিত্য রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছিলেন, বাংলা সাহিত্যে 'গুণপণায়ুক্ত' ছাবলামোর বড় অভাব। অর্থাৎ উচ্চ দরের সাহিত্যেও যে ছাবলামোর স্থান আছে এই মহা সত্যটি তিনি স্বীকার করেছিলেন। আর ছাবলামো যখন গুণপণায়ুক্ত হয়, অর্থাৎ সাহিত্যের প্রসাদ লাভ করে, তখন সেটা আর নিছক ছাবলামো থাকে না। প্রমথ চৌধুরীমশায় সুসাহিত্যিক, তিনি অসাধু ভাষায় সাধু বিষয়ক সাহিত্য রচনা করেছেন। বীরবলও সুসাহিত্যিক, তিনি সাধু ভাষায় (অর্থাৎ গুণপণায়ুক্ত ভাষায়) ছাবলামো করেছেন। কিন্তু আমার মতে সাহিত্যিক হিসাবে প্রমথ চৌধুরীর চাইতে বীরবল এর স্থান ওপরে। সমস্যা গুণবান মানুষের অন্ত ছিল না। এতো মানুষ থাকতে প্রমথবাবু, বিদ্যুৎক বীরবল-এর ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন কেন? বিদ্যুৎক জিনিসটা যে দোষনীয় নয় এইটি প্রমাণ করাই বোধ করি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

এককালে আমাদের রাজা ছিল, রাজসভা ছিল, রাজসভায় বিদ্যুৎক ছিল। এখন গণতন্ত্রের যুগে রাজা এবং রাজসভার স্থান গ্রহণ করেছে জনসাধারণ অর্থাৎ বৃহত্তর সমাজ। গণতন্ত্রের সূচিবস্তু রাজসভায় বিদ্যুৎক-এর স্থান গ্রহণ করবেন সাহিত্যিক এবং বিদ্যুৎক শিল্প অর্চিয়ে সাহিত্য কলার মর্যাদা লাভ করবে। অন্যান্য দেশে ইতিমধ্যেই তা হয়েছে। বীরবল যাকে বলেছেন গুণপণায়ুক্ত ছাবলামো সে জিনিসটা যে আমাদের সাহিত্যে তেমন বিস্তার লাভ করে নি তার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ ছাবলামোকে আমরা গুণ বলে স্বীকার করি না, ওটাকে নিগূর্ণ লোকের লক্ষণ বলে অশ্রদ্ধার চোখে দেখি। সেটা যদি রীতিমতো গুণপণায়ুক্ত হয় তাহলেও তাকে সম্মান মর্যাদা দিতে আমাদের পণ্ডিতী রুচিতে বাধে। দ্বিতীয় কারণটা সামাজিক এবং ঐতিহাসিক। আমাদের দেশে শিক্ষা অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ। বাছাই করা জন কয়েকের জন্য

যে সাহিত্য রচনা হয় তা গুরুদ্বন্দ্বীর না হয়ে যায় না। সেখানে হালকা কথাও ওজনে ভারী হয়ে ওঠে। শিক্ষা যখন বহু বিস্তৃত হবে, তখন বহুসংখ্যক অধীশিক্ষিত ব্যক্তির জন্য সাহিত্য রচনা হবে। সে সাহিত্যের প্রধান টেকনিক হবে গন্দ্বীর কথা হালকা সুঁরে বলা। অবশ্য সেই হালকা কথা গুণপণায়ুক্ত হওয়া চাই। অর্থাৎ ছাবলামোটা রস নিংড়ে নেওয়া কথার ছিবড়ে হলে চলবে না। হালকা সুঁরটি রস-ঘন হলে তবেই তা সাহিত্যপদবাচ্য।

ইংরেজ সাহিত্যিক বেকন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বলতেন ইংরেজী ভাষা ভদ্রলোকের ভাষা নয়, লিখতে হয় তো ল্যাটিন ভাষায়। অতএব তিনি বহু পরিশ্রমে ল্যাটিন ভাষায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর তিনি নিতান্তই কৃপাপরবশ হয়ে এও তা নিয়ে ইংরেজী ভাষায় কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন। অদৃষ্টের এমনি পরিহাস ল্যাটিন ভাষায় লেখা বেকনের গুরুদ্বন্দ্বীর দার্শনিক প্রবন্ধ আজকাল বিস্মৃতপ্রায়। অপর পক্ষে হালকা চং লেখা তাঁর ইংরেজী প্রবন্ধ সর্বজনগ্রাহ্য এবং সর্বত্র আদৃত।

আজকাল আমরা যাকে বলি Belles letters তার জন্ম ফরাসী দেশে কিন্তু ইদানীং ইংরেজী সাহিত্য এ বিষয়ে যেমন উৎকর্ষ লাভ করেছে এমন আর কোনও সাহিত্যে নয়। দৈনিক টাইমস পত্রিকায় তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ সম্পাদকীয় স্তম্ভ এ ও তা নিয়ে লেখা। বলা বাহুল্য এ সব অতি উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা। এগুলো সংবাদপত্র মূলতঃ প্রার্থনা প্রয়োজনকে অতিক্রম করে সর্বকালীন না হলেও দীর্ঘকালীন মূল্য লাভ করেছে। তার প্রমাণ ঐ সব প্রবন্ধ সংকলিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। অত্যন্ত সাধারণ জিনিস নিয়ে তাঁরা অসাধারণ রচনা নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। নিতান্ত কুকুর বেড়াল নিয়ে এমন উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখেছেন যা আমাদের দেশে গো ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেও লেখা সম্ভব নয়। সুখের বিষয় ইদানীং আমাদের নবীন সাহিত্যিকদের মধ্যে কেউ কেউ এ ধরনের রচনায় হাত দিয়েছেন এবং যথেষ্ট কৃতিত্বও দেখিয়েছেন। সুতরাং সাহিত্যে যে এ জাতীয় লেখার বিস্তৃতি হয়েছে তা এরা আপন শক্তির দ্বারা প্রমাণ করেছেন। সাধারণকে অসাধারণ করতে গেলে কঠোর প্রয়োগে যথেষ্ট কারুকর্ম প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যে Belles letters এর বহুল প্রচলন হলে আমাদের ভাষাগত কারুশিল্পের যথেষ্ট বিস্তৃতি হবে।

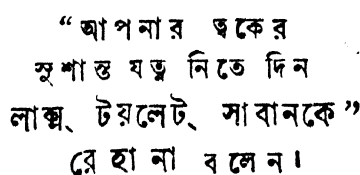
(২) নিম্নলিখিত অংশ বর্জিত  
প্রেসিডেন্সী বিভাগ—

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ২ কোটি ৮০ লক্ষ  
৩২ হাজার অধিবাসীপূর্ণ ৪০ হাজার ১৩৭  
বর্গমাইল স্থান দাবী করা হইয়াছে। এইরূপে  
গঠিত হইলে পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা  
শতকরা প্রায় ৬৮ জন, বিন্যাসিত ও  
প্রায় ৩১ জন লোকসংখ্যা। মোট জনসংখ্যা  
৪৩ লক্ষ ৭০ হাজার ৮০০ জন। শতকরা ৪৫  
হইবে। কিন্তু দেশটির বর্গমাইল স্থানব্যাপী  
২ লক্ষ ৪০ হাজার লোকের বাসস্থান পার্বত্য  
চট্টগ্রাম লোকসংখ্যা কংগ্রেসের বিবৃতিতে কোন  
কথা নাই—লোকসংখ্যাও বাঙালার  
লোকসংখ্যা বর্জন করা হইয়াছে।

চট্টগ্রাম পাবর্তা অঞ্চল বিশেষরূপে  
অ-মুসলমানপ্রধান। সুতরাং তাহা কেন হিন্দু-  
বংশের অস্তিত্ব না হইয়াও পাকিস্তানভুক্ত  
হইবে? পাকিস্তানের সেই ২,৪৭,০৫০ জন  
অধিবাসীতে কোনরূপ দাবী থাকিতে পারে না।  
যে ত্রিপুরা বারবার হাংগামার সময় বর্বর  
মুসলমানদিগের অত্যাচারে ভীত হিন্দুদিগকে  
আশ্রয় দিয়াছে এবং বাহার সেই কার্যের জন্য  
বাঙলার গভর্নরও ত্রিপুরার মহারাজকে ধন্যবাদ  
দিয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথ ভাষাকে আশীর্বাদ  
করিয়াছেন—পাবর্তা চট্টগ্রাম সেই ত্রিপুরার

লক্ষ্য করিবার বিষয়, এবার যে বিভাগ  
হইতেছে, তাহার সহিত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের  
বঙ্গবিভাগের কোনরূপ সাদৃশ্য নাই। সেবার  
ব্রিটিশ সরকার বাঙলা প্রদেশ একজন ছোট-

করিবার জন্য—অট্টালিকা নির্মাণের কার্যে  
নাবিকের কার্যে, দস্তরীর কার্যে কলিকাতায়  
আসিয়াছে—কিন্তু মিস্ত্রী, দস্তরী, খানসামা  
বাবুদী ইহারা নগরস্রষ্টা নহে। মুসলমান  
নবাব সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিয়া  
হতমান হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন—কবি-  
কাতার উন্নতিসাধন জন্য নহে—ক্ষতিসাধন  
করিতে। আর ইংরেজ যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত  
মহাশূরের টিপু সুলতানের বংশধরদিগকে  
কলিকাতায় আনিয়া, নজরন্দার অবস্থায়  
রাখায় ও অযোগ্যের নবাব ওয়াজিদ আলী  
খাঁকে রাজচ্যুত অবস্থায় বন্দী করিয়া রাখায়  
—টালগঞ্জে ও মেটিগাবুর্জে বহু বিবাহ-  
বিলাসী মুসলমানের সংখ্যা অনেক হইয়াছে।



LUX  
MADE IN INDIA

सर्वोत्कृष्ट कालेव  
हिन्दु धार्मिक आचाराय

OVER BROTHERS (INDIA) LIMITED

দিল্লীর শেষ রাজা বাহাদুর শাহকেও বন্দী করিয়া কলিকাতায় আনা হইয়াছিল—কিন্তু সে কেবল রক্তে পট্টাইবার পথে। আমরা টালিগঞ্জ ও মেটিয়াবুরুজে মুসলমান বসতির কারণ উল্লেখ করিয়াছি; জাহাজে খালাসী, লস্কর প্রভৃতির কাজের জন্য খিদিরপুর অঞ্চলেও বহু মুসলমান আঁসিয়াছে। কিন্তু তাহাদিগের গুরুত্ব আছে এবং কলিকাতা ও উপকণ্ঠে শিক্ষাপ্রধান অঞ্চল—বহুতর কলিকাতা বসিলে বাহা বুঝায় তাহাতে মুসলমান সংখ্যালঘি। তবুও যে মুসলিম লীগ অনায়াসে পাকিস্তানের জন্য কলিকাতা পর্যন্ত দাবী করিতে পারে, সেই মুসলিম লীগ যে সুবিধা পাইলে পশ্চিমবঙ্গ—বিশেষ কলিকাতা অঞ্চল আক্রমণ করিতে পারে না, এমন মনে করিবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না।

সীমা নির্ধারণে—পরস্পর সংলগ্নতা ব্যতীত আর “যে সকল বিষয়” বিবেচ্য, সে সকলের মধ্যে এইগুলি বিশেষ বিবেচ্য।

ঢাকার মত শহরও হিন্দুপ্রধান। কিন্তু কেবল সংযোগ্যভাবে—রক্ষা-বাবস্থার অভাবে তাহা হিন্দুরা দাবী করিতে বিরত থাকিতেছেন। কিন্তু মুসলিম লীগ—নিতান্ত নিলঞ্জভাবেই—কলিকাতা পর্যন্ত দাবী করিয়াছেন।

মুসলিম লীগ জাতীয়তার বিরোধী। কাজেই সীমা-নির্ধারণে জাতীয়তার বিষয়ও বিবেচনা করিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলির পরস্পরের উপর এবং গঙ্গার জলের উপর নির্ভরশীলতার উল্লেখ আমরা পূর্ববর্তী প্রবন্ধসমূহে করিয়াছি তাহার পুনরুল্লেখ নিঃপ্রয়োজন। সেই জন্যই পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জিলা প্রয়োজন এবং নদীর সংযোগ রক্ষার জন্য নদীয়া ও যশোহর দুইটি জিলা প্রয়োজন।

সকল বিষয় বিবেচনা করিলে বাঙলার পাকিস্তানি ভাগ হইতে হিন্দুদিগকে যে প্রাণ ও ধর্মকাজে পশ্চিমবঙ্গে আসিতে হইবে, তাহার আলোচনাও আমরা পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধে করিয়াছি। আমরা পশ্চিমবঙ্গ হইতে মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করিতে চাহি না—কেবল তাহারা পশ্চিমবঙ্গে থাকিয়া যাহাতে অনিচ্ছ সাধন করিতে না পারে, সেই ব্যবস্থা করিতে চাহি। তাহারা যদি স্বেচ্ছায় পাকিস্তানে গমন করে, সে সব কথা। কিন্তু আপাততঃ পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান দুইধর্মবাসী-দিগের সহিত প্রবন্ধে যে হিন্দু-দিগকে চলিয়া আসিতে হইবে, তাহাদিগের সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গে আবশ্যক ভূমি দিতে হইবে। ইহাই পশ্চিমবঙ্গের সর্বনিম্ন দাবী। এই দাবী যে একান্ত সংগত তাহা সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আমরা সীমা-নির্ধারণ কমিশনের সদস্য-দিগকে নিরপেক্ষভাবে এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গের জীবন-মরণ সমস্যার সুস্থ সমাধান করিতে অনুরোধ করিতেছি। তাহাদিগের নির্ধারণের উপ বাঙলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিবে—তাহাদিগকে সেই দায়িত্ব বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হইবে।

## কারাভ্যান অপ্রতিদ্বন্দ্বী

### সিগারেট



# CARAVAN

## কারাভ্যান 'এয়ার কন্ডিশন' করা সিগারেট

চাণ্ডাল চৌবাকো কোম্পানী অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড,  
A.C.I.C. 42

# কাথিয়াওবাড়ী সেলাই ও কাঁচের কাজ

উমা রায়

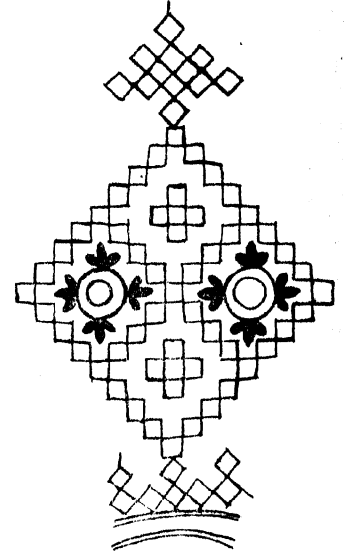
## মেয়েদের জামা

১৩৫৩ সালের পূজোসংখ্যায় আনন্দ-বাজার পত্রিকায় যে কাথিয়াওবাড়ী সেলাই ও কাঁচের কাজের আলোচনা করা হয়েছে এ লেখা তারই পরিপূরক। কাথিয়াওবাড়ী সেলাই-এর সীবনপদ্ধতি সেই প্রবন্ধে প্রধান হয়েছে। এইবার বিশেষ বিশেষ পোষাকে কিরূপ নক্সার প্রয়োজন ও তার বিশ্লেষণ করে কিছু বলা আবশ্যিক।

মেয়েদের জামা অথবা Blouse-এ কি ধরনের নক্সার প্রচলন সে কথাই ধরা যাক। সাধারণত মেয়েদের জামার হাতে ও গলায় কারুকর্ম থাকে—ইদনীং পিঠের দিকের নক্সারও প্রচলন হয়েছে। হাতের ও গলার নক্সার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পিঠে কেউ একটি পানের গড়নের আকার কেউ কেউ গোলাকৃতি নক্সা সেলাই করে থাকেন। তবে শুধু কাথিয়াওবাড়ী অথবা চতুষ্কোণিক ঘর কেটে নক্সা

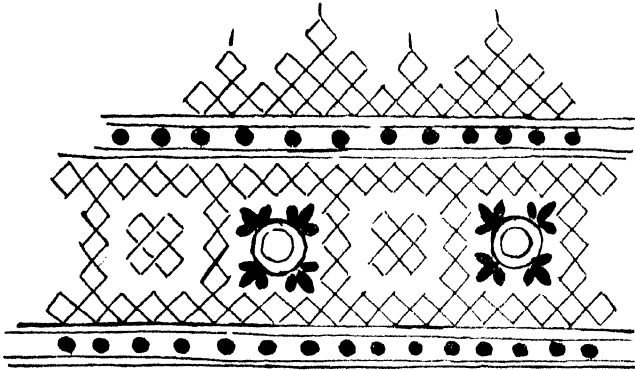
সরল রেখা সেলাই করে, সেই রেখাগুলির মাঝখানের সাদা অংশে ফোঁড়ের কাজ করলেই চলে।

নক্সার বর্ণবিন্যাস সম্বন্ধে বলা খুব কঠিন। রঙ সম্বন্ধে প্রত্যেকের নিজস্ব রুচি ও মতামত থাকে। তবে কাথিয়াওবাড়ী সেলাই আমাদের নিজস্ব চিনিস সূত্রাং ভারতীয় বর্ণপদ্ধতি অনুসারে এই সেলাইয়ে রঙ সংযোগ করা দাঙ্গুনীয়। সাধারণতঃ লাল, কালো, হলদে, খয়েরী ও সবুজ এই পাঁচটি রঙ আমরা খুব বেশী ব্যবহার করে থাকি। কোন পোষাকে যদি লাল রঙটি প্রধান্য লাভ করে তবে সেই নক্সাটিতে অঙ্গপাশ্বতর কালো ও হলুদের কাজ দিতে হবে। অথবা তাতে কালো ও অঙ্গপ সংযোগের কাজ দিতে হবে। তাহলে লাল রঙটি প্রধান্য লাভ করেও চক্ষু পীড়াদায়ক হবে না। যথা 'ক' চিহ্নিত নক্সায় কাথিয়াওবাড়ী চতুষ্কোণিক ঘরগুলি যদি লাল করা যায়—তবে



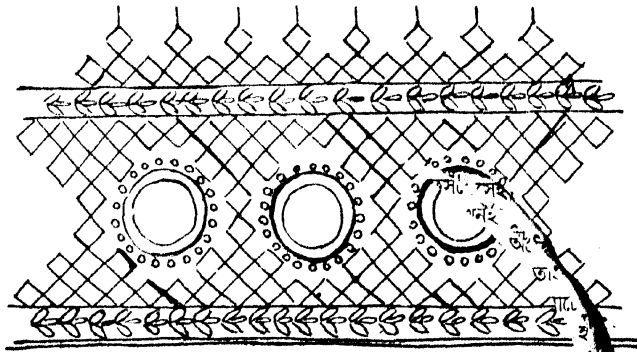
[ঘ]

ভেতরের ছোট গোলাকৃতি অংশটি করতে হবে হলুদ। এই বৃত্তটি কাঁচ বা আয়না দিয়ে ভরতে হবে। কাঁচের অভাবে বোতামের ঘরের সেলাই দিয়ে ভরলেও সৌন্দর্যের হানি হবে না। গোলাকৃতি অংশের ধারে ধারে কালো রঙের ফোঁটা হবে। নক্সাটির দুইদিকের সরল রেখা বা baseগুলি কালো হবে—ও ধারের সরল রেখাগুলির মধ্যে হলুদ ফোঁড়ের কাজ হবে। সরল রেখাগুলি Stem সেলাই অথবা Chain সেলাই দিলে ভালো হয়—ও ভেতরের ফোঁড়ের কাজটি lazy-daisy-loop পাশাপাশি করলে দেখতে ভালো দেখাবে। জামার গলার দুইটি সরল রেখার উপর বায়লটি করলে ভালো হয়। 'ঘ' চিহ্নিত নক্সাটি এই জামার পিঠে বেশ ভালো মানাবে—বলা বাহুল্য তাহলে পিঠের নক্সার বর্ণবিন্যাস 'ক' চিহ্নিত নক্সার অনুরূপ হবে।



[গ]

করলে নক্সার কোন বিশেষত্ব থাকে না—তা একঘেয়ে হয়ে যায়। সেইজন্য চতুষ্কোণিক ঘরের ভেতর গোলাকৃতি কাঁচ বা আয়না বসিয়ে মাঝে মাঝে ফুল ও পাপড়ির গড়নে নক্সা সেলাই করে বৈচিত্র সাধন করা হয়। সকল নক্সার নিচের দিকে দুই একটি সরল রেখা থাকে—এই রেখাগুলিকে বলা যেতে পারে নক্সাটির base। এই base বা বুনিয়েদ না থাকলে সকল নক্সাই অসম্পূর্ণ থাকে। নক্সার প্রস্থ যতখানি তদনুসারে baseএর প্রস্থ কমবেশে হয়। চওড়া নক্সায় একটি সূক্ষ রেখার base থাকলে নক্সার ভার সামান্যত রক্ষা হয় না। Baseএর প্রস্থ বাড়তে হলে দুই বা ততোধিক



[ক]





## অয়াগেন ফিশারের সাক্ষ্য এক বৎসর

প্রশ্নাঙ্কশেখর সরকার

অয়াগেন ফিশারের অধীনে মনুশ্য বংশানুক্রম সম্বন্ধে গবেষণা করিতে যাইবার বাসনা বহুদিন হইতেই ছিল। ১৯৩৮ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের হামবোল্ট বর্তি পাওয়ার ফলেই এটি ইচ্ছা ফলবতী হয়। ১৯৩৮ সালের ১১ই অক্টোবর বার্লিনে উপস্থিত হইলাম।

তখনও বার্লিন শহর হইতে যুদ্ধাশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে যায় নাই। মাত্র কয়েকদিন হইল হিটলার-চাম্বারলেন-মুসোলিনী চুক্তি শেষ হইয়াছে, তবে রণাঙ্গন হইতে তখনও সৈন্যদল ফিরিয়া আসে নাই।

কাইসার উইলহেলম ইনস্টিটিউটে আসিয়া শুনিলাম যে, প্রফেসর ফিশার ছুটিতে বাহিরে গিয়াছেন, ১লা বা ২রা নবেম্বর আসিবেন। প্রোঃ লেনৎস (Lenz) তাহার স্থলাভিষিক্ত এবং তাহারই হুকুম লইয়া ইনস্টিটিউটের ছাত্রভূক্ত হইয়া গেলাম। এইরূপ বিদেশে নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকা একপ্রকার নির্জন কারাবাসের মত। ফিশারের দেখা না পাইয়া মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। আমি অবশ্য জার্মান ভাষা একটু রপ্ত করিয়া লইবার জন্য ইনস্টিটিউট খোলার প্রায় ১ মাস পূর্বেই আসিয়াছিলাম। দিনে কাইসার উইলহেলম ইনস্টিটিউটে টুকটাকি কাজ ও পড়াশুনা লইয়া কাটাওয়া দিতাম আর রাত্রে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান ভাষার ক্লাসে আসিতাম। ইনস্টিটিউটের সময় তবুও কাটে না—দুর্বোধা জার্মান ভাষার পদ্যতক লইয়া কতক্ষণ পড়া যায়? ইনস্টিটিউটের কর্মিবৃন্দের মধ্যে কেহ ইংরাজীও জানে না যে একটু গল্প করিব।

ইতিমধ্যে আমি ইনস্টিটিউটের প্রত্যেক কর্মীদের কাজ দেখিবার অবসর পাইয়াছিলাম। আমার ব্যাকরণদুষ্ট জার্মান ভাষার জন্য প্রথমেই ক্ষমা চাহিয়া লইতাম। একদিন নীচের তলার একটি ঘরে শুনিলাম যে ফিশারের দ্বিতীয় সহকর্মী এই ঘরে জার্মান আদালতে অনর্নিষ্ঠ অজ্ঞাত পিতৃপুত্র মামলার বংশানুক্রম বিজ্ঞানের মতামত প্রদান করেন। আদালত এই প্রকার কোন মামলায় রায় দিবার পূর্বে প্রত্যেকটি ঘটনা ফিশারের নিকট পাঠাইয়া থাকেন। আমি সেইদিনই প্রোঃ লেনৎসের নিকট এইরূপ মামলা গবেষণায় উপস্থিত থাকিয়া হাতেকলমে কাজ করার অনুমতি চাইলাম। পরে ষষ্ঠাদিন ফিশার না আসিয়াছেন ততদিন এই কাজ লইয়া ইনস্টিটিউটের সময়



অয়াগেন ফিশার

বেশ আনন্দেই কাটিত। আমি অপেক্ষাকৃত নিম্নবংশের মামলার অনুমতি পাইয়াছিলাম। বড় বংশের কুৎসা কে আর বিদেশীকে জানাইতে চাহে?

২রা নবেম্বর সকাল বেলা নিজের জায়গায় বসিয়া পড়িতেছি এমন সময় কড়ের বেগে কে যেন একজন ঘরে প্রবেশ করিল তাহা পিছন হইতে বুঝিতে পারিলাম। প্রকাণ্ড ঘর, আমরা ৩ জন এই ঘরেই কাজ করি, সুতরাং ভাবিলাম আমাদের মধ্যেই কেহ বা হইবে। পর মূহুর্তেই হাতে টান পড়িল এবং সংগে সংগেই শুনিলে পাইলাম—“প্রফেসর ফিশার”। তখনও পূর্ণ সম্মিত ফিরিয়া আসে নাই—তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলাম এবং প্রত্যাভিবাদন করিলাম। আমি অভিভূত হইয়া বলিলাম—“হের প্রফেসর, আপনি আমাকে ডেকে পাঠালেই পারতেন।”

ইতিমধ্যে প্রফেসর নিজেই একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িয়াছেন। দেশের, পথের, পরে বিজ্ঞানের অনেক কথাবার্তা হইল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি বিষয়ে কাজ করিতে চাই। আমি বলিলাম—“আমি মানবের বংশানুক্রম নিয়ে কাজ করব বলেই আপনার কাছে এসেছি, বিশেষ করে যমজ নিয়ে বংশানুক্রমের কাজ আমি শিখতে চাই।”

প্রফেসর বলিলেন—“তুমি দর্শন ফ্যাকালটির

লোক—তুমি বংশানুক্রম সম্বন্ধে না কাজ করে সাধারণ শরীরতত্ত্বের উপর কোন কাজ কর না। উপরে আমার শরীরতত্ত্বের বড় মিউজিয়াম রয়েছে। কোন কিছুই অভাব হবে না।”

আমি ধন্যবাদ জানাইয়া বলিলাম—“না, হের, প্রফেসর, আমি বংশানুক্রম ছাড়া অন্য কোন কাজ করতে চাই না আর সেইজন্যই আপনার এখানে আসা।” সেদিন ঐ পর্যন্তই কথাবার্তা হইল। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—“তুমি যমজ সম্বন্ধে পড়াশুনা কর—তারপর আমাকে তোমার কাজের বিষয় ভাবতে দাও। দিন কতক পরে দেখা করো।”

এই স্থলে একটা কথা মনে রাখা কর্তব্য। জার্মানীর প্রত্যেকটি কাইসার উইলহেলম ইনস্টিটিউটের গবেষণা কেন্দ্রে খুব উচ্চতরের গবেষণা হয় এবং এই সকল স্থানে আনকোরা কলেজ ফেরৎ ছাত্রদের আসা একেবারে সমীচীন নহে। আমি এইরূপ কয়েকটি ভারতীয় ছাত্রের দূরবস্থা জানি। ফিশারের লেবরেটরীতে অধিকাংশ কর্মীই হইল চিকিৎসক এবং আমি চিকিৎসক নহি সেজন্য বংশানুক্রম বিজ্ঞানের গবেষণা আমার দ্বারা সম্ভব কি না এই সন্দেহই ফিশারকে পাইয়া বসিল।

সেই ২রা নভেম্বরের পর আর ১৫ই নভেম্বরের পূর্বে ফিশারের সহিত দেখা করিতে পারিলাম না। ১৫ই নভেম্বর বৈকালে প্রফেসরের সহিত পুনরায় দেখা করিলাম ফিশার এমন কাজের কথা বলিলেন তাহা সহিত বংশানুক্রম বিজ্ঞানের সম্বন্ধ যে না তাহা নহে, তবে সে কাজ আমার পছন্দ হইবে না। আমি নম্রভাবে তাহা প্রত্যাখ্যান করি বলিলাম—“হের, প্রফেসর, আমাকে ক্ষমা করে আমি যমজ নিয়েই কাজ করব বলে এসেছি”

প্রফেসর আমার ধৃষ্টতা বা জিদ মাে করিয়াই হউক খানিকটা চুপ করিয়া রহিলে—পরে বলিলেন “আচ্ছা, আমাকে আশ ভাবতে দাও—সামনের শনিবার (১৯ নভেম্বর) আবার দেখা করো”।

প্রফেসর সেই শরের বাইরে আসিয়া ম হইল যে এখনই চলিয়া যাই। শনিবারের উদ্দেশ্যে রাত্রিয়া গেলা ইতিমধ্যে ঠিক তাৎপাট্য আগের শব্দ ইনস্টিটিউটের একটি নাচে তালিসের বাক হইল। সন্ধ্যা ৮টার পর হইতেই সব আসি শব্দ করিল এবং খানিক ইতিমধ্যেই নাচ শব্দ হইল। নাচের গোড়াপত



স্বামীস্বামীর দ্বারা করিতে হয় তাই ইনস্টিটুটের যমজদের মগজ গবেষণাবিশারদ ডাঃ গায়ার ও তাহার স্ত্রীই প্রথমে নাচ শুরুর করলেন এবং সেই সঙ্গে অবতীর্ণ হইলেন প্রোঃ লেনৎজ ও তাহার স্ত্রী। প্রোঃ লেনৎজের বয়স প্রায় ফিশারের মতই হইবে। নাচের আসর বেশ জমিয়া উঠিয়াছে এমন সময় হাজির হইলেন গ্রীমতী সহ প্রফেসর ফিশার। ফিশারের নাচিবার ক্ষমতা নাই (গ্রীমতীকে কখনও নাচিতে দেখি নাই) তাই ফিশার নিকটস্থ টেবিলের ধারেই বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর এ টেবিল ও টেবিল এইভাবে সকলের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে অবশেষে আমাদের টেবিলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাদের টেবিলে তখন আমি, ভিলনার (wilna) একজন পোলিশ, একটি তুর্কী মহিলা ও আর একজন জার্মান মহিলা। ফিশার প্রথমেই আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“হের, সরকার, তোমার সমসার সমাধান করোঁছ কাল সকালেই আমার সঙ্গে দেখা করোঁ।”

তাহার পর আমি কোন ভারতীয় নাচগান জানি কিনা ইত্যাদি নানাপ্রকার গল্প-গুজব চলিতে লাগিল। রাত ১২টা, ১টা বাজিয়া গেল তখনও বৃদ্ধের কি উৎসাহ। ১টাও খানিক পরে একগাল হাসিয়া “ছেলেমেয়েদের নাচতে দাও—আমি বাড়ি চ্যাম—বিদায়” এই বলিয়া ক্ষিপ্তপদে চলিয়া গেলেন।

পরদিন সকাল ৮টার সময় ফিশারের দুর্য্যের করাঘাত করিয়া ভিতরে আসিলাম। ফিশারের নিজের ঘরখানি প্রকাড—নিজের টেবিলে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন। অভিবাদনের প্রত্যুত্তর দিয়া অন্য কোন কথা না বলিয়া পাশের একটি ছোট টেবিল ইগিত করিয়া দেখাইয়া দিলেন। সেই টেবিলটির নিকটে একটি সোফায় বসিয়া দেখিলাম—টেবিলের উপর একটি ছোট কাগজের প্যাড এবং তাহার উপর লেখা—“সরকার, নাগেল (নখ)।” অল্প পরেই নিকটে আসিয়া বসিয়া বলিলেন—“দেখছ, তোমার গবেষণার বিষয়—নখ সম্বন্ধে মোটেই কোন কাজ হয় নি” এই বলিয়া নখের বিষয় নানাপ্রকার চিত্রস্বারা বুঝাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইনস্টিটুটের অন্যান্য কর্মীদের ও আমার প্রয়োজনীয় প্রবাদের জন্য টেলিফোন করিয়া দিলেন।

বাহিরে আসিয়া ডাবিলাম—এক পরীক্ষা—যে সম্বন্ধে কোন কাজই হয় নাই তাহার সম্বন্ধে কোন গবেষণা করিব কেমন করিয়া। নিরাশ হইলাম না। মস্তুরগতিতে দুদাতালায় বাইয়া প্রণীত হইয়া গেলাম। ডাবারশাইম বায়ুটি আর কাহারও বিশেষ কিছু কাজ নাই তাই গরুর পুস্তকাদি লইয়া নিজ আশ্রয় করিয়া আসিলাম।

কয়েকদিনের পর না-ক-পনার পর কার্য-পথতি নিষ্করীয়া কেলিলাম। ইনস্টিটুটে

যে মহিলা কেরানীটির উপর যমজদের চিঠিপত্র লেখার ভার ছিল তাহার সহিত ইতিপূর্বেই যথেষ্ট হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। তাহাকে ৫ বৎসর হইতে ১৫ বৎসর বয়স্কের ১০০ জোড়া জমজের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলাম। এই ইনস্টিটুটের নিয়মানুসারে যে সকল যমজ গবেষণার জন্য আনা হয় তাহাদের সম্পূর্ণ ভার যাহার গবেষণা তাহার উপর থাকে। তাহাদের আহার, বিশ্রাম, পাথের প্রকৃতির কোন কিছুই যেন কোন এন্টি না হয়, তাহার লক্ষ্য রাখাই একমাত্র কাজ। ব্যয়ভার সবই ইনস্টিটুটে বহন করিয়া থাকে।

কাজ আরম্ভ করার কয়েকদিন পর হইতেই ফিশারের আবির্ভাব অত্যন্ত ঘন হইয়া উঠিল। একদিন ফোটে তুলিয়া অন্ধকার ঘরে রাখিয়া আসিয়াছি আর ফিশার কখন যে গিয়া সে ফোটে দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা জানি না। ফোটে দেখিয়া খুসী হন নাই সেজন্য তখনই সহকারীকে ডাকিয়া যথার্থ নির্দেশ দিয়াছেন। এইভাবে ফিশার অনশ্রু আমার গবেষণার উপর নজর রাখিতেন।

এদিকে বর্ডিনের উৎসবের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ডিসেম্বরের মধ্যভাগে বরফ পড়িতে শুরুর হওয়ার বর্ডিন যেন আগাইয়া আসিল। শীতও তদনুরূপ পড়িল, ১৯শে ডিসেম্বর বালিনের শৈত্য—১৯-০ আসিয়া দাঁড়াইল। আমাদের ইনস্টিটুটেও বর্ডিনের উৎসবের (Christmas Ball) ভোজজোড় চলিতে লাগিল।

ঠিক এই সময় একদিন ফিশারের সহিত নীচের তলার ঘরের বারান্দায় দেখা। ফিশার বলেন—“হের, সরকার, আমার মনে হয় যে তোমার মরা যমজের নখগুলোও দেখা উচিত”। তখনই সঙ্গে লইয়া শরীরতত্ত্বের ব্যবচ্ছেদাগারে গেলেন এবং সেখানে ইতিপূর্বে যে জার্মান ছাত্রটি যমজদের মাসপেশী লইয়া কাজ করিত তাহাকে আমার কাজের কথা বলিয়া দিলেন।

এই স্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে এই ইনস্টিটুটে বালিনের সমস্ত হাসপাতালগুলি হইতে যমজদের মৃতদেহ আসিত এবং বিভিন্ন কর্মীরা এই মৃতদেহের বিভিন্ন অংশ লইয়া কাজ করিত। আমি যাওয়ার পূর্বে যে জার্মান ছাত্রটি মাসপেশী লইয়া কাজ করিত সে হাতের তালু পর্যন্ত কাটিয়া কুটিয়া দেখিত এবং পরে সব ফেলিয়া দিত। ফিশারের সেদিনের নখ-গুলিও রাখিবার হুকুম জারির ২৩ দিন পরে ব্যবচ্ছেদাগারে আসিয়া উক্ত জার্মান ছাত্রটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম “গিগাস, আমার নখ সব কোথায়?” গিগাস আর আমি উপরে ও একই ঘরে বসি এবং নীচেও একই ঘরে কাজ করিতে আসিব শুনিয়া পূর্বেই আনন্দিত হইয়াছিল। আমাকে দেখিয়াই উৎকণ্ঠেরে সম্বর্ধনা জানাইয়া বলিল—“দেখছ, সরকার, তোমার জন্যে কতগুলো যত্ন করে জমিয়ে রেখেছি।”

দেখিলাম, প্রায় ২ ফুট লম্বা ও ১০” ইঞ্চি ব্যাসের একটি কাচের পাত্রের তলা হইতে মুখ পর্যন্ত ছোট ছোট হাতে ভরা সবগুলো কঙ্ক হইতে কাটা আর ৪ খানা একত্রে বাঁধা ও তার উপর একটা নম্বর দেওয়া। আমি ত অবাক! আমি বলিয়া উঠিলাম—“গিগাস, তুমি এত-গুলো পেলে কোথায়?” তাহার পূর্বে কোথা হইতে এই সবের আমদানি হয় তাহা জানিতাম না। গিগাসের কাছে সব শুনিয়া ঘরের সমস্ত সংগ্রহ দেখিয়া লইলাম। গিগাস আমার বিশিষ্ট বন্ধু ছিল এবং গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে শত্রুহস্তে বন্দী হয়। ফিশারের পত্রে শুনিলাম যে বেচারী বন্দীশালা হইতে মুক্তি পাইয়াছে বটে, কিন্তু শরীর একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

যাহা হউক, গবেষণার এক পর্ব বাড়িয়া গেল। এই ক্ষুদ্র যমজদের নখ লইয়া বড়ই বিরত হইয়াছিলাম।

রুমে ইনস্টিটুটে খুঁটমাস বলের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। ছেলেমেয়েদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে উপহার লইয়া। একদল স্বীকৃতি করিতে বাস্তু, একদল বেড়াইতে যাইবার জন্য বাস্তু—সারা বালিনই বাস্তু। ফিশার বাহিরে যাইবেন বলিয়া আমাদের ইনস্টিটুটের বলনাচের ব্যবস্থা কিছু পূর্বেই হইল।

এদিনের নাচের ব্যস্ততা আলাদা। সবাই তন্ময় হইয়াছে বটে, কিন্তু নাচ শুরুর হইতেছে না সেজন্য উদগ্রীব হইয়া আছি। এমন সময় হঠাৎ নাচঘরের পশ্চাৎ দুর্য্যার খালিয়া এক বৃদ্ধ আসিয়া হাজির। আবক্ষ শ্বেত শ্মশ্রুগুচ্ছ—পরিধানে আজানুলবিত ঢিলে রঙীন জামা, মাথায় চোঙ টুপ আর হাতে একগাছি ঝাঁটার মত কি যেন একটা। সঙ্গে সঙ্গে পিছনে একদল ছেলেমেয়ে, কেহ বা বৃদ্ধের জামা ধরিয়া টানিতেছে, কেহ বা বৃদ্ধের হাত ধরিয়া টানিতেছে। একটি মেয়ে (ফিশারের বৈজ্ঞানিক সেক্রেটারী) এমন করিয়া বৃদ্ধের পকেটে হাত দিয়া টানিল যে বৃদ্ধ তখনই কাটা লইয়া তাড়িয়া গেলেন। তখনই বৃদ্ধের গলা বুঝা গেল। বৃদ্ধ আর কেহ নহেন আমাদেরই প্রফেসর ফিশার। তখনও কিছু ব্যক্তি প্রতোককে ডাকিয়া এক একটি উপহার প্রদান করিলেন তখনই বুঝিলাম যে আজ ফিশার SANTA CLAUS-এর বেশে সবাইকে উপহার দিতে আসিয়াছেন। প্রত্যেককে উপহার দিবার সময় নানাপ্রকার সরস টিপসীও কাটিতে লাগিলেন। গ্রীমতী ফিশার হইতে শুরুর করিয়া ইনস্টিটুটের প্রত্যেক কর্মী ও তাহাদের স্ত্রী সেদিন উপহার পাইল।

বর্ডিনের এই উৎসবের মধ্যে যমজরা কেহই আসিবে না বলিয়াই আমি মৃত যমজদের আঙ্গুল ও নখ চিরিতে লাগিয়া গেলাম। এই-

ভাবে ১৯৩৯ সাল আসিয়া গেল এবং জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে জ্বর ও বসন্তে আক্রান্ত হইয়া ১৫ দিন গৃহে আবদ্ধ হইয়া রহিলাম।

মার্চ মাসের মধ্যভাগে চেকোশ্লাভাকিয়া লইয়া গোলমাল শুরুর হইল এবং মার্চ মাসের ২৪শে হিটলার যেদিন পোল্যান্ডের মেমেল বন্দরটি অধিকার করিলেন সেদিন যুদ্ধ যে আসন্ন তাহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। ঐ দিনই ভিলনার পোলিশ বন্দুটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা ভাগ্য করিয়া করেক ঘণ্টার মধ্যেই পোল্যান্ডের দিকে রওনা হইয়া গেল। যাইবার সময় বন্দুটি বলিয়াছিল যে পোল্যান্ড বিনা-যুদ্ধে জার্মানিকে 'করিডর' ছাড়িয়া দিবে না। ফিশার কিন্তু পোল্যান্ডের প্রতি অভ্যন্তর সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, পরের অনেক পাঠিতে উক্ত পোলিশরাটির চলিয়া যাওয়ায় দুঃখপ্রকাশ করিতেন।

ইতিমধ্যে ফিশার আমার গবেষণার আরও এক পর্ব, অর্থাৎ তৃতীয় পর্ব বাড়াইয়া দিয়াছেন। যুদ্ধ একদিন যমজন্মের হাতের ছবি দেখিতেছেন এমন সময় বলিয়া উঠিলেন—“আচ্ছা, এদের ভেতরকার হাড়ের ব্যাপার কি হবে? আমাদের সবগুলো X-ray করতে হবে।” আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম। আবার ইহার উপর X-ray! ইনস্টিউটে তখনও পর্বশত রজনরশ্মির দ্বারা ছবি তুলিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না এবং আমিও কখনও রজনরশ্মির দ্বারা ছবি তুলি নাই। একটু শঙ্কিত হইলাম। সেই সন্ধ্যা ভাবিলাম যে এই সকল লেবরেটরীতে কাজের সুবিধা কত এবং জার্মান জাতিকে এইজন্যই apostles of thoroughness বলা হয়।

এ দিনের মধ্যে রজনরশ্মির যন্ত্রপাতি এবং স্বতন্ত্র অধিকার ঘর প্রস্তুত হইয়া গেল। যেদিন বন্দুটি প্রথম চালান হইবে সেদিন আমার লেবরেটরীতে আসিতে দেবী হইয়াছে, এদিকে যে ঘরে বন্দুটি বসান হইয়াছে সে ঘরে ফিশার যাইয়া হাজির হইয়াছেন। গেটে পৌঁছিতেই গেটের মহিলা কেরানীটি বলিল—“হের সরকার, শীঘ্র যাও, হের প্রফেসর তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।”

ক্ষিপ্ৰপদে ত্রিতলে আসিয়া দেখিলাম—সম্পূর্ণ প্রফেসর, তাহার বৈজ্ঞানিক সহকারী প্রভৃতি দাঁড়াইয়া। আসিতেই ফিশার বলিলেন—“হের, সরকার, তোমার ঘর পছন্দ হয়েছে ত—এই তোমার X-ray যন্ত্র—আমি এর নাম দিলাম “সরকার-আপার্যাট” (Apparatus)” এই বলিয়া একবার সুইচটা টিপিয়া দিলেন। বুদ্ধিলাম—এটা যন্ত্রটির শুভ কামনা করা হইল। ফিশারের এইরূপ প্রত্যেক কাজটি দেখিয়াই একটা বেশ সরল আড়ম্বরপূর্ণ।

ফিশারের ৬৫ বৎসর বয়স পূর্ণ হয়

১৯৩৯ সালে এবং আমরা ইনস্টিউটের সফলে মিলিয়া একটি উপহার দিবার ব্যবস্থা করি। ফিশার বলিলেন—“তোমরা তোমাদের নাম ও ঠিকানা সবাই মিলে লিখে আমাকে দিয়ো—আমি তাতেই সন্তুষ্ট হব।”

মে মাসের প্রথম দিকে ফিশার ইনস্টিউটের সব কয়টি বিদেশীয়কে এবং ইনস্টিউটের একটি নিযুক্ত কর্মী ও তাহার স্ত্রীকে নিজ বাড়ীতে রাখিতে আহ্বারের নিমন্ত্রণ করেন। বিদেশীয়দের মধ্যে আমি, একটি তুর্কী মহিলা, একজন নরওয়েবাসী ও একজন হাঙ্গেরিয়ান। ফিশার একাই ভোজপাতি মৃদু করিয়া রাখিয়াছিলেন—টেবিলে মিষ্ট লালা-মদের ব্যবস্থা ছিল—প্রফেসর পাস্কেবের তুর্কী ছাত্রীটিকে তাহার পাতে মদ দিবে কি না এই অনুমতি লইতে গিয়া বলিলেন—“আমি মনে করি আধুনিক তুর্কী মেয়েরা ঔষধ হিসাবে লালমদ খেয়ে থাকে।”

আমার ও প্রফেসরের মধ্যে নবনিযুক্ত সহকারীর স্ত্রী (বেচারীর স্বামী আজও রাশিয়ান বান্দশালায়)। সেজনা প্রফেসর মধ্যে মধ্যে ঝড়কিয়া আমার খোঁজ লইতেছিলেন। খানিক পরে বলিয়া উঠিলেন—“সরকার, এইবার তোমাকে চমকে দেব” এবং বলার সঙ্গে সঙ্গে এক প্লেট ভাত আসিয়া হাজির। ভাতের সঙ্গে ঐ দেশের একপ্রকার সাদা হুড়হুড়ে ডাউটি সিদ্ধ। পরে দেখিলাম সারা ভোজনপর্বেই আমি ও তুর্কী এই দুটি পাচোর অতিথির উপর প্রফেসরের বেশ ভাল নজরই ছিল। ভোজনপর্বের পর প্রফেসরের লাউজে বসিয়া পানপর্ব চলিল। প্রফেসরের ছাত্রজীবনের বহু গল্প শুনিতে শুনিতে রাত প্রায় ১টা বাজিয়া গেল। এদিকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ক্রমশই খারাপ হইতেছিল। একদিন পত্রিকায় দেখিলাম যে, জার্মান সরকার দেশবাসীর নিকট লৌহ

সাহায্য চাহিতেছেন এবং পরের দিন সকালেই দেখিলাম যে বাড়ির সংলগ্ন বাগানের লৌহ-বেড়া কাটা হইতেছে। কয়েকদিনের মধ্যে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ১০ ফুট উচ্চ লোহার বেড়া ভূমিসাং হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেগুর্লি মোটর লরীতে তুলিয়া লইয়া যাইতেছে। শূন্যল্যাম সমস্ত ম্যাগডিভুর্গে (Magdeburg) ক্রুপের কারখানা যাইতেছে।

ফিশারের বাড়িতে সেদিন লাউজে আমি প্রফেসরের পাস্কেব বসিয়াছিলাম। আন্তর্জাতিক অবস্থার কথা একবার উত্থাপন করিতে প্রফেসর বলিলেন—“হাঁ, অবস্থা খুবই খারাপ।” আমিও সেই সঙ্গে বলিলাম—“প্রফেসর, আমার কাজের ত এখনও খানিকটা বাকী তার মধ্যে যদি যুদ্ধ বেধে যায় তাহলে বড়ই বিপদে পড়তে হবে।” প্রফেসর বলিলেন—“হাঁ, তুমিই একমাত্র বহুদূরের লোক।” সেই রাতেই আমার চলিয়া আসার কথার একপ্রকার গোড়াপত্তন করিয়া ফেলিয়াছিলাম।

২৬শে মে আমার গবেষণার মূল বস্তু—১০০ জোড়া যমজের সব কাজ শেষ হইয়া গেল এবং বৈকালের দিকে ঠিক প্রফেসর আসিয়া হাজির। আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি, কতগুলো যমজ হ'ল।” আমি বলিলাম—“হের প্রফেসর, আমার ১০০ জোড়া পুরো হয়েছিল।” শুনেই আমার হাতখানি ধরিয়া সজোরে ক্রমদর্শন করিয়া বলিলেন—“দেখলে, কেমন দিনে আমি এসেছি—বেশ, আমার অভিনন্দন নাও।”

ইহার পর গবেষণার বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা এবং অবশেষে তাহা লিপিবদ্ধ করা। সেইদিনই প্রফেসর বলিলেন—“তুমি যদি আগেই চলে যাও এবং যদি সম্ভব হয় তাহলে তুমি তোমার কাজ ইংরাজী ভাষায় ছাপাতে পার। তুমি এইবার

এক মাসের জন্য

অর্দ্ধ মূল্যে কনসেন্সন



এ্যাসিড প্রভেড 22K<sup>1</sup> মেটো

রোল্ডগোল্ড গহনা

—গ্যারান্টি ২০ বৎসর—

চুড়ী-বড় ৮ গাছা ৩০ স্থলে ১৬, ছোট-২৫, ১০, নেকলেস অথবা মফচেইন-২৫ স্থলে ১০, নেকচেইন ১৮ একছড়া-১০ স্থলে ১০, ১টি-৮ স্থলে ৪ বোতাম এক সট-৪ স্থলে ২, কানপাশা, কানবালা ও ইয়াররিং ৫, জোড়া ৯ স্থলে ৬। জামলেট অথবা গনস্ত এক জোড়া ২৮ স্থলে ১৪। ডাক মাশলে ৫০, হার ৫০, অলংকার লইলে মাশলে লাগবে না।

নিউ ইণ্ডিয়ান রোল্ড এণ্ড কারেট গোল্ড কান্

১নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।

তথ্যগুলো সব সাজিয়ে ফেল আমি একবার শেষ আকারটা দেখতে চাই।”

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে বার্লিন ছাড়ার পালা পড়িয়া গেল। অনেকই সন্নিবর্তনস্থলী দেশে চলিয়া গেল।

বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের সময় তথা যে কি হইয়া দাঁড়াইবে তাহা বুঝিতে পারেন না। প্রকৃতির খামখেয়ালীর মধ্যে কোন প্রজন্ম সূত্র আছে কিনা তাহা তথ্যাদি শ্রেণীবদ্ধ না করিলে কিছুই বুঝা যায় না। এই তথ্য শ্রেণীবদ্ধ করা যে কি কঠিন তাহা বৈজ্ঞানিকমাত্রই জানেন। সারা জুন মাসটি এই কার্য লইয়াই ব্যস্ত ছিলাম। প্রথম উদ্দেশ্য ছিল যে, দুর্বোধ্য অংশের ব্যাখ্যার জন্য ফিশারের পরামর্শের প্রয়োজন এবং দ্বিতীয়তঃ যাহাতে যুদ্ধের পূর্বে স্বদেশে ফিরিতে পারি।

জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ইনস্টিউটে একটা ছোট ভোজের ব্যবস্থা হয়। সারা বার্লিনে একটা আতঙ্কের ছায়া। যে মহিলাটি আমাদের যমজের ব্যবস্থা করিত সে একদিন চুপ চুপ বলিল—“হের সরকার, তোমার যাবার পূর্বেই আমি চলে যাচ্ছি।” আমি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম—“কই, তুমি ত কিছু বলনি এর আগে।” আগের অপেক্ষা আরও নিম্ন গলায় বলিল—“রেড ক্রস থেকে নোটিশ এসেছে—যুদ্ধ অনিবার্য।”

উক্ত ভোজের দিন প্রফেসর আমার হাত ধরিয়া টানিয়া আমাকে নিজের পার্শ্ব বসাইলেন। আমি মাছ মাংস খাই না সেটা তার ঠিকই মনে আছে—তাই নিজের থালায় রুটিখানা আমার থালায় দিয়া এবং আমার থালায় সিম্পকরা মাংসটি নিজে লইয়া বলিলেন—“এস আমার অদল বদল করি।” প্রথম কথাই বলিলেন—“ফুহেরার (হিটলার) পোলায়ন্ডকে নোটিশ দিয়েছেন যে, তিন সপ্তাহের মধ্যে যদি করিডর না ছেড়ে দেয় তাহলে আমাদের সৈন্য পোলায়ন্ড আক্রমণ করবে।” এই কথাটি বোধ হয়, আমাকেই তাঁহার শুনানর উদ্দেশ্য ছিল। তবে কথাটি ইনস্টিউটের অন্য দু'একটি কর্মীর কানে থাইতেই তাহার সকলে আসিয়া প্রফেসরকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। প্রফেসর তৎক্ষণাৎ ফুহেরারের অন্য কথাবাতায় চলিয়া গেলেন।

পরের দিনই সকাল বেলায় আমি প্রফেসরের সহিত সাক্ষাৎ করি। গবেষণার দু'এক কথা বলিবার জন্য বলিলাম—“হের, প্রফেসর এইবার আঁতুড়ে দিন; তবে আমি আমার গবেষণার পক্ষীয় সমস্ত কাগজ-পত্র দেশে নিয়ে আসি।” তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আমি গিয়ে প্রবন্ধটা ছাপাবার ব্যবস্থা করব। ব বলে আশা করি।”

প্রফেসর বলিল—“আচ্ছা, আমাকে একটু ডাকতে।”

বলা বাহুল্য, ফিশারের এই সহায়তা পাইয়াছিলাম বলিয়াই দ্বিতীয় মহাসমরের অব্যবহিত পূর্বের শেষ জাহাজে স্বদেশে ফিরিতে পারিয়াছিলাম।

১৭ই জুলাই এই কয় মাসের নূতন বেণ্টনী ছাড়াইয়া ডারাক্রান্ত হৃদয়ে বার্লিন পরিত্যাগ করিলাম। হামবোল্ট বস্তুর নিয়মানুসারে জুলাই মাস জার্মানীতে কাটাইতে হইয়াছিল। ভিয়েনায় থাকিতেই শুনিলাম যে, পোলায়ন্ড আক্রমণ আসন্ন এবং প্রকৃতই দ্বিতীয়

মহাসমর বিশ্ব ঘোষিত হইবার বহু পূর্বেই পোলায়ন্ড জার্মানীর করতলগত হইয়াছিল।

ফিশারের সহিত প্রায় এক বৎসরকাল থাকিয়া যে শিক্ষালাভ করিয়াছি তাহা এ জীবনেও ভুলিব না। বিজ্ঞান ও শিক্ষা-কলায়, এই দু'য়েতেই নিখুঁত, এমন লোকের সংগলাভ আমার হয় নাই।

বিজ্ঞান ও শিক্ষাকলা বোধ হয় জ্ঞানের বিভিন্ন দিক নয়, মনে হয়, দুইটিই কোন এক সূচ্যরূপে আবদ্ধ।

## কাশি ও সর্দির সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ঔষধ



পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহৃত হয়

## সুসংবাদ !

আপনি একা এখন ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট কিনতে পারেন এবং অন্য কারো সঙ্গে যুক্তভাবে কিনতে পারেন ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যের।

যে পর্যন্ত কেনা যায়

ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট

কিনুন

এবং এভাবে টাকা খাটিয়ে শতকরা ৫০ টাকা লাভ করুন।

ন্যাশনাল সেভিংস ডাইরেক্টরেট

১, চার্নক প্লেস, কলিকাতা কর্তৃক প্রচারিত

# জেরা চট কর (দেখো)

## শ্রীগজেন্দ্র কুমার মিত্র .

সুপ্রতি শহরে যেসব কান্ড চলিয়াছে, তাহাতে আর কাহারও নিশ্চিন্ত থাকিবার উপায় নাই। এ যেন মূড়ি-মিছারির এক দর হইয়া গেল। সেকালে প্রবাদ ছিল যে, দুষ্ট গাইয়ের দলে থাকিলে কপিলা গাইও বাঁধা পড়ে, কথাতার তাৎপর্য ইদানীং হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি। তবে তফাতের মধ্যে একটি দুষ্ট গাইয়ের জন্য হাজার হাজার কপিলা গাইও বাঁধা পড়িতেছে—আর, দলে থাকিবারও প্রয়োজন হয় না। কোথায় কে একটা বোমা ফাটাইয়া গেল, কিম্বা কোথায় কে কাহার পেট ফাঁসাইল, বাস—দেখিতে দেখিতে ঘটনাস্থলের আশেপাশে যেসব বেচারীরা বাস করে, তাহাদের লইয়া হাজত প্রেরণ! রক্ষাকর্তরা এসব ঘটনা বন্ধ করিতেও পারেন না, প্রতিকার করিতেও পারেন না, শুধু যেসব বেচারী লোকেরা শৃঙ্খলিত দূর্ভাগ্যবশতই আশেপাশে বাস করে, তাহাদের ধরিয়া লইয়া যাইতে পারেন। যেন—যেসব গৃহস্থ ঘর-সংসারের কাজ লইয়া নাস্ত, কিম্বা যেসব দোকানদারেরা দোকানের ভিতর খরিদ্দার লইয়া বিব্রত, তাহাদের পক্ষে রাস্তায় নজর রাখা কিম্বা কোথায় কি ঘটিতেছে, তাহার পাহারা দেওয়া সম্ভব! তাছাড়া—যাহার কিছুমাত্র সাধারণ বুদ্ধি আছে, সে কখনও নিজের বাড়ির কাছে অপকর্ম করে না, কারণ জানে যে, ঘটনার কাছে বাহারা থাকে, তাহাদেরই প্রতিঘাতটা আসিয়া লাগে বেশী।

কিন্তু এসব কথা বলা অরণ্যে রোদন। শোনেই বা কে, ভাবেই বা কে। দিনের পর দিন এই-ই চলিয়াছে। এখন দেখি আহত হওয়া আর সুস্থ থাকায় তফাৎ এই যে, যাহারা ছুরি খায়, তাহারা শুধু প্রাণে মরে, আর যাহারা বাঁচিয়া যায়, তাহাদের ধন-প্রাণ দুই-ই যাইবার দাখিল হয়। শুনিয়াছি, কোন কোন শাস্ত্রগ্রন্থে নাকি একথা লেখা আছে যে, পাণ্ডা বাহারা করে নাই, তাহারা যেন নির্ভয়ে থাকে, তাহাদের অনিষ্ট কিছুতেই হইবে না। পাইতাম সে শাস্ত্রকারকে হাতের কাছে ত ধরিয়া আনিয়া এই শহরে দিনকতক রাখিয়া দিতাম—দেখিতাম, শুধু মাত্র নির্মল বিবেকের জোরে কেমন করিয়া তিনি অব্যাহতি পান।

এই ত মহাশয় সৈদিন, ভালও জানি

না, মন্দও না, তবে সকালে বাজার-হাট সারিয়া বাহিরের অফিস ঘরে আসিয়া বসিয়াছি। ইঠাং পাড়ায় কোথায় দূম করিয়া শব্দ হইল। আগে হইলে এসব ছোট-খাট ব্যাপার গ্রাহ্যই করিতাম না, কিন্তু এখন মূখ্য শূকরীয়া গেল। বৃদ্ধিমান বাস্তিরা ঠেকিয়া শেখে না—দেখিয়াই শেখে। কিন্তু এক্ষেত্রে শিখিয়াই বা লাভ কি, ঘর-বাড়ি ছাড়িয়া যাইব কোথায়, আর গেলেও ত বেশি করিয়া সন্দেহের কারণ হইবে। দূর্ভাগ্যবান হইল বেচারী মন্সেল-দের জন্য, তাহারা যদি কেহ আসিয়া পড়ে ত তাহারাও পার পাইবে না। তাছাড়া, আমার বাড়ি আবার ছোকরাদের আড্ডা, দুটি ভাইপো আছে, একটি জগর ছেলে আছে—আবার গ্রামের দুটি-তিনটি শিক্ষার্থী আছে। আমার মহত্বী এবং সেক্রেটারী, সে দুটিও যুবক। একবার ভাবিলাম তাহাদের দূরে কোথাও সরাইয়া দিই কয়েক দিনের মত, আবার মনে হইল যে, তাহাতে হয়ত হিতে বিপরীত হইবে। পাড়ার কোন হিতাকাঙ্ক্ষী সংবাদটি দিয়া দিবে, তখন এই দূরে সরাইয়া দেওয়াটাই অপরাধের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হইয়া উঠিবে।

কিন্তু না-টা বাজিতে না বাজিতেই নিজের নিবৃদ্ধিতার জন্য অনুতাপ করিবার প্রয়োজন হইল। পুলিশ আসিল পাড়ায় খানাতল্লাসী করিতে। সামনের বাড়ির বন্ধ মাস্টার মহাশয় তাহার শালা এবং ভাইপো, দুটি তরুণ যুবককেই ঘটনার শব্দ পাইবামাত্র স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, তাহার গায়ে আঁড়ও লাগিল না। পাশের বাড়িতে যে একটি তরুণ ছিল, সে তাহার অসময়-লক্ষ পকেটের জন্য অনায়াসে অব্যাহতি পাইল শুধু আমরায় 'সপুত্রী এক-গাডায়' গেলাম। এতগুলি তরুণ যুবক এক বাড়িতে দেখিয়া কতর দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, ফলে যদিচ আমাকে আর কোনক্রমেই তারুণ্য, এমনকি প্রৌঢ়ের প্রথম পর্যায়ও ফেলা যায় না, তবু আমাকে শূন্য গিয়া পুর্লিশ ভায়েন উঠিতে হইল।

তারপর সেই মাথাখোলা লরীতে ঠিক দুপুরের (জ্যৈষ্ঠ মাস) সিন্দুধ ঝোড়ে একটা পর্যন্ত ভাজা ভাজা হইলাম। সে পাড়ার আরও কতকগুলি আসিয়া জটিল—সেখান হইতে অন্য পাড়া ছুরিয়া (সেখানে নাকি কে বা

কাহারা কাহাকে গুলী করিয়া গেছে।) গাড়ি বোঝাই করিয়া লইয়া গিয়া ফেলা হইল লালা-বাজারে, সেখান হইতে সম্ভার কিছু পুত্র শহরতলীর এক জেল খানায়। এতকণ পর্বন্ত আমরা যে জীবধর্মী মানুষ, আমাদের বে অগত প্রাণ, সে কথাটা কাহারও মনে পড়ে নাই। ওখানে পেঁপীছিয়া কী ভাগ্য সে কথাটা বড়কর্তারই খেয়াল হইল, সম্ভার সম্বর আমাদের জন্য খাদ্য আসিয়া পেঁপীছিল। জাত, ডাল, তরকারী শুনিতে ভালই, খরচের হিসাবেও হয়ত তাহা প্রথম শ্রেণীর, কিন্তু ঠিক যে বস্তুটি আসিয়া পেঁপীছিল, সেটি আমার সঙ্গী ছেলেরা কোনমতে চোখের জল মূছিতে মূছিতে গলাধঃকরণ করিলেও আমার গ্রহণ করিতে সাহস হইল না। কারণ আমি গ্যান্টিক আলসারের রোগী, আমাকে বার বার অল্প পরিমাণে খাইতে হয় এবং লঙ্কাবর্জিত খাদ্য ছাড়া আমার খাইবার উপায় নাই। এতকণ উপবাসে আমার যন্ত্রণা কম হইতেছিল না, তবু আহায্যের চেহারা দেখিয়া খাইতে সাহস হইল না কিছুতেই।

কর্তাদের কথাটা সর্বিনয়ে নিবেদন করিবার চেষ্টা যে করি নাই তা নয়, কিন্তু কোন ফল-লাভ হয় নাই। একজন এমন রুদ্র দৃষ্টিতে তাকাইলেন যে, বৃকের রক্ত জল হইয়া গেল, সে চাহনির দিকে তাকাইয়া আর একজন মুচকি হাসিলেন, সে হাসির অর্থ হইল এই যে, ওসব কথা তাহারা ঢের শুনিয়াছেন, এত সহজে ভুলিলে আর পুর্লিশে এতদিন চাকরি করিতে হইত না। আর একজন স্নেহ কণপাউই করিলেন না। ফলে, সমস্ত রাত খালি পেটে বায়ব যন্ত্রণায় ছটফট করিলাম। এমনকি, একটু পরিষ্কার জলও তখন আর পাইবার উপায় রহিল না।

পরের দিনও সেই এক ব্যাপারই চলিল। 'আহার' যা আসিল, তা আমার পক্ষে বিব। নিজ হাতে আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই তাহা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। ছেলেরাও এত কদম জীবনে খায় নাই। সভ্য-সভাই খাওয়ার সময় তাহাদের চোখে বার বার জল আসিতোছিল। আমি শুধু এক প্লাস জল খাইলাম। পেটে যন্ত্রণা হইতেছে, কিন্তু উপায় কি? পরে সংসার পাইয়াছিলাম যে, আত্মীয়রা সেইদিনই জামিনের জন্য অনেক চেষ্টা করি, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল।

আজ, তাহাও জন্য হারানো নাই বলিয়া বাড়ি ছেড়ে খাবার পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে পারে। এখানে তিন দিন কা... এত কখনও কল্পনা করি নাই? এয়াও... যাইবে না। রোগীর পথ্য...

আমাদের চিত্রশিল্পের য়ে কতদিক পংগু হয়ে আছে তার হিসাব দেবার চেষ্টা করা ব্যথা। তবে কয়েকটা মোটা মোটা অভাব অতি সহজেই চোখে পড়ে—যেমন ধরুন ভাল শিক্ষামূলক চিত্র, ভাল ভাল সংবাদ-চিত্র, ডকুমেন্টারী ছবি প্রভৃতি। এর কোনদিকেই আমাদের চিত্রশিল্পপ্ৰতিদেবের দৃষ্টি নেই। তারা পুণ্যায়তন আমোদ-চিত্র নির্মাণের ব্যাধি সড়কে হাঁটতেই অভ্যস্ত। কিন্তু আজ তাঁদের এই অভ্যাসের মোহমুগ্ধ হবার দিন এসেছে। ব্যবসায়ের দিকে তাঁরা নিশ্চয়ই তাকাবেন—সেই সঙ্গে স্বদেশী চিত্রশিল্পের ও দেশের অগণিত জনসাধারণের উন্নতির দিকেও তাঁদের দৃষ্টি দিতে হবে। সুদূরপরিচলিতভাবে এই উভয় দিকের প্রয়োজন মিটিয়ে ভাল চিত্র নির্মাণ আদৌ কষ্টসাধ্য নয়। এতে দেশবাসীদের উপকারও হবে এবং আমাদের চিত্র-নির্মাতাদেরও ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হবে। সম্ভা পাঁচের তথাকথিত দেশপ্রেমমূলক চিত্র না তুলে, তাঁরা চিত্রশিল্পের এই সব সংগঠনমূলক দিকের প্রতি নজর দেবেন কি?

### মুক্তিকামী চিত্র

বেংগল ফিল্মসের প্রথম চিত্র “রামপ্রসাদ” আগামী ২৫শে জুলাই একযোগে শ্রী. পূর্ববী ও উজ্জ্বলা চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে। সাধক রামপ্রসাদের গল্প বাঙালী নরনারীদের কাছে সুপরিচিত। এই চিত্রের কাহিনী ও সংলাপ রচনা করেছেন যথাক্রমে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও দেবনারায়ণ গুপ্ত। পরিচালনা করেছেন

দেবনারায়ণ গুপ্ত ও বিনয় সেন। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সাবিত্রী, নিভাননী, সুজিত চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ইন্দু, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি চিত্রাভিনেতা ও চিত্রাভিনেত্রীরা। নবাগত অভিনেতা সুজিত চক্রবর্তী রামপ্রসাদের ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেছেন বলে প্রকাশ।

\* \* \* \* \*

শ্রীঅখিল নিয়োগী রচিত ও পরিচালিত ক্যালকাটা টকিজের প্রথম চিত্র “মুক্তির বন্ধন” অবিলম্বে পর্দার বৃকে বন্ধন মুক্তির আশায় প্রতীক্ষমান। বাংলার গ্রাম জীবনকে কেন্দ্র করে এই চিত্রের আখ্যানভাগ গড়ে উঠেছে বলে প্রকাশ। এই চিত্রে অনেক নবাগত অভিনেতা অভিনেত্রীকে আমরা দেখতে পাব। যারা এই চিত্রে অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন গীতশ্রী, উমা, নীলু রায়, মিসেস তারা ভাদুড়ী, যমুনা প্রভৃতি।

\* \* \* \* \*

এ. কে. ডি প্রোডাক্সন্স-এর প্রথম চিত্র “দুই বন্ধু”ও অনতিবিলম্বে কলিকাতায় মুক্তিকামী। এই চিত্রখানির কাহিনী রচনা করেছেন অজিত দত্ত ও পরিচালনা করেছেন অমর দত্ত। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন দেবী মুখার্জি, প্রভা, গীতশ্রী, কানু, তুলসী, নবম্বীপ, আশু বোস প্রভৃতি।

### স্টুডিও সংবাদ

শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনাধীনে ইন্ড-পূর্বী স্টুডিওর ‘মায়াকানন’ ও ‘উর্মিলা

চিত্রপটের “অগ্রগামী”র কাজ সমাপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে। ইতাবসরে শ্রীযুক্ত বড়ুয়া বিমানযোগে বিলাত চলে যাওয়ায় ছবি দুটির কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে আছে। এই চিত্র দুটিতে যারা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন: পরিচালক বড়ুয়া নিজের, প্রভাত সিংহ, মণি ঘোষ, নীরেন ভট্টাচার্য, রাধারাণী, অঞ্জলি রায় ও রাজলক্ষ্মী।

\* \* \* \* \*

গত সপ্তাহে আমরা পরিচালক বড়ুয়ার বিলাত যাবার কথা আংশিকভাবে আলোচনা করেছি। ভারতীয় বিষয় নিয়ে রচিত ডকুমেন্টারী চিত্র ইংল্যান্ড ও ইউরোপের অনান্য চালানো যেতে পারে কিনা—তাই দেখার জন্যেই তিনি ইংল্যান্ডে গেছেন। আশা করা যায় যে এই মাসের শেষ দিকেই তিনি ফিরে আসবেন এবং আগামী আগস্ট মাসের মধ্যেই এই অসমাপ্ত চিত্রদুটি নির্মাণের কাজ শেষ করবেন।

\* \* \* \* \*

এ. কে. ডি প্রোডাক্সন্সের প্রথম চিত্র “দুই বন্ধু” অবিলম্বে কলিকাতার চিত্রগৃহে মুক্তি-প্রতীক্ষায় আছে একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এরা প্রথম ছবির কাজ শেষ করেই দ্বিতীয় ছবির কাজে হাত দিয়েছেন। তাঁদের দ্বিতীয় চিত্রখানির প্রযোজনা ও পরিচালনা করবেন অমর দত্ত। গত রথযাত্রার দিন কালী ফিল্মস্ স্টুডিওতে এঁদের দ্বিতীয় চিত্রের শূন্য মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে।

### প্রবন্ধ ও কবিতা প্রতিযোগিতা

যশোহর সাহিত্য সংঘের পক্ষ হইতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-প্রতিযোগিতা আহ্বান করিতেছি। ২২শে শ্রাবণ মধ্যে প্রতিযোগিতার ফল প্রকাশিত হইবে। প্রবন্ধ ও কবিতা প্রেরণের শেষ তারিখ—১৫ই শ্রাবণ। প্রত্যেক সাহিত্যিক প্রতিযোগিতায় যোগদান

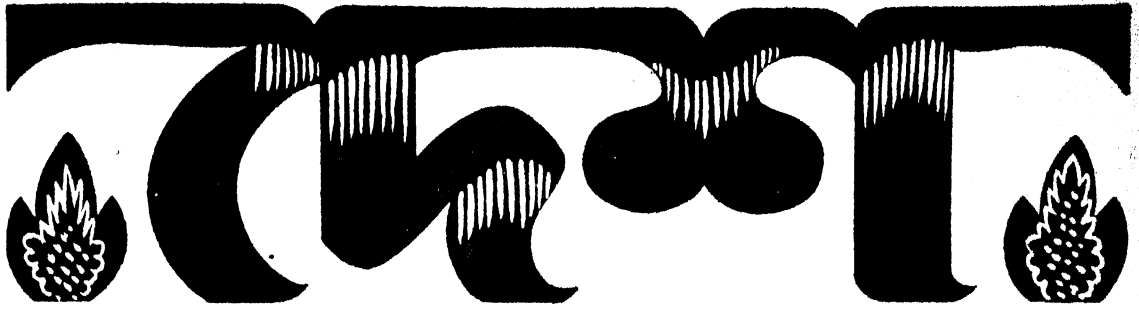
করিতে পারিবেন। প্রবন্ধ ৩ পৃষ্ঠা, কবিতা ২ পৃষ্ঠার মধ্যে রচনা করিবেন। উত্তীর্ণ সাহিত্যিকগণকে সাহিত্যিক উপাধিতে ভূষিত করা হইবে।

প্রবন্ধের বিষয়—রবীন্দ্রনাথের “দুই বিঘা জমি” কবিতার মর্মবাণী।

কবিতার বিষয়—“বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।”

নিম্নের ঠিকানায় কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠাইবেন। শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার, সম্পাদক, যশোহর সাহিত্য সংঘ, যশোহর।





সম্পাদক : শ্রীবাঞ্ছনচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ।

শনিবার, ১৬ই শ্রাবণ,

১৩৫৪ সাল।

Saturday, 2nd August, 1947.

[ ৩৯শ সংখ্যা ]

১৫ই আগস্ট

১৫ই আগস্ট আগতপ্রায়। ভারতের ইতিহাসে এই দিবস স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কারণ, এই দিনে ভারতের দীর্ঘ পুরাধীনতার অবসান হইবে এবং বিদেশীর প্রভু হইতে স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য ভারতের স্বদেশ-প্রেমিক বীর সন্তানগণ যে সূদীর্ঘ সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছিলেন এই দিবস তাহা সার্থকতা লাভ করিবে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে আমরা এসতা বিস্মত হইতে পারি না যে, আমরা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা চাহিয়াছিলাম, আজও তাহা লাভ করিতে পারি নাই। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের কট্টর প্রভাবে ভারতের জাতীয়তার আদর্শ সংহতি-শক্তি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং ভারতভূমি সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বিভক্ত হইয়াছে। জাতির রাষ্ট্রনীতিক অগ্রগতির পথে এ অন্তরায় সামান্য নয়। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও ১৫ই আগস্টকে আমরা অন্তরের সঙ্গে অভিনন্দিত করিব। বিদেশীর কর্তৃত্ব পাশ হইতে আমরা যে মুক্ত হইয়াছি বর্তমান সমস্যার শত জটিলতা সত্ত্বেও এই সত্য আমাদের অন্তর উদ্গত করিবে। কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটি ১৫ই আগস্টকে জাতীয় উৎসবীতি স্বরূপে ঘোষণা করিয়াছেন এবং এই দিবস প্রতিপালন সম্পর্কে দেশবাসীর কর্তব্য নির্দেশ করিয়াছেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং অভিবাদন এই দিবসের প্রধান কর্তব্য বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে। এই সংগে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের কংগ্রেস-কর্মীদের পতাকা উত্তোলন হইতে বিরত থাকিবার জন্য কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য যাহারা মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে ভীত হন নাই এবং অপরিস্রব দুঃখ কষ্ট অঙ্গান বদনে বরণ করিয়া লইয়াছেন,

## সাময়িক প্রদর্শন

রাষ্ট্রপতির এই নির্দেশ মানিয়া চলিতে তাহাদের বাক্য কি বেদনা বাজিবে আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু জাতীয় পতাকার অন্তর্নিহিত আদর্শকে গভীরতরভাবে উপলব্ধি করিয়া আমাদেরকে সে আদেশ পালন করিয়া চলিতে হইবে এবং অঞ্চল ভারতের জাতীয়তার অনুমানকে অন্তরে লইয়া আমাদের কর্মপন্থা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। পাকিস্থানের কংগ্রেসকর্মীদের কর্তব্য আরও সত্যি কঠোর: সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আশ্রয়ের ভিতর তাহাদিগকে আমাদের জন্য সাধনা করিতে হইবে এবং ভেদ বিভেদের প্রতিবেশের মধ্যে সংহতির আদর্শকে প্রোজেক্ট করিয়া তুলিতে হইবে। এ সম্পর্কে কোনরূপ অস্বাদ যেন তাহাদের অন্তরকে অভিভূত না করে। বস্তুতঃ স্বাধীনতার যাহারা সাধক তাহাদের অভিধানে নৈরাশ্যের কোন স্থান নাই। শত অন্তরায়ের মধ্যে তাহাদিগকে আগাইয়া চলিতে হইবে। এক্ষেত্রে দুঃখবাদকে আমরা প্রশ্রয় দিতে চাহি না। বিদেশীর প্রভুরকে আমরা প্রাণ বলে অপসারিত করিয়াছি এবং ঐক্যবন্ধ ভারতের সংহতি বলেই উভা সম্ভব হইয়াছে। এ সত্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের প্রশ্রয়প্রাপ্ত তেমন সাম্প্রদায়িকতার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জাতীয়তার দিক হইতে কংগ্রেসের আদর্শ জাতীয়তাই পরিশেষে জয়যুক্ত হইয়াছে। আজ বিদেশীরা চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রজীবনে সাম্প্রদায়িকতার বিষ তাহারা ছড়াইয়া রাখিয়া যাইতেছে। বিদেশীর

পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও যদি কংগ্রেসের আদর্শ জয়যুক্ত হইয়া থাকে, তবে বিদেশীর প্রভাববিনিমুক্ত ভারতে সাম্প্রদায়িকতার আপাতঃ এই অন্তরায়ও কংগ্রেস সম্প্রদায়িকতার মধ্যেই অতিক্রম করিবে এবং কংগ্রেসের কর্মসাধনায় অঞ্চল ভারতের জাতীয়তার বহুস্তর আদর্শ এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইবে, আমরা এই আশা একান্তভাবেই অন্তরে পোষণ করিতেছি। প্রকৃতপক্ষে এই দিক হইতে ১৫ই আগস্ট আমরা পাকিস্থানেই থাকি, কিংবা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রেই থাকি আমাদের সকলের কাছেই উৎসবের বাণী বহন করিয়া আনিতেছে। আজ আমরা জাতীয় পতাকাকে শ্রদ্ধা ও প্রতীক স্বরূপে গ্রহণ করিব না। সে পতাকার অন্তর্নিহিত আদর্শের অনুপ্রেরণাকে আমরা চিন্তা অনুশ্রবণের ভিতর দিয়া অন্তরে একান্ত করিয়া লইব। বর্তমানে অন্তর ও বাহির এই দুই দিক হইতে আমাদের পতাকা উপাসনা চলিবে এবং একান্ত নিষ্ঠিত সাধকের গভীর সাধনার বলে অন্তর ও বাহির এই দুই দিকের সাধনা যেমন একাত্মতা লাভ করিয়া অভীষ্টের পরিপূর্ণ রূপকে উদ্ভব করিয়া তোলে, আমাদের সাধনাও আচিরেই তদ্রূপ একাত্মতার পরিপূর্ণ লাভে সমগ্র ভারতে উদ্ভব হইয়া উঠিবে।

### রাজনীতিক বন্দীদের মৃত্তি

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই সব সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে যাহারা সংগ্রাম করিয়া ছিলেন, তাহারা অনেক স্থানেও কারাগারস্থিত হইয়াছেন। অন্তরালে আবদ্ধ রাখিয়া পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার কার্যভার গ্রহণ করিবার ইচ্ছাদের মধ্যে কয়েকজন মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

সত্য; কিন্তু এখনও এই বাঙলা দেশেই যেসব রাজনীতিক কর্মী দেশসেবার অপরাধে কারাগারে অবরুদ্ধ রহিয়াছেন তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। গত ২৭শে জুলাই রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করিয়া কলিকাতায় একটি জনসভার অনুষ্ঠান হয়। এই সভায় সভাপতিস্বরূপে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় বলেন, যতদিন বাঙলা দেশের একজন স্বদেশপ্রেমিক স্বতানও কারাগারে অবরুদ্ধ থাকিবেন সে পর্যন্ত আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক সাধনা সম্পর্কিত কোন উৎসবই সত্য হইতে পারে না। আমরাও সমগ্র অন্তর দিয়া তাহার এই উক্তিকে সমর্থন করি। বস্তুতঃ ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিল, অথচ বাহাদের একমাত্র অপরাধ হইল, ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালানো তাহারা হইলেন কারাগারে, ইহা নিতান্ত উৎকট এবং অসহায় অবস্থা। আমরা আশা করি শ্রদ্ধা পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলই নহেন, পূর্ব পাকিস্থানের মন্ত্রিমণ্ডলও দেশের স্বাধীনতার বহুতর পরিপ্রেক্ষিতে এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন। ১৫ই আগস্টের পূর্বেই বাঙলা দেশে রাজনীতিক বন্দীরা সকলেই মুক্তিলাভ করেন, এবং যাহাদের নামে এখনও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহত হয়। আমরা ইহাই দেখিতে চাই। লীগ এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টি পরিভাগ করিয়া স্বাধীনতার আদর্শকে বড় করিয়া দেখিবে এবং বলিষ্ঠতার সঙ্গে সেই আদর্শকে জনগণের সম্মুখে উপস্থিত করিবে, আমরা এই আশা করি। দেশের স্বাধীনতা শ্রদ্ধা হিন্দুর কামা নয়, কিংবা শ্রদ্ধা মুসলমানেরই কামা নয়; হিন্দু এবং মুসলমান প্রত্যেকেরই তাহা কামা। আমাদের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথে এই সত্যটি সুস্পষ্ট করিয়া তোলা সর্বপ্রথমে প্রয়োজন এবং পারস্পরিক মৈত্রীর ইহা প্রধান ভিত্তি হওয়া উচিত।

### পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ

সবরমতী আবার বহুদূরে, নোয়াখালিই নিকটে—সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী তাহার একজন সহকর্মীর চিঠির জবাবে এই কথা লিখিয়াছেন। গান্ধীজীর এই উক্তি হইতে উত্তর এবং পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য তাহার অন্তরের অসীম উদ্বেগের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ১৫ই আগস্টের পর বাঙলার এই অঞ্চলের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, সেজন্য দুই চার সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদায় অত্যন্ত উদ্বেগিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, পূর্ববঙ্গের পূর্বাঞ্চল করিতে আরম্ভ হইবে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, পূর্ববঙ্গের পূর্বাঞ্চল করিতে আরম্ভ হইবে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, পূর্ববঙ্গের পূর্বাঞ্চল করিতে আরম্ভ হইবে।

সম্প্রদায়ের এই আতঙ্কে একান্ত অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিতেছেন। বলা বাহুল্য, নিজেদের নিরাপত্তা এবং অনেকক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টি সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে ইহাদিককে বিবেচনা করিতে অবসর দিতেছে না। গান্ধীজীর উদার দৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নাই। তিনি নিজের জীবন দিয়া এই সত্যকে প্রমাণিত করিয়াছেন এবং অকারণ আতঙ্ক সৃষ্টি করিবার মত ব্যক্তিও তিনি নহেন। উত্তর এবং পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের পক্ষে আতঙ্কের কারণ যে সত্যই দেখা দিয়াছে, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, মানোরঞ্জন গুপ্ত, প্রভাসচন্দ্র সাহুড়ী এবং সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত উত্তরবঙ্গ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে এ সত্য সনিশ্চিত হইয়াছে। তাহারা বলিয়াছেন, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ন্যূনতম প্রকার ভীতি প্রদর্শন করিতেছে। নারীদের সম্বন্ধে কৃৎসিত ইঙ্গিত করিতেও ইচ্ছা ইতস্তত করিতেছে না। অবশ্য যাহারা ঐ ধরনের গুডামি করে, তাহারা দায়িত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তি নহে; কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার মনোবৃত্তি সহজেই মানুষকে দায়িত্ববাহীন করিয়া তোলে। এক্ষেত্রে ভুলিল চলিবে না যে, লীগের নীতি সাম্প্রদায়িকতাকে নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে মূঢ়াভাবে গ্রহণ করিয়া মুসলমানের সমাজ-জীবনে উৎকট দায়িত্ব-হীনতাকে প্রসার দিয়াছে। এখন এই উদ্দাম প্রযুক্তিকে সংযত করা তাহাদের পক্ষেও সহজ নয়। মুসলিম লীগের অধিনায়কস্বরূপ মিমঃ জিয়া বহাদুর হইল সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য মুসলমান সম্প্রদায়কে অব্যাহত হইতে বলিয়াছেন। অতঃপর লীগের কতিপয় নেতাও পাকিস্থানে হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক শান্তি এবং মৈত্রী কামনা করিয়াছেন; কিন্তু দেখা যাইতেছে, লীগের উৎকট অনুরাগীর দল ইহাদের উপদেশ বা নির্দেশও আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করিতেছে না; পরন্তু তাহাদের যুক্তি অনারুপই কৃষ্ণা লইতেছে। ফলে অবস্থা বাস্তবিকই সংকটজনক হইয়া উঠিয়াছে। ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ কংগ্রেস কর্মী সম্মেলন উত্তর এবং পূর্ববঙ্গের অবস্থার এইরূপ গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করিয়াছেন। লীগনেতারা সে অনুরোধে সাড়া দিবেন কিনা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে এই সব দোষাখ্যা দমন করিতে মফস্বল অঞ্চলে তাহাদের কর্মগতী সম্প্রসারিত করিতে অগ্রসর হইবেন কি না, আমরা জানি না। এখনও যদি তাহারা সে প্রয়োজন উপলব্ধি

না করেন, তবে বাঙলাদেশ শ্মশানে পরিণত হইবে এবং সে আগুনে শ্রদ্ধা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ই নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়েরও সর্বনাশ সাধিত হইবে।

### কলিকাতায় উপদ্রব

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডল পশ্চিমবঙ্গে শাসন সম্পর্কিত ব্যাপারে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছেন, কিছুদিন হইল পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী উক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ইহা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন। আমাদের পক্ষে ইহা আশার কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উক্ত ঘোষ এবং তাহাদের সহকর্মীদের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও কলিকাতা শহরে অদ্যাপি শ্রান্তিবিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ঘটনার সংখ্যা হিসাবে উপদ্রব হ্রাস পাইলেও উপদ্রব-কারীদের উগ্রতা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। বোমা, গুলী ও ছুরি সমানে চলিতেছে এবং নির্দোষ পথচারীরা অসহায় অবস্থায় হতাহত হইতেছে। এই সব বোমা ও গুলীর অস্বাভাবিকতা, সে খোজ এখনও হইতেছে না। কিন্তু এসব খড়্গজিহা বাহির করা একান্তই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ১৬ই আগস্টের প্রত্যেক সংগ্রাম সম্পর্কে শহরের কতকগুলি কুখ্যাত অঞ্চলে এখনও সম্প্রদায়-বিশেষের পক্ষে দুর্য্যোগময় রহিয়াছে এবং এইসব অঞ্চলে গুডামিও এখনও পূরাপূরি রাজত্ব। এই অঞ্চলের আপেক্ষিক ভ্রমভ্রমে প্রবেশ করিলে বিশেষ সম্প্রদায়ের পক্ষে প্রাণ লইয়া ফিরিবার সম্ভাবনা খুবই কম। পাকিস্থান রাজত্ব ঐ সব অঞ্চলে কয়েক রাখিতেই হইবে, একদল গুডামি যে এইরূপ গোঁ ধরিয়া কাজ করিতেছে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য, সমগ্র কলিকাতা শহর, অতঃপর পক্ষে তাহার বতকটা অঞ্চল পাকিস্থানের মধ্যে লইতে হইবে, এইসব গুডামি এইরূপ মনোভাব লইয়া কাজ করিতেছে। এই সম্পর্কে একথা অস্বীকার করা যায় না যে, লীগ-নেতারা ইহাদের মনোবৃত্তিকে প্রসার দিতেছেন। সীমানা কমিশন কি সিদ্ধান্ত করিবেন, ইহারা সে ভরসায় থাকিতে পারিতেছেন না। সম্প্রতি শহরের ইসলামিয়া কলেজে মুসলিম লীগের উদ্যোগে একটি সভার অধিবেশন হয়। মৌলবী ফজলুল হক এই সভার সভাপতিত্ব করিয়া ছিলেন। সভাপতিস্বরূপে তিনি নাকি এই কথা বলিয়াছিলেন যে, যে পর্যন্ত একজন মুসলমানও জীবিত থাকিবে, মুসলমানেরা কলিকাতা ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে দিবে না। হক সাহেব পরে এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি পরে প্রতিবাদ করিলেও লীগওয়ালাদের কাজ নিষ্পন্ন হইয়াছে, 'লড়কে লেগের' মনোবৃত্তি উন্মোচন

পাহায়েছে। লাগওয়ালাদের প্রচারকাষের পাকেচক্রে শহরের শান্তি এইভাবে বিপর্যস্ত হইয়া চলিয়াছে। আমরা আশা করি, ডক্টর ঘোষ এই পাকিস্থানী কট্টকরের গণ্ডি হইতে কলিকতা শহরকে মুক্ত করিবেন এবং শহরের বিশেষ বিশেষ অঞ্চল-গুলি যাহারা এইভাবে অন্য সম্প্রদায়ের পক্ষে অনধিগম্য করিয়া রাখিয়া শহরের বাতাসকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে, তাহাদিগকে কঠোর হস্তে দমন করিবেন। বস্তুতঃ সুরাবাদী মন্দিরগুলির কৃপায় ইহাদের রাজত্বভোগ কম দিন চলে নাই। এখন গুন্ডাদের এই জবরদস্তির রাজত্ব যেমন করিয়াই হউক ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে এবং যাহারা পুলিশ বিভাগে থাকিয়া এইসব গুন্ডা-রাজ গঠনে প্রস্রয় দিয়াছে, তাহাদিগকে দৃঢ়হস্তে অপসারিত করিতে হইবে; নতুবা কলিকাতা ভূ-নাগরিকদের বাসের পক্ষে অযোগ্য হইয়াই থাকিবে।

#### ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম

ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। স্বদেশপ্রেমিক সন্তানদের রক্তস্রোতে যবন্বীপ এবং সূচমাত্রার মাটি নিরন্তর সিঁজি হইতেছে। ওলন্দাজ বিমান বহর এবং নৌবহর নরঘাতী সমরোপকরণের সাহায্যে ক্রমাগত নিধনলীলা চালাইতেছে। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতৃগণও নিরুদ্যম নহেন। তাহারা তাহাদের স্বল্প অস্ত্রশস্ত্র লইয়াও অদম্য উৎসাহে শত্রুপক্ষকে বাধা দিতেছেন। ইহাদের প্রাণপাতী প্রচেষ্টার কাছে প্রতিপক্ষের প্রভূত বল-বিস্ত্রমও পর্যদস্ত হইতেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা সহজে নিরস্ত হইবার নয়। তাহাদের রক্তের পিপাসা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী ডক্টর শারীর তাহাদের অনুকূলে সভা জগতের খননাত জাগ্রত করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছেন। তিনি বিশেষভাবে ভারতবর্ষের সাহায্যভ্যস্ত করিবেন বলিয়া আশা করেন। ডক্টর শারীর ভারতে আসিয়া প্রথমেই পশ্চিম জওহরলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পশ্চিমজী তাঁহাকে এই আশ্বাস দান করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ সম্ভবপর সকলরকমভাবে ইন্দোনেশিয়া সাধারণতন্ত্রকে সাহায্য করিবে। তিনি দৃষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, এশিয়ার উপর পাশ্চাত্য জাতির সাম্রাজ্যবাদ-মূলক অত্যাচার আর চলিবে না। এশিয়ার এক-পঞ্চমাংশের অধিবাসী এজন্য কৃতসংকল্প হইয়াছে। এ সম্পর্কে ভারতবর্ষের দায়িত্ব যে বর্তমানে সবচেয়ে বেশী, পশ্চিমজী একথাও প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শুধু কথা নয়, পশ্চিম নৈহর, ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ভারতের রাজনীতি কার্যতঃ প্রয়োগ

কারতেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ১৯৪৫ সালে একটি চুক্তিসূত্রে ভারত গভর্নমেন্ট ওলন্দাজ গভর্নমেন্টকে ভারতের উপর দিয়া বিমান পরিচালনার কতকগুলি সুবিধা প্রদান করিয়া ছিলেন, পশ্চিম নৈহরর আদেশক্রমে সেই সব সুবিধা প্রত্যাহত হইয়াছে। অবশ্য এই সুবিধা হারািয়া ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীরা ইন্দোনেশিয়ায় তাহাদের শোণিতস্রাবী সংগ্রাম পরিচালনায় বিশেষ যে অসুবিধায় পড়িবে, এমন নয়। পশ্চিম নৈহরও তাহা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু এতদ্বারা এশিয়ার আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পর্কে ভারতের ভবিষ্য-নীতি সম্পর্কে হইয়া উঠিল এবং এই কথা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল যে, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা এশিয়ার ব্যাপারে যদি সংযত না থাকে, তবে ভারতের নিকট হইতে তাহারা দস্তুরমত ঘা খাইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবার পূর্বেই স্বাধীন দেশস্বরূপে গুরুত্বের আন্তর্জাতিক দায়িত্ব তাহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। এশিয়ার নির্মীত রাষ্ট্রনিচয় আজ ভারতের দিকেই চাহিতেছে এবং এদেশের রাষ্ট্রনেতাদের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। বলা বাহুল্য, জগত ভারত এ সম্পর্কে তাহার কর্তব্য প্রতিপালনে অবহেলা

করিবে না এবং এশিয়া হইতে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভুত্বকে উৎখাত করিবার জন্য এদেশের স্বদেশপ্রেমিক সন্তানগণ প্রয়োজন হইলে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না।

#### রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতা

সাম্প্রদায়িকতাকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত করা কখনই দূরদর্শিতার পরিচায়ক হইতে পারে না। বর্তমান জগতে এমন নীতির স্থান নাই। দুঃখের বিষয় মুসলিম লীগ এই মধ্য-যুগীয় সাম্প্রদায়িকতাকেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত করিয়া লইয়াছে; কিন্তু বাস্তব অবস্থার চাপে অশপদিনের মধ্যেই লীগের অনুগামীদের এই ভ্রান্তি দূর হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস এবং যত শত্রু তাহাদের এই ভুল দূর হয়, ততই মঙ্গল। সম্প্রতি এমন একটা কথা উঠিয়াছে যে, মুসলমানেরা যখন নিজেদিগকে স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া দাবী করিতেছে, তখন কংগ্রেস হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান স্বরূপে গণ্য হইবে কিনা। আমরা দেখিলাম, গান্ধীজী এমন ধারণার প্রতিবাদ করিয়াছেন। একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, কংগ্রেস কখনই সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারে না। যাহারা তেমন চেষ্টা করিবে, তাহারা যেমন ভারতের শত্রু; সেইরূপ হিন্দু ধর্মেরও শত্রু।



জেনারেল আউক সান ও তদীয় পত্নী। ব্রহ্ম গভর্নমেন্টের ছয়জন সদস্য ১১শে জুলাই দুর্বৃত্তেরা হত্যা করে।



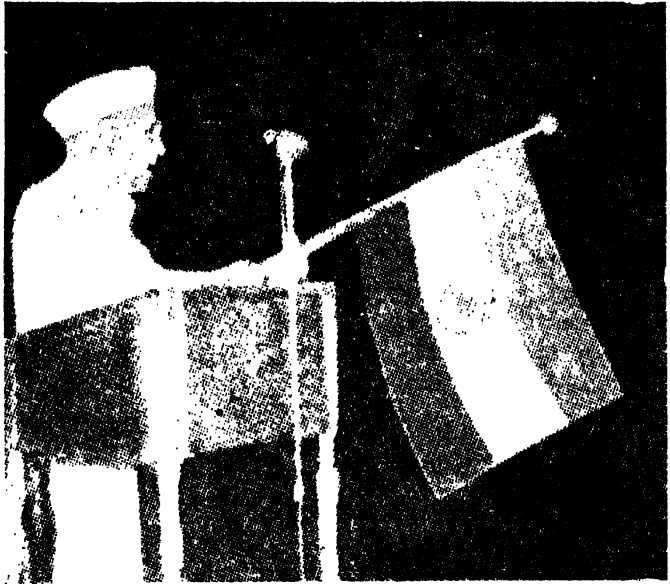
# ভারতের জাতীয় পতাকা

পণ্ডিত জগদ্বরলাল নেহরু

স্বাধীন ভারতবর্ষের এই পতাকা সাম্রাজ্য বা সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক নহে—অপরের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাও উহাতে প্রকাশ পায় না। উহা স্বাধীনতার প্রতীক—শুদ্ধ আমাদের স্বাধীনতা নহে, পৃথিবীর সর্বজনের স্বাধীনতার নিদর্শন। যেখানে ভারতবাসীরা রহিয়াছেন বা যেখানে ভারতীয় প্রতিনিধিরা নিযুক্ত রহিয়াছেন, কেবলমাত্র সেখানেই এই পতাকা লইয়া যাওয়া হইবে না—দূরদর্শনতরে, মহাসমুদ্র অতিক্রম করিয়া ভারতীয় নৌবহর যেখানেই উপস্থিত হইবে—সেখানেই এই পতাকা সগৌরবে উড়িতে থাকিবে। এই পতাকা স্বাধীনতা ও মৈত্রীর ধ্বনি বহন করিবে, পৃথিবীর সকল দেশে উহা একথাটিই জানাইয়া দিবে যে, ভারতবর্ষ সকলেরই বন্ধুত্ব কামনা করিতেছে এবং স্বাধীনতাবিগ্ধ সকলকেই সাহায্য করিতে ভারতবর্ষ ইচ্ছুক রহিয়াছে।

এক সুমহান জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামের উত্থানপতনের কথা আজ আমার মনে হইতেছে। যখনই আমরা নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি, তখনই এই পতাকা আমাদের মনে সাহস সঞ্চার করিয়াছে। বহু সহকর্মীর কথা আজ আমাদের মনে হইতেছে। তাহারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই পতাকাকে শ্রদ্ধা করিয়া গিয়াছেন। অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তাহারা এই পতাকাকে উত্তীর্ণমান রাখিয়া অপরের হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। এই পতাকায় একটি জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রাম, উত্থান-পতন, বিপদ ও বিপদবর্ষের ইতিহাস রহিয়াছে। কিন্তু সংগ্রামে জয়লাভের কাহিনীও এই পতাকায় লিখিত রহিয়াছে। একথা ঠিক যে, আমাদের জয়লাভের আনন্দ বহুলাংশে বিনষ্ট হইয়াছে। গত কয়েক মাসে যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাতে আমাদের হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের মাতৃভূমির অংশবিশেষ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হইয়াছে। নিরাশ্রয় নরনারী আজ অসহায় অবস্থায় পড়িয়াছে। আরও অনেক ব্যাপার ঘটিয়াছে, যেগুলি এখন উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা-সংগ্রাম আজ জয়লাভে আসিয়া শেষ হইছে। এক বিরাট ও শক্তিশালী রাজ্যের পতন স্বীয় কৃষ্ণের অবসান করা হইয়াছে। ন্যা-ব্যাপার নহে। আমরা কিন্তু উহাই যাচাই করিয়া আমাদের উদ্দেশ্য আজ সফল করিয়াছি। কিন্তু আমরা যে ধরণের

স্বাধীনতা চাহিয়াছিলাম ঠিক সে ধরণের স্বাধীনতা পাইতেছি না। ব্যক্তিগত বা জাতি বিশেষ যে উদ্দেশ্য লইয়া যাত্রা করেন, কদাচিৎ তাহা সম্পূর্ণভাবে সফল হয়। সুদূর অতীতের কথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে এক মহাযুদ্ধে সমগ্র মানবসমাজ বিপুল দুঃখভোগ করিয়াছে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে রক্ষার উদ্দেশ্যেই এই যুদ্ধ আরম্ভ



অশোক-চক্র সন্নিবিষ্ট নূতন জাতীয় পতাকা হস্তে

না পাইলেও লজ্জার বা বিস্ময়ের কারণ নাই। আমার বিশ্বাস, আমাদের সাফল্যের পরিমাণও কম নহে। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ আছে, যাহা বহুবিধ জটিল সমস্যায় পূর্ণ নহে? রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দিক হইতে কোন না কোন উপায়ে স্বাধীনতার চেষ্টা করিতেছে না, এমন দেশই বা কোথায়?

## নিরাশ হওয়া উচিত নহে

বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে আমাদেরকে ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করিতে হইবে। অব্যাহত ব্যাপার ঘটিয়াছে বলিয়া আমাদেরকে নিরাশ হইলে চলিবে না। এক ধাপ অগসর হইলেই আর এক ধাপ অগসর হওয়া সম্ভবপর।

পণ্ডিত নেহরু, গণ-পরিষদে বক্তৃতা করিতেছেন

হইয়াছিল। যাহারা স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের সমর্থক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাহারাই এ যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই নূতন যুদ্ধের গুঁজব শুন্য হইতেছে। তিনিদিন পূর্বে আমাদের প্রতিবেশী একটি রাষ্ট্রের নেতাদিগকে যেভাবে হত্যা করা হইয়াছে, তাহাতে এই পরিষদ, এই দেশ এবং সমগ্র পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্বে এশিয়ায় আমাদের একটি মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। স্বাধীনতা এখনও পৃথিবী হইতে অনেক দূরে রহিয়াছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই স্বাধীনতার জন্য আজও কর্মবশী সংগ্রাম করিতেছে। আমরা যতটুকু চাহিয়াছিলাম, ঠিক ততটুকু বর্তমানে

একজন মানুষও যতদিন পরাধীন রহিয়াছে, ততদিন ভারতবর্ষ বা পৃথিবী স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে না। অম্মাভাব, বস্ত্রাভাব ও মানুষের জীবন-ধারণের উপযোগী সুযোগ-সুবিধার অভাব যতদিন রহিয়াছে, ততদিন পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে না।

আমি আপনাদের নিকট এই পতাকা উপস্থিত করিতেছি। আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া হয়ত এই পতাকা গ্রহণ করা হয় নাই। কিন্তু জনসাধারণ উহাকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছিল, উহাকে কেন্দ্র করিয়া বহু ত্যাগস্বীকার করা হইয়াছে। সেদিক হইতে বলা যায়, জনসাধারণ যাহা গ্রহণ করিয়াছে, আজ আমরা তাহা অনুমোদন করিতেছি মাত্র। কেবলমাত্র পাণ্ডিত্য সম্পদের সাহায্যেই একটি

-চক্র-  
গাঢ় নীল



← গৈরিক

← শ্বেত

← গাঢ় সবুজ

#### ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকার পারিকল্পনা

##### নতুন পতাকার বৈশিষ্ট্য

জাতি বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। প্রত্যেক দেশ বিশেষত ভারতবর্ষের মত একটি প্রাচীন দেশের অন্য জিনিসেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। আমি আশ্বিক সম্পদের কথাই বলিতেছি।

##### ভারতের শ্রেষ্ঠতা

বহু সহস্র বৎসরের ইতিহাসে ভারতবর্ষ যদি এ সকল আদর্শবাদ ও আশ্বিক সম্পদের সহিত পরিচিত না থাকিত, তবে ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ দাঁড়িত? ভারতবর্ষ বহু দুঃখভোগ করিয়াছে এবং উহার অধঃপতন ঘটিয়াছে। কিন্তু অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌঁছিয়াও ভারতবর্ষ মস্তক উন্নত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। চিন্তার ক্ষেত্রে ও আদর্শবাদের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ চিরদিনই শ্রেষ্ঠতা বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। সেজন্যই আজ আমরা সগৌরবে বিগত দিনের কথা স্মরণ করিতেছি। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বার্থকল্যাণের কথা চিন্তা করিয়া আমরা সমধিক গর্ববোধ করিতেছি। যে পতাকা আমরা এতদিন ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি, উহার সামান্য পরিবর্তন করা হইয়াছে। বর্ণসমূহ অপরিবর্তনীয় থাকিবে। কিন্তু চরকার সামান্য পরিবর্তন করা হইয়াছে। এই চরকা ভারতের গণসমাজ ও তাহাদের শিল্পের নিদর্শন। মহাত্মা গান্ধীর বাণী হইতেই এই চরকার পরিকল্পনা উদ্ভূত হইয়াছিল।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যে প্রতীকটি জনসাধারণকে এতদিন অনুপ্রাণিত করিয়া আসিয়াছে, উহা বজায় রাখা উচিত। কিন্তু উহার সামান্য পরিবর্তন প্রয়োজন। চরকার চক্রটি রাখা হইবে বলিয়া স্থির হয়। কিন্তু কি ধরণের চক্র রাখা হইবে? অশোক চক্র ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতীক। অতএব, এই অশোক চক্রকেই চরকার চক্ররূপে গ্রহণ করা স্থির হয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই ভাবিয়া আনন্দবোধ করিতেছি যে, আমরা আমাদের পতাকার কেবলমাত্র এই প্রতীকটিই পরিবর্তন করি নাই—পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বাঙ্গেরই স্মরণীয় ব্যক্তি অশোকের নামও যুক্ত করিয়াছি।

সেই সুপ্রাচীন যুগে ভারতবর্ষের সম্মুখে কোন আদর্শ ছিল এবং ভুল, দুর্ভাগ্য ও অধঃপতন সত্ত্বেও ভারতবর্ষ কেননা আদর্শকে এতদিন গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে, আদ্যকার সংঘর্ষ, কলহ ও অসহিবৃত্তির মধ্যে আমাদিগকে তাহা স্মরণ করিতে হইবে। ভারতবর্ষের সম্মুখে যদি উচ্চ আদর্শ না থাকিত, তবে ভারতবর্ষ বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না এবং যুগে যুগে উহার সংস্কৃতির ধারাকে অব্যাহত রাখিতে পারিত না। দীর্ঘ ইতিহাসে ভারতবর্ষ কেবলমাত্র অন্যান্য দেশের সহিত সংশ্লিষ্টই ছিল না উহা একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্রও ছিল। ভারতবাসীরা দূরে-দূরান্তরে ভারতের বাণী

বহন করিয়া নিয়াছে, অন্য দেশের বাণী সংগ্রহ করিয়াছে।

ভারতের ইতিহাসের অশোক যুগ মুখ্যত আন্তর্জাতিক যুগরূপেই পরিচিত রহিয়াছে। সে যুগে দেশে-বিদেশে ভারতের বাণী প্রচারিত হইয়াছে। সে বাণী ছিল—শান্তি, সংস্কৃতি ও শ্রেষ্ঠতার বাণী।

কোন কোন জাতি নবলব্ধ শক্তির জোরে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব অবলম্বন করিয়াছে। স্বাধীন ভারতবর্ষ তাহা করিবে না বলিয়াই আমি আশা করি। যদি তাহা করা হয়, তবে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক শোচনীয় পরিসমাপ্তি বলিয়াই উহা গণ্য করা হইবে।

##### ভারতের পররাষ্ট্রনীতি

আমরা কোন রাষ্ট্র সমবায়ের দলে ভিড়িতে চাহি না। যতদূর সম্ভব, শান্তির সহায়করূপেই আমরা থাকিতে চাহি। শান্তির উপায় বলিতে আমরা বাহা বুনি, তাহা অন্যের উপর চাপাইয়া দিবার ক্ষমতা আমাদের নাও থাকিতে পারে। কিন্তু পৃথিবীতে সমতা লাভের যে পন্থা চলিতেছে, উহা হইতে দূরে থাকাই আমাদের ইচ্ছা। জটিল পরিস্থিতিতে পরিপূর্ণ পৃথিবীতে হয়ত উহা সম্পূর্ণ সম্ভব নহে—কিন্তু আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।\*

\* অশোক-চক্র সমিতিষ্ট নতুন জাতীয় পতাকার উদ্দেশ্যে উপলক্ষে গণ-পরিষদে পরিচিত নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা।



জেনারেল আউগসানের বাসভবনে বিপুল জনতা। তাঁহার মৃতদেহ হাসপাতাল হইতে বাড়িতে আনা হইলে এই জনসমাবেশ হয়।



গে.  
না  
যাজি

বীর  
হ।

আম

জেনারেল আউগসানের শব্দ সহ বিরাট শোভাযাত্রা

# যাত্রিদল

## শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

সপ্তবিংশ অধ্যায়

ভাল ব্যারিস্টার দিয়া মামলা চালাইয়া  
“ব্যয় করিয়াও কোনই ফল হইল না।  
এ মামলাও “স্পেশ্যাল ট্রাইবুনালে” বিচার  
হইল। মাস দুই পরে রায় বাহির হইল।  
অসিত, যতীন ও আরো কয়েকজনের হইল  
যাবজ্জীবন স্বাধীনতার এবং বাকী সকলের পনের  
বৎসর করিয়া কঠোর কারাদণ্ড। অসিতেরা  
কিছুদিন ধরিয়া এমন কিছু হইবে বলিয়া  
পূর্বে হইতেই নিজেদের মনকে প্রস্তুত  
করিয়াছিলেন। তাই আজ তাহাদিগকে রায়  
পড়িয়া শুনান হইলে তাহারা সহজভাবেই তাহা  
গ্রহণ করিল। বার জন নীরবে দণ্ডদেশে শ্রবণ  
করিয়া একান্ত নির্বিকারভাবে আবার জেলে  
আসিয়া যে যাহার সেলে ঢুকিয়াছে। বেলা  
গড়াইয়া শেষ হইয়াছে। অসিত চুপ করিয়া  
নিজের সেলে বসিয়াছিল। তাহার থালা বাটিতে  
জল ও খাবার দিয়া গেল—জমানার আসিয়া  
সেলের দরজা বন্ধ করিল। অসিত একবারও  
তাহার আদন হইতে উঠিল না। সে যেন  
একেবারে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত আপনার  
ভিতরে আপনি সমাহিত হইয়া গিয়াছে।  
তাহার মনে হইতেছিল—দেশ আর তাহার নয়  
—এ জগতও নয়। এই আকাশ—এই বাতাস  
—এই সমস্তই তাহাকে ছাড়িয়া কোন নির্ব-  
দেশের দেশে গিয়া সারাজীবন কাটাতে  
হইবে। আশীর স্বজনের সহিত কোন সম্বন্ধ  
থাকিবে না—অথচ সে থাকিবে বাঁচিয়া—  
অথচ সে থাকিবে এই পৃথিবীতেই। এ তো  
মৃত্যু—এ জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে তফাৎ  
কোথায়? সেই আশ্চর্য—সেই কালোপানির  
দেশ—সেখানকার কত ভীষণ অত্যাচারের কথা  
সে শুনিয়াছে—সেখানে যাহারা যায়, তাহারা  
তো আর ফিরিয়া আসে না। ইহার চেয়ে  
মৃত্যুও তো তাহার ভাল ছিল। ফাঁসী গেলে  
তো তবু নিজের দেশের আলোতে—নিজের দেশের  
বাতাসে—নিজের দেশের মাটিতে মিশিয়া যাইতে  
পারিত। তিলে তিলে সারাজীবন গরিবী কোন  
অজানা দেশে পচিয়া মরিতে হইত না। দুই  
দিন পরে তাহাদের কলিকাতায় আনিয়া লন্ডা  
স্টেশনে লইয়া আসা হইল। রিজার্ভ গার্ডিতে  
তাহাদিগকে তোলা হইলে গাড়ি ছাড়িয়া দিল।  
নিজের চোখের সম্মুখে দিয়া দ্রুত অপসর্যমান  
মাঠঘাট পথপ্রান্তরের দিকে তাকাইয়া তাহার

সারা অন্তর একান্ত উন্মুখ হইয়া উঠিল।  
হয়তো আর মাত্র কয়েকটি দিন পরে তাহাকে  
নিজের দেশ নিজের জন্মভূমি ছাড়িয়া সেট  
একান্ত অজানা দেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে  
হইবে। হয়তো এই মাঠঘাট প্রান্তর আর কোন  
দিন দুই চোখ ভরিয়া দেখিতে পাইবে না।  
রেল লাইনের পাশে পাশে খেজুর গাছগুলো  
মাথা দোলাইয়া দ্রুত চোখের সম্মুখ দিয়া  
হুটুয়া যাইতেছে। ঝোপঝাড়গুলো নিমেষে  
অদৃশ্য হইতেছে—মাঝে মাঝে দিগন্তবিস্তারী  
মাঠ, তাহার আশেপাশে হয়তো দুই একখানা  
গ্রাম—বনবাদাড়ের কোন ফাঁক দিয়া মাঠের  
উপাড়ে হয়তো সেই সব গ্রামের হঠাৎ দুই এক-  
খানা বাড়ির অন্তরে চোখের সম্মুখে ফুটিয়া  
উঠিয়া পুনরায় মূহূর্ত মধ্যে মিলিয়া  
যাইতেছে। কোথাও পাড়ার আশেপাশে দুই  
চারটা আম কাঠালের গাছ—গাছ অজস্র ফল  
ধরিয়া রহিয়াছে। প্রান্তরের দিকে তাকাইয়া  
আজ চোখ জুড়াইয়া যায়। সারা প্রান্তর ফসলে  
ফসলে একেবারে সবুজ রং—এ ভরিয়া  
উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে দলে দলে  
হয়তো কৃষকেরা জমিতে নিড়ানী  
কিতেছে আর ভাটিয়ালী রূগিণীতে  
গান গাহিয়া চলিয়াছে। আকাশে বাতাসে  
তাহারই সুর বাজিয়া উঠিতেছে। কোথাও দূরে  
দূরে পালে পালে গরু চরিয়া বেড়াইতেছে  
রাখারেরা কোন গাছের ছায়ায় জুটিয়া হয়তো  
ডাংগুলি খেলিতেছে। কেহ হয়তো গাছের  
ডালে দুই পা কুলাইয়া দিয়া নিজের সহজ  
রাগিণীতে গান ধরিয়াছে। দলে দলে সাদা সাদা  
বুকের পাল মাঠের মাঝে মাঝে উড়িয়া  
বেড়াইতেছে। মাঠের আলপথ ধরিয়া হয়তো  
কদাচিৎ দুই একজন পথিক পথ হারাইয়া  
সম্মুখের গ্রামের দিক লক্ষ্য করিয়া দিশাহারা-  
ভাবে পথ চালাতেছে—হয়তো দুই একজন  
রাখাল ছেলেকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা  
করিতেছে—পথ কোন দিক দিয়ে ভাই। জবাব  
আসিতেছে কোথায় যাবেন মশাই?

—নিশ্চিন্তপুর।

ঐ যে ঐ জমিটার পাশ দিয়ে যে আল,  
ঐ ঘরে ঐগয়ে যান—ঐ যে কাল কাল গাঁও  
ওরই ওপারে গেলে নিশ্চিন্তপুর পাবেন।  
পথিক ঠিক পথ ধরিয়া চলিতে থাকে। মাঝে  
মাঝে কটকা হাওয়া কোথা হইতে দৃষ্ট ছেলের

মত ছুটিয়া আসিয়া ধানের ক্ষেতের পাটে  
ক্ষেতের উপর গড়াইয়া পড়িয়া সবুজের চেউ  
ভুলিতে থাকে—পথিকের ছাতা টানিয়া ধরিয়া  
জোর করিয়া উঠাইয়া দিতে চাহে। রাখাল  
ছেলেরা শীতল হাওয়ার স্পর্শ পাইয়া আনন্দে  
নৃত্য করিয়া উঠে। এমন করিয়া ভাবিতে  
ভাবিতে অসিতের মন একেবারে তাহার বাল্য-  
জীবনে তাহার গ্রামে ফিরিয়া গেল। সেই  
চন্দনা নদী তর তর করিয়া বহিয়া যাইতেছে।  
মাঝে মাঝে ছোট ছোট ডিগ্গি নৌকা পাল  
তুলিয়া নিয়াছে। থেয়া নৌকার উপরে হাটুরেরা  
ভিড় করিয়া চাপিয়া বসিয়া কলরব শব্দ  
করিয়া দিয়াছে। নদীর দুই পাশে গাভ  
গাছ—মাঝে মাঝে লম্বা লম্বা নটা আর কাশের  
ঝোপ। স্থানে স্থানে বালির পাড় ধসিয়া  
পড়িতেছে কোন স্থানে খাড়া পাড়ের ভিতরে  
অসংখ্য গর্ত গাভ শালিক বাসা বাঁধিয়াছে—  
অসিত কতবার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পাড় বাঁধিয়া  
উঠিয়া এই সব গর্ত হইতে গাভ শালিকের  
ছানা ধরিয়াছে। ঠিক নদীর তীর ধরিয়া তাহা-  
দের গ্রামের বসতি—তাহাদের নিজেদের বৈঠক-  
খানার বসিলে চৈত্র মাসে যখন নদীর জল  
একেবারে তলায় নামিয়া যায়, তখনও চোখে  
পড়ে। অসিত চোখ ব্যজিয়া যেন তাহাদের  
বৈঠকখানায় বসিয়া সেই সব দৃশ্যই বিভোর  
হইয়া দেখিতে লাগিল। ঠিক বৈঠকখানা  
ঘরের দক্ষিণ দিকে ফুল বাগান—ফুল বাগানের  
কথা মনে হইতেই তাহারই পাশের সেই উচু  
ভাঙ্গাটি দেখানে তাহার মাকে দাহ করা হইয়া-  
ছিল, তাহা মনে পড়িয়া গেল। মা—তাহার  
মা! তিনি আজ কোথায়। মা আজ আর নাই  
—তিনি স্বর্গে গিয়াছেন—বেশ হইয়াছে বড়  
অমৃত সে তাঁহার প্রাণে লাগিত তাহার পরিমাণ  
করিবার সাধ্য তাহার নাই, হঠাৎ বর বর করিয়া  
করেক ফোঁটা জল তাহার চোখের কোণ  
বাঁহিয়া গড়াইয়া পড়িল। মায়ের চিন্তায়  
ব্যাকুল, মন তাহার কতক্ষণ এমন করিয়া  
নিজের বুকল মধ্যে মাথা খুঁড়িয়া পুনরায়  
শান্ত হইয়া আবার সেই গ্রামের পথে ঘাটে  
প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। নদীর  
ঘাট হইতে যে পথ সেই পথের দুইধারে সারি  
সারি লোকের বসতি—একে একে তাহার  
পাড়ার প্রত্যেকটি বাড়ির কথা তাহার মনে  
পড়িতে লাগিল, প্রত্যেকটি বাড়ির এমন কি  
তাহার প্রত্যেকটি নরনারী পর্যন্ত তাহার  
চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। গ্রামে থাকিতে  
তাহাদের সে কোনদিন পছন্দ করে নাই—  
তাহাদেরও কোন দোষই আজ তাহার চোখে  
পড়িল না। তাহার চোখে আজ সবই সুন্দর,  
সবই একান্ত আপনার বলিয়া ধরা পড়ি-  
গেল। গ্রামের সমস্ত বন—পুড়—সমস্ত  
জগল তার কাছে পরম সুন্দর হইয়াছে।

সে চোখ বুজিয়া গুপ গুপ করিয়া গাহিতে লাগিল :—

“আমায় সেনার বাংলা তোমায় আমি ভালবাসি  
চিরদিন তোমায় আকাশ তোমায় বাতাস  
আমায় প্রাণে বাজায় বাঁশ—।”

সে গাহিতে গাহিতে একেবারে নিজের মনের  
মধ্যে ডুব মারিয়া দিয়াছিল—শিয়ালদহে গাড়ি  
চুকিলে লোকজনের কোলাহলে তবে তাহার  
ধ্যান ভঙ্গ হইল।

#### অষ্টবিংশ অধ্যায়

চারদিন পরে—সৈদিন বৈকাল বেলা  
অসিতদের একখানা ছোট ধূতি কোটা  
পরাইয়া হাতে হাতকড়া ও পায়ে বেড়ী  
লাগাইয়া আলিপুর জেলের বাহিরে লইয়া  
আসিল। অফিস হইতে তাহাদিগকে শুনাইয়া  
দেওয়া হইল—তাহারা আন্দামান যাইতেছে।  
জেল গেটের বাহিরে কয়েদী গাড়ি দাঁড়াইয়া-  
ছিল। তাহাদের বার জনকে গাড়িতে তুলিয়া  
দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল।  
সেই ছোট গাড়িটির মধ্যে পাশাপাশি বসিয়া  
বারটি প্রাণী কোন নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা  
করিয়াছে। কেহ কাহার মুখের দিকে ফিরাইয়া  
চাহিতেছে না, কেহ একটা কথাও কহিতেছে  
না। শুধু নীরবে সমস্ত অন্তর দিয়া নিরীহ  
পশুর মত নিজদের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে একেবারে  
বিসর্জন দিয়া অদৃষ্টের হাতে নিজদের  
সমর্পণ করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছে।  
কলিকাতার রাজপথ দিয়া গাড়ি ছুটিয়া  
চলিয়াছে তাহাদের মনে হইতেছে—গাড়ির  
ঢাকা যেন তাহাদের বকের উপর দিয়া সমস্ত  
পজিরাগুলোকে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিয়া  
যাইতেছে। পথে পথে অজস্র লোকের ভিড়—  
কোমানীয়া অফিস হইতে ফিরিতেছে। দলে  
দলে ছাত্রেরা স্কুল বসেজের পাঠ সমাপন  
করিয়া জটলা করিতে করিতে পথ চালিতেছে,  
রাস্তার দুইপাশে অসংখ্য বিপণিতে  
ভিড়ের অন্ত নাই। কোথায় যেন  
হস্তদণ্ডপাতি হইতেছিল—তাহারই খানিকটা  
রেশ কোন রকমে গাড়ির মধ্যে  
একমুহূর্তের জন্য ভাসিয়া আসিল।  
গড়ের মাটির দিকে অসংখ্য লোক হয়তো  
থোলা দেখিতে ছুটিয়া যাইতেছে। দেশের  
কোথাও তো সুখ দুঃখের মানুষের দৈনন্দিন  
আহার বিহারের একটুকুও পরিবর্তন হয়  
নাই—শুধু তাহারা বারটি প্রাণী এমনি  
করিয়া লোহ-শৃংখল পরিয়া লোহার খাচায়  
বন্দী হইয়া কোন অজানা দেশে ছুটিয়া  
চলিয়াছে। “কেন এমন হয়?”—কেন এমন  
হইল? এই প্রশ্ন সহসা অসিতের পরাধীন  
বাঙালী মনের তিক্ত হইতে মোড় দিয়া  
গিয়া উঠিল। ঐকিছু প্রশ্নের সমাধান  
নায়া পাইজে বৈশিষ্ট্য লাগিল না। সে

ভাষিল মন্দির ডাক বাহার নিকট আসিয়াছে—  
এই দেশে এ অবস্থা তো তাহার অবশ্যম্ভাবী।  
এখানে মন্দির ডাকে আর মন্দির ডাকে কোন  
তফাৎ নাই। বাহারা এ ডাক শুনে নাই—শান্তি  
তাহাদেরই জন্য—সংসারের সুখ দুঃখের  
হিসাব-নিকাশ তাহাদেরই। এমনিই তো হয়—  
এমনিই হইয়াছে। মন্দির মূল্য দিতে গিয়া  
ইতিপূর্বেও তো কতজন প্রাণ দিয়াছে—  
কতজন স্বািপান্তরিত হইয়াছে। তাহারাও  
চলিয়াছে আরও কতজন যাইবে—এমনি  
করিয়াই হয়তো একদিন যাত্রার শেষ হইবে—  
চির আকাশিকত ফল লাভ হইবে। অসিত কি  
সৈদিন বাঁচিয়া থাকিবে? নাই-বা থাকিল  
বাঁচিয়া। বাঁচিয়া থাকিবে তার দেশ—বাঁচিয়া  
থাকিবে তার জাতি। গাড়ির লোহজালের  
ভিতর দিয়া কলিকাতার রাজপথের দিকে  
তাকাইয়া এই কথাই তাহার মনে হইতেছিল,  
সহসা অসিত গাহিয়া উঠিল—“বন্দেমাতরম্—  
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্য  
শ্যামলাং মাতরম্।” সংগে সংগে বাকী এগার-  
জন তাহারই সংগে কণ্ঠ মিলাইয়া চোখ বুজিয়া  
অপূর্ব আবেগে গাহিয়া চলিল। কড়ে হাওয়া  
যেমন করিয়া হিম্মমের টুকরাকে একেবারে  
নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়, তেমনি করিয়া তাহাদের  
মনের সমস্ত মেঘ কোথায় এক নিমিষে  
অন্তর্হিত হইয়া গেল। চোখের সম্মুখে  
জাগিয়া উঠিল সমগ্র ভারতবর্ষের পারিপূর্ণ-  
রূপ—সারা অন্তর ভরিয়া নামিয়া আসিল  
গভীর প্রশান্তি। আউরাম ঘাটে আসিয়া  
গাড়ি থামিল। তাহাদিগকে গাড়ি হইতে  
নামাইয়া সারবন্দী করিয়া দাঁড় করান হইল।  
সম্মুখেই গঙ্গায় একখানা জাহাজ লাগিয়াছিল  
—জাহাজটির নাম “রাজা”। এই জাহাজই  
আন্দামানে তাহাদিগকে বহন করিয়া লইয়া  
যাইবে। বারজন হাতে পায়ে শিকল পরিয়া  
সারবন্দী হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।  
ওপাড় পশ্চিম আকাশের কোণে পাতলা  
মেঘের আড়ালে সূর্য ঢলিয়া পড়িয়াছে।—  
মেঘের মাথায় মাথায় কে যেন সেনার রং  
ঢালিয়া দিয়াছে। পিছনে কলিকাতানগরী—  
সম্মুখে গঙ্গা। তর তর করিয়া বহিয়া  
যাইতেছে। ইহারই মাঝখানে দাঁড়াইয়া বারজন  
বন্দী শেষবারের মত নিজদের দেশের এই  
অপূর্ব সৌন্দর্য দুই চোখ ভরিয়া দেখিয়া  
লইতেছিল। জাহাজে উঠবার পূর্বে বারজনই  
তাহাদের শৃংখলাবন্ধ হাত কপালে ঠেকাইয়া  
জন্মভূমিকে শেষ নমস্কার জানাইয়া গেল।  
অসিত সহসা নীচু হইয়া নিজের পায়ের তলা  
হইতে দুই মুঠি ভরিয়া পথের ধূল্য তুলিয়া  
বকের উপরে চাপিয়া ধরিল—তাহার দেশের  
মাটির শেষ স্পর্শ। জাহাজের ডেক হইতে  
তাহাদিগকে সিঁড়ি দিয়া খেলের ভিতরে  
নামাইয়া লওয়া হইল। মাঝে মাঝে বিজলী  
বাঁড়ি জ্বলাইয়া স্থানটির অন্ধকার দূর করা

হইয়াছে। এই বিস্তৃত স্থানটির একপাশে  
মোটামোট লোহার শিক দিয়া খানিকটা জায়গা  
বিরিয়া রাখা হইয়াছে। অসিতদের সেইখানে  
ঢুকাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। এটি  
নাকি রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য বিশেষ  
ব্যবস্থা। বাকীস্থান সাধারণ কয়েদীদের  
জন্য। ইতিপূর্বেই বহুসংখ্যক সাধারণ কয়েদী  
আনিয়া সেস্থান পূর্ণ করিয়া ফেলা হইয়াছে।  
খানিক পরে পুনরায় তাহাদের সেই লোহার  
দরজা খাচা খুলিয়া কিছু চিড়া চিনি, তেঁতুল  
ও লেবুর রস জল রাখিয়া যাওয়া হইল—চার-  
দিনের ইহাই তাহাদের খাদ্যবস্তু। বাহিরে  
হয়তো তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে—কিন্তু  
জাহাজের এই খেলের ভিতরে কোন সন্ধানই  
তাহার পাওয়া যাইতেছিল না। প্রত্যেকের জন্য  
একখানা করিয়া কম্বল দেওয়া হইয়াছিল।  
তাহারা জাহাজের মেঝের উপরে সেই কম্বল  
বিছাইয়া লইয়া দেহ এলাইয়া দিল। উত্তেজনা  
অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল—এখন দেহ-  
মনের শ্রান্তিতে দুই চোখ তাহাদের বুজিয়া  
আসিল কিন্তু ঘুমের লেশমাত্র তাহাতে ছিল  
না—বারটি মন দেহের সীমানা ছাড়াইয়া  
নিজেদের দেশের আলেতে বাতাসে সর্বত্র  
ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল—কাহারও মুখ দিয়া  
আর একটা কথাও বাহির হইল না।

#### উনবিংশ অধ্যায়

আজ সকালের দিকে অমিয় কলাগাণী ও  
অজয়কে লইয়া জেল গেটে দিয়া অসিতের  
সহিত দেখা করিয়া আসিয়াছেন। আজই যে  
তাহাদিগকে আন্দামানে পাঠান হইবে এ  
খবরও তিনি পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন।  
তাই আজ বিকালে সন্ধান করিয়া তিনি  
জাহাজ-ঘাটের একপাশে অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ  
করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এমনি অপেক্ষা  
করিবার পর অসিতদের গাড়ি আসিয়া ঘাটে  
পেঁচিল—তাহাদিগকে গাড়ি হইতে নামান  
হইল—সারবন্দী করিয়া দাঁড় করান হইল—  
তারপর জাহাজে তোলা হইল—সমস্ত তিনি  
অলক্ষ্যে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন।  
অসিতদের যখন আর দেখা গেল না তখন  
দেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই অনেকক্ষণ ধরিয়া  
কাঁদিয়া সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া  
নিজের বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়া পড়িলেন।  
এই সন্ধ্যাবেলা সারা বাড়িখানি একেবারে শূন্য  
খাঁ খাঁ করিতেছিল—ইহার কোথাও যেন আজ  
একটা লোকজনও নাই—একেবারে গভীর  
নিস্তব্ধতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। কলাগাণী নিজের  
ঘরখানিতে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সারাটা  
বাড়ির আবহাওয়া একেবারে থমথমে হইয়া  
উঠিয়াছে। অজয় মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া  
চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিল—সমস্ত ব্যাপারটি  
বুঝিতে না পারিলেও গুরুতর কিছু একটা

যে ঘটনা গিয়াছে তাহা সেও বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই একটা কথাও বলিতে সাহস হইতেছিল না—কিন্তু এই নীরবতা সে সহ্য করিতে পারিতোঁহিল না—তাহার যেন নিঃশ্বাস আটকাইয়া আসিতেছিল। সেই সকাল বেলায় সে তাহার বাবাকে দেখিয়া আসিয়াছে—বাবা তাহার কেন সেইখানে রহিয়াছেন? কেন বাড়ি চলিয়া আসেন না? বাবা বাড়ি না থাকিলে যে তাহার ভাললাগে না—বাবার কাছে না শুনিলে যে তাহার ঘুম হইতে চাহে না। বাবা কি ইহা বুঝেন না তাহার কথাটি কি একবারও মনে হয় না? বাবার কি চেহারা হইয়াছে—তাঁহার পরণে ছোট্টছেলের মত হাফ প্যাণ্ট গারে কি এক অদ্ভুত ধরণের জামা—এই পোষাকে ভারি বিব্রী দেখাইতেছিল তাহাকে। বাবা জানালার লোহার শিকের ওপাশে দাঁড়াইয়াছিলেন—তাহাদের নিকট আসেন নাই—তাহাকে কোলে করেন নাই। তাহাদের নিকে তাকাইয়া কিছুক্ষণ পরে ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন—জ্যাঠামণি কাঁদিতোঁহিলেন, মা কাঁদিতোঁহিলেন—দিদিমা কাঁদিতোঁহিলেন—সকলের দেখাশোনা দেও কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। তারপর আজ সারাদিন জ্যাঠামণি তাহাকে একবারও ডাকেন নাই—কোলে করেন নাই, ভাত খান্ নাই—এখন এই সম্ভাব্যলোও তাহাকে ডাকিলেন না, একটুও আদর করিলেন না—নিজের বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়া আছেন। মা সারাটা দিন একটা কথাও কহে নাই—তাহাকে আদর করে নাই—শুধু বিকাল-বেলা তাহাকে নিজের কোলের ভিতরে চাপিয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতোঁহিল। সারাটা দিন মাও তো স্নান করে নাই—আহার করে নাই। কেন ইহারা এমন করিতেছে? কেন বাবা বাড়ি আসিতেছে না? বাবার কি হইয়াছে—কে তাহার জবাব দিবে? কাহারও কাছে যে জিজ্ঞাসা করিবে সে সাহসও আজ তাহার হইতেছে না। সহসা সে মুখ তুলিয়া মায়ের কাছে মুখ লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—ওমা—মাগো—কেন এমন কচ্ছ মা? কি হয়েছে বল না? কিন্তু কল্যাণী কোন জবাবই দিতে পারিল না। অজয় পুনরায় বলিল—বাবা কবে আসবে মা—কি হয়েছে তাঁর—আমায় বল না মা। বাবার জন্য আমার যে মন কেমন করে মা। কল্যাণী কি যেন জবাব দিতে গেল—কিন্তু সহসা ক্রন্দনের রোলে তাহার কণ্ঠস্বর একেবারে ডুবিয়া গেল—কোন কথাই আর বাহির হইল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া হৃদয়ের ভার লঘু করিয়া লইয়া অজয়কে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—মন তো কেমন করলে চলবে না বাবা। সে তো শিশুগির আসবে না—তুই বড় হাঁবি—লেখাপড়া শিখবি—তারপর সে ফিরে আসবে।

—সে যে অনেকদিন মা?

—হাঁ অনেক দিনই ডো বাবা।

—অতদিন আমি বাবাকে ছেড়ে কেমন করে থাকবো মা?

—থাকতে হবে যে অজয়।

—কিন্তু কোথায় যাবে বাবা?

—সে অনেকদূর, তুই সে দেশ চিনিস? নে অজয়।

—বাবা কেন যাবে সেখানে?

—দেশের কাজে অজয়—সেদিন যে বলেছিলাম তোকে, কত বড় কাজের ভার নিয়েছেন তিনি।

—বড় কাজই যদি—তুমি তবে কাঁদছো কেন মা—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি নে।

কল্যাণী আর কোন জবাব দিতে পারিল না, শুধু অজয়কে তেমনি করিয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়াই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

আরো খানিকক্ষণ কাঁটবার পর কল্যাণী বলিল—ওঠ তো অজয়—তোরা জ্যাঠামণি যে সারাদিন খান্—চল্ তাকে ডেকে আনিবি।

কল্যাণী অজয়ের হাত ধরিয়া অমিয়র ঘরের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। অজয় তাহার জ্যাঠামণির কোলের কাছে গিয়া ডাকিল—জ্যাঠামণি।

অমিয় সহসা উঠিয়া বসিয়া দুই হাত দিয়া অজয়কে বুকের ভিতরে টানিয়া লইয়া বলিল—কি জ্যাঠামণি?

—মা খেতে ডাকছে—খেতে চলো।

দরজার নিকে দৃষ্টি পড়িতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন—কে বউমা—তুমি এসেছো! চল বউমা খাব বইকি—আমাকে যে বাঁচতে হবে—নইলে আমার অজয়কে দেখবে কে—সব ভার যে আমারই উপর সে ফেলে রেখে গেছে।

বলিতে বলিতে তিনি হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে। কল্যাণী নিজের ঘরের জানালার শিকের উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। বাহির কলিকাতা নগরী তখন গভীর স্নানিতে মগ্ন। কল্যাণীর সারা অন্তর জড়িয়া আজ যে হাহা-কার—তাহার রেহের সমস্ত প্রাণশক্তিকে নিঃশেষে শোষণ করিয়া লইতে চাহিতোঁহিল তাহার তুলনা নাই। তাহার সমস্ত অনুভূতি যেন স্তম্ভ হইয়া গিয়াছে—চিন্তায় চিন্তায় মন তাহার একেবারে বিকল হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ পাঁচশটি বৎসর—কোন অজানা দেশ—কোন ভয়ঙ্কর স্থানে কেমন করিয়া তাহার দিন কাটবে? কত অভ্যাস-চার হইবে তাহার উপর—জেলের কয়েদী সে—নির্মমভাবে তাহাকে দিয়া কত না কাজ করাইয়া লইবে—যান ঘরাইবে—যাঁতা পিঁপাইবে—আরো কত কি? এমনি করিয়া কি সে বাঁচবে? আর কি কখনও ফিরিয়া আসিবে? তাহার অন্তরের ভিতর হইতে যেন বারে বারে কে হাহাকার করিয়া বলিয়া উঠিতে লাগিল—না আর সে ফিরিয়া আসিবে না—এই শেষ—এই শেষ। এমনি করিয়া ভাবিতে ভাবিতে সেই-খানে বসিয়াই কল্যাণী কখন ঘুমাইয়া পড়িল—

ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিল—অসিতকে যেন কোন এক দেশে লইয়া গিয়াছে—সেখানে চারিদিকে কেবল বন—দলে দলে বাঘ ভাঙে, বিকট চেহারা সব লোক, তাহারা অসিতকে মারিতেছে—অসিতকে দিয়া কাঠ কাটাইতেছে, অসিত যেন যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁদিতেছে। হঠাৎ কল্যাণীর ঘুম ভাঙিয়া গেল। খানিকক্ষণ স্তম্ভ হইয়া বসিয়া স্বপ্ন-কথা স্মরণ করিয়া সহসা মেঝের লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অজয়ের ঘুম গেল ভাঙিয়া—সে তাহার বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—ওমা—মাগো—তুমি ঘুমোওনি কেন? ওঠো মা—লক্ষ্মী মা : তুমি কাঁদলে আমার যে কান্না পায় মা! কল্যাণী চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল—খানিকটা সামলাইয়া লইয়া কি ভাবিয়া যেন অজয়কে বলিল, অজয় বাবা!

—কেন মা?

—তুই ঠাকুর দেবতাকে ডাকতে পারিস বাবা! খুব মন দিয়ে খুব ভাল করে ডাকতে পারবি বাবা?

অজয় ঘাড় নাড়িয়া বলিল—হাঁ, মা, আমি রোজ মনে মনে বলি—হরিঠাকুর, আমার বাবাকে ভাল রেখো—আমাদের সবাইকে ভাল রেখো।

—কে তোকে ডাকতে শিখিয়ে দিল অজয়?

—দিদিমা শিখিয়ে দিয়েছেন মা!

—আজ থেকে রোজ খুব মন দিয়ে তাঁকে ডাকবি—বলবি তাঁকে যেন হরিঠাকুর ভাল রাখেন—আবার তাড়াতাড়ি দেশে ফিরিয়ে আনেন।

অজয় বলিল—এখন ডাকবো মা?

—আয় বাবা দুইজন একনগে বসে ডাক। তারপর অজয় তাহার মায়ের দেখাশোনা চোখ বুজিয়া হাতবোঁড় করিয়া বসিয়া মনে মনে তাহার হরিঠাকুরকে ডাকিতে লাগিল।

### চিৎরং অধ্যায়

পার্লিন অনেকখানি বেলা হইবার পর সিটি দিয়া জাহাজ ছাড়িল। জাহাজের গারে গোলাকার বস্তুগুলি বুড়ি-পাঁচিশ ইঞ্চি পরিধির ছিদ্র ছিল—ছিদ্রগুলির মুখে এক একখানি করিয়া কাচের ঢাকনি—সেগুলির ভিতর দিয়া বাহিরের দৃশ্য চোখ পড়ে। এগুলিকে “লুকফোল” বলে। জাহাজ ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই অনিত তাহার একটি “লুকফোল”এ ভিতরে মুখ দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কতকটা এমনি করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার খেয়াল যে—যখন সে চোখ ভাঙিল, তখন কলিকাতার বাহিরের চোখের অন্তরাল হইয়া কিছু একখানি বোধ হয় বজবজ—তারপর গগার ধারে

বৃক্ষপ্রণয়ী শ্যামল নীলিমায় তাহার দুই চোখ ভরিয়া উঠল। তাঁর প্রত্যেকটি তরলতা যেন তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছিল—দূরের ঘাটে ঘাটে অসংখ্য নরনারী স্নান করিতেছে—ছেলো জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মাতামাতি করিতেছে। তাঁর কাছ ঘেঁসিয়া থাকে ঝাঁকে বক, গাঙ্গাচিল, শালিক উড়িয়া বেড়াইতেছে। কোথাও ভাঙ্গন ধরিয়াছে—উঁচুপাড় ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া জলের ভিতরে ছিটকাইয়া পড়িয়া আবারে সৃষ্টি করিতেছে। দাদা ফেনার পুঞ্জ সৃষ্টি হইয়া স্রোতের টানে ভাসিয়া চলিয়াছে। কোথাও দুই চারিখানা বাড়ির চোখে পড়িতেছে—সেখানে গৃহস্থের নিত্যকার গৃহকর্ম চলিতেছে। এদিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে অসিতের মন এক অভূতপূর্ব উত্তেজনা ভরিয়া উঠিল। এই তাহার দেশ—ইহার প্রতিটি নরনারী তাহার কত না আত্মীয়—প্রতিটি পশুপক্ষীর সহিত তাহার পরিচয়—প্রতিটি বৃক্ষলতা পর্যন্ত তাহার অন্তরের বস্তু—ইহার ধূলিকণা তাহার কাছে সর্বগোচর। তাঁর একটি স্থানে মোহন্য কয়েকটি শিশু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কলরব করিতেছিল—ভাল করিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না—তবু অসিত যতক্ষণ দেখা যায় একদৃষ্টে সেইদিক তাকাইয়া রহিল। তাহার মনে পড়িল অঞ্জুর কথা—সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়িল কল্যাণীর কথা। তাহাদের আর হয়তো সে এজীবনে দেখিবে না! এই সবে অঞ্জুর বয়স আট বৎসর চলিতেছে। অসুখ বিস্ময়ে কে দেখিবে তাহাকে? লেখাপড়ায় চিরগঠনে কে তাহাকে বরষা পরিচালিত? এই সমস্ত দায়িত্বের সব চাইতে বড় অংশ যাহাকে বহন করিবার কথা, এমন করিয়া সে আজ চিরদিনের মত দেশ ছাড়িয়া চলিয়াছে নির্বাসনে। সহসা মনে সেখানে দাঁড়াইয়াই, দুই চোখ বুজিয়া মনে মনে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাইতে লাগিল—হে ভগবন, অঞ্জুর আমার ভাল রাখিও। তাহাকে শিক্ষায় দীক্ষায় মানুষ করিয়া তুলিও। কিন্তু সহসা তাহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল—এই যে দেশ—যেখানে সহস্র নাগপাশের বশন মানুষকে প্রতিনিয়ত অমানুষ করিয়া তোলে—সেখানে সত্যিকারের মানুষ হইবার তো দুঃখের অন্ত নাই। যেখানে চারিপাশে অন্যায় অত্যাচার দুঃখ দুর্দশা, সেখানে সত্যিকারের মানুষ তো প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারে না। সে পুনরায় মনে মনে বলিতে লাগিল—হে ভগবন তাই হোক—অঞ্জুর আমার তেমন মানুষই হোক—অত্যাচারের বিরুদ্ধে সেও মাথা তুলে দাঁড়াক—আমি এতটুকু দুঃখও পাব না। যে গৃহস্থের দল ক'র হাতি দিয়া সে সাধনায় এক-সিঁধন করুক!

সহসা তাঁর মনে হইল—সে এই দলের নায়ক, কে তাহাকে তাহা তো তাহাকে

দেখিতে হইবে। “লুফোল” হইতে মুখ ফিরাইয়া ভিতরের দিকে তাকাইয়া দেখিল—দলের সকলেই একপ্রকার বেশ সামলাইয়া লইয়াছে। মাঝখানে কম্বল পাতিয়া জন আটেক গোল হইয়া বসিয়া পড়িয়াছে। যদুনাথ কিছু কিছু জ্যোতিষ জানিত—হাত দেখিতে পারিত—তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া সকলে ঘিরিয়া বসিয়া যে যাহার হাত বাড়াইয়া ধরিয়াছে। যদুনাথ পরম গম্ভীর হইয়া ভূত ভবিষ্যৎ বলিয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে দুই চারিটি রসিকতা করিয়া সকলকে হাসাইয়া তুলিতেছে। মহেশের বৃদ্ধি একটু মোটা—সকলে যখন তখন তাহার সহিত ঠাট্টা তামাসা করিত। যদুনাথ তাহার হাত দেখিয়া বলিল—তুই বোটা আর দেশে ফিরে আসবিনে, আন্দামানে একটা বার্মিজ মেয়ে বিয়ে করে কয়েদীর বংশ বৃদ্ধি করতে থাকবি। তাহার মন্তব্যে একটা হাসির হুন্স পড়িয়া গেল। কেহ কেহ মহেশের হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া নিয়া হ্যান্ডসেক্ করিয়া বলিল—তোরা নৌভাগ্যে অভিনন্দন জানাচ্ছ মহেশ—এক কথায় বাক বলে গোভাগি—এমন কয়জনের ভাগ্যে ঘটে বলতো?

অন্যজন বলিল—তাহলে তুই শব্দুরবাড়ি যাচ্ছ—কে বলে স্বপীপতর?

আর একজন বলিল—আমরা তাহলে বরষাদ্রী?

মহেশ বলিল—ইস, তাই কখনও হয়? তোরা সব গাভীখরী!

উমেশ বলিল—কেন হবে না শূনি? সেখানে বার্মিজ মেয়েছেলের যে ছড়াছড়ি জানিসনে, রহস্যবোধের কাছে যে!

যদুনাথ ততক্ষণ ভবেশের হাত লইয়া পড়িয়াছে। কিছুক্ষণ পরীক্ষা করিবার পর বলিল—তোরা ভাই পাঁচ ছয় বৎসর পর দেশে ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে—খুব সম্ভব মুক্তি পেতে পারিস—নাও পারিস।

প্রমথ বলিল—আমাদের দেশে একটা কথা আছে—বিন্নে তল তল বান' তোরা দেখছি তেমনি হলো।

যদুনাথ জিজ্ঞাসা করিল—কি রকম?

প্রমথ হাসিয়া জবাব দিল—আচার্যমশাই বোশেখ মাসে চাষাদের কাছে বর্ষফল বলে বেড়ান—বান কেমন হ'বে—ফসল কেমন হবে—জলে মাছ থাকবে কি পরিমাণ—এই সব।

চাষারা জিজ্ঞেস করলো—বান এবার কেমন হবে আচার্যমশাই?

আচার্যমশাই অনেক ভেবে চিন্তে বললেন—এবার ‘বিন্নে তল তল বান’।

চাষারা বুঝলো যে, এবার এমন বান হ'বে যে বিন্নে অর্থাৎ বেনার ঝোপ ডালিয়ে যাবে। সুতরাং ফসলও ভাল হ'বে।

আচার্যমশাই নিশ্চয় পেলেন বড় করে। কিন্তু বর্ষা এলে দেখা গেল সেবার বর্ষা মোটেই

হলো না। চাষারা রাগ করে এসে আচার্যমশাইকে ধরলো—তবে যে বলেছিলেন, ‘বিন্নে তল তল’? বর্ষার জল গেল কোথায়? আমাদের সঙ্গে ফাঁকি নাকি?

আচার্যমশাই হেসে বললেন—সাধে কি তোদের চাষা বলে সব? কথার মানে বুঝিনে—রাগ করবি শূন্য। বলেছিলাম যে ‘বিন্নে তল তল বান’ অর্থাৎ বিন্নে ঝোপের নীচে মাঠ জল আসবে অর্থাৎ বর্ষা এবার মোটেই হবে না।

চাষারা ভাবলো—তাই তো আচার্যমশাইতো ঠিকই বলেছেন—তারা বুঝতে পারিনি। তোরও হয়েছে তেমনি। সকলে আর এক চোট হেসে উঠলো। রামপ্রসাদ মিশর পালোয়ান ব্যক্তি, সময় ও সুযোগ পাইলে সে যেখানে সেখানে দুই-চারিট ডন্ বৈঠক দিতে ছাড়ে না—বিরাত তাহার শরীর—বিরাত তাহার আহার। জেলখানায় সব চাইতে সেই বেশী অসুবিধায় পড়িয়াছে। তাহার দিকে অসিতের নজর পড়িতে দেখিল—সে একপাশে নিজের চোট কাপড়খানার খানিকটা ছিড়িয়া লইয়া একটা লাঙল তৈরী করিবার পরিকল্পনা করিতেছে। অসিতের দিকে নজর পড়িতেই হাসিয়া বলিল—একটা লাঙলের যোগাড় করছি দাদা—দিব্য সমুদ্রের হাওয়ায় কসে দু'চারটে ডন্ বৈঠক দেওয়া যাবে কি বলেন? অসিত হাসিয়া সম্মতি জানাইল। যতীন এক পাশের শিক ধরিয়া ওপাশের সাধারণ কায়কজ্ঞ কয়েদীর সহিত গল্প জমাইয়া লইয়াছে। কিন্তু সহসা সুধীরের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে একেবারে চমকিয়া উঠিল—তাহার কি হইল? সকলকে পরিহার করিয়া সে একেবারে এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহার মুখ যেন উঠিয়াছে একেবারে শুকাইয়া। বয়স তাহার এই মোটে পনের, ষোল। গতবার কোন এক মফঃস্বল ইস্কুল হইতে আসিয়া কলেজে ভর্তি হইয়াছিল। ছেলটি ঘাবড়াইয়া গেল নাকি? অসিত তাহার নিকট বসিয়া পড়িয়া ধীরে ধীরে তাহার কাঁধের উপর একখানা হাত রাখিয়া বলিল—এমন একলাটি চুপ করে বসে কি ভাবছিস্ ভাই? মন খারাপ লাগছে? কিছুক্ষণ সুধীর কোন কথারই জবাব দিল না পরে সহসা উত্তোজিত হইয়া বলিয়া উঠিল—মনের কথা বলছেন হাঁ, মন খারাপ হয়েছে হইকি দাদা? তাই বলে ভয় আমি পাইনি। কিন্তু এর চেয়ে ফাঁসি হলেও যে আমি হানুতে হানুতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে পারতাম। যাদের শাসন মানবো না—যারা অত্যাচারী—উঠতে বসতে এই পঁচিশটা বছর ধরে কেমন করে তাদের অত্যাচার সহ্য করবো দাদা? এতে যে নিজের আত্মার অপমান!—নিজের দেশের অপমান! আমি এমনি করে এ অত্যাচার সহ্য করবো না—বন্দীর আইন কানুন—জেলের

কোন আইন কানুন কিছুই মানবে না—একা একা যুদ্ধ করে মরবে। তাহার এই উদ্ভেজনায় যে যাহার কাজ তুলিয়া উৎসুক দৃষ্টিতে তাহার নিকে তাকাইয়া রহিল।

ভবিষ্যতের আশায় তাহাদিগকে বাঁচিতে হইবে—হইলই বা পঁচিশ বৎসর—তাহার পরও তো তাহারা ফিরিয়া দেশের কাজ করিতে পারে—সেই আশায়ই তো সব অপমান সব দুঃখকষ্ট নীরবে মৃদু বজিয়া সহ্য করিতে হইবে। এমনি অনেক সাম্ভার কথা বলিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া বুঝাইয়া অনিত তাহাকে কতকটা শান্ত করিল। তাহার পর স্নান করিয়া চিনি ও তেঁতুল দিয়া চিড়া খাইয়া কম্বল পাতিয়া যে যাহার মত শুইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার পূর্বে তাহাদিগকে একঘণ্টার জন্য বেড়াইতে ডেকে লইয়া যাওয়া হইল। বাহিরে আসিয়া হঠাৎ তাহাদের মনে হইল—এই বুঝি তাহারা সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছে—পশ্চিমের দিকে তাকাইয়া কোথাও স্থলের কিছুই তাহাদের চোখে পড়িল না—কেবল ধু ধু করিতেছে নীলজল। জাহাজ গঙ্গার পূর্বধার ঘেসিয়া চলিতেছিল—নেদিকে দৃষ্টি পড়িতেই বহুদূরে নীলরেখার মত স্থলের শেষ চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল। জাহাজের ডাক্তার তাহাদের সঙ্গে ছিলেন তিনি অগাধ নীর্দেশ করিয়া জানাইলেন যে বহুদূরে বেলাভূমি দেখা যায়, এখানে প্রতি বৎসর গঙ্গাসাগর মেলা বসে—এ কিপল মূনির আশ্রম। জাহাজ এইবার সমুদ্রে আসিয়া পড়িল আর কি! অসিতদের চোখের সম্মুখ হইতে সেই অস্পষ্ট নীলরেখা ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া যাইতে লাগিল। তাহারা দৃষ্টির অন্তরাল হইবার আগে শেষবারের মত দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া জন্মভূমির উদ্দেশ্যে শেষ প্রণাম জানাইয়া লইল। সেই শ্যামরেখা বখন একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল তখন তাহারা ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে চোখ ফিরাইয়া তাকাইল। সমুদ্রের এক অভাবনীয় দৃশ্য উঠিল অসিতের সম্মুখে ফটিক রাশি রাশি নীলজলের ডেউ—সীমাহীন সংখ্যাহীন—আর তাহারই ঠিক উপরে তপ্তকাণ্ডনথালির মত অস্তগামী সূর্য কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। তাহারা সকলেই অপজক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল—নীলজলের ডেউয়ের মাথায় মাথায় কোন এক অদৃশ্য হাত যেন মূঠা মূঠা আঁবির ছড়াইয়া দিতে লাগিল। মাত্র অল্প খানিকটা সময়—তাহার পরেই স্তাৎ এক সময় সেই স্বর্ণথালিখানা যেন ঝপ করিয়া সমুদ্রের জলে ডুব মারিয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল। একটা অতি তরল অন্ধকারের পর্দায় সমস্ত সংসার আবৃত হইয়া উঠিল। দূর সমুদ্রে, চারিপাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত বহুসংখ্যক নীল লাল আলো বারে বারে জ্বলিতে আর নিভিতে লাগিল। ডাক্তারবাবু বলিলেন—এগুলা

“লাইট পোস্ট”, এগুলা দেখে জাহাজের পথ ঠিক করা হয়। ঐ যে লাল আলো, ঐ আমাদের পথ—ঐ মাদ্রাজের—ঐ বোম্বাইয়ের এমনি আরও কত। নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইলে—তাহাদিগকে পুনরায় জাহাজের খেলের ভিতরে লইয়া আসা হইল। রাশির মত আহার করিয়া তাহারা গল্প গুজব করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। ইতিমধ্যে যেন জাহাজের মাথা একেবারে বিগড়াইয়া গেল—জাহাজ খোলাম কুচির মত অসহায়ভাবে দুর্গলিতে লাগিল। বগোপসাগর নাম হইলে হইবে কি—বাঙালী জাতটার সহিত তাহার কোথাও একটুও মিল নাই, এমন উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল সাগর নাকি খুব কমই আছে। বিশেষত এই সময়টাও ভাল নয়।

অসিতেরা তাড়াতাড়ি যে যাহার মত শুইয়া পড়িল—কেহ নেবুর জল পান করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও রেহাই নাই—জাহাজের সে সোপানী একটুও থামিল না—সারারাত্রি তেমনি চলিল—সকালের দিকেও কিছুমাত্র কমিবার লক্ষণ দেখা গেল না। অনিত বুঝিল ইহাই স্বাভাবিক অবস্থা—বাকী কয়দিন তাহাদের এমনি করিয়াই কাটাইতে হইবে। অসিতের নিজের মাথা বারে বারে ঘুরিয়া উঠিতেছিল। অতিকণ্ঠে উঠিয়া কয়েকবার লেবুর রস পান করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। কিন্তু সংগীদের সাত আউজনের অসুখা উঠিয়াছে অভ্যস্ত কাহিল হইয়া। সকালবেলা দেখা গেল, বমি করিয়া আরও অনাবদ বৃকর্ম করিয়া তাহারা সারা গায়েও কাপড় চোপড় মাখাইয়া জাহাজের মেঝের অসহায়ভাবে দেহ এলাইয়া দিয়াছে। যদুনাথ বাহাজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়াছে—আরও কয়েকজন তাহারই পাশে তেমনি করিয়া গড়াইতেছে। প্যালেয়ান রামপ্রসাদ কিসিয়া সের খানেক চিড়া গোপ্রেসে গিলিয়া ফেলিয়াছিল—কিন্তু সারারাত্রি ধরিয়া সূদ্রে আসলে তুলিয়া দিয়া তাহারই মাঝে লেপটিয়া পড়িয়া আছে—আর মাঝে মাঝে শব্দ বলিতেছে—এ ভাইয়া—ভাইয়া হো—আরে মরাগিয়া রে ভাইয়া, আরে শির তো.....

ক্রমে বেলা হইলে কেহ কেহ উঠিয়া বসিল। যতীন, সুধীর, মহেশ এরা কয়েকজন অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। কিন্তু রামপ্রসাদের অবস্থার কোনই পরিবর্তন হইল না, যতীন রহস্য করিয়া বলিল—আরে এ মিশরাজ দুচার ঠো ডন্ দি জীয়ে না—দুচার ঠো বৈঠক খিঁচিয়ে না! রামপ্রসাদ একে নিজের জুলায় বাঁচিতেছিল না—তাহার উপর এই রসিকতার—জুলায়া উঠিয়া—আরে তোর—বলিয়া গালাগালি সুরু করিয়া দিল। যতীন ও অন্যান্য সকলে এত কণ্ঠেও হাসি চাপিতে পারিল না।

উমেশ বলিল—নেহি ভাই, আউর সের ভর

চিড়া খা লেও.....। রামপ্রসাদেরও গালাগালির মাথা তেমনি বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এমনি করিয়া চার দিন চার রাত্রি কাটিবার পর সৌন্দর্য তাহাদিগকে ডেকে বেড়াইতে লইয়া আসিলেন তাহারা দক্ষিণে, বামে, সম্মুখের দিকে তাকাইয়া একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেল। তাহাদের চারিপাশে ছোট বড় অসংখ্য স্বীপ—এক একখানা অতিকার কারুকাষ্ময় নীল রঙে আঁকা ছবিতে যেন সমুদ্রের মাঝে আঁটিয়া রাখিয়াছে। উত্তাল সমুদ্র ছাড়াইয়া কখন যে তাহারা এই স্বীপপুঞ্জের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই। প্রায় সর্বত্রই দুইপাশে ছোট বড় স্বীপ। মাঝখানে দিয়া জাহাজ চলিতেছে—মনে হয় এ যেন কোন বড় নদীর ভিতর দিয়া তাহারা চলিয়াছে। কোন কোন স্বীপে ছোট ছোট পাহাড় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সর্বত্র অসংখ্য নারিকেল গাছ। নারিকেল গাছের নীচে নীচে মেঝানে সেখানে অসংখ্য আনারস গাছে আনারস ফলিয়া রহিয়াছে। জাহাজ হইতে উহারা কতদূরে তাহা অনুমান করিবার উপায় নাই—পাহাড়ের দূরত্ব অনুমান করা সহজসাধ্য নহে। মাঝে মাঝে বিরাট বিরাট নামানজানা বৃক্ষসকল মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অসিতেরা সেই ডাক্তারবাবুর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল—এই সব স্বীপে বহু কাঠের কারখানা আছে—এখান হইতে বহু কাঠ ভারতবর্ষে চালান হইয়া যায়। কোথাও বা নারিকেল তেলের কারখানা। এমনি সব দেখিতে দেখিতে তাহারা একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেল। মাঝে মাঝে তাহাদের জাহাজের আশপাশ দিয়া মোটর লগ্ন ছুটিয়া চলিয়াছে। বড় বড় ইংরেজ কোম্পানী এখানে আদ্যা বাবসা ফাঁদিয়া বাসিয়াছে। কয়েদী ও কয়েদীর বংশধরেরা এখানকার মজুর। কিছু দূর যাইতে ডাক্তারবাবু সমুদ্রের দিকে আগুলা তুলিয়া বলিলেন—ঐটির নাম “রস্ আইল্যান্ড”। এতক্ষণ ধরিয়া তাহারা সে সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে আসিয়াছে তাহার তুলনা নাই—তবু সমস্ত সৌন্দর্যকে যেন হার মানাইয়াছে এই “রস্ আইল্যান্ড”। তাহারা কথারি না করিয়া সেই ছোট স্থানটির সৌন্দর্য দুই চোখ ভরিয়া পান করিতে লাগিল।

ডাক্তারটি বলিলেন—এইখানে আশামানের সমস্ত ইউরোপীয় কর্মচারীরা বাস করেন।

অনিত মনে মনে বলিল—হইবে না কেন? জগতের যত শ্রেষ্ঠ জিনিস হয় দেবতার না হয় দানবে ভোগ করিবে! ডাক্তারটি পুনরায় আগুলা তুলিয়া দেখাইলেন—ঐ যে সামনে “এবারডিন আইল্যান্ড” যে আশামানের জেল—ঐ জেলের টাওয়ার দেখা যায়। দূরে “এবারডিন দ্বীপ” ও জেলের টাওয়ারের চড়া তাহাদের চে

(জমশ)



উই-পুরী ও তার ভিতরকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা প্রণালী অতিশয় রহস্যময়। ওদের আনাগোনা চলাফেরা আমরা খুব কমই দেখতে পাই, কিন্তু ওদের ধর্মসম্পর্ক আমাদের চোখের সামনেই চলছে অবিরত। ওদের জীবনযাত্রা প্রণালী পর্যবেক্ষণ করবার প্রধান অস্ত্রায় ওদের মাটির তলার অন্ধকার পুরীটি। উই-টিবিকে আমরা অনেক ওদের বাসা বলে মনে করে থাকি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উই-টিবি ঠিক উইয়ের বাসা নয়। বাসা তৈরীর জন্য মাটির তলায় ওদের অনেক গর্ত, অনেক সুরঙ্গ, অনেক কুঠরী প্রভৃতি তৈরী করতে হয়। তার মাটি উপরে তুলে ওরা টিবি মতো করে তৈরী করে। এই টিবির আড়ালে মাটির তলায় ছোট বড় নানা আকারের কুঠরী ও সুরঙ্গের ভিতরে ওদের যথাযথ বাসা। সেই অন্ধকার পুরী হতে ওরা উপরে উঠে আসে খুব কমই। আহা! অশেষগের জন্য যখন ওদের মাটির তলা থেকে উপরে উঠে আসতে হয় তখনো ওরা নরম মাটির আবরণে নিজেদের সর্বদাই ঢেকে রাখে। কোথাও কোনরূপে একটু বাধা পেলেই বা মাটির সে-আবরণ একটু ভেঙে গেলেই ওরা সুর সুর করে বাসার সুরঙ্গের ভিতরে ঢুকি যায়। সকলের ভিতরে ঢোকা হ'য়ে গেলে সুরঙ্গের মুখটি দিয়ে মাটি দিয়ে বন্ধ করে। সুরঙ্গের মুখটি বন্ধ করতে ওরা কখনো ভোলে না। তারপরেই আরম্ভ হয় সংস্কার কার্য।

কিন্তু এত সতর্কতা সত্ত্বেও মানুষের কৌতূহল দৃষ্টি ওরা একেবারে এড়াতে পারেনি। বিজ্ঞানী তাদের সেই অন্ধকার কুঠরীতেও দৃষ্টিপাত করে তাদের জীবনযাত্রা প্রণালীর রহস্য উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করেছেন এবং অনেক বিষয়ে কৃতকার্যও হয়েছেন।

উই-পুরীর সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য বিষয় রাণীর জীবন কাহিনী। উই-পুরীর রাণী বাস করে মাটির তলায় পুরীর মধ্যে ছোট একটি অন্ধকার গুহায়। রাণীর গুহা বা কুঠরীটি তৈরী হয় বিশেষভাবে রাণীরই জন্য। অর্থাৎ তার মধ্যে রাণীর সঙ্গে রাজা মহাশয়ও বাস করেন। ছোট কুঠরীটি চারদিকে মাটির শক্ত দেয়াল দ্বারা বেষ্টিত। সে মাটি সিমেন্টের মতো মজবুত। সমস্ত কুঠরীটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তকতকে বকতকে কোথাও একটু

বাতির কণাও থাকতে পারে না। দেয়ালের এক ধারে ছোট একটি ছিদ্র, সেটি দরজা। তার ভিতর দিয়ে ক্ষুদ্রাকার কর্মী বা সেবিকার দল কুঠরীর ভিতরে সহজেই যাতায়াত করতে পারে, কিন্তু রাণীর দেহ তার ভিতর দিয়ে গলে আসবার সাধা নেই। রাণী যতদিন বেঁচে থাকে বন্দীর ন্যায় তাকে সেই কুঠরীতে বাস করতে হয়। কর্মী বা সেবিকার দল তাকে খাওয়ায়, সবলে জিব দিয়ে ঢেটে ঢেটে তার



একটি উই টিবি

গা পরিষ্কার করে দেয়। কর্মীদের মধ্যে এক দলের বিশেষ কাজ রাণীর ডিমগুলিকে বাসার ভিতরে অন্য সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। রাণীর পরিচর্যা ও ডিমগুলি সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য যারা সর্বদা নিযুক্ত থাকে সেরকম কর্মীর দলের সংখ্যা নিত্যন্ত সামান্য নয়। তার উপর আছে পাহারার জন্য একদল রক্ষী সেনা। এদের আনাগোনা যাতায়াতে রাণীর কুঠরীটি সর্বদাই কর্ম বাস্তবায়ন চণ্ডল হ'য়ে থাকে। তার মধ্যে রাণী থাকে নিজে স্থির অচঞ্চল হয়ে। একইভাবে সে দিনের পর দিন সেই কুঠরীর মধ্যে পড়ে থাকে, তার দেহে কোনরূপ সড়া নেই, এক মহতের জন্যও তাকে এপাশ ওপাশ হতে দেখা যায় না। তার এই অসাড় জড়বৎ দেহের মধ্যে তার প্রাণের লক্ষণ শূন্য দেখতে পাওয়া যায় পুরীর বংশ-

বৃদ্ধির চেষ্টার মধ্যে। রাণী যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন সে অবিরত ডিম প্রসব করেই চলে। খুব কম হলেও রাণী একাই দিনে প্রায় ৩০,০০০ মতো ডিম পাড়ে। এক বৎসরে একটি রাণী হতে প্রায় এক একটি পুরীর মধ্যে প্রায় কোটিরও অধিক ছানার জন্ম হয়। সুতরাং উইয়ের উপরবে মানুষকে যে সর্বদা বাতাবাস্ত হ'য়ে থাকতে হবে তাতে আর আশ্চর্য কি!

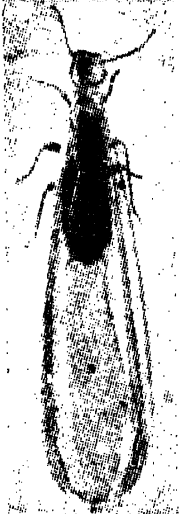
আমরা রূপক হিসেবে রাণীকে মা-জননী নামে অভিহিত করে থাকি। উই-পুরীর রাণী তার প্রজাবৃন্দের রূপক হিসেবে মা নয়। সে যথাযথই সকলের গর্ভধারিনী জননী। উই-পুরীর প্রত্যেকটি অধিবাসীর জন্ম উই-রাণীর ডিম হতে। সুতরাং এত যার সন্তান-সন্ততি তার আর খাওয়া-পারার ভাবনা কি? সন্তানের দল দিনরাত্রি তার পরিচর্যা নিযুক্ত। রক্ষীদল সারবন্দী হয়ে দিনরাত্রি তাকে পাহারা দেয়। রাণীর পরিচর্যা ও কাজকর্মের জন্য যেসব কর্মীদল রাণীর কুঠরীতে ঢোকে বা বার হয় তাদের সকলের উপরেই রক্ষীদলের কড়া নজর। সর্বদা এই আনাগোনা যাতায়াতের মধ্যে শত্রুপক্ষীয় কেউ-না-কেউ তো গা-ঢাকা দিয়ে ঢুকে যেতে পারে! সেরকম কোন সন্দেহের কারণ ঘটলেই রক্ষীদল ছুটে আসে সৈদিকে। মহতের মধ্য মূখের দুই নোটা দাড়া দিয়ে শত্রুকে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

উই-পুরীর রাণীর প্রত্যেক কুঠরীতে রাণীর সঙ্গে থাকে একজন করে রাজা। রাজার গৌরব শূন্য তার অলসভাবে জীবনযাত্রার মধ্যে। রাজাকেও রাণীর ন্যায় পুরীর মধ্যে কোন কাজকর্ম করতে হয় না। কর্মীরাই ওকে খাওয়ায়। দিনরাত্রি তাকে রাণীর সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হয়। প্রজাবৃন্দের ন্যায় রাণীর প্রতি রাজারও আনুগত্য অসীম। রাণীকে এক মহতের জন্যও একা রেখে রাজা কোথাও যায় না। কিন্তু রাণীর মতো তাকে অসাড় জড়বৎ হয়ে বাস করতে হয় না। কুঠরীর ভিতরে সে তার ইচ্ছামত চলাফেরা করতে পারে। কিন্তু কুঠরীর বাইরে আসতে পারে না। রাণীর কোন রকম বিপদে রক্ষীদলের সঙ্গে শত্রুর সঙ্গে সেও লড়াই করে। অনেক সময় রাণীর জীবন সংস্কার জন্য রাজা মহাশয় নিজের প্রাণ দিতেও

স্থাপিত হয় না। এমন পরিবর্তন একনিষ্ঠ স্বামী জীব-জগতে খুব অল্পই দেখতে পাওয়া যায়।

পুরীর ভিতরে আজ যে রাজা ও রাণী, প্রথমাধিই যে ওরা রাজা রাণী ছিলো তা নয়, রাজা ও রাণী হবার পূর্বে এরা দুজনেই ছিলো পুরীর সামান্য একজন অধিবাসী। কিন্তু বর্তমান পুরীতে নয়, অন্য একটি পুরীতে। প্রথমাধি প্রতিনিয়তই নতুন উইপুরীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় রাজা ও রাণীর স্বারা।

রাজা ও রাণী হবার পূর্বে এদের দুজনেই চেহারা ছিলো ভিন্নরূপ। উভয়েরই পিঠে ছিলো অতিশয় হালকা ফিনিকিনে



জানমুড় স্ত্রী উই। একমাত্র এদেরই সন্তান জন্মাবার ক্ষমতা আছে

ধরণের দুজোড়া ডানা। আয়তনেও এরা কর্মীদের অপেক্ষা অনেকটা বড়। এরা মাত্র দুটি নয়, প্রতি পুরীতে এইরূপ রাজা ও রাণী জাতীয় বহু উই বাস করে। প্রথমাধিই পুরীর ভিতরে এদের কোন রকম কাজকর্ম করতে হয় না। এরা শুধু বাসার বসে বসে খায়, খাবার এনে দেয় কর্মীরা। ওদের মুখের দাড়া কাঠ বা অন্যান্য শক্ত জিনিস কাটবার উপযোগী নয়। কাঠ প্রভৃতি শক্ত জিনিস খেয়ে ওরা হজমও করতে পারে না। এই সব শক্ত জিনিস হজম করার জন্য কর্মীদের পেটের ভিতরে থাকে এক জাতীয় জীবাণু। এই জীবাণুর সাহায্যে কর্মী উই তাদের খাবার হজম করে। কর্মীরা যে খায় খায় তাই হজম হবার উপযোগী করে পেট হতে উপগীরণ করে রাজা রাণী ও সেই জাতীয় অন্যান্য উইদের খাওয়ায়।

রাজারাণী ও সেই জাতীয় উইপোকরাই পুরীর মধ্যে একমাত্র স্ত্রী ও পুরুষ। অন্যেরা সকলেই অপরিণত স্ত্রী পুরুষের দল। ওদের

কারোর সন্তান জন্মাবার ক্ষমতা নেই। পুরীর মধ্যে ওরাই হচ্ছে কর্মীর দল, বাসার যাবতীয় কাজ ওরাই করে, ওদের সংখ্যাই বাসার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি। স্ত্রীপুরুষের দল বাসার ভিতর হাতে বের হয় না, জীবনে একবার মাত্র এরা পুরী হতে বাইরে বের হয়ে আসে। এ সময়টি ওদের জীবনের পক্ষে একটি মহা-সম্বন্ধক। কারণ এই সময়েই ওদের স্ত্রী-পুরুষের মিলন ঘটে। অনেকে এ সময় প্রাণও হারায়। চিরজীবন পুরীর ভিতরে অন্ধকারে বাস করলেও ওদের স্ত্রীপুরুষ মিলন ঘটে পুরীর বাইরের আলো বাতাসের মধ্যে। পুরী হতে বের হবার সময় হবামাত্র পুরীর ভিতরে যেখানে মত স্ত্রীপুরুষ আছে সব এসে দলে দলে জড় হয় পুরীর সদর দরজাটির মুখের কাছে। সমস্ত পুরীর মধ্যে জেগে ওঠে এক গভীর উত্তেজনা। সেই উত্তেজনায় কর্মীরা যায় ওদের কাজকর্ম ভুলে, রক্ষীদল এদিক ওদিকে কেনন ব্যাকলভাবে কেবলি ছুটোছুটি করতে থাকে। স্ত্রীপুরুষের দল শেষ আদেশের অপেক্ষায় পুরীর মুখটির কাছে ভিড় করে থাকে। কার আদেশ সে ওরাই জানে। হঠাৎ এক সময় দেখতে পাওয়া যায় দলে দলে স্ত্রী-পুরুষের দল পুরীর ভিতর হতে বের হয়ে আসছে। বাইরে বের হবার জন্য সকলের মধ্যে তখন সে কী ব্যগড়া। কে কার আগে বের হবে সেজনা দরজার মুখে সে কী ভিড়, সে কী উত্তেজনা। রক্ষীদল আজ তাদের আর বাধা দিচ্ছে না। আজ তাদের জন্য পুরীর মুখ খোলা। পুরী হতে বের হতেই স্ত্রীপুরুষের দল ডানা মেলে উপরে আকাশের নিকে উড়ে চলে। উপরে আকাশে উঠে বাইরের আলো হাওয়ার মধ্যে নিজেনের দেয় ছেড়ে। তাদের দেখে মনে হয় ওদের জীবন বেন আজ উল্লাসে আনন্দে পরিপূর্ণ। কিন্তু এ উল্লাস এ আনন্দ কতক্ষণের জন্য। ওদের মহাত্মকাল পূর্বেও কি জানতে পারে এই উল্লাস এই আনন্দের পরিণতি কোথায়? ওরা কি জানে বাইরের আলো বাতাসের মধ্যে আজ এই ওদের প্রথম ও শেষ পরিচয়? উপরে আকাশে ওদের জন্য যে বিরাট ধ্বংস অপেক্ষা করে আছে সে কথাটি কি ওরা এক মূহুর্তের জন্যও জানতে পেরেছে? ওদের নিজের পুরীর দরজা আজ তাদের নিকট বন্ধ, সেখানে আর ওরা প্রবেশ করতে পারবে না—অন্য পুরীতেও ওদের স্থান নেই, সেখানে বড় পাহাড়। অন্য পুরীর কাছে ওরা বিদেশী। উইপুরীর ভিতরে কোন বিদেশীর স্থান নেই। তাহলে ওরা কি করবে? কোথায় যাবে? ওদের দাবার জায়গা পূর্বে হতেই নির্দিষ্ট হয়ে আছে। পুরী হতে বের হয়ে ডানা মেলে একটি দুটি আকাশে দেখা দিতে না দিতেই কারো কারো পাখির দল এসে উপস্থিত হয় তাদের খাবার জন্য। পাখির

শব্দেতেই তাদের টপটপ করে যিকিরে থাকে। বড় বড় গণ্যগণ্ডিগণের দল (dragon fly) উড়ে-জাহাজের মত ছুটে আসে তাদের দিকে। সাপ বাগ-টিকিটিক-গিরগিটিকে তখন তাদের ধ্বংস না করে? সেই বিরাট ধ্বংস হতে শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকে খুব সামান্যই। যে সামান্য কয়েকটি বাঁচে, যদি সৌভাগ্যবশত তাদের স্ত্রীপুরুষের মধ্যে মিলন ঘটে পারে তাহলে তাদেরই উপর দায়িত্ব পড়ে নতুন পুরী গড়বার। নতুন পুরী গড়ে উঠলে ভবিষ্যতে ওরাই হয় সেই সব এক একটি পুরীর রাজা ও রাণী।

কিন্তু প্রথমাধি নতুন পুরী গড়ে তোলবার দৃষ্টি অনেক। পুরী গড়ে তোলবার সূচনায় রাজা ও রাণী কর্মী বা রক্ষীদলের কোন সাহায্যই পায় না। প্রথম কর্মীদলকে



সেপাই উই। পুরী রক্ষার ভার এদের উপর। মুখের দাড়া ওদের প্রধান অস্ত্র

জন্ম দিয়ে তাদের আহার ও আশ্রয় দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয় রাজা ও রাণীকে। কী করে 'তা সম্ভব' হয় তা আজও নিঃসন্দেহে জানা যায়নি। কেননা পূর্বেই বলা হয়েছে রাণীর নিজেরই প্রাণ ধারণের জন্য, আহারের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয় কর্মীদের উপর।

দুটি স্ত্রী পুরুষে মিলন ঘটবার পর ওরা কিছুক্ষণ এদিক ওদিকে বোরাফেরা করে। তারপর উভয়ে মিলে একটি জয়াগা বেছে নেয় বাসার জন্য। সেই স্থানে ভবিষ্যৎ পুরীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। খুব ছোট একটুকু একটি গর্ত—রাণী তারি মধ্যে তার প্রথম ডিম পাড়ে। সেই ডিম হতে হয় ডানা। এই ছানারাই হয় বাসার প্রথম কর্মীদল। এই কর্মীদল কাজে সক্ষম হয়ে উঠলেই রাণীর সকল দৃষ্টি ঘটে যায়। তখন সে খেতে পায় পচুর, তার পরিচর্যার জন্য নিযুক্ত হয় বিশেষ একটা সেবিকা। তখন হতে রাণীকে নিজের বা বাসার আর কোন কাজই করতে হয় না—তখন হতে তার একমাত্র কাজ হয় কেবল ডিমপাড়া। একই অবস্থায় তার দিন রাত সে কেবল শুষে থাকে। দেহটি ক্রমশই হতে থাকে স্ফীত, উদরটি হয়

বিরাট বিশাল। তখন তাকে হঠাৎ দেখে উই-  
স্লে চিনতেই পারা যায় না। একদিন ওর  
পিতে যে দু'জোড়া হালকা কিনফিনে ডানা  
ছিলো, একদিন সে যে সেই ডানা মেলে  
পাখির মতো আকাশে উড়েছিলো একথা তাকে  
দেখে তখন কল্পনায়ও আনা যায় না, কিন্তু  
রাজার দেহের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে না।  
চকচকে ঝকঝকে হালকা দেহটি নিয়ে রাণীর  
পাশে পাশে সে সর্বদা ঘুরে বেড়ায়, এক  
মুহূর্তের জন্য সে রাণীর কাছছাড়া অনা-  
য় না। রাণীর বিকৃত চেহারা তার প্রতি  
তার মনের কোনরূপ বিরপত্তা জাগে বলে  
মনে হয় না। রাণীর প্রতি তার ঐকান্তিক  
একনিষ্ঠ আকর্ষণ দেখে আশ্চর্য হতে হয়।

রাণীর দ্বারা প্রতিপালিত কর্মীদের  
প্রথম কাজ হয় নতুন পুরীতে রাণীর জন্য  
একটি বিশেষ কুঠরী নির্মাণ করা। মাটির  
তলায় তিন হতে ছয় ফুটের মধ্যে কুঠরীটি  
নির্মিত হয়। এই কুঠরীটিকে রাণীর বন্দি-  
শালাও বলা যেতে পারে। কিন্তু এখানে সে  
থাকে রাণীর হালে, এখানে তার পরিচর্যার  
কোন ত্রুটি হয় না, খেতে পায় প্রচুর। কিন্তু  
ভিন্ন পাড়তে হয় তাকে প্রতিদিন হাজারে  
হাজারে। ভিন্ন পাড়বার ক্ষমতা লুপ্ত হলে  
তার বেঁচে থাকবার প্রয়োজনীয়তা ঘটে যায়।  
কর্মীর দল তখন নিষ্ঠুরভাবে তার খাবার  
দেয় বন্ধ করে। কিছুদিনের মধ্যেই অনাহারে  
তার মৃত্যু ঘটে। তখন পুরীর ভিতরের অন্য  
একটি স্ত্রী জাতীয় উইকে এনে রাণী করা  
হয়। রাণী মনে গেলে তার মেদবহুল দেহটিকে  
সকলে মিলে উদরসাৎ করে। উইপুরীর  
একটি বিশেষ পিপড়ের বাসার আস্তাকুঁড়ের  
মতো এখানে আবর্তনা ফেলবার বিশেষ কোন  
স্থান নেই। বাসার ঝাঁকছু আবর্তনা উই-  
পোকার দল তা খেয়ে নিঃশেষ করে। বাসার  
ভিতরে কোন জিনিস ওরা নষ্ট হতে দেয়  
না। রাণীর পরমায়ুর পরিমাণ খুব বেশি নয়,  
পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে ওদের বংশোৎপাদনের  
ক্ষমতা লোপ পেয়ে যায়। তখন তাদের মৃত্যু  
ঘটে অনাহারে।

উইয়ের স্ত্রী পুরুষে মিলন ঘটে পুরীর  
বাইরে সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। পুরীর  
বাইরে মিলন ঘটলেও একই বাসার স্ত্রীপুরুষ  
মিলন ঘটবার রীতি ওদের মধ্যে নেই।  
সাধারণত ভিন্ন ভিন্ন বাসার স্ত্রীপুরুষে ওদের  
মধ্যে মিলন ঘটে থাকে। আমাদের মতো সগোত্রে  
বিবাহ প্রথা ওদের মধ্যেও নিষিদ্ধ। খুব  
সম্ভবত সেই জন্যই পুরীর ভিতরে স্ত্রী-  
পুরুষে মিলন না ঘটে পুরীর বাইরে ওদের  
মধ্যে মিলন ঘটে। কিন্তু এরূপ মিলনের জন্য  
ভিন্ন ভিন্ন বাসার উইয়ের পরস্পরের সঙ্গে  
দেখা সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন। সেইজন্য  
সাধারণত একই দিনে প্রায় একই সময়ে পাশা-

পাশি বাসা হ'তে উইয়ের দল প্রায় একই  
সঙ্গে উড়ে বের হয়। মিলনের অভ্যপ্রায়ে শূন্যে  
উড়লেও স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের মিলন ঘটে  
মাটিতে। কিন্তু মাটিতে স্ত্রীপুরুষ পরস্পর  
পরস্পরকে কী করে খুঁজে বের করে? কীট-  
তত্ত্ববিদরা অনুমান করেন এজন্য ওদের মধ্যে  
বিশেষ সিগন্যাল বা একটি টেরাটেক্স আছে।  
অনেকে অনুমান করেন শূন্য হ'তে মাটিতে  
নামবার পূর্বেই ওরা চারিদিকে সেই টেরাটেক্স  
পাঠায়। সে টেরাটেক্স যে কি তা এখনো অনু-  
মানের বিষয়। সে টেরাটেক্স গন্ধও হতে পারে,  
শব্দও হতে পারে। কুকুর নিয়ে পরীক্ষা করে  
দেখা গেছে স্ত্রীউইয়ের গায়ের গন্ধ নাকে ধরে

ওরা অনেকদূরে পর্যন্ত তাদের অনুসরণ করতে  
পারে। কিন্তু পুরুষ উইয়ের গায়ে সেরকম  
কোন গন্ধ নেই। বাসার ভিতরে পরস্পরের  
মধ্যে সংবাদ আদান প্রদানের জন্য ওরা একরকম  
শব্দও করে। উইয়ের বাসার ভিতরে  
মাইক্রোফোন বসিয়েও সেরকম শব্দের সম্ভান  
পাওয়া গেছে।

## স্বাস্থ্য ভাল রাখার পক্ষে প্রথম আবশ্যক



রক্তই জীবন-নদীর স্রোতস্বরূপ; ভাল  
স্বাস্থ্যের ইহাই গোড়ার কথা। রক্ত হইতে দূষিত  
পদার্থসমূহ নিঃসারিত করিয়া রক্ত পরিষ্কার রাখা  
দবলকারই প্রয়োজন।



ক্লার্কের ব্লাড পিউরিফাইং  
রক্ত পরিষ্কার করার  
ব্যাপারে পাঁচবা  
খ্যাত এক অপূর্ব  
সাধ গ্রী। রক্ত  
বিশুদ্ধ, কোড়া, বা  
ও রক্ত পৃষ্ঠের  
অনুরূপ সমস্ত ক্ষেত্রে  
ইহা অসাধারণ  
ব্যবহার করা যাইতে  
পারে।



সমস্ত দোষের তরল বা বাতিকাচারে পাওয়া যায়।

## পাকা চুল

কলপ ব্যবহার করিলে না। আমাদের  
আর্যবৈদ্য স্বর্ণাশ্ব তৈল ব্যবহার করুন এবং ৬০  
বৎসর পর্যন্ত আপনার পাকা চুল কালো রাখুন।  
আপনার দৃষ্টিশক্তির উন্নতি হইবে এবং মাথাধরা  
সারিয়া যাইবে। অল্প সংখ্যক চুল পাকিলে ২০  
টাকা মূল্যের এক শিশি, বেশী পাকিয়া থাকিলে  
৩০০ মূল্যের এক শিশি, যদি সবগুলিই পাকিয়া  
থাকে, তাহা হইলে ৫ টাকা মূল্যের এক শিশি  
তৈল ক্রয় করুন। ব্যর্থ হইলে স্বিগ্ধ মূল্য ফেরৎ  
দেওয়া হইবে।

## শ্বেতকুষ্ঠ ও ধবল

শ্বেতকুষ্ঠ ও ধবলে কয়েক দিন এই ঔষধ  
প্রয়োগের পর আশ্চর্যজনক ফল দেখা যায়। এই  
ঔষধ প্রয়োগ করিয়া এই ভয়াবহ ব্যাধির হাত  
হইতে মুক্তিলাভ করুন। সহস্র সহস্র হাকিম,  
ডাক্তার, কবিরাজ বা লিঙ্গাপনদাতা কর্তৃক ব্যর্থ  
হইয়া থাকিলেও ইহা নিশ্চয়ই কার্যকরী হইবে।  
১৫ দিনের ঔষধের মূল্য ২০০ আনা।

বৈদ্যরাজ অখিলকিশোর রায়

নং ১০৪, কাতরীসরাই, গয়া।

শিশুর স্বাস্থ্য গঠনে ও সর্দি কাশি নিবারণে

# দুল্যালের

## গানমিছরি

২২১ গ্রাম ১০৭ বারতসী ঘোষ স্ট্রিট, কলিকাতা

ফোন  
৬৮৫



## শ্রীপ্রমথনাথ বিনী

১১

ছাঁদের উপরে আর কেহই নয়—  
শশাঙ্ক ঠাকুর সে হঠাৎ এমন  
অসময়ে অপরের বাড়ির ছাদের উপরে  
উঠিতে গেল কেন? শশাঙ্ক ঠাকুরের  
সহিত পাঠকের পরিচয় দীর্ঘকালের  
—তবুও যদি তাহাকে না বুঝিয়া থাকেন—  
তবে আর কেমন করিয়া বুঝাইব। বাদলির জন্য  
যে শাড়িখানি সে কিনিয়াছিল এবং বাদলি যাহা  
প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, সেই শাড়িখানা আজ  
কয়েকদিন ধরিয়া সে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিতে  
চেষ্টা করিতেছিল। গাঁয়ের লোকে কিনিতে  
চাহে না, কেহ বলে দাম বেশি, কেহ বলে  
প্রয়োজন নাই, কেহ বলে ঠাকুর কাহার শাড়ি  
বোচিতেছে তাহার ঠিক কি! অবশেষে অনেক  
ঘোরাঘুরি করিবার পরে সে পাশের গাঁয়ের  
একজনকে কিণ্ডে মোটা লাভে বিক্রয় করিতে  
সমর্থ হইয়াছে। সকাল বেলাতে মনটা বেশ  
প্রফুল্ল ছিল, আপন মনে গান করিতে করিতে  
সে জোড়াদাঁঘতে ফিরিতেছিল। তাহার কেমন  
যেন ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল, ধর্ম অর্থ কাম  
মোক্ষ একব্রহ্মে বিদ্যুত, নতুবা বাদলির  
প্রত্যাখ্যানের দৃষ্ট কিণ্ডে অর্থগমে দুরীভূত  
হইতে যাইবে, কেন? বাদলির রূঢ় কথাগুলি  
এক একবার মনে পড়ে, মনটা মূর্ছিয়া আসে,  
অমনি হাতের অঙ্গুলিতে টাঁকের পরসাগুলি  
স্পর্শ হয়, মন প্রফুল্ল হইয়া ওঠে, অমনি গানের  
সুর উচ্চতর হয়। এইভাবে চলিতে চলিতে  
যখন সে গ্রামে আসিয়া ঢুকিল, শুনিলে পাইল  
যে, দশানির বাড়িতে বিষম মারামারি বাধিয়া  
গিয়াছে। সে চমকিয়া উঠিল। ইহাও কি সম্ভব?  
দুই পক্ষে লাঠালাঠি চলিতেছে আর সে  
অনুপস্থিত। মারামারি দেখিতে, অবশ্য নিরাপদ  
দূরত্ব রাখা করিয়া, তাহার বড় ভালো লাগে।  
লাঠির আঘাত মাথায় পড়িলে এক প্রকার  
শুদ্ধ শব্দ উঠিত হয়—সেই শব্দটি শশাঙ্কর  
বড়ই প্রিয়। আর উভয় পক্ষের আহতদের  
আত্নানাদ, আহা, তাহার কুম্বন্ধের যুগ্মের  
কথা মনে পড়িয়া যায়। গাম্ভীর্যময় এমন

একটা দুর্লভ-দর্শন কাণ্ড ঘটিতেছে, আর সে  
উপস্থিত নাই। সে ছুটিতে ছুটিতে চলিল।  
মারামারিতে এই অহেতুক আনন্দলাভ ছাড়াও  
আরও একটা প্রয়োজন তাহার ছিল। উভয়  
পক্ষেই তাহার অনেকগুলি খাতক আছে।  
তাহাদের কে মরিল, কে আহত হইল, এ তথ্য  
যত শীঘ্র সে জানিতে পারে, ততই মঙ্গল।  
সেই অনুসারে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করিতে  
হইবে। শশাঙ্ক ঠাকুর দশানির বাড়ির অন্দরের  
প্রাচীর ডিঙাইয়া মণ্ডপের সিঁড়ি দিয়া ছাদের  
উপরে উঠিল এবং তথায় আত্মগোপন করিয়া  
বসিয়া সানন্দে, নির্ভয়ে নিম্নবর্তীদের জীবন-  
মরণ পূর্ণ স্বল্প উপভোগ করিতে লাগিল।  
লাঠালাঠির ঝটখট, মাথা ফাটান পটাপট,  
আহতের গোওয়ান, মর্ম্মরূর দেহ আক্ষেপ,  
মৃতের রহস্যময় নীরবতা তাহার বড়ই ভালো  
লাগিতেছিল। সে ভাবিতেছিল—কিমাশ্চর্যম,  
আমাকে কেহ ধর্ম্মগত পাইতেছে না—অথচ  
আমার কাছে সমস্তই দৃশ্যমান, অসৌ বিধাতার  
একি বিধান! কিন্তু বিধাতার বিধানের সমস্ত  
রহস্য তাহার অবগত ছিল না—নতুবা হঠাৎ  
অতর্কিতে এমন রসভঙ্গকর ভূমিকম্প আরম্ভ  
হইতে যাইবে কেন?

ভূমিকম্পের প্রথম কাঁপনিতে সে ভাবিল  
আর কিছ্ নয়, তাহার মাথাটা ঘুরিতেছে।  
কিন্তু তার পরেই ভাবিল, শশাঙ্ক ঠাকুর নেশার  
আলেকজান্ডার, এমন কোন নেশা আছে,  
যাহাতে তাহার মাথা ঘুরাইয়া দিতে পারে?  
কিছ্ক্ষণের মধ্যেই তাহার আর সন্দেহ রহিল  
না যে, ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়াছে। সিঁড়ি দিয়া  
নামিতে গিয়া দেখিল সিঁড়ি ধরিসিয়া পড়িয়া  
গিয়াছে। তখন সে নিম্নবর্তীদের লক্ষ্য করিয়া  
চীৎকার শুরু করিয়া দিল।

সেই চীৎকার নিম্নবর্তীরা শুনিলে পাইল।  
ভয়ে ঠাকুরের কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়া গিয়াছিল,  
আর লাঠিয়ালদেরও মনের প্রকৃতিস্থ অবস্থা  
ছিল না, তাই প্রথমটা সকলে তাহার স্বর  
চিনিতে পারে নাই—কিছ্ক্ষণের মধ্যেই সকলে  
বিস্ময়াচ্ছন্ন হইল—ছাদের উপরে শশাঙ্ক ঠাকুর।

তাহা ছাড়া, কার্নিসের উপর দিয়া তাহার  
মাথাটাও দেখা যাইতেছিল, ঠাকুরের মাথাটা  
ভূমিকম্পের তালে তালে তরঙ্গভাঙিত কুম্বন্ধের  
মতো দুলিতেছে।

সকলে নীচ হইতে শূন্যাইল, ঠাকুর ওখানে  
গেলে কি করে?

শশাঙ্ক কোন উত্তর দেয় না, হাত জোড়  
করে আর কাঁপে!

গাব, বলিল—কি আশ্চর্য! ভূমিকম্পে  
সকলেই পড়ন হয়, কেবল ঠাকুরের উন্নতি,  
একি রকম?

শ্রীচরণ বলিল—তপস্যার জোরে।

গাব, বলিল—ঠিক তাই। বিকৃতভাবে  
ঠাকুরকে টিক ধরে স্বর্গে নিয়ে চলেছিল—  
হঠাৎ টিক ছিঁড়ে ঠাকুর ছাদের উপরে পড়ে  
গিয়েছে। তাড়াহুড়া তো আর কারণ দেখি না।

তখন নিম্নবর্তীদের মধ্যে ঠাকুরের দুর্দশা  
লইয়া এক প্রকার আমোদ পড়িয়া গেল।  
তখনো ভূমিকম্প চলিতেছে, জীবনের আশঙ্কায়  
তখনো সকলে বিব্রত, তবু অপরের দুর্দশা  
তাহাদের এক প্রকার অম্বাভাবিক আনন্দের  
কারণ হইয়া উঠিল। তাহারা নিজের বিপদ  
ভুলিয়া অপরের বিপদে উল্লাস বোধ করিতে  
লাগিল। মানুষ বড়ই অশুভ জীব। তার  
উপরে শশাঙ্ক ঠাকুর সকলেরই মহাজন।  
মহাজনের দুর্দশায় সুখী না হয়, এমন দেশদার  
সত্যকালে থাকিলেও এই দৃশ্য কলিকালে  
একবারেই বিরল!

গাব, বলিয়া উঠিল—এতদিন ওর ভয়ে  
আমরা কেঁপেছি—আর আজ সবাই, দেখো দেখো,  
ঠাকুরের কাঁপনি দেখো। নয়ন সার্থক হোক।

এমন সময়ে হুড়মুড় করিয়া একটি ভীষণ  
আওয়াজ হইল। মণ্ডপের ছাদ খসিয়া পড়িল।  
শত্রু-মিত্র অভেদে সকলের মন একসূত্রে বাঁধা,  
সকলেরই মনে হইল ঠাকুর মরিয়াছে তো!  
তখনো মণ্ডপের কাঁপনি থামে নাই, কিন্তু  
কেহ বিপদের আশঙ্কা মাত্র গিলি না, সকলে  
দৌড়িয়া সেই সদাপতিত ছাদের নিকটে গিয়া  
সন্ধান করিতে লাগিল—শশাঙ্কর দেহটা।  
সকলেরই মনে এক চিন্তা, ঠাকুর এবারে  
বাঁচিয়া গেলে কহাকেও ছাড়িবে না, নাশিল  
করিয়া ভিতামটি দখল করিয়া লইবে।

হঠাৎ কে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল—  
ওই দেখো দেখো!

সকলে উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল—  
ঠাকুরের দেহ!

একজন সন্দেহসূচক স্বরে বলিল—  
কিন্তু যদি না—তাহার কথা শেষ হইতে না  
হইতে আর একজন শশাঙ্কর নাকের কাছে  
হাত লইয়া গিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিয়া উঠিল  
—মরেছে, মরেছে!

তখন সকলে অর্ধেকশব্দবৎ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল— মরেছে, ঠাকুর মরেছে। আর ভয় নাই, মরেছে।

গাবু, বলিল—কিন্তু মরণও এমন সৌভাগ্য কয়জনের হয়? ওই দেখো না গোপিনীদের জড়িয়ে ধরে ঠাকুর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে।

সকলে দেখিল, দুইটি ইষ্টকনির্মিত গোপিনী-মূর্তি জড়াইয়া ধরিয়া ঠাকুর পড়িয়া আছে।

তখন আর একজন বলিল—ভাই, আল্লাকে দোষ দিয়েছিলাম ভূমিকম্পের জন্য! কিন্তু খোদা কি অবিচার করতে পারেন। এই ঠাকুরকে মারবার জন্যই ভূমিকম্প এনেছিলেন! দেখো না কেন যেই ঠাকুর মরেছে ভূমিকম্পও গিয়েছে।

তখন সকলে সম্মিলিত পাইয়া বুঝিল—ভূমিকম্প সত্যি খামিয়াছে বটে! অমনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল সমন্বয়ে হাকিয়া উঠিল—আল্লা হাকিম! জয় মা কালী! তারপরে তাহারা ঠাকুরের মৃতদেহটা তদন্ত রাখিয়া মন্ডপের বাহিরে আসিল এবং কোনওমতে ভূমি প্রাচীর ও ধ্বংস দালানের স্তূপে জড়াইয়া দশানির বাড়ির বাহিরে আসিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। নিজেদের জীবন সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবামাত্র গ্রামের দিকে তাহারা তাকাইল। কিন্তু কি আশ্চর্য! এক কয়েক ঘণ্টা আগেকার সেই জোড়াদীঘি। তাহারা ভালো করিয়া চিনিতেই পারিল না। কেবল রণক্ষেত্রের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নৈমিত্তিক সর্দারের স্থলিত চক্ষু দুইটা নিরর্থক প্রশ্নের মতো শূন্যের দিকে তাকাইয়া পড়িয়া রহিল।

১২

তখনো আকাশ ধূলিতে আচ্ছন্ন। ভূমি অট্টালিকাসমূহের ধূলিরাশি ইষ্টকের বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া আকাশে যুগান্তের গোমূল সৃষ্টি করিয়া নিখিল প্রকৃতির দেহে অন্তিম বৈরাগ্যের গৈরিক বসন অর্পণ করিল। রাজপুত্র সিংধার্থ চাঁবর ধারণ করিয়াছে, রাজকন্যা রাজাশ্রী কাষায় গ্রহণ করিয়াছে। প্রকৃতি আজ বৈরাগী—জোড়াদীঘির একি অকাল বৈরাগ্য। লাঠিয়ালের দল পূর্ববৈরী বিস্মৃত হইয়া যে যাহার বাড়ির দিকে ছুটিল—পথের দুই দিকে যে-দৃশ্য উন্মোচিত হইতে লাগিল—মানুষের দৃষ্টি কদাচিৎ তাহা দেখিয়াছে।

বড় বড় অট্টালিকা ভাঙিয়া পড়িয়াছে, জানলা-দরজা খসিয়া বুলাতেছে, ভিতরকার আসবাবপত্র চূর্ণবিচূর্ণ। কোন অট্টালিকার ছাদ খসিয়াছে, কোনটার বা দেয়াল ছাদ দুই-ই গত, আবার কোন কোনটার বা ছাদের কিয়দংশ মলমলে যেন অক্ষত! কত কালের সব

বনস্পতি উন্মূলিত, কতক-বা কোমর ভাঙিয়া পড়িয়াছে। পুকুরের জল ভূমিকম্পের ঠেলায় জমিতে উঠিয়া ছিল, এখন নামিয়া গিয়াছে, কিন্তু খালে-থলে জল আটক পড়িয়াছে, শুষ্ক জমিতে মাছ খাবি খাইতেছে। গোয়ালুলা এক সময়ে দড়ি ছিঁড়িয়া বাহির হইয়াছিল, গলায় দড়ি, বুলাইয়া তাহারা মৃতের মতো ইতস্ততঃ দণ্ডায়মান। দশানির হাতটা পিলখানার খোঁটা উপড়াইয়া বাহির হইয়াছে, তাহার গলায় শিকলের সঙ্গে খোঁটাটি বুলাতেছে।

টিনের ঘর ও খড়ের ঘর বাদে গাঁয়ের অধিকাংশ দালানই হয় পড়িয়াছে, নয় ক্ষতিগ্রস্ত। দশানির বাড়ির প্রায় সবগুলি দালানই পড়িয়া গিয়াছে, দু'একটা মাত্র অক্ষত অবস্থায় রহিয়াছে। ছ'আনির বাড়ির নতুন চহরটা পড়ে নাই বটে, কিন্তু পুরাতন অংশ একটা ভূমিস্তম্বে পরিণত হইয়াছে।

ভূমিকম্পের সময় গৃহবাসীরা গৃহত্যাগ করিয়া বাহির হইয়াছিল—এখনো তাহারা ঘরে ঢুকিতে সাহস করিতেছে না, তৎপরিবর্তে মাঠের মাঝখানে নদীর ধারে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। বিজয়া দশমীর পরদিন সকলে যেমন পরস্পরকে আলিঙ্গন করে, কুশল সম্ভাষণ করে, তাহারা তেমনি করিতেছে। এতদিন যে-শত্রুতা তাহারা সময়ে লালন করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা এখন বিস্মৃত। মানুষের বৈরী পৃথিবীর বৈরীর তলে চাপা পড়িয়া গিয়াছে—আজ ক্ষণকালের জন্য শত্রু-মিত্র বৈরাগ্যের শূন্য সম্মানে আত্মপরভেদ তুলিয়া মানুষমাত্র পরিচয়ে দণ্ডায়মান।

অনুসন্ধানের পরে জানা গেল যে, এক শশাঙ্ক ঠাকুর ছাড়া আর কেহ মারা পড়ে নাই। এইমাত্র যাহারা শশাঙ্কের মৃত্যুতে উল্লসিত হইয়াছিল, সামাজিক বোধ ফিরবার সঙ্গে তাহারাও দৃঢ় অনুভব করিতে লাগিল, কিংবা সুখের অনুভূতি চাপিয়া দুঃখের অভিযুক্ত প্রকাশ করিল। মানুষ ইচ্ছা করুক আর নাই করুক, সামাজিক জীব, কেবল প্রলয়ের মুহূর্তে তাহার মনের সমাজ-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, সে ভূমি অট্টালিকার উৎকীর্ণ ধূলিকণার মতো বন্ধন মোচনের আনন্দে মরিয়া হইয়া ওঠে।

জোড়াদীঘির উচ্চ-নীচ ভেদে সমবেত জনতা মৃতের মতো সেই মাঠের মধ্যে বসিয়া রহিল। একজন বলিল—আজ আর বাড়ি ফিরে কাজ নাই, এখনো.....

অশ্রু লক্ষণ সে আর প্রকাশ করিল না, প্রয়োজনও ছিল না, তখনো ধিরদীর হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

আর একজন বলিল—সেই ভালো। রাতটা সকলে মিলে এখানেই কাটানো যাক।

তাহাই স্থির হইল।

সে রাত্রে জোড়াদীঘির অধিবাসীরা, জমিদার, প্রজা, উচ্চ-নীচ, পূর্বজন শত্রু-

মিত্র মরুভূমির মেঘপালকের ন্যায় মাঠের মধ্যে পড়িয়া রহিল। আকাশের নক্ষত্রের দল, মানব-প্রহসনের চিরন্তন সাক্ষীর দল, নীরব নেত্রে সমস্ত দেখিল। এক সময়ে দশমীর চাঁদ আপন আলোর ভায়ে ডুবিয়া গেল। চরাচর অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ। শিবাবধিনিবিরহিত সেই নৈশ-প্রহর জোয়ার-ভাটার আন্দোলনহীন সমুদ্রের মতো নিশ্চল। চারিদিকে ক্রান্তির সূচুসিত। এ যেন মানুষের সংসার নহে, বিস্মৃতির কোন, এক সুমেরু প্রদেশ! কেবল এই অসীম নির্জনতার প্রান্তে কোথা হইতে চাপা ক্রন্দনের করুণ সুর ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। বাদলি কাঁদিতেছে। একাকী, জাগ্রত, রহস্যময়ী।

সন্তম খণ্ড শেষ

অষ্টম খণ্ড

১

পূর্বোক্ত ঘটনার পরে দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে।

জোড়াদীঘি গ্রামে ব্রজ রায় ও কৃষ্ণ রায় নামে দুই ভাই ছিল। দুইজনেই অকৃতদার। কৃষ্ণ রায় গ্রামেই থাকিত, ব্রজ রায় অনেক দিন হইল কাশীবাসী হইয়াছে। কৃষ্ণ রায় নিকল্লাট লোক, সাতেও নাই, পাঁচও নাই, গ্রামা রাজনীতির মধ্যে সে কখনো পদাণ করিত না, নিজের বাড়ির, ক্ষেত-খামার লইয়া থাকিত, কদাচিৎ অপরের সঙ্গে মিশিত। দশানি ছ'আনি বিবাদের কোন অংশ পরোক্ষেও সে গ্রহণ করে নাই। এই সব কারণে আর সকলে তাহাকে দাম্ভিক মনে করিত, বলিত এত গরম কিসের? ওর যা বিদ্যাবুদ্ধি, টাকা-কাড়ি কিছুই তো আমাদের অজানা নাই।

কিন্তু লোকটা এতই নির্বিবাদী যে, তাহার প্রত্যক্ষ দোষ ধরা কঠিন। তাই সকলে তাহার নাসিকাটি লইয়া হাসাহাসি করিত। কৃষ্ণ রায়ের নাকটা খন্দা, তাহার উপরের খানিকটা অংশ অনেকদিন হইল লোপ পাইয়াছে। গ্রামের সকলে বলিত কৃষ্ণ রায়ের নাকের ইতিহাস তো আমাদের অজ্ঞাত নয়, আর যার কাছে হোক সে সাধু সজ্জন। কেহ বলিত, যৌবনকালে পাশের গাঁয়ের একজনের বাড়িতে অবৈধ প্রবেশের সহিত তাহার নাসিকার আংশিক লোপের ইতিহাস জড়িত। অপরে বলিত, বালা কালে ইচ্ছুর একদিন মাষ্টারের কাছে বে খাইয়া মাষ্টারকে শিক্ষা দিবার ইচ্ছায় সে বেতবে বেত কাটিতে ঢুকিয়াছিল। একথানা তিব্ব বেতের সবেগ আঘাতে তাহার নাকের ও অংশটা উঠিয়া গিয়াছে। জনসাধারণের নিক দৃষ্টি কারণই সমান আনন্দদায়ক হওয়াতে এক ঘটনার দুইটি কারণকেই তাহারা সমানভাবে বিস্ময় করিত।

রজ রায় বহুকাল হইল কাশী বাস করিতেছে। মাঝে মাঝে দশদিনের জন্য জম্মগ্রামে আসিত। এবারে সে প্রায় দশ বৎসর পরে জোড়াদীঘিতে আসিয়াছে। বিকাল বেলা সে তাহার ভাইকে বলিল—চল, কৃষ্ণ একবার গ্রামটা ঘুরে আসি।

এই বলিয়া সে ধোয়া ধুতি, বুকের কাছে স্কেট-লাগানো ধোয়া শার্ট পরিয়া, রূপা-বাঁধানো ছিড়িখানা হাতে প্রস্তুত হইল। কৃষ্ণ রায় আসিলে দুজনে বাহির হইয়া পড়িল। দুজনে চলিতে চলিতে রজ রায় জিজ্ঞাসা করিল—হাঁরে কৃষ্ণ, গায়ে এত জগল হল কেন রে?

কৃষ্ণ রায় বলিল—দাদা তুমি দশ বছর পরে আসছো, গায়ে যে ইতিমধ্যে সব ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে।

রজ রায় ভাইয়ের পক্ষে এবং জোড়াদীঘির কোন কোন লোকের মধ্যে গ্রামের জমিদারদের কলহ-বিবাদের কতক কতক সংবাদ পাইয়াছিল—কিন্তু সমস্ত ব্যাপার জানিত না।

কৃষ্ণ রায় বলিল—দাদা, সে জোড়াদীঘি কি আর আছে?

রজ রায় বলিল—বেশ স্পষ্ট দেখছি আছে, তবে নাই কিসের?

কৃষ্ণ রায় বলিল—সম্মানে আনলে মানুষ্টা যেমন থাকে, তেমন আছে। যা দেখছো জোড়াদীঘির স্মরণ।

রজ রায় বলিল—সম্মানও যে এর চেয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। বাবুরা গ্রামটা পরিষ্কার করায় না কেন?

—বাবুরা। কৃষ্ণ রায় বড় দুঃখে হাসিল! তারপরে গলার স্বর নীচু করিয়া বলিল—বাবুদের আর কি কিছু আছে?

রজ রায় বলিল—মামলা মোকদ্দমায় টাকা পয়সা খরচ হয় বটে, তাই বলে গ্রামটা পরিষ্কার রাখবে না?

কৃষ্ণ রায় কঠোর পূর্বতন খাদে বলিল—বাবুদের সে শক্তিও বাকি নাই।

বিস্মিত রজ রায় বলিল—কি রকম?

কৃষ্ণ রায় বলিল—রকম প্রায় যোল আনা! বাবুদের জমিদারি, পত্তনী সমস্ত গিয়াছে।

—সমস্ত? রজ রায় চমকিয়া উঠিল।

—প্রায় সমস্তই। প্রথমে গেলো পত্তনী সম্পত্তি। পাঁচ সাত বছরের বাকি খাজনা জমে এত ভারি হয়ে উঠেছিল যে তা আর শোধ করতে পারলো না। খাজনার দায়ে পত্তনীগুলো গেলো। গেলো কিন্তু সব খাজনা শোধ হ'ল না। শেষে পত্তনী খাজনার বাকি শংশের বাবদ নালিশ করে মালিকরা বাবুদের জমিদারি সম্পত্তিগুলো পর্যন্ত নীলাম করে নিলো।

—বলিস কি রে? রজ রায় এ সমস্তর কিছুই জানিত না।

সে বলিল—ভাললে রাউতালি, সোনার পদুর,

ইসলামপুর সব গিয়েছে? সোনার সম্পত্তি রে, সোনার সম্পত্তি। আমি অনেকদিন ওসব মহালের ন্যেবি করেছি! এক দিনে কিস্তির খাজনা আদায় হ'ত, এক ডাকে পাঁচ হাজার প্রজা এসে খাড়া হ'ত। কিহুই নেই? কিস্তির সময়ে পরগণায় হাতী যেতো। হাতী করে আমি টাকা চালান দিয়েছি।

এমন সময়ে তাহারা পিলখানার পাশে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রজ রায় বলিল—এই তো পিলখানা!

কৃষ্ণ বলিল—ওই পিলখানা পর্যন্তই—হাতীটা?

—যেখানে জমিদারি সেখানে হাতী। দুইজনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

তারপরে দুইজনে পথের যে অংশ দিয়া চলিল, তাহার দুই পাশে ভূমি গোয়াল, শূন্য আস্তাবল, খসিয়া-পড়া অতিথিশালা, ভাঙিয়া-পড়া নহবৎখানা! রজ রায় দুই দিকের দৃশ্য দেখিয়া স্বল্পক্ষণের মধ্যেই বাবুদের অবস্থা বুঝিতে পারিল। জিজ্ঞাসা করিবার আর প্রয়োজন হইল না।

রজ রায় শূদ্রাইল—বাবুদের বাড়িগুলোর অবস্থা কিরকম?

কৃষ্ণ বলিল—সেবারের ভূমিকম্পে প্রায় সমস্তই গিয়াছে।

এমন সময়ে তাহাদের চোখে পড়িল দর্শনার সেই দেউড়িটা উদ্ভূত অভিমানে মতো মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে বটে কিন্তু দু'পাশের প্রাচীর পড়িয়া গিয়াছে। ভাঙা প্রাচীরের আকাশ পথে ভিতরের ধ্বংসস্থাপ দেখা যায়—ধ্বংসস্থাপ আর তাহার উপরের বট, অশথ প্রভৃতির জগল!

রজ রায় বলিল—হ'আনির বাবু কোথায়?

কৃষ্ণ বলিল—তিনি কল্‌কাতায় চলে গিয়েছেন, শুনছি সেখানে চাকরি বাকরি করেন।

—আর দর্শানির বাবু?

—তিনি গায়েই আছেন। তবে বড় বের হন না। জোড়াদীঘি গ্রামের অংশটুকু এখনো তাঁর আছে, তবে শুনতে পাই নাকি সেটুকু আর বেশি দিন নয়!

রজ রায় শূদ্রাইল—কিন্তু গায়ের লোকসব গেলো কোথায়? চারদিকের ভিটে যে পতিত দেখছি।

কৃষ্ণ রায় বলিল—দাদা লোকে আর কি সূত্রে গায়ে থাকবে? নদী গিয়েছে, বিষম ম্যালেরিয়া!

—নদী গিয়েছে? সে কি রকমের?

—চলো না দেখবে।

ইতিমধ্যে তাহারা নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রজ রায় চমকিয়া উঠিয়া বলিল—সত্যি তো! নদী গেল কোথায়? সব বে শূন্যকনো!

কৃষ্ণ রায় বলিল—এই রকমই। আজ পাঁচ সাত বছর হ'ল বর্ষায় জল আসে বন্দ। কোথায় নাকি পদ্মার উপরে পদ্ম গেছে? তাই এই দশ! আর ধুপানের মোহানা পাহাড় প্রমাণ উচু হয়ে উঠেছে। আগে বর্ষায় জল আসতো, মাস দুইতিন দিন থাকতো। এখন তা-ও বন্দ! দেখছো তো কচুরিপানার তেজ! নদী গিয়েছে, জমিদার গিয়েছে, গায়ে লোকে আর থাকে কোন সূত্রে! ম্যালেরিয়া লেগে কতক মরলো, বাকি সব উঠে চলে গেল। এখন যারা আছে উপায় নাই বলে আছে, উপায় হলে আজ এখনই উঠে চলে যায়—এমন তাদের মনের ভাব।

দুইজনে নীরবে অনেকক্ষণ নদীর ধারে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে শীতের সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসিল। কচুরিপানা বোকাই নদীগর্ভ হইতে একপ্রকার বিস্মৃত নিশ্বাস উঠিতে লাগিল, যতদূর দেখা যায় কোথাও কোন জনপ্রাণী নাই, সব কেমন পরিত্যক্ত, পলাতক ভাব! একটা কাল পেঁচা অদূরের বৃক্ষশির হইতে ডাকিতে লাগিল। অন্ধকারের রাজমন্ডী হুতুম হুম হুম আরম্ভ করিল! মলিন সূর্যাস্ত নদীর পরপারে নিবর্ণিত প্রায় চিত্রাশ্রম মতো মিলাইয়া আসিল, কুয়াশা চাপিয়া আসিল!

রজ রায় বলিল—চল, একবার মালিক খুড়োকে দেখে আসি!

কৃষ্ণ বলিল—মালিক খুড়ো? সে তো আজ সাত বৎসর গত হয়েছে!

গ্রামের অবস্থা দেখিয়া এবং শুনিয়া রজ রায়ের বিস্ময়ের ভাব কাটিয়া গিয়াছিল, সে বলিল, তবে চল ভজহরির দোকানে যাই।

কৃষ্ণ বলিল—তার ছেলেটা আছে! দাসও মরেছে।

—তবে চল টোলের দিকে যাই!

—সেখানে কেউ নেই! ভট্টাচার্য্য মারা যাবার পর তার স্ত্রী উঠে চলে গিয়েছে।

—নিন্দু ঘোষ?

—সে আছে বটে! কিন্তু সেখানে না যাওয়াই ভালো!

—কেন রে?

—সে একরকম পাগলের মতো হয়েছে।

—কেন?

কৃষ্ণ বলিল—সে অনেক কষ্টে একটা দালান গোঁথোঁছিল, একদিন রাতে ভূমিকম্প হয়ে তার দুই ছেলে, ছেলের বউ, নাতি নাতি, নিজের স্ত্রী সহ চাপা পড়ে মার গেলো! নিন্দু ঘোষ সেদিন বাড়িতে ছিল না তাই মরেনি, পরের দিন বাড়ি ফিরে এলে দেখে শূন্যে সেই-যে পাগল হ'য়ে গেলে আজও সারেনি! সারাদিন কেবল বকছে—‘ধর্ম’ক্রেত্রে কুরূক্রেত্রে সমবেতা ধ্বংসব-আর হাং হাং করে হাসছে! লোক দেখলে

ডাকে, বলে, এসো এসো গীতার মাহাত্ম্য শুনেনে মাও! পরকালে অশেষ পুণ্য! আর ইহলোকে... হাঃ হাঃ হাঃ!

রজ রায় বলিল—এ যে মৃতের রাজ্য হয়ে উঠলে রে!

কৃষ্ণ বলিল—তাইতো হ'ল দেখছি!

রজ বলিল—কৃষ্ণ তুই আমার সঙ্গে কাশী চল। এখানে থেকে আর কাজ নাই।

কৃষ্ণ বলিল—দাদা, বিশ্বনাথ আমার কপালে, কাশীপ্রাপ্তি লেখেন নি! যে-কটা দিন বাঁচি এখানেই থাকবো!

রজ বলিল—ভাবলাম কবে মরি একবার জন্মস্থানটা দেখে আসি! এখন মনে হচ্ছে না আসলেই ভালো হ'ত! কি দেখবো ভেবে এসেছিলাম আর কি দেখলাম! অহুয়া বাঈয়ের ঘাটে বসে সম্ভার রসুনটোঁকি শুনিনি, সম্মুখে দেখি গঙ্গার নীল জলে বেণীমাধবের ধ্বজার জ্বায়া, কত দেশ-বিদেশের নৌকা যাতায়াত করেছে, মন্দির থেকে সম্ভারাত্তর শব্দ ঘণ্টা ধ্বনি উঠছে, চারদিকে গীতা পাঠ হচ্ছে, কথকতা হচ্ছে, তুলসীদাসের রামায়ণ গান হচ্ছে—কিন্তু আমি কি দেখতাম জানিস—জোড়া-দীঘির গ্রাম, আমি কি শুনতাম জানিস জোড়া-দীঘির হাটের কোলাহল, এমনকি নাকে যেন এখানকার ভাট ফুলের গন্ধটা অবধি পেতাম! মুক্তি আমার হয়নি, মুক্তির ইচ্ছাই হয়নি, তাকি বুঝতে পেরেছি! তাই বিশ্বনাথ কৌশলে একবার গায়ে পাঠিয়ে দিলেন! নতুবা দশ বৎসর পরে আসতে যাবো কেন? বিশ্বনাথ বুঝিয়ে দিলেন, দেখে আয় তোর স্বর্গের কি দশা হয়েছে?

তারপরে সে আত্মধিকারের কণ্ঠে বলিল—আমার মুক্তিও হ'ল না, স্বর্গও গেলো!

কৃষ্ণ রায় বলিল—দাদা আমি অত তত্ত্বকথা বুঝি না! আমার মুক্তির প্রয়োজন নাই, জোড়া-দীঘিই আমার থাক!

রজ বলিল—তাই থাক! তবু তোর সাম্প্রদায়িকতা আছে। আমার দুই ই গেলো! এবার কাশী ফিরে গিয়ে দেখি বিশ্বনাথ দয়া করেন কি না! স্বর্গ তো গেলো, এবারে মুক্তি পাই কিনা দেখি!

কৃষ্ণ রায় বলিল—স্বর্গ যাবে কেন দাদা? আমার স্বর্গের ধারণা কি জানো? জোড়া-দীঘির মতো একখানা পোড়ো গ্রাম, যেখানে সম্ভা না হতেই রাত নিষ্প্রাণ হয়, আর অবিরাম ঝিল্লিধ্বনির মাঝে প্রহর প্রহরে শিয়াল ডেকে ওঠে, যেখানে রাতের চেয়ে দিন বেশি নির্জন, যেখানে দিনের চেয়ে রাত্রি অধিক মধুর, যেখানে মানুষের শ্বাসপদে এত ঘনিষ্ঠতা যে কেউ কাউকে ভয় করে না, যেখানে অন্ন প্রচুর কেবল অন্নই নেই, যেখানে পলাতক ডিটেয়ে হলুদের চাষ, চাষের ক্ষেত অকর্ষিত, যেখানে মানুষের অভাবে রোগে মানুষ মরে

না, সেই সর্বজনের পরিত্যক্ত পরিস্রুত, বিস্মৃত-প্রায় একখানা গ্রামই স্বর্গ বলে আমার বিশ্বাস। অন্য কোন স্বর্গে আমি শান্তি পাবো না, অন্য কোন স্বর্গে আমি যেতে চাই না।

রজ রায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,

তুই স্বর্গ না পাস শান্তি পেরেছিস! তবে এখানেই থাক।

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে দুইজনে অন্ধকার পল্লীপথ দিয়া বাড়িতে ফিরিয়া আসিল।

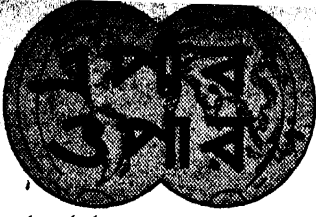
## ধূম পিপাসায় কারাভ্যান সিগারেটই চাহিবেন



# CARAVAN

কারাভ্যান এয়ার কন্ডিশন করা সিগারেট

জালদান চৌবাকো কোম্পানী লিমিটেড  
AGI. C. 43



## জর্জ বার্নার্ড শ

২৬শে জুলাই পার হয়ে গেল, সেই সঙ্গে পার হল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকারের জীবনের ৯০টি বৎসর, শ' আজ ৯১। রাডিয়ান্ড কিপলিং, টমাস হার্ডি ও অস্কার ওয়াইল্ড শয়ের সমসাময়িক। তাঁর প্রথম নাটক যখন প্রকাশিত হল, টেনিসন ও ব্রাউনিং তখন কাব্য রচনা করছেন।

প্রথম তিরিশ বৎসর শ'য়ের কেটেছে দারিদ্র্যের মধ্যে খুবই কষ্টে। তাঁর মা সঙ্গীত শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, কিন্তু আয় ছিল অল্প, তাইতেই চালাতে হ'ত কষ্টে; কিন্তু তাঁর জীবনের বেশীর ভাগই বেশ স্বচ্ছল। তাঁর নাটকগুলি থেকে অর্থাগম হয়েছে প্রচুর, আর পিগম্যালিয়ন, মেজর বারবারা ও সীজার আন্ড ক্রিওপ্যাট্রা—যে তিনখানি নাটক সিনেমায় রূপান্তরিত হয়েছে, তা থেকে তিনি মোট



জর্জ বার্নার্ড শ শেক্সপীরের বাইরে আসছেন

আয়ের শতকরা দশ ভাগ পাচ্ছেন। এত বেশী টাকা কোন সিনেমার লেখক পান নি।

তাঁর বাড়ির নাম "শ'স কর্নার" তিন তলা, বারোখানি ঘর আছে। সকাল ন' টায় ছোট হাজরী সেরে লন্ডন টাইমস থেকে আরম্ভ করে ডেলী ওয়াকার পর্যন্ত পড়ে হাটতে হাটতে যান তাঁর লেখবার জন্য নির্দিষ্ট ছোট একটি কুঁড়েতে যার নাম "দি শেক্সটার।" এখানে বেলা একটা পর্যন্ত লেখেন, চিঠির জবাব দেন। অন্য বৈয়াক্য কাজকর্ম করেন। তারপর লাগু সেরে একটি দিবানিদ্রা। লাগু অবশ্য বাড়িতেই হয়। লাগুর পর আবার শেক্সটারে, শেক্সটার থেকে ফিরে ঠিক সাতটায় ডিনার। সন্ধ্যার



## জর্জ বার্নার্ড শ ও ক্রিওপ্যাট্রার প্রযোজক গ্যারিয়েল প্যান্ডাল

সময় রোডিও শোনেন, বই পড়েন; আর এগারেটায় শয়ন। জুলাই মাসটা তিনি লন্ডনে কাটান; আর সেই সময় তাঁর সকল কর্মচারীদের ছুটি।

শ'য়ের দ্বিতী শালং পেইন-টাউনসেণ্ড ১৯৪৩ সালে মারা গেছেন। শ'য়ের বন্ধুরা বলেন, শ' ১১৫ বৎসর পর্যন্ত বাঁচবেন। শ' মদ খান না, পূমপান করেন না, নিরামিষ ভোজী। তিনি পিয়ারেজ অথবা ইংলন্ডের উচ্চতম সন্মান অর্ডার অফ মেরিট গ্রহণ করতে রাজি হননি। সত্যিই ত' জর্জ বার্নার্ড শ'র উপাধির কি দরকার?

## "আনরা"

বাঙলায় হঠাৎ 'আনরা' বললে ব্যাপারটা কি বুঝতে পারা যায় না। আসলে কথাটি তৈরী হয়েছে ইউনাইটেড নেশানস্ রিলিফ আন্ড রিহাবিলিটেশান আডমিনিস্ট্রেশন: এই বাক্যটির প্রত্যেক কথার প্রথম অক্ষরগুলি যথা ইউ, এন, আর, আর, এ নিয়ে 'আনরা' কথাটি তৈরী করা হয়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ দ্বারা 'আনরা' ১৯৪৩ সালের ১ই নবেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু গত ৩০শে জুন থেকে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত জাতিগুলিকে সাহায্য দান। খরচ চালাবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অনাক্রান্ত জাতিগুলি তাদের সমগ্র আয়ের শতকরা এক ভাগ চাঁদা দিত, এই রকম চাঁদা দ্বারা দেওয়া হয়েছিল।

'আনরা' প্রথম কাজ আরম্ভ করে ১৯৪৫ সালে গ্রীসে ও যুগোস্লাভিয়াতে; সেখানে তারা সামরিক বিভাগের সঙ্গে যোগ দিয়ে কাজ করত। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইয়োয়োরোপের যে সমস্ত দেশে মদ্রা-বিনিময়ের সুবিধা ছিল না, সেই সমস্ত দেশে 'আনরা' কাজ চালাতে থাকে। ১৯৪৫ সাল শেষ হবার

সময় থেকে আনরার সাহায্য ছাড়িয়ে পড়ে অ্যালবানিয়া, পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, এবং ক্রোয়িয়ার চীন। এই সাহায্যদানের কার্য ১৯৪৭ সালের প্রথমার্শ পর্যন্ত চলছিল।

১৯৪৬ সালের শেষে নিউ ইয়র্কে আনরার যে অধিবেশন বসেছিল, তাতে আনরার তদানীন্তন অধ্যক্ষ ফ্যারেলো ল্যাগোভিয়া এই সমস্ত জাতিকে সাহায্যের পরিমাণ প্রকাশ করেন। পরিধেয় জুতো, ওষধ, চাষ করবার যন্ত্রপাতি, কারখানার সাজসরঞ্জাম ব্যতীত ১৯৪৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে গ্রীসে দেওয়া হয়েছে ১৩০৬০০০ টন খাদ্য, যুগোস্লাভিয়ায় ৬৭০০০ টন, অ্যালবানিয়ায় ৮০৬০০০ টন, পোল্যান্ডকে ৬০৮০০০ টন চেকোস্লোভাকিয়ায় ১৮৪৪০০০ টন ইটালীকে ৩৬০০০০ টন, অস্ট্রিয়াকে ৭২০০০ টন, রাশিয়ার কোন অংশে ২০৯০০০ টন উক্রেইন এবং চীন ১০১৪০০০ টন। এ প্রকার সাহায্যদান ব্যতীত জার্মানি ও অস্ট্রিয়ায় গৃহহীন বাড়িদের পুনর্বাসিতর ব্যবস্থাও আনরা করেছিল। ইয়োয়োরোপে মার্শাল প্ল্যান চালু করবার চেষ্টা চলছে, তাইই জন্য কি আনরার কাজ বন্ধ করা হয়েছে?

## আমির সিয়ারিফ-উদ্দিন

ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ডক্টর সুলতান শারীর পদত্যাগ করায় ডক্টর আমির সিয়ারিফ-উদ্দিনকে মন্ত্রিসভা গঠন করবার জন্য আহ্বান করা হয়। ডক্টর আমিরের বয়স চল্লিশ; জাতীয় দলের মধ্যে বামপন্থী নেতা, যদিও তাঁর মতামত অনেকটা সমাজতান্ত্রিক। সুদায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন, শিক্ষা গ্রহণ করেন ব্যাটাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। গ্র্যাজুয়েট হবার দুদিন পরে পুস্তিকা লেখার অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং দেড় বৎসরের জন্য জেব হয়। জেল থেকে বেরিয়ে এসে কিছুদিন ওকালতী করেন। কিছুদিন পরে ডক্টর জা



দুকের অধীনে চাকুরী করেন অর্থনীতি বিভাগে গবেষণার শ্রেণীতে। ১৯৪০ সালে দুরাবারিতে ৫৪ জন সঙ্গীসহ জাপানী কর্তৃক গ্ৰাস্তার হন। জেলে তাঁকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। উক্ত সোয়েকার্নো এবং উক্ত গারীরের হান্দিগতায় তিনি যথাক্রমে ইনফর্মেশান, ইন্টারনাল সিকিউরিটি এবং ডিফেন্স দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন।

#### রাজকন্যার প্রণয়

ইংলন্ডের রাজকন্যা বাগদত্তা হয়েছেন, এ খবর ত আপনারা খবরের কাগজে আগেই পড়েছেন। রাজকন্যার ভাবী স্বামীর নাম ফিলিপ মাউন্টব্যাটেন। ফিলিপ ভারতের বড়লাট লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনের ভাগিনেয়। লর্ড



ফিলিপ, এলিজাবেথ ও মার্গারেট রোজ

লুইয়ের ভগ্নী ম্যালিসের সঙ্গী গ্রীসের রাজার ভাই অ্যান্ড্রুর বিবাহ হয়। ফিলিপ অ্যালিস ও অ্যান্ড্রুর পুত্র, এখন সে ২৫

বৎসরের বৃদ্ধক। দশ বৎসর আগে রাজকন্যার সঙ্গে ফিলিপের সাক্ষাৎ হয়, সঙ্গে থাকত ফিলিপের দুই বোন আর ছোট রাজকন্যা মার্গারেট রোজ। তখন থেকেই নাকি নয়ন-বিনিময় হয়, তারপর কবে একদা হয় হৃদয়-বিনিময়। গত যুদ্ধের সময় ফিলিপ থাকত 'রয়েল আর্থার' নামে যুদ্ধ-জাহাজে, কিন্তু বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ থেকে সে প্রতি সপ্তাহে রাজকন্যার কাছ থেকে একখানি করে চিঠি পেত। ফিলিপের কোঁচনে ছোট টেবলটির ওপর যে তরুণীর ছবি ছিল তাতে লেখা ছিল 'ফিলিপকে, এলিজাবেথ'। এলিজাবেথের ড্রেসিং টেবলে থাকত ফিলিপের ছবি। বিবাহের পর রাজা ফিলিপকে উপাধি দেবেন ডিউক অফ ক্লারেন্স। আমাদের দুঃখ, বিয়েতে এক পাত খেতে পাবো না।



## প্রতীক্ষা

যশ পাল

আজকাল ত' মণ্ডীতে রেল, বিজলী বাতি, মোটর সব কিছুই হয়েছে। কিন্তু সে এক যুগ ছিল যখন ওসব কিছুই ছিল না। হামীরপুর থেকে রবালসরের পথে লোকে, মণ্ডী যেত। সে সময় বাণিজ্য হয় খচ্চরে ঝইতো নয় ত লোকে পিঠে করে পথ চলতো। সেই সময় আমি মণ্ডীর পথে কুলু গিয়েছিলাম। মণ্ডী শহর থেকে কিছু এদিকে এক আধা-ঘণ্টা পাহাড়ী মেয়েকে, বাঁশের টুকরিতে খোবানি নিয়ে পথের ধারে বসে থাকতে দেখেছিলাম। পাহাড়ীরা প্রায়ই এই রকম কিছু ফলটল নিয়ে পথের ধারে বসে যায়, আর পথচারীর সময় এক পয়সা বা দু'পয়সার সওদা বিক্রী করে। খোবানিগুলো বড়ো বড়ো আর বেশ ভালই ছিল।

আমি কাছে যেতেই পাহাড়ী মেয়েটি ভাঙা ভাঙা পাঞ্জাবীতে প্রশ্ন করলো: "তুমি কি লাহোরের বাসিন্দা?"

আমার পোষাক দেখেই বোধ হয় ওর মনে হয়েছিল যে, আমি হয়ত লাহোরের বাসিন্দা হতে পারি। ভাবলাম--আমাকে ও কি চেনে নাকি? কিন্তু কি করে? জবাব দিলাম-- "হ্যাঁ, আমি লাহোরের বাসিন্দা।"

তার চোখ খুঁসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে প্রশ্ন করলো, "তুমি পরসরামকে জানো?"

বিস্মিত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "পরসরাম? কোন পরসরাম?"

সে জবাব দিল, "পরসরাম ঠিকেরদার।"

কিছুই বুঝতে না পেয়ে আবার প্রশ্ন করলাম, "কোন পরসরাম ঠিকেরদার?"

আমি যে দিক থেকে হেঁটে আসছিলাম, সেই দিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে সে বললো, "ঐ দুটি পুঁল যে তৈরি করিয়েছিল।"

তার কথা আমি বুঝতে পারলাম না। জবাব দিলাম, "আমি পরসরামকে জানি না। হবে বা কেউ, কেন?"

উদাসকণ্ঠে সে বললো, "তুমি লাহোরের বাসিন্দা আর ওকে চেনো না! সেও ত' লাহোরের বাসিন্দা। .....পরসরাম ঠিকেরদার সে?"

পাহাড়ী মেয়েটির অধীরতা দেখে একটু নরম হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম, "কোন গিল, কোন মহল্লায় সে থাকে?"

অনেকক্ষণ চিন্তা করে এক হাত গালের উপর রেখে সে আস্তে আস্তে বললো--"গিল, মহল্লা? ..... গিল-মহল্লা নয়, সে লাহোরের বাসিন্দা। তুমিও ত' লাহোরের বাসিন্দা, ওকে চেনো না?"

ঐ স্থানীয়দের অনভিজ্ঞতায় আমি হাসতে পারলাম না। তাকে বুঝাতে চেষ্টা করলাম যে, লাহোর খুব বড়ো শহর। বেশি না হোক, দুই লাখ আড়াই লাখ লোক লাহোরে বাস করে। সেখানে এক একটি মহল্লায় এত লোক থাকে যে, একজন অপরের চিনতে অক্ষম। আমি থাকি হারামমণ্ডীতে। যদি পরসরাম ঠিকেরদার মজ্ঞাও থাকে, তবে সে আমার ঘর থেকে সড়ে

তিন মাইল দূরে থাকে, যদিও সে লাহোরে থাকে, আর আমিও লাহোরেই থাকি, আর আমাদের মধ্যে থাকে আরও লাখখানেক লোক। আমার কথা স্থানীয়লোকটি বুঝতে পারলো না। তার চোখের প্রসন্নতা উবে গেল। গালে হাত দিয়ে মৃদুস্বরে সে বললো, "সে লাহোরের বাসিন্দা, লম্বা, ফর্সা, মিষ্টি মিষ্টি চোখ; তোমার চেয়ে একটু জোয়ান--সাদা সাদা কোট পরে, সিলেক্ট পাগড়ী বাঁধে--সে লাহোরের বাসিন্দা।"

আমি দুঃখিত হয়ে জবাব দিলাম, "না, আমি চিনি না।"

তার টুকরির পাশে উপড় হয়ে বসে খোবানিগুলো বেছে বেছে রুমালের উপর রাখতে লাগলাম। সহানুভূতির স্বরে তাকে প্রশ্ন করলাম, "তোমার কি তার সঙ্গে কোন কাজ ছিল?"

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস টেনে নিয়ে সে বললো, "এখানে পরসরাম পুঁল বানাইছিল। সে আজ পাঁচ বছরের কথা, তখন সে এখানেই ছিল। যাবার সময় তাকে আমি বললাম, 'যাস নে'। সে বললে, 'আমি খুব শীগগিরই কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরে আসব।' আর সে ফেরে নি.....লাহোর ত অনেক দূর তাই না?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, অনেক দূর।" চোখে তার জল এসে গেল। ঘাড় নীচু করে বললো, "জানি না, কেন সে এলো না..... জানি না কবে সে আসবে.....পাঁচ বছর হয়ে

গেল, সে এলো না। এই বলে চুপ করলো।

কিছুক্ষণ ঘাড় নীচু করে থেকেই আবার বললো, “আমি তার পথ চেয়ে থাকি, আর সে জনেই এই রাস্তার উপরেও এসে বসি। আমার অনেক কিছু কাজে বাধা পড়ে। কিন্তু মন অস্থির করে, তাই এখানে এসে বসি। আর দু’জন লোক লাহোর থেকে ফিরেচে। পাঁচ বছর হয়ে গেছে, সে আর ফিরলো না।” বলে সে চুপ করলো।

বছর পাঁচেক বয়সের একটি ছোটমতো মেয়ে এক দিক থেকে দৌড়োতে দৌড়োতে এল। আমাকে অপরিচিত লোক দেখে সে ভাবাচাখা খেয়ে গেল। কিন্তু তারপরেই আমাকে না দেখতে পাওয়ার ভাগ করে মায়ের আঁচলে মুখ লুকিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “এ তোমার মেয়ে?”

নীচু হয়েই সে মাথা নেড়ে সাই দিল। মেয়ের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে সে বললো, “এও পাঁচ বছরের হয়ে গেল। বাপকে এ এখনও দেখিনি। দেখলে চিনতেও পারবে না।”

দু’জনকে দেখতে দেখতে আমি ভাবলাম,—কবিরা বলেন, “বিরহ হলো ভালবাসার প্রাণ, মিলনেই তার মৃত্যু।” এ কি তবে সেই ভালবাসার সমাপ্তি করে দিতে চায়? এইভাবে এর প্রেম কি আবার চিরজীবী হয়ে রইবে? আবার মনে হলো, “এ স্ত্রীলোক কি বেহায়া? এর প্রেম, তাগ অথবা তপস্যার কোন নিদর্শন আছে?”

জিগেস করলাম, “কত পয়সা?”

সে বললো, “না না, পয়সা কিসের? তুমি হলে লাহোরের বাসিন্দা, তোমার কাছ থেকে আবার পয়সা কিসের?” এই বলে দুই হাতের অঙ্গুলি ভরে আমার রুমালে ষটটা ধরে খোবানি তুলে দিল।

বুঝলাম, সে পয়সা নেবে না। তার উদাস মুখের চাহনি আমার মনে খোঁচা দিচ্ছিল; উঠে যাওয়াটাও নিষ্ঠুর বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু মালপত্রসমেত ষটটা বোধ হয় বেশ দূরে চলে গেছে, এই মনে করে উঠতেই হলো। একটা আধালি বার করে আত্মীয়তার ভাব দেখিয়ে শিশুটির হাতে দিতে চাইলাম। প্রথমে সে প্রত্যাখ্যান করলো, কিন্তু আমার মনের ভাব বুঝে তার মেয়েকে নিতে দিল।

তাকে ছেড়ে আমি বস্তীর এক ধর্মশালায় গিয়ে উঠলাম। ওই রাস্তার ধারে বসে থাকা পাহাড়িনীর কথা মনের মধ্যে কেবলই জেগে উঠছিল। ভেবে দেখ, ওইখানে প্রতীকায় বসে বসে সে নিজের শেষ আনুটুকু ক্ষয় করে দেখে।

সকালে রোদ উঠলে বেড়াতে বেরলাম।

পাহাড়টো আমাকে সেই রাস্তার দিকেই টেনে নিয়ে গেল। পাহাড়ের পাশ দিয়ে মোড় ঘুরে দেখলাম, স্ত্রীলোকটি নিজের ক্ষেতে আগাছা পরিষ্কার করছে। পথচারীদের শব্দ শুনে রাস্তার দিকে মাঝে মাঝে এক নজর দেখে নিচ্ছে বলে মনে হ’লো। বাখা আর প্রমে ক্রান্ত শরীরটাকে তার খাঁচিয়ে রেখেছে আশার একটা মেন্দুর হাওয়া—পরসরাম ফিরে আসবে, সেই আশা।

আমাকে দেখে তার মুখে একটা ফিফে হাসি খেল গেল। হাতের কোদাল এক পাশে সরিয়ে সে বললো, “কি, লাহোর ফিরে যাচ্চো?”

বললাম, “না, এমনি একটু বেড়াতে বেড়াতে এসেচি।”

আমি তার ক্ষেতের মধ্যে চলে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, “পরসরাম এখানে কতদিন ছিল?”

পাহাড়িনী জবাব দিল, “আট মাস। বলেছিল, ‘শীগগিরই ফিরে আসব।’ এখনও এলো না। কি জানি কবে আসবে। মেয়েটাও এতো বড়ো হয়ে গেল।”

জিগেস করলাম, “তা তুমি ওর সঙ্গে লাহোর চলে গেলে না কেন?”

গালে হাত রেখে সে বললো, “হাঁ, আমি যাইনি। পরসরাম ত’ বলেছিল, ‘তুই চল’। কিন্তু আমি যাইনি। ভেবে দেখ, আমি যাই কেমন ক’রে? এখানকার সব কিছু ছেড়ে আমি কেমন ক’রে যাই। ওই সামনে খোবানির গাছ, ওই ন্যাশপাতি, আপেল, আর দুটো আখরোটের গাছ। এখান থেকে কোনদিন কোথায়ও যাইনি। শুধু একবার ছোট বেলায় আমার মাসী ওই নীচে তার আপন গাঁয়ে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। অনেক দূর তার বাড়ি। প্রায় দশ রোশ হবে। সেখানে সব কিছুই যেন কেমন কেমন ধরণের। না আছে পাহাড়, না আছে বিয়াস্-নদীর এই কলকল শব্দ, না আছে এমন গাছ। সবই যেন কেমন রুদ্ধ। সেখানে আমার অসুখ হয়ে পড়লো। তখন আমার মেসো পিঠে করে আমাকে এখানে নিয়ে আসে। আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। আমি কখনো কোথায়ও যাইনি। লাহোর ত’ অনেক দূর, সেখানে হয়তো লোকে অসুখ হয়ে পড়ে। পরসরামের জন্যে আমার বড়ো ভয় হয়। কে জানে, কেমন আছে? আমাদের এখানে অসুখ বিসুখ হয় কদাচিৎ। যদি কখনো হয়ও, তাহলে হদ্দ জোলা এসে ঝাড় ফুৎক করে দেয়। ভালো ঝাড় ফুৎক করতে পারে লাহোরে কি এমন লোক আছে?”

আমি বললাম, “হাঁ, থাকবে না কেন, অনেক আছে।”

তুফটিতে মাথা নেড়ে সে বললো, “আচ্ছা!”

একটু ইতস্ততঃ করে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, “পরসরাম আসবার আগে তোমার বিয়ে হয় নি?”

সে বললো, “বিয়ে ত’ হরোঁছিল, অনেক আগে। বিয়ের পর আমার স্বামী তবু আমাকে নিয়ে যায়। সেখানে আমার ভালো লাগল না। অসুখ হয়ে পড়লাম। আমার সতীলি আমাকে ধরে মারতো। আমি এখানেই ফিরে এলাম। আমার স্বামী কখনো কখনো এখানে এসে থাকতো। বিয়ের তিন বছর পরে সে গেল মরে। আমি মায়ের কাছে রইলাম। পরসরামকে আমি বলেছিলাম, ‘এখানে সব কিছু আছে, তুই কোথাও যাস্ নে।’ সে বলেছিল, ‘শীগগিরই আমি এসে যাব।’ পাঁচ বছর কেটে গেল, এখনও সে এলো না। সেখানকার, কবে আসে? আজ দু’বছর থেকে মাও ত’ নেই।”

চতুর্থ দিন অপরাহ্নে আবার আমি ওদিক দিয়ে ফিরলাম। মাথা নীচু করে সে নিজের ক্ষেতে কাজ করছিল। গদু গদু করে কি যেন সে গাইছিল। ক্যানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। হয়তো বিরহের গান গাইছে, হয়তো বা বিগত দিনের কথা স্মরণ করছে। তার ধ্যানে বাখা দেওয়া উচিত মনে করলাম না। ফিরে এলাম।

মণ্ডীতে ছিলাম সন্তাহখনেক। কুলুহ দিকে রওনা হবার আগে তার সঙ্গে একবার দেখা করতে গেলাম। আনমনে সে নিজের ক্ষেত সাফ করছিল। তার মেয়ে ক্ষেত থেকে তোলা ঘাস ছুটে গিয়ে বাইরে ফেলে আসিছিল।

আমি বললাম, “আজ চললাম।”

উৎসুক হয়ে সে জিগেস করলো, “লাহোর?”

বললাম, “হাঁ। এখন কুলু যাবি, সেখান থেকে লাহোরে ফিরবো।”

অত্যন্ত নম্রভাবে সে বললো, “পরসরামকে আমার কথা অবিশ্যি বোলো। বোলো—সারা দিন আমি পথের দিকে চেয়ে থাকি। অনেক অপেক্ষার পাঁচ বছর কেটে গেল। এখন অবিশ্যি তুই ফিরে আস। তোর মেয়ে তোকে কত ডাকে।” বলবে ত’?”

বললাম, “নিশ্চয়ই বলবো।”

মেয়েকে সন্নেহে সে বললো, “দেখ, বাবু, যাচ্ছে তোর বাপের কাছে। বাবুকে সেলাম কর। তোর বাপকে বাবু পাঠিয়ে দেসে।”

শুধু একটা “আচ্ছা” বলে আমি চলে এলাম। আর ওদিকে ফিরে চাইতে পারলাম না। মনে হ’লো, আমার ঘাড়ের পিছনে তার দুই চোখের দৃষ্টি ফুটো করে দিচ্ছে। মনটা অস্থির হয়ে উঠলো। বলতে পারি না কেন—সে কি পরসরামের উপর রাগ, পাহাড়ি মেয়েটির জন্য করুণা, কিম্বা পরসরামের উপর ঈর্ষা?

অনুবাদক : শান্তি লালসান



## ভারতে প্যালুডিন

অমরেন্দ্রকুমার সেন

ম্যালেরিয়ার বিষয়ে নতুন করে আর কিছু বলবার নেই। আমরা বাঙালীরা খুবই কুস্তভোগী। সমস্ত ভারতবর্ষে বৎসরে পনেরো কোটি লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়, তার মধ্যে পনেরো লাখ লোক মারা যায়; এর ওপর ম্যালেরিয়ার জন্য কত রাজা ধ্বংস হয়েছে, কত যুদ্ধের ফলাফল নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

ম্যালেরিয়ার যে ওষুধটি আমরা গত দু'শো বৎসর ধরে ব্যবহার করে আসছি তার নাম কুইনিন। পৃথিবীতে ব্যবহৃত কুইনিনের শতকরা নব্বই ভাগ উৎপন্ন হয় যম্বুদ্বীপে, ডাচ সরকারের তত্ত্বাবধি। পৃথিবীতে যত কুইনিনের চাহিদা, ডাচ সরকার ইচ্ছা করে তদপেক্ষা কম কুইনিন উৎপন্ন করেন; যদি কোনো কারণে উৎপাদন বেশী হয়ে পড়ত তাহলে অতিরিক্ত পরিমাণ নষ্ট করে ফেলা হতো। আমাদের ভারতবর্ষে কুইনিন উৎপাদনের পক্ষে উপযুক্ত স্থান তথাপি কোন রহস্যজনক কারণে তা করা হয় না বলা শক্ত।

কুইনিন ম্যালেরিয়া সম্পূর্ণ সারাতে পারে না; সেই সঙ্গে প্লাসমোজাইন ব্যবহার করলে আরোগ্য হয়। ম্যালেরিয়ার দু'টি অবস্থা আছে, একটিতে কাজ করে কুইনিন, অপরটিতে প্লাসমোজাইন। প্লাসমোজাইন আবিষ্কার করেন দু'জন জার্মান বৈজ্ঞানিক শুল্‌ম্যান ও রোয়েল ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে। প্লাসমোজাইনের আবিষ্কার আরও গবেষণার পথ খুলে দিলে যায় ফলে জার্মানির বায়ার প্রতিষ্ঠান অ্যাটেরিন আবিষ্কার করলেন, যা এখন মেপাকুইন অথবা কুইনাকুইন নামে পরিচিত। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, উপযুক্ত কুইনিন প্রয়োগের পর শতকরা সাতাশ জনের পুনরায় জ্বর হয় কিন্তু অ্যাটেরিন ব্যবহার করার পর শতকরা বারোজন মাত্র জ্বরে পড়ে। জনৈক ইংরেজ বিশেষজ্ঞ অনেক পরীক্ষার পর প্রমাণ করেন যে, কুইনিন শতকরা সাতাত্তর জনের ম্যালেরিয়া আরোগ্য করতে পারে কিন্তু অ্যাটেরিন পারে নিরানব্বই জনের। যাই হোক, বলা যেতে পারে যে, কুইনিন, প্লাসমোজাইন ও অ্যাটেরিন, এই তিনটি ওষুধই ম্যালেরিয়ার খুব ভাল ওষুধ এবং ভারতবর্ষে তাদের চাহিদা খুব বেশী। কিন্তু দু'মুখের বিষয়, এই তিনটি ওষুধই আমাদের

দেশে গত সাত বৎসর থেকে পাওয়া যাচ্ছে না; যেটি পাওয়া যায়, মেপাকুইন, সেটি নানা কারণে আমাদের দেশে জনপ্রিয় হতে পারে নি। যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পরও উপযুক্ত পরিমাণে কুইনিন পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েক বৎসর আগে দু'জন মার্কিন বৈজ্ঞানিক কৃত্রিম কুইনিন প্রস্তুত করেছেন তারও কি হল জানা যাচ্ছে না।

যাই হোক, কুইনিন ও অ্যাটেরিনের অভাব মেটাবার চেষ্টাতেই হোক অথবা বৈজ্ঞানিকেরা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজস্ব গবেষণায় ফলেই হোক কিংবা আর অন্য যে কোনো কারণেই হোক বৈজ্ঞানিক গবেষণারই ফলস্বরূপ ম্যালেরিয়ার আরও একটি ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। নতুন ওষুধটির নাম এম-৪৮৮৮ অথবা প্যালুডিন। ওষুধটি আবিষ্কৃত হয়েছে ইংল্যান্ডের ম্যাগেস্তারে ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির ল্যাবরেটরীতে ডক্টর এফ. এচ. কার্ড এবং ডক্টর এফ. এল. রোজ কর্তৃক। পেনিসিলিন যেমন আবিষ্কার করেছিলেন ডক্টর ফ্রেন্‌কিং, কিন্তু তা নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন ডক্টর ফ্লোরি ও ডক্টর চেইন, সেই রকম প্যালুডিন আবিষ্কার করলেন দু'জন, কিন্তু তার কার্যকারিতা নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেছিলেন ডক্টর ডি. জি. ডেভি। তিনি ওষুধটি নিয়ে চলে যান অস্ট্রেলিয়াতে, সেখানে মেপাকুইনের সঙ্গে এর পরীক্ষা আরম্ভ হয়। অচিরেই দেখা গেল যে নতুন ওষুধ মেপাকুইন অপেক্ষা রোগ দমন করতে অথবা আরোগ্য করতে অনেক ভাল। প্যালুডিনের একটি বড়ি খেলে জ্বর ছেড়ে যায় এবং কুইনিন, অ্যাটেরিন অথবা মেপাকুইনের মতো এর কোনো প্রতিক্রিয়া নেই, যেমন কান ভেঁ ভেঁ করা, মাথা ঘোরা, গা বমি বমি করা অথবা গায়ের রং হলুদে হয়ে যাওয়া।

১৯৪৬ সাল থেকে ভারতে প্যালুডিনের পরীক্ষা সূর্য, হয়; ম্যালেরিয়া ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া এই কার্যের ভার নেন। বহু গ্রামের বহু ডাক্তারখানায় প্যালুডিন দেওয়া হতে লাগল; খবর যা আসতে লাগল তা বেশ আশাবাদ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রথম পরীক্ষা দূর করা হল বেলুচিস্থানের একটি গ্রামে। গ্রামটি কোয়েটা থেকে ছয় মাইল দক্ষিণে, নাম কোঁচবেগ, ম্যালেরিয়ায় ভর্তি। দু'জন ডাক্তার,

একজন ল্যাবরেটরীর সহকারী এবং একজন গবেষক; এই চারজন একত্রে কাজ আরম্ভ করলেন। একটি মাটির ছোটখাটো ডাক্তারখানাও খোলা হলো। গ্রামের অধিবাসীরা খুবই সরল, থার্মোমিটার অনেকে চোখে দেখেনি। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত কোনো রোগী এলেই একটি নতুন পদ্ধতি দ্বারা সংগে সংগেই তাদের রক্ত পরীক্ষা করে ম্যালেরিয়া জীবাণু দেখে নেওয়া হতো। সমস্ত রোগীদের মধ্যে তিন ভাগকে প্যালুডিন আর এক ভাগকে মেপাকুইন দেওয়া হত। উদ্দেশ্য, দু'টি ওষুধের তুলনা করা। এই রকম করে ৫৬০ জন রোগীকে ওষুধ দেওয়া হলো। দেখা গেল যে, তিনটি মাত্র প্যালুডিনের বড়ি বারোটি মেপাকুইনের সমতুল্য। তিনদিনে তিনটি প্যালুডিনের বড়ি খেলে জ্বর সেরে যায়। আরও দেখা গেছে যে, শতকরা আট থেকে দশজনের আবার জ্বর হয়। বাংলা, যুক্তপ্রদেশ ও আসামেও পরীক্ষা করে ভাল ফল পাওয়া গেছে; শতকরা ৯০ জন তিনশত মিলিগ্রাম প্যালুডিন খেয়ে ম্যালেরিয়ামুক্ত হয়েছে। আজকাল প্রায় প্রত্যেক ভাল ডাক্তারখানায় প্যালুডিন বিক্রয় হচ্ছে। প্রতি বড়ির দাম মাত্র কয়েক পয়সা; তবে কয়টি বড়ি খেতে হবে সেটা ডাক্তারবাবুদের জিজ্ঞাসা করে নেওয়া উচিত।

প্যালুডিনের পরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি। যারা পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগছে তাদের কয়টি বড়ি খাওয়ানো উচিত, কতদিন খাওয়ানো উচিত এবং পুরাতন ম্যালেরিয়া একেবারে সেরে যাবে কিনা, ভবিষ্যতে আবার জ্বর আসবে কিনা, এসব পরীক্ষা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। তবে এসঙ্গে একথাও বলা উচিত যে, শুধু প্যালুডিন খেলেই হবে না, যাতে মশা আর জমাতে অথবা আমাদের না কামডাতে পারে তার ব্যবস্থাও করতে হবে। ইতিমধ্যে ডি-ডি-টি আবিষ্কৃত হয়েছে। প্যালুডিন এবং ডি-ডি-টি সম্বন্ধে যতটা শোনা যাচ্ছে তার অর্ধেক কাজ পাওয়া গেলেও ম্যালেরিয়া তাড়াতে বেশী সমর লাগবে না।

উড়িষ্যা সরকার প্রচুর টাকার প্যালুডিন কিনেছেন; কি ফল হয় জানবার জন্য আমরা অপেক্ষা আছি।



শহরের কোলাহল থেকে দূরে পালিয়ে এসেছি। বটো ও মেকী, ময়লা ও ভেজাল ডিঙিয়ে কয়েকটা দিন তফাতে থাকার ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু মেক-আপ মার্কা শহরের হাত থেকে রেহাই পেলো না। শহর আমার পিছু নিলো। টাকা রোজগারের জন্যে সব কিছু করার অধিকার মানুষের আছে—এ রকম নীতি আমি মানিনে। মানুষ মানুষ, মানুষ কখনো পশু হতে পারে না—এইটাই মূলনীতি বলে মনে নিয়েছিলাম। তাই শহরের পাল্লা থেকে একটু রেহাই-এর মতলবে এই ক্ষুদ্র গ্রামটিতে আমার আগমন। মাত্র কদিনের জন্যে।

কিন্তু শহরের সবুর সইলো না। ঘোড়ার রূপ ধরে তাড়া করে এলো আমাকে। বাঁশ ও বাখারী দিয়ে তৈরী ঘোড়ার কাঠামোর ওপর কালো কাপড় মুড়ে একটা ঘোড়ার মূর্তিতে দাঁড় করানো হয়েছে। একটা আস্ত মানুষ তার মধ্যে ঢুকে ঘোড়ার খেল দেখতে দেখতে একেবারে আমার আস্তানার সামনে হাজির। আমরা কজন মিলে নিরিবিবি তাস পিটিছিলাম। একপাল ছেলের কঙ্গরব-কোলাহলে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, বাচ্চা-কাচ্চাদের ভিড়ের মাঝখানে শপাশপ চাবুক খেয়ে খেয়ে একটা ঘোড়া দাবড়ে বেড়াচ্ছে—কখনো মাথা খাড়া করছে, কখনো মাথা নীচু করে চক্কা করে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললাম। পরসো রোজগারের জন্যে এই বেটা পশু সেজেছে। সাদা পশু হতে না পারায় একে নকল পশু সাজতে হয়েছে। সোজা কথা, পশু না হলে যদি পরসো না মেলে, আর সত্যিকারের পশু বনে যাবার পরো সামর্থ্য যদি না থাকে, তাহলে যেন-তেন-প্রকারে কোন-গতিকে একটা পশু সাজতে হবেই। ঘোড়া-বেশীর মনের কথা হয়ত এই। দেখলাম, লোকটা পরসো পাচ্ছে। বাচ্চা-কাচ্চা ও সেই-সঙ্গে তাদের মা-দিদিরাও খুঁসি হয়ে খিলখিল করে হাসছে, আর পরসো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে।

উপভোগ আমরাও করছিলাম বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে বড় বিরক্তিও ঠেকছিলো। ভাব-ছিলাম, কেন লোকটার করে খাবার আর কোনো

পথ কি ছিলো না? চানাচুর বেটা, শোন-পাঁপড়ি ফিরি করা, রিক্সা টানা। কাজের কি অভাব। একেই বলে শহুরে সভ্যতা।

আমরা সবাই হাসাহাসি করছিলাম। কিন্তু আমাদের মধ্যে অমিয়কে দেখলাম খুব নিস্তেজ হয়ে বসে কী যেন ভাবছে। অমিয় আমাদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ—পৃথিবী সম্বন্ধে তার ধারণা অনেক ব্যাপক। কেননা, সারা ভারতবর্ষটা সে চষে বেড়িয়েছে। অল্প জীবনে কত রকম যে কাজ করেছে তার ইয়ত্তা নেই।



“যত কঠিন কাজই হোক, আমি পারব!”

তার এই ভাবান্তরের কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে তেতে উঠতে আরম্ভ করলো। আমাদের কথা-বার্তার অনেক বাগ-বিদ্‌বুপ ঠাট্টা খিকার শ্লেষ ইত্যাদি সবই মেশানো ছিলো।

অমিয় গম্ভীর হয়ে কি-যেন ভাবছিলাম হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে বললো, একটা গল্প মনে পড়ে গেলো। কোদরমা থেকে গয়া যাবার পথে ট্রেনে এক ভদ্রলোকের কাছে শোনা গল্প।

বললাম, গল্প এখন থাক্। খেলাটা জ'মে এসেছে, সব মাটি হবে তাহলে। এখন গল্পে দরকার নেই।

অমিয় নির্বিকারভাবে বললো, তবে থাকগে।

মৃগাঙ্ক বললো, কিসের গল্প, যোদ্ধার? রেস-কোর্সের?

অমিয় মৃচকি হেসে বললো, উই, শিম্পাঞ্জি! রিক্সা-টানা, ফিরি করা অনেক লম্বা লম্বা কথা শুনছি তোদের কাছে। কিন্তু কাজ যখন জুটতে চায় না তখন হাজার চেষ্টাতেও জোটানো যায় না। বেপরোয়া হয়ে মানুষকে আত্মহত্যাও যেমন করতে হয়, তেমনি জানোয়ারের ভূমিকায় স্লেও করতে হয়।

ভূমিকা শুনে আমাদের মধ্যে আগ্রহ বেড়ে উঠলো। আমরা সবাই সম্মুখে বলে উঠলাম, যথা—

অমিয় বললো, যথা আর কী? এই যে লোকটা ঘোড়া সেজেছে—এর পেছনে ওর কী ট্রাজিডি আছে, তা আমরা কেউই নিশ্চয় জানিনে। হয়ত এটাকে ও আত্মহত্যার অলটার-নেটিভ পথ হিসেবেই নিয়েছে। হয় মৃত্যু নয় মৃচ্চিক—এই হয়ত ছিল ওর সংকল্প। এমনি একটা লোককে নাকি এমনি ভাবেই শিম্পাঞ্জি সেজে রোজগার করতে হয়েছিলো। আর তারই ফলে তাকে সিংহের কবলেও পড়তে হয়েছিলো, নাকি।

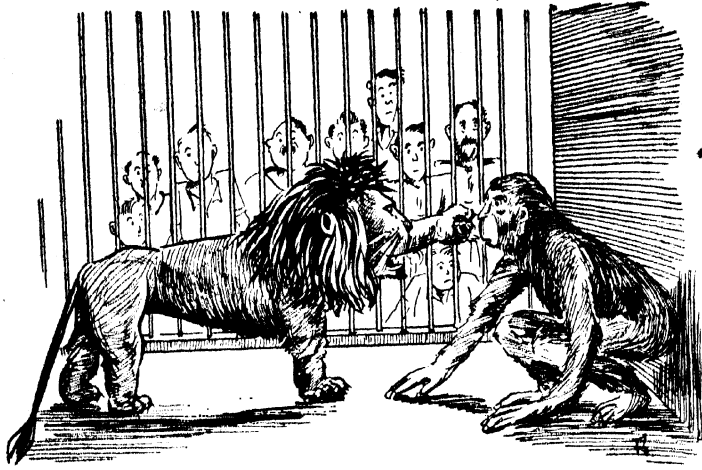
বললাম, ঠিক হয়েছিলো। পশু হবার উচিত সাজা।

অমিয় তেতে বললো, হে মানাবর মানুষ, তোমার মানসিক পশু জাহির না করলেও চলবে।

মৃগাঙ্ক বাধা দিয়ে বললো, থাক হয়েছে। এবার গল্পটা বলো।

অমিয় সিংগরেট ধরালো। এক মনে বসে অনেকক্ষণ টানলো। অনেকক্ষণ ভাবলো, মৃচকি মৃচকি হাসলো। তারপর নড়ে বসে বললো: জমিদার মাস্টারের আজব বাতিক থাকে। আমি যে জমিদারের কথা বলছি, তার বাই ছিলে চিড়িয়াখানার। জন্তু-জানোয়ারকে কয়েদ করে রাখার তার বড় সখ। আশপাশের গ্রাম থেকে দলে দলে লোকজন তার তালুকে এসে চিড়িয়া-খানা দেখার জন্যে ভিড় করবে—এটা ছিল জমিদারের মস্ত আত্মতৃপ্তি। ছোট জমিদারী, কিন্তু সখটা সে তুলনায় মস্ত। তবু খেয়ে না খেয়েও একটা চিড়িয়াখানা গড়ে তোলা হলো। হাতী সিংহ, ঘোড়া, জিরাফ, শিম্পাঞ্জী, বাঘ, ভালুক ইত্যাদি নানা জাতের জীব কুড়িয়ে-কাচিয়ে এনে জড়ো করা হলো। আসল কথা, সত্যিকার একটা চিড়িয়াখানাই তৈরি হলো। এই চিড়িয়াখানা তদারক-তন্বির করার জন্যে সুপারিন্টেন্ডেন্টও রাখা হলো।

যা ভাবা গিয়েছিলো, চারদিক থেকে প্রত্যহ লোকজন চিড়িয়াখানা দেখতে আসতে লাগলো। প্রথমে স্ত্রী দেখাবার ব্যবস্থা ছিলো। কিন্তু



“চুপ কর ব্যাটাছেলে, তোরও চাকরী যাবে, আমারও যাবে।”

চিড়িয়াখানার খরচ দেখে জমিদারের চোখ কপালে উঠলো। অবশেষে লোকজনের কাছ থেকে খরচার টাকাটা তুলবার জন্যে জনপ্রীতি দৃ-আনা করে টিকিটের ব্যবস্থা চালু করা হলো। অগত্যা। এতেও ভিড় কমলো না দেখে জমিদার আশ্বস্ত হলেন। আর টাকা ঢালতে তিনি রাজি নন, টিকিটের টাকায় যদি চিড়িয়াখানা চলে তো চলুক, নইলে এটা তুলে দিতেও তিনি পিছু-পা হবেন না। এমনি ঠিক করে ফেললেন।

মাঝখান থেকে মৃগাংক বললো, অর্থাৎ সংখ্যিটে এসেছে।

কবিশ্ব করে আমি বললাম, যত সাধ ছিলো সাধা ছিলো না।

অমিয় বললো, এইভাবে কয়েকটা বছর কেটে গেলো। কোন জানোয়ার মরলে সেটা আর রিপ্লেস করা হয় না। যা আছে, তাই দিয়ে চালিয়ে যেতে হবে—এই ছিলো সুপারি-টেণ্ডেন্টের উপর অশ্রু। কিন্তু চালিয়ে নিয়ে যাওয়াও তো মুশ্কিল। জন্তুর সংখ্যা কমলে দর্শকেরও সংখ্যাও যে সেই হারে কমে আসে। এতে রাজস্বের মাথাও যে নেমে যায়। কি ভাবে দর্শকের সংখ্যা বজায় রেখে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, এও একটা ফ্যাসাদ। বেশি গাইগাই করলে চিড়িয়াখানাই তুলে দেবে হয়ত, তার চাকরিও হবে খতম। মহা মুশ্কিলে পড়লো সুপারি-টেণ্ডেন্ট। তার চেয়ে প্রাণপণে টেনে-কষে চালিয়ে নিতে পারলে চাকরিটা টিক থাকবে। চাকরি বজায় রাখার জন্যে সুপারি-টেণ্ডেন্টের চেষ্টার চূড়ান্ত নেই।

বেচারীর যখন এই দুর্দশা, তখন তারই কাছে একজন চাকরির উমেদার এসে হাজির। উমেদার লোকটার চোখ কোটরে ঢুকে গেছে, পেট গিয়ে পিঠে ঠেকেছে—রেগড়লার ধুকছে। চাকরি তার একটা চাই-ই। নইলে আত্মহত্যা তাকে করতেই হবে। বিস্তারিত আবেদন শুনেও

সুপারি-টেণ্ডেন্ট অটল হয়ে বসে রইলো, বললো—কোন উপায় নেই।’ উমেদার ব্যর্থ মনোরথ হয়ে চলে যেতে যেতে নিজের মনেই হয়ত বললো, ‘শেষ চেষ্টা করলাম। আজ আত্মহত্যা নির্বাং।’ কথাটা শুনে সুপারি-টেণ্ডেন্ট টান হয়ে বসলো। ডাকলো ‘শুনুন।’ লোকটা ফিরে এলে বললো, ‘একটা চাকরি দিতে পারি। কিন্তু কাজটা বড় কঠিন।’ বেপরোয়া উমেদার বললো, ‘পৃথিবীতে আত্ম-হত্যার মত কঠিন কাজ কিছু থাকতে পারে না—আমি তাতেও রাজি, তখন সব কাজই আমার সাধের মধ্যে। যত কঠিন কাজ হোক, আমি পারবো।’ সুপারি-টেণ্ডেন্ট অনেকক্ষণ তার মূখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, ‘দেখুন, শিম্পাঞ্জি সাজতে হবে।’ লোকটা এগিয়ে এসে বললো, ‘পারিষ্কার করে বলুন।’ সুপারি-টেণ্ডেন্ট বললো, ‘ব্যাপারটা হচ্ছে—আমাদের এই চিড়িয়াখানার শিম্পাঞ্জিটা কিছদিন হলো মরে গেছে। অবস্থা তো বৃদ্ধিতেই পারছেন, নতুন আর একটা কেনা সম্ভব নয়। তাই চামড়াটা আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি। আপনার ডিউটি হবে, সেইটি পরে লোকজনদের সামনে লাফ-ঝাঁপ করা, অগভগাী করা, এক কথায় যারা এখানে দেখতে আসবে তাদের খুসি করা। শিম্পাঞ্জীটা মারা যাবার পর দর্শকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে—এতে চিড়িয়াখানা চালানো কত কষ্ট বোঝেন তো?’ উমেদার লোকটি চট করে রাজি হয়ে গেলো। মাইনে রফা হলো মাসিক তিরিশ টকা।

বললাম, এই গম্প বলার জন্যে এত ভগিতার দরকার কী ছিলো?

অমিয় বললো, আর একটু বাকি আছে।

মৃগাংক বললো, যাক, আর শুনতে চাইনে।

তাসে আমার মন টানছে।

অমিয় বললো, এতটাই যখন শুনলে,

শেষটাও শোনো তবে।

বিরক্ত হয়ে বললাম, বলো—

অমিয় বললো, শিম্পাঞ্জীর ভাব-ভগাী, লাফ-ঝাঁপ দেখার জন্যে আবার পিলপিল করে লোকজন আসতে আরম্ভ করলো। ওদিকে জিরাকের এনক্লোজার, এদিকে সিংহের খাঁচা—চার পাশ উঁচু লোহার গরাদ দিয়ে তৈরি, ওদিকে গাছতলায় পায়ে শেকল-বাঁধা হাতী। লোকজন যারা আসে তারা শিম্পাঞ্জিই দেখতে ভালবাসে বেশি। এবারকার শিম্পাঞ্জিটা বেশি জ্যান্ত, লাফ-ঝাঁপে ভারী ওস্তাদ। তার ওপর রিং খেলা জানে, প্যারালাল বারের খেলা জানে। ভাবভগাীতেও ভারী পটু। গালে হাত দিয়ে বসে কবির মত ভাবতে থাকে, পর মূহুর্তেই আবার হাত দুটো লিড়িয়ে লিড়িয়ে দু’পায়ে ধিন ধিন করে নাচতে থাকে। তার এই এফিশিয়েন্সির জন্য তার ইতিমধ্যে পাঁচ টাকা ইনিরমেট হয়ে গেছে—সুপারি-টেণ্ডেন্ট তার কাজ দেখে বড় খুসি। আগের শিম্পাঞ্জি লোক এখন চিড়িয়াখানায় আসছে। শিম্পাঞ্জির নাম চারদিকের গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। রোপ-ক্রাইসিং পর্যন্ত জানে এই শিম্পাঞ্জীটা।

কিন্তু হঠাৎ একটা অ্যাকসিডেন্ট করে বসলো এই শিম্পাঞ্জি। সেদিন সব চেয়ে উঁচু রিং দুটো ধরে অনেক রকম খেলা দেখাবার পর খুব জোরে দোল খাচ্ছিল। হঠাৎ রিং থেকে হাত পিছলে গিয়ে উঁচু গরাদ ডিঙিয়ে ধপ করে গিয়ে শিম্পাঞ্জিটা পড়লো একেবারে সিংহের খাঁচার মধ্যে। পড়ার ধাক্কাটা সামলে নিয়েই সম্মুখে দেখে হিংস্র জন্তুটা চার থাবায় ভর করে বসে আছে। দর্শকের দল প্রথমটা হকচাকিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু যখন দেখলো দুটো জন্তু চুপচাপ বসে আছে—তখন তারা মজা দেখার জন্যে সেদিকে ছুটলো।

মৃগাংক সরে এসে বসলো, বললো, তারপর কি হলো?

অমিয় বললো, আর আবার কি। এবার ইতি।

বললাম, শিম্পাঞ্জীটিকে ছিড়ে টুকরো টুকরো করলো নিশ্চয়।

অমিয় বললো, প্রায়। সিংহটা কেশর নেড়ে চোখ দুটো রক্ত রাঙা করে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগলো শিম্পাঞ্জির দিকে। দর্শকরা চেঁচামেচি শুরু করে দিলো। খাঁচার মধ্যে আমাদের শিম্পাঞ্জি ভুললোকাটি ভয়ে থর থর করে কাঁপতে আরম্ভ করে দিয়েছে। আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সে সাজলো জানোয়ার, কিন্তু জানোয়ার সজেও তার রেহাই নেই। সিংহটা তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

ভীষততে আমার প্রাণ ভরে উঠছিলো। বললাম, মানুষ যদি জানোয়ার সাজে তাহলে তার এমনি শাস্তি হওয়াই দরকার। তারপর

কি হলো শুন।

অমিয় বললো, হবে আর কি! বা হবার তাই হলো। সিংহ আরও একটু এগিয়ে এলো। শিম্পাঞ্জি দেয়ালে পিঠ চেপে দৃঢ়তা বন্ধ করলো। তাকিয়েই দেখে সিংহটা আরও একটু এগিয়ে এসেছে। ভয়ে শিম্পাঞ্জি কাদ কাদ গলায় বলে উঠলো—ওরে বাবা!

শিম্পাঞ্জির কথা শুনে সিংহ চটে তার গালে সজোরে এক চড় ক'বে দিয়ে সিংহাচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে ঘড়-ঘড় শব্দ করে বললো, 'চুপ কর বেটাছেলে। নইলে তোরও চাকরি যাবে, আমারও যাবে।'—সুপারিন্টেন্ডেন্টের গলা। পরিচিত গলা শুনে শিম্পাঞ্জিটা আশ্বস্ত হলো। নিজেদের কোলাহলে দশ'করা

কিছু শুনতে পেলো না।

ঘরময় সবাই হো-হো করে হেসে উঠলো। হাসির শেষে বললাম, এটা কি তোমার আত্ম-জীবনের প্রথম অধ্যায় থেকে বললে, অমিয়। নইলে এত দরদ, জম্ভু-জানোয়ারের ওপর এত মায়া।

অমিয় মূর্চ্চক হাসলো।

## সাহিত্য প্রসঙ্গ

### সন্যাসী ক্রিষ্টফার ইশারউড

দ্বিধা বাগচি

প্রত্যেক চিন্তাশীল পাঠকের পক্ষে ইশার-উডের রচনার সঙ্গে সর্বপ্রথম পরিচিত হওয়া একটা কর্তব্যের সামিল এবং তা পূরণায় অনুশীলন করা অনাবিল আনন্দের বিষয়।

১৯০৪ সালে চেলসায়ারে ইশারউডের জন্ম। রেপ্টন এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের পর তিনি কিছুকাল শিক্ষকতার কাজ করেন। ১৯২৮-২৯ সালে লন্ডনের কিংস কলেজে তিনি ডাক্তারী পড়তে শুরু করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর ভাগ্যে চিকিৎসক হয়ে ওঠা ঘটল না। এ্যানাটমী ও ফিজিওলজির কণ্টকাক্ত অরণ্য থেকে তিনি একদিন কন্টিনেন্টের পথে পা বাড়ালেন—বাইরের বিশাল পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে। ১৯২৯ সালের শেষ ভাগে তিনি প্যারীতে গেলেন একজন বিশিষ্ট ফরাসী শিম্পাঞ্জির শিক্ষক এবং প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসেবে। এই সময় লন্ডন মার্কারী পত্রিকায় ইশারউড একটা ছোট গল্প লেখেন। সেই সময় অডেনও এই কাগজখানিতে কবিতা লিখতেন। লেখার মারফৎ অডেনের সঙ্গে ইশারউডের পরিচয় হলো এবং সেই পরিচয় অল্পদিনের মধ্যে বন্ধুত্ব পরিণত হয়। ১৯৩০ সালে অডেন যখন বার্লিনে, তখন সেখান থেকে তিনি ইশারউডকে বার্লিনে আসতে নিমন্ত্রণ করেন। সৌভাগ্যক্রমে প্যারী থেকেই বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী অধ্যাপকের একটা চাকরী তিনি যোগাড় করেন। অডেনের নিমন্ত্রণ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের চাকরী—এই দুটোর যোগাযোগের ফলে ইশারউড ১৯৩০ সালের মাঝামাঝি বার্লিনে যাত্রা করেন।

বার্লিন! ১৯৩০ সালের বার্লিন! হিটলারের আসন্ন অভ্যুদয় এই সময় বার্লিনে যে প্রাণচাঞ্চল্য, এর বাস্টি ও সমষ্টি জীবনে যে জাগরণ—তার অন্তরালে ক্ষমতাভাবীর যে নিরক্ষর চক্রান্ত ধীরে ধীরে অস্ত্রোপাশের



ক্রিষ্টফার ইশারউড

দুর্ভেদ্য জাল বুনছিলো—নবাগত ইশারউডের চক্ষে সেই বার্লিন আশ্চর্যভাবে প্রতিভাত হলো। একটা বিরাট ঐতিহাসিক-পন্থ জাতির রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ে জুয়ারীর মনোবাত্তনম্পন্ন এক অজ্ঞাতকুলশীল আধনায়ক সদম্ভে যে রকম ছিনিমিনি খেলা শুরু করছিলেন, তার চক্ষুঃ পরিচয় পাবার সুযোগ পেলেন ইশারউড বার্লিনে এসে। তিনি উদ্বেগ হলেই এই সময়কার বার্লিনের পটভূমিতে একখানি উপন্যাস রচনা করতে। একটা ঐতিহাসিক পরিবর্তনকে তিনি কথা-সাহিত্যে রূপ দেবার প্রচেষ্টায় প্রথমে "দি লস্ট" নাম দিয়ে একখানি উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেন। পরে তিনি সেই উপন্যাসখানিকে দুই ভাগে আলাদা নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। প্রথমটির নাম হলো, "Mr. Norris Changes the trains" এবং দ্বিতীয়খানির নাম হলো, "Sally Bowles"। প্রথমখানি প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে।

"স্যালি বোলস" আয়তনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং সেই জন্যে ইশারউড পরবর্তীকালে, "Good-by to Berlin" নাম দিয়ে যে গল্পের বইটি প্রকাশ করেন, তার মধ্যে ঐ বইখানিকে বড়ো গল্প হিসেবে স্থান দেন। এ দুখানা মূলতঃ বার্লিন সম্বন্ধেই লেখা। অবশ্য এর আগে তাঁর প্রথম উপন্যাস প্রকাশিত হয় লন্ডন থেকে। তার নাম—"All the Conspirators" এবং ইংলন্ডের প্রসিদ্ধ সাহিত্য সমালোচক সিরিল কনোলিই সর্বপ্রথম ইশারউডকে ইংলন্ডের পাঠক সমাজে পরিচিত করে তোলেন এই উপন্যাসখানির মারফৎ।

প্রথম উপন্যাসেই ইশারউড বিন্দু পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। একটা পরিবারের বিভিন্ন নর-নারীর পরস্পর-বিরোধী সংগ্রামকে কেন্দ্র করে "All the Conspirators"—এর আখ্যান ভাগ বিচিত্র এবং সুদৃঢ় শিক্ষণীয় মতোই ইশারউড সমগ্র গল্পটিতে একটা সুসংগত পরিণতির পথে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছেন। জেমস জয়েস ও হেমিংওয়ের কিছুটা প্রভাব এর মধ্যে দেখা যায়। ইশারউডের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উপন্যাসের নাম হলো যথাক্রমে "দি মেমোরিয়াল" ও "ল্যানস্‌ গ্যাংড স্যাডোজ"। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে "মিঃ নরিস চেঞ্জেস ট্রেনস্‌" উপন্যাসটি লিখেই ইশারউড উপন্যাসিকের খ্যাতি অর্জন করেন। এই বইটি প্রকাশিত হবার পর থেকেই ইশারউডের মধ্যে সমালোচকগণ মৌলিক প্রতিভা-সম্পন্ন এক লেখককে আবিষ্কার করেন এবং তাঁর সম্বন্ধে সকলে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। তাঁর বার্লিনের গল্পগুলিতে ষ্টাইলের অনন্য-সাধারণতা লক্ষ্য করার বিষয়। সেই সঙ্গে চরিত্র চিত্রণের সরস অথচ ট্রাজিক ভঙ্গী পাঠকের মন ও চিন্তাকে সহজেই আচ্ছন্ন করে তোলে। ইংলন্ডের সকল শ্রেণীর সমালোচক তাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, "Any one who omits to read it (Mr.

Norris chases trains' will miss one of the most entertaining, absolutely real and original English novels."—এবং এই উক্তি যে অত্যন্ত নয়, বইখানির পাঠক-মাত্রেই তা স্বীকার করবেন।

শিল্পীর জীবনে সবচেয়ে বড় কথা হোলো উপলব্ধি এবং এই উপলব্ধির গভীরতা এবং তা প্রকাশ করবার দক্ষতা—এই দুইয়ের সমন্বয়ের মধ্যেই রয়েছে কথা-সাহিত্যিকের যথার্থ কৃতিত্ব। এই কৃতিত্ব জনপ্রিয়তার মধ্য তাকিয়ে অর্জন করা চলে না এবং তা করলেও স্বল্পকাল স্থায়ী হতে বাধ্য। ইশারউডের সাহিত্যিক জীবনের আজকের পরিণতির দিকে তাকিয়ে মনে হয়, তাঁর জীবনে উপলব্ধির সূচনা ও শেষ বার্লিনের প্রবাস জীবনে। একজন নবাগত ইংরেজের চক্ষে হিটলারের আসন্ন অভ্যুদয়ের পূর্বকাল জার্মানীর জনসাধারণের হৃৎস্পন্দনকে ইশারউড যেভাবে উপলব্ধি করে তাকে কথা-সাহিত্যে রূপায়িত করে তুলেছেন, তার মধ্যে অনুভূতির কোনো অস্পষ্টতা নেই, চরিত্র-চিত্রণের বাহুলা নেই। উপন্যাস হিসেবে এর সবাংশীণ সার্থকতা স্বীকার করে অত্যাশঙ্কিত হলে তাই লিখেছিলেন—  
“It is the finest product of Isherwood's heart and brain; no wonder that I read it enthusiastically.”

“মিঃ নোরিশ চেস্লেস ট্রেনস”-এর নায়ক হচ্ছেন মিঃ নোরিশ। তিনি সেই শ্রেণীর ইংরেজ যাকে চিত্তার দিক দিয়ে কিছুতেই একালের মানুষ বলা চলে না। তাঁর ধরণ-ধারণ, কথা-বার্তা, আলাপ-ব্যবহার সবকিছুর মধ্যে এডওয়ার্ডিয়ান যুগের একজন খিটখিটে মেজাজের অথচ এ্যাডভেঞ্চার টাইপের ইংরেজ ভ্রমলোককে খুঁজে পাওয়া যায়। অনেক রকমের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে মিঃ নোরিশ চলেছেন তাঁর জীবনের পথে এবং যাতেই হাত দিয়েছেন—সে রাজনৈতিক প্রচেষ্টাই হোক, কিংবা সামরিক গোয়েন্দাগিরিই হোক অথবা চোরাই কোরেন বিক্রীর ব্যবসাই হোক—তাতেই তিনি ব্যর্থকাম হয়েছেন। লোকটির জীবনের প্রথম অধ্যায়ে তাকে দেখা যায় একজন কৃতবিদ্য মানুষ হিসেবে, কিন্তু তার শেষ জীবন ব্যর্থতার স্লানিতে পরিপূর্ণ। এই মিঃ নোরিশের সঙ্গেই ট্রেনে প্রথম সাক্ষাৎ হোলো মিঃ ব্র্যাডশয়ের। এই চরিত্রটির ভেতর দিয়ে ঔপন্যাসিক নিজেকেই প্রকাশ করেছেন। বাস্তবে এইরকম চরিত্রের মানুষকে বরদাস্ত করা হয়তো সোজা নয়, কিন্তু ইশারউড তাকে পাঠকের সামনে শুরুর থেকেই পরিচিত করে তুলেছেন একজন ব্যক্তিগতসম্পন্ন মানুষ হিসেবে। ইশারউড তাঁর নায়ককে তার দর্শকের অভিরুচি অনুসারে চলাফেরা করিয়ে এই কথাটা ব্যাখ্যা করেছেন যে, মানুষ যত বড় ব্যক্তিগতসম্পন্ন হোক না কেন, পারিপার্শ্বিককে সে কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারে না। যে করে সে আদৌ সুস্থ ও স্বাভাবিক নয়। মিঃ

নোরিশকে তাই তিনি এই দিক দিয়ে আকর্ষণীয় করেই তুলেছেন, পাঠকের কাছে।

ট্রেনে আলাপ হোজো দেশলাই চাওয়া নিয়ে। দু'জন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোককে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে এই সামান্য বস্তুটার কি অসামান্য সূক্ষ্ম প্রভাব, তা বইখানির আরম্ভে গ্রন্থকার সুন্দরভাবেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দু'জনে দুটো সিগারেট ধরালেন। ট্রেনের উদ্গত গতি, ভেতরে কুণ্ডলিত কুয়াশার মধ্যে বসে দু'জন অপরিচিতের কথাবার্তা, প্রনোত্তরের ভেতর দিয়ে ইশারউড ধীরে ধীরে তাঁর নায়কের পরিচয় দিয়ে চলেছেন। ইউরোপের এমন কোনো শহর নেই যেখানে মিঃ নোরিশ যাননি। কোনো শহরই তাঁর ভালো লাগেনি এথেন্স এবং প্যারী ছাড়া। কিন্তু সমগ্র উপন্যাসের কাহিনীটি বিবৃত করবার স্থান এখানে হবে না; তাছাড়া এত বহু ও বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে সমগ্র কাহিনীটি এত বেশী জীবন্ত যে সম্পূর্ণ গল্পাংশের একটা outline দেওয়া বার্থ চেষ্টা মাত্র। মূল কথাটা হোলো, একটা মানুষের কাহিনী থেকে শুরুর করে ইশারউড একটা সমগ্র জাতির কাহিনীর মধ্যে সোজা চলে গিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্তরে স্তরে বিবৃত হয়েছে আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রাক-হিটলার জার্মানীর কথা; সংবাদ-পত্রের রিপোর্টারের চোখ দিয়ে দেখার মধ্যে আর একজন শিল্পীর চোখ দিয়ে দেখার মধ্যে মূল পার্থক্যটা যে কি, তা বুঝতে হোলো এই বইখানি পড়তে হবে।

তারপর জার্মান জাতিকে নিয়ে লেখা তাঁর গল্পসমষ্টি “Good bye to Berlin” এই নাম নিয়ে যখন বেরুলো তখন ইশারউডের অসংখ্য অনুরাগী পাঠকদের মধ্যে কেউই বুঝতে পারেননি যে ঔপন্যাসিক ইশারউডের সঙ্গে এই তাদের শেষ সাক্ষাৎ। মাত্র পাঁচখানি উপন্যাস লিখে আধুনিক ইউরোপীয় কথা-সাহিত্যে এবং বিশ্ব-সাহিত্যেও এই প্রতিভাবান তরুণ লেখক অপেক্ষাকৃত অল্পসময়ের মধ্যে যে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, তা অনেক লেখকের পক্ষেই ঈর্ষার বিষয়। এই জনপ্রিয়তার মূল কারণটি সম্পর্কে Lehmann বলেছেন :  
“Isherwood has a straight way of approaching the characters and gives the reader the freedom to think for himself.... His prose is easy and flowing, not a word is wasted and everything is precise and daylight clear....”  
এই কথা খুব কম লেখকের পক্ষেই বলা চলে। চরিত্রচিত্রণে ইশারউডের দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে তাহার অপূর্ব সংলাপে এবং সংলাপের মাধ্যমে একটা মানুষ কতখানি জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে তা তিনি তাঁর প্রত্যেকটা গল্প এবং উপন্যাসে দেখিয়েছেন।

“গড্‌বাই টু বার্লিন” মূলত একটা বৃহৎ উপন্যাসের কতকগুলো অসংলগ্ন অধ্যায়ের

সমষ্টিমাত্র। সম্ভবত ইশারউড একটা বিরাট এপিক-জাতীয় উপন্যাস রচনা করবেন এই-রকম মনস্থ করে এর একটা অসম্পূর্ণ কাঠামো প্রথমে তৈরী করেন। কিন্তু স্থাপত্য কাজ শেষ পর্যন্ত শেষ হয়নি। এর প্রত্যেকটি অধ্যায় তাই এক একটা গল্পের মতো এবং এর প্রত্যেকটার ভেতর দিয়ে ইশারউড জার্মানীর জনসাধারণের সুন্দর এবং মনোমুগ্ধকর চিত্র একেছেন। বইটির আরম্ভেই তিনি লিখেছেন :  
“আমার ঘরের জানলা থেকে বিশাল আয়তন রাজপথটি দেখা যাচ্ছে..... একটা বিরাট জাতির ভূনাংশকে প্রত্যক্ষ করছি এইখান থেকে। আমার মনটা যেন একটা ক্যামেরা, যার সাটার খোলা আছে, যা দেখছে এবং ঠিক যেমনভাবে দেখছে, ঠিক তারই আলোকচিত্র সে সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করছে..... সেইসব আলোকচিত্রের মধ্যে অনেককেই দেখা যাবে..... দেখা যাবে ওঁদের জানলায় একজন লোক সেভ করছে এবং ঠিক তারই পাশে বাস্টবটে একজন তরুণী তার কেশের প্রসাধনে ব্যস্ত..... ক্যামেরায় ধরা এই নেগেটিভগুলো একদিন খুব যত্নের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে হবে।”

এই অভিপ্রায় নিয়েই ইশারউড কথা দিয়ে ক্যামেরার মতো যেসব চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, তার প্রত্যেকটি কোণ, প্রত্যেকটি ফোকাস, আলোছায়ার জাদু, আশ্চর্যরকমে নিখুঁত, সুন্দর এবং চিত্তস্পন্দী। অসংখ্য চিত্রের ভীড় এই বইখানিতে। কিন্তু সেগুলি চিত্র হিসেবে যেমন সার্থক, চরিত্র হিসেবেও তেমনি জীবন্ত। এদের মধ্যে “স্যালি বোল্‌স” অধ্যায়টি সবচেয়ে সুন্দর। স্যালি ইংল্যান্ডের মধ্যবিন্দু ঘরের একটি মেয়ে। ইংল্যান্ড ছেড়ে সে বার্লিন এসেছে নতুন জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে। বার্লিনে আসার পর কত লোক যে মেয়েটিকে ভাল-বাসলো এবং কতজন যে তাকে বণ্ডনা করলো তার ইয়ত্তা নেই। একজন আসে, স্যালিকে প্রেম নিবেদন করে, স্যালি বিমুগ্ধ হয় এবং তার পরের মুহূর্তেই কোথায় সে প্রশ্নীয় উধাও হয়ে যায়, বিগত স্যালী তার উদ্দেশ্য পায় না। জার্মানীর ভাণ্ডে যে অনিবার্য ট্রাজেডি আসা য়ে উঠছে, “গড্‌বাই টু বার্লিন”-এর প্রত্যেকটি গল্পে ইশারউড তার অদ্রান্ত ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন। শেষ অধ্যায়ের শেষ কথাগুলো ভারী চমৎকার : “আজকের সূর্য্যকরণের অসম্ভব প্রখরতা—এত উজ্জ্বল সূর্য্য আর কখনো বার্লিনের আকাশে দেখিনি। প্রখর অথচ মৃদু। মাথায় টুপি কিংবা গায়ের ওপর ওভারকোট না চাপিয়েই আমরা শেষ প্রাতঃভ্রমণে বের হলাম। বার্লিনের আকাশে উজ্জ্বল সূর্য্য—এবং এই শহরের ভাগ্যান্বিতা আজ হিটলার..... পথের পাশে একটা দোকানের আয়নায় নিজের মুখটা হঠাৎ দেখতে পেলাম—আর্মি হাসছি দেখে আমি আতঙ্কিত হয়ে



সিংগুরের স্মৃতি-শিবলিঙ্গ

"জ্যোতিঃ সিংগুর পশ্চিমে স্বনামঃ বসতিঃ কৃতঃ।  
হরিপালো মহাগ্রামো হটংগপীসমন্বিতঃ॥ ৬৭৯।"  
পরবর্তীকালে ঘটকগণের কুলজিতেও  
সিংগুরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়; নিম্নে 'বিশ্বকোষ'  
সম্পাদক স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু লিখিত  
'আদিশূর' নামক প্রবন্ধে উদ্ধৃত প্রাচীন কুল-  
পরিচয় বিষয়ে কবিতাটি লিখিত হইলঃ

"আকনাতে গেল ঘোষ, মাহিনাতে বন্দু।  
বাঁড়িয়া রাহিলা মিত্র, দংশে রহে কিহু॥  
বালিতে রাহিলা দত্ত, প্রতাপ প্রচুর।  
রহুগ্রামে গেল সেন, দেও চৈতন্যপুরে॥  
সিংহপুরে রয় সিংহ, হরিপুরে দাস।  
পানিহাটি গত চন্দ্র, গৃহে বঙ্গবাস॥"

(পঞ্চপুস্তক—আশ্বিন ১৩৩৭)

বর্তমানে সিংহবংশীয় কেহ সিংগুরে বস-  
বাস না করিলেও, লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময়,  
দশশালা বন্দোবস্তের অব্যবহিত পরেই  
সিংগুরের স্মারকানাথ সিংহ যে বোর্ড হইতে  
জমিদারী ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ  
পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে হাট্টার সাহেব যাহা  
লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছিঃ

"The principal purchasers of the lots  
sold on the Board were Dwarka Nath  
Singh of Singur, Chhaku Singh of Bhas-  
tara, the Mukerjies of Janai and Baner-  
jies of Tahinipara." (Statistical Account  
of Bengal.)

পাঠান রাজত্বকালে সিংগুরে বহু হিন্দু-  
স্থানী অনিয়া বসবাস করেন; তাহাদের মধ্যে  
কেহ কেহ সেনাবিভাগে কার্য করিতেন এবং  
বৃত্তিবর্ষ ভূমি ভোগ করিতেন। এতদ্ভিন্ন  
বহু ভদ্র গৃহস্থ পশ্চিম হইতে এই অঞ্চলে  
আসিয়া বাস করেন। ইহাদের মধ্যে সিংগুরের  
বাবুরা বিশেষ প্রসিদ্ধ। কেবল দানশীলতা নহে,  
ডাকাতের দল রাখিবার জন্যও ইহাদের বিশেষ  
নাম ছিল। শতবৎসর পূর্বেও সিংগুরের নবাব  
বাবুকে জানিত না বা তাহা নাম শুনে নাই  
এইরূপ লোক বঙ্গদেশে খুব অল্পই ছিল।  
নবাব বাবুর প্রকৃত নাম শ্রীনাথ রায়। বহুদিন  
হইতে ডাকাতের জন্য সিংগুরে প্রসিদ্ধ ছিল  
এবং এই স্থানের ডাকাতে-কালীর নিকট প্রতি  
অমাবস্যায় নরবলি দেওয়া হইত। অব্যাপ

জগলাকীর্ণ বৃহৎ ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে কালী-  
মাতার ভীষণ মূর্তি বিরাজিতা আছে।

নর-বলি কেবল যে আমাদের এই দেশে  
প্রচলিত ছিল তাহা নহে, প্রাচীনকালে পৃথিবীর  
সর্বত্র এই প্রথা ছিল। প্রাচীন মিশরীয় সমাজে  
নরবলি হইতে সর্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়।  
ডায়ডোরাস বলেন, "মিশরের নৃপতিগণ  
লোহিতকেশ লোকদিগকে ওদিসিস দেবতার  
নিকট উৎসর্গ করিয়া বলি দিতেন। (Diodo-  
I, Page—88) মিশরের অপেক্ষা সভ্যতায়  
উন্নত রোমীয় সমাজে বিজিত বর্নদিগকে হত্যা  
করিয়া রোমানরা আনন্দ উৎসব করিতেন।  
বহুকাল এই প্রথা প্রচলিত ছিল কিন্তু রাজকীয়  
আইন দ্বারা এই প্রথা রোমীয় সমাজে হইতে  
রাহিত করা হইয়াছে। (Pliny—XXX, Page  
3). এতদ্ভিন্ন গ্রীক সমাজে ও এথেন্স নগরে  
এপোলো দেবতার পূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর  
একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী বলি দেওয়া  
হইত। (Indo-Aryans, Vol.—II, Page  
53). সুতরাং বঙ্গদেশের কপালকগণই যে

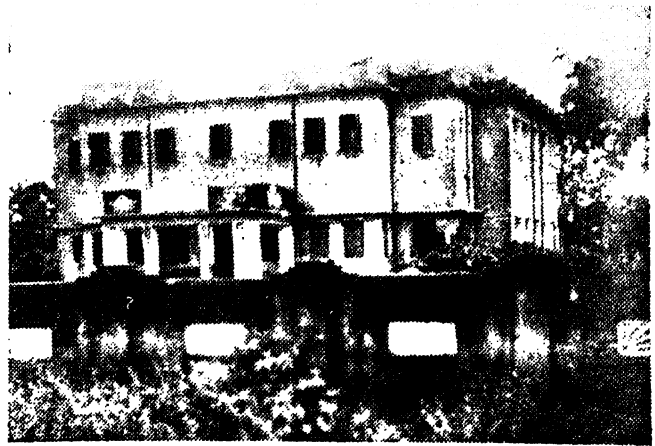
কেবল নরবলি দিত তাহা বেন কেহ মনে  
করেন।

ডাকাতের জন্য সিংগুর এবং হরিপা  
বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। এই ডাকাতি দমন করিবার  
জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও ইংরাজ সরকার  
কুলকিনারা করিতে পারেন নাই। ইহা রো  
করিবার জন্য ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে একটি ডাকাতী  
কমিশন (Dacoity Commission) প্রতিষ্ঠা  
করা হয়। উক্ত কমিশনের রিপোর্ট হইতে নিম্নে  
কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিতেছি।

"Gang-robbery or dacoity is one of  
the most prevalent of Indian crimes.  
Armed with clubs, swords and torches  
they attack a defenceless family or way-  
lay some unguarded boat... but in this  
country crime is difficult to reach, more  
difficult still to eradicate. We have to  
deal with a people who are too apathetic  
to exert themselves individually for the  
suppression of the crime, and with land-  
owners, who too often are more inter-  
ested in sheltering the criminal than in  
giving him up to Justice." (Bengal Under  
the Lieutenant Governor, Vol. I, p. 173)

সিংগুরের বাবুদের পূর্ব হইতেই ডাকাতি  
প্রসিদ্ধ ছিল; কেবল সিংগুরের বাবুরা নহে  
বাঙলা দেশের বর্তমান বহু প্রসিদ্ধ বংশে  
পূর্বপুরুষগণ তৎকালে যে ডাকাতি ছিলেন  
তাহা আজ অম্বীকার করিবার উপায় নাই  
সেই জন্যই বাঁকিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন "আমরা  
যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ের অনেক  
জমিদারই দস্যু ছিলেন।" যাহা হউক সিংগুরের  
বাবুদের বংশে নবাব বাবু ডাকাতিদের পৃষ্ঠপোষক  
ছিলেন বলিয়া সন্দেহে ঠগী দমনের বড় কঠ  
ওয়ার্থ সাহেবের তিনি সুনজরে পড়িলেন  
এবং সেইজন্য হুগলী জেলে তাহাকে আবদ্ধ  
রাখা হয়।

পাঞ্জাব প্রদেশের সেরিনগাঁও নামক পল্ল  
হইতে নবাব বাবুর পূর্বপুরুষ গোপীনা  
ওয়ার্থ বঙ্গদেশে বাসসা করিতে আসেন এবং



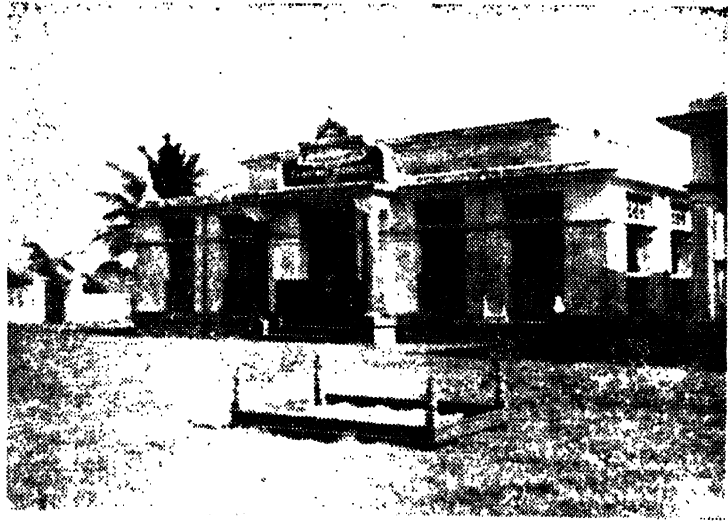
সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রস্তুত-দান



সিংগুরের তৎকালীন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি মহাতাব বাবুর বাড়িতে বিবাহ করিয়া এই স্থানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। ইহারা জাতিতে ক্ষত্রিয়। গোপীনাথের পুত্র স্মারিকানাথ ওয়াহী, সিংগুর জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা; দান ও বিবিধ ক্রিয়া কলাপাদি করিয়া তিনি তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। স্মারিকানাথ সিংগুরের নিকটে জলাঘাটা নামক স্থানে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর সুন্দর মন্দির নির্মাণ করিয়া তথায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। সিংগুরের সন্ত শিব মন্দির ও অন্যান্য বহু দেবালয়ও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন।

স্মারিকানাথের মাতুল বংশ অর্থাৎ মহাতাব বাবুর বংশের উপর, বঙ্গদেশের এই অঞ্চলে বর্গী নিবারণের ভার নবাব কর্তৃক অর্পিত হইয়াছিল এবং সেইজন্য তাহাদের বহু লাঠিয়াল রাখিতে হইত। বহুবাব এই স্থান হইতে তাহারা বর্গী বিতাড়ন করেন বলিয়া নবাব তাহাদিগকে “থানদার” উপাধি দেন। বর্তমানে এই বংশ বিলুপ্ত হইয়া যাইলেও, অদ্যাপি তাহাদের ভদ্দাসন “থানদার বাবুদের ভিটা” বলিয়া প্রসিদ্ধ।

স্মারিকানাথের চতুর্থ পুত্র (ন) ছেলে) শ্রীনাথ রায় বাবুয়ানার জন্য ‘নবাব বাবু’ (ন) বাবু হইতে, নবাব বাবু) বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহার নায় সুপুরুষ ব্যক্তি তৎকালে বঙ্গদেশে খুব অগ্ৰসর ছিল। তাহার জমিদারীর মধ্যে মেদিনীপুর মন্ডলঘাট পরগণায়, প্রজাবৃন্দের সুবিধার জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে তিনি রূপনারায়ণ নদীর বাধ তৈয়ারী করিয়া দেন। অদ্যাপি উক্ত বাধ ‘নবাব বাবুর বাধ’ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহার সময়ে তারকেশ্বরে মোহান্ত স্থাপনের সূত্রপাত হয় এবং তিনি বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও, তিলকদান পূর্বক বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কমললোচন গিরিকে তারকেশ্বরের গদিতে বসান। বঙ্গদেশে বর্ম্মমানের মহারাজার পরেই তাহার স্থান ছিল এবং অপ্রতিহত প্রভাবে তিনি শাসন কার্য নির্বাহ করিতেন। বাৎসরিক প্রায় দশলক্ষ টাকা তাহার জমিদারীর আয় ছিল। তাহার বহু লাঠিয়াল ছিল এবং ইংরাজ সরকার সেইজন্য তাহাকে ডাকাতদের পৃষ্ঠপোষক বলিয়া জেলে আবদ্ধ রাখেন, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি; তিনি হুগলী জেলেও মহা ধুমধামের সহিত সর্বপ্রথম কালীপূজা করেন এবং পূজার প্রসাদ হুগলী জেলার সর্বত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। হুগলী জেলার সাহেবরা পর্যন্ত কালীমাতার প্রসাদ খাইয়া বিশেষ তৃপ্ত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন। বর্তমানে ইহাদের ভগ্নাবশেষ হইলেও গড়খাত সমন্বিত প্রাসাদোপম অট্টালিকা, পুরাতন সন্ত শিব মন্দির, অতিথি সেবার সুবিস্তৃত আশ্রয়নাথ এবং ইহাদের পূর্ব সম্মুখের পরিচয় দিতেছে। শ্রীযুক্ত অবনীনাথ বর্ম্মণ বর্তমানে এই বংশের প্রধান ব্যক্তি।



মধুসূদন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

সিংগুরের সহিত বঙ্গ সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এইস্থানে প্রসিদ্ধ গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা দলের সংগীত রচয়িতা ভৈরব হালদার বসবাস করিতেন এবং তিনি সিংগুরের অধিবাসী ছিলেন। তাহার গানগুলি অতি সহজ, সরল ও সুসুললিত ভাষায় রচিত হইত এবং ইতরভদ্র সকল শ্রেণীর লোক তাহার গান শুনিয়া বিমোহিত হইত। তিনি স্বয়ং গান করিতেন এবং তাহার কণ্ঠও অতি সুন্দর ছিল। তাহার রচিত গানের কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতে খাঁটি বাঙলা ভাষা, ভৈরব হালদারের রচনা নৈপুণ্যে কিরূপভাবে প্রকাশিত হইত তাহাই দেখা যাইবে।

মাসি, তোমার হাঁদিশ পাওয়া ভার।  
নও কাজের কাজী, ভোজের বাজী, সকল ফকিরকার॥  
বরের মাসী, কনের পিসী সেইরূপ প্রকার।  
দুপক্ষেতে আজ যাও সমানে দুকাঠি বাজাও  
ডানমতী খেলাও মাসী দেখতে চমৎকার।  
কখনও হও সতী পীর কখনো পেড়োর ফকির  
কখনও বা যুঁহিষ্ঠির ধর্ম অবতার॥  
বেড়াও তুমি যোগে যোগে  
হাড়ে তোমার ভেলকি লাগে  
মুখের টোটে ভুতও ভাগে কথাই হীরার ধার।  
কখনও হও সিঁথির ঝাঁল  
কখনও শ্যামের মুরলী  
কথাই সর্বস্ব তোমার কাজে পাওয়া ভার।  
যখন যাহার কাছে থাকু তখনি হও তার॥

এতদ্ভাবে তাহার রচিত “যাদু এমন কথা কেন বলিলি” নামক গানের প্রথম দুই-তিন লাইন আজও রাখাল বালকগণ মাঠে গরু চরাইতে চরাইতে গাহিয়া থাকে :

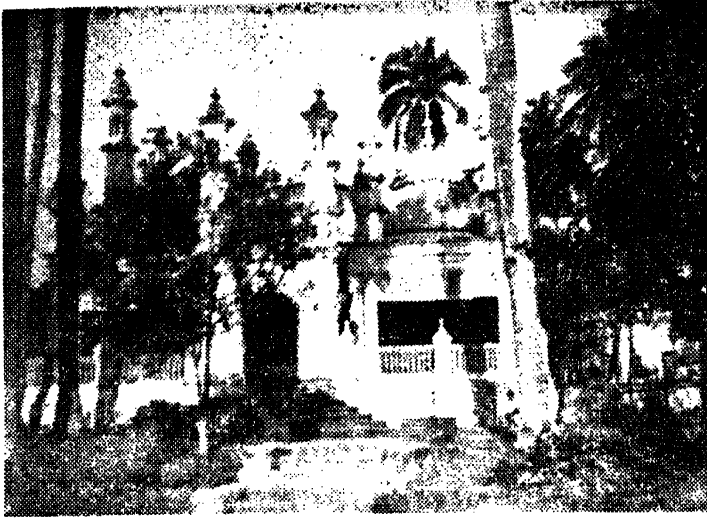
“যাদু এমন কথা কেন বলিলি  
ভোরের বেলা সুখের স্বপন  
এমন সময় আমার জাগালি।”

ভৈরব হালদার সম্বন্ধে ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ

দাশগুপ্ত যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহার কয়েক লাইন উল্লিখিত হইল।

“In Sakher Yatra none achieved so much success as Gopal Ooray. His fame spread from one end of Bengal to the other. He was invited almost from every quarter. The songs of his Vidya-Sundar Pala are still sung in Bangal. Gopal got songs composed in simple language by one Bhairab Haldar of Singur and got them also set to tune by him. With those songs he charmed his audience. The songs were so composed that they were greatly used for dancing.” (The Indian Stage, Vol. I, Page 130).

বর্তমানে সিংগুর থানার অন্তর্গত ছয়টি ইউনিয়ন বোর্ড আছে। এই ছয়টি গ্রামের নাম সিংগুর, নসীবপুর, গোপালনগর, বলরামবাটী, আনন্দনগর ও বড়া। এই গ্রামগুলির মধ্যে বহু জমিদার বংশ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তির বসবাস আছে; তন্মধ্যে সিংগুর ইউনিয়নের মধ্যে অপূর্বপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এবং বড়া ইউনিয়নের মধ্যে স্বর্গীয় রায় সাহেব নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ তাহারা দুইজনেই স্ব স্ব পিতামাতার স্মৃতিরক্ষার্থে পল্লীর উন্নতিকল্পে বিদ্যালয়, হাসপাতাল প্রভৃতি স্থাপন করিয়া হুগলী জেলাবাসীর ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। এতদ্ভাবে বঙ্গের প্রথম সংবাদপত্র ‘বঙ্গল গেজেটের’ সম্পাদক গঙ্গাধর ভট্টাচার্য, ছাপাখানার জন্য প্রথম কাঠের অক্ষর প্রস্তুতকারক পণ্ডানন কর্মকার ‘রায়-রায়ন’ (দিনেমার গভর্নর তাহাকে ‘রায়-রায়ন’ উপাধি দিয়াছিলেন), প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার কবি রসিকচন্দ্র রায়, অস্তচিকিৎসায় সুদীপ্ত রামপুরহাট রেলওয়ে হাসপাতালের সুবিখ্যাত ডাক্তার কেদারনাথ মিত্র এবং ইষ্টবেঙ্গল ও আসামের কেমিক্যাল একজামিনার রায় সাহেব ডাঃ প্রিয়-



জনসাধারণের অর্থে স্থাপিত মসজিদ

নাথ বসু প্রভৃতি বহু কৃতি সন্তান বড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া হুগলী জেলাকে পনা করিয়াছেন বলিলেও অত্যাধিক করা হয় না।

সিংগুরের ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন; কারণ তিনিই প্রসিদ্ধ কর্মবীর সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের পিতা। রাজেন্দ্রনাথ ভবানীপুরে থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন এবং তৎকালে ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক কলিকাতার শ্রেষ্ঠ ডাক্তার ছিলেন। তাঁহাদের জীবনের প্রধান সৌসাদৃশ্য যে তাঁহারা যেমন অতি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনই দেশের জন্য দুইজন কর্মবীর আশুতোষ ও সুরেন্দ্রনাথকে তাহারা রাখিয়া গিয়াছিলেন। ডাঃ রাজেন্দ্র ও ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদের নামে কলিকাতার দুইটি রাজপথের নামকরণ হইয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথ ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ এবং পর বৎসর আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম বেসরকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন এবং তাঁহার কার্যকালে চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি যে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন পৌর প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে তাহা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বাঙলা সরকারের স্বায়ত্বশাসন বিভাগের মন্ত্রী ও ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বিলাতের ইন্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত

হইয়া বিলাত যাত্রা করেন। রাজনীতিক্ষেেত্রে তিনি সার সুরেন্দ্রনাথের মন্ত্রাশ্রয় ছিলেন। আধুনিক শিক্ষিত ও পদস্থ বাঙালীগণ সাধারণতঃ পল্লীগামের সহিত সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া সহরের বিলাসিতার মধ্যে ডুবিয়া থাকেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ একজন আদর্শ পল্লীসেবক ছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খগেন্দ্রনাথ মিত্রের কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা দেবীকে বিবাহ করেন এবং এই মহীয়সী মহিলার প্রেরণায় তিনি দেড়লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সিংগুরে ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে রাজেন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল হাসপাতাল ও মাতার নামানুসারে গোলাপমোহিনী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।\* সূদূর পল্লী অঞ্চলে আধুনিক যাবতীয় সাজসজ্জা মেসৃজ্জিত এইরূপ সুরমা হাসপাতাল নির্মাণ করিয়া তিনি হুগলী জেলার যে প্রভূত উপকার করিয়াছেন, লেখনীতে তাহা প্রকাশ করা যায় না। স্ত্রী শিক্ষার তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং গোলাপমোহিনী বালিকা বিদ্যালয় ২০শে মার্চ ১৯৩৫ খৃঃ স্থাপন করিয়া গ্রাম্য বালিকাগণের শিক্ষার তিনি যে সুবিধা করিয়া দিয়াছেন সেইজন্য তাহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এইরূপ প্রথম প্রাণীর বালিকা বিদ্যালয় বঙ্গের কোন গ্রামে দোঁখতে পাওয়া যায় না। সিংগুরে মহামায়া ইনস্টিটিউশন বলিয়া একটি উচ্চ বালকদের বিদ্যালয় বহুদিন হইতেই ছিল; তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের সভাপতিরূপে বহু উন্নতি করিয়া দিয়াছেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তিনি অপূরণ্য অবস্থায় লোকান্তরিত হন।

১৩০৭ সালের ১৮ই ফাল্গুন তারিখে স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ মল্লিকের ডানী শ্রীমতী গুণময়ী দেবী “রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক চিকিৎসা মন্দিরের” ভিত্তি স্থাপন করেন এবং পর বৎসর ৮ই ফাল্গুন (২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২) তারিখে বঙ্গের তৎকালীন গভর্নর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন কর্তৃক এই হাসপাতালের উদ্ঘাটন হয়।

সুরেন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পর তাঁহার সহধর্মিণী স্বামীর স্মৃতি রক্ষার্থে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একটি আদর্শ প্রসূতি-সদন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ তারিখে তৎকালীন বাঙলার লার্ড-পত্নী লেডী রবার্ট রিড্ ইহার ম্মারোম্মাটন করিয়াছেন। আমেরিকার রক্ফেলার ফাউন্ডেশনের (Rockefeller Foundation) কর্তৃপক্ষ এবং বঙ্গীয় গভর্নমেন্ট ইহার ব্যয় বহন করিবেন। সিংগুরে “সুরেন্দ্রনাথ মডেল হেল্‌থ ইউনিট অ্যাণ্ড মেটর্নিটি ক্লিনিকের” ন্যায় প্রতিষ্ঠান আমেরিকা, বার্মী ও সিংহল বাতীত পৃথিবীর আর কোথাও নাই। লেঃ কর্নেল এ সি চ্যাটার্জির চেণ্টায় ইহা সিংগুরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সিংগুরের উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় স্বর্গীয় মধুরনাথ বর্মণ শত বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহা প্রাচীনতম বিদ্যালয়; অতঃপর বর্ধমান সিয়্যারসোল রাজবংশের মতিলাল মালিয়ার অর্থ সাহায্যে পরিচালিত হইত বলিয়া ইহা মতিলাল মালিয়া ইনস্টিটিউশন বলিয়া পরিচিত ছিল। পূর্বে এই জমিদার বংশ এই গ্রামেই বাস করিতেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে চাঁপদানীর স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার মাতা শ্রীমতী মহামায়া দেবীর স্মৃতি রক্ষার্থে বিদ্যালয়ের জন্য সুরম্যভবন নির্মাণ করিয়া দেন; তদবধি ইহা সিংগুরে মহামায়া ইনস্টিটিউশন বলিয়া কথিত হইতেছে।

সিংগুরে জোনপুর নিবাসী বাবুলাল সাহু ১৯৭৭ সম্বতে একটি কালীবাড়ি নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরগায়ে দাতার ও তাঁহার স্ত্রীর নাম এবং নির্মাণের তারিখ হিন্দী ও বাঙলা ভাষায় উৎকীর্ণ আছে।

পূর্বে এইস্থানে বহু পণ্ডিতের বাস ছিল; তন্মধ্যে সীতানাথ তর্কবাগীশ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, এবং ঠাকুরদাস ন্যায়রত্নের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভ্যতীত এই স্থানের ঘোষ বংশ ও চট্টোপাধ্যায় বংশ এবং নসিবপুরের রায় বংশ ও গোপালনগরের মিত্র

হাসপাতাল ও বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক কার্য-বিবরণী ইংরাজী ভাষায় মুদ্রিত; বঙ্গের পল্লীগামে যে স্থানে শতকরা একজন লোক ইংরাজী ভাষা বলিতে পারে, সে স্থানে ইংরাজী কার্য-বিবরণীর কোন মূল্যই নাই। কর্তৃপক্ষের বঙ্গ ভাষার প্রতি প্রীতি দেখিলে সূচী হইব।

বংশ বহু প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সিংগুর থানার মধ্যে বড়া গ্রামের নিবারণ-চন্দ্র মৃধোপাধ্যায় ২১শে ফাগুনে ১২৭৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পূর্বপুরুষ কল্যাণ চরণ মৃধোপাধ্যায় হুগলী জেলার মধ্যে খলসিনী নামক গ্রাম হইতে আসিয়া এই স্থানে বসবাস করেন। বাল্যে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে ইনি সমর্থ হন নাই এবং সরকারী কার্যে প্রবিষ্ট হন। স্বীয় অধাবসায় ও কর্ম-কুশলতায় তিনি বহু সরকারের পূর্ত বিভাগে একটি উচ্চপদ অধিকার করিয়া 'রায় সাহেব' উপাধি প্রাপ্ত হন। সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি স্বীয় পত্নী বড়া গ্রামে চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া তাহার পিতা মধুসূদন মৃধোপাধ্যায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে ১৭ই পৌষ ১৩৩০ সালে 'বড়া মধুসূদন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর তাহার মাতা প্রসন্নময়ীর স্মৃতি রক্ষাকল্পে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে "প্রসন্নময়ী দাতব্য চিকিৎসা-

লয়" প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুইটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন কার্যে তাহার সারা জীবনের অর্জিত অর্থ, দেশের কল্যাণ কামনায় অর্পণ করিয়া তিনি ১৩৪৫ সালে গতাস্ হন। 'মানস সরোবর ও কৈলাস পর্বত ভ্রমণ' নামে একখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বড়া গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ পাঁচালীকার রসিক-চন্দ্র রায়ের নিবাস ছিল। হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিশালে তাহার পূর্ব নিবাস ছিল; কিন্তু তাহার পিতা হরিকমল রায় মাতামহের জমিদারী পাইয়া এই গ্রামে বসবাস করেন। ১২২৭ সালের বৈশাখী পূর্ণিমায়া তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং বাল্যকাল হইতেই তাহার কাব্যপ্রতিভার বিকাশ হয়। ১২৪৫ সালে তাহার "জীবন তারা" নামক প্রথম কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হয়; কিন্তু উক্ত পুস্তকে আদিরসের মধ্যে অশ্লীলতা থাকায় সরকার হইতে উহার প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর অশ্লীল অংশ পরিহার করিয়া ১২৫০ সালে 'নব্য-জীবন-তারা' ও ছয় খণ্ড পাঁচালী প্রকাশ করেন।

ইহার পর তাহার গ্রীকুপ্রেমাস্কুর, হরিশর্মা চন্দ্রিকা, পদ্যাস্ক দূত, দশমহাবিদ্যা, বৈষ্ণব মনো-রঞ্জন, নবরসাস্কুর, কুসুমী কুলাচার প্রভৃতি বহু কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া ১২৯৯ সালের ৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে দেহ রক্ষা করেন। বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের সহিত তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল এবং তাহার নিদর্শেই বহু বিবাহ নিবারণ কল্পে 'কুলীন কুলাচার' নামক কবিতা পুস্তক খানি রচিত হইয়াছিল। তাহার রচনার নিদর্শ-স্বরূপ নিম্নে একটি কবিতা উদ্ধৃত হইল :

হায় রে বঙ্গের পদ্য হায়! হায়! হায়!  
পূর্বের অপূর্ব মান এখন কোথায়?  
কত ছটা কত ছটা কত দম্ভ ছিল,  
পদ রে! তোমার তেজ সকল ঘুচিল।  
বিস্মতী খেলাতী পদ্য দৌখিয়া বিস্তার  
বাঙালী! কাংগালী তোর বরে'ছ এবার  
পয়ার! দয়ার নাই তোর প্রতি টান,  
হাঁতস বিস্মতী বরণ পেতিস সম্মান।  
বঙ্গের বঙ্গের পদ্য থাক্ থাক্ থাক্  
বাজুক কত না বাজে গদ্য জয়ঢাক।  
ওরব নিরব হবে না রহিবে এদেশে  
অক্ষয় মৃদঙ্গ তুই বাজাবি রে শেষে।

## মহাভারত

নির্মাল্য বসু

মহাভারতের শর-শয়ান—  
ক্লীব শিখণ্ডী—শূন্য ভূগ?  
পৃথিবী হোলো যে মহাশ্মশান—  
এখনো সেথায় জ্বলে আগুন।  
উত্তরায়ণে কবে হবে  
মহাসূর্যের অরুণোদয়ঃ  
শুধু কি বৃথাই ভেবে রাখা  
মহাভারতের শ্লেষ নিচয়!  
অন্তরে আজো মহাত্মা  
স্বর্ণ-ভুগের মেটে না তোঃ  
পাতাল ফুড়িয়া ভোগবতীর  
আনা চাই ধারা-অমৃত।  
দেহমন সব ক্রেদান্ত।  
অনেক হয়েছে রক্তপান।  
শান্তি কোথায়—শান্তিজল?  
হউক এবার মৃত্তি-স্নান।  
মহাভারতের স্বপ্ন-সাধ—  
মহা-জীবনের বৃত্তিকা;  
সফল কড় কি নাই হবে  
চির রাগের প্রতীক্ষা??

## পারিক্রমা

নির্মাল্য বসু।

যাত্রা তাহার কুমারিকা থেকে হিমাচল পর্যন্ত;  
অন্তবিহীন কম্পলোকের পন্থ—  
মানুষের ম্বারে মানুষের বাণী নিয়ে  
যাত্রা তাহার কণ্টক পথ দিয়ে।

মানুষ যেখানে মানুষের গড়া অবিশ্বাসের ফাঁদে  
লাঞ্ছিত হয়ে—নিপীড়িত হয়ে কাদে,  
মানুষের ঘরে মানুষের করে আগুন লাগিছে বেথা  
যাত্রা তাহার সেথাঃ

অবিরাম—অশ্রান্তঃ  
হিংসা কুটিল জটিল পন্থে চির অমৃত পান্থ।

স্বাধির অতীশ চলেছেন একা অমৃত অভিসারে—  
এই মানুষের ম্বার হতে ম্বারে ম্বারে;  
গণ-দেবতার পূজার প্রদীপ জ্বালি  
জীবনের মাঝে মহাজীবনের স্নিগ্ধ সূর্য্যি ঢালি।

নতুন যুগের নতুন দীপঙ্কর—  
তার হাতে জ্বালা আলো কি হবে না চরম শূন্যঙ্কর??

অবশেষে ভারতবর্ষ চিরবাহিত স্বাধীনতা অর্জন করিতে যাইতেছে। বিদেশী শক্তির নীতি এখানে আর চলিবে না। সেই তন উবার স্বর্ণস্বার" খোলার আগে ভারতবর্ষের অনেকখানি ক্ষমতা অর্জন করা যাজন। তাহার অন্তর্বাণিজ্য, বহির্বাণিজ্য, কূল রক্ষার অভিভাবকত্বের ভার ভারতের জকেই গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতবর্ষের ক অবশ্য ইহা নতুন কিছই নয়। পৃথিবী ইউরোপের অন্যান্য দেশ যখন এককালে মধ্যে-আবদ্ধ-জীবন নিয়াই সন্তুষ্ট ছিল, ত, বালি, সুমাত্রা, চীন প্রভৃতি দেশের সংগে ত তখন বাণিজ্য করিত, আপন পণ্য ঐ ন্ত দেশে চালান দিত। বিজয়ীসংহের মত লালী বিজেতা ও নাবিকের উদ্ভব ভারতেই হইয়াছিল। সভ্যতার রম্যবিকাশের সংগে গ ভারতবর্ষ যে সেই বৈশিষ্ট্য হারায়াছে ন নয়; বৈদেশিক অত্যাচার নির্বাতন তাহার ক্ষমতা বিকাশের অন্তরায় হইয়াছিল মাত্র। তবর্ষ তাহার সেই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে ন ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইতেছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রিটিশ সরকারের ওদাসীন্যের ব এতদিন ভারতবর্ষে সুসম্বন্ধ কোন শক্তি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। রিকন্স-ন পলিসি সাব কমিটি (Recons-ation Policy Sub Committee) নন দুঃখ করিয়া বলিয়াছেনঃ Every maritime country has its ional shipping policy; India alone a glaring exception to this universal . It is therefore of supreme ortance that India should lay n a policy for building up her cantile marine."

তাক সমুদ্রসেবিত দেশেরই জাতীয় নৌ-ত রহিয়াছে। ভারতবর্ষই শুধু এই বিম্ব-নি আইনের বাহিরে। অতএব অনতি-ম্বে ভারতের পক্ষে বাণিজ্যপোত িণের নীতি গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য।" মান নিবন্ধে নৌ-শিপ ও পোতাশ্রয়ের মান অবস্থা ও সুউজ্জ্বল সম্ভাবনার ইহা আলোকসম্পাত করা যাইতেছে।

রতের বহির্বাণিজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিঃ ১৭ খৃষ্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামের তন্তরে সিপাহীবিদ্রোহ) পরবর্তী ইতিহাস তের পক্ষে এক স্মরণীয় অধ্যায়। ইহার হইতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কত্বের নন এবং ব্রিটিশ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার সংগে সংগে তীয় বলিতে যাহা কিছু তাহারই পজন ন্ত হইল। ভারতীয় কুটির শিপের ধ্বংস-

স্তপের উপর গড়িয়া উঠিল ব্রিটিশ শিপের ইমারত—ভারতীয় নৌ-বাহিনীর ক্ষমতায় উপর ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীর স্থায়ী (?) সৌধ প্রতিষ্ঠা হইল। মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় "The cottage industry of India had to perish in order that Lancashire flourish. The Indian shipping had to perish so that British shipping might flourish"

দুঃখের বিষয় পৃথিবীর বহির্বাণিজ্যে ভারতবর্ষের নৌ-বাহিনী এখনও সামান্য অংশই গ্রহণ করে। নিম্নলিখিত অঙ্কগুলি হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হইবেঃ

| দেশ           | পৃথিবীর বাণিজ্যের শতকরা অংশ |
|---------------|-----------------------------|
| গ্রেট ব্রিটেন | ২৪%                         |
| যুক্তরাষ্ট্র  | ১৭%                         |
| জাপান         | ৮%                          |
| নরওয়ে        | ৭%                          |
| জার্মানী      | ৬১%                         |
| ইতালী         | ৫%                          |
| ভারতবর্ষ      | ২৪%                         |

সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয়, যে দেশের লোক সংখ্যা পৃথিবীর লোকসংখ্যার শতকরা কুড়ি-ভাগ, তাহাদের পৃথিবীর বহির্বাণিজ্যে শতকরা একভাগও অধিকার নাই। আরও আশ্চর্যের বিষয় ভারতবর্ষের এই বহির্বাণিজ্যের শতকরা ৯৮ ভাগেরও অধিক ব্রিটিশ স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী (British Steam Navigation Co.) এশিয়াটিক স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী প্রভৃতি বৈদেশিক কোম্পানীর নৌবাহিনী দ্বারাই নিরাস্ত হয়। বাকী ২% মাত্র ভারতীয় কর্তৃস্থানী। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পাকিস্তান রাষ্ট্র ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, করাচি ও চট্টগ্রাম দুইটি বন্দর ও তদনুরূপ সামান্য নৌ-সম্পদ ভারত হইতে চলিয়া যাওয়াতে পৃথিবীর বহির্বাণিজ্যে ভারতের শতকরা অংশের অংকের অল্পই ইতর-বিশেষ হইবে। পরে এ বিষয় আরও সুস্পষ্ট হইবে।

ভারতের সুবিস্তৃত প্রায় ৩৫০০ (১) মাইল তটরেখার কথাই ধরা যাউক। এই উপকূল-ভাগের বাণিজ্যেরও শতকরা ৭৫ ভাগেরও অধিক বৈদেশিক নৌবাহিনীর কর্তৃস্থানী। ইহাও অনেকাংশে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর বিকাশ-প্রচেষ্টাকে অগুরুই পগু করিতে প্রয়াস পাইয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাউক, নৌ-শিপ ও পোতাশ্রয় গঠনে ভারতের প্রাকৃতিক সুবিধা অসুবিধা কি কি।

ভারতের বর্তমান পোতাশ্রয়সমূহ ও তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাঃ

সুবিস্তৃত তটরেখা, অনুকূল মহাসীমাপান ও মহাটাল ভারতের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পরদেশী শাসকের তর্জিতাবক্শ ভারতের শ্রেষ্ঠ পোতাশ্রয়গুলিরও উন্নতির কোন চেষ্টাই করে নাই। ভারতে বর্তমানে (২) সাতটি প্রধান পোতাশ্রয় আছেঃ করাচি, বোম্বাই, কোচিন, মাদ্রাজ, ভিজাগাপট্টম, কলিকাতা এবং চট্টগ্রাম। কঙ্কন মালাবার ও বরমন্ডল উপকূলে সব সুদৃশ্য প্রায় দুইশত বন্দর আছে। তন্মধ্যে কঙ্কন-মালাবার উপকূলে ছোট বন্দরের সংখ্যা প্রায় ৭৫ এবং বরমন্ডল উপকূলে প্রায় ১০০।

পশ্চিম উপকূলের প্রধান তিনটি বন্দরই (বোম্বে, কোচিন, করাচি) এখনকার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তদুপরি আবার করাচি বন্দর বিচ্ছিন্ন হইল। এই সমস্ত বন্দর যে সর্বাঙ্গ-সুন্দর এমন নহে। বোম্বে বা করাচি বন্দরের এখনও অতি বৃহৎ জাহাজের পক্ষে ভিড়বার যথেষ্ট অসুবিধা রহিয়াছে। অন্যান্য বন্দরের ত কথাই নাই। অবশ্য কতগুলি ছোট ছোট বন্দর বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে অবস্থিত হওয়ায় (কাথিওয়াদ, দ্রাবাকুর, ওখা প্রভৃতি) উহাদের কোনপ্রকার উন্নতি করার প্রয়াস শাসনতান্ত্রিক জটিলতার সৃষ্টি করিত। কিন্তু অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করায় ঐ বাধা আর থাকিবে না। কালিকট প্রভৃতি বন্দর ব্রিটিশ শাসিত ভারতে থাকা সত্ত্বেও ইহাদের উন্নতির জন্য কোন চেষ্টাই করা হয় নাই।

পূর্ব উপকূলের বন্দরগুলির সমস্যা আরও জটিল। কারণ এখানে সমুদ্র অত্যন্ত অগভীর। মাদ্রাজ এবং ভিজাগাপট্টমই পূর্ব উপকূলের সর্বপ্রধান বন্দর। একমাত্র অনুকূল আবহাওয়াতে মাদ্রাজ বন্দর চালু থাকে। উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু বহিতে আরম্ভ হইলে এই বন্দর একেজো এবং বিপজ্জনক হইয়া উঠে। ভিজাগাপট্টম আবার সাইক্লোন প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় হইতে নুত্ন। কাজেই ইহা যে বর্তমানেই সর্বাপেক্ষা উন্নতিশীল পোতাশ্রয় তাহাতে আশ্চর্যের কিছই নাই।

১ পাকিস্তান রাষ্ট্র সহ ভারতের উপকূল রেখা ৪০০০ মাইল বিস্তৃত।

২ পাকিস্তান রাষ্ট্র ব্যবস্য দিলে পাঁচটি। (করাচি ও চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অন্তর্গত)।

বিশেষতঃ এখানে জাহাজ মেরামত ও তৈয়ারীর কারখানা রহিয়াছে। পরে এ সম্বন্ধে আরও বলা যাইতেছে। ভারতের বন্দরগুলির আমদানী ও রপ্তানির আঁক নিন্দে উল্লেখ করা হইল।

| বন্দর<br>(শ্রেষ্ঠত্ব অনুসারে) | আমদানী<br>(টন) | রপ্তানী<br>(টন) | সর্বমোট<br>(টন) |
|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| কলিকাতা                       | ২৯,৪৮,৬৭১      | ৭০,১৭,২৪০       | ৯৯,৬৫,৯১১       |
| বোম্বাই                       | ৩০,৫০,০০০      | ১৯,৭৫,০০০       | ৫০,২৫,০০০       |
| করাচি                         | ৮,৫৬,০২৪       | ১২,৭৮,০১১       | ২১,৩৪,০৩৫       |
| মাদ্রাজ                       | ৮,৯৫,৬৫১       | ৩,৯১,৯৫৫        | ১২,৮৭,৬০৬       |
| কোচিন                         | ৬,৭৯,০২২       | ২,৭২,০৪১        | ৯,৫১,০৬৩        |
| চট্টগ্রাম                     | ৪,৭০,৫১৫       | ১,০৭,৮১৫        | ৫,৭৮,৩৩০        |
| ভিজাগাপটম                     | ৩২,৪১২         | ৪,৯২,২১৭        | ৫,২৪,৬৩৯        |
| ওখা                           | ৮৪,৪৫৫         | ১,৫২,৯৫৩        | ২,৩৭,৪০৮        |
| ভবনগর                         | ১,৭৫,১৫২       | ৪৫,৬৩৭          | ২,২০,৭৮৯        |
| নোওলাখ                        | ১,০৮,০৫৪       | ৫৬,৫৮১          | ১,৬৪,৬৩৫        |
| বোদি                          | ৫৯,৬০৫         | ৭২,৪৪০          | ১,৩২,০৪৫        |

কলিকাতা এবং চট্টগ্রাম পূর্ব-ভারতের প্রধান পোতাশ্রয়। তন্মধ্যে কলিকাতা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর। চট্টগ্রাম পাকিস্থান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইল, কলিকাতা বন্দরের সর্বাংশে উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত কর্তব্য। বড় সামুদ্রিক জাহাজ এখানে ঢুকিতে পারে না। সকলের চাইতে বড় বাধা হইতেছে হুগলীর মোহানা ও কলিকাতা বন্দরের মধ্যে অনেকগুলি বালির চড়া। এজন্য শুল্ক পরিষ্কার আবহাওয়ায়ই জাহাজগুলি কলিকাতায় আসা-যাওয়া করিতে পারে।

ভারতবর্ষের সুবিস্তৃত উপকূলভাগে শত শত বন্দরের সৃষ্টি করা যাইতে পারে। বন্দরের অবস্থিতি (location) ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, পশ্চাৎ ভূমির সমৃদ্ধি, সমীপস্থ সমুদ্রের গভীরতা এবং যাতায়াতের সুবিধার উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক বন্দরকেই বড় বড় জাহাজ ভিড়বার জন্য উন্নত পোতাশ্রয়ে পরিণত করিতে হইবে। এক্ষণে দেখা যাউক ভারতের সর্বপ্রধান বন্দরগুলির আমদানী ও রপ্তানি দ্রব্য কি কি? (ডান পার্শ্বের তালিকা দ্রষ্টব্য)

এই তালিকা হইতে দেখা যাইবে, ভারত-বর্ষ প্রধানতঃ কাঁচামালই রপ্তানি করে এবং প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রী আমদানী করে। স্বদেশী সরকার প্রতিষ্ঠা এবং শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে ভারতবর্ষ এদেশেই অনেক রকম যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিবে, জাহাজ নির্মাণের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এই দেশেই তৈয়ার করিবে, তাহা একরকম স্থির করিয়াই বলা চলে। কলিকাতা ও বোম্বাই-ই ভারতের বহির্বাণিজ্যে সর্বাধিক অংশ গ্রহণ করে।

নৌ-শিল্প সমস্যায় ভারতঃ নৌ-শিল্পে ভারতবর্ষ এখনও অনেক পিছাইয়া আছে।

কেবলমাত্র ভিজাগাপটমেই একটিমাত্র নাম করার মত নৌ-শিল্পের কারখানা রহিয়াছে। ইহাও আবার নিত্যন্ত শৈশবাবস্থায়। এই কারখানার উন্নতির মূলে সিন্ধিয়া স্টীম নৌভিগেশন কোম্পানীর অধ্যবসায় ও দৃঢ় কর্মকুশলতা

ভারতবর্ষে এক ভিজাগাপটমে চলিবে না। শ্রেষ্ঠ বন্দরসমূহের শিল্প-সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অনেক ভিজাগাপটমের সৃষ্টি করিতে হইবে। আমরা আশা করিতেছি, অচিরেই এ সম্বন্ধে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করিবেন।

সুসম্পন্ন বাণিজ্যপোত বাহিনীর সাধকতাঃ

উপরে ভারতবর্ষের বর্তমান নৌ-শিল্প ও পোতাশ্রয় সমস্যার নানা দিক উদ্ঘাটিত করা হইল। নৌবাহিনী শুল্ক বাণিজ্য জগতেই ভারতবর্ষকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিবে না, উপকূলকে শত্রু আক্রমণ হইতে রক্ষা করায় উহার প্রয়োজন অপরিহার্য। পণ্ডাশের মনস্তত্ত্বের সময় যদি ভারতের নিজস্ব নৌ-বাহিনী থাকিত, তবে কানাডা আর অস্ট্রেলিয়ায় লক্ষ লক্ষ মণ গম পণ্য চিত না এবং বাঙলা দেশে লোক পোকামাকড়ের মত মরিত না। আজ যদি

| বন্দর     | আমদানী                                                                                 | রপ্তানী                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| করাচি (১) | কার্পাস দ্রব্য, পশম ও পশমজাত দ্রব্য, চিনি, ধাতব তৈল, যন্ত্রপাতি, এবং লৌহজাত দ্রব্যাদি। | গম, তুলা, বালি, চাউল, তৈলবীজ, পশম ও চামড়ার দ্রব্যাদি। |
| বোম্বাই   | তুলাজাত দ্রব্য, নানারকম ধাতু, যন্ত্রপাতি, কেরোসিন, চিনি, কাঠ ইত্যাদি।                  | কয়লা, চামড়া, তুলা, ম্যাগনিজ প্রভৃতি।                 |
| মাদ্রাজ   | চিনি, চাউল, কাঠ রেলে র সাজসরঞ্জাম, কয়লা, কাগজ, কার্পাস-জাত দ্রব্য, মটরগাড়ী প্রভৃতি।  | বাদাম, চামড়া, কাঁচা তুলা, তামাক ও নানারকম সার।        |
| ভিজাগাপটম | পেট্রোলিয়াম, পাট, যন্ত্রপাতি, কার্পাসজাত দ্রব্যাদি।                                   | ম্যাগনিজ, কাঠ, চাউল, তৈলবীজ, তুলা দ্রব্য।              |
| কলিকাতা   | তুলাজাত দ্রব্য, নানারকম যন্ত্রপাতি, লবণ এবং পেট্রোলিয়াম।                              | লাক্ষা, পাট, চা, লোহা, তৈলবীজ, তুলাজাত দ্রব্য।         |

বর্তমানে এই কোম্পানীই (Scindia Steam Navigation Company) একমাত্র ভারতীয় কোম্পানী, যাহা শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও বিদেশী কোম্পানীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া টিকিয়া আছে। ১৯১৯ ইংরাজীতে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে উহাই একমাত্র উন্নতিশীল ভারতীয় কোম্পানী। ইহাদের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানে ভিজাগাপটমের নৌ-শিল্পের কারখানা দ্রুত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। যুগপৎ জাহাজ তৈরী, জাহাজ মেরামতের কারখানা এবং পোতাশ্রয়ের সুবিধা থাকায় অল্পে ভবিষ্যতে ভিজাগাপটম যে ভারতীয় পোতাশ্রয়গুলির মূকুটমণি হইয়া উঠিবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তবে

ভারতের জাতীয় সরকার ভারতবর্ষের নৌ-বাহিনী ও পোতাশ্রয় গঠনের দিকে মন দেন, তবে ভারতের বেকার সমস্যারও অনেকাংশে সমাধান হইবে, বহু লোক জীবিকা অর্জনের পথ পাইবে। ইহাতে যুদ্ধোত্তর অভাব-অনটনও ভারতবর্ষকে তেমন দুর্বল করিতে পারিবে না। এখন যেমন তথাকথিত ভারতীয় নৌবাহিনীতে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সকলেই শ্বেতকায়, জাতীয় নীতি গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই বৈষম্য দূরীভূত হইবে।

শুল্ক যুদ্ধ জয় করিবার জন্য নয়, শান্তিকে জয় করিবার পক্ষেও জাতীয় নৌবাহিনীই অমোঘ অস্ত্র।

## নতুন মণ্ড পরিচয়

গত সপ্তাহে তিনটে নতুন নাটক দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। তার মধ্যে দুটি নাটকেরই রূপ এবং অভিনয় পেশাদার রংগমঞ্চে অভিনীত সাধারণ নাটকের চেয়ে বেশ কিছুটা স্বতন্ত্র বলে এ সম্বন্ধে কিংবা আলোচনার প্রয়োজন আছে। প্রথমটি হল মণি-মেলার কিশোর-কিশোরী ভাইবোনদের দ্বারা অভিনীত 'পুতুলের দেশ' নামক কিশোর নাটিকা। এ নাটিকাটি এখন থেকে প্রতি রবিবার সকাল ৯টার রঙমহল রংগমঞ্চে অভিনীত হবে। নাটিকাটির রচনা,

## বক্সডাট

পাশ্চাত্যের ফলে আজ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন স্থায়ী ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। ইদানীং কলিকাতার দুটি নাট্যমঞ্চে বাঙলার শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের আনন্দ বিধান-কল্পে স্থায়ী প্রচেষ্টা চলেছে দেখে আমরা আশান্বিত। এর একটি হল রঙমহলে 'পুতুলের

দেশ' ও অপরটি হল কালিকার 'বিক্রম শর্মা'। তবে যে পর্যন্ত শিশুদের কোন স্থায়ী ও নিজস্ব মণ্ড স্থাপিত না হয়, সে পর্যন্ত এ প্রচেষ্টা পূর্ণাঙ্গ হয়েছে বলা চলে না।

'পুতুলের দেশ'ের আখ্যানভাগ স্বদেশ-প্রেমের উচ্চাশ্রয়ে বাঙলার শিশু সমাজকে উদ্বেষিত করে তোলার প্রয়াস-সজাত। ভারতের পরাধীনতার প্রথম পর্যায়ে থেকে স্বাধীনতা-লাভের শেষ পর্যায় পর্যন্ত ক্ষুদ্র নাটিকার স্বত্বপায়তনের মধ্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের আনন্দবিধানকল্পে লেখককে আশ্রয় নিতে হয়েছে রূপকের। জটিল রাজনীতিমূলক বিষয়ে রূপকের আশ্রয় নেওয়ায় নাটকের বিষয়-বস্তু ছেলেমেয়েদের পক্ষে কিংবা দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে বলে আমার ধারণা। রাজনীতিকে এতটা প্রাধান্য না দিলেই হত। এ ছাড়া অন্যান্য দিক থেকে নাটিকাভিনয় ভাল হয়েছে। কিশোর-কিশোরীদের অভিনয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছে। বিভিন্ন ভূমিকার পাত্রপাত্রীদের বহুবিচিত্র মূখ্যাস ও রঙবেরঙের সাজসজ্জা দেখে ছেলে-মেয়েরা প্রচুর আনন্দ পাবে। আমি এই নাট্যাভিনয়ের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

\* \* \* \*

তৃতীয় যে নাটকটি দেখেছি সেটি পেশাদার রংগমঞ্চে অভিনীত হলেও পেশাদার রংগমঞ্জের নাটক নয়। এ নাটকটি হল সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার মনোজ বসুর 'নতুন প্রভাত'। ডি ডি প্রোডাকশন্স নামক অ্যামেচার



'পুতুলের দেশ' নাটিকার একটি দৃশ্য

প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন বাঙলার কিশোর-কিশোরীদের কাছে সুপরিচিত বিমল ঘোষ। নাটিকায় যে সব ছেলেমেয়ে অংশ গ্রহণ করেছে তাদের প্রত্যেকেরই বয়স ১৬ বৎসরের কম।

অভিনয়ের দোষগুণ বিচার করার পূর্বে বিমল ঘোষকে অভিনন্দন জানিয়ে নেয়া আবশ্যিক। তিনি বাঙলার কিশোর-কিশোরীদের আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে যে নিয়মিত নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন তা অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখে। বাঙলার অগণিত শিশু ও কিশোর কিশোরীদের জন্যেও যে নাট্যশালার আনন্দ-ভোজের দ্বার খুলে দেয়া প্রয়োজন, ইদানীং বাঙলার কোন কোন শিশু সাহিত্যিক এবং পেশাদার রংগমঞ্জের মালিকরা এ সত্য উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছেন—এ প্রকৃতই আনন্দের কথা। অন্যান্য সব কিছুর মত এ বিষয়টি নিয়েও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রচুর চিন্তা করেছিলেন এবং নাট্যাভিনয়ের পথে বাঙলার কিশোর-কিশোরীদের আনন্দ বিধানের চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। কিন্তু প্রতিকূল পারি-



'পুতুলের দেশ' নাটিকার অপর একটি দৃশ্য

অভিনেতা অভিনেত্রী দল কর্তৃক এই নাটকটি বিগত রবিবার সকাল ৯টায় অভিনীত হয়েছিল শ্রীরঙ্গম নাট্যমঞ্চে। মনোজবাবুর এই প্রসিদ্ধ নাটকটির শুধু যে সাহিত্যিক মূল্য আছে তাই নয়, এর মধ্যে আছে আমাদের জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে নতুন ভাবধারা ও বৈশল্যিক পথের ইঙ্গিত। পল্লীর পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের অশিক্ষিত অবজ্ঞাত চাষা মজুরদের সুখে দুঃখে গড়া জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নাটকের আখ্যানভাগ। সংগ্রামের পথে হিন্দু মুসলমান ঐক্য ও সম্প্রীতি স্থাপনের পথ নির্দেশই নাটকার দিয়েছেন। আমাদের জাতীয় জীবনের বর্তমান দুর্দৈবের দিনে এ জাতীয় একখানি নাটকের প্রয়োজনীয়তা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। তা ছাড়া আদর্শ প্রচারের দিক বাদ দিলেও এ নাটকখানির নাটকীয় মূল্যও আছে যথেষ্ট। দুঃখের বিষয় গতানুগতিক পথের যাত্রী আমাদের দেশের কোন পেশাদার রঙ্গমণ্ডের মালিকের দৃষ্টি এ নাটকখানির দিকে পড়েনি। ডি ডি প্রোডাকসন্স এই নাটকখানি মঞ্চস্থ করে প্রশংসার কাজ করেছেন।

অ্যামেচার নাট্যাভিনয় বলে অভিনয় ও প্রযোজনায় দোষত্রুটি থেকে গেছে। তবু তাঁরা একটা কথা নিঃশংসয়ে প্রমাণিত করতে পেরেছেন যে, এই জাতীয় নাটক মঞ্চস্থ হলে দর্শক সাধারণ প্রচুর আনন্দের খোরাক পেতে পারেন। এরা মাঝে মাঝে এই প্রকারের পেশাদার মঞ্চে অবজ্ঞাত ভাল নাটক অভিনয় করলে আমরা খুসী হব। এতে দর্শকদের যেমন রুচি পরিবর্তন করা সম্ভব হয়, তেমন পেশাদার রঙ্গমণ্ডের মালিকদের ফসিল মনেও নতুন ভাবের উদয় হবার সম্ভাবনা থাকে। এই নাটকখানি ডি ডি প্রোডাকসন্সের পক্ষে পরিচালনা করেছেন সঞ্জীব দাস। অভিনয়ে যারা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন শশাঙ্কের ভূমিকায় সমর রায়, হলধরের ভূমিকায় শ্রীহর্ষ, কান্তরামের ভূমিকায় বীরবল, রহিমের ভূমিকায় অপরেণ দত্ত, আমিনার ভূমিকায় গীতা ঘোষ ও যামিনীর ভূমিকায় সাম্ভনা চক্রবর্তী।

### মুক্তিকামী চিত্র

রূপাঞ্জলী পিকচার্সের 'অলকানন্দা' নামক চিত্রখানি শীঘ্রই কলিকাতার কয়েকটি চিত্রগৃহে একযোগে মন্ডিলাভ করবে বলে প্রকাশ। 'অলকানন্দার' কাহিনী রচনা করেছেন নাট্যকার মন্মথ রায়, পরিচালনা করেছেন রতন চ্যাটার্জি এবং সংগীত পরিচালনা করেছেন ধীরেন্দ্র মিত্র। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে আছেন প্রমীলা, পূর্ণিমা, অহীন্দ্র, চৌধুরী, সুপ্রভা রায়, রবি রায়, অজিত চ্যাটার্জি প্রভৃতি।

এ আর প্রোডাকসন-এর 'আমার দেশ' নামক চিত্রখানির মুক্তিও অতাসম বলে কর্তৃ-

পক্ষ জানিয়েছেন। এই চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন অনাথ মৃথোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, পরেশ, জ্যোৎস্না, পূর্ণিমা, বেচু, যুথিকা প্রভৃতি।

অমর দত্ত পরিচালিত এ কে ডি প্রোডাকসন্সের 'দুই বন্ধু' নামক বাণীচিত্রের কাজও শেষ হয়ে গেছে এবং যথাশীঘ্র ছবিখানি মুক্তিলাভ করবে। এই চিত্রে আমরা প্রসিদ্ধ অভিনেতা দেবী মৃথোপাধ্যায়কে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি ভূমিকায় দেখতে পাব বলে প্রকাশ। অন্য দুটি প্রধান ভূমিকায় নেমেছেন গীতন্ত্রী এবং প্রভা। সুদর সংযোজনা করেছেন গোপেন মল্লিক।

### কুঁড়িও সংবাদ

শ্রী বি কে দালালের পরিচালনায় রজনী ফিল্ম কর্পোরেশনের 'চলার পথের কাজ দ্রুত-

গতিতে এগিয়ে চলেছে। ধনতন্ত্রবাদের আওতায় নিষ্পেষিত সর্বহারাদের সুখ দুঃখকে কেন্দ্র করে এ ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে বলে প্রকাশ। বিভিন্নরূপে অভিনয় করেছেন বনানী চৌধুরী, দেবী মৃথোপাধ্যায়, সমর রায় প্রভৃতি। নবাগতা শিক্ষিতা অভিনেত্রী শ্যামলী দেবীকেও একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে। নৃত্য-পরিচালনা ও সুদর সংযোজনায় ভার নিয়েছেন যথাক্রমে সবিতা ঘোষ ও সমরেশ চৌধুরী।

হিন্দুস্থান আর্ট পিকচার্সের প্রথম চিত্র 'দুধারার' চিত্রগ্রহণ কার্য দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কর্তৃপক্ষ এ ছবিতে কয়েকজন নতুন অভিনেতা অভিনেত্রীকে গ্রহণ করেছেন বলে প্রকাশ এবং সুদক্ষ শিল্পকুশলীদের নিয়ে গঠিত একটি শক্তিশালী বোর্ডের উপর পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে।

## স্বাধীনতা দিবস

### উৎসবের মধুভাণ্ড

নিম্নে এসোসিয়েটেড্

ডিস্ট্রিবিউটর্স সমাগত!!

৮ই আগস্ট : শুক্রবার হইতেই সুদর

\* রূপাঞ্জলী পিকচার্সের  
প্রথম সামাজিক

## অলকানন্দা

প্রযোজনা : সরোজ মৃথার্জি

কাহিনী : মন্মথ রায় \* চিত্ররূপ : দেবকী বোস

পরিচালনা : রতন চ্যাটার্জি

সংগীত : ধীরেন্দ্র মিত্র

## অলকানন্দা

রূপায়ণে : প্রমীলা, পূর্ণিমা, পরেশ, প্রদীপ, অহীন্দ্র, রবি রায়, ইন্দু, তুলসী, ডাঃ হরেন, সত্য ঘোষ প্রভৃতি।  
শিল্পগ্রন্থ পর্বতমালার পটভূমিকায় প্রতিফলিত — অপূর্ব সংগীতমুখর সামাজিক চিত্র!!

==একযোগে==

মিনার — বিজলী — ছবিঘর  
আলেয়া — আলোছায়া  
শ্রীরামপুর — গৌরী টকিজ

—১৫ই আগস্ট হইতে—

শ্যামাঙ্গী — মীনাঙ্গী — বর্ণা

— শ্রুভারম্ভ —

১লা আগস্ট, শুক্রবার



কাহিনী, গীত ও পরিচালনা :

অখিল নিয়োগী

সংগীত : শৈলেন ব্যানার্জী

একটি কিশোর আর একটি কিশোরীকে তার ভালবাসার বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল! কিন্তু ভরণ-ভরণের মন দেওয়ানোয়ার যিনি দেবতা তিনি জানেন— এ বন্ধনের হাত থেকে মুক্তি পায় না কেউ! সেই বন্ধন-মুক্তির দ্বন্দ্বের অপরূপ

## মুক্তির বন্ধন

রূপায়ণে : গীতন্ত্রী, নীলু রায়, উমা, কিরণকুমার, নীতীশ, অনন্য, শম্ভু, রতন গুপ্ত, হাজরা, অর্চিতা, রাজলক্ষ্মী  
(ছোট ও বড়)

—একযোগে চলিতেছে—

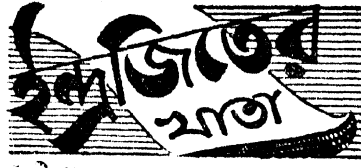
উত্তরা — খান্না — রূপম্ — আলেক্সা  
ভবানী — সুচিত্রা — আলোছায়া  
অলকা — উদয়ন — নবরূপম্

পরিবেশক : কালকাতা টাক্স লিঃ  
২৭-এ, ক্রীক রো, কলিকাতা।

## বিরহ

উঁহু, আপনারা যা ভেবেছেন তা নয়। আমি বিরহী যক্ষ নই। ইন্দ্রাজিৎ লোকটা সময়ে সময়ে মেঘলোকে বিচরণ করে বটে কিন্তু তাই বলে আকাশের মেঘকে বার্তাবহ নিযুক্ত করে প্রমীলা পদুরীর উদ্দেশ্যে বিরহবিলাপ প্রেরণ করবার প্রয়োজন সে বোধ করে না। বিশেষ করে প্রমীলা দেবী যখন দুঃহাত মাত্র ব্যবধানে বসে ঈষৎ হাস্য বিস্তার করছেন তখন ইন্দ্র-জিতের বিরহের প্রশ্নই ওঠে না। যেখানে দুটি মাত্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে সংসারাপ্রম আবদ্ধ সেখানে বিরহের অবকাশভূমি স্বভাবতই অতিশয় সংকীর্ণ। বিরহটা সেখানে সমস্যা নয়—মিলনটাই সমস্যা। এত সংকীর্ণ সীমার মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষ লেগে থাকবারই কথা; কোনো বাউণ্ডারি কমিশন সে সংঘর্ষ নিবারণ করতে পারে না। তার উপরে ধরুন যদি প্রমীলা দেবী বৃক্ষকূল বধূর মতোই তেজস্বিনী রমণী হতেন এবং মেঘনাদী ভাষায় যখন তখন বলতেন—আমি কি ভরাই কভু ইত্যাদি ইত্যাদি তাহলে আমি তো কোন ছার তেমন তেমন বীর পুরুষকেও ঘর ছেড়ে মেঘলোকে আশ্রয় নিতে হত। বিরহ তাপ বরং সওয়া যায় কিন্তু মিলনের দাহ কখনো কখনো মর্মান্তিক হয়ে ওঠে। আমার মতে মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য মাঝে মাঝে বিরহ জিনিসটা কিছু অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ঠেলা-ঠেলি ঠাসাঠাসি গাদাগাদির যুগে আমাদের মধ্যযুগীয় বিরহী মনটা একেবারে চেষ্টে মরেছে। শুধু কি তাই? টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, টেলিভিশন এসে বিরহের যেটুকু বাকী ছিল তাও শেষ করেছে। মানুষ দুঃখ নিরালস্য বসে একটু বিরহ যাতনা উপভোগ করবে তার পথ কোথায়? যন্ত্রণাও যে উপভোগ্য হয় সে কথা প্রেমিক মাত্রেই স্বীকার করবেন। যাক্ সে কথা—বিশ শতাব্দীর ব্যবধানকে ভয় করেছে দূরকে কাছে এনেছে। সেটাকে যদি এ যুগের সব চেয়ে কৃত্রিম বলে মনে নিই তাহলে একথাও স্বীকার করতে হবে যে বিশ শতাব্দীর biggest casualty হচ্ছে বিরহ। তার প্রমাণ—যে বিরহ এককালে কাব্যের প্রধান উপকরণ ছিল এখন তা সাহিত্যরাজ্য থেকে নির্বাসিত।

আমি পূর্বে বলেছি যে বিরহ জিনিসটা মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর। মিলনের satiety দূর করবার জন্য বিরহের interlude প্রয়োজন। কিন্তু এখানে একটি জরুরী কথা বলবার আছে। বিরহ আমার কাছে অসহ্য। কারণ আমাদের কাব্যসাহিত্যে বিরহ নিয়ে বড় বেশি মাতমতি কাম্বাকাটি হয়েছে। বিরহের কবিতা মাত্রেই ছিচকাঁদুনে কবিতা। পড়লে বিরক্তি ধরে যায়। বৃক্ষ ফাটা দীর্ঘশ্বাস আর



চোখ ফাটা লোনা জল মিশিয়ে একটা বিতি-কিচ্ছিরি পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের বৈষ্ণব কবিতা বিরহ নিয়ে বিষম ব্যাড়াঝড়ি করেছেন। সংস্কৃত কাব্যেও বিরহের কথা যথেষ্ট আছে, কিন্তু সে কাব্যে বিরহের ভাষা সংযত যদিচ মিলনের ভাষা অসংযত। বৈষ্ণব কাব্যের ভাষা অম্লিনতেই অতি মাত্রায় গদগদ। তার ওপরে বিরহের বেলায় কবিতা নাকের জলে চোখের জলে মিশিয়ে বিরহ-কাব্যকে যা করে তুলেছেন সেটা এযুগের পাঠকের পক্ষে রীতিমতো অস্বস্তিকর। আমাদের চিটে গুড়ের মতো একটা যেন চট্‌চট্‌ ব্যাপার। বৈষ্ণব সাহিত্যে বিরহের কবিতা পড়ে অবধি বিরহের প্রতি আমার বিষম বিতৃষ্ণা জন্মেছে। এর সাংসারিক মূল্য যদিবা কিছু থাকে কাব্যিক মূল্য একটুও নেই। আমি যদি কবি হতাম তবে যাই লিখি বিরহ নিয়ে কখনো কবিতা লিখতুম না। বীরবল বলেছিলেন বর্ষা সম্বন্ধে কবিতা লিখতে তাঁর ভরসা হয় না। কারণ কিনা ভরসা ছাড়া আর কোনো শব্দের সঙ্গে বরষার খিল নেই। বিরহ কথাটা যদিচ মিলুন বিরোধী তথাপি বিরহের কবিতা লিখতে বোধ হয় মিলের কোন অভাব হয় না; অভাব যদি হ'ত তাহলে বিরহ সম্বন্ধে এত অপব্যাপ্ত কবিতা কখনো লেখা হত না।

কিন্তু একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্র-নাথ এত বড় কবি হয়েও বিরহ নিয়ে মাতামাতি করেন নি; সেজন্য কবিগুরুকে কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আর তিনি যে বিরহকে ক্রমাগত পাশ কাটিয়ে গেছেন আমার মনে হয় সেটা বৈষ্ণব কাব্যেরই re-action। অথচ বাস্তব জীবনে বিরহের মূল্য তিনি স্বীকার করেছেন। বলেছেন, যে স্বামী-স্ত্রী সারাজীবন একসঙ্গে কাটিয়েছেন তাঁরা একজন আরেক-জনকে সম্পূর্ণ জানতে পারেন নি। কাছের মানুষকে দূরে থেকে না দেখলে পুরোপুরি দেখা হয় না। মুখের কথায় যা বলা যায় না নীল খামের চিঠিতে তা অনায়াসে বলা যায়। যে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে জীবনে কখনো পত্র বিনিময় হয়নি তাঁদের মন জনাজানির মধ্যে অনেকখানি ফাঁক থেকে গেছে। ফাঁক মানেই ফাঁকি। অর্থাৎ একজন আরেকজনকে ফাঁকি দিয়েছেন। বিরহবর্জিত অবিচ্ছিন্ন দাম্পত্য-জীবন অবৈজ্ঞানিক। মিলন এবং বিরহ এক

বস্তু দুটি ফুল, একটি আরেকটির পার্শ্ব প্ররক। যেখানে সাময়িক বিরহ নেই সেখানে চিরমিলন চিরবিরহে পরিণত হয়।

সংস্কৃত কবি এবং বৈষ্ণব কবি উভয়েই স্বীকার করেছেন যে বর্ষা বিরহের ঋতু। আমি যে আজ হঠাৎ বিরহ সম্বন্ধে লিখতে বসে গেলাম শ্রাবণের ধারার সঙ্গে বোধ করি কোথাও তার যোগ আছে। বর্ষার অবিচ্ছিন্ন ঝমঝমনির মধ্যে চিত্ত আপনিই উদাস হয়ে যায়। চম্পক পার করে দিয়ে মনের নবীনতা এবং সরসতা বোধ করি অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছি তবু কিন্তু শ্রাবণের ধারাকে উপেক্ষা করতে পারিনে। বর্ষার রিমঝিম শব্দে উদাসী চিত্ত মেঘলোকে পথ হারিয়ে ফেলে। সংস্কৃত কবি মিথ্যা বলেন নি—মেঘলোকে ভবতি সুখীনাপি অন্যথা বৃষ্টিচেতঃ। নিতান্ত সুখী ব্যক্তিরও চিত্ত উদাস হয়। প্রিয় যদি কণ্ঠলগ্না হয়েও থাকেন তথাপি ব্যবধান ঘোচে না—কিন্তু পুনর্দূরসংস্থে?—দূরে থাকলে তো কথাই নেই।

## বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালা।

### পাঙ্কল

কুপারনের বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস Yama the Pit এর অনুবাদ করেছেন শ্রীকুমারেশ ঘোষ ও শ্রীসুকুমার গুপ্ত। দাম ৩০। গণিকাবস্তির বাস্তব কথাচিত্র। অনেকেই হয়তো বলবেন—নর্দমার এ নোঙ্গর ঘাটা কেন? কেন আর! নিজেদেরই স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য।

## ১৪ই ডিসেম্বর

মেরেজ কোরস্কীর December the 14th এর অনুবাদ করেছেন শ্রীচিন্তরঞ্জন রায় ও শ্রীঅশোক গুপ্ত। জার-শাসিত রাশিয়ার স্বরূপ পরিচয়—ভয়াল, মর্মস্ফূট, মহৎ। (যন্ত্রস্ত)

### শিশু কবিতা

ছোটদের জন্য কবিতা সংকলন করেছেন শ্রীশশীতোষ কাব্যার্থী। দাম ১০।

### — শীঘ্রই বের হবে —

শ্রীকুমারেশ ঘোষের

### ভাঙ্গা-গড়া

আধুনিক সমাজের সমস্যামূলক উপন্যাস

### ম্যানিয়া

স্ট্রী-ভূমিকা বর্জিত ছোটদের অভিনয়োপযোগী রস-নাটিকা।

### রীডার্স কর্ণার

৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬



## মালিশ্পক

ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সাধারণ সভায় আগামী ১৯৪৮ সালের লন্ডনের বিশ্ব-অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় প্রতিনিধিগণ প্রেরিত হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। ইতিপূর্বে বিশ্ব অনুষ্ঠানে ভারত হইতে কেলে এ্যাথলেটিকস ও হকি খেলার জন্যই প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইত। সন্তরনের জন্য ১৯২৮ সালে ডি ডি মুলজী ও ১৯৩২ সালে নারিন মালিককে পাঠান হইলেও তাহারা কোন বিশেষ কারণে শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন না। এ্যাথলেটিকস বিষয়ে এই পর্যন্ত তাহারা যোগদান করিয়াছেন, তাহারা সকলেই প্রাথমিক প্রতিযোগিতাসমূহেই বিদায় গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতায় শেষ সীমানায় পৌঁছিবার সৌভাগ্য হয় না। একমাত্র হকি দলই ভারতের গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়া আনিয়াছেন। ১৯২৮, ১৯৩২, ১৯৩৬ সাল পর পর তিনবারের অনুষ্ঠানে ভারতীয় হকি দলের এই কৃতি অর্জনে সাহায্য করেন বাদকের ধানচাঁদ, রূপ সিং, জাকর, ফারা, ট্যাপসেল, এলেন, জয়পাল সিং প্রভৃতি খেলোয়াড়গণ। ইহারা সবাই ভারতীয় দল আর সমর্থন করিবেন না। নতুন একটি দল গত বৎসর গঠন করা হইয়াছে। এ দল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করিয়াছে। অনেক স্থানে ভাল খেলিলেও খুব উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারে নাই। ভারতীয় দল পূর্বে অজিত গৌরব অক্ষর রাখিতে পারিবেন কি না, সেই বিষয়েই সন্দেহ আছে। এ্যাথলেটিকস্ স্ট্যান্ডার্ড পূর্বাপেক্ষা উন্নততর হইলেও বিশ্ব অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া পূর্বাপেক্ষা কোন ভাল ফল প্রদর্শন করিবে ইহা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারেন না। ইহা সত্য ও ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের কৃৎপক্ষীয়গণ আগামী বিশ্ব-অনুষ্ঠানে এ্যাথলেটিকস্ ও হকি দল ছাড়াও আরও অনেক বিষয় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার মনস্থ করিয়াছেন। যে যে বিষয়ের জন্য প্রতিনিধি প্রেরিত হইবে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) এ্যাথলেটিকস্ (২) হকি (৩) ফুটবল (৪) ওয়াটারপোলো (৫) পোলো (৬) কুস্তি (৭) ভারোত্তোলন (৮) মার্টিয়েম্ফ (৯) সন্তরণ।

এ্যাথলেটিকস্ ও হকি সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আমাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছি। ফুটবল খেলা বিষয়ে এইটুকু বলা চলে যে, গত দুই বৎসর সারা ভারতব্যাপী দাণ্ডাহাঙ্গামা ফুটবল খেলায় বিশব-ভাবে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতের কোন স্থানেই ফুটবল প্রতিযোগিতাসমূহ সৃষ্টভাবে পার্চালিত হয় নাই। অধিকাংশ দেশেই খেলোয়াড়গণ নিয়মিতভাবে খেলিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। খেলার স্ট্যান্ডার্ড দুই বৎসর পূর্বে যেরূপ ছিল, তাহা অপেক্ষা নিম্নস্তরের বে হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কলিকতা সারা ভারতের ফুটবল খেলার অন্যতম কেন্দ্রস্থল। সেই কলিকতায় গত দুই বৎসর কোন প্রথম শ্রেণীর খেলা হয় নাই। সুতরাং ভারতীয় ফুটবল দল বিশ্ব অনুষ্ঠানে কেন্দ্রস্থ সুনাম প্রতিষ্ঠা করিবে ইহা আমরা ভরসা করি না। ইউরোপের অনেক দেশেই ফুটবল খেলায় বিশেষ উন্নতি করিয়াছে। সীতম্ব স্থানে ইংল্যান্ড দলের পরাভূত তাহা প্রমাণিত করিয়াছে। এইরূপ অবস্থার বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ভারতীয় ফুটবল দল প্রেরণের কোন সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

ওয়াটারপোলো খেলায় ভারতের দল যদি পূর্বে প্রেরিত হইত, হকি খেলার নায় গৌরব অর্জনই সম্ভাব্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাহা আর নাই।

## খেলা খেলা

কারণ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ওয়াটারপোলো খেলোয়াড় দল হইতেছে বাঙ্গলা। কিন্তু গত দুই বৎসর সাম্প্রদায়িক দাণ্ডা বাঙলার খেলোয়াড়গণকে একেবারেই খেলিবার সুযোগ দেয় নাই। বোম্বাই, পাজাব প্রভৃতি প্রদেশের খেলোয়াড়গণ কিছু খেলিবার সুযোগ পাইলেও তাহারা কখনও শক্তিশালী ভারতীয় দল গঠন সাহায্য করিতে পারেন না। বাঙলার খেলোয়াড়গণের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। যদি ভারতীয় ওয়াটারপোলো দল প্রেরণ করিতেই হয়, তবে ভারতীয় সন্তরণের পরিচালকগণের উচিত বিনা বিলম্বে বাঙলার খেলোয়াড়গণকে সন্নিহন করা। এই প্রসঙ্গে আরও বলা চলে যে, সন্তরণ বিষয়ে ভারতের প্রতিনিধি করিবার একমাত্র অধিকারী বাঙলার সন্তরণগণ। ভারতীয় সন্তরণের বিভিন্ন বিভাগের যে সকল রেকর্ড আছে সমস্তই বাঙলার সন্তরণগণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সুতরাং সন্তরণ বিষয় প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে হইলেও বাঙলার সন্তরণগণকে বাদ দেওয়া কেননাতেই চলে না। বাঙলার সন্তরণগণ গত দুই বৎসর কোন প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, এখন হইতেই যদি তাহাদের নিয়মিত অনুশীলনের ব্যবস্থা করা হয়, তাহারা ভারতের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ তাহা প্রমাণিত করিতে পারিবেন। এইজন্য প্রয়োজন বাঙলার সন্তরণ পরিচালকগণের গত দুই বৎসরের নিষ্কর্তৃতা ত্যাগ করা। আমাদের বিশ্বাস আছে, বাঙলার পরিচালকগণ বর্তমান অবস্থায় আর নীরব থাকিবেন না।

পোলো খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড় পৃথিবীর বহু স্থানেই গৌরব অর্জন করিয়াছেন। এই খেলার দল প্রেরিত হইলে ভারতের সুনাম প্রতিষ্ঠিত হইবে ইহাতে আমাদের কোনই সন্দেহ নাই।

কুস্তি বিষয়ে ভারতীয় পেশাদার মল্লবীরগণ একাধিকবার পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গৌরব অর্জন করিয়াছেন। অপেশাদার মল্লবীরগণ একমাত্র ব্রিটিশ এম্পায়ার গেমসে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইহার পর ভারতীয় কুস্তির স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কে আমরা কেন অনেকই কিছু জোর করিয়া বলিতে পারেন না। ভারতীয় দল প্রেরিত হইলে খুব ফল খরাপ হইবে এই আশংকা আমরা করি না। তবে নিখিল ভারতীয় একটি কুস্তি প্রতিযোগিতার পর প্রতিনিধি নির্বাচন হইলে আমরা সুখী হইব। আমরা খুবই আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি, হঠাৎ ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশন গঠিত হওয়ার। ভারতীয় এমোচার এ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন কোন অধিকারে এইরূপভাবে ফেডারেশন গঠন করিলেন জামিতে ইচ্ছা হয়।

বাঙলা, পাজাব, প্রভৃতি প্রদেশে কুস্তি বিভাগ পরিচালনা করিবার জন্য যে সকল সংঘ আছে, তাহাদের এই বিষয় কিছু পূর্বে জানান হইয়াছিল কি? যদি না জানান হইয়া থাকে, তবে নবগঠিত ফেডারেশনকে কেন করিয়া সর্বভারতীয় ক্ষমতা দেওয়া চলে? তাহা ছাড়া ভারতীয় এমোচার এ্যাথলেটিক ফেডারেশন গঠনও অনেকেরই অজ্ঞাতে হইয়াছে। সকল ভারতের সকল ব্যায়াম বা খেলাখুন্দা প্রতিষ্ঠান ইহা গঠন করে নাই। নিখিল ভারত ব্যায়াম সম্মেলন এই প্রতিষ্ঠান গঠনে কোনরূপ সাহায্য করে নাই। এইরূপ অবস্থায় এই ফেডারেশন

ব্যায়ামের কোন বিভাগের পরিচালকমণ্ডলী গঠন করিতে পারেন না। অমরাবর্তীতে গত নিখিল ভারত ব্যায়াম সম্মেলনে যে “নিখিল ভারতীয় ব্যায়াম শিক্ষা মহামণ্ডল” গঠিত হইয়াছিল তাহাই সর্বভারতের সকল ব্যায়াম পরিচালকগণের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। কারণ এই মহামণ্ডল করেকজন স্বাধীন বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যায়াম পরিচালকদের দ্বারা গঠিত হয় নাই। ভারতের সকল প্রদেশের সকল বৈশাখ রাজ্যের, এমন কি সামরিক বিভাগের প্রতিনিধিগণের দ্বারা গঠিত হইয়াছে। এইরূপ একটি সর্বভারতীয় প্রতিনিধি করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান যখন এই কুস্তি ফেডারেশন গঠন করেন নাই, তখন উহা সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কোন দিনই গণ্য হইবে না।

মার্টিয়েম্ফ বিষয়ে ভারতীয় সাধারণ ক্রীড়া-মৌদগণ কোনদিনই উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই। সেইজন্য এই বিষয়টিতে ভারতীয় উৎসাহী মার্টিয়েম্ফগণ বিশেষ উন্নতি করিতে পারেন নাই। গত মহামণ্ডলের সময় আমেরিকান সৈনিকগণ ভারতে আসিয়া এই বিষয়ে সকলকে উৎসাহিত করিবার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু সাফল্যলাভ করেন না। বাঙলা ও বোম্বাইতে অনেক ভারতীয় মার্টিয়েম্ফকে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে দেখা গেলেও বিশ্ব অনুষ্ঠানের উপযুক্ত নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। সুতরাং হঠাৎ এই বিষয়ে প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করা খুব সমীচীন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। নিখিল ভারতীয় মার্টিয়েম্ফ পরিচালকমণ্ডলী বলিয়া কোন প্রতিষ্ঠান এখনও গঠিত হয় নাই। এই প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া নিখিল ভারত মার্টিয়েম্ফ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা উচিত। তাহার পর যদি দেখা যায় মার্টিয়েম্ফ স্ট্যান্ডার্ড এল হইয়াছে, তখন বিশ্ব অনুষ্ঠানে ভারতীয় দল প্রেরণ করা চলে। বর্তমানে দল প্রেরণ করিলে শোচনীয় ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই ফললাভ হইবে না। আমরা আশা করি ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ ইহা উপলব্ধি করিয়া দল প্রেরণ ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিবেন।

ভারোত্তোলন বিষয়ে ভারতীয় ব্যায়ামবীরগণ উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী হইয়াছেন সন্দেহ নাই, তবে বিশ্ব-স্ট্যান্ডার্ডের তুলনায় তাহা অতি নগণ্য। মিশর, রাশিয়া, সুইডেন প্রভৃতি দেশের ব্যায়ামবীরগণ এই বিষয় খুবই উন্নতি করিয়াছেন। ইহাদের প্রতিনিধিগণের সহিত ভারতীয় ব্যায়ামবীরগণ যখন সমপ্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন না, তখন ভারতীয় দল প্রেরণের সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে অভিজ্ঞতা লাভে বঞ্চিত সাহায্য করিবে। ভারতীয় ভারোত্তোলন সমিতির পরিচালকগণকে এইজন্য অনুরোধ করি, তাহারা যেন তরুণ উৎসাহী ভারতীয় ভারোত্তোলন দল প্রেরণ করেন। তাহা হইলে উল্লিখিত ভারতের এই বিষয়ে সুনাম প্রতিষ্ঠা করিবার সম্ভাবনা থাকিবে।

## বিনামূল্যে

## বিনামূল্যে

## চিত্রকূটের হাঁপানি বটি

বিনামূল্যে ১০ হাজার প্যাকেট

মাসে একমাত্র ব্যবহারে হাঁপানি (দমা) সম্পূর্ণরূপে উপশম হয়। বিজ্ঞাপন ও ডাক ব্যয় বাদে ১১০ টাকা মাত্র পাঠান। ইংরাজীতে যা হিঙ্গলিতে পত্র লিখুন—

স্বাধীনকায়-প্রীতিয়াগ বৈদ্য আশ্রম, চিত্রকূট (বাঙ্গা, ইউ পি)।

## দেশী সংবাদ

২১শে জুলাই—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে গণ-পরিষদের দলপতি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত করিমাছেন। ইহার ফলে পণ্ডিত নেহরুই ভারতীয় ডোমিনিয়নের প্রধান মন্ত্রী হইবেন।

সিদ্ধম ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দলের কলোনি প্রকাশ, বলপূর্বক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জাম দখল ও শস্য কতনের সংবাদ পুনরায় শুন্য হইতেছে। ৮টি জেলার মধ্যে তিনটি জেলা হইতে এইরূপ ৬০টি সংবাদ আসিয়াছে।

গতকাল বাঙালার ২৯ জন রাজনৈতিক বন্দীর মধ্যে ১৩ জনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। এই ১৩ জন রাজনৈতিক বন্দীর মধ্যে ৯ জন মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে এবং ৪ জন আলিপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছেন।

নরাদিক্রীড়া গণ-পরিষদের অধিবেশনে প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র একটি নতুন ধারা সন্নিবেশের প্রস্তাব গৃহীত হয়। উক্ত ধারায় বলা হইয়াছে যে, সমস্ত প্রদেশে একটি আইন সভা থাকিবে। তথাকার গভর্নর আইন সভা কর্তৃক গৃহীত কোন বিল পূর্নাবিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন। আবশ্যিকায় সংশোধনাদির বিষয় সুপারিশের অধিকারও তাঁহার থাকিবে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অন্য গণ-পরিষদে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র কমিটির রিপোর্ট পেশ করেন।

২২শে জুলাই—গণপরিষদ আজ স্থির করিয়াছেন যে, জাকরণ, শেত ও সবুজ বর্ণের সমধারে গঠিত কংগ্রেস পতাকাই ভারতের জাতীয় পতাকা বলিয়া গ্রহণ করা হইবে। এই পতাকার মধ্যস্থলে অশোক ৮য় সর্পিখণ্ড থাকিবে। “চরকা” পারিকল্পনার অন্য মহায়া গানধীকে গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের প্রস্তাবও গৃহীত হয়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সদস্যগণ বিপুল উৎসাহভরে প্রস্তাবটি সমর্থন করেন।

অন্য মুসলিম লীগ বঙ্গীয় সীমা নির্ধারণ কমিশনের নিকট তাহাদের দাবী পেশ করেন। মিঃ ওয়াসিম লীগ পক্ষের সুওয়াল করেন। তিনি বলেন যে, হুগলী নদী ধরিয়া পূর্ব ও পশ্চিম বাঙালার সীমা নির্ধারণ করিতে হইবে।

২৩শে জুলাই—গভর্নর জেনারেল পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে কলিকাতা সহ সমগ্র পশ্চিম বাঙালার শাসনকার্য পরিচালনার পূর্ব ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। কলিকাতার পুলিশ বাহিনীও প্রধান মন্ত্রী ডাঃ ঘোষের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে।

গত মংগলবার বেংগল নাগপুন্নর রেলওয়ের ঋণপূর্যস্থিত রেল কর্মচারীদের আবাসস্থল এলাকার অবক্ষা সাংপ্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে ৯২ জন লোককে ঋণপুন্নর রেলওয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। আহতদের মধ্যে ৬ জন হাসপাতালে মারা গিয়াছে।

২৪শে জুলাই—ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ডাঃ সুলতান শারীর অন্য বিমানযোগে কলিকাতায় পৌঁছেন। ইন্দোনেশীয়দের বহুবিধ বিশ্ববাসীকে জানাইবার জন্য তিনি ভারতবর্ষ, বটেন, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া পরিভ্রমণ করিবেন।

ভারতের শেখ ভাইরয় লর্ড মাউন্টবাটেন আগামী ১৫ই আগস্ট মধ্যাহ্নের পর আর ভাইরয় থাকিবেন না। ১৫ই আগস্ট সকালে তিনি ভারত ডোমিনিয়নের নিয়মান্তরিত গভর্নর জেনারেল হিসাবে শপথ গ্রহণ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

গ্রীষ্ম জিলা কংগ্রেস কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারী

## সাপ্তাহিক

জুলাই

গ্রীষ্ম বীরেন্দ্রনাথ দাস গত ২১শে জুলাই মহায়া গান্ধী ও রাষ্ট্রপতির নিকট এই মর্মে এক তার প্রেরণ করিয়াছেন যে, গণভোটকালে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে যে উন্মত্ত সাম্প্রদায়িক প্রচারণা চলিয়াছিল তাহা বর্তমানে দূর্শন, অগ্নিসংযোগ এবং নারীধর্ষণ প্রভৃতির আকার ধারণ করিয়াছে।

ক্ষমতা হস্তান্তরের পর সংখ্যালঘুদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত এবং অন্য সকল নাগরিকের ন্যায় একরকম ব্যবহার করা হইবে বলিয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ের পক্ষ হইতেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। ভারত গভর্নমেন্ট ও পাকিস্থান গভর্নমেন্টের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত বিভাগ পরিষদ এক যুক্ত বিবৃতিতে এই প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

২৫শে জুলাই—ভারতের অন্তর্বর্তী গভর্নমেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ইন্দোনেশিয়ার ওলন্দাজদের আক্রমণকৃত একটা বিশেষায়ক ঘটনা বলিয়া অভিহিত করিয়া বলিয়াছেন যে, এশিয়ার নতুন জীবনীশক্তি ইহা সহ্য করিবে না।

বড়লাট লর্ড মাউন্টবাটেন নরাদিক্রীতে দেশীয় রাজ্যের শাসন ও মন্ত্রী সম্মেলনে যোগদান করেন, “প্রজাদের কল্যাণের জন্য দায়িত্বশীল বলিয়া আপনারা যেমন তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিতে পারেন না, তেমনি প্রতিবেশী ডোমিনিয়নের গভর্নমেন্ট হইতেও আপনারা আর দূরে থাকিতে পারিবেন না।” বড়লাট আরও বলেন যে, “দেশীয় রাজ্যসমূহের দেশশত্রু, বৈদেশিক ব্যাপার ও যোগাযোগ ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।”

২৬শে জুলাই—মহানসিংহ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি গ্রীষ্ম বীরেন্দ্রনাথ যোষের সভাপতিত্বে নীখল বঙ্গ কংগ্রেস সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। পাকিস্থান ডোমিনিয়নের সংখ্যালঘুদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মিঃ গ্রিফা যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রণয়সা করিয়া পূর্ববঙ্গের আইন পরিষদের কংগ্রেসী দলের নেতা গ্রীষ্ম কিশোরশঙ্কর রায় এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং সম্মেলনে তাহা গৃহীত হয়।

পশ্চিম বঙ্গ মহিলাসভা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে বাঙলা গভর্নমেন্ট হইতে যে কয়টি মামলা দায়ের করা হইয়াছিল, সেই মামলাগুলি প্রত্যাহার করিয়া লইবার প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

বর্তমানে পশ্চিম বাঙালার বিভিন্ন স্থানে যে আনুমানিক ৫০,০০০ বিহারী আশ্রয়প্রার্থী আছে, আগামীকাল হইতে তাহাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন শুরু হইবে।

১৫ই আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তর দিবস উৎসব উপলক্ষে পশ্চিম বঙ্গের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে স্ব স্ব এলাকার সরকারী ভবনে আলোকসজ্জা ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ইন্দোনেশিয়ার ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী ডাঃ শারীর অন্য নরাদিক্রীতে গণ-পরিষদ ভবনে পরিষদ সদস্যদের সমক্ষে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, ইন্দোনেশিয়ার সমস্যা এশিয়াবাসীর

সমস্যা। এই সংগ্রাম সমগ্র বিশ্ব বিশেষ করিয়া এশিয়ার দেশগুলির প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ।

২৭শে জুলাই—অমৃতনরের সংবাদে প্রকাশ, অন্য পাক্সা জন-নিরাপত্তা আইন অনুসারে ১০৮ জন লোকের ৪টি শিখ জটাকে প্রেতার করা হইয়াছে। নিষেধাজ্ঞা আমান্য করিয়া স্বর্ণ মন্দির হইতে নানকানা সাহেব অভিমুখে অগ্রসর হইবার কালে তাহাদিগকে প্রেতার করা হয়। শিখরা যাহাতে নানকানা সাহেব অভিমুখে অগ্রসর হইতে না পারে, তজ্জন অমৃতনরের দরবার সাহেব অঞ্চলে ৪৮ ঘণ্টা সশস্ত্র আইন জারী করা হইয়াছে।

লাহোর হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, সরকারী নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও শিখ সম্মেলনে যোগদানকালে ইতিহাস বিখ্যাত গুরুদ্বারের সম্মুখে জনতার সমাবেশ হয়। জনতাকে হতভগ করার উদ্দেশ্যে সৈন্যরা দুইবার গুলী চালায়। ফলে ৫ জন আহত হইয়াছে।

আজ কলিকাতা ও হাওড়ায় হাঙ্গামাজনিত দুর্ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কলিকাতার বিভিন্ন অংশে হইতে এই দিনে ৫ জন নিহত ও কুড়িজন আহত হইবার সংবাদ পাওয়া যায়। হাওড়ায় ঘটনায় দুই ব্যক্তি নিহত ও ১৯ জন আহত হয়। এই হিসাব সরকারীভাবে সমর্থিত হয় নাই।

## বিদেশী সংবাদ

২১শে জুলাই—ইন্দোনেশিয়ার গণতন্ত্রী বিমান ও স্থল বাহিনী ব্যাপক আক্রমণ শুরু করায় ওলন্দাজ বিমান বহর মধ্য ভাভার রাজধানী বোগাকাতার বিমান ঘাটের উপর বোমা বর্ষণ করে।

গ্রহণ গণ-পরিষদের সভাপতি থাকিন নুর নেতৃত্বে বহুর নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। বহুর আউগ সামের পর তিনিই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী লোক বলিয়া পরিচিত।

২২শে জুলাই—বার্ভাভিয়ার সংবাদে প্রকাশ, ওলন্দাজ উভর সৈন্যবাহিনী ব্যাপকভাবে পূর্ব যবন্যাপে অবতরণ করিয়াছে। জাহাজ হইতে অবতরণ করার পর ওলন্দাজ সৈন্যরা পূর্ব যবন্যাপের তিনটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বন্দর দখল করিয়াছে।

বার্ভাভিয়ার ওলন্দাজ কর্তৃক গতকাল ইন্দোনেশীয় সাধারণতন্ত্রের সহকারী প্রধান মন্ত্রী ডাঃ এ কে গণি এবং অপর কয়েকজন নেতাকে প্রেতার করে।

২৫শে জুলাই—ইন্দোনেশীয় গণতন্ত্রী গভর্নমেন্ট আনুমানিক জনগণকে অস্ত্র সজ্জিত করিবার জন্য এক আদেশ জারী করিয়াছেন বলিয়া ইন্দোনেশীয় নিউজ এজেন্সীর সংবাদে ঘোষিত হইয়াছে। সুমাত্রা, জাভা ও সোলোমস দ্বীপে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। বিভিন্ন রণাঙ্গনে গণতন্ত্রী বাহিনী সাক্ষা অগ্রণ করিয়াছে।

২৬শে জুলাই—ওলন্দাজদের বিমান আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাভা ও সুমাত্রার সমস্ত রণাঙ্গনে প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হইয়াছে। ওলন্দাজ আক্রমণের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রী বাহিনী কঠোরভাবে বাধা দিতেছে। ইন্দোনেশিয়ান প্রধান সেনাপতি জেনারেল সুফর্মিন বলেন যে, ইন্দোনেশিয়ানরা দৃশ্যস্থলভাবে পোড়মাটি নীতি অনুসরণ করিয়া ও গেরিলা যুদ্ধে তাহাদের শক্তির পরিচয় দিতেছে।

২৭শে জুলাই—ইন্দোনেশিয়ান নিউজ এজেন্সী ঘোষণা করিয়াছেন যে, সাধারণতন্ত্রী সেনাদল সুমাত্রার বৃহত্তম শহর ও যুদ্ধপূর্ব ডাচ রাজধানী মেডান অধিকার করিয়াছে।

ভিয়েতনাম সামরিক মহল ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইন্ডোচাইনে গত ছয় মাসের মধ্যে ফরাসীদের মোট ৮৮ হাজার সৈন্য হতাহত ও বন্দী হইয়াছে।

# বর্ষানুক্রমিক সূচীপত্র

চতুর্দশ বর্ষ  
(২৭শ সংখ্যা হইতে ৩৯শ সংখ্যা পর্যন্ত)

| অ                                                                                                       | গ                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ভাষীতের এক পাতা (গল্প)—শ্রীকৃষ্ণদ গদ্য ৭৫                                                               | গদ্যত অস্ত্রোপচার—শ্রীঅনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এস-সি ৩৪৭      |
| অধুনা (কবিতা)—শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৮০                                                       |                                                               |
| অনাগত (কবিতা)—শ্রীনির্মাল্য বসু ২১৫                                                                     | ঘ                                                             |
| অন্ধকার (গল্প)—শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য ৪০২                                                             | ঘরভোলা (কবিতা)—শ্রীবিভা সরকার ৩২৪                             |
| অপরাজ (বড় গল্প)—শ্রীঅপর্বকুমার মৈত্র ২৫৭, ২৯২, ৩২০, ৩৯০, ৪৩৬                                           | চ                                                             |
| অভিনেতা (গল্প)—অনুবাদক মহাশেবতা ভট্টাচার্য ২২০                                                          | চতুরা (গল্প)—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ২৭০                      |
| অশ্বথের অভিশাপ (উপন্যাস)—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ২০, ৭১, ৯৫, ১৫২, ২০১, ২৪০, ২৮৯, ৩৩৭, ৩৮১, ৪১৯, ৪৫৭, ৪৯৭, ৫৪৯ | ছ                                                             |
| অয়গেন ফিশার—শ্রীশশাঙ্কশেখর সরকার ৪৭২                                                                   | ছবি— ৩, ১৪, ৪৮, ৫০, ৮৩, ৯৪, ১৩৬, ১৭০, ৩১৪, ৩১৮, ৩৬০, ৪০৬, ৪৯৪ |
| অয়গেন ফিশারের সঙ্গে এক বৎসর—শ্রীশশাঙ্কশেখর সরকার ৫১৫                                                   | ছায়াপাত (গল্প)—অমর সান্যাল ২৮৬                               |
| আ                                                                                                       | জ                                                             |
| আশ্চর্য ঔষধ—শ্রীঅমরেন্দ্রকুমার সেন ২৯৮                                                                  | জয় (কবিতা)—সুনন্দা সেনগুপ্ত ৯৭                               |
| আঁধি (গল্প)—শ্রীআশু চট্টোপাধ্যায় ১১১                                                                   | "জেরা চট কর্ দেখো" (গল্প)—শ্রীখগেন্দ্রকুমার মিত্র ৫১৯         |
| ই                                                                                                       | ট                                                             |
| ইন্দ্রজিতের খাতা— ৫, ১১৮, ১৬৯, ১৮৪, ২৫৬, ২৭১, ৩১৭, ৫০৯, ৫৭৫                                             | টমাস হাট মরগ্যান—শ্রীশশাঙ্কশেখর সরকার ৬৯                      |
| উ                                                                                                       | ট্রামে-বাসে— ৩৯, ৪৯, ৯৩, ১৭২, ১৮৩, ২২৮ ৩০৪                    |
| উইপিং উইলো (কবিতা)—শ্রীদেবশচন্দ্র দাস ১০৭                                                               | টোটার গাছ (গল্প)—অনুবাদক শ্রীগোপাল ভৌমিক ৫২৬                  |
| উইপুড়ীর রহস্য—শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন ৫৪৬                                                                  |                                                               |
| ঊ                                                                                                       | ড                                                             |
| ঊষ্য রবীন্দ্রনাথ—শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত ২৭২                                                              | দাঁতের দোষ—ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য, ডি টি এম ৫২২                |
| এ                                                                                                       | দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলন—শ্রীমণীন্দ্র গুহ ৩৭৯               |
| এই ভালবাসা (গল্প)—অনুবাদক শ্রীশক্তি দাশগুপ্ত ৩৪৯                                                        | দাঁটির দোষ—ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য, ডি টি এম ২৪৫                |
| একশ বছর পরে (কবিতা)—শ্রীনির্মালচন্দ্র ভট্টাচার্য ৩৬১                                                    |                                                               |
| এপার-ওপার— ৩৬২, ৪০৮, ৪৭৭, ৪৯৬, ৫৫৩                                                                      |                                                               |
| ক                                                                                                       | ধ                                                             |
| কাথিয়াওয়াড়ী সেলাই ও কাচের কাজ—শ্রীউমা রায় ৫১৩                                                       | ধূমপান নিষেধ (নাটিকা)—অনুবাদক শ্রীদেবব্রত মৃথোপাধ্যায় ৯৮     |
| কাব্যগ্রন্থ (কবিতা)—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ৪                                                                 |                                                               |
| কাহিনী নয় খবর— ২৩৬, ৩০৭, ৩৪২, ৩৪৩, ৫০২                                                                 |                                                               |
| কেন (কবিতা)—কুমারী অমিতা বিশী ২০৯                                                                       |                                                               |
| কেমোথেরাপি—শ্রীশান্তদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, এম এস-সি ১০৯                                                      |                                                               |
| কোষ্ঠবৃদ্ধতা, না মনের ভুল—ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য, ডি টি এম ৪২৮                                           |                                                               |
| কৃষ্ণচূড়া (কবিতা)—শ্রীবিভূষণ গুহ ১৩৮                                                                   |                                                               |
| খ                                                                                                       | ন                                                             |
| খেলখুলা— ৪২, ৮৬, ১০১, ১৭৬, ২২১, ২৬৪, ৩০৮, ৩৫৩, ৪০১, ৪৪৪, ৪৮৬, ৫৩১, ৫৭৬                                  | নগ্ন সত্য (গল্প)—অনুবাদক শ্রীসমীর ঘোষ ৩০১                     |
|                                                                                                         | নববর্ষণ (কবিতা)—শ্রীকানাই সামন্ত ৯২                           |
|                                                                                                         | নন্দই বছরের মানুষ বান্দিড শ—শ্রীমণি বাগচি ৬০                  |
|                                                                                                         | নাম ও পদবী—শ্রীপরিমল দত্ত ৪১৭                                 |
|                                                                                                         | নারী ও নগরী—শ্রীপরিমল দত্ত ২১৪                                |
|                                                                                                         | নিকেল মুদ্রা বনাম রৌপ্যমুদ্রা—শ্রীঅনিলকুমার বসু ৩৭            |
|                                                                                                         | নতুন রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা—শ্রীরঞ্জেন্দ্রকিশোর রায় ৩৪৩        |
|                                                                                                         | নোশলপ ও পোতাশ্রয় সমস্যা ভারত—শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী ৫৭১         |

প

ঘ

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| পথ (গল্প)—শ্রীনির্মল চট্টোপাধ্যায়                                      | ১২৭ |
| পশ্চিমে বৈশাখ (কবিতা)—শ্রীপ্রমথনাথ বিশাী                                | ৪   |
| প্রতীক্ষা (অনুবাদ সাহিত্য)—শ্রীশক্তি দাশগুপ্ত                           | ৫৫৪ |
| পরিভ্রম (কবিতা)—শ্রীনির্মলা বসু                                         | ৫৭০ |
| পাকিস্থানী বাঙলা ও জাতীয় বাঙলার অর্থনৈতিক সমস্যা—<br>শ্রীঅনিলকুমার বসু | ৩৯৫ |
| পাকিস্থানের হিন্দু—শ্রীরাজেন্দ্রকিশোর রায়                              | ৪১৩ |
| পদ্মল (গল্প)—শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়                               | ২০৬ |
| পদ্মতক পরিচয়— ৮১, ২১৬, ২৬০, ৩৯৩, ৪৪৫, ৫৩২, ৫৬১                         | ১৭৩ |
| পেন্সনের দাবী (গল্প)—অনুবাদক শ্রীগোপাল ভৌমিক                            | ৫৬  |
| প্রতাপাদিত্য—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ                                    | ৪৪১ |
| প্রতিফলনহীন কাচ—শ্রীহিমাংশু সরকার                                       | ৩৮৭ |
| প্রেমের নির্মলতা—শ্রীক্ষিতমোহন সেন                                      |     |

ব

|                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| বাঙলার কথা—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ২৯, ৬২, ১০১, ১৬৩, ১৯৬,<br>২৪৯, ২৭৯, ৩১৫, ৩৮৫, ৪২৪, ৪৬৮, ৫১০, ৫৬২ |     |
| বাধা (কবিতা)—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ                                                                    | ১৮২ |
| বিজ্ঞান ও রবীন্দ্রনাথ—শ্রীঅমরেন্দ্রকুমার সেন                                                        | ১২  |
| বিভক্ত বঙ্গের নন্দনদী—শ্রীকনকভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়                                                   | ৪৬৩ |
| বিবিধ প্রসঙ্গ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর                                                                     | ৭   |
| বোধ সাহিত্যে নারী—শ্রীদেবব্রত বড়ুয়া                                                               | ২৩৭ |

ভ

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ভারত ও জাপান—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়                                                | ১৫  |
| ভারতভূক্তি ও বাঙলা সাহিত্য—শ্রীপ্রমথনাথ বিশাী                                            | ১০৬ |
| ভারতে প্যারীজিন—শ্রীঅমরেন্দ্রকুমার সেন                                                   | ৫৫৬ |
| ভারতের আদিবাসী—শ্রীসুবোধ ঘোষ ৩১, ৬৪, ১০৩, ১৪৪, ১৯৮,<br>২৬১, ৩০৫, ৩৩৩, ৩৭৭, ৪২২, ৪৮৭, ৫০০ | ৫৩৮ |

ম

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| মহানগরীর পথে (কবিতা)—আশরাফ্ সিদ্দিকী               | ৪৯৫ |
| মর্মর মূর্তি (গল্প)—অনুবাদক শ্রীমতীজয় রায়        | ৪৩৪ |
| মহাভারত (কবিতা)—শ্রীনির্মলা বসু                    | ৫৭০ |
| মাটির তলায় (গল্প)—অনুবাদক আব্দুল কালাম সামসুদ্দিন | ২৫৩ |
| মাতৃবন্দনা (কবিতা)—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর               | ২৭০ |
| মানবদরদী রবীন্দ্রনাথ—শ্রীক্ষিতমোহন সেন             | ১৯  |
| মুক্তি (কবিতা)—শ্রীশান্ত দেবী                      | ১৪৩ |
| মুক্তি কোথায়—শ্রীদেবব্রত বড়ুয়া, এম এ            | ১৬৫ |
| মেঘদূত (কবিতা)—শ্রীবিটকৃষ্ণ দাস                    | ৩২৪ |
| মৌ-পিপড়ে—শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন                      | ২৫১ |
| মৌসুমী (গল্প)—শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়         | ৪৭৯ |

|                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| যাত্রিদল (উপন্যাস)—শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ ৫১, ১১৩, ১৩৯, ১৯১,<br>২২৯, ২৮১, ৩১৫, ৩৭৩, ৪০৯, ৪৭৪, ৫০৩, ৫৪১ |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

র

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| রংগজগৎ— ৪১, ৮৪, ১৩০, ২১৮, ৪৮৩, ৫২৯, ৫৭৩               |     |
| রক্তসন্ধ্যা (কবিতা)—শ্রীসুন্দর সেনগুপ্ত               | ১৮২ |
| রজনীগন্ধা (কবিতা)—শ্রীসুন্দর সেনগুপ্ত                 | ২৯২ |
| রবীন্দ্রনাথ                                           | ৫   |
| রবীন্দ্রনাথ (কবিতা)—শ্রীরেন্দ্রনাথ মিত্র              | ৪   |
| রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় | ১৬৬ |
| রাতের বড় (কবিতা)—শ্রীআদিত্য ওহদেদার                  | ৪৩১ |
| রীফ বিদ্রোহ ও আব্দুল করিম—শ্রীগোপাল ভৌমিক             | ৪৫৩ |

ল

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| লক্ষ্মীছাড়া (গল্প)—শ্রীসুন্দরনাথ ঘোষ | ২২৩ |
| লবঙ্গ (গল্প)—শ্রীসুশীল রায়           | ১৪৯ |

শ

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| শিম্পাজী (গল্প)—শ্রীসুশীল রায়                                    | ৫৫৭           |
| শিশু নাট্যমণ্ড                                                    | ৪৪৫           |
| শুশ্রূষা (গল্প)—শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়                    | ৩৬৩           |
| শব-মেধ, অশ্বমেধ নহে (বড় গল্প)—<br>শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় | ১১৯, ১৫৫, ১৮৫ |

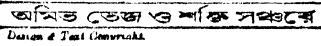
স

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| সকলের জন্যই কবিতা—শ্রীআদিত্য ওহদেদার                                            | ২৬  |
| সম্যাসী রিস্টফার ইশারউড—শ্রীমণি বাগচি                                           | ৫৫৯ |
| স্টেনব্রেকের সাহিত্য ত্রণ—মণি বাগচি                                             | ৪৬১ |
| সাপ্তাহিক সংবাদ ৪৩, ৮৭, ১৩২, ১৭৭, ২২২, ২৬৫,<br>২০৯, ৩৫৪, ৪০০, ৪৪৬, ৫০৩, ৫৭৭     | ৩৩১ |
| সাহিত্যিকের ভূমিকায় সুস্মিগ—শ্রীমণি বাগচি                                      | ৩৩১ |
| সাময়িক প্রসঙ্গ— ১, ৪৫, ৮৯, ১৩৩, ১৭৯, ২২৩, ২৬৭,<br>৩১১, ৩৫৭, ৪০৩, ৪৪৭, ৪৯১, ৫৩৫ | ৯২  |
| সারথি (কবিতা)—শ্রীসুধেন্দ্র গুহ                                                 | ৫৬৬ |
| সিংগুর—শ্রীসুধীরকুমার মিত্র                                                     | ১৩৭ |
| সুর সংগতি (কবিতা)—শ্রীসৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত                                     | ১৮২ |
| সুদূর (কবিতা)—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস                                               | ২১০ |
| সৌরকলঙ্ক—শ্রীসত্যীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়                                         | ১৮  |
| স্বপ্নসাধ (কবিতা)—নির্মলা বসু                                                   |     |

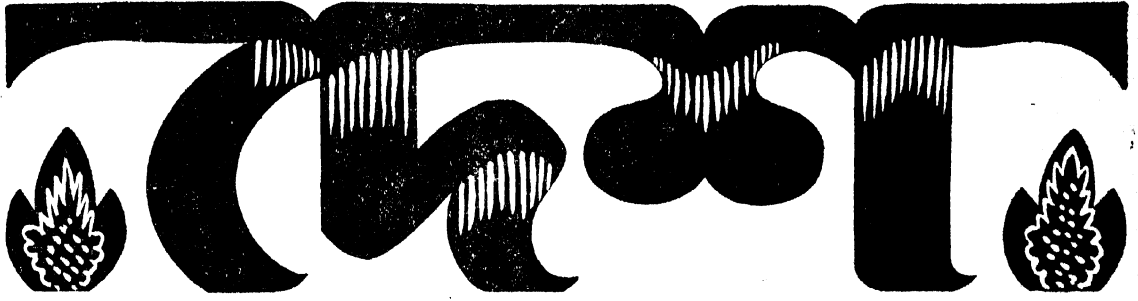
হ

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| হরেন্দ্রলাল ঘোষ                | ৪৫০ |
| হেনা (কবিতা)—শ্রীকল্যাণী মিত্র | ৪৯৫ |

(এন ১৫—২৫।৬)



प्रकाशिकात्री ७ परिचायक :- आनन्ददास पट्टिक निम्नदेष्ट, १२२ बरन चौक, कलकत्ता



সম্পাদক : শ্রীবাৎসলচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ।

শনিবার, ২৩শে শ্রাবণ, ১৩৫৫ সাল।

Saturday, 9th August, 1947.

[ ৪০শ সংখ্যা

### চক্রবর্তী রাজাগোপালআচার্য

শ্রীমন্ত রাজাগোপালআচার্য পশ্চিম বঙ্গের গভর্নর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বঙ্গা বাহুল্য রাজাজীর এই নিয়োগ সকলেই আনন্দের সঙ্গে অভিনন্দিত করিবেন। রাজাজী ভারতের প্রবীণ রাষ্ট্রনায়কদের অন্যতম। এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের তিনি একজন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা এবং সেনানী। একনিষ্ঠ দেশপ্রেমের সাধনায় তিনি জীবনে দীর্ঘ দুঃখকষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার জীবন ত্যাগ-ধর্ম এবং সেবাপ্রবণতায় উজ্জ্বল হইয়াছে। এতব্যতীত শাসন সম্পর্কিত, যোগ্যতার ক্ষেত্রেও তিনি মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র সচিবরূপে যথেষ্ট সূচশ অর্জন করিয়াছেন। তিনি স্ফুটদর্শী রাজনীতিক এবং সুদৃষ্টি মনীষাসম্পন্ন বহুশ্রুত পুরুষ। তাঁহার গীতা ভাষা এবং মহাভারতের আলোচনা-গ্রন্থ ভারতের বিদ্বজ্জনসমাজে সমাদৃত হইয়াছে। অসম্প্রদায়িক উদার দৃষ্টির জন্য রাজাজী ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমানের মৈত্রীর জন্য তাঁহার সুদীর্ঘ প্রচেষ্টার কথা সকলেই অবগত আছেন। ১৯৪৪ সালে গণ-পরিষদের ভিত্তিতে পাকিস্থানের এলাকা স্থির করিবার জন্য মি-জিম্মার সঙ্গে তিনি আলোচনা উপস্থিত করেন, তখন তাহা জনপ্রিয় হয় নাই, এজন্য রাজাজীকে অনেক দুর্যোগ ও ভোগ করিতে হইয়াছে। বস্তুত রাজাজী ভারত-বিভাগবাদী নহেন, তবে পরাধীন ভারত অপেক্ষা বিভক্ত স্বাধীন ভারতেরই তিনি পক্ষ সমর্থক ছিলেন। এতদিন পরে মূলত তাঁহার প্রস্তাবকে ভিত্তি স্বরূপে গ্রহণ করিয়াই কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে একটা রফা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ এমন একজন প্রতিভাবান প্রবীণ

## সাময়িক

এবং শাসনকার্যে সুদক্ষ রাজনীতিক নেতাকে শাসনকর্তারূপে লাভ করিল, ইহা সৌভাগ্যের বিষয়ই বলিতে হইবে। এই পদ লাভে রাজাজীর পক্ষে মান বা প্রতিষ্ঠার দিক হইতে লোভনীয় কিছুই নাই। তিনি দেশের সেবক হিসাবেই এই পদ গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহার শাসনে উপরূত বাঙালয় শান্ত ও সমৃদ্ধি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হউক এবং পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সে শাসনের প্রভাব পরোক্ষভাবে পূর্ববঙ্গেও ঐক্য ও মৈত্রীর নবীন প্রেরণা সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়া উঠুক। আমরা রাজাজীকে আমাদের সম্রাট অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

### দুর্ভলতা নিন্দনীয়

পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সমস্যা সমগ্র জাতির চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহা খুবই আশার লক্ষণ। কিছুদিন পূর্বে ময়মনসিংহে কংগ্রেসকর্মীদের সম্মেলনে এই সম্বন্ধে ইতি-কর্তব্যতা নির্ধারিত হয়; গত ১৬ই এবং ১৭ই শ্রাবণ হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে কলিকাতা শহরে পূর্ববঙ্গ হিন্দু সম্মেলনে এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্বন্ধে কতকগুলি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। উভয় সম্মেলনই ভীতিগ্রস্তভাবে দেশ ত্যাগের সংকল্প পরিত্যাগের জন্য পরামর্শ দান করিয়াছেন। আমরাও বারংবার এই কথাই বলিয়া আসিয়াছি। মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িকতামূলক প্রচারকার্যের ফলে পূর্ববঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গে সমাজ-জীবনে যে বিপর্যয় দেখা দিয়াছে, একথা অস্বীকার

করিবার উপায় নাই; কিন্তু ভীতির ফলে এই অবস্থার প্রতিকার ঘটবে না। প্রকৃতপক্ষে যাহারা ধনী, দেশত্যাগ তাহাদের পক্ষেই সম্ভব হইবে। যাহারা দরিদ্র কিংবা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, তাহারা ঘরবাড়ি ছাড়িয়া পলাইতে পারিবেন না। এইভাবে স্ব-সম্প্রদায়ের দরিদ্র এবং অপেক্ষাকৃত ধনীরাই নিজেদের ছাড়িয়া আসা কখনও মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নয়। গত ২৭শে জুলাই ভারতীয় মুক্তরাষ্ট্রের গণপরিষদের মুসলিম লীগের সদস্যদের বৈঠকে মিঃ জিম্মা যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমাদের মনে আশার সঞ্চার করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম লীগের সর্বাধিনায়কের মুখ হইতে এমন উদার প্রাণিতপূর্ণ উক্তি আমরা কোনদিন শুনি নাই। মিঃ জিম্মা নিজেকে ভারতীয় ইউনিয়নের নাগরিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং তিনি জাতীয় পতাকার প্রতি মুসলমানদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন। আমরা জানি, পূর্ববঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে লীগের অনুরাগীদের মধ্যে যদি এইরূপ মনোভাব সম্প্রসারিত হয়, তবে সেখানে সংখ্যালঘিষ্ঠদের ভয়ের কোন কারণ থাকে না; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আদ্যাপি তাহা হয় নাই। ব্যাপকভাবে কোন অশান্তি না ঘটিলেও লীগের অশ্ব এবং উকট অনুরাগীরা স্থানে স্থানে লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতি শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য, বিশেষভাবে নারীদের সম্বন্ধে কুৎসিত ইঙ্গিত করিতেছে। পূর্ববঙ্গ সম্মেলনের সভাপতিস্বরূপে উক্ত শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এসব কথা বলিয়াছেন। লীগওয়ালারা যদি মিঃ জিম্মার উক্তির মর্যাদা আন্তরিকতার সঙ্গে প্রতিপালন করিতে ইচ্ছুক হন, তবে এই সব দুর্ভলতাকে কঠোর হস্তে সংযত করুন। পূর্ব পাকিস্থানের নব-নির্বাচিত নেতা মিঃ নাজিমুদ্দিনের

দৃষ্টি আমরা এই দিকে আকৃষ্ট করিতেছি। পূর্ববঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গ ভারতের বিপ্লব-সাধনার পীঠভূমিস্বরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। আমরা আশা করি, তথাকার তরুণ সম্প্রদায় পরাজয়ী মনোবৃত্তির স্বারা অভিভূত না হইয়া মানবতার মৰ্যাদা রক্ষায় সংহতিবদ্ধ হইয়া কাজ করিবেন।

### গান্ধীজীর নৈয়াখালি প্রত্যাবর্তন

গান্ধীজী নৈয়াখালিতে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন, এই সংবাদে আমরা অত্যন্ত আশান্বিত হইয়াছি। প্রকৃতপক্ষে নৈয়াখালির সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমাজ-জীবন অসুখি অভিভূত অবস্থায় রহিয়াছে, সেখানে স্বাভাবিক প্রাণরক্ষা ফিরিয়া আসে নাই। পাকিস্থানী জয়োল্লাসের ফলে ১৫ই আগস্টের পরে পুনরায় সেখানে অনর্থ দেখা দিতে পারে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে সর্বত্র এইরূপ আতঙ্ক রহিয়াছে; সে আতঙ্কের কারণ না আছে এমন নয়। নরহত্যা প্রভৃতি গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত কুখ্যাত গোলান বারোয়ারকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ১৫ই আগস্টের পর ইহাকে রাজকীয়ভাবে অভিনন্দিত করবার উদ্যোগ-আয়োজন শুরু হইয়াছে। মিঃ সুরাবর্দীর নিজের কাগজেই ঢাকে ঢোলে এই কথা প্রচার করা হইয়াছে। পাকিস্থানী এমন মহিমা ভরনমাজকে আতঙ্কিত করিবে, ইহা স্বাভাবিক। মহামানব গান্ধীজীর তপস্যা এবং সাধনার নগ্নরূপে নৈয়াখালিতে এবং সেই সূত্রে পূর্ববঙ্গের সর্বত্র শান্তি ফিরিয়া আসুক, আমরা ইহাই প্রার্থনা করি।

### শাসনকর্তা পদে শ্রীযুক্ত নাইডু

পশ্চিমবঙ্গের শাসনকর্তার পদে শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর নিয়োগের ন্যায় যুক্ত-প্রদেশের শাসনকর্তার পদে শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়, বিহারের শাসনকর্তার পদে শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলভরাম, মধ্যপ্রদেশে বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত মঙ্গলদাস পাকওয়াদা নিয়োগ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে এবং এই সব প্রতিষ্ঠাবান মনুষ্যসম্পন্ন একনিষ্ঠ কংগ্রেস-নেতাদের নিয়োগে সকলেই সম্মত প্রকাশ করিবে। ডক্টর রায় বর্তমানে বিনদেশে আছেন। তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডু যুক্ত-প্রদেশের শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। মহিলার প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদলাভ ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম। শ্রীযুক্ত নাইডুর এই নিয়োগ সত্যি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। তাঁহার প্রতিভা এবং কর্মসাধনা সমগ্র জগতে খ্যাতি

লাভ করিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে থাকিয়া তিনি তাহার পরিচালনা করিয়াছেন। দেশনেবার জন্য দুঃখকষ্ট বরণ করিয়া লইবার জন্য মহীয়সী সরোজিনী দেবীর প্রাণপূর্ণ অবদান ভারতের স্বাধীনতা-কামী সমতানগণের অন্তরে সর্বদা শক্তিসম্ভার করিয়াছে। তাঁহার বাস্মতার গীতি-মুচ্ছনা অবসাদের মধ্যে জ্বালাময়ী উদ্দীপনা বিস্তার করিয়াছে। দলিত, পীড়িত এবং নিষাধিতের বেন্দনকে তিনি কোনদিন উপেক্ষা করিতে পারেন নাই; তাহাদের মুক্তির জন্য অক্লান্তভাবে সংগ্রাম করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নাইডুর এই নিয়োগে কংগ্রেসের অসাম্প্রদায়িক ও সার্বভৌমিক উদার আদর্শ এবং কংগ্রেস-নীতির অন্তর্নিহিত প্রগতিমূলক সাংস্কৃতিক সমুদায়ের দিকটা অন্তর্জাতিক জগতে প্রোৎসাহিত হইয়া উঠিবে।

### দৌরাখ্য-দলনে আহ্বান

“বাহারা সমাজের শান্তি দৌরাখ্য প্রভাবে বিপর্যস্ত করিতেছে তাহাদিগকে সমুচিত শিদ্দা দিতে হইবে”—এই সংকল্প বাস্তব করিয়া সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং মিঃ সিহিদ সুরাবর্দী বাঙলায় বিশেষভাবে কলিকাতার নাগরিক-দিগকে উদ্দেশ্য করিয়া ব্যস্তভাবে আবেদন প্রচার করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে কলিকাতার বৃকে দীর্ঘকাল ধরিয়া গুণ্ডাদের যে অরাজক দৌরাখ্যের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, কোন সভা জাতি এবং সমাজে ইহা সম্ভব হইতে পারিত বলিয়া আমাদের ধারণা হয় না। রাজনীতিক মতবিরোধের জন্য নির্দোষের বৃকে ছোরা বনাইতে হইবে, এমন যুক্তি বর্ষের পক্ষেই শোভা পায়; কিন্তু ভারত বিভক্ত হইবার পর রাজনীতিক মতবিরোধের সে সমস্যাও আপাততঃ মিটিয়া গিয়াছে। ইহার পরও হোরা, বন্দুক ও বোমার সাহায্যে বাহারা নরঘাতী দৌরাখ্যে প্রমত্ত রহিয়াছে, তাহারা নিত্যমুখ্যই পশু। এমন নর-পশুদের দৌরাখ্যের কলঙ্ক হইতে শহরের সমাজ জীবনকে মুক্ত করিবার দায়িত্ব প্রত্যেক নাগরিকের উপর রহিয়াছে। শৃঙ্খল গভর্নমেন্ট কিংবা পুলিশের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। আমরা পৌরবাসীদিগকে নিক্রিয়তা পরিত্যাগ করিয়া এসব দৌরাখ্য দমনে গভর্নমেন্টকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছি। নির্দোষীর রক্তে বাহাদের হস্ত সিঁড় হইয়াছে, মনে রাখিতে হইবে, তাহারা যে সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, সকলেরই শত্রু। ইহাদিগকে কোনভাবে প্রসন্ন দেওয়া মহাপাপ এবং সম্প্রদায়নির্বিশেষে ইহাদিগকে সংবৎ করাই প্রত্যেক ভদ্রবাস্তির কর্তব্য।

### লীগ দলের নেতৃ-নির্বাচন

গত ১৯শে শ্রাবণ বিপ্লব ফ্রেণ্ডস্‌শিপে মিঃ নাজিমুদ্দীন পূর্ব বাঙলার নেতা নির্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ নাজিমুদ্দীনের পক্ষাবলম্বীগণ মিঃ সুরাবর্দীর বিরুদ্ধে বড় গলার ইহাই প্রচার করিতেছিলেন যে, তিনি হিন্দু তোষণ-নীতি অনুসরণ করেন, ইহাই তাহাদের মতে মিঃ সুরাবর্দীর প্রধান অপরাধ। মিঃ সুরাবর্দী বেড়াইতে শাসন কার্য চালাইয়াছেন তাহা যদি হিন্দু তোষণনীতি হয়, তাহা হইলে তোষণ-নীতির কলঙ্ক হইতে মুক্ত মিঃ নাজিমুদ্দীনের শাসননীতির স্বরূপ কি হইবে, আমরা তাহা ভাবিয়া উদ্বেগ বোধ করিতেছি। তবে আশার কথা এই যে, মিঃ নাজিমুদ্দীন নেতা নির্বাচিত হইয়াই পূর্ব বাঙলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আশংকা ও উদ্বেগ দূর করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মুসলিম লীগের শাসনে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা সংগত ব্যবহার তো

### বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আগামী সপ্তাহ হইতে ‘দেশ’ পত্রিকায় শ্রীনবেন্দু ঘোষ লিখিত নতুন উপন্যাস “পৃথিবী সবার” ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে।

পাইবেই; অধিকন্তু তাহারা যাহাতে সদয় ও উদার ব্যবহার পায়, তৎপ্রতি তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবেন। সম্প্রদায়িকতার সংগে লীগের নীতি উচ্চাচ গতি যেভাবে জড়িয়া গিয়াছে, এই প্রতিশ্রুতিকে বাস্তব পরিণতি দান করা সহজ নয় বলিয়াই আমরা মনে করি। মিঃ নাজিমুদ্দীন শাসননীতি পরিচালনে তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার মত দক্ষতা, দূরদর্শিতা এবং নিরপেক্ষ উদারতা প্রদর্শনে যদি সমর্থ হন, তবে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা স্বস্থ হইতে পারিবে। মিঃ নাজিমুদ্দীনের নির্বাচন ঘোষিত হইবার পর পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডক্টর ঘোষ তাহাকে অভিনন্দিত করেন এবং পশ্চিম বঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরপত্তা দৃষ্টে আশ্বাস দান করেন। আমরা আশা করি, এইরূপ পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও মৈত্রীর পথে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতির ধারা অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং ভৈরব-বিভেদের বিভীষিকাময় যুগের অতঃপর অবসান ঘটিবে।



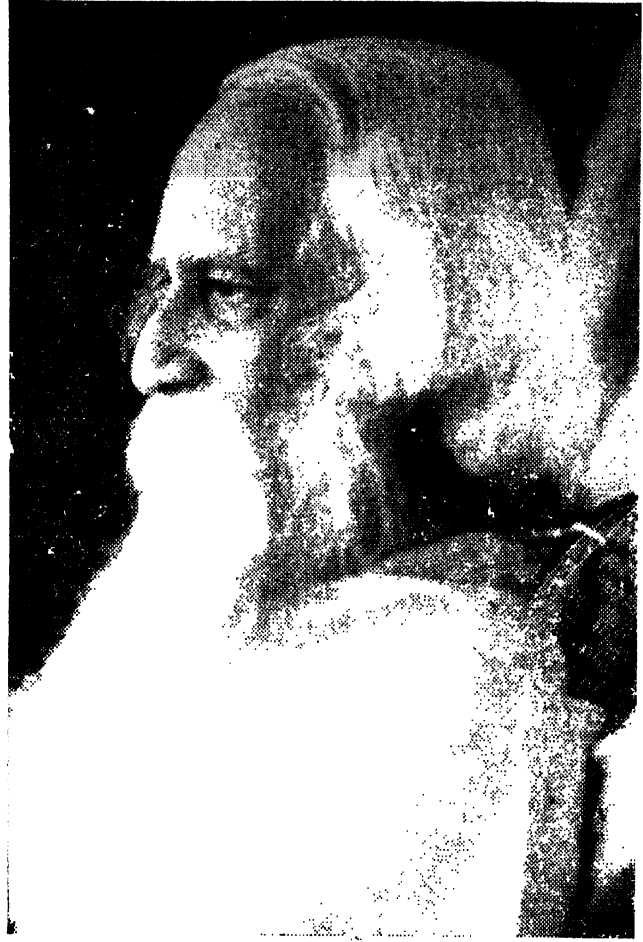
"আমি পায়ের নিকট ঘাটা করেছি—পিছনের ঘাট কী দেখে এলাম, কী রেখে এলাম, ইতিহাসের কী আকর্ষণের উদ্ভূত সভ্যতাসমূহের পরিকল্পনা ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করবে। আশা করবো, মহাপ্রলয়ের পরে নৈরাশ্যের স্বেচ্ছা আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আভ্যপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পৃথিবীর নৃ-সমূহের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাধিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার এই পৃথিবীর নৃ-সমূহের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাধিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্মে ফিরে পাবার পথে। নন, যাদের অস্তিত্বই প্রতিকারহীন পরাজয়কে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"

—রবীন্দ্রনাথ



# বাইশে শ্রাবণ

এক বৎসর কাটিয়া গেল, কালচক্রের আবর্তন পথে ২২শে শ্রাবণ আবার আসিয়াছে। ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের তিরোভাব দিবস। এই দিবস আমরা ভারতের আত্মার প্রজ্ঞান-ঘন-মূর্তি কবিকে হারাইয়াছি। আমরা একান্ত মর্ত্য জীব; কালের গতির আবর্তনক্রমে প্রতি বৎসর এই দিবস যখন আমাদের সন্নিহিত হয়, আমরা কবির বিয়োগের বেদনাময় অনুভূতিতে অভিভূত হই। বস্তুতঃ এই বেদনার পথে কবির নিত্য জীবনের চেতনাই আমাদের মনে জাগিয়া উঠে এবং তাঁহার চিন্ময় সত্তাই জ্যোতির্ময় স্বরূপে আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয়। ভারতের সভ্যদ্রষ্টা ঋষিগণ এমন অমর জীবনের মহিমাই কীর্তন করিয়াছেন এবং তমের পরপারে আনন্দময় লোকের সনাতন চেতনা মানুষের মনে জাগ্রত করিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করবার পরমা বিদ্যাকে তাঁহারা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহাদের সাধনালক্ষ্য সত্যের উপর ভারতের সমগ্র সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিদ্যুৎ রহিয়াছে এবং ইহাদের প্রসাদের স্পর্শে ভারতের আত্মার অমল শতদল যুগে যুগে নবীন সূর্যময় বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। অমৃতলোকে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইহারা জাতির মনোরাজ্যকে পরিচালনা করিতেছেন। ইহারা জাতির চৈতন্য গুরু, চিন্তার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। মর্ত্যদেহে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে ইহারা জাতির শিক্ষাগুরু এবং অমর্ত-স্বরূপে ইহারা জাতির তত্ত্বগুরু, এবং নিত্যগুরু। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু ইহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বদ্রষ্টা মানবগণের অন্যতম। তিনি গুরু গরীয়ান। ২২শে শ্রাবণের বাদল বর্ষণের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ ও অনুকম্পারই আমরা স্পর্শ পাইতেছি এবং অভাবের বেদনার পথে কবির নিত্য জীবনের প্রেমময় প্রভাবের সাক্ষ্যই আমাদের মনে সত্য হইয়া উঠিতেছে। কালের বিচারকে পরাভূত করিয়া কবির সদা-প্রসন্ন চিন্তাশ্রবণ লাবণ্যই উন্মিল্য হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ আছেন এবং দূরে তিনি নাই, এই সত্যই আমরা আজ একান্তভাবে উপলব্ধি করিতেছি। আমাদের কাছে থাকিয়া তিনি আমাদের পরিচালিত করিতেছেন, এই জ্ঞানেই আমরা সঞ্জীবিত হইতেছি। ভারতের ইতিহাসের এক মহান যুগ-সম্মিলনে আমরা উপনীত হইয়াছি। আমাদের অগ্রগতির পথে এখনও অন্তরায় আছে, শঙ্কা আছে, কিন্তু আমরা



তাহাতে বিচলিত হইব না। কবি তাঁহার মরজীবনে সংকট-যাত্রার পথে আমাদের বীৰ্যময় প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। স্বাধীনতার সাধনার দুর্যোগ-পূর্ণ পথে আগাইতে গিয়া বিপদ যখন আমাদের সম্মুখে দেখা দিয়াছে, তিনি বুক দিয়া আমাদের আগুুলিয়া রাখিয়াছেন। কবির কণ্ঠস্বরে পিশাচ কাঁপিয়াছে, তাঁহার বক্তৃ-নির্বোধে যজ্ঞশক্তি রাক্ষস সন্তুষ্ট হইয়াছে। তাঁহার দৃষ্ট বাণীর ময়ুখমালা অশ্ব কারাকক্ষকে আলো করিয়াছে, স্বদেশভক্তের ধমনীতে রক্ত নাচিয়াছে, জাতির চরণ-শৃঙ্খল শিথিল হইয়াছে, মৃত্যুর শীতলতায় প্রাণের প্রবলতা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সত্যই রবীন্দ্রনাথ আছেন। তিনি অন্তরে থাকিয়া আজিও আমাদের পথ দেখাইতেছেন। কবির অমৃত-নিস্যাদিনী কণ্ঠধ্বনি আমরা শুনিতে পাইতেছি। সে ধ্বনিতে অভয় মন্ত বাজিয়া উঠিতেছে। অমৃত হইয়া রবীন্দ্রনাথ

মন্তমূর্তিতে কাজ করিতেছেন। এ সত্য কেমন করিয়া অস্বীকার করিব? সত্যরাজ কবির মৃত্যু আমরা জানি না; বিচারের দ্বারাও বুঝি না। ২২শে শ্রাবণ তাঁহার বিজয়ের দিন, মৃত্যুতিথি নয়। গুরুদেবের বিজয় তিথিতে আমরা তাঁহার অমৃতময় স্বরূপ একান্তভাবে অনুধ্যান করিব এবং গুরুরূপকে সম্বল করিয়া জয়ের পথে অগ্রসর হইব। তবেই ভারতের আত্মার অপরিমলান মহিমা দিকে দিকে পরিস্ফুট হইবে। রবীন্দ্রনাথের নিত্য জীবনের প্রভাব আমাদের কাছে ত্যাগময় ও বীৰ্যময় সাধনায় অনুপ্রাণিত করবে। আশা আছে, রবীন্দ্র-নিষ্ঠা আমাদের দেহ ও মনকে সমানভাবে প্রাণময় প্রেরণায় বলিষ্ঠ করিয়া তুলিবে এবং ভারতের সভ্যতা ও মানবতাময় সংস্কৃতি জগতের সর্বত্র সম্প্রসারিত হইয়া অশ্রু-বের মধ্যে ধ্রুবকে, অসত্যের মধ্যে সত্যকে এবং মৃত্যুর মধ্যে অমৃতকে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

# রবীন্দ্র-প্রমত্ত

## শ্রীকিরণালা মেন

যাঁর কথা লিখতে যাচ্ছি, তাঁর কথা লেখা আমার পক্ষে দুঃসাহস। কত বড় ছিলেন তিনি। গুরুদেবের প্রতিভা এতদিকে বিকীর্ণ ছিল যে, তার ধারণা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু তিনি এতবড় হয়েও শৃঙ্খলধারী পাত্র হয়ে দূরে থাকেন নাই। সকলের অন্তরে প্রবেশ করেছিলেন। তাই আজ সেই ভরসাতেই তাঁর কথা একটু আলোচনা করতে সাহসী হয়েছি।

শেষের দিকে কঠিন ব্যাধিতে যোবার প্রথম পড়েছিলেন, দেবারকার বর্ষামঙ্গল উৎসবের কথা মনে পড়ছে। উৎসবের নির্দিষ্ট দিন কাছে এসে পড়েছে অথচ তাঁর নিন্তা নূতন গান হয়েই চলেছে। যারা গান শিখাছিলেন, কি যারা কর্মী তঁারা উদ্ভিগ্ন হয়ে উঠলেন যে কি করে সেই নির্দিষ্ট দিনে উৎসব করে তুলবেন। কিন্তু এই গানের স্রোত তখন থামায় কে? তখন তিনি গানের আনন্দে পূর্ণ হয়ে আছেন। ভ্রক্ষেপ নেই কোনো দিকে। তাঁর সেই বয়সে ও সেই বিষম ব্যাধির পূর্বক্ষণেও এই গানগুলি এতটুকুও স্থান হয় নাই। এই গানগুলি যেন সবুজ পত্রপটে কতকগুলি সদ্য ফোটা সুগন্ধি মালিকা ফুল। এর তুলনা নেই।

গুরুদেব কবি ছিলেন, শৃঙ্খল এই কথাটুকু বঞ্চে তাঁর বিরাট কাব্যসৃষ্টির কোনো পরিচয় মেলে না। তিনি ছিলেন কবি-সম্রাট। তবু দেখোছি, তিনি এতবড় কবি হয়েও এক এক সময়ে বলতেন, "আমি যে কবি সে কথা জানি, বরঞ্চ কিন্তু তা নিয়ে আমার অহংকার করা চলে না। কারণ কাব্যের বিচার শৃঙ্খল বাইরের লোকের কাছে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু গান সম্বন্ধে এ কথা বলব না। এ নিয়ে আমি অহংকারও করতে পারি।"

"গানের মধ্যে, কথার ছন্দে, সুরে, রসে ভাবের এমন একটি পরিপূর্ণ প্রকাশ যা অবর্ণনীয়। এ সৃষ্টি অপূর্ব। ফুলের মত এর সৌন্দর্য, এর অখণ্ডতা।" বলতেন, "অন্যের কণ্ঠে যখন নিজের গান শানি, তখন এক এক সময়ে চমকে উঠি। মনে তখন প্রশ্ন ওঠে যে এক আমার সৃষ্টি? এ যে অপূর্ব। আশ্চর্য লাগে বড়।" গুরুদেবের একটি গানের

কয়টি লাইনে মনে হয় এই ভাবটি সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে।

"গান গেয়ে কে জানায় আপন বেদনা  
কোনু সে তাপস আমার মাঝে  
করে তোমার সাধনা?"  
বিশ্বের নিবিড় আনন্দ অন্তর্ভুক্তিতে কবির

সারা জীবন পূর্ণ ছিল। তাই তাঁর চিত্তবীণায় এতকাল ধরে কত বিচিত্র মধুর সুর বেজে এসেছে।

দীর্ঘকাল এই আশ্রমে থেকে এই বীণার রাগিণী শোনবার পরম সৌভাগ্য হয়েছে।

প্রকৃতির নানা সৌন্দর্যে, কত উৎসবে, মন্দিরে, কত সুখে-দুঃখে তাঁর গানের ধারা যে এতকাল চলে এসেছে, সেই অমৃতধারা গান করে ধনা হয়েছে আমরা। গান যখন তৈরী করতেন, কতদিন তা শুনোছি। গানে যখন সুর দিতেন তখন তাঁর কাছে যাওয়া কারো চলত না। গান হয়ে গেলে, সুর ভুলে যাবার ভয়ে তখনই অন্যকে তিনি সেই সুরটি শেখাতেন। এই সময় থেকে সেই গান শোনবার অধিকার সকলের হোত। অনেক সময়ে শুনতামও।



এ জনা কখনো তাঁকে বিরক্ত হতে দেখি নাই। তাই সাহসও ছিল।

নূতন গানের আবির্ভাব হয়েছে জানলে সর্বদাই খোঁজ নিতাম যে কখন তিনি সেই গান শেখাবেন। জানতে পারলে আর আমাদের ঘর-করগার পক্ষে তেমন একটা অসময় না হলে শুনতে গিয়েছি তখনই।

সামনে থেকে হোক, আড়াল থেকে হোক বসে শুনছি। এই সময়ে না পারলেও সম্ভাব্যে শোনা যেত। তখন আরো অনেকে শিখতেন।

নূতন গান ছাড়া, পুরানো গানও অনেক সময়ে গাইয়েদের শেখাতেন। নিজেও তখন তিনি কত গান গাইতেন। অনেকে শিখিয়ে তাঁর নিজের দেওয়া গানের সুর তিনি ভুলে যেতেন। কিন্তু পুরোনো দিনের গানের সুর তাঁর খুব মনে থাকত। “মরিলো মরি আমার বাঁশীতে ডেকেছে কে”, “আমার পরাণ লয়ে, কি খেলা খেলাবে ওগো পরাণপ্রিয়” এই রকম কত গান গাইতেন। সেই সুর যেন আজো কানে বাজছে।

বহুদিন পূর্বের একদিনের কথা মনে পড়ছে। একদিন সকালে ‘দেহলীর নীচের ঘরে বসে দীনুবাবুকে নূতন গান শেখাচ্ছিলেন। পাশের ঘরে বসে আমরা শুনছিলাম। কলাভবনের ছাত্রী ছিলাম তখন, তাই হাতে একটা খাতা পেন্সিল ছিল। আনমনে হিচিবিজি কি একটা এঁকেছিলাম। খোলা খাতা ঢাকতে মনে ছিল না। গান শিখিয়ে যখন বাইরে এলেন, গিয়ে প্রণাম করতেই বলেন, “কি করছিলাম এখানে?” বললাম গান শুনতে এসেছিলাম। তিনি তখন রহস্য করে বলেন, “গান শুনছিলাম। আমি তো দেখছি তুমি ছবি আঁকছিলাম। গান তবে আর তুমি কি শুনছ?” তখনই আবার আমার সংকুচিত ভাব দেখে বলেন, “না, না এই তো ঠিক হয়েছে। গান শুনতে শুনতে ছবি আঁকা এই তো চাই।” এই সামান্য কথাটুকু বললাম, শুধু এই জন্য যে এই রকমেই তিনি আমাদের সাহস দিয়েছেন। আর তাই আমাদেরও যখন তখন গান শুনতে যাবার প্রলোভন বেড়ে গিয়েছিল।

সকলেই জানেন, তাঁর গান যখন আসত তখন ক্রমান্বয়ে আসতেই থাকত। তাঁর সময় অসময় ছিল না। রাত দুপুরেও হয়তো গান আসত। গানের পরে গান তাঁর অন্তর থেকে যেন উৎসারিত হতে থাকত। এই সময়ে যেন তিনি অন্য লোকের মানুষ হয়ে যেতেন।

কত নাটক অভিনয়ে, কত উৎসবে দেখেছি, পুরোনো গান দিয়ে আরম্ভ হোত, কিন্তু

শেষে তা থাকত না। সেখা বেত পুরোনো গানের বদলে প্রায় সব গানই নূতন হয়েছে।

মনে পড়ে একবার হিন্দি গান ভেঙে সেই সুরে গান বেঁধে সুর দিচ্ছিলেন। সে এক অপূর্ণ জিনিস। সেই সম্ভ্রান্ত ছবির মতো মনে আছে।

কোনাকর্তে তখন তিনি থাকতেন। একদিন সম্মায়ে গিয়ে দেখি, ভীমরাও শাস্ত্রী আর গুরুদেব গানে যেন মেতে আছেন। প্রাত্যহিক অনেকে ছিলেন নৈদিন। মনে পড়ে ভীমরাও শাস্ত্রী হিন্দি গানটি গাইছেন আর গুরুদেব সেই সঙ্গে সঙ্গেই তখন তখনই গানের কথা বেঁধে সেই সুরে সুর দিচ্ছেন। গানের সুরে দু’জনেই মেতেছিলেন। আনন্দে উজ্জ্বল মুখ দু’জনেরই। গানটি তৈরী হতে হতে তখনই দেখা গেল যে একজন হিন্দি গাইছেন আর একজন বাংলা গাইছেন একই সঙ্গে একই সুরে। সেই গানটি ছিল—

“আঁধারে একেলা ঘরে মন মানে না।”

যেবার অসুখে অচেতন হয়ে পড়েছিলেন, সেবারকার কথা মনে পড়ছে। দুইদিন বাদে বৈদিন দুপুরে রাতে গুরুদেবের জ্ঞান ফিরে এল। সেদিন রাতি যখন প্রভাত হোল উষার আলো চারিদিকে বিকশিত হয়ে উঠল। তখন সেই আলোর অভিনন্দনে কবির চিত্ত সাদা দিয়ে উঠেছিল। রোগ যন্ত্রণার সকল গ্লানি ভুলে গিয়ে, তখন তিনি গান গেয়ে উঠেছিলেন। ভোর বেলায় তাঁর সেই ভোরের রাগিণী, বাইরের সকলের কাছেও পৌঁছেছিল। এই খবরটি তুচ্ছ নয়। তাঁরই যোগ্য। সেদিন সম্মায়েও মনে আছে তিনি ২টি সুর গেয়েছিলেন। আর বাইরে যারা বসেছিলেন, তাঁরা পরম বিস্ময়ে স্তম্ভ হয়ে তা শুনছিলেন। গানের অফুরন্ত উৎস ছিল তাঁর চির-নবীন অন্তরে, তাই সেদিন গান গেয়ে উঠেছিলেন তিনি আনন্দের চেতনায়।

মন্দিরে যখন বলতেন, কতদিন তখন শুনছি নিজে একটি গান গেয়ে বলতে আরম্ভ করতেন। যারা শুনতেন, তাঁরাই জানেন যে, সে গান কি অপূর্ণ ছিল। নির্মল সুন্দর কত উষায় তাঁর সেই গান লোকের মনকে স্পন্দিত করেছিল, পবিত্র করেছে।

“বাঁগা বাজাও হে মম অন্তরে”

“তুমি আপনি জাগাও মোরে”

এই রকম কত গান তাঁর কণ্ঠে এখনো যেন শুনতে পাই।

তিনি জীবন ভরে কত বিচিত্র ভাবের গান রচনা করেছেন। সুখ-দুঃখের, আশা-নিরাশার, আনন্দ-বেদনার কত সব বিচিত্র অনুভূতি মানুষের আছে। সেই সব অনুভূতি তাঁর গানে যেন রূপ পেয়েছে।

তাঁর গানে মনুষ্যের বাণী পেয়ে বাঁরের হৃদয় আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সুখী যারা তারা সুখের সুখ পেয়ে তৃপ্ত হচ্ছে। দুঃখী যারা তারাও দুঃখের চরম সার্থকতা কোথায় তার সম্বন্ধ পেয়ে ধন্য হয়। আর গানে প্রকৃতির সকল আনন্দের মধ্যে প্রবেশ করে মানুষ সার্থক হয়ে ওঠে।

এই সকল সুর নানা বিচিত্র লোকের অন্তরে গিয়ে স্পর্শ করছে। তাই তিনি আজ সকলের অন্তরে পরমাশ্রয়রূপে প্রতিষ্ঠিত। তাই আজ মনে করছি, বর্ষাঋতুর দিন আবার ফিরে এল। সেদিনের মতো আজো তাঁর শ্বরের কাছে শিমূল শাখা থেকে মালতীলতা পুষ্প বৃষ্টি করছে। কোপাই নদীর ধারে আজো কেয়া ফুল ফুটেছে। কিন্তু তিনি আজ কোথায় উৎসব করতে গিয়েছেন? বর্ষার কাঁচা এই বর্ষার দিনটিতেই চলে গেলেন।

১৩৪৫ সালের ২৫শে বৈশাখে তিনি পাহাড়ে ছিলেন। তাঁর এই জন্মাষ্টমি দিনটিতে তাঁর বাণী তাঁর কণ্ঠস্বরেই রেডিওতে দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। দূরে ছিলেন তিনি তাই চিঠিতে তাঁকে প্রণাম জানিয়েছিলাম। তার উত্তরে তিনি ছোট একখানি চিঠি দিয়েছিলেন। সেই চিঠিখানি এই—

কলাগাণীয়ান্,

তোমার চিঠিখানি পেয়ে খুশি হলাম। সেদিন আমার কণ্ঠস্বর ছড়িয়েছিল অনেক দূরে—রেডিওওয়ালারা সতর্ক ছিল, কোনো বাধা ঘটতে দেয়নি পথে। ওরা এত করে উদ্যোগ করেছিল যে সেইজনে আমিও আমার বাণী রচনা করতে আলস্য করিনি। এ জায়গাটি ভালো লাগছে—বেশ নির্জন—বেশী বৃষ্টি নেই—যথেষ্ট আলো—সামনেই হিমাচলের শৃঙ্গ কিরীট মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়। বর্ষা যখন নামবে, তখন বর্ষাঋতুর কবির নামে নিশ্চয়ই মতে, কেয়া ফুটেবে কোপাইয়ের ধারে। আমার শ্বরের কাছে শিমূল শাখা থেকে মালতীলতা পুষ্প বৃষ্টি করবে। ইতি—এই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# রবীন্দ্র-কাব্য-জীবন-প্রবাহ

## কাব্য-স্মরণ-সংকলন

সংকলয়িতার নিবেদন

বাইশে শ্রাবণ আসছে।

কবির ইহলোকত্যাগের দিনে তাঁকে তাঁর স্বদেশবাসীরা স্মরণ করবে। তাঁর তিরোধানের পর থেকে, প্রতি বৎসর এই দিনটিকে ঘিরে নানাস্থানে যে-সব অনুষ্ঠান হয়, লক্ষ্য করে দৃষ্টি পেয়েছি, তাতে তাঁর সৃষ্টির মর্মকথাটি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, বহু ব্যথা বাক্যের নিরর্থকতায় পড়ে যায় চাপা; প্রাতিষ্ঠানিক বাগাড়ম্বরে তাঁর বাণীমূর্তি হয়ে পড়ে নিঃপ্রভ। তাই অনেক সময় ভেবেছি, কেমন করে এ-সব অনুষ্ঠানে তাঁর কাব্য-জীবন-প্রবাহের মূল ধারাটি ধরে, তাঁর যে-সৃষ্টি, ক্রমপরিণতির মধ্য দিয়ে গিয়ে পৌঁছিয়েছে সৃষ্টির অতীতে, তার একটু পরিচয় দেওয়া যায়,—যাতে সার্থক হয় আমাদের স্মরণ, তাঁর সেই নিরন্তর প্রকাশের পথে, অন্তরের উপলব্ধিতে।

এই কথা মনে নিয়েই এবার পঁচিশে বৈশাখে আমার একটি পরম স্নেহাস্পদের গৃহে কবির জন্মোৎসব-অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ভারী খুসী হয়ে ফিরেছিলাম। সেখানে দেখলাম, তাঁর কয়েকটি সহকর্মী বৃন্দ, রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়-অন্তরঙ্গ তাঁদের বৃন্দপত্রীর সহযোগিতায়, কবির নানা যুগের রচনার স্বর্ণাভ সূত্রে গেঁথে নিয়েছেন তাঁর 'বিচিত্র সৃষ্টির নানাবর্ণগন্ধ পুষ্পমালা। গদ্য পদ্য ও সংগীতে গ্রথিত সে-মালার সৌরভে, সে-সম্মার উৎসব-সভা হয়েছিলো আমোদিত। তাঁদের সে সঞ্চয়ন-সংকলনে কালানুক্রমিক ও ভাবানুক্রমিক অসংগতি বা 'রসাদাসদোষ' অস্পষ্টবস্তুর থাকা সত্ত্বেও, তাতে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র মূর্তির আভাস উঠেছিলো ফুটে। কিন্তু আমার মনে হয়েছিলো, তাঁদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীতে কবির সৃষ্টির মূল ঐক্যসূত্রটি পড়েনি ধরা; আর, কবির যে-রূপটি পরিস্ফুট হয়েছিলো, সেটি মূখ্যত তাঁর কবিমূর্তি নয়।

আমি এখানে, তাঁদের আইভিয়াটি নিয়ে, রবীন্দ্রনাথের যে-কাব্যসৃষ্টি, তার অরূপোদয়ে ক্ষণধারা নিব্বির-উৎস থেকে, মধ্যাহ্নদিনে দৃক্‌লক্ষ্যাবী খরনদীপ্তোত্তরে বেয়ে, শান্তসমাহিত সন্ধ্যায় মহাসাগরসঙ্গম পর্যন্ত, যে অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য নিয়ে পরম পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছে, তাঁর একটু পরিচয়, আর তাঁর একটু ব্যাখ্যা—কবির আপন মূখের কথাতেই—দেবার চেষ্টা করেছি। বলবার দরকারও মনে করছি না যে, তাঁর অখণ্ড কাব্য-জীবন-প্রবাহের এ-পরিচয় খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ। আমি শুধু কবি নিজে যে-কথা বলেছিলেন 'রবীন্দ্র রচনাবলী'র ভূমিকায়—

“আমার লেখার দ্বারা আমার জীবনের ধারার সঙ্গে সঙ্গেই অবিচ্ছিন্ন এগিয়ে চলেছে।.....একটা ঐক্যের স্বাক্ষর তাদের সকলের মধ্যে অঙ্কিত হয়ে নিশ্চয়ই পরস্পরের আত্মীয়তার প্রমাণ দিতে থাকে।”—সেই কথাটি মনে রেখে এই সংকলনটি করেছি। এ থেকে বাইশে শ্রাবণের বা পঁচিশে বৈশাখের কোনো একটি অনুষ্ঠানেরও যদি সামান্য সহায়তা হয়, তাতেই আমার তৃপ্তি। ইতি ২২শে আষাঢ়। ১৩৫৪।

অমল হোম

দৃশ্য—

বলে রাখা ভাল যে, কবির দীর্ঘ জীবনব্যাপী কাব্যপ্রবাহের মূল ধারাটিকে একটি দিনের মধ্যে ধরা হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব-পর হবে না। ঠিক এই অনুষ্ঠানপদ্ধতিটিকে সমগ্রভাবে রূপদান করতে গেলে যে সময়ের প্রয়োজন তা স্ফলভ না হ'লে, এখানে বা সংকলিত হোলো, তা স্থান কাল অনুযায়ী সংক্ষেপিত করতাই হবে। সে-ভার রইলো অনুষ্ঠাতাদের হাতে। তারা

তাঁদের অভিরূচি ও আয়োজনমতো এ পদ্ধতি পরিবর্তিত করে নেবেন। কবির কাব্যধারাগতির বোধসহায়তায় আমি যেখানে কোনো একটি কাব্যের বা তার কবিত্ব ব্যাখ্যার একাধিক উদাহরণ সমীচীন করেছি, তারা সেখানে সেটি অনাম্যসেই বর্জন করতে পারেন। তাতে তাঁর সৃষ্টির মূল ঐক্য-সূত্রটি ধরার পক্ষে অসুবিধা হবে না ব'লেই আমার বিশ্বাস।—সংকলয়িতা।

[ বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের অনুমোদনক্রমে ]

“নিজের সত্য পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতরকার মূল ঐক্যসূত্রটি ধরা পড়তে চায় না। বিধাতা যদি আমার আয়ু দীর্ঘ না করতেন, তা হ'লে নিজের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করবার অবকাশ পেতাম না। নানা খানা করে নিজেকে দেখেছি, নানা কাজে প্রবর্তিত করেছি, ক্ষণে ক্ষণে তাতে আপনার অভিজ্ঞান আপনার কাছে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম, তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে,— সে আর কিছু নয়,—

আমি কবি মাত্র।”

২৫শে বৈশাখ, ১৩৫৪।

## উদ্বোধন

১। সর্বপ্রথমে শব্দশৃংখলার মধ্যে কেবলমাত্র বাস্যবন্দ সহযোগে—  
“হে নতুন দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম-শব্দকণ”  
সংগীতটির সুরালাপ শেষ হতে না হতেই সুর হবে—

### ২। সমবেত সংগীত—

“জয় হোক, জয় হোক, নব অরুণোদয়  
পূর্ব দিগন্তল হোক জ্যোতির্ময়  
এসো অপরাঞ্জিত বাণী,  
অসত্য হানি  
অপহৃত শঙ্কা অপগত সংশয়॥  
এসো নব জাগ্রত প্রাণ  
চিরযৌবন জয়গান।  
এসো মৃত্যুঞ্জয় আশা,  
জড়হনাতা  
ক্রন্দন দূর হোক, বন্ধন হোক ফাট ॥”  
সংগীতের শেষ রেশটুকু মিলিয়ে যেতে না যেতেই সুর হবে—

### ৩। পাঠ—

—“যে-সংসারে প্রথম চোখ মেলিছিলুম, সে ছিল অতি নিভৃত।  
সহরের বাইরে সহরতলির মতো, চারিদিকে প্রতিবেশীর ঘর-বাড়িতে  
কলরবে আকাশটাকে আঁট করে রাখেনি। \* \* \*

“আমাদের ছিল মস্ত একটা সাবেককালের বাড়ি, তার ছিল গোটা-  
কতক ভাঙা ঢাল বর্শা ও মরচে-পড়া তেলারখাতানো দেউড়ি, ঠাকুর-  
দালান, তিন-চারটে উঠোন, সদর-অন্দরের বাগান, সর্ব্বদরের গগ্যাজল  
ধরে রাখবার মোটামোটা জালা-সাজানো অশ্রুকার-ঘর। পূর্ব্ববর্গের  
নানা পালপার্বণের পর্য্যায় নানা কলরবে সাজেসজায় তার মধ্য দিয়ে  
একদিন চলাচল করেছিল,—আমি তার স্মৃতিরও বাইরে পড়ে গেছি।  
আমি এসেছি যখন, এ-বাসায় তখন পুরাতন কাল সদ্য বিদায় নিয়েছে,—  
নতুন কাল সবে এসে নামল, তার আসবাবপত্র তখনো এসে পৌঁছয়নি।  
\* \* \* পিতামহের ঐশ্বর্য্যদীপাবলী নানা শিখায় একদা এখানে দীপ্যমান  
ছিল; সেদিন বাকি ছিল দহন শেষের কালো দাগগুলো, আর ছাই,—আর  
একটিমাত্র কম্পমান ক্ষীণ শিখা। প্রচুর উপকরণ-সমাকীর্ণ পূর্ব্বকালের  
আমোদপ্রমোদ-বিলাসসমারোহের সরঞ্জাম কোণে কোণে ধূলিমলিন জীর্ণ  
অবস্থায় কিছু কিছু বাকি যদি বা থাকে, তাদের কোন অর্থ নেই। আমি  
ধনের মধ্যে জন্মাইনি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও না।” (১)

—“আমি যখন জন্মেছিলাম, তখন আমাদের সমাজের যে সকল প্রথার  
মধ্যে অর্থের চেয়ে অভ্যাস প্রবল, তার গতায়ু অতীতের প্রাচীরবেষ্টন  
ছিল না আমাদের ঘরের চারিদিকে।..... সাম্প্রদায়িক গৃহচর যে-সকল  
অনুকল্পনা, যে-সমস্ত কৃত্রিম আচার-বিচার মানুষের বুদ্ধিকে বিজড়িত  
করে আছে, বহু শতাব্দী জুড়ে নানা স্থানে নানা অশ্রুত আকারে এক  
জাতির সংগে অন্য জাতির দুর্ব্বারতম বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে..... যা আমাদের  
দেশে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত থেকে কী রাষ্ট্রনীতিতে কী সমাজব্যবহারে  
মারাত্মক সংঘাতরূপ ধরেছে, তার চলাচলের কোনো চিহ্ন সদর বা অন্দরে  
আমাদের ঘরে কোনো স্থানে ছিল না।” (২)

অন্তরালে মৃদুগম্ভীর স্বরে উপনিষদের মন্ত “ঐ পিতা নোহসি  
পিতৃনোবোধি নমস্তেহস্ত মা মা হিঙ্গোঃ। বিশ্বানি দেব  
সর্বিতঃ দুরিতান পরাসুহ বশন্তঃ তন্নাসুহ। নমঃ শব্দব্যয় চ  
ময়োভিবার চ নমঃ শব্দরায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবার চ শিব-  
তরায় চ” ইত্যাদি আবৃত্তির মধ্যে—

### ৪। পাঠ—

—“আমাদের পরিবারে আমার জন্মের পূর্ব্বই সমাজের নোঙর তুলে  
দূরে বাধাঘাটের বাইরে এসে ভিড়িছিল।..... এই নিরালায় এই পরিবারে  
যে স্বাভাবিক জেগে উঠেছিল সে স্বাভাবিক—মহাদেশ থেকে দূরবীক্ষণ  
স্বীপের গাছপালা জীবজন্তুরই স্বাভাবিক মতো।..... উপনিষদের ভিতর  
দিয়ে প্রাক-পৌরাণিক যুগের ভারতের সংগে এই পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ  
সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই প্রায় প্রতিদিনই বিশ্বব্ধ উচ্চারণে অনর্গল  
আবৃত্তি করেছি উপনিষদের শ্লোক।” (৩)

### ৫। সমবেত সংগীত—

—“প্রথম আদি তব শক্তি  
আদি পরমোজ্জ্বল জ্যোতি তোমারি হে  
গগনে গগনে।  
তোমার আদি বাণী বহিছে তব আনন্দ  
জাগিছে নব নব রসে হৃদয়ে মনে॥  
তোমার চিদাকাশে ভাতে সুর্য চন্দ্র তারা  
প্রাণ-তরঙ্গ উঠে পবনে।  
তুমি আদি কবি, কবিগুরু, তুমি হে  
মন্ত তোমার মন্দির সব ভুবনে॥” (৪)

## কৈশোরক

### ৬। আবৃত্তি—

\* \* \*  
—“একদিন ছিলেম বালক।  
\* \* \*  
তোমরা তাকে কেউ জান না।  
সে সত্য ছিল বাদের জানার মধ্যে  
কেউ নেই তারা।  
\* \* \*  
সেদিনের জীবনের ছোটো গব্যাক্ষর কাছে  
সে বসে থাকত বাইরের দিকে চেয়ে।  
তার বিশ্ব ছিল  
সেইটুকু ফাঁকের বেঠনীর মধ্যে।  
তার অরোহ চোখ-মেলো-চাওয়া  
ঠেকে যেত বাগানের পাঁচিলাতো  
সারি সারি নারকেল গাছে।  
সম্প্র বেলাটা রূপ কথার রসের নিবিড়;  
বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বারখানে  
বেড়া ছিল না উঁচু,  
মনটা এদিক থেকে ওদিকে  
ভিঙিয়ে যেত অনায়াসেই। (৫)

\* \* \*  
—শূন্যে শূন্যে শোনা শেষ হয় না  
রাজপথে চলেছে তেপান্তর পার হতে।  
একদিন বাজল সানাই বারোয়া সুরে  
শুকুনো ডাঙায় প্লাবন নামল  
বাড়িতে এল নতুন বউ  
কচি বয়সের লাভণ্যে ঢল ঢল  
কচা শামলা রঙের হাতে সরু সোপার চুড়ি,

(১) রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-  
ছাত্রীদের সংবর্ধনা সভায় কবির ‘প্রতিভাষণ’। ১৫ই পৌষ, ১৩০৮।  
বিশ্বভারতী প্রকাশিত ‘আত্মপরিচয়’ পুস্তকের পঞ্চম সন্দর্ভে সংকলিত।

(২) ‘আশী বছরের আয়ুঃক্ষেত্রে’ প্রবেশ উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে  
জন্মোৎসব অনুষ্ঠান সভায় কবির ভাষণ। ১লা বৈশাখ, ১৩৪৭।  
‘আত্মপরিচয়’ পুস্তকে ষষ্ঠ সন্দর্ভে সংকলিত।

(৩) ‘আত্মপরিচয়’। ৫৫।

(৪) গীতবিতান। ১ম খণ্ড। ‘পূজা’। স্বরলিপির জন্য দ্রষ্টব্য  
‘গীতালিপি’ ৪র্থ খণ্ড।

(৫) ‘শেষ সন্দর্ভ’। ‘পাঁচিশে বৈশাখ’। রবীন্দ্র রচনাবলী;  
অষ্টাদশ খণ্ড।

মলিন দিনপ্রেরণীর কালো ছাপলাগা পাঁচিল

দু'ফাকি হয়ে গেল জাদুমন্তে

দেখা দিল অপূর্ণ দেশের অপরূপ রাজকন্যা।

ছম ছম করতে লাগল সম্মা

কাঁপতে লাগল অদৃশ্য আলোয়।

ঘুরে বেড়াই, সাহস হয় না কাছে আসতে

ওদিকে থাকে অভাবনীয়, এদিকে থাকে উপেক্ষিত।

রাত হয়ে আসে

স্বরূপ সর্দার হকি দিয়ে যায়।

ছেঁড়া-শেলাই-করা দড়িত-কোলানো মশারি,

তার ভিতরের আকাশ ভরে ওঠে

গোষ্ঠালি লগ্নের লিঙ্গের রঙে

চোলের রঙা অন্ধকারে। (৬)

## ৭। পাঠ—

—“আমি ছিলুম এক কোণের মানুষ—লাজুক নীরব নিশ্চল.....  
কুনো, একলা, এক ঘরে। আমার খেলা ছিল নিজের মনে।.....আমি  
ইস্কুলপালানো ছেলে,—পরীক্ষা দিইনি, পাশ করিনি, মাষ্টার আমার  
ভাবীকালের সম্বন্ধে হতাশবান। ইস্কুল ঘরের বাইরে যে অবকাশটা  
বাধাহীন, সেইখানে আমার মন হা-ঘরেদের মতো বেরিয়ে  
পড়েছিল।” (৭)

—“এইবার আমার নিজস্ব বেদুয়িনী ছাদে শূন্য হোলো আর এক  
পালা, এল মানুষের সঙ্গ, মানুষের স্নেহ। সেই পালা জমিয়ে দিলেন  
আমার জোঁতিদাদা। ছাদের রাজ্যে নতুন হাওয়া বইল, নামল  
নতুন ঋতু।” (৮)

## ৮। আবৃত্তি—

“বয়স তখন ছিল কাঁটা, হালকা দেহখানা  
—ছিল পাখীর মতো, শূন্য ছিল না তার ডানা।  
উড়ত পাশের ছাদের থেকে পায়রাগুলোর ঝিক,  
বারাদাটার রেলিং-পরে ডাকত এসে কাক।  
ফোরওয়ালা হেঁকে যেত গলির ওপার থেকে,  
তপসি মাছের ঝড়ি নিত গাম্‌ছা দিয়ে ঢেকে।  
বেহালাটা হেলিয়ে কাঁধে ছাদের 'পরে দাদা,  
সম্মাভারার সুরে যেন সুর হত তাঁর সাধা।  
জুটোই বৌদিদির কাছে ইংরেজি পাঠ ছেড়ে,  
মুখখানিতে বের দেওয়া তাঁর শাড়িটা লাল পেড়ে।  
চুরি কঠর চাবির গোছা ঝুকিয়ে ফুলের টবে  
স্নেহের রাগে রাগিয়ে দিতেন নানান উপদ্রবে।  
কম্বালী চাটুজ্জে হঠাৎ জুটুত সম্মা হ'লে;  
বা হাঁতে তার খেলো হুঁকো, চাদর কাঁধে কোলে।

এতলয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া;

থাকত আমার খাতা লেখা, পড়ে থাকত পড়া—

মনে মনে ইচ্ছে হোত, যদিই কোনো ছেলে

ভর্তি হওয়া সহজ হত এই পাঁচালির দূরে

ভাবনা মাথায় চাপত নাকো ক্লাসে ওঠার দায়ে

গান শুনিয়ে চলে যেতুম নতুন গায়ি গায়ি।

স্কুলের ছাঁটি হ'য়ে গেলে বাড়ির কাছে এসে—

হঠাৎ দেখি, মেঘ নেমেছে ছাদের কাছে ঘেঁসে।

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে, রাস্তা ভাসে জলে,

ঐরাবতের শাড়ি দেখা দেয় জল ঢালা সব নলে।

অন্ধকারে শোনা যেত রিমঝিমিনি ধারা,

রাজপুত্র তেপান্তরে কোথা নে পথহারা।

ম্যাপে যে সব পাহাড় জানি, জানি যে-সব গাছ

ফুয়েনলন আর মিসিসিপি ইয়াংসিকিয়ায়,

জানার সঙ্গে অধেক জানা, দূরের থেকে শোনা,

নানা রংয়ের নানা সূতের সব দিগে জাল বোনা,

নানা রকম ধূনির সঙ্গে নানান চলাফেরা,

সব দিয়ে এক হালকা জগৎ মন দিয়ে মোর ঘেরা,

“ভাবনাগুলো তারই মধ্যে ফিলত থাকি থাকি

বানের জলে শ্যাওলা যেমন, মেঘের তলে পাখি।” (৯)

## ৯। পাঠ—

“হীতপূর্বেই কোন একটা ডরসা পেয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলুম,  
লোকে যাকে বলে কবিতা, সেই ছন্দ-মেলানো মিল-করা ছড়াগুলো  
সাধারণ কলম দিয়েই সাধারণ লোকে লিখে থাকে। তখন দিনও এমন  
ছিল, ছড়া যারা বানাতে পারত, তাদের দেখে লোক বিস্মিত হ'ত।.....  
পয়ার চিপদী মহলে আপন অবাধ অধিকারবোধের অক্লান্ত উৎসাহে  
লেখায় মাতলুম। আট অক্ষর, ছয় অক্ষর, দশ অক্ষরের চৌকো চৌকো  
কত রকম শব্দ-ভাগ নিয়ে চলল ঘরের কোণে আমার ছন্দ-ভাঙাগড়ার  
খেলা। ক্রমে প্রকাশ পেল দশজনের সামনে।.....

“শব্দ হ'ল আমার ভাঙা ছন্দে টুকরো কাবোর পালা উল্কাবৃষ্টির  
মতো; বাজকের যা-তা ভাবের এলোমেলো কাঁচা গাধুনি।” (১০)

## ১০। আবৃত্তি—

( ১ )

“জনমনোমুখকর উচ্চ অভিলাষ

তোমার বশ্চর্য পথ অনন্ত অপর।

অতিক্রম করা যায় যত পাপাশালা

তত যেন অগ্রসর হ'তে ইচ্ছা হয়।”

( ২ )

“তোমার বাঁশরিম্বরে বিমোহিত মন—

মানবেরা, ঐ স্বর লক্ষ্য করি হায়

যত অগ্রসর হয়, ততই যেমন

কোথায় বাজিছে তাহা বৃদ্ধিতে না পারে।”

( ৩ )

“কোথায় তোমার অন্ত রে দুর্ভিলাষ

“সুখ” অট্টালিকা মাঝে?” তা নয়, তা নয়।

“সুখ” খনির মাঝে অন্ত কি তোমার?”

“তা নয়, যমের স্বোরে অন্ত আছে ভব।”

( ৪ )

“তোমার পথের মাঝে দু'ট অভিলাষ,

ছুটিয়াছে মানবেরা সন্তোষ লভিতে

নাহি জানে তারা, ইহা নাহি জানে তারা

তোমার পথের মাঝে সন্তোষ থাকে না।”

( ৫ )

“নাহি জানে, তারা হয় নাহি জানে তারা

দরিদ্র কুটির মাঝে বিরাজে সন্তোষ।

নিরজন তপোবনে বিরাজে সন্তোষ।

পাখির ধর্মের স্বোরে সন্তোষ আসন।” (১১)

## ১১। পাঠ—

—“আমার গুরুজনদের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের আনন্দ ছিল  
নিবিড়। তখন বাড়ির হাওয়া সেক্সপীয়ারের নাট্য-রস-সম্ভোগে  
আনন্দানিত, সার ওয়াল্টার স্কটের প্রভাবও প্রবল। দেশপ্রীতির উদ্দামতা  
তখন দেশে কোথাও নেই। রংগলালের স্বাধীনতাহীনতার কে বাঁচিতে  
চায় রে, আর তার পরে হেমচন্দ্রের বিংশতি কোটি মানবের বাস  
কবিতায় দেশমুক্তি-কামনার সুর ভোরের পাখীর কাকিলির মতো শোনা  
যায়। হিন্দু মেলার পরামর্শ ও আয়োজনে আমাদের বাড়ীর সকলে  
তখন উৎসাহিত। [এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের  
কবিতা পাঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রদর্শিত ও দেশী গুণী লোক  
পুরুষকৃত হোত। ‘জীবনমুখি’ এই মেলার গান ছিল মেজাদার।”

(১০) “আত্মপরিচয়”। ৫৯।

(১১) রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা ‘অভিলাষ’। শ্রীযুক্ত সজনী-  
কান্ত দাস উহা ১৭৯৬ শকের অগ্রহায়ণ (নবেম্বর-ডিসেম্বর  
১৮৭৪) সংখ্যা “তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা” হইতে উদ্ধার করিয়া  
সর্বপ্রথম ‘শনিবারের চিঠিতে’ প্রকাশ করেন। শ্রীযুক্ত রূজেন্দ্রনাথ  
বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত “রবীন্দ্রপ্রবন্ধ পরিচয়” পুস্তিকাতে সমগ্র  
কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এখানে মাত্র কয়েকটি পদ দেওয়া  
হইল।

লেখা 'জয় ভারতের জয়', গণদাদার † লেখা 'স্বাধীন ভারত যশ গাইব কী করে', বড়োদাদার † 'মলিন মৃৎচন্দ্রমা ভারত তোমার'। (১২২)

—'লর্ড' বর্জনের সময় দিল্লী দরবার সম্বন্ধে একটা গদ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছি—লর্ড লিটনের সময় লিখিয়াছিলাম পদ্যে। ...সেই কবিতার বয়সোচিত উত্তরনা প্রভৃত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তখনকার প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুষ্কিনের কতৃপক্ষ পর্যন্ত কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই। .....সেটা পড়িয়াছিলাম হিন্দুমেলায়, গাছের তলায় দাঁড়াইয়া। প্রোতাদের মধ্যে নবীন সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।" (১৩)

## ১২। আবৃত্তি—

—"কিসের তরে গো ভারতের আজি, সহস্র হৃদয় উঠেছে বাজি?  
যতদিন বিষ করিয়াছে পান, বিহ্বল জাগেনি এ মহা-শ্মশান  
বশন-শৃঙ্খলে করিতে সম্মান ভারত জাগিয়া উঠেছে আজি?  
কুমারিকা হতে হিমালয়-গিরি এক তরে কতু ছিল না গাথা  
আজিকে একটি চরণ-আঘাতে, সমস্ত ভারত তুলেছে মাথা।

\* \* \* \* \*  
"ব্রিটিশ রাজের মহিমা গাহিয়া, ভূপগণ ওই আসিছে ধাইয়া  
রতনে রতনে মূর্তি ছাইয়া, ব্রিটিশ চরণে লোটাতে শির।

\* \* \* \* \*  
"হারে হতভাগ্য ভারতভূমি, কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার  
পরিবারে আজি করি অলঙ্কার গোরবে মাতিয়া উঠেছে সবে?  
তাই কপিতেছে তোর বক্ষ আজি ব্রিটিশ রাজের বিজয় রবে?  
ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাকু আমরা গাব না  
আমরা গাব না হরয় গান  
এস গো আমরা যে ক'জন আছি, আমরা ধীর আরেক তান।" (১৪)

## ১৩। পাঠ—

—"আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে স্বদেশের জন্য বেদনার মধ্যে আমরা ব্যাভিচার উঠিয়াছি।" ["জীবন-স্মৃতি"] "জ্যোতিদাদা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপন করলেন,—একটি পোড়ো বাড়ীতে তার অধিবেশন,—  
ঋগ্বেদের পুঁথি, নড়ার মাথার খুঁচি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার

(১২) "আত্মপরিচয়"। ৫॥

\* সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

† গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

\* স্বরাজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৩) "জীবন-স্মৃতি"।

(১৪) ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের হিন্দু মেলায় রবীন্দ্রনাথ-রচিত-ও-পঠিত কবিতার অংশ। এই কবিতাটি বিলুপ্ত বলিয়াই জানা ছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রসাহিত্যবিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত যতিনাথ ঘোষ মহাশয় এই কবিতাটিই যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের "স্বপ্নময়ী" নাটকের (ইং ১৮৮২) চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে শব্দভাসংহের স্বগত কবিতা, তাহা আবিষ্কার করেন ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে তাহা জানান। রবীন্দ্রনাথকে কবিতাটি দেখাইতে, তিনি সেটিকে তাহার "জীবন-স্মৃতি"তে উল্লিখিত হিন্দু মেলায় পঠিত কবিতা বলিয়া চিনিতে পারেন—যদিও স্বপ্নময়ী নাটকের আখ্যানবস্তু সহিত সংগতি রক্ষার জন্য মূল কবিতায় 'ব্রিটিশ' শব্দটির পরিবর্তে 'মোগল' শব্দটি বসানো হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ তাহার "রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়" সংকলনে এই কবিতাটি সমগ্র পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন। এটি কিন্তু হিন্দু মেলায় পঠিত রবীন্দ্রনাথের বিস্তারিত কবিতা। ইহার দুই বৎসর পূর্বে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী হিন্দুমেলায় নবম বার্ষিক উৎসবে রবীন্দ্রনাথ তাহার যে কবিতাটি পাঠ করেন তাহার কথা জীবনস্মৃতি লিখবার কালে তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন অনুমান হয়। তাহার বয়স তখন ১৩ বৎসর ৯ মাস। ১৮৭৫-৭৬ ফেব্রুয়ারী তারিখের ইংবঙ্গ "অমৃত-বাজার পত্রিকায়" 'হিন্দুমেলায় উপহার' নামে সেই কবিতাটি মুদ্রিত হয়। ইহাই রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরযুক্ত প্রথম রচনা। ব্রজেন্দ্রনাথ ইহা আবিষ্কার করেন ও "প্রবাসী"তে ছাপান।

অনুদান, রাজনারায়ণ বসু তার পুত্রোহিত;—সেখানে আমরা ভারত উদ্ধারের দীক্ষা পেলাম।" (১৫)

## ১৪। সমবেত সংগীত—

—"তোমারি তরে মা, সর্পিপদ দেহ  
তোমারি তরে মা সর্পিপদ প্রাণ  
তোমারি শোকে এ আঁখি বরিষবে  
এ বাঁণ তোমারই গাহিবে গান।

যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্বল, তোমারি কার্য সাধিবে,  
যদিও এ অসি বলহীন মলিন তোমারি পাশ নাশিবে।  
যদিও জননী, যদিও আমার এ বাঁণার কিছু নাহিক বল,  
কী জানি যদি মা, একটি সন্তান জাগি ওঠে শূন  
এ বাঁণ তান! (১৬)

## যৌবনস্বপ্ন

### ১৫। পাঠ—

—"আমার ঘোল বহর বয়সের আরম্ভের মুখেই দেখা দিয়েছে 'ভারতী'। আমার মত ছেলে, যার না ছিল বিদ্যা, না ছিল সাধা, সেও সেই বৈঠকে জায়গা জুড়ে বসল। .....সতেরো বছরে পড়লুম যখন, ভারতীর সম্পাদক বৈঠক থেকে আমাকে সরে যেতে হোলো। এই সময়ে মেজদাদা প্রস্তাব করলেন আমাকে তিনি বিলাত নিয়ে যাবেন। .....জাহাজে চড়ার আগে মেজদাদার সঙ্গে গিয়ে আমাকে মিলিতি চালচলনের গোড়াপত্তন করে নিতে হবে। তিনি তখন জিজ্ঞাসিত করছেন আমোদবাদে।.....

"এখানে কিছদিন থাকার পর.....বোম্বাইয়ের কোনো গৃহস্থঘরে আমি বাসা নিয়েছিলাম। সেই বাড়ির কোনো-একটি এখনকার কালের পড়াশুনোওয়ালা মেয়ে বকবক করে মেজে এনিছিলেন তাঁর শিক্ষা বিলেত থেকে। আমার বিদ্যা সামান্যই, আমাকে হেলা করলে দোষ দেওয়া যেতে পারত না। তা করেননি। পুঁথিগত বিদ্যা ফলাবার মতো পুঁজি আমার ছিল না, তাই সুবিধে পেলেই জানিয়ে দিতুম যে, কবিতা লেখবার হাত আমার আছে। আদর আদায় করবার ঐ ছিল আমার সবচেয়ে বড় মূলধন। যার কাছে নিজের এই কবিযানার জানান দিয়েছিলাম, তিনি সেটাকে মেপেজুখে নেননি, মেনে নিয়েছিলেন। কবির কাছ থেকে একটা ডাকনাম চাইলেন, দিলেন জুগিয়ে, সেটা ভালো লাগল তাঁর কানে। ইচ্ছে করোঁছিলেন সেই নামটি আমার কবিতার ছন্দে ঝড়িয়ে দিতে। বেঁধে দিলুম সেটা কবোর গাঁথনিতে, শুনলেন সেটা ভোরবেলাকার ঝঁড়ববী সুরে, বললেন—'কবি, তোমার গান শুনলে আমি বেশ হয় আমার মরণ দিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠে পারি।' (১৭)

### ১৬। সংগীত—

—"শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি,  
ঘুম এখনো ভাঙিল না কি,  
দেখো তোমারি দুয়ারপরে  
সখী, এসেছে তোমারি রবি।  
শুন প্রভাতের গাথা মোর  
দেখো, ভেঙেছে ঘুমের ঘোর,  
দেখো, জগত জেগেছে নয়ন মেলিয়া  
নূতন জীবন লাভি'  
তবে, তুমি কি রূপসী, জাগিবে নাকো  
আমি যে তোমারি কবি॥" (১৮)

(১৫) "আত্মপরিচয়"। ৫॥ (১৬) "গীতবিতান"। ১ম সংস্করণ। ১২৫ পৃ। স্বরাজিপুর জন্য দ্রষ্টব্য 'শতগান'।  
(১৭) "ছেলেবেলা"। ১৩॥ (১৮) "গীতবিতান"। প্রথম সংস্করণ। প্রথম সংগীত॥

## ১৭। আবৃত্তি—

—“তারপরে.....

ফাগুনের প্রত্যুষে

রঙিন আঁচার অস্পষ্টতার

তরুণ যৌবনের বাউল

সূর্য বেঁধে নিল আপন একতারাত্তে,

কেকে বেড়াল,

নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে

অনিদ্দেশ্য বেদনার খেপা সূরে।

সেই শূন্যে কোনো কোনো দিন বা

বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর আসন টলোছিল;

তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন

তার কোনো কোনো দৃতকীকে

পলাশবনের রঙমাতাল ছায়াপথে

কাজভোলানো সকাল বিকালে।

তখন কানে কানে মৃদুগলায় তাদের কথা শুনোছি,

কিছু বুঝোছি, কিছু বুঝিনি।

দেখোছি কালো চোখের পক্ষ্মুরেখায়

জলের আভাস;

দেখোছি কম্পিত অধরে নিম্নীলিত বাণীর

বেদনা;

শুনোছি কণিত কণকনে

চঞ্চল আগ্রহের চকিত অংকুর।

তারা রেখে গেছে আমার অজ্ঞানিতে

প্রথম ঘুমভাঙা প্রভাতে

নতুন ফোটা বেলফুলের মালা;

ভোরের স্বপ্ন

তারি গম্ভে ছিল বিহীন! (১৯)

## ১৮। পাঠ—

—“যৌবনের আরম্ভ সময়ে [বিলাত থেকে] বাংলাদেশে ফিরে এলেম। সেই ছাঁদ, সেই চাঁদ, সেই দক্ষিণে বাতাস, সেই নিজের মনের বিজ্ঞান স্বপ্ন, সেই ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে চারিদিক থেকে প্রসারিত সংগ্রহ স্বপ্ন, সেই সূদীর্ঘ অবসর, কর্মহীন কল্পনা, আপন মনে সৌন্দর্যের মরীচিকা রচনা, নিষ্ফল দুরাশা, অন্তরের নিগড়ে বেদনা, আত্মপীড়ক অলস কবিত্ব—এই সমস্ত নাগপাশের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে চূপ করে পড়ে আছি।”..... “তখনকার জীবনটা আশ্বিনের একটা বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ অককাশের মাঝখানে দেখা যায়,—সেই শিশিরে ঝলমল-করা সরস সবুজের উপর সোনা-গলানো রৌদ্রের মধ্যে মনে পড়তেছে, দক্ষিণের বারান্দায় গান বাঁধিয়া তাহাতে যোগিয়া সুর লাগাইয়া গদন গদন করিয়া গাইয়া বেড়াইতেছি,—সেই শরতের সকাল বেলায়—

‘আজি শরৎ তপনে প্রভাতস্বপনে

কী জানি পরাগ কী যে চায়।’

“বেলা বাড়িয়া চলিতেছে,—বাড়ির ঘণ্টার দপ্তর বাজিয়া গেল,—একটা মধ্যাহ্নের গানের আবেশে সমস্ত মনটা মাতিয়া আছে,—কাজকর্মের কোনো দাবীতে কিছুমাত্র কান দিতেছি না:—

“হেলা ফেলা সারা বেলা

এ কী খেলা আপন মনে!”(২০)

## ১৯। সংগীত—

“এ শূন্য অলস মায়া; এ শূন্য মেঘের খেলা;

এ শূন্য মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জন,

এ শূন্য আপন মনে মালা গাথে ছিঁড়ে ফেলা;

নিমেষের হাসি কামা গান গেয়ে সমাপন।

শ্যামল পল্লবপাতে রবি-করে সারাবেলা,

আপনার ছায়া লয়ে খেলা করে ফুলগুলি,

(১৯) “শেষ সপ্তক”। পঞ্চিশ বৈশাখ। রবীন্দ্র রচনাবলী : অষ্টাদশ খণ্ড ॥

(২০) “জীবনস্মৃতি”। বিশ্বভারতী সংস্করণ ॥ (২১) গীতিবিত্তন। ২য় সংস্করণ। ২য় খণ্ড। স্বরলিপির জন্য ‘কাব্যগীতি’ প্রণেতা।

এও সেই ছায়াখেলা বসন্তের সমীরণে।

কুহকের দেশে যেন সাধ করে পথ ভুলি

হেথাহুঁধা ঘুরিফিরি সারাদিন আনমনে।

কারে যেন দেবো বলে কোথা যেন ফুল তুলি,

সম্ভায় বনের ফুল উড়ে যায় বনে বনে।

“এ খেলা খেলিবে হায় খেলার সাথী কে আছে?

ভুলে ভুলে গান গাই,—কে শোনে, কে নাই শোনে,

যদি কিছু মনে পড়ে, যদি কেহ আসে কাছে।”(২১)

## ‘প্রভাত সঙ্গীত’

॥ ১২১০ ॥\*

### ২০। পাঠ—

—“এমন সময়ে আমার জীবনে একটা গুলটপালট হইয়া গেল।”

“সদর ধূঁটির রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে, সেইখানে বোধ করি ক্রী-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মৃদুভের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পদা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটা অপূর্ণ মহিমায় বিশ্ব সংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল, তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। আমি সেইদিনই সমস্ত মথাহা ও অপরাহ্ন ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ লিখিলাম। নির্ঝরের মতোই যেন তাহা উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। সেদিন কে জানিত এই কথিত্য আমার সমস্ত কাণের ভূমিকা লেখা হইয়াছে।” (২২)

### ২১। আবৃত্তি—

—“আজি এ প্রভাতে রবির রর

কেমনে পশিল প্রাণের পর,

কেমনে পশিল গৃহের আধারে প্রভাত পাখির গান

না জানি কেনের এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।

জাগিয়া উঠেছে প্রাণ

ওরে উখিল উঠেছে বারি,

ওরে প্রাণের বেদনা প্রাণের আবেগ বাঁধিয়া রাখিতে নারি।

ধর ধর করি কাঁপছে ভূধর,

শিলা: রাশি রাশি পড়িছে খসে,

ফালিয়া ফালিয়া ফেনিল সলিল

গরজ উঠিছে দারুণ রোষে

হোথায় হোথায় পাগলের প্রায়

ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়—

বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায় কোথায় কারার দ্বার।

কেনের বিধাতা পাষাণ যেন

চারিদিকে তার বাধন কেন?

ভাঙরে হৃদয়, ভাঙরে বাঁধন,

সাধরে আজিকে প্রাণের সাধন,

লহরীর পর লহরী তুলিয়া

আঘাতের পর আঘাত কর।

মাতিয়া যখন উঠেছে পরাগ

কিসের আধার, কিসের পাষাণ,

উখিল যখন উঠেছে বাসনা,

জগতে তখন কিসের ডর?

“আমি ঢালিব করুণা ধারা,

আমি ভাঙিব পাষাণ কারা,

আমি জগৎ প্লাবিতা বেড়াব গাইয়া

আকুল পাগল-পারা।

কেশ এলাইয়া ফুল ফুড়াইয়া

\* কাব্যগ্রন্থটির নামের নীচে প্রকাশকাল দেওয়া হইল।

(২২) “জীবনস্মৃতি”। বিশ্বভারতী সংস্করণ ॥



রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,  
রবির কিরণ হাসি ছড়াইয়া দিবরে পরান ঢালি।  
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,  
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,  
হেসে খল খল গেয়ে কল কল তালে তালে দিব তালি।  
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,  
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে, প্রাণ হয়ে আছে ভোর ॥  
কী জানি কী হ'ল আজ, জাগিয়া উঠিল প্রাণ  
দূর হ'তে শূনি যেন মহাসাগরের গান।  
ওরে চারিদিকে মোর  
একী কারাগার ঘোর  
ভাঙ' ভাঙ' ভাঙ' কারা, আঘাতে আঘাত করু।  
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখি,  
এসেছে রবির করু ॥" (২০)

## ২২। পাঠ—

—“এটা হচ্ছে সেদিনকার কথা যেদিন অন্ধকার থেকে আলো এল  
বাইরের, অসীমের। সেদিন চেতনা নিজেকে ছাড়িয়ে ভূমির মধ্যে প্রবেশ  
করল। সেদিন কারার স্মার খুলে বেরিয়ে পড়বার জন্যে, জীবনের সকল  
বিচিত্র লীলার সঙ্গো যোগযুক্ত হয়ে প্রবাহিত হবার জন্যে অন্তরের মধ্যে  
ভীর ব্যাকুলতা। সেই প্রবাহের গতি মহান বিরাট সমুদ্রের দিকে। সেই  
যে মহামানব, তারই মধ্যে গিয়ে নদী মিলবে—কিন্তু সকলের মধ্যে দিয়ে।  
এই যে ডাক পড়ল, সূর্যের আলোতে জেগে মন ব্যাকুল হয়ে উঠল,—এ  
আহ্বান কোথা থেকে? এর আকর্ষণ মহাসমুদ্রের দিকে, সমস্ত মানবের  
ভিতর দিয়ে, সংসারের ভিতর দিয়ে,—ভোগ ভোগ কিছই অস্বীকার করে  
নয়।

“এর দু'-চার দিন পরেই লিখেছি—‘প্রভাত-উৎসব’। একই কথা,  
আর একটু স্পষ্ট করে লেখা।” (২১)

## ২৩। আবৃত্তি—

—“হৃদয় আজ মোর কেমনে গেল খুলি  
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।  
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত  
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি  
এসেছে সখা-সখী, বসিয়া চোখোচোখি,  
দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হাসিছে শিশুগলি।  
এসেছে ভাই বোন, পুত্রকে ভরা মন,  
ডাকিছে ‘ভাই ভাই’ আঁখিতে আঁখি তুলি।

\* \* \*  
‘শিশুর লয়ে কোলে জননী এল চলে,  
বুকেতে চেপে ধরে বলিছে ‘ঘুমো ঘুমো’।  
আনত দু-নয়ানে চাহিয়া মুখপানে  
বাছুর চাঁদমুখে খেতেছে শত চুমো।  
পুত্রকে পুরে প্রাণ শিখরে কলেবর  
প্রেমের ডাক শূনি এসেছে চরাচর

\* \* \*  
এস হে এস কাছে, সখা হে এস কাছে  
এস হে ভাই এস, বসো হে প্রাণময়  
পুরেব মেঘ-মুখে পড়েছে রবি-রেখা  
অরুণ-রথচড়া আদেক যায় দেখা।  
তরুণ আলো দেখে পাখীর কলরব,  
মধুর আহা কিবা মধুর, মধু সব।

\* \* \*  
“পেয়েছি এত প্রাণ যতই করি দান  
কিছুতে যেন আর ফরাতে নারি তারে।

\* \* \*  
“জগৎ আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ,  
জগতে প্রাণে মিলি গাহিছে এ কী গান।  
কে তুমি মহাজ্ঞানী, কে তুমি মহারাজ,  
গরবে ছেলা করি হেসো না তুমি আজ।  
বারেক চেয়ে দেখ আমার মুখপানে,  
উঠেছে মাথা মোর মেঘের মাঝখানে।  
আপনি আসি উষা শিরের বসি ধীরে  
অরুণ-কর পিয়ে মুকুট দেন শিরে।  
নিজের গলা হতে কিরণ-মালা খুলি  
দিবেছে রবিদেব আমার গলে তুলি।  
খুলি খুলি আমি রয়েছে খুলি  
জেনেছি ভাই বলে জগৎ চরাচরে ॥ (২৫)

## ২৪। পাঠ—

—“সেদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গো সঙ্গো আমার আবেগ খসে পড়ল।  
মনে হ'ল সত্যকে মুক্ত দাঁটিতে দেখলুম। মানুষের অন্তরাখ্যাকে  
দেখলুম। দু'জন মুটে কাঁধে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে চলেছে।  
তাদের দেখে মনে হ'ল, কী অনির্বচনীয় সুন্দর। মনে হ'ল না ওরা  
মুটে। সেদিন তাদের অন্তরাখ্যাকে দেখলুম,—লেখানে আছে চিরকালের  
মানুষ। .....তাদের মধ্যে যে-আনন্দ দেখলুম, সে এমন কিছু যার উৎস  
সর্বজনীন সর্বকালীন চিত্তের গভীরে। .....যে-শুদ্ধিতে তাদের মধ্যে  
বিশ্বব্যাপী প্রকাশ দেখলুম, আমি পরম সৌন্দর্যকে অনুভব করলুম।  
মানবসম্প্রদেয় যে বিচিত্র রঙ্গলাভা, আনন্দ, অনির্বচনীয়তা, তা দেখলুম সেই-  
দিন। সে-দেখা বাস্তবের কাঁচা লেখায় আঁকবার করে নিজেকে প্রকাশ করেছে  
কোনরকমে, পরিস্ফুট হয়নি। সে সময়ে আভাস বা অনুভব করেছি, তাই  
লিখেছি। আমি যে যা-খসি গেয়েছি, তা নয়। এ-গান দু'দশের নয়, এর  
অবসান নেই। এর একটা পারাবাহিকতা আছে,—এর অনুবর্ত্তি আছে মানুষের  
হৃদয়ে হৃদয়ে। আমার গানের সঙ্গো সকল মানুষের যোগ আছে। গান  
খামলেও সে যোগ ছিন্ন হয় না।” (২৬)

## ২৫। আবৃত্তি—

\* \* \*  
—“দিন গেল।  
সেই বাসন্তী রঙের প'চিশে বৈশাখের  
রঙ করা প্রাচীরগুলো  
পড়ল ভেঙে।  
যে-পথে বকুলবনের পাতার দোলনে  
ছায়াময় লাগত কাঁপন,  
হাওয়ায় লাগত মর্মর

বিরহী কৌকিলের  
কুহুরবের মিনতিতে  
আতুর হত মধ্যাহ্নে,  
মৌমাছির ডানায় লাগত গুঞ্জন  
ফুলগন্ধের অদৃশ্য ইশারা বেয়ে,  
সেই তৃণ-বিছানো বীথিকা  
পেঁচিল এসে পাথরে-বাঁধানো রাজপথে।  
সেদিনকার কিশোরক  
সুদূর সেয়েছিল যে একতারায়  
একে একে তাতে চড়িয়ে দিল  
তারের পর নতুন তার।  
সেদিন প'চিশে বৈশাখ  
আমাকে আনল ডেকে  
বন্ধুর পথ দিয়ে  
তরুণমগ্নিত জনসমুদ্রতীরে ॥” (২৭)

(২০) “প্রভাত-সংগীত”। নির্বরের স্বপ্নভঙ্গ। রবীন্দ্র-  
রচনাবলী। প্রথম খণ্ড ॥

(২১) “মানুষের ধর্ম”। রবীন্দ্ররচনাবলী। বিংশতি খণ্ড ॥

(২৫) “প্রভাত-সংগীত”। “প্রভাত-উৎসব”। রবীন্দ্ররচনাবলী।  
প্রথম খণ্ড ॥

(২৬) “মানুষের ধর্ম”। রবীন্দ্ররচনাবলী। বিংশতি খণ্ড ॥

(২৭) “শেষ সপ্তক”—“প'চিশে বৈশাখ” ॥

## ‘কড়ি ও কোমল’

॥ ১২৯৩ ॥

### ২৬। পাঠ—

—“আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে.....মহলের পর মহল, দ্বারের পর দ্বার। পথে দাঁড়াইয়া কেবল বাতায়নের ভিতরকার দীপালোকটুকু মাত্র দেখিয়া কতবার ফিরিতে হয়,—সানাইয়ের বাঁশিতে ভৈরবীর তান দূর প্রাসাদের সিংহদ্বার হইতে কানে আসিয়া পৌঁছে। মনের সংগে মনের আপোষ, ইচ্ছার সংগে ইচ্ছার বোঝাপড়া, কত বাঁকাচারা বাধার ভিতর দেওয়া এবং নেওয়া। সেই সব বাধায় ঠেকিতে ঠেকিতে জীবনের নিৰ্ম্মরণধারা মুখরিত উচ্ছ্বাসে হাসিকান্নায় ফেনাইয়া উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকে, পদে পদে আবর্ত ঘুরিয়া উঠে এবং তাহার গতিবিধির কোনো নিশ্চিত হিসাব পাওয়া যায় না। ‘কড়ি ও কোমল’ মানুষের জীবননিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্যসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার—বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্র-জীবনের এই আশ-নিবেদন (২৮)—

### ২৭। আবৃত্তি—

—“মরিতে চাই না আমি সুন্দর ভুবনে  
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।  
এই সূর্যকরে এই পৃথিবীত কাননে  
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।  
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,  
রিহমিলন কত হাসি-অশ্রু-বায়,—  
মানবের সূত্রে দৃষ্টি গাঁথিয়া সংগীত  
যদি গো রচিত পায় অমর-আলয়।  
তা যদি না পায় তবে বাঁচি বতকাল  
তোমাধর্মীর মাঝখানে লভি যেন ঠাই,  
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল  
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।  
হাসিমুখে নিও ফুল, তার পরে হার  
ফেলে দিয়ো ফুল,—যদি সে ফুল শুকায়।” (২৯)

### ২৮। সংগীত—

—“আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।  
কে আছে জাগিয়া পূর্বে চাহিয়া,  
যলো, উঠ উঠ সবনে, গভীর নিদ্রা-গগনে॥  
দেখো তিমির রজনী যায় ওই,  
হাসে উষা নব জ্যোতির্ময়ী  
নব আনন্দে, নব জীবনে  
ফুল কুসুম, মধুর পবনে, বিহগ-কলকলনে॥  
হেরো, আশার আলোকে জাগে শুকতারা উদয় অচল পথে,  
কিরণ-কিরীটে তরণ তপন উঠিছে অরুণ-রথে।  
চলো যাই কাজে, মানবসমাজে,  
চলো বাহিরিয়া জগতের মাঝে,  
থেকো না মগন শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে॥  
যায় লাজ গ্রাস, আপস বিলাস, কুহক মোহ যায়।  
ঐ দূর হয় শোক সংশয় দূর স্বপন প্রায়।  
ফেলো জীর্ণ চীর, পরো নব সাজ,  
আরম্ভ করো জীবনের কাজ,  
সরল সবল আনন্দমনে, অমল অটল জীবনে॥” \*

(২৮) “জীবনস্মৃতি”। (২৯) “কড়ি ও কোমল”। “প্রাণ”। রবীন্দ্র রচনাবলী। শ্রবতীয় খণ্ড ২।

\* “গীতিবিতান”। ২য় সংস্করণ। ১ম খণ্ড। শ্রবতীয় জন্ম ১২৯৯। মাঘ সংখ্যা “সাধনা” মাসিক পত্রিকা (২য় বর্ষ ১ম ভাগ) চন্দ্রব্যা ২।

### ২৯। পাঠ—

—“প্রথমে বুনোনির সময় যে-মাটি বৃষ্টি পায়নি, তার ভূমার পীড়িত বীজ থেকে কৃষ্ণিত হয়ে যে-অঙ্কুর বেরোয়, সে যেমন কিছু একটা প্রকাশ করতে চায়, কিন্তু তার পূর্বেই বাধা হয়ে যায় মরে, আমার সম্মুখ-সংগীতের কবিতা সেই জাতের। একে সংগ্রহ করে রাখবার মতো নেই। এর কেবল একটা দাম আছে,—সে হচ্ছে চিন্তাচাপল্যের আবেগে বাঁধা-ছন্দের শিকলভাঙা। (৩০)

—“কড়ি ও কোমল আমার প্রথম কবিতার বই, যার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বহির্দৃষ্টিপ্রবণতা দেখা দিয়েছে। আর প্রথম আমি সেই কথা বলেছি, যা পরবর্তী আমার কাব্যের অন্তরে অন্তরে বরাবর প্রবাহিত হয়েছেঃ—

‘মরিতে চাইনা আমি সুন্দর ভুবনে  
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই—

যা ‘নৈবেদ্য’ আর এক প্রকাশ পেয়েছেঃ—

‘বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।’

“কড়ি ও কোমলে...আর একটি প্রবল প্রবর্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে,—সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব। যারা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন, তারা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ। কড়ি ও কোমলেই তার প্রথম উন্মেষ।” (৩১)

### ৩০। আবৃত্তি—

—“হায়, কোথা যাবে!

অনন্ত অজানা দেশ, নিত্যন্ত যে একা তুমি,

পথ কোথা পাবে!

হায় কোথা যাবে!

কঠিন বিপুল এ জগৎ

বুজু নেয় যে যাহার পথ।

স্নেহের পূর্তি তুমি, সহসা অসীমে গিয়ে

কার মুখে চাবে!

হায়, কোথা যাবে!

মোরা কেহ সাথে রহিব না,

মোরা কেহ কথা কহিব না।

নিমেষ ঘেন্নি যাবে, আমাদের ভালোবাসা

আর নাহি পাবে!

হায়, কোথা যাবে!

মোরা বসে কাঁদিব হেথায়

শূন্যে চেয়ে ডাকিব তোমায়

মহা সে বিজনমাঝে হয়তো বিলাপধ্বনি

মাঝে মাঝে শুনিয়ে পাবে

হায়, কোথা যাবে!”

চিরদিন তরে হবে পর,

এ-ঘর হবে না তব ঘর।

যারা ওই কোলে যেত, তারাও পরের মতো,

বারেক ফিরেও নাহি চাবে।

হায়, কোথা যাবে!

হায়, কোথা যাবে!

যাবে যদি, যাও যাও, অশ্রু তবে মুছে যাও,

এই খানে দৃষ্টি রেখে যাও।

যে বিশ্রাম চেয়েছিলে, তাই যেন সেথা মিলে,

আরামে ঘুমাও।

যাবে যদি, যাও। (৩২)

### ৩১। সংগীত—

—“বাণী তব যায় অনন্ত গগনে লোকে লোকে,

তব বাণী গ্রহচন্দ্র দীপ্ত তপনতারা।

সুখদুখ তব বাণী, জনমমরণ বাণী তোমার,

নিভৃত গভীর তব বাণী ভক্ত হৃদয়ে শান্তিধারা॥” (৩৩)

[কমল প্রকাশ]

(৩০) কবির ভূমিকা। রবীন্দ্রচরিতাবলী। প্রথম খণ্ড। আশ্বিন। ১৩৪৬।

(৩১) কবির মন্তব্য। “কড়ি ও কোমল”। রবীন্দ্রচরিতাবলী। শ্রবতীয় খণ্ড ২।

(৩২) “কড়ি ও কোমল”। “কোথায়”।

# ববীন্দ্রনাথের— প্রথম খুঁড়িত গদ্যরচনা

ছুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও  
দুঃখসাগিনী

মনুষ্য হৃদয়ের স্বভাব এই যে, যখনই সে  
সুখ দুঃখ শোক প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত  
হয়, তখন সে ভাব বাহ্যে প্রকাশ না করিলে  
সে সুস্থ হয় না। যখন কোন সংগী পাই, তখন  
তাহার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করি, নহিলে সেই  
জব সংগীতাদির দ্বারা প্রকাশ করি। এইরূপে  
গীতি-কাব্যের উৎপত্তি। আর কোন মহাবীর  
শত্রু হস্ত বা কোন অপকার হইতে দেশকে  
মুক্ত করিলে তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক যে  
গীতি রচিত ও গীত হয় তাহা হইতেই মহা  
কাব্যের জন্ম। সুতরাং মহাকাব্য যেমন পরের  
হৃদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়, তেমনি  
গীতিকাব্য নিজের হৃদয় চিত্র করিতে  
উৎপন্ন হয়। মহাকাব্য আমরা পরের  
জনা রচনা করি এবং গীতিকাব্য আমরা নিজের  
জনা রচনা করি। যখন প্রেম, করুণা, ভক্তি  
প্রভৃতি বৃত্তিসকল হৃদয়ের গঢ় উৎস হইতে  
উৎসারিত হয়, তখন আমরা হৃদয়ের ভার লাঘব  
করিয়া তাহা গীতিকাব্যরূপ স্রোতে ঢালিয়া দিই  
এবং আমাদের হৃদয়ের পবিত্র প্রসঙ্গজাত সেই  
স্রোত হয়ত শত শত মনোভূমি উর্বরা করিয়া  
পৃথিবীতে চিরকাল বর্তমান থাকিবে। ইহা  
মরুভূমির দম্ব বালুকাও আর্দ্র করিতে পারে,  
ইহা শৈল ক্ষেত্রের শিলারূপেও উর্বরা করিতে  
পারে। কিম্বা যখন অগ্নিশৈলীর ন্যায় আমাদের  
হৃদয় ফাটিয়া অগ্নিরাশি উৎপীড়িত হইতে  
থাকে, তখন সেই অগ্নি আর্দ্র কাষ্ঠও জ্বালাইয়া  
দেয়, সুতরাং গীতিকাব্যের ক্ষমতা বড় অল্প  
নহে। স্বাধিদগের ভক্তির উৎস হইতে যে সকল  
গীতি উৎখত হইয়াছিল, তাহাতে হিন্দুধর্ম  
গঠিত হইয়াছে, এবং এমন দৃঢ়রূপে গঠিত  
হইয়াছে যে, বিদেশীয়রা সহস্র বৎসরের অত্যা-  
চারেও তাহা ভগ্ন করিতে পারে নাই। এই  
গীতিকাব্যই যুদ্ধের সময় সৈনিকদের উন্মত্ত  
করিয়া তুলে, বিরহের সময় বিরহীর মনোভার  
লাঘব করে, মিলনের সময় প্রেমিকের সুখে  
আহুতি প্রদান করে, দেবপূজার সময় সাধকের  
ভক্তির উৎস উন্মত্ত করিয়া দেয়। এই গীতি  
কাব্যই ফরাসী বিদ্রোহের উত্তেজনা করিয়াছে,  
এই গীতিকাব্যই চৈতন্যের ধর্ম বঙ্গদেশে বশ-  
মূল করিয়া দিয়াছে এবং এই গীতিকাব্যই  
বাঙালীর নিজীব হৃদয়ে আজকাল অল্প অল্প  
জীবন সঞ্চার করিয়াছে। মহাকাব্য সংগ্রহ করিতে

হয়, গঠিত করিতে হয়; গীতিকাব্যের উপ-  
করণসকল গঠিত আছে, প্রকাশ করিলেই  
হইল। নিজের মনোভাব প্রকাশ করা বড়  
সামান্য ক্ষমতা নহে। সেজ্ঞপীয়র পরের হৃদয়  
চিত্র করিয়া দৃশ্যকাব্যে অসাধারণ হইয়াছেন,  
কিন্তু নিজের হৃদয় চিত্রে অক্ষম হইয়া গীতি-  
কাব্যে উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। তেমনি  
বাইরন, নিজ হৃদয় চিত্রে অসাধারণ; কিন্তু  
পরের হৃদয় চিত্রে অক্ষম। গীতিকাব্য অকৃত্রিম  
কেননা তাহা আমাদের নিজের হৃদয় কাননের  
পুষ্প, আর মহাকাব্য শিশু, কেননা তাহা পর  
হৃদয়ের অনুকরণ মাত্র। এই নিমিত্ত আমরা  
বাল্মীকি, ব্যাস, হোমর, ভার্জিল প্রভৃতি  
প্রাচীনকালের কবিদিগের ন্যায় মহাকাব্য  
লিখিতে পারিব না; কেননা সেই প্রাচীনকালে  
লোকে সভ্যতার আচ্ছাদনে হৃদয় গোপন করিতে  
জানিত না; সুতরাং কবি হৃদয় প্রত্যক্ষ করিয়া  
সেই অনাবৃত হৃদয়সকল সহজেই চিত্র  
করিতে পারিতেন। গীতিকাব্য যেমন প্রাচীন-  
কালের তেমনি এখনকার, বরং সভ্যতার সঙ্গ  
তাহা উন্নতি লাভ করিবে, কেন না সভ্যতার  
সঙ্গে সঙ্গে যেমন হৃদয় উন্নত হইবে, তেমনি  
হৃদয়ের চিত্রও উন্নতি লাভ করিবে। নিজের  
হৃদয় চিত্র করিতে গীতিকাব্যের উৎপত্তি বটে  
কিন্তু কেবল মাত্র নিজের হৃদয় চিত্র করা  
গীতিকাব্যের কার্য নহে; এখন নিজের ও পরের  
উভয়ের মনোচিত্রের নিমিত্ত গীতিকাব্য ব্যাপ্ত  
আছে, নহিলে গীতিকাব্যের মধ্যে বৈচিত্র্য  
থাকিত না। ইংরেজীতে যাহাকে Lyric  
Poetry কহে, আমরা তাহাকে খণ্ডকাব্য  
কহি। মেঘদূত খণ্ডকাব্য, ঋতু সংহারও খণ্ড-  
কাব্য এবং Lalla Rookh Lyric Poetry,  
Irish Melodies Lyric Poetry,  
কিন্তু আমরা গীতিকাব্য অর্থে মেঘদূতকে  
মনে করি নাই, ঋতুসংহারকে গীতিকাব্য  
কহিতোঁছি। আমাদের মতে Lalla Rookh  
গীতি কাব্য নয়, Irish Melodies গীতিকাব্য।  
ইংরাজিতে যাহাদিগকে Odes, Sonnets প্রভৃতি  
কহে, তাহাদিগের সমষ্টিকেই আমরা গীতি-  
কাব্য বলিতোঁছি। বাঙলা দেশে মহাকাব্য অতি  
অল্প কেন? তাহার অনেক কারণ আছে।  
বাঙলা ভাষার সৃষ্টি অবধি প্রায় বঙ্গদেশ  
বিদেশীয়দিগের অধীনে থাকিয়া নিজীব হইয়া  
আছে, আবার বাঙলার জলবায়ুর গুণে  
বাঙালীরা স্বভাবতঃ নিজীব, স্বশ্রম, নিশ্বেদজ,

শান্ত; মহাকাব্যের নায়কদিগের হৃদয় চিত্র  
করিবার আদর্শ হৃদয় পাইবে কোথা? অনেক  
দিন হইতে বঙ্গদেশ সুখে শান্তিতে নিদ্রিত,  
যুদ্ধবিগ্রহ, স্বাধীনতার ভাব বাঙালীর হৃদয়ে  
নাই; সুতরাং এই কোমল হৃদয়ে প্রেমের বৃক্ষ  
অঠে পুষ্টে মূল বিস্তার করিয়াছে। এই  
নিমিত্ত জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের লেখনী  
হইতে প্রেমের অশ্রু নিঃসৃত হইয়া বঙ্গদেশ  
প্লাবিত করিয়াছে এবং এই নিমিত্তই প্রেম-  
প্রধান বৈষ্ণব ধর্ম বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছে  
ও আধিপত্য লাভ করিয়াছে। আজকাল  
ইংরাজ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীরা  
স্বাধীনতা, অধীনতা, তেজস্বিতা, স্বদেশ-  
হিতৈষিতা প্রভৃতি অনেকগুলি কথার মর্মার্থ  
গ্রহণ করিয়াছেন এবং আজ কাল মহাকাব্যের  
এত বাহুলা হইয়াছে যে, যিনি এখন কবি  
হইতে চান তিনিই একখানি গীতিকাব্য লিখিয়াই  
একখানি করিয়া মহাকাব্য বাহির করেন কিন্তু  
মহাকাব্যে উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছেন  
না ও পারিবেন না। যদি বিদ্যাপতি, জয়দেবের  
সময় তাহাদের মনের এখনকার ন্যায় অবস্থা  
থাকিত তবে তাহারা হয়ত উৎকৃষ্ট মহাকাব্য  
লিখিতে পারিতেন। এখনকার মহাকাব্যের  
কবিরা রুদ্ধহৃদয় লোকের হৃদয়ে উর্কি  
মারিতে গিয়া নিরাশ হইয়াছেন ও অবশেষে  
মিষ্টান খুলিয়া ও কখন কখন রামায়ণ মহাভারত  
লইয়া অনুকরণের অনুকরণ করিয়াছেন এই  
নিমিত্ত মেঘনাদ বধে, ব্রত সংহারে ঐ সকল  
কবিদিগের পদছায়া স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইয়াছে।  
কিন্তু বাঙলার গীতিকাব্য আজ কাল যে জ্বলন  
তুলিয়াছে তাহা বাঙলার হৃদয় হইতে উৎখত  
হইতেছে। ভারতবর্ষের দুঃবস্থায় বাঙালী-  
দিগের হৃদয় কাঁদিতোঁছে, সেই নিমিত্তই  
বাঙালীরা আপনার হৃদয় হইতে অশ্রুধারা  
লইয়া গীতিকাব্যে ঢালিয়া দিতেছে। “মিলে  
সবে ভারত সন্তান” ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয়  
সংগীত, স্বদেশের নিমিত্ত বাঙালীর প্রথম  
অশ্রুজল। সেই অবধি আরম্ভ হইয়া আজকাল  
বাঙলা গীতিকাব্যের যে অশ্রু নেত্রপাত করি  
সেইখানেই ভারত। কোথাও বা দেশের  
নিজীব রোদন, কোথাও বা উৎসাহের  
জ্বলন্ত অনল। “মিলে সবে ভারত সন্তানের”  
কবি যে ভারতের জয়গান করিতে অনুমতি  
দিয়াছেন, আজ কাল বালক পর্যন্ত, স্ত্রীলোক  
পর্যন্ত সেইজয়গান করিতেছে, বরং এখন এমন  
অতিরিক্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহা সমূহ হাস্য  
জনক। সকল বিষয়েরই অতিরিক্ত হাস্যজনক,  
এবং এই অতিরিক্ততাই প্রহসনের মূল ভিত্তি।  
ভারতমাতা, যবন, উট, জাগ, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি  
শুনিয়া শুনিয়া আমাদের হৃদয় এড় অসাড়

হইয়া পড়িয়াছে যে ও সকল কথা আর আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। ক্রমে যতই বালকগণ ভারত ভারত চীৎকার বাড়াইবেন ততই আমাদের হাস্য সম্ভরণ করা দুঃসাধ্য হইবে! এই নিমিত্ত বাহারা ভারতবাসীদের দেশহিতৈষিতায় উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত অব্যসঙ্গীত লেখেন, তাহাদের ক্ষান্ত হইতে উপদেশ দিই; তাহাদের উদ্দেশ্য মহৎ, তাহাদের প্রয়াস দেশহিতৈষিতার প্রস্রবণ হইতে উঠিতেছে বটে কিন্তু তাহাদের সোপান হাস্যজনক। তাহারা বুঝেন না ঘুমন্ত মনুষ্যের কর্ণে ক্রমাগত একইরূপ শব্দ প্রবেশ করিলে ক্রমে তাহা এমন অভ্যস্ত হইয়া যায় যে তাহাতে আর তাহার ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। তাহারা বুঝেন না যেমন ক্রন্দন করিলে ক্রমে শোক নষ্ট হইয়া যায় তেমনি সকল বিষয়েই। এই নিমিত্তই সৈয়দপুরীর কহিয়াছেন—“Words to the heat of deed too cold breath give.” তোমার হৃদয় যখন উৎসাহে জ্বলিয়া উঠিলে তখন তুমি তাহা দমন করিবে নহিলে প্রকাশ করিলেই নিভিয়া যাইবে এবং যত দমন করিবে ততই জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিবে।

ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী, দুঃখসংগিনী এই তিনখানি গীত-কাব্য আমরা সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাদিগের মধ্যে ভুবনমোহিনী প্রতিভা, ও অবসর সরোজিনীর মধ্যে অনেকগুলি আর্থসংগীত আছে, কেননা ইহাদিগের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক, অপরটি বালক। ইহা প্রায় প্রত্যক্ষ যে দুর্বল-দিগের যেমন শারীরিক বল অল্প তেমনি মানসিক তেজ অধিক; ঈশ্বর একটির অভাব অন্যটির দ্বারা পূর্ণ করেন। ভুবনমোহিনী প্রতিভা ও অবসর সরোজিনী পড়িলে দেখিবে ইহাদিগের মধ্যে একজনের প্রয়াস আছে, অধাবসায় আছে, প্রমশীলতা আছে। একজন আপনার হৃদয়ের খনির মধ্যে যে রত্ন যে ধাতু পাইয়াছেন তাহাই পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন, সে রত্ন ধূলি কর্দম মিশ্রিত আছে কিনা, তাহা সুমার্জিত মসৃণ করিতে হইবে কিনা তাহাতে সন্দেহ নাই। আর একজন আপনার বিদ্যার ভাণ্ডারে বাহা কিছু ফুড়াইয়া পাইয়াছেন, তাহাই একটু মার্জিত করিয়া বা কোন কোন স্থলে তাহার সৌন্দর্য নষ্ট করিয়া পাঠককে আপনার বলিয়া দিতেছেন। একজন নিজের জন্য কবিতা লিখিয়াছেন, আর একজন পাঠকদিগের জন্য কবিতা লিখিয়াছেন। ভুবনমোহিনী নিজের মন তৃপ্তির জন্য কবিতা লিখিয়াছেন, আর রাজকৃষ্ণাব্দ যশ প্রাপ্তির জন্য কবিতা লিখিয়াছেন, নহিলে তিনি বিদেশীয় কবিতার ভাব সংগ্রহ করিয়া নিজের বলিয়া দিতেন না। ভুবনমোহিনী পৃথিবীর লোক, তাহার কবিতার নিন্দা করিলেও গ্রাহ্য করিবেন না, কেননা তিনি পৃথিবীর লোকের

নিমিত্ত কবিতা লেখেন নাই। আর রাজকৃষ্ণাব্দ তাহার কবিতার নিন্দা শুনিলে মর্মান্তিক ক্ষুব্ধ হইবেন, কেননা, যশোহুই তাহাকে কবি করিয়া তুলিয়াছে। একজন অশিক্ষিত রমণীর প্রতিভায় ও একজন শিক্ষিত যুবকের প্রয়াসে এই প্রভেদ। কবিতা যেখানেই প্রায় পরের অনুকরণ করিতে যান সেইখানেই নষ্ট করেন ও যেখানে নিজের ভাব লেখেন সেইখানেই ভাল, কেননা তাহাদের নিজের ভাব-স্রোতের মধ্যে পরের ভাব ভাল করিয়া মিশে না। আর কুকবিরা প্রায় যেখানে পরের অনুকরণ বা অনুবাদ করেন সেইখানেই ভাল হয় ও নিজের ভাব জুড়িতে গেলেই নষ্ট করেন, কেননা, হয় পরের মনোভাবস্রোতের মধ্যে তাহাদের নিজের ভাব মিশে না কিম্বা তাহার আশ্রয় উচ্চতর কবির কবিতার নিকট তাহার নিজের ভাব “হংস মধ্যে বকো যথা” হইয়া পড়ে! এই নিমিত্ত অবসর সরোজিনীর “মধুমাক্ষিকা দংশন” ও “প্রবাহি চলিয়া যাও অগ্নি লো তটিনী” ইত্যাদি কবিতাগুলি মন্দ নাও লাগিতে পারে!

#### “THE WOUNDED CUPID”

Cupid, as he lay among  
Rises, by a bee was stung.  
Whereupon, in anger flying  
To his mother said thus, crying,  
Help, O help, your boy's a dying!  
And why my pretty lad? said she.  
Then, blubbering, replied he,  
A winged snake has beaten me,  
Which country people call a bee..  
At which she smiled; then with her  
And kisses drying up his tears  
Alas, said she my wag! if this  
Such a pernicious torment is;  
Come, tell me then, how great's the  
Of those thou woundest with thy dart?  
“HERRICK”

#### মধুমাক্ষিকা দংশন

একদা মদন করিয়ে যতন,  
বাছি বাছি তুলি কুসুম রতন  
রচিল শয়ন মনের মতন,

ঘুমের ঘোরতে হয়ে অচেতন,  
মুদিয়ে নয়ন রহিল মদন

ঘুমঘোরে কাম নড়িল যেমন,  
মধুমাছি দেহে বাজিল চরণ;  
রাগভরে মাছি সবলে তখন  
ফুটাইল কাম চরণে হুল।  
অধীর হইয়া বিষের জ্বালায়  
উঠি রতিপতি ছাট্টিয়ে পালায়  
প্রিয়তমা রতি বাসয়ে যথায়  
গাঁথিতে ছিলেন মালতী ফুল।  
“অগ্নি প্রিয়তমে!” কহিল রতিরে  
রতিনাথ “প্রাণ যায় যে অচিরে।

কেন শূইলাম বিছাইয়া ফুল  
তাই মধুমাছি ফুটাইল হুল  
কি হবে কি করি প্রাণ বে যার!”

কহে কামে রতি নিকটে আসিয়ে  
“ছোট মধুমাছি দিয়েছে বিঁধিয়ে

তাই তুমি, নাথ! হইলে কাতর  
ভাল, বল দেখি দাসীর গোচর  
কতই জ্বলিবে তাহার অন্তর  
পশুর তুমি বিঁধিবে যায়?”

“Flow on him thou shining river  
But ere thou reach the sea,  
Seek Ella's bower and give her  
The wreath I fling o'er thee.” &c.  
Moore

প্রবাহি চলিয়া যাও অগ্নি লো তটিনী  
কিছু দূরে গিয়ে, পরে দেখিবে নয়নে;—  
তব তটে বসি মম সুচারু হাসিনী  
নব বিবাহিতা বাল্য আনত আননে।  
এই লও, স্রোতে তব দিন দুঃখসাইয়া  
কমল-কুসুম মালা, দিয়েও কর তার।”

ইহাতি।

এই ইংরাজি কবিতা ও বাঙালা কবিতা-  
গুলিতে অতি অল্প প্রভেদ আছে।

“বাঙালী ভায়ারা করি নিবেদন  
ঘোড় করে বন্দি ও রাগা চরণ!  
যা কিছু বলিল ভালির কারণ  
ভাবি দেখ মনে করো না রাগ।  
রাগ ত কর না দাস্য করিতে  
রাগ ত কর না নিগার হইতে  
পাদুকা বহিতে অধীন রহিতে  
হৃদয়ে লেপিয়া কলঙ্ক দাগ!  
এসব করিতে রাগ যদি নাই  
আমার কথায় রেগো না দোহাই  
বাড়িবে কলঙ্ক আরো তা হলে!

অবসর সরোজিনীর কবি ভাবিতেছেন  
তিনি হাসিতে হাসিতে, উপহাস করিতে  
করিতে খুব ব্যর্থ অর্থ স্পর্শ করিতেছেন  
কিন্তু “বাঙালী ভায়ারা” ইত্যাদিতে কবিতার  
উপর অভিজ্ঞ ভিন্ন আর কোন ভাব মনে আসে  
না। তাহার মনোবৃত্তি কবিতার মধ্যে ছন্দ  
আছে বটে কিন্তু ভাব নাই। তাহার প্রেমের  
কবিতার মধ্যে কৃত্রিমতা ও আড়ম্বর আছে বটে  
কিন্তু অনুরাগের জ্বলন্ত তেজ নাই। তিনি  
“কেন ভালবাসি”র ন্যায় একটি কবিতা  
লিখিতে পারেন না এবং ভুবনমোহিনীরও  
তাহার “প্রিয়তমা হাসিল”র ন্যায় কবিতা মনে  
আসিতে পারে না। সরোজিনীর মধ্যে রূপক  
তুলনার কৌশল বাক্যের আড়ম্বর আছে কিন্তু  
সেগুলি হৃদয় স্পর্শ করে না। ভুবনমোহিনীর  
কবিতার মধ্যে অর্থহীনতা, অসম্বন্ধ রচনা

অনেক আছে তথাপি সেগুলি সবুও কতকগুলি কবিতা হৃদয় স্পর্শ করে।

যদিও ভুবনমোহিনীর কবিতার মধ্যে প্রায়সজাত কবিতা নাই, সবগুলিই প্রতিভার চিরজীবন্ত নির্ধারণী হইতে উৎসারিত, তথাপি যদি ভুবনমোহিনীকে মনে হইতে স্বাভাবিকরিত করিয়া কবিতাগুলি পড়ি তবে কেমন লাগে বলিতে পারি না। আমরা ইহার বাহাই পড়িতে যাই তাহাতেই ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে। গুণ পাইলে অমনি ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে, অমনি সেই গুণ স্বর্ণগুণিত হইয়া মনে উঠে। দোষ পাইলে অমনি ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে অমনি তাহার চতুর্থাংশ কমিয়া যায়। যখন আমরা

“রুধির মেখেছে, রুধির পিতেছে,  
রুধির প্রবাহে দিতেছে সাতার  
ছিন্ন শীর্ষ শব, ভেসে যায় সব  
পিশাচী প্রেতিনী কাতারে কাতার।

সম্বনে নিম্বনে মলয় পবন,  
আহারি সুরভি নন্দন রতন  
মন্দার সৌরভ অমৃত রাশি  
মর্মরিছে তরু অটল ভূধর,  
দমিছে দাপেতে কাঁপছে শিখর—

প্রভৃতি পড়িয়া কিছুই অর্থ করিতে পারি না তখন ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে এবং ইহার অর্থ বুঝিতেও চাই না। যখন উল্লামদিনী পড়িয়া আমাদের হাসি আসে তখন ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে অমনি হাসি চাপিয়া ফেলি। যখন প্রতিভার “পিশাচী” “প্রেতিনী”-

ময়ী কবিতার মধ্যে কোন কর্কশ কথা পাই তখন ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে ও আমরা যথাসাধ্য কোমল করিয়া পাঠ করি। একজনকে আমি “উল্লামদিনী” কবিতার অর্থ বুঝাইতে বলি, তিনি কহিলেন আমি ইহার অর্থ বুঝাইতে পারি না, কিন্তু ইহার অভাস্তরে একটি মাধুর্য আছে। কবিতার মধ্যে যাহা অসম্বন্ধ প্রলাপ, যাহার অর্থ হয় না লোকে তাহার মধ্যে মাধুর্য কল্পনা করে এবং দর্শনের মধ্যে যে অংশটুকু দুর্বোধ্য ও কঠোর তাহাই পাঠকেরা গভীরদর্শন বলিয়া মনে করেন। অনেক গীতিকাব্যের দোষ এই যে তাহার শৃঙ্খলা নাই, অর্থ নাই, উন্মত্ততাময়; অনেকে মনে করেন এরূপ উন্মত্ততা না হইলে কবির উচ্ছ্বাসিত হৃদয় হইতে যে কবিতা প্রসূত হইয়াছে তাহার প্রমাণ থাকে না। প্রতিভা এই দোষে কলঙ্কিত। ইহার অনেক দোষ পরিহার করিয়া কতকগুলি কবিতা পাই বাহা উচ্চ শ্রেণীর কবিতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

“সরোজিনী” ও “প্রতিভা” পড়িতে পড়িতে আমরা “দুঃখসিগিনীকে” তুলিয়া গিয়াছিলাম। “দুঃখসিগিনী”তে আর্থ সংগীত নাই, আর্থ রক্ত নাই, যবন নাই, রক্তারক্তি নাই; ইহাতে হৃদয়ের অশ্রুজল, হৃদয়ের রক্ত ও প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নাই। হৃদয়ের বৃণ্ডিনিচয়ের মধ্যে প্রেমে যেমন বৈচিত্র্য আছে, এমন আর কিছুতেই নাই। প্রেমের মধ্যে দুঃখ আছে, সুখ আছে নৈরাশ্য

আছে, শ্বেষ আছে, এবং প্রেমের সহিত অনেকগুলি মনোবৃত্তি জড়িত। এখন কতকগুলি সমালোচক ধূয়া ধরিয়াছেন যে, প্রেমের কথা কহিলে বঙ্গদেশ অধঃপাতে যাইবে। একথার অর্থ খুব অল্পই আছে। হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি প্রেমকে অবহেলা করিয়া যিনি তেজস্বিতা সঞ্চয় করিতে চাহেন তিনি মানব প্রকৃতি নুশেন না। যে মনুষ্যের হৃদয়ে প্রেম নাই তেজস্বিতা আছে তাহার হৃদয় নরক! কিন্তু যাহার হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম আছে, তাহার তেজস্বিতা আছেই। তুমি কবি! নৈরাশ্য বিষাদজনিত অশ্রুজল যদি তোমার হৃদয়ে জমিয়া থাকে, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া ফেল! তাহা দমন করিয়া তুমি বলপূর্বক যেন ‘ভারত’ ‘একতা’ ‘যবন’ প্রভৃতি বলিয়া চীৎকার করিও না। কবিতা হৃদয়ের প্রস্রবণ হইতে উৎখত হয়, সমালোচকদের তিরস্কার হইতে উৎখত হয় না। দুঃখসিগিনীর বিষয় আমরা এই বলিতে পারি তাহার ভাষা অতিশয় মিষ্ট। তিনি যেখানে কিছু বর্ণনা করিয়াছেন সেইখানকার ভাষাই মিষ্ট হইয়াছে। তবে একটি কথা স্বীকার করিতে হয় যে, তাহার ভাবের মাধুর্য অপেক্ষা ভাষার মাধুর্য অধিকতর মন আকর্ষণ করে! এই পুস্তকের মধ্য হইতে আমরা অনেক সুন্দর পংক্তি তুলিয়া দিবার মানস করিয়াছিলাম কিন্তু বাহুলা ভয়ে পারিলাম না।

‘জ্ঞানাপ্তুর ও প্রতিবিশ্ব’—কার্তিক ১২৮০

## “বাইশে শ্রাবণ স্মৃতি গেছে দূরে সরে”

শ্রীতপতী দেবী

তুমি চলে গেছে সে কথা সত্য নয়

শাস্বত তব উদয় আবির্ভাব;

মিথ্যা স্বপন তোমার তো তিরোভাব

নিভা সত্য তুমি হে জ্যোতির্ময়।

আমরা তোমার পালি না মৃত্যুতিথি

বেঁচে আছি জানি মোদের মরমী কবি।

হৃদয় ভুবনে রচিয়া স্নিগ্ধ ছবি

বিস্তার করে সুকোমল ছায়া নিতি।

দিন ক্ষণ ধরে তোমার জন্মদিন

আসিতে পারে না ভকতের হৃদিপদরে;

জন্ম নিতেছ নব নব রূপ ধরে

নব অনুভবে বাজারে মরমবীণ।

কহিতেছ কথা প্রাণের শ্রবণে বসি

শোনাতেছ গান মধুর বাঁশরী সুরে—

ব্যথায় পদকে উঠিছে হৃদয় ভরে

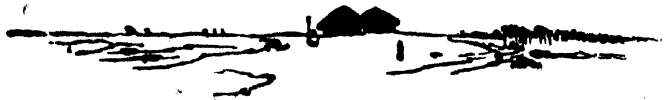
ভাব সমুদ্র তুলিতেছ উচ্ছ্বাসি!

তুমি নাই হেন বলিব কেমন করে?

করি অনুভব প্রতিখনে প্রতি পলে—

তোমার সত্তা এই তো হৃদয় তলে

বাইশে শ্রাবণ স্মৃতি গেছে দূরে সরে।



# রবীন্দ্র-কথা

## জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য প্রথমটা বড় ভয়ে ভয়ে, বড় সন্তর্পণে গিয়াছিলাম। তাঁহার সম্বন্ধে কতরূপ গল্প শুনিয়াছিলাম। লোকে বলিত তিনি চাপা, reserved কাহারও সঙ্গে মন খুলিয়া কথা কহেন না। যাইবার সময় অনেকবার ভাবিয়াছিলাম—ট্রেনে করিয়া তীর্থযাত্রীর মত ত যাইতোছি, কিন্তু শেষে যদি “Well-bred Poetic Stare” (কবি-সুলভ শিষ্টাচারসংগত তীব্র দৃষ্টি) খাইয়া ফিরিতে হয়, তবে বড় নাকাল হইব। যাইয়া কিন্তু দেখিলাম, ঠিক ইহার বিপরীত। স্নিগ্ধ, শান্ত, সংযত মূর্তি, দেখিবামাত্র সব সঙ্কোচের ভাব কোথায় দূরে চলিয়া গেল। বহুকাল ধরিয়া যাহার কাব্য ও রচনা কত ভক্তি, কত প্রাণের সহিত পাঠ করিতোছি, আজ তাঁহার ব্যক্তিগত আলাপ ও ব্যবহারে সেই প্রাণ ও ভক্তির ভাব দৃঢ়ীকৃত হইল দেখিয়া প্রাণে বড় আনন্দ অনুভব করিলাম। ইংরাজীতে বলে (Great Natures are essentially simple)—মহৎ ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃই সরল। রবীন্দ্রবন্দু ঠিক তাহাই—একজন নিতান্তই সাধাসিদ্ধে মানুস। খুব যে হাতপা ছড়াইয়া, গা এলাইয়া দিয়া উচ্চ চাকর ও হাসির সঙ্গে কথা বলিলেন, তাহা নহে—আর সরল করণ যে সাধাসিদ্ধে হওয়ার প্রধান লক্ষণ, তাহাও নহে; স্বভাব-সুলভ ধীরতা ও সংযমের সঙ্গেই আলাপ করিলেন। কিন্তু তাঁহার কথোপকথনের মধ্যে রহস্য বা লুকোচুরির ভাব আদৌ নাই; সরল প্রাণে যাহা ছিল, ঠিক সেইরূপভাবেই কথা বলিতে ছিলেন।

### রহস্যচর্চাপ্রশ্ন

প্রথমে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বোলপুর রহস্যচর্চাপ্রশ্নের কথা উঠিল। তিনি বলিলেন—“পূর্বে আমাদের দেশে রহস্যচর্চা, গাহস্থ্য, বানপ্রস্থ প্রভৃতি জীবনের যে কয়েকটি আশ্রম বিভাগ ছিল—সেটা Historically true কিনা, একথা আমি বলিচি না—কিন্তু তাহার অন্তর্নিহিত আদর্শ (Underlying Ideal) একটা ত ছিল, জীবনের একটা উচ্চ আদর্শ স্থির করে সেই আদর্শটা সফল করবার একটা চেষ্টা ত ছিল। আমার মনে হল যে, আমরা

সেই উচ্চ আদর্শটা সেই পুরাতন পন্থার ভিতর দিয়ে কেন সফল করবার চেষ্টা করব না? তাই আমি স্থির করলাম যে, এখানে এমন একটা স্কুল করব যেখানে ছেলেরা জানবে যে Practical Efficiency (আপাতত কার্য-কারিতা) ছাড়া জীবনের আরো একটা বড় উদ্দেশ্য আছে—যেটা জীবনকেই ভাল করে জানা। আমার ইচ্ছা ছিল যে, এখানে ছেলেরা সুখ ও বিলাস যতখানি পারে ছেড়ে খুব সাদাসিধের উপর থাকবে। তাই আমার স্কুলে ক্রাশ নাই, বেগু নাই, গাছের নীচে আসন পেতে ছেলেরা পড়ে, যতখানি পারে Simple life adopt করে থাকে।” “বোলপুরের মাঠের মধ্যে স্কুল উঠিয়ে আনা, শুমুং যে শহর থেকে ছেলেরা দূরে রাখবার জন্য তা নয়; তার আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল। চারিদিকে গাছপালা বাড়বে তার মধ্যে ছেলেরাও বাড়বে, গাছপালার growth, nature's growth এবং মানুষের growth-র মধ্যে একটা সামঞ্জস্য হবে—এটা আমার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটা ছিল। শহরে ছেলেরা থাকে, তারা ত গাছপালার কাজ তত দেখতে পায় না; তারা দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে, কিন্তু দেওয়াল ত বাড়বে না, নিজীব ইন্ট-পাথরের দেওয়ালে যেন তাদের চেপে ধরে থাকে।” এমন সজীবতার সঙ্গে রবীন্দ্র এই কথাগুলি বলিলেন যেন পাথরের দেওয়াল বন্ধুর উপর চাপিয়া শ্বাসরোধ করিতে আসিতেছে।



“প্রথম প্রথম আমাদের এই স্কুল নিয়ে বড় ব্যস্ত হতে হত। এক একবার এমন হয়েছে যে সমস্ত ছেলেকে স্কুল থেকে দূর করে দিয়েছি। নানা জায়গা থেকে ছেলেরা আসত, তারা কত কদর্য অভ্যাস নিয়ে আসত, কিছুতেই তাদের আমার শিক্ষা-প্রণালীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারতাম

না। অধ্যাপকদের সঙ্গেও অনেক সময় এই মন্স্কিল হয়ে পড়ত। হয়ত সেটা কতকটা আমারই দৃষ্টি। আমি ভাবতাম এখানকার শিক্ষার প্রণালী, এখানকার থাকার নিয়ম, এর মধ্যে থেকেই আমার আদর্শটা এদের মধ্যে বেশ ফুটে উঠবে; কিন্তু তা হত না। তাই এই শিক্ষার নিয়ম, এটা অনেকের কাছে বড় বাইরের জিনিস হয়ে পড়ত। এখন বোধ হয় দোষটা শুদ্ধ হয়ে গেছে। এখন এখানের শিক্ষাপ্রণালীটা যে একটা বিশেষ আদর্শ সফল করবার জন্য সেটা (preparation for a particular ideal of life), সেটা ছাত্র অধ্যাপক সকলেই বেশ উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাই কাজও



বেশ সুন্দররূপে চলে যাচ্ছে। সকলেই প্রাণ দিয়ে এতে লেগে পড়েছেন।”

দুইজন অধ্যাপকের সঙ্গে আদর্শের বিভিন্নতার জন্য রবীন্দ্র যে কিরূপ মন্স্কিলে পড়িয়াছিলেন, তিনি তার একটা দৃষ্টান্ত দিলেন। তিনি বলিলেন—“আমার এখানে একবার একটা শিক্ষক এসেছিলেন, তিনি খুব উৎসাহের সঙ্গে কাজ করতে আরম্ভ করলেন; কিন্তু তিনি বোধ হয় আমার ideal একবারেই ধরতে পারেন নি। তিনি এসে একজন ছেলেকে দিয়ে অন্য ছেলের উপর spy করতে আরম্ভ



করলেন, তিনি দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতেন ছেলেরা কি করে না করে; এবং তাদের চিঠি খুলে পড়তেন। আমার এটা বড় mean বলে বোধ হ'ল। আমি অস্থির হ'য়ে পড়লাম, আর এতে ফল হবে কি?—এতে একটু বাইরের সংশোধন হতে পারে, আর কিছু ত হয় না! আমি বুঝলাম আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন! তার আদর্শ হচ্ছে moral—নৈতিক, আমার তা নয়, আমার তার চেয়ে বেশী spiritual।”

শুনিলাম এখন স্কুল প্রায় একশত কি তাহারও কিছু বেশী ছে আছে। শিক্ষকের

সংখ্যা পনের জন। পাঁচ ছয়জন ছেলে লইয়া এক একটি শ্রেণী; বেশীর ভাগ শেখা মুখে মুখে। শিক্ষার প্রণালী অতি সুন্দর—বিশেষতঃ ভাষা শিক্ষার—ঘেটার ভার রবিবাবুর সম্পূর্ণ নিজের হাতে। সংস্কৃত ও ইংরাজি প্রথম শিক্ষার জন্য রবিবাবু যে প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রণালী আর কিছু আছে বলিয়া জানি না। আমরাও শিক্ষা ব্যবসায়ী; প্রথম শিক্ষার্থীগণকে বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়া যে কত কঠিন, ভুল শিক্ষা দেওয়া যে কত সহজ ও সেই ভুল শিক্ষার ফল যে কতদিন থাকে, তাহা আমরা কিছু কিছু জানি। ফার্স্ট বুক হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজি প্রথম শিক্ষা দিবার জন্য আমাদের দেশে যত পুস্তক আছে সবই এক ধাঁচে লেখা—প্রথমে এক syllableএর কথা, তাহার পরে দুই syllableএর কথা, এইরূপে পরে পরে সিঁড়িভাঙ্গার মত, যেন ছেলেদের যত গোল বড় syllableএর কথা লইয়া। কিন্তু যাহারা শিক্ষা লইয়া একটু, আট আশিট করিয়াছেন, তাহারা জানেন যে এটা সম্পূর্ণ



ভুল। বড় কথায় ছেলেদের মোটে আটকায় না; তাহাদের যত গোল হয় sentence লইয়া। একটি সম্পূর্ণ ভাব (complete idea) লইয়া sentence বা বাক্য। কিন্তু এই sentence বা বাক্যের গঠন লইয়াই ছেলেদের প্রথম বিপত্তি। যে ভাব বাঙলায় প্রকাশ করিতে sentenceএর একরূপ গঠন, ইংরাজিতে সেই ভাব প্রকাশ করিবার জন্য sentenceএর গঠন ঠিক অনারূপ। কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া, সকলেরই বাঙলা ও ইংরাজিতে সম্পূর্ণ স্থানভেদ। এই কারণে ইংরাজি শিখাইতে হইলে একেবারে sentence হইতে আরম্ভ করাই উচিত ও সহজ। রবিবাবু এই মূল সত্যটি হৃদয়গম্য করিয়া এইভাবে তাহার শিক্ষাপ্রণালী গঠিত করিয়াছেন।

### কাব্য ও কবিতা

এইবার রবিবাবুর নিজের লেখা সম্বন্ধে কথা উঠিল। তিনি বলিলেন—“পদ্য ও ছোট গল্প লেখা আমি, র শিলাইনদে শেষ করিয়া আসিয়াছি।” এ কথা বীরভূমের লোক। রবিবাবুর



পাইল। আমি বলিলাম—“তবে আমরা আপনার গদ্যকেই বড় বলিব, কবিতাকে বলিব না।”

তাহার কবিতার উপর কিসের প্রভাব বেশী, এই কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন—“ছেলেবেলা থেকেই মেঘ দেখে আমার বড় আনন্দ হ'ত। আকাশ ঘিরে মেঘ ছেয়ে এসেছে দেখে আনন্দে অধীর হয়ে পড়তাম। উষ্মস্তের মত বারান্দার এধার ওধার ছুটে বেড়াতাম—‘মেঘ এসেছে রে মেঘ এসেছে,’ এ উল্লাস আর ধরে না।” উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে যখন রবিবাবু মেঘ দর্শনে তাহার আনন্দের কথা বর্ণনা করিতেছিলেন, তখন প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী তাহার চিত্তের উপর করুণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, বিশ্ব প্রকৃতিকে তিনি কতদূর আপনার করিয়া ফেলিয়াছেন, বেশ বুঝিতে পারিলাম।

মেঘের কথা বলিতে বলিতে সোনার তরীর প্রথম দুই পংক্তি মনে আসিল,—

“গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা

কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।”

আমি বলিলাম—“আপনার সোনার তরীর নানারূপ অদ্ভুত ব্যাখ্যা হইয়াছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার জন্য লোকের এত মাথা ব্যথা কেন বুঝিতে পারি না।” রবিবাবু বলিলেন—“আমিও তাহাই বলি। একটা concrete picture (বাস্তব ছবি) হইতে ঐ কবিতার উৎপত্তি; উহাকে একটা concrete picture হিসাবে দেখায় আপত্তি কি? তবে উহার যে একটা অন্য ব্যাখ্যা অসম্ভব তা নয়। নিজের কবিতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অন্য



পাঠকের চেয়ে আমার বেশ পারদর্শিতা আছে, এমনতর সম্পর্ক আমি করি না। তবে আমার বোধ হয় যে, ‘সোনার তরী’র এমন একটা ব্যাখ্যা আছে যা কবিতার সঙ্গে বেশ মিলে যেতে পারে; কিন্তু কবিতা বুঝিবার পক্ষে তাহার কি প্রয়োজন?”

অন্তঃপর রবিবাবু ‘সোনার তরী’র একটা ব্যাখ্যার অভ্যাস দিলেন। আমার শব্দদ্বয় মনে আছে, সেটি এইরূপ—আমাদের যা কিছু কাব্য, যা কিছু চিন্তা, সমস্তই সংসার

আমাদের কাছে আদার করিয়া লয়, পৃথিবীর কার্য ও চিন্তা সমষ্টির সঙ্গে আমাদের কাজ ও চিন্তা এক হইয়া যায়; আমাদের ‘সোনার ধান’ সবই আমরা ‘তরী’তে তুলিয়া দিই। কিন্তু ইহাতেইত আমাদের আশা পরিত্যক্ত হয় না। আমরা চাই যে, আমাদের কাজের সঙ্গে আমরাও যেন সংসারের স্মৃতিতে চিরকাল বাঁচিয়া থাকি। কিন্তু তা ত হয় না। সংসার আমাদের কাজ লয় বটে, কিন্তু নিদয়ভাবে আমাদের প্রত্যাখ্যান করিয়া যায়ঃ—

“ঠাই নাই ঠাই নাই ছোট সে তরী  
আমারই সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।”

### গদ্য রচনা

কবিতার কথা ছাড়িয়া দিয়া গদ্যের কথা উঠিল। রবিবাবু তাহার গদ্য রচনার যে ইতিহাস দিলেন তাহা বড়ই কৌতুককর। তিনি বলিলেন—“আমার গদ্য রচনা প্রথমে শব্দ হয়, ‘ভুবনমোহিনী’ প্রতিভার প্রকাশ থেকে। শ্রীলোকের রচনা বলিয়া ‘ভুবনমোহিনী’



প্রতিভার বড় একটা নাম ডাক পড়িয়া যায়; অক্ষয়বাবু, ভূদেববাবু, প্রভৃতি উহার বিস্তার প্রশংসা করেন। আমার এক বন্ধু আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়—তিনি

একেবারে মুগ্ধ হয়ে পড়লেন, তিনি সেই অজ্ঞাত গ্রন্থকর্তাকে টাকা কাপড় প্রভৃতি উপঢৌকন পাঠাতে আরম্ভ করলেন।

তাকে কত বোঝাতেম, কিন্তু সে কি তা মানে? শেষে আমি ভাবলুম ‘রোসো, এক ফান্সি আঁটা যাক; আমি ভুবনমোহিনী প্রতিভার এমন এক সমালোচনা লিখব যে তার সব পদ্য মাটি করে দেব। আমি তখন জ্ঞানাকুরে কবিতা লিখি, আমার বয়স তখন খুব কম—মোটে তের কি চৌদ্দ বৎসর; কিন্তু লিখতাম একেবারে রাশ রাশ, সে সময় ‘জ্ঞানাকুরের’ সম্পাদক আমাদের বাড়ীতে এসে বসে থেকে কবিতা আদায় করে নিয়ে যেতেন। খুব বাড়িয়ে দিতেন: আর বলতেন, এ সুখ্যাতি করেছে, ও সুখ্যাতি করেছে,—সবই বোধ হয় কাল্পনিক; এই রকম করে একেবারে মাথাটি খাবার যোগাড়ে ছিলেন আর কি! সে যাহা হউক, আমি ভাবলাম সমালোচনা জ্ঞানাকুরে পাঠিয়ে দিলে নিশ্চয়ই বাঁচ হবে। খুব আড়ম্বর করে লিখতে বসে গেলাম। ‘পীতি কাব্য’ কাহাকে বলে, ‘খণ্ড কাব্য’ কাহাকে বলে, এই রকম করে দীর্ঘ ছন্দে প্রবন্ধের বৈধিনি আরম্ভ করে দিলাম। অনেক দূর এগিয়ে বড়

সন্দেহ হল যেটা লিখছি সেটা গদ্য কিনা। কিন্তু তখন সন্দেহ করে আর বড় লাভ নাই। কোন রকম করে শেষ করে দিলাম; অত্যাশ্রিত নড়বড়ে গোছের যা হয় কিছু একটা হল। সেইটাই 'জ্ঞানাকুরে' পাঠিয়ে দিলাম, যথা সময়ে বার হল। বন্ধু প্র— তা পড়ে মহা চটে গেলেন। তিনি বলেন—“হী ‘জ্ঞানাকুরে’ ‘ভুবনমোহিনী প্রতিভা’র সমালোচনা করেছে, আচ্ছা একজন বি এ-এর প্রতিবাদ ক'রবে।” আমার বড় ভয় হল। তখন বি এ টি এ দেরে একটা অসাধারণ কিছু মনে করতাম। জ্ঞানাকুরের প্রবন্ধের কথা আর মোটে পাড়তুম না। যা হক সে বিপদটা ভাগ্যে ভাগ্যে কেটে গেল। জ্ঞানাকুরের প্রবন্ধের আর কোন প্রতিবাদ বার হল না; আমারও প্রথম রচনা সমালোচনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল।”

### ছোট গল্প

ছোট গল্প রচনার প্রসঙ্গে রবিবাবু বলিলেন—“আমি প্রথমে কেবল কবিতাই লিখতুম, গল্পে টপ্পে বড় হাত দিই নাই। মাঝে একদিন বাবা ডেকে বলেন—তোমাকে



জ ম দা রি র বি ষ য় ক র্ম দেখতে হবে। আমি ত অবাক; আমি কবি মানুষ পদ্য ট্যা লিখি, আমি এ সবার কি বুঝি? কিন্তু বাবা বলেন—‘তা হবে না; তোমাকে একাজ করতে হবে।’ কি করি? বাবার হুকুম, কাজেই বেরোতে হ'ল। এই জমিদারি দেখা উপলক্ষে নানা রকমের লোকের সঙ্গে মেশার সুযোগ হয় এবং এই থেকেই আমার গল্প লেখারও শুরুর হয়।

এই কথা প্রসঙ্গে রবিবাবু তাঁহার দুই একটি গল্প রচনার ক্ষুদ্র ইতিহাস দিলেন। কোনও না কোনও বাস্তব ঘটনা বা বাস্তব চিত্র হইতে তাঁহার অনেক গল্পেরই উৎপত্তি। পাঠকের বোধ হয় সম্যাস্তর কথা মনে থাকিবে, সম্যাস্তর ইতিহাস রবিবাবু এইরূপ বলিলেন—“আমি একবার জমিদারি দেখা উপলক্ষে একটি নদীর তীরে নৌকা লাগিয়েছি। নৌকায় বসে কোন রকম কায করি। এমন সময়ে দেখলুম একটি মেয়ে—বড় মেয়ে—হিন্দুর ঘরে অভ বড় মেয়ে অবিবাহিত প্রায়ই দেখা যায় না—নদীর তীর থেকে আমার নৌকার দিকে দেখতে। সে তখনই চলে গিয়ে আবার ফস করে একটি ছেলে কোলে ঘিরে এল, এসে নৌকার এদিক ওদিক দেখতে লাগল। নৌকার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভিতরে দেখতে লাগল। তার সমস্ত সজ্জা

দৃষ্টি, চলা ফেরার মধ্যে একটা সহজ স্ফুর্তির ভাব দেখে আমার বড় ভাল বোধ হল। বাঙালী মেয়েদের মধ্যে সে রকম ভাব আমি প্রায়ই দেখি নাই। আমার মেয়েটিকে ডেকে দু একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু আবার কি ভেবে পাল্লুম না। সে দিন ত গেল। তার পরের দিন দেখি আমার পাশের একটি



নৌকায় চাল, ডাল, বাসন, কোসন প্রভৃতি ঘরকন্নার জিনিস বোঝাই হচ্ছে; যেন কোন মেয়ে স্বশুর বাড়ী যাবে। খানিক পরে দেখি ঠিক কালকের সেই মেয়েটিকে কনে সাজিয়ে অনেকে মিলে নৌকার দিকে নিয়ে আসচে। সে কিছুতেই নৌকায় উঠবে না, আর ভাগাও জোর ক'রে তাকে তুলে দেবে। সচরাচর মেয়ে-টোয়ে পাঠাবার সময় যে কান্নাকাটির ভাব দেখি, এক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ অভাব দেখলুম। কান্নাকাটির কথা দূরে থাকুক, অনেকেই বেশ স্ফুর্তি ও আমোদ কচ্ছে। কেবল একটি মেয়ে, বড় মেয়ে সে তার মায়ের কোলে চড়ে আছে, তার লম্বা লম্বা পা দুখানা ঝুলে পড়েছে—সেই মায়ের ঘাড়ে মুখ লুটিয়ে নীরবে ফুলে ফুলে কাঁদচে। তারপরে পাশের নৌকা ছেড়ে দিলে, তাঁর নদীতীরের স্ত্রীলোকেরাও চলে গেলেন। আমি কেবল দূর থেকে শুনলুম একটি মেয়ে মানুষ আর একজনকে বলছেন—ওকে ত জান বোন ও ঐ রকমই। কত ক'রে বললাম, পরের ঘর করতে থাকিস, বেশ সাবধানে থাকিস, ঘাড় হেঁট করে থাকিস, উঁচু ক'রে কথা বলিস নে; কিন্তু সে কি তা পারবে, ইত্যাদি—এই ঘটনাই আমার ‘সম্যাস্ত’ রচনার ভিত্তি।”

“ছুটী” ও “ছুটী” ফটিকচাঁদকে অনেকের মনে পড়িবে। উহার ইতিহাস খানিকটা এই



রকম। রবিবাবু বলিলেন—“আর একবার ওই রকম ভিড়িয়েছি। নদীর তীরে গ্রামের অনেক ছেলে খেলা করতে এসেচে—প্রায় চৌদ্দ পনের জন। তার মধ্যে একটি ছেলেই সর্দার; আর সকলে নিরীহ বোচারীর মত তার অনুসরণ করছে। বামনের ছেলে, বছর তের বয়স, স্ফুর্তি ও সজীবতার অবতার। কোমরে পৈতে বেঁধে সকলের আগে আগে হৈ হৈ করতে করতে যাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে ‘তারে নারে না’ বলে গান ধরে। তার প্রধান আমোদ হচ্ছে এ নৌকা ও নৌকা করে বেড়ান, মাঝিদের কাজ দেখা, মাশতুলের পাল গটানো দেখা

ইত্যাদি। তাঁরে অনেকগুলি গুড়ি কাঠ গাদা করা ছিল। মাঝে ছেলেটি তড়াক করে নৌকা থেকে নেমে এই কাঠগুলি গাড়িয়ে গাড়িয়ে নদীতে ফেলতে আরম্ভ করলে। কিন্তু তার আমোদের পথে একটি বিষয় এসে উপস্থিত হল। একটি ছোট মেয়ে এসে একটি গুড়ি চেপে বসল। ছেলেটি তাকে উঠাবার কড় চেষ্টা করলে, কিন্তু মেয়েটি তা গ্রাহ্যও করলেন না। সে বেশ Philosopher-এর মত গম্ভীর ভাবে গুড়ি দখল করে বসে আছে। তখন ছেলেটি তাকে শব্দশই গুড়িটি উত্তে দিলে। মেয়েটি পড়ে গিয়ে বিকট কান্না জুড়ে দিলে, এবং কাঁদতে কাঁদতে উঠেই ছেলেটিকে কসে এক চড় লাগালে। এই ঘটনা থেকেই ‘ছুটী’ শব্দ।”

### বিদেশী সাহিত্য

দেশীয় সাহিত্যের কথা হইতে বিদেশী সাহিত্যের প্রসঙ্গ উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা



করিলাম—“ইংরাজ কবিদিগের মধ্যে আপনার সর্বাপেক্ষা প্রিয় কে?” রবিবাবু একটু ইতস্তত করিয়া উত্তর করিলেন—“Keats”।

তিনি আরও বলিলেন—“ভাব ও ভাবার সংমিশ্রণে Keats-এর Ode to Autumn, Ode to Grecian Urn প্রভৃতি ছোট ছোট কবিতা এক অপূর্ব পদার্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে। Ode to Autumn-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিলেন শ্রীমান আমা বাবু আনন্দ হইল। কারণ অধ্যাপনা প্রসঙ্গে ছাত্রগণের নিকট আমি অনেকবার উক্ত কবিতার ভূরসী প্রশংসা করিয়াছি, এবং উহাকে perfect specimen of poetry—কবিত্বের নিদর্শন—বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। আমি Browning-এর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—“Browning ত বড় বটেনই। কেমন শক্তি ও কোমলতার সমাবেশ; আবার মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে কত তীক্ষ্ণ অস্তদৃষ্টি, আবার Browning-এর যে শব্দ বিশ্লেষণের ক্ষমতা আছে তা নয়, constructive power—গড়ে তুলবার ক্ষমতাও—যথেষ্ট।”

ছোট গল্প, উপন্যাস প্রভৃতির কথায় আমি বলিলাম—“এসব সম্বন্ধে ইংরাজ গ্রন্থকারের চেয়ে আমেরিকান গ্রন্থকারের সঙ্গে আপনার বেশী তুলনা চলে। আপনার ছোট গল্প পড়িলে রেট হার্টের কথা মনে হয়, উপন্যাস পড়িলে ন্যাথানিয়েল হথর্নের কথা মনে হয়।” রবিবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—“আমি ত ঠিক বলতে পারি তবে হতে পারে।” কিছু পরে নিজেই হঠাৎ কণ্ঠ পনেরূপে



করিয়া বলিলেন—“কিন্তু হৃদয়ের বইতে কি intensity of atmosphere—কেমন একটা গাঢ় জমাট ভাব আছে। “Scarlet Letter”এ সেই মেয়েটির পোষাকে যে ‘A’ লেখা ছিল, পড়তে পড়তে সেটা যেন আগুনের অক্ষরের মত মনে হয়।”

জর্জ ইলিয়ট ও তাঁহার রচনাভঙ্গীর প্রসঙ্গে রবিবাবু বলিলেন—এককালে জর্জ ইলিয়ট আমার খুব Favourite ছিলেন। তাঁহার কেমন একটা স্নিগ্ধ বিবেচনাইন কৌতুকপ্রিয়তা আছে, যা আমার বড় ভাল লাগে। জর্জ ইলিয়টের চরিত্র চিত্রণ বড় sympathetic। অন্যান্য ইংরাজ উপন্যাসিকের কথায় বলিলেন—“স্কট খুব ভাল লাগে, কিন্তু



ডিকেন্স আর তত ভাল লাগে না। কিছুদিন আগে ডিকেন্সের Old Curiosity Shop পড়ছিলাম; অনেক জায়গায় কেমন ছেলেমানুষী বোধ হচ্ছিল, প্রতিভাশালী লোকের লেখা বলে মনে হচ্ছিল না।” ফরাসী উপন্যাসিক ভিক্টর হুগোর কথায় বলিলেন—“বিলেত থেকে যখন ফিরে আসি তখন পথে মাসগিহিতে দুর্দিন আটকে পড়েছিলাম। সেইখানে Notre Dame শেষ করি। কি রকম জোরের লেখা! ভিক্টর হুগোর কি গভীর জ্ঞান! আর কিরূপ অশ্রুত সংগ্রহ! বিস্মিত হতে হয়। কিন্তু অনেক সময়—পাঠককে অভিভূত করে ফেলে। আর মাঝে মাঝে মনে হয় artificial—একটু কৃত্রিম। বেশ পড়ে যাচ্ছি; কিন্তু পড়তে পড়তে এমন যায়গা আসে যখন মনে হয় ‘এই আসছেন,

এইবার ভিক্টর হুগো এসেছেন, এই তিনি কথা সাজিয়ে সাজিয়ে, phrase মিলিয়ে এসেন।’ এমন কৌতুককর করিয়া শেষ করেকাটি কথা বলিলেন, যে আমরা ঘরশুদ্ধ লোক হাসিয়া অস্থির।

হুগোর পর রুশীয় উপন্যাসিক টলস্টয়ের (Tolstoy) কথা উঠিল। রবিবাবু বলিলেন—“আমি টলস্টয়ের বেশী কিছু পড়ি নাই; তবে রান্না করেবিনা (Anna Karenina) পড়েছি। আমার কেমন repulsive—অত্যন্ত বিরক্তিজনক বলে মনে হয়। বোধ হয়, এর কারণ এই যে, আমার ও টলস্টয়ের উপন্যাস রচনা প্রণালীর মধ্যে সাদৃশ্য আছে।”

ইহার পর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মোটের উপর কি কি বই তাঁর সবচেয়ে ভাল লাগে। রবিবাবু একটু থামিয়া উত্তর করিলেন—রান্নাটোল ফ্রান্সের (Anatole France), The Crime of Sylvestre Bonnard, আর হাডসনের ‘The Naturalist in Lapland’। রবিবাবু বলিলেন—“তাঁর বইটিতে কেবল একটিমাত্র চিত্র—একজন প্রফেসর; কিন্তু এই একটি চিত্র অস্পষ্ট অস্পষ্ট এমন সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে, আশ্চর্য হতে হয়। বড়ো প্রফেসর তাঁর oddity, eccentricity, তাঁর ছোটখাট অভ্যাসগুলি, কেমন স্নিগ্ধ সরস কৌতুক, আর কত সহানুভূতির সঙ্গে যে সেগুলি ছোঁয়া হয়েছে তা বলা যায় না। বইখানি পাঠককে অভিভূত করে ফেলে না আস্তে আস্তে তাঁর ভিতরে ঢুকে যায়, তাঁর নিজস্ব হ’য়ে পড়ে।” হাডসন একজন আমেরিকান লেখক। তাঁহার সম্বন্ধে রবিবাবু বলিলেন—“প্রকৃতিকে এমন আপনার করে দেখতে কোন ইংরাজ লেখক পারেন না। আমার হাডসনের

বই পড়ে যেন ঈর্ষা হয়। কেমন সারাদিন prairieর লম্বা ঘাসের উপর শুয়ে আছেন, আর চারিদিকের গাছপালা, পশু পাখী, তাদের সঙ্গে যেন এক হ’য়ে গেছেন, একেবারে মিশে গিয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ করছেন। হাডসন বৈজ্ঞানিক, কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের প্রকৃতির observationএর মধ্যে কেমন একটা নিদয় ভাব রয়েছে; তা হাডসনের মোটে নাই। আবার কবিরা প্রকৃতিকে দেখেন কেবল তাঁদের poetryর mediumএর মত—তাঁদের কাব্য সৌন্দর্য বিকাশের আধারের মত, হাডসনের

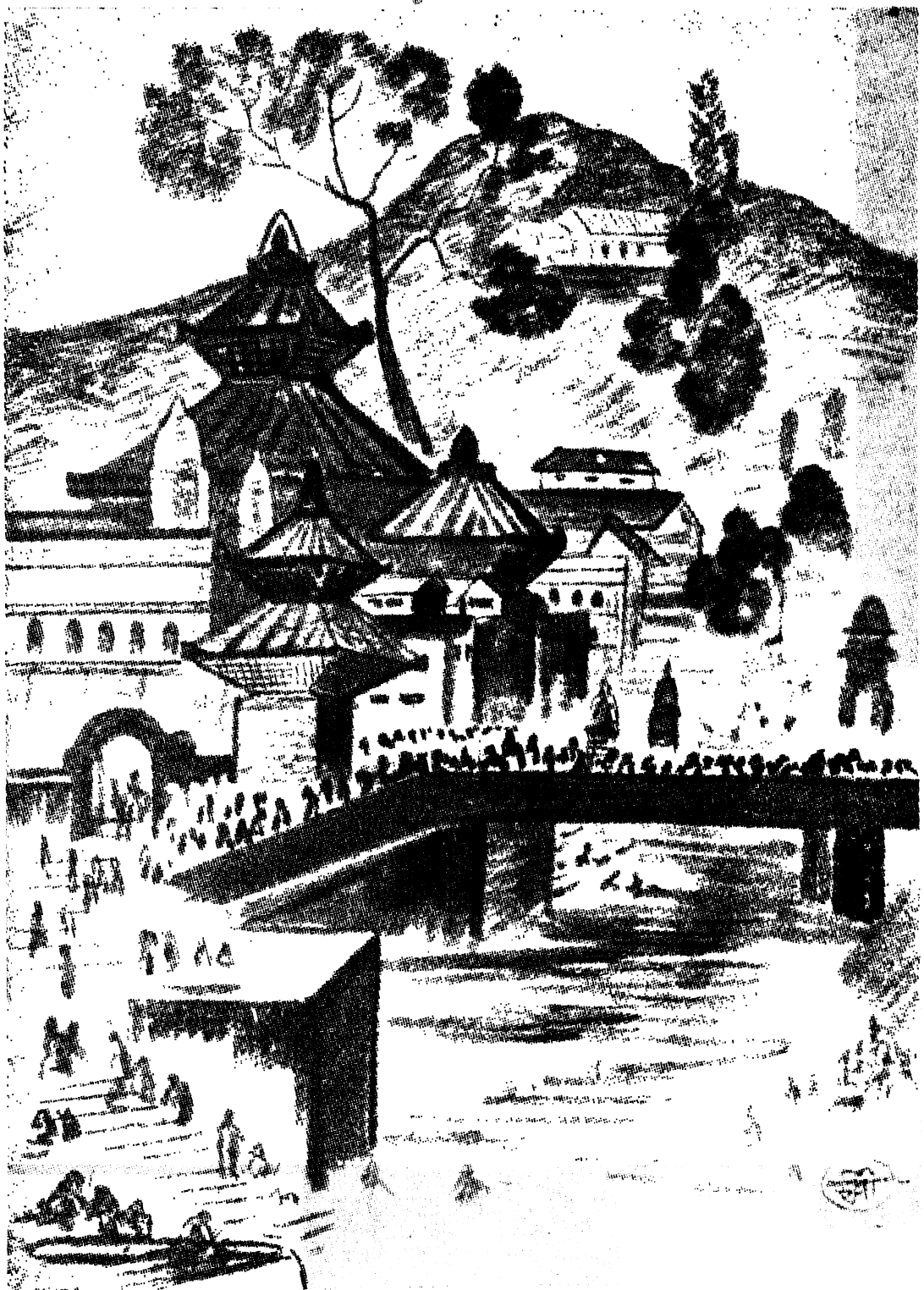


তাও নাই। তিনি যেন নিতান্তই প্রকৃতির আপনার জন। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে এমন ঘরোয়া হইয়াও হাডসন তাহার মধ্যে যে কবিধ্ব (Romance) দেখেন তা আশ্চর্য। ঐ ধরনের আর একখানি বই মেটারলিংকের (Maeterlink) “বি” (Bee)। মেটারলিংক যে কেবল মোমাছিকে বাহিরের থেকে দেখেছেন তা নয়, যেন একেবারে মোমাছির ভিতরে প্রবেশ করেছেন। মোমাছির ছোট বড় সুখ দুঃখ, তাদের জীবনের প্রতিদিনের ঘটনা, মেটারলিংক যেন সব দেখতে পাচ্ছেন, অনুভব করতে পাচ্ছেন। বাস্তবিক কবি ও বৈজ্ঞানিকের একত্রে এমন অপূর্ব সমাবেশ হাডসন ও মেটারলিংক যেমন দেখি, এমন আর কোথাও নয়।”

১৩১৬ সালে রবীন্দ্রনাথের সহিত শান্তিনিকেতনে সাক্ষাতের পর অধ্যাপক জিৎমল্ল বন্দ্যোপাধ্যায় ‘সুপ্রভাত’ পত্রে “শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ” নামে যে প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক জ্যতব্য তথ্য ও আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এই আলোচনার কোনো কোনো বিষয় অবশ্য রবীন্দ্রনাথ পরে ‘জীবনস্মৃতি’ ও অন্যত্র লিখিয়া-

ছেন, তবে অনেক বিষয় অন্যান্য আর লিপিবদ্ধ হয় নাই। ‘সুপ্রভাত’ বর্তমানে সহজপ্রাপ্য নহে বলিয়া প্রবন্ধটির সার-সংকলন আমরা প্রকাশ করিলাম। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে প্রথম মূদ্রিত গদ্যরচনা (‘জ্ঞানাকুর ও প্রতিবন্দ্ব’, ১২৮০ কার্তিক) সম্বন্ধে আলোচনা আছে, তাহা আমরা এই সংখ্যার অন্যত্র মূদ্রিত করিয়াছি।

—সম্পাদক, দেশ]



পদ্মপতি নাথ

শিল্পী—শ্রীবিনায়ক মাসোজ

লেখা প্রকাশ করতে শুরুর করে শরৎচন্দ্রকে অনেক বছর অপেক্ষা করে থাকতে হয়নি, অচিরে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তাঁর রচনা বাঙলা পাঠক পাঠিকা সমাজে হঠাৎ এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়ে দিয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠালাভের কাজে কোন অশ্ব স্তাবকদের প্রচারের প্রয়োজন হয়নি, কোন সঙ্কল্পদর্শী, সাহিত্য বিচারকগোষ্ঠীর সাহায্যেরও বিশেষ দরকার হয় নি। সেযুগে শরৎচন্দ্রের এই আশাতীত প্রতিষ্ঠার কারণ সম্বন্ধে নানালোকে নানা মত প্রকাশ করে গেছেন। কেউ বলেছেন, শরৎচন্দ্র বস্তুতান্ত্রিক লেখক, তাঁর নতুন দৃষ্টিভঙ্গি বাঙালীর হৃদয় জয় করেছে। নীতি-বাগীশ কেউ কেউ মন্তব্য করেছিলেন, সাহিত্যে দুনীতির প্রশ্রয় দিয়ে তিনি সস্তায় নাম কিনেছেন। কেউবা তাকে একজন প্রকাণ্ড সমাজসংস্কারক বলে প্রশংসায় পণ্ডমুখ হয়ে উঠেছিলেন। শরৎচন্দ্র কিন্তু সমাজসংস্কারের লক্ষ্য নিয়ে সাহিত্যরচনায় প্রবৃত্ত হন নি, হলে তাঁর রচনা এমন রসঘন হয়ে উঠতে পারত না—বড় জোর তাঁর গ্রন্থাবলী দিয়ে সৃষ্টি হত একটি ‘মনসংহিতা’। শরৎচন্দ্র বাঙলা সাহিত্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এনেছেন বলে কিন্তু তা বস্তুতান্ত্রিকের দৃষ্টিভঙ্গি নয়। লেখক হিসাবে তিনি ছিলেন বরং একজন কঠোর আদর্শবাদী। আর দুনীতির অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা না করাই ভাল। আজকাল কোন কোন আধুনিক সাহিত্যরসিক ত বসতে শুরুর করেছেন, শরৎচন্দ্রের প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে, তিনি অত্যন্ত দুনীতিবাগীশ ছিলেন।

শরৎচন্দ্রের অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠার একটি মূল কারণ সম্বন্ধে আমরা এই প্রবন্ধে আলোচনা করব। সে কারণটি কোন কৈব ঘটনা নয়—নানা ওঠানামার ঘাতপ্রতিঘাতে সমৃদ্ধ জীবনে তিনি নিজের মধ্যে বিকশিত করে তুলেছিলেন অসামান্য কথাশিল্পের প্রতিভা।

গল্পবলার শিল্পই গল্প লেখকের শ্রেষ্ঠত্বের চরম মাপকাঠি। পৃথিবীর সাহিত্য-ইতিহাসে গল্প বলার উপাদান যুগে যুগে বদলেছে। “আরবারজনী”র অতি-অদ্ভুত ঘটনা সমাবেশ আর এখনকার উপন্যাসের প্লটের প্রধান উপকরণ নয়। কিন্তু গল্পলেখকের শিল্পের প্রকৃতি মূলতঃ একটুও বদলায় নি। আরবারজনীর লেখকের সাফল্যের মূলে যে গুণ ছিল, আধুনিক শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীদের প্রতিষ্ঠার মূলেও দেখা যায় সেই একই গুণ। আজ আর অবশ্য সেই কাহিনী নেই, সেই নরনারীও নেই কিন্তু তাদের সৃষ্টির প্রধান

উপাদান হচ্ছে লেখকের প্রতিভার সেই পুরাতন মোহিনী মায়াজাল। প্লটের মধ্যে যিনি হত বেশি বাস্তবের মায়াজাল (Illusion of Reality) সৃষ্টি করতে পারেন, কথাশিল্পীর দিক থেকে তিনি তত বড় লেখক। এই মায়াজালের প্রধান কথা হচ্ছে বাস্তবকে সুনিপুণভাবে বর্ণনা করা নয়,—তা যেকোন শক্তিশালী সংবাদলেখকের ধর্ম। এর প্রধান কর্তব্য হচ্ছে সুনিপুণভাবে বাস্তববৎ-এর সৃষ্টি করা। সংবাদলেখক এবং গল্পলেখকের মধ্যে তফাৎ এই যে একজন বর্ণনা করেন, আর একজন সৃষ্টি করেন। ভাষার ঐশ্বর্য উপাদান দিয়ে বাস্তবকে সৃষ্টি করা যায় না—বর্ণনা করা যায়, কিন্তু বাস্তববৎকে সৃষ্টি করা যায়। বাস্তব জীবনে ঘটে, বাস্তববৎ শিল্পে সৃষ্টি হয়। আরবারজনীর যুগে সেকালের পাঠক বা শ্রোতার লেখকদের গল্প শুনে শুনে তাদের প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শে কাহিনীকে সত্যের মত বিশ্বাস করত। বিশ্বাস করতে পারত বলেই এসব কাহিনী তাদের এত আদরের ছিল। সেই সব কাহিনীর মধ্যে অনেক অবাস্তব উপাদান আছে সত্য। আমাদের এ যুগের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীদের উপন্যাস গল্পেও অনেক অবাস্তবতা আছে কারণ লেখক বস্তুতান্ত্রিক হোন বা না হোন, সকলেরই সৃষ্টির মূলে আছে কল্পবিশি অভিজ্ঞতা, কল্পনা এবং ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত জীবনের আদর্শবাদিতা। নিছক অভিজ্ঞতার উপাদান নিয়ে কোন সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। আমাদের সব চেয়ে আদরের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যেও আছে অবাস্তব ঘটনা এবং চরিত্র, তবু আমরা সেইসব কাহিনী পড়তে পড়তে এই বিশ্বাস করি যে তা যেন নিত্যন্ত আমাদের চারপাশে আছে। এই বিশ্বাস জাগিয়ে তোলে লেখকের প্রতিভার মধ্যে আছে যে মায়াজাল সৃষ্টি করার শক্তি। এই শক্তির তারতম্য নিয়েই কথাশিল্পীর শ্রেষ্ঠত্বের বিচার হয়। এই শক্তির দিক থেকে শরৎচন্দ্রকে বলা যায় বাঙলা দেশের সব চেয়ে বড় কথাশিল্পী। তিনি তাঁর রচনায় অপূর্ব বাস্তবের মায়াজাল সৃষ্টি করে গেছেন। বাঙলা সাহিত্যে আর কোন প্রতিভা এমন করে তাঁর কল্পনার নরনারীকে আমাদের চোখের সামনে জীবনের খেলা অভিনয় করাতে পারেন নি। তাদের দুঃখ ও বেদনার কাহিনী পড়তে পড়তে মনে হয় তা যেন নিত্যন্ত আমাদেরই একান্ত গোপন ব্যথার কথা। তাদের আনন্দ ও সুখ দেখে আমরা ভুল করি, আমাদেরই বাস্তব

জীবনের পক্ষে দুর্লভ আনন্দ ও সুখের মধ্যে ব্যর্থ ভুবে রয়েছি। শরৎচন্দ্রের মানস ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমরা এমন একাধা হয়ে যাই যে বোধ হয় যেন এ আমাদেরই চির-পুরাতন রূপের এক অপরূপ প্রতিচ্ছবি দেখছি। কথাশিল্পীর মোহিনী মায়ায় অভিভূত এই বিস্মিত বিশ্বাস বোধের কথাই একজন সাহিত্য বিচারকের উচ্ছ্বাসের মধ্যে অজানিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। “আমাদের সমাজ ও পারিবারিক জীবনের সুখদুঃখের মধ্যে এত ঘেরস, এত মাধুর্য তাহা কে কবে জানিত এমন রসানুভূতির দৃষ্টি লইয়া আমরা কে কবে আমাদের জীবনের দিকে তাকাইয়াছিলাম? আমাদের সমাজ ও পরিবারের সঙ্গে ও আমাদের চিরকালের পরিচয়, তাহার সুখদুঃখ ত আমরা প্রতিদিন ভোগ করি—কিন্তু তাহার মধ্যে এমন নিবিড় রসানুভূতির সঞ্চার যে সম্ভব, সুখ ও দুঃখ মাধুর্যের বিচিത്ര্য যে এত বেশি তাহা কি আমরা ভাল করিয়া জানিতাম, না, আমাদের মনের অনুভূতির অলিগলি যে এত সূক্ষ্ম ও জটিল সে সম্বন্ধে আমাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল! আমাদের মনো-রাজ্যের অতি সহজ অনুভূতিগুলিকে হৃদয়-বেগের তরঙ্গে এমন করিয়া কেহ উদ্বেলিত করিয়াছে কি, আমাদের চিত্তবৃত্তিকে এমন সহজ ও স্বাভাবিক সুপরিচিত সুখেদুঃখে এমন বিচিত্র দোলায় কেহ আন্দোলিত করিয়াছে কি?”

এই অপরূপ সৃষ্টিশক্তির মোহন স্পর্শের জন্য আজ থেকে শতবর্ষ পরে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস বাঙালীর আদরের হয়ে থাকবে। হয়ত আজকে আমরা তার মা সামাজিক সমস্যার পটভূমি দেখে বেদনা আনন্দ লাভের মধ্যে দিয়ে সমাজ দৃষ্টা সচেতন হয়ে উঠি, কালের পরিবর্তনে চোখের মানুষদের মনে সে রকম কোন সজাগবে না। আজ আমরা এই রচনাকুলির মধ্যে জীবনের যে একটি বিশেষ রূপ দিকে আকৃষ্ট হই, হয়ত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের জন্য তারা এর মধ্যে সেই বিরাট বাদ দিয়ে জীবনের অন্য রূপের সাপাবে। কিন্তু মনে হয়, শরৎচন্দ্রের বৈগুণ্য পড়ে আমরা যে গভীর পরিচয় পাই, শতাব্দীর ব্যবধান সত্ত্বেও সেকারসিকজনেরা তেমন রসানন্দ লাভ করা এদিক থেকে শরৎচন্দ্রের আসন বসাহিত্যের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

# যাত্রিদল

## শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

### একাদশ অধ্যায়

‘প্রজন ভান’ জেল গেটে আসিয়া থামিলে তাহাদিগকে নামাইয়া পুনরায় সারবন্দী করিয়া দাঁড় করান হইল। অসিত জেলের দিকে তাকাইতেই তাহার চোখে পড়িল গেটের উপর ইংরাজীতে লেখা আছে—“পোর্টার্সের সেলুলার জেল”। জেলার কেরী সাহেব খাটী ইংরাজ। জেল অফিস হইতে বাহির হইয়া একেবারে অসিতদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। খানিকক্ষণ তাহাদের ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া নিম্নলিখিতভাবে সম্ভাষণ আরম্ভ করিলেন—“দেখো, সব ঠিকসে চলে—এ ইন্ডিয়া নেহি—বাঙলা মল্লুক নেহি—সমঝকে চলে—নেহিতো হাম সবকই ঠিক করকে দেগো।” অসিতেরা চুপ করিয়া নতুন দেশের প্রথম সম্ভাষণ গ্রহণ করিল। তারপর তাহাদিগকে গেটের ভিতরে লইয়া আসিয়া খানাতল্লাসী করা হইল। অসিতের কাপড়ের এক পাশে গিট দিয়া কি বেন বাঁধা ছিল—জমাদার গিট খুলিয়া ফেলিলে খানিকটা ধূলা বালি বাহির হইয়া পড়িল। কয়েকবার পরীক্ষা করিয়া সেই ধূলা বালি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল—“আরে মাটি কাঁহে বধকে লে আয়া?” গংগার ধারে পারের তলা হইতে যে মাটি অসিত মূঢ়া ভরিয়া তুলিয়া নিজের বকে চাপিয়া ধরিয়াছিল—তাহাই আচলের এক পাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। সে এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ সেই ধূলা বালির দিকে তাকাইয়া রহিল—ভারতবর্ষের মাটি—বাঙলা দেশের মাটি—তাহার মাটিমা—জন্মভূমির শেষ চিহ্ন! অসিতের দুই চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল।

তারপর তাহাদিগকে জেলের ভিতরে লইয়া আসা হইল এবং কিছুক্ষণ একটি সেডের মধ্যে বসাইয়া রাখিয়া স্নান করাইতে লইয়া গেল। কয়েক বাট করিয়া নোনা জল গায়ে ঢালিয়া তাহারা কোনপ্রকারে স্নান সারিয়া লইল। আহারের পরে সাত নম্বর ওয়ার্ডের দোতলায় প্রত্যেককে এক একটি সেলে বন্ধ করিয়া রাখা হইল। অসিত নিজের সেলের দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া সমস্ত জেলটি দেখিয়া লইতেছিল। জেলের দেয়াল ঠিক বস্তাকারে চারি পাশে ঘিরিয়া আছে। সেই বস্তুর মাঝখানে একটি গম্বুজ আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে

এবং ইহারই চারিদিকে আড়াআড়িভাবে কতকগুলি বড় বড় অট্টালিকা দাঁড়াইয়া আছে। অট্টালিকাগুলির প্রত্যেকটি তেতাল। প্রত্যেকটি অট্টালিকার সহিত টাওয়ারটি কাঠের পাটাতন দিয়া যুক্ত এবং ইহাই পথ—অট্টালিকা হইতে বাহিরে যাইতে হইলে বা বাহির হইতে ভিতরে ঢুকিতে হইলে ইহা ছাড়া অন্য পথ নাই। প্রতিটি অট্টালিকা এক একটি ওয়ার্ড—এবং প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের সম্মুখে এক একটি “ওয়ার্কশপ”। কিছুক্ষণ বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিবার পর অসিত নিজের ঘরের দিকে তাকাইয়া দেখিল। তাহার সেলের মাঝখানে একটি তক্তা এবং তাহারই উপর দুইখানা কম্বল পড়িয়া আছে।—অসিত বুঝিল ইহাই তাহার শয্যা। সে এই শয্যায় নির্বিকারভাবে তাহার শ্রান্তদেহ এলাইয়া দিল। বেলা গড়াইয়া গেলে সেলের দরজা খুলিবার শব্দে তাহার তন্দ্রা ভাঙিল। পুনরায় তাহাদের বারজনকে নীচে নামাইয়া লইয়া আসিয়া ওয়ার্ডের সম্মুখে ফাইল করিয়া বসাইয়া রাখা হইল। তারপর থালায় করিয়া খাবার এবং বাটিতে ‘মিঠা পানি’ দিয়া গেল। তাহারা আহারান্তে থালা-বাটি ধুইয়া আবার ফাইল হইয়া বসিল। পুনরায় আর একদফা সকলকে ‘নাচ’ করা হইল। ইতিমধ্যে জেলার কেরী সাহেব আসিয়া চেয়ার পাতিয়া তাহাদের সম্মুখে বসিয়া ‘মিট’ ‘মিট’ করিয়া তাহাদের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। বার পাঁচ সাত সকলকে ‘সরকার সেলাম’ করাইয়া পুনরায় যাহার যাহার সেলে লইয়া রাত্রের মত বন্ধ করিয়া রাখা হইল। অসিত নিজের সেলের দরজার সম্মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই—পশ্চিম দিগন্তের সূর্য তখনও হয়তো শেষ রশ্মিটুকু পৃথিবীর উপরে নিঃশেষে ঢালিয়া দিতেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা তরল কুয়াশার আবরণ সারা আকাশময় ছড়াইয়া গেল। শব্দ্রপঙ্খের চাঁদ ইতিপূর্বেই আকাশে উঠিয়াছিল—তাহারই এক ফালি জ্যোৎস্না কেমন করিয়া যেন অসিতের ঘরের মধ্যেও আসিয়া পড়িল। দেওয়ালের ওপাশে ক্রমশঃ উঁচু হইয়া পাহাড় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহারই গায়ে গায়ে টিন ও টালির অসংখ্য সেড। এই সমস্ত সেডে বাহিরের

কয়েদীরা বসবাস করে। এই সমস্ত বস্তু হইতে দুই চারিটি আলো মাঝে মাঝে টিম টিম করিতেছে। আশ্চর্য এই দেশ—ইহার কি জেলের ভিতরে কি বাহিরে সর্বত্রই কয়েদীর বাস—যাহারা এখানে জন্মিয়াছে, তাহারাও কয়েদীরই বংশধর। অসিতের পিছনের জানালাটি দিয়া তাকাইলে সমুদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রের ভিতরে দুই একখানা লগ্ন ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—তাহারই উজ্জ্বল আলোয় সমুদ্রের জল ঝিক-ঝিক করিয়া উঠিতেছে। সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা তাহার নিজের শত-সহস্র ছবি মনের মধ্যে একের পর এক ফুটিয়া উঠিতে ও মিলাইতে লাগিল। মাত্র পাঁচদিনের মধ্যে সে নিজের দেশ ছাড়িয়া এই আট শ’ মাইল দূরে কোন এক অদ্ভুত দেশে আসিয়া পড়িল। এ দেশ কি বাঙলা দেশেরই মত! ইহারও কি মাঠে মাঠে তেমন করিয়া সবুজ ধানের উপরে ডেউ তুলিয়া পাগলা হাওয়া নাচিয়া বেড়ায়! দোয়েল কোকিল থাকিয়া থাকিয়া সময়-অসময় তেমন করিয়া গান গাইয়া উঠে! মাঠে মাঠে বাঙলা দেশের মত পালে পালে গম্ভীর চারিয়া বেড়ায়? ঘরে ঘরে তেমন করিয়া “বৃকভরা মধু” লইয়া এদেশের না বোন অপেক্ষা করে! জেলের ঘণ্টায় ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিল। সহসা অসিতের মন একেবারে কলিকাতার নিজের বাসায় এক-মুহূর্তে উড়িয়া গেল। সেখানে আছে অঞ্জুমণি, সেখানে আছে কলাপাণী—সেখানে আছে তাহার দাদা। অঞ্জুমণি হয়তো এতক্ষণ তাহার জ্যাঠামণির কোলের ভিতরে শুইয়া আছে—তিনি ধীরে ধীরে তাহাকে গল্প বলিয়া যাইতেছেন। অঞ্জু এক একবার তাহার কোল হইতে মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়া এক একটি বোয়ড়া প্রশ্ন করিয়া তাহাকে বিবৃত করিয়া দিতেছে। জ্যাঠামণি তাহার তেপান্তরের রাজপুত্রের গল্প বলিতেছেন। যে রাজপুত্র নিজের দেশ ছাড়িয়া, আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া কোন এক নিরুদ্দেশের দেশে চলিয়া গিয়াছিল। হয়তো অঞ্জু মাথা তুলিয়া প্রশ্ন করিল—হ্যাঁ, জ্যাঠামণি, বাবা কি তবে সেই তেপান্তরের দেশেই গেছে? জ্যাঠামণি তাহার সহসা কোন জবাব দিতে পারিলেন না—তাহার দুই চোখ দিয়া বর বর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তিনি দুই চোখ মুছিয়া বলিলেন—হ্যাঁ জ্যাঠামণি, সেখানেই গেছে!

—যেন বাবা সেখানে যেতে গেল জ্যাঠামণি? জ্যাঠামণি খানিকটা ভাবিয়া লইয়া বলিলেন—সেই যে তেপান্তরের দেশের টুক টুক রাজকনো, তোর জন্যে তাকেই আনতে গেছে।

অঞ্জু মাথা তুলিয়া তাহার জ্যাঠামণির

মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া প্রশ্ন করিল—  
কিন্তু তুমি কদম্বো কেন জ্যাঠামণি? বাবা  
কতদিনে ফিরে আসবে বল না—আমার মন  
যে বাবার জন্যে কেনন করে?

তাহার মাথার পিঠে হাত বুলাইয়া বৃকের  
ভিতরে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—আদবে  
জ্যাঠামণি, শিগ্গিরই ফিরে আসবে বই কি?  
চল্ খেতে চল্, ঘুমুনি কখন?

কল্যাণী—মুখ তাহার শুকাইয়া গিয়াছে—  
চুল তাহার রুদ্ধ হইয়া জটা বাঁধিয়া উঠিয়াছে।  
—সময় মত স্নান নাই—যখন-তখন হু হু করিয়া  
নানা কর্মের ফাঁকে ফাঁকে দুই চোখের জলে  
বৃক তাহার ভাসিয়া যাইতে থাকে। রাতে যখন  
সকলে ঘুমাইয়া পড়ে সে নিজের ঘরের জানালা  
ধরিয়া উদাস দৃষ্টি মেলিয়া দূর আকাশের দিকে  
তাকাইয়া থাকে—সারা রাতি একটুও ঘুমাইতে  
পারে না। কখনও অজ্ঞকে নিজের কোলের  
ভিতরে টানিয়া লইয়া চুপ করিয়া বিছানায়  
পড়িয়া থাকে—এই তাহার শেষ সম্বল, এই  
তাহার একমাত্র ভরসা। রাতে তন্দ্রার ঘোরে বিদ্রী  
সব স্বপ্ন দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া জাগিয়া  
উঠে—তারপর দুই চোখ মুছিয়া লইয়া  
বিছানার উপরে স্তম্ভ হইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া  
থাকে—সহসা দুই হাত জেড় করিয়া উর্ধ্ব-  
দিকে তাকাইয়া মনে মনে কি যেন প্রার্থনা  
করিতে থাকে। এতক্ষণ পরে আসিতের মন  
আবার নিজের দেহে ফিরিয়া আসিল। কখন  
দুই চোখের জল অজস্রধারায় ঝরিয়া ঝরিয়া  
তাহার দুই চোয়াল বৃক একেবারে ভাসাইয়া  
দিয়াছে। এই তাহার “সেল্”। এখানেই কেত-  
কাল যে তাহাকে কাটাইতে হইবে, কে জানে?  
কত অপরিচিত বাস্তব, কত ধুনী,—বদমাশ  
এখানেই দিনের পর দিন কাটাইয়া গিয়াছে।  
ঐ তাহার বিছানা—ঐ নোংরা কম্বলে—ইতি-  
পূর্বে কতজন তাহার শয্যা রচনা করিয়াছে।  
সেইদিকে তাকাইয়া তাহার সমস্ত শরীর  
ঘণায় শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু না—না, ঘণা  
করিলে তো তাহার চলিবে না—এই ঘরে, এই  
কম্বলেই তো তাহাকে দিনের পর দিন কাটাইতে  
হইবে। আসিত সেই তক্তাখানার উপরে একখানা  
কম্বল পাতিয়া এবং অন্য একখানা ভাঁজ করিয়া  
মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িল। ভোরবেলা আসিতের  
ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে চুপ করিয়া দরজার  
কাছে দাঁড়াইয়া নতুন দেশের উষার পরিপূর্ণ  
রূপ দেখিয়া লইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে  
জমাদার আসিয়া তাহাদের সেলের দরজা একের  
পর এক খুলিয়া যাইতে লাগিল। পনের দিন  
তাহাদের সাধারণ কয়েদীর সহিত মিশিবার  
হুকুম নাই। অগে করিয়া কোন সংক্রামক  
রোগের বীজাণু বহন করিয়া আনিয়াছে কিনা  
তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য এই সতর্কতা।  
আরও কিছুক্ষণ পদ্ম থালায় করিয়া তাহাদের  
“লাপ্সারী” দিয়া—এই তাহাদের সকাল-

বেলার খাদ্য। বাঙলা দেশের জেলের  
“লাপ্সারী” নমুনা তাহারা দেখিয়া গিয়াছিল—  
ইহা তাহার উপরেও এক কাঠি—ভালের লামও  
নাই—সেরখানেক চাউল মশখানেক জল দিয়া  
অনেকক্ষণ ধরিয়া সিদ্ধ করিলে যে উপাদেয়  
খাদ্য প্রস্তুত হয়, ইহা তাহাই। আহারাদির পর  
এক বাণ্ডিল করিয়া নারিকেলের ছোবড়ার আঁশ  
আনিয়া তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া গেল। ইহা  
দিয়া দাড়ি পাকাইতে হইবে। এমনি করিয়া  
কবে এই পনের দিন তাহাদের শেষ হইবে—  
কবে এখানকার অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের  
সহিত তাহারা মিলিত হইতে পারিবে—এই  
আশায় তাহারা দিন গণিতে লাগিল। পাঞ্জাবের  
কর্তার সিং, মোহন সিং, ইউ পি-র ধর্মদাস,  
বাঙলাদেশের জ্যোতিপ্রকাশ, হেমচন্দ্র প্রভৃতি  
বড় বড় বিপ্লবীগণ এখানেই আছেন—ইহাদের  
সাহচর্য কি কম সৌভাগ্যের কথা? পনের দিন  
তাহাদের কাটিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে এইসব নানা  
প্রদেশের বিপ্লবীদের সহিত তাহাদের আলাপ-  
পরিচয় হইল। এই জেলের কতৃপক্ষের সুপার  
হইতে আরম্ভ করিয়া জমাদার, সেপাই প্রভৃতির  
নানা কুণ্ডলিত মূর্তি তাহাদের চেখে ফুটিয়া  
উঠিতে লাগিল।

#### স্বাধীনতা আন্দোলন

কেরী সাহেব কয়েদীর মুখে ইংরাজী  
বুলী সহ্য করিতে পারিতেন না।  
ইংরাজীতে কিছু বলিতে গেলে বলিতেন—  
ইংরাজী মাংতা নেহি—হিন্দিমে বোলো।  
সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট সিপাহী জমাদারের  
কোন দুর্ব্যবহারের কথা কেহ বলিলে তাহাকে  
হামেশা বলিতে শোনা যাইত যে, একটা মুরগী  
মারিলে নয় আনা লোকসান হয়। আর একটি  
কয়েদী মারিলে দৈনিক সাড়ে পাঁচ আনা করিয়া  
খোরাকী বাঁচিয়া যায়। হেড জমাদার দেদার  
বক্স পেশোয়ারী। তাহার মুখে সর্বদা  
বিদ্রী গালাগালি লাগিয়াই থাকিত। আবার  
স্বদেশী কয়েদীদের উপরেই যেন তাহার  
আক্রোশ ছিল সব চাইতে বেশী। কাজের  
একটু এদিক ওদিক হইলে শুন্য যাইত—  
ক্যাছে কাম কামিত হায়? সরকার কা খানা  
খাতা হায়—শরীর বানাতা হায় ইত্যাদি।  
এমনি করিয়া সাত আট মাস আসিতদের  
কাটিয়া গেল। এখন তাহাদের নারিকেলের  
ছোবড়া একটা কাঠের উপরে রাখিয়া মৃগুর  
দিয়া পিটাইয়া তাহার সূত্র বাহির করিতে  
হইত। সারাদিন পিটাইতে পিটাইতে হাতে  
কোম্কা উঠিয়া ঘা হইয়া যাইত কিন্তু নির্দিষ্ট  
পরিমাণের কাজ করিয়া না দিতে পারিলে তো  
বিশ্রাম নাই। কাজেই যত কষ্টই হউক কাজ  
করিয়া যাইতেই হইত। এই সাত আটটা মাসে  
প্রত্যেকের ওজন ১৫।১৬ পাউন্ড করিয়া  
কমিয়া গেল। রামপ্রসাদ মিশরের সে

পালোয়ানী শরীর আর নাই—একশ আশি  
পাউন্ড হইতে নামিয়া সে একশ বিশে আসিয়া  
দাঁড়াইয়াছে। আহার লইয়া হইয়াছে তাহার  
আরও মুশকিল—যেভাত দিয়া যার তাহা  
তাহার একপাশে পড়িয়া থাকে—কোন প্রকারে  
জল দিয়া পেট ভরাইয়া লয়। যদুনাথ এত  
কষ্টেও দুই চারটা রসিকতা করিতে ছাড়ে  
না—সিপাহী জমাদার নিকটে না থাকিলে  
নিজের জারগা হইতে উঠিয়া আসিয়া এখনও  
দুই একজনের হাত দেখিয়া ভূত ভবিষ্যৎ  
বলিয়া দেয়। যতীন ও অন্যান্য সবাই এক-  
প্রকার যাই হোক অবস্থার সহিত নিজেদের  
মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু  
সুধীরকে লইয়া হইয়াছে মুশকিল। সে সর্বদা  
বিমর্ষ হইয়া থাকে। কিছুদিন কাজ করিবার  
পর তাহার হাতের আঙুলে বড় বড়  
ঘা হইয়া পড়িয়াছিল—তাই কাজ তাহার পরি-  
মাণ মত হইত না। কখনও ফাঁক পাইলে  
সকলের অলক্ষ্যে আসিতেরা ভাগাভাগি করিয়া  
কিছু কিছু তাহার কাজ করিয়া দিত। প্রত্যহ  
জমাদার গালাগালি করিত। সুধীরও মুখ  
বাজিয়া সহ্য করিত না—দুই একদিন হাতা-  
হাতি হইবার উপক্রম হইত। সে যেন এই  
অবস্থাকে কিছুতেই সহ্য করিয়া লইতে  
পারিতেন না। তাহাকে লইয়া আসিতদের  
ভাবনার অন্ত ছিল না—দিন দিন মেজাজ  
তাহার এত রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল যে,  
কতৃপক্ষের বা সঙ্গীদের কাহারও কোন  
কথা বিশেষ গ্রাহ্য করিত না। জেলের খাবার  
মুখে তুলিতে পারিত না—প্রায়ই সব ফেলিয়া  
দিত। শরীর তাহার শুকাইয়া একেবারে কাঠ  
হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিন কাজ তাহার হয়  
নাই। বিকালবেলা জমাদার কাজ বৃদ্ধিয়া  
লইতে আসিয়া বলিল—এই, তোমারা কান  
কাছে নেই হুয়া। সুধীর এক পাশে গুন  
হইয়া বসিয়াছিল। কোন কথার জবাব দিল  
না।

জমাদার পুনরায় মুখ খিচাইয়া বলিল—  
আরে এতো বহুত নবাবী হুয়া রে—বাত নেহি  
বলতা! শালা হারামীকা বাচ্চা! কিন্তু জমাদারের  
মুখের কথা মুখে আছে—সুধীর তড়াক  
করিয়া লাফ দিয়া উঠিয়া মুহূর্ত মধ্যে তাহার  
নাকে দুই তিনটা ঘূঁসি বসাইয়া দিল—  
জমাদারের নাক ফাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত  
ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। জমাদার চট করিয়া  
সরিয়া দাঁড়াইল—সুধীর তখন ক্রোধে হিতাহিত  
জ্ঞানশূন্য হইয়া গর্জাইতেছিল—সেই মূর্তির  
দিকে তাকাইয়া জমাদার আর কিছু বলিতে  
সাহস করিল না। তখনই জেলার কেরী  
সাহেবের কাছে সংবাদ গেল। তিনি আসিয়া  
কি যেন বলিতেই সুধীর তাহার গায়ের জামা  
পরিধানের জ্যাংগা খুলিয়া একেবারে বিবশ  
হইয়া কেরীর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল—

এই তোমারা জাংগিয়া হায়—এই তোমারা কোর্তা হায়—তোমারা কোর্তা জাংগিয়া ভি নেহি পরেগে, খানা ভি নেহি খায়েগে—হাম আজাদী হায়। অসিতেরা যে যাহার জায়গায় বসিয়া বসিয়া সুধীরের কীর্তি দেখিতেছিল। তাহাদের কিছুই করিবার ছিল না। ইহার পরিণাম যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে নিতান্ত শংকিত মনে ভাবিয়া তাহারা ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। কেরী সাহেবের আদেশে কয়েকজন টেডাল ও মেটে মিলিয়া সুধীরকে ধরিয়া তাহার সেলে লইয়া গেল। অসিতেরা সকলে যে যাহার জায়গায় নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। অসিতের দৃষ্টিভঙ্গার আর অন্ত ছিল না। ইহার অর্থ যে কি তাহাতো কাহারও নিকট অবদিত নয়। এই তো সেদিন একটি কয়েদী কাজ 'রিফউজ' করায় তাহার উপর যে নির্মম প্রহার চলিয়াছিল—তাহার ফলেই হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হইল। এমন তো হাসপাতালে চলেছে। জেলার জমাদার হইতে সাধারণ মেটে পর্বন্ত প্রতিদিন উঠিতে বসিতে যে অনহনীর অত্যাচার করিয়া যাইতেছে তাহার সমস্তখানি নির্বিচারে একান্ত পাওনা বলিয়া সহ্য করিয়া যাওয়াই তো এখানকার নিয়ম। তাই চিরদিন ধরিয়া যে নিয়ম চলিয়া আসিতেছে তাহার ব্যতিক্রম ইহারা সহ্য করিবে কেমন করিয়া? যাহারা নাম-করা বদমাস গুন্ডা তাহাদের শাস্যস্তা করিবার জন্যই তো এই আশ্রয়স্থান জেল। তাই তো বাছিয়া বাছিয়া এত জায়গা থাকিতে সমুদ্র পাড়ি দিয়া এই স্থানটি নির্বাচন করা হইয়াছে। অসিতদের 'প্রজন্মাস' টিকিটেও বদমাস, গুন্ডা, ডাকাত এই সব ভাল ভাল বিশেষণ তাহাদের নামের সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই সাত আটটা মাসের মধ্যে প্রতিবাদ তাহারা কোনদিন করে নাই—দমস্তই মুখ বুজিয়া সহ্য করিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সুধীর আজ কেমন করিয়া এমনি বিগড়াইয়া গেল। তাহার দেহের ভিতরের স্বাধীন মানুষের মনটি হঠাৎ গর্জিয়া উঠিয়া এ কি বিপর্যয় কান্ড করিয়া বলিল। এখানে আসিয়া কত দিন কত ফাঁকে অসিত তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু সুধীর কিছুতেই কানে তোলে নাই। সে জবাব করিয়াছে—হয় সে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবে—আর না হয় মরিয়া যাইবে, কিন্তু এমন করিয়া জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে এই যে প্রতিনিয়ত অপমান বহন করিয়া পশুর জীবন যাপন করা ইহা সে কোন প্রকারেই সহ্য করিবে না। নিতান্ত ছেলে মানুষ—নিতান্ত সোঁটমেটাল। এমনি করিয়া অকালে সত্যই জীবনটাকে শেষ করিয়া দিবে নিশ্চয়। সুধীরের সেলে লইয়া তাহাকে সত্যই নিদারুণ প্রহার করা হইয়াছিল, কিন্তু তখন সমস্তই সে নির্বিচারে সহ্য করিয়াছে একটি

কথাও কহে নাই, একটু অক্ষুণ্ণ চীৎকার করিয়াও প্রতিবাদ বা যন্ত্রণা জানায় নাই। অসিতের সেলে ফিরিয়া আসিবার সময় দেখিতে পাইল তাহার সেলের একপাশে থালায় খাবার দিয়া গিয়াছে। সে তাহা স্পর্শও করে নাই—অন্য পাশে তেমনি উল্লংগ হইয়া দুই চোখের দৃষ্টি কড়িকাঠের দিকে নিবন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। অসিতকে তাহার সেলে বন্ধ করিয়া গেলে সে কতবার লোহার দরজার ফাঁকের ভিতরে মাথা ঢুকাইয়া তাহাকে ডাকিয়াছে কতবার কত বুঝাইয়াছে আহার করিতে বলিয়াছে, কিন্তু সুধীরের নিকট হইতে একটা কথারও জবাব আসে নাই। সে হয়তো তেমনি করিয়া তখনও বসিয়াছিল। অগত্যা বিরক্ত হইয়া অসিত নিজের বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু সারাটা রাত্রি বারে বারে সুধীরের কথাই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। আহা! বেচারীকে কি প্রহারটাই না করিয়াছে। সারাটা রাত্রি অনাহারে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভোরবেলা জমাদার আসিয়া অসিতের ঘরের দরজা খুলিয়া সুধীরের সেলের নিকটে যাইয়া আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিল। অসিত তাড়াতাড়ি সুধীরের সেলের দিকে ছুটিয়া গিয়া সেই দিকে চাহিয়া একেবারে শিহরিয়া উঠিল—এ কি সুধীর যে কবল ছিঁড়িয়া দড়ি পাকাইয়া সেলের দরজার সঙ্গে ফাঁস লাগাইয়া মরিয়া আছে। তাহার মৃতদেহ লোহার দরজার সাথে লম্বা হইয়া ঝুলিতেছে। চোখ দুইটি ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে—জিব খানিকটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে। অসিত দুই হাতে নিজের চোখ ঢাকিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। জেলার আসিসলেন—সুপারিন্টেন্ডেন্ট আসিলেন। মৃতদেহ সেখান হইতে নামাইয়া নীচে লইয়া যাওয়া হইল। অসিতদের ইতিপূর্বেই বাহার বাহার সেলে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল—সারাদিন তাহাদের এমনি বন্দী করিয়া রাখা হইল। সুধীরের দেহ কোথায় লওয়া হইল—কি করিল কোন খবরই তাহারা পাইল না। আজ আবার সম্ম্যাবেলা অসিত নিজের সেলে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কাল সন্ধ্যায় নিজের সেল হইতে মুখ বাড়াইয়া কতবার সুধীরকে আহার করিবার জন্য একটু শব্দ হইয়া থাকিবার জন্য কত করিয়া অনুরোধ করিয়াছে—কিন্তু তাহার অপমানিত আত্মা এতটুকু শান্তিলাভ করিতে পারে না। সুধীর তাহাদের ভিতরে সব চাইতে বয়ঃকনিষ্ঠ কিন্তু বোধ হয় সব চাইতে বেশী সাহসী সব চাইতে বেশী বিদ্রোহী। সে যাহাকে একবার শত্রু বলিয়া জানিয়াছে অবস্থা বিশেষে তাহারই অনুজ্ঞা মানিয়া চলিতে—তাহাদেরই আদেশ মাথা পাতিয়া লইয়া জীবনধারণ করিবার মতো মনোবৃত্তি

তৈরী করিয়া লইতে পারে নাই। এ তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—অসিত প্রথমাধি তাহার এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে। রাত্রি এতক্ষণ বোধ হয় ৮।৯টা বাজিয়া গিয়াছে—অসিতের সেদিকে লক্ষ্য নাই—সে এক মনে ভাবিতেছিল। জেলের চারিদিকে একটা গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। তাহাদের পর পর বারটি সেলের মধ্যে আজ একটি শূন্য পড়িয়া আছে। সুধীর আজ আর নাই। বাকী দশজনও নিশ্চয় অসিতের মতই এখন চুপ করিয়া নিজের নিজের সেলে বসিয়া এমনই ব্যাকুল হইয়া ভাবিয়া চলিয়াছে। বে বারজন একই পথের পথিক হইয়া স্বদেশ ছাড়িয়া আসিয়াছিল—তাহাদের একজনের আজ এখানেই এমনি করিয়া শেষ সমাধি হইয়া গেল। কি হইল সুধীরের দেহ? হয়তো সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিয়াছে—আর না হয় মৃত পশুর মত তাহাকে কোথাও মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখিয়াছে—এতটুকু সম্মান—এতটুকু দরদ কেহ দেখায় নাই। যশোর জেলার কোন পঞ্জীগ্রাম হইতে আসিয়া কলিকাতায় কলেজে ভর্তি হইয়াছিল—মধুকর আনিয়াছিলেন তাহাকে দলে টানিয়া। সংসারে তাহার কে কে আছে অসিত জানে না—হয়তো বাড়ীতে তাহার পিতামাতা ভাই বোন পরিপূর্ণ সংসার আছে। সে সমস্ত অবিকলিত চিন্তে ছাড়িয়া আসিয়াছে—ছাড়িয়া আসিয়াছে নিজের সমস্ত ভবিষ্যতের—নিজের জীবনমৃত্যুর চিন্তা। কিন্তু আক্ষেপ করিয়া তো কোনই লাভ নাই। ইহাই তো এখানকার নিয়ম। উঠিতে বসিতে যেখানে মানুষের উপরে পশুর মত ব্যবহার করা হয়—একজন কয়েদীর জীবনের চেয়ে যেখানে একটি মুরগীর মূল্য বেশী—সেখানে ইহার চাইতে বেশী কিছুর আশা করাই তো নির্বুদ্ধিতা। এ মৃত্যু লইয়া আর কোন হেঁচক হইবে না। কাল হইতে আবার তাহাদের যথানিয়মে কাজ করিয়া যাইতে হইবে—কোন প্রতিবাদ চলিবে না।

প্রতিবাদ করিলে তাহাদের অনুরূপ অবস্থাই ঘটিল। সুধীর নিজের হাতে মৃত্যুর পথ বাছিয়া লইয়াছে। কিন্তু সেপাই জমাদারের প্রহারের ফলে মৃত্যু ঘটাও একটুও আশ্চর্য ছিল না। এই নিজের এখানে অভাব নাই। ইহার কোন কোন প্রতিবাদ নাই। মাছের হেমনি করিয়া কাদে—তেমনি হয়তো একটা বিচারের প্রসূধীরের টিকেট খাতায় ডায়েরিয়ায় বা কলেয়ায় বাস—সমস্ত দায়িত্ব শেষ হইল। কিছুকণ চোখের কোণ বাঁহিয়া গড়াইয়া পড়িয়া তাহার

ছিল—এখন সেই ধারা একেবারে শুকাইয়া গিয়া দুই চোখ তাহার হিংস্র পশুর মত জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

### প্রশ্নোত্তর অধ্যায়

ছয় বৎসর পরের কথা। সেদিন অমিয়র অফিস হইতে ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। তিনি হাত মুখ ধুইয়া নিজের ঘরে আসিয়া বসিতেই অজয় দৌড়াইয়া তাহার ঘরে গিয়া ঢুকিল। তিনি মুখ তুলিয়া চাহিতে, তাহার পাশে ধপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল—আজ মির্জাপুরে পাকের মস্ত বড় সভা ছিল, আমি দেখে এলাম জ্যাঠামণি।

অমিয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন—তুই কেন যেতে গেলি—অজয়—এইসব মিটিংএ যায় নাকি? শেষে একটা গণ্ডগোল হোক—মারামারি হোক।

অজয় ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—ইস্ মারামারি আবার করবে কে সেখানে? কত লোক—উঃ, বাপু রে। পার্কে রাস্তায় আশেপাশের বাড়ীর ছাদে কোথাও কি একটু ফাঁক ছিল? অতলোক আমি কোনদিন দেখিনি। মহাত্মা গান্ধী এসেছিলেন সভায়। তিনি বক্তৃতা দিলেন, আমি তাঁর একেবারে কাছে গিয়ে বসেছিলাম। হিন্দিতে বক্তৃতা দিলেন—জ্যাঠামণি—আমি ভাল বকতে পারলাম না কিন্তু কয়েকটা কথা আমি মুখস্থ করে ফেলেছি। প্রথমে বল্লেন—মেরে পিয়ারে ভাইয়ো—আউর বিহিনো, একবার বল্লেন—নন্—কো—অপারেশনের কথা। নন্—কো—অপারেশনের মানে জান জ্যাঠামণি?—অসহযোগ—ইংরেজের সঙ্গে আর আমরা কেউ কোন সম্বন্ধ রাখবো না—তার চাকরী করবো না। তারপর বাঙালয় কতজন বক্তৃতা দিলেন। ছেলেদের ইস্কুল কলেজ ছাড়তে হবে দলে দলে পিকেটিং করতে হবে—ন্যাশনাল ইস্কুল তৈরী হবে তাতেই তারা পড়বে। আরও কত কথা—সব কি আমার মনে আছে! একজন খুব বড় মুসলমান উর্দুতে কি সব বক্তৃতা দিলেন—আমি কিছুই বকতে পারলাম না। কংগ্রেস না কি সবাইকে এইসব করতে

দশ করেছে। তুমি মহাত্মা গান্ধীকে

জ্যাঠামণি! অমিয় এতক্ষণ চুপ

সব শুনিতোছিলেন—কঠিন হইয়া

না, ওরা সব ভুল বলে—

য লেখাপড়া করতে হবে,

দেউ নাই। আর ইংরেজের

ল চলেবে কেন? ইংরেজ

দয় খানিকক্ষণ কি যেন

মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী

জান না—দক্ষিণ

বেসব ভারতবাসী

থাকে তাদের কত সুখ সুবিধে করে দিয়ে এসেছেন। ইংরাজরা তাঁর উপরে কত অত্যাচার করেছিল—তাঁর প্রাণ নিতে চেয়েছিল—তবু তিনি একটুও ভয় পান নাই। অবশেষে তাঁরই জয় হয়েছে।

অমিয় তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—এসব কথা তুই কেমন করে জানলি অজয়?

অজয় হাসিতে হাসিতে বলিল—‘নায়কের’ লিখেছে যে—আজকের নায়ক পড়নি জ্যাঠামণি? আমি রোজ নায়ক পড়ি—বড় ভাল লাগে আমার! সবার সঙ্গে আমিও সভায় চোঁচিয়ে চোঁচিয়ে বলেছিলাম—‘বন্দে মাতরম্—আল্লা-হো—আকবর—মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়!’ উঃ কি সে চাঁৎকার! মানুষ যেন সব আনন্দে পাগল হয়ে গেল। হাঁ, সেই যে সতেন দস্তের জালিয়ানওয়ালাবাগের কবিতা বেরিয়ে—ছিল—

—বিশ হাজারের নিবিড় ভিড়ে চালিয়ে গোলা ফুরিয়ে টোটার পুজি—

সে কথাও হলো। সমস্ত সভার লোক যেন জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের কথা শুনে রাগে গর্জে উঠলো। অজয় আহালাদি করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলে—অমিয় কল্যাণীর ঘরের সম্মুখে গিয়া ডাকিলেন—বোমা! কল্যাণী তাড়াতাড়ি দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। অমিয় বলিলেন—তোমাকে একটা কথা বলতে এসো বউমা! অজয়ের সমস্ত ভালমন্দের ভার যে আজ তোমার উপরে একথা তো ভুললে চলবে না—আজ পিতামাতা দুজনের ভারই যে একা তোমাকেই নিতে হবে? কল্যাণী অমিয়র কথার কোন অর্থই বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অমিয় পুনরায় বলিতে লাগিলেন—সারা ভারতবর্ষময় স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে—দলে দলে ছেলেরা সব ইস্কুল কলেজ ছেড়ে দিচ্ছে। আজ অজয় বিকালে পার্কে গিয়েছিল—সভায় বক্তৃতা শুনেছে। এমনি করে তো ওকে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়—তুমি নিষেধ কর না কেন?

কল্যাণী বলিল—কিন্তু আপনি থাকতে সমস্ত দায়িত্ব আমার ঘাড়েই বা পড়বে কেন? নিষেধ যদি করতে হয় সেতো আপনিও করতে পারেন

অমিয় এবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন—কিন্তু আমাকে যে ও মানতেই চায় না।

কল্যাণী বলিল—আপনার কিন্তু বাড়াবাড়ি হচ্ছে—ছেলেকে এত আশ্চর্য দেওয়া তো ভাল নয়। কোন দিন একটা কটু কথা বসবেন না—একটু শাসন করবেন না—এমনি করে যে ও কাউকে মানতে চাইবে না। আর আপনার কথাই যদি না শোনে, আমার কথাই বা শুনেবে কেন?

অমিয় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—কটু কথা বলতে যে আমি পারিনে বউমা—আমার বুক যে ভেঙ্গে যায়। ওর মুখ ভার দেখলে আমার যে অসির কথা মনে পড়ে—আমার বুকের মাঝে যে শূল বিধতে থাকে। কিছুক্ষণ তিনি আর কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। পরে পুনরায় বলিয়া উঠিলেন, —আমি দুর্বল মানুষ বউমা—অসির মত সাহস আমার নাই—তার মত মনও আমার নয়। আমি চাই অজয় আমার লেখাপড়া শিখুক—ভাল চাকরী করুক—এই সংসারের সুখ দুখ আর দশ জনের মত করে ভোগ করুক।

কল্যাণী বলিল—আমিও তো তাই চাই—।

—তবে কাল থেকে ওকে চোখে চোখে রেখো—ইস্কুল থেকে এলে আর কোথাও বেরতে দিও না। এই ছোটলোয় একবার যদি স্বদেশীর নেশা মাথায় ঢোকে—তবে তার প্রায়শ্চিত্ত যে সারা জীবন ধরে করতে হবে। আমিও এখন থেকে শক্ত হবো—খবরের কাগজ আর বাড়ীতে রাখবো না—ওতে আরও উত্তেজনা এনে দেয়। বলিয়া তিনি নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। পরের দিন হইতে বাড়ীতে খবরের কাগজ আসা বন্ধ হইয়া গেল। অজয় প্রথমে জ্যাঠামশাইয়ের নিকট আবদার করিল—মুখভার করিল কিন্তু তিনি কিছুতেই কাগজ রাখিলেন না। মায়ের কাছে পয়সা চাহিয়াও পাইল না। ইহারই কয়েক দিন পর হইতে প্রত্যহ ইস্কুল হইতে আসিয়া অজয় সেই যে বাড়ীর বাহির হইয়া যাইত আর ফিরিত সন্ধ্যায়। কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিলে ভাল করিয়া জবাব দিত না—কোন প্রকারে তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিত। সেদিন অমিয়, অজয় কোথায় যায় জানিবার জন্য গোপনে গোপনে তাহার পিছ লইলেন। একে দূর আসি, অবশেষে বাগবাজার অঞ্চলের একটি বড় রাস্তার ধারের একখানা বাড়ীর কাছে গিয়া অজয় কাহার যেন নাম খরিয়া ডাকিলে লাগিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে তাহার সম বয়সী একটি ছেলে আসিয়া দরজা খুলি দিল অজয় ভিতরে ঢুকিল। অমিয় ধীরে ধীরে বাড়ীর কাছে আগাইয়া গেলেন। রাস্তা উপরে বৈঠকখানা। অজয় আর সেই ছেলেকে সেই ঘরে গিয়া বসিয়াছে। অজয়ের হাতে একখানা খবরের কাগজ—অমিয় দু দাঁড়াইয়া জানালার ভিতর দিয়া সমস্ত দেখা পাইলেন। অজয় একেবারে তন্ময় হই “নায়কের” পাতায় ডুবিয়া গিয়াছে। অতি রাস্তার অপর পাশে গিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াই রহিলেন। অবশেষে কাগজ পড়া শেষ হই অজয় যখন বাহির হইল তখন বেলা ৩ নাই। অমিয় তাহার পিছনে পিছনে আসি সন্ধ্যার পরে বাড়ী ঢুকিলেন। পরের ১

হইতে বাড়ীতে আবার খবরের কাগজ আসিতে লাগিল। আজকাল সম্মুখাবলী অজয় অমির পাশে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িয়া যায়—অমির বসিয়া বসিয়া শুনেন। মাস কয়েক পরে—সোদীন সম্মুখাবলী খবরের কাগজ হাতে করিয়া অজয় অমির ঘরে ঢুকিয়া বলিল—দেখেছো জ্যাঠামণি আজকের কাগজ? সেই যে চিত্তরঞ্জন দাস—বাকি সবাই সি আর দাশ বলে—তিনি সব ছেড়ে দিয়ে স্বদেশীতে নেমেছেন। অমির হাত বাড়িয়া কাগজ লইয়া দেখিতে লাগিলেন।

অজয় প্রশ্ন করিল—খুব বড় ব্যারিস্টার তিনি, না জ্যাঠামণি?

অমির জবাব দিলেন—হ্যাঁ, মাসে হাজার হাজার টাকা পেতেন তিনি।

অজয় কাগজের পৃষ্ঠা ঘুরাইয়া তাহার চোখের সম্মুখে ধরিয়া আগুন্দ্র দিয়া নির্দেশ করিয়া বলিল—দেখেছো জ্যাঠামণি, কাগজের সম্পাদক “সখার ডাক” নাম দিয়ে কি লিখেছেন তাঁর সম্বন্ধে! অমির কাগজখানা তাহার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—কি লিখেছেন তুই পড় তো অজয়, আমি শুন। অজয় মহা উৎসাহে সমস্ত লেখাটি পড়িয়া গেল। পড়া শেষ হইলে হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বলিল—আচ্ছা জ্যাঠামণি—আজকাল সব লোকের গবর্ণমেন্টের চাকরী ছেড়ে দিচ্ছে না?

অমির বলিলেন—কই না রে, কে বল্পে ছেড়ে দিচ্ছে?

অজয় বলিল—কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশের মত যারা ভাল ভাল লোক তাঁরা তো দিচ্ছেন?

কদাচিৎ কেউ চাকরী ছাড়ছে অজয়—চাকরী কি অত সহজেই ছাড়া যায়?

—কিন্তু তাহলে স্বরাজ আসবে কেমন করে? গান্ধীজী যে চাকরী ছাড়তেই বলছেন!

অমির হাসিয়া বলিলেন—বড় হলে বুঝবি অজয়, চাকরী ছাড়ব বল্পেই ছাড়া যায় না।

অজয় বলিল—আমাদের ক্রাশে ছেলেদের মধ্যে রোজ এই নিয়ে কত তর্ক হয়, জ্যাঠামণি! আমাদের প্রফুল্লর বাবা পুলিশে চাকরী করেন বলে সকলে তাকে কত ঠাট্টা করে। আমাকে কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারে না। আমি বুক ফুলিয়ে বলি—আমার বাবার সঙ্গে কার তুলনা? আমার বাবা সকলের আগে স্বদেশী করে আন্দামানে আছেন। প্রফুল্ল মিথ্যা করে বলোঁছিল—তুমি নাকি সরকারী চাকরী কর। আমি তাকে ধমক দিয়ে বলোঁছিলাম—মিথ্যা কথা—আমার জ্যাঠামণি কখনও সরকারী চাকরী করেন না।

অমির কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—কিন্তু তুমি তো ভাল করনি!

—কেন জ্যাঠামণি?

—আমি যে সরকারী চাকরীই করি অজয়!

—সরকারী চাকরী?

—হ্যাঁ, তাই তো!

অজয় অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে বলিল—কিন্তু আমি যে তাহলে মিথ্যা কথা বলোঁছি, জ্যাঠামণি, আমাকে যে সত্যিকথা কাল তাদের জানাতে হবে?

তা হবে বই কি অজয়—মিথ্যা তো বলতে নেই!

পুনরায় কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া লইয়া সে বলিল—আমাকে সবাই ঠাট্টা করবে জ্যাঠামণি—তোমার নামে নির্দেশ করবে—আমি তা সহ্য করতে পারবো না যে।

অমির ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন—যারা ভাল ছেলে—তারা কোনদিন কারু গুরুজনকে ঠাট্টা করে না অজয়!

অজয় এবার সহসা কোন জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু কি যেন ভাবিয়া লইয়া বলিল—কিন্তু যারা সব ভাল লোক তাঁরা যে সরকারী চাকরী ছেড়ে দিচ্ছেন, জ্যাঠামণি কি হবে চাকরী করে?

অমির হাসিয়া বলিলেন—চাকরী না করলে টাকা আসবে কোথেকে রে!

অজয় মাথা নাড়িয়া বলিল—চাইনা আমার টাকা—কি হবে টাকা দিয়ে?

অমির ধীরে ধীরে অজয়কে নিজের কোলের ভিতরে টানিয়া লইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, টাকা কি আর আমার নিজের জন্যে চাই অজয়! টাকা না হলে কি দিয়ে তোকে মানুষ করে তুলবো—তোকে যে মানুষ হতে হবে জ্যাঠামণি—মানুষ হতে হবে! কিন্তু অজয় মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিতে লাগিল—

তোমার নির্দেশ শূনে আমি মানুষ হ'ব না জ্যাঠামণি!—দাও না চাকরী ছেড়ে—তোমার খুব নাম হোক—দেশের লোকে তোমার নামে জয় দিক—বেমনি করে মহাত্মার নামে জয় দেয়—চিত্তরঞ্জন দাশের নামে জয় দেয়! অমির তাহার কোন কথার জবাব না দিয়া তাহাকে শব্দ বৃকের ভিতরে চাপিয়া ধরিলেন—বুক তাহার যুগপৎ ভয়ে ও গর্বে একেবারে পূর্ণ হইয়া উঠিল। (ক্রমশ)

**সত্যি কবিতাজের**  
**প্রাদ্যারি**  
**হাপানি ও ব্রহ্মইটামে**

অতঃপর যুগের জেট  
নিয়ামককারী মহৌষধ

১ দাগে ষাঁপ কাম  
১ মিনিটে অস্বাস্থ্য

অবশ্য বাক্যেই ইহা কলিঙ্গ পণ্ডিত  
পাঠ্য। হৃদয় জলি, হৃদয়ই ব্রহ্মইটামে  
কোন ইটামে ব্রহ্মইটামে ব্রহ্মইটামে ব্রহ্মইটামে  
কি ব্রহ্মইটামে।

মূল্য—প্রতি মিনিট ১৫  
এক মিনিট ৫০

লব্ধি বক বক নোভাডেল  
পাওয়া যায়।

**কবিতাজ**  
**এস. সি. শর্মা, ১৩ মঙ্গ**  
সাহিত্যিক, বৈদ্যনাথ, দক্ষিণ কলিকাতা

এক মাসের জন্য

**অর্দ্ধ মূল্যে কনসেজন**

এসিড প্রডু ২২K<sup>1</sup> মেট্রো  
রোল্ডগোল্ড গহণা  
—গ্যারান্টি ২০ বৎসর—

চুড়ি—বড় ৮ গাছা ০০ স্থলে ১৬, ছোট—২৫, স্থলে ১০, নেকলেস অর্ধ  
মফচেইন—২৫ স্থলে ১০, নেকচেইন ১৮ একছড়া—১০, স্থলে ৬, আংটি ১টি—৮ স্থলে  
বোতাম এক সেট—৪ স্থলে ২, কানপাশা, কানবালা ও ইয়ারিং প্রতি জোড়া ১  
আম'লেট অথবা অনন্ত এক জোড়া ২৮ স্থলে ১৪। ডাক মাস্ক ৫০, একচে ৫  
লইলে মাস্ক লাগতে না।

**নিউ ইণ্ডিয়ান রোল্ড এণ্ড কারেট গে'**  
১নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



# যোগী কবীর

## শ্রীক্ষিতিমোহন মেন

যোগ ও ক্ষেম এই দুইটি কথা যুক্ত করিয়া ব্যবহার করা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে (গীতা, ৯, ২২)। শঙ্করাচার্য যোগকে বলেন অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি এবং ক্ষেম হউক তাহার রক্ষা। শ্রীধর স্বামীও সেই কথাই বলেন। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে যোগের মর্ম মানুষ অনুভব করিয়াছে। যে মোহেজো-দরোকে পড়িতেরা বলেন আর্বদের ভারতে আদিবাসীর বহু পূর্বের, সেখানেও চমৎকার সব যোগীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। সেই সব মূর্তি দেখিলেই মনে হয় যোগের কোনো না কোনো সাধনায় নিরত।

অসমী অনন্ত বিশ্ববস্তু হইতেই মানবের উদ্ভব। বিশ্বসাগর হইতে তাহার ব্যক্তি লইয়া একটি উর্মির মত মানুষ হইয়া আদিয়াছে বাহির। তাই এই বিশ্ববস্তু নানাভাবে নিরন্তর তাহাকে টানিতেছে, তাহার জীবন্যাও চাহিতেছে বিশ্বব্যাপার সঙ্গে নিরন্তর যুক্ত হইতে। এই ব্যাকুলতাই হইল যোগের মূল।

এখন এই যোগ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি এক আমাদের ভাবের (idea) মধ্য দিয়া ও আর এক উপলব্ধি করিতে পারি আমাদের ক্রিয়ার (practice) মধ্য দিয়া। এই উভয় ভাবেই যোগ আমাদের দেশে সাধকেরা নানা বিচিত্র রকমে প্রার্থনা করিয়াছেন।

মিলনের একটি মূল সূত্র হইল, যাহারা মিলিবে তাহাদের মধ্যে একটি সাধর্ম্য থাকা চাই। সমজাতীয় হইলেও সাধর্ম্য হয়, যেমন জলের সঙ্গে জলের মিলন। পরস্পর পরি-পূরক (complementary) হইলেও মিলন হয়। যেমন শিব শক্তির যোগ। এইরূপ পরি-পূরকতার ক্ষেত্রে যোগের মধ্যে পরস্পরের একটি ব্যাকুল আকাংক্ষা থাকায় যোগ একটি সাধনা-মাত্র না হইয়া, হইয়া উঠে একটি অনুপম রসের বস্তু।

মানব ও বিশ্ব-বিশ্বব্যাপার মধ্যে যোগে এই সমজাতীয়ত্ব ও পরিপূরকত্ব এই উভয়বিধ আবহি আছে। বিশ্ববদেহে ও মানবদেহে যে যোগ সমজাতীয়ের। যদিও তাহাতে পরিমাণ-আছে, বিশ্বাত্মা ও মানবাত্মার মধ্যে পরস্পর পরিপূরকের। একই যোগে এই উভয়ের থাকিলেও বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মা হইল চন্দটুকু আছে বলিয়াই এত আকাংক্ষা ও

উভয়ের মধ্যেই একটি এই এক একটি সম্পূর্ণ

জগৎ। গ্রীক দার্শনিকেরা তাই বিশ্বকে বলেন, "Macrocosm" বা বিরাট জগৎ, মানবকে বলেন, "Microcosm" বা ক্ষুদ্র জগৎ। দার্শনিকভাবে নব গেলটোনিক দার্শনিকেরা ইহা নানাভাবে আলোচনা করিলেও ইহার রসরূপটি ধরা পড়িয়াছে ভারতের সূক্ষী সাধনায় ভক্ত ও কবিদের মধ্যে।

নব গেলটোনিকরাই শব্দে বিশ্বের ও মানবের মধ্যে এই সাধর্ম্যটুকু দেখান নাই। উপনিষদেও দেখি—“এই বিশ্ব-আকাশে যিনি তেজোময় অমৃতময় পুরুষ তিনিই আমাদের আত্মার মধ্যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ (বৃহদারণ্যক, ২, ৫, ১০।১৪) তখন হইতে এই ভাবটি ও দুইয়ের মধ্যকার মিলন-ব্যাকুলতাই হইল ভারতীয় সব ভক্ত ও মরমী সাধক কবিদের প্রাণবস্তু।

ইহারই ত্রিাসাধ্য (practical) রূপ দেখি আমরা মোহেজোদোরার মূর্তিতে। সেখানকার সাহিত্য তো আমরা পাই নাই, পাইয়াছি মাত্র কয়েকটি মূর্তি। মূর্তিতে idea অর্থাৎ মর্ম বা ভিতরের কথা তো রাখা যায় না, তাই সেখানকার ভিতরের কথা পাই নাই, পাইয়াছি বাহিরের যোগ চেষ্টার রূপ।

এই যোগচেষ্টাও ভারতে কম প্রাচীন নয়। খুব সম্ভব ইহা বেদপূর্ব ভারতীয় সভ্যতার একটি বিশেষ সম্পদ। প্রথমে বৈদিক আবেঁরা ইহাতে ধরা দিতে চাহেন নাই। তাহাদের চিন্তার উপরও ইহার প্রভাব আঁসিয়াই পড়িল, চৌকাঁইয়া রাখা গেল না। পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্য তো ইড়া-পিঙ্গলা চক্র-কমল-কোশ নবম্বার মূল্যধার সহস্রার প্রভৃতি তথ্যে ঠাসা। অর্থাৎ বেদেও ইহার কিছু আদি-আভাস পাই।

অষ্টা চরা নবম্বারা দেবনাং পুরয়োধ্যা।  
তস্যাং হিরণ্যঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষ  
যুক্তঃ ॥

(অর্থঃ সংহিতা ৮, ২, ৩১)  
অষ্টচক্র ও নবম্বার যুক্ত এই অজ্ঞের দেবপুরী, এইখানে জ্যোতিতে আবৃত যে হিরণ্য কোশ আছে তাহাই স্বর্গ।

তস্মিন্ হিরণ্যে কোশে গ্র্যবে ত্রিপ্রতিষ্ঠিতৈ।  
তস্মিন্ যদ যক্ষ মাঋত্ব্যং তশ্বে ব্রহ্মবিদো  
বিদুঃ ॥

(ঐ ১০, ২, ৩২)  
ত্রি-অব যুক্ত ত্রিপ্রতিষ্ঠিত সেই হিরণ্য কোশে, আত্মা যুক্ত যে যক্ষ (পূজ্য অপূর্ব পুরুষ) সেখানে বিরাজমান, তাহাকে ব্রহ্ম বিদেবাই জানেন।

এখানে পরবর্তী যোগ শাস্ত্রের অনেক কথাই পাওয়া গেল। তারপর দেখিতেছি আর একটি অপূর্ব মন্ত্র—সেখানেই সেই অন্তঃস্থিত পুরুষের অধিষ্ঠান ভূমির কথা আরও চমৎকার করিয়া হইয়াছে বর্ণিত।

পুণ্ডরীকং নবম্বারং ত্রিভিগুণেভিরাবৃতম।  
তস্মিন্ যদ যক্ষ মাঋত্ব্যং তশ্বে ব্রহ্মবিদো  
বিদুঃ ॥

(ঐ ১০, ৮, ৪৩)

তিন গুণে আবৃত নবম্বার এই কমল। তাহার মধ্যে বাস করেন সেই যক্ষ (পূজ্য অপূর্ব পুরুষ) তাহাকে বহুবিদেবাই জানেন।

এ তো হইল যোগশাস্ত্রের চরম কথা।  
ইড়া-পিঙ্গলা, শিব-শক্তি, চন্দ্র-সূর্য, জ্ঞান-প্রেয় প্রভৃতির মিলনের মধ্য দিয়া আমাদের সেই বিশ্বস্ত মানব ও বিশ্বের যোগ সাধনার চেষ্টাই চলিয়াছে নানা আকারে ও নানা প্রতীকে। এক মূল্যধার হইতে দুইধারা হইয়াছে বিশ্বস্ত আবার তাহাকে মিলাইতে হইবে এক যুক্ত বর্ণীতে। অধো ধারাকে উর্ধ্ব তুলিয়া ষটচক্র বেধ করিয়া যাইবে উর্ধ্ব লোকে।

বহিঃপুরাণে ত্রিযাযোগসারে বিশ্বপুরাণে (৬ষ্ঠ অংশ, ৭ম অধ্যায়), সৌরপুরাণে (১২শ অধ্যায়) ব্রহ্ম বৈবর্ত (কৃষ্ণ খণ্ড), গরুড় পুরাণে (১৪শ অধ্যায়, ৪৯ অধ্যায়), ভাগবতে নানা স্থানে এইসব বিষয় বর্ণিত আছে। দেহের শূভাশুভের সঙ্গেও তার সম্বন্ধের কথা লিগ্ন পুরাণে (৯ম অধ্যায়), মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৩৫ অঃ) আছে। আরও পুরাণের বহু বহু অংশে এইসব কথা আছে।

যোগের ভাবের দিকটাও গীতাতে বহুধা বহু ভাষাতে ব্যক্ত হইয়াছে। যোগবিশিষ্টও সেই হিসাবে খুব মূল্যবান গ্রন্থ। তন্ত্র ও শৈববাদ শাস্ত্রে এমন কি শেষের দিকের বৈশ্বদেব গ্রন্থেও যোগের বহু সম্ভান পাই।

তারপর আসিতে হয় যোগী ও সিদ্ধাচার্যদের গ্রন্থে। সে সব তো যোগ মতেরই গ্রন্থ। গোরক্ষ সংহিতা আগাগোড়া ত্রিযাশিষ্ট (Practical) যোগেরই কথা।

আমি বিশেষভাবে কাজ করিতেছি মধ্য যুগের সন্তদের লইয়া। সেই যুগেও শত শত ভক্তের মধ্যে যোগের কথা নানাভাবে আছে। তাহার মধ্যে শব্দে কবীরের কথাই যদি বলা যায় তবে কবীরের সাহিত্যও তো সমুদ্র বিশেষ।

কবীরের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা ও আকাংক্ষা আজ বিশ্বগ্রাসী। কিছুই তিনি বাদ দিতে চান না। কাজেই তিনি inclusive, তিনি exclusive নন, সেইজন্য হিন্দু, মুসলমান, বৈষ্ণব, সূফী, যোগী, প্রভৃতি সকল ভাবের সাধনকেই ধরিয়াজেন তিনি আঁকড়াইয়া। অথচ তাহাদের সম্পর্ক সাংপ্রদায়িকতা (exclusiveness) কবীরের ভাবের সঙ্গে খাপ খায় না। তাই কবীর ইহার প্রত্যেকটিকেই আপনার ভাবে লইলেন আপন করিয়া। তাহাদের সব সব

ক্রিয়াকাণ্ড সাধনা সংজ্ঞা সব তিনি আপনার ডাবে লইলেন ব্যাখ্যা করিয়া বঝিয়া। কবীর ভক্ত, কবীর প্রেমিক, কবীর যোগী, কবীর মানবরসে ভরপুর, কবীর মৈত্রী যুক্তি প্রভৃতি সব কিছুতে পরিপূর্ণ। এমন অবস্থায় তাহার গৃহীত এইসব প্রত্যেক মতবাদই কতক পরিমাণে তাহার লওয়া। কতক পরিমাণে তাহার আপন ব্যাখ্যা দ্বারা আপনার সঙ্গে যুক্ত করিয়া গৃহীত, কতক পরিমাণে তাহার পরিত্যক্ত, কতক পরিমাণে তাহার দারুণ আক্রমণ প্রাপ্ত। কবীরের যোগ মতবাদ সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা চলে। তিনি কতক পরিমাণে ইহা মানিয়াছেন, কতক পরিমাণে নিজের মত করিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন। কতক পরিমাণে ছাড়িয়াছেন ও কোথাও বা ইহাকে দারুণ আঘাত করিয়াছেন। কবীরের সাহিত্য তো বহুধা বিচিত্র ও বহু সম্প্রদায়ের রক্ষিত। কোন বাণী আশ্রয় করিয়া আলোচনা করা যায়? তাই কবীরের কয়েকটি যোগমত সম্বন্ধে সামান্য দুই একটি কথা বলিবার আধার রূপে আমি কবীরের নাগরী প্রচারণী সভায় প্রকাশিত সংগ্রহটিই ব্যবহার করিলাম।

কবীরের অনেক পদ দেখিলে মনে হয় ঠিক যেন পূর্ববর্তী যোগীদের মতবাদই এমন কি সেই ভাষাই পড়িতেছি। যথা—

প্রথমে গগন কি পৃথ্বী প্রথমে প্রভু  
প্রথমে অবন কি পানী।

পদাবলী ১৬৪ ইত্যাদি

কবীরের প্রশ্নোত্তর ও হেয়ালীগূলি একবারেই প্রাচীন যোগী মতেরই, এই হেয়ালীগূলিকে তাই বলে “গোরখ ধন্দা”।

কবীরের এই পদও যোগী পদেরই মত—

সুনি মণ্ডল মে ঘর দিয়া

তৈলৈ রহৈ গিচনিয়া।

উলটি পবন কহী রাখিয়ে

কোই ভরম বিচারে।

সাঁধে তীর পতল ক’

নিরি গগনহি মারে। ইত্যাদি পদ ১৫৪

ঠিক এইরূপ আর একটি হইল তাহার

পরিশিষ্ট ভাগের ২০৭ নম্বর পদ।

মূল দুত্যাঠে বন্দা বংদ।

রাবি উপর গহি বাখা চংদ।

পশ্চিম দ্বারে সুরজ ত গৈ।

মের ডংড পির উপর বসৈ।

খিড়কী উপর দশবা ম্বার।

কাহি কবীর তাক্স অংতন পার।

যোগ সম্বন্ধেও কবীরের মতের মধ্যেও বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। কখনও তিনি চাহিতেছেন পবন উলটাইয়া ঘট চক্র ভেদ করিয়া গগন শূন্যে সমাহিত হইতে যথা—

উলটে পবন চক্র বট বেধা

মের ডংড সরপুর।

গগন জারাজ মন সুনি সমানী

বাজে অনহদ ত্রা। ইত্যাদি

কখনও বা বলিতেছেন, মনকেই উলটাইয়া ধরিতে হইবে তাহাতে ভরিতে। পবন উলটাইয়া ঘটচক্র বিধিয়া শূন্য “সূর্য্যাততে” ই লাগাইতে হইবে লয়। মনয়ে মনহি উলটি সমানী।

.....  
উলটে পবন চক্র ঘট বেধা সুখি সুরতি  
লৈ লাগী। ইত্যাদি পদ ৮

কখনও দ্বাদশ রূপ হইতে বনমালীর মত নীর ধারা উর্ধ্বে উলটাইয়া সূর্য্যমন্দির কুল চান পূর্ণ করিতে—দশ দিকেই সেই ধারা পাইবে ফুলবাড়ী।

দ্বাদশ ক’ব এক বনমালী

উলটানীর চলাবৈ।

সহজ সূর্য্যমন্দির কুল উরাবৈ

দহাদিশ বাড়ী পাবে। ইত্যাদি

পদ ২১৪

কখনও বা ইন্দ্রেন জলাইয়া ভাটিতে যেমন সূর্য্য লয় চুয়াইয়া তেমনিভাবে অন্তরের মহারসকে গগনস্থানে চুয়াইয়া সেই সূর্য্য চান মন্ত হইতে। অথচ যোগীর এই গগন-রসকে ভক্তের মত তিনি বলিলেন রাম রস। তাহার যোগ ও ভক্তি মত এমনি মাখামাখি। এই রামরসে মন্ত হইতেই কবীরের একান্ত বাদনা।

গগন রসাল চুও নৈরা ভাটী।

সংকি মহারস তন ত্রা কাটী।

বাধে কাহিই সহজ মতবার।

পীত রাম রস জান বিচার।

পরিশিষ্ট পদ ৫৮

“চন্দ্র সূর্য্য এই দুই হইল জ্যোতির স্বরূপ। এই জ্যোতির অন্তরে অনুপম রহস্য বিরাজমান। হে জাননী, সেখানেই কর রহস্য বিচার।”

চন্দ্র সুরজ দুই জ্যোতি স্বরূপ।

জ্যোতী অংতির রহস্য অনুপ।

কর রে জাননী রহস্য বিচার। ইত্যাদি

পরিশিষ্ট পদ, ৬৭

কখনও বা কবীর যোগীর ভেতরকে রূপকের মত ধরিয়া তাহাকে সাজাইয়াছেন সুরতি নিরতি প্রভৃতি দিয়া।

অবধ জ্যোতী জগদৈ ন্যার।

মদ্রা নিরতি সুরতি কর সীগী

নাদ ন বং ভৈ ধারা।

পদ ৬৯

নিরতি মদ্রা সুরতি সিংগায় মণিজত হইয়া সেই যোগী গগনের মধ্যে “চেতন-চৌকী”তে বসিয়া সেই মধুর মহারস করে পান যাহা চুয়ান হইয়াছে সেই অন্তরের ভাটিতে। সেখানে বসিয়া সে দুনিয়ার দিকে চাহিয়াও দেখে না।

বসৈ গগন মে দমনী ন দেখে

চেতনি চৌকী ধৈরা।

চরি অকস আপন নহী জাউ

পীত মহারস মদ্রা। পদ ৬৯

গগন ভাটি চুয়াইয়া করে যে অমৃত রস নিরুৎ, তাহাই করিতে হইবে পান। রসের মধ্যেই করে সেই রস।

গগন হী ভাটী সীগী কর চংগী

কনক কলস এক গাবা।

তহবা চব অমৃত রসনীর

রস হী মে রস চুবা বা।

ইত্যাদি, ১৫৩ পদ

এইখানেই পান করিতে হইবে মন-মাড়ানো “রাম রসায়ন”। দুনিয়া আছে অথচ সব কি জন্মের সাধনায় ভুলিয়া?

বহু দুনিয়া কাই ভ্রম ভুলানী

মে রাম রসাইন মাতা। (ঐ)

গগনমাড়লে করিতে হইবে ঘর, কারণ সেখানে ঝরে সদা অমৃত, সদানন্দ উপজে, রংগলালের রস করিতে হয় পান।

অথ গগন মণ্ডল ঘরকী জৈ।

অমৃত ধনবৈ সদা সুখ উপজৈ

বংকানাল রস পাবে। ইত্যাদি পদ ৭০

কখনও বা কবীর অধো ধারাকে উর্ধ্বে তুলিবার জন্য বেসব আয়োজন তাহা রূপক ইহা বুঝাইয়া, সম, পবন মন সভা সুরতি প্রভৃতির সহায়তায় সহজেই চালাইতে চাহেন সেই ধারা।

লোী কী লেজ পবন কা টাঁক

মন মটম জ বনরা।

সত বী পাট সুরত কা চাটা

সহজনির মুকলারা। ইত্যাদি পদ ২১৪

কখনও বা কবীরের এই যোগ সম্বন্ধীয় তাবৎ আয়োজনই রূপকের মত। তিনি যদিও বলিতেছেন—“হে অবধ, আমার মন হইয়াছে মন্ত। উন্মত্তিত চড়িয়া মগ্ন হইয়া মদ পান করিয়াছে সেই মহারস, তিভূন তাই হইয়াছে দীপ্ত উজ্জ্বল।”

অবধ মোরা মন মতিবার।

উন্মত্তি চড়া মগন রস পাবে

তিভূন ভরা উজ্জ্বল।

পদ ৭২

কিন্তু এই মহারস চুয়াইতে কানকে করিয়াছেন গুড় এবং ধানকে করিয়াছেন মহুরা, মন ধারা হইয়াছে ভাটি।

গুড় কীর জান পান করি মহুরা

ভাটী মন ধারা।

পরিশিষ্ট ৬২, (এবং পদ ৭২)

ইহা হইতেও রূপকটি আরও স্পষ্ট হইয়াছে কবীরের ১৫৫ নম্বর পদে যেখানে তিনি প্রহ্লাদ অগ্নি অদালিয়া গুড় শব্দকে করিয়াছেন গুড়, কাম রোধ মোহ মদ মাংসবাক্যে কাটিয়া কাটিয়া লইতেছেন কসিয়া। ইহাতেই উপজে রাম-রস।

এক বৃন্দ ভরি দেই রাম রস

জা কীর দেই কলালী।

করা কলালী লাহিন করহ

গুড় সব গুড় কানহা।

কাম রোধ মোহ মদ মংগর

কাটি কাটি কস দীন। ইত্যাদি পদ ১৫৫

যোগীদের কাজই হইল সারংগ বাজাইয়া গানের সুরে সকলের চিত্তকে জাগাইয়া তোলা। এখানেও কবীর রূপকের মধ্য দিয়া চাহেন দেখাইতে। সেই যোগী বাজান এই তনু-যন্ত্র। কাজেই ধর্মের দণ্ডে সত্যের

খুঁটিতে তত্ত্বের তাঁত টানা দিয়া রচনা হইয়াছে  
এই বস্ত্র। মনের নিশ্চল আসনে বসিয়া  
“রসনার উপজে রস।” এই সংগীতেই মিটিয়া  
যায় ভবের আসা যাওয়া।

জোগিয়া তনকী জুগুৎ বজাই  
জু- তেরা আবা গবন মিটাই॥

তন করি তণ্ডি ধর্ম করি ডাঙী  
সত কী সারি লগাই।

মন করি নহিলে আসন নিহচল  
রসনা রস উপজাই॥

২০৮

এখানে ২০৪, ২০৫, ২০৯, ২১০,  
২১১ পদে নানাভাবে যোগকে অধ্যাত্ম সাধনার  
অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

তখনকার দিনে একদিকে প্রবল মুসলমান  
সাধনা আর একদিকে প্রবল যোগীদের যোগ  
সাধনা। উভয়কেই কবীর স্বীকার করিয়াছেন।  
অথচ আপনার ভাবে। মুসলমান ধর্মকে তিনি  
কম আঘাত করেন নাই (দ্র সাচ কোতুংগ,  
৫—৯ প্রভৃতি বহু বহু স্থান)। যোগীর  
ভুক্তকেও তিনি বিস্তর আঘাত করিয়াছেন।  
“যোগী পড়ে বিযোগ কই ঘর দূর হৈ”  
ইত্যাদি কবীরেরই তীর্থ কথাত। মনে মনে  
তিনি বুঝিয়াছেন যে আঘাত করিয়া ফল নাই।  
তখন তিনি এই সব শক্তিকে আপনার ভাবে  
ব্যাখ্যা করিয়া রূপকের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া  
লইতে চাহিয়াছেন আত্মসাৎ করিয়া।

মুসলমানকে তিনি বলিতেন, “মনকে কর  
মক্কা, দেহীকে কর কিবলা। এই কায় মসজিদই  
তো দশ দ্বার। সেখানেই গিয়া দাও বাণ?”

মন করি মক্কা কিবলা করি দেহী।

যোলন হারু পরম গুরু এহী॥

কহরে মুন্না বাণে নিবাজ।

একৈ মনীত দসৈ দরবাজ॥

পরিশিষ্ট পদ ১৫৭

সাধারণ লোকপ্রচলিত যোগমতবাদী  
তখনকার দিনের যোগীদের প্রতি কবীরের  
কথাষাতও কম তীর্থ নয়। “দশ মূদ্রা কথ্য  
প্রভৃতি লইয়া ভ্রমের ভেক বাঁহিয়া বেড়ান  
যোগী। আসন পবন দূর করিয়াছে পাগল।  
কপটতা ছাড়িয়া, ওরে পাগল, নিতা উপাসনা  
কর, হরিকে। যাকে তুমি চাও, তিনি নিজেই  
গ্রিভুবনকে করিতেছেন সম্ভোগ। কবীর বলেন,  
তবে জগতে তোমার এই যোগ সাধনার আর  
অর্থ কি?”

ডুডা মূদ্রা খিখা আধারী।

ভ্রম কে ভাই তবৈ ভেখারী॥

আসন পবন দূর করি বওরে।

ছোড়ি কপট নিহ হরি ভজ বওরে॥

জিহ ত যাচাই সো গ্রিভুবন ভোগী।

কহি কবীর কৈসো জগ যোগী॥

পরিশিষ্ট পদ ১০৬

আবার এই যোগীকেই তিনি বুঝাইয়া  
আপনার করিয়া লইতেছেন। বলিতেছেন—

“পাগল, মনের ময়লা দে ছাড়িয়া। সংগা

মূদ্রা দেখাইয়া লোককে চমক লাগাইলে আর  
কি ফল? অগো বিভূতি দলেই বা কি?

আসন পবন কইরে দিট বওরে।

মনকা মেল ছাড়ি দে বওরে॥

ক্যা সীগী মুন্না চমকাবে॥

ক্যা বিভূতি সব অংগ লগরে॥

ইত্যাদি

পদ ৩৫৫

ভারপর রূপক ব্যাখ্যার দ্বারা যোগীর  
মতকে তিনি আত্মসাৎ করিয়া লইতেছেন।  
“সেই তো যোগী যার মূদ্রা হইল মনের মধ্যে,  
রাগি দিন সে জাগ্রত তার সাধনায়। মনেই  
তার আসন, মনেই তার স্থিতি, মনের মধ্যেই  
তার জপতপ, মনের সঙ্গেই তার কথাবার্তা।  
মনের মধ্যেই তার খপ্পর, মনের মধ্যেই শিগ্গা,  
অনাহত নাদও সে বাজায় সেইখানেই। পণ্ডকে  
দংশ করিয়া সে করে বিভূতি। কবীর কহেন  
সেই তো জিতবে লঙ্কা।”

সো জোগী জাকৈ মন মৈ মূদ্রা।

রাতি দিবসন করই নিদ্রা॥

মন মৈ আসন মন মৈ রহণী।

মনকা জপ তপ মনসু কহণী॥

মন মৈ খপরা মন মৈ সীগী।

অনহদ বেন বজাবে রংগী।

পণ্ডে পরজারি ভসম করিভুকা।

কহৈ কবীর সো লহসৈ লঙ্কা॥ পদ ২০৬

কবীর তাহাকেই বলিয়াছেন সাক্ষা যোগী  
যে লোকপ্রচলিত সব যোগীপনার অভীত।  
অর্থাৎ সকল সংকীর্ণ বিধিবিধান হইতে মুক্ত  
সাধকই ছিল কবীরের চির আকাঙ্ক্ষিত। তেমন  
সাধককেই তিনি বলিয়াছেন যোগী। অর্থাৎ সেই  
যোগী কবীরের অস্তরের আদর্শমত যোগী।  
এমন সাধকজনের দল বা সম্প্রদায় হয় না।  
দল বান্ধিতে গেলেই নানা ঝুট মিথ্যা আশিয়া  
করে অধিকার। তাই কবীর বলেন, “বাবা,  
যাহার না আছে তীর্থ না আছে রত না আছে  
মেলা তেমন যোগী একা—সংগহীন। তাহার  
নাই কোলা বা পত্র, নাই বিভূতি। অনাহত  
ধ্বনিই তিনি বাজান।”

বাবা জোগী এক অকোলা।

জাকৈ তীর্থ রতন মেলা॥

কোলা পত্র বিভূতি ন বটবা

অনহদ বেন বজাবে॥ ইত্যাদি পদ ২০৭

এই যোগী তো মনের মানুস, ইহাকে  
বাহিরের জগতে পাই কেমনে? “এই যোগীর  
যুক্তি (মর্ম) যে জন বুঝে, সেইজন বিহার  
করে ভগবানের মধ্যে (“রামে রমে”)। গ্রিভুবন  
তাহার হয় উপলব্ধ। প্রকট কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন  
আছে গুপ্ত আধারী, তাহার মধ্যে যে মূর্তি  
সেই তো এই জীবনের প্রিয়। আছেন প্রভু  
নিকটেই। খুঁজিয়া বেড়ায় দূরে। জ্ঞান গৃহহার  
মধ্যে পুরিয়া লও শিগ্গা! কবীর বলেন, যেজন  
ক্ষণে ক্ষণে অমৃতবজ্রীর রস করে পান, সেই  
যুগ যুগ রহে জীবন্ত।”

যা জোগিয়া কী জগতি বুঝে।

রাম রমে তাকৈ গ্রিভুবন সূঝে॥

প্রগট কথা গুপ্ত অধারী।

তামৈ মুরতি জীবনি প্যারী॥

হৈ প্রভু নে রে খোবৈ দূর।

গানি গুফা মৈ সীগী পুরী॥

অমর বোল জো ছিন ছিন পাইবে।

কহৈ কবীর সো জুগ জুগ জীবৈ॥ পদ ২০৫

ব্যাখ্যা যে যোগী তাহার সাধনা বিব-  
ব্রহ্মাণ্ড লইয়া। একমূর্তি ভিকার প্রার্থনায় সে  
হয় নাই বাহির। অখণ্ড পৃথিবী সে মাগে  
ভিক্ষা; কবীর বলেন, সেই যোগীহীতো জগতে  
সার যোগী। জ্ঞানই তাহার কথ্য, ধ্যানকে সূচী  
করিয়া “শব্দের” তাগায় সেই কথ্য ফেলে  
আচ্ছন্ন করিয়া। পণ্ডতত্ত্বের সম্মুখানে সে চলে  
গুরুর পথে। দয়া তাহার খড়ম, কায়াকে সে  
ধনী করিয়া দৃষ্টি অগ্নি রাখে জ্বালাইয়া.....  
সকল যোগের সার রাম-নাম হইল যাহার কায় ও  
প্রাণ। যে তাহার কৃপা পাইয়াছে জীবনে সেই  
সত্যকে করিয়া যায় ঘোষণা।

নবখণ্ডকী প্রথমী মাংগে সো জোগী জগসারা।  
খিখা জ্ঞান ধ্যান করি সূর্য সবদ তাগ মাখি ঘািলে।  
পণ্ডে তত্ত্বকী করি মিরগানী গুরুকে মাংগ চািলে॥  
দয়া ফাহরী কায়াকি ধুংগ

দৃষ্টিকী অগ্নি জলািলে।

সভ জোগগণ রামনাম হৈ জিসকা পিণ্ডে পরানা।  
কহু কবীর জে কিরপা ধারে দেই সচা নিসানা॥

১৪৬ পদ, পরিশিষ্ট

“সেই তো যোগী যাহার সহজ ভাব, অখণ্ড  
প্রেমের ভিক্ষাই যাহার উপজীব্য। অনাহত  
শব্দই যাহার শিগ্গার নাদ, যাহার নাই কাম  
জোখ, নাই বিষয় বাদ” ইত্যাদি।

সো জোগী জাকৈ সহজ ভাই।

অকল প্রীতি কী ভীষ খাই॥

সবংগ অনাহদ সীগীনাদ।

কাম জোখ বিষয়ান বাদ॥ ইত্যাদি পদ ৩৭৭

“এমন আত্মানন্দ যোগীই মহারস পান  
করিয়া করে অমৃত সম্ভোগ।”

আখা অনব্দী জোগী।

পাইবে মহারস অমৃত ভোগী॥ ইত্যাদি

পদ ২০৪

যোগের এই পরিপূর্ণ দৃষ্টি যখন আসে  
তখন আর এই সংসারের মাটির ঘরে থাকিতে  
চায় না মন, তখন ব্যাকুলতা হয় শ্রীহরির সঙ্গে  
গিয়া যুক্ত হইয়া থাকিতে।

ইব ন রহু মাটী কে ঘর মৈ।

ইব মৈ পাই বহু মিখি হরি মৈ॥ ইত্যাদি

পদ ২৭৩

যোগের মূলগত অর্থ এবং তাহার সর্বশেষ  
পরিণতি হইল ভগবানের সঙ্গে প্রেমের মিলনে।  
সকল ধর্মের সমন্বয় চাহিয়াছেন যে কবীর  
তাহার কাছে কি সাধনায় সাম্প্রদায়িকতা আমরা  
আশা করিতে পারি? তাই সকল সাধনাও যুক্ত  
হইয়াছে কবীরের মহাদৃষ্টিতে। বাঘ ও গরুকে  
এক ঘাটে জল খাওয়াইতে পারিলে তবেই বুঝা  
যায় সামর্থ্য। কবীরের সামর্থ্য বুঝি যখন তিনি  
হিন্দু ও মুসলমান সাধনাকে করিয়াছেন  
সংগত, যোগ ও ভক্তিকে করিয়াছেন পরস্পরে  
আসক্ত। তবে একথা সত্য কবীরের কাছে জ্ঞান  
কর্ম যোগ প্রভৃতি সব সাধনাই হইল নদীর  
মত। সকল সাধনার অবসান হইল গিয়া  
ভগবৎ প্রেম সাগরে।



# অশুখের অভিশাপ

শ্রীপ্রমথনাথ বিনী

(২)

জোঁ চান্দীঘি সম্প্রদে কুঙ্করায়ের মন্তব্য  
মোটেই অত্যাধিক নয়। দশানি ও  
হ'আনির বহু-প্রসারিত অট্টালিকাপ্রণয়ী আজ  
জনসংস্পর্শে পরিগত।

এই ভগ্নস্থলপের উপরে, ফাঁকে ফাঁকে,  
যেখানে সুযোগ পাইয়াছে তরলতা গুল্ম  
বনস্পতি অরণ্যের সৃষ্টি করিয়াছে এবং  
মানুষের উত্তরাধিকারীরূপে, শূণ্য, শূন্য,  
সর্প এবং চামচিকার দল সেখানে অধিষ্ঠিত।  
তখনপ্রায় কড়িকাঁগুলিতে চামচিকার দল  
নিম্নের বেলায় নিম্নমুখে ঝুলিয়া থাকে, রাত্রি  
বেলা তাহার পাখার ফড় ফড় শব্দে দল বাঁধিয়া  
ওঠে, চাঁদের আলোয় নাড়িতে তাহাদের ছায়া  
মুঠে আর লুপ্ত শস্যালের দল সেই ছায়া  
শিকারে ক্ষিপ্ত হয়। শূন্যের দল কর্ণ  
ঘুংকারে নিরেট অশ্বকারকে করাতে চিরিবর  
আঘাত করে, আর একটানা ঝিঝির ঝংকার  
নতুন মাথের পালার খজনি বাজাইতে থাকে।  
দিনের বেলা সেই ভগ্নস্থলী নিঃশব্দ রোধ  
করিয়া নিস্তব্ধ পড়িয়া থাকে, কেবল দম্ভ  
বাতাস খসিয়া-পড়া ঝরোখার বিদীর্ণ হুং-  
পিণ্ডের মধ্যে করুণ নিঃশব্দ ধ্বনিত করিয়া  
তোলে আর ঝলিয়া-পড়া দরজা জানলার  
পাল্লাগুলি বাতাসে খুঁটে খাটে শব্দ করিয়া  
গভীর সমর্থন জানায়। বহু বর্ষের অবাধ  
বর্ষা পথঘাট শ্যামল পিচ্ছিল, মানুষের  
পা পড়ে না, শগাল ফুকুর তীক্ষ্ণ নখচিহ্ন  
রাখিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়, যেখানে চৌধুরী  
রূপসীরা অপরাহ্নে বসিয়া চুল বাঁধিত দেখানে  
একান্তে আজ ঢোলকলমীর ফুল ফুটিতেছে,  
ভাঙা মন্ডপের দেয়ালে বনা যুথীর লতা  
উঠিয়াছে, বাতাসে ছিন্নভিন্ন ফুলগুলি দেবতার  
শূন্য বেদীর উপরে বিবর্তিত হয়। লুপ্ত  
গোষ্ঠিকার সংসদ সপ্তরণে বিষধর সর্পের  
দল বিষর আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে।  
ভগ্নস্থলপের গায়ে গায়ে প্রকৃতির শ্যামল,  
মানুষের কাজের অসম্পূর্ণতা পূরণের ভার

প্রকৃতি লইয়াছে। মানুষের কাজ খেব হইলে  
প্রকৃতির কাজ আরম্ভ হয়। ভুলিয়াও জনপ্রাণী  
সেখানে প্রবেশ করে না, রাখালেরও নয়।  
তাহাদের দলচ্যুত গোরু, বাছুরও ব্যক্তি  
আনে না। হারাইয়া-যাওয়া গোরু বাছুর  
খুঁজবার উদ্দেশ্যেও গ্রামের লোক এখানে  
আসিতে চায় না। যেখানে একরা সকলে সানন্দে  
যাতায়াত করিত, আজ সেই স্থানকে তাহাদের  
বড়ই শঙ্কা। মানুষ বনকে ভয় করে না, কিন্তু  
পরিভ্রম জনপদকে তাহার বড় ভয়। মানুষ  
নিজীব পায়াল মূর্তিকে ভয় করে না,  
তবে নিজীব মানবদেহটিকে তাহার ভয় ভয়  
কেন? পরিত্যক্ত পুরী, শূন্য অট্টালিকা এক-  
প্রকার অপার্থিব ব্যস্ত লভ করে, সে শূন্য  
হইয়াও শূন্য নয়, পরিত্যক্ত হইয়াও অধ্যাত  
নিজীব হইয়াও প্রাণবান। ভূতের ব্যস্ত তখন  
তাহাকে অবলম্বন করে।

আবার রাতিবেলা দশানীর ভগ্নস্থলী  
নতুন ব্যস্তির সঙ্গীত হইয়া ওঠে। তখন  
সেখানে নানাপ্রকার অলৌকিক শব্দ ধ্বনিত  
হয়, জোনাকীর আলোতে ছায়াময় কাহারো  
যাতায়াত করে, নেহাঁনের পদব্দ ঘোনা যায়।  
শূণ্য ডাক, সর্প হিংস শব্দকার তোলে,  
শূন্যের ঘুংকার করে, আর চামচিকা ও  
মাদুড়ের দল উড়িয়া উড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া  
আকাশকে উত্তকিত করিতে থাকে। শীতের  
সম্পদার কুরাশ জমা নিঃশব্দস্রোতী অশ্বকারে  
অট্টালিকার বিদীর্ণ শিখরে বসিয়া জড়ন  
পেঁচা গম্ভীর আওয়াজের হাড়িট দৈর্ঘ্যে  
থাকে—কাল পেঁচা অতীত অভিজ্ঞতার সমর্থনে  
ডাকিয়া ডাকিয়া মরে। অসংখ্য স্মৃতির স্রোত  
নিঃশব্দ পায়ে বাড়ির বন্ধে কক্ষে ভ্রমণ করিয়া  
বেড়ায়। মানুষের জগতের সীমান্ত এই মানব-  
বিহীন পুরী।

এই বৃহৎ বাড়ির এক প্রান্তে খানদুই  
খড়ের ঘরে কীর্তিবাসু সপরিবারে বাস করে।  
তাহার চালচলন দারিদ্র্যে, কিন্তু প্রাচীরে ঘেরা  
বলিয়া লোকে তাহার নিদারুণতা জানিতে

পার না। একটুখানি পরিষ্কার জমিতে লাউ-  
কুমড়োর মাচার ফল ফলে, একটুখানি শাক-  
দস্তুরীর বাগান, গোটা কয়েক লংকা গাছে  
লংকা পাকিয়া লাল হয়।

দশানির দেউড়িতে ঘণ্টার ঘণ্টায় আর  
ঘড়ি বাজে না, প্রহরে প্রহরে আর ডংকা বাজে  
না, ছাপরার দারোয়ানের দল আর দম্ভাবেলা  
তুলসীদাসের রামায়ণ গান করে না, কাছারীর  
ঘরে আমলা গোমস্তার দল নাই, সেখানে পাড়ার  
লোকের গোরু ছাগল বন্দিতে আনিয়া আশ্রয়  
নেয়। দশানির ভগ্ন ঐশ-মন্দির প্রণত  
পূজার্থীর মতো উপড় হইয়া পড়িয়া আছে।

ছ'আনির নবীন নারায়ণ কলিকাতায়  
চলিয়া গিয়াছেন, আর আসে নাই। সেখানে  
অগণ্যের হিড় সে মাথা লুকাইয়াছে, কিন্তু  
কীর্তিনারায়ণের ভাগ্যে সে সাক্ষ্যনাট্য জোটে  
নাই, সে নিজেই একটা ভগ্নস্থলপের মতো  
পড়িয়া আছে, যদি একেবারে নিঃশেষে লুপ্ত  
হইতে পারিত। কীর্তিনারায়ণ ভাবে নবীন-  
নারায়ণ ভাবমান। দারিদ্র্যের চেয়েও  
অধিকতর শোচনীয় অতীত ঐশ্ব্যের স্মৃতি।

নবীননারায়ণ কলিকাতায় গিয়া মাথা  
লুকাইয়াছে—সেখানে কে কাহাকে চেনে?  
সেখানে তরুণের পর তরুণ, স্রোতকে স্রোত  
ঠেলা মারিতেছে, সেখানে নিত্য নতনের ভিড়,  
সেখানে আজকের তলে গতকলা চাপা  
পড়িতেছে, সেখানে কয়াকে হাসি দিয়া  
লুকাইতে, দুঃখকে সুখের ছদ্মবেশ  
পড়িতে, অতীতকে বর্তমানে পরিণত করিতে  
অপেক্ষা পেণ্ড পাইতে হয় না। যেখানে নিত্য  
নতন লব্ধ, নিত্য নতন সমস্যা, সেখানে  
অনন্তনের কটাহে চিরন্তনের পাক চলিতেছে।  
কলিকাতা চিরপ্রবাহমান নদী।

জোড়ারীষ্য পুরাতন সরোবর। চরিত্রিকের  
কলমে আদম্ভ, কতকালের সংস্কারে পঙ্কিল,  
সেখানে অতীত চিরন্তন হইয়া আছে, অন্য  
সেখানে প্রবেশ করিতে পার না, অতীত সেখানে  
বর্তমান। সেখানে মাথা লুকাইবার স্থান  
কোথায়? সেই দীর্ঘতে পঙ্ক ও পঙ্ক  
দুইয়েরই আশ্রয়। সেখানে অতল স্নেহ  
করনা, অগাধ শীতলতা এবং স্নিগ্ধ  
গভীর পঙ্ক। বাঙলা দেশের গ্রামিয়া বলিল,  
মধুর, কাছে হইতে কষায়, শূন্য ভরাট হয়ে  
কপনসায় উজ্জ্বল। বাঙলার আচারদিকের জনপদ  
পঙ্কী নিষ্কলুষ ধবতরা দীপ্তা দেয়।  
মরুভূমি নাই, রুদ্ধ গিরি, বলিল, বেশ তা ন  
বহিঃব্যাপ নাই? কল্পনা দীর্ঘের বড়ো অশু  
ঘড়ির না?

নগরগুলি স্বর্ণমণ্ডপ নয় বটে, কিন্তু সে  
পঙ্কী স্বর্ণপদ্ম ফুটাইয়া, সেই বংশের

খুঁটিতে তত্ত্বের ভাঁত টানা দিয়া রচনা হইয়াছে এই বস্তু। মনের নিশ্চল আসনে বসিয়া “রসনার উপজে রস।” এই সংগীতেই মিটিয়া যার ভবের আসা যাওয়া।

জোগিয়া তনকী জগৎ বহাই

জা’ তেরা আবা গমন মিটাই॥

তন করি তাঁতি ধর্ম করি ডাঙী

সত কী সারি লগাই।

মন করি নাহিচল আসন নিহচল

রসনা রস উপজাই॥

২০৮

এখানে ২০৪, ২০৫, ২০৯, ২১০,

২১১ পদে নানাভাবে যোগকে অধ্যাত্ম সাধনার অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

তখনকার দিনে একদিকে প্রবল মুসলমান সাধনা আর একদিকে প্রবল যোগীদের যোগ সাধনা। উভয়কেই কবীর স্বীকার করিয়াছেন। অথচ আপনার ভাবে। মুসলমান ধর্মকে তিনি কম আঘাত করেন নাই (দ্র সাচ কৌতুহল, ৫—৯ প্রভৃতি বহু বহু স্থান)। যোগীর উড়ংকেও তিনি বিস্তার আঘাত করিয়াছেন। “যোগী পড়ে বিয়োগ কই ঘর দূর হৈ” ইত্যাদি কবীরেরই তীর্থ কথায়। মনে মনে তিনি বুঝিয়াছেন যে আঘাত করিয়া ফল নাই। তখন তিনি এই সব শক্তিকে আপনার ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া রূপকের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া লইতে চাহিয়াছেন আত্মসাৎ করিয়া।

মুসলমানকে তিনি বলিতেন, “মনকে কর মজা, দেহীকে কর কিবলা। এই কায় মসজিদই তো দশ দ্বার। সেখানেই গিয়া দাও বাগ?”

মন করি মজা বিবসা করি দেহী।

বোলন হারু পরম গুরু এহী॥

কহরে মুদ্রা বাগ নিবাজ।

একৈ মনীতি দৈসে দরবাজ॥

পরিশিষ্ট পদ ১৫৭

সাধারণ লোকপ্রচলিত যোগমতবাদী

তখনকার দিনের যোগীদের প্রতি কবীরের কশাঘাতও কম তীর্থ নয়। “দণ্ড মুদ্রা কথ্য প্রভৃতি লইয়া ভ্রমের ভেক বাঁয়া বেড়ান যোগী। আসন পবন দূর করিয়াছে পাগল। কপটতা ছাড়িয়া, ওরে পাগল, নিভা উপাসনা কর, হরিকে। যাকে ছুঁমি চাও, তিনি নিজেই ত্রিভুবনকে করিতেছেন সম্ভোগ। কবীর বলেন, তবে জগতে তোমার এই যোগ সাধনার আর অর্থ কি?”

জডা মুদ্রা খিৎখা আধারী।

ভ্রম কে ভাই ভঁবে তেখারী॥

আসন পবন দূর করি বওরে।

ছোড়ি কপট নিহ হরি ভজ বওরে॥

জিহ ত, যাচাই সো ত্রিভুবন ভোগী।

কহি কবীর কৈসো জগ জোগী॥

পরিশিষ্ট পদ ১০৬

আবার এই যোগীকেই তিনি বুঝাইয়া আপনার করিয়া লইতেছেন। বলিতেছেন—

“পাগল, মনের ময়লা দে ছাড়িয়া। সিংগা

মুদ্রা দেখাইয়া লোককে চমক লাগাইলে আর কি ফল? অগ্নে বিভূতি দেলেই বা কি?

আসন পবন কইর দিট বহুরে।

মনকা মেল ছাড়ি দে বৌরে॥

ক্যা সীগী মুদ্রা চমকাবে।

ক্যা বিভূতি সব অগ্নি লগরে॥

ইত্যাদি

পদ ৩৫৫

ভারপূর্ণ রূপক ব্যাখ্যার দ্বারা যোগীর মতকে তিনি আত্মসাৎ করিয়া লইতেছেন। “সেই তো যোগী যার মুদ্রা হইল মনের মধ্যে, রাত্রি দিন সে জাগ্রত তার সাধনায়। মনেই তার আসন, মনেই তার স্থিতি, মনের মধ্যেই তার জগতপ, মনের সঙ্গেই তার কথাবার্তা। মনের মধ্যেই তার খপ্পর, মনের মধ্যেই শিঙা, অনাহত নাদও সে বাজায় সেইখানেই। পশুকে দগ্ধ করিয়া সে করে বিভূতি। কবীর কহেন সেই তো জীতিবে লক্ষ্য।”

সো জোগী জাকৈ মন মৈ মুদ্রা।

রাত্রি দিবসন করই নিদ্রা॥

মন মৈ আসন মন মৈ রহণী।

মনকা জপ তপ মনসু কহণী॥

মন মৈ খপরা মন মৈ সীগী।

অনহদ বেন বজাবে রংগী॥

পঞ্চ পয়জারি ভসম করিভুকা।

কই কবীর সো লহসৈ লক্ষ্য॥

পদ ২০৬

কবীর তাহাকেই বলিয়াছেন সাদ্ধা যোগী যে লোকপ্রচলিত সব যোগীপনার অতীত। অর্থাৎ সকল সংকীর্ণ বিধিবিধান হইতে মুক্ত সাধকই ছিল কবীরের চির আকাঙ্ক্ষিত। তেমন সাধককেই তিনি বলিয়াছেন যোগী। অর্থাৎ সেই যোগী কবীরের অন্তরের আদর্শমত যোগী। এমন সাধকজনের দল বা সম্প্রদায় হয় না। দল বান্ধিতে গেলেই নানা ঝুটো মিথ্যা আদিসয়া করে অধিকার। তাই কবীর বলেন, “বাবা, যাহার না আছে তীর্থ না আছে ব্রত না আছে মেলা তেমন যোগী একা—সংগহীন। তাহার নাই ঝোলা বা পত্র, নাই বিভূতি। অনাহত ধর্নিই তিনি বাজন।”

বাবা জোগী এক অকেলা।

জাকৈ তীর্থ রতন মেলা॥

ঝোলা পত্র বিভূতি ন বটবা

অনহদ বেন বজাবে॥

ইত্যাদি

পদ ২০৭

এই যোগী তো মনের মানুষ, ইহাকে বাহিরের জগতে পাই কেমনে? “এই যোগীর যুক্তি (মর্ম) যে জন বুঝে, সেইজন বিহার করে ভগবানের মধ্যে (“রামে রমে”)। ত্রিভুবন তাহার হয় উপলক্ষ্য। প্রকট কথ্যার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে গুপ্ত আধারী, তাহার মধ্যে যে মূর্তি সেই তো এই জীবনের প্রিয়। আছেন প্রভু নিকটেই। খুঁজিয়া বেড়ার দূরে। জ্ঞান গুহার মধ্যে পুরিয়া লও শিঙা! কবীর বলেন, যেজন ক্ষণে ক্ষণে অমৃতবজ্রীর রস করে পান, সেই যুগ যুগ রাহে জীবন্ত।”

বা জোগিয়া কী জগতি বটৈ।

রাম রমে তাকৈ ত্রিভুবন সটৈ॥

প্রগট কথা গুপ্ত আধারী।

ভামৈ মুরতি জীবনি পারী॥

হৈ প্রভু নে রে খোকে দুরি।

গান গুফা মৈ সীগী পুরি॥

অমর বোল জো ছিন ছিন পাইবৈ।

কই কবীর সো জগ জগ জীবৈ॥

পদ ২০৫

বথার্থ যে যোগী তাহার সাধনা বিশ্ব-

ব্রহ্মাণ্ড লইয়া। একমুষ্টি ভিক্ষার প্রার্থনায় সে

হয় নাই বাহির। অখণ্ড পৃথিবী সে মাগে

ভিক্ষা; কবীর বলেন, সেই যোগীহীতো জগতে

সার যোগী। জ্ঞানই তাহার কথা, ধ্যানকে সূচী

করিয়া “শব্দের” তাগায় সেই কথা ফেলে

আচ্ছন্ন করিয়া। পশুতত্ত্বের সম্মুখীন সে চলে

গুরুর পথে। দয়া তাহার খড়ম, কায়াকে সে

ধনীর করিয়া দৃষ্টি অগ্নি রাখে জ্বালাইয়া.....

সকল যোগের সার রাম-নাম হইল যাহার কায় ও

প্রাণ। যে তাহার কৃপা পাইয়াছে জীবনে সেই

সত্যকে করিয়া যায় ঘোষণা।”

নবখণ্ডকী প্রথমী মাগৈ সো জোগী জগসারা।

খিৎখা জ্ঞান ধ্যান করি সূর্য সবদ ভাগ মথি ঘাটে।

পঞ্চ ততকী করি মিরগানী গুরুকে মারগ চালে॥

দয়া ফাহরী কায় করি ধুংগ

দৃষ্টিকী অগ্নি জ্বায়ে।

সভ জোগণ রামনাম হৈ জিসকা পিণ্ড পরানা।

কহু কবীর জে কিরপা ধারে দেই সচা নিসানা॥

১৪৬ পদ, পরিশিষ্ট

“সেই তো যোগী যাহার সহজ ভাব, অখণ্ড

প্রেমের ভিক্ষাই যাহার উপজীব্য। অনাহত

শব্দই যাহার শিঙার নাদ, যাহার নাই কাম

ক্লেদ, নাই বিষয় বাদ” ইত্যাদি।

সো জোগী জাকৈ সহজ ভাই।

অকল প্রীতি কী ভীম খাই॥

সবংগ অনাহদ সীগীনাদ।

কাম ক্লেদ বিষয়ান বাদ॥

ইত্যাদি পদ ৩৭৭

“এমন আত্মানন্দ যোগীই মহারস পান

করিয়া করে অমৃত সম্ভোগ।”

আত্ম অনন্দী জোগী।

পাবে মহারস অমৃত ভোগী॥

ইত্যাদি

পদ ২০৪

যোগের এই পরিপূর্ণ দৃষ্টি যখন আসে

তখন আর এই সংসারের মাটির ঘরে থাকিতে

চায় না মন, তখন ব্যাকুলতা হয় শ্রীহারির সঙ্গে

গিয়া যুক্ত হইয়া থাকিতে।

ইব ন রহু মাটী কে ঘর মৈ।

ইব মৈ পাই বহু মিথি হরি মৈ॥

ইত্যাদি

পদ ২৭০

যোগের মূলগত অর্থ এবং তাহার সর্বশেষ

পরিণতি হইল ভগবানের সঙ্গে প্রেমের মিলনে।

সকল ধর্মের সমন্বয় চাহিয়াছেন যে কবীর

তাহার কাছে কি সাধনায় সাম্প্রদায়িকতা আমরা

আশা করিতে পারি? তাই সকল সাধনাকে যুক্ত

হইয়াছে কবীরের মহাদৃষ্টিতে। বাঘ ও গরুকে

এক ঘাটে জল খাওয়াইতে পারিলে তবেই বুঝা

যায় সামর্থ্য। কবীরের সামর্থ্য বুঝি যখন তিনি

হিন্দু ও মুসলমান সাধনাকে করিয়াছেন

সংগত, যোগ ও ভক্তিকে করিয়াছেন পরস্পরে

আসক্ত। তবে একথা সত্য কবীরের কাছে জ্ঞান

কর্ম যোগ প্রভৃতি সব সাধনাই হইল নদীর

মত। সকল সাধনার অবসান হইল গিয়া

ভগবৎ প্রেম সাগরে।



## শ্রীপ্রমথনাথ বিনী

(২)

জোঁ হাদীঘি সম্বন্ধে কৃষ্ণায়ের মন্তব্য মোটেই অতীতি নয়। দশানি ও ছ'আনির বহু-প্রসারিত অট্টালিকাপ্রণয়ী আজ ভগ্নস্বতপে পরিণত।

এই ভগ্নস্বতপের উপরে, ফাঁকে ফাঁকে, সেখানে সন্ধ্যা পাইয়াছে তরলতা গ্লেম্বনস্পতি অরণ্যের সৃষ্টি করিয়াছে এবং মানুষের উত্তরাধিকারীরূপে, শূগল, শূকর, সর্প এবং চামচিকার দল সেখানে অধিষ্ঠিত। ভগ্নপ্রায় কড়িকাটগুলোতে চামচিকার দল দিনের বেলায় নিম্নমুখে ঝুলিয়া থাকে, রাত্রি ফেরা ভাবারা পাখার কড় ফড় শব্দে দল বাঁধিয়া ওড়ে, চাঁদের আলোয় মাটিতে তাহাদের ছায়া পড়ে, আর লুপ্ত শৃঙ্গালের দল সেই ছায়া নিকারে বিপ্লবিত হয়। শূকরের দল কর্শ ঘুংকারে নিরেট অন্ধকারকে করাতে গিরিবর আয়াশ করে, আর একটানা ঝিঝির কংকার নতুন মাথুর পালার খঞ্জনী বাজাইতে থাকে। দিনের বেলা সেই ভগ্নস্বতপে নিঃশ্বাস রোধ করিয়া নিম্নমুখে পড়িয়া থাকে, কেবল দমকা বাতাস খসিয়া-পড়া বরোখার বিদীর্ণ হুং-পিংয়ের মধ্যে কর্শ নিঃশ্বাস ধ্বনিত করিয়া তোলে আর ঝুলিয়া-পড়া দরজা জানলার পায়গাগুলি বাতাসে খুঁটে খাটে শব্দ করিয়া গভীর সমর্থন জানায়। বহু বর্ষার আবাস বর্ষার পথঘাট শ্যামল পিচ্ছিল, মানুষের পা গড়ে না, শূগল ফুড়ুর তীব্র নখচিহ্ন রাখরা রাখিয়া চলিয়া যায়, যেখানে চোঁধুরী রূপসীরা অপরাহ্নে বসিয়া চুল বাঁধিত দেখানে একান্তে আজ ঢোলকলমীর ফুল ফটিতেছে, ভাঙা মন্ডপের দেয়ালে বন্য যুখীর লতা উঠিয়াছে, বাতাসে ছিন্নভিন্ন ফুলগুলি দেবতার শূন্য বেদীর উপরে বর্ষিত হয়। লুপ্ত গোপিকার সর্গদ সঞ্চারে বিষধর সর্পের দল বিবর আঁকিড়িয়া পড়িয়া থাকে। ভগ্নস্বতপের গায়ে গায়ে প্রকৃতির শ্যামল, মানুষের কাজের অসম্পূর্ণতা প্রণয়ের ভার

প্রকৃতি লইয়াছে। মানুষের কাজ শেষ হইলে প্রকৃতির কাজ আরম্ভ হয়। ভুলিয়াও জনপ্রাণী সেখানে প্রবেশ করে না, রাখালেরাও নয়। তাহাদের দলচূত গোরু বছরও বৃষ্টি এতকি আসে না। হারাইয়া-মাওরা গোরু বছর খুঁজবার উদ্দেশ্যেও গ্রামের লোক এখানে আসিতে চায় না। যেখানে একদা সকলে মানন্দে বাতায়ত করিত, আজ সেই স্থানকে তাহাদের বড়ই শঙ্কা। মানুষ বনকে ভয় করে না, কিন্তু পরিত্যক্ত জনপদকে তাহার বড় ভয়। মানুষ নিজীব পাবাণ মূর্তিকে ভো ভয় করে না, তবে নিজীব মানবদেহটাকে তাহার এত ভয় কেন? পরিত্যক্ত পরী, শূন্য অট্টালিকা এক-প্রকার অপার্থিব বাস্তব লাভ করে, সে শূন্য হইয়াও শূন্য নয়, পরিত্যক্ত হইয়াও অধ্যুষিত নিজীব হইয়াও প্রাণবান। ভূতের ব্যস্তির তখন তাহাকে অবলম্বন করে।

আবার রাতিবেলা দশানীর ভগ্নস্বতপে নতুন ব্যস্তির সঞ্জীবিত হইয়া ওঠে। তখন দেখানে নানাপ্রকার অলৌকিক শব্দ ধ্বনিত হয়, জোনাকীর আলোতে ছায়াময় কাহারো বাতায়ত করে, দেহহীন পদশব্দ শোনা যায়। শূগল ডাকে, সর্প হিংস্র শব্দকার তোলে, শূকরে ঘুংকার করে, আর চামচিকা ও বাদুড়ের দল উড়িয়া উড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশকে উজ্জ্বল করিতে থাকে। শীতের সন্ধ্যার কুয়াশা-জমা নিঃশ্বাসরোধী অন্ধকারে অট্টালিকার বিদীর্ণ শিখরে বসিয়া প্রথম পেঁচা গভীর আশ্রয়ের হাড়তি টুকিতে থাকে—কাল পেঁচা অতীত অভিজ্ঞতার সমর্থনে ডাকিয়া ডাকিয়া মরে। অসংখ্য স্মৃতির স্রোত নিঃশব্দ পায়ে বাড়ির কঁকে কঁকে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। মানুষের জগতের সীমান্তে এই মানব-বিহীন পরী।

এই বহু বাড়ির এক প্রান্তে খানদুই খড়ের ঘরে কীর্তিবাবু সপরিবারে বাস করে। তাহার চালচলন দরিদ্রের, কিন্তু প্রাচীরে ঘেরা বলিয়া লোকে তাহার নিদারুণতা জানিতে

পার না। একটুখানি পরিষ্কার জমিতে লাউ-কুমড়োর মাচায় ফল ফলে, একটুখানি শাক-সব্জীর বাগান, গোটা কয়েক লংকা গাছে লংকা পাকিয়া লাল হয়।

দশানির দেউড়িতে ঘণ্টার ঘণ্টার আর ঘড়ি বাজে না, প্রহরে প্রহরে আর ডংকা বাজে না, ছাপরার দারোয়ানের দল আর সন্ধ্যাবেলা তুলসীদাসের রামায়ণ গান করে না, কাছারীর ঘরে আমলা গোমস্তার দল নাই, সেখানে পাড়ার লোকের গোরু ছাগল বন্দিতে আদিয়া আশ্রয় নেয়। দশানির ভগ্ন শিব-মন্দির প্রণত পূজার্থীর মতো উপড় হইয়া পড়িয়া আছে।

ছ'আনির নবীন নারায়ণ কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন, আর আসে নাই। সেখানে অগণের ভিড়ে সে মাথা লুকাইয়াছে, কিন্তু কীর্তিনারায়ণের ভাগ্যে সে সান্ফনটুকু জোটে নাই, সে নিজেই একটা ভগ্নস্বতপের মতো পড়িয়া আছে, যদি একেবারে নিঃশেষে লুপ্ত হইতে পারিত। কীর্তিনারায়ণ ভাবে নবীন-নারায়ণ ভাগবান। দারিদ্রের চেয়েও অধিকতর শোচনীয় অতীত ঐশ্বর্যের স্মৃতি।

নবীননারায়ণ কলিকাতায় গিয়া মাথা লুকাইয়াছে—সেখানে কে কাহাকে চেনে? সেখানে তরঙ্গের পর তরঙ্গ, স্রোতকে স্রোত ঠেলা মারিতেছে, সেখানে নিত্য নৃতনের ভিড়, সেখানে আজকের তলে গতকলা চাপা পড়িতেছে, সেখানে কাহাকে হাসি দিয়া লুকাইতে, দুঃখকে সুখের ছদ্মবেশ পড়াইতে, অতীতকে বর্তমানে পরিণত করিতে জিহ্বা বেগে পাইতে হয় না। যেখানে নিত্য নৃতন মৃদু, নিত্য নৃতন দমস্যা, সেখানে অতীতের কটাহে চিরন্তনের পাক চলিতেছে। কলিকাতা চিরপ্রবহমানা নদী।

জোঁহাদীঘি পুরাতন সরোবর। চরিত্রিকের কলে আবদ্ধ কংকালের সংস্কারে পিচ্ছিল, সেখানে অতীত চিরন্তন হইয়া আছে, অন্য যেখানে প্রবেশ করিতে পায় না, অতীত সেখানে বর্তমান। সেখানে মাথা লুকাইবার স্থান কোথায়? সেই দীর্ঘতে পঙ্ক ও পঙ্ক দুইয়েরই আশ্রয়। সেখানে অতল স্নেহ, করুণা, অগাধ শীতলতা এবং স্নিগ্ধ গভীর পঙ্ক। বাঙলা দেশের গ্রাম মধুর, কাছে হইতে কহায়, কংকনায় উজ্জ্বল। বাঙলার অ-পল্লী নিম্নলিখিত প্রবেশতায় ময়ূরুদ্র নাই, রুদ্রা গিরি বহিঃপ্রাণ নাই? কংকন ঘুচিবে না?

নগরগুলি স্বর্ণমণ্ড পল্লী স্বর্ণপদ্ম ফুটাইয়।

হেরফের ঘূচিবে কবে? স্বর্ণপদ্মের স্বর্ণ যেমন মায়া, স্বর্ণমগের স্বর্ণও তো, তেমন মিথ্যা! তাই বলিয়া দুই-ই কি সমান অবাস্তব? অন্ততঃ শিল্পে মায়ার স্থান আছে, মিথ্যার স্থান কোথায়?

দুর্লভ চৌকিদার নামে একজন মুসলমান জোড়াদীঘীতে বাস করিত। এক সময়ে সে চৌকিদার করিত। তারপর ফকির গ্রহণ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিল। অল্প-কালের মধ্যেই সে বৃদ্ধিতে পারিল চাকুরির চেয়ে ভিক্ষাতে লাভ বেশ, খাটুনি অনেক কম। তখন সে স্থায়ীভাবে ভিক্ষা আরম্ভ করিল এবং এই উপলক্ষে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহার স্ত্রী পুত্র কেহ ছিল না। গ্রামে খান দুই ঘর মাত্র ছিল। গ্রাম ত্যাগ করবার পরে অল্প-কালের মধ্যেই তাহার ঘর দু'খানা পড়িয়া গেল। তাহার বড় ক্ষতি হইল না, কেন না, গ্রামে সে কখনো কদাচিৎ মাত্র ফিরিত। কালে-ভদ্রে যখন আসিত, অপরের বাড়িতে আশ্রয় লইত। আহাের অভাবও হইত না, দশানির বাড়িতে আসিয়া পাত পাতিয়া বসিলেই হইল। একবার সে ভিক্ষা করিতে করিতে মক্কা যাইবার মানসে বাহির হইল। সে মক্কা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু এই উপলক্ষে জোড়াদীঘীতে আট দশ বৎসর অনুপস্থিত ছিল। এবারে যখন সে গ্রামে আসিল তখন গ্রামের বিরাট পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। সে তাহার কিছুই জানিত না।

গ্রামে আসিয়া ভাবিল একবার বড়গাঙ্গুর সহিত দেখা করা উচিত; সে এখন ফকির হইলেও গ্রামের বাবু তাহার জমিদার তো দুষ্টে, তাহা ছাড়া সে যখন গ্রামে আসিত কীৰ্ত্তি-নারায়ণ তাহাকে খান দুই নতুন কাপড়, কয়েকটা টাকা দিতেন। সে কিছুদিন দশানির বাড়িতে চাকুরি করিয়াছিল।

দুর্লভ খিড়কি দরজা দিয়া কীৰ্ত্তি-নারায়ণের নতুন বৈঠকখানার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। কীৰ্ত্তিবাবু তখন একখানা তক্তাপোষের উপরে বসিয়া সংবাদপত্রে মূগ্ধিত এক বিজ্ঞাপনের মহিলার নাকের নীচে কালি দিয়া গোঁফ সংযোজন করিতেছিল। দুর্লভ 'ম' করিয়া আসিয়া দাঁড়াইতেই কীৰ্ত্তি-চমকিয়া উঠিল এবং একবার মাত্র তাহার যা তাড়াতাড়ি কাগজ কলম ফেলিয়া ব ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। অপেক্ষা করিয়া থাকিল, বাবু না, তখন সে একবার চাবি-হিয়া দেখিয়া একটা দীর্ঘ-বয়া কপালে হাত ঠেকাইয়া গেল।

সিয়া শুনিয়াছিল যে আগের মত নাই—কিন্তু

এমন যে হইয়াছে তাহার কিছুই জানিত না। আগে জানিলে কখনই সে যাইত না। দুর্লভ অনেক দেশ, অনেক লোক দেখিয়াছে, সংসারের গতিবিধি সে যেমন বোঝে গ্রামের স্থায়ী লোকদের তেমন বুঝিবার কথা নয়। সে বেশ বৃদ্ধিতে পারিল বাবু তাহাকে দেখিয়া লজ্জায় পলায়ন করিল। বাহার গ্রামে আছে তাহাদের অভ্যস্ত দৃষ্টির কাছে বাবুর লজ্জা নাই, কিন্তু বহুকাল পরে আগত তাহার দৃষ্টিতে বড়বাবু যে নিজের দারিদ্র্য আবার নতুন কলিয়া দেখিল—একথা দুর্লভ বৃদ্ধিতে পারিল। তাহার মুখ দিয়া কেবল বাহির হইল—হা আয়া, এ কি করলাম! আর তুমিই বা এ কি করেছো?

সেই দিনই সে জোড়াদীঘি ত্যাগ করিল—আর কখনো সে গ্রামে ফেরে নাই।

\* \* \*

নবীননারায়ণ তাহার কলিকাতার বাসায় সারাদিন একাকী বসিয়া থাকে। কীৰ্ত্তি-নারায়ণের মতো তাহার দারিদ্র্য নিশ্চন্দ্র নহে, তাহা হইলে সে কলিকাতায় থাকিতে পারিত না। বর্তমান তাহার জোড়াদীঘির বিষয়-সম্পত্তি, বাড়িঘর অক্ষুণ্ণ ছিল গ্রামের আসক্তি সে কচিৎ অনুভব করিত। কিন্তু আজ যখন তাহার সেখানে কিছু নাই বলিলেই হয়, প্রতি মুহূর্তে অন্তরের শিরা উপশিয়ার মধ্যে সে গ্রামের টান অনুভব করে। দ্রুতস্থানই অনুভূত হয়। জানলা দিয়া সে দেখিতে পায় পথে অগণ্য পথিক, গ্রাম, বাস কতরকম স্থান-বাহনের অবিরল আনাগোনা। সে দেখিতে পায় বৃক্ষচূড়ে গুলমোরের একটানা রক্তমা, আরও উচ্চে অদৃশ্য কারখানার চিমনির ধোঁয়ার প্রলেপ বিস্তার, তারও উচ্চে নির্মেষ নীলিমায় প্রসারিত-পক্ষ চিলের সন্তরণ! সে দেখিতে পায় নদীর পরপারে বন-ঝাউগুলি বাতাসে দুলিতেছে, গোটা দুই বক এক পা এক পা করিয়া সন্তরণে অগ্রসর হইতেছে, কচুরি-পানার প্রগাঢ় শ্যামলের উপরে বেগুনি ফুলের গুচ্ছ! তাহার চোখে ভাসিয়া ওঠে, টোকা-মাথায় কৃষ্ণ লাঙলের উপরে ঈষৎ নত হইয়া পড়িয়া চাষ করিতেছে, মাঠের অপর প্রান্তে একখানা বোঝাই গোরুরগাড়ী গাছপালার আড়ালে একবার লুক্কায়িত, একবার প্রকাশিত, সে দেখিতে পায় দূরবর্তী বটগাছের তলে জন-কয়েক লোক আসিয়া মাথার মোট নামাইয়া বসিল। তাহার কানে আসে জেলে নৌকার বৈঠা ফেলিবার ছপাছপ শব্দ, মোটরের হুংকার, হাটের কোলাহল, 'ওরে আজ কি মাঠ থেকে গোরু আনতে হবে না?' 'টেলিগ্রাফ, টেলিগ্রাফ, বড় গোলমাল!' কল্পনা ও বাস্তবের মিশ্র তন্তুতে তাহার চিন্তার বয়ন চলিতে থাকে। জোড়াদীঘির প্রেত তাহার স্কন্ধে ভর

করিয়াছে! হঠাৎ সে শুনিলে পায়—অনেক পড়েছো, এবারে ওঠো। সে চমকিয়া উঠিয়া দেখে মুক্তামালা।

মুক্তামালা বলে—পড়ে পড়েই দেখাছ শরীর নষ্ট করবে।

নবীন বলে—কই পড়লাম আর কোথায়?

তাহার কথা মিথ্যা নয়, বইখানা উপড় করিয়া রক্ষিত, বইয়ের কথা সে ভুলিয়াই গিয়াছে।

মুক্তামালা তাহার স্বামীর নীরব দুঃখের সমস্ত ইতিহাস জানে, কিন্তু কখনো সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করে না, কারণ তাহাতে নবীনের দুঃখ বাড়িবে বই কামিবে না। নবীন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে সে এড়াইয়া যায়।

আজ নবীন বলিল—মুক্তি নিজের দোষে সব নষ্ট করলাম!

মুক্তামালা বলিল—কি যে বলো! আমাদের ছেলেমেয়ে নাই, এত বিষয়-সম্পত্তির কি-বা প্রয়োজন ছিল?

নবীন বলে—নষ্ট করবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? মুক্তি তুমি বুঝবে না পৈঠক সম্পত্তি নষ্ট করবার কি দ্বৈধ!

মুক্তামালা বলে—তুমি তো ভাল করতেই গিয়েছিলে—

নবীন বলে—ভালো করবার পস্থা না জেনে—ভালো করতে গিয়েছিলাম!

প্রসঙ্গের মোড় ঘুরাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে মুক্তামালা একখানা টাইমটেবল আনিয়া নবীনের সম্মুখে ফেলিয়া বলে—নাও, দেখো, ডেটনাগপুর কিম্বা সওভাল পরগণায় গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসা যাক।

নবীন নড়ে না। আগের উৎসাহ তাহার নাই।

মুক্তামালা বলে—সেখানে খরচ অনেক কম। খরচের প্রশ্নে নবীন সক্রিয় হইয়া ওঠে।

মুক্তামালার অলঙ্কারগুলি সে নষ্ট করিয়াছিল, আর উদ্ধার করিতে পারে নাই। মুক্তামালার মুখে টাকার প্রশ্নে সে সঙ্কোচ অনুভব করে। সে তাড়াতাড়ি টাইমটেবল দেখিতে বসে।

মুক্তামালা বলে—বাবু! ও সঙ্গে যাবে।

৩

ছ'আনির ভণ্ড বাড়িতে একাকী জগার মা বাস করে। নবীন তাহাকে কলিকাতায় আনিবার প্রস্তাব করিয়াছিল—জগার মা বলিল—না, বাবু, সে হবে না। যে-কটা দিন বাঁচি, এখানেই থাকবো!

তারপরে স্বগতভাবে বলে—কতী মরবার সময়ে বাড়ির ভার আমাকে দিয়ে গিয়েছেন, আমি কি অনাথানে যেতে পারি?

এই বলিয়া সে চাবির গোছা নাড়ে।

জগার মা চাবির গোছা লইয়া একখানা লাঠি ভর করিয়া বাড়ির ঘরদোর তদারক করিয়া বেড়ায়। সন্ধ্যা হইলে একটা তেল প্রদীপের আলোয় দেখিয়া বেড়ায় দরজাগুলি

বন্দ আছে কি না! অধিকাংশ ঘরের দরজাই আছে—তাহার বোঁশ আর কিছু নাই। কোন দরজা খোলা দেখিলে সন্তর্পণে সে চাবি জাটিয়া দেয়। প্রাচীর-ভাঙা, ছাদ ধ্বংসিয়া-পড়া দরজায় ভালো বন্ধ করিতে করিতে সে বলে—যতদিন জগার মা ষেঁটে আছে, তোমার বাড়ি-ঘর খোয়া যাবে না, কতটুকু, সব ঠিক থাকবে।

গাঁয়ের লোকে বলে বড়ি পাগল হয়ে গিয়েছে।

কথাটা কখনো কোন সূত্রে তাহার কানে আসিলে সে বলে—পাগল হয়ে গিয়েছি! কই কোন পাগলের চাবির গোছা এমন ঠিক থাকে। কেউ আমার কাছে থেকে চাবির গোছা ঠিকিয়ে নিক তো! দেখবো তারা কেমন মাথা-ঠিক লোক! পাগল হয়ে গিয়েছে! জগার মা পাগল হয়ে গিয়েছে!

তারপরে সে নিজের মনে বিড় বিড় করিয়া বলিতে থাকে—নিম্নদুক বলে ঘরবাড়ী সব ভেঙে গিয়েছে! হাঁ, একটু পুরনো হয়েছে। একি তোদের হঠাৎ-নবাবের বাড়ী যে বক বক করবে? কত কালের পুরনো ঘর—পুরনো টাকাতাই ময়লা পড়ে।

তারপরে হাসিয়া বলে—পাগলই হলো আর ছাগলই হলো চাবির গোছা আমার ঠিক আছে।

তারপরে পরলোকগত কতটুকু উদ্দেশ্যে অপমানাকৃত উচ্চস্বরে বলে—তোমার কোন ভয় নেই কতটুকু! যতদিন জগার মা আছে তোমার বাড়িঘর দোর কিছু খোয়া যাবে না।

সম্ভা আসন্ন হইলে তেল প্রদীপ লইয়া লাঠি ঠুকঠুক করিয়া ঘরম্বার পর্যবেক্ষণ করিতে সে বাহির হয়। দরজার কাছে মাটিতে তেল প্রদীপটি রাখিয়া গুচ্ছ হইতে একটা চাবি বাছিয়া লয়, সেটা চোখের অত্যন্ত নিকটে ধরিয়া একবার দেখে, তারপরে মচধরা কুলুপে আচ্ছা করিয়া ঘুরাইয়া আপন মনে বলে—ঠিক—ক আছে! তারপরে আবার ক্ষণি আলেয়া ভাঙা বাড়ীর দেয়ালে ভৌতিক ছায়া নিক্ষেপ করিয়া সে অন্য ঘরের দিকে রওনা হয়। সবগুলি ঘর না দেখিয়া তাহার বিশ্রাম নাই।

পাড়ার কোন মেয়ে জগার মার সহিত দেখা করিতে আসিলে বড়ী বান্ধ হইয়া উঠিত, চীৎকার করিয়া ডাকিত—ও বিদ্দ, ও ক্ষান্ত, ও সৌদামিনী! নাঃ কেউ সাজা দেয় ক্ষান্ত, ও সৌদামিনী! নাঃ কেউ সাজা দেয়

সবাই জানিত চোখুরী বাড়ীর ঐশ্বর্য যেখানে এইসব ভূতপূর্ব দাসীর দলও সেই-খানে গিয়াছে। সবাই জানিত, কেবল বড়ী স্বীকার করিত না। মনে মনে সে কি সত্যই জানিত না?

একখানা ছেঁড়া মাদুর বিছাইয়া দিতে দিতে বলিত, নাঃ পোড়ারমুখীরা পাটি,

মছলন্দ সব কোথায় যে রেখে গিয়েছে, আমি বড়ো মানুস কি বুজে পাই?

সবাই বলিত, থাক দিদি, আমরা এখানেই বসছি, আমরা গরীব মানুস মছলন্দে আমাদের কি দরকার?

বড়ী বলিত, তোদের যেন দরকার নেই, তাই বলে চোখুরী বাড়ীতে কি মাটিতে বসতে দিতে পারি?

সম্ভাব্যেলা কেহ আসিলে বড়ী বলিত, শোনতো দিদি দেউড়ির ছাত্তোরগলো ডুকা বাজাচ্ছে কি না? আমার আবার কানের যে দশা হয়েছে কিছুই শুনতে পাই না।

সবাই বলিত, দিদি ডুকা বাজাচ্ছে বলে বাজাচ্ছে—কান যে ঝালাপালা হয়ে গেল। একটু থামতে বলে দাও?

বড়ী হাসিয়া বলিত—আমি থামতে বললেই কি থামবে, চোখুরী বাড়ীর নিয়ম মতো বাজাবেই। আজ আড়াই শ বছর এক নিয়মে দেউড়িতে ডুকা বেজে আসছে।

দেউড়িতে তখন ঝিকঝিকোকা ডাকিতেছে—আর ডাকার ভাঙা খোলাটোতে বুড়ির জল জমিয়া আছে। এমনভাবে বড়ীতে আর গাঁয়ের লোকে একপ্রকার নিদারুণ অভিনয় চলিত। সবাই পরস্পরকে শূধাইত বড়ী কি বুঝিতে পারে না? কেহ বলিত নব্বই বছর নয়সে বোধশক্তি থাকে না, কেহ বলিত বড়ী যাঁগ সব বোঝে। কিন্তু কেহই তাহার জুল ভাঙাইত না। সেই জনশ্রুতি, ধনশ্রুতি, ভণ্ড-পুরীতে চোখুরী বাড়ীর লুপ্ত মহিমাকে এই বৃদ্ধা সমস্ত লালিত মোহ দ্বারা বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল।

তারপরে একদিন, এই উপন্যাসের ঘটনা সীমার অনেক দিন পরে, বৃদ্ধার অন্তিমকাল উপস্থিত হইল। শ্রুতি বাড়ীর জীর্ণ এক কন্ধ্যার উপরে শূধাই নিঃসঙ্গ বৃদ্ধা বিকারের ঘোরে চীৎকার করিতে লাগিল—সব গেল কোথায়? পোড়ারমুখীরা সব গেল কোথায়? এখনি যে কতটুকু ঠাকরুণ আসবে?

তারপরে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া চীৎকার করিল—ওরে মছলন্দখানা পেতে দে পেতে দে, কতটুকু এসেছেন। এই লেখো বাউ, তোমার চাবির গোছা আমি সাবধানেই রেখেছি, কাউকে দিইনি। এই নাও তোমার চাবি তুমি নাও। তোমার চাবি তুমি নাও। এই রকম চীৎকার করিতে করিতে তাহার মৃষ্টি হইতে চাবির গোছা মাটিতে পড়িয়া বন করিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে তাহার শেষ নিশ্বাস পড়িল।

এই প্রথমবার চাবির গুচ্ছ তাহার মৃষ্টি-চ্যুত হইল, জীবিত থাকিতে চাবির গোছা সে কাহারো হাতে দেয় নাই, মৃত্যুকালে বৃদ্ধি স্বয়ং কতটুকুই দিয়া গেল।

জগার মার মৃত্যুতে এইবার সত্য সত্যই ছ'আনির ঐশ্বর্য দীপ নিভিল। যাহা নাই

কেবল পরম বিশ্বাসের বলেই যেন তাহাকে সে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল।

৪

ব্রজ রায়ের কাশী যাত্রার পূর্বরাতে তাহার ও কৃষ্ণ রায়ের মধ্যে কথোপকথন হইতেছিল। দুইজনেই অপতৃষ্ণ। রান্না ও আহার তাহাদের শেষ হইয়াছিল, জিনিসপত্র বাধাছাড়াও অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে, এখন শয়নের আগে দুইজন বসিয়া গল্প করিতেছিল।

কৃষ্ণ রায় বলিল—দাদা, তুমি কাশীতে থাকো, অনেক সাধু সন্ন্যাসী মানুস দেখেছো, একটা কথা আমাকে বুঝিয়ে দাও।

এইরূপ ভূমিকা করিয়া সে শূধাইল—আচ্ছা, দাদা, একটা গাছ কাটলে একটা গ্রাম ধ্বংস হবে কেন?

ব্রজ রায় বলিল—ভাই কাশীতে যে সবাই সাধু, সজ্জন এমন নয়। তবে হাঁ মস্ত শহর, অনেকদিন আছি নানা রকম লোক দেখেছি বটে।

সে বলিতে লাগিল, আমি যে-বাসায় থাকি সেখানে আরও কয়েকজন ভদ্রলোক থাকেন। তাঁদের মধ্যে একজন সরকারী চাকুরে আছেন, পেন্সন নিয়ে কাশীবাস করছেন। এক সময়ে তিনি সরকারী বন-বিভাগে কাজ করতেন। তাঁর কাছে বনের গল্প শুনতে পাই, জন্তু জানোয়ারের, পাহাড়ী লোকের। একদিন তাঁকে শূধাইয়েছিলাম—আচ্ছা সরকারের এত টাকা খরচ করে বন-জংগল রক্ষা করার দরকার কি? তিনি বলেন—বলেন কি? একে শূধু সরকারী খেয়াল মনে করবেন না। তারপরে বললেন—একটা কথাই ধরুন চা কেন, এই বনগুলো আছে বলে আপনারদের নদী নুলাগলো আছে। এই কথা শুনে আমরা আসরে আরও লোক ছিল, অবাক হয়ে বললাম, সে আবার কি?

তিনি হেসে বললেন—ওই তো। আপনারা না জেনে মিছামিছ সরকারকে দোষ দিচ্ছেন। পাহাড়ের উপরকার গাছগুলোকে রক্ষা না করলে পাহাড়ের বালু আর মাটি বর্ষায় গলে গলে পাহাড়ের নীচেকার নদী সব পলি পড়ে ভরে উঠবে। এমন কত উঠেছে। কত গভীর নদী শুকনো খালে পরিণত হয়ে গিয়েছে। কথাটা আমাদের কাছে নূতন, কিন্তু অবিশ্বাস করতে পারলাম না।

এই পর্যন্ত বলিয়া, একটু থামিয়া বলিল, তবেই দেখো গাছ কাটলে নদী ভরাট হয়ে যায়, নদী ভরাট হয়ে গেলে চারদিকের জনপদ শূকিয়ে ওঠে, ম্যালেরিয়া দেখা দেয়।

কৃষ্ণ রায় সব শুনিয়া বলিল, বেশ তা না হয় হ'ল। কিন্তু জোড়াদীঘির বড়ো অশখ আর তেমন নয়।

ব্রজ রায় বলিল—ঐশ্বর্য নয় বটে, কিন্তু যে গাছ কাটলে জনপদশূন্য হ'ল, সেই বংশেরই



জো গাছ। একদল মানুষ মারলে দোষ আর একটা মানুষ মারলে দোষ নয়?

কৃষ্ণ রায় বলিল,—তবে দাদা তুমি বিশ্বাস করো যে বড়ো অশথ কাটবার ফলে গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেল।

ব্রজ রায় বলিল,—এই ব্যারে মুস্কিল বাধালে। দূরে থেকে অনেক জিনিস বিশ্বাস করি, কাছে গেলে গোল বেধে যায়। যদি ফারো মূখে শুনতাম বা কেন বইয়ে পড়তাম যে, একটা প্রাচীন গাছ কাটবার ফলে গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেল তবে নিশ্চয় অবিশ্বাস করতাম না। কিন্তু এ বে একেবারে কাছের ঘটনা।

—তাই অবিশ্বাস করো?

ব্রজ রায় বলিল,—অবিশ্বাস করবো কেনন করে? চোখের সম্মুখে দেখছি বে।

—তবে কি?

ব্রজ রায় বলিল,—কৃষ্ণিতে বিশ্বাস করি, তার মানে বিশ্বাস করি যে, আকাশের গ্রহ-গুলোর প্রভাব মানুষের জীবনের উপরে কাজ করছে। আর গ্রামের একটা গাছের প্রভাব গ্রামের উপরে থাকবে তা অবিশ্বাস করবো কেন? বিশ্বাসের বলে?

কৃষ্ণ রায় শুধাইল,—এ কেনন করে সম্ভব হয়।

ব্রজ রায় বলিল,—ভাই, অনেক ভেবে বুঝেছি যে সব জানা যায় না। মানুষের জীবন যদি গণিতের পদ্ধতির মতো নিছক জানা দিয়ে তৈরি হ'ত, তবে কি বিপদই না হতো। কোথাও একটুখানি ফাঁক না থাকলে নিশ্চয় ফেলবো কোন্ পথে?

কৃষ্ণ রায় বলিল,—সেই পথেই যে ঝড় আসে।

ব্রজ রায় বলিল,—হলো বাতান আসে। আমিও তো সেই কথাই বলছি—জীবনধারণের বাতাস আসে।

হঠাৎ আলোচনার সূত্র এমন স্থানে আসিয়া পড়িল, যেখানে জল অনেক। ব্রজ রায় ও কৃষ্ণ রায়ের পক্ষে দুইতর। অগত্যা তাহারা চুপ করিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে কৃষ্ণ বলিল,—দাদা, একটা কথা মনে হচ্ছে, হেসো না যেন। মানুষ মরলে তার আস্থ গণ্ডাতে দেয়, নইলে তার মৃত্যু হয় না। আমাদের বড়ো অশথ তো গাছ মাঠ ছিল না, তুমি কাশী যাবার সময়ে তার এক টুকরো কাঠ নিয়ে যাও, কাশীর গঙ্গায় ফেলে দিও।

ব্রজ রায় বলিল,—অশথ কাটা হয়েছে সে কতদিনের কথা। তার কাঠ কি এখনো আছে?

কৃষ্ণ রায় বলিল,—তাকাই সম্ভব। সে গাছ কেউ সরায় নি। কারণ কাটবার পরদিন থেকেই মানুষদের দাঙ্গা বেধে উঠে। বেখানকার গাছ

দেখানোই পড়ে আছে।

ব্রজ বলিল,—তাতে আর আপত্তি কি। কাল সকালে উঠে দুইজনে যাবো। গঙ্গায় বিলে ভালো না হোক, মন্দ হবে না।

কৃষ্ণ রায় বলিল,—ভালো হতেও বাধা নেই। এই মাত্র তুমি তো বললে, কি থেকে কি যে হয় কে জানে।

ব্রজ রায় বলিল,—তাও বটে।

পরদিন প্রত্যবে দুইজনে অশথতলার দিকে রওনা হইল। লোকে বড়ো অশথের কথা এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছিল। অশথতলার মাঠ জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছিল, কেহ নে দিকে ঘাইত না, যাইবার প্রয়োজন ছিল না।

দুই ভাই আগছার জঙ্গল তৈলিয়া, পথ পরিষ্কার করিয়া কোনমতে চলিতে লাগিল এবং অবশেষে অশথতলার আদিয়া উপস্থিত হইল। যেখান ভূপতিত অশথের কাণ্ডখানা তেমনি পড়িয়া আছে, উপরের অনেকটা অংশ রৌপ ও বর্ষা প্রভাবে পচিয়া গিয়াছে, কিন্তু ভিতরের নিরেট অংশটা এখনো অটুট। কিন্তু সমস্ত জায়গাটা এক মানুষ উঁচু আগছায় অচ্ছন্ন বলিয়া কেহ তাহার অস্তিত্ব জানিতে পারে নাই। কৃষ্ণ রায় এক টুকরো কাঠ সংগ্রহ করিয়া আশায় নত হইল, এমন সময় ব্রজ রায় বলিয়া উঠিল,—একি রে?

কৃষ্ণ রায় মুখ তুলিতেই ব্রজ রায় একদিকে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইল।

সে দিকে তাকাইয়া দুই ভাই যেন মন্ত্রমুগ্ধ দৃষ্টি হইয়া গেল, তাহাদের মুখ দিয়া কথা সরিল না, একবার সেই দিকে, একবার পরস্পরের দিকে তাহারা মুঠের মতো তাকাইতে লাগিল। তাহারা দেখিল—নিকটেই, অশথের গুড়ির কাছে, একটি সতেজ, সরল, উন্নত, তরুণ অশথ তরু, ভ্রমশেষ সমুখিত শ্যামা যাদুসেনীর মতো দণ্ডায়মান। তাহার রক্তাভ পত্রগুলি আগুনের শিখার মতো বাতাসে কপিঁপড়েছে।

অনেকক্ষণ পরে তাহাদের মুখে কথা ফুটিল।

ব্রজ রায় বলিল,—তবে তো অশথ মরেনি।

কৃষ্ণ রায় বলিল,—কখন যে নূতন গাছ হয়েছে, জানতেও পারিনি।

ব্রজ রায় বলিল,—তবে আর কাঠের টুকরো নেবার দরকার নেই।

কৃষ্ণ রায় বলিল,—না।

ব্রজ রায় বলিল,—তবে বুঝি আবার জোড়াদীঘির মঙ্গল হবে।

তখন দুইজনে নত হইয়া সেই প্রাচীন বৃক্ষের তরুণ বংশধরকে প্রণাম করিয়া হৃৎ-চিতে ফিরিয়া আদিল।

প্রজ্ঞাভিক্রেরা বলেন, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে জোড়াদীঘির উপর দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদী প্রবাহিত ছিল। তারপরে কালক্রমে নদী সরিয়া গেল, বিল সৃষ্টি হইল, আবার কালক্রমে বিল শুকাইয়া আসিল, এখানে ওখানে জনপদ দেখা দিতে লাগিল এবং তারপরে কালক্রমে ফুর এক পল্লী সুবহুং জোড়াদীঘিরূপে আত্মবিকাশ করিল। তখন মাঠে কৃষাণ লাঙল দিল, শনা হিল্লোলিত হইল, কুঠীরে এবং অট্টালিকার সুখ-দুঃখের ছক কাটা মানুষের জীবনলীলা বহিতে লাগিল। জলের শান পটের উপরে, শানপট অপনারিত হইয়া সবুজ, শ্যামল, বিচিত্র বর্ণের প্রলেপ পড়িল, সুখ-দুঃখের ভের্যাকাটা চিত্রবর্ণ ধরিল।

তারপরে সে সব বর্ণের ঘনিমা ফিকা হইতে লাগিল, কুঠীর ভাঙিল, অট্টালিকা পড়িল, মানুষের জীবনলীলা নদীস্রোতের মতো খাত পরিবর্তন করিয়া অনন্ত সরিয়া গেল, জোড়াদীঘির মেরব অস্তানিত হইয়া দেখানে আবার মাঠ প্রসারিত হইল, নদী শুকাইয়া বিল সৃষ্টি হইল—প্রকৃতি আবার নিগুণিগন্তে জলের শ্রুতপট বিস্তারিত করিয়া দিল। যে তুলিতে একদিন জোড়াদীঘির সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই তুলিতেই আবার সব মুহুরিয়া দিল। এমন ভাবে আবার কত শত বৎসর চলিবে। তারপরে আবার জলের শ্রুতপটে প্রাণের রঙ দেখা দিতে থাকিবে। নদী পুরাতন খাত একেবারে বর্জন করে না, ফিরিয়া ফিরিয়া আসে। মানবজীবন-স্রোতও পুরাতন খাতকে বর্জন করে না, প্রত্যাবর্তন-প্রবণতা দেখায়। জোড়াদীঘির নবতন জীবনব্যাপার আবার আরম্ভ হইবে—কতকাল পরে?

ততদিন কৃষাণেরা মাঠে লাঙলের রেখা টানিতে থাকিবে, লাঙলের ফালে জীর্ণ অস্থি আবিষ্কৃত হইলে বারেক মাত্র অর্ধ অবজ্ঞায় তাহারা তাকাইয়া থাকিবে—আবার অগ্রদূত হইয়া চলিবে, তাহারা বুঝিতেও পারিবে না যে, ওই প্রস্তরীভূতপ্রায় জীর্ণ অস্থিখানা প্রবল প্রতাপাশ্বিত চৌধুরী বংশের। রাখাল বালক পুরাতন ইষ্টক খণ্ডের আঘাতে গরুর খোঁটা পুতিয়া সেখানা দূরে নিক্ষেপ করিবে, তাহারা জানিতেও পারিবে না ইষ্টক খণ্ডটি ঐশ্বর্যবান চৌধুরীদের অট্টালিকার একটি ভূনাংশ। স্রোতের আবর্ত যেমন স্রোতের অণুভূত হইয়া মিশাইয়া যায়, চৌধুরীগণ একসাথে যে আবর্তের সৃষ্টি করিয়াছিল—মানবজীবন-স্রোতে তাহা তেমনি ভাবে মিশিয়া গিয়াছে—যে মানবজীবন স্রোতের স্বাভাবিক গতি ওই কৃষাণের, রাখালের, পথিকের জীবনে অনাদ্যন্ত-লীলায় প্রবাহিত।

সমাপ্ত

‘থ্যা’ পা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশপাথর’—

পরশপাথর না মিলিলেও সারা পৃথিবী বর্তমানে মার্কিন ডলার অব্বেষণে ব্যস্ত। পুরাকালে শিবের জন্য পার্বতীর কঠোর তপস্যার কথা শুনিয়ে, শ্রীরামচন্দ্রের জন্য শবরীর প্রতীকার কাহিনী অব্যত আছি, “নির্বাপিত হোম-অগ্নি তাপসবিহীন শূন্য তপোবনছায়ে” বিসীন পাবাগম্য অহলার দীর্ঘ প্রতীকার উপাখ্যান পাঠ করিয়াছি। কিন্তু মার্কিন ডলার-প্রসার লাভের জন্য সারা পৃথিবীর অভীপ্সা ও লিপ্সা, তপস্যা ও ব্যগ্র প্রতীক্ষা সেইদিক দিয়া কোনপ্রকারে নদান নহে। পূর্বেস্ত পুরাতন কাহিনীগুলির সাথে আধুনিকতম ঘটনার মেঘকার সাদৃশ্য আছে—মূল ঘটনার দিক হইতে নয়, ঘটনার অন্তরালবর্তী ভাবের দিক দিয়া। রণক্লান্ত, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত, সমস্যা-বিপর্যস্ত দিনগুলি উদ্গত হইয়া আছে কখন মাতা কলম্বিয়া প্রদম হস্তে ডলার-দুর্ঘা সিঞ্জন করিবে। বস্তুতঃ পক্ষে দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের অবসানে একমাত্র আমেরিকা ছাড়া অন্যান্য দেশগুলি এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, আমেরিকার সর্বপ্রকার আর্থিক সাহায্য ব্যতিরেকে ঐসব দেশগুলির পুনর্গঠন প্রায় অসম্ভব। দীর্ঘ ছয় বৎসরের যুদ্ধব্যয়ভার বহন করিতে করিতে প্রায় সমস্ত দেশগুলিই নৃজ ও কৃষ্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই ঐসব দেশগুলিকে নিজের পায়ে দাঁড় করাইতে আমেরিকার সাহায্য-যিষ্ঠি প্রয়োজন। কারণ আমেরিকার ভৌগোলিক স্থিতি আসল যুদ্ধ-দেয় হইতে বহু দূরে পড়ায়, যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ধ্বংস-লীলা সেই ভূখণ্ডে অনুষ্ঠিত হয় নাই। কাজেই অন্যান্য যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশগুলির ন্যায় আমেরিকাকে ধ্বংস-স্তূপ হইতে নতুন করিয়া দাঁড় করিবার সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। এই দিক দিয়া আমেরিকার সমস্যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেকটা সহজ ও সরল। কিন্তু বিজ্ঞানলক্ষ্যীর প্রসঙ্গে গোটা পৃথিবীটাই যখন বিভিন্ন দেশের নিকটতর হইয়াছে, যাহাকে বলা যায় “One World,” সেই অবস্থায় অন্যান্য দেশের জটিল সমস্যা-গুলির প্রতিরীয়া আমেরিকার উপরও নিঃসংশয়ে পড়িত হইবে। সেই প্রতিরীয়ার ফলে আমেরিকার সমস্যাগুলিও যে সহজ, সরল থাকিবে তাহা বলা যায় না। অন্ততঃ কুটিল কুপথে না চলিলেও তাহা যে জটিলতার আবর্তে পড়িবে সেই বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় উৎপাদনের (Production) দিক হইতে আমেরিকা যখন উৎসৃত দেশ (surplus country); তখন অন্যান্য দেশ উৎপাদন করিতে পারুক না

পারুক, আর্থিক অস্বচ্ছলতা হইতে মুক্ত হউক কি না হউক, তাহাদের আর্থিক ভিত্তির পুনঃসংস্কার ঘটুক না ঘটুক, আমেরিকার মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন হইবে না। আমেরিকা হয়ত বৈদিক রথের মত অচল, অটল, অনড় ও নিশ্চেষ্ট হইয়া নিশ্চেষ্টে বদরা থাকিতে পারিবে। এইরূপ নির্বিকল্প অবস্থা-প্রাপ্তি হইলে ভাল হইত কি মন্দ হইত তাহা বলা শক্ত। তবে এরূপ অবস্থার বিপদ অনেক। দ্বিতীয়া আর্থিক দুনিয়ার গতিহীন নিশ্চেষ্টতার অবকাশ অপূর। অর্থনৈতিক ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে কোন দেশেরই কেবল হুটার আসনে বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিবার উপায় নাই। ইচ্ছার হোক অনিচ্ছায় হোক ঘটনার প্রবাহে সকলকেই নামিতে হইবে। সাধারণতঃ মনে হয় আমেরিকার কাছ হইতেই যখন সমস্ত দেশকে বর্তমান পরিস্থিতিতে মাল ও ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে, তখন আমেরিকার চিন্তার কারণ কি থাকিতে পারে? এই প্রশ্নে বিচার করিতে হইবে—আমেরিকার মাল হয় করিবার ক্ষমতা অন্যান্য দেশের রহিয়াছে কি না। যদি সেই ক্ষমতা অন্যান্য দেশের না থাকে, তবে আমেরিকার স্তুপীকৃত প্রবাস্ত্যের ক্ষেত্রের অভাবে বিকল্পেই যাইবে। এইরূপ অবস্থার অবশম্ভাবী পরিণাম মন্দা-মার্য সমস্ত বিশেষ সংরামক ব্যাধির ন্যায় হুড়িয়া পড়িবে। তবস্থায় যুদ্ধের ধন রাশীকৃত হইলেও, কিংবা পণোৎপাদনের একচেটিয়া শক্তি থাকিলেও নিশ্চিত মন্দার হাত একচেটিয়া শক্তি থাকিলেও নিশ্চিত মন্দার হাত হইতে আমেরিকার মুক্তি নাই। আর্থিক দুনিয়ার ইহাই অবসংবাদী নীতি যে সমস্ত বিশ্বের অর্থ সঞ্চিত করিয়াও কোন দেশ নিরবচ্ছিন্ন সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না, যদি না অন্যান্য দেশের সমৃদ্ধির মানও সেই অনুপাতে বর্ধিত হয়। তা না হইলে গত ১৯২৮ সালে বিশ্বমন্দার সূচনাকালে পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ স্বর্ণ-সম্পদের অধিকারী হইয়াও আমেরিকাতেই মন্দার প্রথম উপসর্গ দেখা দিল কেন?

আন্তর্জাতিক বাবসায় ক্ষেত্রে আমেরিকার প্রভাব বর্তমানে সূদূরপ্রসারী, প্রথমতঃ আমেরিকার নিকট-পৃথিবীর প্রায় সকল দেশই অল্পাধিক ঋণী। আমেরিকা হইতে রাশিরাশি পণদ্রব্য ক্রয় করা বাব (আমেরিকায় প্রেরিত বিদেশজাত দ্রব্যসম্ভারের মূল্য কাটিয়া রাখিয়াও) বিভিন্ন দেশের নিকট উপস্থিত হিসাব দৃষ্টে আমেরিকার বৎসরান্তে প্রায় ১৪০০০ মিলিয়ন ডলার পাওনা হয়। অর্থাৎ কি না আমেরিকার উৎসৃত রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪০০০ মিলিয়ন ডলার। ১৯৪৭

সালের মার্চ মাসের হিসাব অনুসারে আমেরিকার সহিত যে ১৩৭টি দেশের বাণিজ্য সংযোগ রহিয়াছে, তাহার মধ্যে মাত্র ১৬টি দেশের বাণিজ্যানুরুলো (favourable balance of trade) আমেরিকার নিকট পাওনা থাকে। আর বাকি ১২১টি দেশই প্রতিকূল বাণিজ্য হেতু আমেরিকার কাছে ঋণপাশে আবদ্ধ। কাজেই মূল্যবান অন্যান্য দেশের কাছ হইতে আমেরিকার উপরিত্ত পরিমিত ডলার পাওনা থাকে। যেহেতু একদিকে ঐসব ঋণগ্রস্ত দেশগুলির পর্যাপ্ত পরিমাণ ডলার সংস্থান নাই, অপরদিকে ডলার সাহায্যেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। সেইহেতু বর্তমানে সারা বিশ্বে ডলারের অস্বাভাবিক চাহিদা এবং তাহার স্বাভাবিক পরিণতি অধুনাতন ডলার-দুর্ঘট (Dollar scarcity)। ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যে সকল মতাবলম্বী অনুকূল বাণিজ্যের সমর্থক ও উহার মহিমা কীর্তনে পণ্ডমুখ ছিলেন (যাহা-দিগকে mercantilist বলিয়া অভিহিত করা হইত) তাহারা বর্তমান শতাব্দীতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিলে হয়ত আমেরিকার অবস্থা হৃদয়গম্য করিয়া তাহাদের পূর্ব মতবাদ নিশ্চয়ই পরিবর্তন করিতেন। অধিকন্তু তাহারা আরও উপলব্ধি করিতেন যে আন্তর্জাতিক বাবসায় ক্ষেত্রে অনুকূল বাণিজ্যই (excess of exports over imports) একমাত্র কামা বা সর্বরোগের প্রতিষেধক নয়। রপ্তানি আমদানির সমতা রক্ষাই—আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-নীতির মূখ্য লক্ষ্য। ১৯৪৬ সালে আমেরিকা হইতে আনুমানিক ১৬০০০ মিলিয়ন মূল্যের দ্রব্যসম্ভার বিদেশে রপ্তানি হয় এবং ঐ সকল দেশ হইতে ৭০০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের পণদ্রব্য আমেরিকাতে আমদানি করা হয়। ঐ সকল দেশকে বাকি ৮০০০ মিলিয়ন ডলার প্রত্যর্পণ করিতে রীতিমত বেগ পাইতে হইয়াছিল। তারপর আলাচ্য বর্ষে দেয় ডলারের পরিমাণ ঋণগুণিত হইয়া কিরূপ স্ফূর্তিকায় হইয়াছে তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। পাওনাদার হইয়াও আমেরিকার শান্তি নাই, বিশেষতঃ দেনাদার যখন নিরুপায় ও অভাবগ্রস্ত। কাজেই নিজের পাওনা ফিরিয়া পাইতে হইলে আমেরিকাকে ঐসব দেশগুলির আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য প্রদানে অগ্রণী হইতে হইবে।

এ পর্যন্ত International Monetary Fund গঠিত অর্থ ও অন্যান্য দেশকে প্রদত্ত স্বল্পমেয়াদী ঋণ ছাড়া আমেরিকা মোটের উপর ১৬৫০০ মিলিয়ন ডলার ঋণদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছে। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ-

গুলির অর্থনৈতিক ভিত্তি পুনর্গঠন ও সুদৃঢ় করার জন্য এই ঋণ পর্যািপ্ত নহে। মার্কিন অর্থনীতিবিদগণেরও ইহাই অভিমত। উপরোক্ত ঋণদানের প্রতিশ্রুতি আমেরিকার তরফ হইতে দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে ১১০০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ ব্রিটিশ ও ইউরোপের নানা দেশের জন্য স্থিরীকৃত আছে। কিন্তু এশিয়া ভূখণ্ডের সংগঠনের জন্য একমাত্র চীনদেশ ছাড়া অন্যকোন দেশকে আমেরিকার পক্ষ হইতে ঋণদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নাই। সমস্ত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আর্থিক উন্নতি সাধনই যদি আমেরিকার কাম্য হয়, তবে ঐ ডলার ঋণ কেবল ইউরোপের কয়েকটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া অন্যান্য মহাদেশস্থ জাতিগুলির মধ্যেও বিতারিত হওয়া প্রয়োজন। কাজেই এশিয়ার দেশগুলির পুনরুত্থানের জন্যও আমেরিকার সাহায্য প্রয়োজনীয়। এই দিকটার প্রতি বিশেষ জোর না দিলেও ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিব মিঃ বেভিনের নিম্নোক্ত বক্তৃতাংশ হইতে এশিয়ার পুনর্গঠন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যথেষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে।

"The introduction of peace both in China and Indonesia and a settlement with Japan will open up the distribution of foods, fats, oil, raw materials, silk and textiles, as well as a thousand other things which go to make up all the amenities of life for the world as a whole"—

অর্থাৎ চীন দেশ ও ইন্দোনেশিয়ায় শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত এবং জাপানের সহিত একটা বোঝাপড়া হইলে খাদ্য, চর্বি, তেল, কাঁচামাল, রেশম ও কাপড় ইত্যাদি এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইবে ও তন্ম্বারা দৈনন্দিন জীবনধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় অপরাপর দ্রব্যের অভাব নিতা সহজেই বিদূরিত হইবে। কিন্তু এশিয়া মহাদেশের পুনর্গঠনের জন্য কত পরিমাণ ডলার ঋণের প্রয়োজন তাহা সঠিক এখনও নির্ণীত হয় নাই, মোট কথা এশিয়াকে বাদ দিয়া অন্যান্য দেশের সুখ সমৃদ্ধি লাভের প্রচেষ্টা বার্থ'তায় পর্যবসিত হইবে। কাজেই পৃথিবীর অর্থসংকট দূর করিতে হইলে এশিয়া ভূখণ্ডের দাবি কখনও উপেক্ষা করা চলিবে না।

ইউরোপের পুনর্গঠনের জন্য আমেরিকার সাহায্য দানের যে পরিকল্পনা প্রণীত হইয়াছে তাহা ইতিমধ্যে "Marshall plan" নামে খ্যাত লাভ করিয়াছে। এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য গত ২৭শে জুন প্যারিস সহরে পররাষ্ট্র সচিবদের এক সম্মেলন আহূত হয়। ছয়দিন ব্যাপী বার্থ' আলাপ আলোচনার পর উক্ত সম্মেলন ভাংগিয়া যায়। উক্ত সম্মেলন ভাংগিয়া যাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্স উক্ত সম্মেলন পুনরাবহন করেন এবং যেসব

ইউরোপীয় দেশ উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করার প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে আমন্ত্রণ জানান হয়। ২৫টি ইউরোপীয় দেশের মধ্যে ১৮টি দেশ উক্ত সম্মেলনে যোগদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং রাশিয়া প্রমুখ ৭টি দেশ উক্ত আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ মার্শাল পরিস্কারভাবে বলেন যে, আমেরিকার আর্থিক সাহায্য পাইতে হইলে ঋণগ্রহণেচ্ছু প্রত্যেকটি দেশ পরস্পর মিলিত হইয়া একটি সম্মিলিত পরিকল্পনা রচনা করিয়া আমেরিকার কাছে পেশ করিবেন। ইহার তাৎপৰ্য এই যে, আমেরিকা প্রত্যেক দেশের সাথে আলাদা আলাদাভাবে ঋণ গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া একটি সুপারিকল্পিত যৌথ পরিকল্পনা সাহায্যে সমগ্র ইউরোপ ভূখণ্ডের উল্লার-ঋণের প্রয়োজনীয় পরিমাণ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইতে চান। ফ্রান্স ও ব্রিটেন এই বিষয়ে একমত। কিন্তু রাশিয়া ও তাহার সংশ্লিষ্ট দেশগুলি এরূপ কোন সম্মিলিত একক পরিকল্পনা গ্রহণে পক্ষপাতী নহেন, যেহেতু, তাহাদের মতে, এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ দ্বারা স্ব স্ব দেশীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যকরী করার স্বাধীনতা অনেকখানি ব্যাহত হইবে। ইহা ছাড়া এইরূপ কর্মসূচী, রাশিয়ার মতে, নিজ নিজ সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী। দ্বিতীয়তঃ রাশিয়ার মতে এই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্নভাবে ঋণ গ্রহণেচ্ছু দেশের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া একটি স্থির সিদ্ধান্ত নিরূপণ করা উচিত। তৃতীয়তঃ রাশিয়া প্রথম হইতেই আমেরিকার কাছ হইতে এইরূপ বাধ্যতামূলক প্রতিশ্রুতি চায় যে, যে কোন অবস্থাতেই আমেরিকাকে ঋণদানে সম্মত থাকিতে হইবে। চতুর্থতঃ রাশিয়া চায় যে, জার্মানী অধিকৃত দেশগুলিকে এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হউক ও তাহাদের পুনর্গঠন সমস্যার সমাধান বিষয়ে সবিশেষ মনঃসংযোগ করা হউক। এই সকল সর্ব বিষয়ে মতবৈধ হওয়াতে শেষ পর্যন্ত রাশিয়া উক্ত বৈঠক হইতে সরিয়া দাঁড়ায় এবং ফ্রান্স ও ব্রিটেন এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করিতেছে। এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে গ্রেট ব্রিটেন অত্যন্ত আগ্রহশীল হইলেও সেখানকার খ্যাতনামা অধ্যাপক লাস্কি উক্ত পরিকল্পনার সদৃশ্য সম্বন্ধে কেমন যেন সন্দেহান। তিনি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সারা ইউরোপকে আমেরিকার রাজনীতির ফুটবল-ময়দানে পরিণত করার চেষ্টা পৃথিবীর অন্যান্য দেশ মোটেই বরদাস্ত করিবে না এবং এই পরিকল্পনার গুরুত্ব পথ দিয়া চার্চিল পরিকল্পিত "Western Block"

সৃষ্টি করার অপকোশল কেহই সহ্য করিবে না। রাশিয়া ত এই বিষয়ে সমালোচনার উগ্রতায় গোড়া হইতেই স্পষ্টতঃ চড়িয়া আছে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিব প্রকাশ্যে না বলিলেও অন্তরে অন্তরে যে মার্কিন ডলারের একাধিপত্যে অস্বস্তি বোধ করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মার্শাল প্ল্যান বাহির হইবার কয়েক মাস পূর্বে ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে বক্তৃতাকালে তাহার মুখ হইতে যে নিম্নোক্ত বাক্য কয়টি বিহগত হইয়াছিল, তাহা হইতেই তাহার অস্বস্তির পরিধি কিছুটা হৃদয়গম্য করা যায়। তিনি বলিয়াছিলেন, "India office-এর মাঝখানে দাঁড়াইয়া আমি যখন পৃথিবীর মানচিত্রের উপর দৃষ্টিপাত করি, অতীর্কিতে আমার দৃষ্টি এই বিচিত্র দেশ ভারতের উপর নিবদ্ধ হয়। সেই সময় আমি যখন চিন্তা করি একদিকে রাশিয়ার সাম্রাজ্য লিপ্সা ও অপরদিকে মার্কিন ডলারের সাম্রাজ্য বিস্তারের গুরুত্ব অভিযান কিভাবে চারিদিকের আকাশকে মসীলীকৃত করিয়া ফেলিতেছে, তখন আমার মনে এই প্রশ্নই স্পষ্ট উদ্ভূত হয়— ভারতে শান্তি স্থাপিত হইলে কি দুর্যোগের এই ঘনায়মান দীর্ঘ কাল মেঘ অপসারিত হইয়া আবার স্বাধীনতা ও শান্তির আলোকচ্ছটা সমগ্র পৃথিবীতে প্রকাশিত হইবে?" সে যাহাই হউক, আমেরিকার দিক হইতে একাধিকবার সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, "marshall plan"-এর পশ্চাতে আমেরিকার কোন গোপন দুরভিসন্ধি নাই। সমস্ত পৃথিবীর আর্থিক জটিল সমস্যার একটি সুচিন্তিত সমাধান করাই এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। তবে এই কথাও অনস্বীকার্য যে, বর্তমানে উল্লার-দুর্ঘটনের জন্য যে অর্থসংকটের উপসর্গ দেখা দিয়াছে, তাহা নিরসনের জন্য আমেরিকার অর্থসাহায্য ছাড়া "নানাব গতিরনাথ", রাজনীতির-অক্ষজীড়ার তীব্রতা যত বেশী বৃদ্ধি পাইবে, অর্থসংকটের ক্রম-মেঘ ততই সারা পৃথিবীকে ছাইয়া ফেলিবে। কাজেই আসন্ন অর্থসংকট দূর করিবার একমাত্র উপায়, অন্যান্য দেশগুলিকে পুনর্গঠিত করিয়া সেইখানে দ্রব্যসম্ভার উৎপাদন বৃদ্ধি করা। যে পর্যন্ত না অপরাপর দেশগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইবে, সেই পর্যন্ত বাণিজ্য-স্রোত আমেরিকাভিমুখীই থাকিবে। এইরূপ অবস্থা অর্থনৈতিক স্থায়িত্বের প্রতিকূল। বাণিজ্য-স্রোত যে পর্যন্ত বহুমুখী না হয়, সেই পর্যন্ত আসন্ন দুর্যোগের দীর্ঘ কালছায়া ঘনায়িত হইয়াই আসিবে—অপসারিত হইবার সম্ভাবনাও দূরতর হইবে। কাজেই আমেরিকার বাহিরের দেশগুলির উৎপাদনশক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পাইতে পারে, সেইরূপ কর্মসূচীই অনুসরণ করা সমীচীন। যাহাতে বহিরাগত মালের

আমদানী আমেরিকাতে বান্ধি পায়, সেই বিষয়টি লক্ষ্য রাখা কতব্য। তাহা হইলেই আমেরিকার রতানির উদ্ভূততা ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-স্রোত বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইবে। এইজন্য American Federation of Labour (A.F.L.) এবং Congress of Industrial organization (C. I. O.). মার্কিন সরকারের বিদেশী মালের আমদানী বৃদ্ধির পরিকল্পনা সর্বতোভাবে সমর্থন করিয়াছে। ইহা ছাড়া, আমেরিকাতে বিদেশী

মালের পথ রোধ করিয়া পূর্বে যে সকল শুল্ক-প্রাচীর (Tariff-Walls) খাড়া করা হইয়াছিল, তাহাদের বাধ বর্তমানে শিথিল করা প্রয়োজন। এতদিন যে উগ্র জাতীয়তাবাদের মাদকতায় প্রত্যেক জাতির মধ্যেই অর্থনৈতিক বিষয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণ (Economic Self-sufficiency) হইবার প্রচেষ্টা নাগ বাসুন্ধর নায় ফণা উত্তোলন করিয়াছিল, সেই চেষ্টা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইবে। এইরূপ মনোবৃত্তির ফলে পূর্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-ক্ষেত্র যে “Law of Comparative Costs”

নীতি দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল, তাহা বর্জিত হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-স্রোত পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তাহারই বিষময় ফলস্বরূপ বর্তমান বিশ্বের অর্থ-সঙ্কটের উদয়। যে পর্যন্ত না জাতিগত বিভেদ, বৈষম্য ও রেযারেরি ভুলিয়া গিয়া প্রত্যেক দেশই “এক পৃথিবী” (One World) সূচী করিবার জন্য সহযোগিতার ভিত্তিতে অগ্রসর হইবে, তদবধি বিশ্ব-সংকট পট-পরিবর্তনের নায় নতুন নতুন জটিলতা নিয়া জগতের ইতিহাসে দেখা দিবে।

## পুস্তক পরিচয়

খণ্ডিত ভারত—ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ। প্রকাশক—সুরেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীগোরাগণ প্রেস, ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা। মূল্য ১০ টকা। সাইজ—রয়াল আট পেজী—পৃষ্ঠা সংখ্যা—৪১১।

ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের ‘India Divided’ নামক বিখ্যাত গ্রন্থের বাঙলা সংস্করণ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কটনীতির ফলে ভারত খণ্ডিত হইয়াছে এবং পাকিস্থান কাণ্ড প্রতীক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু তথাপি পাকিস্থানী মূলীভূত নীতির যৌক্তিকতা ও কার্যকারিতা আজও স্বীকৃত হয় নাই কিংবা রাষ্ট্র বিজ্ঞানের দিক হইতে তাহার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হয় নাই। বস্তুত লীগের একান্ত উৎকট দাবীর ফলে পাকিস্থান লইয়া বর্তমানে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহা এখনও অসমীয়াসত্তা হইয়াছে। বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ নানা দিক হইতে এই সমস্যাটির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাহার এই গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থে রাষ্ট্র বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক তথ্য-রাজির উপর ভিত্তি করিয়া সকল দিক হইতে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যবলে অদ্বান্তভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বৈদিক হইতেই বিচার করা যাইক না কেন, লীগের পাকিস্থানী নীতি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং কার্য-কারিতার দিক হইতে ইহা অচল। বর্তমানালোচ্য গ্রন্থখানির এই আলোচনা ভারতের অন্যতম রাষ্ট্র-নেতা গ্রন্থকারের প্রভূত মনোমার এবং রাষ্ট্র বিজ্ঞানে তাহার সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের জটিল সমস্যা সম্বন্ধে যাহারা সকল দিক হইতে আলোচনা করিতে চান তাহাদের পক্ষে এই গ্রন্থখানি অবশ্য পাঠ্য। প্রতিপাদ্য বিষয় পাঠকদের পক্ষে বিশদ করিবার জন্য কয়েকখানা মানচিত্রে গ্রন্থখনা সমৃদ্ধতর করা হইয়াছে।

এই অমূল্য গ্রন্থের বাঙলা সংস্করণ প্রকাশ করিয়া প্রকাশক বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন এবং বাঙালী সমাজের চিন্তার রাজ্যকে সম্প্রসারিত করিয়াছেন; এজন্য তিনি সকলের ধন্যবাদভাজন। বিষয়টি জটিল হইলেও গ্রন্থের ভাষা স্বচ্ছ, সরল ও অনুবাদ প্রাজ্ঞ হইয়াছে এবং গ্রন্থের সাহিত্যিক উৎকর্ষ সর্বত্র সুরক্ষিত হইয়াছে। এমন গ্রন্থ বাঙলার ঘরে ঘরে পঠিত এবং সমাদৃত হওয়া উচিত।

নিম্নোক্ত—শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রণীত। পূর্বাশা লিমিটেড, পি-১৩ গগেনচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

দিনান্ত উপন্যাস। তবে একটানা গল্প সর্বস্ব মামুলি উপন্যাস নয়। একটা পরিপূর্ণ পরিবারের সব কয়টি মানব সমবেতভাবে কি করিয়া ও

পরিবারের দিনান্ত ঘনাইয়া আনিয়াছে, কুশলী লেখক তাহা বেশ নিপুণভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। মাঝে মাঝে প্রেম প্রণয় ও উচ্ছ্বাসতার কয়েকটি চিত্র হয়ত অনেকের নিকট খারাপ লাগিবে, তবে সমগ্রভাবে বিচার করিলে বইটি বর্তমান জীবনের ক্রোড়ের হৃদয়তপ্পূর্ণ সার্থক উপন্যাস হিসাবে বিশেষ উৎসাহসাধ্য তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বইটির ছাপা, কাগজ, বঁধাই উত্তম। প্রচ্ছদপটের চিত্রখানিও বিশেষ তাৎপৰ্যপূর্ণ হইয়াছে। ৮৭।৬৭

মহিলা—সম্পাদিকা শ্রীবাণী গুহ এম এ। কার্যালয়—১২০।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য প্রতি সংখ্যা আট আনা।

আমরা “মহিলা” প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা সমালোচনাপূর্ণ পাইয়া আনন্দিত হইলাম। ইহা সম্পূর্ণরূপে মহিলা-পরিচালিত এবং একমাত্র মহিলাসম্প্রদায়ের রচনাসম্ভারে সূচোভিত হইয়া প্রকাশিত মাসিকপত্র। পত্রখানা পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। ইহা কেবল মামুলি ধরণের গল্প, প্রবন্ধ, কবিতার সংগ্রহ মাত্র নয়। নানা বিষয়ের চিন্তা-কর্ম কতকগুলি বিভাগে রচনাগুলি সাজানো এবং চিত্রসম্ভারে সমৃদ্ধ। আমরা “মহিলা” গ্রীষ্ম ও দীর্ঘজীবন কামনা করি। ১১।১৭

ক্লোক—অনুবাদক—শ্রীকমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—বিমলারঞ্জন চন্দ্র, পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ। ছাপা কাগজ ও বঁধাই ভাল। মূল্য দুই টাকা চারি আনা।

বুধ কথাসিঁপী নিকোলাই গোগোল রচিত ‘ক্লোক’ গল্পটি বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্প হিসাবে পরিচিত। বহুধিকৃত কেরানীজীবনের মর্ম-ভেদী দৃষ্টি বেনদীর উজ্জ্বল আলোখা এই গল্পে পরিস্ফুট হইয়াছে। অনুবাদকের ভাষা বরষরে। বাঙলাদেশের কেরানীকাজ এই গ্রন্থে নিজেদের জীবনের একটি অঙ্গপটু দ্বারা দেখিতে পাইবেন। ৫১।৪৭

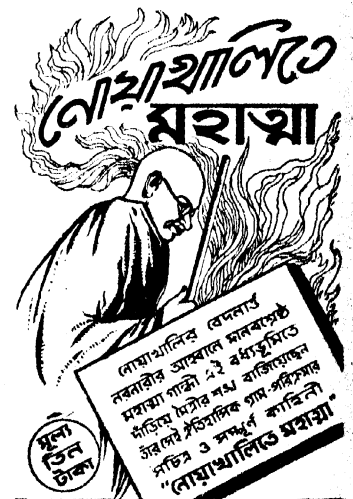
কথাপ্রসঙ্গ—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মথোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—দি বুক কোম্পানী, ৪৪এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

প্রায় দুই শত পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া বিবিধ জ্ঞানের কথায় বইটি পূর্ণ। দেশ বিদেশের ভাষা, সাহিত্য, ভৌগোলিক ও পুরাতত্ত্ব, ঐতিক ও পারম্পরিক নানা তত্ত্ব, সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে কল্পিত উপযোগী নানা কথা, অশ্লিশব্দ ও দেবদেবী

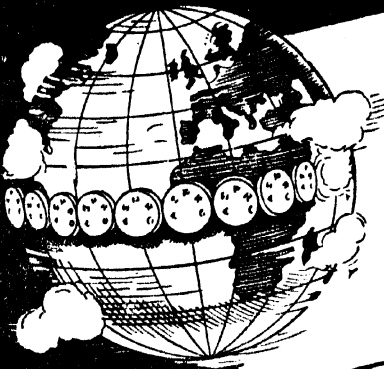
বিষয়ক নানা তথ্য, দেশ বিদেশের গদ্য পদ্যে বুদ্ধলতা ও পুষ্পাদির উল্লেখ প্রভৃতি বহুবিধ কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যরাজিতে বইটির আগা-গোড়া পূর্ণ। বইটি বালকবৃন্দ সকলকেই সমান আনন্দ দিবে এবং প্রত্যেকেই উহা পাঠে নতুন নতুন তথ্য সম্প্রদেয় ওয়াকবহাল হইতে পারিবেন। এই গ্রন্থের মালমসলা সংগ্রহে গ্রন্থকারকে যে বিশেষ শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। তবে ছাপা ও কাগজ আকর্ষণযোগ্য হয় নাই। অবশ্যই ইহার জন্য মূল্য যথেষ্ট সুলভ করা সম্ভব হইয়াছে। ১০।১৭

আমার পৃথিবী—শ্রীস্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—দি বুক সিন্ডিকেট, ১০, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বারো আনা।

‘আমার পৃথিবী’ ভাবমূলক উপন্যাস। পৃথিবীর আলোছায়ার কাল্পনিক হাতির ভিতর দিয়া একটি তরুণ জীবনের বিকাশ কাহিনী গল্পের ভাষায় এখানে স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে। গল্পটি আবেগপূর্ণ ভাষায় রচিত এবং স্রোতের মত গতিশীল করিয়া এর জীবনধারা চিত্রিত। কোথাও তাপ ভণ্ড হয় নাই বলিয়া শেষ পর্যন্ত অনায়াসে পড়িয়া চলা যায়। ৫।৪৭



ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী  
১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট - কলিকাতা



# পৃথিবীর যাবতীয় জটিলতার অধাধীন আধারন ডিউনিজের সাহায্যেই হয়ে থাকে

আম্র অংকুর হিধার  
ছোট্ট একটি বড়ি  
যথেষ্ট

প্রকৃতির  
অহযোগিতাই কও-  
গার বিরুদ্ধ নয়

'অ্যাসপ্রো'  
বুকের পক্ষে  
স্বীকৃত নয়

পৃথিবীতে জটিলতা বোঝাই চলেছে। আমাদের নেতারা এই জটিলতা দূর করতে সকলের সহযোগিতা চান। কিন্তু সমস্ত সমস্যা চুষ্টা করলেই সমাধান করা যায় কারণ সবচেয়ে জটিলতার অন্তরালে যে সত্য নিহিত থাকে তা 'অতি-সহজ ও সরল'। 'অ্যাসপ্রো' অস্ফাল শরীরের এমন একটি সহজ সমাধান। আপনি নিশ্চয় হয়ে উঠবেন। আমাদের দৃষ্টি রাখাই প্রকৃতির উদ্দেশ্য, কিন্তু মাঝে মাঝে জটিলতার উদ্ভব হয়। ছোটখাটো ব্যাপার যেমন সামান্য বেদনা বা হৃদয় মনকে দখিয়ে দেয়—জীবনটা বিবাদ হয়ে ওঠে। সহজে ও তাড়াতাড়ি সারাতে হলে এই সাধা বড়ির একটা বা দুটোই যথেষ্ট। প্রাকৃতিক নিয়মেই আপনি নিরাময় হবেন—এগুলি শুধু প্রকৃতিকে সাহায্য করবে। অস্বাভাবিক দূর হবে এবং পরিবারের স্বাস্থ্য আনন্দ ফুটে উঠবে।

## 'অ্যাসপ্রো'

তথ্য ও এর দূর করে

দ্রী প্রকৃতি ও শিশু নিবিশেষে  
'অ্যাসপ্রো' নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য:

- ৫ মিনিটে মাথাধরা দাওয়া
- রাতারাতি বাতের বেদনা দূর করে
- কয়েক মিনিটে ক্ষুর নাখিয়ে দেয়
- মুহুর্তে স্নায়ুশূল ও বাতের ব্যথা দূর করে
- ব্যথা ও বেদনা আরাম করে
- নিজস্বাধীনতায় নিজস্ব এনে দেয়
- খিটখিটে ভাব দূর করে
- জীলোকের বেদনা দূর করে
- কুলকুচো করলে গলার ব্যথা কমে
- সর্দি ও ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাল করে
- ডেঙ্গু জ্বরের সহজ প্রতিষেধক
- সংক্রামক রোগের থেকে রক্ষা করে



অস্বাভাবিক পাওয়া যায়

পরিবেশক :  
ডে. এল. মরিসন, সন্ অ্যাণ্ড জেন্স  
(ইণ্ডিয়া) লিমিটেড  
পোস্ট বক্স ৩৮৭, কলিকাতা কোল : কাল ৭১৬

আমর সংতাহকাল পরেই ভারতবর্ষকে  
স্বাধীনতা দিয়া উভয় রাষ্ট্রেই  
ডোমিনিয়ন শাসন প্রবর্তিত হইবে।  
ইহাতে স্বায়ত্তশাসন লাভ করা যাইবে  
—কিন্তু সে স্বায়ত্তশাসন স্বাধীনতা  
নহে। যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে এক বৎসর  
পরে এদেশে বৃটিশ শাসনের অবসান হইবে এবং  
ভারতবর্ষ হইতে মুসলমানপ্রধান অংশ বিচ্ছিন্ন  
করিয়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। কাজেই  
সকল বিষয় বিবেচনা করিলে এদেশের লোকের  
১৬ই আগষ্ট উৎসব দিন নহে। কারণ জাতীয়তার  
দাবী ক্ষুণ্ণ করিয়া ভারতবর্ষকে ধর্মানুসারে  
স্বাধীনতা দিয়া হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ  
সম্পূর্ণ স্বাধীনতাও পাইতেছে না। যে ব্যবস্থা  
হইতেছে, তদনুসারে বাঙলাও পূর্ব ও পশ্চিম  
—দুই ভাগে বিভক্ত হইতেছে—পূর্ববঙ্গ  
‘পূর্ব পাকিস্তানে’ পরিণত হইবে।

খণ্ডিত বাঙলার সীমা নির্ধারণ কমিশনের  
সিদ্ধান্ত এখনও প্রকাশিত হয় নাই—কয়দিনের  
মধ্যেই হইবে এবং অনেক আশঙ্কা করিতেছেন,  
সেই সময় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ উগ্র ও তীব্র  
হইবার সম্ভাবনা। কারণ যে মুসলিম লীগ  
এক বৎসর পূর্বে (১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই  
আগষ্ট) বাঙলায় ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রাম’ ঘোষণা  
করিয়া কলিকাতায় এবং পরে পূর্ববঙ্গের  
নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় হিন্দুদিগের প্রতি  
অত্যাচার করিয়াছে, সেই লীগ বর্ধমান  
বিভাগের কয়টি জিলা ব্যতীত সমগ্র বঙ্গদেশ  
পাকিস্তানে পরিণত করিতে চাহিয়াছে এবং  
পশ্চিমবঙ্গে অতিরিক্ত সচিবসংঘ গঠনের সঙ্গে  
সঙ্গে কলিকাতায় অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়াছে,  
সেই মুসলিম লীগের অনুগত ব্যক্তিরা যে  
কলিকাতা না পাইলে আর একদফা ‘লড়াই’  
করিবে, এ আশঙ্কা অযৌক্তিক মনে করা যায় না।  
পশ্চিমবঙ্গে ইতোমধ্যে আসানসোলে যে  
বিষম সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হইয়াছে, তাহাতে  
যেমন, কলিকাতায় প্রাত্যহিক সংঘর্ষও তেমনই  
বৃদ্ধি পাইতেছে, সাম্প্রদায়িকতার অগ্নি  
নির্বাপিত হয় নাই—যে কোন মুহূর্তে প্রবল  
হইয়া উঠিতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের সচিবসংঘ নানা কারণে  
লোকের সাগ্রহ সহযোগ আশানুরূপভাবে  
পাইতেছেন না। প্রথম কারণ—তাহারা হিন্দু-  
মুসলমানে বিরোধ-বিবাদই বর্ণবিভাগের ও  
তাহাদিগের উদ্ভবের কারণ হইলেও মনে  
করিতেছেন, মুসলমানগণ শিষ্ট-শান্ত হইয়া  
নতুন ব্যবস্থা মানিয়া লইবে এবং হিন্দুরাও  
আর মুসলমানদিগকে সন্দেহের দৃষ্টিতে  
দেখিবে না। কিন্তু—

“Never central reconciliation  
grow

Where wounds of deadly hate have  
pierced so deep.”

## বাংলার কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

তাহা সময়সাধ্য। আমরা চলাতে আশাভঙ্গের  
আর কয়টি কারণের উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে  
করি—

(১) মুসলিম লীগ সচিবসংঘ পশ্চিমবঙ্গেও  
মুসলমানের সংখ্যাধিক্য ঘটাইবার চেষ্টায় বিহার  
হইতে যে বহু মুসলমান আমদানী করিয়া-  
ছিলেন, তাহাদিগের কতকাংশকে বহিস্কৃত করা  
হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই সচিবসংঘ যে  
পাঞ্জাবী মুসলমান পুলিশ আনিয়া কলিকাতার  
হিন্দুদিগকে সন্ত্রাসিত করিবার ব্যবস্থা  
করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে এখনও বিতাড়িত  
করিয়া কলিকাতার হিন্দুদিগকে আশঙ্কিত  
করা হয় নাই।

(২) কলিকাতায় যে দুইজন মুসলমান  
পুলিশ ডেপুটি কমিশনার—গফুর ও মোহা  
এবং যে ইংরেজ পুলিশ কমিশনার হাউউইক  
বে-আইনী শোভাবাহার যোগদানের অপরাধে  
অপরাধী, তাহাদিগকে মামলায় নোপদ করা  
হয় নাই।

(৩) উক্ত কলিকাতার পুলিশের ডেপুটি  
কমিশনারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ  
উপস্থাপিত হইলেও তাহাকে স্থানান্তরিত করা  
হয় নাই।

(৪) মিস্টার সুরাবদীর বিরুদ্ধে কোন  
মামলা করিবার আয়োজন হইতেছে, ইহা লোক  
জানিতে পারিতেছে না।

(৫) দৌ-নির্মাণে যাহারা কয় কোটি টাকার  
জন্ম দায়ী, তাহাদিগের বিরুদ্ধে মামলা করা  
হয় নাই।

লোক এ সকল মুসলমানদিগকে তুচ্ছ  
করিবার আগ্রহও অকারণ দৌর্বল্য বলিয়া  
মনে করিতেছে। আর—

(১) কলিকাতায় এখনও লোক নিরাপদ  
হয় নাই।

(২) পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগের শীঘ্র  
তদন্তের ব্যবস্থা হয় নাই।

সুবিধার কথা—

পূর্ববঙ্গে হইতে উপরূত হিন্দু সম্প্রদায়ের  
যে সকল লোক সপরিবারে পশ্চিমবঙ্গে আসিতে  
ইচ্ছুক, তাহাদিগের আসিবার কোন সুবিধা  
করিয়া দেওয়া হইতেছে না এবং পশ্চিমবঙ্গ  
স্বতন্ত্র হইলে তাহার স্বাস্থ্য, সেচ, শিক্ষা,  
শিল্প—এ সকলের উন্নতি সাধনের পরিকল্পনা  
রচনা করিবার জন্য রশিয়ার পঞ্চবার্ষিকী  
পরিকল্পনা রচনা করার জন্য যেমন সমিতি

নিযুক্ত করা হইয়াছিল, সেদুপ কখন সমিতি  
গঠনের আয়োজনের বিষয় লোক জানিতে  
পারিতেছে না। কিন্তু যে আর্থিক দুরবস্থা  
লইয়া পশ্চিমবঙ্গে কাজ আরম্ভ করিতেছে,  
তাহাতে সে সকল উন্নতি ব্যতীত তাহার  
আশ্রয় অসম্ভব। সেই কার্য আমরা বিশেষ  
প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি।

পশ্চিমবঙ্গের অতিরিক্ত সচিবসংঘ যে  
সকল কাজ করিতে পারেন নাই, সে সকল  
করিতে না পারার কারণ বোধ হয়, আবশ্যিক  
ক্ষমতার অভাব। তাহারা সম্পূর্ণ ক্ষমতা না  
পাওয়া পর্যন্ত তাহাদিগের অসুবিধা দূর  
হইতে পারে না।

মফস্বলের নানা স্থান হইতে সংখ্যালঘিত  
হিন্দুদিগের উপর অনাচারের ও অত্যাচারের  
যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, সে সকল  
বন্ধ না হইলে যে হিন্দুদিগের পক্ষে মুসলমান-  
প্রধান স্থানে বাস বিপজ্জনক হইবে, তাহাতে  
সন্দেহ নাই। সে বিষয়ে লীগের প্রদত্ত আশ্বাসে  
নির্ভর করা আমরা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা  
করিতে পারি না। তাহার বিশেষ কারণ এই যে,  
লীগের প্রদত্ত আশ্বাস অনেক ক্ষেত্রেই প্রতারণার  
ছদ্মবেশ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। নোয়াখালি  
ত্রিপুরায় যে সকল মুসলমান প্রতিবেশী হিন্দু-  
দিগকে নিবিঘ্নতার আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি  
দিয়াছিল, তাহারা কয়দিন পরে—সংঘবন্ধ  
হইয়া সর্ববিধ অনাচারের ও অত্যাচারের  
অনুষ্ঠান করিয়াছিল। সুতরাং লীগের কথায়  
আস্থা স্থাপন করা দুষ্কর। কংগ্রেস এ বিষয়ে  
কি করিতে পারেন?

কলিকাতায় ‘রিলাফ কমিটি’ নামক একটি  
প্রতিষ্ঠান সংবাদপত্রে যে বিজ্ঞাপন প্রচার  
করিয়াছেন, তাহাতে যে সকল পরস্পরবিরোধী  
উপদেশ আছে, সে সকল বিশেষভাবে লক্ষ্য  
করিতে হয়। তাহারা প্রথমেই নির্দেশ দিয়াছেন  
—ক্ষমতা পরিবর্তনের সময় পূর্ববঙ্গের প্রত্যেক  
পরিবারের পুরুষেরা যেন অবশ্য স্ব স্ব গ্রামে  
যাইয়া থাকেন; তাহার পরে আবার বলিয়াছেন,  
যে সকল স্থানে স্বল্পসংখ্যক (হিন্দু?) বাস  
করেন, সে সকল স্থান হইতে তাহাদিগকে  
সরাইয়া ঘনবসতি ও নিরাপদ স্থানে আনিবেন।

পূর্ববঙ্গের প্রত্যেক হিন্দুর পক্ষে ভারত-  
বর্ষের নানা স্থানে কাজ ত্যাগ করিয়া গ্রামে  
সমবেত হওয়া কি সম্ভব? তাহাতে কি সংখ্যা-  
গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অত্যাচার করিবার সুবিধাই  
হইতে পারে না? আর লোককে সরাইয়া  
আনিবার যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাও  
অল্প হাস্যোদ্দীপক নহে। তাহাতেই কি  
মুসলিম লীগের আশ্বাসে অবিশ্বাস সপ্রকাশ  
নহে? ব্যয়সাধ্য স্থানান্তরের ব্যয় কে বহন  
করিবে? উপদেশমালার মধ্যে আরও যে সমস্ত

উপদেশ আছে, সে সকলের আলোচনা করিয়া সময় নষ্ট করিতে চাই না। কিন্তু এরূপ উপদেশে যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনোভাবের পরিবর্তন হইবে না—তাহা গান্ধীজীর নৈরাখ্যাতিতে ‘আলোক-বিকাশ’ দেখিতে না পাওয়াতেই প্রতিপন্ন হইবে।

সেদিন শ্রীকিরণশঙ্কর রায় লিখিয়াছেন—  
পূর্ববঙ্গের হিন্দু সরকারী কর্মচারীরা সকলেই পশ্চিমবঙ্গে আসিতে চাহিতেছেন। গত ৩০শে জুলাই সশস্ত্র পুলিশের দুইশত হিন্দু ঢাকা হইতে বদলী হইয়া কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন। এ সকল যে উপেক্ষণীয় নহে এবং অবজ্ঞা করাও যায় না, তাহা বলা বাহুল্য।

নৈরাখ্যাতিতে হিন্দুদিগকে পুনর্বাসিতর জন্য বরাদ্দ টাকার এক-চতুর্থাংশ এখনও দেওয়া হয় নাই।

যে হিন্দুরা পাকিস্থানে থাকিবেন, তাহা-দিগের পুত্র-কন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ হইবে? কিছুদিন হইতে মুসলমান সচিবসংঘের বাঙলা ভাষা বলপূর্বক বিকৃত করিবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে। সকল সজীব ভাষার মত বাঙলা ভাষাও অনেক বিদেশী শব্দ গ্রহণ করিয়াছে। ইংরেজিতে যেমন ‘কেমফ্রাজ’ প্রভৃতি শব্দ গৃহীত হইয়াছে, বাঙলায় তেমনই ‘এঞ্জিন’ প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ফার্সী শব্দ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বলপূর্বক বাঙলা ভাষাকে ‘মুসলমানী বাঙলা’ করিবার চেষ্টা এখন ঐ মন্তব্য ও মাদ্রাসা হইতে ক্রমে পূর্ববঙ্গের সকল বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে দেখা যাইতেছে।

দৃষ্টান্ত—(১) “যাঁহারা খোদাতয়ালাকে এক জানিয়া তাহার এবাদৎ না করিবে, তাঁহারা গোনাহগার হইবে এবং আখেরে খোদার গজবে পাড়িয়া দোজখের আগুনে জ্বলিতে থাকিবে।”

(২) পাক কোরানের ধর্মই একমাত্র সত্য ধর্ম। কোরান শরীফ পড়িলে সওয়াব হয় মন পবিত্র থাকে ও প্রাণে শান্তি পাওয়া যায়। বাটীতে কোর-আন শরীফ পাঠ করিলে শর্যতান পালাইয়া যায় এবং বলা মসিবত কাটিয়া যায়। প্রত্যহ পাক-শাফ হইয়া কোরান শরীফ পাঠ করা উচিত।”

(৩) “তাম্ উঠিবার পূর্বে নিয়তে করিয়া তাম্ ডুবিয়া যাওয়া পর্যন্ত উপবাস করাকে রাজা বলে।”

এই সকল রচনায় যে বিদেশী শব্দগুলির বাঙলা প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যায়—পাঠক মুসলমান বালক-বালিকারা ঐ সকল শব্দের অর্থ গ্রহণ করিতে পারে না। কারণ বাঙলাই তাহাদিগের মাতৃভাষা।

পাকিস্থানের শাসকগণ বলিবেন—পাকিস্থান যখন মুসলমানের স্থান, তখন তথায় ‘মুসলমানী বাঙলাই’ শিক্ষার বাহন হইবে, বাঙালী হিন্দু শিক্ষার্থীদের জন্য কোন মন্তব্য ব্যবস্থা করা হইবে না—সেরূপ ব্যবস্থা

করা কেবল অর্থের অপব্যয়। ফলে পাকিস্থানে বাঙালী হিন্দুকে তাহার মাতৃভাষা ভুলিয়া ‘মুসলমানী বাঙলা’ পাঠ করিতে হইবে। ক্রমে সে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বাঙলা রচনা পড়িতে ও পড়িলে বুঝিতে অক্ষম হইবে। এখন জিজ্ঞাস্য, ইহা কি পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ পাকিস্থানে হিন্দুদিগের চরম দুর্দশার কারণই হইবে না? যে মাতৃভাষা সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছিলেনঃ—

“মাতৃ সম মাতৃভাষা পুরাবে তোমার আশা  
তুমি তার সেবা কর সুখে”

আর তাহারই উল্লেখ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, “মাতৃভাষা সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যে কবিতাটি আছে, পাঠককে তাহা পড়িতে বলি”—বাঙালী বালক-বালিকা পাকিস্থানে থাকার অপরাধে যে সেই ভাষা ত্যাগ করিতে বাধ্য হবে, ইহা কি তাহাদিগের পক্ষে চরম দুর্দশা ব্যতীত আর কিছু হইবে? সেই চরম দুর্দশা হইতে কে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে? এদেশে ইংরেজ শাসনের দোষোচ্ছাতন উপলক্ষে আমরা বলিয়া থাকি—শতবর্ষাধিক কালেও ইংরেজ এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করেন নাই। আর জাপানের সম্রাট ঘোষণা করিয়াছিলেন—রাষ্ট্রের অভিপ্রায় এই যে, জাপানের কোন গ্রামে একটিও নিরক্ষর পরিবার এবং কোন পরিবারে একজনও নিরক্ষর লোক থাকিবেন না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মত পাকিস্তান সরকারও রাষ্ট্রে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিবেন, ইহা মনে করা যাইতে পারে। যদি তাহাই হয়, তবে যে মাতৃভাষা পূর্ববঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার বাহন হইবে তাহা যদি উর্দু না হয়, তবে যে “মুসলমানী বাঙলা” হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। যাঁহারা আজ পশ্চিমবঙ্গে থাকিয়া পূর্ববঙ্গে পাকিস্তান রাষ্ট্রের হিন্দুদিগকে ভিটা ত্যাগ করিয়া আসিতে নিষেধ করিতেছেন, তাঁহারা কি এই বিষয় বিবেচনা করিয়াছেন? পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি পূর্ববঙ্গে হিন্দুদিগের শিক্ষার জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে পারিবেন? তাঁহারা কোন ব্যবস্থা করিতে যাইলে পাকিস্তান সরকার কি তাহার সুযোগ দিবেন? আর হিন্দু বালকবালিকাদিগকে যে হিন্দু সংস্কৃতি-বিরোধী শিক্ষা লাভ করিতে হইবে, তাহার প্রমাণও উদ্ভূত অংশটিতে পাওয়া যায়—“পাক কোরানের ধর্মই একমাত্র সত্য ধর্ম।”

বাঙলার মুসলমান-শাসিত পাঠ্যপুস্তক সমিতির কল্যাণে ইতিহাস—মুসলমানের দ্রুতি গোপন করিবার জন্য কিরূপ বিকৃত করা হইয়াছিল, তাহা আমরা অবগত আছি। আর পরিভাষের বিষয় হিন্দু ইতিহাস লেখকগণও পুস্তক পাঠ্য বলিয়া গৃহীত হইবে

বলিয়া সেই বিকৃতি গ্রহণ করিয়া অর্থাভ্রাণ করিয়াছেন। কাজেই পাকিস্তান বাঙলায় বাঙালী ছাত্রদিগকে কি ইতিহাস পাঠ করিতে হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

এই সকল বিবেচনা করিলে অত্যাচার ভয়-ভীত হিন্দুরা যদি পূর্ববঙ্গে ত্যাগ করিয়া আসিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন, তবে তাঁহাদিগকে সে বিষয়ে সাহায্য করা কি হিন্দুস্থানের অধিবাসীদের কর্তব্য হইবে না?

পশ্চিমবঙ্গে যে আরও লোকের প্রয়োজন, তাহা আমরা পূর্ববর্তী এক প্রবন্ধে বলিয়াছি। যখন বাঙলার মুসলিম লীগ সচিবসংঘ বিহারে হিন্দুদিগের মধ্যে বাঙলায় মুসলমানদিগের অত্যাচারের প্রতিবন্ধ্যার সুযোগ লইয়া সহস্র সহস্র মুসলমানকে নানা উপায়ে প্রলুব্ধ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে স্থান দিয়াছিলেন, তখন একখানি পাকিস্তানী পত্রে বলা হইয়াছিল—পশ্চিমবঙ্গে বহু জমি “পতিত” আছে—বিহারী মুসলমান-দিগকে সেই সকলে বাস করিতে দিলে সে সকল শস্যশ্যামল হইয়া উঠিবে। বাঙলার মুসলিম লীগ সচিবসংগ সেই কার্যের জন্য “পতিত” জমি অধিকার করিবার জন্য আইনও করিতে গিলেন—কর্ণবিভাগে তাঁহাদিগের সেই “বাড়া ভাঙে ছাই” পড়িয়াছে। সে সকল জমি কেন পতিত থাকিবে? পূর্ববঙ্গের হিন্দু কৃষিবল আসিয়া সেই সকল জমি সত্যি শস্যশ্যামল করিয়া বাঙলার অসহায় ঘুচাইয়া বাঙলাকে আবার অমপূর্ণার অমমেলিতে পরিণত করিতে পারিবে।

পশ্চিমবঙ্গে যে কৃষি ব্যতীত অন্যান্য কারণেও আরও বাঙালীর প্রয়োজন এবং বাঙলার অর্থনীতিক উন্নতি সাধনের জন্য তাহাতে আর বিলম্ব করা সঙ্গত নহে, তাহাও আমরা প্রতিপন্ন করি।

তাহাতেই পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগকে পশ্চিমবঙ্গে আনিয়া নিরাপদে রাখিবার প্রয়োজন উপলব্ধ হইবে।

গত শনি ও রবিবারে কলিকাতায় পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধিদিগের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। সেই সম্মেলনে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি নূতন কেন্দ্রী সরকারে মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ইহার পরে তাঁহার পক্ষে উত্তরূপ কোন অনুষ্ঠানে সরকারের কার্যের সমালোচনা করা সঙ্গত হইবে না। এবার তিনি পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগের সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের সচিব সংঘের কর্তব্য সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন।

ইতোমধ্যে যুরোপীয় পরিচালিত পত্রে বলা হইয়াছে, পূর্ববঙ্গে মুসলমানগণ যখন হিন্দু-দিগের উপর কোন অত্যাচার করিতেছে না, তখন তাহার আশংকা প্রকাশ করিয়া তিত্ততা বর্ধিত করা সঙ্গত নহে। যে ইংরেজ একজন ইংরেজ মহিলার অপহরণে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে

রণসজ্জা করিয়াছিল, সেই ইংরেজের মুখপত্র যখন পূর্ববঙ্গে মুসলমানদিগের অত্যাচারের অভিজ্ঞতা লইয়াও এইরূপ কথা বলিতে পারেন, তখন মনে হয়—ইংরেজের কি অধঃপতন হইয়াছে। অবশ্য এই অধঃপতনের পরিচয় জাপানেও পাওয়া গিয়াছিল। তথায় যখন একজন ইংরেজ মহিলাকে প্রায় বিবস্ত্র করিয়া জাপানী রাজকর্মচারীদিগের আদেশে খান-তলাস করা হয়, তখনও বিলাতের প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন তাহার প্রতিকারপত্র হইতে পারেন নাই; বলিয়াছিলেন, য়ুরোপেই বুটেন বিপন্ন, আর প্রাচীতে অপমানের প্রতিকার করিতে অক্ষম। হয়ত সেই অক্ষমতা স্বীকারই জাপানকে অধিক সাহস দিয়াছিল।

কলিকাতায় যে সম্মেলন হইয়াছিল, তাহা পূর্ববঙ্গেই হইবার কথা ছিল; কিন্তু এখনও যে সচিব সংঘ ক্ষমতা ভাগ করিতে বাধা হয়েন নাই, সেই সচিব সংঘের অধীনে কর্মচারীরা তথায় আধিবেশন নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। ঐ সম্মেলনে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের বহু প্রতিনিধি সেই সকল স্থানে যে অবস্থার উল্লেখ করেন, তাহাতে এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না যে, তথায় হিন্দুদিগের আশংকার ও আতঙ্কের কারণ যথেষ্টই আছে। মুসলমানদিগের মধ্যে কেহ কেহ কোন হিন্দুর কন্যাকে বিবাহ করিবে, তাহাও নাকি প্রকাশ করিতেছে। এইরূপ মনোভাব যে স্থানে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সরকারের সমর্থিত সম্প্রদায়কে কার্যে প্রণোদিত করে, সে স্থানে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অবস্থা কিরূপ হইতে পারে? পূর্ববঙ্গ হইতে যাহারা চলিয়া আসিতে চাহেন, তাহাদিগকে আনিবার ব্যবস্থা করা কি প্রয়োজন নহে?

পশ্চিমবঙ্গে যে আরও লোকের প্রয়োজন ও স্থান আছে, তাহা আমরা বলিয়াছি। আজ সেই সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

প্রথম, পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানায় বহু বাঙালীর অন্ন সংস্থানের উপায় হইতে পারে। বাঙলায় যখন প্রথম পাটকল প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহাতে মট্টীমেয় ব্রিটিশ কর্মচারী বাদ দিলে কলী-মজুর হইতে কর্মচারী সবই বাঙালী ছিলেন। ভারতীয় শিল্প কমিশনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের এক রিপোর্টে দেখা যায়, ২০ বৎসর পূর্বে পাটকলে সব শ্রমিকই বাঙালী ছিল—এখন শতকরা ৯০ জন অন্য প্রদেশের। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ভদ্রেশ্বর ও টিটাগড়ে শতকরা ২৮ জন মাত্র শ্রমিক বাঙালী ছিল, আর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বাঙালী শ্রমিক শতকরা ১০ জন মাত্র। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের তুলনায় ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বহিরাগতের সংখ্যা ২৪ পরগণায় শতকরা ৮০ জন বাড়িয়াছিল। ১৮২৯

খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভদ্রেশ্বর পাটকলের হিসাব—

মোট নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় ৬,২০০; তাহাদিগের মধ্যে মাত্র ২২ জন য়ুরোপীয়। অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে ১২ জন বাঙালী, ৮৮ জন অন্যান্য প্রদেশের (৫৬ জন বিহার উড়িষ্যা, ২০ জন মধ্যপ্রদেশের, ১২ জন যুক্তপ্রদেশের); মুসলমান মাত্র ১,৬৮৮ বা শতকরা ২৭ জন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এই পাটকলে মোট প্রদত্ত বেতন—১৬ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা। পাটকলের ডাকঘর হইতে ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭ শত ৭ টাকা বাহিরে প্রেরিত হইয়াছিল।

১৯২৮-২৯ খৃষ্টাব্দে বাঙলার পাটকল-গুরুিতে প্রায় ৩ লক্ষ ৪০ হাজার শ্রমিক কাজ করিয়াছিল এবং তাহারা প্রায় সাড়ে ৮ কোটি টাকা বেতন পাইয়াছিল। অবাঙালীরা ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা পাইয়াছিল এবং ২ কোটিরও অধিক টাকা অবাঙালীদিগের গ্রামে পাঠাইয়াছিল।

একটি পাটকলের এই হিসাব হইতেই বাঙলার পাটকলে অন্য প্রদেশের লোকের সংখ্যা ও তাহারা বাঙলা হইতে বৎসরে কত টাকা লইয়া যায়, তাহা বুঝিতে পারা যায়। পূর্ববঙ্গ হইতে শ্রমপট্ লোক পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া কত কাজ করিতে পারে এবং তাহাতে বৎসরে কত কোটি টাকা বাঙালীর থাকিতে পারে, তাহা ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়। প্রত্যেক শ্রমিক যদি গড়ে ৩ জন লোক পালন করে, তবে পশ্চিমবঙ্গে কত লোকের অন্ন-সংস্থান হইতে পারে? প্রাদেশিকতা যদি অন্যান্য প্রদেশে নিষ্পন্ন না হয়, তবে বাঙলায়ই বা হইবে কেন?

ভাষা অনুসারে প্রদেশ বিভাগের যে প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে বিহারের 'সার্চ লাইট' কিরূপ উগ্র হইয়াছেন, তাহা গত ১৫ জুলাই তারিখের পত্রই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে—অথচ মানভূমের শতকরা ৫০ জনেরও অধিক আধিবাসী বঙ্গভাষাভাষী। বাঙলায় কিন্তু এইরূপ ভাবের কোনরূপ বিকাশ নাই। 'সার্চ লাইট' এমন কথাও বলিয়াছেন যে, পশ্চিম বা হিন্দুবঙ্গের আধিবাসীরা কি বুঝিতে পারিতেছেন না, ভবিষ্যতে মুসলমানের আরম্ভণ প্রতিহত করার জন্যও হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গকে ও হিন্দুপ্রধান বিহারকে একযোগে কাজ করিতে হইতে পারে? কিন্তু মানভূম জিলাটি বাঙলার অন্তর্ভুক্ত হইলেই কি সে কার্যে বিশেষ বাধা ঘটিতে পারে? শেষে কিন্তু 'সার্চ লাইট' বলিয়া ফেলিয়াছেন, বিহারের বঙ্গ ভাষাভাষীদিগের দ্বারা অধুযিত জিলা যদি বাঙলার অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তাহাতে বিহারের বিশেষ ক্ষতি হইবে, কিন্তু বাঙলার কোন উল্লেখযোগ্য লাভ হইবে না। অর্থাৎ বিহার লাভের জন্য বহু বঙ্গভাষা-

বিলো দিলো



চাই

চাওঁ  
করে গেলে

ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট  
এক্সপ্যানশন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত



ভাষীকে তাহাদিগের প্রদেশে যোগদানে বঞ্চিত রাখিতে চাহে।

তাহার পর কথা, বাঙলায় আরও শিক্ষণ প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। যে সময় এদেশে চিনির কল সম্বন্ধে আলোচনা হয়, তখন বিহার ও যুক্ত-প্রদেশের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল, ঐ প্রদেশ-স্বর্ষে যত চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে বাঙলায় ও মাদ্রাজে আর চিনির কল প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন নাই এবং তাহাতে সকল চিনির কলেই লাভের অঙ্ক প্রতিবোধিতায় কমিয়া যাইবে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, এদেশে আরও চিনির প্রয়োজন। বাঙলায় ইক্ষুর চাষের অনেক সুবিধা আছে এবং দামোদর উপত্যকা সম্বন্ধীয় বিরাট পরিকল্পনা যদি কার্যে পরিণত হয়, তখন সে সকল সুবিধা আরও বর্ধিত হইবে। বাঙলায় যে চিনির কল আছে, তাহাও পশ্চিমবঙ্গে নহে। কাজেই বাঙলাকে স্বাবলম্বী হইতে হইলে চিনির কল প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সে জন্য কৃষিকার্য ও কলে বহুলোকের প্রয়োজন হইবে।

কৃষিকার্যের কথায় বলিতে হয়, বাঙলাকে খাদ্য সম্পর্কে স্বাবলম্বী করিবার প্রয়োজন গত কয় বৎসরে যেরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহাতে তাহা আর বলিতে হইবে না। লর্ড রোনাল্ডসে দেখাইয়াছিলেন, পরীক্ষার ফলে অধিক ফলনের দুই জাতীয় ধান্য পাওয়া গিয়াছে—তাহাদিগের চাষে প্রতি একরে তিন মণ অধিক ধান্য উৎপন্ন হয়। বলা বাহুল্য, তিনি ইন্ডসাইল ও কটক-তারা ধান্যের বিষয় বলিয়াছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ঐ দ্বিবিধ ধান্যের চাষে আড়াই লক্ষ একর জমীতে ধান্যের যে পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহার মূল্য ৩০ লক্ষ টাকা। সেই সময়েই তিনি বলিয়াছিলেন, বঙ্গোপসাগরের সন্নিহিত

২ কোটি একর ধান্যের চাষের উপযুক্ত জমী আছে—তাহাতে ঐ দ্বিবিধ ধান্যের চাষ হইলে কত উৎপাদন বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

কেবল ধান্যের চাষই নহে—কৃষিকার্য ও তাহার আনুসঙ্গিক অন্যান্য কার্যেরও প্রসার বৃদ্ধি প্রয়োজন। গত যুদ্ধ আরম্ভ হইতে না হইতে—পূর্ব যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হেতু ইংল-ড খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধিতে অর্বাহিত হইয়াছিল এবং কয় বৎসরে খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ শতকরা ৬০ ভাগ বর্ধিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল বলিয়াই যুদ্ধের সময় বৃটেনে খাদ্যাভাবে লোকের স্বাস্থ্য ক্ষুদ্র হয় নাই। কিন্তু বাঙলায় যুদ্ধের সময় খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে তাহা—

“কোম্পানীকে মাল দরিয়ায় ঢাল”

হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। নহিলে এখনও বাঙলায় লোকের খাদ্যাভাবের আর কোন কারণ থাকিতে পারে না।

পশ্চিম বঙ্গে নানা উন্নতিকর কার্যের জন্যও লোক প্রয়োজন। গত ৩রা আগস্ট তারিখে করাচীতে আচার্য কৃপালনী বলিয়াছেন—

পাকিস্থানে সংখ্যাগরিষ্ঠগণের যদি যথা-যথভাবে (তথিকার) রক্ষা না হয়, তাহা হইলে আমাদিগের ইচ্ছার বিশেষ বিরুদ্ধেও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে অনুর্ব্ব ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইবে। আঘাতের জন্য আঘাত করা বা প্রতিশোধ লওয়া কংগ্রেসের নীতি নহে। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া কেহ অস্বীকার করিতে পারে না।

এই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সচিব সস্বের কমচারীদিগকে কার্যভার প্রদান সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলা আমরা প্রয়োজন মনে করি। ২৪ পরগণা পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টকে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার করা হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতার লোক বলিতে চাহেন—মুসলীম লীগের ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রামের’ সময় তিনি নিরীহ বাঙালিগণের হত্যা নিবারণের কি চেষ্টা করিয়াছিলেন? যে মিস্টার আর কে মিশ্রকে আলীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট করা হইয়াছে, তিনি পূর্ববঙ্গে কিরূপ কাজ করিয়াছিলেন; তিনিই সুদ্রাবন্দী সরকারের সময়ে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র দমন করিবার জন্য কাগজগুলিকে ‘জখাণ্ড’ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিনা এবং তিনিই প্রধান-সচিব সুদ্রাবন্দী বিপ্লবীক কি না তাহা না জানিয়াই মিসেস সুদ্রাবন্দীকে ‘পাস পোর্ট’ দিয়াছিলেন কি না। এ সকল বিষয় কি বিবেচিত হইয়াছে? যাহাকে বীরভূমের জিলা ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হইতেছে, সেই মিস্টার এন জি রায় কি কন্ট্রোলার প্রারম্ভে কলিকাতায় ছিলেন? যে মিস্টার কৃপালনীকে কৃষি, বন ও মৎস্য বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হইল, তিনিই কি সার জন হার্বার্টের কার্যকালে চাউল রপ্তার ব্যাপারে সচিবদিগের মতের অপেক্ষা না রাখিয়া কাজ করিয়াছিলেন?

আমরা আজ মাত্র কয়জনের কথা বলিলাম। আমরা আশা করি, পশ্চিমবঙ্গের সচিব-সংঘ এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া আপনাদিগের কোন কাজ ভুল হইয়া থাকিলে তাহার সংশোধন করিতে ইতস্ততঃ করিবেন না। কারণ, তাহাদিগের কার্যের গুরুত্ব অসাধারণ এবং তাহাদিগের কার্যের সাফল্যে বাঙালীর স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার লাভের যোগ্যতার পরীক্ষা হইবে।

## দৃষ্টির সৎকৃত

রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী

একদিন দৃষ্টি তব বক্ষে মোর তুলেছিল অসির ঝঞ্ঝনা—  
উদ্বেলিত প্রতি রক্তকণা  
পেশিতে পেশিতে মোর জাগায়েছে রক্ত করতালি—  
শিরায় শিরায় যেন স্ফুলিঙ্গের অঘাত দীপালি।  
বৈশাখের কুমুড়া—পূজুভূত আজ রক্ত মেঘ,  
শোণিতের উদ্দাম আবেগ  
একসঙ্গে গাথা তার সাথে  
তোমার সে দৃষ্টির আঘাতে।  
দিগন্ত কাঁপায় নামে ঝড়  
হ্রাসার্ভ অম্বর,  
পূজ পূজ ধূল মেঘে মেঘে  
বিদ্রোহের অগ্নিস্পর্শ লেগে  
তোমার সে দৃষ্টির সংকেত জ্বলে ওঠে—  
দুরন্তের সীমানায় রাশি রাশি রক্তপশ্ম ফোটে।

## উন্মুখর

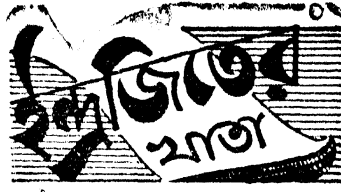
রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী

অজস্র জ্বলন্ত চোখ পথের দুপাশে মোর চেয়ে চেয়ে আছেঃ  
আমার জন্মট সস্তা গলে গলে নামে  
হেনন বরফ গলে পাহাড়ের সুউচ্চ চড়ায়—  
তারপর দূরশ্রমি মিশে তার তরল সন্তায়।  
জ্বলন্ত চোখের শিখা মূক্তির সিঁড়ির ইসারায়  
স্পর্শ করে সর্বাত্মক আমার।  
চিনেছি তাদের আমি—পেরেছি তাদের পরিচয়ঃ  
সে উত্তপ্ত গলে গলে আমার চেতনা ধারা বহে  
মাঠে ঘাটে নগরে প্রান্তরে  
পল্লীর নিবাক কোণে—উন্মুখর কারখানার ঘরে,  
জনতা তরঙ্গে মিশে আমার সে ধারা নিরুদ্দেশ।  
আমার মুক্তির আমি প্রত্যক্ষ করেছি পৃথিবীতে,  
স্বদেশে বিদেশে কাছে দূরে দুরান্তরে—  
উন্মাদ রক্তের স্রোতে সে কাহিনী আজ উন্মুখর।

## বন্ধু-বিরহ

আমার এক বিষম বদভ্যাস। একটা কোনো বিষয় নিয়ে লিখব ভাবি কিন্তু শুরুরতই এত অব্যস্তর কথা এসে যায়, শেষ পর্যন্ত বক্তব্য বিষয়টা আর বলাই হয় না। বহু দূর থেকে জল ঘোলাতে ঘোলাতে অগ্রসর হতে থাকি; অনেক আঁটিঘাট বেঁধে শেষটায় যখন মূল বিষয়টার দোরে এসে পেঁচিছি—তখন দেখি আমার খাতার বরাদ্দ এক পাতা শেষ হয়ে গেছে। তার ফল হয়েছে এই যে, আমার প্রত্যেকটি পাতা একেকটি প্রবন্ধের ভূমিকা মাত্র অর্থাৎ প্রবন্ধের মূখবন্দ। জি কে চেন্টারটনের এক সমালোচক বন্ধু তাঁর সম্বন্ধে অনুরূপ অভিযোগ করেছিলেন। বলেছিলেন, পড়তে পড়তে ঠিক যেখানটায় এসে ভাবি এবার আসল বক্তব্যটা শুনবু হবে ঠিক সেখানটাতেই চেন্টারটনের প্রবন্ধ শেষ হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, আমি চেন্টারটনের কোনো গুণগেই অধিকারী নই; কিন্তু তাঁর ঐ প্রধান দোষটি বেশ ভালো করে আমি আয়ত্ত করে নিয়েছি।

এই ধরুন গেলবারে আমি যে বিরহের কথা লিখিছি সে বিষয়ে লিখবার আমার উদ্দেশ্যই ছিল না। বিরহ কোন কালে আমার ঘাতে সয় না। বোধ করি, বিরহ শব্দটা উচ্চারণ মাত্রই আমার ঈর্ষাচূড়িত হয়েছিল, সেজন্য যে কথা বলব বলে ভেবেছিলাম তা না বলে বিরহের উপরে খানিকটা বাল ঝেড়ে নিয়েছি। আসলে আমি যে বিরহের কথা বলতে গিয়েছিলাম সেটা লৌকিক অর্থে আপনারা যা বোঝেন তা নয়—প্রিয়া বিরহ নয়, প্রিয়জনের বিরহ অর্থাৎ বন্ধু বিরহ। সম্প্রতি আমি বন্ধু-বিরহ-কাতর। যে বন্ধু-মজলিশটি বহুদিন ধরে আমার মনে রসের যোগান দিয়ে আসছিল ইদানীং সেটি হঠাৎ অনেকখানি স্তিমিত হয়ে গেছে। আমাদের মধ্যে যিনি ছিলেন বয়সে সকলের চাইতে ছোট কিন্তু উৎসাহে সকলের চেয়ে বড়, তিনি সম্প্রতি বিদেশে চলে গিয়েছেন। গানে গঙ্গে হাস্যরসে তিনি একাই ছিলেন একশো। প্রমীলা দেবী পরিহাস করে ওকেই বলতেন আমাদের মোচাকের মক্ষিরাণী। সত্যি বলতে কি একজন মানুষ যে কতখানি যায়গা জুড়ে থাকতে পারেন সে কথা আগে ভেবে দেখিনি, এখন প্রতি মহর্তে বুঝতে পারছি। আগের মতোই এখনও আমাদের মজলিশ বসে, কিন্তু রসালোচনা আগের মতো তেমন আর ফেনিয়ে ওঠে না। ভাঙা মজলিশে বসে ভাঙা গলায় আমরা বণ্ডভণ্ডের আলোচনা করি। সেই



তর্কমন্ডনে অমৃতের চাইতে বেশি ওঠে বিষ। আগে সেটি হতে পারত না। ঈষণ কোণে পলিটিক্সের ঝড় উঠবার সম্ভাবনা দেখলেই আমাদের বন্ধুটি কোঁকুহাস্যে পলিটিক্সের তুফানকে উড়িয়ে ঘুরিয়ে দিতেন। হয়ত তর্কের মাঝখানে হঠাৎ রবীন্দ্র সঙ্গীতের এক কলি গেয়ে দিলেন, মজলিশের আবহাওয়াটা এক মহর্তে হালকা হয়ে যেত। আমরা তর্ক করতুম, তিনি তর্কের জট ছাড়াতেন। তাঁর অভাবে আমাদের আড্ডা নিজীব হয়ে গেছে আর আড্ডা-অন্ত প্রাণ ইন্ডিজিভের কি দশা হয়েছে বুঝতেই পারেন। হঠাৎ মনে হচ্ছে, আমার কণার ভাঙার ফুরিয়ে গেছে। আমি তো আগেই বলেছি, আমি লেখক মানুষ নই, আমি কথক মানুষ। যিনি লেখক তিনি পাঠককে উদ্দেশ্য করে লেখেন। যিনি কথক তিনি শ্রোতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন। ইদানীং আমার কথা বলার উৎসাহ গেছে কম তার কারণ আমাদের প্রধান শ্রোতাটি অনুপস্থিত। সুখের বিষয়—‘দেশ’ পত্রিকার দৌলতে আমাদের আড্ডাটি এই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের দেয়াল অভিন্ন করে দূরান্তরে বিস্তারলাভ করেছে। ইন্ডিজিভের খাতা যদিও কাছে ভালো লাগে তাঁরা সকলেই আমাদের এই মজলিশের অন্তর্ভুক্ত। সেইজন্যই তো আমার মনোবেদনাটি আপনাদের কাছে নিবেদন করে চিত্তভার লাঘব করবার চেষ্টা করলুম।

আমাদের মজলিশের মধ্যে আমার সমবয়স্ক বন্ধু একজনও নেই। আমি উত্তর-চল্লিশ আর এঁরা প্রাক্তন-বিশের কোঠায়—বাইশ থেকে তিরিশের মধ্যে এঁদের বয়স। আমার চাইতে বেশি বয়সের লোকের সংগে কোনো কালে আমার সম্পর্ক নেই, এমন কি সমবয়স্কদের সংগেও না। সমবয়স্কদের এঁড়িয়ে চালি বলে তাঁরা আমাকে রীতিমতো অবজ্ঞা করেন। আমি পরিহাস করে বলতুম বড়দের সংগে মিশি না; তার কারণ বড় পীরিতই বািলর বাঁধ। কিন্তু এখন দেখছি ছোটদের পীরিতই বািলর বাঁধ। ওটা টেকসই জিনিস নয়। যে বয়সের লোকের সংগে সাধরণত আমার বন্ধুত্ব সে বয়সে মানুষের ঐশ্বর্য্য-স্থাপকতা থাকে না। দুদিন এখানে, দুদিন ওখানে। এঁরা মোটেই নির্ভরযোগ্য মানুষ নয়। কেউ বা নতুন চাকরি

নিয়ে, কেউ বা নতুন বিয়ে করে দল ছেড়ে চলে যান। এঁরা হয় পিতৃ-আজ্ঞা নরক পয়সী-আজ্ঞাবহ। আমার মতো প্রাজ্ঞ ব্যক্তির আজ্ঞা যদি শ্রবণ করতেন, তবে চিরকাল সুখে আড্ডা দিয়ে কাটাতে পারতেন। কিন্তু সংসারে সদৃপদেশ তো কেউ শুনতে চায় না।

আমার যা বয়স, তাতে নিত্যন্ত স্থাবির না হলেও আমি এখন এক রকম স্থিতিলাভ করেছি। আমার মনটা কতক পরিমাণে গতিশীল হলেও দেহটি এমন স্থিতিশীল যে, যখন তখন স্থানচ্যুত হবার কোন আশংকা নেই। তার প্রমাণ আমাদের আড্ডার সাবেক সভ্যদের মধ্যে আমি এখন একলা। আর সবাই নতুন। টেনিসনের ক্ষুদ্র প্রোভিস্বনীটির মতো আর সবাই আসে আর যায়—কিন্তু I go on for ever. একেকজন যখন যায় অনেকখানি জায়গা ফাঁকা করে দিয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃতি দেবীর বিধানে যেমন একটি sense of justice আছে আড্ডার বিধানও তাই। Natureএর ন্যায় আড্ডাও abhors vacuum. শূন্য স্থানে শূন্য থাকে না। নতুন আরেকজন এসে ফাঁকি-টুকু ভর্তি করে।

এঁদের অনেকের সংগে আমার বন্ধুত্ব অতি স্বল্পস্থায়ী। অস্বাভাবিক যে বন্ধুত্ব কালের মাপে তার গুরুত্ব নয়। এ জাতীয় বন্ধুত্ব অতি দ্রুতগামী। সাতদিনে সাত বছরের পথ অতিক্রম করে। দ্রুতগামী বলোঁ এর স্বল্পস্থায়ীয়ে কিছু এসে যা না। এজন্য বাঁরা অল্পদিনের জন এসেছেন এবং চলে গিয়েছেন, তাঁদের প্রাণ আমার কেনই নাশিশ নেই। অল্পদিনে মদেই তাঁরা যা দিয়েছেন, তার তুলনা হয় না এঁদের অল্পবয়সের বাদ্দের আমার মনকে নবী এবং সরস করে রেখেছে। আর কিছু; হোক! অন্তত এই কারণেও এঁদের কা চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব।

অনেক দেখে বুঝিছি, সংসারে যত রব সম্পর্ক আছে, তার মধ্যে বন্ধুত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ রক্তসম্পর্কিত আপনজনের কাছে যে স্নেহ ভালবাসা পাই, সেটা অনেকটা পৈত্রিক সম্পত্তি মতো আপসে মিলে যাওয়া। কি নিঃসম্পর্কিত বন্ধুজনের কাছে যে ভালবাসা পাই, সেটা আমার নিজ গুণে অর্জিত। এ মূল্য অনেক বেশী। লোকে যখন বলে আমান বন্ধুভাগ্য ভালো, তখন আমি মনে মনে খুশি হই—এই ভেবে যে, শূন্য আমার বন্ধুরাই ভাল মানুষ নয়, আমিও লোকটা ভালো, নইলে অত বন্ধু জুটেবে কেন?

## ইপির ফকির

একটি সংবাদে প্রকাশ যে, ইপির ফকির ১৫ই আগস্টের পর নিজেকে ওয়াজিরস্থানের বাদশা বলে ঘোষণা করবেন। ইপির ফকির একজন বৃটিশ বিরোধী উপজাতীয় নেতা বলে পরিচিত; তাঁর আসল নাম মিজা আলি খাঁ। বাল্যকালে তিনি শৃঙ্গাই রাইফেল ছুঁতে শেখেননি, মস্তবে লেখাপড়াও শিখেছিলেন; ধর্মভক্তও বাদ যায়নি। তীর্থ করতে তিনি একবার মক্কা গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ফেরবার পর থেকেই তিনি 'ইপির ফকির' নামে পরিচিত আর বস্তুতঃ তিনি সন্ন্যাসীর মতোই দিনযাপন করতেন, মধ্য মধ্য দীর্ঘ দিন উপবাসও করতেন। ১৯৩০ সালে ইংরেজ সরকার পেশোয়ারে জনগণের ওপর বেপরোয়া গুলি চালায়; ইপির ফকির এই অভ্যচারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার তাঁর সঙ্গে মিটমিট করতে চান কিন্তু ইপির ফকির, মহাত্মা গান্ধী ও গফ্ফার খাঁয়ের মত দাবী করেন। এই অসংগত দাবী ইংরেজ সরকার মানতে রাজি হলেন না। ইংরেজ সরকার তাঁকে কিছুতেই অবনত করতে পারলেন না। অর্থ দিয়ে ত নয়ই ভয় দেখিয়েও নয়।

১৯২৯ সালে ইপির ফকির নাদির খাঁকে বাচাই সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করেছিলেন। এই উপলক্ষে আরও কয়েকটি বৃটিশ বিরোধী বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় স্থাপন হয়।

ইপির ফকিরের বর্ধমান শক্তির বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার ১৯৩৬ সালে এক ব্যাপক আক্রমণ চালায়। এই সময় ইপির ফকিরের ঘর বাড়ি জনালিয়ে দেওয়া হয় এবং তিনি খৈশোরা উপত্যকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। পরাজয় স্বীকার তিনি করলেন না, কয়েকজন সহসী অনুচর নিয়ে গিরিলা যুদ্ধ চালিয়ে ব্রিটিশ সৈন্যদের উত্তাজ্ঞ করে তোলেন; শেষ পর্যন্ত তাদের হটে আসতে হয়। ইপির ফকির মুসলিম লীগের সীমান্ত নীতি সমর্থন করেন না।

### শিল্পীর হিমালয় অভিযান

কানোয়াল কৃষ্ণ একজন শিল্পী। হিমালয় তাঁর খুব ভাল লাগে। তিনি হিমালয়ের এপার থেকে ওপার আটবার যাওয়া আসা করেছেন। তিনি সিমলা থেকে দুশো মাইল পাহাড় পায়ে হেঁটে বোড়িয়েছেন এবং এখনও তিনি ভ্রমণ করছেন। তিনি তিব্বতের রাজধানী লাসায় আট-



মাস ছিলেন, সেই সময়ে নতুন দালাই লামার গদি আরোহণ উৎসবের অনেক ছবি এঁকেছেন। শিল্পী কানোয়ালের ইচ্ছা তিনি হিমালয়ের পনরো থেকে উনিশ হাজার ফিট উচ্চতার মধ্যে হাজার মাইল ব্যাপী এক ভ্রমণ সম্পূর্ণ করবেন এবং সেই সঙ্গে হিমালয়ের অপূর্ণ শোভার দৃশ্য তুলিবশ্ব করবেন।

### আমেরিকার আবিষ্কার কে?

আমেরিকার আবিষ্কারকে কেউ বলেন কলম্বাস, কেউ বলেন আমেরিগো ভেস্পুচি, আবার কেউ বলেন প্রাচীন বৌদ্ধরা। তাঁরা নিজের দেখান গোয়াটেমালাকে, তাঁ নাকি



ফরএভার অ্যাম্বারের লেখিকা ক্যাথলিন উইনসর

'গোতমালায়' কথার অপভ্রংশ। এ বিষয়ে নতুনতম তথ্য প্রকাশ করেছেন মার্কিন অধ্যাপক ডক্টর উইলিয়াম ওয়াকার স্ট্রং। তিনি বলছেন কলম্বাস আমেরিকায় আসবার আঠার শত বৎসর পূর্বে ফিনিশিয়ানরা আমেরিকার এসেছিল।

প্রমাণ স্বরূপ অধ্যাপক স্ট্রং চারিশত প্রাচীন প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করেছেন। এই সকল প্রস্তরখণ্ডে প্রাচীন ফিনিশিয় অক্ষরে অনেক কিছু লেখা আছে। অধ্যাপক স্ট্রং ফিনিশিয়দের বাইশটি বর্ণমালাই পড়তে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বলছেন যে, যিশু খৃষ্ট জন্মাবার ৩৭১ বৎসর পূর্বে হিমালকন নামক একজন সেনাপতির নেতৃত্বে তিন হাজার ফিনিশিয়দের এক বাহিনী সাস্কিহানা নদী ধরে অ্যামেরিকার অভ্যন্তরে এসেছিলেন। তারা এই নদীর উপত্যকায় বসতি স্থাপন করেছিল এবং তারা খনি থেকে লোহা তুলে তা গালাতো। শিলালিপি থেকে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় যে, গ্রীসের সঙ্গে যুদ্ধে তাদের লোহার ঘাটিত পড়েছে। একটি পাথরে লেখা আছে 'সেনাপতি হিমালকন এই স্থানে আহত হয়েছিলেন।' আফ্রিকা ও এশিয়া মাইনরের কয়েকটি সহরের বিষয়ও উল্লেখ আছে। তানেনদ নামক ফিনিশিয়দের ঈশ্বরের নাম এই শিলালিপিগুলি থেকে পাওয়া যায়; তারা যে নরবলি দিত তাঁরও উল্লেখ আছে। স্ট্রং মনে করেন যে, ফিনিশিয়রা ভূমধ্য সাগর ছেড়ে অ্যাটলান্টিক সাগরে পড়ে 'আজোর্স' দ্বীপে আসে, সেখান থেকে পাড়ি জমিয়ে দক্ষিণ অ্যামেরিকা পেঁছে তার উপকূল অনুসরণ করে 'চীপসেক বে' তে এসে উপস্থিত হয়, তারপর সাস্কিহানা নদী ধরে অ্যামেরিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

### বাজেয়াপ্ত পুস্তকের ব্যবসা

যে সমস্ত বই সরকার বাজেয়াপ্ত করেন সেগুলি গোপনে বেশ চড়া দামে বিক্রয় অথবা ভাড়া দেওয়া হয়। আমাদের দেশেও এরকম ব্যবসা চলেছে। ইংলণ্ডে এই ব্যবসা বর্তমানে খুব জোর চলেছে। যে বাজেয়াপ্ত বইগুলির চাহিদা এখন খুব বেশী সেগুলির নাম হলো জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস', ডি এচ লরেন্সের 'লেডী চ্যাটার্লিস লাভার', ক্যাথলিন উইনসরের 'ফরএভার অ্যাম্বার' (এই বইখানির সিনেমায় ছবিও তোলা হয়েছে), হেনরি মিলারের 'ট্রিপিক অফ ক্যাম্বার' ও 'ট্রিপিক অফ ক্যাপ্রিকন' এবং র‍্যাডক্লিফ হলের 'ওয়েলস অফ লোনলিনেস'। 'লেডী চ্যাটার্লিস লাভার' ও 'ফরএভার অ্যাম্বার' বই দুখানিরই চাহিদা বেশী। এই বই দুখানি পড়তে হ'লে পাঁচ পাউন্ড জমা দিতে হয় ও দৈনিক এক পাউন্ড ভাড়া দিতে হয়। মন্দ কি!



“ওরে আয় রে তবে মাত্ রে”—ফাক্তুনী

କଥା ଓ ଭ୍ରମ ॥ ଗୁରୁଜୀବନାଥ ଠାକୁର

স্বরলিপি ॥ শ্রীঅনাদিকুমার দত্তিদার

ধা না II না -১ সর্ষ -১ সর্ষা । -না -সর্ষা ধা না I না -১ সর্ষা -১ II না -১ সর্ষা -১ I  
ও রে জা য় রে . . . . . ও রে জা য় রে . . . . . ত . . . . . বে . . . . .

I না -রা র্‌সা -া | -ণা -া দা ণা I পা -র্‌সা সা -না | র্‌সা -া দা -না I  
মা ত্‌ বে . . . স বে আ . ন ন দে . আ জ্‌

I না -৭ সী -৭ | না -৭৭ <sup>৭</sup>সী -৭ I সা -মা মা -৭ | মা -পা পা ধা II  
ন • বী ন্ প্রা • গে র ব • স ন্ তে • “ও রে”

-১ -১ -১ -১ II { বা -১ বা -১ | বা -১ বা -না I না -১ সর্গ -১ | রসর্গ -না সর্গ -১ I  
 • • • • পি • ছ ন্ পা • নে ব্ বা • ধ ন্ হ • • তে •

I মা - দা - রা রা | রা - মা মা - I না - মা নমা - রা | মা - দা দা ( - ) } I - না I  
চ . ল ছ ট . আ জ ব . ঞা . . ষো . . তে . .

I    সী - মী    -।    মী।    |    মী - জী    জী -।    I    জী - পী    পী - মী    |    মী - জী    জী -।    I

আ    ং    প্    না    কে    ং    আ    জ্    দ    ং    থি    ন্    হা    ং    যা    য্

I রী র্মা র্মা -৭ | রী -৭ সী -না I ধা -সী সী -না | সী -না ধা -না I  
ছ ড়ি য়ে • দে • রে • দি • গ ন তে • আ জ্

I না - নী সী - নী | না - র্য <sup>র</sup>সী - নী I সা - মা মা - নী | মা - পা পা - দা II

ন • বী নু প্রা • গে ব ব • স ন তে • “ও রে”

-। -। -। -। II { সা-মা    মা    -। | মা    -। মা    -পা । পা    -স।    -। স।    |    স।    -। বা    -। I  
 •    •    •    •    বা    •    ধ    ন    য    •    ত    •    ছি    •    ন    ন    ক    •    য়ো    •

I খা -ণা পখা -ণা | গা -় গা -় I গা -ৰ্গা <sup>ৰ্গা</sup> -ণা | গা -খা খা -পা I  
 আ • নং ম দে • আ জ্ ন • বাঁ নু প্রা • গে ব

I পা -মা মগা -পা । <sup>ম</sup>জা -া -া -া । I পা -া পা -া । পা -া পা -না । I  
ব • স• ন তে • • • অ • কৃ ল্ প্রা • গে ব

I না -১ শা -১ | র'না -না শা -১ I স'না-রা রা | রা -স'না স'না -১ I  
 সা • গ ব তী • রে • ভ • য় কি রে • তো ব

I নসাঁ -না -রাঁ র'সাঁ | স'ণা -ণা -ণা ( -ণা ) I -না I সাঁ -ণা -যাঁ মাঁ | যাঁ -জাঁ জাঁ -ণা I  
ক্ষ. . য়. ক্ষ তি . রে . . . যা . . . আ ছে . . . রে . . .

I জ্ঞা -১- -পা পা | যা -১- জ্ঞা -১- I জ্ঞা -১- -পা পা | যা -১- পা -১- I  
স • ব্ নি যে • তো ব্ ষা • প্ দি যে • প ড্

I ধা -সাঁ সাঁ -না | সাঁ -না ধা -না I না -। সাঁ -। না -রাঁ র'সাঁ -। I  
 জ . ম ম তে . জা জ্ ম . বা নু প্রা . থে ব

I    ज्ञा    -या    या    -।    या    -जा    जा    क्षा    II II

ବିଜୁ ମହାପାତ୍ର

# ‘দেশ’-এর নিম্নস্বাক্ষর

বার্ষিক মূল্য-১০.

বাংলাদেশ-০০.

‘দেশ’ পত্রিকার বিজ্ঞাপনের দ্বারা সাধারণত নিম্নলিখিতরূপে-  
দৈনিক বিজ্ঞাপন-৪, টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতিবার  
বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জ্ঞাতব্য।

সম্পাদক-‘দেশ’, ১নং বর্মান স্ট্রীট, কলিকাতা।

## জহর আয়লা

ডড কোমিক্যাল ও ফ্রান্স  
১১, মার্চ দেবেল্ল রোড, কলিকাতা

# মুক্তিস্থান

মুক্তিস্থান করে মোক্ষ  
লাভের লোভ মনে জাগে  
না কার? কিন্তু মুক্তিস্থানের  
যোগ ও তীর্থস্থানে পৌঁছবার  
সুযোগ বছরে কবার আসে? তবে  
স্নানের পবিত্রতাবোধ বলতে যা বোঝায়  
তার যোগাযোগ ঘটানো কিন্তু প্রতিদিনই  
সম্ভব। চাই-একখানা ভালো সাবান আর  
পরিষ্কার জল-তা কলেরই হোক বা কুয়োর,

নদীরই হোক বা পুকুরের। আর ভালো সাবান বলতেই মনে পড়া উচিত  
‘রেণু’-কারণ এমন স্থলভে এত ভালো  
সাবান বাজারে বড় বেশি নেই। অল্প মাথলেই  
‘রেণু’-র প্রচুর সুগন্ধি ফেনরাশি দেহ সম্পূর্ণ  
পরিষ্কার করে মনে রেখে যায় একটি  
ম্লিষ্ট পবিত্রতার অনুভূতি। তাতে  
মোক্ষলাভ না হোক তৃপ্তিলাভ  
যে অনিবার্য সন্দেহ নেই।



SRK ৬

সোল সোলং এজেন্সিঃ-ওরিয়েন্টাল মার্কেটাইল কোম্পানী লিমিটেড, ৩৬এ ও বি, প্রতাপাদিত্য রোড, কলিকাতা, ফোন নং সাউথ ৮৬৪ (২ লাইন)

# রবীন্দ্র-সাহিত্য-দর্শন বিজ্ঞানের স্থান

শ্রীপ্রব্রজীবন চৌধুরী

(১)

আধুনিক যুগকে বৈজ্ঞানিক যুগ বলিতে হইবে, সুতরাং বিজ্ঞানের প্রভাব আমাদের সাহিত্যকলাতে পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মতে ইহা সাহিত্যের পক্ষে শুভকর নহে। তিনি সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মিশ্রণে বর্নাসংকর ঘটাইবার বিরোধী ছিলেন এবং সাহিত্য হইতে বিজ্ঞানকে প্রত্যক্ষভাবে পৃথক রাখিতে চাহিয়াছেন। বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের মধ্যে প্রথম বিভেদ তাহাদের উপকরণ লইয়া। বিজ্ঞানের গণনাবাদের বিষয় বিশ্বের বস্তুদর্ম—যাহাকে বাস্তবমতলী বলা চলে। কিন্তু সাহিত্যের সামগ্রী সেই মন যাহাদের অনুভূতি দিয়া নির্বাচিত করিয়া সত্য বলিয়া জানিয়া লইয়াছে। যাহা আমাদের বাস্তব—তাহাই আমাদের সত্য এবং সেইটিই সাহিত্যেরও বিষয়বস্তু। কিন্তু এখানে বাস্তব কথাটি ঠিক সাধারণ অর্থে ধরা চলিবে না। সাধারণতঃ বাস্তব অর্থে যাহা কিছু প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান বা ঘটিত হইয়াছে। এক কথায় বাস্তবকে 'যা-তা' বলা চলে—যাহা বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণের বস্তু এবং বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ ও গণনাবাদের ফলে এই যা-তার মধ্যে কোনও নিয়ম বা শৃঙ্খলার সন্ধান করে।

“নির্বিবিশেষে বিজ্ঞানে সন্ধান মূল্য পায় না। তাই বিবিশ্বব্যাপী যা-তা থেকে বাতাই হয়ে না আমাদের আপন স্বাক্ষর নিয়ে আমাদের চারপাশে এসে বিরে দাঁড়ায় তারাই আমাদের বাস্তব।” (১)

আমাদের অনুভূতির কাছে যাহা বাস্তব—তাহাই স্বার্থ সত্য। এই সত্য ও বাস্তবের মধ্যে প্রভেদটিও (২) দেখিতে হইবে—রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়টি অতি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। (৩) যেহেতু বিজ্ঞানে যেটি যেমনভাবে রহিয়াছে, তাহাকে ঠিক তেমনভাবেই দেখিবার প্রয়াস করা হয়, নির্বাচন পরিবর্তন বা পরিবর্তন করা হয় না, সেইহেতু বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক। এইখানে বৈজ্ঞানিক আপনার কোনও ভাবকে স্থান দেন না, আপন বস্তুকে ধরে রাখিয়াই বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান-সাধনা করেন। এক কথায় বৈজ্ঞানিক ভাঁহির সাধনার বিষয়-বস্তুকে বস্তুর সম্ভব অপর জ্ঞান করেন, আপনার করিয়া লন না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে কিন্তু ইহার ঠিক বিপরীতই দেখা যায়। আপন

জ্ঞানার বিষয়বস্তুর সহিত সাহিত্যিক কল্পনায় নিজেকে একীকরণ করেন। সুতরাং সাহিত্যে যদি বস্তু না হলো, তাহলে সাহিত্য সে

যে জগৎকে দেখি, তাহা মানুষের আপন দৃষ্টিতে দেখা জগৎ অর্থাৎ তাহার মানসিক জগৎ। মানুষ প্রকৃতিকে মানবী। করিয়া তুলিয়া তবেই তো উহাকে সাহিত্যে প্রকাশ করে। পদান্তরে বিজ্ঞান প্রকৃতিকে রহীন দেখে, কারণ রসের উৎপত্তিস্থল তো মানব হৃদয়। বিজ্ঞানে মানুষ প্রকৃতির সহিত না মিলিয়া দূর হইতে তাহাকে পর্যবেক্ষণ করে। প্রকৃতিতে যে সুধারস সিঞ্চিত দেখি তাহা মানুষেরই প্রদত্ত।

“এই রসরূপটি মানুষই প্রকৃতিকে দিয়েছে, নিয়ে তার মানবজীবনের একান্ত সাহিত্য খচিত্রেছে।” (৪)

সাহিত্যে এই মানবের ভাবজগতের সহিত পরিচয় লাভ কর এবং বিজ্ঞানে তাহার জ্ঞান-জগতের বর্ণনা পাই। জানে পাই বিষয়কে, কিন্তু ভাবে বিষয় অপেক্ষা বিষয়ীকেই অধিক করিয়া লাভ করি। (৫) এইখানে বিষয় এবং বিষয়ীর একান্ত মিলনে একটি অপূর্ণ বস্তু সৃষ্টি হয় যাহা সাহিত্যের উপজীব্য।

সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আর একটি পার্থক্য এই যে, বিজ্ঞানে কোনও বিশেষ বস্তুকে মূল্য দেওয়া হয় না, তাহাতে বিশেষকে সাধারণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখিবারই প্রচেষ্টা থাকে। একটি বিশেষ গাছ উদ্ভিদ বিজ্ঞানের মনোযোগ টানিয়া রাখিতে পারে না—তাহাকে উদ্ভিদ গোষ্ঠীর কোন একটি শ্রেণীতে ফেলিতে পারিলেই বৈজ্ঞানিক তাহাকে তুলিয়া যান, সেইভাবেই বিশেষ একটি মানুষ কোনও রাষ্ট্রতত্ত্বের বিষয় হইতে পারে না। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ তরুণতা অথবা একটি মানুষ অত্যন্ত আকর্ষণীয় স্থান লাভ করিতে পারে। সত্যকে কোন একটি রূপের মধ্যে উপলব্ধি করা যায়। সাহিত্যের সত্য রূপে রসে প্রকাশিত হয়—বিজ্ঞানের মত সুন্দরভাবে থাকে না। রবীন্দ্রনাথ বলেন, “সাহিত্যের বিষয়টি ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত নয়।” (৬) তিনি আরও বলেন—

“সাহিত্যের ব্যক্তি কেবল মানুষ নয়, বিশ্বের যে কোন পদার্থই সাহিত্যে সম্পৃষ্ট তাই ব্যক্তি, জীবজন্তু, গাছপালা, নদীপর্বত সমুদ্র ভালো জিনিস, মন্দ জিনিস, বস্তুর জিনিস, ভাবের জিনিস সমস্তই ব্যক্তি, নিজের ঐকান্তিকতায় আরও বলেন—

লব্ধিত।” (৭)

সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মধ্যে এই পার্থক্য নির্দেশ করিয়া রবীন্দ্রনাথ এ কথাও বলিতেছেন যে, সাহিত্যাঙ্গনে বিজ্ঞানের প্রবেশ আপত্তিকর তাহাতে সাহিত্যের ক্ষতি হয়। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানেরই প্রতিপত্তি, তাই সাহিত্যিকগণের মধ্যেও বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের বিপক্ষে ছিলেন না। কিন্তু তাহাকে সাহিত্যের মধ্যে টানিয়া আনার বিরুদ্ধে ছিলেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর আওতাধীন আধুনিক সাহিত্যে তেমন বিশ্লেষণ যেন-মিলন প্রদর্শনের ব্যাধাবৃত্তি দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ইহার সমর্থন কোন দিন করিতে পারেন নাই।

“বিজ্ঞান পদার্থটি বস্তুস্বভাববিরূপিত, তার ধর্মই হচ্ছে সত্য সম্বন্ধে অক্ষুণ্ণতা কৌতূহল। এই কৌতূহলের বেড়াফাল এখানকার সাহিত্যেরও মনে জন্মে ঘিরে ধরেছে। অথচ সাহিত্যের বিশেষত্বই হচ্ছে তার পক্ষপাত ধর্ম; সাহিত্যের বানী স্বয়ংস্বা। বিজ্ঞানের নির্বিচার কৌতূহল সাহিত্যের সেই বরণ করে নেবার সভাবকে পরাস্ত করতে উন্নত। আজকালকার ইউরোপীয় সাহিত্যে বৈজ্ঞানিকতার দৈহিকতা নিয়ে খুব যে একটা উপদ্রব চলছে, সেটার প্রধান প্রেরণা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, রেসটো-রেন যুগে সেটা ছিলো লালসা।” (৮)

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল যেমন লালসার উত্তেজনা ক্ষণস্থায়ী প্রমাণ হইয়াছে, তেমনই এইরূপ বৈজ্ঞানিক কৌতূহলও বেশী দিন টিকিবে না। এই কৌতূহল যখন সাহিত্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, তখন ইহার দৌরাখ্যা অসহ্য হইয়া ওঠে, ইহার তাড়নার লেখক যাহা প্রচলিত থাকিবে রুচিসম্মত তাহাকেই স্পষ্ট করিয়া তোলে এবং বে-আরুতার সৃষ্টি করেন।

“মানুষের রসবোধে যে আরু আছে সেইটিই নিত্য, যে আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটিই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞান মনস্তত্ত্ব বিশেষজ্ঞসমূহ তাকে বলছে, ঐ আরুটিই দৌরাখ্যা, নির্বিচার অলঙ্ঘ্যতাই পৌরুষ।” (৯) আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে—

“বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাবে অলঙ্ঘ্য-কৌতূহলবৃত্তি দৃশ্যমান মূর্তি ধরে সাহিত্য-লক্ষ্যীর দৃষ্ট হরণের অধিকার দাবী করছে।” (১০)

ইহার স্পষ্ট রবীন্দ্রনাথ এইটুকুই বলেন যে, ওদেশে বিজ্ঞান সত্যই এমন একটি শক্তি হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার দৌরাখ্যা হইতে সাহিত্যকে রক্ষা করা কঠিন। কিন্তু আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে যে বে-আরুতার চলন হইয়াছে তাহাকে রবীন্দ্রনাথ কোনমতেই সমর্থন করেন না, কারণ এদেশে “অন্তরে বাহিরে ব্যস্তিতে ব্যস্তিহারা” বিজ্ঞানের প্রবেশ নাই এবং এদেশের সাহিত্যে যে নিলব্ধতা দেখা দিয়াছে তাহা “ধারকরা নকল নিলব্ধতা।” ইহা অহেতুক সাহিত্যিক ‘হটগোল’ ছাড়া আর কিছুই নহে।

(২)

যেমন বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের তাগিদে আধুনিক লেখক মানুষের মনের এবং দেহের সমস্ত বিষয়গোষ্ঠিকে তদন্ত করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাকে সাহিত্যের রসদ হিসাবে ব্যবহার করিতেছেন—তেনমই আবার আধুনিক লেখক মনস্তত্ত্ব ও রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনাকেও সাহিত্য ভাণ্ডারে আমদানী করিয়া উহাকে জটীল করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ ইহারও অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। সাহিত্যের কাজ কোনও সমস্যা সমাধান করা নহে এবং সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রও নহে—সাহিত্য রসের দেশ।

“কিন্তু আর্ট দরকার নেই প্রবলেমকে ঠাণ্ডা করা, নিজের রূপটিকে সম্পূর্ণ করাই তার কাজ। প্রবলেমের গ্রন্থিমোচন ইট ইন্টেলেকটের বাহাদুরী, কিন্তু রূপকে সম্পূর্ণতা দেওয়া সৃষ্টি-শক্তিমতী কল্পনার কাজ। আর্ট এই কল্পনার এলেকায় থাকে, লজিকের এলেকায় নয়।” (১১)

যে ক্ষেত্রে কোন বৈজ্ঞানিক আলোচনা সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে সেখানে তাহার মূল্য নিরূপণ যুক্তির সঙ্গতি ম্বারা হইবে না, বরং অনুভূতির সত্যতা ম্বারাই হইবে। সে স্থলে বিচারের বিষয় হইবে “সেগুলি জায়গা পেয়েছে না জায়গা জুড়েছে।” (১২) সাহিত্যে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য তখনই স্থানলাভ করিয়াছে বলিয়া স্বীকৃত হইবে যখন উহা বাস্তবিক অনুভূত হইয়া আমাদের আপন হইয়া উঠিয়াছে, যখন তাহার কথা বৃন্দ বিচারের কথা না হইয়া প্রাণের কথার মত শুনাইবে। যে মুহূর্তে ইহা সম্ভব হয়, তখন আনন্দের সৃষ্টি হয় এবং তাহার স্থায়িত্বও বহু গুণে বাড়িয়া যায়। রাষ্ট্রতত্ত্ব বা মনস্তত্ত্বের কোনও তথ্য যখন নূতন বাঁহরে আসে তখন বিশেষ দেশে ও কালেই উহা সমাদৃত হয় এবং কিছুকালের মশাই উহা পুরাতন হইয়া যায়। মানুষের প্রাণের কথা কিন্তু সর্বজনীন ও সর্বকালীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে।

(৩)

বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির প্রকাপে পড়িয়া অনেক সময় সমালোচকেরা সাহিত্যের সত্যকে বিজ্ঞানের সত্য বা প্রাকৃত সত্যের পরিমাপে মাপিতে চাহেন। তাঁহারা সাহিত্যে চিত্রিত কোন চরিত্রের বিচার আধুনিক মনস্তত্ত্বসম্মত পদ্ধতিতে করিতে চাহেন, তাঁহারা চরিত্রটিকে আধুনিক মনস্তত্ত্বসম্মত না হইলে ভুল বলিবেন কিংবা চরিত্রকে আধুনিক নীতিতত্ত্ব বা সমাজতত্ত্ব বিরুদ্ধ দেখিলে উহাকে অপাঠ্য বলিবেন। রবীন্দ্রনাথকে এইরূপ বহু পণ্ডিত-মুখের সমালোচনার প্রহার সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার কুমুদিনীর চরিত্র লইয়া

কথা উঠিয়াছিল যে কুমুদিনী ভারতীয় নীতিতে নারী বলিতে বাহা বৃদ্ধায় ঠিক তাহারই প্রতিনিধি কি না? রবীন্দ্রনাথ ইহার উত্তরে বলেন—

“কুমু ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ কুমু কিনা এই এই সাহিত্য সঙ্গত প্রশ্নটা কারো কারো লেখনীতে বদলে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে কুমু মানব-সমাজে নারী নামক জাতির প্রতিনিধি কিনা।” (১৩)

এই অসাহিত্যিক সমালোচনার মূলে রাষ্ট্রতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি, কারণ বিজ্ঞান সর্বদাই কোনও ব্যক্তিকে (individual) সমাজের উদাহরণ স্বরূপই দেখিতে চায়। তাই সে কুমুকে নারী জাতির প্রতিনিধিরূপেই পাইতে চায়। বর্তমান সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব নারীর যেমনটি বর্ণনা আছে কুমুকে সেইরূপে দেখিতে পাইলে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি তুষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথ এই কথা অত্যন্ত সহজ ভাষায় স্পষ্ট করিয়াছেন।

“মানব প্রকৃতির যা কিছু সম্ভারণ ঘন তারই প্রতি লক্ষ্য মানব বিজ্ঞানের, আর ব্যক্তি-বিষয়ের যে অনন্যসাধারণ প্রকৃতি তারই প্রতি লক্ষ্য সাহিত্যের।” (১৪) যদিও সাহিত্য অহেতুক বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কিছু বলিতে চাহে না—কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য অনুভূতির সত্যকেই প্রকাশ করা, বৃন্দ্রের সাময়িক কোন তত্ত্ব না তথ্যের ব্যাখ্যা করা নহে। কবি অন্যতর তাহাই বলিতেছেন।

“চরিত্রের প্রাণগত রূপ আমরা দাবী করবই, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি চরিত্রের অন্তর্গত হয়ে বিনীতভাবে যদি না আসে, তবে তার বৃন্দ্রগত মূল্য যতই থাক তাকে নিষিদ্ধ করে দূর করতে হবে।” (১৫)

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে অনুভূতি বা কল্পনা শক্তিকেই প্রধান মনে করেন এবং কোনরূপ বৃন্দ্রবৃত্তিকে প্রশ্ন দেবার বিরোধী। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মিলনে বর্ণসংকর সৃষ্টি করা তিনি আদৌ চাহেন নাই। ইহার দ্বারা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ইহাতে সাহিত্যের নিত্যতা হ্রাস পায়। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ববস্তুর মূল্য অঙ্গসময়ের মধ্যেই কমিয়া আসে এবং উহার যদি সাহিত্যে জায়গা জুড়িয়া বসে তাহা হইলে তাহারও আবেদন সেই সঙ্গো লোপ পাইতে বসে।

(৪)

সাহিত্য বিচারে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানের প্রভাবেই দেখা দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মতে এই পদ্ধতিতে সাহিত্য বিচার করা পণ্ডিত্য মাত্র। ইহাতে কোন সত্যই লাভ হয় না। সাহিত্যের কোন চরিত্রকে বিশ্লেষণ করিয়া যে উপাদানগুলির সম্মান পাওয়া যায় তাহাতে চরিত্রটি সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান অনন্ত

সাহিত্যের দিক হইতে হয় না। কেননা চরিত্র কেবলমাত্র উপাদানের সমষ্টি নহে, বরং উপাদান-সমূহের যোগে একটি নূতন সমগ্রতা—বাহ্যকে অনুভূতি দিয়া বৃদ্ধিতে হয়। সন্দেহ এবং মাংসের উপাদান বিবেচনা করিলে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বাহির করা কঠিন, কিন্তু তথাপি উভয়ে এক নয়। রবীন্দ্রনাথ তাহাই বলিতেছেন—

“সংক্ষেপে আমার কথাটা দাঁড়ালো এই সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। এই ব্যাখ্যা মূল্যে সাহিত্য বিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে, তার জাতিকূল নিয়ে নয়। অবশ্য সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার কিংবা তাত্ত্বিক বিচার হোতে পারে। সে রকম বিচারের শাস্ত্রীয় প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু তার সাহিত্যিক প্রয়োজন নাই।” (১৬)

(৫)

সাহিত্য বিচারে বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা ব্যতীত আরও একটি ব্যাপার রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, সেটিও বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির পরিচায়ক। এটি হইতেছে সাহিত্য বিচারে একটি অবিকল মাপকাঠির সম্মান করা। যেমন পদার্থ বিজ্ঞানে বিন্যাস আছে। রবীন্দ্রনাথ এই সম্মানের বিপক্ষে ছিলেন।

“সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি একটা সজীব পদার্থ। কালক্রমে সেটা বাড়ে এবং কমে; কৃষ্ণ হয় আবার স্পষ্ট হয়ও থাকে। তার সেই নিত্য পরিবর্তমান পরিমাণ—বৈচিত্র্য দিয়েই সে সাহিত্যকে বিচার করতে বাধ্য, আর কোন উপায় নেই।” (১৭)

সাহিত্য বিচারে পাঠকের ব্যক্তিগত রুচিকেই রবীন্দ্রনাথ প্রাধান্য দিয়াছেন এবং সাহিত্য সমালোচনার মূল্য সেই সমালোচনার সাহিত্য রস-বস্তু ম্বারাই নির্ধারণ করিতে বলেন: “মতের সত্যতা দিয়া নহে।” (১৮)

তিনি আরও বলেন—

“এ স্থলে ধ্রুব আদর্শের ভাণ না করে সাহিত্যের পরিমাপ যদি সাহিত্য দিয়েই করা যায়, তাহলে শান্তিরক্ষা হয়। অর্থাৎ জজের রায় স্বয়ং যদি শিল্পনিপুণ হয় তাহলে মানদণ্ডই সাহিত্য ভাণ্ডারে সসম্মানে রক্ষিত হবার যোগ্য হতে পারে।” (১৯)

বিজ্ঞানের প্রভাবে আধুনিককালের সাহিত্য-দর্শনে মনস্তত্ত্ব প্রবেশ লাভ করেছে এবং তাহার সাহায্যে সাহিত্য বিচারের একটি অপরিবর্তমান মানদণ্ডের সম্মান চলিতেছে। রবীন্দ্রনাথের মতে উহা অনধিকার প্রবেশ এবং এইরূপ মাপকাঠির সম্মান আলেয়ার অনুসরণের মতো।

“সাহিত্যে ভালো লাগা মন্দ লাগা হলো শেষ কথা। বিজ্ঞানের সত্য মিথ্যার বিচার শেষ বিচার। এই কারণে বিচারকের ব্যক্তিগত সংস্কারের উপরে বৈজ্ঞানিকের চরম আপীল আছে প্রমাণে। কিন্তু ভালোমন্দ লাগাটা রুচি

নিয়ম; এর উপরে আর কোনো আপীল অযোগ্যতম লোকও অস্বীকার করতে পারে।" (২০)

অবশ্য যে কারণে বিভিন্ন পাঠকের রুচি বিভিন্ন সেই কারণেই সাহিত্য বস্তুর মূল্যও এক সীমাবর্তী থাকিতে পারে না বরং তাহার মূল্য পরিমাণ লইয়া পাঠকে পাঠকে ত্বকের অবতারণা ঘটে এবং লেখককে বিভিন্ন সমালোচনার মুখে পড়িতে হয়। সাহিত্য রচনা কোন প্রমাণ দ্বারা আপন উৎকৃষ্টতা পাঠক সমাজে জ্ঞাপন করিতে পারে না, পাঠকের ব্যক্তিগত রুচির উপরেই তাহাকে নির্ভর করিতে হয়। লেখক বড় জোর কয়েকজন লক্ষপ্রতিষ্ঠ সাহিত্য সমালোচকের অভিমতের নজরী দেখাইয়া নিজ রচনাকে সাধারণের

স্বারাও স্বীকৃত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু তথাপি ইহা সম্পূর্ণভাবেই সাধারণের মতামতের উপরেই নির্ভর করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সাহিত্য বিচারে বিজ্ঞানের মত কোন ধ্রুব আদর্শের ভাণ করা বৃথা, এ স্থলে সত্য নির্ধারণের কোনও ব্যক্তি নিরপেক্ষ উপায় নাই এবং এখানে ব্যক্তিগত মতামতকেই শ্রদ্ধা করিতে হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এ স্থলে অপ্রযোজ্য, সেই কথাই রবীন্দ্রনাথ বলেন।

- ১। সাহিত্যের স্বরূপ পৃঃ ৯
- ২। ইংরাজিতে Truth and Actuality.
- ৩। সাহিত্যের স্বরূপ গ্রন্থে "সত্য ও বাস্তব" প্রবন্ধ প্রণীত।

- ৪। সাহিত্যের পথে পৃঃ ৬৮
- ৫। এ পৃঃ ১০০
- ৬। এ পৃঃ ১২২
- ৭। সাহিত্যের পথে পৃঃ ১২২
- ৮। এ পৃঃ ৯০
- ৯। সাহিত্যের পথে পৃঃ ৯১
- ১০। এ পৃঃ ৯২
- ১১। সাহিত্যের স্বরূপ পৃঃ ২০
- ১২। এ পৃঃ ২০
- ১৩। সাহিত্যের পথে পৃঃ ১২৮
- ১৪। এ পৃঃ ১২৮
- ১৫। সাহিত্যের স্বরূপ পৃঃ ১৮
- ১৬। সাহিত্যের পথে পৃঃ ১৩১
- ১৭। সাহিত্যের স্বরূপ পৃঃ ৪৫
- ১৮। এ পৃঃ ৪৭
- ১৯। এ পৃঃ ৪৬
- ২০। সাহিত্যের পথে পৃঃ ১২৪

## বৈদেশিক চিত্র বনাম ভারতীয় চিত্র

ভারতীয় চলচ্চিত্রকে বেশ দীর্ঘকাল থেকেই বৈদেশিক চিত্রের বিরুদ্ধে—বিশেষ করে বিলাতী ও মার্কিন চিত্রের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আত্মপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতে হয়েছে। আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে



রূপাঞ্জলি পিকচার্সের "জলকানন" চিত্রে  
প্রদীপকুমার ও প্রমীলা গিরেন্দী

এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়বে বই কমবে বলে মনে হয় না। ভারতের চিত্রদর্শকদের উপর এই সব বৈদেশিক চিত্র যে এতকাল একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করতে পারেনি তার একমাত্র কারণ ছিল ভাষার বাধান। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বৈদেশিক চিত্রের পক্ষে ভারতীয় জনমানসে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব নয়। তাই ইন্দোনীং একাধিক সূত্র থেকে আমরা শুনছি যে, হালিউডে নির্মিত চলচ্চিত্রের সঙ্গে হিন্দি, বাঙলা প্রভৃতি ভাষার ভাষা জুড়ে দিয়ে—সেই সব চিত্রকে এদেশে জনপ্রিয় করে তোলার একটা গোপন প্রচেষ্টা চলেছে। একথা সত্য হলে ভারতীয় চিত্রকে অদূর ভবিষ্যতে তীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হবেই। চিত্রগ্রহণ,



শব্দগ্রহণ প্রভৃতি বিভিন্ন যান্ত্রিক উৎকর্ষে ভারতের চলচ্চিত্রের পক্ষে হালিউড কিংবা ইংলণ্ডে নির্মিত চলচ্চিত্রের সঙ্গে টেকা দেওয়া কঠিন। ভাষার ভিত্তিতে যে বিশেষ সুবিধা ভারতীয় চিত্রের ছিল, সেটা থেকে বঞ্চিত হলে তার পক্ষে সমস্ত বিপদের কারণ।

মার্কিন এবং ইংরেজ চলচ্চিত্র শিল্পপতিরা যে সারা বিশ্বের চিত্রপ্রদর্শন ক্ষেত্রে নিজেদের ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার সংস্থাপনের চেষ্টা করছেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ



প্রেমেন্দ্র মিত্র পরিচালিত আওয়ার কিংমেনের  
"নতুন খবর" চিত্রে নায়কের চূড়াকায়  
পরেশ বমনাজ

নেই। যুদ্ধপূর্ব যুগেও তাঁদের এ প্রয়াস বরাবরই ছিল। তার কারণও অবশ্য আছে। দরিদ্র যুদ্ধবিধ্বীর্ণ জগতে আজ ডলার ধ্বংসের মহিমায় মার্কিন আধিপত্য বিশেষ প্রকট। রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সর্ববিষয়েই সে আধিপত্য সুপরিষ্কট। তারই সুযোগ নিয়ে



কালকাটা টাকজের "মুন্ডির বন্দন" চিত্রে  
গীতগী ও কিরণকুমার

মার্কিন চিত্রাধিপতিরাও আজ তাঁদের অষ্টোপাশ বাহ্যে বাড়িয়েছেন বিশ্ব-চলচ্চিত্রের বাজার দখলের জন্যে। একমাত্র মোভিয়েট ইউনিয়ন ও ভারতের চলচ্চিত্রশিল্প ছাড়া অন্যান্য সকল দেশের চিত্রশিল্পের উপরেই তাঁরা নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছেন। যে দেশে ডলারের চাহিদা আছে সেই দেশেই তাঁরা মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থ সম্প্রসারণে মনোযোগী হয়ে উঠেছেন। এর ফলে দেখা যায়, হালিউডের অস্বাভাবিক আয় বৃদ্ধিতে। ১৯৪৬ সালে বিশ্ব-চলচ্চিত্রের বাজার থেকে হালিউড আয় করেছে সাড়ে বারো



কোটি ডলার। ১৯৪৫-এর চেয়ে এ আয় শতকরা ১৫ ভাগ বেশী।

হলিউডের একমাত্র গুরুতর প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন বৃটেনের মধ্য-স্বভাব চিত্রশিল্পপতি জে আর্থার র্যাঙ্ক। সারা বিশ্বে এই ভদ্র-লোকের কম করে হলেও হাজারখানেক প্রেক্ষাগার আছে। এই সকল চিত্রগৃহ থেকে তার যে বার্ষিক আয় হয় তা সহজেই অনুমেয়। বিশ্বের চলচ্চিত্রক্ষেত্রে এই ইংগ-মার্কিন অভিনেতা



প্রেমেন্দ্র নিত্য পরিচালিত আওরীর ফিল্মনের "নতুন ধর" চিত্রে শ্রীমতী ভারতী

ষানের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করে কিভাবে ভারতীয় চিত্রশিল্প নিজের পথে আত্ম-সংপ্রসারণ করতে পারবে—তাই আজ আমাদের ভাববার বিষয়। হলিউডের চিত্র ব্যবসায়ীরা নিজাদের সুবিধাজনক অবস্থার সম্বন্ধে সচেতন বলেই আজ চিত্রশিল্পে অবাধ বাণিজ্যের ধারা তুলেছেন। এর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে হলে অজ দেশীয় চিত্রশিল্পের পক্ষে রাষ্ট্রসাহায্য অপরিহার্য। হলিউড যদি তার চিত্র আমদানির দেশে দেখানোর সুযোগ পায়, তবে আমাদের দেশের চিত্রক্ষেত্রে আমেরিকার দেখানোর সমান সুযোগ নিতে

হবে। কিন্তু তার পূর্বে আমাদের চিত্রশিল্পকে করে তুলতে হবে অনেক উন্নত। এষ জনো চাই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং জাতীয় শিল্প-রূপে চলচ্চিত্রক্ষেত্রে জাতীয় কৃষ্ণ সংস্থাপন।

### স্টুডিও সংবাদ

বিভিন্ন বিদ্যক বোর্ড গঠন করে নতুন চিত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে বিশ্বভারত ফিল্মস্ নামক একটি চিত্রপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। বিগত ২৫শে জুন তারিখে অনুষ্ঠিত এদের একটি অধিবেশনে এই চিত্রপ্রতিষ্ঠানের প্রোডাক্সন্স কন্ট্রোল স্থির করেছেন যে, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা উন্নততর ধরনের সামাজিক ও মনস্তত্ত্ববিষয়ক চিত্র নির্মাণ করবেন। শূভ উদ্দেশ্যে সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথের 'নে'ক ডুবি' নামক প্রদীপ উপন্যাস অবলম্বনে বোম্বাইতে পরিচালক নীতিন বসু 'মিলন' নামে যে লেভাধী চিত্র নির্মাণ করেছেন, তার হিন্দী সংস্করণ বোম্বাইতে মুক্তি পেয়েছে এবং প্রচুরভাবে সমর্থিত হয়েছে। বর্তমানে নীতিনবাসু এস ডি প্রডাক্সন্সের হয়ে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে রবীন্দ্রনাথের 'দুটি নান' চিত্রে রূপান্তরিত করায় ব্যস্ত। প্রধান ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করছেন সুনন্দা দেবী, ছাি বিশ্বাস, অসিতবরণ, কে সি দে ও বিমান ব্যানার্জি। সংগীত পরিচালনা করছেন বিখ্যাত সুরশিল্পী তিমিরবরণ ও শঙ্করশ্রী কাক করছেন মকুল বসু।

গত সপ্তাহে ইন্ডপুর্নী স্টুডিওতে বঙ্গশ্রী কথাচিত্র লিমিটেডের 'সাহারা'র চিত্রগ্রহণ কার্য সমাপ্ত হয়ে গেছে বলে প্রকাশ। এই চিত্রখান পরিচালনা করেছেন সুশীল মজুমদার।

নটরাজ সং'দের প্রথম চিত্র নিবেদন 'বন্দী জাগো'র প্রাথমিক কাজ শেষ হয়ে গেছে। বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক পরিবর্তনের

পটভূমিকায় এই চিত্রের কাহিনী রচিত হয়েছে বলে প্রকাশ। চিত্র পরিচালনা করছেন নবাগত রবীন্দ্র।

গত সপ্তাহে ইন্ডলোক স্টুডিওতে 'ন্যানা' প্রোগ্রেসিভ পিকচার্স' লিমিটেডের ম্যানোজ এজেন্সিস্ পণ্ড প্রদীপের নতুন চিত্র 'ভুলি নাই' উপন্যাসিক মনোজ বন্দুর রচিত সুপ্রসিদ্ধ বিশ্লেষণিক উপন্যাস। এই চিত্রখানির প্রযোজনা ও পরিকল্পনা করবেন হেমেন গুপ্ত।

এম এস প্রোডাক্সন্স নামক একটি নতুন চিত্র প্রতিষ্ঠান শিশিরকুমার প্রযোজিত প্রদীপ নাটক 'দুঃখীর ইমানের' চিত্ররূপ দেওয়া স্থির করেছেন বলে প্রকাশ। প্রযোজনা ও পরিচালনা করবেন সুশীল মজুমদার এবং প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন রবীন্দ্র মজুমদার।

### নানা-কথা

বাঙলার প্রসিদ্ধা চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী কানন দেবী আগামী ৫ই আগস্ট বিশেষ বিমান-যোগে বিদেশ যাত্রা করবেন বলে প্রকাশ। তিনি ফ্রান্স ও ইংলণ্ড হয়ে আমেরিকা যাবেন। ইতিপূর্বে একাধিকবার শ্রীমতী কাননের বিদেশ যাত্রা সম্বন্ধে গুজব রটে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। আমরা আশা করি এবার তিনি সত্য সত্যই বিদেশে যেতে পারবেন এবং নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে তার প্রতিভা আরও তীক্ষ্ণ ও গভীর হয়ে উঠবে।

মিনার্ভা সিনেমা গৃহটি নতুন পরিচালনা-ধানে আসার কিছু রদ বদলের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এই চিত্র গৃহটির পরিচালনা ভার গ্রহণ করেছেন ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া থিয়েটার্স লিমিটেড। গত সপ্তাহে এডওয়ার্ড ই রবিনসন অভিনীত 'দি রেড হাউস' নামক ইংরেজী চিত্র নিয়ে এই চিত্রগৃহটি দর্শকসমাজের কাছে পুনর্মুখিত হয়েছে।

## যাত্রা

শ্রীসুনন্দা সেন

অন্তহীন পথের ধারেতে এসে,  
শুধুলাম আমি—কোথা তুমি প্রিয়তম?  
হিমেল বাতাস গুঞ্জরি বায় শুধু,  
চমকি উঠিনু শূনি নিশ্বাস মম।  
দূরে চেয়ে দেখি নভের নীলিমা মাঝে,  
সীমা যে ভাষার হারিয়ে গিয়েছে হায়।

হিয়ামাঝে যেন শূনিন্দু তোমার বাণী,  
নিবিড় নে প্রেম,—তারে কি গো ভোলা যায়?  
রাতের বিজ্ঞপী কি কহিল কানে কানে,  
মনে হোলো যেন আমি নই আর একা—  
যাত্রা আমার ফুরিয়ে গিয়াছে আজি,  
প্রেমভে আমার পেয়েছি তোমারি দেখা!

## ক্রিকেট

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পরিচালকগণ অট্টোলিয়া ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়গণের জন্য পুণাতে এক শিক্ষা শিবির স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই শিবিরের উদ্বোধন হইবে ১৮ই আগস্ট ও শেষ হইবে ৮ই সেপ্টেম্বর। সময়ভাবের জন্যই বোধ হয় এই শিবির কর্তৃক মাসের জন্য স্থাপন করা সম্ভব হইল না। তারা হইলেও এই শিবির স্থাপন ব্যবস্থা ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করিল। ভবিষ্যতে সকল বৈদেশিক ভ্রমণকারী দলের জন্য এইরূপ শিবির স্থাপিত হইতে দেখিলে আমরা বিশ্বের আনন্দিত হইব।

### দক্ষিণ আফ্রিকা পুনরায় পরাজিত

দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেট দল চতুর্থ টেস্ট খেলাতেও ১০ উইকেটে পরাজিত হইয়াছে। ইংল্যান্ড দল প্রতি খেলায় নতুন নতুন খেলোয়াড় দলভুক্ত করা সত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকা দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিতে সক্ষম হইতেছে, ইহা খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক। প্রথম টেস্টম্যাচ আনন্দানীতভাবে শেষ হইবার পর ইংল্যান্ড দল পর পর তিনটি খেলাতেই সাক্ষ্য লাভ করিল। ইংল্যান্ড দল ঐ খেলাতেও বিজয়ী হইবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। নিম্নে চতুর্থ টেস্ট খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম ইনিংসঃ—১৭৫ রান (মিডেল ৫৩, নর্থ ৫১, বার্টলার ৩৪ রানে ৪টি, এডল ৪৬ রানে ৩টি উইকেট পান।)

ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসঃ—৭ উইঃ ৩১৭ রান (বটিন ৮৫ আউট ১০০, ওয়াসলি ৭৫, এডলি ৪৩, হার্ডলি ৩৬, কম্পটন ৩০, ম্যান ৬৮ রানে ৪টি উইকেট পান।)

দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ইনিংসঃ—১৮৪ রান (মিডেল ৫৩, নর্থ ৫৭, ভিলজেন ২৯, রাস্টন ১২ রানে ৪টি, ইং ৫৪ রানে ২টি ও বার্টলার ৩২ রানে ৩টি উইকেট পান।)

ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসঃ—৪৭ রান (কেহ আউট না হইয়া)

## মুষ্টিযুদ্ধ

বাঙলার মুষ্টিযুদ্ধ বিভাগটি সুপরিচালিত করিবার মহৎ উদ্দেশ্যে বাঙলার মুষ্টিযুদ্ধের প্রথম প্রবর্তক শ্রীমত পুরেশলাল রায়, ইত্যোয়ীরাণ, এসোসাইটিয়ান, বাঙালী মুষ্টিযুদ্ধ পরিচালকগণকে লইয়া কিয়দিন পূর্বে "ব্যাংগল এসোসিয়েশন এনোসিয়েশন" নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এই এসোসিয়েশন গঠনের সংবাদ প্রচারিত হইলে মনে আশা জাগে শীঘ্রই বাঙলার মুষ্টিযুদ্ধ বিবরণির উন্নতির ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু অতি দূরত্বের সহিতই আমাদের বসিতে হইতেছে, "বোধ হয় আমাদের সে আশা পূরণ হইবে না।" উক্ত এসোসিয়েশন গঠনের পর দীর্ঘ দুই মাস অতিত হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে উক্ত এসোসিয়েশন কোন কর্মসূচীই রচনা করেন নাই। কে ইহারা সচল ও কার্যবরা ব্যবস্থা লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন জানিতে ইচ্ছা হয়। নিখিল ভারত অলিম্পিক এসোসিয়েশন আগামী বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় মুষ্টিযোদ্ধা দল প্রেরণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বাঙলার পরিচালকগণ অনতিবিলম্বে যদি বাঙলার উৎসাহী মুষ্টিযোদ্ধাদের একত্র করিয়া অনুশীলন ও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা না করেন তবে বাঙলার মুষ্টিযোদ্ধাগণ

# খেলাধুলা

ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে যোগদানের যে সুযোগ পাইতেন তাহা হইতে বঞ্চিত হইবেন। ইহা ছাড়া যোম্বাইতে সম্প্রতি ভারতীয় বাক্স ফেডারেশন গঠনের যে প্রচেষ্টা হইতেছে তাহাতেও বাঙলার প্রতিনিধি স্থান পাইবেন। আমরা আশা করি, বেঙ্গল এসোসিয়েশন বাক্স এনোসিয়েশনের পরিচালকগণ সকল বিঘ্ন চিন্তা করিয়া শীঘ্রই কর্মক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিবেন।

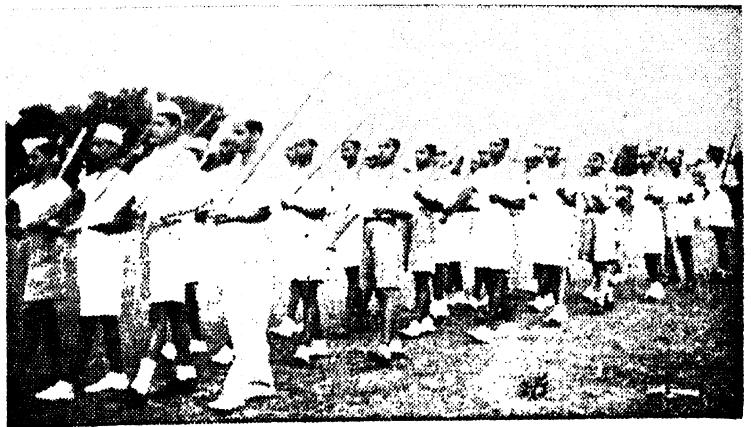
## সংস্কার

ভারতীয় সংস্কার দল বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে প্রেরিত হইবে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া ভারতের সকল প্রদেশের সংস্কারের প্রাণে অভাবনীয় উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছে, কেবল করিতে পারে নাই বাঙলার সংস্কারদের। কারণ আর ইহারা অনুশীলনে যোগদান করিবেন বৃদ্ধিতে পারি না। ইহারা কি সভ্য সভ্য নিখিল ভারত অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সংস্কার যোগদান করিবেন? বেঙ্গল এসোসিয়েশন সংস্কার এনোসিয়েশনের পরিচালকগণই বা কি করিতেছেন? ইহারা কি এখনও নীরব থাকিবেন? তাহা হইলে কি আমাদের যোগ্য করিতে হইবে উক্ত এসোসিয়েশন উত্তীর্ণ গিয়াছে? যাহারা কোন কার্যই করেন না তাহাদের পরিচালনার অধিকার লইয়া বসিয়া থাকার কোনই মানে হয় না। বাঙলার সংস্কারগণ গত ৩০ বৎসর ভারতের প্রত্যেক প্রাদেশিক দলকে পরাজিত করিয়া যে গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে তাহা কতকগুলি দায়িত্ব-জানহীন, অকর্মণ্য ব্যক্তিদের জন্য বাঙলাকে হারাতে হইবে ইহাই হইল পরিতাপের বিষয়। বাঙলার সংস্কারগণ কি ইহা নীরবে সহ্য করিবেন?

## জাতীয় খেলাধুলা

প্রত্যেক স্বাধীন দেশে নিজ নিজ দেশের জাতীয় খেলাধুলার প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা হইয়া

যাকে। এমন কি দেশের মধ্যে জাতীয় খেলাধুলা বাহাতে প্রাধান্য লাভ করে তাহার দিকে রাষ্ট্র পরিচালকগণের বিশেষ দৃষ্টি থাকে। পরাধীন ভারত সেই সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া আছে। বৈদেশিক শাসনের আওতায় পড়িয়া নিজ দেশের দকল কিহুই উপেক্ষা করিতে শিক্ষা করে। ইহার ফলেই ভারতের জাতীয় খেলাধুলার একরূপ অস্তিত্ব নোপ পায়। বর্তমানে যেচক্র আছে তাহা একনিষ্ঠ দেশসেবক ব্যারাম উৎসাহীদের জন্য। প্রথম এই বিষয়ের অগ্রণী হিসাবে মহারাষ্ট্র ব্যারাম সৎকের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ব্যারাম প্রচাকমন্ডলী ১৯৩৬ সালে বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভারতের জাতীয় খেলাধুলা ও ব্যারামের কৌশল প্রদর্শন করেন। ইহার পরে দেখা যায় হাড়ুখ খেলা, কবাডী নামে নিখিল ভারত অলিম্পিকের কর্মসূচীর মধ্যে স্থান লাভ করে। ইহার খেলার নিয়মকানুন গঠন করেন একজন বৈদেশিক নাম মিঃ মাস্থী। এই নিয়মেই এখনও পর্যন্ত উক্ত জাতীয় খেলা নিখিল ভারত অলিম্পিক এসোসিয়েশন পরিচালনা করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্তমানে ভারত যখন স্বাধীন হইতে চলিয়াছে তখন বৈদেশিক গঠিত নিয়মকানুন আর চলিতে পারে না। জাতীয় খেলাধুলা দেশের মধ্যে বাহাতে প্রাধান্য লাভ করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জাতীয় খেলাধুলা ও ব্যারাম বিষয় লইয়া যাহারা এতদীর্ঘকাল সকল অত্যাচার, অন্যায়, উপেক্ষা করিয়া দেশের মধ্যে প্রচার করিয়া আসিয়াছেন তাহাদের পরিচালনার অধিকার প্রদান করিতে হইবে। বাঙলা দেশে এই বিষয়ের একটি মাত্র মচল প্রতিষ্ঠান আছে। ইহার নাম "বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সম্বা"। ইহারা সারা বাঙলা দেশে, সুন্দর গ্রামের মধ্যে পর্যন্ত বেঙ্গল স্থাপন করিয়া জাতীয় খেলাধুলা নিয়মানুষ্ঠিত, সমাজ গঠন, গ্রাম সংগঠন প্রভৃতি বহু জাতীয় জীবনের উন্নতি সহায়ক কর্মনীতি অনুসরণ করিয়া থাকেন। প্রকৃত জাতিকে নতুন পথের সম্মান যদি দিতে হয়, তবে উক্ত সম্বের সাহায্য অবশ্য প্রয়োজনীয় হইবে। বাঙলার ভবিষ্যৎ গঠনের গুরুদায়িত্ব বাহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা নিশ্চয়ই বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সম্বকে উপেক্ষা করিবেন না।



জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সম্বের পরিচালিত বাহরী শিক্ষা শিবিরে সামরিক কুচ কাওয়াজ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

## দেশী সংবাদ

২৮শে জুলাই—ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুসৃত গঠনসম্মতি অনুযায়ী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিসভা নির্বাচিত হইবে বলিয়া গণপরিষদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নির্বাচিত সংখ্যাগুরু দলের নেতা রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী হইবেন এবং প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী মন্ত্রিসভা প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ঘোষণা করেন যে, আগামীকাল আনুষ্ঠানিকভাবে সাম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানে ইন্দোনেশিয়ার যুগ্ম-প্রসঙ্গা উত্থাপন করা হইবে। তিনি বলেন, ভারতের আকাশপথে ডাচ বিমানের চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়াও ভারত গভর্নমেন্ট স্থির করিয়াছেন।

২৯শে জুলাই—সিরাজগঞ্জের সংবাদে প্রকাশ, গতকাল রাগিতে ফকরুদ্দীন এক নৌকাডুবিতে ফলে ৫৪ জন যাত্রী নিখোজ হইয়াছে।

মৌদীনীপুরের সংবাদে প্রকাশ, গতকাল খজাপুর শহরে গৃহদাহের নতুন কয়েকটি ঘটনা ঘটে।

অদ্য গণপরিষদে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী একটি সুপ্রীম কোর্ট গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

সম্প্রতি দিল্লীতে বড়লট লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সহিত দ্বিবাংকুরের দেওয়ানের আলোচনার পর দ্বিবাংকুরের মহারাজা কয়েকটি সর্তাধানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে সম্মত হইয়াছেন।

বাঙলা ও পাজাব প্রদেশস্থর সিন্ধা বিভক্ত হওয়ার ফলে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, ওয়াকিং কমিটি ও মিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির পরবর্তী অধিবেশনে এই সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সাপেক্ষে কংগ্রেসের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার সুবিধার জন্য পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাজাবে আঞ্চলিক কংগ্রেস কমিটি গঠিত হইবে।

৩০শে জুলাই—ভাইসরয় ও লেডী মাউন্টব্যাটেন অদ্য বিমানযোগে কলিকাতা আসেন। ভাইসরয়ের কার্ভার গ্রহণের পর ইহাই লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কলিকাতায় প্রথম পদাধিগ।

ভারত গভর্নমেন্ট অন্য তারফায়ে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পারিষদের চেয়ারম্যানের নিকট ইন্দোনেশিয়ার স-কট সংক্রান্ত প্রদঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের ভারতীয় প্রতিনিধিদল চেয়ারম্যানকে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিবাসপত্র পারিষদে পেশ করার জন্য অনুরোধ করিবেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর বিরোধে যে মামলা চলিতেছিল, অদ্য উত্তর বিভাগ পুলিশ কোর্টের আন্তরিক চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডি এন হকের এজলাসে তাহার শ্রাবণী ভাউলৈ পাবলিক প্রসিকিউটর মিঃ বি সি সেন ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৯৪ ধারা অনুসারে সরকার পক্ষ হইতে অভিযোগ প্রত্যাহারের আবেদন করিয়া এক দরখাস্ত পেশ করেন। ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত মামলা প্রত্যাহারের আবেদন মঞ্জুর করেন এবং পরোক্ষানুধি প্রত্যাহার করিয়া আসামীকে খালাস দেন।

অদ্য কলিকাতার অবস্থার অবনতি ঘটে। এইদিন দাঙ্গাহা-গামাঃনিত বিভিন্ন ঘটনায় ১৫ জন মারা যায় এবং ৮২ জন আহত হয়। এই হিসাব সরকারীভাবে সম্বন্ধিত হয় নাই।

নয়াদিল্লী এক সংবাদে প্রকাশ, ডোমিসাইল কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী স্থির হইয়াছে যে,

## সাম্প্রতিক

কোন ডোমিনিয়ান কর্তৃক ব্যবস্থা অবলম্বিত না হওয়া পর্যন্ত এক ডোমিনিয়ান হইতে অন্য ডোমিনিয়ানে প্রবেশকালে ছাড়পত্র বা পাসপোর্টের প্রয়োজন হইবে না। প্রকাশ, ১৯৪৮ সালের ৩০শে মার্চ পর্যন্ত ভারতবর্ষে ও পাকিস্থানে একই মদ্রা চালু থাকিবে।

৩১শে জুলাই—স্যার এন গোপালস্বামী আয়েংগার রাষ্ট্রপতিঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন ভংগে দায়ে অপরাধীকে ক্ষমা করিবার ক্ষমতার জন্য সে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, অদ্য গণপরিষদে উহা গৃহীত হইয়াছে।



ভারী ইংলণ্ডের বারী প্রিন্সেস এলিজাবেথ

১লা আগস্ট—সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, ২২টি দেশীয় রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিতে রাজী হইয়াছে। এই দলের মধ্যে দ্বিবাংকুর, বরোদা, কোচিন ও রাজপুপলা রাজ্য আছে।

সোস্যালিস্ট রিপাব্লিকান পার্টি গঠনের গঠনের সংবাদ ঘোষণা করিয়া শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু এক বিবৃতি দেন। উহাতে তিনি বলেন যে, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং ব্রিটিশ ও অন্যান্য বৈদেশিক প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্তিলাভ, ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে স্বৈরতন্ত্র শাসনের অবসান ঘটানো এবং ভাষার ভিত্তিতে সোস্যালিস্ট রিপাব্লিক গঠন ও ভারতে সোস্যালিস্ট রিপাব্লিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করাই সোস্যালিস্ট রিপাব্লিক পার্টির উদ্দেশ্য।

করাচীর সংবাদে প্রকাশ, বিহারের গভর্নর

নিযুক্ত হওয়ার শ্রীযুক্ত জররামদাস দৌলতরান সিন্ধুর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে পাকিস্থান গণপরিষদে পদত্যাগপত্র পেশ করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী অদ্য সদলবলে শ্রীনগরে (কাশ্মীর) পৌছেন।

ভারতীয় ডোমিনিয়ানের প্রতি ঠা উৎসব উদযাপন উপলক্ষে ভারত সরকার ১৫ই আগস্ট ও ১৬ই আগস্ট ভারতীয় ডোমিনিয়ানের সর্বত্র ছুটির দিন ঘাঃ করিয়াছেন।

২রা আগস্ট—পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সমস্যা সম্বন্ধে কতব্য নির্ধারণের জন্য প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে পূর্ববঙ্গ সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেন্টের অধীনে যে স্যার অফিসার গৃহস্থপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন,

তাহাদের মধ্যে কয়েকজন অদ্য কার্ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, মিঃ এইচ এস ঘোষ চৌধুরী হেড কোয়ার্টারের ডেপুটি কমিশনার হিসাবে মিঃ দোহার নিকট হইতে কার্ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ অবনীমোহন গুপ্ত উত্তর বিভাগের ডেপুটি কমিশনার হিসাবে মিঃ হাকিমজুদ্দিনের নিকট হইতে এবং মিঃ আর এন গুপ্ত পোর্ট পুলিশের ডেপুটি কমিশনার হিসাবে মিঃ এগরুর নিকট হইতে কার্ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মনোনীত পুলিশ কমিশনার এস এন চ্যাটার্জি মিঃ হার্ডউইকের নিকট হইতে ষ্টা আগস্ট কার্ভার গ্রহণ করিবেন। হাওড়ার জেলা ও দায়রা জজ মিঃ সুকুমার সেন আই সি এস বাঙলা সরকার চীফ সেক্রেটারী স্যার হারকড স্টীভেন্সের নিকট হইতে কাজকর্ম ব্যতীয়া লইবার



প্রিন্সেস এলজাবেথের ভারী পাত ফিলিপ

উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের চীফ সেক্রেটারী হিসাবে নতুন পদে যোগ দিয়েছেন।

বিহার প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার জেনারেল সেক্রেটারী কপিল দেওর রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃতদেহ মোগলসরাই স্টেশনের বিশ্রামাগারে পাওয়া গিয়াছে।

৩রা আগস্ট—আগামী ১৫ই আগস্ট হইতে ভারতীয় ডোমিনিয়নের গভর্নর জেনারেল পদে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের এবং পাকিস্থান ডোমিনিয়নের গভর্নর জেনারেল পদে মিঃ মুহম্মদ আলী জিন্নার নিয়োগ রাজা অনুমোদন করিয়াছেন। রাজা ১৫ই আগস্ট হইতে বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর পদে নিম্নোক্ত নিয়োগগুলি অনুমোদন করিয়াছেন। ভারতীয় ডোমিনিয়ন—(১) পশ্চিম বঙ্গ—চত্রবর্তী রাজগোপালাচারী, (২) পূর্ব পঞ্জাব—স্যার চতুলাল মাধবলাল হিবেদী, (৩) মধ্যপ্রদেশ ও বেহার—শ্রীযুত মঙ্গলদাস পাকবাসা, (৪) উড়িষ্যা—ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজ, (৫) বিহার—শ্রীযুত জয়রামদাস দৌলতরাম, (৬) যুক্তপ্রদেশ—ডাঃ বিধান-চন্দ্র রায়। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আমেরিকা হইতে না আসিয়া দেশেই পদ গ্রহণ করিবেন। পাকিস্থান ডোমিনিয়ন—(১) পশ্চিম পঞ্জাব—স্যার রবার্ট ফ্রান্সিস মডি, (২) সিন্ধ—মিঃ গোলাম হোসেন হেদায়েতুল্লাহ, (৩) উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—স্যার জর্জ কানিংহাম।

শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত একখানি বিশেষ বিমানযোগে নরাদিল্লী হইতে মস্কো অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

রাষ্ট্রপতি আচার্য কৃপাসনী করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার আদর্শ শান্তিপূর্ণভাবে কার্যে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রচেষ্টা চালিতে থাকিবে।

কলিকাতায় পূর্ববঙ্গ সম্মেলনের দুই দিবস-ব্যাপী অধিবেশন সমাপ্ত হয়। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে সমগ্র হিন্দুস্থান ডোমিনিয়নকে পাকিস্থানের সংখ্যালঘুদের দারিদ্র উপলব্ধি বরাদ্দ জন্য অনুরোধ করা হয় এবং হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের সম্মানিত নাগরিক-রূপে গণ্য করার জন্য দাবী জানান হয়। পূর্ব-বঙ্গের হিন্দু অধিবাসীরা একান্ত বাধ্য না হইলে এখনই বাহাতে স্থান ত্যাগ না করে, তত্ত্ব্য সম্মেলন তাহাদের নিকট আবেদন জানায়।

## বিত্তেরী সংবাদ

২৮শে জুলাই—ইন্দোনেশিয়ায় যুদ্ধের স্থায়ী সন্ধির আশঙ্কা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রী ইন্দোনেসিয়ায় দাবী করা হয় যে, পূর্ব জাভার বৃহত্তম বন্দর সুরাবায়ার নিরাপত্তা যোগ্যকর্তার ইন্দোনেশিয়ানদের আক্রমণের ফলে ৪০০ ওলন্দাজ নিহত হইয়াছে। অদ্য জাভা ও সুমাত্রায় ওলন্দাজ ও ইন্দোনেশিয়ানরা উভয় পক্ষই সাক্ষ্যের দাবী করে। ৩০শে জুলাই—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক অস্কার ল্যাঙ্গ অবিলম্বে নিরাপত্তা পরিষদে ইন্দোনেশিয়ানদের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

৩১শে জুলাই—নিউ ইয়র্কে সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা পরিষদে ডাঃ ড্যান ব্রিঙ্কেন্স জানান যে, হল্যান্ড ইন্দোনেশিয়ানরা ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতা মানিয়া লইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

ভারতবর্ষ অদ্য সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা পরিষদকে এই মর্মে অনুরোধ জানাইয়াছে যে, ইন্দোনেশিয়ানরা ডাচ সাধারণতন্ত্রী সংগ্রাম এই মুহূর্তেই বন্ধ করিতে হইবে। ভারতের পক্ষ হইতে মিঃ বি আব সেন এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

১লা আগস্ট—রাহের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বা মকে অদ্য গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

নিউ ইয়র্কে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা পরিষদে হল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়াকে অবিলম্বে বৃদ্ধ বন্ধ করিবার নির্দেশ দানের সিদ্ধান্ত ৮ ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

৩রা আগস্ট—ওলন্দাজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জের গভর্নর ডাঃ ডানমুক বেতারযোগে জানাইয়াছেন যে, আগামীবলা মধ্য রাত্রে ইন্দোনেশিয়ান ওলন্দাজ সামরিক কর্মবাহিনীরা বন্ধ হইবে। প্রায় ১৫ দিন পূর্বে ওলন্দাজ-ইন্দোনেশীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। মধ্যবর্তী গভর্নমেন্ট গঠন সম্পর্কে ইন্দোনেশীয় বিপাক্রিকান মন্ত্রিসভার সঙ্গে দুই মাস-কাল ধরিয় আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পরে গত ২০শে জুলাই ওলন্দাজ সৈন্য বাহিনী আক্রমণ শুরু করে।

## চম সংশোধন

গত সপ্তাহের 'দেশ' পত্রিকার ৫৭১ পৃষ্ঠায় 'নৌশিল্প ও পোতাশ্রয় সমস্যার ভারত' প্রবন্ধে ২য় কলামের ২২ লাইনে 'ভারতবর্ষ...২৪%' এর স্থলে 'ভারতবর্ষ...২৪%' হইবে।

## মকল হইতে সাবধান

# পাকা চুল কাঁচা হয়

(গভর্নমেন্ট রেজিটার্ড)

কলপে সারে না। আমাদের নির্দেশ কেশরজন সংগঠিত আয়ুর্বেদীয় তৈলে চুল চিরন্তনে স্বভাবিক কাল হইবে, আর পাকিবেই না। এই তৈল মাথা ও চক্ষুরেও খুব উপকারী, বিবাস না হইলে, মূত্রা ফেরতের গ্যারান্টি লউন। মূল্য ২০০, অল্প পাকায় ৩০০ তাহার বেশী পাকায় ও ৫, সব পাকায়।

## হিন্দু কল্যাণ ঔষধালয়

নং ১১, পোঃ কাতরীসরাই (গয়া)

# বজ-টোন

জায়বিক ও সর্বপ্রকার নোবেল  
শক্তিবর্ধক ওয়াইন টনিক।

যাত্রা-চাষের ২ চামচ অথবা  
৪ চামচ আধারাত্রে প্রত্যহ  
ভিনবার।



রক্তন ল্যাবরেটরীজ  
১নং বেঙ্গল হাউস রোড, ঢাকা।

## চক্ষু ও হানি

ডিক্সন "আই-কিওর" (রেজিঃ) চক্ষুহানি এবং  
সর্বপ্রকার চক্ষুরোগের একমাত্র অব্যর্থ মনোবৈদ্য  
বিনা অস্ত্রে ঘরে বসিয়া নিরাময় সুবর্ণ  
সুযোগ। গ্যারাণ্টী দিয়া আরোগ্য করা হয়  
নিশ্চিত ও নিভরযোগ্য বলিয়া পৃথিবীর সর্বত্র  
আদরণীয়। মূল্য প্রতি শিশি ৩ টাকা, মাল্‌ট  
৫০ আনা।

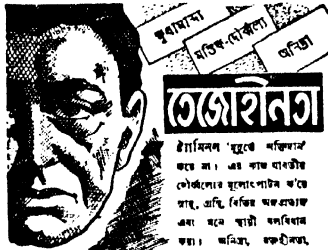
কমলা ওয়ার্কস (দ) পাটপোতা, বেঙ্গল

# পাকা চুল কাঁচা হয়

(Govt. Regd.)

কলপ ব্যবহার করিলে না। আমাদের  
বৃদ্ধিশীল সেনট্রাল মোহিনী তৈল ব্যবহারে  
সাদা চুল পনেরায় কাল হইবে এবং উনি ৬ বৎসর  
পর্যন্ত স্থায়ী হইবে। অল্প কয়েকগাছি চুল  
পাকিলে ২১০ টাকা, উনি হইতে বেশী হইলে  
৩১০ টাকা। আর মাত্রার সমস্ত চুল পাকিয়া সাদা  
হইলে ৫ টাকা মালের তৈল ক্রয় করুন। বার্থ  
প্রমাণিত হইলে দ্বিগুণে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হইবে।

দীনরক্ষক ঔষধালয়,  
নং ৪৫, পোঃ কাশীসরাই, গয়া।



কলপ ব্যবহার করিলে না। আমাদের  
বৃদ্ধিশীল সেনট্রাল মোহিনী তৈল ব্যবহারে  
সাদা চুল পনেরায় কাল হইবে এবং উনি ৬ বৎসর  
পর্যন্ত স্থায়ী হইবে। অল্প কয়েকগাছি চুল  
পাকিলে ২১০ টাকা, উনি হইতে বেশী হইলে  
৩১০ টাকা। আর মাত্রার সমস্ত চুল পাকিয়া সাদা  
হইলে ৫ টাকা মালের তৈল ক্রয় করুন। বার্থ  
প্রমাণিত হইলে দ্বিগুণে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হইবে।

কলপ ব্যবহার করিলে না। আমাদের  
বৃদ্ধিশীল সেনট্রাল মোহিনী তৈল ব্যবহারে  
সাদা চুল পনেরায় কাল হইবে এবং উনি ৬ বৎসর  
পর্যন্ত স্থায়ী হইবে। অল্প কয়েকগাছি চুল  
পাকিলে ২১০ টাকা, উনি হইতে বেশী হইলে  
৩১০ টাকা। আর মাত্রার সমস্ত চুল পাকিয়া সাদা  
হইলে ৫ টাকা মালের তৈল ক্রয় করুন। বার্থ  
প্রমাণিত হইলে দ্বিগুণে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হইবে।

অমিত তেজ ও শক্তি সম্পন্ন  
Datta, J. Tar, Samskrit.

যাদবপুর

যক্ষ্মা হাসপাতাল

সাহায্য-আবেদন

প্রসারকল্পে এবং অধিকতর সংখ্যক রোগীর  
বাস এবং চিকিৎসাব্যবস্থার জন্য আপনার

সমবেত সাহায্য প্রার্থনা করি!!

যথাসাধ্য অদাই পাঠান!

ডাঃ কে. এস. রায়,

সম্পাদক

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল

৬এ, সুব্রহ্মনাথ বানার্জী রোড,

কলিকাতা।

## পাকা চুল

কলপ ব্যবহার করিলে না। আমাদের  
বৃদ্ধিশীল সেনট্রাল মোহিনী তৈল ব্যবহারে  
সাদা চুল পনেরায় কাল হইবে এবং উনি ৬ বৎসর  
পর্যন্ত স্থায়ী হইবে। অল্প কয়েকগাছি চুল  
পাকিলে ২১০ টাকা, উনি হইতে বেশী হইলে  
৩১০ টাকা। আর মাত্রার সমস্ত চুল পাকিয়া সাদা  
হইলে ৫ টাকা মালের তৈল ক্রয় করুন। বার্থ  
প্রমাণিত হইলে দ্বিগুণে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হইবে।

## ধবন ও কুষ্ঠ

গায়ে বিবিধ বর্ণের দাগ, স্পন্দলাভহীনতা, অশ্লীল  
স্বভাব, অশ্লীলতার বক্তব্য, বাতরক্ত একাক্ষয়  
সার্বভৌম ও অন্যান্য চর্মরোগাদি নিম্নোক্ত  
আরোগ্যে জন্য ৫০ বর্ষোদ্ভবকালের চিকিৎসক

## হাওড়া কুষ্ঠ কুটার

সর্বাপেক্ষা নিভরযোগ্য। আপনি আপনার  
রোগলক্ষণ সহ পত্র লিখিয়া বিনামূল্যে  
ব্যবস্থা ও চিকিৎসাপ্রাপ্তক লউন।

—প্রতিষ্ঠাতা—

পণ্ডিত রামপ্রসাদ শর্ম্মা কবিরাজ

১নং মাধব ঘোষ লেন, ব্রহ্মট হাওড়া।

ফোন নং ০৫১ হাওড়া।

শাখা : ৩৬নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা।

(পত্রবী সিনেমাট নিকটে)

# ডি ডি টি

নিওসিড

সব পোকাকীট  
ধ্বংস করে

DDT Veiny DDT

গাইগি ইন্ডাস্ট্রিয়ার্‌ইডস্‌ লিঃ বোম্বাই।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিত্রভাষি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগোরাঙ্গ প্রেসে প্রদ্রিত ও প্রকাশিত।

ব্যবহারকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পাঠক লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।



পাদক : শ্রীবাঞ্ছনচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক : শ্রীনাগরময় ঘোষ

তৃত্বাংশ বর্ষ।

শনিবার, ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৫৪ সাল।

Saturday, 16th August, 1947.

[৪১শ সংখ্যা]

## স্বাধীন ভারত

১৫ই আগস্ট হইতে ভারতে ব্রিটিশ ভূত্বের অবসান হইয়াছে। এইদিন উৎসব বস স্বরূপে প্রতিপালিত হইয়াছে। ব্রিটিশের রাষ্ট্রীয় পতাকা আজ ভারতভূমি হইতে অপসৃত হইয়াছে এবং জাতীয় পতাকা অর্ধে উত্তোলিত হইয়াছে। ভারতের স্বদেশ-প্রমিত সন্তান যে পতাকার মর্যাদা রক্ষা করিতে গয়া শত্রু গুলিতে প্রাণ দিয়াছেন, সঙ্গীনের মাধ্যমে বুক পাতিয়া লইয়াছেন, আজ সেই পতাকার কাছে বিদেশীদিগকে সসম্মানে শির নত করিতে হইতেছে। দিল্লীর লাল কেল্লার উপর আজ জাতীয় পতাকা উড়িতেছে, কলিকাতার সরকারী দপ্তরখানার শীর্ষদেশে এবং লাটপ্রাসাদের সৌধচূড়ে শোভা পাইতেছে জাতীয় পতাকা। আমাদের এ গর্ব এবং উল্লাসের কথা সন্দেহ নাই। ঐক্যবদ্ধ তথাপি দীর্ঘ পরাধীনতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার আনন্দ এবং স্বাধীনতালাভের স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস আমরা অন্তরে উপলব্ধি করিতেছি না। কোথায় যেন কোন গভীর বেদনা রহিয়া গিয়াছে, ব্রিটিশ প্রভুত্বের অপসারণের স্থূল বিচার আমাদের মর্মগত সে মূল বেদনাকে বিদূরিত করিতে সমর্থ হইতেছে না। মনে শুধু এই প্রশ্নই উঠিতেছে, কই, এতদিন যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহা তো পাই নাই। স্বাধীনতাকামী ভারত সন্তানগণ অর্ধশতাব্দীর উদ্বেগকাল ধরিয়া যে অখণ্ড দেশ ও অখণ্ড জাতির স্বাধীনতার জন্য কামনা করিয়াছে, বাঙলার বীর সাধকগণ অজ্ঞান বদনে যে স্বাধীনতার জন্য হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া শোণিতধারা ঢালিয়া দিয়াছে, তাহা আমাদের আজও অধিগম্য হয় নাই। এবং অখণ্ড সংহত ভারতের স্বাধীনতা আমরা পাই নাই।

ব্রিটিশের ভারত-ভাগ-সম্পর্কিত বিভাগ-ব্যবস্থা আমাদের অন্তরে আঘাত করিতেছে।

ভারতের স্বাধীনতাকামী সন্তানগণ এতদিন যে পতাকাকে অন্তরের সঙ্গে গ্রন্থা করিয়াছেন এবং যে পতাকার মর্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন, আজ তাহারা সকলে উন্নতমস্তকে সে পতাকার মূলে সমবেত হইতে পারেন নাই। এই বেদনা অন্তরে লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সকলের সঙ্গে বাঙলায় আমাদের স্বাধীনতার উৎসব পালন করিতে হইয়াছে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারত খণ্ডনের এই বেদনাতোই মহারাজী সর্বমতী আশ্রমে যাইবার আমন্ত্রণের উত্তরে বলিয়াছেন, সর্বমতী বহু দূরে, এখন আমার স্থান নোয়াখালীতে। ১৫ই আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা উত্তোলন করিয়া আমরা ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান ঘোষণা করিয়াছি। কিন্তু সেই সঙ্গে অখণ্ড দেশ ও জাতির আদর্শ যে আজও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এক মুহূর্তের জন্যও আমরা তাহা ভুলি নাই। আমাদের উৎসবের বাতি মানসিক এই উল্বেগের স্বাক্ষর তাড়নে দিগন্ত বিস্তারী আলোক রেখা বিছুরণ করিতে সমর্থ হয় নাই।

কিন্তু তথাপি আমরা নিরাশ হইব না; কারণ আমরা জানি যাহা মিথ্যা তাহা কোনদিনই স্থায়ী হইতে পারে না এবং যাহা সত্য তাহাও বিমলিন হইবার নহে। আমরা নিশ্চিতভাবে এই সত্য অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছি যে, ভারত এক এবং অবিভাজ্য। বর্তমানের এই ভেদগত বিভাগ ইহা একান্তই মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা কৃষ্টিম, এবং ইহার মূলে রাষ্ট্র বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টি নাই, বস্তুতঃ মধ্যযুগীয় ধর্মগত সংকীর্ণ সংস্কার এবং নেতৃস্থানীয়দের অপরি-

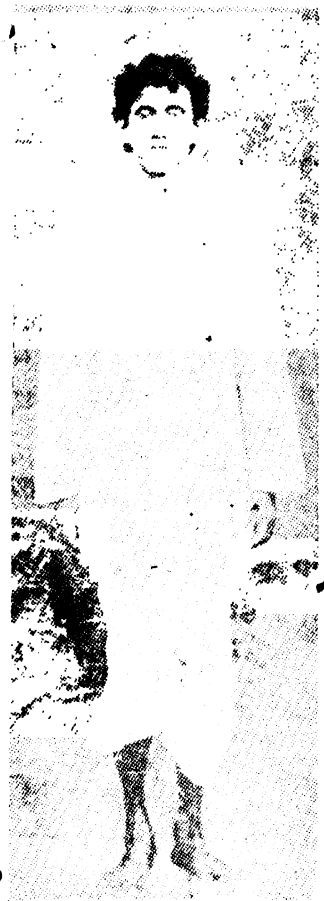
ণ্যাদর্শতাপূর্ণ পরিকল্পনাই ইহার মূলে রহিয়াছে। আমরা একান্তভাবে এই বিশ্বাস করি যে, বাস্তব সত্যের আঘাতে এই কৃষ্টিম এবং কল্পিত বিভেদ টিকিবে না। রাষ্ট্রনৈতিক সংহিতাকে উদার ভিত্তি স্বরূপে গ্রহণ করিয়াই ভারতের সাংস্কৃতিক সংহতিবোধ একদিন সত্য হইয়া উঠিবে। আমরা এ বিষয়ে স্থির নিশ্চয় আছি যে, ভারতের জাতীয়তামূলক যে সংহতিবোধ এদেশের মনীষী এবং সাধকগণ হৃদয়ের শোণিত দিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, সাময়িক অশ্ব আবেগ বা উত্তেজনায় তাহা ধ্বংস হইবে না। পক্ষান্তরে ভেদনীতির ব্যর্থতার ভিতর দিয়া আঁচরেই তাহার সার্থকতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

১৫ই আগস্টের উৎসব আমাদের কাছে আশান্তেই উদ্দীপ্ত করিয়াছে। ভারত আবার এক হইবে। ভাই আবার ভাইয়ের পাশে আসিয়া দাঁড়াইবে এবং একই আদর্শে উদ্বেগ হইয়া চলিবে। ভারতের সমুদায় এবং রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক অভ্যুদয়ই আমাদের সকলেরই হইবে কামনা এবং আমরা সকলেই সেই সাধনাতোই আমাদের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিব। আজ আমরা এই আশা অঁকড়াইয়া ধরিয়াই থাকিব। আমরা পারস্পরিক মিশনের সেই শর্তদিন গণিতে থাকিব। নতুবা আমাদের শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই এবং নিবৃত্তি নাই। অখণ্ড ভারতের আদর্শ আমরা ভুলিতে পারি না, স্মরণ তাহা আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছে। সে আদর্শ ভুলিলে আমরা বাঁচিব না। আমাদের মনের ঠাণ পাইবার সেই এক স্থানই রহিয়াছে। আমাদের সমস্ত কর্মসাধনার তাহাই বীজ মন্ত্র। বিপর্যয় যতই আসুক, আমরা সেই বীজ মন্ত্র জপ করিতে থাকিব এবং সেই মন্ত্র সাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিতেও সন্দিহান করিব না। ভারতের স্বাধীনতার

বেদীমূলে যাঁহারা নিজেদিগকে বলি দিয়া অমর জীবনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, আজ আমরা তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতেছি। তাঁহাদেরই তর্পণ করিতেছি। তাঁহারা অমরলোক হইতে আমাদের কাছে অনুপ্রাণিত করুন। সর্বপ্রকার দৈন্য ও দুর্বলতা হইতে তাঁহারা আমাদের চিন্তকে মুক্ত রাখুন। তাঁহাদের আশ্বাদনের অন্তর্নিহিত আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা আমাদের পথের অনুদার ও অসংস্কৃত যত অন্তরায় সকল অতিক্রম করিব। শ্যামলভূমিতে সপ্তরশ্মিকারী পিশাচের দল আমাদের সাধনমন্ত্রের মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তিতে অপসৃত হইবে এবং সে দিনের অধিক বিলম্ব নাই।—বন্দেমাতরম্।

### বিপ্লবী বীর ক্ষুদিরাম

ক্ষুদিরাম বাঙলার অগ্নিযুগের প্রথম বিপ্লবী বীর। ঊনচাঞ্জিশ বৎসর পূর্বে ১১ই আগস্ট তারিখে বাঙলার তৎপূর্ণ স্বদেশপ্রেমিক বীর সন্তান ফাঁসির মধ্যে হাসিমুখে জীবন দান করেন। ক্ষুদিরামের এই আশ্বাদন বাঙলার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ব্যাপার। স্বদেশের স্বাধীনতার হোমানল বাঙলার বুকে তখন ঘিকি ঘিকি করিয়া জ্বলিতেছিল। এদেশের কবি ও সাহিত্যিকদের বর্ণনায় তাহার অগ্নিময়ী মুচ্ছনা পূর্ব হইতেই বাজিয়া উঠে এবং জাতির তরুণদের মনে সে সূর্য নবসৃষ্টির একটা বলিষ্ঠ কল্পনাকে প্ররোচিত করিয়া তোলে। মজঃফরপুরে ক্ষুদিরামের বিক্ষিপ্ত বোমা এবং তৎপরে তাহার আশ্বাদন বাঙলার চিন্তের স্তিমিত বহিজ্বলাকে অকস্মাৎ প্রচণ্ড বৈশল্যিক বেগে উদ্দীপ্ত করে। ইহার ফলে জাতির ধমনীতে জীবনদান করিয়া স্বাধীনতা অজ্ঞানের উন্মাদনা বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। মজঃফরপুরের তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার কিংস ফোর্ড সাহেব ইতিপূর্বে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ক্ষুদিরামের নিক্ষিপ্ত বোমায় ভ্রমরকমে কিংস ফোর্ডের পরিবর্তে মিস ও মিসেস কেনেডী নাম্নী দুইজন ইংরেজ মহিলা নিহত হন। ক্ষুদিরাম নরঘাতক ছিলেন না। তিনি স্বদেশপ্রেমিক বীর। তিনি তাঁহার এই ভুলের জন্য প্রকাশ্য বিচারালয়ে অনুশোচনা প্রকাশ করেন। বাঙলার বিপ্লবী দলের তৎকালীন মত্মপাথর 'যুগান্তর' ক্ষুদিরামের এই অনুশোচনায় সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। 'যুগান্তর' ক্ষুদিরামের অনুশোচনার উপর মন্তব্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 'ক্ষুদিরাম হত্যাকে এখানে বড় করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহা ঠিক নয়, মহাদাশের প্রাণময় আদর্শকে প্রবল করিয়া তোলাই এক্ষেত্রে কর্মযোগীর প্রধান লক্ষ্য। স্বতুতঃ নিষাচিত মানবাত্মাকে জাগাইয়া তোলাই তাঁহার সমগ্র কর্মের মূলীভূত



বিপ্লবী বীর ক্ষুদিরাম

উদ্দেশ্য। সাধকের দৃষ্টিতে কর্মের স্থূল রূপটি বড় নয়। প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদিরামের আশ্বাদনের ফলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শের প্রেরণায় বাঙলার অন্তরে বিপুল অবতর্ক উদ্ভূত হয়। তাঁহার অবদান ব্যাপ্ত চৈতন্য অনিবার্ণ আকার ধারণ করে। মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীর কণ্ঠে ফাঁসিমাণ্ডে জীবনের জয়গানে জাতির সাধনার সকল স্তরে নবীন জীবনের বন্যা প্রবাহিত হয়। ইহার পর তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আরও কত সাধক ও কর্মী বিপ্লবের বিষ্ময়কুল ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন এবং স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য মরণকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। বস্তুতঃ বৃহদাশ্বাদনের জন্য যে মৃত্যু তেমন মৃত্যু কোন দিন বার্থ হয় না। স্বদেশ প্রেমিক সাধকের প্রতি রক্তবিন্দু হইতে সহস্র আশ্বাদনকারী বীর সন্তানের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। নিয়মতান্ত্রিক নীতির মাপেজোখে ইহাদের আশ্বাদনের শক্তির পরিমাপ করা চলে না। দিয়াই জাতির মনোমূলে প্রাণশক্তিকে সঞ্চার জাতিকে যাহারা গড়ে, তাহারা মরণের ভিতর

করিয়া থাকে। রাষ্ট্রীয় জীবনের খাতায় ইহাদের কর্মের হিসাব সব সময় থাকে না; কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ী এমন অবদানের প্রভাবকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জাহা যখন নিজকে পায়, তখন আত্মত্যাগ এই সব বীর সন্তানদের অবদান শির মূলবীজের দিকে তাহার নজর পড়ে। আর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার উপকণ্ঠে দাঁড়াইয়া ক্ষুদিরামের স্মৃতি আমাদের অন্তরে তাই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে এবং নীতি বা পথের হিসাবের দূরে ফেলিয়া আমরা তাঁহার সাধনার প্রাণময় প্রভাবকেই বড় করিয়া দেখিতেছি। আমাদের দৃষ্টিপথে কালের আধার আরো করিয়া ক্ষুদিরাম জ্যোতির্ময় স্মৃতিতে জাগিয়াছেন। আমরা বাঙলার এই বিপ্লবী সন্তানকে বন্দনা করিতেছি।

### কলিকাতায় শান্তি

কলিকাতায় এখনও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মহাশ্রাজী নোয়াখালি যাত্রার পূর্বে এজন্য আন্তরিক বেদনা ব্যক্ত করিয়াছেন। সেদিন সোদপুরে প্রাধান্তিক সভায় গান্ধীজী বলেন, শহরের হিন্দুরা যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছে, অবশ্য মুসলমানেরাও কিছু বৃদ্ধিমত্তার মধ্যে চালিতেছে না। মহাশ্রাজী বাক্যের গভীরতা আমরা উপলব্ধি করি। বস্তুতঃ সাম্প্রদায়িক অশান্তি কেহই চাহে না এবং এক্ষণে আমরা বারংবার বলিয়াছি যে, শহর শহরে এই ভ্রমার্থ সৃষ্টি করিতেছে, তাহারা নরপশু। সম্প্রদায়নির্বিশেষে তাহাদিগকে দলন করা উচিত। কিন্তু শহরে হিন্দুরা ক্ষেপিয়া গিয়াছে, অন্য সম্প্রদায় নিরোধ্য এবং নিরীহ; আমরা এইরূপ কথার বিশ্লেষণ করিতে পারি না। আমরা জাতি কংগ্রেসকে বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গের মুক্তি মণ্ডলকে অপদস্থ করিবার জন্য লীগের দর হইতে ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে। ইহাদের মনে এই আশঙ্কা দেখা দিয়াছে যে, সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর পশ্চিমবঙ্গের মুক্তি মণ্ডলের মর্যাদা বাড়িবে এবং কংগ্রেসের মর্যাদা সেই সূত্রে বৃদ্ধি পাইবে এবং কলিকাতা শহরে লীগের প্রভাব আর থাকিবে না। এক্ষণে লীগের সাম্প্রদায়িক নীতি ভাঙিয়া যাঁহারা নেতৃগণের মজা লাটিতেছিলেন, তাঁহারা এজন্য চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন। কলিকাতা শহরে লীগের কটুক্ষেপ পাকস্থানীয় গির আরও কিছুদিন চালাইয়া যাওয়াই ইহাদের ইচ্ছা। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের নামে ইহারা শহরের শাসন নীতিতে লীগের প্রভাব জীয়াইয়া রাখিতে চাহেন। কলিকাতার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার এবং নিষাধনের মিথ্যা সংবাদ

ইহারা যেভাবে প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে আমাদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। মুসলিম লীগের আমলে মুসলমানেরা যাহা করিয়াছে, এখন পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে হিন্দুরা তাহাই করিতেছে; এইরূপ কথা একান্ত অভিসন্ধি-মূলক মিথ্যা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী। তাঁহার বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করিতে পারেন, এমন কেহ আছেন বলিয়া আমরা জানি না। ঘোষ-মন্ত্রিমণ্ডলের সদস্যেরা সকলেই ত্যাগী কর্মী, তাঁহারা মান, যশ ও প্রতিষ্ঠার কান্ডাল নহেন। সমগ্র জীবন দিয়া তাঁহারা জাতীয়তার আদর্শের সেবা করিয়াছেন এবং সাম্প্রদায়িকতাকে বর্জন করিয়াছেন। ডক্টর ঘোষ এবং তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডল শহরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সবতোভাবে চেষ্টা করিতেছেন। সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য তাঁহারা তাঁহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারকার্যে রত হইতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকে সংযত হইতে বলি; কারণ তাঁহার ফলে অনর্থ বাড়বে ছাড়া কমিবে না। শহরের হিন্দু-মুসলমান সকলে এক হইয়া এই মন্ত্রিমণ্ডলকে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করুন। পারস্পরিক জিঘাংসার পশুবৃত্তি শহরের বৃদ্ধ হইতে অপসৃত হউক, আমরা ইহাই চাই।

### নোয়াখালিতে গান্ধীজী

পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠের জন্য মহাত্মাজী উর্ষ্বন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার নোয়াখালি গমনের মূলে এই সত্যটিকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। দুঃখের বিষয় এই যে, লীগ-ওয়ালারা গান্ধীজীর নোয়াখালি যাত্রাকে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতেছেন না। মহামানব মহাত্মাজীর সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও এইরূপ মনোবৃত্তির বিকাশ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। মুসলিম লীগ পাকিস্থানে শান্তি কামনা করেন, আমরা এসব কথা অনেক শুনিয়াছি। মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ পারস্পরিক শান্তি কামনা করিয়া জনসাধারণের নিকট আবেদন করিতেছেন, আমরা ইহাও দেখিতেছি পাকিস্থান গণপরিষদের সভাপতিরূপে মিঃ জিল্লার বক্তৃতাও আমরা পড়িলাম। কিন্তু যদি এইরূপ পারস্পরিক শান্তি ও সৌহার্দ্যই তাঁহাদের আন্তরিকভাবে কাম্য হয়, তবে গান্ধীজীর পূর্ববঙ্গে অবস্থানে তাঁহাদের সন্তোষ বোধ করাই উচিত; কারণ

লীগ-নেতাদের ঈর্ষাস্ত শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করাই গান্ধীজীর নোয়াখালি গমনের উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম লীগ এতদিন পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার যে বিষ নিরাক্ষর এবং অজ্ঞ মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার করিয়াছে, তাহা সহজে উৎখাত হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। অজ্ঞ ও যে কোন মুহূর্তে বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে এবং উপগ্রব স্থানে স্থানে না ধটিতেছে এমন নয়। কুমিল্লা হইতে সম্প্রতি খবর আসিয়াছে যে, গত ৩রা আগস্ট দ্বিপ্রহরে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সহস্রাধিক লোক অভয় আশ্রম আরম্ভ করে। আগ্রমের ঘরগুলি নিশ্চয়ই পাকিস্থানী শান্তির বিধ্ব ঘটাইতেছিল না; কিন্তু আকোশটা কংগ্রেসের উপর এবং পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের উপর। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডক্টর ঘোষ এবং শ্রম মন্ত্রী ডাক্তার সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই আগ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। পূর্ববঙ্গের শান্তির জন্য লীগ-নেতাদের আন্তরিকতায় আমরা সন্দেহ প্রকাশ করিতেছি না; কিন্তু পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনে একটা দারুণ উল্বেগের ভাব সে সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহার কারণও আছে। ডক্টর মেঘনাদ সাহা সেদিন সে কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের এক সার্মালিত সভার সভাপতিস্বরূপে তিনি বলেন, পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মনে এমন একটা দারুণ সৃষ্টি হইয়াছে যে, পাকিস্থান লাভ হওয়াতে তাঁহারা প্রত্যেকেই রাজা ও বাদশা বনিয়া গিয়াছে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে পায়ের নীচে ফেলিয়া রাখিবার অধিকার তাঁহাদের সকলেরই জন্মিয়াছে। সাম্প্রদায়িকতার মন্ত্রে উন্মত্ত এইসব অজ্ঞকে নিরস্ত রাখিতে লীগ-নেতারা প্রবৃত্ত হউন এবং পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে কর্মবিন্দু সম্প্রসারিত করিয়া কার্যত শান্তির পথ প্রদর্শন করুন। ইহাই আমাদের অনুরোধ।

### চট্টগ্রামে প্লাবন

সমগ্র চট্টগ্রাম বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার অর্ধাধ নাই। তাঁহারা অন্নহীন, আশ্রয়হীন। গত বৎসরের অপেক্ষা বর্তমান বৎসরের বন্যার এই বিপর্যয়ে চট্টগ্রাম অধিক বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু আমরা এ পর্যন্ত যতদূর জানি, গভর্নমেন্ট হইতে এইসব বিপন্ন নরনারীকে রক্ষা করিবার জন্য কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয় নাই।

পূর্ববঙ্গের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ-ভার বাঁহাদের উপর পড়িয়াছে, লীগ-নেতা নিব্বাচনের রণ-প্রাতি তাঁহাদের এখনও সম্পূর্ণভাবে দূরে হয় নাই; তাঁহার পর ভাগ্যভাগি ব্যাপার-সংশ্লিষ্ট নীতিতে নিজেদের পদ, মান ও প্রতিষ্ঠা ঠিকভাবে বজায় রাখিবার জন্য মস্তিষ্ক সঞ্চালনে তাঁহারা বিশেষভাবে লিপ্যত আছেন। বাঙলা ভাগ হইয়া যাইতেছে সত্য এবং পূর্ববঙ্গের শাসন ব্যাপারে মিঃ সুরাবর্দীর কর্তৃত্বের দিনও শেষ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ১৫ই আগস্টের পূর্বেই মিঃ সুরাবর্দী পূর্ববঙ্গ শাসনের দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না। ব্যাপার দেখিয়া মনে হইতেছে, উপদলীয় নেতৃত্ব ব্যতীত মিঃ সুরাবর্দী এবং তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলের সকল শক্তি এলাইয়া পড়ে। পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের দৃষ্টি বিপন্ন চট্টগ্রামের দুর্দশা নিরাকরণে অবিলম্বে প্রযুক্ত হইবে, ইহা দেখিতে পাইলে আমরা আশ্বস্ত হইব।

### ১২ই আগস্ট

১২ই আগস্ট—ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় তিথি। এইদিন ভারতবর্ষ বিদেশী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। বাঙলার বিপ্লবী-সন্তান একদিন গাঁহিয়াছিল ‘রক্তাব্দীষ আজ করিয়া মন্থন আনিব তুলিয়া স্বাধীনতা ধন।’ সমগ্র ভারত এই স্মরণীয় দিবসে রক্ত-সমুদ্র মন্থন করিয়া স্বাধীনতা অর্জনে অকুতোভয়ে অগ্রসর হয়। এই দিন ভারতের কোপীন-সম্বল মহামানবের মুখে—“কুইট ইন্ডিয়া”, ‘ভারত ছাড়িয়া যাও’ এই বাণী ধ্বনিত হয় এবং সত্যের গোঁরবে দ্রুত, সেই প্রদীপ্ত ভাষা আসমুদ্র ভারতে নব সৃষ্টির অগ্নিময় আলোড়ন জাগাইয়া তোলে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর শোণিত-সিক্ত বিপ্লবের এমন প্রাপণ্য বিকাশ ভারত আর কোনদিন প্রত্যক্ষ করে নাই; অভয় ও মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃত্ত্ব ভারতের আকাশে বাতাসে আর এমন করিয়া রুদ্ধ উয়াস বিস্তার করে নাই। ভারতের শত সহস্র বীর সন্তান বিপ্লবের সেই রক্ত-লীলায় আত্মদান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সে আত্মবিসর্জন ব্যথা হয় নাই; বস্তুত আগস্টের সেই ব্যাপক বিপ্লবই ভারতে বিদেশী শাসনের উপর শেষ আঘাত হানিয়াছে এবং ১২ই আগস্ট ভারতের মর্মমূল মন্থন করিয়া যে মহামন্ত্র উন্মীত হইয়াছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদিগকে পরিশেষে তাহাই মানিয়া লইয়া ভারত ছাড়িতে হইয়াছে।



# কবিতা

## স্বাধীনতা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারছি না :  
আমার প্রকাশ্য গৃহচূড়ে উড়ছে আমার স্বদেশের পতাকা—  
তিমিরমুক্ত অশ্বরের অভিমুখে  
উঁথিত হচ্ছে আমার নিরুদ্ভ আত্মার প্রথম উদার সম্ভাষণ  
আমার জন্মের প্রথম জয়ধোষণ।  
এক প্রান্তে গম্ভীর গৈরিক  
অনপন্যে দুঃখের ওদাস্য আর অপরিমেয় ত্যাগের প্রসন্নতা;  
অন্য প্রান্তে উল্লাস-উজ্জ্বল সবুজের অপরিণীত  
অমিত জীবনের সৃজনসৌন্দর্যের উদ্ভাসন;  
মধ্যস্থলে তুষারসংকাশ্য শুদ্ধতা  
কর্মের নির্মলতা ও অনবদ্য অন্তরমাধুর্যের প্রতীতি।  
আর সেই শুদ্ধতার অন্তরে ঘননীল অশোকচক্র,  
সমস্ত অলাভচক্রের উর্ধ্বে  
শান্তির স্থির বাণী  
দিকে-দিকে দেশে-দেশে মৈত্রীর আমন্ত্রণ;  
শোকশূন্য সময়ের ঘৃণ্যমানতার প্রতীক  
বর্তমান থেকে বৃহত্তর ভবিষ্যতের  
মহত্তর সম্ভাবনায় নিয়ত-আবর্তিত  
উড়ছে আমার ধ্রুব বিশ্বাসের ধ্বজপট  
আমার বীজমন্ডের বৈজয়ন্তী।

কত দুর্গম পর্বত ও কত কণ্টকক্রোশিত অরণ্য পার হয়ে  
কত দুঃসহ দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে  
অজান্তলক্ষ্যে চলে এসেছে তোমরা,  
দৃঢ় হাতে বহন করে এনেছ এই পতাকাকে।  
কত রোষকষায়িত কশা, কত বলদর্পিত বৃট  
কত বর্বর বুলেট  
ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে তোমাদের,  
কিন্তু বজ্রমুষ্টি শিথিল করতে পারেনি,  
স্থলিত করতে পারেনি তোমাদের পতাকার উদ্ভতি,  
নমিত করতে পারেনি তোমাদের দুঃপরাজেয় প্রতিজ্ঞা।  
মায়ের বৃকে সন্তানের মত  
পক্ষীচণ্ডপুটে তৃণখণ্ডের মত  
বারদূদের বৃকে বহিঃকণার প্রত্যাশার মত  
বহন করে এনেছ এই পতাকা  
যাতে আমি প্রোথিত করতে পারি আমার প্রকাশ্য গৃহচূড়ে।

নবীনারম্ভের নিম্নবাসে বিস্তার করতে পারি বৃক,  
উজ্জ্বল উপলব্ধিতে উদ্ভত করতে পারি মেরুদণ্ড।

লেখনাকে বিশ্বাস করতে পারছি না  
যা আমি আজ লিখছি এই মুহূর্তে।  
কত বাক্য রুদ্ধ হয়ে গেছে তোমাদের কণ্ঠে  
দলিত হয়েছে কত অরুণত্ব আত্ননাদ  
স্তম্ভ হয়েছে কত বাণিত বৃকের দ্রোহবাণী।  
সত্যভাষের সেই অধিকারকে ভবু বিধবস্ত হতে দাওনি,  
বহন করে এনেছ এই পতাকা  
এই উদাত্ত বীরবাহা;  
তন্ত্রিত আকাশে মৃত্ত করে দিয়েছ  
সিতপক্ষ কলহংসের কাকলী,  
যাতে আমি পেতে পারি আমার ভাষা  
লেখনীতে অপরাগ্নমুখ তীক্ষ্ণতা।

তাই আজ এই পতাকাকে যখন প্রণাম করি  
প্রণাম করি তোমাদের দুঃজয় বীর্যবতাকে।  
স্মরণ করি তোমাদের  
যারা ফাঁসির রজ্জ্বকে মনে করেছ কণ্ঠলগ্ন কোমল ফুলমালা  
মৃত্যুতে দেখেছ অমরত্বের রাজধানী।  
স্মরণ করি তোমাদের  
নাগনক্ষত্র যাদের যাত্রা,  
যারা কারাকক্ষে নিয়তিনির্দিষ্ট হয়ে  
যাপন করেছ অবিচ্ছেদ্য অশ্বকার,  
আকাশের অগ্নিতেজে তপ্ত রেখেছ বক্ষস্থল,  
জড়গৃহদাহে দেখেছ ইন্দ্রপ্রস্থের নির্মিতি।  
আর তোমাদের স্মরণ করি  
সেই সব অগণন নামহীন পথিক পদাতিকের দল,  
নির্বিশেষ জীবনের আহবানে  
পদে-পদে রক্তচিহ্নিত করেছ পথ-প্রান্তর-জনপদ,  
ঘরে ঘরে জেতলেছ  
জায়া-জননীর হাহাকারের দাবানল।  
যাতে আমি জীবনে পেতে পারি মর্যাদা  
অমূল্য মূল্যবোধ।  
যাতে হাতে পেতে পারি তেজস্ক্রিয় লেখনী  
কণ্ঠে পেতে পারি দুর্বীর কলম্বন  
আর প্রকাশ্য গৃহচূড়ে এই অপ্রকল্প পতাকা॥

## ঋণাশাধের দিন

বিরাম মূখোপাধ্যায়

বস্ত্রচ্যুত রূপীর অতীত।  
রক্ত পলাশের অগ্নি দাউ-দাউ জ্বলে—  
পলাশীর অস্তাচলে লেলিহান চিতা নিভে যায়।  
হে কবি নিজীব কবি,  
স্মৃতির সূর্যাস্ত  
পাথরে চোখের দৃষ্টি আজো ঝলসায়?

উত্তমর্গ শ্বেতমণীপ হঠাৎ দয়ালু,  
পলাশী ও ইন্দ্রপ্রস্থ শ্বেচ্ছাপাণ্ডু বৈমান-আত্মীয়।  
তবু কবি নির্বিকার—  
ভূলে যাই রূপীর অতীত;  
ভূলে যাই ভূতপূর্ব অমৃত-পুণ্ড্রের শব  
শকুনি-সংগ্রাম।

শোণিতের উচ্চমূল্যে ঋণ শোধিলাম।  
আজ শুভ্র শুভলগ্নে নিরাভিশাপের,—  
ক্রান্তিবৃত্তে শহীদের হিরণ্ময় স্বপ্নের সকাল।

স্বাধীনতা—  
স্বাধীনতা তবু এর নাম।  
শহীদের বেদীমূলে একবার নতজানু,  
নতশিরে একটি প্রণাম।  
তারপর গ্রামে গঞ্জে গহচুড়ে দুর্গে ও বন্দরে  
মজবুত হাতে তুলি গ্রিবর্ণের নির্ভীক নিশান।  
আমার কবিতা আজ মুক্তিযয়ী সৈনিকের গান।

## পানরই আগস্টের কাবিতা

দিনেশ দাস

আমার চোখেতে আজ করে ছলোছল  
পশ্মার অজস্র জল  
মেঘনার ডাক  
মেঘের স্রোতের মত স্তম্ভিত অবাক।

ডাক আসে ধূসর শহরে  
রুদ্ধ শ্বিপ্রহরে  
বাতাস ছড়ায় অবসাদ  
ছিন্নমস্তা করে শূন্য রক্তের আশ্বাদ।

শুকনো পাতার মত উড়ে আসে স্বাধীন সনদ  
এখানে আমার চোখে ঢেউ তোলে  
বুকজোড়া পশ্মা হাতে দূর সিঁধুনদ  
তবুও মস্তুর স্রোত ওঠে ফুলে ফুলে  
করোমণ্ডলের ধারে শ্যাম মালাবার উপকূলে  
ভারত-সাগর গভীর  
ইতিহাসে সূর্য হবে নতুন পর্যায়।

এখানেতে শাঁখের করাতে  
দিনগুলি করাতের দাঁতে দাঁতে কাটে  
সীমানার দাগে দাগে জমাট রক্তের দাগ  
কালনেমী করে লঙ্কাভাগ।

তবু এল স্বাধীনতা দিন  
উজ্জ্বল রঙীন  
প্রাণের আবেগে অস্থির  
ডাক দেয় মাতা পশ্মা পিতা সিঁধু-তীরে॥

## ১৫ই অগস্ট

গোবিন্দ চক্রবর্তী

সুদীর্ঘ রাত্রির শেষে আলোকিত, উজ্জ্বল সমুদ্রের জটঃ  
একটি আশ্চর্য সূর্য আকাশে প্রকট—  
একটি বিশাল দেশ  
বিশাল পাখীর মত দূরন্ত দু'ডানা মেলে উড়ে যেতে চায়—  
একটি বিশাল প্রাণ উজ্জীবিত, উজ্জীহান—  
খান্ খান্ ছিঁড়ে ফেলে শৃংখলের জট;  
সমাশ্চর্য সাতচল্লিশ : পনেরো আগস্ট!  
সমাশ্চর্য সাতচল্লিশ : পনেরো আগস্ট!  
এ আকাশ, এ বাতাস—ডাক দিয়ে গেল আজ একান্তে আমার।

নীল রক্ত, লাল রক্ত, কালো রক্তে একাকার বিশাল ভারত :  
বারে বারে চক্রপিষ্ট, বারে বারে শত্রুকীর্ণ, বারে বারে সমুত্তীর্ণ  
সংগ্রামের পথ—  
বার বার বারংবার স্বতোৎসার—সমুদ্রার সম্বন্ধ শপথ,  
হে বিশাল দেশ!  
যাত্রা করো, যাত্রা করো—এবার উৎসব মত শ্বিধাবন্দলেশ  
উদীচির কূলে কূলে গতির গগায় :  
জনগণ-মন-ঘন সঙ্ঘের সংজ্ঞায়  
দূরন্ত অধীর—  
গর্বোন্মত্ত, গর্বোন্মত্ত প্রজাতন্ত্র তন্ত্রধারী—  
পাতিভের, দুঃস্থিতের স্বপ্নেতে নিবিড়।

এবার উদগ্ধ হও  
বুদ্ধিত গ্রামে-গ্রামে, অরণ্যে, পাহাড়ে আর প্রান্তরে প্রান্তরে—  
সহস্র বীরের অস্থি বিকীর্ণ সহস্র তীর্থে তপে ও কংকরে  
অগ্নি ভিক্ষু,  
কপ্ত ভিক্ষু, ॥  
প্রাণে ভিক্ষু,  
মান ভিক্ষু সহস্র জীবন  
এবার তোমার চোখে ভলে ধরে প্রতীক্ষার প্রাত্যস্তিক মন  
রক্তধারা, অশ্রুধারা, গলিত, বিলোল :  
এবার হৃদয় চায় পদানত, পদাহত—  
ছিন্ন ভিন্ন নীড়ে-নীড়ে দাক্ষিণ্য-কল্লোল।

হে বিশাল সাগরের পাহাড়ের দেশ!  
এবার তাদের হাতে হাত দিয়ে ছুটে চলো দুর্জয়, দুর্বীর—  
মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী যদিও জিঘাংসু নখে  
ছিঁড়ে নিয়ে গেছে কিছুর প্রভাঙ্গ তোমার—  
তবু তুমি চিরসুমহান :  
বৃহত্তর বিশ্বলোকে সুকীর্ণত, সুকীর্ণিত, সুচিহ্নিত,  
শুচিস্মিত তোমার সম্মান;  
রূপান্তরে, দেহান্তরে—তবুও শাস্বত রূপ অমর আত্মার।  
শক্তিশালী জয়ধ্বনি দিগন্ত কাঁপায়—  
জানি তুমি প্রতিশ্রুত পুনরেকো প্রতীক্ষিত,  
অভীক্ষিত জনতার বিপ্লব-বন্যায়।

## নতুন ভারত

বিমলচন্দ্র ঘোষ

অগ্নি-নিঃস্বাসিত ইতিহাসের অকুণ্ঠিত ললাটে  
প্রসন্নদীপ্ত সাক্ষর্যের বিজয়টীকা!  
আমাদের কাঁধে চাঁপিয়েছ বিপুল দায়িত্বভার  
পূর্ণমুক্তিসাধনের মহাযজ্ঞে।  
হে মহাদম্ভী ভারত  
অমৃত প্রাণের জ্বলন্ত শিখায়  
রোমাঞ্চ-কম্পিত তোমার পাদ-প্রদীপ  
সংসারকে করেছে দীপান্বিত।  
মুক্তিযজ্ঞমণ্ডপের নভঃস্পর্শী চূড়ায়  
বোমরাশি বিকম্পিত মহাকাশের অরুণাভা  
এনেছে বলিষ্ঠ চেতনা  
অমেয় সাহস  
অফুরন্ত প্রাণশক্তি  
মুহূর্তমুহূর্তে ঝঞ্জাবিদ্যুৎচকিত রাশির অবসানে।  
তুষার কিরীটী হিমাগিরির মন্তোচ্চারিত শৃঙ্গে শৃঙ্গে  
রক্তবর্ণ গরুড়ের পক্ষ সঞ্চালন :  
অতিকায় পালকে পালকে  
দ্বিবার্ষিক পতাকা ওড়ে  
মহিমাম্বিত অশোকচক্রে সমুজ্জ্বল যার প্রাণ কেন্দ্র।  
হে ধ্বংসতারি সবাপাষণ মহাভারত  
তোমার দ্যুতি আজ পৌছে দাও  
শৃঙ্খলিত পাতালের পাষণ গর্ভে,  
নিঃশেষে বিদীর্ণ করো শ্বেত-মর্মর-স্তম্ভের অহংকার  
শোষণবর্গের অট্টালিকা চূর্ণ হোক  
মহাশাস্তার অট্টহাসিতে।  
বিরাট সংগ্রামের—বিরাট ত্যাগের নিরবচ্ছিন্ন সাধনা  
সার্থক আজ সাফল্য গৌরবে।

থেমেছে অশান্ত রাশির ক্রন্দনকম্পিত বিক্লিখনক  
অসহায় অরণ্য-রোদনের ভয়াত মরীচিকা।  
জেগেছে লজ্জিত কাপুরুষ  
অভয়োজ্জ্বল জন্মদিনের আলোকে।  
বিগত বিদ্রোহের ধূমাণ্ডিত পটভূমিকায়  
বিষন্ন গম্ভীর ফাঁসিকাঠ।  
গৌরবের রক্ত এখনো শূন্যায় তার অঙ্গে,  
মহাশূন্যে থম থম করছে  
আত্মদানের অগ্নি-নিঃস্বাস।  
ক্ষোভে দৃগুৎ অনুতাপে  
ফাঁসির দড়ি করেছে ফণা বিস্তার  
মহাপরাধের আত্মদংশনে।  
বিজয়ী ভারত তাই শোকার্ত  
চন্দ্রালোকিত স্মৃতি-শ্মশানে।  
বাথ' হয়নি বীরের আত্মোৎসর্গ  
অনমনীয় বিপ্লবীর নির্ভীক আত্মবলিদান।  
সার্থক আজ যুগ-বিপ্লবের প্রথমাঙ্ক  
পূর্ণাহুতির মহাযজ্ঞ এখনো বাকি  
খণ্ডিত-ভারতের প্রাণমুক্তিকায়।  
যোগ্য করো হে ভারত আমাদের যোগ্য করো  
দায়িত্ব পালনের,  
তোমার রাষ্ট্রীয় পতাকার শান্তিচক্র  
শান্তি আনুক ঘরে ঘরে—,  
অনিবার্ণ করো অমৃত প্রাণের বহিঃশিখা  
দীপান্বিত পৃথিবীতে।  
স্বর্ণশাসান্বিত মহাজীবনের মুক্তিসন্ধে  
তোমাকে প্রণাম করি।

## নতুন তারিখ

সুশীল রায়

নতুন সূর্য, তোমাকে নমস্কার।  
এসো চিরজীবী শাস্বত পনেরই।  
আহত অতীত থাক আজ অনাহত—  
শোকের বিলাস করি, সে সময় কই॥  
অনেক তারিখ মুছে হ'লো একাকার,  
ধূয়ে মুছে গেলো গ্লানিময় বাথ'তা।  
নতুন তারিখ এসেছে যখন স্বারে  
আপাততো নয় ভুলিন, তাদের কথা॥  
পনেরই, আজো বাঁলিয়া বালুরঘাটে  
তোমার পায়ের চিহ্ন রয়েছে অঁকা  
জালিয়ানবাগে পলাশীর প্রান্তরে  
দাগ রেখে এলো তোমার রথের চাকা॥  
পায়ে পায়ে রচি' ইতিহাস অভিনব  
পরিব্রাজক, বহু পথ ভেঙে এলে,  
কত-যে তীর্থ রচিলে ও-পদপাতে  
কত পাদপীঠে প্রদীপ আসিলে জ্বলে॥  
অবনত-মস্তকে রহি' বহুকাল  
আজিকে বিম্বা জাগে উন্নতিশিরে,

নতুন পথের যাত্রা করিতে সূর্য  
অগস্তা বৃক্ষ তাহ'লে এসেছে ফিরে।  
শূন্যচিহ্ন হে মহাতাপস, তুমি  
হয়ত ক্লান্ত হ'য়েছ পথের প্রমে—  
এখানে ক্ষণেক বিশ্রাম নিয়ে ফের  
নব যাত্রায় যেরো পূর্ণোদ্যমে॥  
বহু নাম লেখা উড়ছে উত্তরীয়  
এই নামাবলী যোগ্য অঙ্গবাস,  
সংকেতে বৃক্ষ লিখিয়াছ সংক্ষেপে  
শত শহীদের আত্মার ইতিহাস॥  
স্মৃতি-লেখা যেন না হয় তাদের নাম  
এ-তারিখ যেন হয় না জলের লেখা।  
পনেরই, তুমি পাথরে খোদাই করো—  
মুক্ত-দিনের আলো এনেছিলে একা॥  
শোনো অর্থনা, চৌদিকে কান পাতি'  
দিকে দিকে ওই বাজছে ধ্বনি মাঠেঃ!  
শূভদিনে তাই করি অভ্যর্থনা—  
এসো হে অগস্তা, এসো অগস্ত,  
এসো এসো পনেরই॥

# জানে নবভারতের জনতা

অমরেন্দ্রকুমার সেন

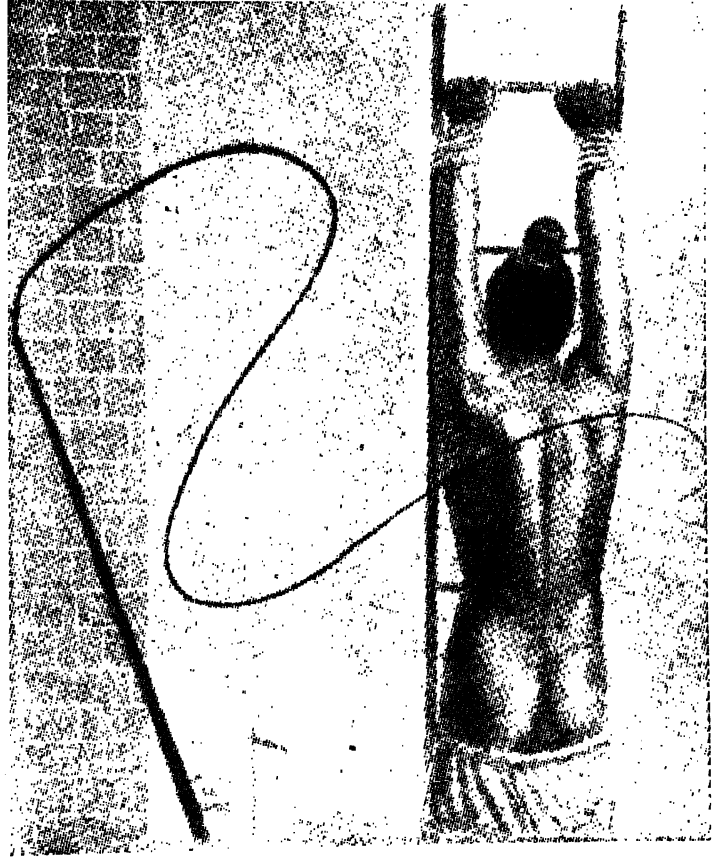
রবীন্দ্রনাথের যেদিন আশী বৎসর বয়স পূর্ণ হোলো, সেদিন তিনি লিখেছিলেন :

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কি লক্ষ্মীছাড়া শ্রমিকের আবর্জনা। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কি বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে।

সত্যি আজ সেই বলপদী ইংরেজ, এতদিন যে ভারতের স্বর্ণভূমিতে শিকার অন্তেষণে নিযুক্ত ছিল আজ তাকে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। আজ সেই শুষ্কপণ্ডিতেরই আমরা স্মরণ করছি যাদের তাঁর দেশপ্রেম বিদেশী শাসকদের ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য করছে। আমরা স্মরণ করব তাদেরই যারা দরিদ্র ভারতের সহস্রজনের মধ্যে মিশে আছে, সহজে যাদের খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু 'সহস্রজনের মধ্যে যিনি একজন' তাঁর অপেক্ষা এই সাধারণজনের দেশপ্রেম মোটেই কম নয়।

প্রথমেই মনে পড়ে সেই ভিখারি আর তার সংগীনিকে। একদা সমস্ত দিন প্রথর রাতে দরজায় দরজায় ঘুরে কিছূ চাল সংগ্রহ করে তারা মেঘনার তীরে দুটো ভাঙা ইটের উপর কাঠ জ্বালিয়ে হাঁড়ি চাপিয়েছে। চাল লাতে স্বেদ হয়, এবং স্বেদ হলে তরকারির পত্র যাতে মেটে সেজন্য হাঁড়িতে দিয়েছিল তারা মেঘনার লবণাক্ত জল। তখন লবণ ব্যাধ্যহর দিন। হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হলো ব্রিটিশ শাসনের প্রতীকরূপী অস্ত্রধারী সৈন্য। মেঘনার তীরে দূর থেকে হাঁড়ি ও বর্ণশিখা দেখেই তারা আইন অমান্যের মহাক্রম প্রমাণ অনুমান করে ব্যবহার করল অশ্রুশাস্ত। ব্রিটিশের দু'জন ক্ষীণতম শত্রুর শিবনাবাসন হোলো। আশ্রয়স্থলধারী স্বস্তির নবনবাস ত্যাগ করল।

ভারতের ইতিহাসে নাদির শাহ ও মুরলিগের সংগে স্যার মাইকেল ও'ডায়ার বা জেনারেল রোজিন্যান্ড ই এন্ড ডায়ারের নাম অমর হয়ে থাকবে। অমৃতসরে যাতে ব্রিটিশের অধিবেশন না বসতে পারে সেজন্য



অমৃতসর। "আমায় বেত মেরে কি মা ডুলাবি"

এই দু'জন ইংরাজ পুণ্ড্রব উঠে পড়ে লেগেছিলেন। কিচলু ও সতাপালকে গ্রেপ্তার করা হোলো। 'সহরবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে' ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলার দিকে যাত্রা করল, মুখে তাদের ধনি, কিচলু ও সতাপালকে ফিরিয়ে দাও। ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলা যেতে হলে পথে পড়ে লেভেল ক্রসিং, সেই ক্রসিং আর পার হতে হোলোনা, তার আগেই সাম্রাজ্যবাদীর আশ্রয়স্থল দু'জনের প্রাণ নিয়ে নিলে, জখম করলে বহুজনকে। জনতা যদিও ক্ষিপ্ত কিন্তু তারা ছিল নিরস্ত।

সেই ক্ষিপ্ত জনতা হয়ে উঠল আরও ক্ষিপ্ত, আরও উত্তেজিত। প্রতিশোধ স্বরূপ কয়েকজন

ইংরেজের প্রাণ তারা নিলে, ও অগ্নিসংযোগ করল কয়েকটি বাড়ীতে, ব্যাংকে, রেল-স্টেশনে। সেই উত্তেজনা ও মত্ততার মধ্যে মিস্ শেরউড নাম্নী একজন ইংরাজ সাইকেল আরোহণী কোথা থেকে এসে পড়লেন। সেই স্থানকে রাস্তা না বলে গাল বললেই ঠিক হয়, বিশৃঙ্খল জনতার চাপেই হোক অথবা কারও ধাক্কা লেগেই হোক মিস্ শেরউড সাইকেল থেকে পড়ে যান। পরদিনই অমৃতসরে সামরিক আইন জারী হোলো, আর জারী হোলো সাম্রাজ্য আইন। দিনের বেলায় দু'জনের বেশী লোক একত্র হওয়া নিষেধ হোলো, সভাসমিতি, শোভাযাত্রা তা' দূরের কথা। সম্মার পর সহরে

নিশ্চন্দ্রদীপ, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হতো। সে একদিন গেছে। শব্দ এইখানেই শেষ নয়। সন্দেহ হলোই পথচারীকে কশাঘাত করবার জন্য একটি মণ্ডও প্রস্তুত করা হয়েছিল, সে মণ্ডেরও সম্ভাবহারও করা হয়েছিল। তারপর সেই গলি, যে গলিতে মিস শেরউড সাইকেল থেকে পড়ে গিয়েছিলেন সেই গলি দিয়ে কোনো লোককে দু'পায়ে হাটতে দেওয়া হয়নি, বেয়নেটের নীচে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল।

তারপর ঘটল জালিয়ানওয়ালাবাগের বলিদান। সেদিন ১৩ই এপ্রিল দলে দলে নিরস্ত্র নরনারী সামরিক আইন ভঙ্গ করে তিনদিক উঁচু পাচীল ঘেরা জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত হয়েছে। নিস্ত্রান্ত হ'বার মাত্র একটি পথ। হঠাৎ সেই একটিমাত্র পথ রোধ করে দাঁড়াল সেনাপতি ডায়ারের সৈন্যদল। কয়েক দল সৈন্য সুবিধামতো স্থান দখল করে পিঞ্জরে আবদ্ধ হাত পা বাঁধা প্রাণীর ন্যায় সেই নরনারীর ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী বর্ষণ করতে লাগল। রোম সম্রাট নিরো হয়ত নগরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পালাবার পথও ছিল অনেক, কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগে সে পথও ছিল রুদ্ধ। বিশ হাজার লোকের ওপর ষোলো শত ঝাঁক গুলী বর্ষণ করা হয়েছিল। গুলী ফড়িয়ে যাওয়ায় আর গুলী বিঁধত হ'তে পারেনি এইটাই সেনাপতি ডায়ারের আক্ষেপ রয়ে গিয়েছিল। সরকারী হিসেবে চারি শত জন মারা গিয়েছিল আর আহত হয়েছিল এক থেকে দুই হাজারের মধ্যে। অগ্নিবর্ষণের পর মৃত ও আহতদের সমস্ত রাত্রি সেই জায়গাতে ফেলে রাখা হয়েছিল, চিকিৎসা দূরের কথা এক বিশুদ্ধ জল দেওয়া হয়নি। জালিয়ানওয়ালাবাগের এই ঘটনা রক্তাক্ত করে লেখা আছে



মন্ডতরে সোনার বাংলা

জাতির ইতিহাসে, এই ঘটনা জাতিকে করেছে সুসংবদ্ধ, জুগিয়ে এসেছে প্রেরণা, অন্তরে দিয়েছে নিভীকতা। জালিয়ানওয়ালাবাগ তাই আমাদের তীর্থভূমি। জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই শত শত শহীদেব আত্মত্যাগ স্বাধীনতা যুদ্ধের শ্রেষ্ঠতম সোপান।

মনে পড়ে কনকলতা বড়ুয়ার কথা। ভারতের অপর প্রান্ত আসামের দরং জেলার তার বাড়ী। অহিংস সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়ে আত্মোৎসর্গের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত কনকলতা স্থাপন করে গেছে। কতই বা ছিল বয়স তার, মাত্র পনেরো। তার বিবাহেরও ঠিক হয়েছিল, এতদিনে সে হয়ত স্বামীপুত্র নিয়ে সুখেই সংসার করত, কিন্তু দেশমাতার আহ্বান যে তার চেয়েও বড়। দেশ জেগে উঠেছে, কনকও জেগে উঠেছে, তার গায়ে লেগেছে স্বাধীনতার হাওয়া।

২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২। দরং জেলার

গোপূরের পচিশত লোকের এক দল থানা দখল করবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল, পুরোভাগে তিননগা ঝাণ্ডা হাতে নিয়েছিল কিশোরী কনকলতা। থানার দরজায় শোভাযাত্রা উপস্থিত হতেই পথরোধ করে দাঁড়াল থানার দারোগা রেবতীমোহন সোম। কনকলতা দাবী করল থানা জনসাধারণের, থানার কর্মচারীরা সাধারণের ভৃত্য; তারা যেন থানা জনসাধারণের হাতে সমর্পণ করে নচেৎ কনকলতা জনতাকে থানা অধিকার করতে আদেশ করবে। বর্মী ত্যাগ করে ব্রিটিশ সিংহ ভারতের প্রান্তে পালিয়ে এসে তখন দম নিচ্ছে; সেই ব্রিটিশেরই প্রতিনিধি রেবতীমোহন সোমের কাছে কনকলতার কথা অসহ্য মনে হোলো। সে জবাব দিলে কনকলতা যেন এরূপ আদেশ তার জীবনের বিনিময়েই দেয়।

নিভীক কনকলতা! অনুপ্রাণিত দেশ-সেবিকাকে সামান্য একটা বুলেটকে কি ভয় করলে চল!

মা গো যায় যেন জীবন চলে,  
শব্দ জগৎ-মাঝে তোমার কাজে  
'বন্দে মাতরম' বলে।  
আমার যায় যেন জীবন চলে।

দারোগাকে তার কর্তব্য সম্পন্ন করতে অনুরোধ করে কনকলতা তার সংগীদের নিয়ে অগ্রসর হোলো। এক পায়ে বশী দু'পা অগ্রসর হতে হোলো না, আসামের কপালে জয়ন্তিলক অঙ্কিত করে কনকলতা মাটিতে লাটিয়ে পড়ল। কনকের হাত থেকে পতাকা তুলে নিল। মৃকুন্দ, কিন্তু সেও দেশমাতৃকার চরণে আত্মোৎসর্গ করল। তারপর চলল জনতার ওপর পাশব গুলীচালনা, যে জনতা তখন পাঁচ হাজারের সীমা অতিক্রম করেছে। তাদেরই মধ্যে একজন কিন্তু থানার ওপরে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিল।



“কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কি লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবজ্ঞানকে।”



সোণার বাংলা

বাঙলার পশ্চিম প্রান্তে মেদিনীপুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেশ, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসনালের দেশ। বিদ্যাসাগর ও দেশপ্রাণ যে যোগ্য দেশে জন্মেছিলেন, মেদিনীপুর-বাসীরা বহুবার তার প্রমাণ দিয়েছে।

১৯৪২-এর আগস্টের জনজাগরণ। ব্যবস্থা অনুযায়ী পাঁচটি শোভাযাত্রার দল তমলুক থানা দখল করবার জন্য পাঁচ দিক থেকে থানার দিকে যাত্রা করল। 'মুন্সু লাঠি চার্জ' শোভাযাত্রাকারীদের রোধ করতে পারল না তখন মুন্সু হোলো বুলেট-বর্ষা। কয়েকজন কিন্তু বুলেট উপেক্ষা করেও থানার দিকে ধাবমান হোলো। তাদেরই মধ্যে একজন রামচন্দ্র বেরা হয়ত বুলেটে আহত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। তার পা ধরে টানতে টানতে তাকে থানার সামনেই, বায়রে, বোধ হয় মৃত মনে করে ফেলে দিয়ে আসা হোলো। ক্ষণিকের জন্য রামচন্দ্রের স্তন ফিরে এসেছিল, কোনো রকমে সে তার আহত রক্তাঙ্গুত দেহ টানতে টানতে থানার ফটক পর্যন্ত উপস্থিত হোলো, তারপর যেন জয়ের আনন্দে তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ক্ষণস্থবরে দ্রুত নিশ্বাস পতনের সঙ্গে উত্তেজিত কণ্ঠে রামচন্দ্র বলে উঠল "ভাই সব থানা দখল করেছি।" সেই তার শেষ কথা।

তমলুকে মাতিগনী হাজরাকে সবাই বলত "গান্ধী বড়ি।" ৭৩ বৎসরের এই বৃদ্ধার দেশমাতার চরণে আত্মোৎসর্গ জাতির ইতিহাসে গৌরবজনক। হাতে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে গান্ধী বড়ি থানার দিকে এগিয়ে চলেছে। হাতে বন্দুক নিয়ে দাঁড়াল,—বলতে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়; ভারতীয় সৈনিকেরা। তারা গান্ধী বড়িকে অগ্রসর হ'তে নিষেধ করল, কিন্তু যে নিষেধ করছে সে জানে না কাকে কি নিষেধ করছে আর কেনই বা নিষেধ করছে। গান্ধী বড়ি থামে না, সে এগিয়ে চলে। গান্ধী বড়ির দু'হাতে দুটি বুলেট বিদ্ধ হয়, তবু পতাকা পড়ে না, নিজের দেহের সঙ্গে প্রাণপণ শক্তিতে ঝড়ের মধ্যে শিশুর মতো সে পতাকা ধুড় চেপে ধরে। তবুও গান্ধী বড়ি থামে না, ভারতীয় সৈন্যদের দেশের শত্রুতা করতে নিষেধ করতে করতে সে অগ্রসর হয়, কিন্তু বন্দুক আরও বুলেট

আছে। তৃতীয় বুলেট গান্ধী বড়ির কপালে জয় টিকার মতো বিদ্ধ হয়। গান্ধী বড়ি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে; "করেংগা ইয়া মরেংগা" এই মন্ত্র পালন করল সেই বৃদ্ধা। পতাকা কিন্তু সে ছাড়েনি। আবার বলতে লজ্জা হয়, যখন ভারতেরই প্রতিবেশী দেশে আর একদল ভারতীয় বাহিনী গান করছে: কৌমী তিরংগে ঝুণ্ডে উঠে রহা জহামে



সাতারায় বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি

হো তেরী সর্ বুলন্দী জ্যো চাঁদ আসমামে তখন আর একজন ভারতীয় সৈন্যের বুলেট আঘাতে গান্ধী বড়ির শিথিল অঙ্গ থেকে জাতীয় পতাকাকে ফেলতে হয়। মাতিগনী হাজরা আমাদের নমস।

মেদিনীপুরে যেমন "তান্ত্রালিঙ্গ জাতীয় সরকার" প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই রকম বীর শিবজীর দেশ সাতারায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পত্নী সরকার। এই স্বাধীন সরকার যারা চালাতো তারা ছিল সাধারণ ব্যক্তি; নানা পাতিল, কিসান বীর, পাণ্ডু মাস্টার; কিন্তু দেশের সেবা করবার তাঁর আকাংক্ষা তাদের গুরুভার সম্পন্ন করবার উপযুক্ত করে তুলেছিল। সাতারায় পত্নী সরকার চলছিল তিন বৎসর।

মনে পড়ে দিল্লীর সত্যবতী দেবীর কথা, গৃহস্থের কুলবধ, দুর্গি সন্তানের জননী। সত্যবতী একদা দিল্লীর ম্যাজিস্ট্রেটকে বলে- ছিলেন, ঘরে আছে তাঁর স্বামী, আছে তাঁর সন্তানোরা, তাদের প্রতিও তাঁর কর্তব্য আছে, কিন্তু দেশ মাতার প্রতি কর্তব্য কি সে কর্তব্য অপেক্ষা বড় নয়? এ কথা বলার জন্য সত্যবতীকে কোনো ধনী ব্যক্তির পত্নী অথবা দেশ নেতার ভণী হতে হয় না, তার জন্য বিখ্যাত সাময়িক পত্রে বিশেষ প্রবন্ধ লিখতেও হয় না। তিনি মানুষের মতই কথা বলেছেন, তাঁর দেশপ্রেম কারও অপেক্ষা কম নয়।

আর মনে পড়ে সেই ছেলেগুলিকে, যারা "সামান্য একটা দড়িকে ভয়" পায়নি, যারা ফাঁসির মণ্ডে জীবনের জয় গান গেয়ে গেছে।

যারা সেই মৃত্তির গান গাইত :

হা হা হা পায়রে হাসি

ভগবান পরবে ফাঁসি

সর্বনাশী শিখার এ হীন তথ্য কে রে?

ডাকে ঐ কাল বোশেখী

কাটাঁবি কাল বসে কি

দে রে দে ভীম কারার ঐ ভিস্তি নাড়ি।

লাথি মার ভাঙরে তাল

যত সব বন্দীশালা

আগুন জ্বালা আগুন জ্বালা ফেল উপাড়ি। কোথায় আমাদের ক্ষুদ্রিরাম, গোপীনাথ, দীনেশ, যতীন দাসের দল, যারা তাদের ক্ষয়হীন প্রাণ নিঃশেষে দান করল। হতে পারে তাদের পথ ছিল ভিন্ন কিন্তু মত কি পৃথক। তারা কি গাইত না?

ঐ গগণায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর!

উঠিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া

পুনর্বীর॥

আর ভুলতে পারি না তাদের, সেই সব লক্ষ লক্ষ অসহায়দের যারা পণ্ডাশের মস্তকতরে ক্ষণ হতে ক্ষণিকতর হতে হতে একদিন বাঙলার বন্দ্য-মাটির সঙ্গে মিশে গেল। সে কি করুণ দৃশ্য, হাহাকার, ক্রন্দন আর বাথিত নিশ্বাস। "মাগো একটু ফ্যান দাও গো!"

ক্ষুধার্ত কুকুরের কাছ থেকে ডাক্তারিন থেকে কুড়িয়ে নেওয়া উজ্জিষ্ট খাদ্য সব্বয়ে রক্ষারত কংকালসার ক্রন্দনরত বালকটিকে যেমন আমরা ভুলতে পারি না তেমনি ভুলতে পারি না সেই লোকটিকে, চালের ব্যবসায় বড়লোক হয়ে মোটর হাঁকিয়ে আজ যে দেশনেতা হয়েছে। আর মস্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

তাই যত্ন করে প্রণাম করি সেই মহাত্মাকে যিনি বলেন স্বরাজ এখনও বহু দূরে, সবারমতীও আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে; নোয়াখালি হয়েছে নিকটতর।

# ডিমোক্রেসি বনাম ডিপ্লোমাসি

## শ্রীমতী সুনীতা ঘোষ

“জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটো তারে  
জীবন-বাণী ঠিক সরুে তাই বাজে না রে।”  
—রবীন্দ্রনাথ

গণতন্ত্র বা ডিমোক্রেসির আবহাওয়ায় আধুনিক যে যুগ ভরপুর, সেই যুগবাতীর বিরুদ্ধপন্থী যারা আছেন, তাঁরা এখনও নিস্তেজ হননি, তাঁদের কটনৈতিক চালচলনের ফলে মানুষের জীবনে যে অসহ্য গ্লানি ও বিভীষিকা এনেছে, তার নিরাময়ের আশা আজও সুদূরপরাহত, এই পরিস্থিতির মধ্যে আমরা ভারতবাসী—স্বাধীনতার প্রথম সোপানে উপনীত হয়েছি।

অকস্পেতেই যারা ভেঙে পড়েন, তাঁরা বলছেন, এটা নিয়তির নির্মম পরিহাস, স্বাধীনতার নামে অতান্ত হৃদয়হীন একটা প্রবণতা মাত্র! অপরদিক হতে শোনা যায় উষ্ণ বাণী—স্বাধীনতার কি এইটেই হোলো উচিত মূল্য যে, দেশ থেকে অল্পবস্ত্রসম্ভার বিলোপ পাবে, প্রতিকারহীন অকথ্য অত্যাচারে দেশবাসী পরস্পরকে পীড়িত করে তুলবে, বহু শতাব্দীর প্রতিবেশী পরস্পরকে সম্পূর্ণভাবে বিজাতীয় ও বৈদেশিক মেনে নিয়ে করাল ভেদনৈতির প্রাবল্যে স্বদেশের সর্বনাশ সাধন সহজতর করে দেবে?

অধিকতর অসহিষ্ণুর দল চাঁকাকর করেন—বন্ধ করো এই ভণ্ডামি, ডিমোক্রেসির নামে এই বাঁচভার! মূখে আউড়াচ্ছে বিশ্বপ্রেমের বদলি, আর কাজের বেলায় চোরকেও কচ্ছে! পুরোদস্তুর সাহায্য, আবার ন্যাকা সেজে গেরস্তকেও সজাগ রাখতে চেষ্টা কচ্ছে! এটা যা কচ্ছে তোমরা, তা ডিপ্লোমাসি হতে পারে, ডিমোক্রেসি আদৌ নয়।

নানাপ্রকার খণ্ডসত্যাপ্রিত কলহমুখর কলরোলে শান্তবর্ধন স্বদেশসেবী আজ বিরত, ক্রিকেত-কাবিরূপ হয়ে পড়েছেন। সেইজন্যে স্বাধীনতার অগ্রদূত হয়ে যারা মৃত্যুপথে জাতিকে আহ্বান করার ভার নিয়েছেন, তাঁদের সেবারত ব্যাহত হচ্ছে প্রতিদিন, প্রতি পদক্ষেপেই। আজ বাঙালীর যোর দুর্দিন।

বাস্তবিকই, তেতাঙ্গিশের মন্বন্তরের পর থেকে এদেশে একটানা দুর্গতির অভাবনীয় উৎপাত শূন্য হয়েছে। রক্ষক সেজে যারা ডাক্তর হয়েছিলেন, এতদিন তাঁদের জারিজুদারী

ভেঙে দেশ থেকে তাঁদের প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি সমূলে উৎখাত কর্তে আমরা, কংগ্রেসের নেতৃত্বে, প্রায় শতবর্ষব্যাপী সাধনা করেছি। আজ, বিগত মহাযুদ্ধের অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় আমাদের জাতীয় মূর্তি প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে সফল হওয়ার নিদর্শন আমরা পেয়েছি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর সমূহ পরাজয়ে। পরাধীনতার শৃঙ্খল আমরা ভেঙেছি। কিন্তু রাজনৈতিক লাভের সমস্ত আনন্দ, সমস্ত সুবিধার সুত্র ছিন্নাভিন্নপ্রায় হয়েছে ব্রিটিশ ডিপ্লোমাসির কূটচক্রান্তে। স্বাধীনতা লাভের আগেই বেধে গেছে অন্তর্কলহ, যার দুর্নিবার কাল পরিণাম গৃহযুদ্ধে পরিণত হতে চলেছে। ছাড়তে হয়েছে আমাদের অখণ্ড ভারতে পূর্ণ স্বরাজের আদর্শ, ভুলতে হচ্ছে আমাদের ভারতের সুমহান সমাজ ঐতিহ্যের অভেদাত্মক সাম্য-মৈত্রীর অমোঘ আদর্শ, পরতে হচ্ছে আমাদের শতাব্দিক হীনতার দাসত্ব-শৃঙ্খল যার ফলে আত্মঘাতী জীবাংসায় আত্মাহুতি আমাদের অনিবার্য হয়ে উঠেছে। সত্যি, বাঙালার আজ বড় দুর্দিন!

শ্রীমারকুম্ভ পরমহংস বলেছিলেন, যত মত—তত পথ। এই-ই হোল ডিমোক্রেসির মর্মকথা, ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের গুঢ় ইঙ্গিত। যে ভারতের নিজস্ব বিরাট সভ্যতা চিরদিন বৈচিত্র্যের সহস্রমুখী বিস্তারে কদাপি বাধা দেয়নি, অথচ বহু বিভিন্নতার বিপরীত সংঘাতকে সংযত করে গড়ে তুলেছিল সামাজিক সমগ্রতার অপূর্ণ নিদর্শনাত্মক ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি, যে ভারতে চিরদিন শতাব্দীর পর শতাব্দী ঘোষিত হয়েছে মানব-বন্ধন-মুক্তির মহামন্ত্র, যে ভারত মানবতার প্রকৃষ্ট উৎকর্ষসাধনে জগন্মুক্তির স্থান-পরিচয় বিশ্বলোকে প্রকট করেছে, আজ সেই ভারত হয়েছে মানব সংস্কৃতি-ধ্বংসী কূটচক্রান্তের অবাধ লীলাক্ষেত্র। ব্রিটিশ বণিকের রাজদণ্ড ও মানদণ্ড হয়তো আমরা ভেঙেছি বটে, কিন্তু তার ফলে বাঙলা, তথা ভারত বিভাগের অনায়াস অপচেষ্টাপ্রসূত আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এই বীভৎস বর্বরতা, এই নশন পৈশাচিকতাই কি আমাদের অনতিলম্বনীয় অদৃষ্টরূপে জাতীয় উন্নতির সমস্ত আশা, মানুষের সহজ সামাজিক জীবনের অনাবিল নিরাপত্তা, রাষ্ট্রবাসীর প্রথমাধিকার—

সুদৃঢ় সহায়-সুযোগের ব্যবস্থা, এ সমস্তই মায়া-মরীচিকার মতো আমাদের পক্ষে পীড়াদায়ক ছলনামাত্র হয়ে থাকবে?

আজ, জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার আদি দিবসে, যারা স্বভাবত উপরোক্ত প্রকারের নৈরাশ্যমূলক সম্প্রদায়ের প্রভাবে প্রত্যক্ষভাবে আনন্দয়োজনে যোগদান কর্তে কুণ্ঠিত আছেন—প্রধানত তাঁদেরই উদ্দেশ্য করে আমাদের বিনীত নিবেদনের সূচনা। বাঙালার দূরবস্থা দুর্দশার আশ্রয় প্রতিকার সহজ সম্ভাবনার বিহীন হলেও—কিন্তু, হয়েছে বলেই, আমাদের বাঙালার প্রতি বাঙালীর কর্তব্য সম্পর্কে অধিকতর সজাগ হতে হবে না কি? সর্দার বলভভাই প্যাটেল বলেছেন—“সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাঙলা থেকেই উৎপন্ন হয়ে সমস্ত ভারতবর্ষ গ্রাস করেছে, সুতরাং এই সমস্যার সমাধান-সূচনা বাঙলা থেকেই হওয়া উচিত।” সর্দার প্যাটেল আরও দিয়েছেন এই উৎসাহ-বাণী: “বাঙালার কংগ্রেসকর্মীদল যদি সাহস, বিচক্ষণতা ও ঐক্য বজায় রেখে অগ্রসর হন, অতি শীঘ্রই সম্ভবত অকল্পিত আকস্মিকভাবেই—বাঙালার অখণ্ড ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং ঐক্যের পথে ভারতবর্ষকে বাঙলাই আবার চালিত করবে।” সর্দার প্যাটেলের এই উত্তম অলীক আকাশকুসুম বলে উপেক্ষা করা সত্যি যুক্তিবদ্ধ হবে কি?

নৈরাশ্যের সর্বনাশা প্রভাব আজ নষ্ট করবার দিন। কেননা, স্বাধীনতার প্রথম প্রকাশে সে সহজ উৎসাহ-উদ্দীপনার স্রোতে জাতীয় শক্তিকে সবলতর করে তোলে, তার স্বাভাবিক বিকাশে বাধা দেওয়া দেশশত্রুর মিত্রতাসাধন ছাড়া আর কিছই হতে পারে না। এটা আমাদের মনে রাখা উচিত। আজকের দিনে নৈরাশ্যবাদ ব্রিটিশ ডিপ্লোমাসিরই অধিকতর সহায়ক হবে, জাতি-মুক্তি-প্রচেষ্টায় যারা নিঃস্বার্থভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণে উদ্যত তাঁদের কর্মোদ্যমে এরূপ বাধা-সৃষ্টিতে সমগ্র দেশের ও দেশের অকল্যাণসাধনই করা হবে।

আজ, ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭—বাঙালীর উদ্বোধনের দিন। সমাজশত্রুর অবাধ প্রতিক্রিয়ামূলে আমাদের মূর্তি-প্রচেষ্টার বিপরীত বিভীষিকায় পরিণতির জন্য দায়ী যুদ্ধোত্তর ভারতের সমাজ-শক্তির সমূহ বিনাশ। কি গ্রাম্য, কি নাগরিক, সাধারণ গৃহস্থের জীবন ও জীবিকা সংকটাপন্ন করে হিংস্র অরাজকতার যে সমস্ত অগ্রদূত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সর্বৈব ক্ষেত্রে আত্মপ্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ ও সুবিধা পেয়েছিল, ক্রমশঃ তারা ক্ষীণতাজা হয়ে পড়েছে লোকমতের বিপরীত সংগঠনে। এই বর্ধিষ্ণু লোকশক্তির কেন্দ্রক অভিব্যক্তি যাতে সমগ্র ভারতের এক-জাতীয়তার

প্রতীক নিখিল ভারত জাতীয় মহাসম্মেলন (কংগ্রেস) প্রতিষ্ঠানটিকে অবলম্বন করে প্রসার ও প্রসিদ্ধি লাভ না করতে পারে, তারই বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব তদুই শতাব্দী-ব্যাপী অক্লান্ত প্রচেষ্টালাভ করছে এবং কুট রাজনৈতিক ডিমোক্রাসির ফলেই আজ আমাদের বাঙলাদেশে এসেছে 'পার্টিসন' আর 'পাকিস্থান'। এই সত্য সমুদ্রভাষে উপলব্ধি করে আজ আমাদের কর্তব্য নির্ধারণের দিন।

"গাছে না উঠতেই এক কাঁদি" বলে যে প্রাবাদিক রসলাপ সচরাচর প্রচলিত আছে, স্বাধীনতা লাভ সম্বন্ধে বহু গগনমান্য প্রাধিকারপদের অক্কেল ও বাবহারে সে কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। স্বাধীনতার প্রত্যন্তমাত্র যখন অক্ষত হয়েছে, তখন স্বাধীনতার পূর্ণ সত্তার সঙ্গে তার হয়তো অপরিসীম ব্যবধান থাকা অসম্ভব নয়, একথা আজ আমাদের হৃদয়ঙ্গম করবার দিন। ব্রিটিশ ডিমোক্রাসি জিনিসটা 'কপূ'রের মতো উবে গিয়ে ডিমোক্রাসির ফলসুস্কৃতি সমাজ-সমৃদ্ধি বাগবাজারের রসগোল্লার মতো হাতে হাতে নগদা বিল-ব্যবস্থার প্রত্যাশা যারা রাজশাস্তির স্বদেশী ওয়ারিসানদের কাছে প্রত্যাশা করেছিলেন, দেশের ও দেশের মূল্য-সামর্থ্যের সহায়ক তাঁরা নয়। কেননা, কার্যবিধির সঙ্গে লোকের চিন্তাধারার আনুষ্ঠানিক পারস্পর্য রক্ষার দিকে মনোনিবেশ না করে কেবলমাত্র "সাম্যবাদ", "গণতন্ত্রবাদ", "জিহাদবাদ" প্রভৃতি হরেকরকম বাদানুবাদের প্ররোচনায় সমাজের বর্তমান দুর্গতি আর বিশৃঙ্খলা তাঁদেরই কৃতকর্মের সহজাতর ও সম্ভবপর হয়েছে বেশী।

অবশ্য, একথা আমাদের ঘোষণা করা কদাপি উদ্দেশ্য নয় যে, যা হয়েছে সেইটেই সর্বতোভাবে মনঃপূত স্বীকার করে নিতে হবে। সে রকম পরিস্থিতি থেকে আমরা অতি নির্মম-ভাবেই বঞ্চিত হয়েছি, একথা সর্বজন-স্বীকৃত। কিন্তু আমাদের মনোমালিন্য ও কর্মপথের বিপরীতগামী অসামঞ্জস্যের কোন ছিদ্রপথে সর্বনাশা দেশধ্বংসী চক্রান্ত কৌশল সাক্ষ্যতার সাফল্যলাভের সহজ সুযোগ পেয়েছে, সে কথাই আমাদের সুগভীরভাবে বিচার করবার দিন আজ এসেছে।

মনে পড়ে, ফরিদপুর কংগ্রেসে দেশবন্ধুর বক্তৃতার প্রারম্ভিক প্রশ্নঃ "যুগে যুগে ভারতবর্ষ জিজ্ঞাসা করিয়াছে, মুক্তি কোন পথে?" আজ আমরা "স্বাধীন" হয়েও মুক্তিলাভ যে কত পারিনি তার কৈফিয়ৎ কে দিবে? দেশবন্ধুর মহা-প্রয়াণের বিশ বৎসর পরে আজ কি আমরা সেইসব দেশাত্মবোধী মহামানব, যারা জাতি-মুক্তির জন্য অকাতরে আত্মত্যাগ করেছেন, তাঁদের পদ্যাম্বুতির কাছে আমাদের শোচনীয় অক্ষমতার কৈফিয়ৎ শুদ্ধ গান্ধীবাদ

বা জিহাদবাদ বা ব্রিটিশের বিশ্বাসঘাতকতার ফাঁকির দোহাই দিয়ে আত্মপ্রত্যাশা করব? জাতীয় সংগ্রামের প্রায় সত্তাত্তম বর্ষে এখনও আমরা ডিমোক্রাসির মোহপাশ কাটিয়ে স্বদেশকে ডিমোক্রাসির সুদৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত কত পারিনি, আমাদের এই শোচনীয় বিফলতার আশু প্রতিকারকল্পে সর্বমানবকল্যাণপ্রসূ সুচিন্তিত কার্যবিধির পরিকল্পনা নিয়ে অটল সংকল্পে স্বাধীনতার মূর্তি বিকাশ সম্ভাবনার আয়োজনানুষ্ঠানের আজই তো তার পূর্ণাতিথি। যুগান্তরের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমাদের আজই আবার আহ্বান এসেছে—

"এসো গ্রাহ্য শূচি করি" মন

ধরো হাত সবাকার—

এসো হে পতিত হোক অপনীত

সব অপমানভার।

মার অভিক্ষেপ এসো এসো স্বরা—

মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা

সবার পরশে পবিত্র করা

তীর্থ নীরে

আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

আজই—এতদিনের ভুল-ভ্রান্তি সত্ত্বেও আমরা সুযোগ পেয়েছি আমাদের জাতীয় কলঙ্ক ধুয়ে মুছে দেবার, যার জন্য ধর্মানিত হয়েছিল বিশ্বকবির মর্মান্তিক আক্ষেপোক্তি—

"সাত কোটি সন্তানের হে মুখ জননী,  
রেখেছো বাঙালী করে, মানুষ করোনি"

মানুষের জগতে আমাদের স্বাধীনতার প্রথম প্রভাত আমরা মানুষের মতো সগর্ব্ব, আত্মশক্তি-বিশ্বাসের পরিপূর্ণ উৎফুল্লতার বরণ করে—আসুন, আমরা জাতিধর্ম্মনিবিশেষে সকলে একত্র হয়ে স্বদেশসেবার পূণ্যরত একত্রে গ্রহণ করি, আমাদের অবিস্মৃত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস-বাণী আবার ধর্মানিত হোক—

বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা

বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা

সত্য হউক সত্য হউক

সত্য হউক হে ভগবান॥

বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন

বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন

এক হউক এক হউক

এক হউক হে ভগবান॥

## শহিদগণের গুণ্য স্মরণে



# ছ ল ন ল র তাল মিছরি

প্রস্তুতকারক—

## শ্রীদুলালচন্দ্র ভট্ট

৩নং বারানসী ঘোষ স্ট্রীট,  
কলিকাতা।



# স্বাধীনতা প্রেরণায় বঙ্গভাষা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

১ ৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে এদেশে ইংরেজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার আরম্ভ। গ্রাহার একশত বৎসর পরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে 'সপাহী' বিদ্রোহ। আর তাহার পরে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা; আর তদবধি মহিবরাম সংগ্রামের ফলে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট স্বাধীনতা স্বীকারের প্রথম সোপান হিসাবে ইংরেজের এদেশে ডোমিনিয়ন শাসন প্রবর্তন। আজ যখন আমরা "জাতীয় পতাকা" উত্তীর্ণ করিতেছি, তখন একবার এই স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গভাষার প্রেরণা কিরূপ কার্যকরী হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া "মাতৃসম মাতৃভাষার" উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলে তাহা প্রসঙ্গত হইবে না।

বাঙলাই সর্বপ্রথমে ইংরেজী শিক্ষালাভ করিয়াছিল এবং ইংরেজী দীক্ষাও গ্রহণ করিয়াছিল। বাঙলায় ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তির দীনবন্ধুর নিমিচাদের মত ইংরেজীতে স্বপ্ন দেখিয়া জন্ম সার্থক করিবার কল্পনাও করিয়াছিল। অনেকে বেশে, বাসে উদ্ভাহে ইংরেজ সাজিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বিজেন্দ্রলাল তাহাদিগের বর্ণনা করিয়াছেনঃ—

"আমরা বিলাতী ধরণে হাসি,  
আমরা বিলাতী ধরণে কাসি,  
আমরা পা ফাঁক করে সিগারেট খেতে  
বড়ই ভালবাসি।"

যখন বাঙলায়ও এই দশা তখন দেশাত্মবোধ বাঙলা ভাষাতেই আপনার বিস্তার সাধন করিতেছিল। প্রথম ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেনঃ—

"(দেশ) বাংসল্য পরম ধর্ম, কিন্তু এ ধর্ম অনেকদিন হইতে বাঙলাদেশে ছিল না। কখনও ছিল কিনা, বলিতে পারি না। এখন ইহা সাধারণ হইতেছে দেখিয়া আনন্দ হয়। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে ইহা বড়ই বিরল ছিল। তখনকার লোক আপন আপন সমাজ, আপন আপন জাতি ও আপন আপন ধর্মকে ভালবাসিত, ইহা দেশ-বাংসল্যের ন্যায় নহে—অনেক নিকৃষ্ট। মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙলাদেশে দেশবাংসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশ-

বাংসল্য তাহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্বগামী। \* \* নিম্ন কয় ছত্র পদ্য ভরসা করি, সকল পাঠকই মুগ্ধ করিবেন—

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখে দেশবাসীগণে  
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।  
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,  
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

তখনকার লোকের কথা দূরে থাক, এখনকার কয়জন লোক ইহা বুঝে? এখনকার কয়জন লোক এখানে ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ?"

শতবর্ষ পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যখন পূর্বোন্মীত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তখন বাঙলা ভাষার আদর—যে স্তরকে আমরা নিম্নস্তর বলি অথচ যে স্তর হইতে সমাজের শক্তির উৎস উদ্ভূত হয়, সেই স্তরে, আর যে সম্প্রদায় ইংরেজীতে শিক্ষিত সেই সম্প্রদায়ের মহিলাদিগের মধ্যে।

সেইজন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া মনীষী অরবিন্দ বলিয়াছেন—বাঙলা সাহিত্য বাঙালী মহিলাদিগের পাঠ্য বলিয়া যাহারা মত প্রকাশ করেন, তাহারা ভ্রান্ত। কিন্তু দীর্ঘকাল যে বাঙলা বাঙালী মহিলাদিগের আদরই পাইয়াছে, সেজন্য সেই মহিলাদিগকে এবং যে বাঙালী লেখকগণ তাহাদিগেরও অতি স্বল্প-সংখ্যক পুস্তকের দ্বারা পঠিত ভাষায় রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাদিগকে বিশেষ প্রশংসাই করিতে হয়। তিনি লিখিয়াছেনঃ—

"All honour then to the women of Bengal, whose cultural appreciation kept Bengali literature alive! And all honour to the noble few who with only the women of Bengal and a small class of culturedmen to appreciate their efforts adhered to the language our forefathers spoke and did not sell themselves to the tongue of the foreigner!"

এই ঘটনার সহিত আয়ারল্যান্ডের ঘটনার সামঞ্জস্য অসাধারণ। যে জেমস কনোলীকে দেশপ্রেমের "অপরোধ" ইংরেজ মৃত্যুদণ্ড দিয়াছিল—তিনি লিখিয়াছেন, আইরিশরা যখন ইংরেজের প্রাধান্যে জর্জরিত, তখন যে সকল স্থানে রোমান ক্যাথলিক আইরিশদিগকে উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইত, সেই সকল স্থানেও প্রোটেষ্ট্যান্ট ধর্মমতাবলম্বী রাজ-

কর্মচারী ও সৈনিকরা আইরিশ বিবাহ করায় রোমান ক্যাথলিক আইরিশ নারীরা ছিলেন। তাহারা ইদিবাগে সন্তানদিগকে আয়ারল্যান্ডের কিস্কদন্তী ও রাটিকালে আইরিশ গান শুনাইয়া—ইচ্ছায় বা অন্য কারণে—সেই আইরিশ বিবেষদণ্ট পরিবেষ্টনে আইরিশ আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে সহায় হইয়াছিলেন। এইরূপে নীরবে যে প্রভাব উদ্ভূত হইয়াছিল, ঐতিহাসিকরা তাহার সম্মান রাখেন নাই বটে, কিন্তু তাহাও আইরিশদিগকে তাহাদিগের জন্মগত অধিকার লাভে সাহায্য করিয়াছিল।

যখন এদেশে ইংরেজী শিক্ষারই সমাদর, যখন বাঙালীরা মেকলের ভিত্তিহীন মত গ্রহণ করিতেছিলেন—প্রাচীন সাহিত্য তুচ্ছ ও উপেক্ষণীয়, যখন বাঙলায় "শিক্ষিত" ব্যক্তির "ইস্কক বিলাতী পণ্ডিত, নাগায়েৎ বিলাতী কুকুর", সকলেরই ভক্ত, তখনই কিন্তু সেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙলা সাহিত্যের দিক্‌পালদিগের আবির্ভাব।

দীনবন্ধু, রাজনারায়ণ, দেবেন্দ্রনাথ, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র—সেই সময়ে আবির্ভূত। আর বাঙলায় লোকশিক্ষার নানা পথ তখন প্রসারিত, যাত্রা, কথকতা, কীর্তন, রামায়ণ, মহাভারত এ সকলের তখন আদর। রাজনারায়ণ-বাবু লিখিয়াছেন—"কোন ইউরোপীয় গ্রন্থ-কর্তা বলেন যে, ইউরোপে যে কাজ বাইবেল, সংবাদপত্র ও সাধারণ পুস্তকাগার—এই তিনের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহা বঙ্গদেশে কেবল রামায়ণ ও মহাভারত দ্বারা সম্পাদিত হয়।"

রামায়ণ, মহাভারতের অনেক অংশ বাঙালী মহিলাদিগের কণ্ঠস্থ ছিল। দাশরথি রায়ের পাঁচালী, নীলকণ্ঠের যাত্রা—সর্বোপরি বৈষ্ণব পদাবলী বাঙলা সাহিত্যের গৌরব।

যখন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার বহুবর্ষ পূর্বে 'বঙ্গদর্শনের' "পদসূচনায়" বঙ্কিমচন্দ্র লিখেন,

"সমগ্র বাঙালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই।.....বাঙলায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙালী কখন বুঝিবে না, বা শুনবে না।"

বাঙালী শিক্ষিত ব্যক্তির অঙ্গপদিনেই বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, পরবশ্যতা দুঃখের আকর। সেইজন্য বাঙালী কবি ও বাঙালী লেখকরা মাতৃভাষাকেই দেশাত্মবোধের প্রচারকার্যে ব্যবহার করিতে থাকেন। বহুতাম্রে ইংরেজীতে "সাধা সূরে" "সাধা কথায়" যখন স্বাধীনতার উল্লেখও কল্পনাতীত ছিল, তখনই রংগলাল, আইরিশ কবি মুরের কবিতায় প্রেরণা লাভ করিয়া লিখিয়াছিলেনঃ—

“স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে,  
কে বাঁচিতে চায়?

দাসত্ব-শৃঙ্খল, বল, কে পরিবে পায় রে  
কে পরিবে পায়?”

দাসত্ব-শৃঙ্খল যে পদপহার নহে, তাহা যাঁহারা  
মনে বুঝিতে না পারেন, তাঁহারা কখন এইরূপ  
উক্তি করিতে পারেন না।

কংগ্রেসের কল্পনা হইবারও পূর্বে—  
১২৮৭ বঙ্গাব্দে ‘বঙ্গদর্শনে’ ‘আনন্দমঠ’—  
প্রকাশ আরম্ভ হয়। ঐ বৎসর যে অংশ  
প্রকাশিত হয়, তাহাতেই “বন্দেমাতরম্” ছিল।  
মহেন্দ্র যখন বলিলেন, “এ ত দেশ, এ ত মা  
নয়—” তখন যে “সন্তান” মাতৃমন্ত্র গান  
করিতেছিলেন তিনি বলিলেনঃ—

“আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্ম-  
ভূমিচ স্বর্গদীপ গরীয়সী।” আমরা বলি,  
জন্মভূমিই জননী; আমাদের মা নাই, বাপ  
নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই—স্রষ্টা নাই, পুত্র  
নাই, ঘর নাই বাড়ি নাই, আমাদের আছে কেবল  
সেই সুজলা সুফলা মলয়ঙ্গ সমীর্ণ শীতলা,  
শস্যশ্যামলা” মা।

কিন্তু মা তখন কি হইয়াছেন?—

“কালী—অন্ধকার সমাচ্ছন্ন কালিমায়ী।  
হৃৎসর্বস্বা এইজন্য নানিকা। আজ দেশের  
সর্বগ্রহী শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী।  
আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—  
হায় মা!”

কিন্তু এই অন্ধকার দূর করিতে হইবে—  
সন্তানের তাহাই সংকল্প। তখন মার দশভূজা  
প্রতিমা নবাবর্ণকরণে জ্যোতির্ময়ী হইয়া  
শোভা পাইবেন। তখন ভারতবাসী মার  
মন্দিরের রক্তবেদী ভক্তির গাণ্ডোদকে ধোত  
করিয়া, শ্রদ্ধার পুষ্পে মার পূজা করিবে,  
নিষ্ঠার পুষ্পপ্রদীপে মার আরাতি করিবে।  
মার মূর্তিঃ—

“দশভূজ দশদিকে প্রসারিত,—তাহাতে  
নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে  
শত্রু বিমর্দিত, পদাপ্রিত বীর কেশরী শত্রু-  
নিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্ভূজা—নানাপ্রহরণ-  
ধারণী শত্রুবিমর্দিনী—বীরেন্দ্রপুষ্টিবিহারিণী—  
দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যা-  
বিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপ কাকটিকের,  
কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।”

এই মার পূজার মন্ত্র বাঙালী লেখক  
বাঙালীর মাতৃভাষায় উচ্চারণ করিয়াছিলেন।  
সেই মন্ত্র মহারাষ্ট্রের লোকমান্য বালগাঙ্গাধর  
তিলক শ্রদ্ধাসহকারে ছত্রপতি শিবাজীর  
সমাধি-ভোরণে উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন।

‘বঙ্গদর্শন’ যে প্রচারবেদী ছিল, সেই  
প্রচারবেদী হইতে আচার্য বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার  
সহকর্মীরা দেশাত্মবোধই প্রচার করিয়াছিলেন—  
কখন উপন্যাসে, কখন ‘কমলাকান্ত’রূপে—

কখন বা ‘লোক-রহস্যে’—কখন রংগ-ব্যঙ্গ,  
কখন উদাত্ত কণ্ঠে।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে যখন ইংলণ্ডের যুবরাজ  
এডওয়ার্ড ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন  
বাঙালার একাধিক কবি সেই ঘটনা উপলক্ষে  
কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র  
লিখিয়াছিলেন—

“যখন নিরাখি নিমাদ্রি-শেখর;  
নিরাখি যখন নীল বিম্বাচল,  
পূর্ব কীর্তি, গীত, গৌরব আকর,  
শূন্য যবে স্বপ্নে হইয়া বিহ্বল;  
জাহ্নবী, যমুনা, নর্মদার মূখে—  
বিশ্রুতি কোটি জীব মৃত্যকার,  
দূর্বিশ্ব ভাব-বাজে যবে বৃকে  
তখনই জানি অস্তিত্ব আমার।

“ছিল অকোঁহণী অষ্টাদশ যার,  
আজি পরহস্তে আত্মরক্ষা তার;

অক্ষয় আছিল যার অস্তাগার,  
আজি অশ্রুমাশি মহাস্র তাহার।  
মহাকাব্য ‘মহাভারত’ যাহার  
মহা রংগভূমি ‘কুরুক্ষেত্র’ হইল!  
ভীষ্ম কৃষ্ণার্জুন অভিনেতৃ যার  
যুবরাজ! আজি সে জানি কোথায়?

“যাও, যুবরাজ! রাজপুতনায়  
বীর ইতিহাসে পরিপূর্ণ যার  
প্রতিপদ; যার প্রতিপদ হায়!  
কীর্তিস্তম্ভ কাক-সাগর বেলায়।  
এখনো চিত্তেরে স্মৃতির নয়নে—  
দেখিবে পশ্চিমী চিতার অনল;  
সেই স্মৃতি তব দয়াদ্র নয়নে  
আনিবে কি আহা! একবিন্দু জল?

“এ মহাশ্মশানে দাঁড়াবে কুমার,  
জিজ্ঞাসিবে যবে—এই রাজস্থান?



বাগানের মধ্যে যখন সুন্দর ভারতীয়  
গোলাপ ভোরবেলায় তাদের নতুন পাপড়ি-  
মেলা আশা নিয়ে ফুটে ওঠে—তখনই  
আপনার চিন্তাধারা ভিনোলিয়া হোয়াইট  
রোজের দিকে চলে যায়। কোমল, ফেনময়  
ভিনোলিয়া তার মিষ্ট সৌরভে আপনাকে  
মগ্নিত করে দেয়—এবং সবচেয়ে কোমল  
ত্বক ও তার যুহুস্পর্শে পরিষ্কার করে। আপনার  
সৌন্দর্যবৃদ্ধির পক্ষে এর চেয়ে ভাল ও  
চমৎকার নিজস্ব সাবান আর নেই।

# ভিনোলিয়া হোয়াইট সাবান

উপহাসচ্ছলে অদৃষ্ট দুর্বার  
করিবে উত্তর—এই রাজস্থান।  
যাও, যুবরাজ, নন্দার কূলে  
কবে প্রোতস্বভী কলকলস্বনে—  
পূর্বে মহারাজ বীরগুণাকুলে  
সম্মুখ সমরে মরিত কেমনে।

“মহারাজ জাতি—নিদ্রাতেও যার  
শিয়রে তুরঙ্গ কটিবন্ধে অসি;  
হ’ল অস্তমিত বিজয়ে যাহার  
অকালের বিশ্বাস ‘অর্ধশশী’;  
শেষ পাণিপথে, এসাই সমরে—  
স্বাধীনতা তরে মত্ত সিংহ প্রাঙ্গ  
ছুটিল যে জাতি প্রাণপণ করে  
যুবরাজ! আজি সে জাতি কোথায়।

“এক পদ আর;—সম্মুখে পাঞ্জাব,  
বীর প্রসবিনী—শিখের জননী,  
জালিয়ানওয়ালায় যাহার প্রভাব  
দেখিলা বৃটিশ-কেশরী আপনি”।

—ইত্যাদি

ইহা আক্ষেপোক্তি। কিন্তু ইহাতে  
স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের উল্লেখ নাই। কিন্তু  
এ উপলক্ষে হেমচন্দ্রের কবিতা—তাহারই  
উপযুক্ত—

“কি দেখিবে আর—আছে কি সৈদন  
ভ্রুভিঙ্গ করিয়া ছুটিত সৈদন  
ভারত-সন্তান নৈঋত ঈশান,  
মুখে জয়ধ্বনি, তুলিয়া নিশান—  
জাগায়ে মেদিনী গায়িত গান।”

কলঙ্কলাঙ্ঘিত জীবন দুর্বহ—

“পূর্বে সহচরী রোম যে আমার  
মগিয়া বাঁচিয়া উঠিল আবার,  
গ্রীসেরও দেখি, জীবন সপ্তার  
আমি কি একাই পড়িয়া রব?  
কি হেন পাতক করেছি তোমায়  
বল, অরে বিধি বলরে আমার  
চিরকাল এই ভগ্ন দণ্ড ধরি’  
চিরকাল এই ভগ্ন চূড়া পরি’  
দাস-মাতা বলি বিখ্যাত হ’ব!  
হা রোম, তুই বড় ভাগ্যবতী!  
করিল যখন বর্বরে দুর্গতি  
ছিন্ন কৈল তোর কীর্তিস্তম্ভ মত,  
করি’ ভগ্নশেষ রেণু-সমাবৃত  
দেউল, মন্দির, রঙ্গ-নাট্যশালা,  
গহ, হর্ম্য, পথ, সেতু, পরোনোলা—  
ধরা হতে যেন মুছিয়া দিল।  
মম ভাগ্যদোষে মম জেতুগণ  
কক্ষ, বক্ষ: ভালে পদাঙ্ক স্থাপন  
করিয়া আমার, দুর্গ, নিকেতন  
রাখিল মহীতে—কলঙ্কমণ্ডিত  
কাশী-গয়াক্ষেত্র চণ্ডাল-ঘণ্ডিত

(শরীরে কালিমা, দীনতা প্রতিমা)  
ধরণীর অঙ্গে যেন গাঁথল।

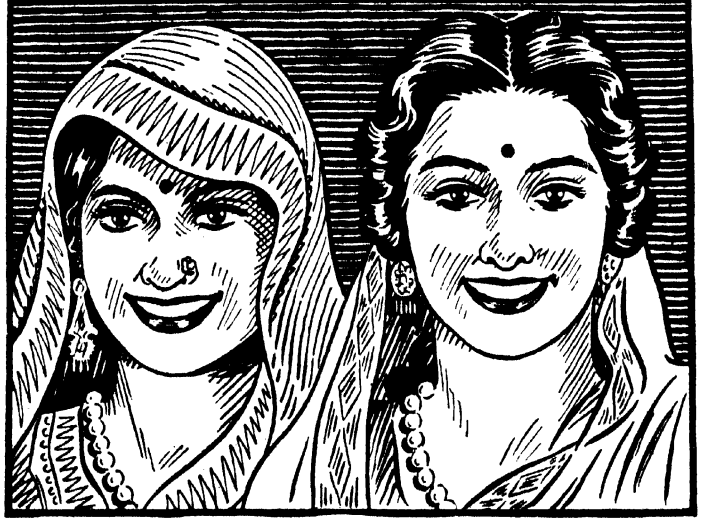
নাহি কি সলিল, হে যমুনে-গঙ্গে  
তোদের শরীরে—উথলিয়া বঙ্গে

কর অপসৃত এ কলঙ্করাশি  
তরণে তরণে অঙ্গ বঙ্গ গ্রাসি’  
ভারত-ভুবন ভাসাও জলে”

—ইত্যাদি

হেমচন্দ্র ‘ভারত-বিলাপে’ লিখিয়াছিলেন—

## সেকালে আর একালে



আপেক্ষার দিনে আমাদের পূর্বপুরুষেরা দাঁত পরিষ্কার রাখতেন অশ্বখ এবং মিমের দাতন ব্যবহার  
ক’রে এবং তার কলেই তাদের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও কখনো বিয় ফটি হতো না।

আধুনিক বিজ্ঞানের দান হিসেবে আজ আমরা পেয়েছি কলিনোস দাঁতের মাজন যা  
দাঁত পরিষ্কার করার কাজকে বহু অংশে সহজ এবং উপভোগ্য করে তুলেছে। কলিনোস-  
এর সক্রিয় কেসা যুগলকরের প্রত্যেক অংশে প্রবেশ ক’রে যেন তুচ্ছতার ভরা এক মনোজ্ঞ স্বাস্থ্য  
অবশিষ্ট রেখে যায় এবং তার কলেই শিথালে ছুটে ওঠে স্বাস্থ্যের লক্ষণবৃত্ত হুগতি।

# KOLYNOS

কলিনোস-এ দাঁতের মাজন—

ইচ্ছাশ্রমের উপর আর ইকি

পরিমাণ ব্যবহার করলেই চলে।



KI, 2 BEN. ৫

“ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই,  
গোরাগা দেখিলে ভুতলে লুটাই,  
ফুটিয়ে ফুকার কাঁদি বলিতে না পাই—  
এমান সদাই হৃদয়ে হাস।  
কি হ'বে বিলাপ করিলে এখন?  
স্বাধীনতা-ধন গিয়েছে যখন  
চোরে শিরোমাণি করেছে হরণ  
তখনি সে সাধ ঘুচে গিয়াছে;  
সাজে না এখন অভিলাষ করা,  
আমাদের কাজ শৃঙ্খল পায়ে ধরা;  
মস্তকে করিলে দাসত্বের ভরা  
ছুটিতে হইবে এদেরি পথে।”

কিন্তু ইংলণ্ড তুমি আজ ভারতবর্ষের প্রতি  
অত্যাচার করিতেছ বটে, কিন্তু—

“তোমারো ত বুকে কত কতবার  
রিপা পদাঘাত করেছে প্রহার—  
কালেতে না জানি কি হ'বে আবার  
এই কথা সदा করিও ধ্যান।”  
আজ

“ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব তার:  
নহিলে শুনিব এ বাণীর ঝঙ্কার;  
বাজিত গরজে উঠিল আবার  
উঠিত ভারতে বাধিত প্রাণ।”

হেমচন্দ্রের ‘ভারত-সংগীত’ যদি ভারত-  
বাসীরা দাসত্বের অবনতিরস্থার ভারত-সংগীত  
বলিয়া বিবেচনা করিত, তবে বহুদিন পূর্বেই  
সে তাহার জন্মগত অধিকার অর্জন করিবার  
জন্য অগ্রসর হইত—

“সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভাবে,  
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে—  
ভারত শৃঙ্খল ঘুমায়ে রয়।”

ইহার অধঃশতাব্দীরও অধিককাল পরে,  
রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—

“দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দিত তব ভেরী,  
আসিল সব বীরবন্দ আসন তব ঘেরি।

দিন আগত ওই

ভারত তবু কই।

সে কি রহিল লুপ্ত আজি সবজন পশ্চাতে,  
লুটক বিশ্বকর্মভার মিলি সবার সাথে।  
প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্দৈব আহবান হে,  
জাগ্রত ভগবান হে।”

রবীন্দ্রনাথ ‘গতগৌরব হৃত-আসন নত-  
মস্তক লাজে’ ভারতবর্ষকে—বিশ্বকর্মভার  
গ্রহণের জন্য শক্তি দিতে ভগবানকে আহবান  
করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই কবিতায়  
ভারতবাসীকে স্বাধীনতা লাভের জন্য উৎসাহিত  
করেন নাই। হেমচন্দ্র কিন্তু মূর্খতার উপায়  
নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ভারত-  
বাসীকে দিক্কার দিয়া লিখিয়াছিলেন—

“বিংশতি কোটি মানবের বাস,

এ-ভারতভূমি যবনের দাস,

রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।”

ভারতবাসীর কি দুর্দশা—

“জনকত শৃঙ্খল প্রহরী পাহারা  
দেখিয়া নমনে লেগেছে ধাঁধা।”

তাহারা—

“আত্ম অভিমান ডুবায় সলিলে  
দিয়াছে সর্পিপা শত্রু-করতলে  
সোনার ভারত করিতে ছার।

হীনবীর্য সম হয়ে কৃতাজলি  
মস্তকে ধরিতে বৈরী পদধূলি  
হাদে দেখ ধায় মহা কুতুহলী

ভারতনিবাসী যত কুলাঙ্গার।”

আজ ভারতবাসী যদি বন্ধপরিকর হয়—

“স্বদেশ উদ্ধার করা কোন্ ছার;

পারিস শাসিতে হাসিতে হাসিতে

সুন্মেরু অবধি কুমারী হইতে

বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে

বারেক জাগিয়ে করিলে পণ।

তবে ভিন্ন জাতি শত্রু পদতলে

কেনরে পড়িয়া থাকিস সকলে

কেননা ছিঁড়িয়া বন্ধন-শৃঙ্খলে

স্বাধীন হইতে করিস মন?”

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—

“তুলিও না—নাট জাতি, মূর্খ দরিদ্র, অজ্ঞ,  
মূর্খ, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর,  
সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি  
ভারতবাসী। ভারতবাসী আমার ভাই; বল  
মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ  
ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।”  
কর্তাদিন পূর্বে হেমচন্দ্র বলিয়াছিলেন—

“একবার শৃঙ্খল জাতিভেদ ভুলে,  
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূত্র মিলে,  
কর দৃঢ় পণ এ মহীমন্ডলে

তুলিতে আপন মহিমা ধ্বজা।

জপ, তপ, আর যোগ আরাধনা,

পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমা-অর্চনা,

এ সকলে তবে কিছুই হবে না

ভুগীর কৃপাণে করবে পূজা।”

দেশকালপাত্রোপযোগী ব্যবস্থা করিতে হইবে—

“যাও সিন্ধু নীরে, ভূধর-শিখরে,

গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে,

রাহু, উল্কাপাত, বজ্রশিখা ধরে

স্বকর্ম সাধনে প্রবৃত্ত হও।

তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে,

প্রতিস্বপ্নসীসহ সমকক্ষ হতে,

স্বাধীনতারূপ রতনে লভিতে

যে-শিরে এক্ষণে পাদুকা বও।

\* \* \* \* \*

অস্ত্রপরাক্রমে হও বিশারদ,

বগরংগরসে হওরে উন্মাদ;

তবে সে বাঁচবে, ঘুচিবে বিপদ—

জগতে যদ্যপি থাকিতে চাও।”

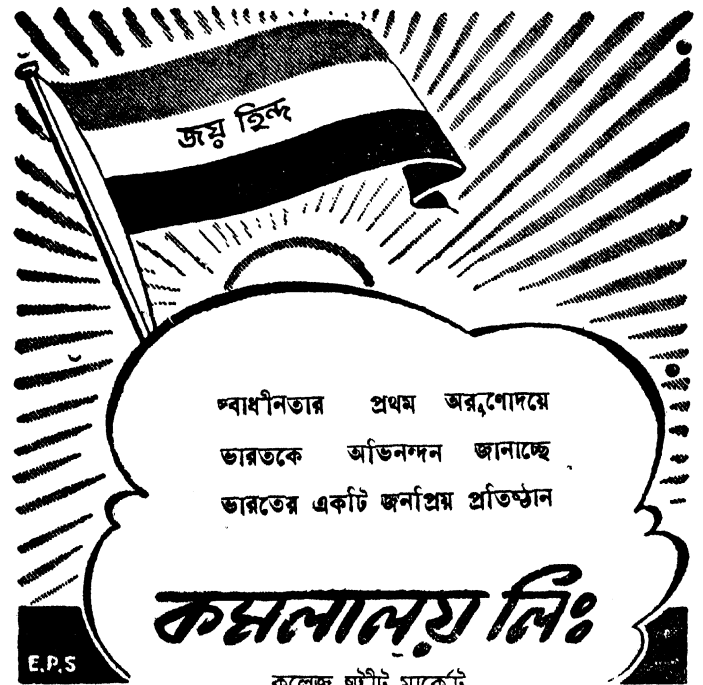
এই যে জগতে থাকা-ইহা মানুষের না থাকা।

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী—

“বীরভোগ্য বসুন্ধরা, বীর্য প্রকাশ কর,

সামদান ভেদ দন্ডনীতি প্রকাশ কর; পৃথিবী

ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক। আর ঝাঁট-



লাথি খেয়ে, চুপটি করে ঘণিত জীবন যাপন  
করলে ইহকালেও নরক ভোগ, পরলোকেও  
তাই।”

ইংরেজ-শাসনের ব্যাধিকা কভাবে দেশকে  
শোষণ করিতেছে, তাহার কথা মনোমোহন বসু  
কাত্ত করিয়াছিলেন :—

‘দে কর, দে কর, রব নিরন্তর—করের দায়  
অগ্ন জর জর!

সিন্ধুবারি যথা শোষে দিনকর, শোণিত শোষণ  
করে কত কর

কর দাহে নর কাতর”—ইত্যাদি

আর অর্থনীতির শোষণ :—

“দিনের দিন সবে দীন, হয়ে পরাধীন!  
অম্মাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ  
অপমানে তনুক্ষীণ!

\* \* \* \*

অতুলিত ধনরত্ন দেশে ছিল

যাদুকর জাতি মন্তে উড়াইল  
কেমনে হরিল কেহ না জানিল, তখনই কৈল  
দৃষ্টিহীন!

তুগি স্বীপ হ’তে পণ্যপাল এসে  
যার শস্য গ্রামে যত ছিল দেশে,  
দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভূষি শেষে,  
হায় রে, রাজা কি কঠিন!

\* \* \* \*

ছুই-সুতো পর্যন্ত আসে তুগি হ’তে  
দীয়াশলাই কাঠি তাও আসে পোতে;  
প্রদীপটি জ্বালিতে খেতে শূতে যেতে  
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।”

মনোমোহনের এই সকল গান যাত্রায় গ্রথিত  
হইয়া বাঙলার গ্রামে গ্রামে সুপরিচিত হইয়া-  
ছিল। বহুদিন পরে ইংরেজ সরকার সেগুলি  
“নিষিদ্ধ” করেন।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার বহুদিন পূর্বে  
কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় আগ্রায় যে গান গাহিয়া-  
ছিলেন, তাহা এক সময় বাঙলায় বিশেষ  
পরিচিত হইয়াছিল :—

“কত কাল পরে বল ভারত রে  
দুঃখ-সাগর সাঁতারি পার হবে?

\* \* \* \*  
নিজ বাসভূমে পরবাসী হ’লে,  
পরদাসখতে সমুদয় দিলে  
পর-হাতে দিয়ে ধন-রত্ন সুখে  
বহ লৌহ-বিনির্মিত হার বুকে।

\* \* \* \*  
পর-দীপশিখা নগরে নগরে  
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।

\* \* \* \*  
নিজ অন্নপরে কর-পণ্যে দিলে  
পরিবর্ত-ধনে দুঃখভিক্ষ নিলে।

\* \* \* \*

কি ছিলে কি হলে কি হ’তে চলিলে  
অবিবেকবশে তুমি কিছু না বুঝিলে।  
ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ যৌবনে গাহিয়াছিলেন :—

“তোমারি তরে মা সর্পিপনু দেহ,  
তোমারি তরে মা সর্পিপনু প্রাণ;  
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে,  
এ বাণী তোমারি গাহিবে গান।  
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্বল  
তোমারি কার্য সাধিবে;  
যদিও এ অসি করেছে মলিন  
তোমারি পাশ নাশিবে।”

“হিন্দু মেলা”য় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান গীত  
হয়—

‘মিলে সব ভারত-সন্তান  
এক তান মন-প্রাণ  
গাও ভারতের যশোগান॥

\* \* \* \*

কেন ভর, ভীরু কর সাহস আগ্রয়

যতোধর্মস্ততো জয়।

ছিল ভিন্ন হীন বল ঐকোতে পাইবে বল,  
মাযের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?”  
বাংকমচন্দ্রের “বন্দে মাতরম্” প্রচারিত  
হইবার পূর্বে বহুদিন এই সংগীত জাতীয়  
সংগীতরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় “আব’গাথা” হইতে  
তাঁহার বহু নাটক পর্যন্ত রচনায় জাতীয়তার  
জয়ধ্বনি করিয়াছেন—ভারতবাসীকে বলিয়াছেন—  
তোমার “রাহিবে উচ্চ শির”—তিনি যে  
স্বদেশকে বলিয়াছেন—

“দেবী আমার, সাধনা আমার,  
ধাত্রী আমার—আমার দেশ”  
সেই দেশকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন—

“আমরা ঘৃচাব মা, তোর কালিমা”

বাঙলার নাট্যশালা জাতীয়তার ভাব প্রচারে  
যে সাহায্য করিয়াছে, তাহাও স্মরণীয় গিরিশ-  
চন্দ্রের, ক্ষীরোদপ্রসাদের ও অন্যান্য লেখকের  
বহু নাটকের অভিনয় “নিষিদ্ধ” হইয়াছিল।

‘নীল-দর্পণ’ হইতে এই সকল নাটক  
জাতীয়তার শিক্ষা দিয়াছে।

চণ্ডীচরণ সেনের উপন্যাসসমূহ যেমন  
শরৎচন্দ্রের একখানি উপন্যাসও তেমনই  
“নিষিদ্ধ” হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ দেশাত্মবোধের বিস্তারে তাঁহার  
প্রতিভা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বঙ্গ-বিভাগ  
বিরোধী আন্দোলন যখন জাতীয় আন্দোলনে  
পরিণতি লাভ করে, তখন বাঙলায় আন্দোলনের  
রূপ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া লিখিয়া-  
ছিলেন :—

আজি বাঙলাদেশের হৃদয় হ’তে কখন  
আপনি  
তুমি এই অপরূপরূপে বাহির হ’লে  
জননী!

ওগো মা—

তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।  
তোমার দুয়ার আজ খুলে গেছে সোনার  
মন্দিরে॥

জন হাতে তোর খজা জবলে,  
বাঁ হাত করে শংকা হরণ,  
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাট নেত্র  
আগুন-বরণ।”

তিনি বাঙালীকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন :—

“কে জাগবে আজ কে করিবে কাজ  
কে ঘৃচাতে চাহে জননীর লাজ?”

**শাইক্য**

খোস, একজিমা, হাজা, কাটা, ঘা,  
শোড়া ঘা নালী ঘা, ফুস্কুড়ি চুলকানি,  
ও চুলকানি যুক্ত সর্ক প্রকার চর্মরোগে  
অব্যর্থ

এবিধান বিসার্চ ওয়ার্কস  
দি. ১৩ চিত্তবর্তন এভিনিউ (নর্থ)  
কলিকতা-২ কোম্পানী, ২৬৩৩

ঘরে ঘরে রাখবার মতো অস্ত্র

**ডিডিটি নিওসিড**

পোকা মাকড়স ধ্বংস করে

গাইগি ইনসেক্টিসাইডস্ লিঃ. বোম্বাই

তিনি আবেদনে-নিবেদনে বিশ্বাস হারাইয়া-  
ছিলেন এবং তিনি মৃত্যুর অল্পদিন পূর্বে যেন  
“Coming events cast their shadows  
before.”

রূপে বর্তমানের চিত্র দেখিয়াছিলেনঃ—

“ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না  
একদিন ইংরেজকে এই ভারত-সাম্রাজ্য ত্যাগ  
করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে  
সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কি লক্ষ্মীছাড়া  
দীনতার আবর্জনা। একাধিক শতাব্দীর  
শাসনধারা যখন শূন্য হয়ে যাবে, তখন কি  
বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে  
বহন করতে থাকবে!”

আজ যখন ইংরেজকে ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনে  
ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইতেছে, তখন  
সে কি করিতেছে? রামমোহন হইতে  
রবীন্দ্রনাথ—রামগোপাল হইতে সুরেন্দ্রনাথ—  
সুরেন্দ্রনাথ হইতে চিত্তরঞ্জন সকল সাধকের  
সাধনা ব্যর্থ করিবার চেষ্টায় সে ভারতবর্ষকে  
হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানে বিভক্ত করিয়া  
ভারতের জাতীয়তার শক্তি ক্ষয় করিয়া  
সাম্প্রদায়িক বিবাদ উদ্ভূত করিয়া যাইতেছে।  
হয়ত সে আশা করিতেছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-  
ভাবে তাহার স্বার্থ কতকটা রক্ষা করা তাহার  
পক্ষে সম্ভব হইবে।

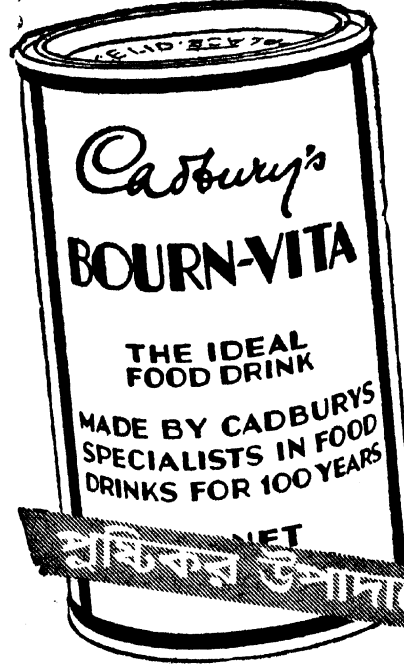
তাই আজ বার বার রবীন্দ্রনাথের কথা  
স্মরণ করিতেছিঃ—

“আজ আশা করে আছি, পরিচালক-কর্তার  
জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত  
কুটীরের মধ্যে। অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার  
দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম  
আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনায়ে এই  
পূর্ব দিগন্ত থেকেই। \* \* আশা করব,  
মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুখ্ত আকাশে  
ইতিহাসের একটি নিম্নলিখিত আত্মপ্রকাশ হয়তো  
আরম্ভ হবে এই পূর্বোক্তের সূর্যোদয়ের  
দিগন্ত থেকে, আর একদিন অপরাজিত মানুষ  
নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম  
করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার  
পথে।”

অর্ধশতাব্দী পূর্বে তিনি একদিন আশা  
করিয়াছিলেন, “শিখদিগের শেষ গুরু, গুরু-  
গোবিন্দ যেমন বহুকাল জনহীন দুর্গম স্থানে  
বাস করিয়া নানা জাতির নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন  
করিয়া সুদীর্ঘ অবসর লইয়া আত্মোন্নতি  
সাধনপূর্বক তাহার পরে নিজের হইতে বাহির  
হইয়া আসিয়া আপনার গুরুত্ব পদ গ্রহণ  
করিয়াছিলেন,” তেমনই আমাদের গুরুকেই  
সাধনা করিয়া সিংধলাভ করিতে হইবে।  
১৩০০ বৎশাব্দে তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন—  
আর আজ সেই গুরুর আবির্ভাব হইয়াছে—  
জনমতে।

সে জনমত দেশাত্মবোধের মধ্য দিয়া  
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—সে বিদেশী ভাষায়  
তাহার ভাব প্রকাশ করে নাই। সে তাহার  
স্বদেশী—মাতৃভাষায় তাহার বাণী উচ্চারণ  
করিয়াছে। স্বাধীনতার প্রেরণা বাঙলা ভাষার  
পথে আসিয়াছে; বাঙলার কবি, ঔপন্যাসিক,  
সাংবাদিক, প্রবন্ধ-লেখক, প্রচারক এই বাঙলা

ভাষার মধ্য দিয়া জাতিকে উদ্বেগ করিয়াছেন।  
আজ যখন ভারতবর্ষের গণ-জাগরণের অরুণরাগ  
তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে,  
তখন “বন্দে মাতরম্” মন্তোচ্চারণ করিয়া  
মশ্ময়ীরূপে প্রত্যক্ষীভূত চিন্ময়ী জননীকে  
প্রণাম করিয়া আমরা “জননী বঙ্গ ভাষাকে”  
প্রণাম করিতেছি।



স্বাদ  
ভালো হলে  
সবই  
ভালো !

হাড় সুগঠিত করতে এবং শরীরকে শক্তিশালী  
ক'রে তুলতে যে সব জিনিসের প্রয়োজন তার শতকরা ৯৫  
ভাগই আপনি বোর্নভিটাতে পাবেন। তা' ছাড়া বোর্নভিটা অতি  
সুস্বাদু এবং পরিপাকের সহায়ক। সহজে হজম হয়, তাই  
বিশেষ ক'রে গর্ভাবস্থায় ও রোগভোগে পর এ খুব উপকারী।



যদি ঠিকমতো না পান তবে আমাদের লিখুন :  
ক্যাডবেরি-ব্রাই (একপোর্ট) লিমিটেড; (টিপার্টেক্ট-২১) পোস্ট বক্স ১৪১৭ - কোলকাতা

# রবীন্দ্র-কাব্য-জীবন-প্রবাহ

## কবি-স্মরণ-সংকলন

সংকলয়িতার নিবেদন

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও তিরোভাব

—এই দুটি-দিনই আমাদের সমভাবে পালনীয় ও স্মরণীয়। কি পশ্চিমে বৈশাখে, কি বাইশে প্রাবে কবির জন্মোৎসব বা কবির স্মৃতি-তর্পণ শ্রদ্ধায় ও অনুরাগে, স্মৃতি ও সংঘর্ষে তাঁর দেশবাসীর অবশ্য করণীয়। কিন্তু প্রতি বৎসর ঐ দিন-দুটিকে ঘিরে নানা স্থানে যে-সব অনুষ্ঠান হয়, লক্ষ্য করে দৃষ্টি পেয়েছি, তাতে তাঁর সৃষ্টির মর্মকথাটি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, বহু বৃথা বাক্যের নিরর্থকতায় পড়ে যায় চাপা; প্রাতিষ্ঠানিক বাগাড়ম্বরে তাঁর বাণীমূর্তি হয়ে পড়ে নিঃপ্রভ। তাই অনেক সময় ভেবেছি, কেমন করে এ-সব অনুষ্ঠানে তাঁর কাব্য-জীবন-প্রবাহের মূল ধারাটি ধরে, তাঁর যে-সৃষ্টি, ক্রমপরিণতির মধ্য দিয়ে গিয়ে পৌঁছেয়েছে সৃষ্টির অতীতে, তার একটু পরিচয় দেওয়া যায়,—যাতে সার্থক হয় আমাদের স্মরণ, তাঁর সেই নিরন্তর প্রকাশের পথে, অন্তরের উপলব্ধিতে।

এই কথা মনে নিয়ে আমি এখানে রবীন্দ্রনাথের যে-কাব্যসৃষ্টি, তার অনুরোধদয়ে ক্ষীণধারা নিব্বর-উৎস থেকে, মধ্যাহ্নদিনে দুকূলপ্লাবী খরনদীপ্রোত বেয়ে, শান্তসমাহিত সন্ধ্যায় মহাসাগরসংগম পর্যন্ত, যে অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য নিয়ে পরম পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছে, তাঁর একটু পরিচয়, আর তাঁর একটু ব্যাখ্যা—কবির আপন মূখের কথাতেই—দেবার চেষ্টা করেছি। বলবার দরকারও মনে করছি না যে, তাঁর অখণ্ড কাব্য-জীবন-প্রবাহের এ-পরিচয় খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ। আমি শুধু কবি নিজে যে-কথা বলেছিলেন ‘রবীন্দ্র রচনাবলী’র ভূমিকায়—

“আমার লেখার দ্বারা আমার জীবনের ধারার সঙ্গে সঙ্গেই অবিচ্ছিন্ন এগিয়ে চলেছে।.....একটা ঐক্যের

স্বাক্ষর তাদের সকলের মধ্যে অঙ্কিত হয়ে নিশ্চয়ই পরম্পরের আত্মীয়তার প্রমাণ দিতে থাকে”

—সেই কথাটি মনে রেখে এই সংকলনটি করেছি। এ থেকে পশ্চিমে বৈশাখের বা বাইশে প্রাবণের কোনো একটি অনুষ্ঠানেরও যদি সামান্য সহায়তা হয়, তাতেই আমার তৃপ্তি। ইতি ২২শে প্রাবণ। ১৩৫৪ ॥

—অমল হোম

সূচনা—

ব’লে রাখা ভাল যে, কবির দীর্ঘজীবনব্যাপী কাব্যপ্রবাহের মূল ধারাটিকে একটি দিনের মধ্যে ধরা হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব-পর হবে না। ঠিক এই অনুষ্ঠানপদ্ধতিটিকে সমগ্রভাবে রূপদান করতে গেলে যে সময়ের প্রয়োজন তা স্ফুট না হলে, এখানে যা সংকলিত হোলো, তা স্থান কাল অনুযায়ী সংক্ষেপিত করতেই হবে। সে-তার রইলো অনুষ্ঠানদের হাতে। তাঁরা

তাদের অভিন্নতা ও আয়োজনমতো এ পদ্ধতি পরিবর্তিত করে নেবেন। কবির কাব্যধারার গতির বোধসহায়তায় আমি যেখানে কোনো একটি কাবের বা তার কবিত্ব ব্যাখ্যার একাধিক উদাহরণ সন্নিবেশিত করেছি, তাঁরা সেখানে সেটি অনায়াসেই বর্জন করতে পারেন। তাতে তাঁর সৃষ্টির মূল ঐক্য-সূত্রটি ধারার পক্ষে অসুবিধা হবে না ব’লেই আমার বিশ্বাস।  
—সংকলয়িতা ॥

### [ বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের অনুমোদনক্রমে ]

“নিজের সত্য পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতরকার মূল ঐক্যসূত্রটি ধরা পড়তে চায় না। বিষ্যতা যদি আমার জন্ম দীর্ঘ না করতেন, তা হলে নিজের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করার অবকাশ পেতাম না। নানা থানা করে নিজেকে দেখেছি, নানা কাজে প্রবর্তিত করেছি, ক্ষণে ক্ষণে তাতে আপনার অভিজ্ঞান আপনার কাছে বিক্লিপ্ত হয়েছে। জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদীক্ষণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম, তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে,— সে আর কিছু নয়,—

আমি কবি মাত্র।”

২৫শে বৈশাখ। ১৩৩৮ ॥

মত সন্তোষে প্রকাশিত  
প্রথম ধারাঃ—উদ্ভাষন। কৈশোরক। যৌবন স্বপ্নন॥  
১। “প্রভাত-সংগীত”। ২। “কড়ি ও কোমল”॥

এই সন্তোষে  
দ্বিতীয় ধারাঃ—৩। “মানসী”। ২। “সোনার তরী”॥

## উপক্রমণিকা

১১ক। পাঠ—

—“একদিন বসন্তে নারী এল সংগীহার। আমার বনে  
প্রিয়র মধুর রূপে।  
এল সুর দিতে আমার গানে,  
নাচ দিতে আমার ছন্দে  
সুখা দিতে আমার স্বপ্নে।  
উদ্ভাস একটা ঢেউ হৃদয়ের তট ছাপিয়ে  
হঠাৎ হ’ল উচ্ছলিত,  
ভুবিয়ে দিল সকল ভাষা,  
নাম এল না মধুখে।  
সে দাঁড়াল গাছের তলায়,  
ক্ষিরে তাকালো আমার কুণ্ঠিত বৈদনাকরূপ  
মুখের দিকে।

ফিরিত পদে এসে বসলো আমার পাশে।  
দুই হাতের মধ্যে আমার হাত তুলে নিয়ে বল্লেন,—  
‘ভূমি চেন না আমাকে, তোমাকে চিনিনে আমি,  
আজ পর্যন্ত কেমন করে এটা হ’ল সম্ভব  
আমি তাই ভাবি’  
আমি বললেম,—দুই না-চেনার মাঝখানে  
চিরকাল ধরে আমরা দুজনে বাঁধব সেতু,  
এই কৌতুহল সমস্ত বিশ্বের অন্তরে”।

ভালোবেসেছি তাকে।

সেই ভালোবাসার একটা ধারা  
ঘিরেছে তাকে স্নিগ্ধ বেগুনে  
গ্রামের চিরপরিচিত অগভীর নদীটুকুর মতো।  
অল্প বেগের সেই প্রবাহ  
বহে চলেছে প্রিয়র সামান্য প্রতিদিনের  
অনুচ্চ তটছায়ায়।  
অনাবৃষ্টির কাপণ্যে কখনো সে হয়েছে ক্ষীণ  
আঘাতের দাক্ষিণ্যে কখনো সে হয়েছে প্রগল্ভ।  
ভুচ্ছতার আবরণে অনুজ্জ্বল  
অতি সাধারণ স্ত্রী-স্বরূপকে  
কখনো করেছে জালন, কখনো করেছে পরিহাল,  
আঘাত করেছে কখনো বা।

আমার ভালোবাসার আর-একটা ধারা  
মহালক্ষ্মীর বিরাট ইগিতবাহিনী।  
মহীয়সী নারী স্নান করে উঠেছে  
তারি অভল থেকে।  
সে এসেছে অপরিণীত ধ্যানরূপে  
আমার সবসেহে-মনে,

পূর্ণিত করেছে আমাকে, আমার বাণীকে।  
জেরে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে  
চিরবিরহের প্রদীপশিখা।

\* \* \* \* \*  
আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে  
সৃষ্টির প্রথম রহস্য,—আলোকের প্রকাশ,  
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য,—ভালোবাসার অমৃত”॥  
[—পত্রপুট। পনেরো॥ রবীন্দ্র রচনাবলী। বিংশতি খণ্ড॥]

অনুবর্তি—

“মানসী”

॥ ১২৯৭ ॥\*

৩২। পাঠ—

—“বালাকাল থেকে পশ্চিম ভারত আমার কাছে রোমান্টিক কল্পনার  
বিষয় ছিল।.....অনেক দিন ইচ্ছে করেছি এই পশ্চিম ভারতের কোনো  
এক জায়গায় আশ্রয় নিয়ে ভারতবর্ষের বিরাট বিক্ষুব্ধ অতীত যুগের  
স্পর্শ লাভ করব মনের মধ্যে।.....শুনিয়েছিলুম গাজিপুত্রে আছে  
গোলপের খেত।.....তারি মোহ আমার প্রবলভাবে টেনেছিল”। (৩৬)  
“মানসীর অধিকাংশ কবিতা লিখেছিলেন পশ্চিমের [এক] সেই  
সহরের বাংলা-ঘরে। নতুনর স্পর্শ আমার মনের মধ্যে জাগিয়েছিল নতুন  
স্বাদের উত্তেজনা। সেখানে অপরিচিতের নিজস্ব অবকাশে নতুন নতুন  
ছন্দের যে বুননের কাজ করেছিলেন, এর পূর্বে তা আর কখনো করিনি।  
নতুনদের মধ্যে অসীমত্ব আছে,—তারি এসেছিল ডাক,—মন দিয়েছিল  
সাড়া যা তার মধ্যে পূর্বে হতেই কুণ্ঠিত মতো শাখায় শাখায় লুকিয়ে  
ছিল,—আলোতে তাই ফুটে উঠতে লাগল”। (৩৬)

৩৩। আবর্তি—

—“নিভৃত এ চিত্তমারে নিমেষে নিমেষে বাজে  
জগতের তরঙ্গ-আঘাত  
ধ্বনিত হৃদয়ে তাই মধুর বিরাম নাই  
নিদ্রাহীন সারা দিনরাত।  
সুখ-দুঃখ গীতস্বর ফটিতেছে নিরন্তর,  
ধ্বনি শব্দ, সার্থে নেই ভাষা;  
বিচিত্র সে কলরোলে ব্যাকুল করিয়া তোলে  
জাগাইয়া বিচিত্র দুরাশা।  
এ চির-জীবন তাই আর কিছ; কাজ নাই  
রচি শব্দে অসীমের সীমা;  
আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে  
গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা। (৩৬)

\*কাব্যগ্রন্থটির নামের নীচে তার প্রকাশকাল দেওয়া হোলো—  
সংকলয়িতা

(৩৬) কবির ভূমিকা। “মানসী”। রবীন্দ্ররচনাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড॥  
(৩৬) কবির ভূমিকা। “সোনার তরী”। রবীন্দ্ররচনাবলী। তৃতীয় খণ্ড॥  
(৩৬) “মানসী”। উপহার। রবীন্দ্ররচনাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড॥



(১)

## ৩৪। পাঠ—

—“নূতন আবেষ্টনে এই কবিতাগুলি সহসা যেন নবদেহ ধারণ করল।.....মানসীতে ছন্দের নানা খেলায় দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।” (৩৭)

## ৩৫। আবৃত্তি—

—“সারাটা দিনমান রচি গান কত না  
তাহারি পাশে রহি যেন কাহি বেদনা।  
কানন মর মরে কত স্বরে কাহিত  
ধানিত যেন দিশে তাহারি সে রচনা  
সতত দূরে কাছে আগে পাছে বাহিত  
তাহারি যত কথা পাতা-লতা ঝরণা ॥

তাহারে আঁকিতাম, রাখিতাম ধরিয়া  
বিরহ-ছায়াতল সুশীতল করিয়া।  
কখনো দোখি যেন শ্লান-হেন মৃখানি  
কখনো আঁখিপটে হাসি উঠে ভরিয়া।  
কখনো সারারাত ধরি হাত দুখানি  
রাহিগো বেশবাসে বেশপাশে ধরিয়া ॥

বিরহ সুমধুর হ'ল দূর কেন রে  
মিলন দাবানলে গেল জ্বলে যেন রে।  
কই সে দেবী কই, হেরো ওই একাকার  
শ্মশানবিলাসিনী বিবাসিনী বিহরে।  
নাই গো দয়ামায়া স্নেহছায়া নাই আর,  
সকল করে ধুশু প্রাপ শূদ্র শিহরে। (৩৮)

(২)

—“খুঁজিতোছি, কোথা ভূমি  
কোথা ভূমি।  
যে অমৃত লুকানো তোমায়  
সে কোথায়।  
অন্ধকার সমুদ্র তাকাশে  
বিজন তারার মাঝে কাঁপছে যেমন  
স্বপ্নের আলোকময়রহস্য অসীম  
ওই নয়নের  
নিবিড় তিমিরতলে, কাঁপছে তেমন  
আত্মার রহস্যশিখা।  
তাই চেয়ে আছি।  
প্রাণমন সব লাগে তাই ভুবিতোহি  
অতল আকাশপারাবারে।  
তোমার আঁখির মাঝে,  
হাসির আড়ালে  
বচনের সুধাপ্রান্তে,  
তোমার বদনব্যাপী  
করুণ শান্তির তলে  
তোমারে কোথায় পাব—  
তাই এ কল্পনায় (৩৯)

(৩)

—“ওগো, থামো, যারে ভূমি বিদায় দিয়েছি  
তারে আর ফিরে এচো না।  
ওই অশ্রুসজল ঠৈরবী আর  
গেয়ো না।  
আজি প্রথম প্রভাতে চলবার পথ  
নয়নবাস্পে ছেয়ো না ॥

ওই মন-উদাসীন, ওই আশাহীন,  
ওই ভাষাহীন কার্জনল  
দেয় ব্যাকুল পরশে সকল জীবন  
বিকল।  
দেয় চরণে বাঁধিয়া প্রেমবাছুরেরা  
অশ্রুকোমল শিকলি।  
হায়, মিছে মনে হয় জীবনের রত  
মিছে মনে হয় সকল ॥” (৪০)

## ৩৬। পাঠ—

—“দুর্দান্ত বৃষ্টি। বৃষ্টির দিনে, যাকে ভালোবাসি তার দুই হাতে চেপে ধরে বালতে ইচ্ছে করে—জন্ম জন্মান্তরে আমি তোমার। আজ এই কথাটি বলা সহজ। আজ সমস্ত আকাশ যে মরিয়া হ'য়ে উঠল, হু হু করে কী যে হেঁকে ব'লছে তার ঠিকানা নেই; তারি ভাষায় আজ বন-বনান্তর ভাষা পেরেছে,—বৃষ্টিধারায় আবিষ্ট জগৎ আকাশে কান পেতে দাঁড়িয়ে।.....ঠিক মনের কথাটি বলার লগ্ন যে উত্তীর্ণ হয়ে যায়।..... বৎসরের পর বৎসর নীরবে চলে যায়, তার মধ্যে বাণী একদিন বিশেষ প্রহরে হঠাৎ মানুষের স্বারে এসে আঘাত করে।.....যেদিন সেই বাণী আসে, সেদিন সমস্ত পৃথিবীকে ডেকে খবর দিতে ইচ্ছে করে—‘শোনো তোমরা আমি ভালোবাসি।’ ‘আমি ভালোবাসি’ এই কথাটি অপরিচিত সিন্ধু-পারগামী পাখীর মতো। কতদিন থেকে কত দূর থেকে আসছে..... স্পর্শ করল আজ সেই কথাটি—আমার সমস্ত জীবন, আমার সমস্ত জগৎ সত্য হ'য়ে উঠল। আজ কাকে এমন করে বালতে চাই—সত্য সত্য, এত সত্য আর কিছড় নয়।” (৪১)

## ৩৭। সংগীত—

—“এমন দিনে তারে বলা যায়  
এমন ঘনঘোর বরিষায়  
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝর ঝরে  
তপনহীন ঘন তমসায় ॥

“সে কথা শুনিয়ে না কেহ আর  
নিভৃত নিজনি চারিধার।  
দু'জনে মৃণ্মুখি গভীর দুখে দুখী  
আকাশে জল ঝরে আঁনবার  
জগতে কেহ যেন নাহি আর ॥

“সমাজ সংসার মিছে সব,  
মিছে এ জীবনের কলরব  
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুখ পিয়ে  
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব,  
আঁখিরে মিশে গেছে আর সব ॥

“তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার  
নামাতে পারি যদি মনোভার  
প্রাণবিরম্বে একদা গৃহকোশে  
দু'কথা বলি যদি কাছে তার  
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার ॥

“ব্যাকুল বেগে আজি বহে যায়  
বিজড়িল থেকে থেকে চমকায়।  
যে-কথা এ জীবনে রাখিয়া গেল মনে  
সে-কথা আজি যেন বলা যায়  
এমন ঘন ঘোর বরিষায় ॥” (৪২)

## “সোনার তরী”

৥ ১৩০০ ॥

## ৩৮। পাঠ—

—“বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি। .....পরিচয়ে অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে।.....ক্ষণে ক্ষণে হটটুকু গোচরে এসেছিল, তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের

(৪০) “মানসী”। ঠৈরবী গান ॥

(৪১) “শেষের কবিতা” ॥

(৪২) “মানসী”। ‘বর্ষার দিনে’ ॥ “গীতিবিতান”। ২য় সংস্করণ। ২য় খণ্ড ॥

(৩৭) কবির ভূমিকা। “সোনার তরী”। রবীন্দ্রচনাবলী। তৃতীয় খণ্ড ॥

(৩৮) “মানসী”। ‘বিরহানন্দ’। রবীন্দ্রচনাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড ॥

(৩৯) “মানসী”। ‘নিষ্ফল কল্পন’ ॥

অন্দরমহলে আপন বিচিত্ররূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে।..... আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানিনি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পশ্চিম আঁতখা নিয়েছি,—বৈশাখের খর রৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মৃদলধারাবর্ষা। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামলী,—এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা,—মাঝখানে পশ্চিম চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দু'লোকের শিশুপী প্রহরে প্রহরে নানা বর্ণের ছায়ার তুলি। এখানে নির্জন সজনের নিত্যসঙ্গম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পেঁচাছিল আমার হৃদয়ে। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হলো আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা—বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা। এই সময়কার প্রথম কাব্যের ফসল ভরা হয়েছিল 'সোনার তরী'তে।" (৪৩)

### ৩৯। আবৃত্তি—

"গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা  
কূলে একা বসে আঁছি, নাঁহি ডরসা  
রাশি রাশি ভরা ভরা ধানকাটা হল লারা  
ভরানদী ক্ষুরধারা খর পরশা  
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা॥

"একখানি ছোটো খেত আমি একলা,  
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।  
পরপারে দেখি আঁকা তরুছায়া মশী-মাথা  
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাতবেলা  
এ পার্বেতে ছোট খেত, আমি একলা॥

"গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে?  
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।  
ভরা-পালে চলে যায়, কোনো দিকে নাঁহি চাম  
ঢেউগুলা নির্মপায়, ভাঙে দু'ধারে,—  
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে॥

"ওগো তুমি কোথা যাও কোন বিশেষ  
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে  
যেয়ো যেথা যেতে চাও, যারে খুঁসি তারে দাও,  
শুধু তুমি নিয়ে যাও ক্ষণিক হেসে  
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে॥

"যত চাও তত লও তরণী-পরে  
আরো আছে?—আর নাই, দিয়েছি ডরে  
এতকাল নদীকূলে বাঁধা লয়ে ছিন্দু, ফুলে  
সকাল দিলাম ফুলে ধরে বিথরে,—  
এখন আমারে লহো করুণা করে॥

"ঠাই নাই, ঠাই নাই ছোট সে তরী  
আমার সোনার ধানে গিয়েছে ভরি  
শ্রাবণগগন ঘিরে ঘন মেঘ ঘরে ফিরে  
শূন্য নদীর তীরে রহিন্দু, পাড়,—  
যাঁহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী॥" (৪৪)

### ৪০। পাঠ—

—“এই জীবনযাত্রার অবকাশকালে মাঝে মাঝে শব্দ মূহুর্তে বিশ্বের দিকে যখন অনিমেষ দৃষ্টি মেলিয়া ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিয়াছি, তখন আর এক অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। নিজের সঙ্গে বিশ্ব-প্রকৃতির এক অবিস্মরণ যোগ, এক চিরপুণ্যতন একাত্মকতা আমাকে একান্তভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। কতদিন নৌকা বসিয়া সূর্যকরোদ্দীপিত জলে স্থলে আকাশে আমার অন্তরাত্মাকে নিঃশেষে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছি; তখন মাটিতে আর মাটি বলিয়া দূরে রাখি নাই, তখনি একথা বলিয়াছি—(৪৫)

### ৪১। আবৃত্তি—

—“আমারে ফিরায়ে লহ, আমি বসুন্ধরে;  
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে,  
বিপুল অঙ্গলতলে। ওগো মা মাতামি,  
তোমার মস্তিকামাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই,  
দিশ্বেদিকে আপনার দিই বিস্তারিয়া  
বসন্তের আনন্দের মতো বিদারিয়া  
এ বক্ষপঙ্কর, টাটিয়া পাশাণ-বন্ধ  
সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ  
অন্ধ কারাগার—হিন্নোয়িয়া, মর্ষারিয়া,  
কাম্পিয়া, খালিয়া, বিকীরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,  
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পলকে  
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভুলোকে।”

শাখায় বন্ধলে পড়ে উঠি সরসিল  
নিগূঢ় জীবনরসে; যাই পরাশিয়া  
স্বর্ণশীর্ষে আনিমিত শলাক্রেতল  
অগ্নিলিঙ্গ আদোলনে; নব পুষ্পদল  
করি পূর্ণ সংগোপনে সর্বপল্লবায়  
সুধাগণ্ডে মধুবিদ্যুৎভারে; নীলিমায়  
পরিব্যাপ্ত করি দিয়া মহাসিন্ধুনীর  
তীরে তীরে করি নতম স্তম্ভ ধরণীর  
অনন্ত কল্লোলগীতে।”

এ-কথা বলিতে কুণ্ঠিত হই নাই—

“তোমার মস্তিকা সনে

আমারে মিশিয়ে লয়ে অনন্ত গগনে  
অশ্রান্তচরণে করিয়া প্রদীক্ষণ  
সবিত্তমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন  
যুগযুগান্তের ধরি,—আমার মাঝারে  
উঠিয়াছে তুণ তব, পুষ্প ভারে ভারে  
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুণ  
পত্র-ফুল-ফল-গন্ধরেণু। তাই আজি  
কোনোদিন আনমনে বসিয়া একাকী,  
পশ্চাতীরে, সম্মুখে মেলিয়া মস্তিষ্ক আঁখি  
সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অনন্তব করি  
তোমার মস্তিকামাঝে কেমনে শিহরি  
উঠিতেছে ভূগাঙ্গুর; তোমার অন্তরে  
কী জীবনরসধারা অহিনীশ ধরে  
করিতেছে সঞ্চার; কুসুম-মুকুল  
কী গন্ধ আনন্দভরে ফুটিয়া আকুল  
সুন্দর বসন্তের মাঝে; নব রৌদ্রালোকে  
তরুলতাক্ষণগন্ধ কী গুঢ় পলকে  
কী মৃদু প্রসাদেরসে উঠে হরাধিয়া—  
মাতৃস্তনপানপ্রাপ্ত পরিতৃপ্ত-বিহ্বা  
সুখস্বপ্ননাসামুখ শিশুর মতন। (৪৬)

### ৪২। পাঠ—

—“বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিজের প্রকৃতির মিলটা অনুভব করা সহজ—  
কেন না সৈদিক থেকে কোনো চিত্র আমাদের চিত্তকে কোথাও বাধা দেয় না।  
কিন্তু এই মিলটাতেই আমাদের তৃপ্তির সম্পূর্ণতা কখনোই ঘটতে পারে না।  
কেননা আমাদের চিত্র ক্ষেত্রে সন্তব নয়,—বিশ্বমানবের ক্ষেত্রেই সম্ভব।  
এই মিলটা বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রে সন্তব নয়,—বিশ্বমানবের ক্ষেত্রেই সম্ভব।  
সেইখানে আপনাকে ব্যাপ্ত করে আপনার বড়ো-আমির সঙ্গে আমরা  
মিলতে চাই।.....এই বড়ো-আমিকে চাওয়ার আগে ক্রমে আমার কবিতার  
মাঝে যখন ফুটে লাগল,—অর্থাৎ অঙ্কুরেরূপে বীজ যখন মাটি ফুড়ে  
বাইরের আকাশে দেখা দিলে,—তারই উপস্থান দেখি, সোনার তরীর  
বিশ্ববৃত্তো—(৪৭)

(৪৩) কবির ভূমিকা। “সোনার তরী”। রবীন্দ্রচন্দ্রাবলী।  
তৃতীয় খণ্ড॥  
(৪৪) “সোনার তরী”  
(৪৫) “আত্মপরিচয়” ১॥

(৪৬) “সোনার তরী”। ‘বসুন্ধরা’॥  
(৪৭) ১৩২৪। আশ্বিন-কাটিক সংখ্যার “সম্বন্ধপত্র” মাসিকে  
‘আমার ধর্ম’ প্রবন্ধ। বিশ্বভারতী প্রকাশিত ‘আত্মপরিচয়’ পুস্তকের  
তৃতীয় সন্দর্ভে সংকলিত॥

## ৪০। আবৃত্তি—

—“বিপুল গভীর মধুর মস্তে  
কে বাজাবে সেই বাজনা  
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য  
বিস্মৃত হবে আপনা।  
টুটুবে বশ্ব, মহা আনন্দ  
নব সংগীতে নৃতন ছন্দ  
হৃদয়-সাগরে পূর্ণচন্দ্র  
জাগাবে নবীন বাসনা।

\* \* \*  
ওগো কে বাজায়—বঁকি শোনা যায়  
মহারহসো রসিয়া  
চিরকাল ধরে গুস্তীর স্বরে  
অম্বরপরে বসিয়া।  
গ্রহমণ্ডল হয়েছে পাগল  
ফিরছে নাচিয়া চিরচঞ্চল  
গগনে গগনে জ্যোতি-অণুল  
পড়িছে খসিয়া খসিয়া।

ওগো কে বাজায়—কে শুনিতে পায়  
না জানি কী মহারাগিনী  
দাঁসিয়া ফাঁসিয়া নাচিছে শিশু  
সহস্রশিরনাগিনী।

ঘন অরণ্য আনন্দে দুলে,  
অনন্ত নড়ে শত বাহু তুলে,  
কী গাছিতে গিয়ে কথা যায় তুলে  
মর্মরে দিনযামিনী।

\* \* \*  
ওই কে বাজায় দিবসনিশায়  
বসি অন্তর-আসনে।

কালের মতে বিচিত্র সুর  
কেহ শোনে কেহ না শোনে।  
অর্থ কী তার ডাবিয়া না পাই,  
কত গুপ্তী জানী চিন্তিছে তাই,  
মহান মানবমানস সদাই

\* \* \*  
উঠে পড়ে তারি শাসনে।  
হৃদয় আমার ক্রন্দন করে  
মানবহৃদয়ে মিশিতে  
নিখিলের সাথে মহারাজপথে  
চলিতে দিবসনিশায়ীথে।

আজন্মকাল পড়ে আছি মৃত,  
জড়তার মাঝে হয়ে পরাজিত  
একটি বিস্ময় জীবন-অমৃত

কে গো দিবে এই তৃষিতে?

জগৎ-মাতনো সংগীত-তানে  
কে দিবে এদের নাচায়ে?  
জগতের প্রাণ করাইয়া পান  
কে দিবে এদের বাঁচায়ে?  
ছিঁড়িয়া ফেলিবে জাতিজালপাশ,  
মৃত্ত হৃদয়ে লাগিবে বাতাস,  
ঘুচায়ে ফেলিয়া মিথ্যাতরাস  
ভাঙিবে জীর্ণ খাঁচা-এ?

বিপুল গভীর মধুর মস্তে  
বাজুক বিশ্ববাজনা।  
উঠুক চিত্ত করিয়া নৃত্য  
বিস্মৃত হয়ে আপনা।  
টুটুক বশ্ব, মহা আনন্দ,  
নব সংগীতে নৃতন ছন্দ,  
হৃদয়সাগরে পূর্ণচন্দ্র  
জাগুক নবীন বাসনা॥ (৪৮)

## ৪৪। পাঠ—

—“আমার কবিতার গতিটা এখানে প্রকৃতির ধাপ থেকে মানুষের ধাপে উঠেছে। বিরাটের চিন্ময়তার পরিচয় লাভ করছে। বিশ্বমানবের ইতিহাসকে যে একজন চিন্ময় পুণ্ড্র সমস্ত বাধাবিঘ্ন ভেদ করে দুর্গম বন্ধুরপথ দিয়ে চালাই করছেন, এখানে তারই কথা দেখি।”  
“এখন হতে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির পালা শেষ হল।” (৪৯)

## ৪৫। সংগীত—

—“এস গো নৃতন জীবন।  
এস গো কঠোর নিষ্ঠুর নীরব  
এসো গো ভীষণ শোভন।  
এসো অপ্রিয় বিরসভিত্ত,  
এসো গো অগ্রসূরিলসিদ্ধ,  
এসো গো ভূষণবিহীন, রিত্ত  
এস গো চিত্ত-পাবন।  
থাক বীণা বেণু, মালতী-মালিকা,  
পূর্ণিমানিশ, মায়ী-কুহেলিকা,  
এসো গো প্রথর হোমানলশিখা  
হৃদয়শোণিতপ্রাশন।  
এসো গো পরম দুঃখনিলয়,  
আশা-অঙ্কুর করহ বিলয়,  
এসো সংগ্রাম, এসো মহা-জয়  
এসো গো মরণ-সাধন॥” (৫০)

(৪৮) “সোনার তরী।” “বিশ্বনৃত্য”॥

(৪৯) “আত্মপরিচয়”। ৩॥

(৫০) “গীতবিতান”। ২য় সংস্করণ। ২য় খণ্ড॥

আগামীবারে—  
তৃতীয় ধারা:—৪। “চিত্রা”। ৫। “কল্পনা”॥



# যাত্রিদল

## শ্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ

চতুঃসংখ্য-অধ্যায়

বিকালবেলা কল্যাণী নিজের ঘরে একখানা বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। আজ ছয়টা বৎসর পরে সে ভাল করিয়া আয়নার নিজের চেহারার দিকে চাহিয়া রহিল। এই করটি বৎসরে শরীর তাহার কি হইয়া গিয়াছে! মাথায় চুলের রাশ রুদ্ধ হইয়া জটা বাঁধিয়া উঠিয়াছে—দুই চোখ গিয়াছে বসিয়া চোখের নীচের দুই পাশের হাড় দুইখানি উঠিয়াছে জাগিয়া। বয়স তাহার এই বত্রিশ বৎসর হইল। এই ছয়টি বৎসর পূর্বে চেহারা তাহার সত্যই দেখিবার মত ছিল। কিন্তু আর মাত্র কয়েকটি বৎসর পরে চুলে তাহার পাক ধরিবে—মুখের হাড়গুলি উঠিবে জাগিয়া—দেখিতে সে একেবারে কুৎসিত হইয়া যাইবে। সহসা বুক ভাঙিয়া তাহার দীর্ঘনিবাস বাহির হইয়া আসিল। এজীবনের কোন সাধ-আহ্লাদই তাহার পূরণ হইল না। যাহার জন্য এই দেহের যত্ন করা—এ সংসারের সুখ-দুঃখের মূলে যে সে আজ কোথায়? কি হইবে দেহ দিয়া? কি আকর্ষণ তাহার সংসারে? ছয়টি বৎসর চলিয়া গিয়াছে আরও অন্ততঃ চৌদ্দটি বৎসর পরে সে হয় তো ফিরিয়া আসিবে। কল্যাণী মনে মনে হিসাব করিল বত্রিশ আর চৌদ্দ ছয়চাল্লিশ। সে যখন ফিরিয়া আসিবে কল্যাণী তখন একেবারে বুড়ী হইয়া যাইবে। কিন্তু সে আর ফিরিয়া আসিবে তো? সেই ‘কালাপানির’ ভ্রূশে এত দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া সে বাঁচিয়া থাকিবে তো? কল্যাণী আর ভাবিতে পারে না—বুক তাহার দুরু দুরু করিতে থাকে—দুই চোখ উঠে অশ্রুতে ভরিয়া। দৌড়-ঝাঁপ করিয়া সিঁড়ি ভাঙিয়া অজয় আসিয়া ঘরে ঢুকিল। হাতের বই-খাতা একপাশে টেবিলের উপরে রাখিয়া দিয়া কল্যাণীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিতে লাগিল। কল্যাণীর হাতের দিকে নজর পড়িতেই বলিয়া উঠিল—ও কিরে এমন মদুসলমানের মত টুপি পরে এলি কোথেকে? অজয় হাসিতে হাসিতে মাঝে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—ইস্‌ মদুসলমানের মত বই কি? একে কি বলে জান মা—গান্ধী-টুপি, খন্দর দিয়ে তৈরী। ভাল করে চেয়ে দেখ না লাল কালি

নিজের পেরুর মাঝের দিকে লেখা হইয়াছে যে।

কল্যাণী বলিল—কিন্তু তুই কোথায় পেলি শূনি?

—আমি কিনেছি মা—চার আনা দাম নিয়েছে। আমাদের ক্লাশে আরও কত ছেলে কিনেছে। খাটের উপরে বসিয়া পড়িয়া অজয়কে তাহার কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া কল্যাণী কতক্ষণ একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। ইতিপূর্বের চিন্তার সূত তাহার এখনও হারাওয়া যায় নাই। অজয় দুই হাত দিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—কাল একটা জিনিষ দেখে এসেছি মা।

কল্যাণী বলিল—কি রে?

—তুমি আগে বল মা—জ্যাঠামণিকে বলবে না? জ্যাঠামণি শুনলে রাগ করবে।

কল্যাণী বলিল—আবার বুঝি সভায় গিয়েছিল?

—না মা সভা নয়—কাল বিকালে মীর্জাপুর পাকের চরকা-প্রদর্শনী হচ্ছিল। দলে দলে লোক চরকা নিয়ে বসে সূতো কাটছিলো। একপাশে পুরুষ—একপাশে মেয়েছেলে—আমি গুণে দেখেছিলাম মা, পুরুষেরা ছিল পণ্ডাশজন—মেয়েছেলেও ছিল পণ্ডাশজন। একশটা চরকায় একসঙ্গে সূতো তৈরী হচ্ছিল। ঘরের ভেতরে ভোমরা যেমন ভোঁ-ভোঁ করে ডেকে বেড়ায়—তেমনি করে চরকার শব্দ হয়—একশটা ভোমরা যেন একসাথে গান ধরেছিল মা। বড় ভাল লাগছিল আমার। হাঁ মা, তুমি চরকা দেখেছো?

কল্যাণী বলিল—দেখেছি আমাদের গায়ে তাঁতিদের বাড়ী ছিল।

আমাদের ক্লাশের অধীরের মা নাকি খুব চরকা কাটতে পারেন বলে—এ মাসের সূতো দিয়ে তাঁর নাকি একখানা কাপড় তৈরী হবে। আচ্ছা মা, তুমি কেন চরকা কাট না? জ্যাঠামণিকে যদি বল, তিনি চরকা কিনে এনে দিবেন।

কল্যাণী হাসিয়া বলিলেন—চরকা কেটে কি হবে রে?

বাঃ তুমি জান না বুঝি? মহাশয় যে বলেছেন—চরকা কাটলে স্বরাজ আসবে? কেন বলেছেন জান মা—ইংরেজেরা বছরে আমাদের দেশে ষাট কোটি টাকার কাপড় বিক্রী করে—আমরা যদি নিজেদের কাপড় নিজেরা

তৈরী করে পরি—তাহলে আর তাদের কাপড় এদেশে বিক্রী হবে না—তারা না খেতে পেয়ে মরবে। আমাকে একখানা খন্দরের ধুতি আর জামা কিনে দেবে মা?

কল্যাণী বলিল—কিন্তু অত মোটা কাপড় তুই পরতে পারবি কেন?

—তুমি দেখো মা, আমি খুব পারবো—বড় ইচ্ছে করে মা খন্দরের ধুতি পরে জামা গায়ে দিয়ে—গান্ধী-টুপি মাথায় দিয়ে ইস্কুলে যাই।

—আচ্ছা সে দেখা যাবে, নে এখন খেতে চল, বলিয়া কল্যাণী তাহাকে রান্না ঘরের দিকে টানিয়া লইয়া গেল। পরেরদিন বিকালবেলা অজয় ইস্কুল হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতেছিল। আজ কতকগুলো কলেজের ছাত্র আসিয়া ছুটির পরে তাহাদের ইস্কুলের সামনের ছোট পাকটায় সভা করিয়াছে। তাহাদের ইস্কুলের ফাণ্ট-ক্লাশের সেকেন্ড ক্লাশের কত ছেলে স্বেচ্ছাসেবক হইল—এমনকি থার্ড ক্লাশের দুই-তিনজনের নামও তাহারা লিখিয়া লইল। অজয়ের ভারী ইচ্ছা ছিল কিন্তু সে আগাইয়া যাইতেই তাহারা বলিয়া উঠিল—তাহাকে লওয়া হইবে না—তাহার বয়স এখনও ষোল বৎসর হয় নাই। ষোল বৎসরের কমে নাকি স্বেচ্ছাসেবক করা হইবে না। সেই হইতে অজয়ের মন মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। সে মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল তাহার বয়স এই চৌদ্দ বৎসর আট মাস হইল—আরও এক বৎসর চার মাস না গেলে সে স্বেচ্ছাসেবক হইতে পারিবে না। ততদিন কি স্বদেশী আন্দোলন থাকিবে? স্বরাজ যদি ইহার ভিতরেই আসিয়া যায় তবে তো আর স্বদেশী আন্দোলন হইবে না! তখন কি আর স্বেচ্ছাসেবকের দরকার হইবে? যদি স্বদেশী আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক না হইতে পারিল—তবে কি হইবে তাহার লেখাপড়া শিখিয়া? কি হইবে ইংরাজী শিখিয়া? আচ্ছা আচ্ছা, স্বরাজ পাইলে ইংরেজরা তো সব বিলাতে চলিয়া যাইবে? তখন আর ইংরাজী পড়িয়া লাভ কি? হঠাৎ ইংরাজী শিখিবার সমস্ত উৎসাহ তাহার নিভিয়া গেল। অজয় যদিও সেদিন, তাহার জ্যাঠামশাই যে সরকারী চাকুরী করেন তাহা তাহাদের ক্লাশের সকলের কাছে বলিবে—মিথ্যা বলিয়া! কাহাকেও ভুলাইবে না বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত সে তাহা কাহারও কাছে বলিতে পারে নাই। ক্লাশে প্রফেসর দ্বন্দ্ব সাহেব তো নিজের চোখেই নিত্য দেখিত—তাহাকে সকলে পুর্লিশ সাহেব বলিয়া ঠাট্টা করিত—তাহার পিতার সম্বন্ধেও কেউ বিশেষ সম্মান করিয়া কথা বলিত না। হয় তো অজয়কেও সকলে তেমনি করিয়া ঠাট্টা করিবে তাহার জ্যাঠা-

মণিকেও কেহ সম্মত করিয়া কথা বলিবে না— সে তাহা কেমন করিয়া সহ্য করিবে? সেদিন ক্রাশে আসিয়া প্রফুল্ল সকলকে শুনাইয়া বলিয়া উঠিল—এই ভাই, তোমরা শোন সম্ভাই—অজয় একটা আস্ত মিথ্যাবাদী। সেদিন যে ও বলেছিল ওর জ্যাঠামণি সরকারী চাকরী করেন না—আজ আমি বাবার কাছে শুনে এসেছি—কান্টমস্ হাউস তো গভর্নমেন্টের—কান্টমস্ হাউসে যারা চাকরী করে তারাও সরকারী চাকরে। প্রফুল্লর কথা শুনিয়া সকলে নানা গবেষণা আরম্ভ করিল—পরে ইস্কুলের খার্ড মাস্টার মহাশয়ের নিকট হইতে তাহাদের সংশয় ভঞ্জন করিয়া আসিয়া অজয়কে কেহ কেহ ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে ছাড়িল না। কিন্তু সেই যে তখন হইতে অজয় ঘরের মেঝের উপরে চোখ নামাইয়া চুপ করিয়া একপাশে বসিয়াছিল—শেষ পর্যন্ত আর একবারও ভাল করিয়া মুখ তুলিয়া চাহে নাই—কাহারও সাহিত একটি কথাও কহে নাই। ছুটি হইলে ধীরে ধীরে ক্রাশ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। ইহার পর হইতে তাহাদের ক্রাশে তাহার কেহ বন্ধু রহিল না। প্রফুল্ল অজয় প্রভৃতি যাহাদের অভি-ভাবকগণ সরকারী চাকরী করেন তাহাদের সব এক বেঞ্চে বসিতে হইত—কোন ছেলে তাহাদের সাহিত বসিতে চাহিত না। অজয় কোনদিন ইহার কোন প্রতিবাদ করিত না—সমস্ত ঠাট্টা-বিদ্রূপ ন্যায্য পাওনা বলিয়া চুপ করিয়া সহ্য করিত। বাড়ীতেও অজয় তেমনি চুপ চাপ থাকিত। যে ছেলে দিনরাত হরিণের মত—সব সময় ছুটোছুটি করিয়া বেড়াইত—হাসিয়া চাঁৎকার করিয়া সব সময়ে বাড়ীর মাতাইয়া তুলিত—তাহাকে এমনি চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সকলে চিন্তিত হইয়া পড়িল। আজ-কাল আর অজয় সম্ভাব্যে তাহার জ্যাঠামণির জন্য বসিয়া থাকে না। কোন কোন দিন তাহার নিজের বিছানায়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকে—কোনদিন বা আলোর সম্মুখে চুপ করিয়া বই খুলিয়া বসিয়া থাকে। সম্ভাব্যেলা অমিয় প্রত্যহ অজয়ের আশায় নিজের ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন—অজয় প্রায়ই আসে না। যদিবা কোনদিন তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যান কিন্তু অজয় একটি কথাও কহে না। গল্প বলিতে গেলে যাহার আগ্রহের সন্ত থাকিত না—গল্পের মাঝে মাঝে কত সম্ভব অসম্ভব প্রশ্ন করিয়া যে তাহাকে বাস্তবাস্ত করিয়া তুলিত—সেই অজয় আজকাল এমনি অসম্ভব গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে।—কোন আগ্রহই আর তাহার দিক হইতে প্রকাশ পায় না। অমিয়র মনে হয় অজয় কিছু শুনিতেন না। তাহার গল্প বলবার সমস্ত আগ্রহ নিঃশেষ হইয়া যায়—মাঝখানেই হয় তো তিনি থামিয়া পড়েন। অমিয় ভাবিয়া পান না, অজয় এমনি হইয়া গেল কেন? কি হইয়াছে তাহার? ভাবিয়া

সেদিন সম্ভাব্যেলা অমিয় অজয়কে নিজের কোলের ভিতরে টানিয়া লইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন—তোর কি হয়েছে অজয়—কেন তুই আর আগের মত আমার কাছে আসিস নে—কথা বলিস নে। অজয় কোন কথার জবাব না দিয়া চুপ করিয়া তাহার কোলের ভিতর মুখ লুকাইয়া পড়িয়া রহিল। কতক্ষণ চুপচাপ কাটিবার পর অমিয় বুঝিতে পারিলেন—অজয় তাহার কোলের ভিতরে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। তিনি জোর করিয়া অজয়র মুখ নিজের বুকের উপরে চাপিয়া ধরিয়া চোখের জল মুছাইয়া পুনরায় বলিলেন—আমাকে বলবি না অজয়—তুই ছাড়া আমার আর কে আছে রে? তুই যদি আমাকে এমনি করে বাথা দিস—তবে আমার দুঃখ আর কাকে জানাব বলতো? বলিতে বলিতে তিনিও কাঁদিয়া ফেলিলেন। কিছুক্ষণ পরে অজয় মাথা তুলিয়া বলিল—আমাকে যে সবাই ঠাট্টা করে, অপমান করে জ্যাঠামণি! অমিয় বলিলেন—কে তোকে ঠাট্টা করে—কেন করে অজয়?—তুমি সরকারী চাকরী কর বলে সবাই যে আমাকে অপমান করে—তোমাকে তাচ্ছিল্য করে! এতক্ষণ সমস্ত ব্যাপার অমিয়র নিকট পরিস্কার হইয়া গেল।—করলেই বা আমাকে তাচ্ছিল্য—যারা ভাল ছেলে তারা তো কার, গুরুজনকেই তাচ্ছিল্য করে না অজয়! তাদের যা ইচ্ছে তাই করুক—তাদের কথায় কোন দিসনে জ্যাঠামণি। তুই তো আমাকে ভালবাসিস—তুই তো আমাকে তাচ্ছিল্য করিস নে!—কিন্তু জ্যাঠামণি—মহাশয় যে বলেছেন সরকারী চাকরী করতে নাই—ইংরেজের সাহায্য করও নাই। কিন্তু অমিয় তাহার কোন কথার আর কোন জবাব দিতে পারিলেন না। তাহার মনের ভিতরে নানা চিন্তা বারে বারে পাক খাইয়া উঠিতে লাগিল। একি সর্বনাশ হইল তাহার—যে অজয়কে নিজের পুত্রের মত করিয়া আদর যত্নে এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন—তাঁহার স্বাভাবিক স্নেহপ্রবণ অন্তরের সমস্ত স্নেহ যাহার উপরে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন—নিজের পুত্র তো অনেক দিনই তাঁহার নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে—আর কোন দিন যে নিজের কাছে তাহাকে ফিরিয়া পাইবেন, সে আশাও বড় একটা নাই—এই অজয়ই তো তাঁহার সারাচিন্তা ঘিরিয়া ছিল—পুত্রের অভাব অনেক-খানি পূরণ করিয়া রাখিয়াছিল। আজ এমনি করিয়া একি সর্বনাশা চিন্তা তাহার মাথায় ঢুকিয়া, তাহাকে তাঁহার নিকট হইতে দূরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। অমিয় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন—আর একান্ত চেষ্টা করিয়াও অজয় তাহার পুত্রের সে শ্রদ্ধা তাঁহার উপরে রাখিতে পারিতেছে না। সমস্ত চিন্তা তাঁহার বাথায় টনটন করিয়া উঠিল। মাস খানেক পরে সেদিন সম্ভাব্যের পরও অজয় বাসায় ফিরিয়া না

অজয় কোথায় গেল—কি হইল ভাবিয়া অমিয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। রাস্তায় নামিয়া তাহাকে খুঁজিয়া দেখিবার জন্য বাহির হইতেছিলেন—এমন সময় তাঁহাদের বাড়ীর ঠিকানা খুঁজিয়া বাহির করিয়া একটি যুবক আসিয়া সংবাদ দিল—অজয় পুলিশের লাঠিতে আহত হইয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আছে। যুবকটি অন্যান্য সংবাদ যাহা বলিল—তাহার মর্ম এইঃ—কোথায় রাস্তা দিয়া কাল নিশান লইয়া কিসের জন্য বিক্ষোভ জানাইতে জানাইতে একদল ছাত্র পথ চলিতেছিল। সেই দলে অজয় ছিল—পুলিশ আসিয়া হঠাৎ শোভাযাত্রা আক্রমণ করে—লাঠি চালায়, অজয় এবং আরও ৮১০টি ছেলে আহত হয়। সমস্ত ব্যাপারটি অমিয় ভাল করিয়া বুঝিয়াও উঠিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে কখন কল্যাণী আসিয়া দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়াছে। অমিয় তাহার দিকে ফিরিয়া দেখেন তাহার দুই চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইতেছে। অমিয় বলিলেন—ছিঃ, কেন না বউমা—শিগগির এস এখনই আমাদের হাসপাতালে যেতে হবে যে। একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়া—কল্যাণীকে গাড়িতে উঠাইয়া নিজে জাইভারের পাশে বসিয়া পড়িয়া মেডিকেল কলেজের উদ্দেশ্যে জোরে চালাইতে বলিয়া অমিয় দুই চোখ বুজিয়া মনে মনে ভগবানের পায়ে শ্রদ্ধা মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন।

পাশাপাশি ৮১০টি বেড ৮১০টি ছেলে শুইয়াছিল তাহাদের অনেকেই অজয়ের চেয়ে বয়সে বড়—কেহ বা তাহার সমবয়সী। অমিয় অজয়ের পাশে বসিয়া ডুকিলেন—জ্যাঠামণি। কল্যাণী ডাকিল—অজয় বাবা।

কিন্তু অজয়ের তখন ভাল করিয়া জ্ঞান ছিল না। সে বড় বড় করিয়া দুই একবার উদ্দেশ্যহীন ভাবে চাহিয়া পুনরায় চোখ বুজিল। পাশের নার্সটি মাথায় আইস ব্যাগ ধরিয়াছিল—কথা বলিতে নিষেধ করিল। হাউস সার্জন আসিয়া জানাইয়া গেলেন—বিশেষ ভয়ের কারণ নাই—মাথায় আঘাত লাগিয়া এমনি হইয়াছে—সকাল পর্যন্ত অনেকটা ভাল হইয়া যাইবে। অজয়ের মাথার একপাশ খানিকটা কাটিয়া গিয়াছিল। অন্যান্য বেডের ছাত্রদেরও আত্মবিশ্বজন কেহ কেহ ইতিমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। জন দুই বয়স্ক ছাত্রের—সম্ভবত তাহারা কলেজে পড়ে—একজনের হাত ও একজনের পায়ের হাড় ভাঙিয়া গিয়াছে। জন তিনেকের অবস্থা আশংকাজনক। সারারাত্রি নিদ্রাহীন চোখে এই আহত ছেলেদের ভিতরে বসিয়া বসিয়া অমিয়র মাথায় নানা চিন্তা আসিয়া বাসা বাঁধিতে লাগিল। বিলাত হইতে কোন মহামান্য অতিথি বোম্বাইয়ে আসিয়া পদাৰ্পণ করিয়াছেন—আর ইহারা কয়েক শত মাইল দূরে এই কলিকাতা শহরে তাঁহার বিরুদ্ধে এই যে বিক্ষোভ প্রকাশ করিতেছিল—তাহা কি

হইয়া পড়িয়াছিল? এই বিস্ফোভ ও আজিকার সারাদিন ধরিয়া শহরে যে হরতাল চলিতেছিল তাহার ভালমন্দ বিচার না করিয়াও তাহার বারে বারে শৃঙ্খল এই কথাই মনে হইতেন—যাহারা শৃঙ্খল মুখের প্রতিবাদ জানাইতেছিল—কাহাকেও আঘাত করে নাই—অহিংসা যাহাদের মূলমন্ত্র সেই নিরীহ শোভাযাত্রীদের উপরে এমন নিরম আঘাত হানিবার কি কারণ থাকিতে পারে? জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা তিনি ভাল করিয়াই কাগজে পড়িয়াছিলেন—সেই স্মৃতি তাহার মনে আবার নতুন করিয়া জাগিয়া উঠিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় নিরমতার নিদর্শন অতি বিরল—হয় তো অনুরূপ ঘটনা একটিও আর পৃথিবীর ইতিহাসের পাতা একের পর এক উল্টাইয়াও বাহির করা যায় না। তবে ইহাই কি নিয়ম? পরাধীন জাতির অদৃষ্টে এমনই কি জড়টিয়া থাকে? অমিয় যতবার এইসব ভাবিতে লাগিলেন—ততবারই আপনার মনে ইহার স্বপক্ষে কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাইলেন না। রাজনীতি তিনি বুঝেন না—তাহার স্বরূপও তাহার জানা নয়—তবু ইহা যে মানুষের নীতি নয়—ইহা তাহার মন নিশ্চয় করিয়া জানাইয়া দিল। তাহার দুর্বল মন—মুহূর্ত্ত মধ্যে দুর্বলতার সমস্ত ছদ্ম আবরণ একেবারে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া—যেন নতুন করিয়া জাগিয়া উঠিল। উদ্বেজনায তাহার সারা দেহ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। বারে বারে শৃঙ্খল মনে হইতে লাগিল—এতদিন তবে যাহা করিয়াছেন, তাহা ভুল—যে শ্রম্ভার মর্ডার অন্তরে ধারণ করিয়াছেন—সে তাহার ছদ্মরূপ মাত্র সত্যকার রূপ আজ এই তাহার চারিপাশে আহতদের ভিতরে প্রকট! যুক্তি এখানে অচল। শোষণনীতির ভিতরে ধর্ম নীতির অব্যবহা পণ্ডশ্রম মাত্র।

দিন দশেকের মধ্যে অজয় সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। এই দশ দিন অমিয় অফিসে যান নাই। দিন রাত্রি অজয়ের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার শৃঙ্খলা করিয়াছেন। আজ বেলা গোটা তিনেকের সময় যখন তিনি অফিস হইতে বহির হইলেন—তখন বাহিরের আকাশ ব্যতাস আলো সব যেন নতুন করিয়া তাহার চোখে ধরা পড়িল—মুগ্ধ আকাশ-তলে বেন মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বাঁচিলেন। আজ এই মাত্র তিনি অফিসে পদ-ত্যাগপত্র দাখিল করিয়া আসিয়াছেন। তাহার মন বারে বারে বলিতে লাগিল—এ ভাল হইল—বেশ হইল! আজ এই দুই মাস ধরিয়া যে দ্বন্দ্ব তাহার অন্তরে চলিতেছিল—তাহাতে তিনি জয়ী হইয়াছেন—প্রলোভনকে মন হইতে বাড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে অমিয় কখন গড়ের মাঠে আসিয়া ঢুকিয়াছেন—সে খেয়াল তাহার ছিল না। আজ মনুমেণ্টের নীচে একটি সভা ছিল। দলে দলে শত শত হাজার হাজার লোক সেখানে

আসিয়া জমা হইতেছে। অমিয় আজ কাগজে দেখিয়াছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রমোহন, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি এখানে বক্তৃতা করিবেন। সমগ্র কলিকাতা সহরের লোক যেন—গড়ের মাঠে ভাগিয়া পড়িতেছে। অতি অভূতপূর্ব উল্লাস—এ কি প্রচণ্ড উল্লাস—সমগ্র জন-সমাজকে যেন কোন দুর্নিবার আকর্ষণে জোয়ারের জলের মত গড়ের মাঠে টানিয়া আনিতেছে। ছাত্র আছে, যুবক আছে, বৃদ্ধ আছে, কুলী, কেরানীর ভেদভেদ নাই—হিন্দু, মুসলমান, পাশাঁ, মাড়োয়ারী সমভাবে আসিয়া একই স্থানে মিলিত হইতেছে।

এ যেন—“বাগে খুলে যায় সব গৃহস্বার  
ভেগে বাহিরায় সব পরিবার  
সুখ সম্পদ মায়া মমতার  
বন্ধন যায় টুটে।”

একপাশে দাঁড়াইয়া দৌঁধতে দৌঁধতে অমিয়র অন্তর একেবারে উল্লাসে নড়া করিয়া উঠিল। চিত্তরঞ্জন বক্তৃতা করিয়া যাইতেছিলেন—সেই বক্তৃতার প্রতিটি বাণী তাহার দুই কানের পরদা ভেদ করিয়া একেবারে যেন মর্মে গিয়া বিধিতোছিল। যখন বাড়ি ফিরিতেছিলেন তখনও তাহার মনে অসহযোগ, অহিংসা, ত্যাগ, চরকা এই সব কথাই ঘুরিয়া ঘুরিয়া একের পর এক জাগিয়া উঠিতেছিল। সম্মুখের বাসায় ফিরিয়া আসিয়া কল্যাণীর ঘরের কাছে গিয়া ডাকিলেন—বউমা! কল্যাণী একপাশে আসিয়া দাঁড়াইলে বলিতে লাগিলেন—আজ চাকরী আমি ছেড়ে দিয়ে এলাম বউমা।

কল্যাণী আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল—ছেড়ে দিয়ে এলেন?

—হাঁ।

—কিন্তু হঠাৎ কি কারণ হলো—আর বছর দুই পরে যে পেনসনের সময় হোত?

অমিয় হাসিয়া বলিলেন—কারণ? কারণ তো এক কথায় তোমাকে সব বোঝাতে পারবো না বউমা! আর পেনসনের কথা? সে তো আমি ভাল করে বুঝেই সব করেছি—টাকার লোভ আর আমার নাই বউমা! যে টাকা এতদিন ধরে চাকরী করে রোজগার করেছি—তাতেই আমার বাকী জীবনটা চলে যাবে—তোমাদেরও হয়তো খুব শীগগির কমে পড়তে হবে না। কিন্তু যার জন্যে সত্ত্বয় সেই যে চায় না টাকা। তুমি তো জান আমি স্নেহের কাঙাল—টাকার নয়। আমার অঞ্জুমণি যদি আমাকে চাকরীর জন্যে শ্রম্ভা করতে না পারে—তবে কি হবে সে টাকা দিয়ে বলতো? কল্যাণী জবাব দিল—কিন্তু অতটুকু ছেলে, তারই কথায় আপনি অত বড় চাকরী ছেড়ে এলেন?

অমিয় পুনরায় হাসিয়া বলিলেন—ছেলে অতটুকু বউমা, কিন্তু ব্যাপারটিতো অতটুকু নয়—অঞ্জু ছাড়া আমার আর কে আছে বলতো? আর এইই শৃঙ্খল আজ একমাত্র কারণ নয়।

অঞ্জুই আমার চোখ ফুটিয়েছে। সেদিন হাস-পাতালে সারারাত্রি ধরে বসে বসে এই চিন্তাই আমি অনবরত করেছিলাম—তারপর এই কয়দিন ধরেও কম ভাবিনি। জীবনটা এখন থেকে আমার অন্যথায় চলিয়ে নিতে চেষ্টা করবো। আমি ভীতু মানুষ, আমি নিতান্ত সংসারী মানুষ—কিন্তু আজ তোমায় আমি সত্যিকারে বলাই বউমা—ভয় আর আমার নাই—অর্থের মোহ আর আমার নাই—আমি স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেব।

কল্যাণী বিস্ময় ও আতঙ্কে কণ্ঠকিত হইয়া প্রশ্ন করিল—কিন্তু পুলিশে দলে দলে লোক ধরে জেলে দিচ্ছে যে!

অমিয় তেমনি হাসিমুখেই বলিলেন—হয় তো আমার অদৃষ্টেও অন্যথা হবে না বউমা! কিন্তু তোমাদের ব্যবস্থা আমি করে যাবো—সে দিক দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

কল্যাণী পুনরায় বলিল—আপনার শে শরীর—যে স্বাস্থ্য।

কিন্তু অমিয় কোন জবাব না দিয়া হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। অজয় এতক্ষণ ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিতোছিল—হঠাৎ একেবারে ছুঁটিয়া আসিয়া দুই হাত দিয়া অমিয়কে জড়াইয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিল—সত্যি চাকরী ছেড়ে দিয়েছো জ্যাঠামণি!

অমিয় তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন—হাঁ রে, তুই খুঁসি হয়েছিস তো অঞ্জু?

অঞ্জু মাথা হেলাইয়া জানাইল—সে খুব খুঁসি হইয়াছে।

—আমি যদি জেলে যাই, তুই কাঁদবি না তো?

অজয় খানিকটা কি ভাবিয়া লইয়া বলিল—কান্না আমার পাবে জ্যাঠামণি। কিন্তু ভাল কাজে তো চেতের জল ফেলতে নাই! সবাইকে আমি বুক ফুলিয়ে বলবো—আমার জ্যাঠামণি যে সে লোক নয়—কত বড় চাকরী তিনি ছেড়েছেন—দেশের জন্যে জেলে গেছেন। আবার যখন তুমি ফিরে আসবে জ্যাঠামণি—তোমার কোলের মধ্যে বসে বুক আমার আনন্দে ফুলে উঠবে যে!

অমিয় আর একটা কথাও না বলিয়া ধীরে ধীরে অজয়ের মাথায় পরম স্নেহে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

#### পশ্চিমবঙ্গ অধ্যায়

মাস খানেকের ভিতরে চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রমোহন, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি বড় বড় নেতাদের সহিত অমিয়র পরিচয় হইয়া গেল। স্থির হইল তিনি গ্রামে ফিরিয়া যাইবেন। গ্রামে নিজেদের বাড়ীতে একটি আশ্রম করিয়া সেখানে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, তাঁ ও চরকা প্রচলন প্রভৃতি করিতে হইবে।

কালীয়া তখন “গৌড়ীয় সর্ববিদ্যালয়” নামে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। তাহারই অধীনে বাঙলার সর্বত্র স্কুল কলেজ খোলা হইতেছে। কলিকাতা হইতে আরও জনতিনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি অমিয়র আগ্রমে যোগ দিবেন ঠিক হইল। কল্যাণী ভাস্করের কোন কথাই প্রতিবাদ করে নাই। সমস্তই নীরবে সমর্থন করিয়া চলিয়াছে। অজয় যাত্রার ৫।৬ দিন পূর্বেই মহাউৎসাহে সমস্ত জিনিসপত্র বাঁধা-ছাদা করিতে লাগিয়া গিয়াছে। যে ইস্কুল শূণ্য “গোলামখানা” যেখানে শূণ্য ইংরাজের খোয়ালখুশী মত তাহাদের ভাষা তাহাদের আচার ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হয়, সেখানে আর তাহাকে পড়িতে হইবে না। গ্রাম সে দেখে নাই—তাহার মার নিকট সে কত গল্প শুনিয়াছে। মনে মনে কত তাহার ছবি আঁকিয়াছে—নদী গাছপালা, মাঠ—মাঠ ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু। তাহার নিজের গ্রাম—নিজের জন্মমাটি!

জ্যোতির্ময় বলেন—গ্রামই তো দেশের আসল রূপ—গ্রামের উন্নতি না হইলে স্বরাজ আসিবে না! কলিকাতা হইতে ডাঃ রায় যাইবেন, অধ্যাপক বসু যাইবেন, আর যাইবেন নামকরা লেখক জ্যোতির্ময় দত্ত। উঃ কত বড় বড় লোক ইহারা সকলে। সে দেশের কাজ করিবে—অবসর সময়ে ইহাদের নিকট লেখাপড়া করিবে। আর সে কি যা তা লেখাপড়া? সেকালের মনিষ্যের আগ্রমের মতো—গুরুর কাছে বসিয়া বসিয়া সে সর্বপ্রকারের বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া লইবে। সংস্কৃত ভাল করিয়া পড়িবে। আচ্ছা গেরুরা রঙে কাপড় ছোপাইয়া লইয়া পুরিলে—মাথায় স্বামী বিবেকানন্দের মত পাগড়ী বাঁধিলে কেমন হয়? পাগড়ী বাঁধিবে কি মাথায় গান্ধী টুপি দিবে এ লইয়া তাহার মনে স্বপ্ন বাধিয়া যায়। এমনি করিয়াই রাতদিন নানা চিন্তা অজয়ের মাথায় খেলিতে থাকে। কিছুদিন ধরিয়া কাত্যায়নী দেবী বাড়ী আসিয়া বাস করিতেছিলেন। দুই বাড়ীতে খান-তিনেক ঘর এখনও কোন প্রকারে টিকিয়া ছিল। সেই-গাউলি সংস্কার করিয়া লইয়া এবং আরও দুই একখানা নতুন করিয়া তুলিয়া আগ্রমের কাজ চালান হইবে ঠিক হইল। অজয় গ্রামে আসিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল। এতদিন সে এক পাও বাহিরে যায় নাই। গ্রাম যে এত সুন্দর তাহা তো সে জানিত না। এত ফাঁকা জায়গা যেখান সেখান হইতে তাকাইলেই—প্রত্যেক দিকের আকাশের একেবারে শেষ সীমা পর্যন্ত চোখে পড়ে। কলিকাতার বাসায় এতটুকু হাওয়ার জন্য তাহারা কত সময় জানালার পাশে হা করিয়া বসিয়া থাকিয়াছে—আশেপাশের বাড়ীগুলোর ফাঁক দিয়া কোনক্রমে একটু হাওয়া ঘরে ঢুকিলে, তাহার মন উল্লাসে ভরিয়া

উঠিয়াছে। আর এয়েন আলো ও হাওয়ার সমুদ্র—কোন বাধা নাই—বন্ধ নাই। আলো-বাতাসের জন্য পথ চাহিয়া থাকিতে হয়, ইহা এখনকার লোকে ভাবিতেই পারে না। সারা গ্রামময় কত গাছ—আম, কাঁঠাল, জাম, নারিকেল আরও কত সব। অজয় সবগুলির নামও জানে না। বাড়ীর সম্মুখে নদী মানুষ অবোধে এখানে স্নান করে, সাতার কাটে। অজয় সাতার দিতে জানে না—গাছে চড়িতে পারে না। সে মনে মনে সংকল্প আঁটিল, এই সবই তাহাকে শিখিয়া লইতে হইবে। মাস খানেকের মধ্যে বাড়ীর সংস্কার করিয়া লওয়া হইল। কলিকাতা হইতে ডাঃ রায়, অধ্যাপক বসু এবং সাহিত্যিক জ্যোতির্ময় দত্ত আসিয়া পেঁপাছিলেন। ইতিপূর্বেই এই অঞ্চলে আন্দোলনের ঢেউ আসিয়া পেঁপাছিল—এখন রীতিমত সাড়া পড়িয়া গেল। বাহিরের বৈঠকখানা ঘরে বিদ্যালয় বসিল। ২৫।৩০টী ছেলে ইহারই মধ্যে জুটিয়া গিয়াছে—তাহারা লেখাপড়া করিবে, চরকা কাটিবে—তাই বোনা শিখিবে। ইহাদের ভিতরে যাহারা একটু ব্যস্ত, দরকার হইলে আন্দোলনের অন্যান্য কাজও তাহারা করিবে। ইহা ছাড়া নানা স্থান হইতে আরও বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ হইতে লাগিল। নিকটবর্তী মহকুমা সহরটীতে সংগৃহীত স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য অন্য একটি ক্যাম্প করা হইল—সেখান হইতে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকগণ পকেটিং করিবে। স্বদেশী জিনিসের প্রচার করিবে ইত্যাদি কর্মপ্রণালী স্থির হইল। আজ বৈকালে অমিয়র নিজের গ্রাম সোণাতলায় খুব বড় একটি সভা হইবে বলিয়া প্রচার করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। শ্বিপ্রহর হইতেই দলে দলে হিন্দু, মুসলমান নানা শ্রেণীর লোক সোণাতলার দিকে আসিতেছিল। সভায় বসিয়া এই জনসমাগমের কথা চিন্তা করিয়া অমিয়র বুকু আনন্দে ও গর্বে ফুলিয়া উঠিল। সভা আরম্ভের কিছুক্ষণ পূর্বে তিনজন ভদ্রবর্ষী মুসলমান আসিয়া সভাক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। ইহাদের ভিতরে একজনকে অমিয় চিনিতেন—তিনি জামালপুরের লতিফ মিঞা—তাহাদের মহকুমা সহরের উকিল। লতিফ মিঞা অন্য দুইজনের পরিচয় করাইয়া দিলেন। অন্য দুইজনের আর একজনও উকিল এবং একজন এ অঞ্চলের বিশেষ নাম করা তালুকদার। লতিফ মিঞা জানাইলেন—তাহারা আর ওকালতী করিবেন না—তিনজনেই আন্দোলনে যোগ দিবেন। অমিয় একেবারে আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। ইহাদের মত নাম করা মুসলমান আন্দোলনে যোগ দিলে, আর ভাবনা কি—দুই দিনেই সমস্ত মুসলমান সমাজ কংগ্রেসে আসিয়া পড়িবে না! অমিয় তাহাদের সাহিত্য ভাবের আগে কোলাকুলি করিয়া লইয়া—কলিকাতার বন্ধুদের সাহিত্য

তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন! সভা সেদিন খুব জমিয়া উঠিল—ডাঃ রায়, অধ্যাপক বসু, জ্যোতির্ময় দত্ত ও অমিয় বক্তৃতা দিলেন। লতিফ মিঞা খেলাফৎ আন্দোলনের কথা মুসলমান দিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন—বিলাতী কাপড় আর লবণ বর্জন করিতে অনুরোধ করিলেন। সমস্ত সভার লোক যেন একেবারে মাতিয়া উঠিল মুহম্মদঃ সেই “জনতা বন্দে মাতরম্”, আল্লা হো আকবর, মহাত্মা গান্ধীক জয় ধ্বনি করিতে লাগিল। অক্ষয় এবারও আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল। পরের দিন বিকালে তাহাকে সঙ্গে করিয়া চাঁদার খাতা লইয়া অমিয় গ্রামে বাহির হইলেন। ইদানিং তাহাদের গ্রামে রায়দের আর্থিক অবস্থাই সবাইকে ছাড়িয়া উঠিয়াছে—তাই প্রতিদিন বৈকালে তাহাদের বৈঠকখানায় মান্যগণ্য ব্যক্তিদের আড্ডা বসে। অমিয় সেখানে পেঁপাছিলেই সকলে তাহাকে সমাদর করিয়া বসাইলেন। বৃন্দ কলীনাথ ভট্টাচার্য বলিলেন—এই বাপু, তোমাদের কথাই এতক্ষণ ধরে হচ্ছিল। কি জিনিসই তোমরা দেশে এনেছো—আহা, এ যেন সেই মহাপ্রভুর ঘরে ঘরে হরিনাম প্রচারের মত—“শান্তিপুত্র ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়!” মহাপ্রভুর মতই মহাত্মাজীও “আচ্ছাডালে” কোল দিলেন—আহা তা নইলে কি আর মহাপুরুষ হয়? বলিয়া তিনি যত্ন কর কপালে ঠেকাইয়া উদ্দেশ্যে নমস্কার করিলেন।—আর তাও বলি বাপু—এতো ভগবানেরই খেলা—গীতায় যে বলেছে—“যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি”—সেই অবস্থাই তো এসেছে আজ—ধর্ম কি আর দেশে ছিল? তাই না মহাত্মাজীর আবির্ভাব! অমিয় মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন। হির-মোহন সৈকদার বলিয়া উঠিলেন—অমিয় ভায়া সত্যি সত্যি কিন্তু স্বরাজের মানোটা আমি এখনও ভাল করে বুঝে উঠতে পারিনি। একটু বুঝিয়ে দাও দেখি? অমিয় জবাব দিলেন—স্বরাজ মানে—স্ব-রাজ। বিদেশীর শিক্ষা বিদেশীর দীক্ষা আমরা নেব না। বাক্যে কার্যে মনে আমরা একেবারে স্বদেশী হয়ে উঠবো। আমাদের যা কিছু প্রাচীন—যা কিছু পূর্বকাল আদর্শ তা যে আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের সহায়—তা আমরা বুঝতে পেরেছি। ইংরেজের ভাষা শিখে, তার গোলামী করে, আর আমরা নিজেদের ধর্মকর্মকে বিসর্জন দেব না—নিজেদের প্রাণের সঙ্গে এক করে নেব। ভারতীয় সংস্কৃতি—হে সংস্কৃতি একদিন আমরা অবহেলায় বিসর্জন দিয়েছিলাম—তাকেই আঁকড়ে ধরবো—সেইতো স্বরাজ! স্বরাজ মানে আত্মশুদ্ধি—স্বরাজ মানে আত্মচেতনাবোধ। স্বরাজ মানে স্বাবলম্বী হওয়া—নিজের জমির খান, বাড়ীর গরুর দুধ, বাগানের তরকারী আর চরকার কাটা সুতোর কাপড়—বাস—এর

বেশী আর কি চাই—এই তো স্বরাজ! বিলাসিতা আমরা ত্যাগ করবো—ভোগের পথ ভারতের ঋষিদের পথ নয়। সকলে নিস্তম্ভ হইয়া অমিয়র কথা শুনিতোছিলেন। বৃন্দ কালীনাথ বারোবারে মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া অমিয়র কথায় সায় দিয়া যাইতেছিলেন। তাহার কথা শেষ হইলে বলিয়া উঠিলেন—বাঃ বড় চমৎকার ব্যাখ্যা করেছে বাবু! শ্যামাচরণ সরকার ওকালতী করেন—তিনি বলিয়া উঠিলেন—কিন্তু স্বরাজ হলে ইংরেজদের কি হবে—দেশের রাজা হবে কে?

কাশীনাথ বলিয়া উঠিলেন—সে আর এমন শক্ত কথা কি? ইংরেজ রাজা আছে—সে নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকারটা কি শুন? আমাদের কথা হচ্ছে—তোমরা রাজা আছ থাক কিন্তু অবিচার করতে পারবে না—দেশে সুবিচার করতেই হবে, তোমাদের ধর্ম এনে, বিলাসিতা এনে, উচ্ছৃঙ্খলতা এনে, তোমাদের জিনিসপত্তোর এনে, আমাদের দেশে চালাতে পারবে না। অমিয় ঘাড় নাড়িয়া তাহার কথায় সম্মতি জানাইলেন। কিন্তু উকিল শ্যামাচরণ বৃদ্ধিলেন না। পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—আচ্ছা যদি ইংরেজ আমাদের কথা না মেনে—শিক্ষা তাদের চালাতেই থাকে, ধর্ম প্রচার করতেই থাকে, বিলাতী কাপড় ইত্যাদি বিক্রী করতেই থাকে—কি করবেন তা হলে? অমিয় জবাব দিলেন—বয়কট—বিলাতী জিনিস কিনবো না—ইংরাজী ইস্কুলে পড়বো না—জাতীয় বিদ্যালয় তো খোলা হচ্ছে! শ্যামাচরণ পুনরায় বলিলেন—কিন্তু জাতীয় নেতাদের, স্বেচ্ছাসেবকদের দলে দলে জেলে দিচ্ছে যে!

—দিক না জেলে—কত জনকে জেলে দেবে শুন? দশ হাজার, বিশ হাজার, এক লাখ—এক কোটি? ত্রিশ কোটি ভারতবাসী আমরা!

কাশীনাথ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—তোমার ওকালতী তরু থামাও তো শ্যামাচরণ! বিশ্বাস করতে শেখো। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর! কিন্তু তবু শ্যামাচরণের মনে যেন কোথায় সন্দেহ রহিয়া গেল—মন যেন তাহার সব কথায় সায় দিতে চাহিতেছিল না।

চাঁদার খাতায় মোটা রকমের কতকগুলি অঙ্ক লিখিয়া লইয়া অমিয় ও অক্ষয় সেখান হইতে আবার পথে নামিয়া পড়িলেন। ইচ্ছা ছিল এখন জামালপুরের দিকে যাইবেন। রাস্তার একধারে কতকগুলি ছেলে একসঙ্গে গান গাহিতেছিল—

—ও আমার দেশের মাটি,

তোমার পায়ের নোয়াই মাথা—

অক্ষয় বলিল—দেখেছেন দাদা, ছোট ছোট ছেলেরা পর্যন্ত কেমন মেতে উঠেছে—দেশকে এরাও মাতৃ-জ্ঞানে পূজা করতে শিখেছে। অমিয়র হৃদয়ও আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছিল—জবাব দিলেন—এ সবই ভগবানের অনুগ্রহ,

অক্ষয়—তা না হলে কি মন্ত্রশক্তির মত এমন করে এই বিশাল ভারতবর্ষ জেগে উঠতে পারে? কিছুদূরে মাঠের ভিতরে একটি বটগাছের তলায় কৃষকেরা বিশ্রাম করিতেছিল। তাহার পাশ দিয়াই পথ। অমিয় সেখানে যাইতেই তাহার উঠিয়া দাঁড়াইয়া অমিয়কে সেলাম জানাইল। নিতাই মণ্ডল একেবারে তাহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে আসিল—অমিয় তাড়াতাড়ি সরিয়া গিয়া কহিলেন—কর কি মণ্ডল—আমাকে পাপের ভাগী করো না। বলিয়া তাহার দৃষ্টি হাত ধরিয়া রাখিলেন। নিতাই মণ্ডল আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল—পাপ হ'ব কিসের জিনিস—আপনি বাওন না?

অমিয় হাসিয়া বলিলেন—বামুন হলেই হলো না ভাই—তুমি বয়সে কত বড় দেখো তো। কংগ্রেস বলেছেন, গান্ধীজী বলেছেন—এ সংসারে কেউ ছোট নয়—কাউকে ছোট বলে মনে করবে না। স্বরাজ হলে কেউ কাউকে ছোট বলে মনে করবে না। নিতাই হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। অমিয় অপর পার্শ্বে দণ্ডায়মান কৃষকটির পিঠে হাত রাখিয়া ঘলিলেন—ভাল আছ তো গহর ভাই?

গহর অত্যন্ত বিনীতভাবে জবাব দিল—হাঁ বাবু, ভাল আছি।

—ছিঃ ভাই, বাবু কি বলতে আছে? বাবু আর আমরা নই—আমরা তোমাদের মতই—এই দেশেরই লোক একই মায়ের সন্তান। এখানে হিন্দু-মুসলমানের, ধনী-দরিদ্রের কোন ভেদ নাই—আমরা সব ভাই ভাই।

—স্বরাজ হ'লি আমাদের সুখ-সুবিধে তা কি হবে?

—তোমাদের সুখ-সুবিধাই তো আসল কথা ভাই। কৃষক হচ্ছে দেশের প্রাণ। কৃষিকাজের উন্নতি হবে—কৃষকের অবস্থার উন্নতি হবে, কেমন করে ক্ষেতে বেশি ফসল ফলান যায়, তার ব্যবস্থা হবে। পাটের দাম বাড়বে। আর তুমি মুসলমান, তোমাকে খাঁটি মুসলমান হতে হবে—যে হিন্দু, তাকে খাঁটি হিন্দু হতে শিক্ষা দেওয়া হবে। ধর্ম আমরা ভুলে গেছি ভাই—তাই তো আমাদের এই দুর্দশা। সকলে মাথা নাড়িয়া তাহাকে সমর্থন করিল। অমিয় পুনরায় সেখান হইতে বিদায় লইয়া মাঠের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন।

#### ষট্টিশ অধ্যায়

কল্যাণী বিকাল বেলা ঘরের দাওয়ার কম্বল পাতিয়া বসিয়া চরকা কাটিতেছিল—আর অজয় তাহারই পাশে বসিয়া গাহিতেছিল—“মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়

মাথায় তুলে নেবে ভাই।

দীন দৃখনি মা আমাদেব

তার বেশি আর সাধ্য নাই।”

সূতা কাটিতে কাটিতে ও গান শুনিতে শুনিতে কল্যাণী আনমনা হইয়া পড়িয়াছে—কখন হাতের চরকা থামিয়া গিয়াছে—খেয়াল নাই।

তাহার মনে হইতেছিল, তাহার জীবনের মাঝখানের কলিকাতা বাসের দশটি বৎসর কোথায় অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। এ যেন কোনদিন সত্য করিয়া তাহার জীবনে আসে নাই—এ যেন একটা দৃশ্বেশ্বপ্ন। মনে হইতেছিল, অসিত যেন সেই ছোটটিই আছে—কে বলিবে তাহার বয়স আজ ষট্টিশ বৎসর। তাহার মন ষট্টিশ বৎসর বয়সের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া এক নিমেষে শৈশবে ফিরিয়া গেল। —তাহার কাকীমা আশ্রয় দেবী হয়তো কোন কাজে ব্যস্ত আছেন—এখনই হয়তো তাহার পাশে আসিয়া তাহাকে কোলের ভিতরে টানিয়া লইয়া ছোট মেয়েটির মতো গায়ে-মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করিতে থাকিবেন। অসিদা—বস্তু দূরন্ত সে—হয়তো তাহার সহিত ঝগড়া করিবে—তাহাকে খাপাইয়া রাগাইয়া তুলিবে। তারপর আবার তাহাদের ভাব হইয়া যাইবে—পকেটে করিয়া ছোলাভাজা—টক্কর কুল লইয়া আসিয়া গোপনে তাহাকে খাইতে দিবে। এমন করিয়া নিন কাটিতে লাগিল—অসিদা বড় হইল—সে বড় হইল। অসিদা বাড়ি ছাড়িয়া কলিকাতা পড়িতে গেল—তাহার কিছুই ভাল লাগিত না। এখন অসিদাকে সে অসিদা বলে না—মা—কাকীমা, এরা কি সব ইংগিত করেন—কল্যাণী সেনসব বৃদ্ধিতে পারে, তাহার চোখ-মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া যায়। তারপর হঠাৎ অসিদা একদিন কলিকাতা হইতে বাড়ি চলিয়া আসিল—হঠাৎ একদিন স্বদেশী করিয়া জেলে গেল। তাহার কাকীমার সৈনিকের মর্তি মনে আছে। তারপর হইতে শরীর আর তাহার ভাল হইল না। অবশেষে একদিন, কি ভয়ংকর দিনই না সে—তিনি সংসারের সকল মায়া-মমতা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অসিদার জন্য সৈনিক তাহার বৃদ্ধ ভাংগিয়া কায়া আসিতে লাগিল—যে মাকে সে এত ভালবাসিত, আজ সেই মার শেষ সময়ে সে উপস্থিত থাকিতে পারিল না। তারপর অসিদা একদিন ফিরিয়া আসিয়া মায়ের খবর শুনিয়া নৌকার উপরে মচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল—সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া তাহাকে ঘরের দাওয়ার আনিয়া শোয়াইয়া দিল। তাহার বৃদ্ধ তখন বাহাজ্ঞান ছিল না—সে কতবার তুলসী তলা, মার ঠাকুরঘরে গিয়া মনে মনে কাঁদিয়া বলিয়াছে—ঠাকুর ভাল করে দাও—তাকে ভাল করে দাও। তারপরে তিনিই বৎসর—এখন অসিদা আর অসিদা নয়—তাহাকে সে যেমনি করিয়া চাহিয়াছিল—তেমনি করিয়া পাইয়াছে। সে যেন এক মধুর স্বপ্ন—সেই স্বপ্নই তো তাহার জীবনে অক্ষয় সম্পদ হইয়া আছে। এই কয়টা বৎসরের ভিতরেই তো অজু তাহার কোলে আসিল। স্বামী-পুত্র লইয়া কি সুখের সংসারই না তাহার। তারপর আসিল—কলিকাতার জীবন—এই কয়টি বৎসরকে সে ভাবিতে পারে না—তাহার যত দৃঃখ-দুর্ভাগ্যের কারণ এই কলিকাতা।



কলিকাতা আসিয়া কি হইল তাহার—কিসের নেশায় সে তাহাদিগকে এমনি করিয়া ত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। তারপর একদিন তাহার চরম পরিণতি নামিয়া আসিল—তাহার বকে বজ্রাঘাত হইল। সে যে এত বড় আঘাতেও মরিল না—ইহা কি কম আশ্চর্য! আজও তো সারা ভারতবর্ষ ভরিয়া স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে—লোকে চাকুরী ছাড়িতেছে—সভা-সমিতি করিতেছে—জেলে যাইতেছে। কেহ ছয় মাস—কেহ এক বৎসর, দুই বৎসর জেল খাটিয়া আবার বাহির হইয়া আসিবে। কিন্তু সেই সর্বনাশা রক্তাশ্রিত পথ ছাড়া—খনোখনির ব্যাপার ছাড়া অন্য পথ কি আর তাহারা সেদিন খুঁজিয়া পাইয়াছিল না? এমনি করিয়া আজিকার মত দেশের কাজ করিলে তো আর তাহাকে হারাইতে হইত না। ভাবিতে ভাবিতে কল্যাণীর দুই চোখের কোণে দুই বিন্দু অশ্রু টলমল করিতে থাকে।

অজয়ের কখন গান শেষ হইয়া গিয়াছে, সে এতক্ষণ অবাক হইয়া মায়ের মূখের দিকে তাকাইয়া ছিল—মা তাহার অপলক দৃষ্টিতে কেমন করিয়া একইভাবে তাকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কি ভাবিতেছে মা তাহার?

অজয় ডাকিল—ওমা, মাগো? এমনি চুপ করে বসে আছ যে মা!

কল্যাণীর ধ্যান ভঙ্গ হইল। কিন্তু সূতা-কাটা আর হইল না—হাতের পাঁজ ফেলিয়া রাখিয়া অজয়কে বকের ভিতরে টানিয়া লইয়া ঝরঝর করিয়া হঠাৎ অকারণে কেন যে কাঁদিয়া ফেলিল—অজয় তাহার কিছই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। অজয় একটা কথাও কহিল না—চুপ করিয়া মায়ের কোলের ভিতরে পড়িয়া রহিল। সে মনে মনে ঠিক বুঝিতেছিল, এখন কথা বলিবার সময় নয়—এমনি করিয়া যদি মায়ের কোলের ভিতরে চুপ করিয়া থাকিতে পারে, মা তাহার তাহাতেই ভাল হইয়া যাইবে। কিছুক্ষণ পরে কল্যাণী ডাকিল—অঞ্জু, বাবা!

অজয় বলিল—কেন মা?

—হারে, তোর তাঁর কথা মনে পড়ে না?

অজয় বুঝিল বাবার কথা হইতেছে—কার কথা মা—বাবার কথা? খুব মনে পড়ে মা—দিনরাত যে আমি বাবার কথাই ভাবি। রাতে শুষে শুষে ভগবানের কাছে বল—ভগবান, হরিঠাকুর—বাবাকে আমার ফিরিয়ে আন। কিন্তু আমি তো কেবল কাঁদি না মা—বাবার জন্যে যে গর্বে আমার বুক দশ হাত হয়ে ফুলে ওঠে। আজকাল স্বদেশী যারা করেন—তাঁদের দুই বৎসর, এক বৎসর জেল হয়—আর আমার বাবার জেল হয়েছে পাঁচ বৎসরের। আমার বাবা এদের চেয়ে কত বড় দেখতো মা!

—কিন্তু ওরে আমি কার কাছে গর্ব করতে চাইনে—মান-সম্মান চাইনে—শুধু চাই সে

ফিরে আসুক। সংসারের কোন দুঃখ-কষ্টকে আমি দুঃখকষ্ট বলে মনে করবো না—সে যদি কাছে থাকে, আমি সব দুঃখকে বুক পেতে সহ্য করতে পারি—বলিয়া পুনরায় কল্যাণী চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। অজয় আর কোন কথার জোব দিল না; কথা বলিতে তাহার ভয় করিতেছিল—কি কথায় কি আসিয়া পড়িবে, আর তার মা এমনি করিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিবে। কিছুক্ষণ সে ভাবিয়া লইয়া বলিল—চল না মা—নদীর ধারে ফুলবাগানের পথ দিয়ে একটু ঘুরে আসি—যে গরম, ঠান্ডা হাওয়ায় শরীরটা দিবা জুড়িয়ে যাবে।

—চল, বাবা—বলিয়া কল্যাণী তাহার হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

#### সত্যিংগ অধ্যায়

আশ্রমের কাজ লইয়া অমিয় অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। প্রথমে সব কাজ যত সহজ মনে হইয়াছিল—এখন কাজের বেলায় তাহার ভিতরে নানা গলদ দেখা দিতে লাগিল। চরকায় যে সূতা হইতে লাগিল—তাহার পাক ঠিক হয় না—বুনাইবার সময় বাবে বাবে ছিঁড়িয়া গিয়া বিস্মট বাধাইয়া তোলে। অনেক সময় মিলের সূতা মিশাইয়া তবে কাজ চালাইতে হয়। এই কয়টি মাসের মধ্যে ছাত্রদের লেখাপড়া একটুও অগ্রসর হয় নাই। স্থানে স্থানে সভা-সমিতি করিতে, আশ্রমের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে এবং মাঝে মাঝে মহাকুমা শহরটির ভলান্টিয়ার ক্যাম্প গিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেই অমিয়র সমস্ত সময় কাটিয়া যাইত। এমনি সময় হঠাৎ চা-বাগান হইতে ফেরত কুলীদের লইয়া চাঁদপুরে ভীষণ গন্ডগোল বাধিয়া উঠিল এবং তাহারই ঢেউ আসিয়া গোয়ালন্দ পর্যন্ত পৌঁছিল। কয়েকদিন ধরিয়া অমিয়র নিকট গোয়ালন্দ যাইবার জন্য সংবাদ আসিতেছিল। সেদিন সংবাদ আসিল, চাঁদপুরে কুলীদের উপরে ভীষণ অত্যাচার হইতেছে—লাঠিচার্জ ও সংগীনের খোঁচায় তাহাদিগকে দলে দলে আহত করা হইয়াছে; সুতরাং গোয়ালন্দেও কিছু করা দরকার। দুই-একদিনের মধ্যে দেশবন্দু চিত্তরঞ্জন দাশ আসিয়া গোয়ালন্দে পৌঁছিবেন। কলিকাতা হইতে স্বামীজী আসিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছেন—আরও লোকের দরকার। সুতরাং অমিয়কে আর বিলম্ব না করিয়া রওনা হইতে হইল—ডাঃ রায় তাহার সঙ্গ গেলেন। গোয়ালন্দে পৌঁছিয়া সমস্ত খবর শুনিয়া তাহারা একেবারে বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলেন। কোন মন্তব্যে মহাশয় গান্ধীর ডাক চা-বাগানে গিয়া পৌঁছিয়াছে এবং তাহারই ফলে দলে দলে হাজার হাজার কুলি চা-বাগান ছাড়িয়া নিজদেশের দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হইয়াছে। সাহেবদের চাকুরী তাহারা করিবে না—গান্ধী মহারাজের আদেশ আসিয়াছে। কেমন

করিয়া এই বাণী সেই দূরতম প্রদেশে পৌঁছিয়া একেবারে বাগানের পর বাগানের কুলীদের এক মূহুর্তে হৃদয় জয় করিয়া ফেলিয়া তাহাদিগকে এমনি পাগল করিয়া—চাকুরী ছাড়িয়া টানিয়া আনিল। কোন বিপদ-আপদের কথা তাহাদের মনে জাগিল না—পথের দুঃখ-দুর্দশার কথা ভাবিল না। যে যাহার স্বপ্নমাত্র সম্বল লইয়া—স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল। এমনি করিয়া হাজারে হাজারে যখন চাঁদপুরে আসিয়া পৌঁছিল, তখন কর্তৃপক্ষের টনক নাড়িল। সাংঘাতিক কথা তো! এমনি হইলে সমস্ত চা-বাগান যে একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং আরম্ভ হইল কুলীদের উপরে অকথা নিষেধ। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট—মহাকুমা হাকিম, পুলিশের কর্তারা দল বধিয়া আসিয়া কুলীদের বুঝাইতে লাগিলেন—ভয় দেখাইলেন; কিন্তু কেহ তাহাদের কথায় কর্ণপাতও করিল না—সকলেই মূখে গান্ধী মহারাজ কী জয় ধ্বনি করিয়া স্টীমারে চড়িয়া গোয়ালন্দ অভিমুখে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইল। ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষ সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় স্টীমার ঘিরিয়া রাখিলেন—তাহাদের কাহাকেও আর স্টীমারে উঠিতে দিলেন না। দিনের পর দিন কুলীরা চাঁদপুরের সেই জাহাজের ঘাটে পড়িয়া পড়িয়া পচিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাহাদের দল আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। এমনি করিয়া তাহাদের সংখ্যা দশ হাজারের উপরে আসিয়া দাঁড়াইল। কর্তৃপক্ষ উপায়ান্তর না দেখিয়া সৈন্য দিয়া লাঠিচার্জ ও সংগীনের খোঁচায় অমানুষিক অত্যাচার করিতে লাগিলেন। সেই সময় নিরক্ষর কুলীর দল অনাহারে, অর্ধাহারে লাঠি ও সংগীনের আঘাত সহিয়া ভেঁমান করিয়াই চাঁদপুরে পড়িয়া রহিল—একজনও পুনরায় চা-বাগানে ফিরিয়া গেল না। এমনি সময় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ইহাদের ভিতরে আসিয়া পড়িয়া তাহাদের আহারের, রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত ভার নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন। জনৈক স্বামীজী পবেই গোয়ালন্দে আসিয়া স্টীমারের ও রেলের কুলি এবং স্টীমারের সারেং-সুখানীদের ভিতরে আন্দোলন করিতেছিলেন। আজ অমিয় ও ডাঃ রায় এখানে পৌঁছিলে পুনরায় তাহারা এ বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন। দেশবন্দু চিত্তরঞ্জন নিদেশ পাঠাইয়াছেন, গোয়ালন্দের সমস্ত কুলীদের ধর্মঘট করাইয়া সমস্ত স্টীমার বন্ধ করিয়া দাও এবং তিনি নিজেও এই উদ্দেশ্যে গোয়ালন্দে আসিতেছেন।

পরের দিন দেশবন্দু গোয়ালন্দে আসিয়া পৌঁছিলেন। বিকাল বেলা গোয়ালন্দের চরে সভা বসিল। সেই বারশত কুলি দেশবন্দুর বক্তৃতায় একেবারে পাগল হইয়া উঠিল। বন্দনন্দন মিশর, কুলির সদর—সভার পরে

তাহাকে লইয়া আলোচনা হইল—ঠিক হইল আগামীকাল হইতে কোন কুলি কোন প্রকার মাল বহন করিবে না। শ্রীমারের প্রায় সমস্ত সারেং-সুখানীরাও এই ধর্মঘটে যোগ দিতে স্বীকৃত হইল। আগামীকাল হইতে যে শ্রীমার চলাচল অসম্ভব হইয়া উঠিবে, তাহা বেশ বুদ্ধিতে পারা গেল। কিন্তু এই যে বারশত কুলি—“যাহারা দিন আনে দিন খায়”—তাহারা কেমন করিয়া বাঁচবে। ধর্মঘট যে কতদিনে শেষ হইবে তাহারও তো কোন স্থিরতা নাই। ঠিক হইল—এই বারশত কুলিকে কংগ্রেসই প্রত্যহ খাদ্য যোগাইবে। দেশবন্ধু জানাইলেন—কলিকাতা হইতে সমস্ত খরচের ব্যবস্থা তিনি করিবেন। সেই দিনই রাতে স্বামীজী এবং অমিয়র উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া দেশবন্ধু কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। গোয়ালন্দেই সেই চরের উপরে চাটাই দিয়া ছাউনি করিয়া বারশত লোকের আহ্বারের স্থান, রাম্যার স্থান করা হইল। এবং পরের দিন হইতে প্রত্যহ দুইবেলা সমস্ত লোকের আহ্বারের ব্যবস্থা স্থান হইতেই করা হইতে লাগিল। শ্রীমারে কেহ আর মাল তুলে না—নামায় না। সারেং সুখানীরা শ্রীমার ছাড়িয়াছে—কুলিরা কয়লা তুলে না—শ্রীমার চলিবে কি করিয়া? কোন সময় হয়তো দেখা যাইত শ্রীমারের ক্যাপ্টেন দোতলায় দাঁড়াইয়া করুণ দৃষ্টিতে পাড়ের দিকে তাকাইয়া আছে—কুলিরা দল বাঁধিয়া ঘাটের পাশে পাশে বসিয়া জটলা করিতেছে—একজনও কাজে যাইতেছে না। সেই দলের ভিতর হইতে কেহ কেহ সাহেবের উদ্দেশ্যে বাগ্‌গ বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িতেছে না। কোন কোন সময় সাহেবেরা নিজেরাই আসিয়া নোঙর তুলিতেছে—নিজেরাই কোনক্রমে শ্রীমার ওপারের চড়ের পাশে লইয়া গিয়া নোঙর করিতেছে। সাহেবদের ভিতরে রীতিমত আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে—এই বারশত লোক না জানি কোন সময় ক্ষেপিয়া উঠে—না জানি কখন তাহাদের শ্রীমারে ঢুকিয়া সমস্ত লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া যায়।

এমনি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। দুই একদিন পর পর চাঁদপুর হইতে সেখানকার সমস্ত খবর আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। সেখানে দশ হাজারের উপরে কুলি আসিয়া জমিয়াছে। সেই সমস্ত কুলিদের জন্য সেনগুপ্ত তাঁহার যাহা কিছু সমস্ত বিলাইতে বসিয়াছেন। প্রত্যহ দশ হাজার লোকের সমস্ত খরচ বহন করা তো কথার কথা নয়। জমিদারী তাহার বিক্রয় হইতে বসিয়াছে। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে যে সাহায্য সেখানে পৌঁছিত, তাহা প্রয়োজনের তুলনায় বৎসমান্য মাত্র। এমনি করিয়া মাস-খানেক কাটিয়া গেল—ধর্মঘট তেমন চলিতেই

লাগিল। কিন্তু এমনি করিয়া আর কতদিন চলিবে? চাঁদপুরের চা বাগানের কুলিদের ভিতরে কলো দেখা দিল—প্রত্যহ ২।৪টী করিয়া মরিতে লাগিল। অবস্থা তখন সত্যি উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এদিকে এতদিনে সেনগুপ্ত তাঁহার যথাসর্বস্ব প্রায় নিঃশেষ করিয়া ইহাদের পিছনে ঢালিয়া দিয়াছেন, ইহার পর কি হইবে? কোথা হইতে অর্থ আসিবে—ইহাই এক ভয়ানক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। এমন সময় কোন সদাশয় জমিদারের সহায়তায় কয়েকখানি দেশী কোম্পানীর জাহাজ মিলিল—তাহাতে করিয়াই অবশেষে প্রত্যহ কুলিদের গোয়ালন্দঘাটে আনিবার ব্যবস্থা হইল। সেদিন প্রথম দুইখানা জাহাজ কুলি বোঝাই করিয়া গোয়ালন্দে আসিয়া ভিড়ল। দলে দলে এই সব কুলিরা যখন শ্রীমার হইতে নামিয়া—সার বাঁধিয়া তীরে উঠিয়া আসিতেছিল—অমিয় তখন ঘাটের এক পাশে দাঁড়াইয়া দুই চোখের জল ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না। রৌদ্র বৃষ্টিতে অনাবৃত স্থানে দিনের পর দিন কাটাইয়া, অনাহারে, অর্ধাহারে থাকিয়া রোগে ভুগিয়া কি ইহাদের চেহারা হইয়াছে! ইহারা কি মানুষ নয়! ইহাদের কি ইচ্ছার এতটুকু স্বাধীনতাও নাই! কাজ করিবে না—নিজের দেশে ফিরিয়া যাইবে—ইহাই কি এত বড় অপরাধ!—যাহার জন্য এমনি অমানুষিকভাবে ইহাদের গতিরোধ করিতে হইবে—সৈন্য ও পুলিশ লেলাইয়া দিয়া এমনি করিয়া পশুর মত প্রহার করিতে হইবে। অমিয়র বুক ভাঙিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।—ইহাই তাহার দেশ—ইহাই তাহার দেশের লোক। প্রত্যহ এমনি করিয়া হাজার খানেক লোক আসিতে লাগিল। তাহাদের আহ্বার করাইয়া—গাড়ীতে তুলিয়া দিতে হইত। যাদ কেহ অসুস্থ হইত, তাহাকে গোয়ালন্দে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইত! দুই একটি করিয়া কলো তখনও ইহাদের ভিতরে দেখা দিতেছিল। কোন দিন হয়তো জাহাজের মধ্যেই দুই একজন মরিয়া থাকিত। মৃতদেহ-গুলি নামাইয়া আনিয়া সেগুলি পুড়িয়া ফেলিবার ব্যবস্থাও স্বেচ্ছাসেবকদেরই করিতে হইত। এমনি ধারা নানা কাজে সারা দিন রাত্রি অমিয়র একটুও অবসর থাকিত না। শ্রীমার ঘাটে ভিড়িলে অমিয় প্রত্যহ ঘাটের পাশের মাটির টিবিব উপরে দাঁড়াইয়া তাকাইয়া থাকিতেন। কখনও প্বামী-স্ত্রীর হাত ধরিয়া চলিয়াছে—কখনও মেয়েরা কাপড় দিয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে পিঠে বাঁধিয়া লইয়া ঘাটের দিকে চলিয়াছে। সঙ্গে হয়তো মাত্র দুই একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুটুলী—দুই একটি মাদুর দুই একটি মাটির পাত্র বা ক্যানাস্তারার খালি টীন। এমনি স্বপ্ন মাত্র সম্বল তাহাদের—ইহা

লইয়াই তাহারা এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া নিজেদের দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

সেদিন সমস্ত যাত্রী নামিয়া যাইবার পর, একটি স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া অমিয়কে সংবাদ দিল—একটি ছোট ছেলে শ্রীমারের ভিতরে মরিয়া রহিয়াছে। অমিয় তাড়াতাড়ি শ্রীমারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছেলেটির বয়স তিন চার বৎসরের বেশী নয়। মৃত্যুর পূর্বে এ ছেলেটির কিন্তু দিবা ভাল স্বাস্থ্য ছিল—নিকষ কাল রঙের পাথরের উপরে কে যেন তাহার মূর্তিখানি কুঁদাইয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। ছেলেটির সম্ভবত কলোয় মৃত্যু হয় নাই—হয়তো শ্রীমারের ভিতরেই হঠাৎ কোন খরাপ ধরনের জ্বর হইয়াছিল—হয়তো অজ্ঞ পিতামাতা ভয়ে মাথায় এক ফোঁটা জলও দেয় নাই—মাথায় রক্ত উঠিয়া তাহারই ফলে মৃত্যু হইয়াছে। ছেলেটির শরীরের কোথাও এতটুকু বাতিল হয় নাই—সে যেন চূপ করিয়া খানকয়েক ছেঁড়া ন্যাকড়ার বিছানা সম্বল করিয়া অঘোরে ঘুমাইয়া যাইতেছে। ছেলেটির দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া অমিয়র চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল। জন দুই স্বেচ্ছাসেবক ধীরে ধীরে একটা ঝড়ির ভিতরে ছেলেটিকে তুলিয়া লইল। ছেলেটিকে ঝড়ির ভিতরে তুলিবার সময় তাহার ছেঁড়া ন্যাকড়ার বিছানার ভিতর হইতে কি যেন একটা শ্রীমারের মেরুর উপরে পড়িয়া ঠক্ করিয়া শব্দ হইল। অমিয় সৌন্দর্য্যে তাকাইয়া দেখেন, একটি কাঠের রঙ-করা ঘোড়া। ঘোড়াটি ছেলেটির হয়তো কত না আদরের বস্তু ছিল—তাই তাহারই শেষ শয্যা-পার্শ্বে ঘোড়াটিকে বাপ-মা রাখিয়া গিয়াছে। অমিয় ঘোড়াটিকে নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন। ছেলেটিকে ঝড়িতে করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে যখন তাঁহারা পশ্চিম তীর ধরিয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন—তখন বেলা একেবারে পড়িয়া আসিয়াছে। আজ যে সমস্ত

## এম্ব্রয়ডারী মেশিন

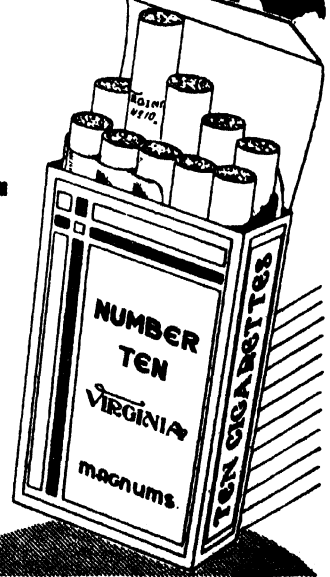
নতুন আবিষ্কৃত। কাপড়ের উপর সুতা দিয়া অতি সহজেই নানা-প্রকার মনোরম ডিজাইনের ফুল ও দৃশ্যাদি তোলা যায়। মহিলা ও বালিকাদের খুব উপযোগী। চারিটি সূঁচ সহ পূর্ণাঙ্গ মেশিন—মূল্য ৩০ ডাক খরচা ১১০।

ডীন ব্রাদার্স; আলীগড়, নং ২২।

কুলি আসিয়া পেঁপীছিয়াছিল, তখন তাহাদের  
আহার করাইয়া দ্রেনে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল।  
তাহারাই শেষ ট্রেনটি এইমাত্র গোয়ালন্দ ঘাট  
ছাড়িয়া গেল। চরের উপরে খানিকক্ষণ স্তব্ধ  
হইয়া দাঁড়াইয়া সেই ট্রেনটির দিকে তাকাইয়া  
অমির মনে হইল—এই গাড়িতেই হয়তো  
ছেলেটির হতভাগা পিতামাতা চলিয়াছে। যে  
সন্তানকে এতদিন তাহারা প্রাণাধিক জ্ঞান  
করিত—আজ অবস্থার ফেরে পড়িয়া সেই প্রাণ-  
প্রিয় পুত্রের মৃতদেহকেও এমনি করিয়া  
ফেলিয়া রাখিয়া তাহাদিগকে পলাইতে  
হইতেছে। মাইলখানেক আসিয়া যেখানে তাহারা  
পেঁপীছিলেন—সেখানে আর বালির চড়া নয়—  
এখানে নদীর জল হইতে পাড় প্রায় ২৫।৩০  
হাত উচ্চ। গত বর্ষায় এখানে ভাঙন আরম্ভ  
হইয়াছিল—তাই স্থানে স্থানে এক একটি একশ  
দেড়শ হাত লম্বা ও পঞ্চাশ ষাট হাত চওড়া  
মাটির চাপ নদীর দিকে খানিকটা হেলিয়া  
তেমনি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—সম্ভবত  
আগামী বর্ষা না আসা পর্যন্ত আর এগুলি  
নদীর জলে ভাঙিয়া পড়িবে না। মূল ভূমি ও  
চাপগুলির মধ্যে একহাত দেড়হাত করিয়া এক  
একটি ফাটল একেবারে দশ বার হাত নিচের  
দিকে নামিয়া গিয়াছে। এইসব ফাটলের দিকে  
তাকাইলে ভয় হয়—মনে হয় চাপগুলি এখনই  
বা হুড়মুড় করিয়া নদীর ভিতরে ভাঙিয়া  
পড়িবে। এমনি একটি ফাটল বাছিয়া লইয়া  
তাহারই ভিতরে ধীরে ধীরে ছেলেটিকে ৮।১০  
হাত নীচে নামাইয়া দেওয়া হইল। অমির  
তখনও সেই কাঠের ঘোড়াটি হাতে করিয়া  
ধরিয়াছিলেন—ধীরে ধীরে সেটিকেও ছেলেটির  
কাছে নামাইয়া দিলেন। তারপর কোদালী  
দিয়া মাটি কাটিয়া ফাটলটি বন্ধ করিয়া দিয়া  
যখন তাহারা ফিরিয়া চলিলেন—তখন সন্ধ্যা  
হইতে আর বিলম্ব নাই। নদীর জলে একটা  
কাল জায়া নামিয়া আসিয়াছে। ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা  
বাতাস বহিতেছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া দূরের  
মাঠে একটা গাভী হাম্বা হাম্বা করিয়া অবিরত  
ডাকিয়া চলিয়াছিল—হয়তো বাছুরটি তাহার  
কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। অমির মন এই  
আবেষ্টনীতে এক অভূতপূর্ব অনুভূতিতে  
ভরিয়া উঠিল। যে ছেলেটিকে এইমাত্র মাটি চাপা  
দিয়া আসিলেন—তাহার স্মৃতিই তাহার সারা  
অন্তর একেবারে চাপিয়া ধরিয়াছে। ইহাকেই  
কেন্দ্র করিয়া বারে বারে নানা চিন্তা তাহার  
মনে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল।—কেন  
এমন হয়?—কেন এমন হইল?—কে দায়ী?  
অমির কোমল ও সংযত মনও আজ বারে বারে  
বিদ্রোহ করিতে লাগিল—ইহা অন্যায্য,  
ইহা অবিচার—ইহা আর যাই হোক মানুষের  
কাজ নয়! পশ্চার শীতল জলে স্নান করিয়া  
যখন তিনি ক্যাম্পে পেঁপীছিলেন—তখন রাতি  
৮টা বাজিয়া গিয়াছে। (ক্রমশ)



হাদস  
ক্সিগারেট  
নাছাব  
টেন  
ভার্জিনিয়া

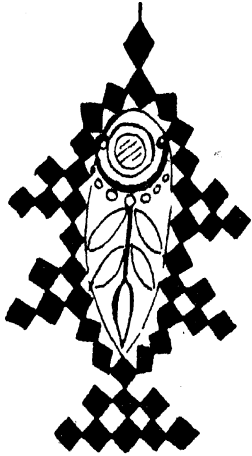


# কাথিয়াওয়াড়ী

## সেলাই ও কাচের বগজ উমারায়

### শিশুদের পোষাক

কাথিয়াওয়াড়ী সেলাই ও কাচের কাজ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই সেলাইয়ের ধরণ-ধারণ, অলংকরণ পদ্ধতি ও বর্ণবিन्याস সম্বন্ধে নানাপ্রকার জ্ঞাতব্য বিষয় ঐ দুটি প্রবন্ধ থেকে পাওয়া যাবে। আজকের প্রবন্ধে শিশুদের পোষাকে কাথিয়াওয়াড়ী সেলাই ও কাচের কাজ কি ধরণের হতে পারে, তার বিষয়ে একটু আলোচনা করব।



ক

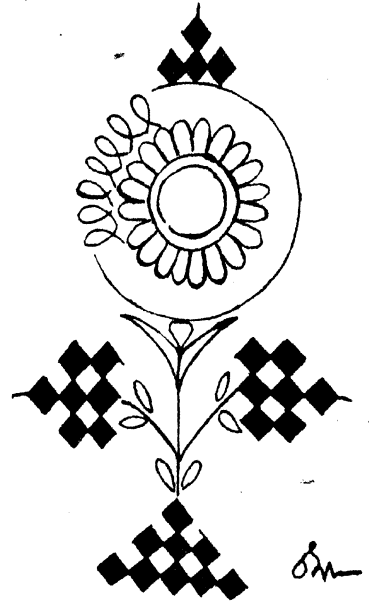
শিশুদের পোষাকের মধ্যে ফুকই বহু প্রচলিত। ফুক বিদেশী জিনিস; কিন্তু বেগি, চেয়ার, পেন্সিলের মত—নামসম্বন্ধ জিনিসটিকে আমরা ভারতীয় করে নিয়েছি। তবে একটা ব্যাপার লক্ষণীয়: বিদেশ থেকে আমদানী হয়েছে বলেই হয়তো, সকল রকম ফুক দেশী ধাঁচের সেলাই মনায় না। এই থেকে বোঝা যাবে যে, পোষাকের ছাঁটকাটের সঙ্গে মানিয়ে সেলাইয়ের কাজ করাটাই সুরূচির পরিচায়ক। কোনো কোনো বিশেষ ছাঁটের ফুকে দেশী কাজও ভালোই মানায়।

ফুকের দুটি ভাগ। উপরি ভাগটাকে yoke বলা হয় এবং নিচের অংশটিকে বলে skirt

অথবা ঘাগুরা। ফুকের উপরি ভাগের আকৃতি যদি গোলা ছাঁটের হয়, তবে সেই ফুকের বুকের সমস্ত অংশটি গোলাকার কারুকার্যে ভরাট করে দিলে, জিনিসটি অত্যন্ত সুন্দর হবে। আবার আজকালকার নতুন ফ্যাসন অনুযায়ী যদি forelo style (waist coat)এর ফুক হয়, তবে জামাটির উপরিভাগের waist coatটির চারিধারে কাজ ও সামনের দুই দিকে দুটি পান অথবা কলকা ধরণের নক্সা—ভালো মানাবে। এই বিশেষ ছাঁটের ফুক অপেক্ষাকৃত বড় মেয়েদের উপযোগী।

আমাদের দেশী ধরণের জামা হলো ঝাপলা। এই পোষাকটি বিহারী ঝুল্লার মতন দেখতে। ঝুল্লার নিচের দিক ঘিরে চওড়া কাথার ফোর্ডের কাজ থাকে এবং হাতে ও গলায় সরু রেখার কাজ থাকে আর গলায় একটিমাত্র ঘূর্ণি দেওয়া বোতাম থাকে। ঝাপলা সাধারণতঃ এক বৎসর থেকে তিন বৎসরের মেয়েরা ও ছেলেরা পরতে পারে।

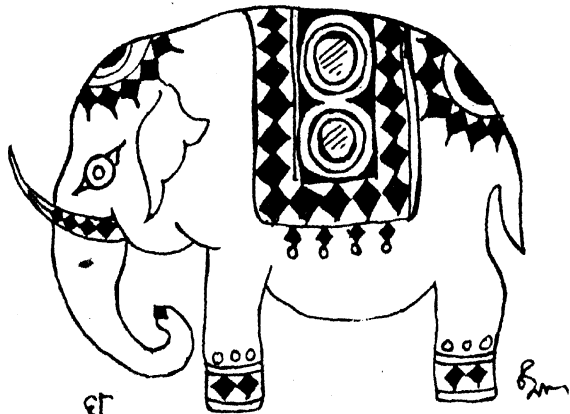
শিশুদের জামায় কি ধরণের নক্সা দেওয়া যায় তার আলোচনা করা যাক। শিশুরা বস্তুবাদী। চোখে দেখা জগতের সঙ্গেই তাদের কারবার। অবাস্তব সুন্দর লতাপাতার কারুকার্য তাদের মনকে আকৃষ্ট করে না। রংএর বেলাও দেখি অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল বর্ণ তাদের চোখে বেশি ভাল লাগে। তাদের পোষাকে মাছ, হাতী, পাখী, হরিণ প্রভৃতি জন্তু-



খ

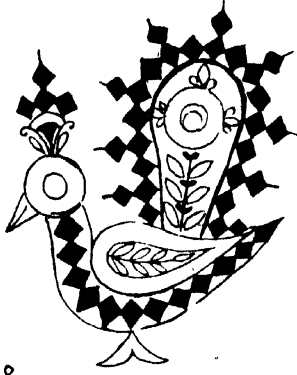
জানোয়ারের ছবি থাকলে তারা খুব খুসী হয়। বিলাতী ফুকের খেলায় দেখি ভেড়া, মুরগী, হাঁস কুকুরছানা প্রভৃতি নক্সার ছড়াছড়ি। আমাদের দিদিমা ঠাকুরমারা চিরকাল কাথায় মাছ, হাতী, পাখী, হরিণ প্রভৃতির নক্সা সেলাই করে এসেছেন। অনেকেই হয়ত “এসো নাতি, চড়ে হাতী” লেখা হাতীর নক্সাওয়ালা কাঁথা দেখে থাকবেন। বিভিন্ন দেশের সেলাইয়ের যে বৈশিষ্ট্যের কথা ইতিপূর্বে বলেছি, এই সব ভিন্ন ভিন্ন ধরণের নক্সা নির্বাচনে তারি পরিচয় পাওয়া যায়।

আজকের এই প্রবন্ধে দিদিমা ঠাকুরমার প্রবর্তিত পথ ধরে মাছ, হাতী, পাখী ও ফুল



গ

ঘ



গ

প্রভূতি নক্সা শিশুদের পোষাকে কিভাবে কর;  
যেতে পারে, তারই আভাস দিই।

‘ক’ নক্সা

‘ক’ নক্সার মাছটি ঝাপ্‌লার নিচের দিকে পাশাপাশি করলে বেশ মানাবে। আবার এই ডিজাইন কোন ফ্রকের বৃকে yokeএ মথোমুখি আকারে করলে ভালোই দেখাবে। ছোট ছেলে অথবা মেয়ের waistcoatএ এই নক্সাটি বৃটা হিসাবেও সুন্দর দেখাবে। এই নক্সার কাথিয়াওবাড়ী ঘরগুলি গাঢ় খয়েরী (৪০৩নং) হবে। মাছের চোখের গোলাকৃতি অংশটিতে লাল (৭০০নং) সূতো দিয়ে কাচ বসাতে হবে। তার পাশের রেখাগুলি হবে কালো। পাতা-গুলি গাঢ় সবুজ (৬৮৪নং) হবে ও বৃত্তটি কালো হবে।

‘খ’ নক্সা

এই ফুলটি ফ্রকের বৃকে অথবা waist coatএর দুই ধারে বেশ মানানসই নক্সা। এই (৪৪৪নং) রঙের সূতো দিয়ে কাচ বসবে। তার পরের ছোট ছোট “পাপিড়িগুলো খয়েরি হবে ও বৃত্তের ধারের পাপিড়িগুলি হবে হলদে।

‘গ’ নক্সা

‘গ’ নক্সার পাখীটি ফ্রকের বৃকে মথোমুখি-ভাবে সেলাই করলে বেশ দেখাবে। waist coatএর বৃটা হিসাবেও এই নক্সা বেশ চলতে পারে। এর কাথিয়াওবাড়ী ঘরগুলি সোনালি রঙের হবে (৭০৩নং) ও পাখীর গায়ের ও পৃষ্ঠের রেখাগুলি হবে কালো। পাখীর ঠোঁটের কাছে ও পৃষ্ঠের গোলাকৃতি অংশটি ফিকে নীল রঙের (৭৬৪নং) সূতো দিয়ে কাচ বসাতে হবে। ঠোঁট ও পা কালো হবে। পাখীর মাথার উপর ঝুঁটির অংশটি কালো ও ছোট পাপিড়ি দুটি সাদা হবে। পৃষ্ঠের ভিতরকার অংশের ও পাখীর গায়ের ভিতরকার অংশের বড় পাপিড়িগুলি সাদা ও বৃত্ত কালো

হবে। কাঁচের তিন পাশের তিনটি পাপিড়ি ফুলগুলিও সাদা হবে।

‘ঘ’ নক্সা

‘ঘ’ নক্সার হাতীটি ছোট শিশুদের Ramper (রম্পার) এ বেশ মানাবে—আবার কোনো কোনো জামার পকেটের উপরও বেশ দেখাবে। কাথিয়াওবাড়ী চতুষ্কোণগুলি কালচে লাল রং (৬৯৯নং)এর হবে। হাতীর পায়ের সরু রেখাগুলি কালো হবে। বড় গোলাকৃতি বৃত্তগুলিতে হলদে

(৫১৫নং) রংএর সূতো দিয়ে কাচ বসবে, ও ধারের ডরাটগুলি কালো হবে। অর্ধ গোলাকৃতি অংশটিও কালো হবে ও ছোট বৃত্তগুলি হলদে রংএর হবে। হাতীর চোখটি কালচে লাল হবে ও পাশের ছোট সরল রেখা দুটি কালো হবে।\*

\* যারা সেলাই করবেন তাঁদের সুবিধার জন্য Clark's Stranded Cotton-এর সূতের নম্বর দিয়ে দেখা যাবে।



# কুমারেশ

আপনার দেহরক্ষা করে আপনার লিভার—তার রক্তকণিকা গঠন, পিত্তনিসারণ, দূষিত পদার্থ শোধন প্রভৃতি ক্রিয়ার স্বারা। আপনার লিভারকে রক্ষা করে ও শক্তিশালী করে কুমারেশ। তাই কুমারেশ যে শব্দ, জিভার ও পেটের যে কোন পীড়া নিশ্চিতরূপে আরোগ্য করে তাই নয়—যে কোন রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করে আপনার দেহকে রক্ষা করে।

ও, আর, সি, এল, লিঃ।

দালিকরা : : বাওড়া



ডুম-ডুম-ডুম—

ঢোলের আওয়াজটা ক্রমেই শিরসি গ্রামের নিকটবর্তী হতে লাগল।

এদিকে ধানের জমিই বেশী আর সে ধানও অনেকদিন আগেই কাটা হয়ে গেছে। খা খা করছে দিগন্তবিসারী ঢেউখেলানো মাঠ। দেউলিয়া বড়লোকের মত রিক্ততার নশ্বতা নিয়ে বিস্মৃত হয়ে আছে। তারই ওপর দিয়ে ঢোলের শব্দটা ভেসে এল, গড়িয়ে গড়িয়ে।

শিরসি গ্রামের বাসিন্দারা বামন কায়েৎ নয়, সাঁওতাল, খাঙরদেরই গ্রাম সেটা। তারা কেউ আধি চাব করে, কারো কারো পাঁচদশ বিঘা জমি পর্যন্ত আছে, নিজের হালগরু আছে, আর বাকী সবাই জনমজুরের কাজ করে, জোতদার মহাজনদের বাড়িতে চাকরী করে, মোষের গাড়ি চালায়। এদিকে—শিরসি, নিমাইল, নিমতাঙ্গা, বাঘারিয়া, হরিশপুরা—এই গ্রামগুলোতেই ওদের বাস বেশী।

যাযাবর জাতের বংশধর ওরা। সাঁওতালেরা।

অনেক, অনেকদিন আগে, বুনো হালের দলের মত এদিকে এসে একদিন ওরা থমকে দাঁড়িয়েছিল। তখন আশেপাশে, কুড়ি পাঁচশ মাইলের মধ্যে কোনো বসতি ছিল না, আবাদ ছিল না, ছিল শুধু নিবিড় জঙ্গলাবৃত উর্বর মাটি, ছাইচাপা সোনার মত, ছিল শুধু মস্ত-কাময় রূপান্তরিত সমুদ্রের ঢেউয়ের মত বিষ্ময়াস-ঢাকা অন্তহীন মাঠ। হঠাৎ একদিন এল ওরা, জঙ্গলের কালো ছায়ায় এসে কালো কালো মানুষগুলো তাদের কালো চোখের বিম্বন্ধ দৃষ্টি মেলে তাকাল চারিদিকে, নিজেদের ভাষায় কি সব যেন বলাবলি করল, তারপর সেখান থেকে আর নড়ল না। খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে আগুন জ্বালাল তারা, রান্না করল, খাওয়াদাওয়া সারল। আর রাতের বেলা নিবিড় জঙ্গলের মাঝে যখন জ্যোৎস্নার আলো পড়ে অবাস্তব স্বপ্নরাজ্যের মত আলো-ছায়ামেশনো একটা অপরূপ পরিবেশ সেখানে সৃষ্ট হল তখন ওদের মাদলে ঘা পড়ল, বাঁশী বেজে উঠল, মদমস্ত কণ্ঠ থেকে গান বেরোল। কালো কালো মানুষগুলো কালো কোঁকলের মতই মিষ্টি গলায় গেয়ে উঠল। মাদলের গুরু

গুর আওয়াজ আর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর জ্যোৎস্নারাত্রে বহুদূর পর্যন্ত ভেসে গেল। বহুদূর পর্যন্ত যেন ওদের ঘোষণা ছড়িয়ে পড়ল—যেন ওরা জানিয়ে দিল যে এখন থেকে ওরা এখানেই থাকবে, আর কোথাও যাবে না, অখণ্ড নির্জনতায় ভরা এই নবাবিস্কৃতা কুমারী পৃথিবীর ঐশ্বর্যসম্পদ একমাত্র তাদের। জঙ্গল কাটল তারা, ছাইয়ের গাদা থেকে সোনা বের করল, পতিত, বিস্মৃত মাটির গভর্কোষ থেকে তারা প্রাণের ফসল বের করে আনল—পেশী সঞ্চালন করে, কালো দেহের লাল রক্তকে জল করে। ওরা ভাবল যে হল বেশ, এ পৃথিবী ওদের। কিন্তু অঘটন ঘটল, খর-গোশের মত শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোর কাছে একদিন ধুমকেতুর মত একটা লোক এসে হাজির হল, বলল যে জমিদারকে খাজনা দিতে হবে। সব ধারণা বদলে গেল, ওরা জানল যে পৃথিবী সবার নয়, যে চায় তারি হয় না, পৃথিবীটা মাত্র কয়েকজনের। সেদিন থেকে সব কিছু বদলে গেল। সে পরিবর্তনের কথা আজ থাক, সে কাহিনী বারান্তরে কথিত হবে। আজকের কাহিনীতে ফিরে আসা যাক।

সেই সব আবিষ্কারক যাযাবরেরা আজকাল আর নেই। অনেকদিন আগেকার সেই সব কালো মানুষেরা এখন পায়ের নীচেকার সোনার মত মাটির মাঝে মিশিয়ে গেছে, বিস্মৃতির গহবায় পাথরচাপা পড়েছে, তাদের পৃথিবী ভুলে গেছে। তারা নেই কিন্তু তাদের বংশধরেরা আছে এখন। অবিকল তাদের মত দেখতে। কালো মেঘের মত রং তাদের, চ্যাপ্টা নাক, পুরু পুরু ঠোঁট। সাঁওতালেরা। খাঙরেরা।

—ডুম-ডুম-ডুম—

ঢোলের আওয়াজটা ক্রমেই নিকটবর্তী হতে লাগল।

শিরসি গ্রামের মুখেই যে বাড়টা, যে বাড়টার বিষ্ময়াস-মেশনো সিমেন্টের মত মসৃণ মাটির দেয়ালে একটা কাঁচা হাতের আঁকা হাতীর কঙ্কাল আছে সেই বাড়টারই দাওয়ায় বসে পাট থেকে দড়ি পাকাচ্ছিল মংরা আর ঝুমরু। দড়ি পাকানোর সঙ্গে সঙ্গে মংরার

সুগঠিত কালো দেহের পেশীগুলো যেন তাল রেখে তরঙ্গায়িত হচ্ছিল, দুর্লভ তার যন্ত্রাজিত বাবরী চুল আর ঝুমরীর সুডোল হাতের রূপোর বালা আর কাঁচের চুড়ির মৃদু শব্দ সেই তালকে সুস্পষ্ট করে তুলেছিল। একটা পাক দিচ্ছিল মংরা, আর একটা ঝুমরী। ঘাড় বাকিয়ে পাক দিচ্ছিল ঝুমরী তার সঙ্গে সঙ্গে তার কঠিন স্তন্যগ্রচ্ছাদা দুটো নড়ে উঠছিল।

দূরে, উঁচুনীচ, ঢেউখেলানো ক্ষেতের ওপর শেষ ফাগুনের রোদ এঁর মধ্যে শাণিত খল-ফলকের মত ধারালো হয়ে উঠেছে, মাথার ওপরকার আকাশ যেন রৌদ্রালোক-প্রতিফলিত একটা বিরাট আয়না, তার দিকে তাকালে চোখে ধাঁধা লাগে, মাথা ঘুরে যায়। ফাঁকা-মাঠ আর—ক্ষেতের ওপর দিয়ে শনশন করে পশ্চিমা বাতাস বইছে, তাতে ভেসে আসছে দূরবর্তী শব্দপ্রায় বিলের জলজ ঘাস আর শৈবালের কাদা আর মাটির গন্ধ।

—ডুম-ডুম-ডুম—

ঢোলের আওয়াজটা আরো কাছে এল।

“ঢোল দিচ্ছে কেনে জী?” চোখ বড় করে দুটো বাঁকা ভুরু কুঁচকে ঝুমরী তার স্বামীর দিকে তাকাল।

“ক্যামনে কহিব বা?” মংরা দড়িপাকানো থামিয়ে বাইরের দিকে তাকাল।

ঝুমরী মাথাটা এদিক ওদিক দুটলিয়ে প্রখর দৃষ্টি মেলে চারদিকে তাকাল তারপরে ঘোষণা করল, “হুই দেখা যাচ্ছে—জমিদারের গাইক পিয়াদা মালুম দিচ্ছে”—অগুনতী নির্দেশ করে সে দেখাল ডানদিকে।

মংরা তাকাল। হ্যাঁ। ডানদিকের সরু, সাদা পথটা বেয়ে পাগড়ীধারী পশ্চিমা লাঠিয়াল জনার্দন সিংয়ের সঙ্গে একজন লোক ঢোল বাজাতে বাজাতে এগিয়ে আসছে। পেছনে কৌতুহলী নশ্ব ছেলেমেয়ের দল আর জন-কয়েক ছোকরা। ঢোলের আওয়াজ পেয়ে পাশব-বর্তী বাড়িগুলো থেকে সাঁওতাল স্ত্রীপুরুষেরা ছুটে বেরিয়ে এল, এগিয়ে গেল তাদের দিকে, গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়াল একটা নতুন সংবাদের প্রত্যাশায়।

—ডুম-ডুম-ডুম—। ঢোলবাদক আয়েস করে খুব জোরে জোরে ঢোলটিকে পিটোল।

নশ্ব ছেলেদের মধ্যে একটা বছর ছয়কো টারা ছেলে ঢোলের শব্দে পুলকিত হয়ে উঠল মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে একটা অদ্ভুত ঢোল বাজানোর ভঙ্গী করে মোটা গলায় বটে উঠল—“ডুম-ডুম-ডুম”—

আর সব ছেলেমেয়েরা খিলখিল করে হেসে উঠল।

জনাদর্শন সিং ধমক দিয়ে উঠল, “এয়াই শয়তানলোগ—চোপু—চোপু”—হাসি বন্ধ করে পাঁচ সাত হাত পেছনে হটে গেল ছেলেগুলো। তখন ঢোলবাদক হাটার দলের অভিনেতার মত মোটা গলায়, এপাশ ওপাশ ঘুরে বলতে আরম্ভ করল, “দোহাই, দোহাই জিঁমদারবাবুর হুকুম শোনো। এই বছর হইতে তুমরা কেউ আর কাড়োল বিলে মাছ ধরতে পারবা না—এখন থিকা উটা জিঁমদারমশায়ের কাজে লাইগবে। যে এই হুকুম অমান্য করিবা, ইয়ার পর যে জোর করিবা মাছ ধরবা সে বিপদে পড়বা, এমনকি, আদেশ না মাইনলে বন্দুকের গুলীতে উড়িয়া যাবা। দোহাই দোহাই জিঁমদারবাবুর হুকুম শোনো-ও-ও—”

—ডুম-ডুম-ডুম—আর একবার সজোরে বেজে উঠে ঢোলটা থেমে গেল, ঘোষণাকারী, লাঠিয়াল জনাদর্শন সিং ও তাদের অনুসরণকারী কৌতুহলী ছেলেমেয়ের দল এগিয়ে গেল। সমস্ত গ্রাম ঘুরে তারা আবার অন্য গ্রামের দিকে চলে যাবে।

সত্থতা।

যারা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল একটা নতুন সংবাদের প্রত্যাশায় তারা কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যা শুনল তা নতুন সংবাদ বটে কিন্তু তা যেন প্রত্যাশা করেনি, তা যেন বিশ্বাস করতে স্মিধা বোধ করল তারা। অথচ স্বপ্ন দেখছে না তারা, পায়ে নীচেকার গরম মাটি তাদের রক্ত বাস্তবতার কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। তবে? মৃদু একটা গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল তাদের মধ্যে যেন মোটাচাকি ঢিল পড়েছে। ক্রমেই সেই গুঞ্জন সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, উত্তেজিত আলোচনার রূপ ধারণ করল।

“ইটা কি কহিল জী-আ?”

“মাছ মাইরতে যাব না, ই কামন কথা।”

“আর হরেক বছর যে মাছ মারিন্দু সিটা কি হইল বা?”

“হয়—বাপদাদার আমল থিকা কি মাছ খাছি নী”—

“না না, ই হুকুমটা খারাপ আছেক—বড়া খারাপ ভাই”—

মগ্না চুপ করে বসে ছিল। দড়ি পাকানো তার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সামনের দিকে তাকাল সে সোজা। ছোট্ট পাহাড়ের সারির মত উঁচু-নীচু ক্ষেতের ওপর পাংলা তারের মত রৌদ্রালোকের উগ্র আঘা খরখর করে কাঁপছে, অগ্নিরাগের আলাপচারী সেতারের ঝঙ্কত তারের মত। সে সমস্ত অতিক্রম করে আরো দূরের দিকে মংরার দৃষ্টি নিবন্ধ হল। দূরে, দিগন্তের কোলে, কাড়োল বিলের একটুকরো দেখা গেল। বিলের জল শূন্য হয়ে এসেছে, তবু যা আছে তা কম নয়, দূর থেকে তরল রূপের মত চক্চক করছে তা, অপরূপ দেখাচ্ছে।

কাড়োল বিল। ছোটবেলা থেকে তা দেখে আসছে মংরা, তার বাপ দেখেছে। বাপের বাপও দেখেছে আর তারও আগেকার বড়োরাও নাকি দেখেছে ঐ বিলকে। গ্রীষ্মকালে শূন্য হয়ে যায় বিলটা, কেবল জায়গায় জায়গায়, গভীরতম অংশগুলোতে তখনও অল্প অল্প জল আটকে থাকে। ক্লেদাঙ্ক, পঙ্কিল, মহামারীর কালো বিষ-ভর্তি জল। শূন্যে বিলের বৃকে বলমী, শাপলা আর কচুরীপানাগুলো পড়ে থাকে আর তার চারিদিকে নধর দুর্বাঘাস অঙ্কুরিত হতে থাকে, ক্রমে তা সজেজে হাটু পর্যন্ত বড় হয়ে ওঠে। তখন চারদিকের গ্রাম থেকে রাখালরা নিয়ে আসে গরু আর মোষ, সারাদিন চড়ায় বিলের বৃকে। এখানে ওখানে জলজ ঘাস শূন্য হয়ে ক্রমে বিবর্ণ, লালক হয়ে ওঠে, অল্প জলের মাঝে গভীর পঙ্করাশি যেখানে থকথক করতে থাকে তার ওপর অজস্র রক্তপশ্ম থরে থরে ফটে থাকে। ক্রমে মাটি আরো শুকায়, ফাটল দেখা দেয় তাতে, তা দিয়ে পাতালের বিষাক্ত, গরম, নিঃশ্বাস গল্গল করে বেরিয়ে আসে। তারপর, বর্ষা-আকাশের বৃকে তখন মোষ জমা হয়, ফাটা ফাটা বিস্তৃত বৃক মেলে বিলটা আকাশের দিকে তাকায় তার তৃষ্ণার্ত ঠোট তুলে। বৃষ্টি নামে; চারদিকের উঁচু জমি থেকে ছোট ছোট গৈরিক জলের ধারা তীরবেগে বিলের বৃকে ছুটে আসে। প্রথমে তা শূন্য হয়ে যায়, তৃষ্ণার আধিক্যে সব জলকে লেহন করে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে বিলটা, ক্রমে তার তৃষ্ণা কমে যায়, তখন জল জমতে আরম্ভ করে, দুর্বা আর বিনাঘাসগুলো ডুবতে থাকে। শ্রাবণ-শেষে বা ভাদ্রের প্রথমে বিলকে দেখে ভয় লাগে। পায়ে নীচেকার সে মাটি এখন যেন কোন ইন্দ্রজাল-মন্ত্রে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তার পরিবর্তে আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত, মাইলের পর মাইল জুড়ে, বিরাট একটা নাগিনার মত গর্জতে থাকে কালো, কুটিল জলের ধারা, তাতে ভাসতে থাকে কচুরীপানা আর উৎপাতিত গাছ, বনা লতা আর খড়ের ঢালা। দিনের বেলা গলিত রূপোর মত সূর্যালোকে জ্বলতে থাকে বিলের জল। তারপর, হঠাৎ হয়ত আকাশে মেঘের পিঙ্গল জটা দেখা যায়, তার গুরুগুরু গর্জন-ধ্বনি আকাশ থেকে তরংগের মত গড়াতে গড়াতে এসে বিলের বৃকে থেমে যায় আর পূর্বদিক থেকে ছুটে আসে উদ্‌গম, ঠান্ডা বাতাস। বিলের জল তখন দুল ওঠে, নেচে ওঠে, ছোট্ট একটা ভয়াল সমুদ্রের মত উদ্‌গম হিংসার আবেগে ফুলে কালো হয়ে ওঠে। আর রাতের বেলা কুহকিনীর মত রহস্যময়ী হয়ে ওঠে কাড়োল বিল। বয়হীন জ্যোৎস্না রাত্রির মধ্যমধ্যে যদি কেউ বিলের দিকে তাকায় তবে সে বিস্ময়ে স্তম্ভ হয়ে যাবে, তখন চন্দ্রলোকিত আকাশের নীচে, ধ্বংসে সিক্কের চাদর-মোড়া রূপসার

মত অঙ্গ-মণ্ডর দেহ এলিয়ে বিলটা যেন স্বপ্ন দেখতে থাকে। এই তার এক রূপ। আবার যদি বাদড়ের ডানার মত কালো কোনো অশ্বকার রাতে বিলের ধারে কেউ দাঁড়ায় তবে সে অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে কালো জলের রাশিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত দেখতে পাবে। ভয়াব্র দেহে, স্তিমিত চেতনায় সে তখন শূন্যে পাবে তার অস্পষ্ট কলকল ছলছল শব্দ—যেন একটা রূপসী কালনাগিনী হিস হিস শব্দ তুলে পাংলা তারের মত লকলকে জিভ মেলে আসছে, সাদরে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

বর্ষা কেটে যায়। মাইলের পর মাইল জুড়ে বহুদূর পর্যন্ত টলমল করে বিলের জল। গ্রীষ্মকালে শূন্যে বিলের মাঝখান দিয়ে গরু মোষের গাড়ী চলাচল করে কিন্তু বর্ষা থেকে সেসব বন্ধ হয়ে যায়, তখন নৌকো ছাড়া আর চলাই যায় না। আর বিলের বৃকে নৌকো চালানো সোজা কথা নয়, দিনের বেলাতেই দিক্‌ভ্রম হয়ে যায়, রাতের বেলা তো আর কথাই নেই। এমনি সময়ে, আগেকালের দিনে শ্বাপদসংকুল দুর্গম অরণ্যের মতই ভয়াবহ হয়ে উঠত বিলটা। দিনের বেলা হোগলা আর কাঁশ-বনে লুকিয়ে থাকত হিংস্র, লোভী মানুষের ছিপ। রাতের বেলা যখন মহাজনী বা যাত্রী-বোঝাই নৌকা যেত বিল দিয়ে তখন তাদের ওপর বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ত সেই সব ডাকাতেরা। কিন্তু তারাও আজকাল আর নেই, তাদের নিষ্ঠুর পাশবিকতা নিয়ে সেই সব দুর্ধর্ষ দস্যুর দল এ পৃথিবী থেকে প্রেতলোকে বাসা বদলেছে।

বর্ষা কেটে যায়। শরৎ এসে, বিলের ধারে তুলোর মত সাদা কাশফুল দুলাতে থাকে। সারস আর বকেরা এসে সারি বেঁধে বসে কাশগাছের গোড়া ঘেঁসে। আসে হেমন্ত। রৌদ্রের মধ্যে জ্বালা আরম্ভ হয়, জলে টান ধরে, বিলের চেহারা শূন্যে উঠতে আরম্ভ করে। তারপর ফাল্গুন মাসের গোড়া থেকে জায়গায় জায়গায় মাটি দেখা দেয়, আর বাকী জায়গায় এক কোমর, এক হাটু জল থাকে। তখন থেকেই শূন্য হয়, মাছ ধরার পালা। চারপাশের গ্রাম থেকে গরীব মানুষেরা ছুটে আসে। সাঁওতাল, ধান্তর, মুসলমানেরা হাজারে হাজারে এসে বিস্তৃত বিলের বৃকে নেমে পড়ে। পোলুই, ছেকা জাল, লাঠি আর কোঁচ নিয়ে। জিরোল, মাগুর, শোল কৈ, খলসে, পুন্ট, বোয়াল, কাংলা—এইসব মাছই পাওয়া যায় তাতে। গরীব চাষাভুষোরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা জল আর কাদার মধ্যে পড়ে থাকে। ভাতের কাঙাল ওরা, প্রতিদিন মাছ খাওয়া দূরে থাক, ভালভাবে একদিন খাওয়ার জন্যও মাছ কিনবার মত সংগতি নেই তাদের। সেই অভাব, মাছ খাওয়ার সেই লোভ তাদের এই বিল মেটায় মাস দুয়েক ধরে। বিলটা জমিদারের জমিদারীর মধ্যে পড়ে বটে কিন্তু

আকাশের জল তো আর জমিদারের সম্পত্তি নয়, সেই জলে যে মাছ জন্মায় তাও সেই জলের মতই সবার সম্পত্তি। আজ পর্যন্ত জমিদার তার ভোগ থেকে প্রজাদের বঞ্চিত করেনি। চিরকাল এই হয়ে আসছে, চিরকাল এমনভাবে চারপাশের গরীব গ্রামবাসীরা বিলের মাছ মেরে খেয়েছে। খেয়ে খেয়ে রক্তের মধ্যে তাদের একটা সংস্কার জন্মে গেছে যে, বিলের মাছ খাওয়া তাদের একটা জন্মগত অধিকার আর এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার মত সাহস কারো হতে পারে না। প্রকৃতির দেওয়া আলো বাতাস আর জলের মতই বিলের মাছ খাওয়ার অধিকারটাও তাদের চিরকাল ধরে আছে, চিরকাল ধরে থাকবে। অথচ আজ—

মংরার চমক ভাঙ্গল।

“হুই মংরা—মংরা সদর!”—আলোচনা রত সাঁওতালরা তার বাড়ীর দাওয়ার কাছে এসে দাঁড়াল তাদের কালো কালো পেশল দেহ যেন প্রস্তর-খোদিত অপূর্ণ ভাস্কর্যের নমুনা। তাদের কবাট বক্ষ, সুগঠিত উরু, চওড়া কব্জি আর অজস্র পেশী-সমৃদ্ধ পৃষ্ঠদেশ যেন একটা উত্তেজনার খরখর করে কাঁপছে। তাদের শান্ত, কালো চোখে হঠাৎ যেন দাবানল-দগ্ধ অরণ্যের রক্ত-দীপ্ত দেখা দিয়েছে।

“কি? কি চাইস তুয়া?” চোখ ছোট করে প্রশ্ন করল মংরা। বেশ উজ্জ্বল তার কণ্ঠে।

সাঁওতালরা নিরন্তরে দাওয়ার ওপর উঠে দাঁড়াল।

“চোপায়া দে জী!”—মংরা ঝুমুরীর দিকে তাকাল।

ঘরের ভিতর দৌড়ে গেল ঝুমুরী, তার হাতের বালা আর চুড়ী বেজে উঠল। গোটা তিনকে চোপায়া নিয়ে এল ঝুমুরী, দড়ির তৈরী ছোট ছোট চোপায়াগুলো, এনে ওদের বসতে দিল।

“বৈস্, বৈস সবাই”—সে মৃদু হেসে বলল, সাড়ীর আঁচলটা ভালো করে আঁট করে জড়াল গায়ে।

দুর্দিনজন বসল, বাকী সবাই মাটিতেই বসল, হাটু দুটোকে দু’হাতে জড়িয়ে তাকাল মংরার দিকে।

“ফাইস্ না ক্যানে—কি চাইস তুয়া?” আবার প্রশ্ন করল মংরা।

যারা এসে বসল তাদের মধ্যে থেকে সোমাই কথা বলল। মংরার সমবয়সী সে, ব্রিটিশ চৌরিশ বছর বয়স তারও। দেখতে শুদ্ধ কালো নয়, ঘোর কালো সে। মিশকালো মোমের মত। বিরাটকায়। আর তেমনি প্রকৃতি তার, দুর্দান্ত, দুঃসাহসী। ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে যাদের সঙ্গে বড় হয়েছে মংরা, তাদের মধ্যে সোমাই সবচেয়ে পুরানো ও অন্তরঙ্গ। থাকেও দুটো বাড়ির পরেই। মংরার এবং গ্রামের সবার প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে

অকুণ্ঠচিত্তে, হাসিমুখে সোমা এগিয়ে আসে—বরাবর।

“কি আর চাইব ভাই?” সোমা স্মান হেসে বলল, “ডংকা শুনলু নাই?”

“ডংকা?”

“হাঁ—ডংকা—”

মাথা নাড়ল মংরা, অনামস্ক ভঙ্গীতে বলল, “শুনিনাছি। তাহে কি হইল বা?”

গুঞ্জন উঠল সাঁওতালদের মধ্যে, যেন এক-সঙ্গে আত্ননাদ করে বলল, “তাহে কি হইল! বাঃ—”

মংরা গলায় জোর দিল, বৃকের ওপরকার রূপার তক্তটাকে নাড়াচাড়া করে বাগ্পের সুরে বলল, “হাঁ। কি হইল তাহে। এতদিন ধইরা মাছ খাছ আর খাভা না, বাস্। শুনলু নাই?” ঘোষকের কণ্ঠ অনুসরণ করে ছেলে-মানুষের মতই সে আউড়ে গেল, “দু’হাই—জিমিদারবাবুর হুকুম শুন—দু’হাই—ই?”

সাঁওতালরা চুপ করে রইল। তারা বুঝল যে মংরা তাদের অতি দৃঢ়তা বাগ্প করে কথা বলছে। নিঃশব্দেই রইল তারা।

কিন্তু সোমা গর্জন করে উঠল, “কিন্তুক্ ইটা যে জলুম হৈছে—জলুম—”

সাঁওতালরা সমর্থন জানিয়ে বলল, “হাঁ—জলুম হৈছে, জলুম—”

ঠোট উলটিয়ে, নির্বিকারভাবে, বিদ্বেষের সুরে বলল মংরা, “জলুম তো হামি কি করভ রে বাপ্—আ? শুনলু নাই?” দু’হাত দিয়ে কাপনিক একটা বন্দুক তুলে ধরে মুখ দিয়ে সে শব্দ করল, “বু—ম্—”

“মানে? বুলি মানেটো কি উয়ার?” সোমা বোকার মত তাকাল মংরার দিকে।

শাণিত হেসে মংরা বলল, “বন্দুক। গুলি করা মাইরবে। শুনলু নাই?”

সাঁওতালরা চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল, “জলুম হৈছে কিন্তুক্—জলুম—”

“হাম্‌রা—হাম্‌রা যদি না মানি ই জলুম?” শব্দে প্রশ্ন করল উত্তেজিতভাবে।

“বু—ম্—বন্দুক্। মরবু।”

সোমা মাথা নাড়ল, বাতাসে মৃদুস্বাভা করে জোর দিয়ে বলল সে, “নাই—মরবু নাই। বুল্ তো মংরা, অখনি হাম্‌রা করম্ কি?”

সাঁওতালরা তাকাল মংরার দিকে। তাদের খরগোসের মত শান্ত চোখে, নিরীহ মুখে একটা ভয়মিশ্রিত উত্তেজনা থম্ থম্ করছে। বন্দুক! গুলি মারবে! শুনেন কিরকম যেন হয়ে যায় তারা, তাদের গরম রক্ত ঠান্ডা হতে চায়, চোখের লালচে নেশার ঘোরটা কেটে যাবার উপক্রম করে।

মংরা তাদের দিকে ডাকিয়ে মাথা নাড়ল,

“আম বাপ্—সে হামি কি বুলব? না, হামি বুলতে লারব—”

“বাঃ—তবে বুলবে কে? আ?”

সাঁওতালরাও প্রশ্ন করল, “হয়—কে?”

“ক্যানে? তুদের সদর লাই? রসিক মাঝি? যা—উর কাছোং যা তুয়া—”

ঠিক। কথাটা মনেই পড়েনি তাদের। অপ্রত্যাশিত খবরটা তাদের সবার মনকে এমন নাড়া দিয়েছে যে সবাই উপস্থিতবৃদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে।

ঘাড় নেড়ে বলল, সোমা, “হাঁ—রসিক মাঝি তো আছেক্। তবে চল্ তারু ঠাই। পশু করম্ হাম্‌রা—মিটিং করম্। বিলের মাছের হক্‌দার আমরা, ক্যানে তভে মাছ মারম্ নাই, খাম্ নাই—ক্যানে রে বাপ্?”

সাঁওতালদের চোখের অপস্ফূর্ত লালিমা, রক্তের বিলীয়মান আভা আবার ফিরে এল, চোয়াল শক্ত করে মাথা নেড়ে তারা বলল, “হয়—চল্ তভে মংরা—সদরের কাছোং চলক্ ক্যানে—”

ঝুমুরীর দিকে তাকাল মংরা। বাপের নামে গবেঁ মেয়েটার মুখ চোখ কেমন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, কেমন অপূর্ণ শ্রীধারণ করেছে, চাপা একটা হাসির রেখা কেমন জোয়ারের মত প্লাবিত করছে তার পুরু পুরু রসালো দুটো চোঁটকে!

“তুর বাপের কাছোং যাচ্ছিরে—” হেসে বলল মংরা। বোঁকে দেখে হঠাৎ আশ্চর্যসদে মনটা ভরে উঠল তার—হয় বাপ্, তার বউ শিরসি গাঁয়ের সেরা মেয়ে, সদরের মেয়ে।

দু’চোখের খরবিদ্যুৎ বর্ষণ করে ঝুমুরী বলল, “যা। হামার বাপের কাছোং যাচ্ছিস্—কিন্তুক্ আই তুর কে হয় বটে? আ?”

“শ্বশুরা”—মংরা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল।

সাঁওতালরা সবাই হেসে উঠল। ঝক্‌ঝকে দাঁত মেলে হাসতে হাসতে সবাই নিচে নামল, ঘাসের মধ্যবর্তী, লিকলিকে সাপের মত সরু, সাদা পথটা ধরে চলতে লাগল।

পাট আর অর্ধ-সমাপ্ত দাঁড়ীকে তুলতে তুলতে ঝুমুরী তাকাল। পথটার ওপাশে তিনজন স্ত্রীলোক তখনো দাঁড়িয়ে ছিল তাদের উদ্দেশ্যে সে বলল, “উদের লিয়া হামার মনিষটা হামার বাপের কাছোং যাচ্ছে—তুদের সদরের কাছে। মিটিং—মিটিং কইরবে”—স্বামী এবং পিতার গরিমায় বলমূল করে উঠল সে, এমনভাবে তাকাল সেই স্ত্রীলোকদের দিকে যেন তারা নেহাৎই রূপার পাথ্রী, যেন মংরার মত স্বামী এবং রসিক মাঝির মত পিতা না থাকায় তাদের জীবনটা বার্থ, অর্থহীন হয়ে গেছে।

স্ত্রীলোক তিনজন তাদের মাথার রুদ্ধ চুলে হাত বুলিয়ে তাকাল সেই সরু পথটার দিকে,



বিড়বিড় করে বলল, 'মিটিং জী—মিটিং, আয় বাপ্—'

গরীব চাষাভূষার এতদিনকার অধিকার—কাড়োল বিলের মাছ মারা—জমিদার শিবেন্দ্রকুমার চৌধুরী কেড়ে নিলেন।

কেন তার আগে জমিদারের বিষয়ে একটা গল্প বলা যাক্।

শিবেন্দ্রকুমার সৌখীন লোক। একে জমিদার, তায় বয়স এখনো ছত্রিশ পার হয়নি তাঁর। কলকাতার বিলিভী দীর্জর দোকানে তার বিদেশী পোষাক থেকে পাঞ্জাবী পর্যন্ত তৈরী হয়, নিপুণ চীনে কারিগরেরা তাঁর জুতো সেলাই করে, প্যারিস থেকে আসে তাঁর সিলেক্ট রুমালের জন্য এসেন্স আর চুলের টর্নিক, শাশিতপুরের তাঁতিরাই গলদুর্ঘা হয়ে তৈরী করে তাঁর জন্য সস্তর টাকা জোড়া ধতি এবং ফরাসী দেশের ট্রান্সকুঞ্জ গুচ্ছ গুচ্ছ রসালো আঙুর তো তাঁরই পানীয় সরবরাহের জন্য জন্মে থাকে। তিনি সৌখীন লোক, দামী দামী নানা সখ তাঁর আর তাদের মধ্যে সবচেয়ে সেরা সখ হচ্ছে কুকুর পোষা। স্যানিয়েল, ফল্ টেরিয়ার, উলফ্ টেরিয়ার, বুলডগ্ রাড হাউণ্ড—নানাজাতীয় বিদেশী কুকুর তিনি পুষেছেন একের পর এক। বর্তমানে একজোড়া গ্রে-হাউণ্ড পুষছেন তিনি। চমৎকার কুকুর দুটো।

কলকাতায় যাচ্ছিলেন শিবেন্দ্রকুমার। কুকুর দুটোও অবশ্য সঙ্গে ছিল, ওরা যে তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় ছিলেন তিনি। সঙ্গে পুরোনো চাকর নন্দ। সে কুকুর দুটোকে নিয়ে চাকরদের কামরায় ছিল। গ্রে-হাউণ্ড দুটোর নাম মিকি ও জেনী। শেকল বাঁধা ছিল গলায়, অন্য প্রান্তটা ছিল নন্দর হাতে। খোলা দরজার সামনে বসে ছিল কুকুর দুটো, কান খাড়া, বাইরের দিক জিভ বের করে হাঁপাচ্ছিল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখাচ্ছিল, দ্রুত অপসর্যমান পৃথিবীটাকে। কামরাটা বৃন্দ থাকলে কুকুর দুটো ছটফট করছিল রুমসই—একটা দরজা খোলা রেখেছিল নন্দ। তখন বিলের ধার দিয়ে যাচ্ছিল ট্রেনটা, গতিবেগ ধীরে ধীরে বাড়ছিল। এমনি সময়ে বিলের ধারে ঘন ঘাসের মাঝে একটা রুগ্ন কুকুরকে কি খুঁজতে দেখা গেল। তাদের দেখে বিলিভী কুকুরগুলোর আচস্মানে বোধ হয় যা লাগল। দেশী নিগারদের ওপর শ্বেতাঙ্গ সাহেবেরা যেমন গর্জে উঠত তেমনিভাবেই গর্জে উঠল মিকি আর জেমী। পর মুহূর্তেই চকিত একটা ব্যাপার ঘটল। মিকি হঠাৎ একটা প্রচণ্ড লাফ দিল খোলা দরজাটা দিয়ে। অনামনস্ক নন্দর হাত থেকে শেকলটা ছিটকে

বোঁরিয়ে গেল। লাফ দিয়ে তা ধরতে গিয়েও পারল না নন্দ। মিকি বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নন্দর বৃদ্ধি যেন লোপ পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি জীনের শেকলটা বৃন্দ দরজার হাতলে বেঁধে কুকুরকে পড়ে বাইরের দিকে তাকাল নন্দ। কিন্তু কোথায় মিকি? কোনো চিহ্ন নেই তার। ঝড়ো হাওয়ার মত হু হু করে এবার চলছে ট্রেনটা, প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে যাচ্ছে, আর কি মিকিকে দেখা যেতে পারে। অসম্ভব। তবে? কি করা যাবে?

খুব ভাবল নন্দ। চেন ধরে টানবে নাকি? বাপরে কথাটা ভাবতেই ভয় পেল সে। পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দেবে নাকি সে? উঃহু।

তবে? ট্রেন না থামলে তো আর মিকিকে খোঁজা যাবে না। পরবর্তী স্টেশনে যখন তা থামবে তখন মিকি অন্ততঃ আট দশ মাইল পেছনে পড়ে থাকবে। আর মিকি তো বর্ণ পরিচয়ের 'সুবোধ বালক' নয় যে, এক জায়গাতেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে বা বৃদ্ধি খরচ করে ট্রেনের পেছন পেছন দৌড়ে আসবে। সে হয়ত সেই নিগার কুকুরটাকে তাড়া করেছে এতক্ষণ। বিলের ধার দিয়ে জল কাদা ভেঙে ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে হয়ত রুগ্ন দেশী কুকুরটা তার লোমহীন ল্যাজটাকে গুটিয়ে পেটের সঙ্গে লাগিয়ে উদ্ভ্রম্বাসে পালাচ্ছে, পালাচ্ছে এবং মিকি অক্লান্তভাবে সর্বিষ্টমে তার পশ্চাৎদর্শন করেছে।

তাহলে? কি হবে? জমিদারবাবুকে তো জানাতেই হবে কথাটা। এখন উপায় নেই কিন্তু ট্রেন থামার আগেই জানাতে হবে তাঁকে। তখন? ভাবতে মাথা ঘুরে গেল নন্দর, চোখের সামনে সত্যি সর্বে ফুল এসে দেখা দিল।

বিমূঢ়ের মত স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল চাকরটা।

ট্রেনের গতি আবার মন্ধর হয়ে এল আর চাকরটার নাড়ীর স্পন্দন তেমনি দ্রুত হয়ে উঠল। শেষে একসময়ে ট্রেনটা থেমেই গেল।

উপায় নেই। জেনীকে নিয়ে নন্দ নামল কামরা থেকে। গেল শিবেন্দ্রকুমারের কাছে।

"কি হল?" তিনি হঠাৎ শব্দ জেনীকেই নিয়ে আসতে দেখে প্রশ্ন করলেন।

নন্দর মুখে কোথাও রক্তের চিহ্ন নেই, ফ্যাকাশে ভয়ে মুহোমান মুখটা নীচু করে সে বলল, 'হুজুর—কিন্তু কথা শেষ করার সাহস তার আর হল না।

"কি? কি বলছিস? মিকি কই?"

"লাফিয়ে পড়েছে"—

"মানে?"

গার্ডের হুইসল শোনা গেল।

"হঠাৎ চলতি ট্রেন থেকে লাফিয়ে বাইরে চলে গেল—আর একটা কুকুরকে দেখে"—

ট্রেনের বাঁশী বাজল।

তাড়াতাড়ি জেনীকে নিয়ে ভেতরে গেল নন্দ।

"কি বলছিস—এঁা!" শিবেন্দ্রকুমার তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন।

"আজ্ঞে"—

ট্রেন তখন চলতে শব্দ করে দিয়েছে।

রক্তের উচ্ছ্বাস ঘনিয়ে এল শিবেন্দ্রকুমারের সারা মুখে, কঠিন একটা হিংস্রতা দেখা দিল তার আরক্ত চোখের তারায়। এগিয়ে গেলেন তিনি নন্দর দিকে।

"শুনার, তুই করছিল কি? এঁা!"

"আজ্ঞে"—

"চোপ্—"ঠাস করে একটা চড় বাঁসিয়ে দিলেন তিনি নন্দর গালে।

চল্লিশ বছর বয়স্ক চাকরটা একবার তার অসহায় দৃষ্টি মেলে জমিদারবাবুর দিকে তাকিয়েই ত্রাখাটা নীচু করল। অপরাধীর মত।

শিবেন্দ্রকুমার ঘুরে দাঁড়ালেন, বাঘের মত থাবাটা দিয়ে এ্যালার্ম চেনটা টেনে ধরলেন। হঠাৎ চলতি ট্রেনের গতি কমে গেল। তীক্ষ্ণ বংশীধ্বনি করতে করতে তা দাঁড়িয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। দরজা খুলে দাঁড়ালেন শিবেন্দ্রকুমার। গার্ডের প্রত্যাশায়।

অন্য কামরাগুলোর খোলা জানালা এবং দরজা দিয়ে কোতুলী যাত্রীরা মুখ বাড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। ব্যাপার কি? চেন টানল কে? ডিসটাণ্ট সিগনালকে তো ডাউনই দেখা যাচ্ছে তবু ট্রেনটা দাঁড়াল কেন? জাতিহলের অতিশয়ো অনেকে অস্থির হয়ে উঠল, কামরা থেকে নীচে নামল।

গার্ড সাহেব এসে ফার্স্ট ক্লাশ কামরাটির সামনে দাঁড়াল।

"কি হল স্যার—কোনো বিপদ হয়নি তো?"

শিবেন্দ্রকুমারের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করেই গার্ড সাহেব একটু চমকে উঠল। ভদ্র-লোক যেন চেনা চেনা।

"স্যার আপনি—আপনি কি?"

"হ্যাঁ, আমি নন্দীগ্রামের জমিদার শিবেন্দ্রকুমার চৌধুরী—"

"নামস্কার স্যার"—

"নামস্কার। ব্যাপার কি হয়েছে জানেন? আমার একটা গ্রেহাউণ্ড আগের স্টেশনের পরে কামরা থেকে লাফিয়ে পড়েছে—তাকে উদ্ধার করতে হবে।"

গার্ডসাহেব একটু ভাবল। গোলমেলে ব্যাপার বটে। কিন্তু যে নন্দীগ্রামের জমিদারকে

রেলকোম্পানীও খাতির করে, যাঁর খাতিরে রাতারাতি নন্দীগ্রামে স্টেশন তৈরী হয়ে ওঠে তাঁর ব্যাটারাতের সুবিধার জন্য, সেই জমিদার-বাবুর কুকুরকে উৎসার করার চেষ্ঠা না করলে হয়ত তার চাকুরীটা নিরেই গোলমাল শুরুর হবে। কাজ কি বাবা অত ফাঁসাদে—না হয় পনেরো কুড়ি মিনিট লেটই হবে ট্রেনটা। এমনি তো মাঝে মাঝে দেড় ঘণ্টা দু'ঘণ্টা পর্যন্ত লেট হয়। রিপোর্টটাকে কোনরকমে সে ম্যানেজ করে নেবেই।

গার্ডসাহেব বেশ খোসামুদে হাসি হেসে বলল, “কোন চিন্তা করবেন না স্যার—আপনার কুকুর স্যার—তার জন্য পেছা হটতে হবে বৈকি—এখনি যাচ্ছি সেদিকে।”

“ধন্যবাদ—ট্রেনটা যেন একটু আস্তে আস্তে চলে, নইলে হয়ত আমরা কুকুরটাকে মিস্ করব।”

গার্ডসাহেব মাথা নেড়ে হন হন করে প্রথমে স্টেশন-মাস্টারের কাছে গেলেন, পরে ড্রাইভারের দিকে এগিয়ে গেলেন, কি সব নির্দেশ দিলেন দ্রুতকণ্ঠে, তারপরে ফিরে গেলেন নিজের কামরায়। তীক্ষ্ণ বংশীধ্বনি করে ট্রেনটা পেছন দিকে চলতে আরম্ভ করল। যে সব যাত্রীরা কামরা থেকে নীচে নেমেছিলেন, তারা এখন কোলাহল করতে করতে আবার কামরায় উঠতে লাগল।

শিবেন্দ্রকুমার আত্মপ্রসাদে, গর্বের, নিজের প্রতাপের নন্দনা দেখে খুশী হয়ে উঠলেন, নন্দর দিকে তাকিয়ে বললেন, “হারামজাদা শূয়ার কোথাকার—যত সব—দে, ফ্রাস্ক থেকে চা দিয়ে বাইরে নজর রাখ।”

“আজ্ঞে—”

নন্দ নিজের প্রান্ত্রন অপরাধ স্থালন করার জন্য অত্যধিক যত্ন ও দরদের সঙ্গে ফ্রাস্ক থেকে চা ঢেলে এগিয়ে দিল মনিবের দিকে। তারপর পরজা দিয়ে বন্ধুকে বাইরের দিকে তাকিয়ে গেল।

আস্তে আস্তেই চলাছিল ট্রেনটা। গার্ডসাহেবও বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। আর তার দিকে তাকিয়েছিল ইঞ্জিনের ড্রাইভার।

প্রায় মিনিট দশেক কেটে গেল।

হঠাৎ গার্ডসাহেবের লাল নিশানকে আন্দোলিত হতে দেখা গেল। ট্রেন থেমে গেল। ব্যাপার কি?

“পাওয়া গেছে—এঁ?” শিবেন্দ্রকুমার আবার উঠে দাঁড়ালেন।

“আজ্ঞে—গার্ডসাহেব আসছেন মিকির চেন ধরে।” সঙ্গে একটা সাঁওতাল।

“বটে!”—দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন শিবেন্দ্রকুমার।

“এই যে আপনার কুকুর স্যার—লাভালি দেখতে—” গার্ডসাহেব এসে বিগলিত হাসি হাসল।

“অনেক—অনেক ধন্যবাদ গার্ডসাহেব—আপনি আমার খুব উপকার করলেন।”

“আমি আর কি করছি স্যার—যা করেছে, সে এই লোকটা। কুকুরটাকে দেখে ও স্টেশন মাস্টারের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য নিয়ে আসছিল। তা নইলে কোথায় খুঁজতেন বলুন তো!”—বৈষ্ণবী বিনয়ে চোখ মুখটাকে নিরীহ করে তুলল গার্ডসাহেব।

“তুই খেরিছিলি কুকুরটাকে—এঁ?” সাঁওতালটির দিকে তাকালেন শিবেন্দ্রকুমার।

“আজ্ঞা হুজুর—হামি”—সাঁওতালটি হাত জোড় করল।

পকেটে হাত দিলেন শিবেন্দ্রকুমার, দুটো এক টাকার নোট বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, “নে ব্যাটা বক্‌শিস”—

“আজ্ঞা”—অভিভূত হয়ে সাঁওতালটা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল তাঁর দিকে, তারপরে নোট দুটো কুড়িয়ে নিল।

“তাহলে আসি স্যার”—গার্ডসাহেব বলল।

“আসুন। আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি গার্ডসাহেব।”

“না না, কি যে বলেন, এ তো আমার ডিউটি”—

ট্রেন আবার চলতে আরম্ভ করল। এবার অবশ্য সামনের দিকেই।

মিকির গারে হাত বুলাতে বুলাতে শিবেন্দ্রকুমার আদরের সুরে বললেন, “ভেরী নটি, ভেরী নটি, মিকি, তুই একটা বদমায়েস” হঠাৎ নন্দর দিকে নজর পড়ল তাঁর। মৃদু মৃদু হাসছে চাকরটা।

তিনি গর্জে উঠলেন, “দম্ভ-বিকাশ করা হচ্ছে কেন, এঁ? ব্যাটা যাঁড়, উল্লক—হনমান!”

এই গল্প থেকেই নন্দীগ্রামের জমিদার শিবেন্দ্রকুমার চৌধুরীর খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। দিগ্বিজয়ী, দুর্ধর্ষ সম্রাটের মত তাঁর মেজাজ আর প্রতাপ। রেল কোম্পানী পর্যন্ত তাঁকে খাতির করে, তাঁর কুকুরের জন্য পাঁচ ছয় মাইল পিছিয়ে নিয়ে যায় ট্রেনকে।

কুকুর পোষেন শিবেন্দ্রকুমার। হিংস্র বিলতি কুকুর। শিকারের উপর যারা লাফিয়ে পড়ে, যারা টুংটি কামড়ে ধরে অবলীলাক্রমে। আর সেই সব কুকুরদের যিনি বশ করেন, তাঁর কথা আর বেশী বলে কি হবে? জমিদার—খাঁটি জমিদার তিনি। তিনি জানেন যে, দাপট না দেখালে প্রজারা ঠান্ডা থাকে না।

বদরাগাঁ, নিষ্ঠুর লোকটা। লোভী, স্বার্থপর। আর অন্তরের সেই সব হিংস্র, কুটিল বৃন্তিগুলো তাঁর চেহারাকেও কুণ্ঠিত করে ফেলেছে। অত্যধিক ভোগবিলাসে দেহ তার মেদবাহুল্যে হাতীর মত দেখায়, হাঁটলে ব্যাঙের কথা মনে পড়ে। বুলডগের মত

মুখটার দুটো সদা-রক্তিম চোখ মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখে, ভয় পাইয়ে দেয়।

আর সেই দুটো রক্তাভ চোখের নীচে আছে কালো কালো ছায়া। তার মাঝে উদ্‌যম, বন্য, লালসাতুর অনেক কালো রাতের কথা। কলকাতার অভিজাত পাড়াতে প্রতি মাসে দেখা যায় নন্দীগ্রামের জমিদারকে। নিজস্ব গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে বিদ্যুৎবেগে ছুটে যায় তাঁর রয়াল ক্রাইসলার, ক্যাসনোভার আর ফিরপোতে, সিনেমায় আর রংগালয়ে, লেকে আর মাঠেও তাঁকে অনায়াসে চেনা যায়। তিনি একা থাকেন না, তাঁর সঙ্গে সবদাই একজন দু'জন যুবতী থাকে। তারা তাঁর স্ত্রী নয়, আত্মীয়া নয়। তারা কি তা বলার দরকার কি? তারা সুন্দরী এটা বলা যায় অক্লেশে, সেই সব সুন্দরীদের দিকে তাকালে মনে বিশ্বাস জন্মায় যে, তাদের সৌন্দর্যে এমন মাদকতা আছে, আছে এমন কিছু যা চেতনাকে দুর্বল করে তোলে, যা সমস্ত বিবেক-বুদ্ধিকে লোপ করে মানুষকে অরণ্যের অন্ধকারে ঠেলে নিয়ে যায়।

আর এইসব রূপসীদের মুখের হাসির জন্য, তাদের মমভৈদী কটাক্ষের জন্য, তাদের উত্তপ্ত আলিঙ্গন ও চুম্বনের জন্য, তাদের রাতের অন্ধকারে নিজের শয্যা পাবার জন্য তাড়া তাড়া নোট বের করেন শিবেন্দ্রকুমার চৌধুরী।

সৌখীন ও বিলাসী মানুষ শিবেন্দ্রকুমার শিক্ষিতও বটে। রাজনীতি তিনি বোঝেন, দেশের দ্রুত রাজনৈতিক পরিবর্তনকেও তিনি লক্ষ্য করেছেন। সবথেকে বেশী লক্ষ্য করেছেন তিনি তাঁর প্রজাদের, চাষা মজুরদের। লক্ষ্য করে একটা অবশ্যম্ভাবী ঘটনার বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হয়েছেন, বুঝেছেন যে যা করবার এই সময়েই করতে হবে, কবে যে ওই সব মুখ, জানোয়ারের দল পাগলা হাতীর মত ছুটে আসবে তার ঠিক নেই। তার আর সন্দেহ নেই, বিশ্বাস জন্মেছে যে, ঐ সব অধীনশ পশুরা একদিন শৃঙ্খল তাঁর জমিদারীই নয়, সমস্ত পৃথিবীটাকেই দাবী করে বসবে। সুতরাং লেবুকে নিংড়ে নিংড়ে সবটুকু রসই পেতে হবে। বিল? ঐটাই বা বাদ যায় কেন? ইজারা দিলে বার্ষিকী দশ পনেরো হাজার টাকার মোটা লাভ। অতএব? ঢোল দেওয়া হোক গ্রামে গ্রামে। সবাই জানুক যে কাড়োল বিলের মাছ ধরার অধিকার কারো নেই। যদি তবু ধরে? জেলার সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব সে বিষয়ে অশ্বাস দিয়েছেন, পাঠিয়ে দিয়েছেন দশজন শশস্ত্র প্রহরীকে। যদি জানোয়ারগুলো আদেশ অমান্য করেই মাছ ধরে তবে দশটা রাইফেল থেকে অগ্নিময় মৃত্যুর হুঙ্কার শোনা যাবে। সাবধান।

শিরসি গ্রামে ঢোল বাজার আগেকার ইতিহাস মোটামুটি এই।

ওরা গিয়ে রাসিক মাঝির বাড়ির সামনে দাঁড়াল।

রাসিক মাঝির বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে, মাথার চুলগুলো রোদে জলে ডিঙে পড়ে থাকে পালকের মত ধবধবে সাদা হয়ে গেছে। তবু শব্দ

আছে তার দেহের কাঠামো, তালগাছের গাড়ির মতই মজবুত তার শরীরটা। ছোট ছোট চোখ দুটোতে ধূত তার চামলা, অনেক অভিজ্ঞতা দাগ কেটেছে তার ললাটে আর চোখের কোণে। মস্ত বড় একটা চুটি টানতে টানতে সে

জামাই ও অন্যান্য সবার কথা মন দিয়ে শুনল। গম্ভীর ও নির্বিকারভাবে। কিন্তু কোনো কথা বলল না, দাওয়া থেকে মদুতা বাড়িয়ে খানিকটা থুথু ফেলে সে চুপ করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। (ক্রমশঃ)



# স্বর্ণমৃগ...

‘স্বর্ণমৃগ’ একান্তই বহুসস্তাহীন

কিন্তু এর অপূর্ণ রূপ-সৌন্দর্যের

বিজ্ঞাচ্ছটায় রচে মোহের ইন্দ্রজাল

এবং আনে দর্শকের বিপজ্জনক

বিভ্রান্তি। অধুনা বিস্তৃত পণ্য ভবোর

অত্যধিক অভাব হেতু যে সব কৃত্রিম

ও নকল প্রসাধন সামগ্রী বাজারে

আত্মপ্রকাশ করেছে এসব ‘স্বর্ণমৃগের’ স্থায়ী

সারবস্তহীন ও প্রতারণামূলক। বিখ্যাত ‘হিমকল্যাণ’

এর বহু অবিকল ও অমূল্য নকল বাজারে খরিদারগণকে

বিভ্রান্ত করেছে কিন্তু একটু সাবধানতা অবলম্বন পূর্বক

সম্ভ্রান্ত দোকান হ’তে খরিদ

ক’লেই প্রতারিত হবার

সম্ভাবনা কম। বর্তমানে

‘হিমকল্যাণ’ এর সরবরাহ

পূর্বা পেক্ষা বেশী। ইহা

অননুগ্রহণীয় ও অপরাধেয়

আয়ুর্বেদীয় কেশপ্রসাধনী।



# হিমকল্যাণ

ভৈরব বিশারদ তগেজনাথ শাস্ত্রীর

আয়ুর্বেদাত  
কেশতৈল



হিমকল্যাণ ওয়ার্কস • কলিকাতা, কর্তৃক প্রচারিত

# নবীন রাশার খড়্গ

শ্রী অঞ্জলি দেবী

মু' ফিসে আজকাল কাজ-কর্ম বন্ধই হয়ে এসেছে বলতে গেলে। 'পার্টিশান' 'ফারেন্ডাম' এই সব মত্থরোচক সংবাদগুলি লোচনা করতেই সময় কাট, কাজে কারুরই নেই। ভবে দেশের এই মহানন্দিক্ষণে, যখন তান্দীর সাধনা সফল হ'তে চলেছে, যখন ম্পর্শী এবং মৃগান্তকারী নাটক অভিনীত ছে দেশের বিরাত রংগমঞ্চে প্রতি মূহর্তে—খন বিদেশী বণিকের টাকা আনা পাই-এর সোব যদি বাবুদের মন না থাকে ত, বিশেষ পিরাধ নেওয়া যায় না।

সেদিনও আলোচনাটা জমে উঠেছিল খুব।

মাত্রাজী ছোট সাহেব এবং পাশী' মেজো সাহেব দুজনেই অনুপস্থিত। বড় সাহেবের প্রাপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরের মধ্যে বাইরের শব্দ পৌঁছয় না; সুতরাং গলা চড়লেও দ্রুতি নেই আজ। অটলবাবুর বাজখাই আওয়াজটাই সবার জন্য চাপিয়ে উঠছে বার বার, তিনি বলছেন, খাই বলো ভাই, মত্থজ্ঞে আমাদের বাঘের বাজা বটে—ও না লাগলে এত সহজে পার্টিশানটা সাক্ষেদ'ফুল হ'ত না।'

দয়ালবাবু বংগেসের ভক্ত, গলা তাঁর বেশী চড়ে না অন্যসময় তবু, মত্থজ্ঞের প্রশংসায় বিচলিত হ'য়ে কোনমতে শিরা ফুলিয়ে তিনি জবাব দিলেন, "ছো! কংগ্রেস যদি ব্যাপারটা টেক্-আপ না করত তাহলে আর এত সহজে হত না—এ কথাটা মনে রাখবেন। আন্দোলনটা অন্য ব্যাপারের মতই ভাষা ভাষা থেকে যেত—বংগেসের চেটোতেই না জনমতটা এমন করে 'আমোদান জড়ো করতে পারলে!'

সুশীলবাবু খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে বললেন, 'আসল কথাটা তোমরা কেউই বসছ না। সত্যি সত্যি যদি কারুর কিছু কৃতজ্ঞতা পাওনা থাকে ত সে পত্রিকার। পত্রিকা জনন আদ-জল খেয়ে না লাগলে—'

নরেন এসে এঁদের টেবিলের ওপরই জাঁকিয়ে বসেছিল। সে টেবিলের ওপর একটা চড় মেরে বললে, 'যাক গে—কার স্বার; হ'ল এটা বড় কথা নয়। হয়েছে এই টের। সব ভাল বার শেষ ভাল। এখন ভাল ভাল ওদের পশ্চাপার করে দিতে পারলে বাঁচি। বাউন্ডারী

কমিশনের রিপোর্টটা না বেরোন পর্যন্ত স্থাস্তি পাচ্ছ না, এই যা!'

এই সময় সকলের নজরে পড়ল অতুল ওধারের টেবিলে ঘাড় গুঁজে কাজ করেই যাচ্ছে। এতে বোধ হয় ওদের বিবেক একটু অপরাধী বোধ করল—অটলবাবু চোঁচিয়ে উঠল, 'কী হে ছোকরা! তোমার যে কাজে আজ বস্তু মন দেখছি! এস এস, এমন আনন্দের দিনে—

অতুল ওর ফাইল থেকে মাথা তুলে বললে, 'এটাকে আনন্দের দিন বলে ঠিক মনে করতে পারছি না অটলবা। বরং মনে হচ্ছে দেশের এত বড় দুঃখের দিন আর কখনও আসেনি—'

অটলবাবু মত্থখানা বিকৃত করে বললেন, 'ও তোমার আবার সেই বিশ্বপ্রেম, ভুলেই গিয়েছিলুম।'

সবাই হেসে উঠল। অতুল কিন্তু দৃঢ় কঠেই বললে, 'এটা বিশ্বপ্রেমের কথা নয় অটলবা, বরং খুবই স্বার্থ'কেন্দ্রিক কথা।..... মুসলমানভাইদের আলাদা করে দিলাম এদুখে ত আছেই—কিন্তু তাদের যদি আজ ভাই বলে স্বীকার করতে রাজী না-ও থাকেন ত পৌণে দু'কোটি হিন্দু বাঙালীর কথাই বা ভোলেন কি করে! যদি এটা আজ নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হ'য়ে থাকে যে মুসলমানদের রাজস্ব আমরা সুখে থাকব না, তাহলে তাদের কোন ভরসায় আপনারা ভানিয়ে দিলেন?'

অটলবাবু একটু ঢোক গিললেন। তা বটে—তা অবশ্য বটে। খুবই দুঃখের কথা এটা তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আর কীই-বা করা যেতে পারত বলো। সর্বনাশ উপস্থিত হলে পণ্ডিতরা অর্ধেকটা ত্যাগ করে থাকেন। আমাদেরও তো সেই সর্বনাশেরই সময় এটা—'

সুশীলবাবু বললেন, 'গ্রেটার কজ, মানে বহুস্তর কারণের জন্যই আমরা তাদের বলিদান দিতে বাধ্য হলাম। বাঙালী হিন্দুর সংস্কৃতি সবটাই ত যেতে বসেছিল—তবু যেটুকু বাঁচে।'

নরেন বলে উঠল, 'তাছাড়া স্বাধীন পশ্চিম-বংগই তাদের ভরসা রইল—'

দয়ালবাবু আর থাকতে পারলেন না, বললেন, 'তুই থাম নরেন—পশ্চিমবংগ যে তাদের কত বড় ভরসা তা তারা জানে। আমাদের পাড়ায় একটি বস্তু ভরলোক ত খোলাখুলিই বললেন, যাক মশাই, বাঙালদের উপদ্রব থেকে

প্রাণ বাঁচল। .....পশ্চিমবংগের যা দরদের নমুনা তা বাঙালরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে, এমন নিপদে পড়ে আশ্রয় খুঁজতে তারা কলকাতাতে এল—তোমরা যতটা পারলে বাড়ি নিয়ে ব্রাক-মাকে'টিং করলে। চল্লিশ টাকার বাড়িটা রাতারাতি একশ' চল্লিশ হল, তার উপর সেলামী আছে দু' হাজার, তিন হাজার। .....তাও আমাদের পাড়ায় ত বাড়িই দিতে চায় না বলে, না মশাই ও বাঙাল-ফাঙাল চলবে না। ...না, ওসব কোন কাজের কথা নয়, তবে ঐ—নিজে বাঁচলাম এইটেই বড় কথা। ওদের যা হয় হোক, এটুকু ত রক্ষা পেলে। একটা জেলাও ত বাঁচত না।'

'কে বললে বাঁচত না দয়ালদা?' এবার এগিয়ে এল অতুল, 'আপনারা একবার চেষ্টা করে দেখেছেন কি? আজ এত বড় আন্দোলন, কেউ নেই যে, বলবে মুসলমান মতাই খরাপ কিংবা এতকাল যাদের সঙ্গে সুখে-দুঃখে, উৎসবে বিপদে পাশাপাশি বাস করে এলাম, তাদের মধ্যে আর কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না। অসং সব দেশের সব সমাজেই চিরকাল আছে, থাকবেও। সেই অসংগুলোকেই অনুকূল বাতাস দিয়ে প্রবল করে তোলা হয়েছে—এই মাত্র। সেই ব্র্যাক ফোর্সেসগুলোকে কি হারানো যেত না শেষ পর্যন্ত, এই আপনার বিশ্বাস? তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা চিরন্তন, সত্য। শেষ অবধি সত্যেরই জয় হত—যদি আমরা চেষ্টা করতাম, যদি মিথ্যার সঙ্গে সংগ্রাম করার সাহস আমাদের থাকত।'

'সংগ্রামটা কী করে করবে?'—অটলবাবু এবার খিঁচিয়ে উঠলেন, ঢাল নেই, তলোয়ার নেই—নিধিরাম সর্দার। ঐ ত তোমার গান্ধী, উনি উপদেশ দিলেন অহিংসা দিয়ে—জয় করো। ছুরি, বশী, বন্দুক, আগনের সামনে অহিংসা নিয়ে দাঁড়াবে, এমন পাগল ত কেউ নেই। নেতারা কেউ এসে দাঁড়িয়েছিল, কোন উপায় বলে দিয়েছিল? বাঙলা দেশ নিয়ে কোন নেতারই মাথা বাথা নেই। কে আসবে বলো?'

অতুলের মুখে উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছিল। তবু সে শাস্তভাবেই বললে, 'গান্ধীজীর অহিংসা কি আপনারা কেউ পরীক্ষা করে দেখেছিলেন? বটিশ বেরেনেটের সামনে ত এই অহিংসা নিয়েই—কোন দাঁড়িয়েছিলেন—আর তাতে ফলও ত ফলল।'

'সে সারা ভারতব্যাপী একটা মাস মুন্ডমেট হয়েছিল—'

'আজ্ঞা, সেকথা ছেড়েই দিন। আরও হোট কথা বলছি। সে ত বেশ দিনের কথাও নয়। আই এন এ বিচারের সময় ধর্মতলা স্ট্রীটে শোভাযাত্রার পথ আগলেছিল গভর্নমেট। লীগ

গভর্নমেন্ট আর ব্রিটিশ অস্ত্র তার পিছনে, বাধা ত কম ছিল না। তবু সৈনিক সেই মুন্টিমেয় ছাত্রদের নিরস্ত্র প্রতিরোধের সামনে গভর্নমেন্টকেই পথ দিতে হয়েছিল। কটা আর মরেছিল বলুন। রামেশ্বর! অমন কত রামেশ্বর প্রতিদিন অপঘাতে মরছে। কী এসে যায় দু-একটা প্রাণে? নোয়াখালির সংবাদ যেদিন প্রথম এখানে পৌঁছয়, সেদিন কি পাঁচ-সাত হাজার নিরস্ত্র ছেলে এখান থেকে মার্চ করতে পারত না? স্টেন বন্ধ করতে? না হয় পায়ে হেঁটেই যেত। কী করে বাধা দিত তাদের? পৃথিবীর কোন গভর্নমেন্টের সাধ্য নেই যে, সাত হাজার নিরস্ত্র ছেলের ওপর গুলী চালায়। হয়ত এক-আধবার ভয় দেখাত, হয়ত দু-একশ' ছেলে মরত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এদেরই হত জয়। ..... তারপর এই সব ছেলেরা সেখানে গিয়ে 'মারো' বলে বুক পেতে দাঁড়ালে যত বড় ব্যাঙ্ক ফোর্সই হোক না কেন, মাথা নত করতে বাধ্য হত নাকি? গান্ধীজীকে ত পাগল বলে উড়িয়ে দিলেন দাদা, তার কথা মত চল দেখেছেন ফল হত কিনা? অস্ত্র দিয়ে অস্ত্র নির্মূল করা যায় না—পৃথিবীর ইতিহাসে সে প্রমাণ বার বার পাওয়া গেছে, অস্ত্র যত বড় শক্তিশালীই হোক তার চেয়েও বড় অস্ত্র এসে তার মারণ-শক্তিকে স্তান করে দেয়। গান্ধীজীর পথই বিচারা পথ, আর তা একদিন পৃথিবীর লোক বুঝবেই। কিন্তু সেসব ত বড় বড় কথা দাদা, আমার আফশোষ এই যে, এমন করে নিজের মাঁকে দুখানা করলাম, ভাইকে পর করলাম একেবারে বিনা চেষ্টায়, বিনা যুদ্ধে। .....এই যেসব কাগজ পাঠিশানে এত উৎসাহ দিলেন, যেসব নেতারা এত লক্ষ্যবাক্ষ করলেন, তাঁরা একবারও চেষ্টা করে দেখলেন না যে, বাইরে থেকে যে ইভলু ফোর্স এসে বাঙালী মুসলমানদের ঘাড়ে চেপে বসেছে, তাকে ঘাড় থেকে নামানো যায় কি না। ঠিক দেউজীর ঝগড়ার মতই আমরা আলাদা হবার দিকে সব চেষ্টাটা দিলাম, একাঙ্গে থাকা যায় কিনা, সেকথা একবারও ভাবলাম না। নেতারা নিজেরা ত কিছু করলেনই না, ছেলেদেরও ডাকলেন না, 'আয় ভাই' বলে। একটা মডেমেন্ট পর্যন্ত হল না।'

'ও, নরেন বলে উঠল। 'তোমরাও বুঝি বোস সাহেবদের দলে? স্বাধীন রাষ্ট্র গড়তে চাও?'

'কারুর দলেই নই আমরা। বোস সাহেবের ত নয়ই।.....তা বলাই না, বলাই যে সমস্ত বাঙলা দেশটাকেই ইন্ডিয়ান ইউনিয়নে রাখা যেত কিনা, সে চেষ্টা করে দেখেছেন কি কেউ? একটা মাস মডেমেন্ট, যাকে খবরের কাগজে বলে গণ-আন্দোলন, তা করলে 'কি কোনই ফল হত না? শতকরা পঁচিশ জনের দল আন্দোলন করে

ভারতকে দুখানা করতে পারলে আর শতকরা সাতচল্লিশের দল বাঙলাকে এক করতে পারত না? .....এ আমি বিশ্বাস করি না। আমাদের পাপেই এই হল নরেনবাবু, লেখাপড়া-জানা হিন্দু বাঙালীরা বাঙালী মুসলমানদের কোন-দিনই আপন করার কোন চেষ্টা করিনি, আজও করলুম না। শহরে বসে বাধা হয়ে চুক্তি করছি, কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু করিনি। আজও বিনা চেষ্টায়, বিনা স্বিধায় তাদের পর করে দিলাম।'

বলা বাহুল্য, এসব কথা কারুরই ভাল লাগল না। নরেন চুপিচুপি দয়ালবাবুকে বললে, 'কম্যুনিষ্ট নাকি?'

সুশীলবাবু হাই তুলে বললেন, 'হাই, স্টেটমেন্টটা আজই সেরে রাখতে হবে আবার।'

দয়ালবাবুও ফাইলের দিকে চোখ নামিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ—আজ ত কলমই ধরিনি বলতে গেলে। ছোট সাহেব থাকলে দেখিয়ে দিত মজা।'

অতুল আর কিছুতেই কাজে মন দিতে পারল না। উত্তস্ত, উত্তেজিত মস্তিষ্কে বার-কয়েক কাজ করবার ব্য্থা চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত ফাইল বন্ধ করে বসে রইল। ওধারে ততক্ষণ আবার আলোচনা জমে উঠেছে, কিন্তু এবারে আর কেউ অতুলকে ডাকলেন না। তাকে কাজের কথাও কেউ জিজ্ঞাসা করলেন না। বসে বসে এক সময়ে পাঁচটা বাজতে অতুল উঠে পড়ল।

কিন্তু বোরিয়ে তখনই সে বাড়ি গেল না। কী সব গোলমাল হয়ে গেছে—বোবাজার স্ট্রীটে, কলেজ স্ট্রীটে, শিয়ালদহের মোড়ে। সবাই হস্ত, রাস্তা জনহীন। বাসে সবাই ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে, তবু কেউ সাহস করে রাস্তার নামছে না, প্রাণের ভয়ে সবাইকার মুখ শূন্য, বিবর্ণ।

অতুল কাউকেও জিজ্ঞাসা না করলেও বাপারটা অনুমান করে নিলে। এসব অজকাল কলকাতা শহরের নিতানৈমিত্তিক ঘটনা, এ নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামায় না। ছুরি মারা, গুলী বা এসিড ছোঁড়া, বোমা ফেলা—মৃত্যুর নানা বিচিত্র উপায়—সবকটাই গা সওয়া হয়ে গিয়েছে। শব্দ যেখানে সদ্য ঘটনাটা ঘটে, কিছুক্ষণের জন্য সেখানটা জনশূন্য হয়ে যায়। যারা মরেনি, তাদের ভয় পাছে তাদের নিয়ে পুঁলিশ টানা-টানি করে।

আজও রাস্তার পড়েই অতুল ঝুলতে পারলে যে, ঘটনাগুলো সদ্য ঘটে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সোজা বাড়ি ফিরল না। গণেশ এডিনউট দিয়ে বোরিয়ে এসে ওয়েলিংটন স্ট্রীট, তারপর কলেজ স্ট্রীট, হাটতে হাটতে এসে এক সময় গোলদীঘতে বসে পড়ল। সী-বা-

বাতি আইনের সময় পিছিয়ে গেছে আজকাল, এখনও অনেকক্ষণ বসা যাবে।

অতুলের আজ কদিনই এই রকম হয়েছে। কিছুই ভাল লাগছে না তার কোন কিছুই। তার পশ্চিমবঙ্গে বাড়ি, হুগলী জেলায়। বাউন্ডারি কমিশন যা-ই রায় দিক না কেন, ওদের দেশ কখনও পাকিস্থানে যাবে না, এটা ঠিক। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে ওর কোন আশংকা নেই। বাকী সকলে যেমন হেসে-খেলে নিশ্চিন্ত আছে, তেমনিই থাকতে পারত সে অনায়াসেই। তার কি মাথা ব্যথা? ...কিন্তু তবু আজ কদিন কাঁটার মত এই কথাটাই প্রাণের ভেতর খুঁ খুঁ করছে যে সমস্ত বাঙলাদেশ মিলিয়ে যে সংস্কৃতি, যে সাহিত্য, যে শিক্ষণ গড়ে উঠেছিল আজ আর তার কোন চিহ্ন রইল না। হয়ত বা চিরকালের মতই তারা পৃথক হয়ে গেল। ইতিহাসে একদা দুটি দেশ-বাসী বলে তারা গণ্য হবে। বাঙালী হয়ত একদিন বাঙালীর কাছে বিদেশী হয়ে উঠবে। এ ভাবতেও কোথায় যেন বুকের মধ্যে টন টন করে ওঠে। চিরকাল যা কিছু ভেবেছে বাঙালী দেশ সম্বন্ধে, সমগ্র বাঙালার ছবিটাই মনের পৃষ্ঠপটে উজ্জ্বল হয়ে থেকেছে। আজ একী হল? আর কি কোনদিন আবার তারা মিলতে পারবে? নেতারা আশাব্যস্ত হচ্ছেন এই ভেবে যে এ ব্যবস্থা সাময়িক, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সে মনে মনে কোন ভরসাই পাচ্ছে না। এতদিন এক হয়ে থেকে যাদের আপন করা গেল না, পৃথক হয়ে তারা আপন হবে? মনে ত হয় না।...কে জানে, হয়ত বা একদিন বাঙালীকে বাঙালীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে রণাঙ্গনেই দাঁড়াতে হবে।

সামগ্রিকভাবে বাঙালীর কথা ছেড়েই দেওয়া গেল—হিন্দু সে, হিন্দুদের কথাই ভাবা যাক। যদি ধরা যায় যে, ওদের বিশেষ কোন বিপদ হবে না, তাহলে এত কাণ্ড করে পশ্চিম-বঙ্গের পৃথক হবার কী প্রয়োজন ঘটল? আর যদি বিপদের আশংকা থাকেই ত কোন ভরসায় ঐ হিন্দুদের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল তারা?

সে জানে যে আজ যে বিচ্ছেদটা অপার হয়ে উঠেছে তা একদিন অনায়াসেই বিলুপ্ত হতে পারত। সে চেষ্টাই করা হয়নি। জমিদার এবং মহাজনের গদীতে বসে হিন্দু-মুসলমানদের ওপর সব সময়ে সুবিচার করিনি সামাজিক দিক দিয়েও অনেক অবহেলা করেছে তারা। তার ফলেই আজ এত সহজে বাইরের ষড়যন্ত্র আমাদের ঘরের মধ্যে সার্থক হয়েছে এতবড় দোঁদটা গড়ে উঠতে পেরেছে।

দোষ কি কংগ্রেসেরও নেই? যতদূর শুনছে সে, উনিশ শ' পর্যাগিশ সালের শাসন-ব্যবস্থা অনুসারে স্বতন নির্বাচন হত তখন সাধারণ অনায়াসের জন্য কংগ্রেস একটি

মুসলমান কি নমঃশুদ্ধকে দাঁড় করাননি। হ্যাঁ—তাদের নির্দিষ্ট আসন ছিল বটে, তাই বলে কি সাধারণ আসন থেকে দশটা স্থানও ছেড়ে দেওয়া যেত না? জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা কী আশ্বাসে দুঃখ বরণ করবে? এই ত এবারেরও, নিজেদের আসন ত ছাড়লেই না—মুসলমান আসনের জন্যও জাতীয়তাবাদী সামান্য যে কজনকে দাঁড় করানো হল, তাদের জন্য ছোটলেন পাঞ্জাবে ইলেকশনের জন্য বৃত্তা করতে নোয়াখালি কি চট্টগ্রাম কি ঢাকায় যাবার সাহস হল না। ফলে জাতীয়তাবাদীরা কোথাও স্থান পেলে না। অথচ এইসব ভদ্র-লোকেরা হিন্দুদের চেয়ে ঢের বেশী লাজুক। সহ্য করেছে স্বধর্মীদের কাছে। তার কি পুরস্কার দিলে কংগ্রেস?

কংগ্রেসের নিবন্ধিতা, তার আত্মভরিতা একেবারে আত্মঘাতী বে। তার নেতারা কখনও কখনও শহরে হযত মহকুমা শহরে বৃত্তা করে, কিংবা খবরের কাগজে বৃত্তা দিয়ে নিজেদের কতবা শেষ করেন। নিশ্চিত হয়ে দায়িত্ব চাপিয়ে দেন জনসাধারণের মাথায় আর লীগ ততক্ষণে হাতে হাতে প্রচারকার্য চালিয়ে মুক-নিরক্ষর চাষীদের মধ্যে নিজের আসন করে দেয়। প্রচারের যুগ এটা—কংগ্রেস তা ভুলেই গিয়েছে মনে হয়। মাথা-ভারী প্রতিষ্ঠানের সমস্ত দোষ তার রম্বপথে ঢুকেছে, আজ আর জনসাধারণের সঙ্গে কোন যোগ নেই।

আর তার কী ফলই হল! একই দেশ, এক ভাষাভাষী এক জাতি—অন্তত কয়েক শতাব্দী সেইভাবেই তারা নিজেদের দেখে আসছে—হঠাৎ দু'দলে ভাগ হয়ে গেল। আজ তারা বিদেশী, বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের। ভাইকে ভাইয়ের কাছে যেতে হলে পাসপোর্ট লাগবে—

অতুলের যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। কতকটা ছটফট করে উঠে পড়ে সে। এবারেরও সম্বা হয়ে আসছে, রাস্তায় পথিকের চিহ্ন নেই। ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে, বাসও বিরল। একটু পরে হযত রাস্তায় চলাটাই অপরাধ হয়ে দাঁড়াবে। সে উঠে বাড়ির পথ ধরলে।

মরুকগে! তার কি? তার চাকরী এবং বাসা থাকলেই হল।

এক গিলির মধ্যে ওর বাসা। বাড়িতে অনেক ভাড়াটে, অতুল দোতলায় দেড়খানা ঘর ভাড়া করে থাকে। স্ত্রী আর দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে বড় ঘরে সে থাকে, ছোটটা মায়ের। বারান্দায় একটা কোণ ঘিরে রান্নার জায়গা। এখন আর এর চেয়ে বেশী পাওয়া যায় না; তাই গ্রিষ টাকা ভাড়া। ছোট সংসার, খুব বেশী কষ্টও হয় না।

কিন্তু আজ বাড়িতে পা দিয়েই অতুল থমকে উঠল। একী ব্যাপার! নিচের তলায় দু'ঘর ভাড়াটে, অথচ ঘর মাত্র তিনটি। রকও একফালি, চলন আরও সামান্য। তবু সেই রক

এবং চলনই আজ মাল আর মানুষের ভরে উঠেছে। বালক-বন্দ-শিশু নারী তরুণী আর তার সঙ্গে ট্রাক, সুটকেশ, বস্তা, পট্টলি, গ্রামোফোন, পাখীর খাঁচা আরও কত কি। এ একেবারে বাস উঠিয়ে চলে আসার চিহ্ন, যে যা পেরেছে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছে। যতটুকু সামর্থ্য উঠিয়ে এনেছে।

নীচের ঘরের চণ্ডীবাবু এবং নিখিলবাবু দুজনেই পূর্ববঙ্গের অধিবাসী। এঁরা যে সেই সূত্রেই এসেছেন তা দেখামাত্র বুঝতে পারল অতুল। অবশ্য না বুঝলেও ক্ষতি হত না, কারণ কোনমতে মেয়েদের বাঁচিয়ে মালের স্তূপ ডিঙিয়ে সিঁড়ির মুখে পৌঁছেতেই দেখা গেল সিঁড়িরই শেষ ধাপটায় শূকনো মুখে বসে আছেন চণ্ডীবাবু। ওকে দেখে বললেন, 'আসুন—আপনারই অপেক্ষা করছিলুম এত দেরি যে?'

‘না—এমনি। এঁরা—’

‘বলছি।’ বলে চণ্ডীবাবু একটু চোঁক গিললেন, ‘এই ত সব দেশ থেকে ওরা এসে পড়েছেন। কাঁকা, খুড়ীমা, ভাই, বোন আমার তেরটি, নিখিলবাবুর সাতটি। কোথায় কাকে স্থান দিই বলুন ত। কলকাতায় ত ঘর খালি নেই বহুকাল, ঘুষ সেলামী কত কি দিয়েও মেলেনা। সেসব ত জানেনই। আর এখনকার ত কথাই নেই—এত দেশী লোক আসছে প্রতিদিন, যে কোন টাকায় তারা বাসা ভাড়া চায়। তাছাড়া, ঘর ভাড়া নিতে চাইলেও ত এখনি মিলবে না। চেষ্টা করতে হবে, সে সময় চাই। এখন কোথা স্থান দিই বলুন? মালগুলো না হয় এমনি স্তূপাকার করাই রইল কিন্তু মানুষ—?’

‘মিনিট দুই চুপ থেকে অতুল বললে, ‘আমাকে কি করতে বলেন?’

তারও প্রশ্ন করবার ধরণে এবং শাস্ত কণ্ঠে চণ্ডীবাবুর মুখ আরও শুকিয়ে উঠল। তিনি একটু আমতা আমতা করে বললেন, ‘আপনাকেই বা কি বলি, তবু এইসব ছেলে-মেয়েদের মুখচেয়েই যদি কোনমতে একটু অসুবিধা সহ্য করেন, মানে রাত্রে যতটা ধরে ঘরের মেঝেতে শোবার জায়গা করে দেন—মাকে বলছি, তিনি রাজী আছেন, অবশ্য যদি আপনার মত হয়।’

‘এঁরা চলে এলেন কেন?’ আরও শাস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে অতুল।

‘চলে এলেন মানে ঠিক থাকতে সাহস হল না। যে রকম ব্যাপার চলেছে তাতে নানারকম আশঙ্কা করেই—’

‘ও, কিছ ছোট্টো, শূদ্ধ আশঙ্কা?’

‘ঘটলে ত আর উপায় থাকত না। আর ভরসাই বা কি বলুন। আপনি আমাদের দেশ দেখেননি তাই; নইলে—’

‘তা অবশ্য দেখিনি। কিন্তু তাই বলে দেশ বাড়ি জমি সব ছেড়ে এঁরা চলে এলেন?’

এঁদের কলকাতায় এসে দাঁড়াবার এই সূত্র বা সুযোগটুকু ছিল, তাই তারা অনায়াসে যাদের নেই তাদের আরও দুর্বল, আরও অসহায় করে রেখে পালিয়ে এলেন। বা!’

‘তা কি আর কেউ ভাবে?’ ঈষৎ বিরক্ত কণ্ঠেই বলেন চণ্ডীবাবু। যদিচ বেশী বিরক্তি প্রকাশ করার সাহস নেই, এরকম যখন সাংঘাতিক বিপদের সামনে দাঁড়ায় মানুষ, তখন স্বার্থপর না হয়ে উপায় থাকে না। আপনি ভাবুন ত আপনার এতদিনের ধর্ম, সংস্কার সব ত্যাগ করে পরের হুকুম যদি অন্য ধর্ম এবং অন্য ধরণের জীবনযাত্রা গ্রহণ করতে হত ত কেমন লাগত!’

আমি হলে তা করতুম না! মরতে ত একদিন হবেই, না হয় মরতুম। কত লোক ত অপঘাতে এমনিই মরে।’

‘তা না হয় মনেন। কিন্তু মেরেমা—’ জানেন কত লেখাপড়া জানা বড় বংশের বাঙালী মেয়ে সিদ্ধু, বেলুচিস্থান কিংবা ঈসব মল্লুকে গিয়ে পড়েছে কিংবা বাঙলা-দেশেই ছেঁড়া চট পরে, ছেঁড়া বোরখা ঢাকা দিয়ে ভাঙাসানকীতে পালতা ভাত খাচ্ছে।’

‘তারা যায় কেন বলতে পারেন চণ্ডীবাবু? জহরত এই দেশের মেয়েরাই করছিল। এই ত সেদিনও, পাঞ্জাবীরা নিজে হাতে স্ত্রী-কন্যাকে কেটে ফেলে দিলে তবু বেইজ্ঞত করতে দিলে না। মরা কি এতই কঠিন?’

এবার চণ্ডীবাবুর কণ্ঠস্বর উষ্ণ হয়ে উঠল। তিনি বললেন, ‘নিরাপদে কলকাতায় বসে, এরকম উপদেশ সবাই দিতে পারে, বুঝলেন? এ অবস্থায় পড়লে দেখতাম কি করেন?’

‘চোখের সামনে ত দেখছিও—’ বাধা দিয়ে বলে অতুল; ‘কলকাতাতে ত আপনারাই দলে ভারী, তাতে কি ওরা সবাই কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে? না পশ্চিমবঙ্গের কোন গ্রামে ওরা নেই?’

চণ্ডীবাবু আর উত্তর দিলেন না, গুম খেয়ে বসে রইলেন। মুখ-চোখ ভরলোকের লাল

## কৈলাসপর্বতজাত বনৌষধি—

(রেজিঃ)

৩১-৮-৪৭ (পূর্ণিমা) তারিখে সেবা।

৩১-৮-৪৭ (পূর্ণিমা) তারিখে সেবা।

চন্দ্রাবা—মাকড়সী টেটের নারিকেল দেওয়ান ও জজ শ্রীযুক্ত শম্ভুদয়াল লিখিয়াছেন, এই অত্যন্ত্যর্ঘ বনৌষধি সেবনে ২০ জনের মধ্যে ১৮ জন হাঁপানীর রোগীই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

কেবল ইংরেজীতে অবিসম্ব লিখনঃ—

ব্রহ্মচারী জি, দাস

শ্রীসিদ্ধ ব্রহ্মচার্য সেবা আশ্রম

পোঃ চিতকট, জেলা বাম্বা (ইউ পি)

(এম ৮—৬।৮)

হয়ে উঠেছিল অপমানে ও রাগে। মৃদুত্ব কয়েক সেন্দিক চেয়ে থেকে অতুল হঠাৎ গলাটা নামিয়ে বললে, 'কিছু মনে করবেন না চণ্ডী-বাবু। বিপদের সময় আশ্রয় দেবার ভয়ে এত কথা বলিনি। মনটা খারাপ ছিল বলেই—। যাক, মার ঘরেই আমরা সবাই একরকম করে আশ্রয় নেব এখন, বড় ঘরটা আপনার হাতে রইল, বত লোক রাখতে পারেন রাখুন।'

ওপরে আসতে স্ত্রী ছলছল চোখে বললে, 'তুমি কী গো? এই অবস্থায় এসেছে বেচারীরা, আর তুমি ওদের বলছ মরতে পারলে না কেন, মারতে পারলে না কেন? এসব মেয়েদের যদি কেউ ধরে নিয়ে যেত? বাপরে—আমার ত ভাবতেই জ্ঞান থাকে না।'

কঠিন কণ্ঠে অতুল জবাব দিলে, 'তুমি থামো! যাদের ভয়ে এমন পাগলের মত ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে এরা, তাদের সঙ্গেই এদের চিরকাল কেটেছে। এতদিন যারা মানুষ ছিল, তারা কি সবাই রাতারাতি দানব হয়ে উঠল? সবাই অমানুষ নয়—যারা অত্যাচার করতে চায়, তারা বিকারগ্রস্ত হয়েছে বুঝতে হবে। আত্মীয় অসুস্থ হলে রোগের চিকিৎসা করে না, তাকে ফেলে পালায়? এই ত তোমার মামা পাগল, সবাইকে মারধোর করেন, জিনিস-পত্র নষ্ট করেন। কৈ, তোমার দিদিমা ত তাকে ভোগ করতে পারেন নি, এখনও তার চিকিৎসার জন্য কত চেষ্টা করছেন, কত পরিস্রা খরচা করছেন দৈব ওষধের আশায়!'

'তোমার এক কথা। ওদের সঙ্গে আত্মীয়ের তুলনা।' ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে রমা।

অতুল আর কথা কইলে না। কাপড়-জামা ছেড়ে ক্রান্তভাবে জানলার ওপর বসে পড়ল।

রমা বললে, 'মৃদু-হাত ধোবে না? খাবে না কিছ? চা চড়াবে?'

'থাকগে! একেবারে ভাত খাবো।'

এর উপায় করতেই হবে, গিলির একটা ফাঁক নিয়ে যে একটুকরো আকাশ দেখা যায়, সেই দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগল অতুল। এমন করে আত্মহত্যা করবে তার দেশবাসীরা? একজনের ঈশ্বর উপাসনার পন্থাতির সঙ্গে আর একজনের পন্থাতির মেলে না বলে এত বড় সর্বনাশ হয়ে যাবে? এই সব মুসলমানদের

মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই জনই ত এককালে হিন্দু ছিল—একই রক্ত হয়ত গ্রামের দুটি সম্প্রদায়ের বিবদমান লোকগুলির ধমনীতে বইছে। হয়ত বা একই প্রপিতামহ কিংবা অতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহের রক্ত। ঘরবাড়ি, জমি জীবিকা সব ত্যাগ করবে এমনি কোন আত্মীয়দের সন্দেহের চোখে, আশঙ্কার চোখে দেখে বলে?'

আকাশের সন্তর্ভিন্নমণ্ডল স্থির হয়ে থাকে। তার সঙ্গে দূরের কালপুরুষও। ঐ না কাল-পুরুষের খজা? উদ্ভ্রান্ত অতুল বসে বসে ভাবে, কিসের খজা ওটা। কে জানে!

কিন্তু এর কি কোন উপায় নেই?

গান্ধীজী নোয়াখালিতে আসছেন। হয়ত বা মরতেই। কিন্তু এর চেয়ে অপমানের কথা বাঙালীর আর কি হতে পারে? বাঙালী নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করলে না, নিজেদের ভেতরের এই কৃত্রিম মনগড়া বাধা দূর করারও চেষ্টা করলে না। তার জন্য টেনে আনতে হল অশীতিপর বৃদ্ধ এক গুজরাটীকে। এ লজ্জা সে রাখবে কোথায়?

কোথায় সে শক্তিমান মহাপুরুষ, যিনি এই দুর্দিনে বাঙালীকে রক্ষা করবেন? নবীন আশার আলো নিয়ে আসবেন?

সে আপন মনেই অক্ষুণ্ণ স্বরে আবৃত্তি করতে লাগল—

'হে বিজয়ী বীর নব জীবনের প্রাতে

নবীন আশার খজা তোমার হাতে,

জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে—

বন্ধন হোক ক্ষয়!

ভেগেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়।

তোমারি হউক জয়!'

সারারাত ধরেই ভাবলে অতুল। সে নেতা নয়—বাঙালীকে বাঁচাবার জন্য সে চিন্তা করবে, এমন আশাও কেউ করে না। বরং শুনলে হয়ত উপহাসই করবে, তবু অতুল যেন কিহুতেই স্থির থাকতে পারে না। একজন বাঙালী হিসাবে তার যেটুকু দায়িত্ব আছে, তাই-বা সে অব্যবহার করবে কি করে? নাই-বা হল সে নেতা।

ভোরবেলাই নিদ্রাহীন আরক্ত চোখে জল দিয়ে সে বোরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। রাস্তায়

বাতাস আছে, শান্তি আছে। এতগুলো মানুষের নিঃশ্বাসে ও কোলাহলে যেন তার দম বৃদ্ধ হয়ে এসেছে।

আচ্ছা, একা সে কি কিছুই করতে পারে না? কোন কিছুই কি করা সম্ভব নয় তার পক্ষে?

যীশুখৃষ্টও একা দাঁড়িয়েছিলেন সমস্ত ইহুদীদের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। বৃদ্ধ একা দাঁড়িয়েছিলেন গ্রাহ্যগণের গোড়ামির সামনে। একা মহাস্বাভাবী ব্রিটিশ রাজশক্তিকে মাথা নত করাতে বাধ্য করালেন। অবশ্য এই সব মহাপুরুষদের সঙ্গে একত্রে তার নাম করায় পাপ, তবু, একা মানব কি কিছুই করতে পারে না? যদি তার ইচ্ছা থাকে? কাঠবিড়ানি রামচন্দ্রের সেতু বেঁধে দিতে পারে নি, সব কথা—তবু বাকি কর্মীদের উৎসাহ জুগিয়েছিল?

একা সে ত মরতেও পারে?

মরবার আগে কি সে একটি বাঙাল মুসলমানকে বুঝিয়ে দিয়ে যেতে পারবে না যে সে বাঙালী, এইটেই তার সত্য পরিচয়। বাইরে সমস্ত ধারণা, সমস্ত সন্দেহ মিথ্যা। কিং একটি বাঙালী হিন্দুকে বুঝিয়ে দিয়ে যে পারবে না যে, যে বাঙালী মুসলমানকে তু সন্দেহের চোখে দেখছে, সে আসলে তোমা আত্মীয়। এই সন্দেহ ও আশঙ্কার কারণ কৃত্রিম। এ-ও কি সম্ভব হবে না?

নাই-বা হল! মরতেও ত পারবে। সম বাঙালী জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত একা শেষ করতে না পারুক, অন্তত আরম্ভ কর লোষ কি?

হে ঈশ্বর, তুমি সাক্ষী রইলে। এ-জাতি তুমি ক্ষমা করো।

অতুল দ্রুতপদে শিয়ালদা স্টেশনের ধরলে। তেমনি এক বস্ত্র, তখনই। রইল রইল বাছারা, রইল বাড়ি মা।

তার ব্যক্তিগত দায়িত্বের চেয়ে ঢের দায়িত্ব আজ তাকে টেনে ঘরের বার কর হয়ত-বা সে মরতেই চলল, কিংবা বাটার বাঁচতে।

'তোমরা আমার মাপ করো রমা!' মনে ম বললে অতুল।



## দেশী সংবাদ

৪টা আগস্ট—আলিপুরস্থিত বেসভৌডারের গ্রীহট বাউন্ডারী কমিশনের অধিবেশন আরম্ভ হইলে কমিশনের বিচারক বিবরের মধ্যে “গ্রীহট ও সংলগ্ন জেলাসমূহ” বলিতে কি ব্যকার তৎসম্বন্ধীয় প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এই বিবরে আলোচনা চলার সময় কমিশনের সভাপতি স্যার সিংল রাডারফের একটি টেলিগ্রাম আসে। উহাতে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, সংলগ্ন জেলাসমূহ বলিতে গ্রীহটের সংলগ্ন আসামের জেলাসমূহ বুঝাইবে, বাঙলার সংলগ্ন আসামের কোন জেলা বুঝাইবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল স্মার্টস পশ্চিম জওহরলাল নেহরুকে এক পত্রযোগে জানাইয়াছেন যে, পেগিং এন্ড বা অন্যান্য ভারতীয় বিরোধী ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা হইবে না।

পাটনার সংবাদে প্রকাশ, প্রায় দেড়শত সশস্ত্র পুলিশ বিহার শরিফ মহম্মদের চারটি গ্রামে যৎপৎ তল্লাসী চালাইয়া বহু রাইফেল, স্টেনগান, ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করিয়াছে।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর স্যার সি দেশমুখ এদা কালকাতায় ব্যাংকের বাৎসরিক সাধারণ সভার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারত বিভাগের ফলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্বের পরিবর্তন ঘটিবে। সুতরাং রাজনৈতিক বিভাগ সত্ত্বেও আপোনা আলোচনা দ্বারা ভারতীয় অর্থনৈতিক একীকরণের রাখার জন্য সব প্রকারে চেষ্টা করা কর্তব্য।

৫ই আগস্ট—কলিকাতায় পরিবদ ভবনে পূর্ববঙ্গ এবং গ্রীহটের ব্যবস্থা পরিবর্তনের মুসলিম লীগ সদস্যদের এক বৃহৎ সভায় বাঙলার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন তাহার প্রতিশ্রুতি প্রার্থী বর্তমান প্রধান মন্ত্রী মিঃ এইচ এস সুরাবদীকে পরাজিত করিয়া পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী দলের নেতা নির্বাচিত হন। খাজা নাজিমুদ্দীন ৭৫ ভোট পান; অপর পক্ষে মিঃ সুরাবদী মাত্র ৩৯ ভোট পান।

খাজা নাজিমুদ্দীন পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের আইন সভায় মুসলিম লীগ সদস্যদের এক সম্মিলিত बैठকে ঘোষণা করেন, “পূর্ব পাকিস্থান রাষ্ট্রের মুসলমানদের পক্ষ হইতে পূর্ব পাকিস্থানের সংখ্যালঘিত সম্প্রদায়গুলিকে আমি এই প্রতিশ্রুতি দান করিতেছি যে, আমরা তাহাদিগকে শব্দ সংরক্ষণই করিব না, আমরা তাহাদের প্রতি উদার ব্যবহার করিব।”

মহাত্মা গান্ধী কাস্মীরে প্রার্থনাত্মক সভায় বলেন যে, কাস্মীরীদের ইচ্ছানুসারেই কাস্মীর ও জম্মুর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হওয়া উচিত। গান্ধীজী আরও বলেন যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বা পাকিস্থান, যে কোন একটিতে কাস্মীরকে যোগদান করিতেই হইবে।

গতকাল্য হইতে রামপুর রাজ্যে ব্যাপকভাবে প্রকাশ্য বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। একটি মুসলিম সম্মেলনের লোকজনের দ্বারা এই হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়। তাহারা এই বলিয়া আন্দোলন চালায় যে, রামপুর রাজ্যের ভারতীয় গণপরিষদ হইতে পদত্যাগ করিয়া পাকিস্থান গণপরিষদে যোগদান করা উচিত। তাহারা শোভাযাত্রা বাহির

## সাপ্তাহিক

করে এবং উত্তেজিত হইয়া সরকারী ভবনে অগ্নিসংযোগ করে। পুলিশ অফিসার শ্রীযুত জগদীশ স্বরূপ শকসেনার গৃহে অগ্নিসংযোগ করা হয়; ফলে তিনি জীবন্ত দগ্ধ হন।

৬ই আগস্ট—পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ ঘোষণা করেন যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তনশীল সময়ে যে কোন জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হইবার জন্য কলিকাতা ও উত্তর বাঙলার সীমান্তের জেলাগুলিতে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করা হইতেছে। ডাঃ ঘোষ

বসেন যে, পুলিশ প্রহরীর ব্যবস্থা ছাড়াও যেখানে প্রয়োজন হইবে মিলিটারী প্রহরীর ব্যবস্থা করা হইবে।

কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় ঘোষিত হইয়াছে যে, বাঙলার উপদ্রুত অণুসংশ্লিষ্টার্থ অপিলেশ উন্নত ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বনের সুবিধার জন্য বাঙলার গভর্নর “বঙ্গীয় উপদ্রুত এলাকা অর্ডিন্যান্স” (১৯৪৭-এম ৭ম সংখ্যক অর্ডিন্যান্স) নামে একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন।

নয়াদিল্লীতে বিভাগ পরিবর্তনের এক बैठকে সম্প্রদায়িক গোত্রযোগে বিপন্ন আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্য ও পুনর্বাসিতর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

লাহোরে মহাত্মা গান্ধী কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন,—“আমি আমার জীবনের অবশিষ্টকাল



ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্তন শীলমোহর



পাকিস্থানে অতিবাহিত করিব—হয় পূর্ববঙ্গে, যা হয় পাকিস্থানে, আর না হয় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে।” মহাত্মা গান্ধী অভ্যুত্থান বলেন,—“পশ্চিম পাকিস্থান ছাড়িয়া লোকের অন্য চালাইয়া দিতেছে জানি আমি অত্যন্ত মর্মান্বিত হইয়াছি।”

অদ্য কলিকাতার হাঙ্গামায় ১১ ব্যক্তি নিহত ও ১০ জন আহত হয়। এই হিসাব সরকারীভাবে সমর্থিত হয় নাই।

হায়দরাবাদ স্টেট কংগ্রেসের আহ্বানে অদ্য উত্তরপাশ্চাত্যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে।

৫ই আগস্ট—অদ্য হায়দরাবাদ স্টেট কংগ্রেস কর্তৃক রাজ্যের সর্বত্র “ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান দিবস” পালিত হইয়াছে।

ফেশী মহকুমা এবং ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত বিলোনিয়ার একটি বিরাট অংশ জনমগ্ন হইয়াছে।

প্লাবনের ফলে লক্ষাধিক লোক ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

কুমিল্লার এক সংবাদে প্রকাশ, গত ৫ই আগস্ট রাতে ত্রিপুরা পাহাড় হইতে অকস্মাৎ বিপুল জলরাশি নামিয়া আসায় মিজোর বাজার হইতে দুইশত পঁচাত্তর চৌদ্দগ্রাম থানায় ১১টি ইউনিয়নের আনুমানিক আড়াইশত বর্গ মাইল বিস্তৃত স্থান প্লাবিত হইয়াছে।

কলিকাতায় রেলপথসমূহের পার্থক্য রিলেগেন্স অফিসার জানাইয়াছেন যে, দেশ বিভক্ত হওয়ার ফলে বেঙ্গল আসাম রেলপথটি (৩,৫৬৬ মাইল) চারিভাগে বিভক্ত হইবে।

গত বৃহস্পতি রাতে গোলাবাড়ী (হাওড়া) থানা এলাকায় একটি ঘটনার পর থানার ভারপ্রাপ্ত জনৈক কর্মচারী (অফিসার-ইন-চার্জ) ও একজন কনস্টেবলকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পূর্ব বাঙলা সরকারের কর্মচারী ও সাজ-সরঞ্জাম কলিকাতা হইতে ঢাকায় প্রেরণ আরম্ভ হইয়াছে। প্রায় দুইশত অফিসার ও সাড়ে তিন হাজার অন্যান্য কর্মচারী ঢাকায় যাইতেছেন।

৬ই আগস্ট—মিঃ এইচ এস সুরাবর্দী, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও খাজা নাজিমুদ্দীন এক যুক্ত বিবৃতিতে বাঙলার সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন যে, সীমা নির্ধারণ কমিশনের রায় এক বা অপর সম্প্রদায়ের নিকট বৃত্তি অব্যাহত হউক না কেন, তাহারাই যেন তাহা মানিয়া লন।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রার্থনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী বলেন, আমার নিকট সমগ্র ভারতই আমার দেশ—দেশকে পৃথক পৃথক অংশে বিভক্ত করার কথা আমি অনুগ্রহণ করিতে পারি না। আমি হিন্দুস্থান পাকিস্থান উভয় স্থানেই বাস করিতে চাই। উভয় স্থানই আমার স্বদেশ।

অদ্য কলিকাতায় বিভিন্ন ঘটনায় ১৪ জন

মারা যায় ও ৪৫ জন আহত হয়। হাওড়ায় একজন মারা যায় ও ১০ জন আহত হয়। এই হিসাব সরকারীভাবে সমর্থিত হয় নাই।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ৬ষ্ঠ মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে নিখিল ভারত রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতির উদ্যোগে অদ্য অপরাহে কলিকাতা ইউনি-ভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এক বিরাট জনসমাবেশ হয়। পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি রক্ষার জন্য নিখিল ভারত রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি যে চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্য বিশেষভাবে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদারকে ধন্যবাদ দিয়া ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বলেন যে, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি রক্ষার্থ ২৫ লক্ষ টাকার আবেদন করা হইয়াছে। সে টাকা এখনও উঠে নাই, কিন্তু উঠিবে। আজ যখন গভর্নমেন্টের আসনে আমরা বসিয়াছি তখন এ সম্বন্ধে আমাদের একটি কর্তব্য রহিয়াছে। আমি আশা করি—পশ্চিম বঙ্গ গভর্নমেন্ট সে কর্তব্য পালন করিবেন।

স্যার ফ্রেডারিক চার্মার্স বৃদ্ধকে ১৫ই আগস্ট হইতে পূর্ববঙ্গের গবর্নর নিয়োগ করা হইয়াছে।

ফরিদপুরের এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, আগামী ১৫ই আগস্ট পূর্ববঙ্গে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গের জেলাগুলিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়াছে। এই সকল জেলার মুসলিম লীগ নেতারা সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়া জানাইয়াছেন যে, সংখ্যালঘুদের রক্ষা করা তো হইবেই, পরন্তু পাকিস্থান গভর্নমেন্ট তাহাদের প্রতি ন্যায় ও উদার ব্যবহার করিবেন।

জানা গিয়াছে যে, বাঙলার ব্রিটিশ সওদাগরী ফর্মগুলি আগামী ১৫ই আগস্ট তারিখে ভারতের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্ব স্ব সওদাগরী ফর্মগুলির উপর ভারতীয় ইউনিয়নের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিবেন।

১৫ই আগস্ট—মহাত্মা গান্ধী অদ্য দিল্লী এক্সপ্রেসযোগে পাটনা হইতে কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। কলিকাতা পৌঁছার অব্যবহিত পরেই তিনি মোটরযোগে সোমপুর আশ্রমে চলিয়া যান।

ভারত সরকারের খাদ্য দপ্তরের জনৈক কর্মচারী নয়াদিল্লীতে ঘোষণা করেন যে, ভারতের খাদ্যাবস্থা সংকটজনক। ভোমিনিয়ান মন্ত্রিসভাকে প্রথমেই এ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে। আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসই সর্বাপেক্ষা বেশী সংকটের কাল। ভারতের পূর্ব ও দক্ষিণাংশ দুভিক্ষের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙলা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে তাহাদের মাত্র ১৫ দিনের খাদ্য থাকিবে।

প্রামাণ্য সূত্রে জানা গিয়াছে যে, স্বাধীনতা দিবস

উপলক্ষে পশ্চিম বঙ্গের ৪টি সেন্ট্রাল জেল এবং ২০টি সাব জেল হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রায় ২৫০০ বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইবে।

## বিদেশী মন্তব্য

৪ঠা আগস্ট—ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ডাঃ সুকর্ণ প্রধান সেনাপতিরূপে অদ্য রাতে বেতারযোগে ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রী বাহিনীকে মধ্য রাত্রি হইতে যুদ্ধ বিরতির আদেশ দেন।

মার্কিন সমর বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আর একটি যুদ্ধের আশঙ্কায় ৬০টি সরকারী কারখানাকে বিশেষ ধরনের অস্ত্রোপাদানের জন্য প্রস্তুত রাখা হইবে।

৫ই আগস্ট—গ্রীস হইতে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে বলিয়া ব্রুটেন অদ্য গ্রীক সরকারকে জানাইয়াছে।

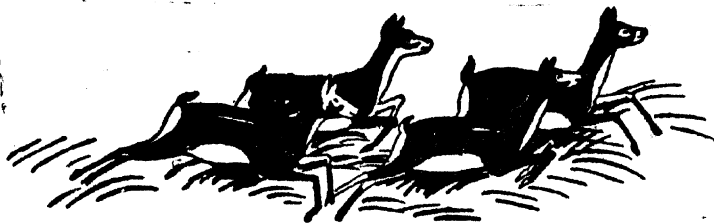
মিশরের প্রধান মন্ত্রী নোকরাসী পাশা অদ্য নিউইয়র্কে নিরাপত্তা পরিষদে মিশরের প্রদত্ত উত্থাপন করিয়া বলেন যে, মিশর ও ব্রুটেনের মধ্যে সম্প্রতি যে মনকবাক্ষি চলিয়াছে, তাহা শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। মিশরে নিয়ত ব্রিটিশ আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করাই অবিরত সংঘর্ষ চলিয়াছে।

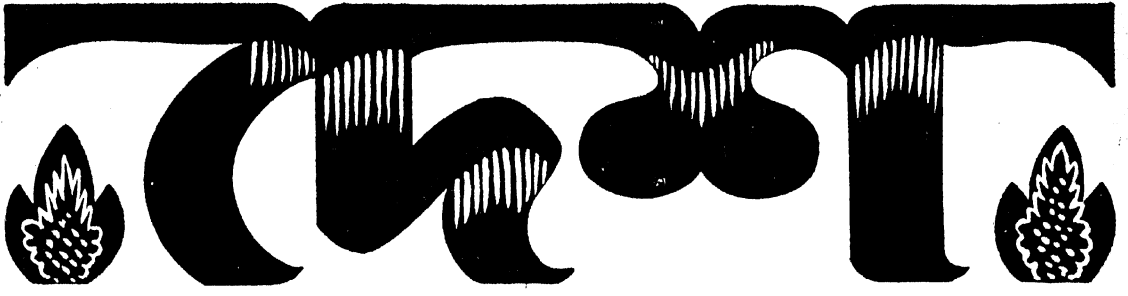
৬ই আগস্ট—রুশিয়ায় নিযুক্ত ভারতীয় দূত শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত দলবলসহ মস্কো পৌঁছিয়াছেন।

৭ই আগস্ট—ওলন্দাজ ও ইন্দোনেশীয় প্রজা-তন্ত্রের মধ্যে বিরোধ মিটাইবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যস্থতার যে প্রস্তাব করিয়াছে, অদ্য ইন্দোনেশিয়া সেই প্রস্তাবে সম্মতি জানাইয়াছে।

৮ই আগস্ট—যোগ্যকর্তা হইতে প্রজাতন্ত্রীদের নিয়ন্ত্রিত বেতারে ইন্দোনেশীয় সামরিক কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে, জাভার উত্তর-পূর্বে মাদুরা দ্বীপে তুমুল যুদ্ধ চলিয়াছে। যুদ্ধ-বিরতির দুইদিন পর অর্থাৎ ৬ই আগস্ট ওলন্দাজ সৈন্যরা পামেস-কাসাম শহর দখল করিয়াছে। উক্ত দ্বীপের রাজধানী বাং কালানও ওলন্দাজ সৈন্যরা দখল করিয়াছে।

যোগ্যকর্তা বেতারে ভারত গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্যে প্রচারিত এক আবেদনে ইন্দোনেশিয়ার সহিত আন্তর্জাতিক তারবাতার যোগাযোগ ছিন্ন করার অভিযোগ করা হইয়াছে এবং ভারত গভর্ন-মেন্টকে ইন্দোনেশীয় গণতন্ত্রের যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণার পরবর্তী কার্যকলাপ সম্পর্কে জাতি-পুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদকে অবহিত রাখিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।





সম্পাদক : শ্রীবিষ্ণুমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ ]

শনিবার, ৬ই ভাদ্র, ১৩৫৪ সাল।

Saturday, 22nd. August, 1947.

[ ৪২শ সংখ্যা

### নবীন সূর্যোদয়—

সত্য অপরাধেয়। সূর্যের আলোকে রাষ্ট্রের অন্ধকার যেমন দূর হয়, সত্যের উজ্জ্বল সংস্পর্শে মিথ্যার গ্লানিও সেইরূপ অপসৃত হইয়া থাকে। দীর্ঘ পরাধীনতার শ্বাসরোধকারী বায়ু-মণ্ডলের প্রতিবেশ-প্রভাবে পড়িয়া ভারতের আত্মধর্ম এতদিন আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল। স্বাধীনতার অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার উন্মুক্ত আকাশতলে আবার প্রাণপ্রদ বয়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। গত এক বৎসরকাল বাঙলার প্রাণকেন্দ্র কলিকাতা শ্মশানপুরীর আকার ধারণ করিয়াছিল, ঠিক এক বৎসর পরে স্বাধীনতার প্রথম স্পর্শে সে শ্মশান পুরীতে নবীন জীবনের সঞ্চার ঘটে। ভেদ-বিভেদের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া সংকীর্ণতার সকল অবরোধ ভগ্ন করিয়া শহরের সর্বত্র প্রাণের তরঙ্গ বহিতে থাকে এবং প্রাণের সেই সন্মহান জাগরণে অতীতের দুঃখপ্রদ সকল স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া যায়। অনেকের কাছেই ইহা একরূপ অপ্রত্যাশিত ছিল; কিন্তু অপ্রত্যাশিত বা অভাবনীয় যাহা, অনেক ক্ষেত্রেই তাহা স্বাভাবিক সত্য। মানুষের মনে গুপ্ত সত্যের বেদনা যখন উদার প্রেরণায় চেতনা লাভ করে, তখন তাহা অপ্রত্যাশিত বা অভাবনীয় মাধুর্ষেই স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠে। আজ আমরা যে সত্যের অপ্রত্যাশিত এবং অচিন্ত্য প্রভাব প্রত্যক্ষ করিতেছি, মহাত্মা গান্ধী বহুদিন পূর্বেই ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। গোল-টেবিল বৈঠকে ব্যর্থতার সম্মুখীন হইয়া ভারতের এই সত্যসম্বন্ধ পুরুষ অজ্ঞানত ভাষায় ঘোষণা করিয়াছিলেন, আজ আপনারা ভারতে যত ভেদ বা বিভেদই দেখুন না কেন, ইংরেজ ভারত ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে এসব বিলুপ্ত হইবে এবং ভাই ভাইয়ের পাশে গিয়া দাঁড়াইবে। গান্ধীজীর বাণী সত্য হইয়াছে। স্বাধীনতার সোনার কাঠি স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যা

## সাময়িক প্রসঙ্গ

জাগিয়া উঠিয়াছেন এবং জীবনের অপরূপ সৌন্দর্য ও মাধুর্ষে হিংসার দূরন্ত তাণ্ডবে স্তম্ভীভূত বিভীষিকাময় কলিকাতার সর্বত্র উদ্ভাসিত হইয়াছে। ঘাতকের হাত হইতে ছুঁরি ছোঁরা খসিয়া পড়িয়াছে। দেখিতেছি, আজ ভাই ভাইকে বৃকে ধরিবার জন্য আকুল। ১৫ই আগস্ট হইতে পশুদের অশ্বকার শহরের বৃক হইতে অপসৃত হইয়াছে এবং সত্যকার মানুষ আজ মানুষকে পাইয়া আপনার করিয়া লইবার জন্য বাহির হইয়া আসিয়াছে। আত্ম-বিভূতির অভাবনীয় প্রভাবে অসুন্দের অত্যাচার বিচূর্ণ করিয়া নর-নারায়ণ জাগিয়া উঠিয়াছেন; সমাজ চেতনা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহাই সত্য। আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে মিলনের এই গুপ্ত বেদনাই এতদিন গুমরিয়া ফিরিতেছিল কিন্তু পরাধীন আবহাওয়ার বিষাক্ত প্রভাবে তাহা পূর্ণ বলে বিচ্ছুরিত হইবার পথ পায় নাই। ইংরেজ ভারত ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে পথের বাধা দূর হইয়াছে, আর সেই গুপ্ত বেদনা বাস্তব সত্যে চেতনা লাভ করিয়াছে। এই সহজ ও স্বাভাবিক সত্যকে আমরা সমস্ত অন্তর দিয়া একান্ত করিয়া লইব এবং কর্ম সাধনার প্রভাবে সমাজ-জীবনে ইহাকে প্রতিষ্ঠা করিব। আমাদের এই উদ্দেশ্য সাধনে কবির বাণী আমাদের মনে শক্তি সঞ্চার করবে। স্বাধীনতার সূর্য করোজ্জ্বল ভূমিতে দাঁড়াইয়া রবীন্দ্রনাথের অমৃতময়ী বাণীই আমাদের কানে বাজিতেছে। কবি গাইয়াছেন—  
“কোথা মিথ্যা রাজা, কোথা রাজদণ্ড তার?  
কোথা মৃত্যু, অন্যায়ের কোথা অত্যাচার?  
ওরে ভীরু, ওরে মূঢ় তোল তোল শির,  
আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির।”

### মহাত্মাজীর সাধনা

স্বাধীনতার প্রথম প্রভাতে ভারতের মহা-মানব গান্ধীজীকে আমরা বন্দনা করিতেছি। কলিকাতা নগরীর এক কোণে থাকিয়া তিনি যে প্রাণশক্তি সঞ্চার করিয়াছেন, তাহারই তাঁর সংবেদনা জাতির মনে উদার মানবতার আবর্ত তুলিয়া আমাদের স্বাধীনতা লাভের আনন্দকে সত্য এবং সার্থক করিয়াছে। তাহার ত্যাগময় জীবনের তপশশক্তি যদি এইভাবে সঞ্চারিত না হইত, তবে দানবীর জিঘাংসা বৃষ্টির যে পৈশাচিক লীলা এতদিন শহরের বৃকে চলিতেছিল, তাহা এমন আকস্মিকভাবে নিরস্ত হইত না। মানুষের অন্তরের একান্ত সত্যকে মহামানব বাঁহারা, তাহারাই তাহাদের বৃহত্তর বেদনাময় জীবনের প্রভাবে উজ্জ্বল করিয়া তোলেন। তাঁহারা নিত্য স্মৃতিকে উদ্দীপ্ত করেন এবং স্বরূপ তত্ত্বকে জাগাইয়া দেন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের অন্তরের প্রেমের যে পরম সত্য, আত্মিক প্রভাবে আচ্ছন্ন ছিল, গান্ধীজীর সাধনার ফলে তাহা এমন রূপে এবং রসে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়াছে। আজ যদি গান্ধীজীকে আমরা নিজেদের মধ্যে না পাইতাম, তবে আমাদের অদৃষ্টে কি ছিল কে জানে? বস্তুত কলিকাতা শহরের বৃকে যদি শান্তি না ফিলিত এবং নরঘাতক রাক্ষস বৃষ্টি যদি নিরস্ত না হইত তবে আমাদের স্বাধীনতা লাভ দুই দিনেই ব্যর্থ হইয়া যাইত এবং ব্রাহ্ম-রক্তের ক্রেদ কদমে জড়াইয়া আমরা ভয়াবহ অন্ধকারের দিকেই গড়াইয়া যাইতাম। প্রকৃত-পক্ষে কলিকাতায় যদি শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হইত, তবে পূর্ববঙ্গের সর্বত্র আত্মিক জিঘাংসা বৃষ্টি সম্প্রসারিত হইত; এমন আশঙ্কার বিশেষ কারণ ছিল। লীগের কর্মীরা যেমন চেঁচাই করুন না কেন, মানুষের প্রাণময় সাধনার অবদান ছাড়া শুধু কথার

জোরে পশুদ্বকে পরাস্ত করা যায় না এবং হিংসা হিংসাকেই উত্তেজিত করিয়া তোলে। গান্ধীজীর তপস্যার প্রভাবে কলিকাতার শান্তি ফিরিয়াছে, শৃঙ্খল তাহাই নহে, পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার সর্বত্র মানুষ পশুদ্বকে পরাভূত করিয়া আপন মহিমায় জাগিয়া উঠিয়াছে এবং আমরা এই আশা করিতেছি যে, অল্প কিছদিনের মধ্যেই পান্জাব প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক অশান্তিতে উপদ্রুত স্থানেও শান্তি ফিরিয়া আসিবে; বাঙলার এই বিপুল জনজাগরণের হিসোল পান্জাবেও দোলা দিবে বলিয়া মনে হয়। এমন জাগরণ যথার্থ হইবার নয় এবং প্রাণের এইরূপ স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকে খণ্ডিত বা ক্ষয় করিয়া পশুদ্বকের গ্লানি বা দৈন্যের মধ্যে লওয়াও সহজ নহে। প্রকৃতপক্ষে ইহাই আমাদের সবচেয়ে বড় আশা। আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি, প্রাণধর্মের পরম প্রয়োজনেই আজ আমাদের মধ্যে সমাজ-চেতনা জাগিয়া উঠিয়াছে; ভেদ বিদ্বেষপূর্ণ স্বার্থান্ধ কূটনীতির কোন খেলাই একান্ত এই যে সত্য, ইহাকে সহজে স্বপ্ননা করিতে পারিবে না। সে ক্ষেত্রে প্রাণময় মানুষ পশুদ্বকে পিণ্ড করিবে। বাঙলার বৃকে মানুষ জাগিয়া উঠিয়াছে; নিশাচর শব্দপদের দল আজ বিবরে পলায়ন করুক। আমরা মানুষের দেশে মানুষকে বরণ করিয়া লইতেছি।

### পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে স্বাধীনতা উৎসব—

স্বাধীনতার উৎসবে কলিকাতায় যে আনন্দ এবং উল্লাস আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা মানুষের কেন দেবতারও উপভোগ্য। পৃথিবীতে আনন্দের প্রবাহ বহিলে দেবতারও নির্লিপ্ত থাকিতে পারেন না। তাহারা আকাশ হইতে পুষ্পে বর্ণিত করেন বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। কলিকাতার রাজপথে হিন্দু-মুসলমান জনতার পারস্পরিক মিলনের এই ছন্দোময় আনন্দে দেবগণও পুষ্পবর্ণিত করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। দিনের পর দিন, শহরে এমন মিলন মহানন্দের উদ্দাম-উল্লাস আমরা কোনদিন প্রত্যক্ষ করি নাই। এ দৃশ্য দেখিয়া ভারতের স্বাধীনতার জন্য যাহারা জীবন দান করিয়া গিয়াছেন, তাহারা অমরলোক হইতে নিশ্চয়ই আশীষধারা বর্ষণ করিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়া স্মৃতি হইলাম, শৃঙ্খল কলিকাতায় নহে, পূর্ববঙ্গের সর্বত্র হিন্দু এবং মুসলমানের মিলনের আনন্দেই স্বাধীনতা উৎসব স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মিঃ নাজিমুদ্দীন স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক প্রেম এবং পারস্পরিক মৈত্রীর কল্যাণময়ী বাণীতেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আশ্বস্ত করিয়াছেন। কায়েদে আজম জিন্না ১৫ই আগস্ট তারিখের বেতার বার্তার ঘোষণা

করেন যে, এখন হইতে আমাদের কথায় ও কার্যে এবং চিন্তায় পাকিস্থানের সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়ের কাছে ইহাই প্রতিপন্ন করিতে হইবে যে, তাহারা যতদিন পাকিস্থানের রাষ্ট্রগত কর্তব্য প্রতিপালন করিবেন, সে পর্যন্ত তাহাদের স্বার্থ সম্বন্ধে কোনরূপ আশংকার কারণ তাহাদের নাই। আমরা আশা করি, পূর্ব পাকিস্থানের মুসলিম লীগের কর্মকর্তাগণ কায়েদে আজমের এই নির্দেশ যাহাতে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়, তত্ত্বজনা সতর্ক থাকিবেন। তাহারা যেন এ সত্য বিস্মৃত না হন যে, শত্রুর দল এখনও একেবারে নিরস্ত হয় নাই। দেশের দুর্দশা লইয়া যাহারা পাপ-বাবসা চালায় তাহারা ছিদ্দের সম্মানে রহিয়াছে এবং সুযোগ পাইলে তাহাদের জিহ্বা আবার বাড়াইয়া দিবে; কারণ ভ্রাতৃবিরোধ ও হানাহানিতেই ইহাদের স্বার্থান্ধি এবং প্রতিষ্ঠা বা প্রতিপত্তি। পারস্পরিক সহযোগিতা এবং কল্যাণের মন্ত্রে আমরা যদি সমাজ-দেহে বলিষ্ঠ ক্রুতনা জাগাইয়া রাখিতে না পারি, তবে আমাদের পথের বাধা বাড়িয়াই চলিবে এবং স্বাধীনতা লাভ করিয়াও তাহা আমাদের ভোগে আসিবে না।

### সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত

১৭ই আগস্ট নয়াদিল্লী হইতে দণ্ডবিভাগ সম্বন্ধে সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইয়াছে। কমিশনের সিদ্ধান্তে দেখা যায়, বড়লাটের ঘোষণায় আনুমানিক বিভাগের যে পরিকল্পনা ছিল, তাহার পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত একেবারে বিপরীত রকমের হইয়াছে। আনুমানিক ভাবে খুলনাকে পশ্চিমবঙ্গের ভিতরে রাখা হইয়াছিল, সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্তে খুলনা জেলাকে সোজাসুজি পূর্ববঙ্গের ভিতর ফেলা হইয়াছে; সেইরূপ মুর্শিদাবাদ জেলাকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে; অথচ আনুমানিকভাবে মুর্শিদাবাদ পূর্ববঙ্গের হিসাবের মধ্যে ছিল। ২৪ পরগণার সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই। এই জেলা সমগ্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। পদ্মাত্তরে উত্তরবঙ্গে অনেক ওলটপালট হইয়াছে। জলপাইগুড়ির ওটি থানা পূর্ববঙ্গের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। যশোহর, মালদহ, দিনাজপুর, নদীয়া প্রভৃতি কয়েকটি জেলাও উত্তরবঙ্গের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা বরাবরই এ কথা বলিয়াছি যে, বাঙলা দেশকে বিভাগ করার ব্যাপারটাই একান্ত কূটম। এক্ষেত্রে সমস্যার জটিলতা রহিয়াছে, এ কথা কেহই অস্বীকার করিবে না; কিন্তু হিন্দু

সংখ্যাগরিষ্ঠ সমস্ত খুলনা জেলাকে কোন হিসাবে পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হইল, অনেকের কাছেই ইহা বিস্ময়ের বিষয় হইবে। এক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদ জেলার কথা উঠিতে পারে; কিন্তু মুর্শিদাবাদকে যেমন পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে, তেমনই পার্বত্য চট্টগ্রামের অমুসলমানপ্রধান অঞ্চলও পূর্ব পাকিস্থানের ভাগে পড়িয়াছে। জলপাইগুড়ির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কোন সংযোগ-সূত্র রাখা হয় নাই, ইহাও অন্যতম বিস্ময়ের বিষয়। পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত জলপাইগুড়িকে পশ্চিমবঙ্গ হইতে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া বিভাগ করা হইয়াছে যে, এক্ষেত্রে বিহারের স্ৱাস্থ্য না হইলে জলপাইগুড়ির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কোন সংযোগ রাখিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ ইহা অতি বিচিত্র ব্যবস্থা এবং ইহার মূলে কোন যুক্তি নাই, নীতি নাই। অথচ, এমনটা ঘটাইবার পক্ষে বিশেষ কোন কারণই ছিল না। কারণ, দিনাজপুর জেলার কয়েকটি থানা উত্তর দিকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে জড়িয়া দিলেই এই ব্যবধানটা থাকিত না। এই ব্যবস্থা যেমন উৎকট, তেমনই অসঙ্গত হইয়াছে এবং সীমান্ত কমিশনের সভাপতির কর্তব্য প্রতিপালনে দায়বদ্ধতার পরিচয়ই ইহাতে প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কমিশনের সিদ্ধান্ত, সভাপতি র্যাডক্লিফ সাহেবেরই স্ৱৈর-সিদ্ধান্ত। শুনিতোছি, তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবার সময় তাহার সহকর্মীদের কাহারও পরামর্শ লইতে চাহেন নাই এবং তাহা প্রয়োজনবোধও করেন নাই। এমন স্ৱৈরাচারের ফলে অবিচার ঘটিবেই। এইরূপ নানাদিক হইতে সীমান্ত কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সমালোচনা করিবার অনেক কিছই আছে; কিন্তু আমরা জানি, এ বিষয় লইয়া বিশেষ আলোচনা করিয়া লাভ নাই; কারণ কংগ্রেস পূর্বেই কমিশনের সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে; সুতরাং সিদ্ধান্ত যেমনই হউক, আমাদের আপাততঃ ইহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। সিদ্ধান্তে যাহারা নিরাশ হইয়াছেন, তাহাদিগের প্রতি আমরা সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি এবং তাহাদিগকে এই আশ্বাস দান করিতেছি যে, এই কূটম রাষ্ট্র বিভেদ-রেখা বাঙালীর বাস্তব জীবনে সত্যকার কোনরূপ বিভেদ আনিতে পারিবে না। ইংরেজের স্ৱৈর-সিদ্ধান্ত যেমনই হউক, শেষের লোকেই নিজেদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করিয়া লইবে। এ সব সত্ত্বেও বাঙলার সমস্ত সংস্কৃতি পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সংহতিবোধকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত রাখিবে। সেই সংস্কৃতির প্রভাবে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ দুইনয়ম সম্মিলিত হইবে এবং সে দিনেরও যে অধিক বিলম্ব নাই, ইহাও অবধারিত সত্য।

সিদ্ধান্ত প্রদান ছাড়া তাহারা আর কোন গত্যন্তর দেখিতে পান না।

(১০) সুতরাং অদমি আমার সিদ্ধান্ত প্রদান করিতেছি। সর্বশেষট নানা জটিল প্রশ্নের আলোচনার সাহায্য করার জন্য আমি আমার সহকর্মীগণকেও এই সঙ্গে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এই রায়ের 'ক' চিহ্নিত পরিশিষ্টে সীমানার বিষয় বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট 'খ' চিহ্নিত পরিশিষ্টে এই বিবরণ অনুযায়ী মানচিত্র সন্নিবিষ্ট হইল। 'ক' চিহ্নিত পরিশিষ্টে প্রদত্ত বর্ণনা ও 'খ' চিহ্নিত পরিশিষ্টে প্রদত্ত মানচিত্রের মধ্যে যদি কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তবে 'ক' চিহ্নিত পরিশিষ্টে বিবৃত বর্ণনাই গ্রাহ্য হইবে।

রেলপথ ও নদী যেখানে বিভক্ত না করিয়া পারা যায়, সেখানে সেগুলিকে অবিভক্ত রাখিয়া সীমারেখা টানিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। কারণ, প্রদেশের আন্তঃরেখার পক্ষ তাহা অপরিসর। কিন্তু ইহা করিতে বাহিয়া আমাদের জন্য নির্ধারিত নীতির কিছু ব্যতিক্রম করিতে হইয়াছে। কারণ, তাহা না করিয়া উপরোক্ত সীমা নির্দেশ অসম্ভব। তবে আমি এই আশা করি যে, উক্ত রায় নিজেদের মধ্যে একটা ব্যবস্থা করিয়া এই ব্যতিক্রমের ফসফেল যথাসম্ভব হ্রাস করিতে পারিবেন।

সীমারেখা—

(১) দার্জিলিং জেলার ফান্সিদিওয়া থানা ও জলপাইগুড়ি জেলার তেতুলিয়া থানার মধ্যকার সীমা যেখানে বিহার প্রদেশকে স্পর্শ করিয়াছে, থানা হইতে এই সীমা বরাবর একটি রেখা টানিয়া তুলিয়া ও রাজগঞ্জ থানার, পাঁচগড় ও রাজগঞ্জ শার এবং পাঁচগড় ও জলপাইগুড়ি থানার একার সীমানা বরাবর লইয়া যাইতে হইবে; অতঃপর রেখাটি দেবীগঞ্জ থানার উত্তর কোণ ধরিয়া কুচবিহার রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত যাইবে। দার্জিলিং জেলা এবং এই রেখার উত্তরে যতখানি আছে, জলপাইগুড়ি জেলার ততখানি অংশ পশ্চিম বঙ্গে যাইবে। কিন্তু পাটগ্রাম থানা এবং এই রেখার পূর্ব ও দক্ষিণে অবস্থিত জলপাইগুড়ি জেলার অপভ্রান্ত অংশ পূর্ববঙ্গে যাইবে।

(২) অতঃপর দিনাজপুর জেলার হারিপুর ও রায়গঞ্জ থানার মধ্যবর্তী সীমানা যেখানে বিহার প্রদেশ স্পর্শ করিয়াছে, সেখান হইতে ২৪ পরগণা ও খুলনা জেলার মধ্যবর্তী সীমারেখা যেখানে বংগোপসাগর স্পর্শ করিয়াছে সেই পর্যন্ত একটি রেখা টানিতে হইবে। অতঃপর নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলিতে যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সেই ভাবে রেখাটিকে টানিয়া লইয়া যাইতে হইবে। এই রেখার পশ্চিমে যে অংশ পড়িয়াছে, তাহা পশ্চিম বঙ্গে পড়িবে এবং উপরিলিখিত ১নং অনুচ্ছেদে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা ধরিয়া প্রদেশের অবশিষ্টাংশ পূর্ববঙ্গে যাইবে।

(৩) রেখাটি অতঃপর নিম্নলিখিত থানাসমূহের মধ্যস্থিত সীমারেখা ধরিয়া যাইবে—হারিপুর ও রায়গঞ্জ, হারিপুর ও হেমতাবাদ, রাণীসংকটাইল ও হেমতাবাদ, পীরগঞ্জ ও হেমতাবাদ, পীরগঞ্জ ও কালীগঞ্জ, কালীগঞ্জ ও কালীগঞ্জ, বিরল ও কালীগঞ্জ, বিরল ও কুলমুন্ডি, বিরল ও গঙ্গারামপুর, দিনাজপুর ও গঙ্গারামপুর, দিনাজপুর ও কুমারগঞ্জ, তিরির বন্দর ও কুমারগঞ্জ, ফুলবাড়ী ও কুমারগঞ্জ, ফুলবাড়ী ও বালুরঘাট। অতঃপর রেখাটি এমন একটি বিন্দুতে আসিয়া শেষ হইবে যেখানে ফুলবাড়ী ও বালুরঘাটের সীমানা বালুরঘাট থানার

পূর্ব কোণে বেঙ্গল আসাম রেলওয়ের উত্তর-পশ্চিম লাইনের সহিত মিলিত হইয়াছে। রেখাটি অতঃপর রেলওয়ে লাইনের পশ্চিম কিনারা ধারণা ঘূরিবে এবং এই কিনারা বালুরঘাট ও পাঁচবিবি থানার মধ্যস্থিত সীমানার সহিত মিলিত না হওয়া পর্যন্ত যাইবে।

(৪) এই বিন্দু হইতে রেখাটি নিম্নোক্ত থানাগুলির মধ্যস্থিত সীমারেখা ধরিয়া চলিবে—বালুরঘাট ও পাঁচবিবি, বালুরঘাট ও জয়পুরহাট, বালুরঘাট ও ধামরাইরহাট, তপন ও ধামরাইরহাট, তপন ও পল্লীতলা, তপন ও পোরসা, বাননগোলা ও পোরসা হাবিবপুর ও পোরসা, হাবিবপুর ও গোমস্তাপুর, হাবিবপুর ও ভোলাহাট, ইংলিশ-ভোলাহাট, ইংলিশবাজার ও ভোলাহাট, ইংলিশ-বাজার ও শিবগঞ্জ, কালিয়াকে ও শিবগঞ্জ। অতঃপর রেখাটি এমন একটি বিন্দুতে আসিয়া পৌঁছিবে, যেখানে শেষোক্ত থানা দুইটির মধ্যস্থিত সীমানা গঙ্গানদী ধরিয়া মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যস্থিত সীমানার সহিত মিলিত হইয়াছে।

(৫) রেখাটি অতঃপর গঙ্গানদী ধরিয়া দক্ষিণ-পূর্বে ঘুরিয়া মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলা, রাজসাহী ও মুর্শিদাবাদ জেলার রাজসাহী ও নদীয়া জেলার মধ্যস্থিত সীমানা ধরিয়া নদীয়া জেলার উত্তর-পশ্চিম কোণের একটি বিন্দু পর্যন্ত যেখানে গঙ্গা নদী হইতে মাথাভাঙ্গা নদীর খাল বাহির হইয়াছে—যাইবে। জেলার সীমানাই গঙ্গা নদীর মূল গতিপথ নহে—পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সীমানা নির্ণয়ক হইবে।

(৬) গঙ্গা নদীর যেখান হইতে মাথাভাঙ্গা নদীর খালটি বাহির হইয়াছে, সেখানকার একটি বিন্দু হইতে রেখাটি এই খালটি ধরিয়া উত্তর দিকের সর্বশেষ প্রান্তের একটি বিন্দু পর্যন্ত যাইবে, সেখানে উহা দৌলতপুর ও করিমপুর থানার মধ্যস্থিত সীমানার সহিত মিলিত হইবে। প্রধান খালটির মধ্যস্থিত রেখা প্রকৃত সীমানার কাজ করিবে।

(৭) এই বিন্দু হইতে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সীমানা দৌলতপুর ও করিমপুর, গঙ্গানদী ও করিমপুর, মেহেরপুর ও তেহাড়া, মেহেরপুর ও চাপরা, দামরহুদা ও চাপরা, দামরহুদা ও কৃষ্ণগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা ও কৃষ্ণগঞ্জ, জীবননগর ও কৃষ্ণগঞ্জ, জীবননগর ও হংসখালি, মহেশপুর ও হংসখালি, মহেশপুর ও রাণাঘাট, মহেশপুর ও বনগাঁও, ঝিকরগাছা ও বনগাঁও, সারসা ও গৈগাঘাট ও কালারোয়া থানার মধ্যস্থিত সীমানা ধরিয়া এমন একটি বিন্দু খুলনা ও ২৪ পরগণা জেলার মধ্যস্থিত সীমানার পর্যন্ত যাইবে যেখানে এই সমস্ত থানার সীমানা সহিত মিলিত হইয়াছে।

(৮) রেখাটি অতঃপর খুলনা ও ২৪ পরগণা জেলার মধ্যস্থিত সীমানা ধরিয়া দক্ষিণাভিমুখে এমন একটি বিন্দু পর্যন্ত যাইবে যেখানে সীমানা বংগোপসাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে।

### শ্রীহট্ট সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত

শ্রীহট্ট জেলা এবং আসামে উহার পার্শ্ববর্তী জেলা সম্বন্ধে আমি বঙ্গীয় সীমা নির্ধারণ কমিশনের রিপোর্ট পেশ করিতেছি। ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের ও ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী রিপোর্টে যে কথা বলা হইয়াছে, তাহা কমিশনের সিদ্ধান্ত এবং রায় বলিয়া আর্জিহত হইবে।

বাংলা দেশকে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গলায় বিভক্ত করিবার জন্য বঙ্গীয় সীমা নির্ধারণ কমিশন গঠিত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত বিষয়-গুলি আসামের বিচার্য বিষয় ছিল—

মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যা-গরিষ্ঠ সকলের সংলগ্নতার ভিত্তিতে কমিশনকে বাংলার দুইটি অংশের সীমা নির্ধারণ করিতে বলা হইয়াছিল। ইহা করিবার জন্য অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও মনোযোগ দিতে হইবে।

শ্রীহট্ট জেলায় গণভোটের ফলে যদি এই জেলাকে পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার অনুকূলে ভোট প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে সীমা নির্ধারণ কমিশন শ্রীহট্ট জেলার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল এবং আসামে উহার পার্শ্ববর্তী জেলা-সমূহে পরস্পর সংলগ্ন সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল-সমূহেরও সীমা নির্ধারণ করিবে।

বাংলা সম্পর্কিত কাজ শেষ হওয়ার পরে কমিশন শ্রীহট্টের ব্যাপারে আগ্রহসম্পন্ন দল-সমূহের নিকট হইতে স্মারকলিপি চাহেন। এই সম্পর্কে বহু স্মারকপত্র পাওয়া যায়।

শুনানীর জন্য চঠা, ৫ই এবং ৬ই আগস্ট কলিকাতায় কমিশনের প্রকাশ্য অধিবেশন হয়। একাদিকে পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে ও প্রাদেশিক এবং জেলা মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে কোঁসুলী সওয়াল করেন। অপরদিকে আসাম গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে এবং আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও আসাম প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে কোঁসুলী সওয়াল করেন। প্রকাশ্য অধিবেশনের সময় আমি কলিকাতায় ছিলাম না, আমি এই সময়ে পাঞ্জাব সীমা নির্ধারণ কমিশনের কার্যে লিপ্ত ছিলাম। তবে শ্রীহট্ট সম্পর্কে যে সওয়াল হয়, প্রত্যহ তাহা আমাকে জানান হয়। প্রকাশ্য অধিবেশনের শেষে কমিশনের সদস্যগণ আমার সহিত আলোচনা করেন। নয়াদিক্কাতেই এই আলোচনা হয়।

প্রথমে অধিকার সীমা সম্বন্ধে মতভেদ দেখা দেয়। আমার দৃষ্টিকোণে সহকর্মী এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আসামের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ যে কোন অঞ্চল এবং যেকোন পূর্ব-বঙ্গের সংলগ্ন, সেইগুলিকে আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষমতা কমিশনকে দেওয়া হইয়াছে। আমার অপর দৃষ্টিকোণে সহকর্মী এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কোন অঞ্চলকে পূর্ববঙ্গের সহিত যুক্ত করার ক্ষমতা কেবল শ্রীহট্ট এবং উহার নিকটবর্তী জেলা-গুলির সংখ্যাগরিষ্ঠ ও পরস্পর-সংলগ্ন অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমার অভিমতের জন্য এই মতভেদের বিষয় আমার জানান হয়। আমি এই অভিমত প্রকাশ করি যে “আসামের পার্শ্ববর্তী জেলা” বলিতে শ্রীহট্টের পার্শ্ববর্তী জেলা বাতীত আসামের অন্যান্য জেলা বোঝায় না। এই ভিত্তি অনুযায়ী কমিশন কাজ চালাইতে থাকেন। পূর্ববঙ্গ গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে সীমা-নির্ধারণ কমিশনে বলা হয় যে, ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী অন্ততঃ সমগ্র শ্রীহট্ট জেলাকে পূর্ববঙ্গের

অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। আমার সহযোগীরা এই কথা অগ্রাহ্য করেন। আমিও তাহাদের সহিত একমত হই।

বাংলাকে যেভাবে ভাগ করা হইয়াছিল, শ্রীহট্টের ব্যাপারেও আমরা সেইভাবে অগ্রসর হইব না, ইহা স্পষ্টরূপে কার্যে আমাদের অস্বীকার্য হয়। কারণ তথায় ভাষাগত পার্থক্য ছিল। কিন্তু আমার সহকর্মীরা এই সম্বন্ধে উপনীত হন যে, আমাদের শ্রীহট্ট জেলা এবং আসামের পূর্ববর্তী জেলাগুলিকে মুসলমান ও অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সংলগ্ন অঞ্চলের ভিত্তিতে আসাম ও পূর্ববঙ্গের মধ্যে ভাগ করিতে হইবে। অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করিয়া আমি ঐ অভিমত স্বীকার করিয়া লই।

সীমারেখা দিভাবে টানা হইবে, তৎসম্বন্ধে কামিশনের সদস্যগণ একটা সর্বসম্মত সম্মতিতে উপনীত হইতে অসমর্থ হন। তাহারা আমায় এই ব্যাপারে অভিমত দিতে বলেন। আমি এখন তাহা বলিতেছি। আমার মতে এই ব্যাপার শ্রীহট্ট এবং কাছাড় জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

শ্রীহট্টের ৩৫টি থানার মধ্যে ৮টি থানায় অমুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ। ঐ আটটি থানার মধ্যে সাল্লা এবং আজমীরগঞ্জ মুসলমান অঞ্চল দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরিবেষ্টিত সেই জন্য ঐ দুইটিকে পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। অপর থানা ছয়টির লোকসংখ্যা ৫ লক্ষ ৩০ হাজার। উহা শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণ অংশ বরাবর অবস্থিত। ঐ থানাগুলি দুইটি মহকুমায় বিভক্ত। উহার মধ্যে দক্ষিণ শ্রীহট্ট মহকুমায় লোকসংখ্যা ৫ লক্ষ ১৫ হাজারেরও অধিক, তথায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। অপরদিকে করিমগঞ্জ থানার লোকসংখ্যা ৫ লক্ষ ৬৮

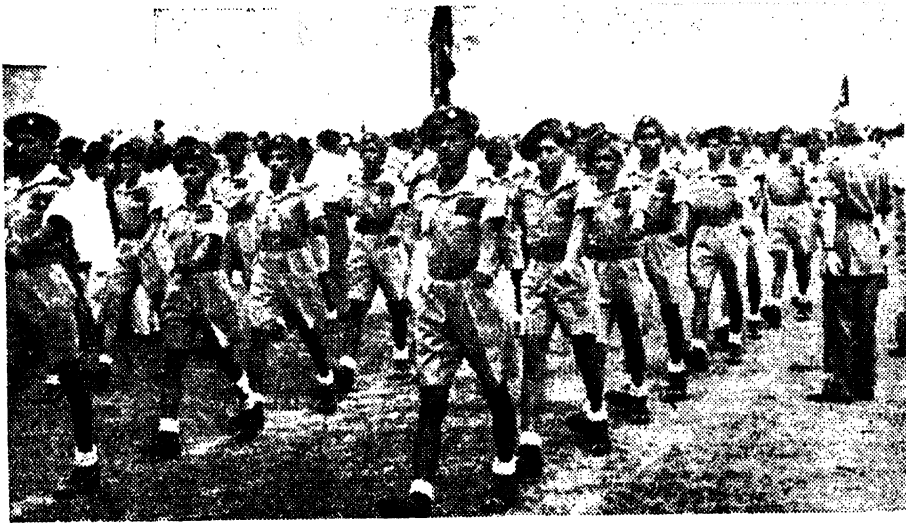
হাজারেরও অধিক। তথায় মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

কাছাড় জেলার হাইলাকান্দি থানা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল এবং উহা শ্রীহট্টের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা বদরপুর এবং করিমগঞ্জের সহিত সংলগ্ন। হাইলাকান্দি এবং কাটলিছরা থানা লইয়া হাইলাকান্দি মহকুমা গঠিত। সমগ্রভাবে হাইলাকান্দি মহকুমায় মুসলমানরা নাম মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ। তথায় মুসলমানদের সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৫১ ভাগ। আমার মনে হয় স্বাভাবিক যোগাযোগের জন্য কাটলিছরা এবং হাইলাকান্দির এক স্থানে রাখা উচিত। মুসলমানরা হাইলাকান্দি মহকুমাকে পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী করে। কিন্তু আমার মতে, মানচিত্র দেখিয়া বুঝা যায় যে, এইভাবে ভাগ করিলে শাসন পরিচালন সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে এবং তাহার ফলে সমগ্র জেলার ভবিষ্যৎ মঙ্গল ব্যাহত হইতে পারে। হাইলাকান্দি সম্বন্ধে মুসলমানদের দাবী যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে কেবল যে, শ্রীহট্টের ছয়টি অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে, তাহা নহে, পরন্তু উহার ফলে উত্তর ও দক্ষিণে স্বাভাবিক সীমারেখা টানা হইবে না, উদ্ভটভাবে পূর্ব হইতে পশ্চিমে সীমারেখা টানা হইবে এবং শ্রীহট্টের মধ্য দিয়া রেলপথ ভাগও উদ্ভটভাবে করা হইবে। উহার ফলে এই হইত যে, শ্রীহট্ট সহর পূর্ববঙ্গে না পড়িয়া আসামের মধ্যে পড়িত।

এই অবস্থায় আমার মনে হয় যে,

কর্তৃকর্তাভাবে বিভাগ করিতে হইলে কোন কোন অঞ্চলের আদানপ্রদান প্রয়োজন। কয়েকটি অমুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলকে পূর্ববঙ্গে দিতে হইবে এবং কয়েকটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল ও হাইলাকান্দি আসামে রাখিতে হইবে। তদনুযায়ী আমি নিম্নলিখিত অভিমত দিতেছি—

এমন একটি স্থান হইতে রেখা টানা হইবে যেখানে পাথারকান্দি ও কুলাউরা থানার মধ্যস্থিত সীমানা দ্বিগুণা রাজ্যের সীমান্তের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং উক্ত রেখাটি পাথারকান্দি ও বড়লেখা থানার মধ্য দিয়া উত্তরাভিমুখে চলিবে। তাহার পর উক্ত রেখাটি বীরমগঞ্জ ও বড়লেখা থানার মধ্যস্থিত সীমানা ধরিয়া চলিবে এবং তাহার পর করিমগঞ্জ ও বিয়ানী বাজার থানার মধ্য দিয়া চলিবার এমন একটি স্থানে আসিয়া উপনীত হইবে যেখানে ঐ সীমারেখা কুশিয়ারা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ঐ রেখা অতঃপর কুশিয়ারা নদীকে সীমানা ধরিয়া পূর্বদিকে ঘুরিয়া যাইবে এবং এমন একটি স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবে সেখানে ঐ নদীটি শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলার মধ্যস্থিত সীমানার সহিত মিলিত হইয়াছে। প্রধান নদী অথবা খালের মারামারি স্থানই সীমারেখা বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই রেখার পশ্চিম ও উত্তরে শ্রীহট্ট জেলার যতখানি অংশ পড়িবে তাহার আসাম প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পূর্ববঙ্গ প্রদেশে স্থানান্তরিত হইবে। আসাম প্রদেশের অন্তর্গত কোন অংশ স্থানান্তরিত হইবে না। বৈশদ ব্যাখ্যায় জন্য ব্রতেনসেন 'এ চিহ্নিত একখানি মানচিত্র প্রদত্ত হইল। মানচিত্রে চিহ্নিত রেখা ও ১৩ অনুচ্ছেদ বিবরণের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা দিলে সিদ্ধান্ত বিবরণই গ্রাহ্য হইবে।



১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে দিল্লীতে ভারতীয় সৈন্যদের কুচকাওয়াজ

# যাত্রিদল

## শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

অষ্টাদশ অধ্যায়

আজ স্ট্রীমারে করিয়া শেষ কুটির দল আসিয়া পৌঁছিল। ইহাদের অহাংরায়ীরাই স্ট্রেনে তুলিয়া দিয়া আজ যাবার অমিয় সন্ধ্যার পূর্বে নদীর তীরে আসিয়া দাঁড়ইলেন। কাল ইতে আর গোয়ালন্দে কোন কাজ নাই। আবার খানকার কুলিরা কাজে যোগ দিবে, কারণ মাঘটের সমস্ত প্রয়োজন শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে আর একটি কাজের নির্দেশ আসিয়া পৌঁছিয়াছে—আগামী পরশু যুবরাজ ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিবেন। তাই সর্বত্র হরতাল করিয়া, শোভাযাত্রা করিয়া অত্যাচারিত ভারত, নির্যাতিত ভারত তাহার প্রতিবাদ জানাইবে। ঠিক হইয়াছে, আগামীকাল তাঁহারা এখানে বিশ্রাম করিয়া পরশু সকালে মহকুমা শহরটীতে পৌঁছিয়া সর্বত্র হরতাল করাইবেন। কেমন করিয়া কি করিবেন, তাহাই এতক্ষণ বালির চড়ার উপরে বসিয়া বসিয়া অমিয় ভাষিতোঁছিলেন। এমন সময় ধীরে ধীরে কুলির সর্দার যদুনন্দন মিশির আসিয়া ডাকিল—অমিয়বাবু!

অমিয় তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—কি মিশিরজী!

যদুনন্দন তাঁহার পাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল—কালকের দিনটা পরে তো সব চলে যাচ্ছেন এখান থেকে—আর হয়তো দেখা-সাক্ষাৎ হবে না—তাই এলাম একবার দুঃখে কথা বলতে।

অমিয় বলিলেন—যেতে তো হবেই মিশিরজী, কিন্তু এই একটা মাসের উপরে এখানে আপনাদের ভিতরে থেকে গোয়ালন্দে উপরে মায়া বসে গেছে আমার—যাবার কথা হলে সত্যি দুঃখ হয়।

মিশিরজী হাসিয়া বলিলেন—কিন্তু কি দিয়ে ধরে রাখবে আমরা আপনাদের?

অমিয় বলিলেন—ধরে রাখবার জিনিসের অভাব নাইতো মিশিরজী! আজ একটা মাস এখানে বাস করে আমার চোখ খুলেছে—চা-বাগানের কুলিরা, গোয়ালন্দ ঘাটের কুলিরা আমার দৃষ্টি খুলে দিয়েছে। আমি সত্যি করে বুঝেছি, এরাই আমার দেশের লোক। আর এই নিজের চোখেই তো দেখতে পেলাম—কত বড় এরা অসহায়—কত বড় নিরাশ্রয়।

মিশিরজী কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তবু, হয়তো আপনি এদের বিশেষ কিছুই জানেন না—জানলে স্থির থাকতে পারতেন না। চা-বাগানের কুলিদের কথা শুনবেন? আপনারা ওদের পেট পূরে খাবার দিয়ে গাড়িতে চড়িয়ে স্বাধীন নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলেন—বেচারারা এবার বেশি ফিরে বাঁচবে। কিন্তু এ যে কত বড় ভুল, তা জানলে এতটুকুও শান্তি পেতেন না। কি দেশে, কি বিদেশে ওরা সত্যি নিরাশ্রয়। চা-বাগানের যারা কুলি, তারা আসে বেশির ভাগ ছোটনাগপুর জেলা থেকে। ছোটনাগপুরের জঙ্গলে কুড়ে বেঁচে সেখানেই দিনের পর দিন ওরা বাস করে। পাহাড় খুঁড়ে—পাথর বেছে জমি তৈরি করে। জমিতে এক বুক গর্ত করে জল জমিয়ে রাখে, তাতেই ধান চাষ করে। যা অল্পস্বল্প ফসল হয়, তাই দিয়ে বনের ফল মূল দিয়ে—মহায়া সিম্প খেয়ে কোন রকমে বেঁচে থাকে। অবস্থা তাদের কোনদিনই ভাল ছিল না। কিন্তু তবু ইংরেজ কোম্পানী এদেশে আসার আগে—এদের সকলেরই কিছু কিছু জমি ছিল। কোম্পানী এদেশে এসে রেল খুললো—কয়লার খাদ খুললো—চা-বাগান তৈরি করলো—প্রচুর তার কুলির দরকার। কিন্তু কি শকুনির মত নজর এদের দেখেছেন বাবু—খুঁজে খুঁজে বের করে ফেললে ছোটনাগপুরের এই পাহাড়িয়া জাতিটাকে। কুলি ভাগানোর কোম্পানী তৈরি হল। তার এজেন্টরা প্রথমে ওরাও মৃন্ডা, সীঁওতালদের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে পাঁচ টাকা, দশ টাকা করে কর্জ দিতে লাগলো। টাকা তারা কোন কালে শোধ দিতে পারবে না—তা এজেন্টরা জানতো। কিছুদিন পর টাকার জন্য চলতে লাগলো পীড়ন অবশেষে যারা টাকা দিতে পারলে না—তাদের আরও দুই-চার টাকা দিয়ে তাদের জমিগুলো কোম্পানীর নামে লিখিয়ে নিলে। কোম্পানী সে জমি আবার মাড়োয়ারী, বেহারী, বাঙালী জমিদারদের কাছে বিক্রী করে দিতে লাগলো। এমনি করে জমি তাদের সব কেড়ে নেওয়া হলো। তারপর চললো আড়কাঠির আনাগোনা—তারা প্রলোভন দেখালে—আসামের চা-বাগানের—সেখানে গেলে মোটা মাহিয়ানার চাকুরী মিলবে—পরম সুখে শান্তিতে থাকতে পারবে। নিজের দেশে ভূমিহীন হয়ে, নিরাশ্রয় হয়ে,

অনাহারে আর কত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করবে তারা? এলো সব দলে দলে বেরিয়ে—গেল সব চা-বাগানে। কিন্তু কয়দিনেই ভুল এদের ভেঙে গেল—চা-বাগানের হিসেব করা পরস্যা—খেয়ে-পরে কোন প্রকারে যাতে বেঁচে থাকতে পারে—এর বেশি তাদের কপালে জুটল না। যদি-বা কেউ কোন ফাঁকে কিছু জমায়—সে জন্যও ব্যবস্থা করা হলো—সস্তা দামে বাগানে বাগানে দেশি মদের দোকান খুলে দেওয়া হলো—জমান তো দূরের কথা, ভাতের পরস্যা মদে উড়ে যেতে লাগলো। এই এদের অবস্থা বাবু। অমিয় জিজ্ঞাসা করিলেন—কিন্তু তাহলে দেশে এরা ফিরে যাচ্ছে কিসের আশায় মিশিরজী!

মিশিরজী বলিলেন—ঠিক করে বলতে পারবো না বাবু। হয়তো ভেবেছে, যদি এমনি শূন্যকায়ের মরি—বিদেশে মরবো কেন—নিজের দেশে গিয়েই মরবো। আমি \* সত্যিই জানি বাবুজী—দেশে ওদের জন্য এতটুকু আশ্রয় নাই—কিছুমাত্র ভরসা নাই। ওদের ভবিষ্যৎ ভাবলে গা শিউরে ওঠে। এতো গেল চা-বাগানের কুলিদের কথা। কিন্তু এই যেসব স্ট্রীমারের কুলি, রেলের কুলি দেখছেন—এরা সব বিহার থেকে এসেছে। আমি নিজে ছাপড়া জেলার লোক—আমার তো জানতে বাকি নাই—এরা ওদেশে কি অবস্থায় থাকে। এরা বেশীর ভাগ কৃষক—কিন্তু জমি এদের নাই। বাঙলা দেশে আমি কুড়ি বৎসর আছি বাবু—কিন্তু বাঙলা দেশে আর আমাদের দেশে তফাৎ কি জানেন—বাঙলা দেশের জমির তিনগুণ বেশি খাজনা দিতে হয় বেহারে। অথচ চাষের খরচ সেখানে অনেক বেশি—সার চাই—জল চাই—তবু ফসল সেখানে তেমন ভাল ফলে না। জমির খাজনা দিয়ে, চাষ করে কারুরই প্রায় চলে না—তাই জমিদার দেয় জমি নীলাম করে। আবার যাদের জমি নাই—তারা জমিদারের জমি ভাগে চাষ করে। এক মণ ফসল হলে চম্বিশ সের পাবে জমিদার, আর বোল সের পাবে—যে রৌদ্রে পুড়ে, জলে ভিজ়ে, গায়ের রক্ত জল করে সারা বছর খেটেছে সে। তার জমি—কোম্পানীর খরচ আছে, সারের খরচ আছে—বীজের খরচ আছে। এই সব খরচ বাদে কি যে চাষার লাভ থাকে, সে তো বুঝতেই পারছেন। দেশে পেট ভরে না—তাই তো ছুটে আসে বিদেশে। বিদেশীরা দেশের সর্বনাশ করেছে, তা মানি—কিন্তু তাই বলে নিজের দেশের এই জমিদাররাও তো দিনের পর দিন কম সর্বনাশ আমাদের করছে না বাবু! এর প্রতিকার করবে কে?

অমিয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন—প্রতিকার এর হবে মিশিরজী। যে শক্তিকে আশ্রয় করে এই পরগাছার দল পুষ্ট হয়ে উঠেছে, সেই

শক্তির ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে এই পরগাছা সব কোথায় মিলিয়ে যাবে দেখবেন।

মিশিরজী উৎসাহিত হইয়া বলিলেন—সত্যি হবে বাবুজী? গান্ধী মহারাজ বলেছেন এই কথা!

অমিয় হাসিয়া বলিলেন—বলেছেন বই কি মিশিরজী। দীন দুঃখীর বাধা যদি তাঁর প্রাণে না বাজতো—তাহলে কি এমন করে সর্বস্ব ত্যাগ করে—নির্ভয়ে এত বড় কাজে হাত দিতে পারতেন?

মিশিরজী হাসিয়া বলিলেন—আমি নিজেও যে এই কুলীদের শোষণ করে কিছু টাকা-পয়সা না করেছি এমন নয়। কিন্তু টাকার আমার প্রয়োজন নাই—সংসারে আপনার বলতে কেউ নাই—এই কুলীদের আমি ভালবাসি। স্বরাজ্য মানে তো বৃদ্ধি না, সত্যি যদি স্বরাজ্য এলে এদের সুখ-সুবিধা ফিরে আসে—টাকা আমার সব স্বরাজ্যের জন্যে বিলিয়ে দিতে রাজী আছি বাবু।

অমিয় একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া মিশিরজীর পিঠে একখানা হাত রাখিয়া বলিলেন—মিশিরজী! এই তো চাই ভাই—এই তো মানুষের মত কথা।

পরের দিন পূর্বাহ্নেই সমস্ত সংবাদ পুন্ড্রিশের নিকট পৌঁছিয়াছিল—তাই পরের দিন ট্রেন স্টেশনে পৌঁছিবার বহু পূর্বেই হইতেই স্টেশনের চারি ধার একেবারে পুন্ড্রিশে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। অমিয় এবং স্বেচ্ছাসেবক দল ট্রেন হইতে নামিবামাত্র—অমিয়, ডাঃ সেন এবং আরও পনরজনকে গ্রেপ্তার করিয়া সাব-জেল লইয়া যাওয়া হইল। সমস্ত মহকুমা শহরটি উঠিল একেবারে চঞ্চল হইয়া। গোয়ালন্দে গিয়া এ-সংবাদ পৌঁছিল। পরের ট্রেনে মিশিরজী সমস্ত কুল লইয়া আসিয়া পৌঁছিলেন। বিকাল বেলা বারশ' কুল, স্বেচ্ছাসেবক ও অন্যান্য লোক মিলিয়া এক বিরাট শোভাযাত্রা সারা শহরের পথে পথে ঘুরিয়া বিক্ষোভ-ধ্বনিতে শহরটি কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল।

#### উনচয়ারিং অধ্যায়

ছয় মাস চলিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে অমিয়কে ডিস্ট্রিক্ট জেল ঘুরাইয়া আলিপুরে সেন্ট্রাল জেলে লইয়া আসা হইয়াছে। আন্দোলনে ভারতবর্ষ যেন একটা অভূতপূর্ব চাপলোর সাজা পড়িয়া গিয়াছে, দলে দলে নরনারী যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হইয়াছে—তাহা অমিয় জানিতেন। কিন্তু তাহার শক্তি যে এত প্রচণ্ড, তাহা তো অমিয় কল্পনাও করিতে পারেন নাই। নিজেদের ডিস্ট্রিক্ট জেল একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে—আর তিলধাণের স্থান নাই। এখানে এই সেন্ট্রাল জেলেও তিন হাজারের উপরে রাজনৈতিক বন্দীকে আনিয়া বন্দ করা হইয়াছে। সারা ভারতবর্ষময়ই এই অবস্থা। সারা দেশের হিসাব লইলে এই সংখ্যা

কত লক্ষে দাঁড়াইবে কে জানে? বর্ষার বারি-ধারা যেমন করিয়া বাঙলা দেশের পল্লীতে পল্লীতে অলিতে-গলিতে ছড়াইয়া পড়ে—তেমনি করিয়াই এই মুক্তির ডেউ সারা দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এতদিনের পরাধীন ভারত, সুস্ত ভারত কোন্ সজীবনী মস্ত্রে প্রাণচঞ্চল হইয়া এমনি করিয়া জাগিয়া উঠিল। ইহা কি কম বিস্ময়। অমিয় নিজের জীবনের বিগত দিনগুলির দিকে চাহিয়াও তো নিজেই এমনি বিস্মিত হইয়া যান। একালের বাঙালীর চিরাচরিত প্রথামত তিনি লেখাপড়া শিখিয়া—লক্ষ্য ছিল চাকুরী—চাকুরীও তিনি পাইয়াছিলেন। অর্থ উপার্জন করিয়া ঘর-সংসার লইয়া নিতান্ত ভাল মানুষটির মত দিন তাহার একপ্রকার যাইতেছিল। কোন প্রকার হৈ-চৈ, কোন প্রকার গন্দগোলের ধার দিয়াও যেঁসেন নাই। অফিসের সাহেবকে দুই বেলা হুটমানে সেলাম ঠুকিয়াছেন—দরকার হইলে তোয়াজ করিয়াছেন—এতটুকু গ্লানিও তো কোনদিন তাহার মনে আসে নাই। তারপর কোথা দিয়া কি হইয়া গেল। কি এক মায়ার প্রভাবে এই গভীর অন্ধকারের ভিতরেও আলো ফুটিয়া উঠিল—চিৎ ভাবিয়া জাগিয়া উঠিল নিজের দেশের সত্যাকারের রূপ। অত্যাচারীর অত্যাচার চোখের সম্মুখে ধরা পড়িয়া গেল—দেশ-মাতৃকার মূর্তিতে হৃদয় তাহার শক্তিমান হইয়া উঠিল—তেজ ও বীর্যে অন্তর তাহার ভরিয়া উঠিল—নিজেকে অসঙ্কোচে সর্পিণ্যা দিলেন তাহারই পায়। সেই দিনের অমিয় আর আজিকার অমিয়ে কত না পার্থক্য।

সেদিন সকাল বেলা বরিশাল জেল হইতে একদল স্বেচ্ছাসেবককে এখানে লইয়া আসা হইয়াছিল। বিকাল বেলা অমিয় এই নতুন দলের সহিত পরিচয় করিবার জন্য তাহারের ওয়ার্ডে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দুই-চারি-জনের সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া হঠাৎ একজনের মুখের উপরে অমিয়র দুই চক্ষু কতক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এ যেন তাহার কত পরিচিত মুখ, অথচ কিছুতেই স্মরণে আনিতে পারিতেছেন না। যাহার মুখের দিকে এমনি করিয়া তাকাইয়া ছিলেন—তিনি কিন্তু এতক্ষণ কিছুই লক্ষ্য করেন নাই। কিছুক্ষণ পরে অমিয় নিজের মনের সুস্ত তলা হইতে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। অমিয় তাহার নিকটে আগাইয়া গিয়া একেবারে একখানি হাত পিঠের উপরে রাখিয়া বলিলেন—রমেশ না?

রমেশ হঠাৎ মুখে তুলিয়া কিছুক্ষণ অভিভূতের মত চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন—আরে অমিয় যে।

অমিয় হাসিয়া বলিলেন—হাঁ ভাই, আমিই। কিন্তু একি বিস্ময় বলতো? শেষকালে তুমিও? রমেশ মূর্চক হাসিয়া বলিলেন—দোষ কি?

—আরে, এ যে এক পরম বিস্ময়! মিঃ আর সি ব্যানার্জি, জেলা স্কুলের হেডমাস্টার, একে-বারে পুরো সাহেব। পাঁচশো টাকা মাইনে পেলেও যার চলে না—সেই আর সি ব্যানার্জি আর এই রমেশ কত তফাৎ বলতো? রমেশ লম্বিত মুখে বলিলেন—থাক ভাই, আর পুরানো কাসুন্দী যেটে লাভ কি? ওসব ভাবলেও যে আজ লম্বায় মরে যাই—কি হয়ে-ছিলাম বলতো? আর বিস্ময়ের কথা যদি বল তুমিই কি কম বিস্ময় অমিয়? নিজেও তো মোটা মাইনের সরকারী চাকুরে ছিলে। জীবনে কোনদিন যে এমনি হৈ-হুল্লার ভিতরে আসবে, তাকি কেউ কোনদিন ভাবতে পেরেছিল? সেই যে কলেজে ক্রাশের একপ্রান্তে নিতান্ত নিরীহ গো-বেচারীর মত চূপ করে দিনের পর দিন বসে থাকতে, সে মূর্তি তোমার আজও তো আমি ভুলিনি।

অমিয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—অর্মান হয় ভাই—অর্মান হয়। তারপর দুই বন্ধুতে বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা চলিল। অবশেষে অমিয় প্রশ্ন করিলেন,—আজ ছয়টা মাস জেলে অছি—বাইরের কোন খবরই তো রাখি না—বাইরের খবর কিছু বল তো!

বাইরের খবর? তা হয়ত কিছু কিছু সত্যি আমি বলতে পারি ভাই। মাস তিনেক আগে চাকুরী তো দিলাম ছেড়ে, কিন্তু তখনও কি করবো না করবো কিছুই স্থির করিনি। রাজ তো কাগজে পড়তাম—কেমন করে সারা ভারতবর্ষ এই আন্দোলনে মেতে উঠেছে। বড় ইচ্ছা হলো, এবার এই সময় দেশের প্রধান প্রধান স্থানগুলো ঘুরে দেখে আসি। বেরিয়ে পড়লাম। আগে বাঙলা দেশটি ঘুরে যে যে স্থানে বড় বড় জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছে শুনতে পেলাম—সেই সেই স্থানেই গেলাম। বরিশালের বানরীপাড়ায় কেশব ব্যানার্জি প্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যালয় দেখলাম। হরদয়াল নাগের চাঁদপুর বিদ্যালয়, ঢাকার জাতীয় মহাবিদ্যালয় দেখলাম। ঢাকার সত্যীশ-চন্দ্র সরকার ঢাকা কলেজের প্রফেসরী ছেড়ে এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হলেন—প্রফেসর অতুল সেন এসে যোগ দিলেন। কলকাতার গোড়ীয় সর্ব-বিদ্যারতনের কথা তো জানই। কলকাতা থেকে গেলাম কাশীতে। কাশী বিদ্যাপীঠ এক অতি বিস্ময়কর সৃষ্টি ভাই—শিব-প্রসাদ গুপ্ত অকাতরে অর্থ ঢেলেছেন, মহা-পণ্ডিত ডাঃ ভগবান দাস বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ, আচার্য নরেন্দ্র দেব, সম্পূর্ণানন্দ এঁদের মত ব্যক্তি সব হয়েছেন অধ্যাপক। সেখান থেকে গেলাম গুজরাটে, দেখলাম গুজরাট বিদ্যাপীঠ—ডাঃ গিথোয়ানী, কৃপালনী এঁরা নিয়েছেন এখানকার অধ্যাপনার ভার। তারপর বয়কট আন্দোলন—স্বদেশী সভা, শোভাযাত্রার কথা আর কি বলবো ভাই! সারা ভারতবর্ষের নর-

নারী সতাই যেন পাগল হয়ে উঠেছে, দলে দলে কত লোক যে প্রতিদিন জেলে যাচ্ছে—তার কি সীমা সংখ্যা আছে। যমুনালাল বাজাজ—‘বাজাজ ফান্ড’ নামে একটি ফান্ড খুলেছেন—নিজে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে এই ফান্ড থেকে ভারত-বর্ষে বৃত্ত দূঃস্থ আইন ব্যবসায়ী নেমেছেন, তাঁদের পরিবারবর্গকে মাসিক অর্থ সাহায্য করছেন। সেখান থেকে আবার কলকাতায় ফিরে এলাম। মন আর ঘরে বেড়াতে চাইল না। ভাবলাম নিজে তো কিছই করলাম না—এইবার দেশে গিয়ে কিছ করতে হবে। হাঁ, ইতিমধ্যে দেশবন্ধু গ্রেপ্তার হলেন। আমি তখন পথে—দুইদিন পরে এসে কলকাতায় পৌঁছলাম। সেই দিনই হলেন বাসন্তী দেবী গ্রেপ্তার, সেদিনের কলকাতার অবস্থার কথা আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না ভাই। দলে দলে নরনারীতে রাস্তাঘাট ভরে বেতে লাগলো—পার্ক পার্কে প্রতিবাদ সভা চললো—পথে পথে শোভাযাত্রা করে বিক্ষোভ প্রদর্শন হতে লাগলো। কাউন্সিলের সেশন চলছিল—খবর যখন সেখানে পৌঁছলো—সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন কাউন্সিলার প্রতিবাদ করে বাইরে চলে এলেন। খেলার মাঠে খেলা বন্ধ হলো—সারা সহরময় হরতাল চললো। এই সম্মিলিত প্রতিবাদ এই বিক্ষোভ দেখেই হয়তো কতাদের টনক নড়লো, তাই পরের দিন তারা বাসন্তী দেবীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। তারপর গেলাম দেশে। জাতীয় বিদ্যালয়ে যোগ দিলাম। দুই একটা বস্তুতাও দিলাম—তারই ফলে এলাম এই ইংরেজের অতিথিশালায়।

### চর্যাংশ অধ্যায়

স্বরাজ কিন্তু আসিল না, এদিকে আশ্রম এক রকম ভাঙিয়া গিয়াছে। বিদ্যালয়ে আর ছাত্র আসে না—পড়াইবারও শিক্ষক নাই—সকলেই প্রায় গ্রেপ্তার হইয়া গিয়াছেন। অজয়ের কিছই ভাল লাগে না। সারাক্ষণ সে বসিয়া বসিয়া ভাবে, কেন স্বরাজ আসিল না? কেন আরও দলে দলে লোক জেলে গিয়া জেল একেবারে ভর্তি করিয়া দিল না? মহাত্মা গান্ধীর মত লোক, দেশবন্ধুর মত লোক জেলে যাইতে পারিলেন আর সাধারণ লোক যারা তাদেরই কি এমন জেলের ভয় হইল? কিন্তু জেলেই বা যাইবে কেমন করিয়া লোক? মহাত্মা নিজেই তো আইন অমান্য করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। একি ভাল হইল? স্বরাজ ব্যক্তি আর কোনদিনই আসিবে না। ভাবিতেই অজয়ের মন একেবারে বেদনার মূর্ছাড়া পড়ে। দেশে সে উৎসাহ আর নাই—পঞ্জীতে পঞ্জীতে স্বদেশী নগর কীর্তন আর হয় না—গ্রামে গ্রামে সভা বসে না—বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকোটিং হয় না। এখন আবার উকিলেরা ওকালতী করিতেছেন—চাকরুরা চাকরী

করিতেছেন—ছাত্রেরা জাতীয় বিদ্যালয় ছাড়িয়া আবার সরকারী স্কুলে ভর্তি হইয়াছে। কোথায় গেল ইহাদের সেই পুণ—কোথায় গেল সেই উৎসাহ! বাহারা দেশের জন্য পুন্নিশের লাঠি খাইল—বাহারা জেলে বসিয়া দিনরাত কত দূঃখ-কষ্ট সহ্য করিতেছে—তাহাদের কথা কি ইহাদের মনে একবারও পড়িল না। এদিকে আশ্রমে তখনও যে দুই চারজন কর্মী মাঝে মাঝে তাঁতি চালাইত—চরকার সূতা কাটিত—তাহাদের মনও দিমিয়া গিয়াছে। তাহারা তো জেলে যাইতে যে-কোন তাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু মহাত্মা যে সে পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এমনি নানা চিন্তায় অজয়ের দিন কাটিতে লাগিল।

রায়দের বাড়ির উল্লাস কলকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়িত। পুজার ছুটিতে বাড়ি আসিলে তাহার সহিত অজয়ের পরিচয় হইয়া গেল। উল্লাস নতুন নতুন বায়ামের কৌশল জানে—ভাল লাঠি খেলিতে পারে—ছোরা খেলিতে পারে—তরোয়ার ভাঁজ জানে। চমৎকার স্বাস্থ্য তাহার। অজয় কয়েকদিনের ভিতরে তাহার সহিত ভাব জমাইয়া ফেলিল। উল্লাস দাদার মত লাঠি খেলা, ছোরা খেলা তাহাকে শিখিতে হইবে—তাহার মত শরীরটা তাহার তৈরী করিয়া লইতে হইবে। এই প্রলোভন অজয়কে পাইয়া বসিল। সেদিন বিকাল বেলা নদীর তীরে গাছের ছায়ায় বসিয়াছিল—উল্লাস আর অজয়। কতক্ষণ নানা প্রশ্নের পর অজয় প্রশ্ন করিয়া বসিল—আচ্ছা উল্লাসদা, আপনি কেন আন্দোলনে যোগ দিলেন না—আপনি কেন জেলে গেলেন না? উল্লাস নিম্পৃহভাবে জবাব দিল—আমার মত দুই একজন নাই বা গেল জেলে—কিন্তু এত যে হাজার হাজার লোক জেলে গেল স্বরাজ তাতে এলো কই? অজয় উত্তেজিত হইয়া বলিল,—আপনি কি দেশ ছাড়া? পরের উপর নিজের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে আজ এমন কথা আপনি কেমন করে বলছেন দাদা? হাজার হাজার লোক জেলে যাওয়াই কি এমন একটা বেশী হলো? যে দেশে ত্রিশ কোটি লোক—সে দেশের কোটি কোটি লোকের তো এমনি করে জেলে যাওয়া উচিত ছিল। হয়তো তাহলে স্বরাজ এসে যেতো। উল্লাস হাসিয়া বলিল—তোমাদের ঐ স্বরাজের মানে আমার বুঝতে পারিনে ভাই! ওটা সেনার পাথর বাটী। ইংরেজ থাকবে দেশের রাজা, তারই অধীনে খানিকটা অধিকার লাভ করে গড়ে তুলবে স্বরাজ! এই তো নেতাদের স্বরাজের মানে! অজর আশ্চর্য হইয়া বলিল, কিন্তু মহাত্মা যে বলেছেন এতেই দেশের মণ্ডল হবে। উল্লাস কি যেন ভাবিয়া লইয়া বলিল—মহাত্মার সব কথা আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনে ভাই। তবে সারা দেশ যে তাঁর কথার মেতে উঠেছে, এটা কেউ অস্বীকার

করবে না। তা ছাড়া আমাদের নিষেধ ছিল ভাই।

—কিসের নিষেধ।

উল্লাস বলিল—তোমার কাছে বলতে বাধ্য নাই, কিন্তু এসব কাউকে বলো না যেন। দেশে আরও স্বদেশী দল আছে অজয়—তারা সত্যি সত্যি স্বাধীনতা চায়—ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়িয়ে নিয়ে নিজেরা দেশ শাসন করতে চায়। কিন্তু তাই বলে তারা কংগ্রেসের মত অহিংসা মেনে চলে না। দরকার যদি হয় গুলী, গোলা, বন্দুক পিস্তল দিয়ে যুদ্ধ করে তারা দেশকে স্বাধীন করতে চায়। অসি কাকার ছেলে তুমি অজয়—অসিকাকা ছিলেন এই দলের একজন নেতা। তাই বলে এরা গান্ধীজীর আন্দোলনে বাধ্য দেন নাই—অনেকে এই আন্দোলনেও যোগ দিয়েছেন। আমার উপর নিষেধ ছিল—কোন কথার অবাধ্য হওয়ার উপায় আমাদের নাই। অজয় পরম উৎসাহিত হইয়া বলিল—আমার বাবা ছিলেন এই দলে—আপনি ঠিক জানেন দাদা!

উল্লাস হাসিয়া বলিল—হাঁ ঠিকই জানি ভাই।

—আমিও এই দলে যোগ দেব দাদা—আমিও বন্দুক ছুড়বো, পিস্তল ছুড়বো। নেবেন আমাকে? আপনার পায়ে পড়ি দাদা!

উল্লাস বলিল—সময় এখনও হয় নাই ভাই—আরও একটু বড় হও নিশ্চয় তোমার ডাক পড়বে!

অজয় ক্ষুর হইয়া বলিল—কবে আমার বয়স হবে দাদা! স্বদেশী আন্দোলনের ভুলে-টিয়ার আমি হতে পারলাম না—আপনার দলেও আমি ঢুকতে পারবো না। এমনি করে কোন কাজেই যদি না লাগি—কি হবে বেঁচে থেকে!

উল্লাস হাসিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন—পাগল! সময় এলে কত কাজ করতে পার দেখা যাবে অজয়। কয়েক দিন পরে উল্লাস একদিন অজয়কে তাহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া নানা কাগজপত্রের ভিতর হইতে খুঁজিয়া একখানা ফটো বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল—দেখতো অজয় এর ভিতরে কাউকে চিনতে পার কিনা? সারি বাঁধিয়া বারজন লোক দাঁড়ইয়া আছে—পারদানে তাহারের ছোট এক টুকরা করিয়া কাপড়—হাতে হাত কড়া পায়ে শিকল। কে ইহারা—অজয় অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই দিকে তাকাইয়াও কিছই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। উল্লাস হাসিয়া বলিল—চিনতে পারলে না কাউকে অজয়? পরে সকলের প্রথম ব্যক্তিটিকে দেখাইয়া বলিল—দেখতো একে ভাল করে। সেই দিকে পুনরায় কয়েক মূর্ত্ত তাকাইয়া অজয় চেঁচাইয়া উঠিল—চিনেছি উল্লাসদা—চিনেছি—এ যে আমার বাবা! অজয় দুই



চোখের দৃষ্টি একেবারে ছবিখানার উপরে নিঃশেষে চালিয়া দিয়া তাহার প্রতিটি রেখা প্রতিটি বর্ণ যেন নিজের অন্তরের ভিতরে গাঁথিয়া লইতেছিল। দেখা সারা হইলে ফটোখানা কপালে ঠেকাইয়া কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। উল্লাস এতক্ষণ একটা কথাও কহে নাই—এখনও কিছ্ কহিল না — শূন্য নিঃশেষে নয়নে অজয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। কতক্ষণ পরে ধীরে ধীরে অজয় ডাকিল—দাদা! উল্লাস বলিল—কি ভাই!

ফটোখানা কিন্তু অমায় দিতে হবে দাদা।

—বেশ—দিলাম তোমায়, কিন্তু খুব সাবধানে রেখো ভাই। আমি অনেক চেষ্টা করে সংগ্রহ করেছি। অসি কাকাদের যখন আন্দামানে নিয়ে যায়, তখন গঙ্গার ঘাটে তাদের জাহাজে তোলার আগে সারবন্দী করে দাঁড় করিয়েছিল, তখন সমিতির কোন লোক দূর থেকে চুরি করে ফটোখানা তুলে নেয়।

—হাঁ আমার মনে পড়েছে দাদা—সেই যে বাবার সঙ্গে আমার শেষ দেখা করে এসেছিলাম—সে কথা আমি ভুলিনি। বাবার সে মূর্তি আমার মনে আছে। উল্লাসের ঘর হইতে বাহির হইয়া ফটোখানা জামার নীচে করিয়া বুকের উপরে চাপিয়া ধরিয়া অজয় যখন পথ চলিতেছিল, তখন এক অদ্ভুত আনন্দে বুক তাহার ভারিয়া উঠিতেছিল। তাহার বাবার ছবি! কত বড় বীর তাহার বাবা—কত বড় স্বদেশভক্ত তিনি!

বিকালবেলা অজয় মাকে ঘরের ভিতরে

ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিল—তোমাকে একটা চমৎকার জিনিস দেখাবো মা।

কল্যাণী হাসিয়া বলিল—কি জিনিসের, অজয় নিজের বুকের ভিতরে হইতে ফটোখানা বাহির করিয়া মায়ের হাতে দিয়া হাসিয়া বলিল—দেখ তো মা কার ছবি! ফটোখানার উপরে একবার মাত্র চোখ বুলাইয়া লইতেই কল্যাণীর বুক দুর্দ দুর্দ করিয়া উঠিতে লাগিল। কতক্ষণ একটু কথাও কহিতে পারিল না—শূন্য নিঃশেষে নয়নে ছবিখানার দিকে চাহিয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে নিজের বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিল—এ ছবি তুই কোথায় পেলি অজয়! অজয় তাহার প্রশ্নের জবাব না দিয়া বলিল—বাবাকে তুমি চিনতে পেরেছো তো মা? এই দেখ সকলের আগে দাঁড়িয়ে তিনি! আমি কিন্তু প্রথমে ঠিক পাইনি মা—কতক্ষণ তাকিয়ে তার পরে চিনতে পারলাম। কতদিন বাবাকে দেখিনি বলতো—হঠাৎ কি এমনি করে চিনতে পারা যায়?

—কিন্তু আমার কথার তো জবাব দিল না বাবা—কার কাছে পেলি ছবি? অজয় কিছুটা দ্বিধা করিয়া পরে মায়ের কানের কাছে মুখ লইয়া আসিয়া বলিল—তোমার কাছে তো না বলে পারবো না মা। কিন্তু খুব গোপন কথা—কেউ যেন না শোনে—আমাকে কারুর কাছে বলতে নিষেধ করে দিয়েছে। ও পাড়ার উল্লাসদাদাকে চেনো তো। তিনি কলকাতায় পড়েন। তিনি বাবা যে স্বদেশী দলে ছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে এখানা সংগ্রহ করে এনেছেন। তাদের লোকেরা খুব গোপনে

জাহাজ ঘাট থেকে বাবার ছবি তুলে এনেছিল। খুব ভাল করে তোমার জামা কাপড়ের বাস্ত্রে তুলে রাখ মা। অজয় তাহার পাশে বসিয়া আরও কত কি বলিয়া যাইতেছিল — কতক তার কল্যাণীর কানে গেল—কতক গেল না। দুই চোখের দৃষ্টি তাহার ফটোখানার উপরে নিবন্ধ ছিল বটে, কিন্তু মন চলিয়া গিয়াছিল দেহ ছাড়িয়া কোন অজানা দূরতম দেশে। এই দেশের দক্ষিণে সমুদ্র—সেই সমুদ্র পাড়ি দিলে তবে সেই আন্দামান দ্বীপ। কি ভয়ঙ্কর স্থানই না জানি সে দেশ। সেখানেই বন্দী হইয়া কত না দুঃখে, কত না কষ্টে দিন তাহার কাটিতেছে। দেহ তাহার শুকাইয়াছে—মাথার চুল রুদ্ধ হইয়াছে—উজ্জ্বল বর্ণ কালি হইয়া গিয়াছে। এত দিন দুঃখের আগুন পড়িয়া পড়িয়া চোখের জল কল্যাণীর বাষ্প হইয়া উড়িয়া গিয়াছিল। তাই চোখের কোণ বাহিয়া এক ফোঁটা অশ্রুও গড়াইয়া পড়িল না। কিন্তু বুক তাহার দ্রুততালে লাফাইয়া লাফাইয়া উঠিতে লাগিল। কল্যাণী বিছানার উপরে শুইয়া পড়িয়া চোখ বুজিল। অজয় মায়ের মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিল—কি হলো মা—শরীর খারাপ লাগছে?

কল্যাণী তেমনি করিয়া জবাব দিল—হ্যাঁ, বাবা।

—একটু বাতাস করি মা।

—কর।

অজয় পাখা লইয়া মায়ের কোলের কাছে বসিয়া তাহার মাথায় বাতাস করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ

## শঙ্কা

শ্রীসুনন্দা সেন

রূপালী সন্ধ্যা নেমোছিলো এই বনে,  
উইলোর পাতা হেসেছিলো মৃদুহাসি,  
সেইক্ষণে প্রিয় গহনের কোন কোণে,  
মধুরের সুরে বেজেছিল তব বাঁশী?

আজ এ নিশীথে অযুত তারার তলে,  
মনে পড়ে হায় কত গান কত কথা।

সাগরের বৃকে লক্ষ মাণিক জ্বলে—  
তবু তার মাঝে গুমরি উঠিছে ব্যথা!

যা পেয়েছি তার হারাবেনা কিছু জানি,  
কেন বাজে হায় বেদনার ঝঙ্কার,  
মনের মাঝারে পেয়েছি যে তব বাণী,  
তবু ভয়ে মরি অজানা সে শঙ্কার।



# গোলাম সৈনিকের জঙ্ঘা **আজাদী ফৌজ**

শ্রীকৃষ্ণ কুমার পাল

ভূমিকা

[জয় হিন্দ! বন্ধুগণ, আজাদ হিন্দ ফৌজের অমর কাহিনী আজাদী সৈনিকের মূখে আপনারা শুনেছেন। এবারের যুদ্ধে আমি ছিলাম তাঁদের বিপক্ষে। বিপক্ষের লেখনীতে ভারত মাতার ঐ বীর সন্তানগণের ইতিহাস এবং আদর্শ খর্ব হতে পারে, তবু অসীম সাহস নিয়ে আমি কিছু লিখলাম। ভালমন্দ বিচারের ভার আপনাদের হাতে।

মণিপুরের যুদ্ধে আমি ছিলাম। ভাই ভায়ের সাথে মারণাস্ত্র নিয়ে লড়েছি। কিন্তু সবই অজ্ঞাতসারে। দু' ফালং দু'রে পাহাড়ের ওপর পিঠে আজাদী সৈনিক যে আমাদের পরাধীনতার প্লানি ঘুচাতে জীবনমরণ পণ করে যুদ্ধ করতে এসেছিল তা

ব্রিটিশ ভারতীয় সৈনিকের জানা ছিল না। একটি জাপানী বধ করে মনে করেছিলাম, আমরা শুধু জাপানীদের সাথেই লড়াই। এখন বেশ বুঝতে পারছি, যেদিক থেকে জাপানী রেজিমেন্ট আসছিল, শুধু সেই দিকেই আমাদের পাঠানো হয়। রাণী বাঁসি বাহিনী বা আজাদী বাহিনীর সংস্পর্শে গুরুত্বপূর্ণ ক্যাডীত আমাদের কাউকে যেতে দেওয়া হয়নি। ব্রিটিশ কন্টিনেন্ট কৌশল মণিপুরের জঙ্গলে কেমন করে জয়লাভ করেছে আমি শুধু তাই দেখাবার চেষ্টা করেছি। মণিপুর ও সিংগাপুরের যে-সব ঘটনা আমার মনে উর্কি মারছে এবং আমি যা নিজের চোখে দেখেছি তাই ব্যক্ত করলাম।]

**আগস্ট** বিপ্লবে যখন কলেজ ছেড়ে ধর্মঘটে যোগ দিই তখন কম্পনাও করতে পারিনি যে ঠিক এক বছর পরে আমি একজন পাকা সৈনিক সাজব। সাতদিন কারাবাসের পর আমাকে নির্দেশ বলে ছেড়ে দেওয়া হল। সারা ভারতই যে একটা জেলখানা এ সত্যটা চোখে পড়ল এই প্রথম। কিন্তু আগস্ট আন্দোলনের মূল দুর্বলতাটাও খানিকটা দেখতে পেরেছিলাম। সুতরাং বাইরে এসে অস্বাস্থ্য বেড়েই উঠল। কেবল নিছক ভাবালুতার জ্বিলন্তে আমাদের মত অকেজোদের দিয়ে জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে না এ সত্যটা যতই বেশী চোখে পড়তে লাগল ততই ছটফটানিও বেড়ে যেতে লাগল; মনে হল এর চেয়ে যুদ্ধে গিয়ে একটা কিছু শিখে আসা ভাল। মতলবটা কাজে পরিণত করতে দেরী হল না। নাম লেখানো আর warrant নিয়ে গাড়ীতে চেপে বসা, মাঝখানে আত্মীয়স্বজনের একটু কান্নাকাটি এইমাত্র।



সিংগাপুর বিমানঘাঁটিতে নেতাজী সূভাষচন্দ্র

মধ্য প্রদেশে শিক্ষা কেন্দ্র কাটনীতে কিছুদিন রাইট লেফট আর রাইফেল নাড়াচাড়ার পরই হুকুম হল চলো মণিপুর। কাটনী থেকে লাহোর তারপর একেবারে বাঙলার সুন্দরপ্রান্ত ময়মনসিংহ হয়ে চাটগাঁয়ে গিয়ে আমার ইউনিটের সাথে দেখা হল। ওটা ইম্ফলের কাছে কাংগাটংবিতে ছিল। হঠাৎ আদেশ হল আরাকানে যেতে হবে। আমরা আরাকান দিয়ে জাপানীদের ওপর আক্রমণ চালাব। অবশ্য যুদ্ধ করা আমার কাজ নয়। আমার কাজ হল সাংসাই দেওয়া—কাপড়-চোপড়, গোলাবারুদ, মোটরগাড়ী ইত্যাদি (Ordnance Store) তবে যুদ্ধ বিন্দ্য

সবাইকে শিখতে হয়। বন্দুক চালায়ে পরীক্ষা পাশ করতে হয়। সেটা আমিও করেছি। এ শিক্ষা শুধু আত্মরক্ষার জন্য। অর্থাৎ বিপদ এসে গেলে নিজেকে বাঁচাতে হবে।

শোনা গেল জাপানীরা লড়াই ব্যাপারটাতে আমাদের চেয়ে ওস্তাদ। সুতরাং হুকুম হল গোলাবারুদের শিক্ষা আমাদের আরো নিতে হবে। যেই হুকুম সেই কাজ। ট্রেনিং চলল পুরো মাত্রায়। ফাগুনে মাস—কিন্তু তখনই বেশ গরম পড়েছে চাটগাঁয়ে। ট্রেনিং নিতে গিয়ে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। ট্রেনিং ট্রেনিং—কি জন্যে, কার জন্যে, কোন প্রেরণা

নেই পেছনে—কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়? আমাদের ইউনিটের সর্দার জলিল সাহেব, মজিদ সাহেব ও ভূঁয়ার অবস্থা দেখে বড়ই করুণা হত।

ফেব্রুয়ারী প্রায় শেষ হয়ে গেছে। একদিন খোদ ব্রিগেডিয়ার সাহেব এসে উপস্থিত। আমাদের নাকি একটা গোপনীয় বক্তৃতা দেবেন। আমরা সবাই হাজির। তিনি বললেন “আমি তোমাদের আরাকানে পাঠাবার জন্য মণিপুর থেকে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু আমি দুঃখিত যে তোমাদের আবার মণিপুরের কাংগাটংবিতে ফিরে যেতে হবে। আমাদের আক্রমণে পূর্বক্ষেণে জাপানীরাই আরাকান আক্রমণ কতে ফেলেছে। তাই আমাদের offensive নেওড়া হল না। এখন শুধু আত্মরক্ষা করতে হবে। “The aggression policy of our commander and that of the enemy have coincided. And that is not uncommon in history.”

অর্থাৎ শত্রুপক্ষের আক্রমণ নীতির সাা আমাদের আক্রমণ নীতি মিলে গেছে। এ এরকম উদাহরণ যুদ্ধের ইতিহাসে বিরল ন অতএব তোমরা মনক্ষুদ্র না হয়ে কাংগাটংবি আবার ফিরে যাও এবং পুরোদমে কাজ ক আমি একদিন না একদিন তোমাদের সিংগাপ পাঠাবই পাঠাব।”

ব্রিগেডিয়ার সাহেবের ওজস্বিনী বধ শুনে বুঝতে বাকী রইল না যে বারোটা মে গেছে। কিন্তু সে যাই হোক, তাঁর শে কথাটা শুনে আমরা—ভারতীয়রা—সবাই এ মূঢ়কে হেসেছি। আমি ও শিব একটু মন্তব্য করতেও ছাড়িনি। শেষটায় ি ঘটনার দ্রুত পরিবর্তনে তারই কথা গিয়েছিল। আমাদের মন্তব্য নিছক মন্ত

মধ্যে স্থান পেল। একেই বলে 'নির্য়তি কেন বাধাতে।'

আমরা ফিরে চললাম আপন ঘরে। ২রা মার্চ, '৪৪ সাল মণিপুরের দিকে রওয়ানা হলাম। স্পেশাল গাড়ী - ফিস্ ফিস্ করে চলল। কিন্তু পেছনে ফেলে গেলাম ৪০ বছরের বড়ো চ্যাটার্জি'দাকে। বিদায়ের বেলা চ্যাটার্জি'দা চোখের জল ধরে রাখতে পারলে না। অথচ চার পাঁচ মাসের পরিচয় মাত্র! কে জানত যে সে আমাদের এতটা স্নেহ করে।

গাড়ী মণিপুরের দিকে ছুটে চলেছে। এর আগে আমি আর মণিপুর যাইনি। শূন্যে মণিপুর শব্দ পাছা জুগলে ভর্তি। এছাড়া আর কিছুই জানা ছিল না। এবার মণিপুর দেখার সুযোগ পাব এই ভেবে আনন্দ হল। কলেজ জীবনে আমার এক বন্ধু তাদের মণিপুরের রাজা ও রাজবাটীর কথা প্রায়ই আমাকে বলত। সেই বন্ধুটির কথা তখন মনে পড়ল।

পরিদর্শন বেলা দুপুরে সায়েস্তাগঞ্জে এলাম। বাড়ী আমার কাছেই। উর্গিক বৃষ্টি দিলে হাত কাউকে দেখতে পাব এই আশায় বাইরে এসে ডাক্তার গিরীনবাবুর সাথে দেখা হল। অকস্মাৎ আমাকে সৈনিকের বেশে দেখে ডাক্তারবাবু একটু থমকে দাঁড়ালেন। বললেন “একি, কোথায় যাবেন?” অতি সংক্ষেপে জবাব দিলাম “মণিপুর”। আমরা কোথায় যাই কোথা থেকে আসি সেটা বলা অপরাধের মাঝে গণ্য। তাই কানে কানে তাকে বলছি “মণিপুর”। মাকে জানিয়ে দেবেন আমি মণিপুরে থাকব। চিন্তার কিছুই নেই। কথা শেষ হতে না হতেই হুইসেল বেজে গেল। গিরীনবাবু দৌড়ে এসে এক ঠোঙাবোকাই মিষ্টি দিয়ে গেলেন। বন্ধুদের নিয়ে খুব করে মিষ্টি খাওয়া হল। একটি মাদ্রাজী বন্ধু রহস্য করে টিম্পনী কাটলেন—“ভুললোকটি বেশ বৃষ্টিছেন যে ফ্রন্টে গিয়ে আমরা আর না-ও ফিরতে পারি, তাই মিষ্টি মুখ করিয়ে দিলেন।”

গাড়ী আমাদের গরুর গাড়ীর সঙ্গে ভাল রেখে চলেছে। ৫ই মার্চ ১টার ডিমাপুর পৌঁছল। কাছেই ছিল রেন্ট ক্যাম্প। খাওয়া দাওয়া সব ওখানেই হবে। তাই পোটলা পুটলি সব নিয়ে পায়দল মার্চ করে রেন্ট ক্যাম্পে গেলাম। বড় ক্রিকে পেয়েছিল। আমি প্লেট পেয়লা নিয়ে সবার আগে ‘লংগরে’ গিয়ে হাজির হলাম। খাওয়া হল—যেন সাপে আধার খেয়েছে।

ডিমাপুরে দু দিন কেটে গেল। কাংগা-টংবি ওখান থেকে ১১৭ মাইল দূর। পাহাড়ীরা রাস্তা—শব্দ অকাবাকা। সবাই মোটর গাড়ীর অধীর প্রতীক্ষায় আঁচ। এমন সময় একজন বন্ধু এসে বললেন, “শূন্যে, জাপানীরা নাকি



সিংগাপুর বিমানঘাঁটিতে নেতাজীর সর্বপ্রথম অবতরণ

মণিপুরও আক্রমণ করেছে। টিডিম, টাম, পেলেল সব দিকেই ঘেরাও করে ফেলেছে। আবার শোনা যাচ্ছে কোহিমার অতি কাছেই নাকি ওরা এসে গেছে।”

খবরটা খুব অপ্রত্যাশিত ছিল না। তাই চমকে উঠিনি। “তোমরা কাংলাটংবিতে ফিরে যাও” ঐকথা শুনতেই বৃষ্টি বাকী ছিল না যে শত্রুর আক্রমণ মণিপুরের দিকেও হবে। বিশেষ করে এবারের যুদ্ধে সাঁড়াশি আক্রমণ শত্রুদের অনেক সহায়তা করেছিল। আরাকান আক্রমণ হলে মণিপুর আক্রমণ অনিবার্য, এ ধারণা চাটগাঁ থেকেই নিয়ে এসেছি। কিন্তু মণিপুরে আসতে না আসতেই বিপদ যে এতটা ঘনিষ্ঠ যাবে তা কল্পনা করতে পারিনি। খবরটা অবিশ্বাসও করা যায় না। কেন না খবরদাতা একজন উচ্চপদস্থ বন্ধু। অবশ্যি শ্বেতাঙ্গ। “যা হবার হবে” এই সাক্ষ্য নিয়েই আলোচনার যবনিকা পাত হল। কিন্তু এর আগে বহুবার বন্ধুটি জাপানীদের নৃশংস অত্যাচারের কথা উল্লেখ করে গেলেন। কথায় কথায় ওদের গালি দিলেন। তাতে পরিষ্কার বোকা গেল যে জাপানীদের নাম শুনতে উনি ঘাবড়ে গেছেন। ঘাবড়ে হাবার কথাই। শ্বেতাঙ্গদের প্রতি জাপানীদের অমানুষিক অত্যাচারের কথা বহুবার আমাদের জানানো হয়েছে। আমি শ্বেতাঙ্গ হলে আমারও একটু ভয় হত। যে যোর জুগলে ঢুকব সেখান থেকে বেরিয়ে আসা তো হবেই না বরং জাপানীদের হাতে বৃষ্টি বন্দী হব। আর শ্বেতাঙ্গ হয়ে বৃষ্টি বন্দী হওয়ার চেয়ে মৃত্যুই ভাল, এই ভীতি অনেকেরই ছিল। তাই আমার বন্ধুটির ঘাবড়ে যাওয়ায় খুব

দোষনীর বলে মনে করতে পারি না। ভারতীয়দের একটা বিশেষ আশার কথা ছিল যে জাপানীরা নাকি ভারতীয়দের প্রতি এতটা খারাপ ব্যবহার করে না। শব্দ তাদের হুকুম তামিল করলেই হল। এ রকম নানা কথা শুনতে আমাদের একটু আশা হল। তারপর সবার ওপর এই সাক্ষ্যনা ছিল যে বৃষ্টি বন্দী হলেও তো বাড়ীর কাছেই থাকব। এমন কি বাড়ীর আশপাশই হবে তখন আমাদের কর্মস্থল।

গাড়ীর যোগাড় হল। আমরা ‘কনডর’ করে রওয়ানা হলাম। গাড়ীর সংখ্যা এক শতেরও উপর ছিল। ৫ই মার্চ ভোর পাঁচটা। সোঁ সোঁ করে গাড়ী চলল। আমার গাড়ীতে আমিই ছিলাম সর্ব সর্ব।

নূতন রাস্তা, চারিদিকে গগনভেদী পাহাড়, কোথাও হয়ত ছোট একটি পাহাড়ীরা নালা, আর সেই নালায় ধার দিয়ে আকাবাকা পথ পথিকের চিত্ত বিনোদন করে। বিশেষ করে বঙ্গদেশের বাঙালী বন্ধুগণ ঐ রকম প্রাকৃতিক দৃশ্যের খুব উচ্চ প্রশংসা করেছেন। সেক্সপিয়রের কথায় Love at first sight অর্থাৎ প্রথম দর্শনেই প্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু Last sight পুষ্পস্ত যে ঐ Love বজায় থাকবে না সে অনেকেরই বৃষ্টিতে পাবেন নি। মণিপুরের জুগলে যে মশক সৈন্য বাহিনী রয়েছে তাদের আক্রমণ নিষ্পন্ন গরিলার চেয়েও কম ছিল না। হুল ফোটতে ওরা বুনো ওস্তাদ। মণিপুরের প্রকৃতির সাথে প্রেম তাই অটুট থাকে না। শেখটার মনে হত এ যেন “গুস্ত ঘনেন” গহ্বরে পড়ে আছি। আলো নেই, বাতাস নেই, শ্বাসরোধ হয়ে আসে। পালালেই বাঁচি। অবশ্যি আলো বাতাসের

জন্য মণিপুর দায়ী নয়। দায়ী আমাদের বোমা-প্রফ জঙ্গল বাসস্থান।

যাবার পথে কোহিমা দেখে গেলাম। শিলং-এর মতই মনে হল। টিলার ওপর ঘরবাড়ী। আশেপাশে বসতিহীন টিলাগুলো গাছপালায় ভর্তি। বৃন্দাটী বলাচ্ছিল—কোহিমা-তেও শত্রুর আবির্ভাব হয়েছে—তাই সন্দেহ দৃষ্টিতে কোহিমার দিকে তাকিয়েছি। মনে হল থমথমে ভাব।

১০ মাইলের কোঠায় আমার গাড়ীখানা খারাপ হয়ে যায়। ড্রাইভার আমার একেবারে বোকারাম। সে শব্দ গাড়ী চালাতেই জানে কলকলস্কার ধার সে ধারে না। গাড়ী তাই আটকা পড়ল। সারারাত গিয়ে সকাল বেলা এক ভদ্রলোক এসে আমার গাড়ীখানা ঠিক করে দিলেন। আমরা বেলা দশটার কাংগলা-টংবিতে পেঁছলাম।

আমি কাংগলা যাওয়ার বহু আগে অনেকেই কাংগলা পেঁগছে গিয়েছিল। আমি গিয়ে দেখি সবার মুখেই বিষাদ লেগে আছে। কারণ কিছু বোঝা গেল না। তারপর দুজনকে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলতে শুনলাম। সেই কথা—যা ডিমাপুরেও শুন্য এসেছিঃ “এবার আর কি হবে ভাই? নির্ঘাতি যুদ্ধ-বন্দী” ইত্যাদি।

ওপর থেকে হুকুম পেয়ে সবাই মরিচা (ট্রেণ) খুঁড়তে তৎপর হয়ে উঠল। মুখে কারো হাসি নেই, প্রাণের মায়া আছে তো? পাহাড়িয়া মাটি পাথরে ভর্তি। একটি মরিচা খোদাই করতে গিয়ে প্রাণান্ত হতে হয়। কণ্টের অবধি নেই, তবু ছোট বড় সবাই কাজ করে যাচ্ছে—আমি আর যাই কোথায়? ভাণের চুটি করিনি। তবু কিছু করতে হল।

কাংগলার ঘোর জঙ্গলে ছন বাঁশের তৈরী ব্যারাকে আমাদের আস্তানা গাড়া হল। আমাদের ব্যারাক থেকে সদর রাস্তা ৫০০ গজের অধিক হবে না। তবে ছোট ছোট গাছ দিয়ে ঢাকা ছিল বলে রাস্তা থেকে কিছুই দেখা যেত না। চারিদিকে পাহাড়; তারই পাদদেশ দিয়ে ঐ ইম্ফল-ডিমাপুর রাস্তা গিয়েছে। কিন্তু দিনরাত ধরে ঐ দিকে যারা আসা যাওয়া করে তারা খবরই পায় না যে এত বড় একটা বিরাট ডিপো জঙ্গলের ভেতর পড়ে আছে।

সেনদার সাথে আমার তখনই প্রথম দেখা। ভাইটি আমার বহুবিন্দ্য বিশারদ। অনেক ভাষা জানে। মণিপুরের ঘোর জঙ্গলে সে একটি ছোটখাট সংসার তৈরী করেছিল। আত্মীয়স্বজন সবাই পাহাড়িয়া—নাগা, কুকি ও মণিপুরী। কুকিদের সঙ্গে তার সব চেয়ে বেশী জমেছিল। কুকিরা তার জন্যে খাবার তৈরী করে ডিপোতে পাঠিয়ে দিত। সেনদার

কোন অসুখ হয়েছে শুনলে কুকিরা প্রাণপণে তার শত্রুতা করত। সেনদার মুরগী প্রীতির কথা অনেকেই জানে। প্রায় ২০০ মুরগীর হাট ছিল। আমি তার মুরগী খুব খেয়েছি। তাই না বলে পারলাম না।

সেনদা প্রায়ই কুকিদের বাড়ীতে আসা যাওয়া করত। সে আসা যাওয়ার মাঝে নিছক স্নেহ মমতার বন্ধন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু সে এক আখ্যা পেয়ে যায়—fifth columnist গুস্তচর। আর সে আখ্যাকে নির্ভর করে ৭।৮ মাস পরে তাকে সৈন্য বিভাগ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। সে যদি সত্যিকারের গুস্তচরের কাজ করত, তাহলে আজ ভারতের বীর সন্তানদের অন্যতম বলে



মহারাষ্ট্রাঙ্গানের কোন এক স্থানে নেতাজী গুডাবচান্দ

গণ্য হত। আমরা মণিপুরের জঙ্গলে যার বিরুদ্ধে শত্রু বলে লড়াই করছি সে যে শত্রু নয় তা তো জানা ছিল না। তাই বসি সেনদার গুস্তচরের কাজে শত্রু সহায়তা না হয়ে আমাদের জাতীয় সৈন্যেরই সাহায্য হত।

আমরা অজ্ঞাতসারে আজাদ সৈনিকের সাথে লড়াইছি। আজ একথা জলের মত পরিষ্কার। তবু আই এন এ'র উল্লেখ না করে আমি ‘শত্রু’ শব্দই ব্যবহার করব। কেন ‘শত্রু’ শব্দ ব্যবহার করব তা শ্রীকগণ পরে বিচার করবেন।

যাক, কুকিদের কাছ থেকে সেনদা শত্রু আগমন বার্তার তাজা তাজা খবর নিয়ে আসত। মার্চ মাসের ২০।২৫ তারিখ খবর পাওয়া গেল জাপানীরা কোহিমা দখল করে ডিমাপুর রাস্তা অবরুদ্ধ করে ফেলেছে।

সবার মুখেই একটা আতঙ্কের আভাষ কুটে উঠল। অথচ কাগজে পড়ে জানা যায় কাংগলা থেকে প্রায় ১৫০।২০০ মাইল দূরে টিডিম, টামুতে যুদ্ধ চলছে। জাপানীরা যে কোন রাস্তা দিয়ে কোহিমায় ঢুকেছে সে অনেকেই জানত না। খবরটা তাই বিশ্বাস হয়েও হল না।

একদিন যেতে না যেতেই সপ্তাহ ঘটে গেল। কোহিমা ছিল আমাদের পেছনে,—কিন্তু টিডিম, টামু, সম্মুখের দিকে বহুদূরে। জাপানীরা ডিমাপুরের রাস্তা কেটে দেওয়ায় কোহিমার আশে পাশে থেকে গাড়ী গাড়ী বোঝাই মাল আমাদের ডিপোতে আসতে থাকল। টিডিম, টামু থেকেও তাই। ঐদিক থেকে জাপানীরা এগিয়ে আসছিল, তাই হরদম আমাদের ডিপোতে মাল আসছে। এখন কোহিমা ও টিডিম, টামুর মাঝখানে পড়ে আমাদের প্রাণান্ত অবস্থা। পেছন ও সামনে দুদিক থেকেই গাড়ী আসছে। এবারে পরিষ্কার হয়ে গেল যে সত্যি সত্যিই বিপদ ঘনি়ে এসেছে।

হুকুম হল কাটা তার দিয়ে সমস্ত ডিপো ঘেরাও করতে হবে। আদেশ পালন করা হল। তারপর সামরিক কাষদায় কেমন করে ডিপো পাহারা দিতে হবে, কে কোথায় থাকবে, কার কোন কাজ হবে সবই বলে দেওয়া হল।

সেনদাকে জিজ্ঞেস করলাম “কি হে, তোমার কুকিরা কি বলে?”

ওরা সব খবর ঠিকই দিয়েছিল। কিন্তু জাপানীদের মাঝেও যে আমাদের আজাদ হিন্দের বীর সৈনিকগণ ছিলেন সে কথা বলতে পারেনি। তারা শুন্যে জাপানীরা আসছে। তাই মনে হয় শত্রুপক্ষের সবাইকে ওরা জাপানী বলে জানত। তবে মজার কথা এই যে, বেতাঙ্গদের ফিস্ ফিস্ করতে শুন্যি— “The bloody Jips are also fighting” বর্মার বন্দী যে সব ভারতীয়গণ জাপানীদের পক্ষ নিয়ে লড়াইছেন তাদের আমাদের কাছে ‘জিপ’ বলে প্রচার করা হত। ভাগ্যের পরিহাস এইখানেই। এই ‘জিপস্’ই যে আজাদ হিন্দ সৈনিক তা কল্পনাও করতে পারিনি। অথচ তাদের ও আমাদের মাঝে তফাৎ ছিল মাত্র ২।৩ ফার্ন-এর। পাহাড়ের একপাঠে ওরা অন্য পাঠে আমরা। তবু জানার সুযোগ ছিল না যে ভাই ভাইয়ের সাথে হাতিয়ার নিয়ে লড়াই। কে জানত যে স্বাধীনতার বাণী নিয়ে শত দুঃখ কষ্টকে পায় দলে ওরা এসেছিল আমাদের মুক্তি দিতে? কে জানত যে নেতাজীর স্পর্শ পেয়ে ওরা গেয়ে চলেছে— “কদম্ কদম্ বাড়িয়ে যা—?” কে জানত যে নেতাজী ওদের শিখিয়ে দিয়েছেন—

“And in our last sleep we shall kiss the road that will bring our Army to

Delhi. The road to Delhi is the road to freedom. Chalo Delhi?"

১লা এপ্রিল খবর পাওয়া গেল শত্রু অতি কাছে। দু'তিন মাইল ব্যবধান মাত্র। বড় কর্তাদের মধ্যে কালো ছায়া। ক্যাপটেন সাহেব আমাদের ক'জনকে ডেকে বললেন—

"I tell you a secret. The enemies are not far off. You should not be in a panic. We are moving and moving to Imphal."

চক্ষের নিম্নেই সবকিছু গুটিয়ে নেবার আদেশ হল। শুন্য গেল আমরা পায়ে হেঁটে বিশেষপদুর রোড দিয়ে শিলচর যাব। ইম্ফলের জংগল থেকে বাইরে যাবার বাকী সবগুলো রাস্তা কেটে দিয়েছে। একমাত্র বিশেষপদুর রোডই তখন "নিরাশ আঁধারে আশার জ্যোতি।" কিন্তু ভাগ্যের এমনি ফের যে পরক্ষণেই খবর এল আমাদের যাওয়া হবে না। বিশেষপদুর রোডেও জাপানীরা এসে গেছে। 'ভাগ্যের ফের' কেন বললাম তা পাঠক পরে বুঝতে পারবেন। তবে এটুকু বলে রাখি, যদি বিশেষপদুর রোড খোলা থাকত তবে মণিপুরের পতন অনিবার্য ছিল। মণিপুরের বাইরে যাবার রাস্তা ছিল না বলেই আমরা লড়েছি, আর তাতেই ব্রিটিশ-ভাগ্যলক্ষ্মী হন সুপ্রসন্ন। যদি বাইরে যাবার সুযোগ থাকত তবে 'প্রাহিমাং মধুসূদন' বলে সবাই পালিয়ে আসত মণিপুর থেকে। এবং ফল কি দাঁড়াত তা না বললেও অনুমেয়। কুটনৈতিক যুদ্ধ কৌশলের দিক থেকে সবগুলো রাস্তা অবরুদ্ধ করা যে ভুল হয়েছিল তা আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন উচ্চ পদস্থ অফিসারও স্বীকার করেছেন। আমি তাঁর সাথে সম্পূর্ণ একমত।

আমাদের ইম্ফল যাত্রা সৈন্যদের মত বাদ পড়ে গেল।

২রা এপ্রিল, রাত্রি তখন ১টা। হঠাৎ হুইসেল বেজে উঠল। সবাই পূর্ব আদেশমত 'আরমারি' রুমের সামনে হাজির হল। শত্রু নাকি ডিপোর ভেতর ঢুকে পড়েছে। রাইফেল ও গোলাবারুদ দেওয়া হল—আমরা পাহারায় গেলাম। আমি তখন আটজন সেপাইর মাতব্বর। আমরা খালি হাতে জাপানী মারব। অস্ত্রশস্ত্র কিছুই নেই। নয়জনের মাঝে শত্রু একটি রাইফেল। আমি ওদের খুব আশ্বাস দিলাম। ওরা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় শত্রুর আগমন অপেক্ষায় লুকিয়ে রইল। শত্রুর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। আশ্রয় তাই বীরদর্পে সকাল বেলা ব্যারাকে ফিরে এলাম।

৩রা তারিখ শোনা গেল শত্রু আমাদের কাছ থেকে দু'তিন ফাং দূরে। কাংলার ডিপো ছেড়ে আমাদের এক মাইল এগিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে হবে।

এক বন্ধু এসে খবর দিলেন "ওহে শুনছে? একজন 'জিপ্' অফিসার আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। জাপানীদের সাথে কিছু ভারতীয় সৈন্য আছে। তবে ওদের অবস্থা

একেবারে নাজেহাল। জাপানীরা ওদের খুব সুখে রাখেনি। ওই একজন অফিসার পালিয়ে এসেছে আমাদের কাছে।" এ রকম নানা কথাই শুন্য গেল। কিন্তু কার কথা বিশ্বাস করব। এদিক ওদিক উভয় দিকের কথাই তখন শুন্য। সেনদার কুকিরা তখন জাপানীদের অধীনে। সেখানে যাবার সুযোগ নেই—নইলে তাজা খবর পাওয়া যেত।

৪ঠা তারিখ বিকাল ৫টা আমরা ডিপো ছেড়ে ৪১নং হাসপাতালে (I.G.H.) যাই। সে মাত্র ১ মাইল তফাৎ। সবাই এসে গেছে, কিন্তু সেনদাকে খুঁজে পাচ্ছি না। ঠিক সম্ভার

পরই মুরগী হাতে করে সেনদা এসে হাজির। মুরগী আনতে গিয়ে অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। আমরা ডিপো ছাড়তে না ছাড়তেই শত্রুরা ডিপোতে ঢুকে পড়েছিল। সেনদার ঐদিকে খোঁজ নেই। মুরগী তাকে আনতেই হবে অথচ অশ্রদ্ধার ঘনিয়ে এসেছে। মুরগীদের খুব সাবধানে ধরছে এমন সময় শত্রুদের আনা গোনা টের পেয়ে গেল। তখন সেই শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় চুপি চুপি গলি রাস্তা দিয়ে পালিয়ে এল। মুরগী তাকে খেতেই হবে—তাই প্রাণের চেয়েও মুরগীর মায়া বড়।

(কমঃ)

## কাশি ও সর্দির সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ঔষধ



পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহৃত হয়

এক মাসের জন্য

অর্ধ মূল্যে কনসেজন



এ্যান্ড প্রডাক্ট 22K<sup>1</sup> মেট্রো

রোল্ডগোল্ড গহণা

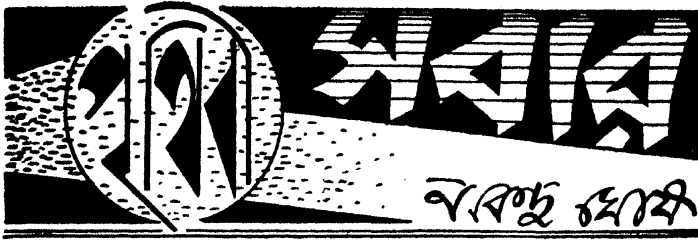
—গ্যারান্টি ২০ বৎসর—



চাঁদ-বড় ৮ গাছা ০০ স্থলে ১৬, ছোট—২৫, স্থলে ১০, নেকলেস অথবা  
মফচেইন—২৫ স্থলে ১০, নেকচেইন ১৮ একছড়া—১০, স্থলে ৬, জাটী ১টি—৮ স্থলে ৪,  
বোতাম এক স্ট ৪ স্থলে ২, কানপাশা, কানবালা ও ইয়াররিং প্রতি জোড়া ১ স্থলে ৬।  
আর্মলেট অথবা অনন্ত এক জোড়া ২৮ স্থলে ১৪। ডাক মাস্টল ৮, এক্রে ৫০, অলঙ্কার  
লইলে মাস্টল লাগতে না।

নিউ ইণ্ডিয়ান রোল্ড এণ্ড কার্ভেট গোল্ড কোং

১নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



[ ২ ]

‘তাইলে কি কইরতে হবি সিটি বুল্লা দে’  
—মংরা সব কিছুর বলে শব্দরের  
মুখের দিকে তাকাল।

সাঁওতালেরা মাথা নাড়ল, “হয়—সিটি  
বুল্লা দে।”

রসিক এবার মুখ তুলল, টেনে টেনে বলল,  
“জিমিদারে ডংকা দিয়াছে—বড়া কঠিন কথা  
জী—কঠিন কথা।”—

সোমা একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠল সর্দারের  
এই নিরুদ্ভাপ ভঙ্গী দেখে, নিস্তেজ কণ্ঠ  
শব্দে, সে বলল, “কঠিন কথা কি সহ্য লাগে  
নাকি—আঁ? হামাদের বাপদাদার আমল থিকা  
যিটি হয় আইসছে আইজ সিটি পলটাইবে  
কানে বা?”

মংরা তার গলার বাপের তন্তুটাকে দু'লিয়ে  
বলল, “না, তা হবে নাই সর্দার। হামাদের হক্  
হামরা ভোড়ব কানে? ইটি তো জিমিদারের  
অন্যায় আছেক।”

“অন্যায়!” রসিক মাঝি মোটা গলায়  
একটু হেসে উঠল, “জিমিদার—পরজার বাপ  
যাই সাই কামনে অন্যায় কইরতে? যদি করে  
ভি তবে বুইঝবা যে ইয়ার ভিতরোং একটা  
কারণ আছেক।”

“ইটা কি কহুছ সর্দার?” বিস্ময়ে অবাক  
হয়ে গেল মংরা। তার শব্দর, তাদের সর্দার  
কেমন ছেলে মানুষের মত কথা বলছে।

“ঠিক কহুছি।”—

“ঠিক কহুছি বাঃ।”—

রসিক মাথা নাড়ল, “হাঁ—ঠিক কহুছি।  
কারণ নিশ্চয় আছেক—তবে কিনা সিটি  
হামরা বুইঝতে লারছি। আচ্ছা, তুর কথা  
মানলম হামি—মানলম। জিমিদারের অন্যায়  
হছে—ভালো কথা। কিন্তুকি কি করব, তুরা?  
আঁ?”

বদমেজাজী সোমা সোজা হয়ে দাঁড়াল  
সবার মাঝে, বলল, “হামরা লড়মু—হক্  
আদায় করমু।”—বলে সবার ওপর নিজের  
রক্তবর্ণ চাহনিটা বুলিয়ে নিল। যেন সবাইকে  
অভিভূত করে দলে টানতে চাইল সে।

মাটির ওপর মুষ্টাঘাত করে বাব্বির চুল

৩

দোলাল মংরা, সোমার উঁচু পর্দার কণ্ঠস্বরের  
জের টেনে বলল, “হাঁ, হক্ আদায় করমু।  
আইজ মাছ ধইরতে পারবা না বুলল, কাইল  
জমি ছাড়্যা চলা যাথে বুলবে। না, ইসব হুকুম  
মাইনব নাই হামরা—হামরা লড়মু।”—

মংরা আর সোমার উত্তেজনা সংক্রামিত  
হল আর সবার মধ্যে, বিদ্রোহের মত তরঙ্গায়িত  
হল প্রত্যেকের রক্তে, কঠিন করে তুলল তাদের  
কালো পাথরের মত শব্দ পেশীকে।

মাথা ঝাঁকিয়ে সবাই বলল, “হাঁ সর্দার,  
হাঁ, হামরা মাইনব নাই, লইডব।”

রসিক নিঃশব্দে সবার মুখের দিকে  
তাকাল। প্রথম করছে সবার মুখ, নিশ্চিত  
একটা সংকল্প ওদের ললাটে, চোয়ালে, চিবুকে  
ও চোখে রেখায়াত হয়ে উঠেছে। অধিকাংশই  
বুঁক তারা। বড় জেদী, বড় উশ্বত। আজকাল-  
কার ছেলে ওরা, বাইরের দুনিয়ার হাওয়া এসে  
গায়ে লাগছে। গোয়াল ঠেলে দিচ্ছে। আগ-  
কালের মত নিজের সংকীর্ণ পৃথিবীতে ওরা  
থাকতে চায় না, ওরা ছড়িয়ে পড়তে চায়  
দূরের পৃথিবীতেও। ওরা বোকা। তিন কুড়ি  
বয়স হতে চলল রসিক মাঝির, অনেক দেখেছে,  
অনেক শিখেছে সে। একা এসেছিল এখানে,  
খড়কুটোর মত ভাসতে ভাসতে, নিঃসম্বল,  
অসহায় অবস্থায়। “পাইট” মজুরের কাজ করে,  
আধি চায় করে আজ শিব্রি গামের মোড়ল  
হয়েছে সে, চারপাশের পাঁচ ছটা গায়ের  
সাঁওতাল আর ধাঙরেরা তাকে সর্দার বলে ডাকে,  
মানে। আজ তার দুটো হাল, দুটো মোষ, দুটো  
গরু, একটা গাড়ী, কুড়ি বিঘা জমি আর সাজানো  
গোছানো বাড়ি। এক মেয়ে বড়বু, যোগ্য  
পাত্রের সঙ্গে তার শ্রিয়ে দিয়েছে রসিক। কয়েক  
বিঘা জমি আছে মংরার, আধি চাষও করে সে।  
এঃ ছেলে পুয়া—বিয়ের যোগ্য বয়স হয়েছে  
তার, কাজেকর্মে সোনার টুকরো ছেলে।  
সেই রসিক মাঝি। সে জানে যে সরলভাবে  
নিজের গণ্ডীতে পড়ে থাকাই ভাল, সে ভাবে  
যে সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের সংগ্রাম-যোষণা  
ভারী হাস্যাস্পদ, সব কিছুরেই দাবী করাটা  
মুর্থতা। নিঃশব্দে সবার দিকে তাকাল সে।  
জামাইটাও আজকাল বেয়ারা হয়ে উঠেছে, তাকে

আর মানতে চায় না। শহর থেকে দু'একজন  
ছোকরা বাবু এসে মাঝে মাঝে কি সব যেন  
মংরা আর তার বন্ধুদের বোঝায় আর ওরা  
নির্বাক হয়ে কান খাড়া করে শুনতে থাকে  
তাদের কথাগুলো। সে দেখছে সব কিছুই,  
জানেও সব। মংরা তার জামাই বলে এতদিন  
সে ব্যাপারটা গায়ে মাখেনি, কিন্তু ক্রমেই  
ব্যাপারটা অসহ্য হয়ে উঠেছে। মংরাকে কেন্দ্র  
করে আলাদা একটা দল গড়ে উঠেছে সাঁওতাল  
ধাঙরদের মাঝে, বিদ্রোহের রক্তলেখা ওদের  
চোখের চাউনিতে। ওরা এখানকার পান্ড্রী  
সাহেবকে খাতির করে না, জোতদারদের গালি-  
গালাজ করে, এমনকি, জমিদারের সঙ্গেও  
লড়াই করতে চায়। ওরা সব চুলোয় গেছে।  
কিন্তু বেশীদিন চূপ করে থাকবে না রসিক,  
এটা ঠিক। চারদিকে তাকাল রসিক। দরজার  
পাশে স্থূলকায় পুবার মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে  
তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস খাচ্ছে, দাওয়ার  
নীচে হুটপুট পোষা কুকুরটা জিভ বের  
করে সূর্যালোকিত ধূসর দিগন্তের দিকে  
তাকিয়ে ছাঁপাচ্ছে। হঠাৎ স্তব্ধতা ঘনিয়ে  
এসেছে, সবাই অপেক্ষা করছে রসিকের রায়ের  
জন্য। তার মুখের দিকে প্রথর দৃষ্টি মেলে  
বিদ্রোহীরা তাকিয়ে আছে।

রসিক মুখ ফিরাল, মূদু হেসে বলল,  
“লড়বু? বন্ধুকের গুলিক ডরাস্ নাই তুরা?  
হামার কথাটো শুনবু—আঁ? তুরা বাচ্চা আছিষ্  
—বাচ্চা, হামার কথাটো মান। হামরা কি  
রে বাপ—আঁ? হামরা চাষী পরজা আছি,  
মাটি লিয়া হামাদের কাম। বিলের মাছ খায়া  
তো হামাদের জান বাঁচে নাই—তবে? বিলের  
মাছ খাবার লাগা কানে জান দিব, তুরা?  
বিচার কর কথাটো—ভাইভা দেখু।”—

মংরা বাধা দিল মাঝপথে, মাথা নেড়ে বলল,  
“না, হামরা ভাবব নাই সর্দার—হামরা হকটো  
ভোড়ব নাই।”

একটা উষ্ণ স্রোত সারা দেহে ছাড়িয়ে  
পড়তে চাইল কিন্তু রসিক মাঝি দমন  
করল তা, একটু ভেবে বিমর্ষভাবে বলল,  
“মাথা গরম করিস নাই জামাই। শুন,  
এক কাম কর।”—

“কি বটে শুন?”

“কাইল বিকালে হামরা জিমিদারের  
কাছোং যামু—দরবার করমু—বুলব যে হামা-  
দের হকটো যানে কাড়িয়া না ল্যান।”—

মংরার পছন্দ হল কথাটা। আচ্ছা। মন্দেদর  
ভাল, জমিদারকে একবার বলেই দেখা যাক।  
বুড়োর একথায় বৃষ্টি আছে, হুট করে একটা  
কিছুর ফেলেই তো আর হয় না। আগে  
ভালোভাবে চেষ্টা করা যাক তারপরই না হয়

আইনকে নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া যাবে।

সমর্থন জানিয়ে বলল, “ঠিক, তুর রায় হামরা মাইনা লিলাম সর্দার—ঠিক, দরবার করমু হামরা”—সবার দিকে তাকিয়ে সে নিজের সমর্থনটাকে বেন সবাইকে জানিয়ে দেবার চেষ্টা করল।

রসিক বলল, “গায়ের সবাইকে এই রায়টি কহিয়া দ্যাও—ছোঁড়া দিক পঠায়া দাও আউর সব গায়ো—সবাই মিলে যামু হামরা—আঁ?”

সংভালেরা মাথা নেড়ে সাই দিল, “হয়, তু ঠিক বুলাছিস সর্দার—ঠিক বুলাছিস”—তারপরে একে একে সবাই চলে গেল। চিন্তিত মুখে বসে বসে চুটি টানতে লাগল রসিক মাঝি।

পুয়ার মা তার পাখাটাকে জোরে জোরে চালিয়ে বলল, “জামাই আসাছিল”—

রসিক জবাব দিল না।

বিড়বিড় করে পুয়ার মা আবার বলল, “কিন্তুকি উর মাথা লিগড়া গিছে—জমিদারের সাথে লড়াই কইরতে চায়—ই কামান কথা! আঁ?”

এবারও কোনো জবাব দিল না রসিক মাঝি। একইভাবে বসে বসে চুটি টানতে লাগল সে। বাইরে তখন রোদ কড়া হয়ে উঠেছে, দূরে ধুলো উড়ছে, বাড়ির পেছনকার নিম আর জাম গাছ মর্মিরত হয়ে উঠেছে। গরম মাটির ওপর বড় বড় শক্ত শক্ত কালো পা ফেলে ওরা সবাই অনেকক্ষণ চলে গেছে। আজকালকার বিদ্রোহী সাঁওতালরা। দাওয়ার নীচে উপবিষ্ট হুটপুট পোষা দেশী কুকুরটা ঘাড় বাকিয়ে একবার রসিক মাঝিকে দেখল, তারপর দূর দিগন্তে বিলীয়মান উঁচুনিচু ক্ষেতটার দিকে তাকিয়ে জিভ বের করে হাঁপাতে লাগল। একটা মাটি এসে তার মাড়ির পাশে ভন্ ভন্ শব্দ তুলে সবার চেষ্টা করতে লাগল। বারকয়েক মাথা নেড়ে মাছিটাকে তাড়াবার চেষ্টা করল কুকুরটা, কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা। শেষে ক্রুদ্ধ হয়ে সে গর্জন করে মাছিটাকে কামড়াতে গেল, কিন্তু দাঁতে দাঁতে ঠেকে একটা বাথ’তার শব্দ ঠক্ করে উঠল শব্দ, তখন বিরক্ত হয়ে সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

মোষ দুটাকে একবার দেখে এল মংরা, তারপর বলল, “ইবার ভাত দে বুদুমরী।”

বুদুমরী ভাত বাড়তে বসল। আজ সকাল থেকে সেই ডঙ্কা শব্দবাবর পর থেকেই কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেছে মংরা। জম্বাভাবিক মাত্রায় গম্ভীর ও চিন্তাকুল হয়ে উঠেছে সে। চোয়াল দুটো শক্ত দেখাচ্ছে, চ্যাণ্টা নাকটা ফুলে রয়েছে, আর ললাটে জেগেছে কতগুলো রেখা। কি ভাবছে সে, অত ভাববার কিই-বা আছে? বুদুমরী ভেবে কিছুই বুঝতে পারে না, কোন কল্কিনারা পায় না।

“শুদুছিসজী”—সে ডাকল।

“হাঁ শুদুছি।” মংরা সংক্ষিপ্ত জবাব দিল।

“বৈস্ ভাত খাইতে।”

বসল মংরা। নিঃশব্দে খেতে লাগল সে।

“আচ্ছা—কি হইল তুর—আঁ?” কপট রোবের সংগে বুদুমরী প্রশ্ন করল।

খাওয়া থামিয়ে মংরা বলল, “কি হৈবে বা—কিছু না তো।”

“তাইলে চুপ করা আছিস্ যে!”

“ভাবছি।”

“কি ভাবছিস্? উংকার কথা?”

“হাঁ।”

“ক্যানে বাপ—উর লাগা ভাইবতে হবু ক্যানে?” বুদুমরীর কণ্ঠে এবার আর কপট রোষ নয়, সত্যি রাগ করল সে।

মংরা খেতে খেতে অবজ্ঞাসূচক কণ্ঠে বলল, “ক্যানে ভাইবতে হবু, সি কথাটা বুঝতে পারবু তু—চুপ থাক।”

বুদুমরীর আশ্চর্যমানে ঘা লাগল। মংরা তাকে নেহাই বোকা ভাবে, নইলে এমন কথা বলার অর্থ কি? কেন তার বুদ্ধি কি কম? যে মোষ দুটাকে দেখে সারা গায়ের সাঁওতালেরা হৈ হৈ করে, যাদের দেখে হাটের লোকেরা বলাবলি করে যে, মংরা মাঝির মোষ দুটোই হচ্ছে এ তল্লাটে সব চেয়ে সেরা, সে দুটোকে যদি বুদুমরী খরিদ করতে না বলত তাহলে কি হোত? তবে? মংরার এই উদ্ভাসিকতা তার এই আশ্চর্য্যভরতা কেন সহ্য করবে বুদুমরী?

সে মুখ চোখ অন্ধকার করে বলল, “চুপ থাকমু ক্যানে? হামি কি মনিষ লয়?”

বুকঝকে দাঁত মেলে এবার হাসল মংরা।

“মনিষ তো আছিস্, কিন্তুকি মেয়ামনিষ যে—”

তজ্জনী আর বৃথাগুণ্ঠ যুক্ত করে দেখিয়ে সে বলল, “মনিষ আর মেয়ামনিষ—ই দুটোর মাঝে ক্যাবলইন্টরাক্ ফারাক্ আছে—বুঝলু?”

অতিমান-আহত অন্তরে, ধরা গলায় বলল বুদুমরী, “বুঝলাম।”

“ঠিক বুলাছি না?” মংরা বিদ্রূপের সুরে প্রশ্ন করল। সে বুঝতে পারল যে, বুদুমরী রাগ করেছে। বুকঝকে আকাশ দেখে যেমন চাষীরা বলতে পারে যে, বৃষ্টির বিলম্ব আছে কি না, তেমনি প্রথর অনুভূতি দিয়ে মংরা বুঝতে পারল ব্যাপাট্টা কি। সাময়িকভাবে বিলের চিন্তাটা তার চাপা পড়ল। বুদুমরীর দিকে তাকাল সে। মেয়েটা মনে মনে ফৌস ফৌস করছে, গর্জাচ্ছে একটা বাঘিনীর মত কালো চোখ দুটো তার আরো কালো হয়ে উঠেছে, নাকের ডগাটা থরথর করছে একটা চাপা রোষে, ঠোঁট দুটো দৃঢ়সংবদ্ধ হয়ে আশঙ্কাজনক একটা পরিস্থিতির পরিচয় দিচ্ছে। রাগলে ভালো দেখায় রসিক মাঝির বেটিটকে। তাকে দেখে

মনে মনে হাসল মংরা, তাকে আরো রাগিয়ে দেবার একটা বালসুন্দর বৃষ্টি তার মনের মধ্যে ক্রমাগত সৃষ্টিসৃষ্টি দিতে লাগল।

“কি কথা বুলাছিস্ না ক্যানে রে? হামার কথাটো বুঝলু তো?”

“হয়”—চাপা দাঁতের ফাঁক থেকে বেরিয়ে এল কথাটা।

“ভাল ভাল। তা বুঝবু নি ক্যানে, মেয়ামনিষ হইলেও যে তুর বুদ্ধি আছেকি থব—সিটা হামি মাইনিছি।”

বুদুমরী এবার গর্জে উঠল, “কি! ঠাটা হচ্ছে—ঠাটা?”

হো হো করে হেসে উঠল মংরা বুদুমরীর রাগ দেখে। মেয়েটার দু’চোখে আকাশের বিদ্যুৎ চমকচ্ছে, কুণ্ডিত ভুরু দুটোর মাঝে দুটো ঘন রেখা দেখা দিয়েছে, রসালো জামের মত চক্চকে ঠোঁট দুটো ঈষৎ স্ফূর্তিত হয়ে কাঁপছে আর শ্বাসপ্রশ্বাসের সংগে সংগে বারংবার ওঠা-নামা করছে তার বৃগলবন্ধ-পদ্ম। দেখে একটা বন্য আবেগ তার অন্তরের মধ্যে আকুল-ভাবে ফেনায়াত হয়ে উঠল অরণ্যের মর্মকোষে যেমন উদ্গম হাওয়ায় মর্মরধূনি তোলে তেমনি ভাবে তার রক্তের মাঝে একটা অদৃশ্য কামনার ঝড় হা হা শব্দে বয়ে গেল। চাপা পড়ে গেল বিলের চিন্তাটা। ইচ্ছে হল দুটো বাহু দিয়ে শক্ত বুকোর ওপর পিষে চূর্ণ করে ফেলে ঐ গর্বিভা নায়িকার রাগকে দুটো লোভী ঠোঁট দিয়ে লেহন করে নেয় তার মনের উজাপকে।

সে হেসে বলল, “ঠাটা হবি ক্যানে বা—ঠিক কথাই কহুছি আমি।”

কটমট করে বুদুমরী স্বামীর দিকে তাকাল, নিদারুণ রাগে খানিকক্ষণ স্তম্ভ হয়ে বসে রইল নিশ্চল প্রস্তরমূর্তির মত। তারপর উঠে দাঁড়াল। বলল, “চুপচাপ ভাত খাবু তো খা—হামার সাথে কথা কহিস্ নাই।”

“আয় বাপ—রাগ করলু নাকি? আঁ?”

দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বুদুমরী। পায়ের রূপোর ধাক্কা বম্ববম্ব শব্দ করে উঠল। ঘরের স্তম্ভ বাতাস আর নিশ্চল কেরোসিনের ডিম্বার শিখাটাকে আন্দোলিত করে সে একটা ঘর্পি হাওয়ার মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

“এ্যাই—এ্যাই বুদুমরীয়া”—অনুচ্চকণ্ঠে হেসে ডাকল মংরা।

কিন্তু কোনো সাড়াই পেলো না সে। বুদুমরী সত্যি রাগ করেছে। একটু ভাবল সে। না, এর ওপরে আর তার রাগকে বাড়ানো উচিত হবে না, এই পর্যন্তই থাক। আবার খাওয়ায় মন দিল সে। তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে সে অবশিষ্ট ভাতের রাশিকে নিশেষ করতে করতে বিলের কথাটা আবার তার মাথায় ফিরে এল। প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার গরীবদের তো মানুস বলেই মনে করেন না, সাঁওতালদের আরো না। তারা যেন কুকুর শেয়ালের চেয়েও অধম তারি কাছে। নদীর জলের

ওপর যেমন সবার অধিকার আছে, তেমনিভাবে কাড়াল বিলের ওপরেও তাদের অধিকার আছে। সে অধিকার বহু প্রাচীন, আদিম, জন্মগত। অথচ সেই অধিকারই আজ লোপ পেতে চলেছে একটি মাত্র লোকের ইচ্ছায়। খাওয়া শেষ করে হাত মুখ ধু'ল' সে। বাইরের দাওয়ার গিয়ে বসে চুটি টানতে লাগল। তখন বেশ রাত হয়েছে, রাতের নুপুর বাজছে গাছপালায়, ক্ষেতে মাঠে—একটানা, অবিশ্রান্ত। দূরে অন্ধকার পূর্ব আকাশের গায়ে কুমড়োর ফালির মত বাঁকা চাঁদটা সবে দেখা দিয়েছে। শিবের মাথার মেঘের মত কালো জটাগুলোর মধ্যবর্তী বাকী চাঁদটা। হালকা একটা আলোর স্পর্শ লেগেছে নিবিড় নিঃশব্দ অন্ধকার স্রাতের দেহে। অস্পষ্ট, কুহেলিকাময়, অপার্থিব একটা অজ্ঞাত পৃথিবী যেন ধীরে ধীরে তার অবগুণ্ঠন অপসারিত করছে, ধীরে ধীরে তার বিচিত্র যৌবনকে মেলে ধরছে মধ্যরাত্রির অতন্দ্র দশকদের জন্য।

বাঁকা চাঁদের ক্ষীণ আলোতে আকাশটাকে এবার আবছা আবছা দেখা যায়। ভিতরে উঠোনের এক কোণে বসে বাসন মাঝেঝে বুমরী—তার চুড়ির ঠুনঠুন আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। বুমরীর রাগ এখনো কমেনি, তাব চুড়ির শব্দ থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, নিষ্ফল আক্রোশে খুব জোরে জোরে বাসন মাঝেঝে সে। দূরে অন্ধকারে অস্পষ্ট দিগন্তের ওপর আকাশটা কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে। আর সারিবদ্ধ বক্ষ-শ্রেণী নিষ্কম্প যোদ্ধাদের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন প্রতিজ্ঞা করছে—তুর্ষ্য নিনাদিত হলেই ওরা মাটি কাঁপিয়ে রণরঙ্গন করতে করতে কোনো অদৃশ্য শত্রুদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হবে, উন্নত উল্লাসে কাঁপিয়ে পড়বে তাদের ওপর।

—হুয়া—আ—আ, হুয়া—হুয়া—আ—আ—আ—

নিশাচর, অগ্নিনেত্র মাংসভুকের তীব্র, তীক্ষ্ণ চাঁৎকারটা এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত একটা তরঙ্গের মত গড়িয়ে গেল। রাতের প্রহরী ওরা, প্লহর ঘোষণা করল। রাত হয়েছে, রাত হয়েছে। কান পাতল মংরা। ভিতরে আওয়াজ নেই কোনো। বুমরী তবে শূন্যে পড়েছে।

ভিতরে গেল সে।

এককোণে কেরোসিনের ডিবেটা জ্বলছে। তার তীব্র গন্ধযুক্ত ধূমকলঙ্কশীর্ণ শিখাটা সাপের ফণার মত এদিক ওদিক মৃদুমন্দ দুলছে। আর তার বিপরীত দিকে বিছানার ওপর পাশ ফিরে শূন্যে আছে বুমরী। ক্ষীণ কটি থেকে পাহাড়ের মত ঢেউ খেলে উঠেছে সূচ্যম প্রোণীদেশটি। তার ওপর এক হাত রেখে আর শিয়রে এক হাত রেখে শূন্যে আছে বুমরী। কিন্তু সে কি সত্যি ঘামিয়েছে?

“বুমরী—এ বুমরীয়া”—লঘুকণ্ঠে ডাকল মংরা।

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। কেবল দ্রুত নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেল।

অনুকণ্ঠে হাসল মংরা। মেয়েমানুষ রাগ করলে কি ঘুমোতে পারে! অসম্ভব। আর এমন স্থির ভগ্নীতে? উহ—

হাঁটু গেড়ে নিদ্রিতা স্ত্রীর পাশে বসল সে, তার গায়ে হাত রেখে আবার ডাকল, “এাই—আরে ও শব্দুরার বিটি—আগ করছ, ক্যান, আ?”

কোনো জবাব এল না। নাঃ, বড় বেশী মান করেছে মেয়েটা। হাত দিয়ে বুমরীর মুখটা ঘুরিয়ে আনল নিজের দিকে, ফুঁ দিল তার চোখের পাতায়। না, কোনো ব্যতিক্রম ঘটল না, ঘুমিয়েছে বোধ হয়। কিন্তু দূর ছাই। কি দরকার তত তোষামোদে? বাইরের দিকে তাকাল সে খোলা জানালাটা দিয়ে। বসন্তের রাত। রক্তের মধ্যে যেন একটা মাতাল কৌকিল গান গাইতে আরম্ভ করল। অথচ বুমরী রাগ করল।

“বুমরী—অ বুমরী।”

খুব জোরে এবার ঝাঁকুনি দিল সে বৌকে। এবার চোখ মেলেল বুমরী, দুটো কালো চোখে আগুন জেলে উঠে বহল, ওপরের দিকে তাকিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, “হামার গায়ে হাত দিস্ নাই তু!”

“আয় বাপু, ইটা কি কহ'ছিস তু! অমন কহিলে হামি মইরা যামু—লিচয় মরমু।”

“দিক্ করিস্ না তু—ঠাটা করিস্ নাই”—অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যে মুখ চোখ অন্ধকার করে বুমরী বলল।

“তুর হাতে ধরছি বা”—খপ করে বুমরীর হাত দুটো ধরে ফেলল মংরা, ধরে বুকুর দিকে টানল তাকে।

সাঁওতালের মেয়ে, গায়ে শক্তি আছে প্রচুর, প্রবল আকর্ষণে হাত দুটোকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে কঠিন প্রচেষ্টা করে বলল, “ছাড় হামার হাত, ছুঁস নাই তু হামাকে—নাঃ—”

কিন্তু মংরা হাত ছাড়ল না, ঝকঝক দাঁত মেলে সে হেসে বলল, “আগ কইমবে নাই তুর—আঃ? আচ্ছা, আচ্ছা তবে তোরা পায়ে পড়লম্ হামি—হয়—বলেই ক্ষিপ্ৰগতিতে সে হাত দুটো ছেড়ে বুমরীর পা দুটো চেপে ধরল, কপট কারুণ্যে কণ্ঠস্বরকে মোলায়েম করে বলল, “দুহাই বাবা—হামার কিরিয়া লাগে—তু আগ করিস্ নাই, মাফ্ করা দে—আ?”

সাপে কামড়ালে মানুষ যেমনভাবে লাফিয়ে ওঠে তেমনিভাবে লাফিয়ে উঠল বুমরী, পা দুটো ছাড়িয়ে নিল, তারপর কি একটা কঠিন কথা বলার জন্য তাকাল স্বামীর দিকে। এমন একটা কিছু সে বলতে খাচ্ছিল, এমন সাংঘাতিক কথা যা অগ্নিময় বস্তুর মত মংরাকে আঘাত করতে নির্বাক করে ফেলবে। কিন্তু স্বামীর

দিকে তাকিয়ে তার সব রাগ হঠাৎ যেন জল হয়ে গেল।

অনুগত, ভয়াব্র প্রজার মত করজোড়ে, পাংশুমুখে তাকিয়েছিল মংরা, যেন কোনো রাজাধিরাজের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইছে এমন ভঙ্গী করে কাতর কণ্ঠে বলল সে, “দুহাই—দুহাই তুর—হামার কিরিয়া লাগে সদীর”—

উত্তপ্ত লাভাস্রোত যেন হঠাৎ গলিত তুষার-সমূহে গিয়ে পড়ল, ঠান্ডা হয়ে গেল, তুষারের সঙ্গে মিশে গেল।

গম্ভীর, অন্ধকার মুখটা হঠাৎ সহজ ও কোমল হয়ে এল আর তার পর মুহূর্তেই ফিক করে হেসে ফেলল বুমরী।

“আগ্ গেলছে তো—আ?”

“হঃ—”

“গেলছে তো?”

“হয়ের বাপু গেলছে—ইঃ, কামান বদমাশ্ আছিস্ তু, বাপু!”

মংরা আরো ঘন হয়ে বসল, বলল, “হামি বদমাশ্।”

“হাঁ—”

“না না, ভালা বল”—

“যি ভালা লয় তাক্ কামানে বুলি তা?”

“হাঁ?”

“হাঁ।”

“তবে তো বদমাশি করবুই হামি”—এই বলে বুমরীকে সে সবলে বুকের ওপর টেনে নিল, দুটো বাহুর শক্ত অঙ্গুলরের মত বলিষ্ঠ, ক্ষমতা বহুর নাগপাশে জড়িয়ে ধরল কালো মেয়েটার উত্তপ্ত, কোমল দেহটাকে। স্পর্শ, মৃদু দেহসৌভ আর বাইরের কুহেলিকাময়ী পৃথিবীটা যেন ওর মনকে মাতাল করে তুলল, রক্তের মাঝে যে মাতাল কৌকিলটা বসন্ত-রাগের আলাপ করছিল তার আকুল ডাকটা পরিষ্কার শুনতে পেল সে। এমন রাত! সাঁওতালের মন উৎসবের আকাশকায় ময়ূরের মত পেখম মেলে নেচে উঠল।

“বুমরী—

“উঃ?”

“আগ গেলছে তো?”

“হারে বাপু—

“চাঁদ দেখাছিস্?”

“হাঁ—সুন্দর দেখাচ্ছে—

“মাদল বাজামু—তু গান গাবু?”

“এই রাতের পরে জী?”

“তাথে কি? সভাই তো নিদ্র যাচ্ছে—

গা—

“বাজা ভবে”—

ঘরের কোণে আছে ঢাক আর মাদল। লাফিয়ে মাদলটাকে টেনে আনল মংরা, মৃদু ঘা দিল তাতে।

বুমরী গিয়ে কেরোসিনের ডিবেটাতে ফুঁ দিল, নিভে গেল সেটা, ঘরের মধ্যে বাইরের বাঁকা চাঁদের ক্ষীণ আলো এক চক্ষিণে এসে



ঢুকল, সঙ্গে নিয়ে এল রাশি রাশি রহস্যময় অনুভূতি।

মাদলের মদ শব্দ ধনিত হতে লাগল। সমস্ত ঘরটা যেন থরথর করে কেঁপে উঠল সেই শব্দে, মগ্নিত হয়ে উঠল। আর স্বামীর কাছ ঘেষে বসে, বাইরের অপরাধ পৃথিবীটার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিে মনোচ্ছন্ন চোখ মেলে গুণগুণ করে গাইতে শুরু করল কুমুরী।

“তিনগা ডাহার নাইগো

খিবী লটরী,

দোজোরিমা বিলিদি বালাদে

নানগোরিমা বামারে কুমুরে॥

বেশ মিষ্টি গলা কুমুরীর, গায়ের সেরা ময়ের কণ্ঠস্বরও সেরা। মাদল আর গানের শব্দ মিলে এক ঢুকুরো বাঁকা চাঁদের আলো একটা উত্তেজক রসায়নের মত দেহের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে তাল কেটে গেল। কুমুরী স্বামীর দিকে তাকাল। কি যেন ভাবতে ভাবতে বাজাচ্ছে মনো। গান গাইতে চেয়ে হঠাৎ সে অনামনস্ক হয়ে পড়ল কেন? ব্যাপার কি?

একবার নয়, তিনবার তাল কাটল মনো। গান থামল কুমুরী।

“কি ভাইবিছিন্ তু?” অবাক হয়ে প্রশ্ন করল সে।

বাজনা থামিয়ে মনো অপরাধীর মত হাসল, “থামলি ক্যানে গান গাব্ না?”

“তুও শুনিলে তো—ভাইবিছিন্ কি”—আহত কণ্ঠে বলল কুমুরী।

“হয়”—মনো স্বীকার করল মাথা নেড়ে, “ভাইবিছিন্”—

“কি?”

“বিলের কথাটো। মাছ মাইরতে দিবে নাই”—

কুমুরী হঠাৎ ক্ষেপে গেল। কি লোকটা! এমন প্রতারক! নিজের উদ্যোগী হয়ে গান-বাজনা শুরুর করে অন্য কথা ভাবে! বিল—তা ভেবে তোর কি হবে বাপ? সে তো কাল যাবে জমিদার বাড়ি। আজ—আজকের এই রসঘন, বাসনাময় ও গীতিমুখর মহোত-গুলোকে কি সেইজন্য অস্বীকার করতে হবে। না, সে তা স্বীকার করবে না। মাদলটাকে ঠেলে দিয়ে সে হঠাৎ বন্য আবেগে হিংস্র হয়ে মনোর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সিরাসি গ্রাম থেকে এক মাইল হেঁটে বিল পার হয়ে পাকা এক ক্রোশ হাটিলে পর জমিদার বাড়ি পৌঁছানো যায়।

দুপুরের পার হতেই ছোট ছোট লাঠি হাতে প্রায় শিশুজন সাঁওতাল ও ধাওর রওনা হয়ে গেল। রোদ চনচনে হয়ে উঠেছে, মাথার তালুকে ফাটাবার উপক্রম করেছে বলে পাগড়ী বাধার জন্য গামছা নিল তারা, কেউ কেউ ছোঁড়া

রঙ-চটা ছাতা বা টোকা সঙ্গে নিল। গরম মাটির ওপর কালো কালো, শক্ত শক্ত পা ফেলে ওরা হন্থন্থ করে এগিয়ে চলল। বিলের জলকাদা ভেগে সোজা রাস্তা ধরে পাড়ি মারল। বায়গায় বায়গায় জল বুক পর্যন্ত ছিল, সেখানে তারা গামছা পরে কাপড় মাথায় করে জল পার হল। এক ঘণ্টা বাদেই তারা জমিদারের কাছারী ঘরের সামনে গিয়ে হাজির হল।

মধ্যাহ্ন-তন্দ্রার জের তখনো জমিদার বাড়ীতে শেষ হয়নি। কাছারী ঘরও নিস্তব্ধ। বারান্দায় জনার্দন সিং কি একটা ব্যক্তিগত হিসেব মেলাচ্ছিল, দুর্ভাগ্যজন চাকর একটা ছোঁড়া মাদুরের ওপর গড়াগড়ি যাচ্ছিল। তারা সাঁওতালদের আসতে দেখেই কোত্থলী হয়ে উঠে বসল।

“আদাব সিংজী—আদাব”—রসিক মাঝি বিনীত হাসি হাসল।

এই খাতিরে ও বিনীত ভাল দেখে জনার্দন সিং একটু খুশী হয়েই উঠল, সহাস্যে বলল, “আরে রসিক সর্দার যে! বোয়াপার কিরে মাঝি? আরে উঠিয়ে আয়, উপরে আইসা বইট”—

গুটি গুটি পা ফেলে, সসম্ভ্রমে বারান্দায় উঠে এল রসিক মাঝি। পেছন পেছন এল মনো, সোমা, শুকরা, চোমা আর মেঘু। রসিক মাঝির পরেই যারা পাঁচ ছটা গ্রামের খাতির পায়। এসে সিমেন্টকরা মেঝের ওপর তারা বসল, দু’হাত দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে ধরে। আর সবাই নীচে রইল, মস্ত বড় একটা আম গাছের শ্যাম-ছায়ায়। অনেকে টার্কি থেকে চুটি বা বিড়ি বের করল, ধারিয়ে ধীরে টানতে লাগল আর বিস্ময়-বিস্ফারিত ও সন্তুষ্ট সত্ত্ব দৃষ্টি মেলে জমিদার বাড়ির চারিদিক দেখতে লাগল।

“কিরে মোড়ল, বোয়াপার কি?” জনার্দন সিং আবার প্রশ্ন করল।

রসিক হাসল, কদমছাটি পাকা চুলের মাঝে আঙ্গুল চালিয়ে বলল, “আসলম্ হামরা দরবার কইরতে”

“দরবার?”

“হাঁ সিংজী।”

“দরবার কিরে? হামি সমঝলম্ না।”

“বিলোং মাছ ধরার লাইগা।”

জনার্দন সিং তবু ঠিক পরিষ্কার বুঝতে পারল না, “সে কি! তুরা কি কাইল বিহানে ডংকা শুনিস নাই?”

“শুনিনাছি সিংজী।।

তবু, তবু মাংছিস রে?”

রসিক মাঝি মদু হেসে বিশদ ব্যাখ্যা করাটাকে এড়িয়ে গেল, বলল, “তবু দরবার করম্, জমিদারাবর ঠেঙে।”

জনার্দন সিংয়ের মূখ একটু গম্ভীর হয়ে উঠল, “হু—সমঝলম্। পৈবসা থাক তবে,

জিমিদারাবাদ্ এক ঘণ্টা পিছে আইস্বে, খবর পাঠাছি। ওরে লালদ, অন্দর মহলে খবর দিয়া আয় কি সাঁওতাল পরজারা সব ভেট মাংতাসে।”

দেড় ঘণ্টা, ঠায় দেড় ঘণ্টা বসে রইল ওরা। দিনের আলো ক্রমশ মলিন হয়ে এলো, ইংলিশবাজারগামী বিকেলের ট্রেনটা তীক্ষ্ণ একটা বংশীধ্বনি করে দূরবর্তী স্টেশনে এসে থামল। পরস্পরের দিকে অনিচ্ছা দৃষ্টি মেলে দরবার-প্রত্যাশীর দল তাকাতে লাগল। চাপা উত্তেজনায় মনোর মুখটা হিংস্র হয়ে উঠল, আশ্চর্য্য দৃষ্টি মেলে সে চুপ করে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ জনার্দন সিংয়ের ডাক শোনা গেল, “হুসিয়ার রে রসিক মাঝি, জিমিদারাবাদ্ আইসছেন।”

সবাই উঠে দাঁড়াল, তাকাল বাদিকের রাস্তার দিকে। গ্রে-হাউন্ড কুকুর দুটোর শেকল ধরে দিগ্বিজয়ী, দুর্ধর্ষ সন্ন্যাসের মত জমিদার শিবেন্দ্রকুমার মন্ডরগতিতে কাছারী ঘরের দিকে আসছেন। মূখে জবলন্ত ১৯৯ নম্বর স্টেট এক্সপ্রেস সিগারেট। গায়ে দামী মটকার পাঞ্জাবী, পায়ে সাদা চামড়ার পাম্প-সু, চামড়া বের-করা ছাড় আর গলার ভাঁজে সুগন্ধী পাউডরের ছোপ।

সর্বস্বত হয়ে উঠে দাঁড়াল রসিক, অনুরক্ত ভক্তের মত দুটো হাত এক করে কুঁকি পড়ে বলল—“সেলাম, হুজুর, সেলাম।”

মনোর দল শব্দ মাথাটা ঝাঁকাল, হাত তুলল না। বাকী সবাই রসিকের কথার প্রতিধ্বনি তুলল।

শিবেন্দ্রকুমার স্রক্ষেপ করিলেন না, কোলা ব্যাংয়ের মত থপথপ করতে করতে ভারী শরীরটাকে নিয়ে বারান্দায় উঠলেন তিনি। গ্রে-হাউন্ড দুটো সমবেত সাঁওতালদের দেখে হঠাৎ নাসিকা বিস্ফারিত করল, শেকল ছিঁড়ে তাদের মাঝে লাফিয়ে পড়তে চাইল, মোটা গলার বিদ্রী গর্জন করে উঠল।

“আয় বাপু”—মেঘু চাপা গলায় ক্রটিম ভয়ের ভাব দেখাল।

“হয়—শালাক শেষের ছোটো ভাই বলা,

ম্যালুম হছে জী”—হেসে বলল সোমা।

“কি রকম ভেইড়ে আইসছে—দু’হাই মেরী মাইকি বাপু”—চোমা কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল।

কুকুর দুটো সমানে ভেঁকে চলেছে। চোখে ওদের হিংস্র ঘৃণা।

মিকি—জেনি—চোপ—শা—আউ—আপু—শেকল দুটোকে দুই বক্সমুঠি দিয়ে কঠিন ভাবে আঁকড়ে ধরে গর্জন করলেন শিবেন্দ্রকুমার। তাঁর গর্জন গ্রে-হাউন্ডদের গর্জনের চেয়ে চাপা দিল, কুকুর দুটোও ধমকের ঢোটে শান্ত

হল একটু। হাজার হোক মনিব তো, হিংস্র কুকুর দুটোর মনিব হবার যোগ্যতা রাখেন শিবেন্দ্রকুমার।

জনার্দন সিং ছুটো ভিতর থেকে একটা চেয়ার এনে সামনে রাখল। শিবেন্দ্রকুমার তাতে বসে সবার দিকে তাকালেন, অকুণ্ঠিত করে প্রশ্ন করলেন, “কি কি চাই তোমাদের?”

রসিক মাঝি দু’পা এগিয়ে এল, কেশে গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, “সিরসি, নিমাইল, নিমডাঙ্গা আর হরিশপুয়ার হামরা পরজা হুজুর—একটা দরবার কইরতে চাইছি।

“দরবার! কিসের দরবার?”

“কাইল বিহানে ডাঙ্গা শুনলম্ হুজুর—আপনার হুকুম।”

“শুনোইস্ বৈশ করেইস্, তাতে দরবার করার কি আছে রে?” ক্রান্ত, বিরক্ত মুখভঙ্গী করলেন শিবেন্দ্রকুমার, একটা হাই ভুলে রাক্ষসের মত একটা বিরাট মুখাবরণকে উন্মোচিত করলেন।

“আছেক্ হুজুর—আপনাদের হুকুম হামাদের দুখ দিছে”—

“দুখ!” গভীর বাগধ্বনি হইল শিবেন্দ্রকুমারের কণ্ঠে “দুখ কিরে মোড়ল, এঁা?”

“হা হুজুর। বরাবর হামরা বিল থিকা মাছ খাই, এবার থিকা যি কামুনটো বদলাইল তাই বিশ্বাস হইল নাই হুজুর—গরীব মনিব্”—অর্থাত্ তীরের মত জমিদারবাবুর হৃদয়কে বিন্দ্ব করার উদ্দেশ্যে ভালভাবে গাঁড়িয়ে বলবার চেষ্টা করে গলদখম হয়ে উঠল রসিক মাঝি, বিশেষ জোর দিয়ে আবার একটা কথা বলল সে, “হামরা গরীব মনিষ হুজুর।”

স্থির দৃষ্টি মেলে রসিকের মুখের দিকে তাকালেন তিনি, বুঝতে পারলেন ব্যাপারটাকে, অবস্থা জনগণের শৃংখলা নাড়ছে। আচ্ছা, দেখা যাক। কিরূপ জনগণের। করায়ত্ত করার অঙ্গুশ আছে তার কাছে।

তিনি বললেন, “বরাবর খেয়েইস! হ্যাঁ, তা খেয়েইস্—যখন আমার বিলে দরকার ছিল না। এবার থেকে ও বিল আমার দরকারে লাগবে, তাই ওর মাছ আর তোরা ধরতে পারি না। পনেরো হাজার টাকায় বিল বন্দোবস্ত করে দিয়েছি—তোরা খেলে সে টাকা আমার আসবে কোথেকে রে? তোরা দিবি নাকি?” লেফাঙ্গক হাসি দেখা দিল তাঁর ঠোঁটের ডগায়।

“হামরা! গরীব মনিষ হুজুর”—

“তবে?”

রসিক মাথা নাড়ল, “ঠিক বুলছেন হুজুর, বুললম্। কিন্তুক্ আপনার বাবামশায়ের সময়ে তো ইটা হইল না—তাই ভাবছি হামরা মনে মান দখ পাছি—গরীব মনিষ।”

শিবেন্দ্রকুমার ধমকে উঠলেন, “হয়েছে থাম্। আমার বাবা আর আমি কি এক মানুষ নাকি? আর আমার বাবার সময়ে দুনিয়া যা ছিল তা কি আজো এক আছে নাকি, এঁা? ডাঙ্গা দেওয়া হয়েছে, এখন সব কথা আবার খুলে বলা হল—তোরা আর বিলের মাছ ধরিবি না, বুলবি? বাস্—এবার বাড়ী যা সব”—মাছি তাড়াবার মত ভঙ্গী করলেন তিনি ডান হাত দিয়ে।

“কিন্তু হুজুর”—মরিয়া হয়ে বাকী কথাটা বলে নিজের সর্দারজীর দায়িত্বটাকে পূর্ণাঙ্গ করতে চাইল রসিক, “সাঁওতালরা সব গরম হয় উঠিছে—বুলিছে কি দরবার কইরলে হুজুর লরম হবিন।”

“সাঁওতালরা সব গরম হয়েছে!” শিবেন্দ্রকুমারের চোখ দুটোতে রক্ত দেখা দিল, তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, “তুই তো মোড়ল, যা, ঠাণ্ডা করগে তাদের” চকিতে একবার মংরাদের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে বিমর্ষভাবে বলল রসিক, “হামাকে উরা মাইনলে তো? ছোকরারা হামাকে বড়ুহা আগুনে দেখাছে বুলছে কি হামরা মাছ মারবুই মারবুই”

শাণিত হাসি ছড়িয়ে গেল তাঁর মুখে, শিবেন্দ্রকুমার সতেজে বললেন, বলছে! বটে!”

“আজ্ঞা”

“তাদের বলে দিস্ যে এমন দুঃসাহস যেন তাদের না হয়, সুখে থাকতে ভুতের কিলের জন্য আকুলিবিকুলি যেন না করে। আর যদি মাছ ধরেছ তবে বন্দুকের গুলীতে মাথায় খুলি উড়ে যাবে—এখন থেকে এখানকার থানায় চাবিশ ঘণ্টার জন্যই বন্দুকধারী পুলিশ থাকবে, বুলবি?”

এতক্ষণ মংরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল একপাশে, নির্বাক হয়ে শুনছিল সব কথা। এতক্ষণ পর্যন্ত রসিক যা বলেছে তা মোটা-মুটি ভালই, কিন্তু জমিদারের চোখ রক্তাভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বড়ো মানুষটা কেমন যেন মিইয়ে গেল, মেজাজটা কেমন যেন নিরীহ ভেড়ার মত হয়ে গেল। মংরা আর স্থির থাকতে পারল না, তাড়াতাড়ি সে রসিকের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

জমিদারের দিকে সোজা তাকিয়ে সে বলল, “কিন্তুক্ একটা কথা হুজুর—শোনা লাগে”—

“তুই কে রে? এঁা?” শিবেন্দ্রকুমার উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন।

“আজ্ঞা হামি—মংরা মাঝি”—

“সে আবার কে তুই—আমি চিনি না!”

রসিক মদুকণ্ঠে বলল, “আজ্ঞা হামার জামাই হুজুর।”

“বৈশ, কি চাস তুই?”

মংরা ধীরকণ্ঠে বলল, “হামাদের হক্ ক্যানে ছিনইয়া লিবেন হুজুর—বিলের মাছ-ধরা যে হামাদের হক্ আছেক্”—

চেয়ার ছেড়ে তড়িৎবেগে উঠে দাঁড়ালেন শিবেন্দ্রকুমার, দুটো বড় রক্তচক্ মেলে তিনি বললেন, “কি বলবি? হক্! রাসি সোয়াইন—হক্! বিল কি তোর বাপের মে শূয়ার?”

স্থির দৃষ্টি মেলে, সবাইকে স্তম্ভিত করে, দুঃসাহসী সাঁওতালটা জবাব দিল, “এই দুনিয়াটো তো কারো বাপের লয় হুজুর।”

দুনিয়ার জোখে কেঁপে উঠলেন শিবেন্দ্রকুমার, গর্জে বললেন, “চোপারও শূয়ারক্ বাচ্চা—ইউ সান অফ এ বীচ।”

মংরা হাসল, তার দু’চোখের তারাতে ঘনীভূত হিংসার আগুন কলসে উঠল, তবু আরো ধীরকণ্ঠে সে বলল, “গালি দিচ্ছে হুজুর! কথাটা ভাইভা দ্যাখেন। সাঁওতালরা বুলছে কি যে তারা তাদের হক্ ছাইড়বে নাই।”

“জনার্দন সিং”—শিবেন্দ্রকুমার ক্ষিপ্ত হয়ে ডাক দিলেন।

“হুজুর!”

সোজা হয়ে দাঁড়াল জনার্দন সিং।

“ব্যাটাকে নীচে নামিয়ে দেতো যাড়ে ধরে আর সবাইকে তাড়িয়ে দে এখন থেকে—সবাইকে। ব্যাটার গরম গরম গুলি খেয়ে তবে চিট্ হবে। তাড়া—ভাগা ব্যাটারে”—

গ্রে-হাউন্ড কুকুর দুটোও এবার গা বাড়িয়ে উঠল। মনিবের অঙ্গুলি নির্দেশ ও ক্রোধ ভঙ্গী লক্ষ্য করে তারাও হঠাৎ যেন উত্তপ্ত হয়ে উঠল, শেকল ছিঁড়ে প্রভুর বিরগভাজনদের টুটি কামড়ে ছিঁড়ে ফেলবার জন্য ওরা অধীর হয়ে উঠল।

“যা, তুরা সব ঘর যা—যা”—জনার্দন সিং গোঁফে চুমুড়ি দিয়ে সবাইকে নীচে নেমে যেতে ইঙ্গিত করল।

রসিকের মুখ চোখ পাংশু হয়ে উঠল। ভয় পেল সবাই। খরগোসের মত কাতর দৃষ্টি মেলে সবাই হঠাৎ সম্ভ্রান্ত পদক্ষেপে চলতে আরম্ভ করল। কেবল ওরা কজন ভয় পেল না, দুর্গম অরণ্যের শালগাছের মত দীর্ঘকায় ওরা কজনই নির্ভীক চাহনি মেলে ফিরে তাকাল, নিঃশব্দে একটা বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানায় ইস্পাতের মত কঠিন দেহভঙ্গী দিয়ে। ওরা—মংরা, সোমা, টোমা, শুকরা আর মেঘু। ওদের কুচক্ কালো চামড়ার নীচে যেন আগুন জ্বলছে উঠল, ওদের কবট বক্ষ, সুগঠিত উর, চওড়া কব্জি আর অজস্র পেশীবহুল পৃষ্ঠদেশ একটা অধীর উত্তেজনা খরখর করে কাঁপতে লাগল আর ওদের শান্ত, কালো চোখে হঠাৎ যেন দাবানল-দগ্ধ অরণ্যের রক্ত-দীপ্তি দেখা গেল। তবু আর কিছু বলল না ওরা নিঃশব্দে সামনের ধূলি-ধূসর পথটা ধরে এগিয়ে চলল।

শিবেন্দ্রকুমার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের যেতে দেখলেন। দেখতে দেখতে মাথায় ভাবন

এল তাঁর। তিনি শিক্ষিত, তিনি দেশের এবং সমস্ত পৃথিবীর খবরাখবর রাখেন। 'প্রতাহ ইংরাজী' বাঙলা সংবাদপত্র আসে তাঁর নামে, লন্ডন, প্যারিস, কলিকাতা, দিল্লী থেকে বাতাসের ধমনী বেয়ে দেশ বিদেশের প্রাত্যহিক ঘটনাবলী তার সুসজ্জিত কামরায় ঘোষিত হয়। সব খবরই রাখেন তিনি। আর দেখেনও অনেক কিছু। পৃথিবীটা দ্রুত বদলে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে মানুষ আর তার সমাজ। দ্বিগুণ দ্রুত সন্ন্যাসীদের রথের চাকার নীচে ছিল যে সব মানুষেরা তারা আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, রক্তবীজের মত বাড়ছে এসব বিদ্রোহীরা, আগামীকালের পৃথিবীটা যে একমাত্র ওদের সে বিষয়ে সন্দেহ করার মত নির্বোধ নন শিবেন্দ্রকুমার। সব জেনেও বিলকে ইজারা দিতে চান তিনি—যতটুকু লাভ হয়, যে কদিন ভোগ করা যায় এই আশায়। বহু-বিচিত্র পৃথিবীতে অজস্র ভোগের জিনিস আছে। বিলতী হোটেল আর নিজস্ব কুঞ্জ-বিভানে যে সব তিলোত্তমারা তাঁর পাশে থাকবে তাদের জন্য টাকা চাই, টাকা চাই রেসের জন্য, দামী মদের জন্য, রোমাঞ্চকর রাতের আলো আর অশ্বকরের জন্য। আজ এই সব সাঁওতালরা তাতে বাদ সাধতে চায় খানিকটা। হুঁ। যদিও তিনি চোখ পাকালেন, বন্দুকের ভয় দেখালেন, তবুও ভরসা কমে না। মাইলের পর মাইল ধরে বিলটা বিস্তৃত হয়ে আছে। এর কোথাও কেউ মাছ ধরলে তিনি টের পাবেন কি করে? আর আইনের ভয়কে অগ্রাহ্য করেই যদি তা করে বসে এসব জানোয়ারেরা তাহলেই বা তিনি তা আটকাবেন কি করে? ওরা যদি ক্ষেপে যায় তাহলে হয়ত বাধা হয়ে তাঁকে তাঁর হুকুম প্রত্যাহার করতে হবে। কিন্তু যতক্ষণ না সে অবস্থার উদ্ভব হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে বাধা দিতেই হবে। অতএব একজন লোক চাই—যে বিভীষণের মত স্বর্ণলংকার সন্ধান বলে দেবে, যে বিশ্বস্ত গুপ্তচরদের মত যথাসময়ে সতর্ক করে দেবে বিদ্রোহীদের গতিবিধি লক্ষ্য করে। অতএব—

হঠাৎ শিবেন্দ্রকুমার ডাকলেন, "জনাদর্ন সিং—"

"হুজুর—"

"সাঁওতালদের সর্দার ঐ রসিককে ডেকে আনো তো—আর সবাইকে যেতে বল, ওকে ছাড়া—"

"জী—"

ওরা তখন সবে জমিদার বাড়ির ফটকটা

পার হয়ে বাইরের রাস্তায় পড়েছে।

জনাদর্ন সিং ছুটে গেল।

"এই—আরে ও মাঝি, ও রসিক মোড়ল"—  
ধমকে দাঁড়াল দলটা।

রসিক মাঝি জনাদর্ন সিংয়ের দিকে তাকাল, "ডাইকছ ক্যান সিংজী—আঁ?"

জনাদর্ন সিং বলল, "জমিদারবাবু ডাইকছেন তুকে"—বাকী সবার দিকে তাকিয়ে আবার বলল, "আউর তুরা ব্যাবাক্ ফিরা যা"—

রসিক মাঝির মুখের ওপর একটা শঙ্কার ছায়া খেল গেল, "ডাইকছে! ক্যানে সিংজী?"

"সে হামি কি জানি রে—চল্ চল্"—

রসিক সবার দিকে তাকাল, "তুরা তবে আগে গিয়া দাঁড়া মাঠোং—হামি আইস্ছি"—  
নিশেপেদে রইল সবাই, চিন্তাকুল চিন্তে রসিক মাঝিকে জনাদর্ন সিংয়ের সঙ্গে চলে যেতে দেখল।

"চল জী—আগায়া চল সভাই"—টোমা হাঁক দিল।

মংরা আমোদ দিকে তাকাল, "কি হইল্ রে বাপু—আঁ?"

সোমা মাথা নেড়ে ঠোঁট উলটাল, "বুইঝতে লারছি ভাই"—

চট্ করে ভেবে নিল মংরা, বলল, "হামরা আগিয়ে যাচ্ছি—তু চুপি চুপি দেখা আয় তো কি হচ্ছে ওইঠি। সর্দারকে কি আটক্ কইরবে নাকি—জমিদারবাবুর মংলব ভালো লয়"—

"হয়—ঠিক কহাছিচ্—তুরা তভে আগায়া যা"—

"আজ্ঞা হুজুর?" সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে জমিদারের দিকে তাকাল রসিক মাঝি। গভীর আশঙ্কায় নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠেছে তার, প্রশ্ন করতে গলাটা কেমন যেন শুকনো মনে হল।

"এদিকে উঠে আয়"—তর্জনী দিয়ে আদেশটাকে জোরালো করলেন শিবেন্দ্রকুমার।

"আজ্ঞা"—আবার বারান্দায় উঠে দাঁড়াল রসিক মাঝি।

"তোকে সবাই সর্দার বলে, না?"

"আজ্ঞা তা বলে তো"—

"তুই ওদের যা বলবি তা ওরা করবে তো?"

"আজ্ঞা"—

"হুঁ"—পকেটে হাত দিলেন শিবেন্দ্রকুমার, বের করলেন কয়েকটা নোট, রসিকের দিকে তাকাদৃষ্টি মেলে বললেন, "এগুলো কি তা জানিস তো মাঝি?"

দশ লক্ষার নোট হুজুর।"

"তুই নিবি এগুলো।"

"না হুজুর"—সবেগে মাথা নাড়ল রসিক, তার ছোট ছোট চোখের তারায় একটা জলের পরদ চক্‌চক্ করে উঠল।

শিবেন্দ্রকুমার ধমকে উঠলেন, "হাঁ নিবি, নিতে হবে তোকে। তুই সর্দার, তোকে সবাইকে ঠান্ডা রাখতে হবে, দেখতে হবে যাতে কেউ মাছ না ধরে। আর যদি মাছ ধরতে নামে ওরা তবে আমাকে খবর দিবি, বুঝলি? আয়, এদিকে আয়, নে এগুলো। যদি আমার হুকুম তামিল না করিস তাহলে আজ এই ঘরে তোকে তালাবন্দ করে মারব ব্যাটা। নয় তো জমি কেড়ে নিয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেব। আয়"—

নোটগুলি খচমচ করে উঠল শিবেন্দ্রকুমারের হাতে, তার ঠোঁটের কোণে শুকনো একটা হাসির রেখা। রসিক তাকাল নোটগুলোর দিকে, একটা দুর্নিবার মোহ আচ্ছন্ন করল তাকে, তার চোখের সামনে একটা রঙীন পরদা ভেসে উঠল আর গলাটা শুকিয়ে এল তার। জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটোকে ভিজিয়ে নিয়ে একপা একপা করে এগোল সে। মন্ত্রমুগ্ধের মত, সম্মোহিতের মত। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল সে। না, ওরা কেউ ফিবে আসেনি। নোটগুলোর দিকে নজরটা ফিরে গেল তার। টাকা—যার ক্ষমতা অনেক, আণবিক বোমার চেয়েও যা ভয়াবহ বস্তু। রসিক মাঝির দুটো হাত তখন সামনের দিকে প্রসারিত হল, তার স্পর্শ-লোভাতুর হাতের আঙ্গুলগুলো থরথর করে কেঁপে উঠল।

কিন্তু ভুল দেখেছিল রসিক। দশ লক্ষার নোটের রঙীন ইসারা তখন তার পশ্চাৎ বছরের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে সব কিছুকে ঝাপসা, সব কিছুকে দেখবার ক্ষমতা লোপ করে দিয়েছিল। সে দেখতে পেল না, জমিদারও দেখতে পেল না যে, অনতিদূরে, ফটকের সম্মুখবর্তী আমগাছটার আড়াল থেকে একটা কালো মুখ দুটো রক্তরঞ্জন চোখের কঠিন দৃষ্টি মেলে রসিকের দিকে তাকিয়েছিল। তার কালো মুখটা তখন রাগে, হিংসায় প্রজ্জ্বলিত কালো কয়লার মত জ্বলছিল, দাঁতে দাঁত চেপে একটা বন্য গর্জনকে সে দমন করেছিল, আহত শ্বাপদের মত জ্বলন্ত চোখ মেলে সে একদৃষ্টে রসিক ও জমিদারবাবুর প্রতিটি ভঙ্গীকে লক্ষ্য করছিল। (ক্রমশ)



## উনিশ শতাব্দীর ভারতে সমাজ আন্দোলন

যোগানন্দ দাস

প্রায় দীর্ঘ দুশো বছর ধরে ইংরেজের যে শাসন-শোষণের তাণ্ডবলীলা চলছিল এই ভারতের বুকের উপর আজ তার অবসান হতে চলেছে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর ক্ষেত্রে যে নাটকের শূন্য, আজ তার সারা হবার পালা। মীরজাফর-উমিচাঁদের সমগ্র সেনা-বাহিনীতে যে বিশ্বাসঘাতকতা দেখা দিয়েছিল, তাকে অগ্রাহ্য করে এক সময়ে যে মুষ্টিমেয় হিন্দু ও মুসলমান স্বদেশভক্ত বীর পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের হৃদয়ের রক্তে সিঁক্ত করেও বাঙলা ও ভারতকে রাখতে পারে নি, সৈনিকার সেই বীর রক্তের সেচনের ফলে আজ সোণার ফসল ফলতে চলেছে। মীরজাফর উমিচাঁদের বংশ এখনও নিঃশেষ হয় নি সত্য, কিন্তু তাঁদের দিন ফুরিয়েছে। সে-কথা আজ তারা ভালো করে জানে বলেই মরবার আগে তাদের এই শেষ প্রাণপণ চেষ্টা। প্রদীপ নিববার আগে একবার দপ করে জ্বলে ওঠে।

এই কিষ্কিন্দু দুই শতাব্দীর ইতিহাস ভারতের নব জাগরণের ইতিহাস এবং এই সদা-গর্জনশীল ভারতীয় জাতির সংগে ঠঠাৎ-নবাব ব্রিটিশ শক্তির নিত্য সংঘাত ও সংঘর্ষের ইতিহাস। এই সংঘাতের ফলেই ভারতে জাতীয়তার জন্ম, জাতীয় মহানবীর অভ্যুদয়। এই ইতিহাসেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭। এই তারিখে ইতিহাসের সমাপ্তি নয়, নতুন অধ্যায়ের শুরুর মাত্র।

পলাশীর ক্ষেত্রে যে সংঘাত আরম্ভ হয়েছিল, সেটা শূন্য হাতিয়ারে-হাতিয়ারেই হয় নি, কটনীরিত্তি তার সবটা পরিচয় নয়। তার সীমা আবদ্ধ থাকে নি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে, বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার নবনিযুক্ত 'দেওয়ানের' রাজস্ব-সংগ্রহে। পলাশীর ক্ষেত্রে সংঘাত ঘটেছিল একটা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংগে আর একটা সভ্যতা ও সংস্কৃতির, ম্বল্ব বোধেছিল গোটা পাশ্চাত্য সমাজের সংগে ভারতীয় ও প্রাচ্য সমাজের। তার শেষ মীমাংসা এখনও হয়নি।

এই সংঘাত বা ম্বল্বনীতির প্রাণ হ'ল দেওয়া আর নেওয়া, ভাঙা ও গড়া,—এক সংগে। পুরাতনের সংগে নতনের সংঘাত যখন হয়, তখন পুরাতনের মধ্যে যা কিছু থাকে জীর্ণ ও অকেজো, যা নবাগত যুগের প্রতিদিনের প্রয়োজন মিটিয়ে চলতে পারে না,

সে-সমস্তই পড়ে ভেঙে ভেঙে আর নতনের কাছ থেকে সে নিত্য সংগ্রহ করে যুগোপযোগী নব নব পাথের। অথচ পুরাতন মানুষ নতনের কাছ থেকে সহজে কিছু গ্রহণ করতে চায় না, সে নতুন বলে 'বিদেশী বলে' অপরিচিত বলে। তাই এই সিম্বন্ধে লাগে ম্বল্ব নিজেদেরই ভিতর, অতীতে ও বর্তমানে পুরাতনে ও নতনে, সংস্কারে ও সংস্কৃতিতে। ফলে, জন্ম নেয় সম্পূর্ণ নতুনতর এক সমাজ, যা প্রাচীন সমাজ নয়, হুবহু নবাগত বিদেশী সমাজও নয়, কিন্তু উভয়ের মধ্যেই যা কিছু আছে প্রগতিশীল ও বেগবান, তাদের সমন্বয়ে এক অভিনব সমাজ ও সংস্কৃতি। যা ছিল সনাতন, তাই নতনের মিলনে নবরূপে জন্মগ্রহণ করে, আপনার ঐতিহ্যকে না হারিয়ে।

ইংরেজ আমলে ভারতের পরিবর্তনশীল রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের পাশাপাশি বা তাকে অঙ্গীভূত করে বিবর্তিত হয়েছে একটি নতুন ভারতীয় সমাজের নিত্য-নবায়মান ধারা। একদিকে ভাঙা, একদিকে গড়া। একদিকে যেমন চললো সাম্রাজ্যবাদীর শাসন-শোষণ, অন্যদিকে তেমনি বহিতে সূর্য করলো, ঐতিহাসিক নিয়মেই একটি প্রগতির ধারা। পুরাতন জীর্ণ সমাজের চিতাভস্ম থেকে ধীরে ধীরে উঠত হ'ল একটি নতুন বলিষ্ঠ আধুনিক সমাজের ভাবমূর্তি। এখনও সে-মূর্তি পূর্ণাঙ্গ প্রাণবান দেহ ধারণ করতে পারে নি।

এই যে প্রগতির ধারা, তার উৎপত্তি ভারতীয় জাতির অন্তর থেকে। বাইরে থেকে ইংরেজ চাইলো দেওয়ানী, চাইলো বাণিজ্য। সেই দেওয়ানী ও বাণিজ্যকে কায়মী করবার জন্য শূন্য হল তার শোষণ, এবং সেই শোষণকে নির্বিশ্বাস করবার জন্য প্রয়োজন হ'ল একটা করায়ত্ত শাসন-যন্ত্র। এমনি করেই "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে।" তার শাসন ও শোষণের প্রয়োজনে নিযুক্ত করল সে নানান মহালের এজেন্ট বা দালাল, এবং সৃষ্টি করে তুলল একটা বিরাট কেরানীর দল। ভারতীয় প্রাচীন সমাজ কোন অবস্থায় রইল বা না রইল, সেদিকে দৃষ্টি দেবার তার তাগিদও ছিল না, অবসরও ছিল না।

কিন্তু ভারতবর্ষ এই দেশব্যাপী সংঘাতের মধ্যেও তার প্রাণশক্তি বা মনীষা হারায় নি।

একদিকে সেই বিদেশী শাসনকে ঠেকাবার জন্য বিভিন্ন হিন্দু ও মুসলমান রাজন্যবর্গ পরস্পর নিছিন্নভাবে হাতিয়ারের আশ্রয় নিলেন, কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি নিজ নিজ স্বার্থের মধ্যে, নিজ নিজ রাজ্য রক্ষার বা অপরের রাজ্য হরণ করে তাকে বাড়াবার মধ্যেই ছিল আবদ্ধ, সামন্ত যুগের সীমাকে বা তার দর্শনকে অতিক্রম করে প্রসারিত হতে পারে নি। ইতিহাসে তাঁদের যা কিছু মূল্য, সেটা শূন্য ছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে। তাঁরা নতুন যুগকে ধরতে পারেন নি বলেই একটা ব্যাপক জাতীয় ও সামাজিক দৃষ্টি নিয়ে হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে রথে দাঁড়াতে পারেন নি, নিজেদের মধ্যে মারামারি করে কাটিয়েছেন। তাই তাঁদের সকল চেষ্টাই বার্থ হয়েছে।

অপর পক্ষে একদল লোক দু'পাতা ইংরেজী শিখবার ও বিলাতী ক্রায়দা আয়ত্ত করবার দিকে ঝুঁকতে পড়ল নিজেদের বাস্তবগত স্বার্থের জন্য উৎকৃষ্ট বা গৌরবান্বিত কেরানী বা দালাল হয়ে সম্পত্তি, প্রতিপত্তি ও পদ-মর্যাদা বাড়াবার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু ভারতের যে সূক্ষ্মতর ও গভীরতর মনীষা বা সংস্কৃতি, সে ঘুমিয়ে ছিল মরে নি। পশ্চিমের বিপুল সংঘাতে সে জেগে উঠে দেখা দিল অস্পসংখ্যক মানুষের মধ্যে। তাঁরা বুঝলেন যে, এটা শূন্য এদেশে ইংরেজের অভিযান নয়, এ হল পুরাতনের দুর্গপ্বারে সম্পূর্ণ একটা নতুন যুগের অস্থির ও বিরাম-হীন করাম্বাতি। তাঁরা বুঝেছিলেন, একপক্ষে যেমন কেবলমাত্র কেরানীগিরির জন্য বা বাস্তবগত জীবনে বিলাতী কায়দা আয়ত্ত করবার জন্য ইংরেজী শিখলে বিলাতী আমল এদেশে অচলায়তন হয়ে থাকবে, অপরপক্ষে তেমনিই, ইংরেজকে যদি ভবিষ্যতে এদেশ থেকে বিদায় করতে হয়, তবে সেটা আপাতত শূন্য সাবেকী গোলাগদলি, বারুদ বা তলোয়ারের সাহায্যে চলবে না। সে-কাজটি করতে গেলে আগে নতুন যুগের যে শিক্ষা ও অন্তর্নিহিত শক্তি তাকে সমগ্রভাবে আয়ত্ত করতে হবে। অর্থাৎ গোটা সমাজকে ঢেলে সাজতে হবে, যুগোপযোগী করতে হবে।

গোটা সমাজকে স্বাধীনতার ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে না পারলে যে সে স্বাধীনতা বা গণতন্ত্রকে ধরে রাখতে পারা যায় না বা সেটা বাস্তব চোহারা নিয়ে দেখা দেয় না, এ ধারণা বর্তমান জগতের মনের মধ্যে ক্রমেই গেঁথে যাচ্ছে ও প্রসার লাভ করছে। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টি, এই দর্শনের নাম সমাজতন্ত্রবাদ। সমাজতন্ত্রের ভিত্তি শূন্য তথাকথিত রাষ্ট্র নয়, সমগ্র সমাজ; শূন্য সমস্ত পুরানো ভাঙচোরা আবর্জনা সমেত তথা-

কথিত গরীবের দুনিয়া নয়, সর্বপ্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিপন্থী, বিভেদমূলক কদাচার ও কু-সংস্কার থেকে মুক্ত, সমঅধিকারযুক্ত, আদর্শ গণতান্ত্রিক সমাজ। এই 'সমাজ'-আলোকে আলোকিত ও সামাজিক কুসংস্কার মুক্ত গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রতন্ত্রের নামই সমাজতন্ত্র।

পাশ্চাত্য দেশে এই ধারার বিবর্তন হয়েছে ধাপে ধাপে। বৈশ্বাভিক সমাজতন্ত্রবাদের পিছনে আগেকার যুগের সামন্ততন্ত্রের ভগ্ন-মৃত্যুপের উপর অধিষ্ঠিত যেমন একটি অবশ্যম্ভাবী সংস্কারমূলক সামাজিক আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস ছিল, ভারতবর্ষেও সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীবোপে একদিকে সামন্ততান্ত্রিক যুগের অবসানের ও অন্যদিকে আধুনিক সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার অভ্যাসের এই উভয়ের একতানে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে, তেমনই একটি সামাজিক আন্দোলনের বিকাশ ঘটেছে স্তরে স্তরে।

এদেশে ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী সমাজ-তান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি রচনা করে গিয়েছে ঊনিশে শতাব্দীর এই সমাজ আন্দোলন। তাকে কেউ দেখেছে সংস্কার আন্দোলনরূপে, আবার সমসাময়িক রক্ষণশীল সমাজের মানুষেরা তাকে 'সমাজ-বিপ্লব' আখ্যা দিয়ে তার থেকে ভয় পেয়েছে, তাকে বাধা দিয়েছে এবং দূরে ঠেলে রেখে একঘরে করবার চেষ্টা করেছে।

ঊনিশ শতকে প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত-তান্ত্রিক বিরূট প্রাচীন সমাজের মধ্যে যে অল্প সংখ্যক প্রগতিশীলের দল ছিল, যাদের মধ্যে স্বাধীন রাষ্ট্রের ভিত্তি স্বরূপ সামাজিক দৃষ্টি প্রথম খুলেছিল, তাঁদের অগ্রণী হ'লেন রাম-মোহন রায়। রামমোহন রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের দিকে গেলেন না, কেননা তিনি তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখলেন যে, এই ইংরেজ-অভিযানের পাশাপাশি রয়েছে ফরাসী বিপ্লবের একটি বৃহত্তর গণতান্ত্রিক জীবন-দর্শন যা রাষ্ট্রকে অতিক্রম করে পেঁছেছে মানুষের গৃহে, পরিবারে, সমাজে, যার নাম 'ফ্রেঞ্চ ইলিউমিনেশন' বা ফরাসী জীবনালোক; এবং যে চিন্তার ধারা শূদ্ধ ফ্রান্সের চৌহদ্দীর মধ্যে বাঁধা পড়ে থাকে নি। তাই তিনি ভল্টেয়ারের ইতিহাসকে পাঠ্য করে দিলেন তাঁর নিজস্ব বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য; এবং মন দিলেন, প্রাচীন ভাব-প্রধান ও কীর্তন প্রধান এবং তান্ত্রিক 'ক্রিয়া'-বহুল খণ্ড খণ্ড সমাজকে পরিবর্তিত করে, তাকে নতনের সঙ্গে সমন্বিত করে (নতনের অর্থ অনুকরণের মধ্যে দিয়ে নয়), জ্ঞানের, যুক্তির ও গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি নিখিল ভারতীয় নতনতর আধুনিক সমাজ গড়বার দিকে। সেই নতন ভাবের সমাজ ও সংস্কৃতিরই প্রথম পরিকল্পনা ও বিনিয়াদ দেখা দিল ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে।

প্রধানত তিনটি সমাজ-আন্দোলনকে আশ্রয় করে সারা ঊনিশ শতাব্দী জুড়ে প্রাচীন সমাজ ভেঙে নতন প্রগতিশীল ভারতীয় সমাজের কাঠামো গড়তে থাকলো,—ব্রাহ্মসমাজ (১৮২৮), প্রার্থনা সমাজ (১৮৬৭), আর্যসমাজ (১৮৭৫)। এই তিনটি আবার পরস্পর সংশ্লিষ্ট। প্রার্থনা সমাজকে ব্রাহ্মসমাজের শাখা বললেও অত্যন্ত হয় না। প্রধানত এই তিনটিকে আশ্রয় করেই ঊনিশ শতাব্দীর বিরাট সামাজিক আন্দোলন হয়ে গিয়েছে, যার ফল আজ আমরা উপভোগ করছি এবং যে আন্দোলন ভবিষ্যৎ সমাজ-তান্ত্রিক সমাজের উপযোগী জন্ম তৈরী করে দিয়ে গিয়েছে।

সারা শতাব্দীব্যাপী এই বিরাট আন্দোলনের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া দূরে থাকুক, সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়াও এখানে সম্ভব নয়। আমি শূদ্ধ বিষয়গুলির উল্লেখমাত্র এখানে করব।

১। প্রথম আরম্ভ সতীদাহ নিবারণ আন্দোলনে (১৮১৮—১৮২৯)। এই আন্দোলন রামমোহন রায় আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সমাজদেহে প্রচণ্ড আলোড়ন দেখা দেয়। প্রতিক্রিয়াশীলের দল তাড়াতাড়ি সংঘবদ্ধ হয়, সতীদাহ নিবারণ বা নিষেধকদের 'সতী-স্বৈরী' নাম দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু করে, তাদের সঙ্গে একত্র আহা-বিহার, সকল প্রকার সামাজিক ক্রিয়াকর্ম নিষেধ করে ফতোয়া দেয়, কিন্তু তা টেকে নি। সতীদাহ নিবারণ আইনই এ-যুগে প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে সামাজিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীলদের প্রথম বিজয় লাভ। এর পরে সামাজিক আন্দোলন চলতে থাকল দ্রুতগতিতে ও নানা দিকে। যেমন :

২। বিবাহ-সংস্কার—(ক) বিধবা বিবাহ প্রচলন, (খ) বহু বিবাহ নিবারণ, (গ) বাল্য-বিবাহ নিবারণ, (ঘ) 'পুনর্বিবাহ' প্রথা নিবারণ, (ঙ) অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন, (চ) বাঙালী-অবাঙালী ও ভারতীয়-অভারতীয় বিবাহ প্রচলন, (ছ) পণপ্রথা নিবারণ, (জ) বিবাহের উদ্দেশ্যে পাশপাশীর পরস্পর সাক্ষাৎ মনোনয়ন প্রথা প্রবর্তন, (ঝ) বিবাহে ও অন্যান্য কার্বে শূভদিন, লগ্ন, জোটক প্রভৃতি কুসংস্কারের অস্বীকৃতি, (ঞ) সধবার লক্ষণ-স্বরূপ শাখা, সিঁদুর, নোয়া প্রভৃতি প্রচলিত সংস্কারের বিরোধিতা (এ বিষয়ে অসীম মনের বল লাগে। ঊনিশ শতাব্দীতে এ বিষয়ের পথ-প্রদর্শক অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার কন্যা সুশীলা বোস। দুইজনেই কুসংস্কার মানবেন না বলে বিয়ের পর সধবার চিহ্ন ত্যাগ করেন এবং দু'জনেই বিধবা না হয়ে সধবা অবস্থাতেই মারা যান)।

৩। স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলন, মেয়েদের স্কুল কলেজে শিক্ষা। সে-কালে প্রচলিত সংস্কার ছিল, লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়।

৪। অবরোধ প্রথা নিবারণ, স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলন। পুরুষের সঙ্গে নারীর সমান অধিকারের স্বীকৃতি।

৫। নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা—স্বাধীন ভদ্র জীবিকা প্রচলন (শিক্ষায়ত্নী, ধাত্রী, নার্স, ইত্যাদি)।

৬। ভদ্র গৃহস্থ নারী সমাজে সংগীত বিদ্যা প্রচলন। সেকালে সংস্কার ছিল, মেয়েরা গান বাজনা শিখলেই বিপথগামিনী হয়।

৭। নারীর বসন-সংস্কার। আগে রেওয়াজ ছিল খালি গায়ে থাকা। বাইরে বেরবার সময়ে চাদর বা আলোয়ান মুড়ি দেওয়া। সংস্কার ছিল জামা বা শেমিজ পরিলেই স্লেচ্ছ হবে, 'বিরি' হবে, জাত যাবে।

৮। দেশের কাজে ও জনসেবায় পুরুষের সঙ্গে স্বাধীনভাবে নারীর যোগদান, প্রকাশ্যে বক্তৃতা ইত্যাদি।

৯। গঙ্গাসাগরে শিশু হত্যা নিবারণ।

১০। শ্লেগ বসন্ত প্রভৃতিতে দেবদেবীর পূজার পরিবর্তে টীকার প্রচলন ও অন্যান্য কুসংস্কার নিবারণ।

১১। খাল্যখাদ্য সংস্কার। হেঁসেলের উপর ধর্ম বা মনুষ্য নিভর করে না, এই বোধ।

১২। কালাপানি পার হওয়া। আগে সাগর পারে গেলেই শাস্ত্রের শাসনে জাত বেত। ফিরে এসে গোবর খেয়ে "শুদ্ধ" হতে হত। প্রথম ভারতীয় নারীর সাগর পারে (বিনাত) যাত্রা (১৮৭০)।

১৩। জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা—ব্রাহ্মণের উপবীত ত্যাগ। ঊনিশে শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাসে এইটাই হ'ল অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবের আন্দোলন। ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন যে সমগ্র ভারতীয় প্রাচীন সমাজের গোড়া ধরে নাড়া দিয়েছিল এবং ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রাচীন সমাজের তীব্র বিরোধিতা ও অত্যাচার জাগিয়ে তুলেছিল, তার প্রধানতম কারণ ছিল—গৃহস্থ ব্রাহ্মণ কর্তৃক উপবীত ত্যাগ। আজও অনেক তথাকথিত 'কমিউনিষ্ট' এদেশে আছেন, বাঁরা বাড়ীতে বাপ-দাদার শাসনে কাঁধে পৈতে বুলিয়ে রাখেন, কিন্তু পার্টি-মিটিং যাবার সময়ে সেই পৈতে টাঁকে গুঁজে রাখেন। সামাজিক বিপ্লব বিরোধী বলেই প্রাচীন সমাজ-উদ্ভূত অধিকাংশ কমিউনিষ্ট ব্রাহ্ম-সমাজ-বিরোধী। প্রথম উপবীত-ত্যাগী গৃহস্থ ব্রাহ্মণ হ'লেন আদি ব্রাহ্ম সমাজের রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৪। অস্পৃশ্যতা নিবারণ আন্দোলন। এর সূত্রপাত ১৮৮০ সালে, দাক্ষিণাত্যের ব্যাংগালোরে।

১৫। মদ্যপান নিবারণ আন্দোলন। এরও জন্ম ঊনিশে শতাব্দীতে।

এই ধরনের আরও অনেক প্রগতিশীল আন্দোলনই দেখা দিয়েছিল উনিশ শতাব্দীতে, প্রাচীন সমাজকে যুগোপযোগী করে এবং ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক সমাজের বাহকরূপে ঢেলে সাজবার উদ্দেশ্যে। এগুলির অধিকাংশই দেখা দিয়েছিল ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনকে আশ্রয় করে, যার জন্যে সমাজ-বিশ্ববের আশংকা দেখা দিয়েছিল।

জন রবার্টস্ নামক একজন ইংরেজ চাকর সাহেব ১৮৭২ সালে প্রকাশিত একখানি বইয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন যে, “ইংরেজ আমলে এদেশে দু’টী “আপেনয় গিরি”র উদয় হয়েছে। প্রথমটির নাম সিপাহী বিদ্রোহ, তার বিপদ কেটে গিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়টি দেখা দিয়েছে, এটি আরও ভয়াবহ। এটিকে যদি বাড়তে দেওয়া হয়, তবে যে-বিশ্বব দেখা দেবে তার সামনে এদেশে ব্রিটিশ রাজত্বকে টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে। এই দ্বিতীয় আপেনয়গিরির নাম ব্রাহ্মসমাজ।”

এর কিছু পরেই বাঁকমচন্দ্র তাঁর আনন্দমঠ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের গোড়াতেই “বিজ্ঞাপনে” পরিণকার ভাষায় প্রাচীন সমাজকে সাবধান করে দিয়ে লিখলেন, “সমাজবিশ্বব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী।..... এই সকল কথা এই গ্রন্থে বদ্বান গেল।”

প্রায় এই সময় থেকেই এদেশে সমাজ-বিশ্বব-বিরোধী আন্দোলনের আরম্ভ। প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনগুলির ইতিহাস লিখবার অসবর আজ হবে না। তবে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এই সকল আন্দোলনগুলির অন্যতম হ'ল স্বয়ং এদেশীয় ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট। এদেশে ব্রিটিশের রাষ্ট্রনৈতিক শাসনের ইতিহাস ও প্রকৃতির আলোচনা অনেক হয়েছে। কিন্তু তার সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীলতার ইতিহাস এখনো লিখা হয়নি। লর্ড উইলিম্ বেন্টিন্ প্রভৃতি মুষ্টিমেয় যে দু'য়েকটি শাসক এদেশে সমাজ-সংস্কারে সহায়তা করেছিলেন সে হ'ল প্রধানত এদেশের জনমতের চাপে, স্ব-ইচ্ছায় নয়। রামমোহনের জীবিতকালেই বিলাতের ইন্ডিয়া হাউসে শাসকদের (কোর্ট অফ ডিরেক্টরদের) এক সভায় ভারতের জাতিভেদ সম্বন্ধে কথা উঠায় একজন ইংরেজ বলেন, “জাতিভেদ প্রথায় একেবারে হাত দেওয়া উচিত নয়। ঐ প্রথা আমাদের সাম্রাজ্য রক্ষার পক্ষে ভগবৎ প্রেরিত বা ‘গড-সেন্ড’। ঐ ভেদনীতি বজায় রাখতে না পারলে ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব থাকবে না।”

স্যার হেনরি কটন, আই সি এস, এদেশে ভারতবর্ষ বলে পরিচিত। তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম সভাপতি (১৯০৪)। ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত তাঁর ‘নিউ ইন্ডিয়া’ গ্রন্থে তিনি এদেশের জাতিভেদের ও বহুদেব-বাদের পক্ষে অনেক ওকালতি করেছেন। তাতে

তিনি বলেছেন, “ওগুলোতে কোনও রকমে হাত দেওয়া উচিত নয়, ওগুলো খুব ভালো জিনিস, থাকা দরকার।” এরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

ব্রিটিশ আমলে তাই দেখা যায়, সরকারী অথবা বেসরকারী অনেক ইংরেজ এদেশের মধ্যযুগীয় অনেক সামাজিক কুপ্রথা ও সংস্কার বজায় রাখবার প্রয়াসী ছিলেন এবং এদেশের প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক আন্দোলনগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মার্কিন অথবা ব্রিটিশ শাসক ও ধনী সম্প্রদায়ের সহানুভূতিলাভ করেছে।

যাই হোক উনিশ শতাব্দীর সামাজিক প্রগতির আন্দোলন ও ধারা ব্রিটিশ আমলে তার বাধা সত্ত্বেও অনেকখানি এগিয়েও মাঝ পথে স্থগিত আছে। আজ ১৯৪৭, ১৫ই আগস্ট তারিখে সে কথা বিশেষ করে মনে করা দরকার। আজ যে স্বাধীনতা এসেছে সে পূর্ণ স্বাধীনতা নয়, কৃষক-মজুরের স্বাধীনতা নয়। এই স্বাধীনতা আনতে গেলে গোটা সমাজের ভিত্তি বদলাতে হবে, শুল্ক রাষ্ট্রনৈতিক পরি-কল্পনায় চলবে না। সে কাজ করতে গেলে,

যে পর্যন্ত এসে সামাজিক বিশ্লব স্তম্ভ হয়ে রয়েছে সেখান থেকে আবার নতুনভাবে ভবিষ্যতের স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে তার রুদ্ধ ধারাকে মুক্ত করে দিতে হবে। আজকার দিনে দরকার একটা বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টি নয়, একটা সমগ্র ও বৈশ্বিক সামাজিক দৃষ্টি ও তার গঠন-পরিকল্পনা।



## ডায়াপেপসিন



হজমের ব্যতিক্রম হইলে পাকস্থলীকে বেশী কাজ করান উচিত নহে। বাহ্যতে পাকস্থলী কিছু বিশ্রাম পায় সেদৃশ কাৰ্যই করা উচিত। ডায়াপেপসিন সেই কাৰ্যই করিবে। কণ্ঠলীর কাৰ্য কতক পরিমাণে ডায়াপেপসিন বহন করিবে এবং খাদ্যের সারাংশ লইয়া শরীরে বল আনিবে। শরীরে বল আসিলেই পাকস্থলীও বললাভ করিবে ও এখন খাদ্য হজম করা আর তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইবে না। ডায়াপেপসিন ঠিক ঔষধ নহে দ্রব, পাকস্থলীর একটি প্রধান সহায় মাত্র।

ইউনিয়ন ড্রাগ  
কলিকাতা

## সাপের হাঁচ বোদয় চোনে

পঞ্চকজ্জুষণ সেন

হাঁ হাঁ, খবরদার, আর আপনারা কেউ ঘরে ঢুকবেন না বাবু।" বনমালী দুই হাত বাড়াইয়া রামাঘরের দরজা আগলায়। নটুবাবুরা তিন ভাই থমকিয়া দাঁড়াইয়া যায়। গতকলা সন্ধ্যার সময় বড় বউ চাকিতের জন্য কিসের যেন লাজ দেখিয়াছিলেন—টিক-টিকরও হইতে পারে, আবার সাপেরও হইতে পারে। এবং লেজটি যে কোন জীবের, তাহা তিন ভাই ও সন্তুষ্ট পরিবারবর্গের যাবতীয় সভোরা বহুরাত্রি পর্যন্ত তর্কবিতর্ক করিয়াও একমত হইতে না পারায় আজ বনমালী বেদের সম্মুখী আবির্ভাব।

নটুবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিজের সাহস দেখাইবার জন্য কপট বিরক্তির সহিত বলে, "সাপ না হাতী! ভেঁই মল সব?"

নটুবাবু ধমক দিয়া বলে, "থাক খবে হয়েছে, তোমার সব জায়গাতেই গোয়াতুর্মি করে কাজ নাই।" তাহার পর বনমালীর দিকে চাহিয়া বলে, "নাও হে বাবু, বটপুট হাতটা চালিয়ে বল দেখি ঘরে সাপটা কিছু আছে কি না।"

"এই যে বাবু।"

বনমালীর স্ত্রী ঝোলার ভিতর হইতে এক খণ্ড খড়ি বাহির করিয়া বনমালীর হাতে দেয়। বনমালী বলে, "দেন ত বাবু আপনার হেঁসেল ঘরটা একে, হাত চালিয়ে দেখি ঘরে আছেন কি না।"

নটুবাবু মোটামুটি রামাঘরের একটা নক্সা সিমেন্টের বারান্দায় আঁকিয়া ফেলেন। বনমালী নক্সাটা বেশ মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষণ করিয়া বলে, "নক্সাটা ঠিক হোল্চে ত? আখা কতি আছে? বাসনকেসনের জলচৌকী, নুন-তেলের কোলগা?"

নটুবাবু জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে বিশেষ এক শব্দ করিয়া বলে, "আমি কি ভ্রাম্য ত্যামন করে আঁকিতে জানি! কে আঁহস? থেকাকে একবার ডেকে দে ত: এবার নাকি রবিকাকুর না দুশপাঠাকুর একে প্রাইজ পেয়েচে। ও ঠিক জলচৌকী মায় কলস মার্কা পায়া পর্যন্ত হুবহু একে দেবে।"

বনমালী বাধা দিয়া বলে "থাক, অত বাহার করে আঁকিতে হবে না হুজুর। আপনি শুধু চারী মেরে দেখিয়ে দেন কতি কি আছে।"

বনমালী স্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য ছোট্ট করিয়া ডাকে—"চাঁচু?"

চণ্ডলা ফিরিয়া তাকইতেই বনমালী কি বেন ইশারা করে। চণ্ডলা ঝোলার ভিতর

হইতে একটি জরি বাহির করিয়া বনমালীর হাতে দিল। বনমালী সমবেত দর্শকমণ্ডলীর দিকে চাহিয়া বলে, "হাঁ এই দেখুন জরিটা—বাড়ির ঈষাণ কোণে পুঁতে খুলে সাপখোপ, বিছে, কাকিলাস, তক্ষক....."

"বাবা রে-এ-এ-এ" নটুবাবু ভীতকণ্ঠে লাফাইয়া তিন হাত দূরে সরিয়া যান। পায়ে উপর দিয়া এইমাত্র কি একটা চলিয়া গেল। নটুবাবুর সপ-ভীতিপূর্ণ মনটা আচমকা কোন কিছুর স্পর্শ পাইলেই অতিকাইয়া উঠে। যাক! আরসোলা দেখিয়া নটুবাবু একটু আশ্বস্ত হন।

নটুবাবু বনমালীকে তাড়া দিয়া বলে, "জরিটার পরে হবে, আগে হাতের কাজটা সেরে ফেল না।"

বনমালী জরিটা টাঁকের মধ্যে রাখিয়া বলে, "দি বাবু, তবে কি জানেন ছেলোপিলে নিয়ে ঘরকন্মা করেন, কখন কুন্মার দিয়ে বেপদ আসে বলা যায় না। একটা লিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে পারেন কত্তা।"

নটুবাবু শান্তকণ্ঠে বলে, "নেব নেব, তোমার কাজটা আগে শেষ হোক তার পর নেব।"

বনমালী মেঝের উপর হাতের চেটো পাতিয়া অনুচ্চস্বরে মন্ত বলিতে ও ফুঁ মারিতে থাকে; আধ মিনিটের মধ্যে হাতের চেটেটা অশ্লিত ঘরের দিকে সরসর করিয়া চলিতে আরম্ভ করে এবং শেষ পর্যন্ত আঁকিয়া বাঁকিয়া অশ্লিত রামাঘরের এক কোণের নিকট থামিয়া যায়।

নটুবাবু পরম উৎসাহের সহিত জিজ্ঞাসা করে, "কি, পাওয়া গেল?"

বনমালী হাতের ধূলাটা ধীরস্থিরভাবে কাপড়ে মুছিয়া বলে, "গেল বলে গেল! জাত সাপ, খরিস? শুধু একটা লয় দু'দুটো।"

ভয়ে নটুবাবুর চক্ষু মোটা হইয়া যায়, সর্বনাশ! এতদিন সাক্ষাৎ মৃত্যুর সহিত বাস করিতে হইয়াছে। মৃত্যু বই কি! এই ত পশু সন্ধ্যায় নটুবাবু নিজেই টিকে ধরাইবার জন্য রামাঘরে ঢুকিয়াছিলেন; বাপস! একটা পা উহাদের কাহারও লেজের উপর পড়িলেই অন্য পাটা নটুবাবুকে আর এ পৃথিবীতে ফেলিতে হইত না, ফেলিত বৈতরণীর তন্য পাড়ে। নটুবাবুর সমস্ত রাগটা তাহার স্ত্রীর উপর পড়ে এবং এই আনুমানিক মৃত্যুর জন্য স্ত্রী ছাড়া আর কে দায়ী? স্ত্রী পড়ান হইলে

একটু আগুন চাহিয়া পাইবার যো নাই। ঘোড়ার ডিম, তামাক খাওয়াই ছাড়িয়া দিবেন।

বনমালী নটুবাবুর সন্তুষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া বলে, "বডুড ভয় পালছেন না? অবশ্য ভয়েরই জিনিস ত বটে। তবে আর ভয় নাই, আপনারদের সঙ্কলের ভয় নিজের মাথায় তুলে লিয়ে উদিকে এখনি ধরে আনছি। তবে এটাও সত্য কথা যে, কে বলতে পারে আজ একটু অসাবধান হব না? কে বলতে পারে যে, এই হেঁসেল-ঘরেই আমার শ্যাব সাপ ধরা। না কি বলছেন কত্তা?"

চণ্ডলা ছোটবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলে, "কত্তাঠাকুর, শুধু মুখের বড়াই কল্লেই আমাদের প্যাট ভরে না। বলতে নাই, উর আজ বদি কিছু হয় হমরাজকে কটাকা বকাসি দিয়ে উকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিতে পারেন?"

ছোটবাবু একটু অপ্রস্তুতভাবে মৃদু ফিরায়।

নটুবাবু ভাইয়ের বললে বলেন, "তোমাদের কাজটা সত্যিই একটা বড় কাজ, তার আর কথা কি!" নটুবাবুর আর দেরী সহ্য হয় না, সাপ দুইটা ধরা পড়িলে বাঁচেন, বনমালীর অবশ্যে যাহাই হউক। নটুবাবু বেশ খোসা-মোদী করিয়া বলে, "তা হলে আর দেরী কেন বাবা?"

বনমালী গায়ের ফড়িয়াটা খুলিয়া, বস্তাটা বেশ অটিসাট করিয়া পরিধান করিয়া বলে, "তা হলে একটা শাবল-টাবল দ্যান, উয়ারা আখার কোণেই আছেন।"

শাবল আসিয়া গেল।

বনমালী শাবলটা তুলিয়া লইয়া বলে, "তা হ'লে একটা চুঁজি ঠিক হয়ে যাক কত্তা, শ্যাবকণ্ডে যে কাঁচিরম্যাচার হবে সেটা ভাল লয়, তা মানে এগুতে তিতো পরে মিঠাই ভাল।"

নটুবাবু বলেন, "বেশ, ভূমি কত চাও?"

"দশটি টাকা লাগবে কত্তা।"

বাবসা এক চেটে! বিশ টাকা চাহিলেও দিতে হইবে, কিন্তু একটু দর না করাটা কি ভাল দেখায় ভাবিয়া বলেন, "বন্ড বেশী হ'ল হে একটা সম্ভব মতন বল।"

বনমালী হাতের শাবলটা দেওয়ালে ঠেকাইয়া রাখিয়া বলে, "তবে পারব না কত্তা, আপনারা শুধু টাকাটার দেখছেন, দেখছেন না যে একটা ছোবল মারলে আপনার দশ টাকাই হোক আর দশ হাজারই হোক, সব পেছনে থায়ে চোখ বুজতে হবে। আত্ম দিন কাল লিয়ে খেলা করছি ক্যাবল এর লেগে।" বনমালী নিজের পেটের উপর হাত বুলাইয়া দেয়।

নট্টবাবু বনমালীর সওয়ারের তেমন জবাব খুঁজিয়া পান না, রাজী হইয়া যান।

রান্না ঘরটা লম্বা খাঁচের। একটি মাত্র জানালা তাহাও কেহ সাহস করিয়া খুলিতে পারে নাই, বনমালী শিকলটা খুলিয়া চোকাঠের নিকট দাঁড়াইয়া বিড় বিড় করিয়া মশ্রু আঙড়াইতে থাকে।

নট্টবাবুর ছোট নানি কখন সকলের অলক্ষ্যে সাপ ধরবার কৌশলটা দেখিবার জন্য রান্নাঘরের দরজার নিকট দাঁড়াইয়াছিল। বনমালী পিছদ ফিরিয়া ধমক দিয়া বলে, “পালাও পালাও, ছেলের হিমিত দেখ দেখি!”

নট্টবাবুও ছেলেটির কাণ্ড দেখিয়া রাগের মাথায় একটীট মারিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া সরাইয়া লন। মনের ভাবখানা—যায় শত্রু পরে পরেই, তোর ওখানে গিয়ে কাজ কি বাপু!

বনমালী রান্না ঘরে ঢুকিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু আধ মিনিট পরেই বাহিরে আসিয়া বলে, “কতটা একটা ভুল হয়ে গেলছে?”

“কি হ’ল আবার?”

“কাপড় ঝাড়া দেওয়া হয় নাই, শেষে হয়ত বলবেন তোমার কোমরেই ত সাপ ছিল আগু থেকেরই; আপনি হয়ত না বুলতে পারেন, কিন্তু আর পাঁচজনে বলবে হয়ত; এই দেখুন—” —নট্টবাবু কিছু বলিবার পূর্বেই বনমালী বিশেষ দক্ষতার সহিত কাপড় ঝাড়িয়া দেখাইয়া দিল যে, তাহার কাছে সাপ থাকা অসম্ভব!

নট্টবাবু সন্তুষ্ট হইয়া বলেন, “পাগল নাকি কোমর আবার সাপ রাখা যায়! ওসব কোন চিন্তা নাই, তুমি আপনার নিজের কাজে যাও।”

বনমালী হুট মনে বলে, “বেশ কতটা আপনার আশীর্বাদে কাজ হাসিল হয়ে যাবে; একখানা কাপড় বকসিস্ লোব কিন্তু!” বনমালী অন্ধকার ঘরের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করে।

এই সুযোগে চণ্ডলা যাদু বিদ্যা দেখাইতে আরম্ভ করে। কাঠের বল, কাপড়ের পুতুল, পিতলের ঘোড়া, জীর্ণ এক জোড়া তাস, জীবন্ত বাদির এক জোড়া।

চণ্ডলা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সুর করিয়া চাঁৎকার করিয়া উঠে... “আররর... লাগ ভেল্ক লাগ, পিকলু মর্দনির লাচ.....” চণ্ডলার গঙ্গা শুনিয়া উঠানের আবালবৃদ্ধ ঝাঁটাইয়া আসিয়া চণ্ডলাকে ফিরিয়া ফেলে।

কাঠের বলটা চণ্ডলার হাতে এই আছে এই নাই, কাপড়ের পুতুল জীবন্তের মতন নাচিতে থাকে, অপরের হাতের তাস চণ্ডলা নিভুলভাবে ধালিয়া দেয়।

যানরের খেলা—

চণ্ডলা মাটিতে লাঠি ঠুকিয়া তাল দেয়, বানরটা তালে তালে বেশ নাচিতেছিল, হঠাৎ শব্দইয়া পড়ে। চণ্ডলা দড়িতে টান দিয়া বানরকে জিজ্ঞাসা করে “কি হলচে মানিক? রাগ?”

বানরটা ঘাড় নাড়ে।

“কান? বিয়ে করবি? ও ভাল ভাল! দেখত ইকে পছন্দ বটে?”

চণ্ডলা বানরীকে ‘রঙ্গমণ্ডে’ অবতীর্ণ করায় বানরটা সোৎসাহে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া সমবেত জনতাকে হাসাইয়া দেয়।

“মানিকবাবু শব্দবদ্যভাঙিতে কামন করে হাটবি একবার ইদিকে দেখিয়ে দেত।” বানর নিজের লাজটা কোঁচা ধরিবার কায়দায় হাত দিয়া ধরিয়া এক পাক হাটিয়া লয়।

“বলি ও হীরামন? তুর স্বামী পসিন্ হলছে ত?”

হীরামন ঘাড় নাড়ে, পছন্দ হয় নাই!

“এমন স্বামী! এমন মরদ! তবু পছন্দ লয়?” চণ্ডলা একটি ছোকরা দর্শককে দেখাইয়া বলে, “বলি ইকে পছন্দ?”

বানরী ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানায়। দর্শকরা হাসিয়া উঠে, ছোকরা লজ্জিতভাবে এক পার্শ্ব সরিয়া যায়।

“হীরামন? স্বামী গয়না না দিল কি করবি?” চণ্ডলা প্রদত্ত লাঠি লইয়া বানরী বানরটিকে এক ঘা বসাইয়া দেয়। বানর হইলেও রক্তমাংসের শরীর ত! নব বিবাহিত পত্নীর নিকট এইরূপভাবে লাঞ্চিত হইয়া হয়ত রক্ত প্ৰস্র হইয়া উঠে, বানবটা রাগিয়া গিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে বানরীকে কামড়াইয়া ও খামচাইয়া দেয়! বানরীও প্রতিশোধ লয়—ফলে হুড়োহুড়ি ব্যাপার।

চণ্ডলা নির্মমভাবে দুই চারি ঘা লাঠি কসাইয়া এই বিবদমান নব দম্পতীর মধ্যে পুনরায় দাম্পত্য শান্তি ফিরাইয়া আনে।

“যা হীরামন, বাবুদের পেনাম করে পয়সা চা।”

দশ বার আনা পয়সা আদায় হইয়া গেল।

এদিকে বনমালীর কি হইল?

জনতা পুনরায় রান্না ঘরের কাছে ফিরিয়া আসে, বনমালী তখনও শব্দ করিতেছে ঠক ঠক ঠক।

বস্তু বেশী দেবী হইতেছে। কে একজন জিজ্ঞাসা করে, “কই হে পেলে?”

আর একজন ঠাট্টা করিয়া বলে, “বুটাকে বসাচ্ছে বা!”

বনমালী শুনিতে পায়, দরজা খুলিয়া মৃদু ব্যাড়াইয়া বলে, “মুদ্রণী ধরতে আসি নাই যে সটান কাজ হয়ে যাবে” কার কত বকের পাটা আছে এসে ধর কানে একটো!” বনমালী শ্রুতি করিয়া জনতার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া

থাকে; কেহ আর উত্তর দেয় না।

বনমালী ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলে নট্টবাবু উঠানের লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, “তোমাদের সরফরাজি করবার কি দরকার। ও যা হয় করছে!”

বনমালী বাহির হইয়া আসে। পাওয়া গিয়াছে—প্রায় আড়াই হাত গোখরো।

বনমালী সাপটার গলা টিপিয়া ধরিয়া আছে—বনমালীর সমস্ত হাত সাপটা জড়াইয়া ফেলিয়া নিখুঁত আক্ৰোশে ফুলিয়া ফুলিয়া গর্জন করিতেছে।

নট্টবাবু ভীতকণ্ঠে বলেন, “ওরে বাবোরে!”

বনমালী অশ্রুতভাবে একটু হাসে।

ভীড়ের মধ্যে একজন খেলা দেখাইবার জন্য অনুরোধ করে। বনমালী নট্টবাবুর মস্তকের দিকে চাহিয়া বলে, “দেখাব”

নট্টবাবুর আর একটি সাপ তখনও রান্না ঘরের ভিতরে আছে—অন্ততঃ বনমালীর কথা অনুসারে। নট্টবাবু ব্যস্তভাবে বলে, আর একটা যে রয়ে গেল, ওটা ধরে ফেল আগে তারপর বত খুশি খেলা দেখিও।

বনমালী খালি বাঁপির মধ্যে সাপটা রাখিতে যাইতেছিল চণ্ডলা আগাইয়া আসিয়া বলে, “দাও, মা ঠাকরুন্দর দেখাইগে।” চণ্ডলা নিতান্ত সহজভাবে বনমালীর হাত হইতে সাপের পাঁচ খুলিয়া লইয়া নিজের হাতে জড়াইয়া মেয়ে মহলে চলিয়া গেল। অশ্রুত ক্ষমতা!

বনমালী পুনরায় রান্নাঘরে প্রবেশ করিল।

চণ্ডলা কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখে বনমালী তখনও বাহির হয় নাই, সাপটা বাঁপিতে বন্ধ করিয়া উদ্ভবনভাবে জিজ্ঞাসা করে, “যাব নাকি?”

বনমালী হাতের কাজ বন্ধ করিয়া বলে, “আমি।”

চণ্ডলা ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করে, “কি হ’ল কি?”

বনমালী একটা বিড় ধরাইয়া বলে, “হুঁল মাথা আর মৃদু! হাত চালিয়ে দেখলাম ঘরে সাপ নাই, ওদিকে রোগা ছেলের লেগে ওবুধ কিনব তার একটা পয়সা নাই, খামকা ফিরে যাব? তাই আমাদেরই দুটো কামান (বিষ দাঁত ভাঙা) সাপ ছেড়ে দিলাম। একটাত পেলাম আর একটা যে কতি সিঁদোল তা আর খুঁজে পোছি না।”

চণ্ডলা একবার ঘরের চতুর্দিকে দাঁষ্ট ফিরাইয়া লইয়া বিরাস্তি সহকারে বলে “দিন দিন তুর বৃদ্ধি খুলেছে! ঘরের মূর্তিটা খুলে খুঁয়ে সাপ ছেড়ে দিয়েচিস। দুটোই বে পালাই নাই এই তুর বাবার ভাগি! এখন কি করবি?”

বনমালী হতাশভাবে বলে “তাইত! ইদিকে



বলে বসে আছি যে দুটো সাপ আছে! তার ওপর বাড়ীত একটাও নাই যে আবার ছেড়েদি!"

বনমালী বাড়ির প্রসাদটা চণ্ডলাকে দিয়া বলে "চ" ত ঘর থেকে একবার বেরুই, মা মনসা যা করেন।"

বনমালীদের খালি হাতে বাহির হইতে দেখিয়া লুটুবাৰু, কাবুলিওয়ালাদের মতন তাগাদা মারিয়া জিজ্ঞাসা করে "কি হ'ল, আর একটা কই?"

বনমালী কপালের ঘাম মুছিয়া বলে "বোধ হয় ভেগেছে কত্তা! আর একবার হাত চালাতে হবে দেখছি।"

বনমালী পুনরায় হাত চালায়। নাঃ, আর সাপ নাই।

বনমালী নুটুবাৰুকে জিজ্ঞাসা করে "ঘরে নালি আছে নাকি জলনিকাশের?"

আর একটি সাপ না পাওয়ায় নুটুবাৰু মোটেই খুশি হয় নাই। হয়ত বিশ্বাসও করেন নাই তাই সিম্পন্ধভাবে বলে "তা ত আছে; কিন্তু তোমার নজর এড়িয়ে পালাল কি করে?"

বনমালী আমতা আমতা করিয়া বলে "তাইত!" তাহার পর পরম উৎসাহের সহিত বলে "ঠিক! এক ব্যাপার হোলচে কত্তা!"

"কি?"

"আজ্ঞে সেটা এই জরির গুণে! আপনাদিকে দেখানর পর জরিটা টাঁকেই থেকে গেলছিল! আপনাদের আগেই বুলেছি এই জরির গুণের কথা! সাপখোপে, ডম্ফক, শাঁখুচুশি—এক ডপ্ টিক্‌তে পারে না, জরির এমনি গুণে!"

জরির গুণ দেখিয়া নুটুবাৰু বিস্ময়ে প্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু উঠানের কত একজন প্রশ্ন করিল—"তবে অন্যটা পালাল না ক্যানে হে ওস্তাদ?" কঠিন প্রশ্ন! নুটুবাৰু মনে মনে ভাবে তাও ত বটে!

বনমালী কোন উত্তর দিবার পূর্বেই চণ্ডলা বনমালীর হাত ধরিয়া টান মারিয়া বলে, আয়ত হে'সেল ঘরের পিছনটা একবার দেখে আসি ঠিক ঐখানেই আছে।"

চণ্ডলা ও বনমালী রাসাঘরের পিছন দিকে সাপ খুঁজিতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে উঠানের লোকগুলিও পিছন ধরিল।

কি জংগল! বুনো ওল, কচু আর ভূত-কাঠির বন! বাছুর লুকাইলে পাওয়া যায়, তায় সাপ!

বনমালী ও চণ্ডলা খুঁজিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু কই?

চণ্ডলা বিরক্তির সহিত বাহিরের লোকদের শুনাইয়া শুনাইয়া বলে, "কোমরে এখনো জরিটা ধরোঁচিস ত? সাপটা এখান থেকেও পালক তাহলেই তুর নামে খুব জয়জয়কার পড়ে যাবে! দেখছিচিস ত মজা মারতে তিন কাহন লোক জুটেছে!"

বনমালী চণ্ডলার মুখের দিকে চাহিল। চণ্ডলার এই বিশেষ দৃষ্টির ভাষা বনমালীই জানে। জরিটা চণ্ডলার হাতে ফেরৎ দিলে, চণ্ডলা জরিটা রাখিতে চলিয়া গেল। জরির যা গুণ!

চণ্ডলা ফিরিয়া আসিয়া বনমালীর সহিত যোগ দেয়—কই সাপ?

রাসাঘরের নালির কিছু তফাতে একটা ছুতা হাঁড়ি উপড়ু হইয়া পড়িয়া আছে, যাগাটা তেমন সমতল না থাকায় একটু ফাঁক থাকিয়া গিয়াছে। চণ্ডলার তীক্ষ্ণ চক্ষু তাহা বহুদূরবেই দেখিতে পাইয়াছে, আর দেরী করিয়া লাভ কি? বনমালীর কানে কানে চণ্ডলা কথাটা জানাইয়া দেয়। বনমালী অতি সন্তপণে হাঁড়ির নিকটে গিয়া হাঁড়িটা তুলিয়া ধরিতেই সাপটা ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া যায়! বনমালী অশ্রুত তৎপরতার সহিত সাপ ধরিয়া ফেলে।

নুটুবাৰু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, জরির গুণ বটে! হুড়ু হুড়ু করিয়া অনেকগুলি জরি বিকি হইয়া গেল।

বনমালী গাল ফুলাইয়া তুমুরীতে ফুঁ দিয়া এক বিচিত্র সুরের সৃষ্টি করে, কোমরে ভর দিয়া সাপ দুইটি ফণা তুলিয়া দুলিতে থাকে—কি অতুলনীয় রূপ! মৃত্যুর সাক্ষাৎ দূতের এত বর্ণাবিন্যাসের এত শিল্প পারিপাট্যের কি অর্থ!

খেলা শেষ হইল। বনমালী নিজের জিনিসপত্র এক বায়গায় জমা করিয়াছে, বিদায় লইবার অভিপ্রায়ে হাত পাতিয়া বলে "কই কর্তা, দান এবার ছুটি!"

নুটুবাৰু একখানি দশ টাকার নোট বনমালীর হাতে তুলিয়া দিল। বনমালী নোটখানি সামলাইতে গিয়া ছোটবাৰুকে দেখাইয়া চণ্ডলাকে ইংগিত করে।

"আপনি কি দ্যাবেন দেন বাবু!" চণ্ডলা মিষ্টি করিয়া হাসিয়া ছোটবাৰুর কাছে হাত পাতে।

"ও আবার আলাদা করে কি দেবে! আমারই ছোট ভাই যে।" নুটুবাৰু ছোটবাৰুর হইয়া জবাব দেয়।

চণ্ডলা উঠিয়া আসিয়া নুটুবাৰুর পায়ের ধূলা লইয়া বলে "ভা জানি কত্তাবাবু! এই যে সাপ দুটো ধরা পল্ল তাতো বাড়িশুদ্ধ লোক খুঁশি হোল্‌চেন না আপনি একাই সবাই হয়ে খুঁশি হোল্‌চেন? বলুন বাবু? বক্সিস্ দেওয়াটা খুঁশির কাজ হুজুর! যার যার মন চায় তারাই দুচার আনা ফেলে দ্যায়—দশের লাঠি একের বোঝা!"

নুটুবাৰু চণ্ডলার কথার তোড়ে দাঁড়াইতে পারে না, বাড়ির দিকে পা বাড়াইয়া বলে, "বেশ বেশ, দেয় ত কিছু দিক্ না আমি ত আর মানা করি নাই!"

বনমালী নুটুবাৰুর পিছন ধরিয়া অন্দরে

চলিয়া গেল কিছু জলখাবার আদায়ের চেষ্টায়।

চণ্ডলা ছোটবাৰুকে একলা পাইয়া বলে, "দেখি বাবু আপনার হাতটা।"

"হাত দেখতেও জান নাকি?" ছোটবাৰু হাত পাতিয়া দেন।

চণ্ডলা ছোটবাৰুর হাতটা নাড়িয়া চাড়িয়া বলে—"মেলা ছেলোঁপলো!"

"হুঁ।"

"টাকা পরসোও হবে।"

"হুঁ।"

"তবে মনে ত্যামন....." চণ্ডলা কথাটা শেষ না করিয়াই ছোটবাৰুর মুখের দিকে তাকায়।

ছোটবাৰু উল্খম্ভভাবে বলে, "ধাম্‌লে যে?"

"গরীব মানুষ আমরা, পারলেও সব কথা কি আর বুলতে পারি?"

ছোটবাৰুর মনটা দুশ্চিন্তার ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়। কি বলিতে চায় এই বেদেনী? পারিবারিক? ব্যক্তিগত? না শারীরিক?

"নির্ভাবনায় বলতে পার।" ছোটবাৰু কোনক্রমে বলে।

"দুটো টাকা লাগবে কিন্তু।"

টাকার কথায় ছোটবাৰু চটিয়া উঠেন। বলেন "ও! বুজরুকি!"

"বুজরুকি! তবে আপনার মনের অশান্তি মনেই চেপে থোন।" চণ্ডলা ছোটবাৰুর হাত ছাড়িয়া দিয়া নিজের জিনিসপত্র গুছাইতে লাগিল।

অশান্তি? অশান্তি আবার কাহার মনে নাই! হয়ত টিলছোঁড়া ব্যাপার! লাগিলে তাক না লাগিলে তুক! কিন্তু এই অচেনা ছোট জাতের বেদেনী ভিতরের খবর পাইল কি করিয়া? দুটো টাকা বইত নয়! কতদিকে কত বাজে খরচ হইতেছে, না হয় বেদেনীর পেটেই দুইটা টাকা গেল!

"বেশ, দুটোকাই দেব, বল কি বলবার আছে।" ছোটবাৰু আর একবার হাতটা বাড়িয়া দেয়।

চণ্ডলা নিজের কাজই করিয়া চলে, হাত দেখিবার আর তেমন যেন উৎসাহ নাই। নির্লিপ্তভাবে বলে "থাক বাবু, আমাদের বুজরুকিতে আপনার আর বিশ্বাস করে কাজ নাই! এইত চোখের ছামুতেই দেখলেন দু'দুটো সাপ যমের দূত! যা একবার ডংশালে শিব পর্যন্ত হার মানে—সেই সাপ ধরতে হলে আমাদেরকেই ডাকেন তখন আমরা বুজরুকির জোরেই হোক আর যেমন করেই হোক প্রাণ হাতে লিয়ে কাল্‌ ধরতে যাই.....ধরতে পারলে দু'পাঁচ টাকা আর ছোবলালেই....." চণ্ডলা চক্ষু মর্দিয়া মৃত্যুর ভাণ করে।

একটি ছোটছেলে আসিয়া ছোটবাৰুকে

জানাইয়া দেয় যে “বাড়িতে” ডাকিতেছে।

আর হাত দেখান হয় না। ছোটবাবু একটি টাকা ফেলিয়া দিয়া বলে “আজ থাক।”

চণ্ডলা টাকাটা উঠাইয়া লইয়া হাসিয়া বলে “একদিন যেকোন কালে আমাদের উদিক পানে, এইত পশুপদুরেই থাকি, হাতটা দেখে একটা ভাল মাদুলিও দিয়ে দোব।”

বনমালী ফিবিয়া আসিল; গামছায় এক পট্টুলি মর্দি, একখানা পিতলের থালা,

একখানা ছেঁড়া শাড়ি আরও কত কি টুক-টুকি আদায় করিয়াছে।

ফিরবার পথে দুজনে এক পেট করিয়া মদ খাইয়া লইল। রুদ্রন ছেলেটার জন্য দুই আনার বাতাসা আর একটা কমলা নেবুও খরিদ করিতে ভুলে নাই! বনমালী চণ্ডলার কাছে হাত দিয়া টলিতে টলিতে চলিয়াছে কাঁধের ভার হইতে কলান সাপের খাঁপি দুইটি দুলিতেছে পূর্বে আর পশ্চিমে!

বনমালী নেশার ঘোরে জড়াইয়া জড়াইয়া বলে “বুঝলি চাঁচু এ যা হোল তা মাসের মতন!”

চণ্ডলা যত্নকর কপালে ঠেকাইয়া বলে, “হেই মা মনসা! প্যাটের জ্বালা বিষম জ্বালা! ছেগের জ্বালা (জ্বর) সহিতে নারি! এই অধমটুকু ক্ষমা করিস মা! ছেলেটা ভাল করে দে, আর বছর ভাল করে পুজো দোব তোরা!”

## ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

গোপাল ভৌমিক

পশ্চিম জওহরলাল নেহরু একবার একটি বিবৃতিতে প্রসঙ্গক্রমে বলিছিলেন : “এশিয়াকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে—ইউরোপ কিংবা পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য নয়, এশিয়ার প্রতিটি দেশের স্বাধীনতার জন্য। মালয় ও ইন্দোনেশিয়াসহ সকল পরাধীন দেশের স্বাধীনতাই ভারতের লক্ষ্য। পৃথিবী কখনও অর্ধেকটা দাস জাতিতে এবং অর্ধেকটা স্বাধীন জাতিতে বিভক্ত হয়ে থাকতে পারে না। অন্যান্য জাতি পরাধীন থাকলে ভারতের স্বাধীনতা স্থায়ী হতে পারবে না।” স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র সংগঠনের ভার গ্রহণ করবেন যে, পশ্চিম নেহরু তাঁর এই মূল্যবান উক্তি সম্মুখে রেখেই আমাদের বিচার করে দেখতে হবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতের স্থান ও ইতিহাস। যে বৈদেশিক অধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে আমরা এতদিন হাঁফিয়ে উঠেছিলাম, আজ তার অবসান হতে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অভ্যন্তরে ও বাহরে আমাদের কর্তব্যও বহুদূরে বেড়ে গেছে। আমরা আজ স্বাধীন হতে চলেছি—এটা বড় কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বাধীনতাই একটা জাতি বা দেশের জীবনে শেষ কথা নয়। স্বাধীনতা মহত্তর কর্তব্য সাধনের একটা উপায় মাত্র। সেই মহত্তর কর্তব্যেরও আবার দুটো দিক আছে—একটি হল স্বজাতির প্রতি কর্তব্য এবং অপরটি হল স্বজাতি বহির্ভূত অন্যান্য জাতির প্রতি কর্তব্য। এই দুটো কর্তব্য সম্বন্ধেই আমাদের অবিলম্বে অবহিত হতে হবে।

চোখের উপর যখন দেখি যে, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্দোনেশিয়ায় জনগণের স্বাধীন রিপাব্লিকের বিরুদ্ধে ডাচ সাম্রাজ্যবাদ অনায়াস অত্যাচার করে চলেছে, আমাদের অপর পার্শ্ববর্তী দেশ মালয়ে জাতীয়তাবাদীদের

বিরুদ্ধে চলেছে ব্রিটিশ কুটনৈতিক ষড়যন্ত্র এবং আমাদের অদূরবর্তী রাষ্ট্র ভিয়েতনামে চলেছে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের দীর্ঘায়ত নিষ্ঠুর সংগ্রাম—তখন আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতাকে মনে হয় অর্থহীন। পৃথিবী থেকে সাম্রাজ্যবাদী অনাচারকে সমূলে উৎপাটিত না করা পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা কখনও পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সাম্রাজ্যবাদী শাসন শোষণ দূর করার একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে ভারতের। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতাঙ্গ শক্তিপুঞ্জের আবির্ভাবের পূর্বে পর্যন্ত ভারত ছিল সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাংস্কৃতিক রাজধানী। ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতের দুইশত বৎসরের ইতিহাস বাদ দিলে আমরা দেখতে পাই যে, ভারত তার সমসাময়িক জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্য সকল দিক থেকেই ছিল উন্নত। সামরিক ও রাজনৈতিক দিক থেকেও ভারত ছিল তৎকালীন এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র। তবু ভারত কোনদিন তার সাম্রাজ্য বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করে নি। ইচ্ছা এবং চেষ্টা করলে ভারতের পক্ষে একটা বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও ভারত সেদিকে মন দেবার প্রয়োজন বোধ করেনি। রাজনৈতিক বিজয় তার লক্ষ্য ছিল না, তার লক্ষ্য ছিল আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক বিজয়। এই শ্রেয়োক্ত বিজয়লাভ করা ভারতের পক্ষে সম্ভবও হয়েছিল অতি সহজে। তার কারণ স্বার্থপ্রণোদিত রাজনৈতিক বিজয় তার লক্ষ্য ছিল না বলে কোন জাতিই ভারতের সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপন প্রচেষ্টাকে সন্দেহের চোখে দেখত না। একটু চেষ্টা করলেই তারা বদ্বতে পারত যে, ভারতের আধ্যাত্মিকতা এবং সংস্কৃতি প্রকৃতই উন্নত ধরণের। তখন তারা

অতি সহজেই তার কাছে নীতি স্বীকার করত। এমনই করে ভারত একদিন পার্শ্ববর্তী গ্রন্থ থেকে সুদূর জাপান পর্যন্ত তার সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং মূলত হয়ে দাঁড়িয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শ্রেষ্ঠ চিন্তা-নাযক। ভারতের সেই বহু প্রাচীন প্রভাবের চিহ্ন আজও রয়েছে ইন্দোনেশিয়ার মন্দিরে মসজিদে, থাইল্যান্ডের প্রাসাদ শিখরে, কাম্বোডিয়ার পথে প্রান্তরে। তাই এই সব দেশে আজ ভিন্ন ভিন্ন জাতি বাস করলেও এক সময় সাংস্কৃতিক দিক থেকে তারা ছিল বহুস্তর ভারতেরই অন্তর্গত। ভারতসহ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া একই সুবহুৎ পরিবারের শাখা-প্রশাখা একথা যদি বলা হয় তবে খুব অন্যায্য করা হবে না। এই প্রসঙ্গে আবার পশ্চিম নেহরুর Discovery of India নামক গ্রন্থে বর্ণিত একটি বিষয়ের উল্লেখ করছি। একজন শ্যামদেশবাসী ছাত্র শান্তিনিকেতন ভ্রমণ করে তাঁকে যে চিঠি লিখেছিলেন পশ্চিমজী তাঁর গ্রন্থে সেই চিঠির উল্লেখ করেছেন। এই চিঠিতে উক্ত শ্যামদেশবাসী ছাত্রটি ভারতবর্ষকে আখ্যাত করেছেন তাঁর ‘মাতামহী’ বলে—কেননা তাঁর মাতৃভূমির যে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম তার সব কিছুই ভারতের দান। শূদ্ধ শ্যাম নয়—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশের সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য।

যাই হোক, সুদীর্ঘ পরাধীনতার ফলে ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই সম্প্রীতিজনক যোগাযোগ হয়ে পড়েছিল বিচ্ছিন্ন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা নিষেধিত ভারত হারিয়ে ফেলেছিল তার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নেতৃত্ব। আজ আবার ভারতের স্বাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার মহা-মুহূর্তে ভারতের সেই হারানো নেতৃত্ব ফিরে পাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীন ও পরাধীন দেশগুলি আজ স্বেচ্ছায় নেতৃত্বের আশায় তাকিয়ে আছে ভারতেরই দিকে। স্বাধীন ভারত কিভাবে তাদের এ দাবী পূরণ করতে পারে—আজ অবিলম্বে তার উপায় উদ্ভাবন করা প্রয়োজনীয় বিষয়। অস্বাধীন ভারতের আদর্শ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতিপুঞ্জ কি আকুল আগ্রহে সাড়া দেয় তার বড় প্রমাণ আমরা পেয়েছিলাম মাস চারেক পূর্বে অনুষ্ঠিত দিল্লীর নিখিল এশিয়া সম্মেলনে। সুতরাং স্বাধীন ভারতের ঐক্য ও মৈত্রীর আহবানে তারা যে একযোগে সাড়া দেবে—সে বিষয়ে সন্দেহ করার আদৌ কোন কারণ নেই। বর্তমান অবস্থায় মাত্র দুটি দেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই অতিপ্রয়োজনীয় নেতৃত্বের অভাব পূরণ করতে পারে। তার একটি হল চীন এবং অপরটি ভারত। যুদ্ধ-দীর্ঘ হৃত্ত্রী জাপানকে ইচ্ছা করেই বাদ দেওয়া হল। জাপান তার গগনচুম্বী দুর্দশার জন্যে আজ যে শোচনীয় দুর্দশার মধ্যে পড়েছে তার জের কাটিয়ে উঠতে তার স্বাভাবিকভাবেই বেশ কয়েক বৎসর সময় লাগবে। বাকী থাকল মহাচীন। কিন্তু এই বিরাট দেশটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের বেশী আশান্বিত হওয়া যায় না। তার কারণ এই দেশের বহুদুর্ভিক্ষ আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং তার পররাষ্ট্র নীতির উপর বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রভাব। চীনে বিগত ৮ বৎসর কাল যে গৃহযুদ্ধ সমানে চলেছে তার ফলে এই রাষ্ট্রটির ভিত্তিমূল হয়ে গেছে কাঁচা। কম্যুনিষ্ট চীন সাহায্যের আশায় তাকিয়ে আছে সোভিয়েট ইউনিয়নের দিকে, আর চিয়াং কাইশেকের নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী চীন তাকিয়ে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উলার ঋণের দিকে। যুক্তরাষ্ট্র চীনের অনুসৃত বৈদেশিক নীতির মধ্যে এ দুর্বলতা স্পষ্ট ধরা পড়েছে। স্বাধঃপ্রণোদিত হয়ে প্রতি পদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুগামী হওয়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে চীনের বর্তমান বৈদেশিক নীতি। বিশ্বরাষ্ট্র সভায় অধঃস্বাধীন ভারত নিষ্পত্তি মানবতার পক্ষ নিয়ে এ পর্যন্ত একাধিকবার বিশ্ব-বিবেকের কাছে আবেদন জানিয়েছে। যুদ্ধ তাই নয়—বিশ্বজনমতের কাছে শ্বেত-সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণপ্রয়াসী কু-চক্রান্তের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতেও ভারত কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু চীনের পররাষ্ট্র নীতিতে ইদানীং এতটুকু সবলতার সম্ভাবনও আমরা পাই নি। মার্কিন সোভিয়েট রাজনীতির টানা-পোড়েনে পড়ে চীনের জাতীয় জীবনে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলেছে তারই থেকে জন্ম নিয়েছে এ দুর্বলতা। জাতীয় জীবনের এ দৌর্বল্য কাটিয়ে উঠতে চীনকে দৃঢ় ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করতে এখনও অনেককাল সময় লাগবে। তাই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নেতৃত্ব ভার বহন করার মত শক্তি বর্তমানে চীনের নেই। এ অবস্থায় এই ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণের দায়িত্ব এসে পড়েছে ভারতেরই স্কন্ধে। ভারতেরই স্কন্ধে একদিন সে দায়িত্ব ছিল—আবার দীর্ঘ দিনের পরবশতার শেষে সে দায়িত্ব এসে পড়েছে ভারতেরই স্কন্ধে। ভারত যে

সে দায়িত্ব বহনে পরাম্ভুখ নয়, তার একাধিক প্রমাণ ইতিমধ্যে আমরা পেয়েছি। ভারতের নেতৃত্ব দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিখিল এশিয়া মহাসম্মেলনের মধ্যে দেখেছি আমরা এর শুরুর সূচনা। মুক্ত স্বাধীন ভারত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সাম্রাজ্যবাদী শাসন শোষণের অবসান ঘটাতে এবং এই অঞ্চলে ঐক্য ও সংস্কৃতির দৃঢ় ভিত্তি স্থাপনে আগ্রাণ প্রয়াস পাবে—এরূপ বিশ্বাস পোষণ করার কারণ আছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির স্বরূপ বুঝতে হলে আমাদের বুঝতে হবে এই অঞ্চলে প্রচলিত সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের স্বরূপ। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে কয়টি দেশ আছে তার মধ্যে একমাত্র শ্যামকে (বর্তমানে থাইল্যান্ড নামে পরিচিত) বাদ দিলে প্রত্যেকটি দেশই সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা শোষিত ও নিপীড়িত। শ্যাম কার্যত স্বাধীন হলেও সে চতুর্দিকে শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদ-শাসিত দেশ-গুলির দ্বারা পরিবৃত। তার একাদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অক্টোপাশ ও অপর দিকে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সোভাতুর দৃষ্টি। এই দুই-এর মধ্যে পড়ে শ্যামের ভাগ্যে পরিপূর্ণরূপে বৈদেশিক প্রভাব বিজিত পূর্ণ স্বাধীনতা কোনদিনই ভোগ করা সম্ভব হয় নি। বিগত যুদ্ধপূর্ব যুগে তার উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর সে আগ্রাণ প্রয়াসে এই প্রভাব বর্জন করতে উন্মুখ হয়ে ওঠে। তখন তার উপর এসে পড়ে জাপ সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব। আজ যুদ্ধ শেষে শ্যাম পুনরায় স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সাম্রাজ্যবাদী শাসন সম্মূলে উৎপাটিত না হলে সে কখনও পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবে না।

সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শ্বেত সাম্রাজ্যবাদ জড়িয়ে আছে অক্টোপাশের মত। এর একটি হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। দীর্ঘকাল ধরে ভারত, ব্রহ্ম ও মালয় ছিল তার করতলগত। অপরটি ডাচ সাম্রাজ্যবাদ ইন্দোনেশিয়ার উপর দীর্ঘকাল সে একচেটিয়া প্রচুর করে এসেছে এবং বর্তমানেও সেই প্রভুত্ব পুনঃসংস্থাপনে হয়েছে ব্রতী। অপরটি হল ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ—ফরাসী ইন্দোচীনে এতকাল ছিল যার একাধিপত্য। বিগত বিশ্বযুদ্ধের শেষে ইন্দোনেশিয়ার মত ইন্দো-চীনেও জাতীয়তাবাদীরা স্থাপন করেছে একটি স্বাধীন রিপাব্লিক। এর নাম ভিয়েতনাম রিপাব্লিক। কিন্তু ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা আজও তাকে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। তারা ভিয়েতনাম রিপাব্লিকের উপর ফরাসী কর্তৃত্ব পুনঃসংস্থাপনে হয়ে উঠেছে তৎপর। কিন্তু

স্বাধীনতাকামী ভিয়েতনামীরা তাদের স্বাধীনতার দাবীতে অনমনীয় বলে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা রিপাব্লিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের দিক থেকে এই তিনটি শ্বেত সাম্রাজ্যবাদ পরস্পর-বিরোধী হলেও এশিয়াবাসী বিরোধী অভিযানে তাদের স্বার্থ এক ও অভিন্ন। তারা জানে যে, তাদের কারও স্বার্থ এশিয়ায় বিপন্ন হলে—অপরদের স্বার্থও অবশ্যম্ভাবীরূপে লাগবে আঘাত। তাই তারা নিজেদের অভিন্ন-স্বার্থ বলে মনে করে। এর মধ্যে যে আদৌ অত্যাধিক নেই—ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতাকামী রিপাব্লিকের বিরুদ্ধে ডাচ সাম্রাজ্যবাদীদের সংগ্রামে এবং ফরাসী ইন্দোচীনে স্বাধীনতাকামী ভিয়েতনাম রিপাব্লিকের বিরুদ্ধে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সংগ্রামে বৃটিশরা উভয় ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীদের যে সাহায্য করেছে তারই মধ্যে আমরা এর জড়মূল প্রমাণ দেখতে পেয়েছি। সাম্রাজ্যবাদীরা যখন তাদের স্বার্থকে এভাবে এক ও অভিন্ন বলে মনে করে, তখন পরাধীন দেশের জাতিগুলিকেও তাদের স্বার্থ এক ও অভিন্ন একথা মনে রেখে সম্মিলিত শক্তিতে আত্মনিয়োগ করতে হবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে। পরিবর্তিত বিশ্ব-পরিস্থিতিতে ভারতের স্বাধীনতা দাবীর কাছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আজ করতে হয়েছে নতি স্বীকার। ব্রহ্ম ও সম্মিলিত জাতীয় দাবীর বিরুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ আর দীর্ঘদিন তাদের অস্তিত্ব অক্ষুর রাখতে পারবে বলে মনে হয় না। তাই বলে বৃটিশরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের জাল গুলিয়ে নিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছে এরূপ মনে করলে ভুল করা হবে। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধের ব্যাপারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি যে সিংহস্বার-বিশেষ নে কথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। ভুলে হল বৃটিশদের শ্রেষ্ঠ সামরিক ঘাঁটি ও নৌবন্দর। একে তারা কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজী নয়। তাই মালয় ও সিংগাপুরকে আজও বৃটিশরা হাতছাড়া করতে চায় না। মালয় ও সিংগাপুর যদি তাদের হাতছাড়া হয়ে যায় তবে প্রাচ্যে তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থও ভীষণভাবে বিপন্ন হয়ে পড়বে। মালয়ের রাষ্ট্রীয় জীবনে যাতে দৃঢ় সংবদ্ধ জাতীয়তাবাদ কোন দিন দেখা দিতে না পারে, তার জন্যে তারা ইংল্যান্ডের মত এই ক্ষুদ্র দেশটিকে তিন তিনটি ক্ষুদ্র বিভাগে করে রেখেছে বিভক্ত। তার কিছুটা অংশ সরাসরি বৃটিশদের অধীন, কিছুটা বৃটিশদের অধীনে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির মত, আবার কিছুটা নামে স্বাধীন। কিন্তু কার্যতঃ সমগ্র মালয়ের উপরেই আছে বৃটিশ কর্তৃত্ব। এই

বিভেদকৌশল ত আছেই, সগে সগে আছে জাতি-বিশেষ সঞ্চার। মালায়ে খাঁটি মালয়বাসী আছে, বহু সংখ্যক চীনা ও ভারতীয়ও আছে। এদের পরস্পরের বিরোধ উত্তেজিত করে দিয়ে নিজেদের সাম্রাজ্যিক স্বার্থ অক্ষুর রাখা ব্রিটিশদের একটি সুপরিচিত সাম্রাজ্যবাদী অপকৌশল। সুখের বিষয় আজ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধে যুদ্ধোত্তর মালায়ের অধিবাসীরা বহুলাংশে একত্রিত হতে পেরেছে। কিন্তু মালায়ের শাসন কর্তৃক বর্জনের ইচ্ছা ব্রিটিশদের নেই। তাই তারা সমগ্র মালায়কে একটি কনফেডারেশনের অধীনে আনবার প্রস্তাব করেছে। আপাতদৃষ্টিতে প্রস্তাবটি মন্দ বলে মনে হয় না—কিন্তু উক্ত প্রস্তাবের কোথাও ব্রিটিশদের শাসন ফলতা হস্তান্তরের কথা নেই। এইখানেই হল প্রকৃত বিপদ। মালায়-বাসীদের তরফ থেকে তাই এ প্রতিরক্ষাশীল ব্রিটিশ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে উঠেছে প্রতিবাদের ধ্বনি। তবু ব্রিটিশরা জোর করে মালায়ে এই কনফেডারেশনের পরিচালনা চালু করার প্রয়াস পাবে—একথা মনে করার কারণ আছে।

ইন্দোনেশিয়ার দিকে তাকালে দেখি সেখানে ক্ষুদ্রে সাম্রাজ্যবাদী ডাচদের কুপ্রয়াস স্বাধীনতাকামী ও শান্তিপ্রিয় ইন্দোনেশিয়াদের দুর্দশার অন্ত নেই। ইংগ-মাকিং সাম্রাজ্যবাদের সহায়তা সত্ত্বেও ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরা কোন ক্রমে ইন্দোনেশিয় রিপাব্লিকের উপর নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। তাই তারা একবার করে রিপাব্লিকের সঙ্গে আপোষ-রফার ভান করছে এবং সেই সুযোগে নিজেদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে তারা সুযোগ সুবিধামত ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে চালাচ্ছে বর্বর সামরিক অভিযান। তারা যে ইন্দোনেশিয়ার বুক থেকে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন শোষণ দূর করতে ইচ্ছুক নয়—এটা তারই প্রমাণ। যুদ্ধোত্তর বিশ্বে সমগ্র জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা বিধানের জন্যে ও পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ। এই প্রতিষ্ঠানের সনদে শান্তি ও গণতন্ত্রের নামে কত বড় বড় বাণীই না প্রচারিত হয়েছে! এই প্রতিষ্ঠানের কত বিভাগ, কত দপ্তর! কিন্তু সব কিছুর উপরেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদীদের পূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান বলে ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে হল্যান্ডের অনায় অনাচারে তাদের কাউকে আমরা একটা মৌখিক প্রতিবাদও উত্থাপন করতে দেখি না।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইন্দোনেশিয়ার মত ভিয়েতনামও একটি সাম্রাজ্যবাদ-প্রপীড়িত দেশ। ডাঃ হো চি মিনের নেতৃত্বে স্বাধীনতাকামী ভিয়েতনামীরাও গড়ে তুলেছে একটি স্বাধীন রিপাব্লিক। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের শাসন-শোষণ থেকে সর্বাঙ্গীন মুক্তিই তাদের কাম্য।

পরাদীন জাতির স্বাধীনতার দাবীতে কারও কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়। কিন্তু ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা ভিয়েতনামের উপর তাদের শাসন-কর্তৃত্ব কিছুতেই বর্জন করতে প্রস্তুত নয়। ভিয়েতনাম নামে পরিচিত ভূতপূর্ব ফরাসী ইন্দোচীনকে একজন ইংরেজ গ্রন্থকার বলেছেন “প্রাচ্যর মূর্ত্তা”। এ নামের মধ্যে আদৌ অতীতি নেই। প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে এই দেশটি সত্যি অতুলনীয়। কিন্তু ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের বেপরোয়া শাসন শোষণে এমন সোনার দেশের অধিবাসীদেরও দুঃখদারিত্রের অন্ত নেই। নিজেদের দুঃখদারিত্রের অবসান-কম্পে তারা যদি আজ স্বাধীন হতে চায়, তবে তার মধ্যে দোষ কোথায়? কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের একনিষ্ঠ পূজারী ফরাসীদের সে কথা বিচার করে দেখার অবকাশ নেই। তারা চলে বলে কৌশলে প্রাকৃতিক সম্পদের আকর এই নোনার দেশের উপর নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব অক্ষুর রাখতে বন্ধপরিকর। তাই তারা আজ শান্তির সময়েও শান্তি ভিয়েতনামের বকে যুদ্ধের আগুন জ্বলাতে কসুর করেনি। তাদেরও কৌশল ডাচ সাম্রাজ্যবাদীদের অনুরূপ। একবার তারা জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে আপোষরফার ভান করে—পরমুহর্তে তারা সুযোগ পেলে তাদের বিরুদ্ধে চালার বেপরোয়া আক্রমণ। যুদ্ধশেষে গত দুই বৎসরকাল ভিয়েতনামে আমরা এই দুঃশোরই অভিনয় দেখে আসছি। কিন্তু স্বাধীনতাকামী ভিয়েতনামীরা এত সহজে নিজেদের রক্তমূল্যে কেনা স্বাধীনতার অধিকার ত্যাগ করতে সন্মত নয়। তাই তারা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের পশুশত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হয়েছে। নরনারী বালক বৃদ্ধ নির্বিশেষে স্বাধীনতার অধিকার দাবীতে ভিয়েতনামীরা দৃঢ় ও অনমনীয়।

মালায়, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদীদের এই কূটকৌশলী অনায় অনাচারের পটভূমিকা সম্মুখে রেখেই আমাদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতের নেতৃত্বের কথা বিচার করে দেখতে হবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে এই সাম্রাজ্যবাদী অনাচারের অবসান ঘটাতে না পারলে, ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ব্যাহত হতে বাধ্য। সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে আছে ঘনিষ্ঠ বোগাযোগ। তাই নিজেদের দেশে সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটানো-কেই কংগ্রেস কোনদিন তার একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করেনি। কংগ্রেস বরাবরই সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদীবিরোধী সংগ্রামকে তার আদর্শ বলে ঘোষণা করে এসেছে। বহু পূর্বে ১৯২১ সালেই কংগ্রেস একটি প্রস্তাবে তার বৈদেশিক নীতির ব্যাখ্যা করেছিল। এই

প্রস্তাবে ছিল যে কংগ্রেস পরাদীন দেশগুলির স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজের পূর্ণ সহানুভূতি ও সহযোগিতা দেবে। এ প্রতিশ্রুতি কংগ্রেস বরাবর রক্ষা করেছে এসেছে। জাপানের মাগুরিয়ারবিরোধী অভিযানে কংগ্রেস সর্বপ্রথম জানিয়েছিল তার প্রতিবাদ, চীনের জাপ-বিরোধী সংগ্রামে কংগ্রেসের সাহায্য ও সমর্থন সুপরিজ্ঞাত, ইথিওপিয়ায় ইটালীর অভিযানের বিরুদ্ধেও কংগ্রেস জানিয়েছিল সবল প্রতিবাদ, স্পেনে রিপাব্লিকের ফ্রাঙ্কো-বিরোধী সংগ্রামেও ছিল কংগ্রেসের অকুণ্ঠ সমর্থন। কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা দাবী করেছে শৃঙ্খল ভারতের জন্যেই নয়, সমগ্র বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের মুক্তির প্রতীক রূপে। কংগ্রেসের ১৯৪২ সালের ঐতিহাসিক আগস্ট প্রস্তাবের একাংশে ছিলঃ “বৈদেশিক শাসনাদীন এশিয়ার জাতি-পুঞ্জের স্বাধীনতার পক্ষে ভারতের স্বাধীনতা হবে প্রতীক ও ভূমিকা বিশেষ। রহু, মালায়, ইন্দোচীন, ডাচ ইণ্ডিজ, ইরান ও ইরাককেও ফিরে পেতে হবে তার পূর্ণ স্বাধীনতা।” আজ কংগ্রেসের এই প্রতিশ্রুতি পূরণের দিন এসেছে।

স্বাধীন ভারতের দিকে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরাদীন জাতিপুঞ্জ তাকাতে নতুন আশা ও ভরসা নিয়ে—সবল নেতৃত্বের প্রত্যাশায়। আমরা এতকাল তাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে জানিয়ে এসেছি নৈতিক সমর্থন ও সহানুভূতি। তার কারণ কার্যকরী সহানুভূতি দেখানোর উপায় পরাদীন ভারতের ছিল না। কিন্তু আজ আর সৌন্দর্য নেই। ভারত আজ স্বাধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। কাজেই এই সব পরাদীন দেশ আজ আমাদের কাছ থেকে কার্যকরী সাহায্য ও সমর্থনই প্রত্যাশা করবে। কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীন ভারত তাদের সে সাহায্য ও সমর্থন থেকে বঞ্চিত করবে না—এ প্রত্যাশা করবারও যথেষ্ট কারণ আছে। পূর্ণ স্বাধীনতা পাবার আগেই ভারত ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ সাম্রাজ্যবাদীদের অনায় অভিযান বন্ধ করায় যে কৃতিত্বের পরিচয় সম্প্রতি দিয়েছে তাতে পরাদীন জাতিপুঞ্জের মনে আশা সঞ্চারিত হবারই কথা। ইন্দোনেশিয়ায় ডাচদের যুদ্ধ আরম্ভ হবার কয়েকদিন পরেই পশ্চিম নেহরুর নেতৃত্বে ভারত গভর্নমেন্ট ভারতের উপর দিয়ে ডাচ সাম্রাজ্যবাদীদের বিমান চলাচল দিয়ে-ছিলেন নিষিদ্ধ করে। সগে সগে বিশ্ব নিরাপত্তা পরিষদেও এই ইন্দোনেশিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ভারত অবিরাম দাবী করেছিল যুদ্ধ বিরতি ঘোষণার নির্দেশ। অনায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতের এই সবস কঠোর ঘোষণা বিশ্বের অন্যান্য জাতি উপেক্ষা করতে পারেনি। বিশ্ব নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশে ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ সাম্রাজ্যবাদীরা



তাদের বর্বর অভিযান বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। এই ঘটনার আলোকে বিচার করে মনে হয় যে ভারত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রকৃত নেতৃত্বভার গ্রহণ করতে পারবে এবং এই অঞ্চলের পরাধীন জাতিপুঞ্জের স্বাধীনতা

সংগ্রামে সক্রিয় সাহায্য করে শ্বেত সাম্রাজ্য-বাদের অবসান ঘটাতে পারবে। পরাধীন জাতিপুঞ্জের স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেস এতকাল যে সমর্থন ও সহানুভূতি দেখিয়ে এসেছে তার পিছনে রাষ্ট্রশক্তি ছিল না। এবার রাষ্ট্র-

শক্তি কংগ্রেসের হাতে এসেছে বলে পরাধীন জাতিপুঞ্জের প্রতি তার নৈতিক দায়িত্বও গেছে বেড়ে। সেই দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা কংগ্রেসের আছে কি না—এবার আরম্ভ হল তারই অশ্বিনপরীক্ষা।

### স্বাধীনতা দিবস

আমাদের নিজস্বের আত্মা ছেড়ে দৈবাৎ কখনো যদি অন্য কোনো আত্মায় গিয়ে পড়ি তাহলে আমার যে কি দুর্দশা হয় কি বলব—ঠিক যেন ডাঙায় তোলা মাছের মতো। এই সৈদিন এ রকম একটা দুর্দশা ঘটেছিল। যেখানটায় গিয়ে পড়েছিলাম সেটা এক বিরাট আত্মা। আমরা অল্প জলের অধিবাসী, গভীর জলে গিয়ে অমনিতেই থৈ পাই না। তার উপরে আবার গিয়ে দেখি ওখানকার অধিকাংশ লোক বিষম বিম্বান। বিম্বান ব্যাঙরা যেমন ভালো বস্তা তেনে খারাপ শ্রোতা। তাঁরা সবাই বলেন, কেউ শোনে না। আত্মা জিনিসটা যদিচ খাঁটি বাঙলা দেশের জিনিস তথাপি দেখা যাচ্ছে এ যুগের বাঙালীরা ইংরেজি কেতায় বস্তুত করতে শিখেছেন, কিন্তু বাঙালী রীতিতে আত্মা দিতে ভুলে গিয়েছেন। আত্মার প্রাণশক্তি হল হাস্যরস। বিম্বানের আত্মায় হাস্যরস থাকে না, কিন্তু সবটা মিলিয়ে সমস্ত ব্যাপারটাই হাস্যকর হয়ে ওঠে।

আলোচনাটা শুরু হয়েছিল স্বাধীনতা দিবস নিয়ে; কিন্তু গোড়াতেই তর্ক উঠল স্বাধীনতা মানে কি, স্বাধীনতা এবং freedom-এর মধ্যে কি তফাৎ ইত্যাদি। একজন বললেন, আমরা যা পাচ্ছি সেটা স্বাধীনতাও নয় freedomও নয়, সেটা হচ্ছে independence. আরেকজন বললেন এর কোনটাই না বলে একে শুধু ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান বলাই বিধেয়। আড়াই ঘণ্টা ধরে এমন বিষম তর্ক চলল এবং প্রত্যেকটি কথার এমন সুক্ষ্ম মর্মার্থ প্রকাশ পেতে লাগল যে সে তর্কের গোলক ধাঁধায় পড়ে আমার ইংরেজি বাঙালার সামান্য যে জ্ঞানটুকু ছিল তাও তালগোল পার্কিয়ে গেল। তা ছাড়া স্বাধীনতা যে কি বিষম গোলমালে ব্যাপার সেটা ওখানে গিয়েই আমি প্রথম বুঝতে পারলাম। স্বাধীনতার এসব ভাষাকারেরা ঘরে বসে আড়াই ঘণ্টা ধরে তর্কযুগ্মে যা হয়রাণ হলেন গত পঁচিশ বছর ধরে যারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে এসেছেন তাঁরাও বোধকরি ততখানি হয়রাণ হননি।

বহু তর্কের পরে স্থির হল যে স্বাধীনতা আমরা পাইনি—১৫ই তারিখ থেকে স্বাধীনতার পথে সবে আমাদের যাত্রা শুরু হবে। ব্যাপারটা



একটু ভেবে দেখলেই কোতুকটা বুঝতে পারবেন। ভদ্রলোক এক কথায় গত ষাট বৎসরের ইতিহাসকে একেবারে নস্যাত্ন করে দিলেন। কংগ্রেস এতদিন যে লড়াই করল তাতে আমরা স্বাধীনতার পথে একটুও অগ্রসর হইনি। স্বাধীনতার এজিনটা এখনও ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ১৫ই তারিখে স্বাধীনতার স্টীম ভর্তি করে নিয়ে এজিনটা হঠাৎ পুরোদমে হুস হুস করে চলতে শুরু করে দেবে।

যারা স্বাধীনতা কথাটায় অপরিত কর-ছিলেন তাঁরা বলতে চান দেশের লোকের যখন পেটে অন্ন নেই, গায়ে বস্ত্র নেই, মাথা গুঁজবার ঠাই নেই তখন একে আমরা স্বাধীনতা বলব না। শূন্য কথা, দুশ বৎসব ধরে আমরা অন্নহীন, বস্ত্রহীন, বাসগৃহহীন আজ স্বদেশী শাসন চালু হবামাত্র ১৫ই তারিখে স্বদেশীদের সংগে সংগে আমাদের দৈন্যদশা এক মুহূর্তে ঘটে যাবে, এ আমরা কেমন করে আশা করতে পারি? বিরালিশ দিন জ্বরে ভুগবার পর যে রোগীকে আজ ভাত পথ্য দেওয়া হল সে যদি ডাক্তারকে বলে তার রোগ সারেনি, কারণ কিনা সে রুম-ক্যান্সি রেস দিতে পারছে না—সেটা কি নিতান্তই আবদারের মতো শোনাবে না? স্বদেশী মন্ত্রীদের হাতে যে আলাদিনের ল্যাম্প নেই সে কথাটা কিছদিন অন্তত স্মরণ রাখা কর্তব্য। এতদিন যে দুঃখ, অক্ষমতার দরুণ সহ্য করেছি এখন দুটা বছর না হয় ধৈর্য এবং উদারতার সংগেই সহ্য করলাম। দুশো বৎসরের এই দৈন্যদশা যত শীঘ্র ঘোচে সেজন্য অবশ্যই নিরলস চেষ্টার প্রয়োজন। সেটা সমালোচনার দ্বারা হবে না, সহযোগিতার দ্বারা হবে। স্বদেশী মন্ত্রিমণ্ডলীর কর্মপন্থা ধৈর্য ধরে লক্ষ্য করুন। যে মুহূর্তে তাঁরা বিপথে যাবেন সে মুহূর্তে নিশ্চয় বাধা দেবেন।

একথা অবশ্য-স্বীকার্য যে, দেশী মন্ত্রী হলই স্বদেশী শাসন হয় না। দেশী মন্ত্রী আগেও অনেক হয়েছেন, দুর্দশা বেড়েছে বই

কমেন। এককালে আমরা বলেছি Good government is no substitute for self-government. সুশাসনের চাইতে স্ব-শাসন ভালো। সে যুগ গিয়েছে। এখন বলব Self-Government is no substitute for good Government. স্বদেশী সুশাসনদেব কিছতেই প্রশ্রয় দেব না। এই সুত্রে দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে যে, পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলী স্বদেশী শাসনের যে কাঠামোটি তৈরি করেছেন সেটি মোটেই আশাপ্রদ নয়। সেই অতি পুরাতন ইস্পাতের ফ্রেমের উপরে একটু শুধু কংগ্রেস সোনার পাত লাগানো। অর্থাৎ কিনা সোনার পাথর বাটি। একদিকে সিভিল সার্ভিসের Steel frame অপর দিকে পুলিশ সার্ভিসের pig iron frame—এই দুই-এর সাহায্যেই এতকাল বৈদেশিক শাসন বলবৎ ছিল। যেসব ব্যক্তি স্বাধীনতার আন্দোলনকে ডাঙা দিয়ে ঠাণ্ডা করতে চেয়েছিল কংগ্রেসের কাছ থেকে আজ তারাই পেয়েছে সর্বপ্রথম পুরস্কার। সৈদিনেব পঞ্চম বাহিনীকে কংগ্রেস তার প্রধান বাহিনী করেছেন, শুধু বাহিনী নয় করেছেন বাহন। এর চাইতে দুর্দৈব আর কি হতে পারে। Independence makes strange bedfellows.

এই যদি স্বদেশী গভর্নমেণ্টের রকম হয় তবে এর রং বদলালেও চং বদলাবে না। বাঙালার সরকারে যা দিল্লীর দরবারেও তাই। সেখানেও আই সি এস আর ব্রিটিশ প্রতিপালিত নাইটদের প্রাধান্য। অথচ যে হরিবিষ্ণু কামাখ্য দেশের আহ্বানে আই সি এস পদ ত্যাগ করেছিলেন তিনি তো ওর মধ্যে নেই। কেন, তিনি কি কেন্দ্রীয় কিম্বা কোন প্রাদেশিক সরকারের চীফ সেক্রেটারী হতে পারতেন না? পুলিশের চাকুরিতে I. N. A officerদের নিযুক্ত করা যেত না? Experience-এর দোহাই দিয়ে পুরোনো আমলকেই বজায় রাখা হয়েছে। অত্যাচার, অবিচার, ঘৃণা, চুরি, কালাবাজার—এই তো পুরাতন Administration-এর experience. সেই experience আমাদের কোন কাজে লাগবে। নাঃ, থাক স্বদেশী শাসনের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে অনেক বিদ্রূপ এসে গেল। বলেছিলাম বিদ্রূপ সমালোচনার দ্বারা কোন লাভ হবে না। কিন্তু স্বভাব যার না মলে, এমনকি স্বাধীন হলোও। স্বাধীনতা-প্রাপ্তিতে এক-আধটু স্বাধীন মত ব্যক্ত করবার লোভ কিছতেই কাটাতে পারলাম না।

# রবীন্দ্র-কাব্য-জীবন-প্রবাহ

## কাব্য-স্মরণ-সংকলন

সংকলয়িতার নিবেদন

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও তিরোভাব

—এই দুটি-দিনই আমাদের সমভাবে পালনীয় ও স্মরণীয়। কি পঁচিশে বৈশাখে, কি বাইশে শ্রাবণে কবির জন্মাৎসব বা কবির স্মৃতি-তপ্পণ শ্রদ্ধায় ও অনুরাগে, স্মৃতি ও সংগমে তাঁর দেশবাসীর অবশ্য করণীয়। কিন্তু প্রতি বৎসর ঐ দিন-দুটিকে ঘিরে নানা স্থানে যে-সব অনুষ্ঠান হয়, লক্ষ্য করে দেখেছি, তাতে তাঁর সৃষ্টির মর্মকথাটি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, বহু বৃথা বাক্যের নিরর্থকতায় পড়ে যায় চাপা; প্রাতিষ্ঠানিক বাগাড়ম্বরে তাঁর বাণীমূর্তি হয়ে পড়ে নিঃপ্রভ। তাই অনেক সময় ভেবেছি, কেমন করে এ-সব অনুষ্ঠানে তাঁর কাব্য-জীবন-প্রবাহের মূল ধারাটি ধরে, তাঁর যে সৃষ্টি, ক্রমপরিণতির মধ্য দিয়ে গিয়ে পৌঁছিয়েছে সৃষ্টির অতীতে, তার একটু পরিচয় দেওয়া যায়,—যাতে সার্থক হয় আমাদের স্মরণ, তাঁর সেই নিরন্তর প্রকাশের পথে, অন্তরের উপলব্ধিতে।

এই কথা মনে নিয়ে আমি এখানে রবীন্দ্রনাথের যে-কাব্যসৃষ্টি, তার অরুণোদয়ে ক্ষীণধারা নিষ্কর-উৎস থেকে, মধ্যাহ্নদিনে দৃকলম্বাবী খরনদীপ্রোভ বেয়ে, শান্তসমাহিত সন্ধ্যায় মহাসাগরসংগম পর্যন্ত, যে অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য নিয়ে পরম পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছে, তাঁর একটু পরিচয়, আর তাঁর একটু ব্যাখ্যা—কবির আপন মূখের কথাতেই—দেবার চেষ্টা করেছি। বলবার দরকারও মনে করছি না যে, তাঁর অখণ্ড কাব্য-জীবন-প্রবাহের এ-পরিচয় খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ। আমি শুধু, কবি নিজে যে-কথা বলেছিলেন ‘রবীন্দ্র রচনাবলীর ভূমিকায়—

“আমার লেখার দ্বারা আমার জীবনের ধারার সঙ্গে সংগেই অবিচ্ছিন্ন এগিয়ে চলেছে।.....একটা ঐক্যের স্বাক্ষর তাদের সকলের মধ্যে অঙ্কিত হয়ে নিশ্চয়ই পরস্পরের আত্মীয়তার প্রমাণ দিতে থাকে” —সেই কথাটি মনে রেখে এই সংকলনটি করেছি। এ থেকে পঁচিশে বৈশাখের বা বাইশে শ্রাবণের কোনো একটি অনুষ্ঠানেরও যদি সামান্য সহায়তা হয়, তাতেই আমার তৃপ্তি। ইতি ২২শে শ্রাবণ। ১৩৫৪।

—অমল হোম

দ্রষ্টব্য—

ব'লে রাখা ভাল যে, কবির দীর্ঘজীবনব্যাপী কাব্যপ্রবাহের মূল ধারাটিকে একটি দিনের মধ্যে ধরা হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব-পর হবে না। ঠিক এই অনুষ্ঠানসম্পর্কটিকে সমগ্রভাবে রূপদান করতে গেলে যে সময়ের প্রয়োজন তা স্ফুট না হ'লে, এখানে যা সংকলিত হলো, তা স্থান কাল অনুযায়ী সংকোচিত করতেই হবে। সে-ভার রইলো অনুষ্ঠাতাদের হাতে। তাঁরা

তাদের অভিরূচি ও আয়োজনমতো এ পদ্ধতি পরিবর্তিত করে নেবেন। কবির কাব্যধারাগতির বোধসহায়তায় আমি যেখানে কোনো একটি কারো বা তার কবিত্ব ব্যাখ্যার একাধিক উদাহরণ সন্নিবেশিত করেছি, তাঁরা সেখানে সেটি অন্যায়সেই বর্জন করতে পারেন। তাতে তাঁর সৃষ্টির মূল ঐক্য-সূত্রটি ধরার পক্ষে অস্বীকৃতি হবে না ব'লেই আমার বিশ্বাস।

—সংকলয়িতা।

### [ বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের অনুমোদনক্রমে ]

“নিজের সত্য পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতরকার মূল ঐক্যসূত্রটি ধরা পড়তে চায় না। বিধাতা যদি আমার আত্ম দীর্ঘ না করতেন, তা হ'লে নিজের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করবার অবকাশ পেতাম না। নানা ধান্য করে নিজেকে দেখেছি, নানা কাজে প্রবর্তিত করেছি, ক্ষণে ক্ষণে তাতে আপনার অভিজ্ঞান আত্মার কাছে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম, তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে,— সে আর কিছ' নয়,—

আমি কবি মাত্র।”

২৫শে বৈশাখ। ১৩৩৮।

—২৩শে শ্রাবণের সংখ্যায় প্রকাশিত—

প্রথম ধারা—উন্মোচন। কৈশোরক। যৌবনস্বপ্ন ॥

১। “প্রভাত-সংগীত”। ২। “কড়ি ও কোমল” ॥

—৩০শে শ্রাবণের সংখ্যায় প্রকাশিত—

দ্বিতীয় ধারা—৩। “মানসী”। ৪। “সোনার তরী” ॥

—এই সংখ্যায় প্রকাশিত—

তৃতীয় ধারা—৫। “চিত্রা”। ৬। “কল্পনা” ॥

## উপক্রমণিকা

—“এক সময় যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলেম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আশ্রয় পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সাদরবিশ্বস্ত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সূর্যমুখী উদ্ভাস উদ্ভাসিত হতে থাকত, আমি কত দূরদূরান্তের দেশদেশান্তরের জলমল্ল বসন্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নিচে নিশ্চিন্তভাবে শুয়ে পড়ে থাকতাম, তখন শরৎসন্ধ্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস যে একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাশ্য বৃহৎভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব, এ যেন এই প্রতিনিয়ত অন্ধুরিত মূর্চ্ছিত পূর্লিকিত সূর্যস্নানাদি আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে, এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবরণে খরখর করে কাঁপছে।”

\* \* \*

—“এই পৃথিবীটি আমার অনেকদিনকার এবং অনেকজন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন।.....আমি বেশ মনোহর করে পারি, বহুদূর পূর্বে তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্রোত থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করতেন,—তখন আমি এই পৃথিবীর নতুন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলাম। তখন পৃথিবীতে জীবন্ত কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উদ্ভূত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলাম—নবশিশুর মতো একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলস্রবতলে আলোয়ালিত হয়ে উঠেছিলাম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার মস্ত শিকড়গুলি দিয়ে ভাঁড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলাম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্ভূত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যামছটা আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমার দুঃখে একলা মৃত্যুমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অঙ্গে অঙ্গে মনে পড়ে।”

—“ছিন্নপত্র” ॥

—“আজ মনে হয় সকলোর মাঝে

তোমারই ভালোবেসেছি;

তখন তা বাঁহিয়া চিরদিন ধরে

শুধু তুমি-আমি এসেছি।

চেয়ে চারিদিক-পানে

কী যে ভেগে ওঠে প্রাণে।

তোমার-আমার ভস্ম মিলন

যেন গো সকলখানে।

কতদূর এই আকাশে যাপন,

সে-কথা অনেক ভুলেছি,

তারায় তারায় যে-আলো কাঁপছে

সে-আলোকে দৌঁড়ে দুলেছি।

যাহা সূর্য-রোমাঞ্চ ধরণীর পানে

আমি-তবে নব-আলোকে

যে যবে আপনার মনে

প্রাণ ভরি উঠে পূলাকে।

মনে হয় যেন আমি

এই অকথিত বাণী,—

মুক মৌদিনীর মনের মাঝে

জাগছে যে-ভাবখান।

এই প্রাণে-ভরা মাটির ভিতরে

কত যুগে মোরা ঘেপেছি,

কত শরতের সোনার আনোকে

কত তুণে দৌঁড়ে কেঁপেছি।

\* \* \*

লক্ষ বরষ আগে যে-প্রভাত

উঠেছিল এই ভূবনে,

তাহার অরুণ-কিরণ-কাঁপকা

গাধি নি কি মোর জীবনে?

সে প্রভাতে কোন্‌খানে

জেগেছিল কে বা জানে?

কী মূর্ত্তিমাক্ষে ফুটলে আমারে

সেদিন লুকায়ে প্রাণে?

হে চির-সুধানো, চিরকাল মোরে

গড়িছ নতুন করিয়া।

চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর,

রবে চিরদিন ধরিয়া।”

—“উৎসর্গ” ॥ ১৩। রবীন্দ্রচন্দ্রাবলী ১০ম খণ্ড ॥

## চিত্রা

॥ ১৩০২ ॥

৪৬। পাঠ—

—“আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি, তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই—এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনো কণ্ঠস্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম, তখন মনে করিয়াছি আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি, কথাটা সত্য নহে। কারণ, সেই খণ্ড কবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই। সেই তাৎপর্যটি কি, তাহাও আমি পূর্বে জানিতাম না। এইরূপে পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি। তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল। তাই দীর্ঘকাল পরে একদিন লিখিয়াছিলাম—(৫১)

৪৭। আবৃত্তি—

“এ কী কৌতুক নিত্য নতুন

ওগো কৌতুকময়ী,

আমি যাহা কিছু চাই বলিবারে

বলিতে দিতেছ কই

অন্তর মাঝে বসি অহরহ

মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,

(৫১) “বঙ্গ ভাষার লেখক” গ্রন্থে কবির আত্মকথা হইতে “আত্মপরিচয়” পদ্যভূক্তের প্রথম সন্দর্ভরূপে সংকলিত।

মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ  
মিশায়ে আপন সুরে।  
কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই,  
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,  
সংগীত স্রোতে কল নাহি পাই  
কোথা ভেসে যাই দূরে। (৫২)

## ৪৮। পাঠ—

—“যখন যেটা লিখতেছিলাম, তখন সেইটেকেই পরিণাম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম।.....আমিই যে তাহা লিখিতেছি, এ সম্বন্ধে সন্দেহ ঘটে নাই। কিন্তু আজ জানিয়াছি সে-সকল লেখা উপলক্ষ্য মাত্র।.....তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর একজন কে রচনাকারী আছেন, বাহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান।  
“শুধু কি কাঁবতা লেখার একজন কতা কাঁবকে আক্রমণ করিয়া তাহার লেখনী চালনা করিতেছেন? তাহা নহে। সেইসঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে,—তাহার সমস্ত সুখ, দুঃখ, তাহার সমস্ত যোগ্যযোগ্যের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অক্ষত তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন—(৫৩)

## ৪৯। আবৃত্তি—

—“বলিতেছিলাম বসি একধারে  
আপনার কথা আপন জনারে,  
শুনাতোছিলাম ঘরের দুয়ারে  
ঘরের কাহিনী যত;  
তুমি সে ভাষারে দাঁহিয়া অনলে  
ডুবায়ে ভাসিয়ে নয়নের জলে,  
নবীন প্রতিমা নব কৌশলে  
গড়িলে মনের মতো।

এ কী কৌতুক নিত্য-নূতন  
ওগো কৌতুকময়ী।  
যৌদিকে পাশ্চ চাহে চলিবারে  
চলিতে দিতেছ কই।

পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক,  
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,  
ব্রহ্মত হৃদয় ভ্রান্ত পথিক  
এসেছি নূতন দেশে।  
কখনো উদারগিরির শিখরে,  
কতু বেদনার তমোগহবরে  
চিনি না যে-পথ সে-পথের পুরে  
চলেছি পাগল বেশে।  
থেপায় মতন কেন এ জীবন,  
অর্থ কী তার, কোথা এ ভ্রমণ,  
চুপ করে থাকি শুধায় যখন—  
দেখে তুমি হাস বুঝি।  
কে তুমি গোপনে চালাইছ মোরে  
আমি যে তোমারে খুঁজি।  
রাখো কৌতুক নিত্য-নূতন  
ওগো কৌতুকময়ী।  
আমার অর্থ, তোমার তত্ত্ব  
বলে দাও মোরে অঁরি।  
আমি কি গো বীণা-যন্ত্র তোমার,  
বাথায় পাইঁড়িয়া হৃদয়ের তার  
মুছনাভরে গীতঝংকার  
ধ্বনিছ মর্মমাঝে?  
আমার মাঝারে করিছ রচনা  
অসীম বিরহ, অপার বাসনা,  
কিসের লাগিয়া বিশ্ব-বেদনা  
মোর বেদনায় বাজে?

জেরেছে কি মোরে প্রদীপ তোমার  
কারবারে পুজা কোন দেবতার  
রহস্যঘেরা অসীম আধার  
মহামন্দিরতলে?  
নাহি জানি, তাই কার লাগি প্রাণ  
মারিছে দাঁহিয়া নিশিদিনমান,  
যেন সচেতন বাঁহুসমান  
নাড়িতে নাড়িতে জ্বলে। (৫৪)

## ৫০। পাঠ—

—“এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপবরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাহাকেই আমার কাব্যে আমি জীবন-দেবতা নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহ জীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না,—আমি জানি, অনাদিকাল ইহাতে বিচিتر বিস্মৃত অবস্থায় মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন।.....

[আমার অন্তর্নিহিত সে সৃজনশীল আমার জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখকে সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান তাৎপর্যদান করিতেছে, আমার রূপ-রূপান্তর-জন্মজন্মান্তরকে এক সূত্রে গাঁথিতেছে,—যাহার মধ্য দিয়া বিশ্বচরাচরের মধ্যে আমি ঐক্য অনুভব করিতেছি, তাহাকেই আমি ‘জীবন দেবতা’ নাম দিয়া লিখিয়াছিলাম (৫৫)—

## ৫১। আবৃত্তি—

—“ওহে অন্তরতম  
মিটেছে কি তব সকল তিয়াস  
আসি অন্তরে মম।  
দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়  
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,  
নিঠুরে পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ  
দলিত ব্রাহ্মসম।

কত যে বরণ, কত যে গন্ধ,  
কত যে রাগিনী, কত যে ছন্দ,  
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন  
বাসর শয়ন তব,—

গলাগে গলাগে বাসনার সোনা  
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা  
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া  
মরতি নিত্য নব।

আপনি বারিয়া লয়োছিলে মোরে  
না জানি কিসের আশে।

লেগেছে কি ভালো হে জীবননাথ,  
আমার রজনী আমার প্রভাত,  
আমার নর্ম আমার কর্ম  
তোমার বিজন বাসে।

বরষা শরতে বসন্তে শীতে  
ধ্বনিয়াছে হিয়া যত সংগীতে  
শুনেছ কি তাহা একেলা বসিয়া  
আপন সিংহাসনে।

মানস-বুসুম তুলি অণ্ডলে  
গেঁথেছ কি মালা, পরেছ কি গলে,  
আপনার মনে করেছ ভ্রমণ  
মম যৌবন বনে।

কী দেখিছ বন্ধু মরনমাঝারে  
রাখিয়া নয়ন দুটি  
করেছ কি ক্ষমা বাক্য আমার  
স্থলন পতন হুটি।

পূজাহীন দিন, সেবাহীন রাত,  
কত বার বার ফিরে গেছে নাথ  
অর্থাকুসুম করে পড়ে গেছে  
বিজন বিপিনে ফুটি।



যে-সূরে বাঁধিলে এ বাঁগার তার  
নামিয়া নামিয়া গেছে বার বার,  
হে কবি, তোমার রচিত রাগিণী  
আমি কি গাহিতে পারি?  
তোমার কাননে সৌবচারে গিয়া  
ঘুমায়ে পড়েছি ছায়ায় পড়িয়া,  
সন্ধ্যাবেলায় নয়ন ভরিয়া  
এনেছি অশ্রুবরি।  
এখন কি শেষ হয়েছে প্রাণেশ  
যা-কিছু আছিল মোর।  
যত শোভা যত গান যত প্রাণ  
জাগরণ, ঘুমঘোর।  
শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন,  
মদিরাবাহীন মন চুম্বন,  
জীবনযুগে অভিসারনিশা  
আজ কি হয়েছে ভোর?  
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,  
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,  
নূতন করিয়া লহ আর বার  
চির পুরাতন মোরে।  
নূতন বিপাহে বাঁধবে আমায়  
নবীন জীবন ডোরো।" (৫৬)

## ৫২। সংগীত—

—“আমারে করো তোনার বাঁশা, লড়া গো লহ তুলে।  
উঠিবে বাঁজ, তপ্তী-রাজ মোহন অঙ্গলে॥  
কোমল তব কমল-করে পরশ করো পরাণ-পরে,  
উঠিবে হিরা গুজরিয়া তব শ্রবণ-মলে॥  
কখনো সুখে কখনো দুখে কাদিবে চাঁহ তোমার মুখে,  
চরণে পড়ি রবে নীরবে, বাঁহিবে যবে তুলে।  
কেহ না জানে কী নব তানে উঠিবে গীত শুন্যপানে,  
আনন্দের বারতা বাবে আনন্দের কুলে॥” (৫৭)

## ৫৩। পাঠ—

—“যে প্রেম মানুষের আয়াকে দুঃখের পথে ন্যস্তের পথে অভয় দিয়ে  
এগিয়ে নিয়ে চলে, সেই প্রেমকে আশ্রয় করেই প্রেমকে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি  
‘চিত্রায়’ এবার ফিরাও মোরে। কবিতাটির মধ্যে সুস্পষ্ট বাস্তব হয়েছে।  
বাঁশীর সুরের প্রতি দিক্কার দিয়েই সে কবিতার আরাধনা.....মানুষের যে  
শান্তি এ কবিতার লক্ষ্য তা নয়। এর পর থেকে বিরাট চিন্তের সঙ্গে  
মানব চিন্তের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা ফলে ফলে আমার কবিতার মধ্যে দেখা  
দিতে লাগলো। দুইয়ের এই সংঘাত যে কবল আরাধনের কেবল মাধ্যমের  
তা নয়। অশেষের দিক থেকে যে আহ্বান এসে পৌঁছায় সে তো বাঁশীর  
ললিত সুরে নয়। সে আহ্বান তো শক্তিবই আহ্বান।” (৫৮)

—“সেই আহ্বানের আকর্ষণে মানুষ বোরসে পড়েছে অজানার দিকে,—  
এই যাত্রার ইতিহাস তার ইতিহাস। তার চলার পথপাশে কত সাম্রাজ্য উঠল  
এবং পড়ল—ধনসম্পদ হাল সংপাক্ষ, আয়ার গেল মিলিয়ে ধুলোর  
মধ্যে। মানুষ অশান্ত যাত্রা করেছে অগাধতার জন্যে নয়,—আপনার সমস্ত  
শক্তি দিয়ে মানুষলোকে মহামানবের প্রতিষ্ঠা করার জন্যে, আপনার জটিল  
বাধা থেকে আপনার অন্তরতম সত্যকে উন্মার করার জন্যে;—সেই সত্য  
যা তার পূজিত প্রবচনের চেয়ে বড়ো, তার সমস্ত কৃতকার্যের চেয়ে বড়ো,  
তার সমস্ত প্রথা মত নিষাবন্দের চেয়ে বড়ো,—যার মতু নেই, যার ক্ষয় নেই।  
প্রকৃত হয়েছে মানুষের জুলজালিত নিষ্কলতা মানুষের দুঃখব্যাখার  
আঘাত হয়েছে অপারিসীম।.....এ সমস্ত এক মহাতত্ত্ব কে সহ্য করতে  
পারত, মানুষের অন্তরবাসী ভূমার মধ্যে যদি এর চিরন্তন কোনো অর্থ না  
থাকত। মানুষের সকল দুঃখের উপরকার কথা এই যে—মানুষ আপন  
চৈতন্যকে প্রসারিত করছে আপন অসীমের দিকে;—জ্ঞানে প্রেম কৰ্মে  
বৃহত্তর একাকে আয়ত্ত করতে চলেছে আপনার সকল মহৎ কীর্তিতে তার

নিকটতর সামীপ্য পাবার জন্যে ব্যগ্র বাহু বাড়িয়েছে।.....মুক্তি পেতে হবে,  
মুক্তি দিতে হবে,—এই যে তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।” (৫৯)

## ৫৪। আবৃত্তি—

—“মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে  
নিভয়ে ছুটিতে হবে সত্যের করিয়া ধ্বংসতার,  
মৃত্যুর না করি শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা  
মস্তকে পড়ির করি; তারি মাঝে যাব অভিসারে  
তারি কাছে জীবনসম্বন্ধন অপরিয়াছি যারে  
জন্ম জন্ম ধারি।

—“কে সে? জানি না কে। চিনি নাই তারে  
শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাতি-অশ্বকরে  
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে,  
ঝড়ঝঞ্ঝা বহুপাতে, অদ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে  
অন্তর-প্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শূন্যেছে কানে  
তারার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নিভীক পরাণে  
সংকটআবর্ত মাঝে দিয়েছে সে সর্ববিসর্জন,  
নির্ধাতন করেছে সে বক্ষ পাতি, মৃত্যুর গর্জন  
শূন্যেছে সে সংগীতের মতো। দাঁহায়েছে অগ্নি তারে,  
বিন্দু করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,  
সর্বপ্রিয় বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইশ্বন  
চিরজন্ম তারি লাগি জেদলেছে সে হোমহুতাশন—  
হুর্বাণ্ড করিয়া ভিন্ন রক্তপদ্ম অবাণ্ডপহারে  
ভীতভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে  
মরণে কুণ্ডল করি প্রাণ।.....

“শূনিয়াছি তারি লাগি  
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্দা, বিষয়ে বিরাগী  
পথের চিহ্নক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে  
প্রতাহের কুশাকুর। তারি পদে মানী সর্পিপয়াছে মান,  
ঘনী সর্পিপয়াছে ধন, বীর সর্পিপয়াছে আত্মপ্রাণ;  
তাহারি উদ্দেশে কবি বিরাটো লক্ষ লক্ষ গান  
ছড়াইছে দেশে দেশে.....শুধু জানি,  
যে বিশ্বেপ্রচার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বালদান  
বর্জিত হইবে দূরে জীবনের সর্ব অসম্মান,  
সম্মখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি  
সে-মস্তকে ভরা লেখে নাই লেখা, দাসের ধূলি  
আঁকে নাই কলমকটিলকা।” (৬০)

## কল্পনা

॥ ১৩০৭ ॥

## ৫৫। পাঠ—

—“এমনি করে পূর্ব জীবনের সঙ্গে আসন্ন জীবনের একটা  
বিচ্ছেদ দেখা দিতে লাগল। অনন্ত আকাশে বিশ্বপ্রকৃতির যে শান্তিময়  
মাধুর্য-আসনটা পাতা ছিল, সেটাকে হঠাৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে বিরোধ-  
বিক্ষেপ মানবলোকে রক্তবর্ণে দেখা দিল.....সেই নতন বোধের  
অজুদায় কী রকম ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল, ‘বর্ষশেষ’ কবিতাটির  
মধ্যে সেই কথাটি আছে।” (৬১)

## ৫৬। আবৃত্তি—

—“হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন  
সহজ প্রবল।  
জীব পূর্ণপদল যথা ধ্বংস ভংগ কর চতুর্দিকে  
বাহিরায় ফল—  
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ঘ করি বিকীর্ণ করিয়া

(৫৬) “চিত্রা”। জীবন দেবতা॥

মোহন অঙ্গল গান। ‘গীতবিতান’। ২য় সংস্করণ। ২য় খণ্ড॥

যাত্রা শুরুর ইন্ডিয়া। ৩।

(৫৯) “মানুষের ধর্ম”। রবীন্দ্রচন্দ্রাবলী। বিংশতি খণ্ড॥

(৬০) “চিত্রা”। এবার ফিরাও মোরে।

(৬১) “আত্মপরিচয়”। ৩।

অপূর্ণ আকারে  
 তেমন সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ  
 প্রণমি তোমারে।  
 তোমারে প্রণমি আমি, হে ভীষণ, সুস্নিগ্ধ শ্যামল,  
 অক্লান্ত অম্লান।  
 সদোজাত মহাবীর, কী এনেছ করিয়া বধন  
 কিছু নাহি জান।  
 উড়েছে তোমার যদুভা মেঘরশ্মিত ওপনের  
 জলদর্চিরেখা;  
 করজোড়ে চেয়ে আছি উপরমুখে, পড়িতে জানি না  
 কী তাহাতে লেখা।  
 হে কুমার, হাসামুখে তোমার পন্থকে দাও টান  
 বনন রনন,  
 বক্ষের পঙ্খর ভেদি অন্তরেতে হউক কাশ্পত  
 সূতীর স্নান।  
 হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জরভেরী  
 বরহ আহ্বান।  
 আমরা দাঁড়াই উঠে, আমরা ছুটিয়া বাহিরব  
 আপবি পরাণ।  
 চাল না পশ্চাতে মোরা, মানিল না বধন রুদন,  
 হেরি না দিক,  
 গণিল না দিনক্ষণ, বীরব না বিতর্ক বিচার,  
 উদ্দান পাপিক।  
 মুহুর্তে করিব পান মৃত্যুর কোঁচল উমত্ততা  
 উপবৃন্ত ভীর।  
 খিলে শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ পিঙ্কর লাঞ্ছনা  
 উৎসর্গ করি।  
 শূন্য দিনব্যাপনের শব্দ, প্রাণধ্বংসের প্লানি,  
 শরণের ডালি,  
 নিশি নিশি রুদ্ধ করে ক্ষুণ্ণিমা স্ফীত দীপের  
 ধর্মাকৃত কারি,  
 লাভ ক্ষতি টানটানি, অতি সফল ভণ্ড অংশ ভাগ,  
 কলহ সংশয়,  
 সহে না সহে না আজ জীবনের খড় খড় করি  
 দড়ে দড়ে ক্ষয়।  
 যে পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে  
 সোপা প্রান্তর  
 এক পাত্শে রাখো মোর, নিরাশব নিরাট স্বরূপ  
 যুগ-যুগান্তের  
 শোনসম অকস্মাৎ ছিন্ন করে উপেক্ষা লগ্নে যাও  
 পক্ষকুণ্ড হতে,  
 মহান মৃত্যুর সাথে মূখোপধি করে দাও মোরে  
 বজ্রের আলোকে।" (৬২)

#### ৫৭। পাঠ—

—“ঝড় থামল। ব'ললুম—অভ্যস্ত কর্ম নিয়ে এই জে এতদিন  
 কাটালুম,—এতে তো চিত্ত প্রসন্ন হ'ল না। যে আশ্রম জীর্ণ হয়ে এল,

(৬২) “কল্পনা”। বর্ষশেষ। রবীন্দ্রচন্দ্রাবলী। সপ্তম খণ্ড।

তাকেও নিজের হাতে ভাঙতে মনস্তার বাধা দেয়। ঝড় এলে আমার  
 মনের ভিতরে তার ভিত্তিকে নাড়া দিয়ে গেল, আমি ব'ললুম বেরিয়ে  
 আসতে হবে।” (৬৩).....“এখন থেকে দ্বন্দ্বের দৃষ্টি, বিপ্লবের আলোড়ন।  
 অজ্ঞাতবাসের মোয়াদ ফরোল—এবারে বিশ্বমানবের রণক্ষেত্রে  
 ভীমপর্ব।” (৬৪)

#### ৫৮। আবৃত্তি—

—“সৈন্য জীবনের রণক্ষেত্রে  
 দিকে দিকে জেগে উঠল সংগ্রামের সংঘাত  
 গরু গরু মেঘমল্লৈ।  
 একতারা ফেল দিয়ে  
 কখনো বা নিতে হল ভেরি।  
 খর মধ্যাহ্নের তাপে  
 ছুটেতে হ'ল  
 জয়পরাজয়ের আবর্তনের মধ্যে।  
 পায়ে বাঁধেছে কাটা  
 ক্ষত-বিক্ষেপে রক্তধারা।  
 নিম্নম কঠোরতা মেরেছে ঢেউ  
 আমার নৌকার ডাইনে বাঁয়ে,  
 জীবনের পথ চেয়েছে ডুবিয়ে দিতে  
 নিম্নার তলায় পক্ষের মধ্যে।  
 বিবেকের অনুরাগে  
 ঈর্ষায় মৈত্রীতে,  
 সংগীতে পরুষ-কোলাহলে  
 আলোড়িত ত'ত বাস্পনিশ্বাসের মধ্য দিয়ে  
 আমার জগৎ গিয়েছে তার কক্ষপথে।” (৬৫)

#### ৫৯। সমবেত সংগীত—

—“বজ্রে তোমার বাজ বাঁশ  
 সে কি সহজ গান।  
 সেই সুরেতে জাগব আমি  
 দাও মোরে সেই কান।  
 ভুলব না আর সহজেই,  
 সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে  
 মৃত্যু মাঝে ঢাকা আছে  
 যে অন্তহীন প্রাণ।  
 সে ঝড় যেন সেই আনন্দে  
 চিৎকার তারে  
 সপ্ত সিন্ধু, দশ দিগন্ত  
 নাচাও যে কংকারে।  
 অরাম হাতে ছিন্ন করে  
 সেই গভীরে লও গো মোরে  
 অশান্তির অন্তরে বেগার  
 শান্তি স্মহান।”

(৬৩) “শান্তিনিকেতন পত্রিকা”। ১৩৩২। বৈশাখ।  
 (৬৪) “আত্মপরিচয়”। ৩। ৬৫। “শেষ সপ্তক”। “পরিচয়  
 বৈশাখ”। রবীন্দ্রচন্দ্রাবলী। অষ্টাদশ খণ্ড।

আগামীবারে—

চতুর্থ ধারা—৭। “ক্ষণিকা”। ৮। “নৈবেদ্য”। ৯। “স্মরণ”।

শ্রীশ্রীবিশ্বকর্মার জীবন চিত্র—শ্রীঅপরাজিতা দেবী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ২০৩।১।১৯মং কন'ওয়ার্ল্ড স্ট্রীট, কলিকাতা। ৬১৬ পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ টাকা।

কলা ও কৌশল জর্জরিত বুদ্ধিবী উপন্যাস সকলের নিকট ভাল লাগে না। এমন অনেক পাঠক আছে যাদের নিকট বৃন্দার খেলা ও পাণ্ডিত্যের ছাঁড়সারী উপন্যাসের রস গ্রহণে বিরট বাধা হইয়া উঠিয়াছে। তাহার চেয়ে সহজ সরল মনোভাবের কাহিনী একটানা হইলেও তাহাদের মন ভরাইয়া তুলিতে পারে। পাণ্ডিত্য অপেক্ষা হৃদয়বেগ এবং বুদ্ধি বৃন্দ অপেক্ষা প্রসাদগুণেই স্বপ্রকাশ প্রাদুর্ভাবিক আকর্ষকতর আনন্দ দান করে। শ্রীঅপরাজিতা দেবীর 'শ্রীশ্রীবিশ্বকর্মার জীবন-চিত্র' পাঠে তাহারা যে বিশেষ আনন্দ পাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রন্থখানা আকারে বিরাট। কিন্তু হাসি, অশ্রু, নৈহমতা, ব্যঙ্গনা ও করুণায় ইহার পৃষ্ঠাগুলি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। উহার শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাঠকের মন অন্যরাসে টানিয়া নেয়, পাঠকের মনে কোন রান্ধিত বা বিরাজ আসে না। সহজভাবে ও প্রাঞ্জল ভাষায় লেখিকা একটি ভাববহুল জীবন ও তৎসহ অন্যান্য ছোট বড় নানা জীবন চিত্রিত করিয়া চলিয়াছেন। ইহার প্রসাদ-গুণ প্রতি পাঠকের মনঃস্পর্শ করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ৪২।৪৭

কে?—শ্রীশ্রীমানী বসু বি এ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—দাদাগুরু এড বোং, ৫৪।৩৩২ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

একখানি উপন্যাস। স্নেহ, প্রেম ও সম-বেদনার নানা বিচিত্র ঘটনাবলীর ভিতর দিয়া ইহার আখ্যানভাগকে রূপায়িত ও চরিত্রগুলিকে বিকশিত করিয়া তোলায় চেষ্টা করা হইয়াছে। ভাষা আরম্ভময়। তবে গল্পবাণী বড় মৃদু ও উহার গতি মন্দ্র। ৫২।৪৭

সংগ্রাম ও সমরনায়ক—শ্রীবিজয় বানার্জি প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—সমনা বুক ডিপো, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

একটি তৃতীয় মহাসুন্দরের পটভূমিকা রচনা করিয়া বহু আয়োজিত লিভারী মহাবন্দর শেষ হইয়াছে। এই বৃন্দ নাৎসিবাদকে পর্যন্ত করিয়াছে, কিন্তু বিজয় রথের প্রতি সন্ধিতে নতুন নতুন ফাসিবাদ গ্রন্থি রচনা করিবার প্রয়াস পাইতেছে। কাজেই নতুন করিয়া সংগ্রামের প্রয়োজন মাথা তুলিতে বাধ্য। ভারত স্বাধীন হওয়ার মহাবন্দর ব্যাপ্তি তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে উহার সহিত যোগাযোগ করিতে হইতে পারে এবং সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতাকর বিহীন অবস্থায় তাহাকে বৃন্দাবলী নীতি ভাগ করিয়া নীতি-মত রণপন্থিত হইয়া উঠিতে হইবে। এজনা দেশের আপামর জনসাধারণের সাংঘাত সংগ্রাম শাস্ত্র পাঠ করার ও সৈন্যদের ব্যাখ্যার লোকেরও বৃন্দের সকল বিভাগ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে। শ্রীমত বিজয় বানার্জির আলোচ্য বইখানি আধুনিক সংগ্রামবিদ্যা সম্পর্কে সকলকেই সৌম্যমুখিত হইয়া পরিবেশের উপযোগী হইয়াছে।

শ্রীমত বিজয় বানার্জির সহিত প্রত্যক্ষভাবে প্রচার সম্পর্কিত প্রচেষ্টা

## গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়

তাহার দীর্ঘকাল হইতে পরিচিত। তিনি সাধারণের যুগ্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য বিশেষ যত্নস্বার্থক এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। আশা করি, এইরূপ আরও গ্রন্থ বাঙলা ভাষায় প্রণীত হইয়া জাতিকে বিশ্বের সহিত অগ্রগমনে সহায়তা করতে থাকিবে। এ যুগে যুগ্মকে পরিহার করা যখন সম্ভব নয়, তখন অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়োজন জনসাধারণকে সংগ্রামশীল করার চেষ্টা কিহুতেই অগ্রাধিকার হইতে পারে না। ১১০।৪৭

Marxism & National and colonial Question—By J. Stalin.

প্রকাশক—শ্রীজীবহারী বর্মন, বর্মন পার্বলীশং হাউস, ৭২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য চারি টাকা মাত্র।

এই গ্রন্থখানাতে মার্ক্সবাদ এবং জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন সম্পর্কে স্ট্যালিনের বহুসংখ্যক প্রবন্ধ ও ভাষ্য সংকলিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রধান প্রধান অধ্যায়গুলি এই—মার্ক্সবাদ ও জাতীয় সমস্যা, জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে রিপোর্ট, অক্টোবর বিপ্লব ও জাতীয় সমস্যা, রাশিয়ার জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে সোভিয়েট গভর্নমেন্টের নীতি, সোভিয়েট রিপাবলিকসমূহের একাত্মতা, দল ও রাষ্ট্র বিধানে জাতীয় উপাধান সম্পর্কে নিকটবর্তী, জাতীয় সমস্যা, চীন, জাতীয় সমস্যা সমাধানে প্রসেস্টারিয়ান প্রথা, সোভিয়েট রাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব, চরিত্র।

জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন সোভিয়েট রাশিয়ার ন্যায় ভারতবর্ষের জটিলতাও কম নহে। সোভিয়েট রাশিয়ার জাতীয় ও আঞ্চলিক বিভিন্নতা ও সৈচিত্র্য যে সমস্যার সৃষ্টি করিতে পারিত, সোভিয়েট রাশিয়া ঐক্যের ভিত্তিতে তাহার সুন্দর মীমাংসা করিয়া নিয়াছে এবং কোন সংঘাতই বাধিবার অবকাশ পায় নাই। ছোট বড় সকল অধিকারকে তুচ্ছ করিয়া উহার 'এক জাতি এক প্রাণ একতা'র অমোঘ অস্ত্র শক্তিত হইয়া নাৎসিবাদ ধ্বংস করিয়াছে এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। ভারতও এইভাবে অখণ্ড শক্তিতে শক্তমান হইয়া উঠিতে পারিত; কিন্তু এক দল জাতীয়তার নীতি গ্রহণ করার তাহা সম্ভব হইল না। আলোচ্য গ্রন্থখানা ভারতের সকল রাজ-নৈতিক মতাবলম্বী লোকেরই বিশেষ অভি-নিবেশের সহিত পাঠ করা উচিত এবং সমস্যা সমাধানে সোভিয়েট রাশিয়া যে যে ভাবে সফল-লাভ করিয়াছে তাহা অনুধাবন করা উচিত। এই গ্রন্থখানা মাত্রা পাঠকদের এই সুবিধা হইবে যে, তাহারা সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়ক স্ট্যালিনের লিখিত সর্বদেশের পক্ষে ভাবিবার উপযুক্ত একটি সমস্যা সম্পর্কে বহুসংখ্যক রচনা একসঙ্গে পাঠ করার সুযোগ পাইবেন। গ্রন্থের উপযোগিতা এবং পাঠ্যবস্তু প্রচারের দিক বিবেচনা করিলে মূল্যও যথেষ্ট সুলভ হইয়াছে বলা চলে।

অগ্রদূত—প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা। সম্পাদক—শ্রীতারিণীশংকর চক্রবর্তী। কার্যালয়, ৬৪ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্য বার্ষিক ৪০০, প্রতি সংখ্যা ছয় আনা।

অগ্রদূত নতুন মাসিক পত্র। অনেকগুলি সুখপাঠ্য গদ্য-পদ্য রচনা লইয়া ইহা আত্মপ্রকাশ করিল। রচনা নির্বাচন, মূদ্রণ, মলাটের ছবি প্রভৃতি সবদিক দিয়াই পত্রখানা সুন্দরিতা পরিচয় বহন করিতেছে। আপাততঃ পত্রখানাতে উল্লেখযোগ্য বিশেষ লক্ষ্য নাই। শীঘ্রই উহা ভাব ও বর্ণনার অগ্রদূত হিসাবে পাঠক সমাজে আপনার স্থান করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু 'অগ্রদূত' প্রবন্ধের বড় অভাব দৌখলাম। গল্পের সংখ্যাই অধিক। আমরা এই নতুন সহযোগীকে সাদর সম্ভাষণ জানাই। ১৩৭।৪৭

ছাড়পত্র—সুদান্ত ভট্টাচার্য প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—দাদ বুকমান, ৮৭ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—২০। মূল্য দুই টাকা।

সুদান্ত ভট্টাচার্য কবিতা লিখিয়া অতি অল্প বয়সেই নাম করিয়াছিলেন। বাঙলার প্রগতিপন্থী সাম্যিকপন্থীরা তাহার বহু কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে এবং সেগুলি ভাব ভাষা ছন্দ শব্দ নির্বাচনের নিপুণতা—সব দিক দিয়াই বহু পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু তাহার কাব্য-প্রতিভার সম্যক বিকাশের পূর্বক্ষেত্রে এই কবিকে পৃথিবী হইতে বিদূর গ্রহণ করিতে হইল, ইহা অত্যন্ত দুঃখের।

'ছাড় পত্র' কবি সুদান্ত ভট্টাচার্যের মোট ৩৫টি কবিতা স্থান পাইয়াছে। ভাবের বৈচিত্র্য, ছন্দ শব্দ ও ভঙ্গীর দক্ষতার ইহার অধিকাংশ কবিতাই যে রসোত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আধুনিক বাঙলা কাব্যে এক নতুন দিকের বিকাশ সম্ভাবনার পরিচয় কবিতাগুলিতে সুস্পষ্ট। কবির অকাল-বিয়োগ কাব্যসাহিত্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিব্রত কারণ হইয়াছে। ১৩৮।৪৭

ধানকানা—ননী ভৌমিক। ইন্টারন্যাশনাল পার্বলীশং হাউস লিমিটেড, ৮৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা বারো আনা।

'ধানকানা' মোট দশটি গল্পের সমষ্টি। ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬র মধ্যে গল্পগুলি রচিত হয়। এ কয়টি বঙ্গের এ দেশের ইতিহাসে বড়ই দুর্ঘটনাগর্ভ। কাজেই এ সময়ের দুর্ঘটনার স্বাক্ষর এই গল্প-গুলিতে সুস্পষ্ট। গল্পগুলি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। সহরের ও পল্লীর লালিত্ত অবজ্ঞাত মানুষের চিত্রই অধিকাংশ গল্পে রূপায়িত হইয়াছে। মানুষের দুঃখ দুঃশার বেদনাময় চিত্র এবং সঙ্গে সঙ্গে স্নেহমমতার চিত্তাকর্ষক দৃশ্য প্রত্যেকটি গল্পেই সুস্পষ্ট। লেখকের ভাষাও এই ধরনের গল্প বলার সর্বোৎকৃষ্ট উপযোগী। ছাপা, কাগজ ও বঁধাই ও প্রচ্ছদপট সুন্দর। ১৪১।৪৭

আধুনিক চীনা গল্প—অনুবাদক—অমল দাশ-গুপ্ত। ইন্টারন্যাশনাল পার্বলীশং হাউস, ৮৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

আধুনিক চীনা গল্পলেখক লু সুদ, লাও চাং, ভিঙ লিঙ প্রমুখ আট জনের ১১টি গল্পের অনুবাদ এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। আধুনিক চীনা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণ করিয়া লিখিত একটি মূল্যবান ভূমিকা গ্রন্থ মধ্যে সংযোজিত হইয়াছে। চীনের রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি একটা বৈশ্বিক সাহিত্য প্রচেষ্টা কিভাবে দানা বাধিয়া উঠিয়াছে ভূমিকাপটে তাহা জানা যাইবে। চীনা গল্পের অনুবাদ বাঙলা সাহিত্যে খুব বেশী হয় নাই। ভারতবর্ষের মতই চীন দারিদ্র্য ও সমস্যাপীড়িত দেশ। প্রাচীনকালের বিরাট

সভ্যতা ও সংস্কৃতির মালিক হইয়াও সে ভারতবর্ষের মতই মম্বাধ অবস্থায় পতিত ছিল এবং অধুনা ভারতবর্ষের মতই তাহার বিধে নূতন প্রাণসঞ্চার হইয়াছে। কানাদের এই প্রতিবেশী মহারাষ্ট্রের জীবন-ধারণ ঠিক আমাদের প্রাণের মূল সুর প্রতিধ্বনিত। আলোচ্য গ্রন্থের গল্পগুলিকে চীনা জীবনের প্রতি-নিধির মতই দেখা যাইতে পারে। ইতিপূর্বে বিদেশী কথাসিঙ্গার তুলিকায় চীনা জীবন-চিত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই গ্রন্থে চীনা কথাসিঙ্গারদের নিজেদের তুলিকায় অঙ্কিত খাটি জীবন-চিত্র প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাওয়া যায়। অনুবাদকের ভাষা স্বচ্ছ এবং জোরালো। পড়িতে অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই এবং প্রচ্ছদপট সুন্দর।

১৩৯১৪

**সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা**—ডিয়ানা লেভিন প্রণীত। অনুবাদক—শ্রীঅনিলকুমার সিংহ। ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড, ৮৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উত্তম। ২৪০ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থা, বিজ্ঞানে প্রগতি এবং সামাজিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে উহার শিক্ষা ব্যবস্থাও বিশেষ মনোযোগ ও কোম্পনীর সহিত লক্ষণীয়। আলোচ্য গ্রন্থের লেখিকা ডিয়ানা লেভিন ইউরোপের নানাদেশের এবং আমেরিকার মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া মস্কোর স্কুলে কার্যগ্রহণ করেন। তাহার নিজের অভিজ্ঞতা সোভিয়েট শিক্ষা ব্যবস্থার যাহা কিছু বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পাইয়াছেন, আলোচ্য গ্রন্থে তাহাই তিনি নিপুণ ভাবে পরিবেশন করিয়াছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা কটাক্ষিত না করিয়া বিশ্ববাস্তুকে তিনি সাধারণের উপযোগী সহজভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বিনামূল্যের ভিতরে ও বাহিরে ছাত্রছাত্রীদের কাজ-কর্ম খেলাধুলা প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পিতামাতা ও শিক্ষকের জীবনযাত্রার সুন্দর অভিজ্ঞতা লেখিকার বর্ণনায় ধরা পড়িয়াছে। এক কথায় সোভিয়েট শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত রূপ এই গ্রন্থে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-দের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকেরও এই ধরনের বই পাঠ করা উচিত।

১৪০৮৭

**THE HERO OF HINDUSTAN**—By Anthony Ellenjattam. Orient Book Company, Calcutta—12. Price Rs. 6/-

ভারতের মুক্তিযোদ্ধা মানসে স্বেচ্ছাসেবক দেশভোগ্য করিয়া প্রথমত ইউরোপ এবং তথা হইতে সিংগাপুরে যান এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিয়া মুক্তিযুদ্ধে অবতরণ করেন। তাহার ব্রহ্ম রণাঙ্গনের কর্মপ্রচেষ্টা বহুবিধ প্রামাণিক বিবরণ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা এবং নানাপ্রকার কাগজ-পত্রে বিশেষভাবে সুস্পষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তৎপূর্বের তাহার ইউরোপের কর্মপ্রচেষ্টা এদেশের লোকের নিকট খুব স্পষ্ট নহে। সুপ্রচুর প্রামাণ্য বিবরণাদির অভাবে আমরা এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকিত নহি। আলোচ্য পুস্তকের লেখক এই অভাব পূরণে কিছু সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ইতালী ও জার্মানিতে নেতাজীর সমর-প্রভুত্বের বিবরণ যথেষ্ট প্রামাণিকভাবে না হইলেও বেশ চিত্তাকর্ষকভাবে এই গ্রন্থের লেখক দিয়াছেন। প্রমাণপঞ্জীর অভাবে তাহার প্রদত্ত বিবরণ হয়ত যথেষ্ট জোরালো হইতে পারে নাই, কিন্তু বইটির সর্বত্র ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বীর সন্তানের যে রূপটি অঙ্কিত হইয়াছে তাহা খাটি এবং অকৃত্রিম। স্বেচ্ছা-চন্দ্রের চলচলন কথাবার্তার তাহার ব্যক্তি ও মহত্ত্বের

সপ্রকাশ লেখকের বর্ণনায় সুস্পষ্ট হইয়াছে। বইটি আগাগোড়া উপন্যাসের মত মনোহর এবং কবিতা, দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতির সমন্বয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং সর্বোপরি সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ। লেখক মালাবারের অধিবাসী। তিনি বহু বৎসর ইউরোপে থাকিয়া সাহিত্য দর্শন ধর্মাদি বিষয়ে পড়াশুনা করিয়া-ছেন। লেখক ইতালীতে অবস্থানকালে নেতাজী স্বেচ্ছাসেবক ও তাহার সহকর্মীদের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাতের ফলে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে এবং ভারতের মহত্ত্ব ও নেতাজীর বীরত্বের উপর ভিত্তি করিয়া এই বইটি রচিত। লেখকের ভাষা কবিত্ব-পূর্ণ ও জোরালো। গভীর অন্তর্দৃষ্টির আলোকে তাহার বর্ণনা প্রাণকর্ষণী হইয়া উঠিয়াছে। সুগভীর হৃদয়বেগের সহিত তাহার সাহিত্য ও দর্শন জ্ঞানের সমন্বয়ে নেতাজীর কর্মপ্রচেষ্টার একটি অধ্যায় এই বইয়ের পাতায় সজীব হইয়া উঠিয়াছে। ১৪২১৪

**অগ্রগামী—শ্রীনিবাস চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।** নিউ রাইটার্স এসোসিয়েশন বর্ষক ১২২, মডারাম বাবু স্ট্রীট হইতে মুদ্রিত। মূল্য ১/০ মাত্র। নিউ রাইটার্স এসোসিয়েশনের প্রথম পুস্তক। বর্তমান বাঙালি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার ছোট ছোট নমুনা। রচনাগুলি মন্দ হয় নাই।

১৩০১৪

**নাম্বার টেন—শ্রীকাল্পদ্রী মুখোপাধ্যায় প্রণীত।** সুখেশ্বর সাহিত্য মন্দির, ২০৬, কন'ওয়ার্ল্ড স্ট্রীট, কলিকাতা।

নাম্বার টেন সিরিজের প্রথম গ্রন্থ 'নাম্বার টেন' ছাপা, কাগজ ও বাঁধাইতে বেশ ভালই হইয়াছে। কিন্তু কাহিনী, রচনা, বর্ণনাপ্রণী কোনদিক দিয়াই বইটি ভাল লাগে নাই।

১২৮১৪

**রাজনীতির ভূমিকা—শ্রীপারমলচন্দ্র ঘোষ, বি এস-সি (ইকন) লন্ডন প্রণীত।** প্রাপ্তিস্থান—এইচ চ্যাটার্জি এন্ড কোং লিমিটেড, ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারতের রাষ্ট্রসংগঠন বিরাট পরিবর্তনাদির ফলে দেশের জনসাধারণের অধিকাংশের মধ্যেই রাষ্ট্রচিন্তনা বিকাশিত করিতেছে। কিন্তু রাজ-নীতির মূলবস্তুত্ব বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানে ব্যক্তি জনগণ ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির কর্তব্য ও পথ নির্ণয়ে সমর্থ নহে। বাঙলা ভাষায় উপস্থিত রাজনীতির গ্রন্থের যেমন অভাব, তেমনি অভাব দল নিরপেক্ষ-ভাবে রাজনীতি চর্চার অনুকূল আবহাওয়া। 'রাজনীতির ভূমিকা' বইটি পড়িয়া আনন্দিত হইয়াছি। রাজনীতির বিশদ চর্চার সোপান হিসাবে বইটি সকলেরই বিশেষ কাজে আসিবে। রাজনীতির তাৎপর্য, জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, শাস্তি ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা—এই কয়টি পরিচ্ছেদে ভাগ করিয়া লেখক রাজনীতির ভূমিকা আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা প্রাজ্ঞ ও সহজবোধ্য। আলোচ্য বিষয়বস্তুতে লেখকের প্রগাঢ় জ্ঞান বিষয়টির সহজ পরিচয় ও প্রকাশে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। বাঙলা ভাষায় এই গ্রন্থ লিখিয়া লেখক বাঙালী পাঠকগণের ধন্যবাদ ভাজন হইলেন। গ্রন্থের মূল্য, কাগজ ও প্রচ্ছদপট আনন্দনীয়।

১২৭১৪

**বিভিন্ন দেশের নারী সমাজ—ভূপদীক শ্রীকৃষ্ণশিখর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, পোঃ গড়িয়া, জিলা ২৪-পরগণা।** এই ঠিকানায় গ্রন্থকণের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য দুই টাকা চারি আনা। জাপানী নারী, চীন দেশের নারী, ব্রহ্মদেশের

নারী, বহিঃভারতীয় হিন্দু-মুসলমান নারী, ইউরোপের নারী, এই কয়টি অধ্যায়ে গ্রন্থখানা বিভক্ত। এই সকল দেশের মেয়েদের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, শিক্ষা, শৈল্পিকতা ও জীবনযাত্রার নানাদিক লেখক প্রাজ্ঞ ভাষায় এই গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। দেশ-বিদেশের নারীজীবনের সহিত পরিচয় লাভের পক্ষে বইখানা বিশেষ সহায়ক।

১১৫১৪

**চিত্রিতা—মাসিক পত্র—৪র্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।** সম্পাদক—শ্রীনিবাস চট্টো। প্রাপ্তিস্থান—চিত্রিতা প্রকাশালয়, ৯এ, কার্তিক বসু লেন, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা। প্রতি সংখ্যা আট আনা। পত্রিকাখানি সুসম্পাদিত এবং বহু গল্প প্রবন্ধ ও চিত্র সম্বন্ধে সমৃদ্ধ। আলোচ্য সংখ্যাটিতে প্রবীণ ও নবীন লেখকগণের কয়েকটি ভাল ভাল রচনা স্থান পাইয়াছে। পত্রিকার রূপসজ্জার দিব্যতা যথার্থ কন্যাসম্মত হইয়াছে। আণা করি, পাঠক সমাজে পত্রিকাখানি সমাদৃত হইবে।

**শাহী ফাদিরান বন্দু—এক বন্দেধর্মণী** কতৃক সম্পাদিত। অশোক লাহরেরী, ১৫১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা মাত্র।

বাঙালি লিঙ্গলপ্রচেষ্টার ইতিহাসে ফাদিরানের নাম উল্লেখ হইয়া আছে। তাহার মহান আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া মুক্তিপ্রার্থী বন্দনপীড়িত জাতি যে হেরণা লাভ করিয়াছে, তাহার মূল্য অপারিসীম। তাহার সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে এই পুস্তিকার আলোচনা করা হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত হটলও তাহার স্মরণ দিবসে, এই চর্চিত কথা সকলেই সমর্থচিত্তে গ্রহণ করিবেন।

## সাহিত্য সংবাদ

### রচনা প্রত্যাগতা

বর্ণাধ্যায় বংশাঙ্ক সংঘের উদ্যোগে রচনা প্রতি-যোগিতা হইবে। রচনার বিষয়—

- ১। আধুনিক সভ্যতার উপর বিজ্ঞানের প্রভাব,
- ২। কৃষি বনাম শিল্প ও
- ৩। ভারতে জাতীয়তা যোনের প্রসার ও তাহার বর্তমান অবস্থা।

প্রতি বিষয়ে বাঙালি জন্য দুইটি ও ইংরাজীর জন্য একটি করিয়া সবসম্মত নয়টি পুরস্কার দেওয়া হইবে। রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৭। ফলাফল নভেম্বর মাসের প্রথম সংখ্যায় পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। পূর্ণ বিবরণের জন্য আবেদন করুন। সেক্রেটারী, বর্ণাধ্যায় বংশাঙ্ক সংঘ, ১৬৬-ই বোম্বার্ডার স্ট্রীট, কলিকাতা।

### বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার

সাধারণ প্রগতি পাঠাগার (ঘোলা, মেদিনীপুর) কতৃক পরিচালিত

### প্রতিযোগিতার ফলাফল

প্রথম—হিমালী বসু, (নবম শ্রেণী), বালাী গার্লস স্কুল, হাওড়া।  
দ্বিতীয়—মোহাম্মদ মোকোম খাতুন, (নবম শ্রেণী), সিরিয়ার-কান্দী উ ই বিদ্যালয়, বগুড়া।

তৃতীয়—শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, দশম শ্রেণী (ক) ই আই আর, উ ই বিদ্যালয়, জামালপুর (মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র)

—গুণময়ী মাসা, ১৯-এ চারি পাঠ

# খেলাধুলা

## ক্রিকেট

৯ই আগস্ট ভারতের জাতীয় ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন। পটিৎ পংসর পূর্বে ঠিক এই দিনে ভারতের আসন্ন হিমচল আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামের 'ভারত ছাড়' বিপুল ধ্বনিতে। বিদেশী শাসক তাহার সমস্ত শক্তি লইয়া সেই আন্দোলন দমন করিবার জন্য কি অমানুষিক অত্যাচার ও পীড়নই না করিয়াছিল। নগর ও পল্লী, রাজপথ ও প্রান্তরের উপর দিয়া রক্তস্রব বহিয়া গিয়াছিল। জনগণের অপরাধের আত্মত্যাগ বিদেশী শক্তিকে শেষ পর্যন্ত বিদ্রান্তই করে। ঠিক সেই স্মরণীয় দিনে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি মিঃ ডিমেলো ভারতের সকল খেলোয়াড় ও ক্রীড়ামোদীকে একত্র হইবার জন্য যে আন্তরিক আবেদন করিয়াছেন তাহা এই স্মরণীয় দিনের ধ্বনির নায় সারা ভারতের আকাশ বাতাস ছাইয়া যাইবে। রাষ্ট্র পরিচালকগণ বিপক্ষে পড়িয়া যাহা আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সম্মত করিতে পারেন নাই খেলোয়াড়গণ ও ক্রীড়ামোদীগণ একত্র হইলে বাস্তব রূপ দিতে না পারিলেও কিছুটা যে সাহায্য করিবেন এই বিশ্বাস আমাদের আছে। অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতাই ছিল কংগ্রেসের কাম্য ও সকলেরই কাম্য। কেবল কট-নীতিপরায়ণ ব্রিটিশ শক্তি নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যেই ভারতকে শ্বিধাবিক্ত করিয়া দুইটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই যে ব্যবস্থা ইহা চিরস্থায়ী থাকিতে পারে না। ইহার অবসান অবশ্যম্ভাবী। ক্রীড়ামোদী ও খেলোয়াড়গণ প্রকৃতই একত্র হইয়া যদি ভারতের অখণ্ডতার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন, তবে জনমত দ্রুত এইদিকে চালিত হইবে। একবার জনমত সৃষ্টি হইলে কাহারও সাধ্য নাই তাহার গতিরোধ করিতে পারে।

মিঃ ডিমেলো বলিয়াছেন "আমরা যেন কখনও একতা ও সম্মতত্বের পথ না ভাঙা করি। ইহার দ্বারা পৃথিবীর লোককে দেখাইতে পারিব রাজনীতি ও খেলাধুলা এক নহে।" আমরাও মিঃ ডিমেলোর সহিত একমত হইয়া বলি "ইহা দেখাইবার প্রয়োজনীয়তা আছে। খেলাধুলা ও ব্যায়াম জাতীয় জীবনের কিতিকে সুদৃঢ় করে। সেই খেলাধুলা ও ব্যায়াম যদি রাজনীতির উদ্দেশ্য না থাকে, তবে সে জাতি কখনও শক্তিশালী ও কর্মক্ষম হইতে পারে না।

## সম্মতরণ

ভারতীয় সম্মতরণ পরিচালনা লইয়া দীর্ঘ ১২ বৎসর ধরিয়া যে স্বন্দ্র চলিয়াছিল তাহা অবসানের জন্য সম্প্রতি চেষ্টা হইতেছে দেখিরা আনন্দিত হইলাম। তবে এই কথা না বলিয়া পারিওঁছি না যে, মিটমাটের দায়িত্ব নিরপেক্ষ কোন বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদীর উপর ন্যস্ত করিলেই ভাল হইত। কিন্তু ভারতীয় সম্মতরণে তিনি যে একপক্ষের শত্রু হইবার ক্ষমতা অর্জন করিতে

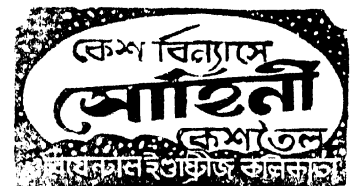
পারেন না। তাহা ছাড়া একটি কথা প্রায়ই আমরা শুনিয়া থাকি যদিও তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না যে, যিনি সকল মিটমাটের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন তিনিই নাকি এই গড়গোলের প্রথম সূচনার কারণ। ১৯৩৬ সালে ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশনকে আন্তর্জাতিক সম্মতরণ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হইতে তিনিই নাকি বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। এত দীর্ঘকাল ধরিয়া এই যে স্বন্দ্র বর্তমান আছে, কোন মীমাংসা হইতেছে না তাহার জন্যও নাকি তিনিই প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে দায়ী। এই সকল কথা যখন শুনিত হয়, তখন মনে হয় ইহা কি সম্ভব? সম্ভব হইলে সেই ব্যক্তি কিরূপে আজ অগ্রণী হইয়া মিটমাট করিবার চেষ্টা করিতেছেন? অতীতের সকল কথা ভুলিয়া মিটমাট বাহাতে হয় তাহার জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। যদি কোন স্বদেশের মীমাংসা না হয় এইবারও ভারত হইতে কোন সীতারু বা ওয়াটারপোলো দল বিশ্ব-অলিম্পিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারিবে না। দীর্ঘ ১২ বৎসর ব্যথা স্বদেশের মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছে, আর সময় নষ্ট করা অনুচিত হইবে।

## কুস্তি

ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশন গঠিত হইবার সময় একটি কথা প্রচার করা হয় যে, ঐ ফেডারেশন সমস্ত প্রাদেশিক কুস্তি সম্বন্ধ বা ফেডারেশনের সহিত সংযোগ স্থাপন করিবে। অন্যান্য প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিলে বাঙালার কোন প্রতিষ্ঠান এই ফেডারেশনে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকারী জানিতে ইচ্ছা করি। কারণ বাঙালার কুস্তি পরিচালনা করিবার জন্য দুইটি প্রতিষ্ঠান আছে। একটি বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশন নিজেদের ইচ্ছা মত কতকগুলি ক্রীড়ামোদীকে লইয়া গঠন করিয়াছেন। এই ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে অনেকই কুস্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞান রাখেন না। এই প্রতিষ্ঠান সারা বৎসর ধরিয়া কি করেন, কেহই জানিতে পারে না। কেবল যখন প্রাদেশিক অলিম্পিক অনুষ্ঠান হয়, তখন এই পরিচালকমণ্ডলীর অস্তিত্বের কথা লোকে জানিতে পারে। ইহারা অলিম্পিক অনুষ্ঠানের কর্মতালিকার কুস্তি বিভাগটি পরিচালনা করেন। এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন তাহাদেরই মনগড়া কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের সভা, তাহাদের অনেকই অপেশাদার কি না সেই বিষয় যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ নির্মল ভারত কুস্তি প্রতিযোগিতা হইলে বাঙালার প্রতিনিধি মনোনয়ন করেন।

আর একটি প্রতিষ্ঠান আছে; তাহার নাম বঙ্গীয় প্রাদেশিক কুস্তিসম্বন্ধ। এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলী বিভিন্ন কুস্তি ক্লাব বা আখড়ার প্রতিনিধিগণ দ্বারা গঠিত। এই প্রতিষ্ঠান বাঙালার বিভিন্ন জেলায়ও অনেক জেলা প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। ইহাদের সহিত সংঘর্ষ কয়েকশত

ক্লাব। ইহারা ভারতীয় প্রথার কুস্তি বেশী শিক্ষা দিয়া থাকেন। বৈদেশিক প্রথাও কুস্তি প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করেন। সিনিয়র, জুনিয়র, স্কুল, কলেজ প্রভৃতি সকল বিভাগের মল্লবীরদের জন্য ইহারা কুস্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। কয়েক মাস পূর্বে ইহারা একটি দল সিংহলে প্রেরণ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে বলিতে হয় এই প্রতিষ্ঠানই বাঙালার মধ্যে কুস্তি প্রচার ও প্রসারের জন্য অপ্রাণ চেষ্টা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ সকলেই অভিজ্ঞ মল্লবীর। ইহাদের সকল বিষয়ে সাহায্য করেন বাঙালার তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মল্লবীর গোবরধর বা যতীন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়। এই প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের কর্তৃপক্ষীয়গণের সন্মুখের পড়ায় ভাল কাজ করিয়াও বাঙালার পরিচালকমণ্ডলী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন নাই। আমরা সবুজ হইব যদি ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশন এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে গ্রহণ করেন। এই কথা বলিতে আমাদের কোন বিশ্বাস হইতেছে না যে, বঙ্গীয় অপেশাদার কুস্তি সংঘকে বাঙালার পরিচালকমণ্ডলী হিসাবে যদি ফেডারেশন না গ্রহণ করেন। তবে বাঙালার সমস্ত মল্লবীরদের সাহায্য ও সহানুভূতি হইতে ফেডারেশন বঞ্চিত হইবেন। জনমত ইহাদের পশ্চাতেই আছে। জনমতের অধিকার এতদিনে প্রতিষ্ঠিত হইল। জনমত অস্বীকার করিয়া সরকারের আওতাধীন থাকিয়া সুবিধামত ব্যবস্থা সাহায্য করিতে পারিতেন তাহাদের অস্তিত্ব আর থাকিতে পারে না।



(গভঃ রোজঃ)

## হাঁপানীর চিকিৎসা পাহাড়জাত বনৌষধি

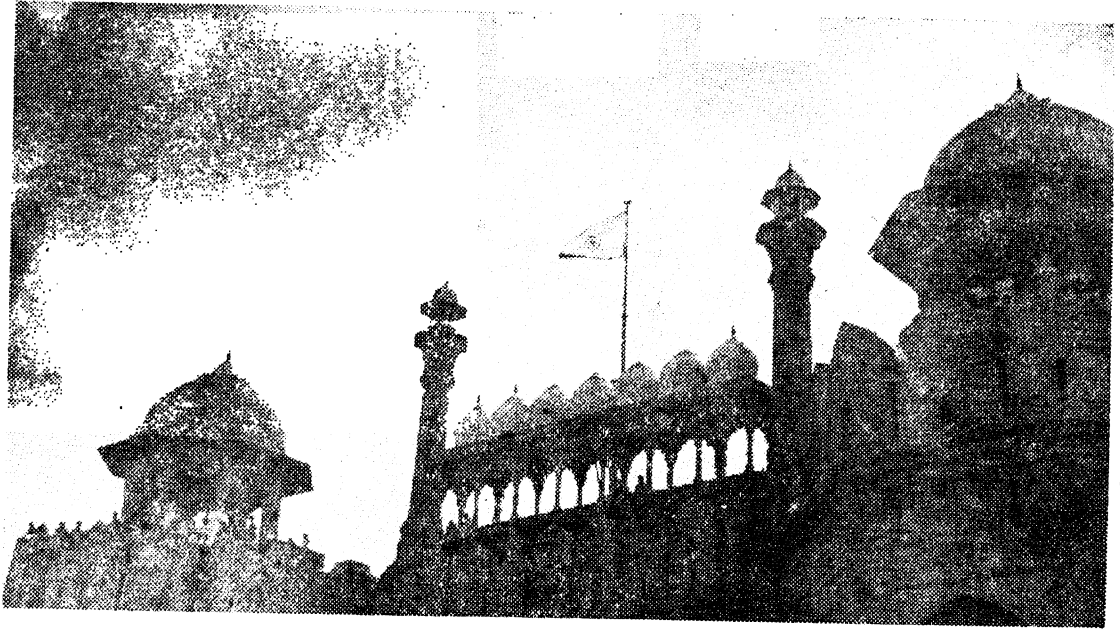
ব্রী মহাশয় ১০৮ এস পি দাসজী কর্তৃক প্রস্তুত। এক মাত্রায় হাঁপানী উপশম হয়। ৩১-৮-৪৭ তারিখ পূর্ণিমায়া সেবা। ইংরেজীতে চিঠিপত্রাদি লিখুন।

শ্রীচিকিৎসা দমনাশক আয়ুর্বেদিক সিদ্ধ সেবা আশ্রম,

পোঃ চিকিৎসা (বান্দা), ইউ পি।

(এম ৮-১৪৮)

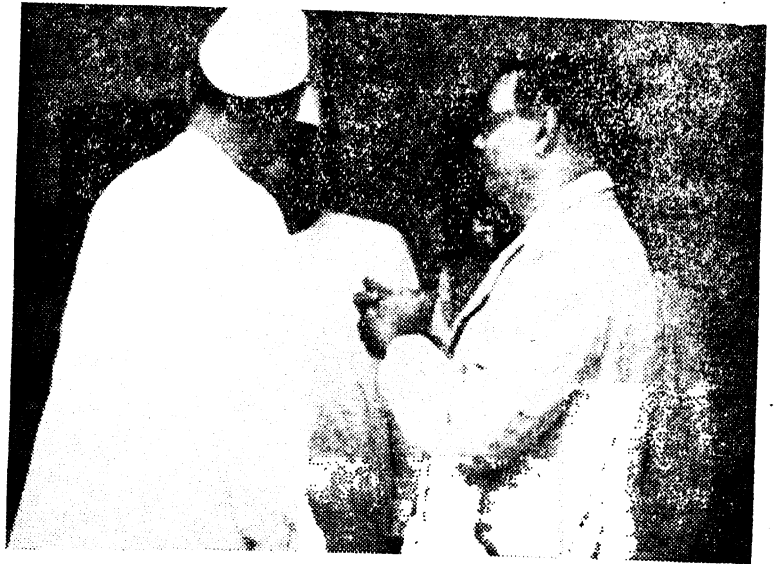
# ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি দিবসের অনুষ্ঠান



স্বাধীনতা দিবসে দিল্লীর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লাল কেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন

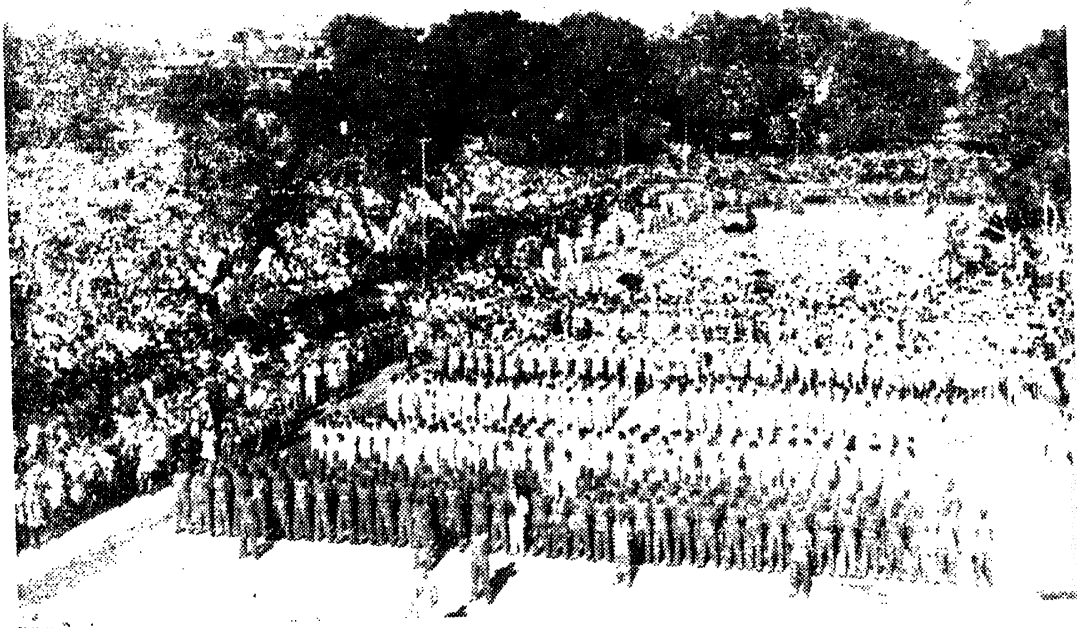


পাণ্ডিত জওহরলাল নেহরু লাল কেল্লায় পতাকা উত্তোলন করেন। ছবিতে তাঁহাকে পতাকা উত্তোলনের জন্য বিদ্যুতের বোতাম টিপিতে দেখা যাইতেছে



গণ-পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার পরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহিত আলোচনা করিতেছেন

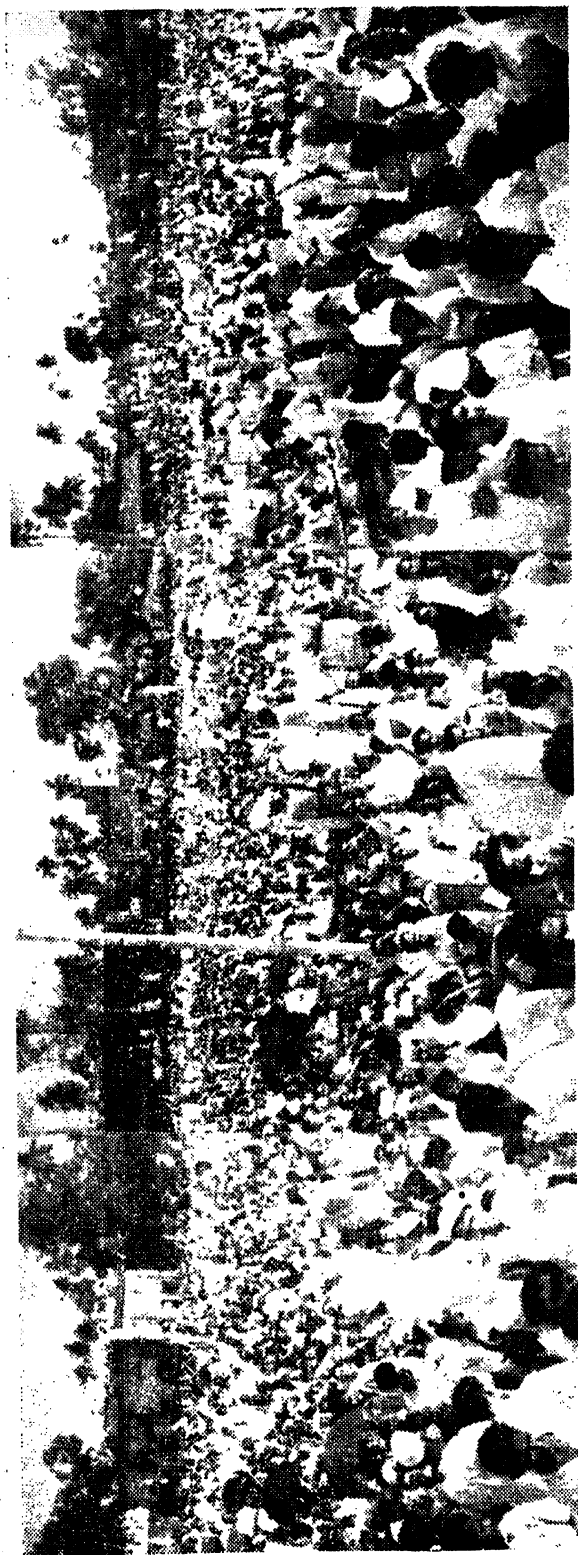
৪৩০০ খণ্ডের জ  
চার পাঁচদিনের ভিত্ত



লাল কেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনকালে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাগণ কর্তৃক পতাকা অভিযান



বড়লাটভবনে শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগদানান্তে বিশিষ্ট অতিথিবর্গ প্রাসাদ হইতে বাহির হইতেছেন



মহিলারা নরিকেলভাংগাতে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভাঃ উভয় দপ্তরদ্বয়ের বিপুল জনসমাবেশ



১৫ই আগস্ট দিল্লীতে গণ-পরিষদের সম্মুখে সহস্র সহস্র লোকের জনতা

আমরা  
এটার জন্য  
চার পাঁচদিনের ভিড়ের



## বুটেনের চিত্র জগতে সংকট

বুটেনের চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সম্প্রতি একটা বিরাট সংকটের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বুটেন যে একটা বড় রকমের অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে চলেছে সম্প্রতি কমন্স সভার আলোচনা থেকেই তা প্রকাশ পেয়েছে। এই সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বুটেনে ট্যাক্সের পরিমাণ বাড়তে বাধ্য হয়েছেন। এই আগস্ট থেকে বুটেনে প্রদর্শিত বিদেশী চিত্রের আয়ের উপর যে নতুন ট্যাক্স বসানো হয়েছে তার প্রতিবাদে মার্কিন চিত্র নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বৃহত্তম পণ্ডাশিটি চিত্র প্রতিষ্ঠান এক-যোগে স্থগিত করেছেন যে, তাঁরা আর বুটেনে কোন চিত্র প্রদর্শনের জন্যে রপ্তানি করবেন না। তাঁদের বক্তব্য এই যে, বুটেনে প্রদর্শিত চিত্রের শতকরা ৭৫ ভাগ আয়ই যখন নতুন ট্যাক্সের ফলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট পাবেন, তখন তাঁদের বুটেনে চিত্র রপ্তানি করে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। মার্কিন চলচ্চিত্র সমিতির (এম পি এ) প্রেসিডেন্ট মিঃ জনসন মার্কিন চিত্রাধিপতিদের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করে বলেছেন যে, বুটেনে মাত্র ২৫ সেন্ট দিয়ে এক ডলার মূল্যের ফিল্ম পেতে চায়। তাঁরা এই অস্বস্তি ব্যবস্থা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না।

মার্কিন চিত্রাধিপতিরা বুটেনের প্রেক্ষাগার-গুলিতে প্রদর্শনের জন্যে আর মার্কিন চিত্র রপ্তানি করবেন না—এই সিদ্ধান্তের ফলে বুটেনের প্রেক্ষাগারমালিকদের মনে ভীষণ গ্রাসের সত্ত্বা হয়েচে। ব্রিটিশ চিত্র প্রদর্শকরাও সমান চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। বুটেনে প্রতি বৎসর এত অধিক সংখ্যায় মার্কিন চিত্র প্রদর্শিত হয় যে, এই মার্কিন বয়কটের ফলে বুটেনের অধিকাংশ প্রেক্ষাগার বন্ধ করে দিতে হবে—তাঁদের মনে এই আশঙ্কা হয়েচে। বুটেনের প্রেক্ষাগারগুলিতে সাধারণত সপ্তাহে দু'বার চিত্র পরিবর্তন করা হয়। এখন তাঁদের সপ্তাহে একবার চিত্র পরিবর্তন করতে হবে। তাতেও তাঁরা ক্লান্ত পাবেন কি না সন্দেহ। বুটেনের নিজস্ব চিত্র ও আমেরিকা-বাহির্ভূত অন্যান্য দেশের চিত্র দিয়ে মার্কিন চিত্রের জায়গা পূরণ করা যাবে না—এই তাঁদের ধারণা। তাই তাঁরা গভর্নমেন্টের নতুন ট্যাক্স ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

অপর পক্ষে মার্কিন চিত্রাধিপতিরা বুটেনের বাজার বয়কট করার সিদ্ধান্ত করায় ব্রিটিশ চিত্রনির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণভাবে সন্তুষ্ট হয়েছে—বলা চলে। মার্কিন চলচ্চিত্র যে তাদের গর্বের প্রতিবন্ধী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই বুটেনের শ্রেষ্ঠ অর্থার রায়স্ক এ বিষয়ে প্রকাশ করেছেন। ইনি শতাধিক প্রেক্ষাগারের

## বঙ্গভাষা

মালিক এবং বহু চিত্র-নির্মাণ প্রতিষ্ঠানেরও পরিচালক। তিনি ঘোষণা করেছেন যে, অবিস্মের অধিক সংখ্যায় ব্রিটিশ চিত্র নির্মাণে তিনি হাত দেবেন এবং তিনি অন্যান্য ব্রিটিশ চিত্রমালিকদেরও উপদেশ দিয়েছেন যে তাঁরা যেন কথা কম বলে কাজ বেশী করেন।



গ্রীকস্টোন দে

বাই হোক, মার্কিন সিদ্ধান্তের ফলে বুটেনের চিত্র জগতে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংকট দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে যদি উভয় পক্ষের সন্তোষজনক একটা মিটমাট না হয়, তবে যে আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ট্যাক্স বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছেন, সে উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হবে এবং বুটেনের অসংখ্য চিত্রাঙ্গীরাও গভর্নমেন্টকে অভিষাপ দেবে।

## নতুন ছবির পরিচয়

স্বপ্ন ও সাধনা—এম পি প্রোডাক্সন্সের ছবি। কাহিনী: নিতাই ভট্টাচার্য, পরিচালনা: অরুণদত্ত, সংগীত: শৈলেন রায়, সুর সংযোজনা: রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সন্ধ্যারাণী, পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, নরেশ মিত্র, জীবন বসু, সুহাসিনী প্রভৃতি।

১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে আলোচ্য চিত্রখানি একযোগে কলিকাতার তিনটি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে। ছবির কাহিনীতে কিছুটা অভিনবর আমদানি করার প্রয়াস পাওয়া হয়েছে। নায়িকার পিতা মিঃ রায়কে দেখানো হয়েছে একজন আদর্শচরিত্র ধনীরাপে। তিনি নিজের চেষ্টায় সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের সাধনায় সামান্য একজন মিস্ত্রী থেকে হয়ে দাঁড়িয়েছেন একটি কয়েক লাখ মূলধন-সম্মিলিত বিরাট কারখানার মালিক। কিন্তু তিনি স্বার্থপর ধনতন্ত্রবাদী নন—গান্ধীজীর সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি নিজেকে জনগণ ও শ্রমিক সমাজের ট্রাস্টরূপেই বিবেচনা করেন। তাঁর কারখানার শ্রমিকরা তাঁর কাছে যে অনুপাতে মাইনে বৃদ্ধির আবেদন জানায়, তারা পায় তার চেয়ে অনেক বেশী মাইনে। অপর দিকে উচ্চ শিক্ষিত নায়ক অজয়েরও জীবনের স্বপ্ন ও সাধনা হল স্বদেশের শিক্ষা-বাণিজ্যের প্রসার। তার সবই আছে, প্রয়োজনানুরূপ শিক্ষাদীক্ষা আছে, আছে যান্ত্রিক প্রতিভা-শুদ্ধ নেই তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার মত আর্থিক সামর্থ্য। সেই সামর্থ্য সে শেষ পর্যন্ত অর্জন করল ধনী মিঃ রায়ের একমাত্র কন্যার প্রেম-পাত্র হয়ে।

স্বদেশী শিক্ষণ বাণিজ্য সম্প্রসারণের একটা গঠনমূলক দিকের ইতিহাস কাহিনীকার এই চিত্রে দেখার প্রয়াস পেয়েছেন। এ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু সেই সঙ্গে কাহিনীর একটা গুটির কথা উল্লেখ না করেও পারি না। একাধিক লক্ষ্য হাস্যরস, অপরদিকে নায়ক-নায়িকার প্রেম এত বেশী প্রাধান্য পেয়েছে যে তার ফলে কাহিনীর উল্লিখিত গঠনমূলক আদর্শের দিকটা বহুদূরতঃ চাপা পড়ে গেছে তবু চিত্র হিসাবে 'স্বপ্ন ও সাধনা' ব্যর্থ হয়নি—দর্শক মনকে শেষ পর্যন্ত টেনে রাখতে সক্ষমতা আছে এই চিত্রের। অভিনয়ে যার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই না করতে হয় সন্ধ্যারাণী ও জহর গাঙ্গুলীরা। এ দুইজনের সহজ সারলীল অভিনয় দর্শককে যথেষ্ট তৃপ্ত দেয়। নায়ক পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দর নয়—কোন কোন স্থানে তাঁর বাচ ভঙ্গীতে অস্পষ্টতা ও জড়তা দেখা গেলেও মিত্র, জীবন বসু ও সুহাসিনী তাঁর অভিনয় করেন নি। আলোক-চিত্রের ব আশানুরূপ নয়—মাঝে মাঝেই ছবি অস্পষ্টতা চোখে পড়ে। শব্দগ্রহণ মোটামুটি ভাল। আলোচ্য চিত্রে যে দুইখানি আছে, দুইখানিই সুগীত। 'স্বপ্ন ও সাধনা' প্রথম শ্রেণীর চিত্র না হলেও দর্শকসমাজের মধ্যে আনন্দের খোরাক খুঁজে পাবেই আমার বিশ্বাস।

সংগ্রাহে দুই সের তিন ছটাক খাদ্যশস্য বরাদ্দ ছিল। গত ২৫শে আগস্ট হইতে বরাদ্দ এইভাবে বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, মোট সামগ্রিক বরাদ্দের মধ্যে এক সের পাঁচ ছটাকের বেশী চাউল লওয়া চলিবে না; বাকী চৌদ্দ ছটাক গমজাত দ্রব্য লইতে হইবে। কঠোর পরিশ্রমী লোকেরা অতিরিক্ত চৌদ্দ ছটাক খাদ্যশস্য পাইয়া থাকে। এই চৌদ্দ ছটাকের মধ্যে তাহারা আট ছটাক পর্যন্ত চাউল লইতে পারিবেন; বাকী ছয় ছটাক গমজাত দ্রব্য লইতে হইবে। এই নতুন ব্যবস্থা বাঙালীদের পক্ষে ক্রেশকর হইবে, সম্ভব নাই; কারণ ভাতই বাঙালীর প্রধান খাদ্য। পশ্চিমবঙ্গের গভর্নমেন্টের রেশন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর চাউলের এই বরাদ্দ হ্রাসের সম্বন্ধে সর্বাঙ্গতঃ একটি কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। তাহার বক্তব্য এই যে, বর্ষার দরুণ সরকারী শস্য সংগ্রহের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে, ফলে সরকারী গদ্যামে সঞ্চিত চাউলের পরিমাণ অত্যন্ত কমেিয়া গিয়াছে। সরকারী গদ্যামে যে এইরূপ চাউল সংকট দেখা দিয়াছে, তাহা আমরা গভ কর্তৃক সংগ্রাহ যাবৎ রেশন প্রদত্ত হরেক নমুনার খাদ্য ও অখাদ্য, আতপ ও সিন্ধের স্বরূপ দেখিয়াই বুঝিয়া লইয়াছি; কিন্তু এমন অব্যবস্থার জন্য পশ্চিমবঙ্গের নবগঠিত মন্ত্রিসভাকে দায়ী করা যায় না; প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন লীগ মন্ত্রিসভাই প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার লীগ মন্ত্রিসভার নিকট হইতেই উত্তরাধিকার সূত্রে ইহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভাকে লীগ মন্ত্রিসভার অব্যবস্থা ও কৃব্যবস্থার ফলে উদ্ভূত অনেক অসুবিধার ভিতর দিয়াই কাজ করিতে হইতেছে। সম্ভবতঃ কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের নিকট হইতেও তাহারা নিরাশ হইয়াছেন। কারণ তাহারা পূর্বেই পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, রেশনের পরিমাণ কমাইতে হইবে এবং খাদ্যশস্য সংগ্রহের উদ্যম বাড়াইতে হইবে। রেশনের পরিমাণ হ্রাস করিয়া পশ্চিমবঙ্গের গভর্নমেন্ট আপাততঃ দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, মোট বরাদ্দ হ্রাসের প্রয়োজন যাহাতে না দেখা দেয়, আমরা আশা করি, তাহারা তৎপ্রতি অব্যাহত থাকিবেন এবং লীগ মন্ত্রিসভার অবলম্বিত অব্যবস্থা ও দুর্নীতির উৎখাত সাধন করিয়া খাদ্যশস্য সংগ্রহে সমাধিক উদ্যম সহকারে প্রবৃত্ত হইবেন। পশ্চিমবঙ্গকে অসংস্কৃত হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্বই তাহাদের পক্ষে মুখ্য এবং সে দায়িত্ব প্রতিপালনে তাহাদের যোগ্যতার উপরই ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

#### নতুন বিপদের লক্ষণ

সাম্প্রদায়িকতার দৌরাত্ম্যে ভারতবর্ষের সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে; বস্তুতঃ এই উপদ্রব হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্যই কংগ্রেসকে নিতান্ত

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভারত-বিভাগ স্বীকার করিয়া লইতে হয়। কিন্তু আগুন নিভিয়াও নিভিতেছে না; গান্ধীজীর প্রাপ্যতী চেষ্টার ফলে কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেও মফস্বলের কোন কোন স্থানে সে আগুন শিকি শিকি জ্বলিতেছে; পাঞ্জাব তো সে আগুন ছারখার হইয়া গেল। এই অবস্থার মধ্যে প্রাদেশিকতা আবার মাথা তুলিয়া উঠিতেছে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত শঙ্কিত হইতেছি। সমগ্র ভারতের জাতীয়তাবাদীগণ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়া অখণ্ড ভারতের সংহতির আদর্শ অক্ষুর রাখিবার জন্য আজ আগ্রহে আকুল। এখন এই ধরনের প্রাদেশিকতার বিষ উপকাইয়া তুলিয়া জাতির সর্বনাশ সাধনের দুর্বুদ্ধি যাহাদের মধ্যে দেখা দিয়াছে, তাহাদের নিন্দা করিবার ভাষা আমাদের নাই। পূর্বাতে বাঙালীদের বিরুদ্ধে উড়িয়াবাসীদের এক শ্রেণীর মধ্যে কিছুদিন পূর্বে বিশেষ দেখা দেয়। কিন্তু পরে পশ্চিমবঙ্গ এবং উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রীর চেষ্টায় তাহা প্রশমিত হইয়াছে। আসামে বঙাল-খন্দা আন্দোলনের বিভীষিকা বিস্তার লাভ করিতেছে। দার্জিলিংয়ের গুখী লীগের স্বাভাব্যবাদ পিপদ বাড়াইতে পারে। কিন্তু সম্প্রতি জামসেদপুরে বাঙালী সম্মেলনের প্রতিনিধিদের উপর আক্রমণ করিয়া বিহারের একদল গুন্ডা যে দৌরাঘা করিয়াছে, তাহার আশঙ্কিতক পরিণতি ভাবিয়া আমরা সর্বাধিক শঙ্কিত হইতেছি। দুঃখের বিষয় এই যে, পাটনার 'স্যাচ লাইট' পত্র এই সম্পর্কে বাঙালীদের বিরুদ্ধে নিতান্ত অভদ্র ভাষায় আক্রমণ করিয়াছে। পরন্তু সে আক্রমণের কারণ কিছুই নাই। নিচক মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপিত করিয়া এই আক্রমণ করা হইয়াছে। কোন সংবাদপত্রের একজন দায়িত্বসম্পন্ন সম্পাদক যে এইরূপ মিথ্যা কাহিনী সৃষ্টিতে প্রস্রয় দিতে পারেন এবং তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া সমগ্রভাবে বাঙালী জাতিকে ইতরোচিত ভাষায় গাল-গালাজ করিতে পারেন, ইহা আমরা ধারণাও করিতে পারি না। কিন্তু 'স্যাচ লাইট'র সম্পাদক সাম্প্রদায়িকতার এমনই অন্ধ হইয়াছেন। বাঙালী সমাজের বিরুদ্ধে তাহার এই উৎকট অন্ধ বিশ্বাসের কারণ এই যে, জামসেদপুরের সম্মেলনে বাঙালীদের পক্ষ হইতে মানভূম, সিংভূম, সাঁওতাল পরগণা এবং পূর্ণিয়া বঙ্গ-ভাষাভাষী এই কয়েকটি অঞ্চলকে বিহার হইতে পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য দাবী করা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই দাবী নতুন নহে এবং কংগ্রেসের প্রদেশ বিভাগ সম্পর্কিত বিষোদিত নীতি অনুসারেই এই দাবী করা হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এখন নতুনভাবে গঠিত হইতেছে এবং বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রিসভার সঙ্গে আলোচনার পথে প্রাদেশিক সীমানা সম্পর্কিত প্রশ্নের

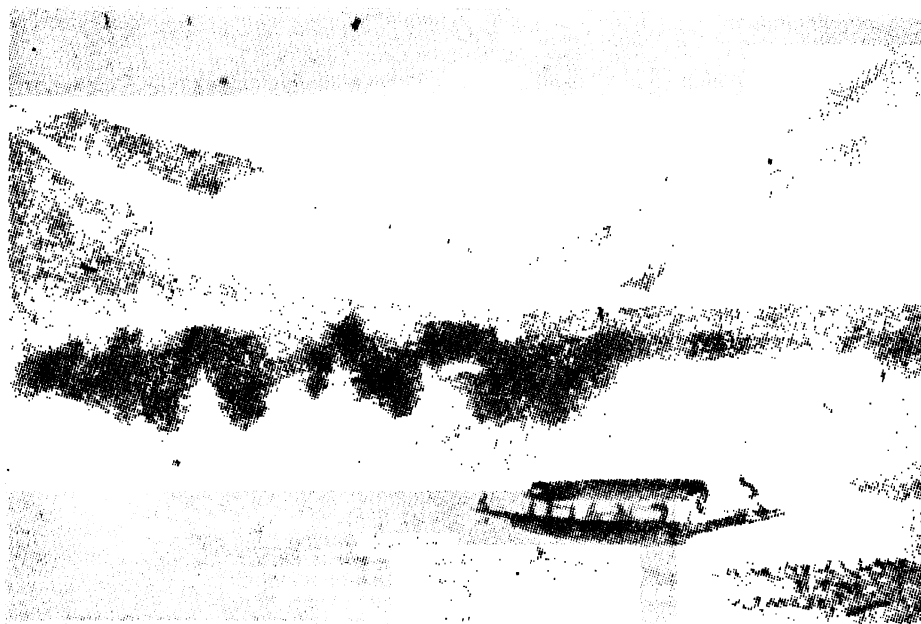
সমাধান করিবার কথাও উঠিয়াছে; নতুন এক্ষেত্রে বাঙালী সমাজের এই দাবীতে অন কিছুই হয় নাই; কিন্তু বিশেষ ন্যায় বা অন্যভাবে বিচার কিছু রাখে না। স্যাচ লাইটের সম্পাদ্য পদোচিত মর্বাদবোধে জলাঞ্জলি দিয়া অমনোবিস্ত্রসূলভ সাম্প্রদায়িকতায় কাণ্ডজ্ঞান হই বিচ্যুত হইয়াছেন। সত্যের বাল্যই চুকাইয়া দি তিনি মিথ্যার আগুনে জ্বলিয়া রুটির পরি দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, বাঙালী সম্মেলনে প্রতিনিধিরা সম্মেলনে উপস্থিত আত্মবিহারী ভুলোকদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল এই অভিযোগ সম্পূর্ণই মিথ্যা। বিহারের কোন সংবাদপত্রেই এমন মিথ্যা অভিযোগ কোন নাই। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বাঙা ভুলোকেরাই বিহারীদের দ্বারা আক্র হইয়াছিলেন। কিন্তু 'স্যাচ লাইট'র মিথ্যা রটনা এবং অভদ্র ও অনি কর প্ররোচনার প্রসঙ্গ বাড়াইয়া আ আমাদের লেখনী কলঙ্কিত করি চাহি না। আমরা কংগ্রেস-নেতৃবর্গের দ, আপাততঃ এই দিকে আকৃষ্ট করিতেছি। তাহা অবিলম্বে সজাগ হউন। প্রাদেশিকতার এই ছড়াইয়া যাহাতে না পড়ে, তেমন ব্যব কঠোর হস্তে অবলম্বন করুন। 'স্যাচ ল' সম্পাদকের ন্যায় প্রাদেশিকতার বিকারগ্র দিগকে সংযত করা তাহাদের পক্ষে একা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে; নতুবা সাম্প্রদায় ন্যায় প্রাদেশিকতা আমাদের সমগ্র ভাব অধঃকারাচ্ছন্ন করিয়া তুলিবে।

#### সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার অনিষ্টকারিতা

রাজ্যতন্ত্রক সিদ্ধান্তের ফলে বাঙালার কোন অঞ্চলের মুসলমান সমাজে হর্ষাধর্ম সাম্প্রদায়িক উদ্বেগনার ভাব জাগিয়া উঠিয়া কিন্তু এই সব ব্যাপক আকার ধারণ করিবে বলিয়াই আমরা আশা করি। কিন্তু গ্রীহ হবিগঞ্জ হইতে যেসব সংবাদ পাওয়া যাইতে তাহা সত্যই আতঙ্কজনক। হবিগঞ্জ পাকিস্থানী এই অসংযত উল্লাসজনিত আে এবং উদ্বেগনার ময়মনসিংহ ও কুি পর্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে, ও আশঙ্কার কারণ আছে। মহাস্বাভাবী এি পূর্ববঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াই কায়েদে আজম জিন্না এ সম্বন্ধে সম্প সংবাদপত্রে যে বিবৃতি প্রদান করিয়া তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ি 'মুসলমান সমাজকে অন্ধ ভাবাবেগে ত্যাগ কর যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হইবার অনুরোধ করিয়াছেন। সীমানা কমিশ সিদ্ধান্তে ক্ষুদ্র হইয়া যেসব মুসলমান অন সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ভাব এখনও জ পোষণ করিতেছে, আমরা আশা করি, জিন্নার উপদেশ, - 'একতার জন্য সাহায্য করিবে চার পিঠাদিনের ভিতরে



মানস সরোবরের পথে



মানস সরোবরে নৌকা-বিহার

# কবিতা

## সম্যাধিলাপ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

মহাশয়, আমার দিকে তাকান। আসল মানুষ আমি-ই।  
আমি-ই মহাভাগ্যঃ আমি পরিতৃপ্ত।  
যা চেয়েছিলুম তার অনেক বেশী পেয়েছি,  
সব রয়েছেঃ কোনো অন্তরায়ই ঘটেনি।  
জীবনই ছিল লুকোচুরি খেলার যায়গা,  
আমাকে যা প্রতারণিত করেছে।  
এখনো লজ্জিত হই, যেন ধরা পড়েছিলুম,  
তিরস্কৃত হ'য়েছি সেজন্যে।  
কিন্তু এখন আমি অদৃশ্য। ছিলুম বোকা,  
এখন দেখছি এমন বিষয় জানি জ্ঞানের রাজ্যেও যা অজ্ঞাত।  
কারণ, আমি কিছই জানিনে। ছিলুম ক্রীতদাস,  
আর এখন অশাসিত, মুক্ত। আর আমার ঐশ্বর্য--  
কল্পনাতীতঃ কারণ, আমার কিছই নেই।  
সৌন্দর্য চেয়েছিলুম, আকাংক্ষা করেছিলুম বিশ্রামের জন্যে,  
আর এখন সব কিছই পেয়েছি। না,  
আমিই হচ্ছি সম্পূর্ণতাঃ কারণ আমি কিছই নই,  
আমি মৃত্যু।\*

\* Lascelles Abercrombie-র EPITAPH কবিতার  
অনুবরণে।

## মুখ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

মুখখানি মনে রাখি তবু।  
তোমার অন্তর মুখ আমাদের যুগ্ম-জীবনের  
ক্ষয়হীন অব্যয় প্রতিভু॥  
তোমার শরীরে--  
প্রসারিত সর্ব অঙ্গে, নিভৃত প্রদেশে,  
বিচ্ছেদের অস্ত্রখানি ব্যবচ্ছেদ কার্যে নিয়োজিত।  
শাখা হ'তে শাখা দূরে, তরু হ'তে তরু,  
খণ্ডিত মাটীর মাঝে আজ দগ্ধ মরু,  
এ চক্রান্ত তোমায়ে ইংগিত?  
পাকিস্থানে, হিন্দুস্থানে  
বোধ করি মন বাঁধা নেই কোনো স্থানে।  
উজ্জীন পাখীর মতো মন উড়ে যায়,  
মরুভূর দগ্ধ প্রান্তে, পারাবারে, দূর নীলিমায়,  
দিগন্তের স্বর্ণ-সীমানায়।  
এতোকাল পাশাপাশি। আজ শুধু সরে গিয়ে দূরে  
ভাবি কি চক্রান্ত চক্র সর্ব অন্তঃপুরে,  
মুখখানি মনে রাখি তবু।  
ভারতী, তোমার মুখ আমাদের যুগ্ম-জীবনের  
ক্ষয়হীন অব্যয় প্রতিভু॥

## ভাসমান

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

পায়ের নীচে মাটি সরে যায়  
অথৈ সাগরেতে ডুবে যাই--  
অতল জল-ধারা দূরে ধায়,  
নিরাশ আধারে-ও আলো পাই।  
আবার হই যেন ভাসমান,  
নতুন পথ-রেখা ডেকে যায়--  
সহসা পাই ফিরে হৃত প্রাণ,  
দূরের দ্বীপ কাছে আসে প্রায়।  
এমন কত দ্বীপ আসে কাছে,  
মিলায় মৃগতৃষা কতবার--  
তবু কি প্রাণ আজো লিভিয়াছে  
স্বপন-সুদূরীভূত গৃহ তার?

এমন ব্যথা চলা নেই শেষ?  
জীবন-ব্যাপী আজো শুধু ক্ষয়।  
অনেক দূরে সেই মহাদেশ--  
বিজয়ী রূপ লভে পরাজয়!

সরল পথ-রেখা সরে যায়  
অতল জল-তলে ডুবে যাই--  
সুদূরে দ্বীপ জাগে শুধু হায়।  
শ্যামল স্নেহ-মায়া সেথা নাই।

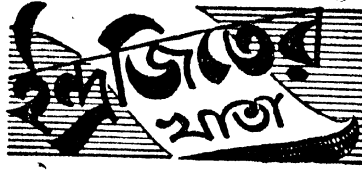
দূরের দ্বীপ-রেখা দূরে যায়  
অকূল প্রাণে ভাসা, চার পটাদিনের ভিড়ের

## সোনার কাঠি

আজ ১৫ই আগস্ট। স্বাধীন ভারতের প্রথম সূর্যোদয় দেখলুম, স্বাধীন দেশের প্রাণভরে বৃক্কে টেনে নিলুম। জীবনে কানোদিন জ্ঞাতসারে কোনো পুণ্য কাজ করিনি তথাপি জীবনের চরম পুরস্কার হাতের কাছে এল। যাদের স্মৃতিতে পুণ্যফল আমরা স্মৃতিতীরা লাভ করলুম তাঁদের পায়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করি।

রূপকথার মতোই রোমাঞ্চকর। স্বাধীনতার সোনার কাঠি ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে দু'শ বছরের ঘুম থেকে রাজকন্যা জেগে উঠেছে। স্বাধীন রাজপুত্র সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দু'শ বছরের ঘুম ভাঙালেন সর্বাঙ্গে তাঁকে প্রণাম করি। ভাষারীর বেশে আমাদের রাজপুত্র—দরিদ্রের স্টীরে আর ভাঙ্গা বসতিতে তাঁর নিঃশব্দ দসম্পরণ। যেই দিনটিতে তাঁর সহকর্মীরা গোরবে প্রবেশ করেছেন গবর্ণমেন্ট প্রাসাদে শাউ উড়িয়েছেন, গগনচুম্বী প্রাসাদ শীর্ষে পাইদানে তিনি গিয়েছেন বেলেঘাটার পথের পাশে। আগে ভাবতুম দেশ যেদিন স্বাধীন হবে সেদিন আমরা তাঁকে কোথায় বসাব, কী কথা রাখব। এখন দেখছি সবচেয়ে বড় সমস্যার আসনটি তাঁরই জন্য রাখা ছিল। দ্বায়ে দিয়েছ ঘর, আমরা দিয়েছ শুধু "জাতির সব চাইতে বড় মহোৎসবের দিনে আর কোনো স্থানেই তাঁকে মানাত না—থের মানুষ পথেই তাঁর স্থান—সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে।

আমি সম্ভবতঃ এত আজকে বাজে কথা বলি, আমার মূখে গম্ভীর কথা মানায় না—তের মূখে রাম নামের মতো শোনায়। কিন্তু আজকে মনের ভাবটা যা হয়েছে কোনো নামেই তা প্রকাশ করতে পারছি—না গম্ভীর সুরে না হাসকা ঢং এ। এ যে কি আশ্চর্য অনুভূতি কি বলব। মাথায় যে কটা কথা চুল ছিল মনে হচ্ছে সে কটা নিশ্চয় সবার কাঁচা হয়ে যাবে। মূককে বাচাল হতে নেই। কিন্তু আমার মতো বাচাল মানুষও সময়ে সময়ে স্তব্ধ। উন্মত্ত জনতার সাগর স্রোতে দাঁড়িয়ে জীবনে অল্প প্রথম তীর্থদর্শন করলুম। ভারলে আশ্চর্য লাগে আজকে রাষ্ট্র ভাঙের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট দেশ এবং জাতির জীবনে কত বড় পরিবর্তন ঘটে গেল খাচ বিশ্বপ্রকৃতির কি উদাসীন মূর্তি! সেই



আকাশ, সেই বাতাস, সেই সূর্যালোক, এতটুকু তার পরিবর্তন নেই। উদাসীন প্রকৃতির চোখের পাতাটুকু পর্যন্ত নড়ল না। ওদিকে যে মানুষটা একদিন আগেও ছোরা হাতে খুন করেছে সে আজ ছোরা ফেলে দিয়ে আতর বিলাচ্ছে, পিস্তলের বদলে গোলাপ জলের পিচিকারি হাতে ছুটেছে। বলছে, ভাই যদি ভায়ের বক্ষে ছোরা মারিতে চায় তবে তাহার স্থান বেলেঘাটা নয়, রাজাবাজার নয়। মানুষের প্রকৃতিতে আর বিশ্বপ্রকৃতিতে এইখানেই তফাৎ। বিশ্বপ্রকৃতি সৃষ্টির শিকলে বাঁধা তার থেকে তার মুক্তি নেই, কিন্তু মানবপ্রকৃতি যে কোনো অবস্থা থেকে মুহূর্তে মুক্তিলাভ করে।

যে কাজ বহু নেতা মিলে করতে পারেন নি স্বাধীনতা তাই করেছে। এখনও আমরা স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করিনি। আমাদের নবজাত স্বাধীনতার বয়স মাত্র কয়েক ঘণ্টা। এখনও ওটা ধরাছোঁয়ার অতীত একটা কথা মাত্র, কিন্তু open sesame-এর মতো মানুষের মনের কপাট গিয়েছে খুলে। দেশের মুখ রক্ষা হয়েছে। আমরা বরাবর বলে এসেছি তৃতীয় পক্ষ ইংরেজ সেরে দাঁড়াক—আমাদের ঘরোয়া বিবাদ আমরা নিজেরাই মিটিয়ে নেব। হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া দুই সতীনের ঝগড়া। ইংরেজ আবার একজনকে করেছে সুয়োরানী আরেকজনকে দুয়োরানী। এখন ইংরেজ গেছে, দুই সতীনি আর কি নিয়ে ঝগড়া করবে?

হিসেব খতিয়ে দুজনেই দেখেছে ইংরেজ শুধু দেনাই রেখে গেছে—liabilities without assets, রেখে গেছে শুধু পেটের খিদে। পেটের খিদে নিয়ে ঝগড়া করা পোষায় না।—এই একটি কথা বুদ্ধিতে পারলে হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ একদিনে খুঁচে যাবে। ঝগড়া লাগাবার মতো তৃতীয়পক্ষ অবশ্য দেশেও আছে। এদের পেটের খিদে নেই, কিন্তু নেতৃত্বের খিদে আছে। এদের বিশ্বাসং নৈব কর্তব্য। ইংরেজের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে, কিন্তু নেতার হাত থেকে রক্ষা করবে

কে? 'স্বাধীন ভারতের' ওটাই হবে সবচেয়ে বড় সমস্যা।

আজ হঠাৎ যে মিলনটা হয়েছে সেটা ধোপে টিকবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ এর মধ্যে লজিকের চাইতে মাজিকের অংশ বেশী। কি করব আমাদের পাপ মন, অশিষ্টাচারী মন—আমরা miracleএ বিশ্বাস করি না, যদিচ গান্ধীজী বলেছেন—the days of miracle are not yet gone. অবশ্য গান্ধীজীর নিরলস সাধনা সার্থক হউক, এই প্রার্থনাই করি।

এই সূত্রে আরেকটা কথা মনে আসচে। পরাধীন ভারতে যাঁরা ছিলেন নেতা, স্বাধীন ভারতে তাঁদেরই নেতৃত্ব করতে হবে, এমন কোন বাঁধাবাদী নিয়ম নেই। স্বাধীনতা অর্জন করা এক কথা, স্বাধীনতা রক্ষা করা আরেক কথা। দুটোর দুই টেকনিক। ইংলন্ডের মুশকলানী নেতা হিসাবে চাচিল ছিলেন indispensable, কিন্তু শান্তিপূর্ণ রাজনীতি থেকে তাঁর মহাভিনয়করণ। ভারতবর্ষেও সেটি হলে মঙ্গল হবে। বর্তমান নেতাদের ভুল-ভ্রান্তির ফলে আমাদের রাজনীতিতে যে সব জট পাকিয়েছে, ভবিষ্যতের নেতারা সে সব জট ছাড়াবেন। অর্থাৎ সে সব নেতাদের approachটা হবে ধর্ম-নিরপেক্ষ। এতদিন জাত আর ধর্ম নিয়ে মানুষে মানুষে লড়াই হয়েছে, এখন হবে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে। হিন্দু-স্কুল কিম্বা ইসলামিয়া কলেজ যেমন বিদ্যা-মন্দিরের অপমান, হিন্দু রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্র তেমনি রাষ্ট্রনীতির অপমান।

না, এ নৈরাশ্যের সূরটা আজ না আনলেই ভালো হতো। বলছি তো আমার পাপ মন, সেজন্যই যত রকম সন্দেহ কেবল মনের কোণে উর্জিক মারছে।

এ যে আমাদের পাড়ার ছেলেমেয়েরা গান ধরেছে—তোরা মরা গাঙে বাণ এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী। মনটা নেচে উঠেছে। না, অশিষ্টাচার আর নয়। অশিষ্টাচার পরাজয়ের লক্ষণ, বিশ্বাসেই শক্তি।

১৫ই আগস্টের আনন্দটা আজ কদিন ধরে ধীরে আস্তে রিসিয়ে উপভোগ করছি। ইচ্ছে করেই দেরী করে আপনাদের দরবারে পেশ করলুম। হয়তো দরকার ছিল না। কিন্তু এমনি বদভাস হয়ে গেছে আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে উপভোগ করতে না পারলে এখন আর কিছুতেই রস পাই না।



# যাত্রিদল

## শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

একচর্যাবিংশ অধ্যায়

তবু ছয় সাতটি বৎসর এত দুঃখ কষ্টেও যে কেমন করিয়া আসিতের কাটিয়া গেল—তাহা কম বিস্ময়ের নহে। দিনের পর দিন তাহারা নারিকেল ছোবড়া পিটাইয়া হাত ফুলাইয়া ফেলিয়াছে—দাঁড়ি পাকাইয়া হাতে ঘা করিয়াছে—ঘানি টানিয়াছে—একটা দিনও রেহাই পায় নাই—শরীর নিতান্ত অচল হইয়া পড়িলেও, কেহ এতটুকু দরদ দেখায় নাই—এতটুকু কাজের লাঘব করিয়া দেয় নাই। ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়াকে যেমন আহরের সময়টুকু ছাড়া—সর্বদা তাহার মালিক খাটাইয়া লইতে চাহে—ঘোড়া তাহার কয়দিন বাঁচিবে না বাঁচিবে সে হিসাব করে না—এখানেও ঠিক তেমনি ব্যবহারই তাহারা পাইয়া থাকে। কিন্তু আজ মাস তিনেক হইল অবস্থা তাহাদের খানিকটা ভাল হইয়াছে—জেল কতৃপক্ষের অমানুষিক অত্যাচারের মাত্রা অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার মূলে যে ব্যক্তিটি—সে আর বাঁচিয়া নাই। মাস পাঁচেক পূর্বের ঘটনা। আগরা যড়যন্ত্র মামলার আসামী মদনগোপাল সিং সুপারিন্টেন্ডেন্টের সম্মুখে সাফ জবাব দিয়াছে—আগামীকলা হইতে সে অনশন আরম্ভ করিবে। স্বতদিন রাজনৈতিক বন্দীদের সম্মানজনক কাজ না দেওয়া হয়—তাহাদের সহিত ভাল ব্যবহার করার প্রতিশ্রুতি না দেওয়া হয়, ততদিন সে আহার গ্রহণ করিবে না। মদনগোপাল ঘানি ঘরুয়াইত। আসিতদের ওয়ার্ডের তেতলায় তাহার থাকিবার সেল। প্রত্যহ উপরে উঠিতে নীচে নামিতে আসিতের সহিত তাহার আলাপ পরিচয় হইত। অল্প বয়স—উন্নত বলিষ্ঠ চেহারা। কিন্তু মাস তিনেক ধরিয়া ঘানি টানিতে টানিতে শরীর তাহার শুকাইয়া উঠিয়াছিল—মন তাহার অনেকখানি ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। আসিতেরা প্রথমে ব্যাপারটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করে নাই। ভাবিল শুধু শুধু হয় তো ঘোচারা পাঁচ সাত দশ দিন অনাহারে নিজের দেহটাকে দুঃস্থ হইতে দিবে—ফল কিছুই হইবে না। জেল কতৃপক্ষ ফিরিয়াও তাকাইবে না। তারপর আবার আহার তাহাকে করিতেই হইবে—আবার একদিন মধু নীচু করিয়া ঘানি ঘরে গিয়া ঢুকিতে হইবে। সতাই জেল কতৃপক্ষ প্রথমে গ্রাহ্যই করিল না। দিন তিনেক পরে একদিন দম্প্তরমত শাসাইয়া গেল। যদি সে অনশন

ভগ্ন না করে তবে সারাদিন রাতি তাহাকে হাতকড়া দিয়া দাঁড়ি করাইয়া রাখা হইবে—বেত মারা হইবে ইত্যাদি। কিন্তু মদনগোপালের সংকল্প তাহাতে একটুও টালল না। এমনি করিয়া সাত দিন গেল—দশ দিন গেল—অবশেষে বিশ দিন পর্যন্তও জেল কতৃপক্ষ আর কোন কথাই কহিল না। মদনগোপাল শুধু জলপান করিত আর সারা দিনরাতি নিজের বিছানায় পড়িয়া থাকিত। প্রত্যহ তাহার শিয়রের কাছে নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য সাজাইয়া রাখা হইত কিন্তু সে সৈদিক ফিরিয়াও তাকাইত না। একদিন সকলের অলক্ষ্যে আসিত গিয়া কয়েক মিনিটের জন্য তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছিল। শরীর তাহার একেবারে শুকাইয়া কাঠ হইয়া উঠিয়াছে—ভাল করিয়া কথা বলিতে পারে না। তাহার দিকে চাহিলে মনে হয়—কতদিন ধরিয়া কি এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে যেন ভুগিতেছে সে। পঁচিশ দিনের দিন—তাহাকে জোর করিয়া আহার করান আরম্ভ হইল। হাত পা জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া রবারের নল নাকের ভিতর দিয়া ঢুকাইয়া সেই নলের সাহায্যে পেটের ভিতরে দুধ ঢালিয়া দেওয়া হইত। দুই তিনদিন এমনি চলিল। মদনগোপাল তাহার শেষ শিষ্টটুকু পর্যন্ত দিয়া বাধা দিত। ধস্তাধস্তির পরে যখন সে অবসন্ন হইয়া পড়িত—নল দিয়া দুধ ঢালিয়া দিত। দিন চারেক পরে সেদিন আসিতেরা যখন নীচের তলায় বারান্দায় বসিয়া কাজ করিতেছিল ডাক্তার তখন লোকজন লইয়া মদনগোপালের সেলের দিকে উঠিয়া গেল। তাহারা মনে করিল—অন্য দিনের মত আজও তাহাকে জোর করিয়া আহার করান হইবে। ইহার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে চারিদিকে ট্যাণ্ডেল সিপাহী জমাদারদের—যেন একটা চাপা কথার আওয়াজ ভাসিয়া আসিতে লাগিল—টাওয়ারের সিঁড়ি দিয়া তাহারা দ্রুত ওঠা—নামা করিতে লাগিল। জেলারকে উপরে উঠিতে দেখা গেল—এবং কিছুটা পরেই ডাক্তার ও জেলার দ্রুত সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া হাসপাতালের দিকে চলিয়া গেল। আসিতরা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কয়েক মিনিট পরে “বি ক্লাশ” কয়েদীরা কাহার সারা দেহ কম্বলে ঢাকা দিয়া ট্রেচারে করিয়া নামাইয়া হাসপাতালের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। কি হইল? কাহাকে এমনি করিয়া হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইতেছে। ওধার

হইতে যতীন চাঁৎকার করিয়া বলিল—মদনগোপালকে ওরা মেয়ে ফেলেছে—ট্রেচারে করে মদনগোপালের দেহ নিয়ে যাচ্ছে। মুহূর্ত মধ্যে সারা জেলময় এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল। যে স্বদেশী কয়েদীরা ঘানিতে কাজ করিত—অন্যান্য ওয়ার্ডে থাকিত—তাহারা সকল বাধা—নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া একেবারে ছুটিয়া আসিল—আসিতদের ওয়ার্ডের সম্মুখে। সর্বশুদ্ধ তাহারা বিশজন। এই বিশজন উন্মত্তের মত ছুটিয়া চলিল হাসপাতালের দিকে। সিপাহী জমাদার ছুটিয়া আসিল—তাহারা গ্রাহ্য করিল না। সিপাহীরা নিরুপায় দেখিয়া বাঁশিতে ফুঁ দিল—গেটে পাগলরা ঘণ্টি ৩৭ ৩৮ করিয়া বাজিতে লাগিল। তবু তাহারা ভ্রক্ষেপ মাত্র করিল না—যেখানে মদনগোপালের দেহ কম্বল চাপা দিয়া রাখা হইয়াছিল—সেখানে আসিয়া মৃতদেহকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল—কম্বল তুলিয়া সকলে নিনিমেষ নয়নে মদনগোপালের দেহের দিকে রহিল চাহিয়া। ইটাং একেবারে রাগে দুঃখে পাগল হইয়া উঠিল তাহারা। কয়েকজন মিলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—আজ আমরা সবাই একসঙ্গে মরবো—তার আগে চল কোথায় ডাক্তার তাকে চরম শাস্তি দিয়ে যাব। উন্মত্তের মতই ছুটিয়া বাহির হইতে চাহিল তাহারা। ইতিমধ্যে সিপাহী, ট্যাণ্ডেল, পেটি অফিসার প্রভৃতি মিলিয়া দেড় শ লোক আসিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল—কাহারও হাতে বন্দুক, কাহারও হাতে লাঠি সোটা। কিন্তু কাহারও উপরে মারপিট হইল না—কেহ সাহেবের আদেশে ৫।৭ জন মিলিয়া আসিতদের এক একজনকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া তাহাদের যাহার যাহার সেলে আনিয়া বধ করিয়া রাখিল। আসিতেরা রুদ্ধ আক্রোশে ফুলিয়া ফুলিয়া মর্ষিতে লাগিল। ইহার পরদিন হইতে এই বিশজন রাজনৈতিক বন্দীই অনশন আরম্ভ করিয়া দিল। কয়েক দিনের ভিতরেই অবশ্য কতৃপক্ষ এবার নরম হইয়া আসিল। জেলের ভিতরে যে ছাপাখানা ছিল—এই বিশজনকে সেখানেই কাজ দেওয়া হইল। মদনগোপালের পণ এবার সত্যসত্যি খানিকটা পূরণ হইল। শ্যামবাজার বোমার মামলার আসামী বীরেন দাস হইলেন তাহাদের ছাপাখানার ট্যাণ্ডেল।

মাস ছয়েক পরের কথা। ছাপাখানার নানা কাজে মাঝে মাঝে বীরেনবাবুকে জেল অফিসে যাইতে হইত। সেদিন বিকাল বেলা জেল অফিস হইতে আসিয়া বীরেনবাবু নিজের জ্যাংগায়ার ভিতর হইতে লুকান খানাতিনেক খবরের কাগজ বাহির করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আসিতরা সব কয়েকজন তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বীরেনবাবু বলিলেন—গোপনে বন্দোবস্ত করোঁছ—এখন থেকে রোজ বিকাল বেলা এক ঘণ্টার জন্য কাগজ পাওয়া যাবে। চার পঁচাটদিনের ভিতরে

এবারকার ডাকের সব কাগজগুলো পড়ে ফেলতে হবে। কাগজ খুলিতেই সকলে বুকিয়া পড়িয়া এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল—“দি সার্ভেট”। অসিতরা একেবারে পদূলকে আত্মহারা হইয়া উঠিল—বাঙলা দেশের কাগজ—কলিকাতার—কাগজ! বীরেনবাবু বলিলেন—ভয়ানক সব খবর আছে—আমরা তো দেশের কোন খবর জানিনে—কি ভীষণ এক আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে—পড়ে যাচ্ছি সব চুপ করে শোন। বীরেনবাবু মাঝখানে বসিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলেন—আর তাহাকে ঘিরিয়া পঁচিশ গ্রিণ্টি প্রাণী উৎকর্ষ হইয়া শুনিয়া যাইতে লাগিল। পূর্বের কোন ঘটনা ইহারা জানে না। পাঞ্জাবে যে এত বড় একটা নৃশংস কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে—সারা দেশ নানাভাবে প্রভাবিত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে, ইহার কোন খবরই তাহাদের কর্ণে পৌঁছায় নাই। শূদ্ধ আজিকার এই কয়খানা কাগজ হইতে বীরেনবাবু পড়িয়া যাইতেছিলেন—বোম্বায়ে য়েরাজ আসিয়া নামিবেন এবং তাহারই ফলে ভারতবর্ষের প্রতি নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে যে প্রতিবাদের ধ্বনি উঠিয়াছে তাহার ইতিহাস। কংগ্রেসের এই নির্দেশ। মহাত্মা গান্ধী দেশব্যাপী এই আন্দোলনের ভার লইয়াছেন এবং ইহার পর সারা দেশময় এই গবর্ণমেন্টের সহিত এই মহাত্মারই নেতৃত্বে—অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তিত হইবে—স্কুল কলেজ আইন আদালত ইতিমধ্যে বয়কট আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কাগজ পাঠ শেষ হইল। কিন্তু কে এই মহাত্মা গান্ধী? তাহার সত্যকার পরিচয় কি? ইহাদের মধ্যে বাঙালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী প্রভৃতি নানা জাতীয় লোক ছিল—কিন্তু কেহই ভাল করিয়া মহাত্মা গান্ধীকে চিনিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে জনৈক পাঞ্জাবী জানাইলেন—একজন গান্ধী নাকি দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়া সত্যগ্রহ আন্দোলন করিয়া খুব নাম করিয়াছিলেন—কয় বৎসর পূর্বে তিনি আন্দামানে আসার আগে দেশ হইতে এই খবর জানিয়া আসিয়াছিলেন। এই মহাত্মা গান্ধী সম্ভবতঃ সেই গান্ধী হইবেন। অবশিষ্ট বেলাটুকু, সারা রাত্রি অসিতের মনের ভিতর—মহাত্মা গান্ধী, বয়কট, অহিংস অসহযোগ—নানা কথা একের পর এক জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

পরের দিন কোন সময় আবার কাগজ দেখিতে পাইবে সেই আশায় মন তাহার চঞ্চল হইয়া রহিল। কয়েকদিনের ভিতরে সেবারকার ডাকে যে পনের দিনের কাগজ আসিয়াছিল—তাঁহা পড়া হইয়া গেল। বাঙলা দেশের সেই বিখ্যাত বোমার মামলার ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সত্যচন্দ্র বসু, বিহারের বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ইউ পি-র মতিলাল নেহরু, জওহরলাল নেহরু—বোম্বাইয়ের নরসিমান, পাঞ্জাবের লাল লালপত রায়, দিল্লীর হাকিম আজমল খাঁ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত

প্রদেশের আবদুল গফর খান—তাছাড়া নামকরা মুসলমান নেতা মহম্মদ আলী, সৌকত আলী ইহারা সকলেই এই অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। যে চিত্তরঞ্জন দাশের বিলাসিতা সর্বসাধারণের ভিতরে একটা গম্পের বিষয় ছিল—যিনি মাসে হাজার হাজার টাকা উপার্জন করিতেন—তিনি সর্বস্ব ছাড়িয়া একেবারে সম্যাসী সাঁজিয়া সর্বসাধারণের ভিতরে নামিয়া আসিয়াছেন। আজ হিন্দু-মুসলমান, ধনী, নির্ধন সকলে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া, হাতে হাতে মিলাইয়া দেশের কাজে আসিয়া নামিয়াছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কথা অসিতের মনে জাগিয়া উঠিল। কিন্তু সেবারকার আন্দোলনে তো মুসলমানেরা কোন সহানুভূতিই দেখায় নাই—মাত্র বাঙলা দেশে অল্প কয়েকশত লোক জেলে গিয়াছিল। আর আজ সারা ভারতবর্ষময় সকল সম্প্রদায় এমনি করিয়া ভেদাভেদ ভুলিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে—দলে দলে জেলে যাইতেছে। অহিংসা অসহযোগ সম্বন্ধে তাহাদের কোনই ধারণা নাই। তাহাদের মত ও পথ ভিন্ন, কিন্তু তবুও তো একথা আজ কোন প্রকারেই অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, তাহারা সর্বসাধারণের ভিতরে দেশপ্রেমের বিশেষ কোনই প্রেরণা আনিতে পারে নাই। নিজেরা নিজেরা গুপ্ত দল সৃষ্টি করিয়া লোক চক্ষুর অন্তরালে অতি সংগোপনে কাজ করিয়া গিয়াছে। তাহারা কি, কি তাহাদের উদ্দেশ্য, কি তাহাদের আদর্শ, কোন দিনই তাহা সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিবার সুযোগ তাহাদের হয় নাই—সে চেষ্টাও করে নাই। তাই তাহাদের দেশের মূর্খতামের লোক ছাড়া—কেহ তাহাদিগকে ভাবিয়াছে দন্দা—কেহ বলিয়াছে নিষ্ঠুর নরঘাতক—আরও কত কি! কিন্তু আজ সত্য করিয়াই দেশের লোক নিজের মাতৃভূমিকে চিনিতে পারিয়াছে। হোক সে অহিংসার পথ—তাহাদের সে বিচার করিবার আবশ্যক নাই। আর কিছু না হোক—না আসুক দেশে স্বরাজ—নিজের দেশকে যে দেশবাসী আপনার বলিয়া জানিতে পারিয়াছে ইহাই কি কম লাভ।

ইহার দিন কুড়ি পরে আবার একদিন বিকাল বেলা বীরেনবাবু কাগজ পড়িয়া যাইতেছিলেন—অসিতরা তেমনি করিয়াই তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া এক মনে শুনিয়া যাইতেছিল। এতদিনে গবর্ণমেন্ট প্রতিদিন শত শত লোককে গ্রেপ্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কে কোথায় গ্রেপ্তার হইল তাহার সংবাদ বীরেনবাবু পড়িয়া যাইতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে এক সময়ে তিনি পড়িয়া গেলেন—গোয়ালন্দ মহকুমার গ্রেপ্তারের কথা—অমিরর কথা—এই আন্দোলনে তাহার ত্যাগ ও দানের কথা। এবং তিনি যে আন্দামান শ্রীপাণ্ডুরিত অসিত লাহিড়ীর ভ্রাতা সে পরিচয়ও লেখা ছিল। পাঠ শেষ করিয়া বীরেনবাবু অসিতের

দিকে তাকাইয়া বলিলেন—এ কি অসিতবাবু, ইনি যে দেখছি আপনার দাদা! অসিতের যদিও কিছুমাত্র সংশয় ছিল না তবু—ইহা সে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবে? যিনি একান্ত নিরিবিলি দিন কাটাইতেন—কোনপ্রকার হৈ চৈ বাঁহার খাতে পোষাইত না—দেশ কি, দেশপ্রেম কি এ সম্বন্ধে কোনদিন কোন কথা অসিত তাহার মুখ হইতে শুনিয়াছে কিনা মনে করিতে পারিল না। আর আজ সেই নিরীহ মানুষ নিজের চাকুরী ছাড়িয়াছেন—এমন কি জেলে পর্যন্ত গিয়াছেন। এমনি করিয়াই তাহা হইলে—তাহার দেশ জাগিয়া উঠিয়াছে—এমনি করিয়াই দেশের সর্বসাধারণের ভিতরে দেশপ্রেমের বান ডাকিয়া গিয়াছে। অসিতের সর্বশরীর বিশ্বাস ও আনন্দে বারে বারে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল। আরও দিন দেশকে পরের কথা। সেদিন দ্বিপ্রহরে আহাির করিয়া অসিত নিজের সেলে বিশ্রাম করিতেছিল এমন সময় মেট আসিয়া বলিল—অসিতবাবু আপনার চিঠি আছে। চিঠি? অসিত ছাঁ মারিয়া মেটের হাত হইতে চিঠিখানা লইয়া তাহার উপরে দুই চোখের দৃষ্টি নিঃশেষে ঢালিয়া দিল। চিঠি! তাহার দেশের কথা বহন করিয়া আনিয়াছে—তাহার স্বপ্নপুত্র সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে। এক বৎসর ইহা গেল—সে তাহার দাদার একখানা চিঠি পাইয়াছিল—আর এতদিন পরে আজ আবার এই চিঠি আসিয়া পৌঁছিল। কে লিখিয়াছে চিঠি? খামের ভিতর হইতে কাগজখানা টানিয়া বাহির করিতেই কাঁচা হাতের লেখা চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। কে লিখিয়াছে—এতো তাহার দাদার লেখা নয়। তবে কি কল্যাণী লিখিয়াছে? অসিত তাড়াতাড়ি চিঠির নীচের দিকের নামটি পড়িয়া ফেলিল—“আপনার স্নেহের অঞ্জলি”। অঞ্জলি? তাহার অঞ্জলি লিখিয়াছে চিঠি! আনন্দের উত্তেজনায় সমস্ত শরীর তাহার থর থর করিয়া কাঁপতেছিল। অসিত পড়িয়া যাইতে লাগিল—বাবা আজ এক বৎসরের উপরে আপনার কোন সংবাদ জানি না। আপনার সংবাদ না পাইলে আমরা যে কি দুঃশ্চিন্তায় থাকি তাহা কি আপনি বুঝিতে পারেন না। আজ ছয় বৎসর আপনাকে দেখি না বাবা যখনই আপনার কথা মনে হয়—তখনই দুই চোখ ভরিয়া জল আসে। মা আপনার কথা বলিতে বলিতে একেবারে কাঁদিয়া ফেলেন। শরীর তাহার একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। রাত দিন একা একা বসিয়া কত কি ভাবিতে থাকেন। জ্যাঠামণি ভাল আছেন। তিনি চাকুরী ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমরা সকলে এই এক মাস হইল গ্রামে আসিয়াছি। গ্রাম আমার কাছে খুব ভাল লাগে বাবা—নদী, গাছপালা, মাঠ এই সব কত যে সুন্দর মনে হয় তাহা আর কি বলিব। জ্যাঠামণি বাড়িতে আশ্রম করিয়াছেন। আগ্রামে চরকার সূতা কাটা হয়—ভাঁড়

বোনা হয়। তাছাড়া কলিকাতা হইতে দুইজন খুব বিদ্বান লোক আসিয়াছেন। তাহারা আমাদের বাইরের ঘরে যে জাতীয় বিদ্যালয় হইয়াছে—তাহাতে পড়ান। আমি তাহাদের কাছেই পড়ি। আমি এখন খুব বড় হইয়াছি বাবা—অশ্বকার রায়েও একা একা পথ চলিতে পারি—একটুও ভয় করে না। জ্যাঠামণি আমাকে খুব ভালবাসেন। আপনি কতদিন পরে ফিরিয়া আসিবেন বাবা! আপনার জন্য সदा সর্বদা আমার মন কেমন করে! আপনি আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি সেবক—আপনার স্নেহের অঞ্জলি। তারপর দুই তিনবার চিঠিখানা আসিত পড়িয়া গেল! তাহার অঞ্জলি এমনি করিয়া চিঠি লিখিতে লিখিতে কি কাদিয়া ফেলিয়াছিল অঞ্জলি? তাহারই চোখের জল কি গড়াইয়া পড়িয়াছিল এখানে? কল্যাণী হয় তো পাশে বসিয়া—এক একটা কথা বলিয়া দিওঁতছিল আর আঁচলে চোখ মুছিতোঁতছিল—অঞ্জলি কোন-রকমে দুই চোখের জল চাপিয়া লিখিয়া চলিয়াছিল। চিঠিখানা হাতের মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া এমনি কত কি ভাবিয়া চলিয়াছিল আসিত। উত্তরের জানালা দিয়া দূরে “হিল টেশনের” পাহাড়টি দেখা যাইতছিল। সূর্যের আলোয় ক্ষণে ক্ষণে সেই পাহাড়ের উপরে নানা বর্ণের লুকোচুরি খেলা চলিতছিল—নীচে উত্তাল তরঙ্গমালা বারে বারে তটপ্রান্তে ঘা খাইয়া খাইয়া ফিরিতছিল—আর সেই তরঙ্গের মাথায় মাথায় পুঞ্জ পুঞ্জ ফেনরাশি নৃত্য করিতছিল—মনে হইতছিল কে যেন অজস্র সাদা ফুল সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দিয়াছে। কিন্তু আসিত শব্দ এই দিকে নিরর্থক দৃষ্টি মেলিয়াই তাকাইয়াছিল—ইহার কোন কিছুই তাহার মনে রেখাপাত করিতে পারিতছিল না। তাহার মন পাহাড় সমুদ্র ডিঙাইয়া কোন এক দূরতম প্রদেশের ক্ষুদ্র কয়েকখানি কুটীরের চারি পাশে বারে বারে ঘুরিয়া ফিরিতছিল। সহসা ঢং ঢং করিয়া তাহাদের কাজের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—পাশের সেল হইতে যতীন বাহির হইয়া আসিয়া ডাকিল—আসিদা চলুন যাই। আসিত দুই হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—চল যাচ্ছি।

শ্রাব্যায়োশ অধ্যায়

এক বৎসর পরে অমিয় জেল হইতে মুক্তি

পাইলেন। দেশ তখন নিঃসাড় আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—সে উত্তেজনা নাই—সে উৎসাহ নাই—অবসাদ ও হতাশ্বাসে সারা ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে। যাহারা আজ করা প্রাচীরের অন্তরালে তাহারা একান্ত নির্বিকারভাবে নির্দিষ্ট মেয়াদের দিন গণিয়া চলিয়াছে। যে কর্মিদল এখনও বাহিরে অথচ যে কোন ভাগ স্ববিকারে তাহারা প্রস্তুত ছিল আজ তাহারাও একেবারে নিশ্চুপ হইয়া গিয়াছে—সেনাপতির আদেশে সমগ্র বাহিনীকে পিছু হটিয়া আসিতে হইয়াছে—যুদ্ধ পরি-ত্যাগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু আজও নীরবে প্রতি সেনানীর শিরায় শিরায় রক্ত নিষ্ফল আবেগে টববগু করিয়া ফুটিয়া ফুটিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—তবুও এতটুকু বাহ্যিক প্রকাশ তাহার নাই। এ কি ভাল হইয়াছে? এ কি সেনা-পতির ভুল হইল? বারে বারে নিজের মনে এ প্রশ্ন অমিয় করিয়াছেন। কিন্তু কোন উত্তর খুঁজিয়া পান নাই। মনে করিয়াছেন হয়তো ভুল হয় নাই, যিনি দেশের সত্যকার নাজীর খবর রাখেন—এ তাহারই আদেশ। যখনই গতি-বেগ তাহার নির্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করিয়া বিপথে চালিত হইতে যাইতছিল—তখনই তিনি রাস টানিয়া ধরিয়াছেন—হয়তো এ ভালই হইয়াছে। পরিশ্রান্ত ঘোড়া থামাইয়া লইয়া বিশ্রাম দিতে হয়—আহার করাইতে হয়—তাহার পর আবার পূর্ণ বেগে ছুটাইতে পারা যায়। এ হয়তো বা তাহাই। এমনি নানা জবাব ইহার অমিয় মনকে দিয়াছেন। তাই জেল হইতে বাহিরে আসিয়াও এতটুকু নিষ্ঠা তাহার ক্ষুর হইল না—আদর্শের প্রতি, নেতার প্রতি এতটুকু বীতরাগ হইলেন না। বাড়ি আসিয়া দেখিলেন—আশ্রম বন্ধ হইয়া গিয়াছে—অজয়ের লেখাপড়া এই একটা বৎসর ধরিয়া কিছুই হয় নাই। অজয়কে লইয়া তিনি পড়িলেন মহা-সমস্যায়। দেশের ন্যাশনাল স্কুল অধিকাংশ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দুই একটা যাহা এখনও টিকিয়া আছে—তাহাও ভবিষ্যতে কি হইবে বলা যায় না। অনেক চিন্তা ও শ্বিখার পরে তাহাকে পুনরায় নিকটবর্তী ইস্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল। অজয় তাহার মনের সকল সংশয় কাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আবার উৎসাহে লেখাপড়া আরম্ভ করিয়া দিল। চরকা লইয়া ধর্মগ্রন্থ লইয়া অমিয়র দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। মাস ছয় পরের কথা। দিন দশেক অবিরাম জ্বরে ভোগার পর অজয় অমিয়র জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা-বেলা অজয় তাহার শিরের কাছে বসিয়া মাথায় বাতাস করিতছিল—মাঝে মাঝে তাহার মাথায় কপালে হাত বুলাইয়া দিতোঁতছিল। কিছুদিন ধরিয়া অমিয়র মন ভাল ছিল না। এ সংসারের কোন বন্ধনই তাহাকে তেমন করিয়া আকর্ষণ করিতোঁতছিল না। এক অজয়

খানিকটা তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল বটে, কিন্তু একান্ত আপনার যাহারা তাহারা যে একেবারে দূরে সরিয়া গিয়াছে। স্ত্রী তাহার উপরে চরম অবচার করিয়াছে—নিজে মরিয়াছে তাহাকে ও চিরকালের জন্য কলঙ্কের ভাগী করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। পুত্র দূরে সরিয়া গিয়া আজ একেবারে পর হইয়া উঠিয়াছে। শশাঙ্ক এবার আই এ পাশ করিয়াছে—হয়তো বি এ ক্লাশে ভর্তি হইবে, কিন্তু ইহার কোন খবরই তিনি জানিবার অধিকারী নন। নিজের পুত্রের ভবিষ্যতের চিন্তা করিতে—লেখাপড়ার ব্যয় ভার বহন করিতে কতব্য-অকর্তব্য নির্ধারণ করিতে কিছুতেই তাহার এতটুকু অধিকার নাই। স্ত্রী তাহার প্রতি এমন শত্রুতাই সাধন করিয়া গিয়াছে যে, নিজের পুত্রকে পর্যন্ত চিরতরে বিসর্জন দিতে হইয়াছে। বিস্তৃশালী নিঃসন্তান মাতুল শশাঙ্ককে নিজের করিয়া লইয়াছেন। অসুখের ভিতরে এই সমস্ত চিন্তাই অমিয়কে একান্ত করিয়া পাইয়া বসিল। সৈদিন সন্ধ্যাবেলাও অমিয় এই সবই ভাবিতোঁতলেন—ইঠাং তাহার বুক ভাঙিয়া শব্দে এমনি করিয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল যে, অজয় পর্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। অজয় তাহার মুখের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিল—কি হয়েছে জ্যাঠামণি—অমন করছো কেন? অমিয় প্রশ্নের জবাব না দিয়া অজয়ের এক-খানি হাত নিজের বুকের উপরে চাপিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে অজয় পুনরায় প্রশ্ন করিল—কি ভাবছো জ্যাঠামণি? অমিয় অজয়ের হাতখানি নিজের দুই শীর্ণ হাতের ভিতরে ঝুঁকি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—কয়েক দিন ধরে মন আমার সত্যি ভাল নাই, জ্যাঠামণি, কয়েক দিন ধরে শব্দ শশাঙ্কের কথাই মনে হচ্ছে—হাজার হোক নিজের সন্তান তো? অজয় উৎসাহিত হইয়া বলিল—দাদার কথা ভাবছো জ্যাঠামণি—দাদার কাছে যে আমরা পরশু চিঠি দিয়েছি—এক খামের ভিতরে না লিখেছে—আমি লিখেছি।

—“চিঠি লিখেছিস?” “হ্যাঁ জ্যাঠামণি!”—

“কি লিখেছিস?”

—আমি লিখেছি—দাদা কতদিন আপনার দেখি না। একবার আসবেন। আর মা তোমার অসুখের কথা বলে একবার আসতে লিখেছে। সহসা অমিয়র সারা মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—কই আমাকে তো একথা জানাস্ নি জ্যাঠামণি—বউমাও তো বলেনি। পরে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া বলিলেন—কিন্তু সে কি আসবে রেঃ অঞ্জলি?

—কেন আসবে না,—মা বলেছে নিশ্চয়ই আসবে। কতদিন দাদাকে দেখানি বলতো জ্যাঠামণি।



সেই যে গতবারের আগের বার বিজয়ার দিন আমাদের বাসায় এসেছিলেন—আর তো দেখা হয় নাই। দাদা খুব ভাল হয়ে আই-এ পাশ করেছেন—এবার বি এ পড়বেন, না জ্যাঠামণি?

অমিয় ধীরে ধীরে বললেন—হয়তো তাই পড়বে রে। অমিয় নিজের মনে কি যেন হিসাব করিয়া বললেন—কাল তোদের চিঠি সে পাবে—আজ যদি লেখে কালই তো জবাব আসতে পারে—না রে! অজয় মাথা নাড়িয়া বলিল—তা আর পারে না—মোটো তো ছয় সাত ঘণ্টার পথ এখান থেকে কলকাতা। কিন্তু একের পর একদিন চলিয়া যাইতে লাগিল—শশাঙ্কের কোন পত্র আসিল না। অমিয়র শরীর ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু প্রতিদিন তিনি ডাকের সময় পিয়নের আশায় পথের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন—কলিকাতার ট্রেনটি স্টেশন হইতে ছাড়িয়া যাইবার পর অন্তত ঘণ্টা দুই বাহরের ঘরের বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া দুই চোখের দৃষ্টি দূর মাঠের উপরে মেলিয়া ধরিতেন, হয়তো হঠাৎ কোনদিন শশাঙ্ক তাহাদের কোন খবর না জানাইয়া আসিয়া পড়িবে। কিন্তু অমিয়র কোন আশাই সফল হইল না। সেদিন অজয়কে বললেন—হাঁ রে অজয়, তোর দাদার চিঠির ঠিকানাটা লিখতে ভুল করিস নি তো! অজয় বলিল—না জ্যাঠামণি—আমার ঠিক মনে আছে—২৬।২, ম্বারকানাথ লেন লিখেছি। —কিন্তু এমন তো হতে পারে যে, ২৬।২ লিখতে শুধু ২৬ নম্বর লিখে দিয়াছিস—হয়তো ভুল করে দুইটি বাদ পড়ে গেছে? এতটুকু যে অজয় তাহারও অমিয়র মুখের দিকে তাকাইয়া মনিটি বেদনায় মোচড় দিয়া উঠিল—হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া মিথ্যা কথাটি বাহির হইয়া গেল—তাই হয়তো হবে জ্যাঠামণি হয়তো আমার ভুল হয়েছে—নইলে এতদিন কি দাদা চিঠি না দিয়ে থাকতে পারেন। আবার লিখবো জ্যাঠামণি?

অমিয় বললেন—বেশ তাই লেখ অজয়, খুব ভাল করে একখানা চিঠি লেখ দিক? লেখ খবর করে একখানা চিঠি লেখ দেখতে চাচ্ছি—একবার যেন ছুটে আসে? অজয় কাগজ কলম লইয়া আসিলে পুনরায় কিছুক্ষণ স্তম্ভ হইয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন—আচ্ছা অজয়, চিঠি না লিখে তার চেয়ে চল না একবার আমরা কলকাতা থেকে ঘুরে আসি? আমার তো শরীর বেশ সেরে উঠেছে—আর ৫।৭টা দিন ধরেই আমি যেতে পারবো—তুই যাবি আমার সঙ্গে? অজয় এবার পরম উৎসাহিত হইয়া বলিল—সেই ভাল জ্যাঠামণি—সেই ভাল—তোমাতে আমাতে গিয়ে দাদাকে এবার ধরে আনবো। অমিয় অজয়ের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন—পারবি তো অজয়

—তোর দাদাকে ধরে আনতে পারবি না?

—খুব পারবো জ্যাঠামণি। দাদা ছুটিটা এখানে কাটিয়ে আবার কলকাতায় গিয়ে কলেজে ভর্তি হবেন।

অমিয় পুনরায় ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—কি যে আনন্দ হবে আমার তাহলে অজয়! তোরা দুটী ভাই যদি আমার চোখের সামনে থাকিস আমি হাসতে হাসতে মরতে পারি রে! দিন পনরো পরে অজয়কে সঙ্গে করিয়া অমিয় ২৬।২, ম্বারকানাথ লেনের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাহরের ঘরে বসিতেই বাড়ির ঝি আসিয়া তাঁহার ডাকিয়া উপরে লইয়া গেল। শশাঙ্কর দিদিমা কাছে বসিয়া কুশল প্রশ্ন করিলেন। কয়েক মিনিট পরে শশাঙ্ক আসিয়া প্রণাম করিয়া এক পাশে দাঁড়াইল। প্রায় দুই বৎসর পরে দেখা। শশাঙ্ক এই দুই বৎসরে আরও অনেকখানি বড় হইয়াছে—আরও সুন্দর হইয়াছে। অমিয় নির্ণিমেষ নয়নে পুত্রের দিকে চাহিয়া ছিলেন। হঠাৎ এক সময় শশাঙ্কর দিদিমা তাঁহার মৃত কন্যার নাম করিয়া একেবারে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাহার যে কপাল মন্দ—সামান্য দুঃখে যে সে এমনি করিয়া মরে নাই, ইহাই বিনাইয়া বিনাইয়া বলিয়া তিনি চোখের জলে ভাসিতে লাগিলেন। অমিয়র মন একেবারে দুঃখে ও সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গেল—তিনি অধোমুখে চুপ করিয়া বসিয়া সমস্ত অনুযোগ শুনিয়া যাইতে লাগিলেন। রাত্রি আহারান্তে শয়ন করিয়া অমিয় অজয়কে প্রশ্ন করিলেন—তোর দাদার সঙ্গে কথা হলো অজয়?

অজয় বলিল, কথা হয়েছে জ্যাঠামণি। কিন্তু দাদা যেতে পারবেন না আমাদের সঙ্গে।

—কেন রে?

তিনি যে কাল তাঁর মামার সঙ্গে দিল্লী যাচ্ছেন!

দিল্লী কেন?

—তার মামার কি কাজ আছে—দাদাকেও তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন সব পুরানো কীর্তি দেখাতে।

—কিন্তু তুই বলি না আমাদের সঙ্গে যাবার কথা?

—বলেছি তো।

—কি বললে সে?

—দাদার ইচ্ছা নেই জ্যাঠামণি—তিনি বলেন গ্রামে যে জল কাদা জঙ্গল ম্যালেরিয়া তার মধ্যে কি মানুষ থাকতে পারে?

—কালই তাহলে ওরা দিল্লী যাবে?

—তাই তো কথা।

অমিয় আর একটা কথাও না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন—বাতায় সারা বুক তাঁহার টন টন করিতে লাগিল। পরের দিন সকালবেলা অজয় খবর লইয়া আসিয়া বলিল—দাদা চলে গেছেন জ্যাঠামণি।

—কোথায় রে?

—দিল্লী। কাল যে বন্ধাম তাঁরা দিল্লী যাচ্ছেন?

—চলে গেছে?

অমিয় একেবারে স্তম্ভ হইয়া বসিয়া রহিলেন। সে চলিয়া গেল—অথচ একটি বারও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল না—যাইবার পূর্বে দেখাটি পর্যন্ত করিল না? অথচ সে তাহারই সন্তান? বেদনায় অপমানে সারা অন্তর অমিয়র রি রি করিয়া জ্বলিতে লাগিল। পরে সহসা মুখ তুলিয়া বলিলেন—চল অজয় আমরা বাড়ি ফিরে যাই। অজয়েরও এ বাড়ির আবহাওয়া কিছুমাত্র ভাল লাগিতেছিল না—সে তৎক্ষণাৎ রাজী হইল। কাপড়-জামা লইয়া অমিয় উঠিয়া দাঁড়াইতেই অজয় বলিল—একবার দিদিমার সঙ্গে দেখা করে যাবে না জ্যাঠামণি?

অমিয় বলিয়া উঠিলেন—না না অজয়, কারু সঙ্গেই আর আমি দেখা করতে চাইনে রে—এ বাড়িতে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, শিগগির চল বেরিয়ে পড়ি। দুইজনে যখন শিয়ালদহ স্টেশনে আসিয়া পৌঁছলেন—তখন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গোয়ালন্দগামী কোন গাড়ি নাই। স্টেশন হইতে অজয়কে কিছু খাবার কিনিয়া খাওয়াইয়া সারাটা দিন নিজে অকুণ্ঠ থাকিয়া চুপ করিয়া স্টেশনের ওয়েটিং রুমের বেঞ্চার উপর বসিয়া রহিলেন। অমিয় বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। দিন তাঁহার পুনরায় কাটিতে লাগিল। এখন হইতে বেশী করিয়া ধর্মগ্রন্থে মন দিতে লাগিলেন, বেশী করিয়া চরকা কাটিতে লাগিলেন। তবু মাঝে মাঝে মন তাঁহার হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিতে থাকে। নিজের পুত্র একবার তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাইল না। এতটুকু সম্মান তাঁহার দিল না—এ সংসারে তবে তাঁহার কিসের বন্ধন? কিসের মায়া? সেদিন সম্ভাবনা এক মনে এই সবই ভাবিতেছেন। অজয় ছিল তাঁহার পাশে বসিয়া—সহসা অজয়কে নিজের বুকের উপরে টানিয়া আনিয়া বলিলেন—অজয়! জ্যাঠামণি? অমিয়র কণ্ঠ যেন বেদনায় ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। অজয় বিস্মিত হইয়া জবাব দিল কেন জ্যাঠামণি? তুই তো তোর দাদার মত কখনও আমাকে ছেড়ে যাবেন অজয়? তা হলে কি নিয়ে বাঁচবো আমি? আমার মন যে দিনরাত হু হু করে কেঁদে ওঠে! বলিয়া তিনি বর বর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

অজয় তাঁহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া দুই হাত দিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—আমি চিরদিন তোমায় ভালবাসবো—চিরদিন তোমার কাছে কাছে থাকবো জ্যাঠামণি। অমিয় তাহার গায়ে মাথায় বারে বারে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন—তাই থাকিস্ জ্যাঠামণি, তাই থাকিস্। (ক্লেশ)

# পুষাকর ব্রজ

অমর সান্যাল

মা হার, গ্রামে জীবনের বাইশটা বৎসর কাটিয়ে দিল কুন্দলাল। আজ সে নিজেই ভুলে গেছে কবে সাঁওতাল পরগণার এই অজ্ঞাত পল্লীতে সে বাস করতে এসেছিল। আসার কারণও ঠিক তার মনে নেই। শহর ছাড়িয়ে পড়ে পুয়ার, নদী, তারপর ময়ূরাক্ষী। দুই নদীর সংগমস্থলে মাহার, ছোট গ্রামখানিকে অপত্যস্নেহে জড়িয়ে আছে। সংগমে কুন্দলালকে দেখা যায় রোজই, খোলা গায়ে স্নান করছে। টিলার উপর দাঁড়িয়ে থাকে মাওতালদের মেয়েরা, কুন্দলালকে দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

বর্ষার ঢল নামে পুয়ারের বৃক্ষে, দুহাতে স্রোত তেলে উজান চলে কুন্দলাল। বলিষ্ঠ হস্তের দুর্বীর আলোড়নে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তাঁটনীর প্রমত্ত বেগ। পুয়ারকে জয় করে কুন্দলাল পাড়ি দেয় ময়ূরাক্ষীর দিকে। পাহাড়ী মেয়েদের হাসির টুকরা গানের মত অন্তরীক্ষে ছড়িয়ে পড়ে।

পুয়ারের একেবারে গায়ে গায়ে কুন্দলালের আস্তানা। বাঙলো ধরণের একখানা বাড়ি, চারিধারে ঘন করে বাঁশঝাড়। সারা দিনরাতে একটিবার মাত্র বাইরে আসে কুন্দলাল,—স্নানের সময়। শুরুর হাটের দিন কুন্দলালকে দেখা যায় স্নান সেরে পায়চারী করছে জেলা বোর্ডের বাঁধান সড়কের উপর। সাঁওতাল মেয়েরা সেজে-গুজে চলেছে শহরের হাটে, নাথায় বড়ি-বোকাই আনাজ, হাতে তেলের শিশি। কুন্দলালের কোন কিছুরই খেয়াল থাকে না। উন্মনা হয়ে সে পথ চলে পুয়ারের ব্রজ পেরিয়ে, ক্যাথলিক ফাদারের বাঙলো ছাড়িয়ে। পথচলা শেষ হবে কোথায় সে নিজেই জানে না।

এক এক দিন ফাদারের ডাকে থমকে যায় কুন্দলাল।—কোথায় চলেছ কুন্দলাল? চমৎকার বাঙলা বলতে পারেন ফাদার স্টীন, বিদেশী টান একটুও নেই।

অগত্যা দাঁড়িয়ে যেতে হয় কুন্দলালকে। সামনের দিকে একবার তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সব কিছুর মিলিয়ে যাচ্ছে মরীচিকার মত।

ফাদার স্টীনের বাড়ি মাটো। পুরাপুরি ইয়োরোপীয় তাকে বলা চলে না, মূখেচোখে এশিয়ার কমুনীয়তা মাথান। মিশনের কাজে ভারতের মাটিতে কাটিয়ে দিলেন চল্লিশ বৎসর, কিন্তু নিমকের মর্যাদা রক্ষা করেছেন সময়ে।

মাহারতে এই লোকটির সঙ্গে কুন্দলাল আলাপ করেছে উপযাচক হয়ে।

ফাদার প্রায়ই বলে কুন্দলালকে—ফিরে যাও কুন্দলাল, বড় প্রলোভনের জায়গা এই মাহার। এর গায়ে গায়ে জড়িয়ে আছে কী একটা অস্বাভাবিক ক্ষুধা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করে একটা নেশার মতো।

বাইশ বছর ধরে কুন্দলাল শুনেন আসছে এই একই কথা আজও তার ব্যতিক্রম হল না।

ফাদারের বক্তৃতা একেবারে নিষ্ফল হয় না। হাটের দিন সাতসাতাই কী একটা উন্মত্ত আবেগে কুন্দলালের শিরা উপশিরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। পথের মায়া তাকে পেয়ে বসে নেশার মত। এর প্রতিটি ধূলিকণা, ছায়াখেরা তরঙ্গেরা তার সমস্ত সত্ত্বাকে বিহ্বল করে তোলে। দুই পথপ্রান্তে কাননীর গায়ে মিলিয়ে যায় একের পর এক চঞ্চলা রমণী মূর্তি, পথের বাকি ধুলো উড়িয়ে এগিয়ে আসে নৃতনার দল, অশান্ত কলরবে বাতাস হয় ভারাক্রান্ত। ফাদার স্টীনের বাঙলোর গেটে টেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কুন্দলাল।

—ফিরে যাও কুন্দলাল, বড় প্রলোভনের জায়গা। ফাদার স্টীনের মৃদু কণ্ঠে শ্বিতীয়বার সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়।

বাড়ি ফিরে কাজে মন বসে না কুন্দলালের, শেলফ বোকাই বই-এর দিকে তাকিয়ে থাকে বোকার মত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের লেখা পুস্তক জগতের জ্ঞানরাজ্যের ভান্ডার সংগ্রহ করেছে কুন্দলাল। সেদিন কিন্তু সে অনুভব করে নিজের দৈন্য। সুদীর্ঘ বৎসরের সঞ্চিত জ্ঞান এক লহমায় মূছে গেছে তার মন থেকে, পরিবর্তে সৃষ্টি করেছে বিরাট একটি গহ্বর। চারিদিক শূন্যতার ভারে থমথম করছে।

সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে পুয়ারের জলে বাঁপিয়ে পড়ে কুন্দলাল, দুর্ভাগ্য স্রোত দুহাতে তেলে উজান চলে সে। জয় করবার নেশা সমগ্রভাবে পেয়ে বসে তাকে, বনশেষের হিজল গাছ তাকে হাতছানি দেয়, সন্ধ্যাতারার রহস্যময় ইংগিত তাকে পথনির্দেশ করে।

রাত হয় গভীর। হাটভেঁদের পদধ্বনি মিলিয়ে যায় পুয়ারের ব্রজের উপর। ভাটির টানে শিথিল তনু ঢেলে দেয় কুন্দলাল। ফাদার স্টীনের সুগভীর বাণী তার কানে বাজে,—ফিরে চল এই প্রলোভনের স্থান থেকে।

রহস্যপূর্ণ কলেজে সবচেয়ে ভাল ছেলে ছিল

কুন্দলাল। হোস্টেলে দেড়শো ছেলের মধ্যে ভাল করে তার তিনবার গঙ্গাস্নান ও হরিনার কীর্তনে ব্যাঘাত ঘটেনি। পাশেই ছিল সিপাই-দের ব্যারাক, কুন্দলালের কাণ্ড দেখে তারা অচিরেই আকৃষ্ট হয়ে উঠল এই কিশোর ছাত্রের উপর। গঙ্গার ধারে বটতলায় পশ্চিমা সাধুদের আস্তানা; কুন্দলাল সতীর্থদের কাছে ঋণ গ্রহণ করে তাদের যতপক্ষ ডালরুটি ভোজন করাতে লাগল। ঋণের পরিমাণ দু'এর ঘর ছাড়িয়ে তিন অঙ্কে উঠলে কুন্দলালের একদিন রহস্যময় অন্তর্ধান হল। হোস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট পুলিশে খবর দিলেন; সিপাইরা বলল,—খোকাবাবু গেছে সাধুদের সঙ্গে হিমালয়ে তপস্যা করতে।

হিমালয় না হলেও কাছাকাছি ত বটেই। রহস্যপূর্ণ খবর এল কুন্দলাল হরিদ্বারে বাস করছে। সুপারিন্টেন্ডেন্ট দীনতারপবাবু, পাকা লোক, ঘরছাড়া প্রাণীকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা না করে স্বকর্মে মন দিলেন।

ইপ্সিত কামনা কিন্তু কুন্দলালের সিম্ব হল না। ধ্যানমগ্ন হিমালয় তাকে দিশাহারা করে দিল। চিরন্তন রহস্যের অফুরন্ত ভান্ডার এই দেবতাত্মা নগাধরাজ, এ রহস্যের সমাধান তার মত ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে ত সম্ভব নয়! সে নেমে এল কাশীতে। তার তখন সন্ন্যাসীর বেশ,—গৈরিক বসন, অঙ্গে বিভূতি। ধর্মশালায় ঠাই পেলে কুন্দলাল।

কাশীতে প্রথম রাত্রির কথা আজীবন মনে থাকবে কুন্দলালের। ধর্মশালা লোকে লোকারণ্য, বারান্দার এক কোণে কন্বল মূড়ি দিয়ে আছে কুন্দলাল। অনেক রাতে তার মনে হল কে একজন পাশে শুয়ে আছে। চমকিত হয়ে উঠে বলল সে: টা' জেদে আরও চমকিত হল,—শুয়ে এক সন্ন্যাসিনী। অঙ্গে অঙ্গে পাক দিয়ে জড়ান গেরুয়া কাপড়, মাথার জটা দীর্ঘ বেণীর মত লুটিয়ে পড়েছে পিঠের উপর, চোখেমুখে তপস্চরণের কঠোর ছাপ।

চোখে আলো পড়তে সন্ন্যাসিনীও জেগে উঠল লজ্জিত মৃদু হাসি তার মুখে। বলল,—বড় ভয় করছিল এই বড়বাদলের রাতে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্বন্ধে এতক্ষণে সচেতন হল কুন্দলাল। ভয় করবার মত রাতই বটে। প্রচণ্ড শীতের মধ্যে শুরুর হয়েছে বড়বৃষ্টির তাণ্ডব নৃত্য, তার কন্বলের একটা দিক জলে ভিজে গেছে। কুন্দলালের কেমন মায়ী হল তবুও সে রাগের ভাগ দেখিয়ে বলল,—ত আমার কাছে এলে কেন, আরও সন্ন্যাসী—বাধা দিয়ে সন্ন্যাসিনী বলল,—ভয়ের সময় কি লোকবিচারের ক্ষমতা থাকে!

বিদ্রূপের সুদে কুন্দলাল বলল,—অত ড় যার তার এ পথে না আসাই ভাল।

সম্মাসিনী হঠাৎ চুপ করে গেল। কুন্দ-  
লালও নিব্বাক। খানিক পরে সে বলল—ভয়  
করে ত শূন্যে পড় এখানেই, আমি ওখানে  
পায়চারী করি একটু; কতটুকুই বা রাত  
আছে!

স্বিরস্তি না করে সম্মাসিনী শয্যা গ্রহণ  
করল, আর কুন্দলাল শূন্য করে দিল বারান্দায়  
পাদচালনা। কিন্তু এ কী! আপনার অজ্ঞাত-  
সারে কখন সে এসে দাঁড়িয়েছে সম্মাসিনীর  
শয্যাপ্রান্তে, অভিনব একটা অবসাদে জড়িয়ে  
আসছে তার দেহমন। সে শূন্যে পড়ল  
সম্মাসিনীর পাশে। শীতের হাওয়া হয়ে উঠেছে  
পরম রমণীয়, কম্বলটা পড়ে রইল অবহেলায়  
পায়ের কাছে।

শীতের দীর্ঘ রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এল।  
সম্মাসিনীর চাপা কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—  
প্রতিজ্ঞা মনে রেখো কুন্দলাল, ভোর হওয়ার  
আগেই মরতে হবে দুজনকে, বিষ আছে আমার  
ঝুলিতে।

শ্রান্তস্বরে কুন্দলাল বলল,—পাপ করলেই  
প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ভোর হয়ে এল, বিষ  
নিয়ে এস।

—তোমাকে আমার ভয় করছে কুন্দলাল।  
তোমার গলার স্বর বসছে, বিষ তুমি হয়ত খেতে  
পারবে না। কিন্তু আমাকে খেতেই হবে। এই  
মোড়ক রাখলাম, পার ত খেও। ভোরের আলো  
দেখা দিয়েছে, নিজের জায়গায় আমি ফিরে  
চললাম।

সম্মাসিনী চল গেল বারান্দার আর এক  
দিকে; বিষের মোড়কটি কুন্দলাল চেপে ধরল  
হাতের মতোয়। মনে মনে হাসতে লাগল সে,—  
চালাক মেয়ে বটে এই সম্মাসিনী; আমাকে ত  
খুব একচোট ভীতু বলে সরে পড়ল। কিন্তু  
নিজে খেতে পারবে কি? উহু, অত সাহস  
নেই।

মোড়কটি সাবধানে লুকিয়ে কুন্দলাল ঘুমিয়ে  
পড়ল।

স্বপ্ন দেখছিল সে, সম্মাসিনী ফিরে  
এসেছে; কি একটা গোলমালে জেগে উঠল।  
সবে ভোর হয়েছে, কিন্তু এরি মধ্যে বারান্দায়  
লোক গিসগিস করছে। কৌতূহল ও আতঙ্ক  
যেন এই জনসমূহকে চঞ্চল করে তুলেছে।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলল কুন্দলাল।  
বারান্দার ঠিক মাঝখানে সম্মাসিনীর মৃতদেহ  
শায়িত। সুবর্ণ উঠতে তখনও অনেকটা দেবী,  
রজনীর শেষ অধকারটুকু জড়িয়ে আছে শব-  
দেহের মুখে। সারা চোখের দৃষ্টি দিয়ে  
সম্মাসিনীকে যেন গ্রাস করছিল কুন্দলাল।

বয়স বোধ করি চল্লিশের কাছাকাছি,  
চোখেমুখে পরিস্ফুট রয়েছে মৃত্যুশঙ্কার সকল  
নিদর্শন। এক দুর্বল মহুভের শোচনীয়  
পরিণতি!

সেইদিনই কাশী ছেড়ে চলে গেল কুন্দলাল।

শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন নিয়ে  
প্রায় পঁচ বৎসর পরে ব্রহ্মপুত্রে সে ফিরে এল।

নদীর ঘাটে এক অলৌকিক সাধুর  
আবির্ভাবে ব্রহ্মপুত্র চঞ্চল হয়ে উঠল। ত্রিকাল-  
দর্শী সাধু, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নখদর্পণে।  
শহরের বড় উকীল রামজীবনবাবুর সংসারের  
খট্টিনাটি খবর পর্যন্ত সাধু এক নিমেষে বলে  
দিয়েছে। রিটার্ড ডেপুটি সত্যশরণবাবুকে  
সুস্থশরীরে পেনসন ভোগ করবার উপায়  
বাতলে দিয়েছে এই সাধু। শিবচরণবাবুর  
স্ত্রীর তিন বৎসরের পুরাতন রোগ নিবারণ  
হয়েছে সাধুর কৃপায়। শহরে ধনা ধনা পড়ে  
গেল।

গঙ্গার ধারে বাঁধান বটতলায় সাধুর  
আশ্রম। কুটীর রচনার যাবতীয় খরচ বহন  
করলেন রামজীবন, সত্যশরণ ও শিবচরণ।  
বৈকালবেলা পদধ্বনিতে চঞ্চল হয়ে ওঠে সাধুর  
প্রাঙ্গণ। রামজীবনের প্রোচা গৃহিণী আসেন  
নাতি নাতনী নিয়ে, সত্যশরণ আসেন তৃতীয়  
পক্ষের স্ত্রীর সংগে। শিবচরণ ভরসা দিয়েছেন,  
তার স্ত্রী একটু হাঁটতে পারলেই সাধুবাবার  
কাছে আসবেন কৃতজ্ঞতা জানাতে।

জনসমাগম সকালবেলাতেও কম হয় না।  
পুলিশ ব্যারাকের মুক্তকণ্ঠ সিপাইরা গঙ্গাজলে  
প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে লোটোহস্তে বটতলায়  
ভিড় করে। সাধুবাবা যোগাসনে সমাসীন।  
হাত পা অন্তত ভগ্নীতে চারিদিকে প্রসারিত।  
পুরাতন সিপাই হনুমান সিং ভক্ত লোক,  
ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখে। সে  
চুপি চুপি বন্ধ রামবকসকে বলল,—গগন-  
বিহারী মুদ্রা!

রাত একটু গভীর হলে জনশূন্য হয়  
সাধুর আশ্রম। শিবচরণবাবু বললেন,—এই  
সময়টা সাধুজী তান্ত্রিক সাধনায় বাস্ত থাকেন।  
শ্মশানচারী প্রেতাত্মারা ভিড় করে আশ্রমের  
প্রাঙ্গণে, তাদের সংগে মর্যমাংস আহার করে  
রাত্রি যাপন করেন সাধুবাবা। ব্যারাকের সিপাইরা  
বলল,—রাত বারটা আন্দাজ নদীর ঘাট থেকে  
উঠে আসে নরককালের সারি, তাদের হাড়ের  
খটাখট শব্দে রক্ত জল হয়ে যায়!

ব্রহ্মপুত্রের চাঞ্চল্য শতগুণে বর্ধিত হল।  
পথে ঘাটে, ক্লাবে, চায়ের দোকানে—সর্বত্র এক  
আলোচনা। খবর ছড়িয়ে পড়ল নানাবিধ।  
সত্যশরণবাবুর হাত দেখে সম্মাসিনী নাকি  
বলেছেন, তাঁর তৃতীয় পক্ষের বড় ছেলের (যার  
বয়স বর্তমানে চার) হাকিমী অবধারিত।  
রামজীবনবাবুর গৃহিণীকে কি একটা শিকড়  
দিয়েছেন সম্মাসিনী, দুঃখযোগে সেবন করে তাঁর  
খ্যাতিপ্রতিপত্তি আরও বেড়ে গেছে শহরের  
নারীমহলে। শিবচরণের ছেলের ভাল চাকুরী  
হয়েছে বাবাজীর কৃপাদৃষ্টিতে। বাঁধান একখানি

খাতা নিয়ে শিবচরণবাবুকে প্রায়ই দেখা যায়  
গুটিগুটি চলেছেন পথ দিয়ে। চাঁদার খাতা  
এখান, সাধুবাবার একটি ভদ্রগোছের আস্তানা  
গড়ে তুলতে হবে ব্রহ্মপুত্র শহরে।

এমনি করে কেটে গেল পূর্ণ একটি বৎসর।  
সাধুর আশ্রমে সৌন্দর্য উৎসবের সাড়া পড়ে  
গেল। দলে দলে ভক্তেরা আসছে বাবাজীকে  
অভিনন্দন জানাতে। বাবাজী মুদিত নেত্রে  
সমাসীন। সন্তীক রামজীবন, সত্যশরণ ও শিব-  
চরণ অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়িত করছেন।  
সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রি হয়ে গেছে কখন,  
জনশ্রোতে ভাটা পড়ে এসেছে। বাড়ির মেয়েরা  
বিদায় নিল, বাকী রইলেন বাবাজীর এই প্রধান  
তিন ভক্ত।

বারটা বাজে। সাধুজী বসে আছেন তেমন  
হাত পা ছড়িয়ে। আশ্রমের আলো নিভে গেছে,  
বাবাজীর ধুনী থেকে একটা লাল আলো চারি-  
দিকে সৃষ্টি করেছে অপার্থিব আবহাওয়া।

সত্যশরণবাবু গা টিপলেন রামজীবনের,  
রামজীবন টিপলেন শিবচরণের, শিবচরণ  
সজোরে চেপে ধরলেন রামজীবনের হাত।

রামজীবন বললেন,—সরে পড়া যাক হে!  
বারটা বাজল, তাঁদের আগমন হবে এখন!

সত্যশরণ ফিস ফিস করে বললেন—হ্যাঁ,  
জ্যামত অবস্থায় প্রেতত্বপ্রাপ্তির সাধ না থাকলে  
সরে পড়াই ভাল!

শিবচরণ বললেন,—নদীর ঘাটে কাদের  
কথাবতী শুনতে পাচ্ছি।

স্বিরস্তি না করে তিনজনই আশ্রমের মায়া  
কাটিয়ে বাড়ির পথ ধরলেন।

পরদিন সকালে শহর সরগরম হয়ে উঠল  
আকস্মিক এক খবরে। রিটার্ড ডেপুটি  
সত্যশরণবাবুর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী অন্তর্ধান  
করেছেন, সেই সংগে সাধুবাবাও। সত্যশরণ-  
বাবু নাকি অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে দেখেন,  
শয়নমন্দির শূন্য, চার বছরের ভাবী হাকিম  
শুধু বাপের পাশবাঁশলটা আঁকড়ে পড়ে  
আছে। সেই রাতেই তিনি ছুটলেন রামজীবনের  
বাড়ি, সেখান থেকে থানা, থানা থেকে পুলিশ  
সায়েরের কুঠী। সামান্য ও সহানুভূতি পেয়ে  
বাড়ি ফিরলেন শেষরাতে, বাকী রাতটুকু চেয়ারে  
বসে কাটিয়ে দিলেন।

পুলিশ চেফার হুটি করল না। সত্যশরণের  
স্ত্রীকে পাওয়া গেল, তবে জীবন্ত অবস্থায়  
নয়। নদীর ধারে বড় একটা খোপের মধ্যে  
পড়েছিল তাঁর মৃতদেহ। অলংকারশূন্য দেহ,  
মৃত্যুশঙ্কায় বিকৃত মুখশ্রী—দেখে চমকে  
উলেন সত্যশরণ। পোষ্ট মর্টেমে প্রকাশ পেল,  
দৈহিক উপভোগের পর কে বা কারা তাঁকে  
নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। সাধুর নামে হুঁলিয়া  
বের করে পুলিশ কর্তব্য শেষ করল।

[illegible]

# অল ইণ্ডিয়া রেডিও

শ্রীমদকুমার সেন

প্রায় দশ বৎসর পূর্বে যখন একটি রিটার মাস্তুল-সদৃশ পদার্থ দিল্লীর উত্তর প্রান্তদেশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, তখন গ্রাম-বাসীর গতানুগতিক জীবনে একটি বিপ্লব চাঞ্চল্য দেখা দিল এবং রং বেরং-এর গুঞ্জে গ্রাম ভরিয়া গেল। কেহ বলিল, “এরূপ সুউচ্চ কলকারখানার মাস্তুলটি বৃষ্টি দেবতা ইন্দের ক্রোধ সঞ্চার করিবে এবং অচিরেই একটা বিপর্যয় অনিবার্য।” হাতে হাতে ইহার প্রমাণও জন্মিয়া গেল—সে বৎসর বৃষ্টি দেবতা অতি সামান্য বর্ষণান্তর বিদায় গ্রহণ করিলেন।

‘অল ইণ্ডিয়া রেডিও’র দিল্লী গ্রামাঞ্চলের পরিকল্পনা কিন্তু শান্তভাবেই অগ্রসর হইতে লাগিল। গ্রাম গ্রামে ‘রেডিও সেট’ একটা নতুন ঋনদুষ্টি এবং জনসাধারণের মধ্যে ঔৎসুক্য ও আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। গ্রাম-বাসীও দল বাঁধিয়া তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম শুনিতে লাগিল বটে, কিন্তু ঐ অভিনব পদার্থটির উপপত্তি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাহাদের সংশয় কাটিল না। কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন দলকে রেডিও স্টেশনে আমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন এবং গ্রামা শ্রোতা-বর্গের কাছে তাহারা রেডিও সংযোগে বক্তৃতা করিয়া অথবা গান গাহিয়া শুনাইল। অগত্যা গ্রামের জনসাধারণ বিশ্বাস না করিয়া পারিল না যে, যন্ত্রনিঃসৃত সংগীত ও বক্তৃতা মনুষ্য কণ্ঠস্বরই, কোন দেবতা-দানবের নহে!

অতীতের এই দশটি বৎসরের কথা স্মরণ করিলে ‘অল ইণ্ডিয়া রেডিও’র বর্তমান সংগীত ও জনপ্রিয়তা সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আজ যে গ্রামে ‘রেডিও সেট’ স্থাপিত আছে, রেডিও বিহীন অন্যান্য গ্রামগুলি তাহার প্রতি ঈর্ষান্বিত দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করে! পরিকল্পনা ও সামর্থ্য অনুযায়ী ‘রেডিও’ বিতরণ শেষ হইয়া গেলেও চাহিদা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। গ্রাম গ্রামান্তর হইতে ‘রেডিও সেট’-এর দাবী কর্তৃপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে।

গ্রামা প্রোগ্রাম বর্তমানে সবিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে এবং এই প্রোগ্রামের সময় ও বৈচিত্র্য বাড়াইবার জন্য অনুরোধ উপরোধেরও অন্ত নাই। সাধা ভোক্তার ন্যায় রেডিওর সাধ্য প্রোগ্রামের মান গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। একটির সহিত অপরটির যোগাযোগও বিস্ময়জনকরূপে ঘনিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দিনান্তে কর্মকালত ক্লবক যখন আহার করিতে বসে তখন রেডিও কতৃপক্ষের প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতাসূচক উজ্জ্বল ধ্বনিত হয়—সে বলে, “রেডিওতে আপনারা যখন মহিলা-

দের প্রোগ্রাম নির্দিষ্ট করেন নাই তখন তাহারা তাহাদের খেয়াল-খুশীমত রান্না করিত। আজ গরজ বড় বালাই, যথাসময়েরও পূর্বে তাহারা রান্না সারিয়া রেডিওতে তাহাদের প্রোগ্রাম শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়ে!”

১৯৩৮ সালে সর্বপ্রথম ভারত গভর্নমেন্ট দিল্লী পল্লী-বেতার পরিকল্পনায় (Delhi Rural Broadcasting Scheme) মনোযোগী হন। ইহার পূর্বেও পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের অনুরোধে ১৯৩৬ সালের জুন মাস হইতে ১৯৩৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত একটি কর্মপ্রণালী অনুসৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু আশানুরূপ সাফল্যলাভ করে নাই। উক্ত প্রণালী অনুসারে পাঞ্জাবে তেরটি এবং দিল্লীতে চারটি রেডিও সেট স্থাপিত হয় এবং তৎজন্ম ভারত গভর্নমেন্ট একলক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন। পরিকল্পনাটি প্রারম্ভে একরূপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইলেও দিল্লী প্রদেশের বেতারের বর্তমান উন্নত ও সম্প্রসারিত অবস্থার মূলে উৎস তাহাই। দিল্লী প্রদেশে বর্তমানে ১২৫টি রেডিও সেট কার্যকরী রহিয়াছে এবং আরও কুড়িটি মজুত অবস্থায় রহিয়াছে।

সংগীত, সংবাদ, নাটক, গল্প, কথোপকথন, আবহাওয়ার নির্দেশ প্রভৃতি প্রোগ্রাম সমূহকে সবিশেষ আকর্ষণযোগ্য ও বৈচিত্র্যময় করিয়া তোলে। এই সকল প্রোগ্রামে গ্রামবাসীরা অংশ গ্রহণ করে এবং গ্রামের মণ্ডলাঞ্চল চিন্তা করিয়া প্রয়োজনানুসারে প্রোগ্রামের বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়। প্রতি পনের দিন অন্তর মহিলাদের জন্য একটি এবং শিশুদের জন্য একটি বিশেষ প্রোগ্রাম নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার প্রত্যেকটিতে গ্রামের মহিলারা এবং শিশুরা যোগদান করে।

গ্রামের জনসাধারণের আন্তরিক আগ্রহ ও সহযোগিতা দ্বারা যখন পল্লী পরিকল্পনা সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিল, তখন দেখা গেল, মহিলারাও ইহাতে অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং রেডিও সেট হইতে ‘নিরাপদ দূরত্বে’ দাঁড়াইয়া ঔৎসুক্য ও আগ্রহের সহিত প্রোগ্রাম শুনিতেন। ইহাকে একটি বিশেষ শুল্ক-লক্ষণ বলিয়া বিবেচনা করা হইল এবং অর্গাণে পরীক্ষামূলকরূপে পশ্চিমাট ‘লাউড-স্পীকার’ স্থাপন করা হইল।

গ্রামা শ্রোতাদের সুবিধার নিমিত্ত ‘অল ইণ্ডিয়া রেডিও’র গবেষণা বিভাগ একটি বিশেষ ধরনের ‘সেট’ নির্মাণ করিয়াছেন। গ্রামের সাধারণ সভাস্থলে বৃক্ষ বা অনুরূপ কোন কিছু সহিত ‘সেট’টিকে আঁটিয়া রাখা

হয়। তালাবন্ধ একটি ধাতুনির্মিত বাজে ‘সেট’টি আবদ্ধ থাকে, তন্দরূপে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও অল্প লোকের হস্তক্ষেপের ফলে বানচাল হইবার আশঙ্কা থাকে না। স্থানীয় রেডিও স্টেশনের সহিত ইহা সংযুক্ত থাকে এবং যথাসময়ে একটি স্বয়ং চালিত ‘টাইম সুইচ’ (automatic time switch)-এর সাহায্যে প্রোগ্রামের উদ্ভাবন হয়। প্রতিদিন শ্রোতার সংখ্যা ৫০ জন হইতে ১০০ জন এবং বিশেষ প্রোগ্রামের দিনে ১৫০ জন হইতে ৩০০ জন পর্যন্ত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রায় দুই লক্ষ গ্রামবাসীর মধ্যে ত্রিশ সহস্রজনকে দিল্লীর পল্লী বেতার পরিকল্পনা আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহা শুধু শিক্ষা সম্প্রসারণেরই নহে, সমগ্র প্রদেশের গ্রামা জনসাধারণের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনেরও একটি অত্যন্ত সম্ভাবনার সৃষ্টি করিয়াছে।

পল্লী-বেতার পরিকল্পনার প্রথম উদ্যোক্তারূপে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে অভি-নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে। ১৯৩৫ সালে ‘পেশোয়ার পরিকল্পনা’ কার্যকরী করা হয় এবং পল্লী অঞ্চলের উপযোগী ‘রেডিও সেট’ সংগৃহীত হয়। এই সকল ‘সেট’ ধলাবালি, উদ্ভাপ ও কীটপতঙ্গাদির আক্রমণ হইতে আশ্রয়দায়ক ব্যবস্থাসম্পন্ন ছিল। ক্লবক শ্রোতা-বর্গের ঔৎসুক্যও সময় সময় এরূপ প্রবল ও বেপরোয়া হইয়া দাঁড়াইত যে, তাহা হইতে আশ্রয়লাভ না! যন্ত্রের দেহ হইতে সংগীত নিঃসৃত হইতেছে, বস্তা বক্তৃতা করিতেছেন, অল্প গ্রামবাসীর ইহা ভাবিয়া বিস্ময়ের অবধি ছিল না!

পেশোয়ার পরিকল্পনাটি প্রধানত পরীক্ষামূলকভাবেই গৃহীত হওয়াতে স্বভাবতই ইহাতে ত্রুটিবৃত্তি অল্প ছিল না। পরিকল্পনাটি কার্যে প্রযুক্ত হইলে বহু প্রকার বাধা বিপত্তি দেখা দিল। অর্থ সমস্যা ও উপযুক্ত কর্মীর অভাবও অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকরূপে উপস্থিত হইল। বিদ্যুৎ শক্তির অভাবে ব্যাটারীর ব্যবহার অত্যন্ত অসুবিধাজনক এবং ব্যয়বহুল বলিয়া বোধ হইল। প্রোগ্রামগুলি প্রথম ভাগ কৃষি সম্বন্ধীয় পুস্তিকা ও বিবরণী প্রভৃতির সারাংশ বর্ণনা দ্বারা শেষ হইত এবং সরলবুদ্ধি নিরক্ষর গ্রামবাসী শ্রোতার মস্তিষ্কে তাহার প্রায় কিছুই প্রবেশ করিত না! তথাপি এই সমস্ত ত্রুটিবৃত্তি ও অন্তরায় সত্ত্বেও এই পরীক্ষামূলক পরিকল্পনাটি হইতেও মূল্যবান অভিজ্ঞতা লাভ হইল।

সময় ও ঘটনার দ্রুত পরিবর্তনে আজ রেডিওর সমস্যাও বহুলাংশে দূরীভূত হইয়াছে। মালাকন্দ হাইড্রো-ইলেকট্রিক ব্যবস্থার ফলে বিদ্যুৎ শক্তির সমস্যা আজ আর নাই।

যুদ্ধের অনুকূল অবস্থায় রেডিওর ক্ষেত্র ও জনপ্রিয়তা বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সীমান্ত প্রদেশ ও উপজাতীয় অঞ্চলের লোকের কাছে আজ বেতারের চাহিদা যথেষ্ট। বর্তমানে রেডিও সেট-এর সংখ্যা শতাধিক এবং প্রতি-দিন পেশোয়ার হইতে পুস্তু ভাষায় গ্রাম্য প্রোগ্রাম পরিচালিত হইয়া থাকে।

পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী এবং বাঙলায়ও পল্লী-বেতার পরিকল্পনা কার্যকরী রহিয়াছে।

১৯৩৬ সালে- বাঙলায়, মেদিনীপুরের সন্নিকটে কয়েকটি পল্লী অঞ্চলে ছয় মাসের জন্য পনেরটি 'সেট' স্থাপন করিবার পরিকল্পনা বাঙলা গভর্নমেন্ট গ্রহণ করেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করেন। মেদিনীপুরের চতুঃপার্শ্বে আশী মাইলের মধ্যে এই 'সেট'-সমূহ স্থাপিত হয় এবং কলিকাতা বেতার কেন্দ্র হইতে গ্রাম্য প্রোগ্রাম-গুলি (Rural Programmes) পরিবেশিত হইতে থাকে। এই পরিকল্পনা সাফল্য লাভ করায় পরীক্ষার কার্যকাল বর্ধিত করা হয় এবং 'সেট'-সমূহ মেদিনীপুরের আরও সন্নিকটে আনিয়া স্থাপন করা হয়। ১৯৩৮-৩৯ সালে পুনরায় স্থান পরিবর্তন করা হয় এবং ১৯৩৯ সালের মে মাসে প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট এই ব্যবস্থা রহিত করিয়া দেন। ব্যাটারী এবং 'সেট'-সমূহকে অল ইন্ডিয়া রেডিও গ্রহণ করেন, এবং শ্রমিকদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে কলিকাতার নিকটবর্তী চটকলসমূহে 'সেট'-গুলি স্থাপিত করেন। বর্তমানে প্রতি বৃষ্ণ-বার এবং বৃহস্পতিবার বাঙলায় এবং শনিবার ও রবিবার হিন্দুস্থানীতে কুড়ি মিনিটকাল কলিকাতা কেন্দ্র হইতে প্রোগ্রামগুলি পরিবেশিত হইয়া থাকে।

বোম্বাইতে ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট 'সেট' স্থাপন করেন এবং অল ইন্ডিয়া রেডিওর বোম্বাই কেন্দ্র হইতে মারাঠী ভাষায় গ্রাম্য প্রোগ্রাম চলিতে থাকে। ১৯৩৯ সালের ১লা মে এই ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হয়। ১৯৪৪ সালের ১৭ই এপ্রিল আর একটি উদ্যোগপূর্ণ পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়। গভর্নমেন্ট এ পর্যন্ত আট শতাধিক 'সেট' সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সেগুলি প্রদেশের প্রধান প্রধান গ্রামসমূহে স্থাপিত হইতেছে। ক্রমে ক্রমে সমগ্র প্রদেশে ব্যাপকভাবে এই ব্যবস্থা কার্যকরী করা উক্ত পরিকল্পনানুগত করা হইয়াছে। বোম্বাই কেন্দ্র হইতে বর্তমানে নিয়মিতরূপে প্রতিদিন চতুর্দশ মিনিটকাল গ্রাম্য প্রোগ্রাম পরিচালিত হইয়া থাকে।

মাদ্রাজ ১৯৩৮ সালের ১লা নভেম্বর সর্বপ্রথম গ্রাম্য প্রোগ্রামের প্রবর্তন করা হয় এবং সন্তোহে তিনদিন তামিল ও তেলুগু ভাষায় তাহা পরিবেশিত হইতে থাকে। ১৯৩৯ সালের মে মাসে ট্রিচিনপল্লী কেন্দ্র

প্রতিষ্ঠিত হইলে পর তামিল প্রোগ্রামসমূহ তথায় স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে ট্রিচিনপল্লী হইতে প্রত্যহ তামিল প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় এবং সন্তোহে ছয় দিন তেলুগু প্রোগ্রাম মাদ্রাজ হইতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রোগ্রামসমূহের নিয়মিত ও যথাযথ পরিবেশন ও পরিচালনা 'সেট'-সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি কার্যাদি মাদ্রাজ গভর্নমেন্টের প্রাদেশিক ব্রডকাস্টিং বিভাগের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা হইয়াছে। ১৯৪৪ সালে প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট কর্তৃক স্থাপিত গ্রাম্য 'সেট'-এর সংখ্যা ছিল চার শত আটষাট। প্রাদেশিক ব্রডকাস্টিং বিভাগ জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপালিটির পক্ষ হইতেও রেডিও সেট স্থাপনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন।

পাঞ্জাবে, লাহোর বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং প্রয়োজনানুরূপ অর্থ ব্যয় করেন। দিল্লী কেন্দ্র হইতে প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। লাহোর কেন্দ্র কার্যকরী করার পর পাঞ্জাবের 'সেট'-সমূহ সরাইয়া আনিয়া লাহোরের সন্নিকটে স্থাপন করা হয়। বর্তমানে প্রত্যহ লাহোর হইতে গ্রাম্য অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। জেলা বোর্ড কর্তৃক স্থাপিত পল্লী অঞ্চলের 'সেট'-এর সংখ্যা ১০০ শত।

যুক্তপ্রদেশে ১৯৩৯ সালের ১লা জুলাই পল্লী অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে প্রত্যহ ত্রিশ মিনিটকাল এই অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট কর্তৃক স্থাপিত 'সেট'-এর সংখ্যা প্রায় ১০০টি। লক্ষ্মৌ হইতে বহির্গত প্রধান প্রধান রাস্তা-গুলির সহজ দূরত্বে, লক্ষ্মৌ-এর একশত মাইলের মধ্যে এই 'সেট'-গুলি স্থাপিত।

'অল ইন্ডিয়া রেডিওর' পল্লী অনুষ্ঠান (Rural Programmes) প্রসঙ্গে ভারত গভর্নমেন্টের যুদ্ধোত্তর বেতার উন্নয়ন পরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে। বিগত ১৫ই মার্চ তারিখে নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বেতার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য সর্দার বল্লভভাই উক্ত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ করেন।

বর্তমানে সমগ্র ভারতে ৯টি রেডিও স্টেশন কার্য করিতেছে। আলোচ্য পরিকল্পনানুসারে রেডিও স্টেশনের সংখ্যা বৃদ্ধি ও উন্নত ধরনের অধিকতর শক্তিশালী যন্ত্র স্থাপনের দ্বারা বেতারের সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধতির ব্যবস্থা করা হইবে। এলাহাবাদে একটি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন 'মিডিয়াম' স্টেশন প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতা এই চারটি স্টেশনের শক্তি বৃদ্ধি করা হইবে। আটটি নতুন স্টেশন স্থাপন করা

হইবে এবং চালু স্টেশনগুলির স্টুডিওর ব্যবস্থা উন্নততর করা হইবে। প্রচারের সুবিধার নিমিত্ত ভাষা, সংগীত ও সমগ্রভাবে সংস্কৃতি-গত একের উপর ভিত্তি করিয়া অল ইন্ডিয়া রেডিওকে পাঁচটি অঞ্চলে (zones) বিভক্ত করা হইয়াছে। ভিন্ন ভাষাভাষী জনসাধারণের চাহিদা এবং সংগীত ইত্যাদির শ্রেণী বহুলতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই এই আঞ্চলিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে। দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা ও এলাহাবাদ এই পাঁচটি অঞ্চলের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। দিল্লী কেন্দ্রের অধীনে উত্তর-পশ্চিম ভারত, কলিকাতা কেন্দ্রের অধীনে পূর্ব ভারত, এলাহাবাদ কেন্দ্রের অধীনে বোম্বাই প্রদেশ, সিম্ধু নিজাম রাজ্যসমূহ এবং মধ্য প্রদেশের মহারাষ্ট্র অঞ্চল এবং মাদ্রাজ কেন্দ্রের অধীনে মাদ্রাজ প্রদেশ ও মহাশূর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ভাষা ও সংগীতের প্রকার ভেদ অনুসারে এইরূপ সীমা নির্ধারিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বেলগাঁওয়ের উচ্চাঙ্গের সংগীত ও বোম্বাই-এর উচ্চাঙ্গ সংগীত (Classical music)-এর মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই প্রকার দক্ষিণ অঞ্চলের মহাশূরের সহিত মাদ্রাজের, বোম্বাইয়ের সহিত হায়দরাবাদের এবং মাদ্রাজের সহিত বেজওয়াড়ার সাদৃশ্য উল্লেখ করা যাইতে পারে।

নতুন আটটি স্টেশন স্থাপনের পর প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া প্রচারকেন্দ্র (ব্রডকাস্টিং স্টেশন) প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভারত গুরুত্ব অনুসারে পূর্ববঙ্গ, গুজরাট, অন্ধ্র-দেশ, কানারাটিক, কেরালা, তামিলনাদ প্রভৃতি অঞ্চলেও স্টেশন কার্যকরী করা হইবে বলিয়া পরিকল্পনায় উল্লিখিত হইয়াছে। ভারত গভর্নমেন্টের এই পরিকল্পনা মূলত অষ্ট-বার্ষিকী হইলেও বর্তমানে ইহাকে পঞ্চ-বার্ষিকীরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

ভারতে বিপুল জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় ব্যবহৃত রেডিওর সংখ্যা ও বেতারের গঠনমূলক কার্যক্ষেত্র যে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ একথা অবশ্য স্বীকার্য। যুদ্ধকালে বেতারের কিঞ্চিৎ সম্প্রসারণ ঘটিয়া থাকিলেও প্রয়োজনের তুলনায় আজ পর্যন্ত অল ইন্ডিয়া রেডিও একটি সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই। স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হইবার প্রাক্কালে গণজাগরণ, গণচেতনা ও শিক্ষা এবং জাতীয়তার ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে কৃষি ও শিল্পসম্বন্ধীয় তথ্যাদির প্রচার দ্বারা জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তোলার দায়িত্ব-পূর্ণ কর্তব্য বেতার বিভাগের অঙ্গ নহে। অথচ এতাবধিকাল অল ইন্ডিয়া রেডিও যে প্রকার গতানুগতিক ও অবৈজ্ঞানিক ধারায় চলিয়া আসিতেছে তাহাতে জনসাধারণ বিশেষ

উপকৃত হইতে পারে নাই। প্রধানত আরাম কেন্দ্রার মৃদুশ্রমেয় ব্যক্তিগণের সৌখীন সজ্জা-দ্বারা পাইয়া উহা স্থান পাইয়াছে। সর্দার প্যাটেল পক্ষী অণ্ডে বেতারের প্রসার তথা সর্বতোভাবে অল ইন্ডিয়া রেডিওকে একটি আদর্শ জনশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানরূপ গড়িয়া তোলার উপর উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। ভারতের কোটি কোটি জনসাধারণের মধ্যে বেতারের প্রসার লাভ হইলে এবং সুলভ ও সম্ভা দরে রেডিও সরবরাহ করা সম্ভব হইলে বেতারের শক্তি ও মূল্য সম্প্রদায় হইবে। বর্তমানে ভারতে মোট রেডিও লাইসেন্স হোল্ডারদের সংখ্যা মাত্র দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার। রেডিও সেট নির্মাণ করিয়া তোলা বেতার উন্নয়ন পরি-

কল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যরূপে গৃহীত হওয়া উচিত।

সুলভ রেডিও সেট সরবরাহ করিতে হইলে ভারতের নিজস্ব রেডিও নির্মাণ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যিক। বর্তমানে রেডিওর জন্য আমরা সম্পূর্ণরূপেই আমদানীর উপর নির্ভরশীল। সরবরাহ প্রচুর হইলেও আমদানীকৃত বিদেশী রেডিও সেটের মূল্য ভারতের জনসাধারণের ক্রয়শক্তির বহু উর্ধ্বে। তথাপি যুদ্ধোত্তরকালের বর্ধিত চাহিদার সুযোগ ইহার উত্তমরূপেই গ্রহণ করিয়াছে। এবং ফাউন্টেন পেন ইত্যাদির ন্যায় বিদেশী রেডিওর আড়ম্বরপূর্ণ বিজ্ঞাপন আমরা অহরহ প্রত্যক্ষ করিতেছি। এমতাবস্থায়

দেশীয় শিল্প হিসাবে ভারতীয় রেডিওর নির্মাণ ব্যবস্থা করূপে সম্ভব তাহা ভাবিয়া দেখা কঠিন। 'ভারতীয়' বলিয়া বর্তমানে যে করাটি সেট-এর নাম বাজারে প্রচারিত হয় তাহারা হয় আদৌ ভারতীয় নয়, অথবা অতিশয় নিকৃষ্ট ধরনের। অবশ্য দেশের লোকের আন্তরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা এই সমস্ত দেশীয় প্রতিষ্ঠান সহজে লাভ করিতে পারে না। টাটা কোম্পানী নির্মিত একটি রেডিও সেট উপরোক্ত ৯০ টাকায় বিক্রয় হইবে এইরূপ প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা বিদ্যুৎ শক্তির উপর নির্ভরশীল। ইহাতে ব্যাটারীর ব্যবহার সম্ভব না হইলে গ্রামাঞ্চলে ইহার ব্যবহার সম্ভব হইবে না, শহরের চাহিদা বাড়িবে এইমাত্র।

## কংকাবতী

আশুতোষ সিংহ

ক'চবরণ কন্যা  
মেঘবরণ কেশ  
মস্তুর মত দাঁত  
হাসতে ঝরে মাণিক  
কাদতে ঝরে সোনা  
আর  
কথা বলে  
কথা তো নয় :  
হীরামোতি ফুল যেন.....

কত শুনছি কংকাবতীর কথা :  
ঘরের দাওয়ায় বোসে  
দিদিমার কাছে  
গায়ের অশথের ছায়ায়  
রাখালদের কাছে  
রূপকথায়  
গল্পে.....

স্বপ্ন দেখিছি :  
ক'চবরণ কন্যা  
মেঘবরণ কেশ  
দৈত্য-পুত্রীতে বিন্দনী.....  
অধোর ধারায় অশ্রু বইছে  
কমল চোখ বেয়ে  
নদী হয়ে বয়ে যাচ্ছে  
কালের সাগরে.....

কত রাজা ভেগে গেলো  
কত রাজস্ব মুছে গেলো

কত রাজপুত্রের এলো  
ময়ূরপংখী সাজিয়ে  
পংখীরাজ ছুটিয়ে

কিন্তু দৈত্যদের মায়ায়  
পাশাপাশি হয়ে রইলো তারা,  
সবুজ বনের ফাঁকে  
বেঙমা বেঙমী জানালো শোক—  
সবুজ পাতার ফাঁকে  
কুসুম ঝরলো বেদনায়.....

আমি এ যুগের রাজকুমার  
ময়ূরপংখী নেই  
পংখীরাজ নেই  
তবু কংকাবতীকে খুঁজে ফিরি  
স্বপ্ন দেখি :  
ক'চবরণ কন্যা  
মেঘবরণ কেশ.....

১৫ই আগস্টের সকালবেলা  
সোনালী রোদ গলছে  
ফুল ঝরছে  
পাখী ডাকছে  
আর  
চারিদিক ঘিরে  
কারা যেন সব আনন্দ করছে  
সূর্যের আলোয় বলমলিয়ে উঠছে  
লক্ষ-কোটি ঢাল-তরোয়াল

সিপাই শাস্ত্রী ঘোড়-সওয়ার  
সব প্রস্তুত

শ্রুৎগাম :  
ওরাও কংকাবতীর মূর্তি চায়  
ওরাও বেড়িয়ে পড়েছে দিক-বিনিকে

জনতার সাথে হাত মেলালাম  
শহর ছাড়িয়ে  
খোয়ানদী পেরিয়ে  
মেঠো পথ দিয়ে  
অচিন-গায়ের কাজল দীঘির ধারে  
এক পাতার ঘরের পাশে এসে  
থমকে দাঁড়িলাম :  
ক'চবরণ কন্যা  
মেঘবরণ কেশ.....  
বললাম :  
কংকাবতী, চিনতে পারো,  
তোমাকেই খুঁজতে এসেছি  
আমি রাজকুমার.....  
আর শোনো :

দৈত্যদের মায়াজাল ভেগে দিয়েছি  
তুমি আর বিন্দনী নও—  
আমাদের নবলক্ষ সেনা  
সপ্ত ডিঙা মধুকর  
ময়ূরপংখী নাও  
আর  
পংখীরাজ  
সব জেগেছে।



[ ৩ ]

রোজ চারপাশের গ্রাম থেকে লোকজন আসতে লাগল, ভীড় করতে লাগল রসিক মাকির ওখানে। জমিদারের ডঙ্কা শুনছে তারা, শুনেন তাদের রক্ত উত্তাল হয়ে উঠছে, দেহমন বারুদের মত জ্বলে উঠছে। ডঙ্কা শুনেন বিলের দিকে তাকিয়েছে তারা আর তাদের চোখে বিদ্রোহের লাল নিশান দেখা দিয়েছে।

একের পর এক আসছে সবাই। সাঁওতালোরা।

“জমিদারের যি ডঙ্কা মাইরল তার মানেটো কি বা?” শূধোয় তারা।

“মাছ মাইরতে পারম্ না—ঈটা কুন কথা বাবা!”

“দরবার কইরাও ফল হইল নাই—কিছু না—”

“আয় বাপু—”

“বরাবর মাছ মারি হামরা—আকাশের দেবতার দেওয়া বিঘির পানি, বোঙার দেওয়া মাছ—তা আর ধরবার পারম্ না? বাঃ—”

“ইঃ—মাছ ধরম্ না কানে—নিশচয় ধরম্—”

“কভে সর্দার—কভে ধরম্?”

“হয়—হক্ ছাইডব না হাম্—”

কিন্তু রসিক মাঝি নির্বাক হয়ে বসে থাকে, কোনো রূপান্তর ঘটে না তার চেহারা, উত্তেজনার একটু ছায়াও কালো করে না তার মুখকে, নির্বাপিত হাউয়ের মত মাটির ওপর তার তালগাছের গুঁড়ির মত শক্ত দেহটা নিয়ে স্থির হয়ে বসে থাকে, ধূততা-মাথানো ছোট চোখের দৃষ্টি মেলে মাথা নাড়ে আর মাথা নাড়ে।

“না—মাছ ধরা হব্ না—না—” সবাইকে নিরাশ করে জবাব দেয় রসিক।

“কিন্তু কানে সর্দার? কানে?” উচ্চ কণ্ঠে প্রশ্ন করে ওরা।

আগের মতই মাথা নেড়ে রসিক উত্তর দেয়, “আয় বাপ, জমিদার মা বাপ, দোষ কইরলেও তাই মাইনতে হয়।”

মংরা, সোমা, টোমা, শূক্‌রা আর মেঘ, শূধু দাঁতে দাঁত ঘষে। মনের মধ্যে যে অশ্রু ওরা প্রতিনিয়ত শান দিচ্ছে তারই ক্ষরধার পাশব দীপ্ততা ওদের চোখের কোণে ঝিলিক মারে।

“হয়, মাইনতে হয় জী। যদি জমিদার বলে কি তু শালারা দ্যাশ ছাইড়া চলা যা, মইরা যা—তবে তাই করবার লাগে, বন্ধু, তুরা?”

মংরার জিহ্ব দিয়ে যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের টুকরো ছিটকে বেরিয়ে আসতে থাকে।

“ঠিক কহাছ ভাই। হক্ আবার কি? হক্ থাকে মনিবের, কিন্তুক হাম্‌রা কি মনিব আছি ভাইবাছ? নাঃ, তা লয়। হাম্‌রা জালোয়ার আছি, তাই হামাদের কিছু বলেতে লাই, কইরতে লাই, খালি জমিদারকে মাইনতে হয়।”—

মোঘের মত কালো কুৎসিত মুখটাকে আরো কালো ও ভয়ঙ্কর করে তুলে সোমা কথাগুলো বলে। যারা শোনে তারা তার কথার অন্তর্নিহিত অর্থটা, শ্লেষটা বুঝতে পারে।

রসিকও বোঝে তা। কড়া চাউনী দিয়ে সে বিদ্রোহীদের ঠাণ্ডা করতে চায়। কিন্তু গোলায় গেছে আজকালকার সাঁওতাল ছোকরারা—তারা তার চাউনীকে দেখেও চোখ ফেরায় না, মাথাও নীচু করে না, জামাইয়ের নেতৃত্বে একটা বিদ্রোহী দল গড়েছে ওরা। হুঁ।

একে একে সবাই উঠে যায়। সোমা সবার আগে ক্ষণকালের জন্য থমকে দাঁড়ায়, কি রকম একটা অস্বস্তিকর দৃষ্টিনিষ্ক্রেপ করে রসিকের ওপর, কি যেন বলতে চায়, তারপর নিজেকে সংযত করে এগিয়ে যায়।

অনেকে ক্রান্ত পদে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। যারা অস্পবয়স্ক আর যাদের রক্তের উত্তাপ এখনো কর্মনি তারা মাটির দিকে তাকিয়ে মংরার পেছন পেছন হটিতে থাকে। একটু নিরিখালিতে গিয়ে ফাঁকা মাঠের আলোর ওপর বসে সবাই, বিদ্যাঘাসের ধারালো শিশ তুলে দাঁত দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে নিষ্ফল আক্রোশে।

আর মংরা থেকে থেকে বলে, “ভাব্‌ছ কানে? ভাবিস্ নাই তুরা। আগে কয়টা দিন দেখ্‌ম্ হামি—শালার শব্দরার সর্দারি দেখ্‌ম্—তারপর—তারপর—”

হঠাৎ সে থেমে যায়, বাকী কথাগুলোকে দাঁত দিয়ে চেপে আটকে দেয়।

সৈদিন বিকেলে শিরিস গ্রামে এ অঞ্চলের পাদ্রীসাহেব এলেন। ফাদার জেকব। প্রায়ই আসেন তিনি, দলছাড়া মেমশাবকদের মেম-পালকের সন্ধান দিতে, পরম করুণাময় পরম পিতা ও যিশুর প্রতি এই সব কালো মানুষদের মনকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রায়ই ঘোরাঘুরি করেন তিনি। সাঁওতালী ভাষায় ছাপা বাইবেলের সেন্ট জনের অধ্যায় ও যিশুর জীবনী

বিতরণ করে যান লেখাপড়া-জানা লোকদের কাছে। যিশু ও অন্যান্য সাধু মহাপুরুষদের অলৌকিক জীবন-কথা বলেন গদগদ ভাষায়, চোখ বৃজে। পৃথিবীতে কেমন করে নরক নেমে এসেছে, লোভ, হিংসা, কপটতা ও বাভি-চারের ফলে কেমন করে সমস্ত পৃথিবী আজ অনিবার্য মহাপ্রলয়ের দিকে ছুটে যাচ্ছে তার ভয়াবহ ও রোমাঞ্চকর বর্ণনা দেন তিনি শূধু বাঙলায়। তারপর হঠাৎ গম্ভীরকণ্ঠে, সবাইকে সম্মোহিত করার চেষ্টা করে বলেন যে, এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতির হাত থেকে বাঁচতে হলে, এই নরকের মাঝে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত করতে চাইলে যিশুর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর গতান্তর নেই।

ফাদার জেকবের আগে ছিলেন ফাদার হাইনরিখ। একেবারে খাঁটি টিউটন, জার্মান দেশের লোক। কিন্তু যুগ্ম লাগবার পরই তাঁকে একদিন ধরে নিয়ে গেল ব্রিটিশ সরকার, এলেন ফাদার জেকব। হিরিশপূরার আশ মাইল দূরে, নিজনি মাঠের ওপর, গৈরিক মাটির তৈরী দোতারা কোঠা আছে একটা। এই অঞ্চলের গীর্জা। আর তিনটে ছোট ছোট টালি-দেওয়া বাড়ি, তারই একটাতে থাকেন ফাদার জেকব। দিনের পর দিন এখানে কাটাচ্ছেন জেকব। একঘেয়ে বৈচিত্রহীন জীবন। সেই একই কথা বলা, মালা ঘোরানো, প্রার্থনা করা, পুস্তিকা বিতরণ করা, মানুষের সুখ দুঃখের খবরাখবর নেওয়া, এই অঞ্চলের একমাত্র দৃশ্যের প্রতিনিধি তিনি।

ফাদার জেকব জার্মান নন, সাহেবও নন। তিনি নির্ভেজাল ভারতীয়। লালমুখো চেহারা না তাঁর, রীতিমত কালো। বাড়ি মৌদীনীপুর জেলায়। সাদা আলখল্লা পরে, কাঁচাপাকা দাড়িমুখে পাদ্রীসাহেবকে দেখায় বেশ, যাত্রাওয়ালার মুনিখামির মত। সাঁওতাল বুনোদের জন্য খাটেন খুব, অনেক কিছু করেছেনও তাদের জন্য। ইস্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, এমনি নানা জিনিস। তবু যিশুর মাহাত্ম্যকে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করে নিয়ে বেশী লোক খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। এদিকের অধিকাংশ সাঁওতালই হিন্দু—শতকরা আশি-জন। অবশ্য মা কালীকে পূজো করার পরেও বোঙাকে ভোলেনি তারা। বোঙার ওখানে নিয়মিতভাবেই মূরগী বলি দিয়ে আসে তারা। আর যারা খৃষ্টান তারা শূধু নামেই জন, জেম্‌স্। বাঁধনা পরব বা কালীপূজো, বোঙা পূজোর ব্যাপারে তারা পিছিয়ে থাকে না মোটেই, সমান অংশই গ্রহণ করে আর সবার সংগে। কিন্তু পাদ্রী জেকব সহিষ্ণু লোক, খৃষ্টান ধর্মের অভ্যন্তরীণ মাহাত্ম্যেরই প্রতীক তাঁর নিরন্তর সাহিষ্ণুতা, তাই তিনি আশা ত্যাগ করেন নি, গ্রামে গ্রামান্তরে নিয়মিত যান, খোঁজ খবর নেন, উপদেশ পরামর্শ দেন। ‘প্রভু, ওরা জানে না যে, ওরা কি করছে।’ লোক ভালো পাদ্রীসাহেব—জমিদার থেকে চাষী গৃহস্থ পর্যন্ত সবাই খাতির করে তাঁকে।



ঘরতে ঘরতে রসিকের বাড়ি গিয়ে হাজির হইলেন জেকব।

“সেলাম বাবা—সেলাম”—খুঁকে প্রণাম জানাল রসিক মাঝি।

“ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।” আশীর্বাণী উচ্চারণ করে, প্রশান্ত, উদার হেসে জেকব প্রশ্ন করলেন, “কি রসিক, ভালো আছো তো?”

“আজ্ঞা বাবা, ভালো আছি। ঠিকের—চোপায়াটা এগিয়ে দিয়ে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে রইল রসিক। অন্যান্য সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষেরাও সেখানে জেকবকে দেখে ভীড় বাড়তে লাগল।

“একটা কাজ এসেছি রসিক—বিশেষ করে তোমার কাছে”—

রসিক যেন কৃতার্থ হয়ে গেল। আয় বাপ, কি কাজ! পাদ্রীসাহেবের কাজ তার সঙ্গে!

“বলেন কানে বাবা।”

“জমিদারবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল কাল বিকেলে, তাঁর কাছে এবং অন্যান্য গায়ের লোকদের কাছেও বিলের কথা শুনলাম”—

“আজ্ঞা”—

“দুদিন ধরে ঘুরে যা দেখলাম তাতে আমার ঘোরতর আশঙ্কা হচ্ছে। অল্পবয়স্ক তরলমতি যুবকদের মধ্যে বিশেষ উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে এই বিল নিয়ে—তাই না?”

“জী বাবা”—

“সবাই কৃতসংকল্প যে, তারা জমিদারবাবুর আদেশ অমান্য করবে, বিলে মাছ ধরবে। ঠিক তো?”

“আজ্ঞা হাঁ বাবা”—

জেকব চুক্ চুক্ শব্দ করলেন, ক্রুশ-বিশ্ময় খাটের মত স্বর্ণীয় বেদনা-মণ্ডিত মুখভঙ্গী করে শ্রুতগুরু-শোভিত মাথাটা বারকয়েক নাড়লেন, তারপর হঠাৎ চোখ বড় বড় করে স্থিরভাবে তাকালেন রসিকের দিকে। তজ্জনী উত্তোলন করে বললেন, “সাবধান রসিক, সাবধান। ওরা ভুল করতে চাইলেও তুমি ওদের ভুল পথে যেতে দিয়ে না। তুমি সর্দার, তুমি মোড়ল, তুমি ওদের ঠান্ডা করো, মেঘপালক যেমন দলছাড়া বিভ্রান্ত মেঘশাবকদের খুঁজে খুঁজে জড় করে তেমনিভাবে তুমি ওদের বুঝিয়ে ঠিক করো। বুঝলে?”

“বুঝছি হুজুর—হামিও তো উদিক্ তাই কহছি”—রসিক অভিভূত কণ্ঠে বলল। তার ক্ষমতা যে অপরিমিত তা যেন হঠাৎ পাদ্রীসাহেবের কথায় অনুভব করল সে। সেদিন জমিদারবাবুর কথাতেও এই প্রশান্তি ছিল, আজ পাদ্রীসাহেব যেন সেই প্রশান্তিকে আরো দীর্ঘ, আরো উত্তেজক করে তুললেন। ভারী খুশী হল রসিক মাঝি, আত্মগর্বে তার মুখ-মণ্ডল গম্ভীর ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, নেচে উঠল তার ছোট ছোট চোখের তারাগুলো।

জেকব প্রশান্ত হাসলেন, “নিজদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাক, জমিদারের সঙ্গে লড়াই করে কি লাভ? তিনি আমার কাছে আজ খুব

দুঃখ করছিলেন যে, প্রজারা সব অবাধ্য ও দুর্বিনীত হয়ে উঠেছে। আমি বললাম যে, তা কেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আমি ওদের বুঝিয়ে বলব সব কথা। শোন, তোমরা সব শান্ত, নিরীহ মানুষ, কারো সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করনি, আজ কেন করবে তা? তোমরাই তো প্রকৃত মানুষ। ‘কেহ এক গালে চড় মারিলে অপর গালটিও আগাইয়া দিবে’—যিশু বলেছিলেন—হঠাৎ আবৃত্তির মত সুরেলা ও ভাব-গদগদ হয়ে উঠল তাঁর কথাগুলো, অপার্থিব একটা জ্যোতি যেন তার সর্বাঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হতে লাগল।

তিনি বলে চললেন, “তোমাদের সেই দিব্য কাহিনী কি আমি বলিনি? সিনাই পর্বতে, মোজের কাছে ঈশ্বর আবর্তিত হয়ে কি বলেছিলেন তা কি তোমরা ভুলে গেছ? তাঁর সেই দর্শিত আদেশের কথা?” ইংরাজীতে আউড়ে গেলেন তিনি, মুখস্থ করা ছড়ার মত, গ্রাহমণ পুরোহিতের শ্লোকের মত,

“Thou shalt not covet thy neighbour's house, thou shalt not covet thy neighbour's wife, nor his manservant, nor his maid-servant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbour's.”

অর্থাৎ পরের কোন দ্রব্যের ওপরেই লোভ করিও না। তবে? জমিদারের সম্পত্তি ঐ বিল, আজ যদি জমিদারবাবুর অন্য রকম ইচ্ছে হয়েই থাকে তবে তোমাদের তাঁর বিরুদ্ধে কোনো বিক্ষোভ করা উচিত না, তাঁকে অমান্য করা সেক্ষেত্রে পাপ হবে—ঘোরতর পাপ! বুঝলে?

সাঁওতাল স্ত্রী পুরুষেরা চুপ করেই রইল, কোনো জবাব দিল না তারা, এত বড় আধ্যাত্মিক বক্তৃতার পরেও তাদের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। তাদের কাছে কেমন যেন পানসে মনে হল কথাগুলো, কেমন যেন অর্থহীন, ছেলেমানুষী ঠেকল তা। অথচ পাদ্রী সাহেব সাধুমানুষ—তাকে কি করে কোনো প্রতিবাদ জ্ঞাপন করবে তারা। তাই নির্বাক রইল সবাই।

কেবল রসিক সোৎসাহে মাথা নাড়ল, “আজ্ঞা বাবা—আজ্ঞা”—

সবার ওপর নজর বুলিয়ে পাদ্রী সাহেব রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন, বললেন, করুণাময় পরম্পিতা তোমাদের মঙ্গল করুন। তারপর? তোমরা যে গীর্জাতে আসো না? কি হবে এলে? এসো, এসো, এই রবিবারে। কেমন?”

আগের মতই সবাই নিঃশব্দ রইল, কেবল রসিক বলল, “আজ্ঞা বাবা—যাম্, এই রবিবারে—”

শেষে এক সময়ে জেকব সেখান থেকে বিদায় নিলেন।

তখন থেকে রসিক মাঝি আরো ষো পেয়ে গেল। প্রবল প্রতাপাবৃত্ত জমিদার শিবেন্দ্র-কুমার চৌধুরী আর রাজধর্মের পুরোহিত পাদ্রী সাহেব তার পৃষ্ঠপোষক, তাঁরা পর্যন্ত তাকে খ্যাতির করছেন! মাথাটা কেমন যেন বিগড়ে গেল বড়ো মোড়লের। বিলের কথা নিয়ে যে আসতে লাগল তাকেই ধমকে ঠান্ডা করে দিতে লাগল সে।

“কি বুলিছিস? মাছ ধরব? যা, ধরগা—গুলি খায়া মরগা। কথা শুনিছিস নাই—হামাক মানিছিস নাই তুরা!”

সম্ভার সময় একে একে সবাই এসে আবার জড় হল। মংরার দল ও অন্যান্য সবাই। উত্তেজিত আলোচনা শুরু হল। তাদের চেঁচামেচি শুনে পাড়ার সবাই ছুটে এল, পোষা কুকুরগুলো চোঁচিয়ে উঠল, হাঁস ও মুরগীগুলো ডানা কাপটে নড়ে উঠল আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কোলে চড়ে মায়ের স্তন আঁকড়ে ধরল।

তাল গাছের গুঁড়ির মত রসিক মাঝির শক্ত শরীরটাকে এতদিনে কাঁপতে দেখা গেল, এতদিনে তার নির্বাক ভাবটা খসে পড়ল, চীৎকার করে সে বলল, “শ্যাম কথা শুনা লে তুরা হামি সর্দার, হামার কথা মান, মাছ মাইরতে যাম না হামরা। হুকুম মানবু নাই? গুলি খায়া মরবু সভাই? য়ুন খারাপী করবু! করগা তুরা—হামি উয়াও সর্কর হমু নাই। পাদ্রী সাহেব ভি উই কথা কহু গেল—শুনলু?”

“পাদ্রী! হু—পাদ্রী ব্যাটাকে মাইনভ কানে হামরা?” টোমা দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল।

টোমার আসল নাম ‘টমাস’—সে খৃষ্টান। কিন্তু ‘টমাস’ সংক্ষিপ্ত হয়ে ‘টোমা’ হয়ে গেছে। বাপ মায়ের সঙ্গে খৃষ্টান হয়েছিল টোমা, সেই ছোটবেলায়। কিন্তু খৃষ্টান হয়েও কোনো পরিবর্তনকে অনুভব করেনি সে, আর সব সাঁওতালদের সঙ্গেই দিনরাত থাকে সে, বোজা আর কালীপুজোয় সেই হয় সবচেয়ে উৎসাহী পাণ্ডা। গীর্জাতে কিস্মিনকালে যায় না সে, পাদ্রীদের দেখলে মুখ ভেঁচায় বড়ো আঙুল দেখায়।

রসিক প্রায় লাফিয়েই উঠল, “পাদ্রী সাহেব মানবু নাই! অমন গিয়ানী লোকটাকে মানবু নাই তো করবু কি তুরা?”

“পাদ্রী! ই—পাদ্রী তো কি হৈছে? উরা সব রেংরাজদের লোক আছে—সভাই মংলববাজ, কানে মানমু উদিক?” ঘাড় বাকিয়ে উদ্ঘত-ভাবে জবাব দিল টোমা।

“না মানবু তো করবু কিরে হারামী?” গর্জে উঠল রসিক।

এতক্ষণ চুপ করে ছিল মংরা, এবার সে

উঠে দাঁড়াল, বলল, লড়ম্ হামরা, হামাদের হককে উশল করম্—”

আহত দৃষ্টি মেলে, মর্মভেদী কণ্ঠে বলল রসিক, “তু হামার জামাই হয় মানছিস নাই হামাক!”

মংরা মৃদু হাসল, “তুর জামাই হামি—তুর আপনার লোক, তাথেই তো ভাল কথা বলাছি তুকে। জামাই তো কি হইল শূনি? জলম্ মানম্ না হামি—নাঃ—”

সবেগে হাত নেড়ে রসিক বলল, “তবে যা—মাছ মারগা। কিস্তুক হামার রায় শূনি তুরা—জিমিদারের সাথে তুরা লড়িস নাই।”

“না—লড়ম্ হামরা, নিশচয় লড়ম্।” প্রতিটি কথায় জোর দিয়ে বলল মংরা। উত্তেজনায় তার চাপা নাকটা মোটা হয়ে ফুলে উঠল, শরীরটা কাঁপতে লাগল, দুলাতে লাগল।

“কে কে যাভে তুদের সাথে?”

“অনেকে যাভে—সোমা বলল, এক পাশ থেকে।

“যাভে?” বিকৃত হাসি হাসল রসিক।

বড় সাঁওতালের কণ্ঠ ধ্বনি তুলল, “হাঁ জী—যাভে।”

“হামাক্, সর্দারক মানব্দ, না তুরা! আঁ?” রাগে, লজ্জায়, অপमानে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল রসিক মাঝি।

দরজার আড়াল থেকে পুষার মা সভয়ে এসে রসিকের পাশে দাঁড়াল, ফিস্‌ফিস করে বলল, “গদুস্‌সা কইরো না জী—গদুস্‌সা কইরো না—”

আর অসহায় দৃষ্টি মেলে সবার দিকে তাকাতো লাগল পুষা।

তব্দ খামল না রসিকের রাগ।

“সর্দারক মানব্দ, না তুরা!” বড় কর্ণ, বড় মর্মভেদী শোনালা রসিকের পুনরুক্তি।

“মানব্দ, কিস্তুক তুর ভুলকে মানব্দ নাই।” সোমা এবার পরিস্কার করে দিল তাদের মনোভাবটা।

একটা বনমানুষের মত দাঁত খিঁচিয়ে উঠল রসিক, “তবে যা দূর হ তুরা। যারা হামাক মানিস তারা থাক, বাকী সভাই হামার সামনা থিকা চলা যা ভাগ”—চোঁপায়ার ওপর বসে পড়ে সে হাঁপাতে লাগল, কোমর থেকে চুটি আর দেশলাই বের করে প্রবল উত্তেজনাকে দমন করবার চেষ্টা করতে লাগল।

“যাচ্ছি”—নিশ্চুর হাসি হেসে, বাবাড়ি চুল দুলায়ে মংরা বলল, “যাচ্ছি হামরা, গদুস্‌সা হিচ্ছি ক্যানে বা? শূনা রাখ—কাইল বিহানেই যাম্ হামরা, বিলং মাছ ধরম্—

হাঁ—”

অনেকের উত্তেজিত কণ্ঠ সমর্থন জানাল, “হাঁ—কাইলকাই মাছ মারম্”—

সম্ভার অশ্বকারে সমস্ত চরাচরটা তখন আবৃত হয়ে গেছে। পশ্চিমের বাতাস মন্দা হয়ে গেছে। আম গাছের মাথায় বসে নীড়-প্রভাগত কাকেরা কোলাহল করছে। বাদুড়েরা মন্থর ডানা মেলে কালো-হয়ে-আসা শূন্যতায় ভেসে চলেছে। আর আকাশের গায়ে, দিগন্তের বনয়েথা ভেদ করে যে লাল রঙের মেঘের পাহাড়টা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল, সূর্য অস্তমিত হওয়ায় সেটা ক্রমে পুরোনো পিতলের মত ময়লা ও কালো হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

“কে কে বাব্দ হামার সাথে?” সবার ওপর নজর বুলিয়ে মংরা বলল, “কে আঁছিস মাইনষের বাটা মরদ—আয়, উঠা আয়”—

প্রায় অর্ধেক লোক উঠে এল। নিঃশব্দে, দৃঢ় পদক্ষেপে। ঝড়ে উৎপল্লিত তাল গাছের মত বসে রইল রসিক, বিস্ফারিত চোখ মেলে তাকিয়ে রইল রসিক মাঝি। তাকিয়ে রইল আর সবাই যারা সর্দারকে অমান্য করতে সাহস পায় না, যারা জমিদার আর বন্দুকের গুলীকে ভয় করে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ লজ্জা পেল ওরা, মাথা নীচু করল, মাটীর গর্ভে তলিয়ে যেতে চাইল। সর্দারকে মেনে আজ ওদের পৌরুষ আর মনুষ্যত্ব পদদলিত হল, রঙের জাক বাতাসে মিলিয়ে গেল।

সারি বেধে বিদ্রোহীরা চলে গেল। অশ্বকারে মিলিয়ে গেল ওদের কালো দেহের ছায়া।

মংরা বলল, “হামার ঐটি চল্ কথা আছেক।”

সবাই সাড়া দিল, “হয়—চলেক।”

দাওয়ার নীচে বসল সবাই, উবু হয়ে চুটি টানতে লাগল। কড়া তামাক আর শালপাতার পোড়া গন্ধ বাতাসকে ভারী করে তুলল। আকাশে চাঁদ দেখা দেবে মনে হচ্ছে, কয়েকদিন বাদেই পূর্ণিমা। কৃষ্ণবর্ণ মর্মর-মর্তির মত ওদের দেহগুলো ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। চকচকে চোখ মেলে, দৃঢ়সংবদ্ধ ওষ্ঠে ওরা পরস্পরের দিকে তাকায় আর ভাবে। কাল ওরা বিলে মাছ ধরবে। এটা তাদের জন্মগত অধিকার।

“বস্ তুরা—বস্”—নরম গলায় বলল মংরা। ঘরের ভিতর গেল সে।

দরজার পাশ থেকে সদৃশজ্ঞিতা ঝুমুরী তাদের লক্ষ্য করছিল, কাছে এসে ফিস্‌ফিস করে সে বলল, “উরা কি চাহে জী—আঁ?”

“চাহে তুর যথা—”

“আয় বাপ—ইট কি কহঁছিস্ তু!”

“কাম আছেক রে শ্বশুরার বিটি, কাম আছেক। শূনি—পচানি আছে?”

“হাঁ।”

“কয় হাঁড়ি?”

“দু” হাঁড়ি। ক্যানে শূনি?”

“উদিক খাওয়াম্”—

“আয় বাপ—হামরা খাম্ কি? পুশিমার রাত আইসছে যি—”

“খাইতে দে—ফির আনম্ হামি। দে পচানি”—

আর বাক্য বায় না করে ঘরের কোণ থেকে দুই হাঁড়ি পচানি ও একটা ভাঁড় এনে দিল ঝুমুরী। মংরা তা নিয়ে বাইরে গেল।

“হুই ভাইসব—পচানি খা”—

“পচানি!”

সবাই যেন চমকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল, উল্লসিত হয়ে বলল, “পচানি খাম্।”

“হয়—খা সভাই—খা।”

টোমা দু’হাত শূন্যে তুলে বলল, “দু’হাই মা মেরীর তু বাটা থাক মংরা মাঝি তুর পাঁচটা বেটা হাঁব আর দশটা বিটি—”

“হাঃ হাঃ হাঃ”—হেসে উঠল সবাই।

“সাবাস ভাই সাবাস” শূকরা জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটোকে ভিজিয়ে তুলল।

মংরা ও সোমা সবাইকে পচানি বিতরণ করল। তব্ব, তিঙ একটা ঝাজালো গম্ধ চুটির গন্ধের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল। কালো কালো বৃকের ভিতরকার জ্বালাটা এবার যেন আরো প্রখর ও অসহ্য হয়ে উঠল, চোখের সামনে একটা রক্তাভ পরদা ঝিল-ঝিল করে দুলা উঠল, ধমনীতে প্রবাহিত হল একটা অদৃশ্য অগ্নির স্রোত। আঃ আঃ।

মংরা গম্ভীরকণ্ঠে বলল, “কাইল বিহানে যাম্—সভাইকে বইলা দিস্।”

“হাঁ—কাইল যাম্”—সবাই সাড়া দিল।

“হামরা মরদ, জিমিদারের কুস্তা না, বুবল্? হামরা হামাদের হক ছাইড়ম্ না—আর আর”—বৃকের ওপর ডান হাত দিয়ে বারকয়েক চাপড় মেরে বলল সোমা। আরো কিছু বলবারও যেন ইচ্ছে ছিল তার, কিন্তু বলল না, চুপ করে গেল। সমর্থন ধ্বনিত হল, “হয়—হয় জী।”

যেভাবে বাঙলা বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহাতে সর্বপ্রকারে হিন্দুদিগের সম্বন্ধে অবিচার করা হইয়াছে। প্রথমত রাম-মোহন হইতে সুরেন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জন এবং সুরেন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জন হইতে সুভাষচন্দ্র যে সাধনা করিয়া আসিয়াছেন, বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদীরা চক্রান্ত করিয়া সেই সাধনা বার্থ করিয়া দিয়াছে—ভারতবর্ষকে স্বাধীনভাৱে করিয়া দুর্বল করিয়া তাহাকে স্বাধীনতার পরিবর্তে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত “ডোমিনিয়ন” শাসন মাত্র দিয়াছে। আর বাঙলাকে ঘেরাপভাবে বিভক্ত করিয়াছে, তাহা অনায়াস। গত ১৮ই আগস্ট ভারতের গণপরিষদে বাঙালী সদস্যরা বঙ্গ-বিভাগ বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে—বিভাগ-ব্যবস্থা যে নিয়মে বিভাগ হইবে বলা হইয়াছিল, তাহার বিরোধী। কারণ—

(১) প্রথমে যে হিন্দুপ্রধান খুলনা জিলা পশ্চিমবঙ্গভুক্ত বলা হইয়াছিল, অন্যায়রূপে তাহা পাকিস্তানভুক্ত করা হইয়াছে।

(২) বাঙলাকে ২ ভাগে বিভক্ত না করিয়া ৩ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর।

(৩) উত্তরে জলপাইগুড়ী ও দার্জিলিং জিলা ২টির সহিত পশ্চিমবঙ্গের অন্য অংশের যোগ করা হইয়াছে।

(৪) জলপাইগুড়ী জিলা হিন্দুপ্রধান হইলেও তাহার কতকাংশ পাকিস্তানভুক্ত করা হইয়াছে।

(৫) চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশের লোক শতকরা ৯০ জন অ-মুসলমান হইলেও তাহা পাকিস্তানভুক্ত করিয়া মুসলমানদিগের সম্বন্ধে বৃটিশের অকারণ বা সকারণ প্রেমের পরিচয় প্রকট করা হইয়াছে।

(৬) পশ্চিমবঙ্গকে সমগ্র বঙ্গের অধিবাসীদিগের সাম্প্রদায়িক বিভাগানুসারে জমি দেওয়া হয় নাই। ফলে অধিবাসীবিনময় দুঃসাধ্য হইবে। ইহা হয়ত ইচ্ছাপূর্বকই যোগ রক্ষা সহজসাধ্য হইলেও দুই ভাগে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে।

হিন্দুরা এই ব্যবস্থায় কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না। কাজেই যে কোনদিন—কোন না কোন ঘটনা উপলক্ষ করিয়া অশান্তি আত্মপ্রকাশ করিতে পারে।

বাঙলা বিভক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু প্রস্তাব করিয়াছেন—

মানভূম জিলা

সিংভূম জিলা

সাঁওতাল পরগণা, পূর্ণিয়া ও

ভাগলপুর জিলা ৩টির বঙ্গভাষা-ভাষীপ্রধান অংশ

## বাংলার কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

পশ্চিম বঙ্গে সংযুক্ত করা হউক। এই প্রস্তাব নূতন নহে। লর্ড কাজন বাঙলার হিন্দুর শক্তি খর্ব করিবার জন্য যেমন বাঙলাকে পূর্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন—পরে তেমনই—সেই উদ্দেশ্যেই পূর্ণোক্ত স্থানগুলি বিহারে (তখন বিহার ও উড়িষ্যা) দিয়া বাঙালী হিন্দুর প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। কংগ্রেস যখন ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতির সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন, তখন ঐ সকল স্থান যে বাঙলার প্রাপ্য তাহা কিরূপে অস্বীকার করিবেন?

কিন্তু দেখা গিয়াছে, গত ১৮ই আগস্ট জামসেদপুরে বিহারী বাঙালী সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে ঐরূপ প্রস্তাব হইবে বলিয়া একদল বিহারী সভা ভঙ্গ করিবার জন্য “অহিংসার প্রতীক” লাঠি ব্যবহার করিয়া কয়জন বাঙালীকে আহত করিয়াছিলেন।

শুন্য যাইতেছে, বিহার সরকার টাটা কোম্পানীকে শতকরা ৮০ জন বা ঐরূপ সংখ্যক বিহারী কর্মী নিযুক্ত করিতে বলিয়াছেন। একথা যদি সত্য হয়, তবে বাঙলার লোক বাঙলার সরকারকে বাঙলায় বিহারীদিগের সম্বন্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলিবে—সন্দেহ নাই। বাঙলার পাটকল যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন কর্মচারী ও শ্রমিকের শতকরা ৯০ জনেরও অধিক বাঙালী ছিল—আজ বাঙালী শতকরা ১০ জন মাত্র। অবশিষ্ট কর্মী প্রভৃতির মধ্যে বিহারী প্রায় অর্ধেক। কাজেই বলিতে হয় বিহারীরা বাঙলা—পশ্চিমবঙ্গ—হইতে মাসে অল্প অর্থ লইয়া যায় না। বিহারে বাদ বাঙালীরা বিহারীদিগের তুল্যাধিকারে বঞ্চিত হয়, তবে বাঙলায় বিহারীদিগকে তুল্যাধিকার দানের কি কারণ থাকিতে পারে?

পশ্চিম বঙ্গের সরকার এখনও তাহাদিগের কার্য-পদ্ধতির বিষয় লোককে জানান নাই। অথচ বর্তমান বাঙলা সরকারের ঘাটতি প্রায় ছয় কোটি টাকা; গঠনমূলক কার্যের বায়ও দশ বৎসরে বার্ষিক ছয় কোটি টাকা হইবে। ইহার সহিত দেশরক্ষার বায় যোগ দিতে হইবে। গভর্নরের বেতন ঘেরূপ অত্যধিক তাহাতে মনে হয়, অচিরে সচিবদিগের বেতন বৃদ্ধির বিষয়ও বিবেচিত হইতে পারে। দেশের লোকের আয় বৃদ্ধি ব্যতীত এই সব নির্বাহ হইতে পারে না।

কাজেই সে জনা বাঙলা সরকারকে আবশ্যক উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

স্যার সিরিল র্যাডক্লিফ সীমানাধারণ কমিশনের সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। যখন কমিশনের অধিবেশন হয়, তখন তিনি উপস্থিত ছিলেন না; কাজেই কোন যুক্তি তিনি শুনেন নাই—কোন বিষয়ে কোন প্রশ্ন করেন নাই। গম্পে আছে, এক পণ্ডিতের টোলে বহু ছাত্র পড়িত—একজন কিন্তু কিছুতেই কোন বিষয় অধ্যয়ন করিয়া বুদ্ধিতে পারিত না। সে টোল ত্যাগের কিছুদিন পরে কোন শ্রামধানুষ্ঠানে গুরুর নিমন্ত্রণ হয় এবং গুরু বাইয়া দেখেন, তথায় সেই ছাত্রটিই প্রধান পণ্ডিত। তিনি ছাত্রটিকে সে কোন কোন বিষয়ে অধ্যাপনা করে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিয়াছিল—সে গুরুর নিকট ব্যাকরণ ব্যতীত আর কোন বিষয় অধ্যয়ন করে নাই, সেই জন্য ব্যাকরণ ব্যতীত আর কোন বিষয়ে অধ্যাপনায় তাহার কোন সংশয় হয় না। স্যার সিরিলও তেমনই অবশ্যে তাহার রায় দিয়া গিয়াছেন এবং লর্ড মাউন্টবাটেন তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। স্যার সিরিল বলিয়াছেন, তাহার সহযোগীরা একমত হইতে না পারায় তাহারা তাহাকে তাহার রায় দিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু কমিশনের সদস্য শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় কি তাহাকে তাহার মতই কমিশনের রায় বলিয়া প্রদান করিতে বলিয়াছিলেন? যদি তাহারা তাহা না বলিয়া থাকেন, তবে স্যার সিরিলের রায় কমিশনের রায় বলা যায় না।

স্যার সিরিলের রায় যে বাঙলার হিন্দুদিগের সম্বন্ধে অবিচার করা হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেন নাই, তাহার সম্বন্ধে কয়টি কথা বলা প্রয়োজন—

(১) পশ্চিম বঙ্গের লোকসংখ্যা প্রায় ২ কোটি ১২ লক্ষ হইতেছে। ইহার মধ্যে মুসলমান ৫৩ লক্ষ অর্থাৎ বাঙলার মুসলমানের শতকরা ১৬ জন পশ্চিম বঙ্গে থাকিবে। আর পূর্ববঙ্গে লোকসংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৯১ লক্ষ হইবে। ইহার মধ্যে অ-মুসলমান এক কোটি ১৪ লক্ষ অর্থাৎ বাঙলার অ-মুসলমানদিগের শতকরা ৪২ জন পাকিস্থানে মুসলমান শাসনাধীন হইবে।

(২) যদিও বড়লট যে প্রাথমিক বিভাগ করিয়াছিলেন, তাহাতে পশ্চিম বঙ্গের আয়তন ৩২ হাজার বর্গ মাইল ছিল—এখন তাহা ২৮ হাজার বর্গ মাইল মাত্র হইল। পূর্ববঙ্গের আয়তন ৪৯ হাজার বর্গ মাইল হইল। ফলে অধিবাসী-বিনময় দুঃসাধ্য করা হইল।

(৩) জলপাইগুড়ি জিলার ৫টি হিন্দু প্রধান থানা পাকিস্থানভুক্ত করা হইয়াছে। যশোহর জিলার ৪টি হিন্দু প্রধান থানাও পাকিস্থানকে দেওয়া হইয়াছে এবং পশ্চিম বঙ্গের অন্য অংশের সহিত জলপাইগুড়ির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে।

(৪) আবার কেবল সংযোগের অভাব হেতু সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্থানভুক্ত করা হইয়াছে। চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশ সম্বন্ধে নির্ধারণ প্রদানের অধিকার স্যার সিরিলের ছিল কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ অনিবার্য। এই প্রদেশ পাকিস্থানকে প্রদান করা গত ওরা জনের ঘোষণারও বিরোধী। কারণ, সেই ঘোষণায় বলা হইয়াছিল কোন স্থানকে তাহার অধিবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইউনিয়নে বা পাকিস্থানে যোগদানে বাধ্য করা হইবে না। এই পার্বত্য প্রদেশের কোন প্রতিনিধি ব্যবস্থা পরিষদেও নাই। ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৪৭ হাজার এবং তাহার মধ্যে ২ লক্ষ ৩৯ হাজার ৭ শত ৮৩ জন মুসলমানাতিরিক্ত। কাজেই এই সকল লোককে বলপূর্বক মুসলিম শাসনাধীন করা দুর্নীতিজন্যে বাতীত কি বলা যাইতে পারে? অথচ লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেন অনায়াসে নিবিবাদভাবে সেই কাজ করিয়াছিলেন।

(৫) গোপালগঞ্জ হিন্দুপ্রধান। তাহাকেও মুসলিম শাসনাধীন করা হইয়াছে।

(৬) সমগ্র খুলনা জিলা হিন্দুপ্রধান হইলেও তাহা পাকিস্থানভুক্ত করা হইয়াছে। অথচ প্রাথমিক বিভাগে খুলনা পশ্চিম বঙ্গ ধরা হইয়াছিল এবং ৪৪ জন লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেন বলেন, খুলনা—

"Has a very small fraction of non-Muslim majority. I shall be astounded if the Boundary Commission places the whole of that district in the non-Muslim area."

অথচ সমগ্র খুলনা জিলা পাকিস্থানভুক্ত করা হইয়াছে।

খুলনা সম্বন্ধে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের মতও থাকে নাই।

আর কংগ্রেস এ সম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন, তাহাও বিস্ময়ের বিষয়। ২৮শে মে তারিখে কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি আচার্য কৃপালনীর দিল্লীতে বলিয়াছিলেন, কংগ্রেস দেশ বিভাগ চাহে না; কিন্তু মুসলিম লীগ যদি পাকিস্থানই তাহা-দিগের কাম্য বলেন, তবে বাঙলা ও পঞ্জাব বিভাগ নিবারণ করা যায় না। আর যদি বিভাগ হয়, তবে তাহা ন্যায়সংগত হইবে এবং কংগ্রেস অ-মুসলমান প্রধান স্থানের পাকিস্থান ভুক্তি কখনই হইতে দিবেন না—

"If partition must come the division must be fair, under no circumstances will the Congress allow the inclusion of non-Muslim areas in the so-called Pakistan".

অথচ এই আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়া আজ যে পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেসী প্রধান সচিব বলিয়াছেন—সকলে কমিশনের নির্ধারণ মানিয়া লউন, ইহাতে কংগ্রেসের মর্যাদা কি অবজ্ঞাত হয় নাই?

পশ্চিম বাঙলার প্রধান সচিব কয় শত খুলনাবাসীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলে বলিয়া-ছিলেন, খুলনার হৃদয় যে ক্ষতিবিক্ষত হইয়াছে, তাহা তিনি অবগত আছেন। কিন্তু তিনি সে জন্য কি করিয়াছেন?

## যখনই ধূমপান করিতে চাহিবেন কারাভ্যান সিগারেট পান করিবেন



# CARAVAN

কারাভ্যান এয়ার কন্ডিশন করা সিগারেট

আশানান টোব্যাকো কোম্পানী অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড  
A.C.I.C. 45

## আব্রাহাম লিংকনের ব্যক্তিগত কাগজপত্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব সভাপতি আব্রাহাম লিংকনের নাম সকলেরই জানা আছে। মার্কিনরা তাঁকে দেবতার মতো জ্ঞান করেন ও সেইরকম সম্মান দিয়ে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রে যে গৃহযুদ্ধ হয়েছিল, সেই সময়ে লিংকন রাষ্ট্রপতি ছিলেন। তাঁর যে সমস্ত ব্যক্তিগত কাগজপত্র ছিল, সেগুলি কিছুদিন হ'ল প্রকাশিত হয়েছে। এতদিন এইগুলি অপ্রকাশিত ছিল, কারণ লিংকনের মৃত্যুর পর এই সমস্ত কাগজপত্র তাঁর পুত্র রবার্ট রক্ষা করছিলেন, তিনি তার কিছুই হস্তান্তর করেন নি; অবশেষে যখন মার্কিন সরকারের কাছে সেই সব কাগজপত্র দিলেন, তখন সর্ব কার্যে নিয়োজিত যেন, তাঁর মৃত্যুর পর ২১ বৎসর পূর্ণ না হলে যেন এই সব কাগজপত্র প্রকাশ করা না হয়। সেই ২১ বৎসর পূর্ণ হয়েছে গত ২৬শে জুলাই রাতি ১৪টায়।

২৬শে জুলাই রাতি ১২টায় সরকারী লাইব্রেরী গৃহে লিংকন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, সাংবাদিক, ফোটোগ্রাফার, রেডিও ও

## এপার ওপার

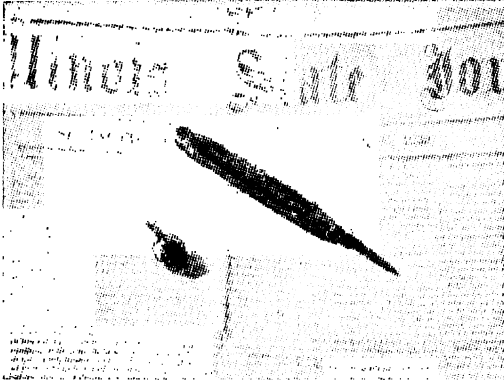
### বিদেশী লেখকদের খবর

এমিল লুডউইগ, বিখ্যাত জীবনচরিত লেখক। নেপোলিয়ান, বিসমার্ক, ফ্রিড্রিখ, হিটলার, বুদ্ধভেট ইত্যাদির উৎকৃষ্ট ও প্রামাণ্য জীবনী লিখেছেন। তিনি ইহুদী বলে তাঁর বইগুলি হিটলারের জার্মানীতে নিষিদ্ধ ছিল। জার্মানীর রুশ অঞ্চলে এই নিষেধাজ্ঞা, কিন্তু এখনও প্রত্যাহত হয় নি।

সমারসেট মম, ৭৩ বৎসর বয়স অতিক্রম করেছেন। তিনি স্থির করেছেন তাঁর শেষ বই এইবার লিখে ফেলবেন। মম প্রায় ৯০ হাজার টাকা দান করেছেন। যার উপস্বত্ব থেকে একজন নতুন লেখকের বিদেশ ভ্রমণের ব্যয় বহন করা হবে।

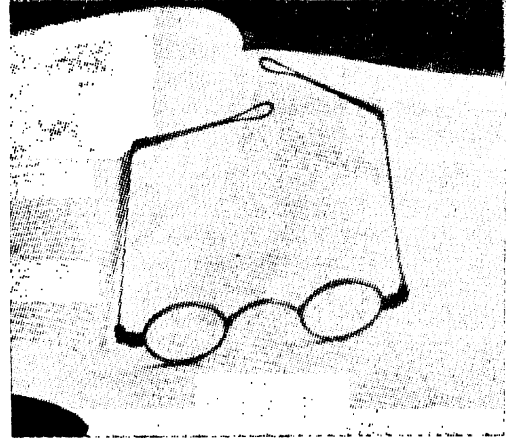
পি জি ওডহাউস, 'জিভস নামক বিখ্যাত চরিত্রের স্রষ্টা। যুদ্ধের সময় জার্মান রেডিও

পূর্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি চিকিৎসক-রূপে প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। যুদ্ধান্তে নানা সরকারী হাসপাতালে তিনি চাকরী করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে তিনি বাঙলা সরকারের ডিরেক্টর অফ পাবলিক হেলথ ছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হতেই তিনি লেফটেন্যান্ট কর্নেলরূপে ৪০ আই জি এচ সেনাদলের অধিনায়ক হয়ে সিংগাপুরে যান। তিনি সিংগাপুরে পৌঁছেছিলেন ১৯৪২ সালের ২৯শে জানুয়ারী; তার ১৫ দিন পরেই সিংগাপুরের পতন হয়। তারপর তিনি জেনারেল মোহন সিংয়ের সঙ্গে যোগদান করে প্রথম আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করেন। মোহন সিং পদত্যাগ করার পর এবং নেতাজী এসে পৌঁছন না পর্যন্ত তিনিই আজাদ হিন্দ বাহিনীকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। নেতাজীর অনিধায়কতায় পুনর্গঠিত আজাদ হিন্দ বাহিনীতে তিনি রাজস্বসচিব নিযুক্ত হন। ভারতের যে সমস্ত অংশ আজাদ হিন্দ বাহিনী জয় করে নিয়েছিলেন, শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় সেই সব অংশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন।



লিংকন বাবহৃত ছুরি ও ঘড়ীর লকেট

টেলিভিশনের প্রতিনিধিগণ দ্বারা ঘর পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ঠিক ১২টা বাজার সঙ্গে প্রধান লাইব্রেরিয়ান সম্মুখে বসে লোহার আলমারীর চাবি খুলে সেই সব মূল্যবান কাগজপত্র বার করে দেন। প্রায় দশ হাজার কাগজের মাইক্রোফিল্ম তোলা হয়েছে। এগুলি মার্কিন গৃহযুদ্ধ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের দেখাবার জন্য ইংলন্ডে পাঠানো হবে। অনেকে আশা করছেন যে, এই সব কাগজপত্র থেকে মার্কিন ইতিহাসের এক অধ্যায়ের অনেক অজানিত খবর জানা যাবে, আর একদল আশা করছেন যে, লিংকনের ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী ছাড়া নতুন কিছু জানা যাবে না। এখন যেখানে সরকারী লাইব্রেরীটি রয়েছে সেইখানেই একদা "উইলিয়াম প্রিন্সিংস" নামে বোর্ডিং হাউস ছিল, যেখানে একদা বাস করতেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাবী সভাপতি আব্রাহাম লিংকন।



লিংকন বাবহৃত লোহার ফ্রেমের চশমা

থেকে বাধা হয়ে কত কথাই না বলতে হয়েছে। তিনি ছয় মাসের জন্য নিউইয়র্কে বেড়াতে গেছেন, ভাল লাগলে হয়ত বরাবর থাকতে পারেন। তিনি তাঁর কয়েকটি নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করতেও পারেন। ওডহাউস খুব দ্রুত লিখতে পারেন, বরাদ্দ সময় পূর্ণ হবার আগেই অতিরিক্ত চারখানি বই তিনি লিখে ফেলেছেন।

রবার্ট লুই স্টিভেনসন যখন মধ্যচন্দিমা যাপন করছিলেন, তখন যে বইখানি লিখেছিলেন তার নাম 'ট্রাভেলস উইথ এ ডংকি'।

### শ্রীঅতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নামটা অচেনা মনে হচ্ছে। তিনি আমাদের দেশে মেজর জেনারেল এ সি চ্যাটার্জী নামে পরিচিত। এইবার চিনতে পেরেছেন। তিনি বাঙলা সরকারের সার্জন-জেনারেল এবং ডিরেক্টর অফ পাবলিক হেলথ নিযুক্ত হয়েছেন। দ্বিতীয় পদটিতে তিনি যুদ্ধের

১৯৪৫ সালের গোড়ায় নেতাজী তাঁকে মেজর জেনারেলের পদে উন্নীত করেন। বিশেষ কাৰ্যভার দিয়ে নেতাজী তাঁকে সাইগনে প্রেরণ করেন। সাইগনে তিনি খুব তাড়াতাড়ি ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের শাখা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের জন্য বহু অর্থ সংগ্রহ করেন। ভাগ্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ইন্দো-চায়নায় আশ্রয় নিতে হয়েছিল। সেখান থেকে ১৯৪৬ সালে তাঁকে ভারতে আনা হয়।

### বাঙলার শাসনকর্তা

বাঙলার যিনি শাসনকর্তা, তাঁর পুরো নাম চক্রবর্তী রাজগোপালচন্দ্র; সেইজন্য সংক্ষেপে বলা হয় সি আর। এ হেন যার নাম, তিনি মার্সল্যান্ড গ্যান্ডার নামে একজন ইংরাজ সাংবাদিককে বলেছিলেন, "কি মজার নাম তোমার!"



## বেতার তাপ

প্রীতিস্বানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বি এন-সি, বি ই

যাঁ যখন সভ্যতার আলোক পায় নি,  
যখন সে থাকত পাহাড়ের গহ্বরে,  
ঘরে বেড়াতে বনে জংগলে, তখনকার সেই  
আদিম বর্বর যুগেই গহ্বারবাসী মানুষ  
শিথিল আগুনের ব্যবহার। দারুণ শীতে  
চকমকি ঠেকে শকানা পাতায়, গানের ডালে  
আগুন জ্বলিয়ে তারা শীত নিবারণ করত,  
মাংস বললে আহার্য পছন্দ করত, কবুত বনা  
জন্তু হাতে আভরণ। তারপর কত যুগ  
পার যায় মানুষ সমস্ত মৌসুম ধাপে ধাপে  
উঠে চলেছে। তখন আগুন জ্বলিয়ে উত্তাপ  
উৎপাদন করলে সে ব্যবহার করছে পধানতঃ  
কয়লাকে। বিবেক কালেক শাকসবী পর্যন্ত  
কয়লাই তাপ বর্ধনের কাজে হানসক্রে সাহায্য  
করে আসছে। তারপর এসেছে বৈদ্যুতিক যুগ।  
আকাশের সিঁড়িতে মানুষ তার হস্তের মাঠের  
মাঝে আমানত করে রাখি কি চল্লিশ বছর  
বৈদ্যুতিক শক্তির বহুল ব্যবহার হয়েছে  
সম্ভব।

পরদিন বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরীক্ষা  
করে দেখা গেল যে এক টুকরা ইস্পাত খুন্ড  
একটি বৈদ্যুতিক তারের কন্ডাক্টর মাঝে রেখে  
ঐ তারের দিকের পরমাণুতে তড়িৎ আধানবাহিত  
কারেন্ট প্রবাহিত করলে অতি অল্পক্ষণের  
মধ্যেই ঐ ইস্পাত টুকরাটি উত্তপ্ত হয়ে  
এঠে। কন্ডাক্টর দিকের ঐ তড়িৎ ইস্পাতের  
টুকরাটির মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাব  
বিস্তার করে (ইন্ডাক্টসন কারেন্ট), ফলে  
টুকরাটির নিজস্ব সিঁড়ি-নিরোধক ক্ষমতা  
(ইন্ডাক্টিভিটি রিজিস্ট্যান্স) জনা তাপ  
উৎপন্ন হয়।

জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মাইকেল  
ফারাডে সর্বপ্রথম ঐ বৈদ্যুতিক আবেশ  
(ইন্ডাক্টসন কারেন্ট) আবিষ্কার করেন। নিন  
প্রমাণ করেন যে পাতক বিশুদ্ধ প্রবাহিত  
কন্ডাক্টর সংগে চৌম্বক শক্তির বহা সংশ্লিষ্ট  
থাকে। আর তড়িৎআবেশের পরিমাণের হ্রাস  
বৃদ্ধি নির্ভর করে ঐ চৌম্বক শক্তি-বাহার  
আবিস্কারের তারকায় পরিবর্তনের ওপর।

ঐ ত গেল তড়িৎ পরিস্রাবক-পদার্থ  
(কন্ডাক্টর) কণা। তারপর বৈজ্ঞানিকগণ তড়িৎ-  
রোধক (নন-কন্ডাক্টর) পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা-  
কার্য চালান এবং কাচ কাঠ, নদার প্রভৃতি  
পদার্থকেও অতি চমকটে উত্তপ্ত করতে  
সক্ষম হন, তাদের পর্যায়ক্রম তড়িৎ-সংলক্ষক  
বৈদ্যুতিক আধারের মধ্যে রেখে। ঐ বৈদ্যুতিক

আধারের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তির ক্রমাগত দিক-  
পরিবর্তনের জন্য কাচ, কাঠ বা রবারের অণু-  
গুলি পরস্পর বিপরীত দিকে আকর্ষিত  
হতে থাকে, ফলে অণুগুলির ক্রমাগত পরস্পর  
ঘর্ষণের ফলে তাপ উৎপন্ন করে। আণবিক  
ঘর্ষণের ফলে উত্তাপ উৎপাদনের একটি মস্ত  
বড় সাক্ষ্য হল ঐ যে পদার্থটির অন্তর  
এবং বাহির একই সঙ্গে উত্তপ্ত হতে আরম্ভ  
করে। কিন্তু যে কোন অবৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায়  
পদার্থটির বহিরাংশই সর্বপ্রথম উত্তপ্ত হয়।

বৈদ্যুতিক উপায়ে উত্তাপ বর্ধনের এই  
দৃষ্টি উপায়ে বিজ্ঞান জগতে যুগান্তর এনেছে  
সন্দেহ নেই। ১৯২১ সালে বিখ্যাত মার্কিন  
শিল্প প্রতিষ্ঠান জেনারেল ইলেকট্রিক সর্বপ্রথম  
আবিষ্কারটি তাদের বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার  
করে সফল পাবে। এই সময় তাঁরা বায়ুশূন্য  
কাচের আধারের মধ্যে বন্ধ করার পূর্বে ঐ  
আধারের মধ্যেকার ধাতব তন্তু (ফিলামেন্ট)  
থেকে গ্যাস নিষ্কাশনের একটি পথ্য উদ্ভাবন  
করবার চেষ্টা করছিলেন। ধাতব তন্তু থেকে  
গ্যাস বার করতে হলে তাকে যথেষ্ট উত্তপ্ত  
করা প্রয়োজন। এখন আধারটি বাইরে থেকে  
উত্তপ্ত করতে গেলে তার কাচ যায় ভেঙে  
অসম সংকোচন-পসারণের ফলে। এই সমস্যার  
সমাধান হল বেতার-রশ্মির সাহায্যে। পর্যায়ক্রম  
ভিড় প্রবাহিত একটি বৈদ্যুতিক কন্ডাক্টর  
অভ্যন্তরে ঐ ধাতব তন্তুসহ কাচের আধার  
রাখা হল। এতে উত্তপ্ত হবে শুধু ধাতব  
তন্তু—এর বৈদ্যুতিক নিরোধক ক্ষমতা কাচের  
চাইতে কম বলে।

আরও আট বছর পরে অর্থাৎ ১৯২৯  
সালে হম্ব-টেট প্রেরক বেতার কোষের সাহায্যে  
বায়ুশূন্য আধারের কাছে কর্মনিরত কর্মীগণ  
আবিষ্কার করলেন যে বেশীক্ষণ ঐখানে কাজ  
করার দরুন তাঁদের দেহ ঝেঁও উত্তপ্ত হয়ে  
ওঠে—তাঁরা জরুরিবে লোভ করেন। একজন  
বৈজ্ঞানিক বললেন যে ঐ সাহায্যে টিউব হতে  
দ্রুত তরঙ্গ বিমিষ্ট অতিশয় শক্তিশালী  
বেতার-রশ্মি ক্রমাগত কর্মীদের দেহের অভ্যন্তরে  
প্রবেশ করার দরুনই তাঁদের জরুরিবে অনভূত  
হয়। এর থেকেই নকল জরুরিবে যন্ত্রের  
(Artificial Fever Machine) আবিষ্কার  
হয়েছে। এই যন্ত্র প্রায় প্রত্যেক বড় বড়  
হাসপাতালে সহজে রক্ষিত হচ্ছে অবশ্য  
বিদেশে।

এই দৃষ্টি আবিষ্কারের পর বহুদিন এই

দিকে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। সম্প্রতি  
যুদ্ধের খাতিরে এর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।  
এই সাহায্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকানরা  
তাদের দেশকে টিনের ঘাঁটিতে হতে রক্ষা  
করেছে। যুদ্ধের সময় খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য  
বস্তু অতি প্রয়োজনীয় জিনিসের রস্তানির  
কাজে টিনের কেঁটোর প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী।  
সাধারণতঃ খাব পাতলা ইস্পাতের চাদর গলিত  
টিনের মধ্যে ডুবিয়ে কলাই করে কেঁটা ইত্যাদি  
প্রস্তুত করা হয়। গবেষণাগার টিনের কলাই  
করার এমন একটি প্রণালী আবিষ্কার করলেন  
যাতে কম পরিমাণ টিনের ব্যবহারে পূর্বাপেক্ষা  
অল্পতরঙ্গক্ষেত্র তিনগুণ বেশী ইস্পাত কলাই  
করা সম্ভব হল। এই প্রণালীতে একটি  
চৌকো চৌবাচ্চায় টিন স্ক্রোইড নামক দ্রব্যের  
মাঝে একদিক ঐ ইস্পাতের চাদরটি আর  
একদিকে খাঁটি টিনের পাত চোবান থাকে।  
আর বিনা সরবরাহের ধনাত্মক (পজিটিভ)  
এবং ঋণাত্মক প্রান্ত যথারূপে টিনের পাত এবং  
ইস্পাতের চাদরের সংগে সংযুক্ত করা হয়।  
এখন ভিড় সংলগ্ন শব্দ হলে টিন স্ক্রোইড  
দ্রব্য থেকে যাত্রা টিনের অণুগুলি ইস্পাতের  
পাতের উপর জমাতে থাকে। ইস্পাতের চাদরের  
উপর ধাতব টিনের একটি অতি সূক্ষ্ম  
আস্তরণ পড়ে যায়; আর সমপরিমাণ বিশুদ্ধ  
টিন ঐ টিনের পাত হতে দ্রবীভূত হতে  
থাকে। এই প্রক্রিয়াটির নাম বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া।  
কিন্তু এই প্রণালীটি একেবারে লোভমুক্ত নয়  
কারণ ইস্পাতের চাদরে টিনের আস্তরণ সমান-  
ভাবে সম্পূর্ণ পড়ে না। স্থানে স্থানে  
আণবিকগত আধিক্যতার সৃষ্টি হয় যার ফলে  
অতি শীঘ্রই এ সকল স্থানে মরিচা ধরে, যার  
দরুন ধাতব টিনের আস্তরণ দেওয়ার বা  
কলাই করার আর কোন সার্থকতা থাকে না।

এখন এই সমস্যার সূচন্য সমাধান হয়েছে  
বেতার রশ্মির ব্যবহারে। অসমান টিনের  
আস্তরণ লাগান ইস্পাতের পাত বা চাদরটি  
বেতার রশ্মির সাহায্যে যথেষ্ট উত্তপ্ত করলে  
টিন দ্রবীভূত হয়ে যায় আর ইস্পাতের গারে  
সমানভাবে আস্তরণ পড়ে।

প্লাইউড তৈরী করতে বেতার রশ্মি  
আজকাল যথেষ্ট ব্যবহৃত হচ্ছে। সাধারণতঃ  
প্লাইউড তৈরীর রীতির কথা আলোচনা করা  
যাক। কয়েকটি পাতলা কাঠের পাতের  
মাঝে প্রয়োজনমত আঠা দেওয়ার পর তাদের  
বাষ্প স্ফারা উত্তপ্ত দৃষ্টি ইস্পাতের প্লেটের

মাথো রেখে মাথোঁ চাপ দেওয়া হয়। এই উপায়ে প্লাইউড গঠন সম্পূর্ণ হতে অর্থাৎ তার অন্ততম পর্যন্ত প্রয়োজনীয় উত্তপ্ত হতে কয়েক ঘণ্টা হতে কয়েক দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। সময়ে সময়ে প্লাইউডের ভেতর অবাধ নির্দিষ্ট পরিমাণ উত্তপ্ত হওয়ার বহু পূর্বেই বিহারাংশের আঁধার প্রয়োজনীয় উত্তাপ পাওয়া শেষ হয়ে যায় যার দরুন প্লাইউডের স্থলস্থ এক ইঞ্চির বেশী করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু বেতার রশ্মি একই সময়ে অন্তর ও বাহির উত্তপ্ত করছে, তাই এখন যে কোন আকার, আয়তন এবং স্থলস্থবিশিষ্ট প্লাইউড তৈরী অসম্ভব হয়নি। আর এই উপায়ে সময়ও লাগে অল্প। সে প্লাইউডের নৌকা তৈরী করতে আগে সময় লাগত প্রায় ছয় মাস এখন বেতার রশ্মির সহযোগিতায় তাহা মাত্র ছাব্বিশ দিনে সম্পূর্ণ হচ্ছে। অনেক শুনলে হয়ত আশ্চর্য হবেন যে বিটেনের সুবিখ্যাত বোমারু বিমান মস্কুইটো এই প্লাইউড হতেই প্রস্তুত হয়েছিল। Sea-plane-এর দু' পাশে ঝোলানো দু'টি সমতাক্রমিক নৌকা সাধারণতঃ এই প্লাইউডেরই তৈরী।

আজকাল প্লাস্টিক শিল্পে বেতার-রশ্মি খুব ব্যবহৃত হচ্ছে। প্লাস্টিককে শুকনো করার সময় প্লাইউডের মত সমস্যাই দেখা দেয়। একটু বড় আকারের প্লাস্টিকের চাদর অন্য উপায়ে শুক করতে গেলে উহার অন্তর ও বাহিরের উত্তাপের অসমতার দরুনই উহা অবাধার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু বেতার-রশ্মির সাহায্যে সমস্যার সমাধান হয়েছে।

এবার ইস্পাত-তৈরী প্রভৃতি সহজাত শিল্পে বেতার রশ্মি ব্যবহারের কথা বলব। বেতার-রশ্মি নিয়োজিত-তাপ বর্ধক যন্ত্রের সাহায্যে প্রায় নৈড ইঞ্চি মোটা ইস্পাতের শ্লেটের উত্তাপের মাত্রা অন্তত ২৭০০° ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায় মাত্র আট সেকেন্ডে। আকারে একটি সাধারণ বেডিং সেটের মত বস্ত্র ঘণ্টায় পাঁচ টন ইস্পাতের খণ্ড নিয়ে কাজ করতে সক্ষম। খণ্ডগুলি যখন বোরিং আসে তখন তার একদিকে থাকে সম্পূর্ণ ঠান্ডা আর অপর দিক হয় লাল টকটকে। এই যন্ত্রের একটি মস্তবড় সুবিধা হল এই যে অতি অল্প সময়ে প্রয়োজনীয় একটি নির্দিষ্ট অংশ-বিশেষ উত্তপ্ত করা সম্ভব। আর ঐ উত্তপ্ত অংশটুকু যখন হঠাৎ জলে ডুবিয়ে ঠান্ডা করা হয় তখন তা একটি অতি কঠিন ইস্পাতে পরিণত হয়। এই উপায়েই স্ক্রুর মাথা গিয়ারের দাঁত, ইঞ্জিনের সিলিন্ডারের অস্থ প্রভৃতি অল্পে কঠিন ও মজবুত করা হয়। আবার বেতার রশ্মির ব্যবহারে প্রস্তুত মোটর, লরী ও উড়ে জাহাজের যে রবারের টায়ার তৈরী হচ্ছে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তা অধিকতর

মজবুত ও টেকসই হচ্ছে। আর এই উপায়ে টায়ার তৈরীর কাজে আগের চাইতে সময় লাগছে ৪/৫ অংশ কম। আমেরিকার ফায়ার-স্টোন কোম্পানী তাদের কারখানার আজকাল মোটর ও রেলগাড়ীর আসন তৈরীর কাজে বেতার রশ্মি ব্যবহার করছেন।

খাদ্য এবং ঔষধ তৈরীর কাজেও বেতার-রশ্মির ব্যবহারে অতিশয় সফল পাওয়া গেছে। পেনিসিলিন শুকনো করতে আগে সময় লাগত চব্বিশ ঘণ্টা, আর বেতার রশ্মির সাহায্যে সেই সময় কমে দাঁড়িয়েছে দশ মিনিটে।

উত্তাপ উৎপাদনের এক একটি নতুন নতুন আবিষ্কার মানুষের সভ্যতাকে কয়েক ধাপ করে এগিয়ে দিয়েছে সন্দেহ নেই। উত্তাপ

বর্ধনের জন্য আগুন, রাঁধার জন্য আগুন, যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদনের জন্য আগুন—মানুষ আগুনের ব্যবহার করেছে সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন স্তরে। মানুষ অগ্নির পূজা করেছে, বসিয়েছে দেবতার আসনে। আমাদের যুগে বেতার-রশ্মি উত্তাপ বর্ধনের কাজে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য মানব সভ্যতার বেশ কয়েক ধাপ অগ্রগতি হয়েছে। শিল্পজগতে বেতার-রশ্মির আবির্ভাব একটি পরম বিস্ময়। বেতার রশ্মির ব্যবহারে শিল্পজাত দ্রব্যের দাম গেছে কমে, প্রাচুর্য গেছে বেড়ে। বেতার রশ্মি ব্যবহারে শিল্পজাত দ্রব্যের প্রস্তুতপ্রণালী হয়েছে সহজ, সরল, সুন্দর ও সূক্ষ্ম আর কর্মীরা পেয়েছে আরাম। বেতার রশ্মির ব্যবহারেই বহু নতুন শিল্পের হয়েছে পত্তন, হয়েছে উন্নতি। বেতার-রশ্মির জয় হোক।

কাশি  
ও  
সর্দিতে

সি রোলিন  
"রচি"

পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহৃত হয়

# গোলাম সৈনিকের চোখে স্বাধীনতা যুদ্ধ

★ শ্রীকৃষ্ণ কুমার পাল ★

(৪)

কাংগলা ছেড়ে ৪১ নং হাসপাতালে যখন আসি তখনও আমাদের কোন Fighting Regt. সেখানে ছিল না। কোহিমার পতনের পরক্ষণেই যে কাংগলার ওপর শত্রুর সুনজর পড়বে তা বোধ হয় বড় কর্তারা ঠিক ধরতে পারেন নি। ফল হল, আমরাই তখন আশ্রয়স্থান কাজে লেগে গেলাম।

হাসপাতাল শব্দ নামে মাত্রই হাসপাতাল ছিল। রোগীদের বহু আগে থেকেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানকার ব্যারেক ও তাঁবু আমাদের লোকের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। বহু কষ্টে তাঁবু খাটানো গেল। তাঁবু যে নিরাপদ নয় তা সবাই বুঝেছি। রাত্রে গোলা-বারুদের ধ্বংস অনিবার্য। মরিচা বাতীত বাঁচার কোন উপায় নেই। অথচ অন্ধকার এদিকে ঘনিষ্ঠ এসেছে। তাই সে রাত্রের মত মরিচা খোদার যুক্তি বাব দেওয়া গেল।

বিকাল ৬টা থেকে সকাল ৫টা পর্যন্ত পাহারা বাতীত তাঁবুর বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ হল। তখন রাত ৮টা। শত্রুপক্ষের একটা রাইফেল-গুলীর আওয়াজ কানে এল। আমাদের পক্ষ থেকে তখনই সে আওয়াজ লক্ষ্য করে হাজার হাজার গোলা বর্ষিত হল। টারগেটের কোন খোয়ালই নেই, তবু গুলী চলেছে। এরকম আধ ঘণ্টা গুলী ছোড়ার পর সবাই নিস্তব্ধ। আবার শত্রুপক্ষ থেকে দ্বিতীয় আওয়াজ হল। যেই আওয়াজ, সেই কাজ। আমাদের বীরগণ হাজারে হাজারে গুলী ছোড়লেন। আমাদের যারা পাহারায় ছিল, তারা সবাই তো বুনো সৈনিক কিনা! প্রাণের ভয় তাই অতান্ত বেশী। শত্রুর থেকে আওয়াজ হতে না হতেই টারগেটের ভোয়াল না রেখে হাজার হাজার গুলী চালায়। এগু চুৎ রহস্য অতি সোজা—“তুমি বেই হও বাপু, তোমাকে আর আসতে দেব না।” তাতে ফল হত এই, শত্রুর এক গুলীর জন্যে আমাদের হয়ত পনের হাজার গুলী নষ্ট হয়ে গেল। আর শত্রুরও বঝতে বাকী রইল না, আমরা কোন শ্রেণীর যোদ্ধা। ৪ তারিখ রাইট অর্নি করেই কেটে গেল। বিশেষ কিছু ঘটল না।

৫ তারিখ ভোর থেকে সবাই কাজে বাস্তব।

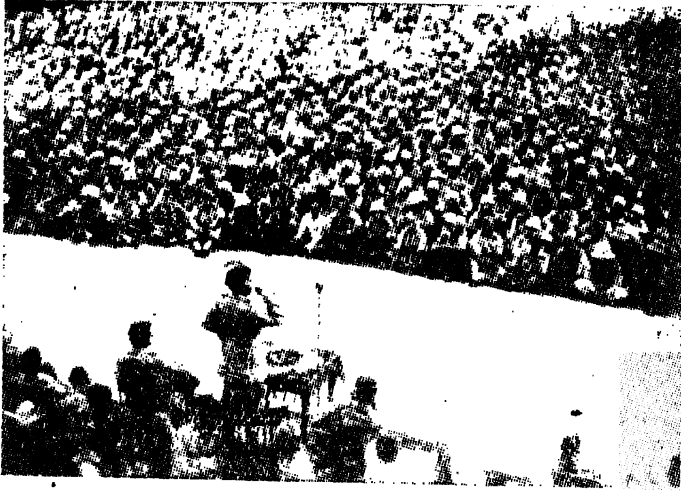
কারো হাতে ‘বেলচা’, কারো হাতে ‘গায়াত’, আবার কারো হাতে ‘শাবল’। সবাই মরিচা করছে। হাজার হাজার গোলা-বারুদের মাঝে একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়স্থল মরিচা। আমি কে পতা জলিল সাহেব ও পেঠিয়েন মাল্লাই মিলে একটি মরিচা করেছিলাম। সে কি কষ্ট! সৈনিকের কথা ভুলব না। পায়ে পড়েছে ফোসকা—তবু মাটি কেটে যাচ্ছি।

মরণের মুখেও যে মানুষ ‘হলে বলে কলে কৌশলে’ বেঁচে থাকতে চায়, তার সাক্ষী আমি নিজে। সামান্য দু ইঞ্চি পরিমাণ একটি বুলেট যাকে ধরাশায়িত করতে পারে, তার বেঁচে থাকার অদম্য উৎসাহ দেখলে তখনকার মত সে দৃশ্য উপভোগ করা যায়। মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। সে বলে—“মরিতে চাই না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচবারে চাই”—কীর্তির ভেতর দিয়ে বেঁচে থাকার অর্থ ছেড়ে যদি ঐ কীর্তির বাহ্যিক ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে সেই অসংখ্য মরণাস্থের সম্মুখে বেঁচে থাকার প্রয়াসকে বাহবা না দিয়ে পারা যায় না। সাবাস ভাই মানুষ! তুমি বেঁচে থাকো। মরণের সাথে হাতাহাতি করেও বেঁচে থাকো। গাঙ্গুলী যখন তার ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কাদিতে থাকল, তখন আসন্ন বিপদের মুখেও হাসি ধরে রাখতে পারলেন না। সবাই বাঁচতে চায়। কারো হয়ত ছেলেমেয়ে,



নেতাজী লিঙ্গাপুরে অভিযান. গ্রহণ করিতেছেন





সিংগাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক রূপে নেতাজীর প্রথম বক্তৃতা

কারো বা স্ত্রী, কারো বা বিষয়-সম্পত্তি। একটা না একটা আকর্ষণ লেগেই আছে। তাকে বাচিতেই হবে। অথচ মরণ এদিকে হাতে ধরে তাকে টানছে। দু' মিনিট আগে যার সাথে কথা বলেছি, তাকে দু' মিনিট পরই চোখের সামনে মরতে দেখে বেঁচে থাকার প্রাসকে শূন্য পাললাম বলেই মনে হয়। চোখের সামনে অসংখ্য মৃত্যু দেখে দেখে এ ধারণা বশমূল হয়ে গেছে যে, মরণ যৌদিন আসবে, সৈনিক আমাকে মরতেই হবে। শত চেষ্টাও আমাকে আর ধরে রাখতে পারবে না। Cowards die many times before their death—এরকম বেঁচে থাকার কোন সাধকতা নেই।

আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সন্তানগণের অমর কাহিনী সবাই জানেন। তাদের সাথে ব্রিটিশ ভারতীয় সৈনিকের তুলনা কত হাস্যাস্পদ! ওদের ছিল 'জীবন-মৃত্যু' পায়ের ভূতা চিত্ত ভাবনাহীন—, আর আমাদের? সদা মৃত্যু ভয়; এই বুঝি মরে যাই! ওরা এসেছিল যুদ্ধ করতে, ৪০ কোটির দাসত্ব শৃঙ্খল মোচন করতে; আর আমরা গিয়েছিলাম চাকরি করতে। ওদের শেষ সম্বল ছিল ঘাস, গাছের লতাপাতা আর আমাদের? মার্টিন, গ্যাণ্ড, হুইলস্ক, রায়ম! শুধু-স্বাচ্ছন্দ্যকে বর্জন করে ওরা বরণ করেছিল দুঃখকে, আর আমরা শত বিপদের মাঝেও আরামকে খুঁজে বেড়িয়েছি। উভয়েই ভারতীয় সৈনিক। তবু কেন এরকম রাতদিন তফাৎ? ওরা শুনেনি নেতাজীর অমোঘ বাণী—

"Hark! India is calling! India's metropolis, Delhi, is calling; three hundred and eighty-eight millions of your countrymen are calling. Blood is calling to blood."

৫ তারিখ রাত সাতটা থেকেই গোলাগুলি চলতে থাকে। শত্রুর আগের মতই একটা গুলি

ছুড়ে বসে থাকে। তারপর আমাদের হাজার হাজার গুলি বর্ষিত হয়। এমনি করেই সারারাত কেটে গেল। উল্লেখযোগ্য কিছুই আর ঘটেনি। দিনের বেলা সবাই নীরব নিস্তব্ধ। গোলা-বারুদের নাম-গন্ধও নেই। আমাদের তিন দিক পাহাড়ে ঘেরাও ছিল। এসব পাহাড়ের ওপর থেকেই শত্রুরা গুলি ছুড়ত। দিনের বেলা পাহাড়ের দিকে তাকালে কেমনতর একটা আতঙ্কের আভাস পাওয়া যেত।

৬ তারিখ রাতে তুমুল যুদ্ধ চলল। আমরা ট্রেণের ভেতর থেকে শূন্যে পেলাম Carry on Johnny, Carry on." আমাদের ইউনিটের পাহারারত গোরা সৈনিক হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আর বলছে "Carry on." রাতি ৪টার পূর্ব পর্যন্ত রাইফেল, টম গান ও এল এম জি'র (Light Machine Gun) আওয়াজ শুনিয়ে। কিন্তু রাত ৪টা থেকে প্রায় ৫টা পর্যন্ত শত্রুরা মরটার বোমা ছুড়েছে। ওগুলো ছোড়ার সময় আতস বাজীর হাওঁর মত ফিস করে শব্দ হয় এবং লক্ষ্যস্থলের ওপরে এসে বোমার মত আওয়াজ করে ফেটে যায়। শত্রুর লক্ষ্যস্থল আমাদের তাবুর হাজার গজ সামনে ছিল। তাই মরটার বোমা বিস্ফোরণের সাথে সাথে আমাদের তাবু কেঁপে উঠত। ৬ তারিখ রাতে চার-পাঁচটা বোমা ছুড়েছিল। প্রতিবারেই মনে হত, এবারে বোধ হয় আমাদের তাবুতেই পড়ল। বহু ভাগ্যের ফলে বেঁচে গেলাম।

সকাল সাতটায় চা খেতে যাব, এমন সময় একজন বন্দু এসে খবর দিলেন, "শুনছে? কাল রাতে বুঝি একটি জাপানী মরেছে। আমাদের ইউনিটের ভেতর দিয়ে ও হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক তখনই একজন জমাদার

সাহেব ওকে গুলী করে মেরেছে।" চা খাবার আগেই মৃত জাপানীকে দেখার কৌতূহল জাগল। সে কি বিকট অবস্থা! সারা গায়ে রক্ত। তার কাপড়-চোপড় ও বুট দেখে মনে হল গত ছয় মাসেও বোধ হয় সে সাবান ও গ্রাস ব্যবহার করেনি। গোলা-বারুদ ছাড়া পোষাক-পরিচ্ছদের বলাই ওদের নেই। আমাদের আবার ঠিক উল্টো। ওরা Lightly dressed—Heavily armed, আর আমাদের বেলা Heavily dressed—Lightly armed. কাপড়-চোপড় খুঁজে ওর জামার পকেট থেকে একটা মণিবাগ পাওয়া গেল। তাতে ছিল কিছু টাকা, আর স্মৃতির শেষ সম্বল একখানা গ্রুপ ফটো। ফটো দেখে মনে হল দু'নিয়ার বৃক থেকে বংশ তার লোপ পায়নি। বৌ ও ছেলেমেয়ে সে রেখে গেছে।

জাপানী বধ করে শেবাংগ বন্দুর দু'একজন একটু বীরত্ব জাহির করতে কসর করেন নি। আমি কিন্তু তখনই বলেছিলাম—"Be ready for to night. We may be paid back in our own Coin." আমার কথা— আশংকা ফলে গেল। ৮ তারিখ সকাল বেলা খবর এল, আমাদের দু'জন গোরা সৈনিক মারা গেছে। ৫।৬।৭ তারিখ দিনের বেলা কোন পক্ষ থেকেই গোলা-বারুদ ছোড়া হয়নি। কিন্তু ৮ তারিখ সকাল ৮।৯টায় মনে হল, আজ বোধ হয় দিনের বেলায়ই জাপানীরা আক্রমণ চালাবে। একটু পর পরই এল এম জি'র তওয়াজ কানে আসতে লাগল। বড় কতারা প্রমাদ গণলেন। বেলা ১১টায় হুকুম হল, জিনিসপত্র সব রেখে আমরা পায়ে হেঁটে ইম্ফল যাব। ইম্ফল সেখান থেকে মাত্র ১৭ মাইল। আমরা একটা হেভার-সেককে সম্বল করে ইম্ফলের দিকে রওয়ানা হলাম। আর যাবার সময় এ ধারণা বশমূল হয়ে গেল যে, দিন দুই-তিনের ভেতর ইম্ফল শহরে শত্রুর সাথে আমাদের মোলাকাত হবে।

(৫)

কাংগলা থেকে মবা পায়ে হেঁটে রওয়ানা হয়েছি। সবার মুখেই অসহায় ভাব। পরাজয়ের গ্লানি অপবাদ আমাদের মর্মে মর্মে বিম্ব করছে। পা যেন চলেও চলে না। পাঁচ-ছয় মাইল হাওয়ার পর একখানা রেশন গাড়িতে আমি, জীল সাহেব ও আরো দু'তিন বন্দু উঠে পড়লাম। কাংগলা থেকে জীবনের মায়ায় বে যেদিকে পেরেছে পালিয়ে গেছে। বেশীর ভাগই রাজপথ দিয়ে পায়ে হেঁটে ইম্ফল চলে গিয়েছে।

বিকাল চার-পাঁচটায় ইম্ফল পৌঁছলাম। কাংগলা থেকে রওয়ানা হবার আগে আমরা শুনিয়েছিলাম, ইম্ফলই আমাদের গন্তব্যস্থল। ইম্ফল পৌঁছে কারো কোন খবর পেলাম না। বাধা হয়ে রেন্ট ক্যাম্পে গিয়ে অতিথি হতে হল। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। খাওয়া-দাওয়া মোট-



সিঙ্গাপুরে প্রথম অবতরণের পর নেতাজীরা আজাদ হিন্দ ফৌজ পরিদর্শন

মুঠি হল। শরীরটা তখন বিশ্রামের জন্য উন্মুখ। কিন্তু ঘুমোব কোথায়? জায়গা নেই, কাপড়-চোপড় কিছই নেই। বহু কষ্টে তাঁবুর দু'খানা কাপড়ের দেয়াল খুঁজে পাওয়া গেল। আমাদের দলে তখন সাত-আটজন। দেয়ালের একখানা নীচে ও একখানা ওপরে দিয়ে সে রাতের মত শুয়ে পড়লাম। আকাশ ছাদের নীচে রাতটা কেটে গেল। সৈনিক জীবনের নিখুঁত ছাঁচের আরো একটা আভাস পেলাম।

পরাদিন সকাল বেলা বন্ধুদের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। ওরা সবাই ইক্ষফলের কাছে ছিল। তবে রাজপথ থেকে কিছু দূরে। ইক্ষফল থেকে দু' তিন মাইল তফাৎ। চারিদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা। অতি কাছে ছিল 4th. Corp-এর হেড কোয়ার্টার্স। সকাল নয়টায় গিয়ে দেখি, পাহাড়ের নীচে ছোট এক মাঠের ধারে বন্ধুরা আস্তানা গেড়েছেন। রাতে তাদের খাওয়া-দাওয়া হয়নি। তার ওপর আতংক। মুখ শুকিয়ে গেছে। কেউ এখানে, কেউবা ওখানে শুয়ে আছেন।

শিবের সাথে ওখানে দেখা হল। আমাদের কাংগলা ছাড়ার আট-নয় দিন আগে গোলা-বারুদের কাজে শিবরা এখানে চলে এসেছিল। আমাদের বীরত্বের কাহিনী ওরা মন দিয়ে শুনল। আমরাও ইক্ষফল-বার্তা তাদের কাছ থেকে পেয়ে গেলাম।

আমাদের নতুন আবাসে পেশ্চিয়ার পর থেকেই মণিপুরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। ভগবানেরই ইচ্ছে। নইলে এ বছর এত আগে বৃষ্টি নামবে কেন। আমাদের ছত্রভঙ্গ অবস্থায় সেখানে বিশেষ কোন কাজ রইল না। Ordnance Store এর বহু জিনিসপত্র কাংগলাতে শত্রুর হাতে ফেলে এসেছি। শূন্য গেল, মণিপুরে যারা

অকেজো হয়ে পড়েছে, তাদের সবাইক বিমান-যোগে জেডহাট, সিলেট এবং কুমিল্লা—এই তিন জায়গায় পাঠান হবে। এরকম অনর্থক বিপদের সম্মুখীন না হয়ে পালিয়ে আসতে সবাই ছিল উদগ্রীব। কিন্তু পালিয়ে আসার আগেই ইক্ষফলের পতন আসন্ন ছিল। তাই যুদ্ধবন্দী হওয়ার ভয়ে সেই পালিয়ে আসাকে নিয়ে দিল খুলে কেউ হাসতে পারত না। ৮ এপ্রিল কাংগলা ছাড়ার পর আমাদের বন্ধ ধারণা ছিল, ১২।১৩ এপ্রিলের ভেতরই ইক্ষফল শত্রুর হাতে চলে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বৃষ্টি নেমে আসায় বীর আজাদী সৈনিকগণ আর এগিয়ে আসতে পারল না। সেই বিশেষপূর্বের যুদ্ধ—যারা দেখিনি, যারা গোলা-বারুদের আওয়াজ কানে শুনিনি, তারা কল্পনাই করতে পারবে না। একদিকে গুর্খা, অন্যদিকে আজাদী সৈনিক—

তুমুল যুদ্ধ চলছে। সম্ভার পর থেকে গোলা-বারুদের আওয়াজ শুনতে কল্পনা করা যেত না, ঐ শব্দ মেঘ গর্জনের না যুদ্ধের। ওঃ! সে কি অবস্থা! তবে তখন আমরা শুনছিলাম 17th. Division গুর্খাদের সাথে জাপানীরা লড়াই। আমাদের জানা ছিল না ঐ নিঃপনদের মাঝেও আমাদের বীরগণ লড়াই—আমাদের জানা ছিল না ভারতমাতার বীর সৈনিকগণ Gateway to the plains of Assam এর জন্যে প্রাণপণ লড়ে চলেছেন—আমাদের জানা ছিল না ঐ ইক্ষফলের জয় পরাজয়ের ওপর তাদের সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে—আমাদের জানা ছিল না তাদের প্রেরণার উৎস ছিল—

"There, there in the distance—beyond the river, beyond those jungles, beyond those hills lies the promised land, the soil from which we sprang—the land to which we shall now return."

আজ যুদ্ধ অবসানে আজাদী ফৌজের বহু কাহিনী বেরিয়েছে এবং আমিও নিজের চোখে যা দেখে এসেছি তা থেকে গুর্খাদের সম্পর্কে দু'একটা কথা বলতে চাই। ভারতে সামরিক জাতি বলতে আমরা পশ্চিমবাসী এবং গুর্খাদের কথাই বুঝি। কিন্তু এই যে গুর্খা—তারা তো ভারতবাসী বলে পরিচয় দিতে চায় না। ভারতবর্ষ পরাধীন, এবং নেপাল স্বাধীন বলে নাকি? দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলছি—গুর্খা এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোক নিয়েই Indian Army। আমিঁতে অফিসারদের নীচে যারা আছেন তাদের Other Ranks বলা হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে একই Indian Armyতে আমাদের বলা হত Indian Other Ranks এবং গুর্খাদের বলা হত Gurkha Other Ranks। যেন ওদের একটা স্বতন্ত্র Nationality। এ শব্দ যুদ্ধে এসেই শুনলাম। ডিসিপ্লিনের জন্য গুর্খারা ভারতে



নেতাজী কর্তৃক সিঙ্গাপুরে আজাদনামা শহীদগণের উদ্দেশ্যে পুষ্পমালা দান

সবার ওপরে স্থান পাবে। এরকম রাজভক্ত আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। নমস্য ঐ জাত। তবু যেন ওদের একটু সমালোচনা না করে পারছি না। গুর্খারা ভারতবাসী না হয়ে আলাদা জাতি বলে নিজের পরিচয় দিয়ে যদি বাহাদুরি নিতে চায় তাতে ভালমন্দ বিচার করার আমার কিছুই নেই। কিন্তু মন্তব্য করার যথেষ্ট আছে। গুর্খা সৈন্য ও অফিসারদের সাথে আমি খুব মেলোমেশা করেছি। এরকম সরল জাত খুব দুর্লভ। তাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে অনেকেই নিজের স্বার্থ আদায় করতে পারে। বিংশ শতাব্দীতে এরকম সরলতার মূল্য কতটুকু এবং রাজনীতিতে তার স্থান কোথায়? তাই ভাবি, নৈতিক চরিত্র ও সরলতার সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক পরিচালনা না করলে ফল পাওয়া যায় না। সরলতার শৃঙ্খল অপব্যবহারই হয়। গুর্খাদের শৌর্য বীর্য এবং কৃতিত্বের পরিচয় এবারের যুদ্ধে বার্মা এবং মণিপুর্ হ্রস্টে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাকবে। নিম্পন সৈন্যদের সমকক্ষ বলে তারা বেঁচে থাকবে দুনিয়ার বৃকে। গিরীলা যুদ্ধে গুর্খারা যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে তা ১৮নং সৈন্য বাহিনীর ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। ভারতবাসী বলে যদি স্বাধীন ভারতেও তারা ঐ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে তবে আমিই তাদের বাহাদুরি দেই। ভারতমাতা জাতির ইতিহাসে তাদের স্থান করে রেখেছেন। সে স্থান তারা অধিকার করুক এটা সবাই চায়। তারা বলুক তারা ভারতবাসী। গুর্খা, শিখ, পাঞ্জাবী, বাঙালী, মারাঠী—পরের কথা। জাতির কাঠামকে প্রথমেই গড়ে তোলা চাই, তারপর অন্য সব কিছু। আমরা ভারতবাসী—এই বাণীই মূর্ত হয়ে উঠুক সবার প্রাণে।

এপ্রিল প্রায় শেষ হয়ে এল তবু ইম্ফলের পতন হল না। যারা জার্মান সৈন্যের মত দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছিল হঠাৎ তাদের থেমে যাওয়ার কারণ কিছু বোঝা গেল না। তবে কেউ কেউ বলল, জাপানীদের Reinforcement আসেনি। সৈন্য সামন্ত ও গোলাবারুদ পর্যাপ্ত পরিমাণে এলে ওরা আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আমাদের ক্যাম্পের কাছেই একটি বিমান-ঘাঁটি ছিল। চারিদিক শত্রুর ঘেরাও করেছে বলে সবাই তখন একত্রিত। ঐ বিমান ঘাঁটির আশপাশেই গোলা বারুদ ও খাদ্য সরবরাহের ডিপো ছিল। ইম্ফলকে কেন্দ্র করে ১৫।১৬ মাইল রেডিয়াস নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকলে যতবড় হবে আমার মনে হয় ঠিক ততখানি জায়গায় আমরা সীমাবদ্ধ ছিলাম। শত্রুর উড়ে জাহাজ প্রায়ই আনাগোনা করত। একটি, দুটি, তিনটি করে বহু দিনই এল, কিন্তু বোমা ফেলল না।

মে মাসের প্রথম সপ্তাহের ভেতরই

অকেজো সবাইকে ইম্ফলের বাইরে নিয়ে আসা হয়। ইম্ফল থেকে বিমানগুলো ওদের নিয়ে যেত এবং ফেরার পথে রেশন নিয়ে আসত। আমাদের ইউনিটের প্রায় এক হাজারকে নিয়ে যাওয়া হল। বাকী পাঁচ শ' ইম্ফলেই থেকে গেলাম। এই সময়েই শিব, সেন দা, বিম্বাস, ভূঞা ও গাঙ্গুলীর সাথে বন্ধুত্ব ঘনিষে ওঠে। A friend in need is a friend indeed! সবার সামনেই বিপদ—তাই বন্ধুত্ব আরো বেড়ে উঠল। মরিতো সবাই মরব—বন্দী হই তো সবাই এক সাথে বন্দী হব।

মে মাসের মাঝামাঝি শূনা গেল শত্রুরা কাংগলা ছেড়ে চলে গেছে। একদিন জমাদার মিশ্র সাহেব আমাকে বললেন—

“বাবুজি, আপনি শোনা? জাপানী ও আওরাত লোক ইদার লড়াই করনেকে লিয়ে আয়া।”

আমি বললাম—“মেরা খেয়াল ইন্লোক নার্স ইয়া ওরাক (W A C) বাগেরা হোগা।”

আফসোস! এরাই যে আমাদের বীর ভগ্নি ঝাঁসির রাণী বাহিনী ছিল তার নাম গম্ভ ও আমরা জানতে পারিনি। নেতাজীর ম্যাজিক স্পর্শ পেয়ে এরাও যে যুদ্ধ বিদ্যা শিখে ইম্ফলের জঙ্গলে এসেছিল—মাতৃভূমিকে বিজয়ের মালা পরিয়ে দিতে—তা কল্পনাও করতে পারিনি। '৪৫ সালে জাপানের আত্ম-সমর্পণের পর যখন সিংগাপুরে যাই তখনই শৃঙ্খল ঐ রাণী বাহিনীর অমর কীর্তি শুনতে পাই। শ্রদ্ধাযাত্রার তাদের শতবার নমস্কার জানিয়েছি। ঝাঁসি রাণী বাহিনীর ক্যাম্প উন্মোচন করতে গিয়ে নেতাজী বলেছিলেন—

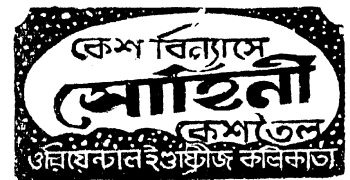
“You have just now heard the brave words of the commandant of the Rani of Jhansi unit at Shonan. She expressed their determination to work ceaselessly day and night to get prepared for the onward march to Delhi. I feel joyous at hearing that slogan ‘On to Delhi’ from our sisters as I have been hearing from our brothers.”

ঝাঁসির রাণীরা তাদের এই প্রতিজ্ঞা

অক্ষরে অক্ষরে ফালিয়েছেন। \* বীর রমণীগণ, তোমরা অমর হয়ে বেঁচে থাকো, ভগ্নিভের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে। তোমরা আমার চির নমস্যা!

শত্রুরা পেছন হটার সাথে সাথে ওদের গোলা বারুদ, ঔষধপত্র কিছু কিছু পাওয়া গেল। ঐসব যোগাড় করে আমাদের ইউনিটে নিয়ে আসা হয়। সৌভাগ্যক্রমেই হোক—আর দুর্ভাগ্যক্রমেই হোক—এ Enemy Equipment-এর চার্জে আমাকে নিযুক্ত করা হল। আমার কাজ ছিল ওগুলোকে বাছাই করে, প্যাক করে বিমানযোগে মরীচটে পাঠিয়ে দেওয়া। মরীচটে বুদ্ধি ঐ সব নিয়ে গবেষণা করা হবে। একদিন কতকগুলো জাপানী পত্রিকা পেয়ে গেলাম। ক্যাপ্টেন সাহেব আমাকে বললেন—“ওগুলো তোমাদের মেসে নিয়ে জবালিয়ে ফেল।” লাইনে নিয়ে এসে পত্রিকা-গুলো উল্টাতে গিয়ে নেতাজীর তিনখানা ছবি পেলাম। সবই সিভিল পোষাকে। কিছুই বুদ্ধির সুযোগ ছিল না। জাপানী হরফে লেখা পত্রিকা। তখনকার মত যা দুর্বোধ্য ছিল আজ তা স্কটিকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে। শত্রুর এইসব জিনিসপত্র দিয়ে ইম্ফল রাজদরবারে একটা প্রদর্শনী করা হয়। আমি তখন হেসেছিলাম। আর আজ?

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত)



আই, এন, দাস  
(আর্টিস্ট)

কটো এন্লাজমেন্ট, ওরটার কলার ও অয়েল পোর্টিং কার্বে সুন্দর, চার্জ সুন্দর, জনাই সাক্ষাৎ করুন বা পর লিখুন।  
৩৫নং প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কলিকাতা।

# ডি ডি টি

DIP ৪১৮

## নিওসিড

মানুষের কোনো  
খাতি করে না, কিন্তু

সিপড়ে, তারুশলা, ছারলোকা,  
বইএর পোক ইত্যাদির সঙ্গে  
একেবারে মারাত্মক।

১০% ডি ডি টি মেশানো

গাইগি ইনসেক্টিসাইডস্ লিট, বোম্বাই

মুদ্রা পরিদপ্তর



## একটি রাতের করুণ কাহিনী

এটি Marya Rodziewicz-এর A night's tragedy গল্পের অনুবাদ। লেখিকার বাড়ী পোল্যান্ডে। ও দেশে তাঁর লেখার খুব আদর। গল্পটি পড়লেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাবে।]

চাঁরিন্দিক থম্ থম্ করছে। সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ, একটি একটি করে তারা আকাশের গায়ে ফুটে উঠছে। মাঠের কাজ সেরে চাষীরা যে যার ঘরে গেছে। তাদের কুঁড়েঘরগুলোয় অল্প অল্প আগুন জ্বলছে। মে মাসের একটি দীর্ঘ দিনের শেষ—এখন অল্প অল্প শিশির পড়ছে, পরিশ্রান্ত পৃথিবীর কপালে যেন বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। সারাদিনের কাজের পর চাষীরা গানবাজনা করে একটু স্মৃতি করছে। গ্রামের ভেতরকার নদীটাই কেবল একইভাবে বয়ে চলেছে। শেষ-প্রান্তের কুঁড়েঘরটার আগুনের প্রতিফলন হচ্ছে নদীটার বকে—কে যেন আবার গুলে জায়গাটাকে রাঙিয়ে দিয়েছে। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে একটি গানের রেশ ভেসে আসছে।

কুঁড়েঘরটির ভেতর চারজন লোক বিশ্রাম করছে। একটি আধবুড়ো চাষী আধশোয়া অবস্থায় পাইপ টানছে। তার স্ত্রী আলদুর খোসা ছাড়াচ্ছে। আগুনের ধারে একটি মেয়ে মাথার পিছনে হাত রেখে দাঁড়িয়ে গান গাইছে আর জানলার ধারে একটি যুবক সেই গানের সঙ্গে বেহালা বাজাচ্ছে। মেয়েটি একটু সামনে বকে আছে আর মাঝে মাঝে যুবকটির দিকে বিজোল কটাক্ষ হানছে। মেয়েটিকে আর কিশোরী বলা চলে না। তার চুলগুলো একটা রুমাল দিয়ে চাষীদের কেতায় কান অবধি টেনে ঝাঁধা। ওর পরণে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ—তাতে কোনো আড়ম্বরের চিহ্ন নেই। মেয়েটির বয়স বেশী নয় আর ও পরমাসুন্দরী—ওর চোখ দুটি কৃষ্ণকালে আর টানটানা বড়; গায়ের রং উজ্বল শ্যামবর্ণ। বেশ লম্বা দোহারা গড়ন আর ওর হাবভাবে যেন বুনো জানোয়ারের স্বাভাবিক শ্রী রয়েছে। মেয়েটি ঐ একই ভাবে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ গান গাইলো। মাঝে মাঝে সে মিনিট মোহিনী হাসি হাসছে, কখনো বা অর্ধপূর্ণ চাঁদেতে ছেলেটির দিকে চাইছে, ওর ঠোঁট দুটিও যেন ব্যাকুল—এ সবই ঐ যুবকটিকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা।

আগুনের আঁচ পড়ে এসেছে, বয়স্কা স্ত্রী-

লোকটি একবোঝা শূকনো ডালপালা নিয়ে এলো আগুনটাকে জিইয়ে রাখবার জন্যে। এক সময় গান বন্ধ হলো যুবকটি ছড় নামিয়ে রাখলো, তারপর সারাদিনের জুড়ে নামলো নিস্তব্ধতা।

“আর একটা গান করো না?” স্ত্রীলোকটি বললো।

অলসভাবে হাতপা ছাড়িয়ে আর একজন উত্তর করলো “শেষ অবধি তো গাইলুম।”

“কিন্তু বাকীটা? তুমি তো সেই বিয়ের গানটা গাইলে না” যুবকটি হেসে বলল।

“বিয়ের গান?” ও কাধদুটোয় একটা ঈষৎ ঝাঁক দিয়ে অবজ্ঞার সুরে বললো, “সে গানের দরকার তো তোমার আমার দুজনকারই ফুরিয়েছে। ওর কপালে নেমেছে কিসের ছায়া, মাথাটা বকে পড়েছে, হঠাৎ যেন ওর বয়স অনেক বেড়ে গেছে।

“দুঃস্থ ছিলে। তুমি নিশ্চয়ই তোমার গিল্লীর কাছে ফিরে যেতে খুব বেশী ব্যস্ত নও” প্রোড় স্ত্রীলোকটি মৃদু ভৎসনার সুরে বলল।

“না, ওর পালিয়ে চলে যাবার কোনো সম্ভাবনা বা আশংকাই নেই”—যুবকটি বলে ওঠে, ওর কণ্ঠস্বরে শ্লেষ “গাও মেরিউকা, আর একটা গান ধরো।”

মেয়েটি অশ্রুত ভাবে হাসলো, এত জোরে মাথা নাড়লো যে মাথায় বাঁধা রুমালটা পড়লো খুলে, তারপর ধরলো সেই বিয়ের গান। বিয়ের গান হলে কি হয় সুরটা অত্যন্ত করুণ। যুবকটিও সঙ্গে সঙ্গে গাইতে আরম্ভ করলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজাটা কে কেন টেনে খুললো আর তারপরেই শোনা গেল সেই চিরাচরিত সম্ভাষণ “ঈশ্বর ধন্য হউন” সঙ্গে সঙ্গে গান গেল বন্ধ হয়ে। আগন্তুককে দেখতে পেয়ে মেয়েটির মুখ কালো হয়ে গেল। যুবকটি গাফিলে উঠে কতকটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশেই দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা দড়িটা চেপে ধরলো। বয়স্কা স্ত্রীলোকটি ভয়ে অস্ফুট চিৎকার করে উঠলো। একমাত্র প্রোড় চাষী অবিচলিত, সে মাথা নুইয়ে আগন্তুকের সম্ভাষণের উত্তরে বললো “সর্বশেষে ও সর্বকালে।”

লোকটি দরজা ভেঁজিয়ে দিয়ে ঘরের ভিতর এগিয়ে এলো। লোকটির বয়স অল্প, সুন্দর স্বাস্থ্যবান চেহারা কিন্তু মূর্খ বিষয়তার ছাপ।

পরণে জমিদারী পোষাক—ছাই রংএর সুট আর তার ধারগুলো সবুজ। সে যে বনরক্ষকের কাজ করে টুপিটাই তার প্রমাণ। ওর পারে উঁচু বুট জুতো। লোকটির পিঠে শিকারের থলি আর কাঁধে বন্দুক ঝুলছে। সে ওই দুটো খুলে এককোণে নামিয়ে রাখলো তারপর মেয়েটির দিকে ফিরে বললো—“শুভ সন্ধ্যা, মেরিউকা”

“শুভ সন্ধ্যা, জেকব” মেয়েটি একটু উদাসীনভাবে উত্তর দিল।

“শুভ সন্ধ্যা, বাবা মশাই। আর মেরিয়েজ তোমাকে জানাচ্ছি, খবর সব ভাল তো?”

“এই চলে যাচ্ছে, তোমার খবর কি?” প্রোড় জিজ্ঞেস করলো।

“কোনরকমে কেটে যাচ্ছে” জেকব বললো।

“তোমার নিশ্চয়ই খুব ক্ষিধে পেয়েছে”—এতক্ষণে স্ত্রীলোকটি মুখ খুললো।

“না, ভয়ানক ক্লান্ত লাগছে অনেকটা পথ আসতে হয়েছে, এখন আমি একটু বিশ্রাম চাই”—এই বলে সে কপালের ঘাম মুছে ধপ করে একটা বেঁকুর ওপর বসে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘনিশ্বাস। ওর ক্লান্তি বোধ হয় কোন অশ্রুত কারণের জন্যে কারণ ওকে দেখাচ্ছিল ভয়ানক ফ্যাকাশে আর ওর ঠোঁট দুটি মৃত্যুনীল।

“তোমায় দেখে মনে হচ্ছে তুমি ভুত দেখেছো, তোমায় একটা কিছু পানীয় দিই অনেকটা ভাল বোধ করবে”—মেরিয়েজ বললো।

“ভূত? ভূতের চেয়ে ভয়ঙ্কর অনেক কিছু আছে। তা’ ছাড়া আমি আজকাল মদ খাই না, বিয়ের পর ছেড়ে দিয়েছি।”

খানিকক্ষণ কাটলো একটা বিচ্ছিন্ন রকম নীরবতার মধ্যে তারপর জেকব জানালা দিয়ে একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে শূন্য করলো “কি চমৎকার রাত্রি, না? কোন গোলমাল নেই, হেঁ চেনেই, উষ্ণতা লোকের অন্তর অবধি স্পর্শ করছে। আমরা বেশ স্মৃতিতেই বাড়ি ফিরতে পারবো, চমৎকার লাগবে।”

“আজ রান্দিরটা এখানে থেকে গেলে হয় না”—প্রোড় লোকটা জিজ্ঞেস করলো।

“না, না, আজ আমরা বাড়ী ফিরতেই হবে বিশেষ তাড়া আছে, নানা কাজ বাকী, আমি আরো ঘণ্টাখানেক আছি, তারপর চাঁদ উঠলে রওনা হবো।” সে এবার আস্তে আস্তে উঠে

মেয়েটির কাছে গেল—ওর হাতদুটি ধরে বললো, “আমি যখন এলুম তখন তুমি গান গাইছিলে—এখন আর একটি গাও।” জেকব ওকে আদর করছে মেয়েটি বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে; কোন কারণ অবশ্য করছে না কিন্তু নিজের সব শরীরি কাঠের মত শক্ত করে রেখেছে। ও মেরিউকার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে, চোখ দুটি দিয়ে যেন ভিক্ষে করছে, অনুদয় করছে। মেরিয়েজের প্রথমটা একটু হিংসা হয়েছিল—একটু অসচ্ছন্দ বোধ করেছিল; কিন্তু যখন সে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলে তখন পাইপটা ধরিয়ে বাগ্পের হাসি হেসে একটা গান জুড়ে দিল।

জেকব মেয়েটির কাছ থেকে সরে এল—মেরিউকার উদাসীনতায় ওর সর্বাঙ্গ যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে। ও বাধা দিয়ে বলে উঠলো “বাঃ, মেরিয়েজ তুমি চমৎকার গান কর।” মাথাটা হাতের মধ্যে ধরে ও বসে রইলো যেন ঘুমোচ্ছে ওদিকে মেরিয়েজ তখনও স্লেষ করে গান গেয়ে চলেছে। জেকব হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে, গা ঝাড়া দিয়ে বললো “মেরিয়েজ, তোমার গানের জন্যে ধন্যবাদ। মেরিউকা কোনো দিনও আমার কাছে গান গায় না। আমাদের বাড়িতে গান শোনাই যায় না কাজেই খুব ভাল লাগে। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলাটা আমার নিরানন্দেই কাটে। বড়ী মা মাঝে মাঝে অনুযোগ করেন কিন্তু কি কি পোকাকার ডাক আর তার সংগে গাছের সঁা সঁা শব্দের সংগত ছাড়া অন্য কিছু শোনা য় না—এই বলে সে হা হা করে হেসে উঠলো কিন্তু আনন্দের চিহ্নমাত্র নেই। তারপর কোমরের বেগুটা শক্ত করে বাঁধলো, বন্দুকটা হাতে নিল, কপালের ওপর এসে পড়া চুল-গুলিকে পিছনের দিকে চালিয়ে দিয়ে পাইপটায় তামাক ভরতে ভরতে বললো “আমাদের খাবার সময় হয়েছে। মেরিউকা তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।”

“আজ রান্দিরটা এখানেই থেকে যাও না। স্ত্রীলোকটি আবার অনুরোধ করলো।”

“না, আজ রান্দির নৌকো করে যাওয়া খুব সহজ হবে—অনেকটা পথ, তাড়াতাড়ি ভোর হয়ে যাবে, আমাদের এখন রওনা হতেই হয়।”

যশ্চালিতের মতো মেরিউকা উঠলো কিন্তু তার দৃষ্টিতে অব্যাহতা আর একগুয়েমীর ছাপ। কোনো কথা না বলে সে তার জিনিসপত্রগুলো গোছাতে লাগলো আর ওর মা কর্ণপতহস্তে সাহায্য করতে লাগলো। মেরিয়েজ বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে সরে পড়লো। জেকব এক দৃষ্টে আগুনের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

প্রাচ্য চাষী আরম্ভ করলো, “শোনো বাবা, তুমি বশিষ্ঠমান, আমার একটা কথা রেখো, ওকে তুমি কিছু কঠিন শাস্তি দিও না।”

স্ত্রীলোকটি এগিয়ে এসে জেকবের হাত ধরলো, বললো “জেকব, এইবারটির মত ওকে মাপ করো, ওকে মারধর করো না।”

জেকব কোনো কথা না বলে ঘরটির ভেতর দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। মেয়েটি ততক্ষণে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা পুটুলী জেকবকে ওর কোনো ভয়ই নেই বরং ওর চোখে একটা কোঁতুহলী দৃষ্টি।

“পুটুলীটা দাও, ওটা আমি নিচ্ছি”—এই বলে জেকব তার টুপীটা চোখের ওপর পর্যন্ত টেনে দিল তারপর কৃষ্ণকন্দপতীর দিকে ঈষৎ নুয়ে বললো “ঈশ্বর ধন্য হউন।”

“সর্বদেশে ও সর্বকালে! তোমার যাত্রা নিরাপদ হউক” তারা শূভেচ্ছা জানালো।

জেকব প্রত্যুত্তর করলো “আপনারা সুস্থ থাকুন।”

তারপর দরজার একটা মৃদু, কিচ্চকিচ্, আওয়াজ, আবার সব চুপচাপ।

কোনো কথা না বলেই ওরা দুজন এগিয়ে চললো নদীর দিকে ছোটো পায়ে চলা পথ ধরে। মেয়েটি আগে, পরে ছেলেটি। তখন সবে মাত্র চাঁদ উঠেছে। আবেছা আলোয় ওদের ছায়া পড়ছে পিছনে, যেন কোনো অশরীরী আত্মা ওদের পিছন দিয়েছে। পথে অনেকের সঙ্গে ওদের দেখা হল। প্রত্যেকেই মৌখিক ভদ্রতা করে ওদের সম্ভাষণ জানালো। কিন্তু ওরা দুজন পেরিয়ে যেতে না যেতেই শোনা যাচ্ছিলো চাণা হাসি আর ঠাট্টা। দু-এক টুকরো কথাও ভেসে আসছিলো কানে। “দাখো দাখো, বোকা জেকবটা আবার ওর বোকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে। ওর ঘটে কি এটুকুও বশিষ্ট নেই যে এতে কেনো লাভই হবে না। আরে বাবা, ঘুর-ঘুরে পোকা তাড়ানো কি এতই সোজা।” জেকব এই সব কথা শুনতে পেল। লজ্জায় ওর মাথা কাটা যাচ্ছিলো। এই সব হাসি, ঠাট্টা, টিপ্পনীর মূলে যে সে-ই। তবু সে একটি কথাও বললো না।

ওরা হাজির হল নদীটার ধারে। পাড়ের উপর শূন্যে শর ভরাতি একটা নৌকো। মেরিউকা এক লাফে নৌকায় চড়ে শূন্যে ঘুমোবার ভান করতে লাগলো। জেকব নৌকোটা ঠেলে জলে নামালো। হালটা ঠিক করে নিয়ে বৈঠা বাইতে আরম্ভ করলো। প্রথমে সে নদীর অন্য পাড়ের ছোটো ঘন বোপের আড়াল দিয়ে চলতে লাগলো। তারপর এক সময়ে বাঁকের আড়ালে গ্রামটা গেল অদৃশ্য হয়ে। ওরা একা—একেকবারে নিঃসঙ্গ। জেকব ওর কোট খুলে ফেললো, আর বন্দুকটা নামিয়ে রাখলো। নদীতে তখন জোয়ার এসেছে। নদীটা চাঁদের আলোতে ঝলমল করছে। কে যেন ওদের হাওয়ার জন্যে একটা রূপোলি রাস্তা তৈরী করে দিয়েছে। সে এই পথ ধরে নৌকো বেয়ে চললো। বিষম উদাস দৃষ্টি মেলে ও তাকিয়ে আছে, দূরে বহুদূরে। নদী থেকে একটা জোলা স্যাসিসেতে গন্ধ আসছে। মাঝে মাঝে আগাছা-

গুলো রূপোলি নীল নদীর বুকে তারার মতো ঝিকমিক করে উঠছে। নল খাগড়ার বোঁপগুলো যেন আকাশের গায়ে মেঘ। তীরে কোন বোঁপে একটা বুলবুল শিখ দিচ্ছে। মাঠের মধ্যে এদিক সৈদিক একটা আলোয়া ছুটে বেড়াচ্ছে। তারপর নামলো রান্দিরটা জুড়ে শাদা কুয়াসার ঘোমটা। কিন্তু কোনো জনপ্রাণীর সাক্ষ্য নেই। জেকব কোনো শব্দ না করে নৌকো বেয়ে চললো। ও যেন, এই নিখর নিশাখি রাতের ঘুম ভাগাতে চায় না। নৌকো এগিয়ে চলেছে একটা অপছারার মতো, পিছনে নদীর বুকে এক দিকে দিয়ে যাচ্ছে ক্ষণিক চিহ্ন। মেয়েটি এক পাশে অন্ধকারের মধ্যে নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। হঠাৎ জেকব মৃদু স্নেহপূর্ণ স্বরে বললো, “মেরিউকা, আমার একটা কথা শুনবে?” মেয়েটি উদাসীনভাবে উত্তর দিলো, “বলতে পারো।” “আচ্ছা, তুমিই বলা আমি কি দোষ করছি?” “কিছু না, আমি তোমাকে দেখতে পারি না।” “তা হলে মা ঠিকই বলে-ছিলেন—একটা নেড়ে কৃত্যকে আদর করলে খাওয়ালে ভালোবাসতে পারে। একটা বুনো পাখীকে যত করে পোষ মানানো যায়। কিন্তু মানব চরিত্র ঠিক উল্টো, তেল দাও, জল দাও ভবি ভোলার নয়। যে হাত দিয়ে তাকে আদর করা হবে, সেই হাতই সে কামড়াবে, তারপর ছুড়ে ফেলে দেবে ধূল্যর।” “হ্যাঁ, তাঁর কথাই ঠিক, আমাকে বিয়ে করা তোমার উচিত হয়নি” মেয়েটি কৰ্কশভাবে বললো। ছেলেটি অবাক হয়ে খানিকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর আরম্ভ করলো “তুমি ভুলে যাচ্ছে যে, তোমাকে আমি জোর করে বিয়ে করিনি। বছর দু-এক আগে তোমার সঙ্গে মাঠের ধারে আমার প্রথম দেখা। সেখানে ছেলেরা আগুন জ্বালিয়ে গোল হয়ে বসেছিল, আর মেয়েরা গান গাইছিল। আমি সেই আগুনের মধ্য দিয়ে সব চেয়ে উঁচু লাফিয়েছিলাম, আর তুমি সব চেয়ে ভালো গান গেয়েছিলে। বলা, মেরিউকা, তোমাকে ভালোবেসে আমি কী দোষ করছি? আমি তো আর জানতুম না যে, তোমার ভালোবাসা রাত পোহাবার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে। তুমিও তখন আমার ভালোবাসার প্রতিদান দিয়েছিলে। মনে আছে আমরা সারারাত হাতে হাতে রেখে ওকগাছের তলায় বসে কাটিয়ে দিয়েছিলাম। পৃথিবীর অন্য কোনো কথাই আমাদের মনে হয়নি। অনেকেই তোমাকে ভালবাসতো, কিন্তু একমাত্র আমি তোমার পায়ের আমার জীবন বিলিয়ে দিয়েছি, আর সেইটেই আমার একমাত্র অপরাধ।” উত্তেজনায় সে তাড়াতাড়ি দাঁড় টেনে চললো। নৌকোটা টলমল করে উঠলো। বুলবুলগুলো ভয় পেয়ে চুপ করে গেল। সে আশ্বেত আশ্বেত বলে চললো “নদীর ধারে তোমায় প্রথম দেখা, তারপর দু-জন কত প্রণয়গুঞ্জনেই না করেছি। তোমার বিরুদ্ধে লোকে কতো কথাই না বলেছে। আমি কান দিইনি। আমি তোমাকে বিশ্বাস করতুম।

হুমি আমার বৃকে মাথা রেখে সব শুনছি। তারপর করোঁছ তোমায় চুমন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দেহ মন আত্মা সব বিকিয়ে গেছে তোমার কাছে। তুমি বাধা দাওনি। তারপর আমি যখন এলুম তোমার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে, তুমিই আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করেছিলে। সেই সুন্দর রাতগুলির কথা মনে হচ্ছে—ওরা জানে আমার ভালোবাসার কথা, সুখের খবর, বিরহের বেদনা আর মনের অশান্তি। দুর্ভোগের রাত্তিরে কতোদিন বরফ-জমা নদীর ওপর দিয়ে নিজের প্রাণ হাতে করে তোমার বাড়ি থেকে ফিরেছি। সব কিছু সাহসের মূলে ছিল আমার ভালোবাসা, তখন ভূত বা মৃত্যু কিছুর ভয়ই আমি করিনি। তুমিই ছিলে আমার সকল বল, আমার জীবন। আর এখন? মাস ছয়েক আমাদের বেশ সুখেই কেটেছিল। তোমার কি মনে পড়ে না যে এই রকম এক রাতে তুমি এসেছিলে আমাদের বাড়িতে? কোনো কিছুর অভাবই তো তোমার ছিল না। তোমাকে যে যত আমি করেছি তা যদি কোনো লোককে খুন করার পর তার অনাথ ছেলে-মেয়েদের করতুম তবে এতদিনে আমার লোক-হত্যার পাপ ধুয়ে মুছে যেত। কিন্তু আমার ভালবাসার প্রতিদানে তুমি আমার হৃদয়টা ছিঁড়ে মাড়িয়ে দিলে—আমায় ছেড়ে তুমি চলে গেলে। আমার সারা শরীর যেন ছিঁড়ে পড়িছিলো—আমার প্রত্যেকটি স্নায়ু, প্রত্যেকটি তন্তু বেদনায় অচল হয়ে গিয়েছিলো। আমার সে যন্ত্রণার তুলনা হয় না। আমি কিন্তু এক মহাত্মার জন্যেও আশা ছাড়িনি। সব সময় মনে হয়েছে তুমি তোমার ভুল বৃদ্ধিতে পারবে, আবার তুমি ফিরে আসবে। সেইজন্যে শতহাসি ঠাট্টাকে উপেক্ষা করেও আমি গেলুম তোমায় ফিরিয়ে আনতে। কে যেন রাতের বেলা আমার কানে কানে বলতো—ধৈর্য ধর, কোমল হও, ভালবাসা দিয়ে জয় করো। আমি তোমাকে দিয়ে ঘরকমার কাজ করতে আরম্ভ করলুম, ভাললুম যে তা' হলে হয়তো তোমার মনের পরিবর্তন হবে। আমি তোমার ওপর কোনো জোর খাটাইনি এমন কি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্পর্শ অবধি করিনি। সব সময় তোমায় মাথায় করে রেখেছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, তুমি দ্বিতীয়বার পালিয়ে গেলে। বৃদ্ধিমা বল্লেন—যেতে দাও। কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। পাড়াপেশাী বললো—লাঠোঁধি ছাড়া এ রোগ সারবার নুয়। আমার মন কখনও সে সবে সায় দেয়নি।

“তোমার উচিত ছিল আমায় মারধর করা, মেরে ফেলে সব চুকিয়ে দেওয়া” মেয়েটি চীৎকার করে উঠলো।

জেকব ভয় আর হতাশামিশ্রিত দৃষ্টিতে একবার মাত্র ওর দিকে তাকালো। তারপর নিল মুখ ফিরিয়ে। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকবার পর সে আবার শুরু করলো “আমি যদি

শহুরে লোক হতুম তা' হলে তাই করতুম। আমি বনেজগলে পশুপাখীদের সঙ্গে মানুষ, সেখানে এমন একটিও জন্তুজানোয়ার আমার চোখে পড়েনি যে তার শিগুনীকে মেরে ফেলেছে। তখন আমাকে যেন কেউ যাদু করেছিল—আমি আবার তোমায় ফিরিয়ে আনলুম। কিন্তু আমার সব আশাবরসাই তখন গেছে নষ্ট হয়ে। আমার হাসি গেল মিলিয়ে—বৃক গেল ভেঙে। সারা জগতটার আর কোনো মানে রইলো না আমার কাছে। আমি বৃদ্ধিতে পারলুম যে হাজার বৃদ্ধিয়ে বা ভয় দেখিয়ে মেরিয়েজের কবল থেকে তোমাকে ফেরানো যাবে না। তখন আমি হাল ছেড়ে দিলুম। ভাললুম কপালের লেখা—এ খণ্ডানোর সাধ কারুর নেই। যে মেরিয়েজ তোমার সঙ্গে দু'দণ্ড প্রেমের অভিনয় করতো, তারপর চলে যেত তার স্ত্রীর কাছে, যে মেরিয়েজের পেশা হলো রোজ নতুন নতুন মেয়েদের সঙ্গে ফর্তি করা—তাকে তুমি বেশী পছন্দ করত, তাকে তুমি ভালবাসত। এই কথা সব সময় মনে হয়ে আমার শরীরমন তিলে তিলে ক্ষয় হয়েছে। শেষটা লজ্জায়, অপমানে, অনুশোচনায় এমন হ'লো যে হৃদয় বলে আমার আর কিছু রইলো না। এবার সময় হয়েছে, এসপার ওসপার একটা করতেই হবে। এই পৃথিবীতে আমি, মেরিয়েজ আর তুমি তিনজনের স্থান নেই—একজনকে সরে যেতেই হবে। প্রথমে ভেবে-ছিলুম আত্মহত্যা করি কিন্তু তাতে কি ফল হতো তুমি তো আর মেরিয়েজকে বিয়ে করতে পারতে না। তারপর ভাললুম যে ওকে মেরে ফেলে সব আপদ চুকিয়ে দিই—কিন্তু তাতেও কোনো লাভ নেই। তোমার সম্বন্ধে এই ধরনের কিছু ভাবা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তখন শীতকাল তুমি একেবারে বাড়িতে ছিলে। আমার ভালবাসার কথা তখনও আমি একেবারে ভুলে যাইনি। যদিও মন আমার গিয়েছিল ভেঙে তবুও বসন্তকাল অবধি টেনেহিঁচড়ে চললো। তারপর তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে কাদা শুরু করলে। তোমার চোখদুটিতে দেখা গেল অশ্রুত দৃষ্টি! আমার উবেগ বেড়ে চললো—রোজই বন থেকে কাজ সেরে ফেরবার সময় মনে হতো হয়তো বাড়ি ফিরে আর তোমায় দেখতে পাব না। যা ভয় করেছিলুম ঠিক তাই ঘটলো। একদিন বাড়ি ফিরে এসে দেখি তুমি নেই। যাক ভালই হয়েছে তুমি নিজেই নিজের শাস্তি বেছে নিয়েছো।”

“কি শাস্তি?” মেয়েটি বলে উঠলো—ওর মুখটা একটু ফাকাশে দেখাচ্ছে। জেকব চুপ করে দিগন্তপ্রসারী দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। দূরের যাঁতাকলটা দেখাচ্ছে একটা বিরাট দৈত্যের মত। হঠাৎ সে নৌকোর মুখটা ডানদিকের জোঁট খাঁড়টার দিকে ফেরালো।

মেরিউকা লাফিয়ে উঠে বললো “এটা তো আমাদের যাবার রাস্তা নয়।”

“আমাদের নয় তোমার—এটা দিয়ে গেলে তুমি সহজেই তোমার মেরিয়েজের কাছে পৌঁছোতে পারবে।”

মেয়েটির কি রকম যেন অসোয়াস্তি হতে লাগলো—সে পাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে ভাবতে লাগলো কি করে পালান যায়। জেকব বোধ হয় ওর মনের কথা টের পেলে—একটু অবজ্ঞার হাসি হাসলো আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও বেরিয়ে এলো। “মেরিউকা, তুমি আমাকে ঠিকিয়েছ কিন্তু তোমার শাস্তিকে ঠেকাতে পারবে না। ভয় করলে চলবে কেন?” ও বেশ ধীরে ধীরে শান্তভাবে এই কঠী কথা বললো—ওর স্বরে একটা দৃঢ়তার আভাস। নদীর পাড়দুটো খাড়া আর দু'পাশে জলভূমি—নদীটা কালো আর গভীর।

এতক্ষণে চাঁদটা অনেক নীচুতে হেলে পড়েছে। অন্ধকারটা আরো বেড়ে উঠেছে। নিস্ততশ্বতাটো যেন আরও ভীষণ আকার ধারণ করেছে। কারণ এই জায়গাটা একেবারে জনপ্রাণীশূন্য। এমন কি, পাখীর কিচিরমিচির অবধি শোনা যাচ্ছে না। কখনো সখনো এক আঘটা জোনাকীর মিটিমিটে আলো দেখা যাচ্ছে। এই ভীষণ নিস্ততশ্বতার মধ্যে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে চাপা দীর্ঘশ্বাস, ভীত অশ্রুত স্বর, মৃদু আতর্নাদ—কখনো মনে হচ্ছে এ সব শব্দ আসছে নদীর ভেতর থেকে কখনো বা মনে হচ্ছে দূরের জলাভূমি থেকে। সত্যিই যে এ শব্দ হচ্ছে কি না বলা শক্ত, তবে সেই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে এ সব সত্যি বলেই মনে হচ্ছে। জলের ওপর কুয়াশাটাকে কতক-গুলো আবহা প্রেতমূর্তির মতো লাগছে। নৌকোটা কাছাকাছি যেতে না যেতেই সেগুলো যেন কোথায় পালিয়ে যাচ্ছে আবার ভেসে উঠছে কিছুটা সামনে গিয়ে।

মেরিউকার অসম্ভব ভয় করতে লাগলো। ওর মনে হচ্ছিল যেন একটা ভীষণ কিছু ওর জন্যে ঠুঁত পেতে বসে আছে। কোনো অশরীরী জীব ওর দিকে ক্ষমাহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, ওর কানে ফিস্‌ফিস করে কথা বলবার চেষ্টা করছে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মেয়েটি চোখ বন্ধ করে নৌকোর মধ্যে গুঁড়িগুঁড়ি মেরে বসলো।

জেকবও যেন সব কিছু শুনতে পাচ্ছিল। প্রতি মহাত্মাই ওর মুখ হয়ে উঠছে কঠিন থেকে কঠিনতর। ঠাণ্ডা ঘাম ওর কপাল বয়ে নেমে এলো। ওর মনের মধ্যে ভীষণ তোলপাড় চলেছে। ওর মনের ভেতর এখনও কে যেন বলছে—ক্ষমা করো, দয়া করো। কিন্তু বাইরের সব কিছু, সুদূর যেন অনারকম। তাই যত সময় যাচ্ছে ততই তার সংকল্প দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে।

নৌকোটা এবার যেখানে এলো সে জায়গাটা ভীষণ অন্ধকার আর নদীটাও খুব গভীর।

গভীরতার জন্যে এখানে শরগাছ জন্মায় না।  
সাঁপল গাভিতে ছোট ছোট টেউ এসে ভেঙে  
পড়ছে নৌকোর গায়ে আর ফেনার চারিদিক  
ভরে যাচ্ছে। আবার জেকব, ধরাগলায় শব্দ  
করলো “আজ শেষবারের মত তোমায় ফিরিয়ে  
আনতে গিয়েছিলাম। এবার তুমি তোমার  
ইচ্ছে মতই চলতে পারবে। এই নদীটা  
তোমাদের গ্রামের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে। এইটে  
ধরেই তুমি মৌসিয়েজের বাড়ি হাজির হয়ে  
তাকে আদর করতে পারবে। আমি তোমাকে  
মৌসিয়েজের হাতে সমর্পণ করবো—এক্ষুনি”  
মেরেটি চীৎকার করে উঠলো “জেকব আমায়  
মেরে ফেলো না, আমায় বাঁচতে দাও।” ওর  
গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেল জেকব ওকে এক  
হাতে ধরে রেখে একটা রুমাল শক্ত  
করে মেরিউকার মুখে মাথায় জড়িয়ে গলায়  
বেঁধে দিল। ও জেকবের দৃঢ় মূর্খি ছাড়বার  
জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো। জেকব  
দু’হাতে ধরে ওকে উঁচু করে তুললো তারপর  
লোকের যেমন খাচার জানোয়ারকে খাবার দেয়  
ঠিক তেমনিভাবে ছুড়ে ফেলে দিল নদীর  
মধ্যে ঘূর্ণীর মাঝখানে।

জলে ঝপ করে একটা শব্দ, মেরিউকার  
শরীরটা একবার ডুবে গেল তারপর আবার  
উঠলো ভেসে, ওর শাদা জামাটা চক্‌চক্‌  
করছে। ইন্দুর মেরে খাওয়ার আগে বেড়াল  
যেমন খেলা করে নদীটাও মেরিউকাকে নিয়ে  
ঠিক তেমনি খেলা করতে লাগলো। একবার  
ওর হাতের মূর্খি দেখা গেল। তারপর, একরাশ  
বদবদ, আর জলের ওপর কতকগুলি বস্ত্র-  
ছাড়া সেই রাত্তির ভীষণ ব্যাপারের আর কোনো  
চিহ্নই রইলো না।

জেকব কপালের ঠাণ্ডা ঘাম মুছে ফেলে  
দাঁড়া তুলে নিল তারপর সেই সংকীর্ণ খাঁড়ি  
বেয়ে আবার ফিরে চললো। আবার চারিদিক  
নিস্তব্ধ। চাঁদটা আরো হেলে পড়েছে। সেই  
বাঁকা আলোতে মনে হচ্ছিল যত রাজ্যের  
দিতাদানা জেকবকে ঘিরে ধরেছে। যাঁতা কলটার  
পাখাগুলো যেন ওকে আর এগোতে বারণ  
করছে। নৌকোটা সেই স্বপ্নালোকিত পথ  
বেয়ে ফিরে চলেছে। নৌকার ভার হালকা হয়ে  
খাওয়ায় ওর গতি গিয়েছে বেড়ে। ঝোপগুলোর  
মধ্যে বুলবুলিপাখী আবার শিশ দিতে শব্দ  
করছে—যদিও ভোর হতে বেশ দেরী আছে।

ইতাল জেকব নৌকোর মধ্যে মাথা গুঁজে  
শুয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। স্রোতের  
টানে নৌকোটা ঝাউগাছগুলোর তলায় সরে  
এলো। তারপর ছায়ার মধ্যে কোথায় হারিয়ে  
গেল। তখন পূর্বের আকাশ ফরসা হতে আরম্ভ  
করছে। রাত্তির নিস্তব্ধতা, বুলবুলি শিশ  
আর ঘন্‌ঘন্‌ পৃথিবীর বৃকে জেগে রইলো  
একটি লোকের মৃদু কান্নার স্বর।

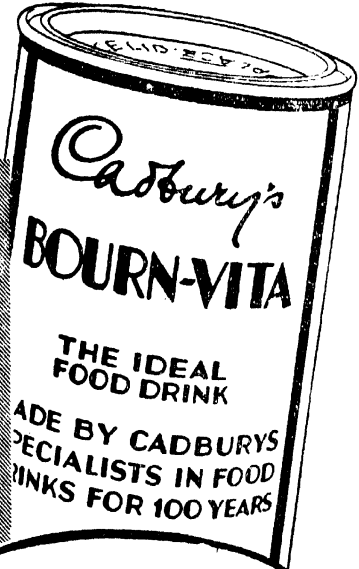
অনুবাদক : রাজত রায়।

সাদিক্যাশভে  
**দুলালের**  
তালমিছরি

**দুলালম** সেন্টেড  
হোয়াদায়ল  
৩৩ কেমিক্যাল ওয়াকম  
১৩১, ১৩২-১৩৩-১৩৪-১৩৫

K.B.2

স্বাদ  
ভালো হলে  
সবই  
ভালো!



বিশেষ কার  
লিঙ্গদের জন্য

ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন আছে বলে  
বোর্নভিটা বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের হাড় পেশী পুষ্ট করে।  
বোর্নভিটা খেলে বড়োদেরও ভালো ঘুম হয় এবং অফুরন্ত  
কর্মোৎসাহ আসে।

**ক্যাডবেরির**  
**বোর্ন-ভিটা**  
ক্যালসিয়াম ও ভিটামিনে সমৃদ্ধ  
ক্যাডবেরির নালভেই গণ্য ডালিন

যদি ঠিকমতো না পান তবে আমাদের লিখুন :  
ক্যাডবেরি-ব্রাই (এক্সপোর্ট) লিঃ; (ডিপার্টমেন্ট ২১) পোস্ট বক্স ১৪১৭ বোম্বাই

# রবীন্দ্র-কাব্য-জীবন-প্রবাহ

## কবি-স্মরণ-সংকলন

### সংকলয়িতার নিবেদন

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও তিরোভাব

—এই দুটি-দিনই আমাদের সমভাবে পালনীয় ও স্মরণীয়। কি পঁচিশে বৈশাখে, কি বাইশে শ্রাবণে কবির জন্মোৎসব বা কবির স্মৃতি-তর্পণ শ্রদ্ধায় ও অনুরাগে, স্মৃতিচিহ্ন ও সংঘমে তাঁর দেশবাসীর অবশ্য করণীয়। কিন্তু প্রতি বৎসর এই দিন-দুটিকে ঘিরে নানা স্থানে যে-সব অনুষ্ঠান হয়, লক্ষ্য করে দৃষ্টি পেয়েছি, তাতে তাঁর সৃষ্টির মর্মকথাটি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, বহু ব্যথা বাক্যের নিরর্থকতায় পড়ে যায় চাপা; প্রাতিষ্ঠানিক বাগাড়ম্বরে তাঁর বাণীমূর্তি হয়ে পড়ে নিম্প্রভ। তাই অনেক সময় ভেবেছি, কেমন করে এ-সব অনুষ্ঠানে তাঁর কাব্য-জীবন-প্রবাহের মূল ধারাটি ধরে, তাঁর যে-সৃষ্টি, ক্রমপরিণতির মধ্য দিয়ে গিয়ে পৌঁছেয়েছে সৃষ্টির অতীতে, তার একটু পরিচয় দেওয়া যায়,—যাতে সার্থক হয় আমাদের স্মরণ, তাঁর সেই নিরন্তর প্রকাশের পথে, অন্তরের উপলব্ধিতে।

এই কথা মনে নিয়ে আমি এখানে রবীন্দ্রনাথের যে-কাব্যসৃষ্টি, তার অরুণোদয়ে কণীধারা নিব্বার-উৎস থেকে, মধ্যাহ্নদিনে দুকূলপ্লাবী খরনদীপ্রোত বেয়ে, শান্তসমাহিত সন্ধ্যায় মহাসাগরসংগম পর্যন্ত, যে অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য নিয়ে পরম পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছে, তার একটু পরিচয়, আর তাঁর একটু ব্যাখ্যা—কবির আপন মূখের কথাতেই—সেবার চেষ্টা করেছি। বলবার দরকারও মনে করছি না যে, তাঁর অখণ্ড কাব্য-জীবন-প্রবাহের এ-পরিচয় খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ। আমি শুধু কবি নিজে যে-কথা বলেছিলেন ‘রবীন্দ্র রচনাবলী’র ভূমিকায়—

“আমার লেখার ধারা আমার জীবনের ধারার সঙ্গে সঙ্গেই অবিচ্ছিন্ন এগিয়ে চলেছে।.....একটা ঐক্যের স্বাক্ষর তাদের সকলের মধ্যে অঙ্কিত হয়ে নিশ্চয়ই পরস্পরের আত্মীয়তার প্রমাণ দিতে থাকে” —সেই কথাটি মনে রেখে এই সংকলনটি করছি। এ থেকে পঁচিশে বৈশাখের বা বাইশে শ্রাবণের কোনো একটি দ্বন্দ্বস্তানেরও যদি সামান্য সহায়তা হয়, তাতেই আমার তৃপ্তি। ইতি ২২শে শ্রাবণ। ১৩৫৪।

—অমল হোম

ধূনশব্দ—

বাঁলে রাখা ডাল যে, কবির দীর্ঘজীবনব্যাপী কাব্যপ্রবাহের মূল ধারাটিকে একটি দিনের মধ্যে ধরা হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব-পর হবে না। ঠিক এই অনুষ্ঠানপদ্ধতিটিকে সমগ্রভাবে রূপদান করতে গেলে যে সময়ের প্রয়োজন তা সুলভ না হলে, এখানে যা সংকলিত হোলো, তা স্থান কাল অনুযায়ী সংকোচিত করতেই হবে। সে-ডাল রইলো অনুষ্ঠানবাদের হাতে। তাঁরা

তাঁদের অভিরূচি ও আয়োজনমতো এ পদ্ধতি পরিবর্তিত করে নেবেন। কবির কাব্যধারাগতির বোধসহায়তার আঁধা যেখানে কোনো একটি কাব্যের বা তার কবিকৃত ব্যাখ্যার একাধিক উদাহরণ সমিতিবোধিত করেছি, তাঁরা সেখানে সেটি অনাম্যানেই বতন করতে পারেন। তাতে তাঁর সৃষ্টির মূল ঐক্য-সূত্রটি ধারার পক্ষে অসুবিধা হবে না বলেই আমার বিশ্বাস। —সংকলয়িতা।

### [ বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের অনুমোদনক্রমে ]

“নিজের সত্য পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতরকার মূলে ঐক্যসূত্রটি ধরা পড়তে চায় না। বিধাতা যদি আমার আয়ু, দীর্ঘ না করতেন, তা হলে নিজের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করবার অবকাশ পেতাম না। নানা খানা করে নিজেকে দেখেছি, নানা কাজে প্রবর্তিত করেছি, ক্ষেপে ক্ষেপে তাতে আপনার অভিজ্ঞান আপনার কাছে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদীক্ষণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম, তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে,— সে আর কিছ, নয়,—

আমি কবি মাত্র।”

২৫শে বৈশাখ। ১৩৩৮।



—২৩শে শ্রাবণের সংখ্যায় প্রকাশিত—  
 প্রথম ধারা—উন্মোচন। কৈশোরক। যৌবনম্বন॥  
 ১। “প্রভাত-সংগীত”। ২। “কড়ি ও কোমল”॥  
 —৩০শে শ্রাবণের সংখ্যায় প্রকাশিত—  
 দ্বিতীয় ধারা—৩। “মানসী”। ৪। “সোনার তরী”॥  
 তৃতীয় ধারা—৫। “চিত্রা”। ৬। “কল্পনা”॥  
 —এই সংখ্যায় প্রকাশিত—  
 —৬ই ভাদ্রের সংখ্যায় প্রকাশিত—  
 চতুর্থ ধারা—৭। “ক্ষণিকা”। ৮। “নৈবেদ্য”। ৯। “স্মরণ”॥

## উপক্রমণিক।

—“স্মরণ রে তুই, মম শ্যাম সমান!  
 মেঘবরণ তুঝ, মেঘ জটাগুট,  
 রক্ত কমলকর, রক্ত অধরপুট,  
 তাপবিমোচন করুণ কোর তব

মৃত্যু-অমৃত করে মান  
 তুই মম শ্যাম সমান।”  
 —ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। ১২৮৮—১২৯২ বঙ্গাব্দ॥

—“নাই তোর নাই রে ডাবনা  
 এ জগতে কিছই মরে না  
 \* \* \*

এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে,  
 নিস্ততঃ তাহার জলরাশি।  
 চারি দিক হ’তে সেখা অবিরাম অবিশ্রাম  
 জীবনের প্রোত বিশেষ আসি।  
 \* \* \*

জগতের মাঝখানে, সেই সাগরের তলে  
 রচিত হতেছে পলে পলে  
 অনন্ত জীবন মহাদেশ।”  
 —“প্রভাত সংগীত”। “অনন্ত জীন”। ১২৯০ বঙ্গাব্দ॥

—“যতটুকু বর্তমান তারেই কি বল প্রাণ?  
 সে তো শূন্য পলক নিমেষ!

অতীতের মৃত ভার পুণ্ডিতে রয়েছে তার  
 কোথাও নাহিক তার শেষ।  
 যত বর্ষ বেঁচে আছি তত বর্ষ মরে গেছি  
 মরিতেছি প্রতি পলে পলে,  
 জীবন্ত মরণ মোরা মরণের ঘরে থাকি,  
 জানিনে মরণ কারে বলে।  
 \* \* \*

মৃত্যুরে হেরিয়া কেন কার্দি?  
 জীবন তো মৃত্যুর সমাধি!”

—“প্রভাত সংগীত”। “অনন্তমরণ”। ১২৯০ বঙ্গাব্দ॥

—“চপল চঞ্চল প্রিয়া ধরা নাহি দিতে চায়  
 স্থির নাহি থাকে,  
 মেলি নানাবর্ণ পাখা উড়ে উড়ে চলে যায়  
 নব নব শাখে।  
 তুই তব, এক মনে মৌনরত একাসনে  
 বাঁসি নিরলস,  
 ক্রমে সে পাড়বে ধরা, গীত বধ হয়ে যাবে  
 মানিবে সে বশ।  
 \* \* \*

ওগো মৃত্যু, সেই লগ্নে নির্জন শ্মশনপ্রান্তে  
 এস বরবেশে,  
 আমার পরাবধ, ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া  
 বহু ভালোবেসে  
 ধরিবে তোমার বাহু; তখন তাহারে তুমি  
 মস্ত পাড়ি নিয়ে,  
 রক্তিম অধর তার নির্বিড় চুম্বন-দানে  
 পান্ডু করি দিয়ে।”

—“সোনার তরী”। “প্রতীক্ষা”। ১২৯৮—১৩০০ বঙ্গাব্দ॥

—“তাই ডেবেছি আজকে খেলিতে হইবে নতুন খেলা  
 রাগিরেলা।

মরণশোভায় ধরি রশিগাছি  
 বলিব দু’জনে বড়ো কাছাকাছি  
 কল্পা আসিয়া আট হাসিয়া মারিবে ঠেলা  
 আমাতে প্রাণেতে খেলিব দু’জনে কলন খেলা  
 নিশীথবেলা।  
 \* \* \*

প্রাণেতে আমাতে মৃত্যুমুখি আজ  
 চিনি লব দোহে ছাড়ি ভয় লাজ,  
 বক্ষে বক্ষে পরাশব দোহে ডাবে বিড়োল  
 দে দোল্ দোল্।  
 স্বপ্ন টুটিয়া বাহিরিছে আজ দুটো পাগল।  
 দে দোল্ দোল্।”

—“সোনার তরী”। কলন॥

—“সে যে মৃত্যুপাণি  
 স্তন হ’তে স্তনান্তরে লইতেছে টানি।”

—“সোনার তরী”। বন্ধন॥

—“উঠিতেছে চরাচরে অনাদি অনন্ত স্বরে  
 সংগীত উমার,  
 সে নিত্য গানের সনে বিশাইয়া লহ মনে  
 জীবন তাহার।  
 ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্ব দেখ তারে সর্বদৃশ্যে  
 বৃহৎ করিয়া,  
 জীবনের ধূলি ধুয়ে দেখ তারে দূরে থুয়ে  
 সম্মুখে ধরিয়া।”

—“চিত্রা”। “মৃত্যুর পরে”। ১২৯৯—১৩০২ বঙ্গাব্দ॥

—“জগৎ-রচনাকে যদি কাব্য হিসাবে দেখা যায়, তবে মৃত্যুই তাহার  
 সেই প্রধান রস, মৃত্যুই তাহাকে যথার্থ কবিত্ব অর্পণ করিয়াছে। যদি  
 মৃত্যু না থাকিত, জগতের যোজনাকার বাহা তাহা চিরকাল সেইখানেই যদি  
 অবিকৃতভাবে দাঁড়িয়া থাকিত, তবে জগৎটা চিরস্থায়ী সমাধি মন্দিরের মতো  
 অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত বন্ধ হইয়া রহিত। এই অনন্ত  
 নিম্নলতার চিরস্থায়ী ভার বহন করা প্রাণীদের পক্ষে বড় দুর্ভ হইত।  
 মৃত্যু এই অস্তিত্বের ভীষণ ভারকে সর্বদা লঘু করিয়া রাখিয়াছে এবং  
 জগৎকে বিচরণ করিবার অসীম ক্ষেত্র দিয়াছে। যদিকে মৃত্যু সেই দিকেই  
 জগতের অসীমতা। সেই অনন্ত রহস্যভূমির দিকেই মানবের সমস্ত  
 কবিতা, সমস্ত সংগীত, সমস্ত ধর্মতত্ত্ব, সমস্ত তুষ্টিহীন বাসনা সঙ্গ-  
 পারগামী পক্ষীর মতো নীড় অশ্রবণে উড়িয়া চলিয়াছে। একে, বাহা প্রত্যক্ষ  
 বাহা বর্তমান তাহা আমার পক্ষে অত্যন্ত প্রবল,—আবার তাহাই যদি  
 চিরস্থায়ী হইত, তবে তাহার একেশ্বর দৌরাযোগের আর শেষ থাকিত না,—  
 তবে তাহার উপর আর আশীল চলিত কোথায়? তবে কে নির্দেশ করিয়া  
 দিত যে ইহার বাহিরেও অসীমতা আছে? অনন্তের ভার এ জগৎ কেমন  
 করিয়া বহন করিত, মৃত্যু যদি সেই অনন্তকে আপনার চিরপ্রবাহে নিত্যকাল  
 ডাসমান করিয়া না রাখিত?

“জগতের মধ্যে মৃত্যু কেবল চিরস্থায়ী—সেই জন্য আমাদের সমস্ত  
 চিরস্থায়ী আশা ও বাসনাকে সেই মৃত্যুর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।  
 আমাদের স্বর্গ, আমাদের অমরতা, সব সেইখানে। যে-সব জিনিষ আমাদের  
 এত প্রিয় কখনও তাহাদের বিনাশ কল্পনাও করিতে পারি না,—সেগুলি  
 মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়া জীবনান্তকাল অপেক্ষ করিয়া থাকি।.....  
 আমাদের শিব শ্মশানবাসী, আমাদের সর্বোচ্চ মঙ্গলের আদর্শ মৃত্যুকালকেতনে।  
 জগতের নন্দরতাই জগতকে সুন্দর করিয়াছে।”  
 —“পঞ্চভূত”

—“মৃত্যু বাঁধন ছিন্ন করে দেবে, এইটাই কুংসিং; আপনি বাঁধন আজগা  
 করে দিয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে তার হাত ধরব,—এইটাই সুন্দর।”  
 “বাপী”

## “ক্ষণিকা”

॥ ১৩০৭ ॥

### ৬০। পাঠ—

—“এক সময়ে মনপ্রাণ ছিল ফাল্গুনে মাসের জগতে, তখন জীবনের কেন্দ্রস্থলে একটি রূপ দেখা দিয়েছে আপন বর্ণ-গন্ধ-গান নিয়ে; সে বসন্তের রূপ, যৌবনের আবির্ভাব—তার আশা আকাঙ্ক্ষার একটি বিশেষ বাণী ছিল। তার পরে জীবনের অভিজ্ঞতা প্রশস্ততর হয়ে এল; তখন সেই প্রথম-যৌবনের বাসন্তী রংয়ের আকাশে ঘনিষে এল বর্ষার সজল সমারোহ—জীবনে বাণীর বনল হ’ল, বাণায় আর এক সুর বাঁধতে হবে।” (৬৭)

### ৬১। আবৃত্তি—

\* \* \*  
—“ফাল্গুনে আমি ফুলবনে বসে  
গোধীছিন্দু যত ফুলহার  
সে নহে তোমার উপহার।  
যেথা চলিয়াছে সেথা পিছে পিছে  
সতংগান তব আপনি ধ্বনিছে  
বাজাতে শেখোনি সে-গানের সুর,  
এ ছোটো বাঁগার তার;  
এ নহে তোমার উপহার।

“কে জানিত সেই ক্ষণিকা মূর্তি  
দূরে করি দিবে বরষণ  
মিলাবে চপল দরশন?  
কে জানিত মোরে এত দিবে লাজ?  
তোমার যোগ্য করি নাই সাজ।  
বাসর-ঘরের দুয়ারে করালে  
পূজার অর্ঘ্যবিরচন  
এ কী রূপে দিলে দরশন।” (৬৮)

### ৬২। পাঠ—

—“রাত্রির প্রাতে প্রভাতের যখন প্রথম সঞ্চার হয়, তখন তার আভাসটা যেন কেবল অলংকার রচনা করতে থাকে। আকাশের কোণে কোণে মেঘের গায়ে গায়ে নানা রকম রং ফুটেতে থাকে, গাছের মাথার উপরটা ঝিক্‌ঝিক্‌ করে, ঘাসে শিশিরগুণ্ডো ঝিক্‌ঝিক্‌ করতে শুরু করে। .....বোঝা যায় আকাশের অন্তরে অন্তরে সূর্যের স্পর্শ লেগেছে; বোঝা যায় সূর্য রাত্রির নিভৃত গম্ভীর পরিবাস্ত শান্তি শেষ হ’ল, জাগরণের সমস্ত বেদনা সন্তকে সন্তকে মিড় টেনে এখনই অশান্ত সুরের ঝংকারে বেজে উঠবে.....বিশ্বপ্রকৃতির অখণ্ড শান্তি এবার বিদায় হ’ল।” (৬৯)

### ৬৩। আবৃত্তি—

—“পথে যতদিন ছিন্দু, ততদিন  
অনেকের সনে দেখা।  
সব শেষ হ’ল যেখানে সেখায়  
তুমি আর আমি একা।  
নানা বসন্তে নানা বরষায়  
অনেক দিবসে অনেক নিশায়  
দেখোছি অনেক, সহোছি অনেক  
লিখোছি অনেক লেখা,  
পথে যতদিন ছিন্দু, ততদিন  
অনেকের সনে দেখা।  
কখন যে পথ আপনি ফুরাল  
সন্ধ্যা হ’ল যে কবে,  
পিছনে চাহিয়া দেখিন্দু, কখন  
চলিয়া গিয়াছে সবে।

তোমার নীরব নিভৃত ভবনে  
জানি না কখন পশিন্দু কেমনে।  
অবাক রহিন্দু আপন প্রাণের  
নূতন গানের রবে।  
কখন যে পথ আপনি ফুরাল  
সন্ধ্যা হ’ল যে কবে।” (৭০)

## “নৈবেদ্য”

॥ ১৩০৮ ॥

### ৬৪। পাঠ—

—“প্রকৃতি তাহার রূপ রস বর্ণ গন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বৃন্দ মন, তাহার স্নেহ প্রেম লইয়া আমাকে মূগ্ধ করিয়াছে,—সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না, সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না। তাহা আমাকে বশ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে; তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাস্ত করিতেছে। নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, নৌকাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। জগতের সমস্ত আকর্ষণশাল আমা-দিগকে তেমনি অগ্রসর করিতেছে।.....আমরা যেমনই মনে করি, আমাদের ভাই, আমাদের প্রিয়, আমাদের পুত্র আমাদিগকে এক জায়গায় বাঁধিয়া রাখে নাই;.....প্রেম প্রেমের বিষয়কে অতিক্রম করিয়াও ব্যাস্ত হয়।.....পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরাধকে সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মূর্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমি মূগ্ধ,—সেই মোহেই আমার মূর্তিরসের আশ্বাদন।” (৭১)

### ৬৫। আবৃত্তি—

—“বৈরাগ্যসাধনে মূর্তি, সে আমার নয়।  
অসংখ্য বস্তুনিষ্ঠ মহানন্দময়  
লভিত মূর্তির স্বাদ। এই বসুন্ধার  
মূর্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার  
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত  
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো  
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়  
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমার শিখায়  
তোমার মন্দিরমাঝে। হিন্দুরের দ্বার  
রুদ্ধ করি যোগসন, সে নহে আমার।  
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে  
তোমার আনন্দ রবে তারি মাঝখানে।  
মোহ মোর মূর্তিরূপে উঠবে জ্বালায়,  
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফালিয়া।” (৭২)

### ৬৬। পাঠ—

—“বিরোধ-বিশ্লবের ভিতর দিয়ে মানুষ যে একটি ঝুঁজে বেড়াচ্ছে, সেই একটি কী? সেই হচ্ছে শিবম্। এই যে মণ্ডল, এর মধ্যে একটা মস্ত শব্দ। অক্ষুর এখানে দুই ভাগ হয়ে বাড়তে চলেছে—সুখ দুঃখ, ভালো মন্দ। মাটির মধ্যে যেটি ছিল, সেটি এক, সেটি শান্তম্, সেখানে আলো-আঁধারের লড়াই ছিল না। লড়াই যেখানে বাধল সেখানে শিবকে যদি না জানি, তবে সেখানকার সত্যকে জানা হবে না। এই শিবকে জানার বেদনা বড় ভারী।” (৭৩)

### ৬৭। আবৃত্তি—

—“দুর্দিন ঘনায়ে এল ঘন অশ্বকারে,  
হে প্রাণেশ। দিক্‌বিদিক বৃষ্টিবারিধারে  
ভেসে যায়, কুটিল কটাক্ষে হেসে যায়  
নিষ্ঠুর বিদ্রোহশিখা,—উত্তোল বায়  
তুলিল উতলা করি অরণ্য কানন।

(৬৬) “গীতাবতান”। ২য় সংস্করণ। ১ম খণ্ড ॥

(৬৭) “ক্ষণিকা” সম্বন্ধে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত কবির পত্র।

“স্ববিশিষ্ট” ২য় খণ্ড ॥

(৬৮) “ক্ষণিকা”। ‘আবির্ভাব’ রবীন্দ্রচরিতাবলী। সপ্তম খণ্ড ॥

(৬৯) “আত্মপরিচয়”। ৩ ॥

(৭০) “ক্ষণিকা”। “সমাস্ত” ॥

(৭১) “আত্মপরিচয়”। ১৩ ॥ (৭২) “নৈবেদ্য”। ১০ ॥ রবীন্দ্র-চরিতাবলী। অষ্টম খণ্ড ॥ (৭৩) “আত্মপরিচয়”। ৩ ॥

আজি তুমি ডাকো অভিসারে, হে মোহন,  
হে জীবনস্বামী। অশ্রু-সিক্ত বিশ্বমাঝে  
কোনো দৃষ্ণে, কোনো ভয়ে কোনো ব্যথা কাজে  
রাহিব না রুদ্র হ'য়ে। এ দীপ আমার  
পিচ্ছিল তিমির-পথে যেন বারংবার  
নিবে নাহি যায়,—যেন আশ্রম সমীরণে  
তোমার আহ্বান বাজে। দৃষ্ণের বেটনে  
দুর্দিন রচিল আজি নিবিড় নিজ'ন,  
হ'ক আজি তোমা সাথে একান্ত মিলন॥”(৭৪)

## ৬৮। সংগীত—

—“যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি।  
ঝড় এসেছে, গুরে, এবার ঝড়কে পেলাম সাথী॥  
আকাশ-কোণে সব'নেশে ক্ষণে ক্ষণে উঠছে হেসে,  
প্রলয় আমার কেশবেশে করছে মাতামাতি॥  
যে-পথ দিয়ে যেতোছিলেম ভুলিয়ে দিলে তারে,  
আবার কোথায় চলতে হবে গভীর অন্ধকারে।  
বুঝি বা এই বজ্রবে নতন পথের বার্তা ক'বে  
কোন পুরীতে গিয়ে তবে প্রভাত হবে রাতি॥”(৭৫)

## ৬৯। পাঠ—

৭৫ক। —“জীবন মৃত্যুর রহস্য সম্বন্ধে আমরা যা ভাবি, আর যা  
বলি, তার মধ্যে অশঙ্কার থেকে যায়, কেননা আমরা ওদের এক করে মিলিয়ে  
দেখতে পারি। আমরা ভাগ করে দেখি।.....জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে  
কোনো সত্যকার ব্যবধান নেই, উভয়ের মধ্যে স্বন্দ্র নেই—আজ অংশমাত্রকে  
একান্ত করে জানছি বলেই সমগ্রের মধ্যে ভেদ দেখতে পাচ্ছি।.....অখণ্ড  
সত্যকে জীবন ও মৃত্যুকে কখনও বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। জীবনে আমরা  
যে-সত্যকে পেয়ে আনন্দিত আছি, মৃত্যুতেও আমরা সেই সত্যকেই পাব।  
মৃত্যুতে পাব জীবনের পরিপূর্ণতা।” [“শান্তিনিকেতন”]

## ৭০। আবৃত্তি—

—“মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর। আজি তার তরে  
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপতেছি ডরে।  
সংসারে বিদায় দিতে, আঁখি ছলছল  
জীবন আঁকড়ি ধরি আপনার বলি'  
দুই ভুজ্জে।  
“ওরে মৃত, জীবন-সংসার  
কে করিয়া রেখেছি—এত আপনার  
জনম-মৃত্যু হতে তোমার অজ্ঞাতে,  
তোমার ইচ্ছার পূর্বে। মৃত্যুর প্রভাতে  
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার  
মুহূর্তে চেনার মতো। জীবন আমার  
এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়,  
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়।  
স্তন হতে তুলে নিলে কাদে শিশু ডরে  
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে॥”(৭৬)

## “স্মরণ”

১৯৩১০১

## ৭১। পাঠ—

—“মৃত্যু সুন্দর, মধুর। মৃত্যুই জীবনকে সহজ করে রেখেছে।  
জীবন বড়ো কঠিন; সে সবই চায়, সবই আঁকড়ে ধরে, তার বজ্রমন্দির  
ক্লপণের মতো ছাড়তে চায় না। মৃত্যুই তার কঠিনতাকে রসময় করেছে,  
তার আকর্ষণকে আলগা করেছে; মৃত্যুই তার নীরস চেঁচৎ জল এনে দেয়,  
তার পায়ণ স্থিতিতে বিচলিত করে।

“ভাগ্য সুন্দর, ভাগ্য কোমল। সে স্মার খুলে দেয়। সপ্তমকে সে  
কেবল এক জয়গায় স্তম্ভপাকার রূপে উদ্ভূত হয়ে উঠতে দেয় না। সে  
ছাড়িয়ে দেয়, বিলিয়ে দেয়। মৃত্যুরই সেই উদার। মৃত্যুই পরিবেষণ  
করে, বিতরণ করে।”(৭৭)

(৭৪) ‘নৈবেদ্য’। ৮৫।

(৭৫) ‘গীতবিতান’। ২য় সংস্করণ। ১ম খণ্ড।

(৭৬) ‘নৈবেদ্য’। ১০।

## ৭২। আবৃত্তি—

—“তুমি মোর জীবনের মাঝে  
মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।

চির-বিদায়ের আভা দিয়া  
রাঙায় গিয়েছ মোর হিয়া,  
এ'কে গেছে সব ভাবনা

সূর্যাস্তের বরণ-চাতুরী।

জীবনের দিকচক্রসীমা  
লভিয়াছে অপূর্ণ মহিমা,  
অশ্রুধোত হৃদয়-আকাশে

দেখা যায় দূর স্বর্ণপদুরী।

তুমি মোর জীবনের মাঝে  
মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।

\* \* \*

“তুমি মোর জীবন মরণ  
বাঁধিয়াছ দুটি বাহু দিয়া

প্রাণ তব করি অনাবৃত  
মৃত্যুমাঝে মিলালে অমৃত,  
মরণের জীবনের প্রিয়

নিজ হাতে করিয়াছ, প্রিয়া  
খুলিয়া দিয়াছ স্মারখানি,  
যবনিকা লইয়াছ টানি,

জন্মমরণের মাঝখানে  
নিশ্চিন্ত রয়েছ দাঁড়াইয়া  
তুমি মোর জীবন মরণ

বাঁধিয়াছ দুটি বাহু দিয়া॥”(৭৮)

## ৭৩। পাঠ—

—“মৃত্যুর মধ্যে আমরা প্রাণকেই শ্রম্ভা করি।.....আমাদের  
প্রেমের ধন, স্নেহের ধন যারা চলে যায়, তারা সেই শ্রম্ভাকেই জাগিয়ে  
দিক, তারা আমাদের জীবন-গৃহের যে দরজা খুলে দিয়ে যায়, তার মধ্য  
দিয়ে আমরা শূন্যকে যেন না দেখি,—অসীম পূর্ণতাকেই যেন দেখতে  
পাই।”(৭৯)

—“মৃত্যু তো জীবনের সব শেষের ছেদ—কিন্তু জীবনেরই মাঝে  
মাঝে তো পদে পদে ছেদ আছে। জীবনের গান মরণের শব্দে এসে থাকে  
বটে, কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার তাল তো কেবলি নাট্য মাঠায়  
ছেদ দেখিয়ে যায়। সেই ছেদগুলি যদি বেতলা না হয়, যদি তা ভিতরে  
ভিতরে ছন্দোময় সঙ্গীতের স্মার পূর্ণ হয়, তাহলেই শব্দে এসে আনন্দের  
বিচ্ছেদ ঘটে না। কিন্তু ছেদগুলি যদি সঙ্গীতকে, পূর্ণতাকে বাধা দিয়ে  
চলে, তাহলেই শব্দ একেবারে নিরর্থক হয়ে ওঠে। জীবনের ছেদগুলি  
যদি ভাগ্যে, ভিত্তিতে পূর্ণস্বরূপের কাছে আত্মনিবেদনে ভরিয়ে রাখতে  
পারি,—মৌচাকের কক্ষগুলি মৌমাছি যেমন মধুতে ভরিয়ে রাখে,—তাহলে  
যা-ই ঘটুক না কেন, কিছুতেই ক্ষতি নেই। তাহলে শুনাই পূর্ণের  
বাজনাকে বহন করে। বিশ্বের মমকুহর থেকে নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে ও,  
হাঁ—আমি আছি। আমাদের অন্তর থেকে আসা সূত্রে দৃষ্ণে উৎসবে  
শোকে সাড়া দিক—ও, হাঁ সব পূর্ণ, পরিপূর্ণ!! বলুক—

## ৭৪। সংগীত—

—“আছে দৃষ্ণ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে,  
তবু শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে॥

তবু প্রাণ নিতামরা হাসে সূর্য চন্দ্র তারা,  
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে।

তরঙ্গ মিলিয়ে যায়, তরঙ্গ ওঠে, কুসুম খরিয়া পড়ে, কুসুম ফোটে;  
নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ,  
সেই পূর্ণতার পানে মন স্থান মাগে॥”(৮০)\*

(৭৭) ‘শান্তিনিকেতন’ উপদেশাবলী। ২য় খণ্ড। রবীন্দ্র  
গদ্যাবলী। প্রায়দশ খণ্ড।

(৭৮) ‘স্মরণ’। ‘মৃত্যুমাধুরী’। রবীন্দ্রচন্দাবলী। অন্তিম খণ্ড।

(৭৯) ‘শান্তিনিকেতন’। ২য় খণ্ড।

(৮০) শান্তিনিকেতন। ২য় খণ্ড। \* ‘গীতবিতান’। ২য় সংস্করণ।

আগামীবারে প্রকাশ্য—

পঞ্চম ধারা—১০। ‘উৎসর্গ’।

(১)

১২৬৪ খ্রীস্টাব্দের অগস্ট মাসে ফ্লরেন্স শহরের মাথায় দেখা দিল এক ধুমকেতু—তাহার অগ্নিময় জ্বলন্ত পুচ্ছ সারা আকাশ দূরতমান করিয়া তুলিল। নাগরিকেরা বলাবলি করিতে লাগিল, এক মহাপুরুষের জন্ম হইবে; এ নাকি তাহারি লক্ষণ! কয়েক মাস পরে ১২৬৫ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে সিনর আলিঘায়েরো আর মাদোনা গারবিয়েলার এক পুত্র জন্মিল। নাম হইল তার দুরান্তে—সংক্ষেপে দান্তে।

ছেলেটি সর্বদাই বিষম—প্রাণে সুখ নাই। পাঁচ বছর বয়সে সে মাকে হারাইয়াছে, আর বারো বছর বয়সে পিতাকে। পাংশু, মুখ, সোনালি চুল আর ঘন কালো উৎসুক চোখ দুইটিতে মিলিয়া তাহাকে দেখিতে বড়ই অদ্ভুত। লোকে তাহাকে ‘অন্য জগতের কবি’ বলিয়া ডাকিত—সে শুধু অদ্ভুতভাবে তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিত।

একজনের দিকে চাহিলে সে আর চোখ ফিরাইতে পারিত না—চাহিবার বাসনা খুবই জাগিত, কিন্তু সাহস হইত না। ফ্লরেন্সের ধনকুবের ফলকো দে পোর্তনারির কন্যা সে, নাম বিয়াগ্রিচে। সকলে ডাকে ‘বিচে’ বলিয়া। একবার কিন্তু দান্তে তাহাকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিল—এক ভোজসভায়। স্বর্ণাভ তাহার কেশভার, রক্তাভ তাহার পোষাক। মনে হয়, যেন স্বর্ণ হইতে কোনো অসরী স্যো নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তারপরেই বিচে মিলাইয়া গেল। তাহাদের বয়স তখন নয় বৎসর।

কয়েক বৎসর পরে বিয়াগ্রিচেই চাহিয়াছিল তাহার পানে। ‘পথে যাইতে যাইতে সে চাহিল, যেখানে আমি অপ্রতিভমুখে দাঁড়াইয়াছিলাম, সম্ভ্রান্ত আভিজাত্যের একটি সর্বিয় হাসি ফুটিল তাহার মুখে।’

ইহাই তাহাদের ভালোবাসার সূত্র, আর ইহাই তাহাদের শেষ দেখা। দান্তে—খর্বাকৃতি, শীর্ণকায়, খজ্ঞানাসা, নিভৃতবাসী দান্তে জানিত আলাপ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু সে তো লিখিতে জানে, লেখনীর সাহায্যে সে একদিন অমর করিয়া তুলিবে তাহার ভালোবাসাকে। বিয়াগ্রিচেকে সাথী করিয়া সে তাহার পার্থিব প্রেমকে আঁকিবে স্বর্গীয় সুস্মার।

[২]

এক ধনী ব্যাঙ্কারের পুত্রকে বিয়াগ্রিচে বিবাহ করিল—পরিণয়ের অল্পকাল পরেই মারা গেল। সেদিন হইতে দান্তে এক আধ্যাত্মিক নির্জনতার মধ্যে বাস করিতে লাগিল। শহরের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সে নাগিল, ‘কাম্পালদিনো’র সমরভূমিতে সে যুদ্ধও করিল, অভিজাত সম্প্রদায়ের নৃত্য-গীতের অঙ্গরেও যোগ দিল—কিন্তু এ সকল শুধু উপরের চামুলা, ইহার তলায় অন্তঃসলিল তাহার সেই নিঃসঙ্গ বিষন্নতা—এক দৈবী দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। মনে চিরজাগর রহিল এক অনিবার্ণ আকাঙ্ক্ষা—বিয়াগ্রিচের সহিত ক্ষণকালের দেখায় মনে যে পূনরুজ্জীবিত—সেই ক্ষণিক স্বপ্নকেই গানের মধ্যে অমর করার আকাঙ্ক্ষা।

তখন ইতালির রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অশান্তি—উদারপন্থী ‘গুয়েলফ’ আর রক্ষণশীল ‘ঘিবেলাইন’ দল পরস্পর সংঘাতে মগ্ন। দান্তে ইহাদের কোনো দলেই রহিলেন না, আপন স্বাধীন মতামত লইয়া নিজেই একটি দল গড়িলেন, তিনিই তাহার ‘নায়ক এবং একমাত্র সৈন্য’। অল্পকালের জন্য দান্তেকে বিচারপতির আসনে বসানো হইয়াছিল—বিবাদকামী সকলকেই তিনি নির্বিচারে নির্বাসনদণ্ড দিলেন—তাহার মধ্যে তাহার প্রিয় সুহৃৎ ‘গুইদো কাভালকান্তি’ও অন্যতম।

অতএব কিছুদিনের মত ফ্লরেন্সে শান্তি আসিল, কিন্তু আসিল না দান্দের সংসারে। গেমমা দোনাতি নামে এক কলহপ্রিয়, সংকীর্ণচিন্তা রমণীকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। গেমমা স্বামীর নিভৃত কাব্যচর্চার মধ্যে কোনো অর্থ পাইতেন না, দান্দেরও অসহ্য লাগিত এই কোপনা, মুখেরা পত্নীটির হীনসন্দেহ ও অতিসাধারণ মনোবৃত্তি। ফলে দান্দের নিজের ধৈর্য, শান্তিও হারাইল, সাহিত্যক্ষেত্রেও তাহার বহু প্রতিস্বন্দ্বী দাঁড়াইল, এবং লেখনীর সূচাগ্রভাণের সাহায্যে তাহার পরস্পরের প্রতি গরলবর্ষণে রত হইলেন—সে গরল প্রায়ই শোভনতার পায়ে পরিবেশনের অযোগ্য হইত। একজন তাহার নামে লিখিয়াছিলেন, ‘কাপুরুষ বাপের কাপুরুষ সন্তান, কপর্দকহীন চাটুকার—যে হাতে উহাকে চাবুক মারা হয়, পরম ভক্তিভরে সেই হাতই ও লেহন করিতে থাকে।’

ইহাতে ধর্মানাধার ও লেখনীর শক্তির

পরিচয় যতই থাক, ইহাকে পূর্ণ সভা বলা চলে না। দান্তে অন্ততঃ কাপুরুষ এবং চাটুভাষী ছিলেন না। সাহস এবং অকুণ্ঠ সত্যপ্রিয়তার জন্যই জীবনের নিষ্ঠুরতম আঘাত তাঁহাকে শিরোধার্য করিতে হইয়াছিল। কিরূপে, তাহাই বলি।

তখন পোপ ছিলেন অষ্টম বোনিফেস্। উদার অধ্যাত্মবাদ লইয়াই তিনি থাকিতেন না, পার্থক্য স্বার্থ, ঈর্ষা, প্রভৃতি বিষয়গুলিতেও তাহার অসামান্য ব্যাপ্তি ছিল। তাহারই কাজে প্রবাসে গিয়া তাহার সহিত দান্দের মতান্তর হইল এবং দান্তে ‘সে কথাটি তাহার মুখের ওপর বলিতে দ্বিধা করিলেন না। পোপ অমায়িকভাবে হাসিলেন, কিন্তু তাহার মনের পৃষ্ঠায় খোদিত রহিল এই স্পর্ধিত যুবকের নাম—তাঁহাকে অমান্য করিতে যাহার সাহস হইল।

স্মৃতিশক্তি তাহার অসাধারণ। ফ্লরেন্সে ফিরিতে গিয়া দান্তে শুনিলেন স্বদেশ হইতে তাঁহাকে নির্বাসিত করা হইয়াছে। জনসাধারণের তহবিল হইতে অর্থ আয়সাৎ করার অপরাধ। এই ভিত্তিহীন অভিযোগের প্রতিবাদের জন্যও দান্তে প্রবেশাধিকার চাহিলেন—কিন্তু উত্তরে তাঁহাকে হত্যার ভয় দেখানো হইল। ‘ইগনে কম্বুরাটুর সিক্ কুওড, মোর্রিয়ারটুর’—অগ্নিদণ্ড করা হইবে।

এবার ফ্লরেন্সের নবীন কবি যযাবরের ধর্ম দীক্ষা নিলেন। তাহার নিজের ভাষায় ‘তথ্যযাত্রী, অচেনাপথ বাহিয়া চলিয়াছে, সম্মুখস্থ প্রতি কুটিরকেই সে পাথশালা বলিয়া মনে করে;—নিকটে গিয়া যখন দেখে, তাহা নয়, তখন ভাবে, তবে ইহার পরেরটি অবশ্যই হইবে। এইরূপে দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া অবশেষে হয়তো মাথা রাখিবার একটা স্থান মেলে।’

মাঝে মাঝে সম্ভ্রান্ত গৃহে তিনি আশ্রয় পাইতেন—মহান কবিরূপে নয়, সর্বহারা ভিক্ষুরূপে—কেহ তাহার কবিত্ব প্রতিভার কথা জানিত না। দুখণ্ড মাংস ছুঁড়িয়া দিয়া স্থানোদর অভিজাত সম্প্রদায় আবার তাহাদের মনোহারী সং ও মদ্যের দিকে মন দিতেন। কেবল একজন সম্ভ্রান্ত পুরুষ তাহার কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন, লোকে দান্তেকে ছাড়িয়া ঐ ভাঁড় ও সংগুলিকে লইয়া থাকে কেন? দান্তে উত্তর করিয়াছিলেন, ‘রতনে রতন চেনে।’.....

.....শান্তিহীন, কক্ষচ্যুত, তিস্ত অভিজ্ঞতা-ভরা জীবন। তবুও দানতে নিজেই নত করেন নাই। উহাদের বিস্তৃত যতই থাক, চিন্তের দিক্ হইতে উহারা কপদ'কহীন। সোনাদানা হইতে অনেক দামি তাহার অন্তরের রস, তাহার মানসিক সম্পদ।

(৩)

এমনি করিয়া সীমাহীন কল্পনার অতল বিস্তৃতির মধ্যে দানতের মন যতই উড়িয়া চলিল, তাহার হৃদয় ততই কামনা করিতে লাগিল ফ্লরেনসের মাটিটুকুকে। বারবার তিনি আবেদন জানাইলেন, এবার তাহার অধিকার তাহাকে প্রত্যাপন করা হোক—প্রতিবারই কর্তৃপক্ষের উত্তর আসিতে লাগিল, দানতেকে তাহারা শুধু মার্জনা করিতে সম্মত আছেন, আর কিছুই করা তাহাদিগের পক্ষে সম্ভব নহে। ক্ষুদ্র দানতে এ সত্বে অস্বীকার করিয়া লিখিলেন, 'পনেরো বছরের দুঃখ-স্বীকার ও নিবাসন ভোগের পর এই কি দানতে আলিখিয়োর উপযুক্ত প্রতিদান? এত শাস্তির আঘাতের পর আবার অবনতির অপমান—নির্দোষের প্রতি এই কি ন্যায়বিচার? দার্শনিক যে, সে কখনো দাগীপাপীর মত নিজের হাতে বেড়ি পরাইতে দিবে না। ন্যায় ও কলাগের কবি কখনো বিপক্ষের হস্তে ক্ষমাভিক্ষা করিবে না। স্বদেশে ফিরিবার এ পথ আমার নহে।'

অন্যাপথের সন্ধান করিতে লাগিলেন তিনি। এই একই ভাবে উদ্বুদ্ধ আরও কয়েকটি সহ-বন্দীকে লইয়া বলপূর্বক নগরপ্রবেশের চেষ্টা করিলেন। বীরোচিত সে প্রয়াস ব্যর্থ হইল। আবার সেই নিঃসঙ্গ নিভৃতবাসের পালা। ইতালিয়ভাষী সকল স্থানেই আমি ভিক্ষকের ন্যায় ঘুরিয়াছি, অনিচ্ছা সহকারে সকলকে দেখাইয়াছি আমার দুঃভাগ্যের ক্ষতিচিহ্ন। হালভাঙা, পালহারা আমার জীবনতরণী বারোবারে প্রতিব্দল বন্দর বা তুটে ভিড়িয়াছে নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের তন্ত দুর্যোগ নিশ্বাসের মধ্যে।'

এতদিনে ইতালির কোনো কোনো স্থানে তাহার কবিত্ব প্রতিভার কথা ঈষৎ শোনা যাইতেছিল। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া সবাই বিস্মিত হইল; এই জীর্ণ, ক্ষীণায়ু হতভাগ্যের মধ্যে প্রতিভার শিখা জ্বলিতেছে! তাও কি সম্ভব? 'অনেকের নিকট গিয়াছি, তাহারা আমার সামান্য খ্যাতি শুনিয়া আমার সম্পূর্ণ অনা একরূপ কল্পনা করিয়াছিল। এবার স্বচক্ষে দেখিয়া তাহারা শুধু আমারই নয়, আমার রচনার প্রতিও ঘণা পোষণ করিতে লাগিল।'

তিনি সরুপ ছিলেন না। বোকাচিও লিখিয়াছেন, 'তাহার মুখ দীর্ঘ, নাক বাঁকা, চিবুক বৃহৎ, সদাযুৎসর মত নিম্নোষ্ঠ উপরেটি হইতে সম্মুখে বাহির হইয়া আছে,

...ক্ষমদেহ অবনত, বর্ণ তাম্রাভ, চোখ দুটি বসিয়া গেছে, সর্বদাই বিষম ও যুদ্ধং দেহি ভাব।' আর একজন সমসাময়িক, গিওভানি ভিলানি, লিখিয়াছেন, 'এই দানতে লোকটি দাম্ভিক এবং লাজুক, উন্নীত, অন্যান্য দার্শনিকদের মতই অভদ্র, অশিক্ষিতের সহিত আচরণ সম্বন্ধে অজ্ঞ।'

এইরূপে জীবিতদের জগতে দানতে নিঃসঙ্গভাবে ঘুরিতে লাগিলেন। কিন্তু কল্পনায় যে মূর্তের জগৎ তিনি আঁকিতে-ছিলেন সেখানে তিনি একা নহেন, সংগে বিয়াগিচে। অমৃত আশ্বার সমাবেশ হইয়াছে সেখানে—স্বর্গে, নরকে ও শোষণস্থলে। অসংখ্য নরনারী, শিশু, সকলকে তিনি ঈশ্বরোচিত সুবিচার এবং মানবোচিত দয়া দান করিতেছেন। 'ভিভিনা কমেডিয়াতে মূর্তের জগৎ আঁকিতে গিয়া চিরশত্রুকে দানতে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। তাহার শত্রুদের তিনি নরকান্নের ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন, ভীষণতম অগ্নিকুণ্ডটি রহিল চিরশত্রু পোপ্ বোনিফেস-এর জন্য। ১৩০৩এ পোপের মৃত্যু হইল। দানতে তখন নরকবাসের সগটি লিখিতেছেন। অগ্নিকুণ্ড দেখাইয়া উৎসুকভাবে প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কি এখনি ওখানে দাঁড়িয়ে আছো, বোনিফেস?"

ভিভিনা কমেডিয়া-র প্রসিদ্ধতম 'ইন-ফেরনো' বা নরকের পরিচ্ছেদটি যে শুধু বাস্তবগত প্রতিশোধের বাসনা লইয়াই রচিত, তা নয়। সেকালের মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রার স্বর্গ, নরক প্রভৃতির যে কল্পনা হইয়াছিল মানুষের পাপপুণ্যের বিচারালয়স্বরূপ, তাহাকেই দানতে সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। সে যুগের ধর্মকে রূপ দিয়াছেন দানতে, তাই তাহাকে বলা হয় 'নীরব শতাব্দীর কণ্ঠ'। ধর্মের যে কল্পনা বায়ব-ভাবে আকারে রহিয়াছিল, তাহাকে রূপ দিয়া দানতে সকলের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন। তিনি শুধু নিজের শত্রুদেরই নরকস্থ করেন নাই, যাহারাই তাহার কাছে ঈশ্বরের শত্রু বলিয়া সাবাস্ত হইয়াছে, তাহাদেরই নরক ভোগের দূর্দশা ঘটাইয়াছে তাহার হাতে।

এবার 'ভিভিনা কমেডিয়া'র যাত্রাপথের একটি সংক্ষিপ্ত আভাস পাওয়া যাক্। কাহিনীটি এই:

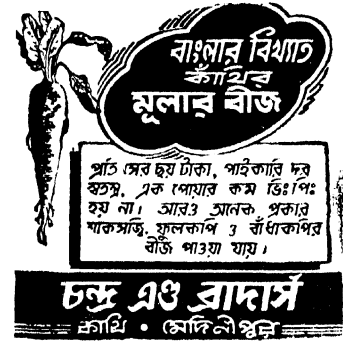
একদা এক গহন অরণ্যে পথভ্রান্ত অবস্থায় কবি দেখিলেন এক চিতাবাঘ, এক নেকড়ে বাঘ ও এক সিংহ—সম্ভবতঃ ইহারা লালসা, উচ্চাশা ও দর্পের প্রতীক—তাহাকে আক্রমণোদ্যত। এই সংকটকালে 'ঈনিড' এর মহাকবি ভার্জিল আসিয়া তাহাকে রক্ষা করিলেন। তারপর উভয়ে যাত্রা করিলেন পাতালপুরীর বিভিন্ন রাজ্যগুলি দর্শনার্থে।

উভয়ে নরকের বহিঃগণে আসিয়া উপনীত হইলেন। সেখানে নামগোত্রহীন,

অলস, তুচ্ছ ব্যক্তিদের আশ্বার গতি হইতেছে। বিরামহীন শ্রমই ইহাদের শাস্তি, তাহার ভাষায় ইহারা 'ঘূর্ণিঝড়ে বালুকণার ন্যায় চির-ঘূর্ণমান।'

এরপর নরকের অভ্যন্তর—তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে যে সকল পাপীরা সহসা দূর্ভূতি সাধন করিয়াছে, তাহাদের আয়োজন। দ্বিতীয়াংশে চোর, জুয়াচোর আদি। আর তৃতীয়াংশে যাহারা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া খুব প্রকৃতিস্বভাবে খুনজখম, কৃতঘ্নতা, গদুতর-বৃত্তিতে লিপ্ত হইয়াছে।

সে এক অন্ধকার, ভয়ানকস্থান—'এখানে যাহারা প্রবেশ করিবে, তাহারা সকল আশা ত্যাগ করো।' প্রথমদলকে অগ্নিতন্ত বালু-



(১ম ২১৮৬)

## পাকা চুল

কলপ ব্যবহার করিবেন না। আমাদের আয়ুর্বেদীয় সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করুন এবং ৬০ বৎসর পর্যন্ত আপনার পাকা চুল কালো রাখুন। আপনার দৃষ্টিশক্তির উন্নতি হইবে এবং মাথাধরা সারিয়া যাইবে। অল্প সংখ্যক চুল পাকিলে ২৫০ টাকা মূল্যের এক শিশি, বেশী পাকিয়া থাকিলে ৩৫০ মূল্যের এক শিশি, যদি সবগুলিই পাকিয়া থাকে, তাহা হইলে ৫০ টাকা মূল্যের এক শিশি তৈল ক্রয় করুন। ব্যর্থ হইলে দ্বিগুণে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হইবে।

## শ্বেতকুষ্ঠ ও ধবল

শ্বেতকুষ্ঠ ও ধবলে কয়েক দিন এই ঔষধ প্রয়োগের পর আশ্চর্যজনক ফল দেখা যায়। এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া এই ভয়াবহ ব্যাধির হাত হইতে মুক্তিলাভ করুন। সহস্র সহস্র হাকিম, ডাক্তার, কবিবরাজ বা বিজ্ঞাপনদাতা কর্তৃক ব্যর্থ হইয়া থাকিলেও ইহা নিশ্চয়ই কার্যকরী হইবে। ১৫ দিনের ঔষধের মূল্য ২৫০ আনা।

## বৈদ্যরাজ অখিলকিশোর রায়

পোঃ সুরাইয়া, জেলা হাজরাবাগ।

রাশির উপর বাঁধা রাখা হইয়াছে। শ্বিতীয় দলটিকে শয়তানেরা কশাকর্জিত অবস্থায় পুণ্ড্রগন্ধময় পঙ্ককুণ্ডে ফেলিয়া দিতেছে। আর তৃতীয় দলকে নন্দনে এক বিশাল তুরারসমুদ্রে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছে। তাহাদের আত্মনা দে নরকের আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ।

এর পরে কবি আমাদের শোধনস্থলে লইয়া চলিয়াছেন। এখানে নারকীয় শাস্তি অন্তে স্বর্গীয় শান্তির জন্য পাপীদিগকে প্রস্তুত করা হইতেছে। দুর্গম এই শোধন-পর্বতে আরোহণে কষ্ট খুব—কিন্তু দানতের প্রাণে অসীম আশা, তারই বলে তিনি নির্বিকোঁটে উঠিয়া যান। দেখানে তিনি উৎসাহ দেন অসংখ্য আত্মাকে এই আরোহণপথে—‘অন্তরিকতা, প্রেম, অনুশোচনার মধ্যেই ঈশ্বরের পথ।’ তাঁহারা ঈশ্বরের মহিমার এক অনির্বচনীয় জ্যোতির্ময় গীতি শ্রুতিতে পান।

এইরূপে তাঁহারা স্বর্গের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হন। এবার পথপ্রদর্শক আর ভক্তজন নন্দ, স্বপনচ্যাবণী বিয়্যগ্রিতে। তারা তারা তিনি কবিকে পথ দেখাইয়া চলেন—জ্যোতির্ভাসিত স্বর্গলোকের পথ। স্বর্গের সে সৌন্দর্য, মাধুর্য, মানুষ্যের ভাবের অতীত। কুসুমসৌরভ, সঙ্গীতসুধা, আলোকমালায় মাধা সকল মানুষ্যের প্রাণতরঙ্গ পতিয়া চলিয়াছে এক দর্শিত, প্রেম ও রূপের সমৃদ্ধ অভিমুখে। স্বর্গের এই উদ্ভাসিত হইতে পৃথিবীর দিকে ঢাঁিয়া দানতে বলিতেছেন,

‘হায়, নন্দর মানুষ্যের মূঢ় দর্প!’

ইহারা কৃত্রিম একটু প্রশংসা, একতাল সোনা

নিজের একটি মূর্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য!

এ চায় অনেকে শাসন করিতে

লোভে অন্ধ আর একজন হত্যা করে

জীবনপথের সহচরীকে।

হায়রে নিরর্থক, ক্ষণিক উল্লাস, নিষ্ফল দম্ভ!”

পৃথিবীর এই আভাসটুকু দিয়া অবসান হয় এই ‘স্বর্গীয় মিলনায়ন’। সেই ‘ভিভেসো পেরুলা লুসে ইটেন’ বা ‘শাস্বত জ্যোতিঃ-প্রবাহের—

‘গভীর অন্তঃস্থলে আমি দেখিলাম  
খণ্ড খণ্ড গ্রহতারকার ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদ  
এক অখণ্ড পূর্ণ বিশ্বগ্রন্থের মধ্যে গ্রথিত  
সুগন্ধীয় ঈশ্বরের সুকোমল হাতে।’

[ ৪ ]

মর্ত-জীবনের শত দুঃখকষ্ট, লাঞ্ছনা, অভ্যচার, নিপীড়নে অবমানিত দানতে তাঁর এই কপন্যার রাজ্যে নিজেকে মহিমময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। জীবন-সংগ্রামে পরাজিত কবি আর এক মানসলোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যেখানে তিনি আশ্রয় পাইবেন, ভালোবাসা পাইবেন, প্রীতি, স্নেহ, সখ্য পাইবেন। সকল

আতের জন্য এই সুখস্বপ্নলোকের গান—  
‘এ কাবের উদ্দেশ্যে মানবজাতিকে দুঃখকষ্ট হইতে পরিত্রাণ দিয়া আনন্দময় এক অমৃত-লোকে লইয়া যাওয়া।’

দেহমন ভগ্ন, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অপমান সব-কিছু সহ্য করিয়াও কবি তাঁহার কীর্তি সমাপনের জন্য বাঁচিয়া ছিলেন। সে কাজ শেষ হইল, চিরনিবাসিত কবি যাত্রা করিলেন তাঁর কপলোকের পানে—সেখানে হয়তো বিয়্যগ্রিতে অনির্বচনীয় দীপ হস্তে তাঁহার পথ চাহিয়া প্রতীক্ষমান।

জীবিকালে দানতের জন্মস্থান ফ্রেনস-এর

লোকে তাঁহাকে হত্যার ভয় দেখাইয়াছিল। মরণান্তে সেই দানতেরই দেহাবশেষ স্বদেশে ফিরাইয়া আনিতে ফ্রেনসবাসীরা উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাতে ফল হয় নাই। মরণস্থল রাভেমারেই তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

পাঁচশো বছর পরে ইংলন্ডের কবি বারন এই ইতালিয় কবির সমাধি দেখিতে আসিয়া-ছিলেন। বারন, যাঁহার বাঁহজীবনে কেহ কোনরূপ অবগণপ্রবণতা দেখে নাই, এই মৃত কবির সমাধি-শিখরে আসিয়া সেই বারন জানু পাতিয়া বসিয়াছিলেন—তাঁহার চোখে দেখা দিয়াছিল জল।

## প্রতি উৎসবে



স্বামী আর্কনার  
প্রধান অঙ্ক

সি. আর. দাশের

রাঙ্গাজবা  
সিন্দুর  
কুম্‌কুম  
আলতা



‘রূপং দোহ, জয়ং দৌহ’—রূপের এই আরাধনা বিলাস-প্রচেষ্টা নহে। সুন্দর হবার সুনির্বিড় আহ্বান মানুষ্য পেয়েছে তার অন্তর পুরুষের কাছ থেকে তাই কোটর ছেড়ে প্রাসাদ-বক্ষল ছেড়ে সে সৃষ্টি করেছে বিচিত্র বসন ভূষণ। এ তার কত বড় গর্ব ও আনন্দ! প্রসাধন দ্রব্যও জন্মোন্মত্তির পথ ধরে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। তার পরিচয় পাওয়া যায় ঘরে ঘরে রাঙ্গাজবাব নিত্য ব্যবহারে। বিশুদ্ধতায় ও বর্ণ-সম্পদে নারীকে সে দিয়েছে পরিপূর্ণ তৃপ্তি, তাই আজ প্রতি উৎসবে ‘রাঙ্গাজবা’র স্থান সবার উপরে। জাতি, ধর্ম ও বয়স নির্বিশেষে ভারত-নারীর প্রিয়তম প্রসাধন সি আর দাশের রাঙ্গাজবা সিন্দুর, কুম্‌কুম ও আলতা।

অনুম্‌পা কোমিক্যাল: কলিকাতা

## আমাদের ফিল্ম সেন্সর বোর্ড

আজ ভারতের জাতীয় গভর্নমেন্টের সম্মুখে বহু সমস্যা। তার মধ্যে একটি হল আমাদের ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের পুনর্গঠন করা। এ ব্যবস্থাটা অবিলম্বেই হওয়া উচিত। ব্রিটিশদের আমল থেকেই সেন্সর বোর্ড আমাদের দেশে আছে। কিন্তু এই বোর্ড কোনদিনই সেন্সরের প্রকৃত দায়িত্ব পালন করেন নি। কেননা এতকাল তারা পরিপূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিলেন ব্রিটিশ দয়ার উপর। যা কিছু ব্রিটিশ বিরোধী তা যতই আমাদের দেশ ও জাতীয় স্বার্থের পক্ষে অনুকূল হোক না কেন, তাঁদের কাঁচির হাত থেকে তার রেহাই ছিল না। আমাদের জাতীয় চিত্রশিল্প যে এতদিন জাতি গঠনমূলক প্রচেষ্টায় কোন উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করতে পারে নি—তার অন্যতম কারণ হল আমাদের এই ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সক্রিয় বিরোধিতা। কিন্তু সত্ত্বে সত্ত্বে তারা এমন অনেক চিত্র অনুমোদন করেছেন যা সত্য সত্যই আমাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বহু চিত্রের অশ্লীল যৌন আবেদনমূলক দৃশ্য সেন্সরদের কৃপাদৃষ্টি লাভ করে এসেছে। তার ফলে সমাজ-জীবনে দুর্নীতি প্রশয় পেয়েছে।

আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে এ অবস্থা কিছুতেই চলতে দেওয়া যেতে পারে না। জাতীয় জীবনে ও সমাজ জীবনে চিত্র শিল্পের অপ্রতিহত প্রভাব। চিত্রশিল্প সুপরিচালিত হলে যেমন প্রচুর জাতীয় কল্যাণ সাধন করতে পারে, তেমনিই কুপথগামী হলে প্রচুর অকল্যাণ সাধনও করতে পারে। জাতির কল্যাণমূলক প্রচেষ্টায় আজ জাতীয় চলচ্চিত্র শিল্পকে নিয়োগ করার সর্বাধিক প্রয়োজন আছে। এ কাজে জাতীয় সরকারকেই অগ্রণী হতে হবে। তাঁরা অগ্রণী হলে আমাদের জাতীয় চিত্রশিল্পের পরিপূর্ণ সহযোগিতা যে তাঁরা পাবেন সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। এ কাজকে সার্থক করে তুলতে হলে প্রথমেই সরকারী ফিল্ম সেন্সর বোর্ডকে পুনর্গঠিত করা প্রয়োজন। অতীতের কলঙ্কজনক ঐতিহ্যের হাত থেকে সেন্সর বোর্ডকে মুক্ত করতে হবে। এমন ব্যক্তিদের নিয়ে সেন্সর বোর্ড গড়ে তুলতে হবে যারা প্রকৃতই রস-বোধ এবং আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতিকামী। স্বার্থবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে তাঁদের কোন অননুগত্য বা ভীতি থাকলে চলবে না। তাঁরা হবেন চিত্রশিল্পের নির্ভীক সমালোচক। এইরূপ দৃঢ় চরিত্রের ব্যক্তিদের স্বেচ্ছা যদি আমাদের ফিল্ম সেন্সর বোর্ড



পুনর্গঠিত হয়, তবে প্রকৃত জাতীয় কল্যাণমূলক চিত্রের পক্ষে সরকারী অনুমোদন লাভ করা কষ্টসাধ্য হবে না এবং তার ফলে আমাদের জাতীয় জীবনের কল্যাণ হবে।

সেই সত্ত্বে আর একটি বিষয়ের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। চিত্রশিল্পকে একটি কেন্দ্রীয় বিষয় বলে গ্রহণ করতে হবে এবং



তারাস্করের 'ধাত্রী দেবতা' চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী চন্দা। ইন্টার্লিং ফিল্ম এক্সচেঞ্জের পরিবেশনায় ছবিখান শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিবে।

সারা ভারতের জন্যে বিচারের একই মাপকাঠি প্রয়োগ করতে হবে। প্রাদেশিক ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের পরিবর্তে সারা ভারতের জন্যে একটি-মাত্র দায়িত্বশীল ফিল্ম সেন্সর বোর্ড গড়ে তোলা অত্যাাবশ্যক।

## স্টুডিও সংবাদ

শ্রীনিবদরগ সাহার প্রযোজনায় চিত্রশিল্পী লিমেটেডের প্রথম বাঙলা চিত্র 'নতুন প্রভাত' এর চিত্র গ্রহণ শীঘ্র আরম্ভ হবে বলে প্রকাশ। চিত্রখান পরিচালনা করবেন শ্রীঅমল্য বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চিত্র-কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় কয়েকজন নতুন শিল্পী আত্মপ্রকাশ করবেন বলে জানা গেছে।

এম পি প্রোডাকসন্সের 'অনিবার্ণ' নামক চিত্র শ্রীসৌমেন মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায়

দ্রুতগতিতে সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। কানন দেবী, ছবি বিশ্বাস, অশ্ব গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, নরেশ মিত্র, রবি রায় প্রমুখ নামকরা অভিনেতা অভিনেত্রীরা বিভিন্ন ভূমিকায় অবতরণ করেছেন।

প্রোডাকসন্স বারো নামে একটি নবগঠিত চিত্রপ্রতিষ্ঠান শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর "আগামী দিন"-এর চিত্ররূপ দেবেন বলে স্থির করেছেন। রাধা ফিল্মস্ স্টুডিওতে শ্রীজ্ঞানাজন নিয়োগীর সভাপতিত্বে এঁদের শূভ মহরৎ সম্পন্ন হয়ে গেছে। চিত্রখান পরিচালনা করবেন শ্রীঅনাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রকাশ যে বেঙ্গল মুভিটোন নামক চিত্র-প্রতিষ্ঠান শীঘ্রই শ্রীমনীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা' নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাসকে চিত্রে রূপান্তরিত করবেন। চিত্রখান পরিচালনা করবেন মিঃ বি সেন।

## বিশ্ব-সাহিত্য গ্রন্থমালা

সম্পাদনাঃ জগদীন্দ্র বাগ্‌চী

## ১৪ই ডিসেম্বর.

মেরেভকোবস্কীর সুবিখ্যাত উপন্যাসের অনুবাদ করেছেন—শ্রীচন্দ্রজ্ঞান রায় ও শ্রীঅশোক ঘোষ। জার-শাসিত রাশিয়ার প্রথম বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের রক্তাক্ত কাহিনী।

## পঞ্চকল

কুপরিণের 'ইয়ামা'র অনুবাদ।

দাম—৩৫০

## ভাঙ্গা-গড়া

শ্রীকুমারেশ ঘোষ প্রণীত আধুনিক সমাজের সমস্যামূলক উপন্যাস।

দাম—২১০

## অ্যানিমা

শ্রীকুমারেশ ঘোষ রচিত স্ত্রী-ভূমিকাবর্জিত ছেলেমেয়েদের অভিনয়যোগ্য রসনাটিকা।

দাম—১

## শিশু কবিতা

শ্রীআশুতোষ কাব্যতীর্থ সংকলিত।

দাম—১১০

## রীডার্স কণার

৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬

কৃষ্ণা ফিল্মস এন্ড স্টুডিও লিমিটেড  
বিশ্বকমলচন্দ্রের প্রসিদ্ধ দেশস্বাধিক উপন্যাস  
“আনন্দ মঠকে” চিত্রে রূপায়িত করবেন বলে  
স্থির করেছেন। ২১শে আগস্ট বৃহস্পতিবার  
বেংগল ন্যাশনাল স্টুডিওতে এঁদের মহরং  
উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই উৎসবে  
পৌরোহিত্য করেছিলেন ‘রূপমণ্ড’ সম্পাদক  
শ্রীযুক্ত কালীশ মুখোপাধ্যায়। চিত্রখানি পরি-  
চালনা করবেন শ্রীসন্তোষ হাজরা।

\* \* \* \*

উপন্যাসিক মনোজ বসুর বহু প্রচলিত  
দেশপ্রেমোদ্দীপক উপন্যাস ‘ভুলি নাই’ শীঘ্রই  
চিত্রে রূপান্তরিত হবে। পরিচালনা করবেন  
হেমন্ত গুপ্ত এবং সংগীত পরিচালনা করবেন  
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

\* \* \* \*

চলিতকার দ্বিতীয় বাঙলা চিত্র “মাটি  
ও মানুষের” চিত্রগ্রহণ কার্য আরম্ভ হয়েছে বলে  
প্রকাশ। চিত্রকাহিনী রচনা করেছেন সুধীর  
বন্দু এবং পরিচালনাও করছেন তিনি।

\* \* \* \*

হিন্দুস্থান আর্ট পিকচার্সের বাণীচিত্র  
“দুধারা”র কাজ দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে  
চলেছে।

\* \* \*

বিশ্বকমলচন্দ্রের প্রসিদ্ধ উপন্যাস ‘চন্দ্রশেখর’  
পাইওনীর পিকচার্সের উদ্যোগে চিত্রে  
রূপায়িত হয়েছে। শীঘ্রই এই ছবিটি কলকাতায়  
মুক্তিলাভ করবে বলে প্রকাশ। এই চিত্রে

ভারতবিশ্বায় চিত্র-তারকাদের অপূর্ব সমন্বয়  
ঘটেছে। অশোককুমার, কানন দেবী ও ভারতী  
তিনটি প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।  
নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস।  
চিত্র পরিচালনা করেছেন দেবকী ঘোষ ও  
সংগীত পরিচালনা করেছেন কমল দাশগুপ্ত।

\* \* \* \*

বোম্বে টকীজ-এর বাঙলা চিত্র ‘নৌকা-  
ডুবি’ও শীঘ্রই কলকাতার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ  
করবে। বোম্বে টকীজ বহু সাফল্যপূর্ণ হিন্দী  
চিত্র নির্মাণ করে ভারতবাসী খ্যাতি অর্জন  
করেছেন। তাই তাঁদের নির্মিত প্রথম বাঙলা  
চিত্র কেমন যে তা দেখার জন্যে বাঙালী দর্শক  
সাধারণ উদগ্রীব হয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথের  
বিশ্বায় উপন্যাসকে তাঁরা প্রথমেই চিত্রে  
রূপায়িত করেছেন বলে দর্শকদের ঔৎসুক্য  
আরও বেড়ে গেছে। ‘নৌকাডুবি’র চিত্রনাট্য  
রচনা করেছেন শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস এবং চিত্র  
পরিচালনা করেছেন শ্রীনীতিন বসু। মানসটা  
ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর্সের পরিবেশনাধীনে  
মিনার, বিজলী ও ছবিঘরে ‘নৌকাডুবি’  
প্রদর্শিত হবে।

\* \* \* \*

আমাদের দেশের চিত্র প্রদর্শকরা যাতে প্রত্যেক  
প্রেক্ষাগৃহে চিত্র প্রদর্শনের শেষে ভারতের  
ত্রিবারঞ্জিত জাতীয় পতাকার চিত্র দেখাতে  
পারেন, সেই উদ্দেশ্যে সাহিন ফার্মিসাস বহু  
বর্ষের একটি ক্ষুদ্র ছবিতে জাতীয় পতাকাকে  
রূপায়িত করেছেন। সেই সংগে আছে

সম্মিলিত কণ্ঠে গীত জাতীয় সংগীত বন্দে  
মাতরম্-এর দুটি ছত্র। প্রসিদ্ধ সুরশিল্পী  
তিমিরবরণ ও প্রণব দে যত্নভাবে সংগীত  
পরিচালনা করেছেন।

### নানাকথা

সুপ্রসিদ্ধা চিত্রাভিনেত্রী কানন দেবী  
অবশেষে প্রকৃতই বিদেশ যাত্রা করেছেন।  
কলকাতায় সংবাদ পেয়েছে যে তিনি  
ইতিমধ্যেই লন্ডনে পৌঁছেছেন এবং স্যাক্স  
হোটেলে অবস্থান করছেন। লন্ডনে পৌঁছানোর  
পরদিন কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানী তাঁকে  
আমন্ত্রণ করে আপ্যায়িত করেছিলেন।

\* \* \* \*

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে  
নিউইয়র্কস্থিত মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ার  
কোম্পানী এবং তাঁদের হলিউড স্থিত  
স্টুডিওর পরিচালকমন্ডলী ও অভিনেতা  
অভিনেত্রীরা তাঁদের স্থানীয় কর্মকর্তাদের  
মারফৎ ভারতস্থিত তাঁদের পৃষ্ঠপোষকমন্ডলী  
ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।  
এই উপলক্ষে তাঁদের ভারতস্থিত সকল  
অফিস ও প্রেক্ষাগৃহে জাতীয় পতাকা  
উত্তোলনেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।  
আমাদের জাতীয় জীবনের এই স্মরণীয়  
দিনটিকে উপলক্ষ্য করে মেট্রো গোল্ডউইন  
মেয়ার কোম্পানী তাঁদের ভারতস্থিত সকল  
কর্মচারীকে স্বাধীনতা বোনাস হিসেবে দুই  
সপ্তাহের বেতন দিয়েছেন।

## সহসা

রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী

স্বতন্ত্র দিনটা সহসা চকিতে ভেঙে হলো থান খান,  
ভাঙা প্রাচীরের সমাধি-মৌন-ধ্যান  
খনে বিদ্যুৎ বেগে  
আকাশের স্লান স্পিনল চোখে আগুন উঠেছে জেগে।  
মৃতপঞ্জীর বন্দরে বন্দরে,  
পথে ঘাটে অন্দরে,  
ঝড় নেমে আসে জনতার ঘোলা চোখে,  
বন্যার ধারা শূঙ্ক-কঠিন বৃকে।  
খেয়াঘাট জনাকীর্ণ,  
দুঃস্বপ্নের পাংশু কুয়াসা দীর্ণ।  
জেগে ওঠা এই ক্ষণিকের ঝড়ো স্বাদ  
তোমার রক্তে এনেছে কি আজ অশ্লি-আশীর্বাদ?  
তোমার ধ্যানে কি চমকায় বিদ্যুৎ?  
তোমার স্বপ্নে এনেছে বাতাঁ নবজীবনের দূত?  
কী জানি আমার প্রশ্নের তুমি কী পাঠাবে উত্তর;  
আমার পেশিতে আমার শোণিতে  
সত্য হয়েছে আজকের এই বিদ্যুৎ জাগা ঝড়।

## বীরভোগ্যা

বিভা সরকার

কেন এই কাতরতা বার্থ বেদনার  
স্ববলে রচিয়া লহ পথ আপনার।  
বল তুমি নহ ভীরু নহ কাপুরুষ  
আপনি উঠবে জাগি ঘুমন্ত পোরুষ।  
কারো পানে চাহিও না করিও না রোষ  
বৃথা যদি অবহেলি দেয় কেহ দোষ।  
আধারে নিভাঁকি চিত্তে হও আগুয়ান  
আপন সত্যায় কর এবিসেব প্রমাণ।

ক্রন্দন কলঙ্ক—সে-ত দুর্বলের ধন  
দুঃখের সমুদ্র কর সবলে মগ্নন।  
অমৃত উঠিবে তবে পাবে খুঁজে আলো  
ধীরে ধীরে লাগি সম্পদ সাজালো।  
অক্ষয়ের নাহি ক্ষমা নাহিক সম্বল  
বীর পদভারে পৃথনী করে টলমল।



## ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের অস্ট্রেলিয়া অভিমুখে যাত্রার দিন বৃহৎ নিকটবর্তী হইতেছে ততই সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণ দলের শক্তি ও সামর্থ্যের উপর বিশেষ আস্থা রাখিতে পারিতেছে না। অনেকেরই হইতমধ্যে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন “এইবার দল প্রেরণ না করিলেই ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ভাল করিবেন।” এই যে নৈরাশ্যজনক অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণের মধ্যে ইহার জন্য প্রধানত দায়ী দলের মনোনিবেশ বিভিন্ন খেলোয়াড় সম্প্রদায় বিভিন্ন দিন নানা প্রকার সংবাদের প্রকাশ। প্রথমে সংবাদ প্রকাশিত হইল দলের অধিনায়ক বিজয় মাচেস্টে সম্পর্কে। তিনি নাকি স্বাস্থ্য ভগ্নের জন্য দলের সাহিত বাহতে পারিবেন না। মাচেস্টে একাই দলের শক্তির অধাংশ অপেক্ষাও বেশী। সেই মাচেস্টে বাইবেন না শুনিয়া সকলেই হতাশ হইয়া পড়িলেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড এই সংবাদ শুনিলামাত্র দিল্লিতে সন্ধ্যা সমাধানের “জন্য বৈঠক করিলেন। বৈঠকে ক্রিকেট হইল মাচেস্টে যদি দলের সাহিত না যান অমর-নাথকে দলের অধিনায়ক করা হইবে ও সহকারী অধিনায়ক হইবেন মনুভাক আলী। তবে সেই সঙ্গে মাচেস্টেকে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ দ্বারা পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইল। ডাক্তারগণ পরীক্ষা করিয়া স্বাস্থ্য ভগ্নের কোন লক্ষণ পাইলেন না। কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি ভবন মাচেস্টের সাহিত দেখা করিলেন। দীর্ঘ আলোচনা হইল। তারপর শোনা গেল, মাচেস্টের এক বন্ধু কোম্পাউন্টের এক হাকিমের নিকট মাচেস্টেকে লইয়া বাহিতেছেন। উক্ত বন্ধুর দৃঢ় বিশ্বাস আছে অতি অল্প সময়েই মাচেস্টেকে সুস্থ করিতে সক্ষম হইবেন। ইহা হইতে ধারণা করা যায়, মাচেস্টে দলের সাহিত শেষ পর্যন্ত বাহিবেন। হইতমধ্যে আরও একটি সংবাদ প্রকাশিত হইল অমরনাথ শর্মার অসুস্থতার জন্য পূর্ণার শিক্ষা শিবির ত্যাগ করিয়া স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। এই সংবাদের সংগে সশেণ আরও সংবাদ প্রচারিত হইল যে, মনুভাক আলী দলের সাহিত বাহিতে পারিবেন না। তাহাকে নাকি চাকুরী স্থান হইতে ছুটি দেওয়া হয় নাই। সি এস নাইডুর বাড়ির আশে পাশের অবস্থা আশঙ্কাজনক সেইজন্য তিনিও দেশে চলিয়া গিয়াছেন। কিংগডার্লিও মাডুদেবীর অসুস্থের সংবাদ পাইয়া বাস্তু হইয়া স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। অপর যে সকল খেলোয়াড় শিক্ষা-শিবিরে আছেন তাহারাও বিশেষ আনন্দে নাই। বর্টিসের জন্য অনশীলন করিতে পারিতেছেন না। কেবল মাঝে মাঝে সাধারণ ব্যায়াম করিতেছেন। অন্যান্য দলের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। ইহারই মধ্যে বিভিন্ন সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। অস্ট্রেলিয়া অভিমুখে ভারতীয় দল যাত্রা করিবে মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরে, আর সেই দলের বিভিন্ন খেলোয়াড় সম্পর্কে যদি এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত হয় তবে কাহারও পক্ষেই দলের উপর আস্থা রাখা সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণ যে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন ইহার জন্য তাহাদিগকে কোনরূপ

# খেলাধুলা

দোষারোপ করা চলে না। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পরিচালকগণের উচিত এই সময় সকল অবস্থা বিদ্যমানভাবে সকলকে বুঝাইয়া সাধারণের মধ্য হইতে নৈরাশ্য দূর করা। আমরা সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য হইতৌছি, হইতপূর্বে কখনও কোন বৈদেশিক ভ্রমণকারীর দল লংঘ্য এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় নাই—এইবার হইল কেন?

## দক্ষিণ আফ্রিকার পঞ্চম টেস্ট ম্যাচ

ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দলের পঞ্চম বা শেষ টেস্ট ম্যাচ অমান্যসিদ্ধভাবে শেষ হইয়াছে। এই খেলায় দক্ষিণ আফ্রিকা দল সময়ভাবের জন্য জয়ী হইতে পারে নাই পর পর তিনটি টেস্ট খেলার শোকার্হিতভাবে পরাজিত হইবার পরও শেষ খেলার দক্ষিণ আফ্রিকা দল নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে পারিয়াছে ইহা বড়ই কৃতিত্বের পরিচায়ক। টেস্ট খেলার “রবার” ইংল্যান্ড দল পাইয়াছে, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা দল শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত করিয়াছে যে, তাহারাও একদিন “রবারের” অধিকারী হইবে। ইংল্যান্ড দলের অধিনায়ক ইয়াডলী খেলার শেষে বলিয়াছেন, “দক্ষিণ আফ্রিকা দল অধিকাংশ তরুণ খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত। এই সকল তরুণ খেলোয়াড় ভবিষ্যতে ভালই ফলাফল প্রদর্শন করিবেন। বিভিন্ন খেলায় যে অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন তাহাই ভবিষ্যতে উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী করবে।” ইয়াডলীর এই ভবিষ্যদ্বাণী বার্থ হইবে বলিয়া মনে হয় না। মহাশুদ্ধের কবলে পড়িয়া দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড়গণ কয়েক বৎসর একেবারেই খেলিতে পারেন নাই তাহা সত্ত্বেও এইবারের ইংল্যান্ড ভ্রমণ বিশেষ নৈরাশ্যজনক হয় নাই। সেইজন্য আশা হয় অল্প সময়ের মধ্যেই ইহার উন্নতির পক্ষে প্রদর্শন হইবেন। নিম্নে টেস্ট খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

**ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংস:—**৪২৭ রান (হাটন ৮৩, কম্পটন ৫৩, ইয়াডলী ৫৯, ইভান্স ৫৫, ম্যান ৯৩ রানে ৪টি ও রোয়ান ৯২ রানে ৩টি উইকেট পান।)

**দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম ইনিংস:—**৩০২ রান (মিচেল ১২০, ডসন ৫৫, রাইট ৮৯ রানে ২টি হাডওয়ার্থ ৬৪ রানে ৩টি ও কম্পটন ৪৬ রানে ৩টি উইকেট পান।)

**...ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংস:—**৬ উই: ৩২৫ রান (কম্পটন ১১৩, হাডওয়ার্থ ৮৩, নট আউট ৪৫, রোয়ান ৮৯ রানে ৩টি উইকেট পান।)

**দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ইনিংস:—**৭ উই: ৪২৩ রান (মিচেল নট আউট ১৮৯, নর্স ৯৭, হাডওয়ার্থ ৮৫ রানে ৩টি উইকেট পান।)

প্রত্যেক স্বাধীন দেশ জাতীয় খেলাধুলার প্রসার ও প্রচারের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়া থাকে।

## জাতীয় খেলাধুলা

ভারত স্বাধীন হইয়াছে সুতরাং সেই ভারতে শীঘ্রই জাতীয় খেলাধুলা বিশেষ সনাদ লাভ করিবে এই বিষয় আমরা নিঃসন্দেহ। বোম্বাই প্রাদেশিক সরকারের পরিচালিত ব্যায়াম শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালকগণ হইতমধ্যেই এই বিষয়ে আগ্রহী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। ইহার শিক্ষা কর্মকর্তাদের মধ্যে হাড়ু-ডু ও অন্য একটি জাতীয় খেলার শিক্ষার ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বোম্বাই ব্যায়াম শিক্ষা কেন্দ্রের এই সংবাদ দেখিয়া আমাদের আশা আছে মাদ্রাজ, মহাপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি প্রাদেশিক ব্যায়াম শিক্ষা কেন্দ্রে অনুরূপ ব্যবস্থা হইবে। বাঙলার প্রাদেশিক ব্যায়াম শিক্ষা কেন্দ্রেও এই বিষয় পশ্চাতে থাকিবেন না নিশ্চয়। এখন প্রয়োজন হইয়াছে নিখিল ভারতীয় জাতীয় খেলাধুলা পরিচালকমণ্ডলী গঠন করা। ইহা অতি সম্ভব হইতে পারে যদি অখিল ভারতীয় শারীরিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই বিষয়ের ভার দেওয়া হয়। এই মহামণ্ডলী হইতেছে একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাহার উপর ভারতের সকল প্রদেশের ও সকল দেশীয় রাজ্যের ব্যায়াম পরিচালকগণের আস্থা আছে। কারণ এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতের সকল প্রাদেশিক সরকার ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ দ্বারা গঠিত। ভারতে অন্য যে সকল নিখিল ভারতীয় ব্যায়াম বা খেলাধুলার প্রতিষ্ঠান আছে তাহার একটিও এইরূপ সং-ভারতীয় প্রতিনিধিগণ লইয়া গঠিত হয় নাই। স্বতন্ত্রলি সুবিধাবাদী ক্রীড়ামোদিগণ বিদেশী সরকারের সহায়তায় এই সকল গঠন করিয়াছে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ সকল সময় বিরোধিতা করিয়াছে। খেলোয়াড় ও ব্যায়াম উৎসাহিগণ বাহ্যতে জাতীয় আন্দোলনে যোগদান না করে তাহার জন্য সকল সময় চেষ্টা করিয়াছে। এইজন্যই দেখা যায় এই সকল নিখিল ভারতীয় ব্যায়াম ও খেলাধুলার পরিচালকমণ্ডলীর সভাপণের কেহ কেহ সরকারের নিকট হইতে বড় বড় খেতাব লাভ করিয়াছেন। ইহার যে কোনদিন দেশকে ভালবাসেন নাই তাহার প্রমাণ তাহারা এখনও পর্যন্ত বৈদেশিক সরকারের প্রদত্ত খেতাব ত্যাগ করেন নাই। এই সকল সুবিধাবাদী ক্রীড়া পরিচালকদের নিখিল ভারতীয় কোন ব্যায়াম বা ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানে আর স্থান দেওয়া উচিত নহে। বাঙলা সরকার যদি এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে চাহেন তাহারা অখিল ভারতীয় ব্যায়াম শিক্ষা মহামণ্ডলের একমাত্র অন্তর্ভুক্ত বাঙলার প্রতিষ্ঠান স্বাধীন প্রাদেশিক জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘের সাহায্য লাভ করিতে পারেন। বাঙলার জাতীয় খেলাধুলা প্রচারের জন্য গত ৭ বৎসর ধরিয়া এই প্রতিষ্ঠানটিই অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছে। ইহাদের দান উপেক্ষা করিবার নহে। বাঙলার অধিকাংশ শহর ও গ্রামে ইহাদের কেন্দ্র আছে। ইহার অধিকাংশ পরিচালক জাতীয় আন্দোলনে বহু নিযুক্ত ও অধ্যাচার সহ্য করিয়াছেন। কারাবরণ করিতেও কুঠাঘোষ করেন নাই। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় জাতীয় উন্নতি সহায়ক এইরূপ ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান বাঙলা দেশে আর নাই।

১৮ই আগস্ট—ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ অদ্য অমৃতসরে প্রচারিত এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন যে, গোল-যোগকারী সমস্ত লোককে অবিলম্বে কঠোরহস্তে দমনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহারা বলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাব উভয় প্রদেশে অশান্তি দমনকল্পে ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান গবর্ণমেন্ট যুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

নয়াদিল্লীতে গণ-পরিষদের বাঙালার সদস্যগণ সীমা নির্ধারণ কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিবেচনা করেন। তাহারা বলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও খুলনাকে পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা আয়োজিক হইয়াছে।

১৯শে আগস্ট—গত কয়েকদিন ধরিয়া কলিকাতায় হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির যে অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা দিয়াছে, পশ্চিম বঙ্গের গভর্নর শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচাৰী কলিকাতা রোটারী ক্লাবের বক্তৃতা প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ করিয়া কলিকাতাবাসীদের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জানাইয়া বলেন,—“আপনারা একটি মহৎ জাতি, আপনারা যেমন খুব বড় ভুল করিয়াছেন, তেমনি অনেক শ্রেষ্ঠ কার্যও করিয়াছেন। ভারতের অন্য কোন আধিবাসীই এরূপ কাজ করিতে পারিত না।”

প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এক বেতার বক্তৃতা পাঞ্জাবের অবস্থা ও আন্দোলনকে গৃহীত সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, অমৃতসর ও লাহোরে আমরা অত্যাচারের বীভৎস কাহিনী শ্রবণ করিয়াছি—হাজার হাজার হিন্দু, মুসলমান ও শিখ আশ্রয়-প্রার্থীকে আমরা ঘর বাড়ী ত্যাগ করিয়া আসিতে দেখিয়াছি। শহরের কয়েকটি স্থানে তখনও আগুন জ্বলিতেছিল। আমরা এই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, দৃঢ়ভাবে এই পরি-স্থিতির সম্মুখীন হইতে হইবে এবং যে কোন প্রকারেই হউক, অবিলম্বে এই অনাচার বন্ধ করিতে হইবে।

মহাত্মা গান্ধী কলিকাতায় প্রাথমিক সভায় বক্তৃতাকালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কর্তব্যের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে প্রত্যেকটি সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়ের প্রতি কর্তব্য পালন করিয়া চলিতে হইবে। অপর রাষ্ট্রে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় কেমন ব্যবহার করিতেছে, সে বিচার না করিয়াই এ কর্তব্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

জামসেদপুরে বিহার বেংগলী এসোসিয়েশনের অধিবেশনে বিহারের বাংগলা ভাষাভাষী অণ্ডল সমূহকে পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানাইয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

মহাত্মা গান্ধী অদ্য কাঁচরাপাড়া পরিদর্শন করেন। কয়েকদিন পূর্বে তথায় হাংগামা হইয়াছিল।

২০শে আগস্ট—কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশে নিম্নলিখিত জেলাসমূহ থাকিবে—(১) কলিকাতা শহর, (২) হাওড়া, (৩) হুগলী,

(৪) বর্ধমান, (৫) বীরভূম, (৬) মেদিনীপুর, (৭) বাকুড়া, (৮) ২৪ পরগণা, (৯) নন্দীয়াপ (১০) মুর্শিদাবাদ, (১১) মালদহ, (১২) পশ্চিম দিনাজপুর, (১৩) জলপাইগুড়ি, (১৪) দার্জিলিং।

নয়াদিল্লীতে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে গণ-পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইলে শ্রীযুক্ত আর কে সিংহ এবং আরও কয়েকজন সদস্য হায়দরাবাদ, আগ্রা দুর্গা, জম্মুলপুর এবং আরও কয়েকস্থানে স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকার প্রতি অহমানন্য উল্লেখ করেন এবং ঐ সম্পর্কে তদন্তের দাবী করেন।

দীক্ষণ আত্মকাম্প ভারতীয়দের সমস্যা সম্পর্কে সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবের উপর নিভর করিয়া ফিল্ড মার্শাল স্মিটস ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মধ্যে যে সকল পর্যালাপ ঘটিয়াছিল অদ্য নয়াদিল্লীতে সেগুলি সরকারীভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে।

কলিকাতায় পোলক স্ট্রীট ময়দানে প্রাথমিক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী চট্টগ্রামের অবস্থার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গান্ধীজী বলেন—অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে, খাদ্য ও বস্ত্র বণ্টন করিতে হইবে এবং চিকিৎসাও ব্যবস্থা করিতে হইবে। তিনি বলেন যে, রিলিফের কাজে বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ করা প্রয়োজন। মোড়ায়ারী রিলিফ সোসাইটি হিতপুর্বেই কনিদল প্রেরণ করিয়াছেন জানিয়া মহাত্মা গান্ধী আনন্দ প্রকাশ করেন। মিঃ মুরহেডের নেতৃত্বাধীনে ফ্রেডস সার্ভিস ইউনিটও চট্টগ্রাম যাত্রা করিতেছেন।

২১শে আগস্ট—অদ্য এক আদেশ জারী করিয়া গভর্নরের বেতন হ্রাস করা হইয়াছে। অতঃপর প্রত্যেক গভর্নর সমান বেতন পাইবেন

এবং উহা বার্ষিক ৬৬ হাজার টাকা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। বোম্বাই ও মাদ্রাজের বর্তমান গভর্নরদের সম্পর্কে এই আদেশ প্রযুক্ত হইবে না।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে মেয়েদের এক বিশাল সভায় মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও হিন্দু মুসলমান ঐক্য সম্বন্ধে মেয়েদের বিরাট দায়িত্বের কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন।

কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত শংকর-রাও দেও চোরাকারবার ও দুর্নীতি নিবারণের জন্য বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান মন্ত্রীর নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

২২শে আগস্ট—ডাঃ খাঁ সাহেবের মতিসভাকে বরখাস্ত করা হইয়াছে এবং সীমান্তের গভর্নর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের বিরোধী দলের তোতা খাঁ আব্দুল কোরায়ুম খাঁকে মতিসভা গঠন করিতে আহ্বান করিয়াছেন। হায়দরাবাদের নিজাম অদ্য এই মর্মে এক ফারমান জারী করিয়াছেন যে, বিগত ১৫ই আগস্ট হইতে হায়দরাবাদ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে গণ্য হইবে।

উত্তর কলিকাতার দেশবন্ধু পার্কে লক্ষাধিক নরনারীর এক বিশাল সমাবেশের মধ্যে অদ্য মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভা বসে। গান্ধীজী উক্ত সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, ধর্ম বস্তুগত ব্যাপার এবং লোকে যদি উহা নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতে পারে, তবে তাহাদের রাজনৈতিক জীবনে কোন গোজমানই দেখা দিবে না।

২২শে আগস্ট—পূর্ববঙ্গ সরকারের এক প্রেসনাটে প্রকাশ, এখন হইতে নিম্নলিখিত পাঁচটি জেলা লইয়া চট্টগ্রাম বিভাগ গঠিত হইবে—চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ঠিকুরা ও শ্রীহট্ট। নিম্নলিখিত জেলাগুলি লইয়া রাজসাহী বিভাগ গঠিত হইবে—রাজসাহী, রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, খুলনা, যশোর ও নদীয়া।

পশ্চিম বঙ্গ সরকার আগামী ২৫শে আগস্ট হইতে চাউলের বরাদ্দ হ্রাসপূর্বক ২ সের ৩ ছটাসের স্থলে ১ সের ৫ ছটাক করিবার



কলিকাতায় গান্ধীজীর শান্তি প্রচেষ্টা : একটি প্রাথমিক সভায় মিঃ সুরাবর্দী বক্তৃতা করিতেছেন

সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

পশ্চিম বঙ্গ সরকার আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড টাইম মানিয়া চলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

২৩শে আগস্ট—শ্রীহট্টের সংবাদে প্রকাশ, গত ১৯শে আগস্ট হইতে হবিগঞ্জ মহকুমার লখাই ও হবিগঞ্জ থানায় গুরুতর সাংপ্রদায়িক গোলাযোগ, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ আরম্ভ হইয়াছে। এই গোলাযোগ ক্রমশই প্রসার লাভ করিতেছে।

ঢাকার এক অসম্মানিত সংবাদে প্রকাশ যে, সীমানা নির্ধারণ কমিশনের রোয়েদাদ প্রকাশ হইবার পর হইতে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে তাঁর অসন্তোষ ও গোলামাল আরম্ভ হইয়াছে। শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পূর্ব বাঙলা গভর্নমেন্ট একদল সশস্ত্র পাক্ষাবী মুসলমান পুলিশ তথায় পাঠাইয়াছেন।

পূর্ব বঙ্গ সরকারের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলেন যে, চট্টগ্রামের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের সমস্ত আউশ ফসল নষ্ট হইয়াছে। চট্টগ্রামে ৫ হইতে ৭ লক্ষ লোক এবং ফেণীতে প্রায় আড়াই লক্ষ লোক ক্ষুধাগ্রস্ত হইয়াছে। আমন ধানের বীজেরও ক্ষতি হইয়াছে। গভর্নমেন্ট কৃষকদিগকে কৃষি ঋণ দিতেছেন। সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

পাকিস্থান সরকারের আদেশ অনুযায়ী আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন আবদুর রাসিদকে

স্বাধীনতা দিবসে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

২৪শে আগস্ট—কলিকাতায় গড়ের মাঠে মনুমেন্টের পার্শ্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধীকে নাগরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। গান্ধীজী তাঁহার প্রাথমিক ভাষণে বলেন, “ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান—এই উভয় জোমিনয়নকে যদি সন্তানের সহিত এবং বন্ধুভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হয় তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক মনোভব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিতে হইবে।”

হারদরবাদ রাজ্যে ‘সত্যগ্রহ’ আন্দোলন চলিতেছে। গতকলা ৪ জনকে আইন অমান্যের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়।

রেওয়া রাজ্যের ভূতপূর্ব মহারাজা স্যার গোলাপ সিং রেওয়া রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ভারত গভর্নমেন্ট ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত করেন।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অদ্য পূর্ব পাক্ষাবে দ্বিতীয়বার সফরকালে নানা স্থানে জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন জানান। এক প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতজী জানান যে, পশ্চিম পাক্ষাবে বলপূর্বক সম্পত্তি দখলের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পাকিস্থান সরকারকে বিষয়টি জানান হইয়াছে।

## ভিদেশী সংবাদ

১৯শে আগস্ট—ইন্দোনেশিয়ায় শান্তিপূর্ণ ভাবে যুদ্ধ বিগ্রহের অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যস্থতা করার জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহা অদ্য সরকারীভাবে প্রত্যাখ্যার করা হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অসম্মত হওয়ায় এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

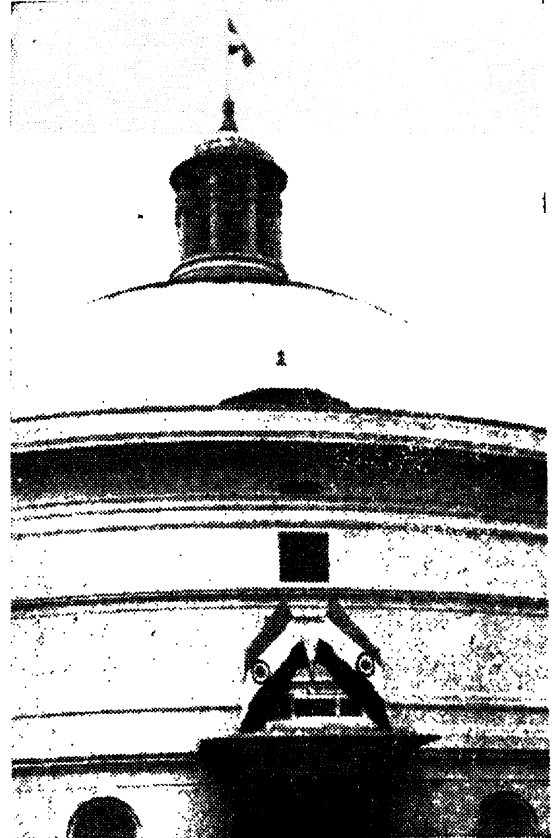
গতকলা ফেব্রুয়ারির অন্তর্গত কানিজের জাহাজ ঘাটায় এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে দুই শতাধিক ব্যক্তি নিহত ও পঞ্চাশ হাজারের অধিক লোক আহত হয়।

২১শে আগস্ট—ব্রিটিশ অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত এক আদেশ দ্বারা অদ্য হইতে পূর্ব গোলাবর্ষে স্টালিংকে ডলারে পরিবর্তিত করিবার ব্যবস্থা রহিত করা হইয়াছে।

২৪শে আগস্ট—ম্যাগেস্তারের সংবাদে প্রকাশ, ফ্রান্সের দ্য ব্লুক বন্দর হইতে প্যালেস্টাইনের দরিয়ায় আগত সাড়ে চারি শত ইহুদী আশ্রয়-প্রার্থীকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট জার্মানীতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত করায় উহার প্রতিবাদে উত্তর ইংল্যান্ডের ৪৫ হাজার ইহুদী আগামীকলা হইতে সারাদিন অনশন করিবেন।



পণ্ডিত নেহরু ও মিঃ রফি আহমদ কিসোরায় গণপরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য হাটতেছেন



স্বাধীনতা দিবসে গণপরিষদের শীর্ষে জাতীয় পতাকা

# দেশ

সম্পাদক : শ্রীবাঞ্ছনচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

চতুর্দশ বর্ষ।

শনিবার, ২০শে ভাদ্র, ১৩৫৪ সাল।

Saturday, 6th September, 1917,

[ ৪৪শ সংখ্যা

## জাগরণের আহ্বান

গত ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতার শান্তি আবার বিপর্যস্ত হইয়াছে। নরঘাতক গুণ্ডার দল আবার ছোরা তুলিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ঐ দিন রাত্রি হইতে অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। গান্ধীজীর সংকল্প বৃতদিন শহরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত তিনি অনশন ব্রত ভঙ্গ করিবেন না। যাহারা শহরের শান্তি এইভাবে হিংস্রতা এবং বর্বরতার ভঙ্গ করিতেছে, তাহাদের আমাদের আর বলিবার কিছু নাই। ইহাদের রক্তের অন্ত নাই। প্রকৃতপক্ষে কলিকাতায় বর্তমানে যে উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে, ইহাকে সাম্প্রদায়িক অশান্তি বলা চলে না। ইহা রীতিমত গুণ্ডারাজ। এইসব গুণ্ডাদের কাছে হিন্দু নাই, মুসলমান নাই। ইহারা শহরে অরাজক অবস্থা যেন তৈরী ভাবে সৃষ্টি করিয়া লুণ্ঠরাজ চালাইতে চায়। মহাত্মা গান্ধীর প্রাণের জন্য ইহাদের কোন দরদ নাই। তিনি নিজের প্রাণ বিসর্জন দেন, ইহারা বোধ হয় তাহাই চায়। বাঙলার জন্য ইহাদের যত দরদ সবই জানা যাইতেছে; বস্তুত ইহাদের নৃশংসতাপ্রণোদিত দৌরাণ্ডো বাঙলা দেশ ধ্বংস হয়, ইহারা তাহাই কামনা করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কঠোরহস্তে এই দৌরাণ্ডা দলন করুন। জাতিধর্মনির্বিশেষে ইহাদিগকে সারোস্ত্রতা করা হউক, কিংবা প্রয়োজন হইলে বাঙলাদেশ হইতে ইহাদিগকে বাহির করিয়া দেওয়া হউক, আমরা ইহাই চাই। পাজাবের জন্য বেদনা আমাদের কম নয়; কিন্তু কলিকাতা শহরের রাজপথ নির্দেশ এবং নিরীহের রক্তপাতে কলঙ্কিত করিয়া, এখানকার অগণিত নরনারীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিয়া পাজাবে অন্তর্নিষ্ঠিত অত্যাচারের প্রতিকার হইবে না। পক্ষান্তরে কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার প্রভাব

## সাম্প্রদায়িক ব্রহ্মচর্য

ভারতের অন্যান্য স্থানেও সম্প্রসারিত হইবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, পারস্পরিক জিঘাংসার বর্বরতা বাহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে, এসব কোন সুস্থিতি তাহারা মানিবে না। এ অবস্থায় সহবাসীদের সকলকে সহবেব শান্তি রক্ষার জন্য কলিকাতার নাগরিক মথিদা অক্ষয় রাখিবার জন্য আগাইয়া যাইতে হইবে। তাহারা



অত্যাচারীকে সংযত করুন এবং হিন্দু কিংবা মুসলমান, বিপন্ন অবস্থায় পতিত দেখিলে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হউন। আমরা যে মানুষ, এ কথা যেন আমরা না ভুলিয়া যাই। আমরা যেন বাঙলার সনাতন সংস্কৃতির মথিদা বিস্মৃত না হই এবং বাঙলার শত শত স্বদেশপ্রেমিক সন্তান মহামানবতার যে উদার আদর্শের প্রেরণায় প্রণোদিত হইয়া স্বাধীনতার যজ্ঞে আত্মহুতি প্রদান করিয়াছেন,

আজ গুণ্ডা বা নরঘাতকদের ভয়ে সেই সব স্বদেশপ্রেমিক সাধকগণের স্মৃতিকে অবমাননা করিবার মত দুর্বলতাকে ক্ষণেকের জন্যও অন্তরে পোষণ না করি। আমরা আজ দৃঢ় কণ্ঠে এই সংকল্পই ঘোষণা করিব যে, আমরা বর্বরতাকে আর কিছুতেই বরদাস্ত করিব না এবং কলিকাতা সহরে স্থায়ী শান্তি ফিরাইয়া আনিব। স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি; কিন্তু বাঙলার সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং নরঘাতকদের হিংস্র বর্বরতার প্রবৃত্তি দমন করিয়া আমরা সে স্বাধীনতাকে সমাজ-জীবনের শান্তিপূর্ণ সংস্থাপিত সত্য করিয়া তুলিব। মহাত্মা গান্ধীর মানব মণ্ডলময় তপস্যা ভারতের স্বাধীনতার পূর্ণাঙ্গীর্ণ ভূমি এই বাঙলা দেশে পুনরুজ্জীবিত ভাগীরথীর এই এই উপকূলভাগেই সর্বংশে সার্থকতা লাভ করিবে, আমরা ইহাই দেখিতে চাই।

## শান্তির স্থায়িত্ব

পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী সম্প্রতি একটি যুক্ত বিবৃতিতে আমাদের এই আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন যে, পাজাবে যাহাই ঘটুক, তাহারা উঠিয়ে পশ্চিম এবং পূর্ববঙ্গে শান্তি অক্ষয় রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। এক বৎসর পরে কিছুদিন হইল কলিকাতায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু আতঙ্ক তখনও একেবারে দূর হয় নাই। গত সোমবারে দীর্ঘ দিনের এই শান্তি কয়েকটি ঘটনায় কিছু বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। সুখের বিষয়, ইহা বিস্মৃত হইতে পারে নাই। কতকগুলি স্বার্থসংশ্লিষ্ট দৃষ্ট লোকের দ্বারা প্ররোচিত এই অশান্তি সংকীর্ণ গাঁড়ের মধ্যেই নিবদ্ধ আছে। কিন্তু পাজাবের ব্যাপারের প্রতিক্রিয়া ইহার মূলে রহিয়াছে। দৃষ্টান্তলোকে স্থানকার অশান্তির সূত্র ধরিয়াই এখানে অশান্তি সৃষ্টি করে। কলিকাতা শহরে ভারতের

না, উদাহরণস্বরূপ কৃষ্ণনগরের রাজা ঐতিহ্যের আশ্রিত বাণেশ্বর বিদ্যালয়কার পং মহারাজনন্দকুমার হইতে ওয়ারেন্ পুংস্বত রাজপুত্রবর্ষের অনুগ্রহপুষ্ট তর্ক পণ্ডাননের নাম করা যাইতে। বার্ণায়ার আওরংজেবের আমলের কাশী-র যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতেও তসর ও রদের উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া পণ্ডিতদের শিবিকারোগ্রহণে গমনাগমনের কথা বলা হইয়াছে, বলা বাহুল্য বহু ধনী ইহাদের পুষ্টপোষক ছিলেন এবং দারিদ্র্য কাহাকে বলে তাহা তাহারা জানিতেন না। “বিনাপ্রায়ংন তিস্তি কবিতা-বিনিতা-লতাঃ” আশ্রয় ব্যতীত কবিতা, বিনিতা ও লতা অবস্থান করিতে পারে না বলিয়া যে প্রবচন চলিয়া আসিয়াছে তাহার মূলে যথেষ্ট সত্য আছে।

চসার হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করিলেও দেখিতে পাই চসার ধনী মদ্যব্যবসায়ীর পুত্র এবং স্বয়ং রাজানুগ্রহে পুষ্ট, বেকন উচ্চপদস্থ রাজপুত্রবর্ষের পুত্র, সিডনী এবং রালে উভয়েই উচ্চপদস্থ রাজপুত্রবর্ষ, হারবার্ট ধনী পিতার সন্তান, ড্রাইডেন এডিসন, বার্ক, ফিল্ডিং, ওয়ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, সাদে, স্কট, বায়র্ন, শেলী ইত্যাদি কেহই অল্পবয়সহীন দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন নাই। সেক্সপীয়র, মিল্টন্, পোপ, জনসন, গোল্ডস্মিথ প্রভৃতি বড় ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন নাই এবং বেন জনসন, স্পেনসার, বানিয়ান ইত্যাদিকে নানাপ্রকারের দুর্দশা ভোগ করিতে হইয়াছে, কিন্তু যাহাকে প্রকৃতই দরিদ্র বলে কেহই তাহা ছিলেন না। সত্যকথা বলিতে গেলে প্রাচীন ভারতের সাহিত্যিক ও পণ্ডিতগণের তুলনায় ইংলন্ড ও ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের মধ্যযুগের সাহিত্যিকগণ তুলনায় দরিদ্র, অনেকে সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। ভারতীয় সাহিত্যিকগণের ন্যায় তাহারা রাজা বা রাজপুত্রবর্ষদিগের অনুগ্রহও কমই লাভ করিয়াছেন এবং অনেককে দুঃস্বপ্নের বাধাবিঘ্নে ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়া দেশের উপরে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। ইহাদের সহিত নবাবগণের সাহিত্যিকগণের তুলনা চলে। ঈশ্বর গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—ইহাদের দারিদ্র্যের বাধা লঙ্ঘন করিয়া স্বশক্তি অগ্রসর হইতে হইয়াছে, মধুসূদন নিজের দোষে কষ্ট পাইলেও দরিদ্রের সন্তান ছিলেন না, নবীনচন্দ্রের দারিদ্র্য ও দুরবস্থার অবসানের সহিত কবিজীবন আরম্ভ হইয়াছে, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, গিরিশ, দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রভাতচন্দ্র, শরচ্চন্দ্র প্রভৃতি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান, যদিও সকলের প্রথমজীবনের আর্থিক অবস্থা ঠিক একরকম ছিল না। বাঙলা দেশে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা বড় কবিও জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাহার অপেক্ষা

সৌভাগ্যবানও কেহ জন্মেন নাই এবং কোন বাঙালী কবি মধুসূদন ও ভাওয়ালের গোবিন্দ দাসের মত বৃকের রক্ত নিঙড়াইয়া সাহিত্যের সেবা করেন নাই। আধুনিক রূশ দেশ যেমন সকল বিষয়ে নূতন, সাহিত্য চর্চায়ও তেমনই নূতন, আধুনিক যুগে রুশজাতির ন্যায় কোন জাতি বৃকের রক্ত দিয়া সাহিত্য রচনা করেন নাই।

কাণ্ডনরসিস্ত সাহিত্যে যতটা কাণ্ডনের ঔজ্জ্বল্য আছে, ততটা লৌহের তীক্ষ্ণতা নাই। বাস, বাস্মাটিক প্রভৃতি ঋষিদিগের সাহিত্য বাদ দিলে সংস্কৃত সাহিত্য অনেকটা দরবারী সাহিত্য, তাহাতে কবির নৈপুণ্যের যত পরিচয় আছে, তত আন্তরিকতা নাই, তাহাতে একটা জাতির সমৃদ্ধি বত বাড়িয়াছে, জাতির প্রাণ-শক্তি তত বাড়ায় নাই; ক্ষয়িকৃ জাতিকে তাহা রক্ষা করিতে পারে নাই। শিব, পার্বতী, রাম, যমুধিষ্ঠির বা অর্জুন—কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি প্রভৃতির সৃষ্টি নহে; সেই সকল চরিত্রে যতটুকু নূতন সৃষ্টি আছে, তাহা পুরাতন আর্থসৃষ্টির মহত্বকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে উদয়ন, দুঃস্বপ্ন প্রভৃতি যে সকল চরিত্র সর্বথা ইহাদের সৃষ্ট, তাহার মধ্যে সৌন্দর্য আছে বীৰ্য নাই; কবি প্রয়োজনমত তাহাদের শরীরের বর্ম চাপাইয়াছেন বটে, কিন্তু বৈশাসিক পারিকর্মে দুর্বল সেই সকল শরীর যেন বর্মের ভার বহিতে অপারগ হইয়া পড়িয়াছে। সাহিত্য ভোগীর ভোগের তাগিদে ক্রমে আদরস বহুল হইয়া পড়িয়াছে এবং এই বিষয়ে এক কবি আর এক কবির উপর উৎকর্ষ দেখাইতে যাইয়া মরফিয়ার মাত্রা ক্রমে বাড়িয়া দিয়া কখন যে ভ্রষ্টতা ও শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিজেরাই টের পান নাই। মানুষের দারিদ্র্য, শোক দুঃখ, জীবনের নিত্য-নূতন সংঘর্ষ ইহার মধ্যে বিরল। স্থানে স্থানে দুঃখ দারিদ্র্যের যে চিত্র পাওয়া যায় তাহা নিত্যন্ত পোষাকী, বৃদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল কিন্তু হৃদয়ের দানে সমৃদ্ধ নহে। প্রবাদ আছে—ভর্তৃহরির কয়েকটি কন্যা ছিল এবং তিনি তাহাদের শিক্ষার জন্য আচার্য দণ্ডীকে নিয়োগ করেন। দণ্ডী রাজকন্যাদের পড়াইবার জন্য দশকুমারচরিত রচনা করেন। দশকুমার-চরিতে দুর্বৃত্ত, ধর্মজ্ঞানহীন লম্পটের চরিত্রও আছে এবং তাহার নায়ক-নায়িকাগণ নীতি-শাস্ত্রের বড় একটা ধার ধারেন না। রাজা ভর্তৃহরির দৃষ্টিতে এই নূতন গ্রন্থ পঠিত হইলে তিনি দণ্ডীর চরিত্রে সন্দেহান হইয়া উঠিলেন এবং এইরূপ ব্যক্তি কে ভরুণী তনয়াদিগের শিক্ষার জন্য নিয়োগ করিয়া বিবেচকের কাজ করিয়াছেন কিনা ভাবিতে লাগিলেন। বৃদ্ধিমান দণ্ডী রাজার মনের কথা বৃদ্ধিতে পারিলেন এবং রাজাকে দারিদ্র্যবিশয়ক একটি শ্লোক রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজাও ছিলেন কবি, তাহার কবিত্বের অভিমান

জাগরিত হইল,—তিনি লিখিলেন—

‘আমার গৃহে (অম্মাভাব্যে) মৃষিকা মশকীর ন্যায়, মার্জারী মৃষিকার ন্যায়, কুক্কুরী মার্জারীর ন্যায় এবং গর্হণী কুক্কুরীর ন্যায় হইয়াছে—অন্যের সম্বন্ধে কি আর বলিব। শিশুরা মুচ্ছিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে ইহা দেখিয়াই যেন মাকড়শার জালরূপ বস্ত্রাঙ্গে মুখ আবৃত করিয়া ঝিল্লীরবজ্জলে চুল্লী দীর্ঘ রোদন করিতেছে।’ দারিদ্র্যের এই বর্ণনা যে চমৎকার তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু উপমা ও উৎপ্রেক্ষর চমকে, বৃদ্ধির বলকে কবি যেমন সকলকে অভিভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন দারিদ্র্যের মর্মভেদী দুঃখ তেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে কোথায়? এ বিষয়ে রাজা ভর্তৃহরির দণ্ডীকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই আসল কথা। দণ্ডী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—“মহারাজ, আপনি কখনও দুঃখের মুখ দেখেন নাই। তথাপি দারিদ্র্যের এ বর্ণনা কেমন করিয়া করিলেন?” রাজা উত্তর দিয়াছিলেন “কবি-কল্পনার অগম্যস্থান কোথায়, কবি স্বয়ং অনুভব করুন বা না করুন তিনি সকলই বর্ণনা করিতে পারেন।” তদন্তরে দণ্ডী বলিয়াছিলেন—দারিদ্র্যের সংশ্রব হইতে দূরে থাকিয়া আপনি যদি কবিকল্পনাবলে দারিদ্র্যের বর্ণনা করিতে পারেন তবে আমিই বা স্বয়ং ধর্ম ও নীতি মানিয়া উচ্ছৃংখল জীবনের চিত্র অঙ্কন করিতে পারিব না কেন?”—কিন্তু ইহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন কবিবিশ্বপনায় নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করা যত সহজ সেই চিত্রে প্রাণ সঞ্চার করা তত সহজ নহে।

আধুনিক প্রাণবন্ত সাহিত্যে—সংস্কৃত সাহিত্যের সেই নৈপুণ্য এবং বিচারচাতুরী নাই, সাধারণ বস্তুকেও মার্জিত করিয়া অসাধারণ করিবার ক্ষমতা তাহার তত নাই। তুলিকার সূক্ষ্মরেখার অপূর্ণভাগে নানাবিধ উজ্জ্বল বর্ণপাতে ইহার চিত্র অঙ্কিত হয় না, চোখের কাছে আনিয়া অথবা অনুবীক্ষণের সাহায্যে ইহার সৌন্দর্য বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। স্থলরেখার বিন্যাসে, অনাবশ্যক বর্ণপাতের গোরব লঙ্ঘন করিয়া ইহা স্পষ্ট ভাষায় আপনাকে জানাইয়া দেয়, সৌন্দর্য অপেক্ষা বীর্ষের পরিচয় অধিক প্রদান করে।

সর্বাঙ্গসুন্দর সাহিত্য সেই রচনা করিতে পারে ভোগে যাহার বীৰ্য নষ্ট করে নাই—দারিদ্র্য বা অভাব যাহার সৌন্দর্য বিমলিন করে নাই। যে সাহিত্যিক সংসারের সহিত নিবিড়ভাবে পরিচিত অথচ সংসার যাহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই, সংসারের বাস্তবভূমির উপর দৃঢ়াঙ্গমান থাকিয়া যিনি আনন্দের উর্ধ্বলোকে মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছেন—যাহার বক্ষে শোক দুঃখ, আশা ও আনন্দের হিম্মোল খেলায় বেড়ায়—তাহার সাহিত্যই সার্বভৌম ও সার্বলৌকিক হইয়া নিত্যকালের আনন্দ ও উপকার বিধান করিতে পারে।

# যত্নেব মোহিনী

## শ্রীমুখ্যকর দাম

পৃথিবীতে দেখবার কমতি কিছদ নেই।  
নিতানুতন সৃষ্টিও চলেছে বিরামবিহীন  
স্রোত বেয়ে.....সৃষ্টি চলেছে বিচিত্র পথে নব  
নব যৌবনের গৌরবে-সৌরভে অরূপ রূপের  
ভাঙার বিচ্ছিন্নে। আর আগের কালে যে সব  
সম্পত্তি আশ্চর্য ও তার ছোট ছোট ভাইবোন  
রূপের মাধুরী নিয়ে আজো অন্তরে অন্তরে  
চিরনুতন রয়েছে—দেশে দেশে;

“সেই দেশের তরে

আমার মন যে কেমন করে।”

এমনি একটা দেশের ঠিকানা পেলাম  
কালিদাসের দেশে বসে এক চিঠিতে। আশ্চর্য  
হলাম ঠিকানাটা পড়ে:—.....

“পৃথিবীর সেরা সুখী দম্পতি  
পাঠান নরপতি মহিষী রূপমতী—  
মান্ডুনগরী ধাম—  
ইতিহাসে পাবে নাম।”

রূপমতীর কথা শুনেছিলাম প্রথম সারংগ-  
পুরে, ঐ নামে ভাল একখানা বই দেখেছিলাম  
মারাঠী সাহিত্যে। রূপমতীর সমাধিও  
সারংগপুরে লালহাজিরার কাছেই আজো  
দেখতে পাওয়া যায়। তাহাড়া ভারতীয় রূপলী-  
পদার নায়কনায়িকা ছোটবড় তারকার  
জীবনীকার হিন্দীলেখক পাঞ্জাবী গংগা সিংও  
বলেছিলেন: রূপমতীকে রূপালীপদার  
রূপায়িত করতে পারলে সিনেমা জগতে  
প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে।

সেই রূপমতীর স্মৃতি বিজড়িত  
মান্ডুনগরী.....

চোখের ক্ষুধার তর সইলো না। গংগা সিং  
কথা দিয়ে ছবি এঁকে দিয়েছিলেন—সেই ছবি  
স্বচক্ষে দেখবার স্বপ্ন কতক্ষণে চোখে ধরা  
পড়বে; সে কী ব্যাকুলতা!

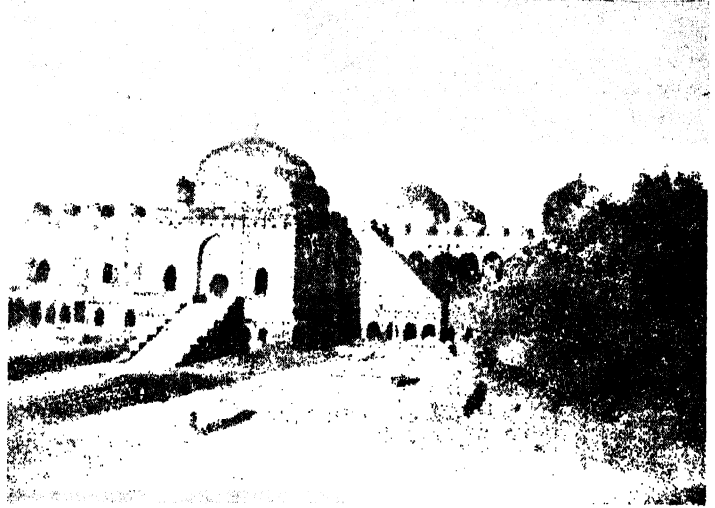
পথে ধরনের কেলা। ঠিক ‘ধর’ শহরের  
বহির্ভাগে অবস্থিত। যারা কাঁসীর বা  
গোয়ালিয়রের দুর্গ দেখেছেন তাদের কাছেও  
এই ছোট্ট কেলাটির আকর্ষণ কম নয়। এই  
কেলার প্রাকৃতিক চিরনিতীশীতোষ্ণ গহবরে  
আশ্রয়প্রার্থী আনন্দি বাঈ-এর গর্ভে দ্বিতীয়  
বাজারীও জন্মগ্রহণ করেন। কেলার মধ্যস্থিত  
বাজারীও-এর ছেলে-খেলার কুপটি দর্শক-  
মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৮৫৭-র  
মহাবিদ্রোহে এই অঞ্চলের দেশীয় সৈন্যদল  
ইংরেজদের বালি দিতে বিদ্রোহ ঘোষণা  
করে। পরে বিদ্রোহীরা এই কেলার প্রতিরোধ

গড়ে তুলে, “একজনও জীবিত থাকতে  
আত্মসমর্পণ না” করার নীতি গ্রহণ  
করেছিল।.....

১৮৫৭-র সেই মহাবিদ্রোহের আগুন  
ইংরেজরা দম্ভভরে নেবাতো চেয়েছিল,  
নেবানো দূরে থাক—সেই আগুনের বর্ধিত  
শিখায় তাদের শেষ দিন যখন সমাগত—তখন  
সবার আগে যারা আগুন জেলে গেছে—  
তাদের স্মরণ করতে হবে বই কী!.....

কেলার মাথায় চড়ে ধর শহর, ঐতিহাসিক

ব্যবসায়ী। ভদ্রলোকের নয়টি সন্তান-সন্ততি।  
প্রত্যেকেই এরা সংগীতে ও বাদ্যে সুদক্ষ  
শিল্পী হবার প্রতিভা রাখে এবং মিঃ বিডলকর-  
“মেশিনগানের সম্মুখে হুঁই ফুলের গান”  
পরমানন্দে সহ্য ও উপভোগ করেন। তাড়া-  
তাড়িতে ভ্রাম্যমাণ অতিথির জন্যে এক  
অব্কেস্ট্রার বন্দোবস্ত হল। অনুষ্ঠান শেষে  
এদের কথাবার্তায় জানা গেল—এদের ধারণা;  
বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে সংগীতজ্ঞ, বাদ্যবিশারদ,  
শিল্পীসুধী-র চিরসমাবেশ লেগেই আছে।



জামি বা জাম্মা মসজিদ

ভোজরাজের “ধারা-নগরীর” ল্যান্ডস্কেপ  
চোখভরে দেখবার মতো সুন্দরই বটে। সুন্দর,  
আশ্চর্য সুন্দর, অপূর্ব সুন্দর, মনোমহন।  
অদূরে পাহাড়ের পরে কালিকামন্দিরের  
চুড়া মেঘ ছুঁয়েছে—চারদিকে দীর্ঘ দীর্ঘকার  
কাকচক্ষু জলে মালায়া প্রান্তের নীল, শ্বেত,  
অম্র, রাঙা মা রাঙানো আকাশের প্রতিচ্ছবি।  
এক পলকে পক্ষপাত দৃষ্টিক্ষেপ.....।

গাইড—ধর-ইনফ্যান্ট্রি-র অফিসার কম্যান্ডিং  
মিঃ ডি, কে, বিডলকর তার বাসায় যেতে  
আমন্ত্রণ জানান। কেলার মধ্যেই বাস।  
এই মারাঠী ভদ্রলোক, ভদ্রতার নিখুঁত নিদর্শন।  
ইঠাৎ বিশ্বাস করতে বোধে অত সেলামের  
অধিকারী এত বিনয়ী, এ লোকই সম্ভ্রান্ত

আমাদের দুর্ভাগ্য দেশমাতৃকার বাইরে  
কতজনে কত কল্পনায় না গড়ে তুলেছে.....  
কত স্বপ্নে সকল দেশের শিরোমণি মণিময়  
বাঙলা.....যেমন শিল্পের শিরোমণি “তাজ”  
ভেমনি।

মিঃ বিডলকর সন্ধ্যার পর জ্যোছনালাকে  
কেলা দেখতে অনুরোধ করলে, কিছতেই তা  
এড়ান গেল না। সন্ধ্যার অব্যবহিত অভিজ্ঞানায়  
পাষণ কেলার পূজ পূজ সৌন্দর্যের সমারোহ  
ফুটে উঠেছিল। তাই দেখে ফেরবার পথে  
আনন্দানুভূতি হঠাৎ হোচ্চট থেলো। কেলার  
মধ্যে ট্রাকের পর ট্রাক বোকাই বস্তা এসে  
জমাচ্ছে.....আরো ট্রাক সম্মুখে.....মিঃ বিডলকর  
বলেন: আমার সৈন্যেরা দুদিন অনাহারে,

আজ তারা প্যারেডে দাঁড়াতে পারছিল না—। ঘরে এদের একটা দানা নেই—সারারাত জেগে এই চানা দেব—তবে কাল এরা দুটো মুখে দেবে—। এই ১৯৪৭-এর মার্চ থেকে ভারতবর্ষে আবার দেশজোড়া খাদ্যমন্ডলের প্রথম পদক্ষেপ সুরু হয়েছে—ধরের কেল্লায় দুর্ভিক্ষের যে সাদা হাড়ের নিশান উড়ছে সে নিশানই সারাদেশের ভয়ঙ্কর ভীষণ নিশানা! কিন্তু কথা হচ্ছে; এহেন মরু-ময় রুদ্ধতায়, উদরদেবতার রুদ্ধরোষের মধ্যে 'সৌন্দর্য' উপলব্ধির স্থান কোথায়? তবু মানুষের মন চির-উপবাসী—।

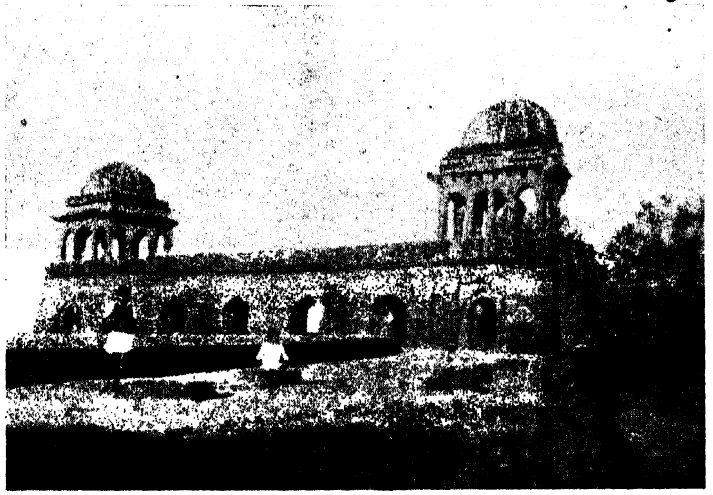
ধর থেকে মানুষের দূরত্ব বাইশ মাইল। এই পথের প্রথম পর্বে কোন বৈচিত্র্য চোখে পড়ে না; একমাত্র পোকাকার অক্রমণে শস্যভ্রষ্ট রিক্তক্ষেত ছাড়া। অশীতিপর বৃশ্চদের মুখেও শোনা গেছে—অর্থ শতাব্দীর মধ্যে ১৯৪৭ সালের মতো এমন সর্বনাশ আর কেউ হতে দেখেনি—মাকাই গেছে, গমও গেল—জোয়ারটাও পেলাম না—একটা গমের দানাও মানুষের খাদ্য হল না। এমন যে হবে এ সকলের ধারণা তো দূরের কথা, কল্পনারও অতীত। কারণ মালোয়াকে মধ্যভারতের শস্যক্ষেত্র বলা হয় অহেতুক নয়। প্রবাদ আছেঃ

“মালও ভূমি ইন্দ্র কী ঝরে গুপ্ত বরষাৎ  
বিন পানি গোড়া পাকে দেখতে হিয়া হারখাৎ।  
অর্থাৎ এই মালোয়াভূমি ইন্দ্রের দেশ। এখানে গুপ্ত বর্ষা বর্ষিত হয়—তাই বিনা জল সেচনে গম পাকে এবং পাকা শস্য দেখে মানুষের অন্তর আনন্দে হর্ষাৎফুল্ল।

এবারও গমের ফলনে যে প্রাচুর্য ছিল পোকা না ধরলে মালোয়া তো ফাউ অসংখ্য টন সেরা গম সে বাইরে রপ্তানি করতে সক্ষম হত। কিন্তু প্রকৃতি প্রতিশোধ নিয়েছে, নিম্নম প্রতিশোধ। সৃষ্টির আদি থেকে সে মানুষের সকল রকমে বিরোধিতা করে আসছে—মানুষ তাকে জয় করে, বশ করে আপন সুখ-স্বচ্ছন্দ সমৃদ্ধি-সমারোহে সৃষ্টি করে চলেছে—। মনে পড়ছে এই সংগ্রামের কথা শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ কত সুন্দর ভাষাই না প্রকাশ করেছেনঃ

“যতদিন মানুষ জানেনি তার নিজের মধ্যে কি চমৎকারিণী শক্তি রয়েছে সৃষ্টি করবার, ততদিন সে তার চারিদিকের অরণ্যানীকে ভয় করে চলছিল, পর্বতশিখরকে ভাবিছিলো দুঃস্বপ্নের, ভীষণ, বিশ্বরাজ্যের উপরে কোন প্রভুত্বই সে আশা করতে পারছিল না; তার কাছে সমস্তই বিরাট রহস্যের মত ঠেকছিল...”

তারপর যৌদিন সে “নিজের মধ্যে এই চমৎকারিণী শক্তির” সন্ধান পেলে, অমনিঃ “রহস্যের দ্বারে গিয়ে সে ধাক্কা দিলে—সবলে।” প্রকৃতির ভয় কাটিয়ে উঠে প্রকৃতিকে সে জয় করবার সাহস নিয়ে এগিয়ে গেল—কৃপণ ধরিত্রীর বুক চিরে করলো অমৃত-স্রোত উপাদান। সেই থেকে সভ্যতার অভিযানে



রূপমতীর পার্ভাভিলয়ন

নূতনতর অধ্যায় হল সুরু। এগিরকালচার-এর পত্তনের সাথে সাথে প্রথম কালচার জন্ম নিল—। তবে প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ জয় সে করতে পারেনি আজো। তাই আধা পরাজিত প্রকৃতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করছে মাঝে মাঝে—। প্রকৃতির এই জঘন্য প্রতিশোধই মনে করিয়ে দেয় না কি যে, জীবনকে সুন্দর করতে হলে প্রকৃতিকে পরিপূর্ণ পরাভূত করা প্রয়োজন! মার্চের মালোয়া মালভূমি মধ্যাহ্নে মরিয়া হয়ে অশ্রুংগার করছে। তেষ্ঠার বৃকের ছাতি ফেটে যায়—জলের বোতলে টগবগ করে ফুটছে জল। ছোট একটা আস্তানা দেখে সেদিকেই সতৃষ্ণ হয়ে তাকাই।

—ইধার আইয়ে, তস্বির রাখিয়ে; এদিকে আসুন, বসুন।

এগিয়ে যেতেই খাটিয়া বিছিয়ে দিলে। বাড়ির অগ্গনে বেলতলার একটা বেদী। তার এক পাশে এক জটিলারী সমোসী আগুন জ্বালিয়ে ভস্মমেখে বসে আছে গঞ্জিকায় আঁধা লাল করে—।

—মেহেরবাণী কোরকে পানী পিলাইয়ে; দয়া করে জল পান করান।

—আপ বাঙালী হায়, 'যাদু' ইয়াদ হায় জরুর.....। সমস্বরে দুতিন জনে প্রশ্ন করে। এদের কাছে বাঙালী “যাদুকর”।

তবু এরা সহজ সরল মানুষ। অতি অল্পে ভাব জমে যায়। সহজে বিশ্বাস কিন্তু করতে চায় না : না “যাদু” বাঙালী আবার জানে না। বলে : ‘যাদু’র বলে দিন না আমাদের ভাল ভাল খাবার খাইয়ে। সমোসী বাবাজীর খাবার খাওয়ার যৌক বড় বেশী। বৈরাগ্য নিলেও ভোগী, ভাগ্যী হননি সমোসী।

—খাবার কী মিলে না এদিকে—

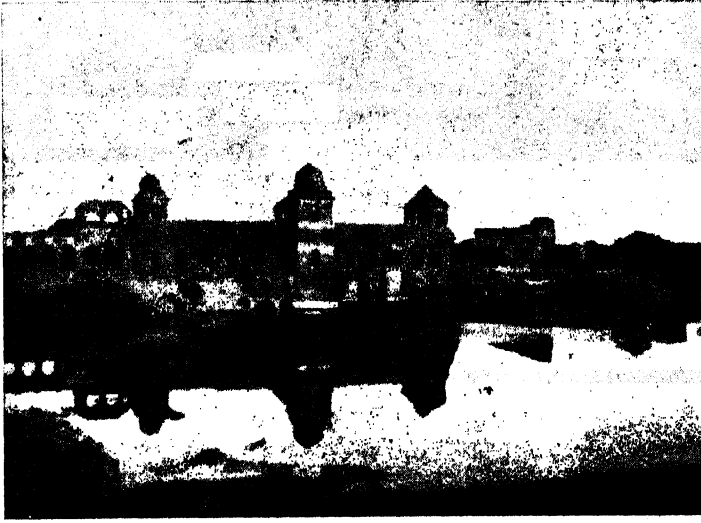
—সে মিললে কি আর কথা ছিল। ক্ষুধ

হয়ে ওয়া জানায়ঃ কৃষকদের লুটে বাইরে বেশী দামে গম বেচে এতকাল সব ভূরি ফাঁপিয়েছে—এবার সব চানা খাও—তাও লুটেপুটে নিচ্ছে—এই দেখুন চানা খাচ্ছ—খাবেন চারটে.....?

চানা বা ছোলা—। কাঁচা সবুজ ছোলা আগুনে ঝলসে তাই দিয়ে উদরপূর্তি করছে। এ তবু খেতে মন্দ লাগে না—বিশেষ করে যখন ছোলার রুটি গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হচ্ছে উচ্চমধ্যবিত্তরা পর্যন্ত।

কৃষকদের অভিযোগ মোটেই মিথ্যা নয়। ধর-রাজ্যের দেওয়ান মিঃ এন, আর চান্দনারকর মাত্র এরই তিনচারদিন আগে বলেছিলেন—এই রাজ্যের আট মাসের উম্বস্ত শস্য প্রজার কাছ থেকে পর্যাশ্রিত টাকা দরে কিনে পঁচাশী টাকায় বাইরে বেচে দেওয়া হয়েছে। ভূতপূর্ব উম্বস্ত মালোয়া এজেন্সীতে যতগুলো দেশীয় রাজ্য আছে তার বেশীরভাগই গত ৩৯ হতে ৪৬-৪৭ পর্যন্ত একাধারে কৃষকদের কাছ থেকে অধিক মূল্যে ফাঁকি দিয়ে জোর করে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে অজস্র টাকা মুন্যফায় বিক্রী করেছে বাইরে। ৪৭-এর মাকাই জোয়ার শস্য হারাবার সময়েও যথেষ্ট গম উম্বস্ত ছিল বিগত বছরের, অথচ এই লোভী দুর্বস্ত রাজন্যবর্গ স্ব স্ব রাজকর্মচারী সহযোগে গ্রাকের বাবসা থেকে নিবৃত্ত হওয়া দূরে থাক ব্রাক উদ্ভাদ হয়ে উঠেছে—এর অজস্র প্রমাণ উপস্থিত করা যায়। মুন্যফালোভী বাবসা মানদুর্ভিক্ষকারী দস্যুতায় পরিণত হয়েছে।

ধর-মাণ্ডু সড়কের পরে প্রথম এবং শেষ উল্লেখযোগ্য গ্রাম নালচা মাণ্ডুর ছমাইল এখানে পড়ে। বর্তমানে এ একটি গণ্ডগ্রাম মাত্র—অতীতে হয়তো একদিন ছিল এর সমৃদ্ধি সমারোহ—। গ্রাম জুড়ে অসংখ্য ধংসাবশেষ বিদ্যমান, কোনটা, অট্টালিকা, কোনটা মসজিদ,



কপূর ট্যাঙ্ক জাহাজ মহলের প্রতিবিম্ব

কোনটা বা সমাধি। কিন্তু ধ্বংসাবশেষ দেখে তো আর শ্রান্তি দূর হবার নয়। তাই শ্রান্তি বিনোদনের বাসনা স্বভাবতই মনে জাগে। সড়কটা যেখানে মোড় ঘুরেছে তার পাশেই ধ্বংসের সাদা একটা একতলা দালান। বহিঃসৌষ্ঠবে বেশ বোকা যায় বাড়ির বাসিন্দার। এইখানের কেউকটা হবেন নিশ্চয়ই। আর ভাববার মতো মনের অবস্থা নয়—সোজা সে দরজার করাঘাত করতেই ফিটফাট ভদ্রবেশী পুরুষ বেরিয়ে এসে সাদর অভ্যর্থনা জানানেন অকুণ্ঠিত স্খিধাহীন কণ্ঠে। মাণ্ডুয়াটী বাঙলা দেশে ঘর—এই হাজার হাজার মাইলের অভিযান শুনে তিনি যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন—তারই কারণ তৎক্ষণাৎ, সদ্যকেনা, মাণ্ডুর “গাইড বুক” উপহার দিয়ে অভিনন্দিত করলেন।

সংগী মারাঠী যুবক ডি. ডি. খিরওয়ার্ডকর দ্রাম্যমাণ জীবনে একেবারেই আনাড়ি। মিনিট পাঁচেক পূর্বেও সে ধারণাই করতে পারেনি; এমন অভাবনীয় যোগযোগও ঘটতে পারে। এখন দেখি তার চোখ দুটো ফুটফুটে হাসি-খুশীতে লাফাচ্ছে—হাসিখুশী সে কিছুতেই চেপে রাখতে পারছে না। আরাম কদরায় গা ছড়িয়ে কত কী-ই না সে কল্পনা করেছে। সবেমাত্র কলেজ জীবনে প্রবেশ—খিরওয়ার্ডকরের অনশন অর্ধাশন সহ্য করবার সাহস নেই—আছে শুধু নবযৌবনোচ্ছ্বাসদীপ্ত বুকভরা আশা আর চোখজোড়া সোনালী স্বপ্ন। বিশ্রামটাকে আস্ত করে নিতেই, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তার মনে ক্ষুধা-চিন্তার পীড়ন চলেছে—চোখেমুখে ভীতির ছায়া।

একটু বাদেই স্নানের জন্যে ঠাণ্ডা ও গরম জল, তেল, সাবান, কত কী এলো। তেল

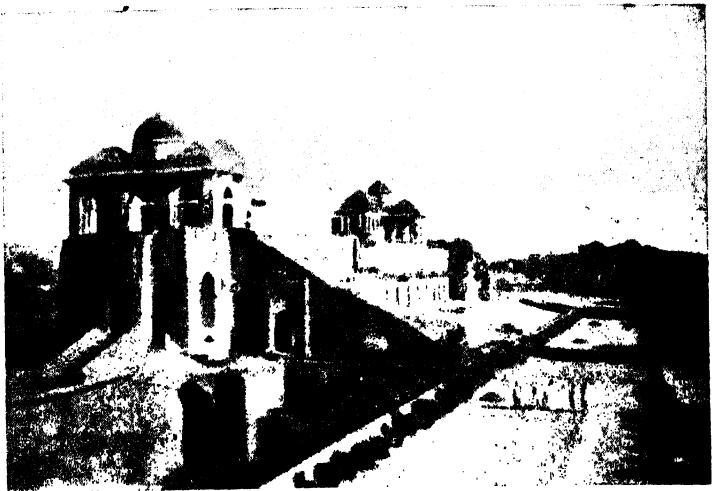
মাথাবার মানুষ পর্যন্ত বাদ গেল না। আরামে স্নান সাংগ হলেই আহ্বারের আহবান।

সেদিন হাল ‘হোলি’র পরব। রং-এ রং-এ রাঙিয়ে দেবার, ভাসিয়ে দেবার, রাঙিয়ে দেবার; ঘর রাঙাবার, বা’র রাঙাবার, মন রাঙাবার চিররাঙন উৎসব। রঙের উৎসব, রসের উৎসব, রূপের উৎসব, যৌবনের উৎসব—মনের উৎসব, মিলনের উৎসব, মাধুর্যে মোড়া মনোমোহন মধুময় প্রেমের মধুৎসব। বাঙলা দেশের ‘হোলি’ আর বাঙলার বাইরের এ ‘হোলিতে’ আকাশ-পাতাল ফারাক। প্রেমের ঠাকুরের প্রাণ জাগানো, মন মাতানো, দিল ডোবানো প্রভাবটা যেনো মালোয়াতে মগুর। আপন জনের সঙ্গে অন্তর মেশাবার, হৃদয়ে হৃদয় হারাবার, অন্তরে অন্তর মেলাবার

মোহনীয় আকর্ষণে এদিকে সকলেই যেনো মহাচঞ্চল। আমাদের যেমন শারদীয়া। উৎসবের উপযোগী উদ্যোগ আয়োজন আহ্বারের মধ্যেও সুপরিষ্কট। কেবল পর্যাপ্তই নয়, ভোজ্য-সামগ্রীর শ্রেষ্ঠ সমাবেশ করা হয়েছে। মিন্টোনে, মধুরেন সমাপয়েৎ.....।

খিরওয়ার্ডকর কিছুদিন যাবৎ হোটেল চানামিগ্রিত গমের রুটির সম্ভাবহার করতে করতে পরিপাকযন্ত্রের যন্ত্রণা সৃষ্টি করে নিয়েছে; বহুদিন সুস্বাদু খাদ্য খাবার সৌভাগ্য থেকে সে বঞ্চিত—সেই মরুর মতো মন্বন্তরে স্বাদু সামগ্রীর রসে মনে তার মৃতসঞ্জীবনীর কাজ হচ্ছে। এতক্ষণে সে সত্যিই খাসা খুশীর জগতে ঝিন্দা আনন্দে বিচরণ করতে সুরু করেছে। পরিতৃপ্ত ভোজনের বাঞ্ছনা তার চোখেমুখে কথাবার্তায় চিকমিক ঝিকমিক ঝিলিক খাচ্ছে। সে বললে—“আজকের খাবার চিরকাল স্মরণ থাকবে—এ যে স্বপ্নের অতীত।”

এত আদর আপ্যায়ন, সেবাস্বল্প সাদর অভ্যর্থনা, উদার আতিথেয়তা অমর ভারতের শাস্বত আশ্রয় অপূর্ব স্বকীয় সন্তারই পরিচয়-জ্ঞাপক। তবে এই দুঃসময়ে, দারুণ দুর্ভিক্ষে রাজকীয় ভোজ্যবিলাস; ভাবতে লাগলাম—এর পরিবেষণ যে সে গৃহস্বামীর পক্ষে সম্ভব কী কখনও। নিশ্চয়ই ইনি কোন বিত্তশালী ববসায়ী বা জাঁদরেল জায়গীরদার হবেন। কল্পনা করতে লেগে গেছলাম—এর জমি হবে অন্তত কয়েক হাজার বিঘে, জমা টাকার পরিমাণ কত হাজার হতে পারে; গ্রিশ চাঁদ্রশ, পঞ্চাশ পেরোপেও ক্ষতি নেই—। ঘরে বাইরে দুঃপ্রস্থ চাকরবাকর, তেল মালিশ করবার মানুষ পর্যন্ত রাখা যার তার কাজ নয়.....বাঙলা দেশের কোন জেলা ম্যাজেস্টেটও এতটা পারে



জাহাজমহলের পার্শ্বদৃশ্য



কি-না সম্ভব! কিন্তু দেশীয় রাজ্যে বর্ম্ম সবই ব্যতিক্রম।

ঘাবড়াবেন না যেনো। পরে জেনেছিলাম ইনি পঁচিশ টাকা মাইনের একজন পুন্ডলিশের দারোগা—জমাজমি নেই বলেই চলে। তবু, সেই যে ছাঁতশগড়ি গানে আছেঃ

“দারোগা সাহেব

.....

এক পরসায়

তিনি কিনতেন মুরগী ও ডিম

দারোগা সাহেব ছাড়া আর কেবা

এক পরসায় বাজারে কিনত কাপড়?”\*

একাদিক্রমে ছমাইল প্রসারিত ধ্বংসস্তূপ—নালচা থেকে মাণ্ডু ধ্বংসের চিহ্ন। বৃকে নিয়ে এলোপাখাড়ি একাকার হয়ে পড়ে রয়েছে। ধু ধু করছে রুদ্ধ প্রান্তর—খা খা করছে শ্মশান,—হাহাকার করছে ইতিহাসের অজ্ঞাত বোবারা। আরঃ

“ও সে তরুণের রসের বিরহে—

হুতাশে দহে!”

গাইড জুটোঁছিল একজন অল্প শিক্ষিত মুসলমান। বিনা পারিশ্রমিকে সে পথের আশেপাশের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলোর ইতিহাস বলার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। তার সহজ স্বাভাবিক সাহচর্য ও সহযোগিতা সহজে ভোলবার নয়।

—দেখিয়ে জনাব, ইয়ে হায় তেলেন টিকরি—এই দেখুন, তেলেন টিকরি—উঁচু পাহাড় উঠেছে আকাশে। তেমন কিছদ নয় তো—

গাইড বললে—এইখানে গঙ্গা-ভেলগানার বিপুল বাহিনীকে পরাস্ত করে ভোজরাজার দুর্ধর্ষ সৈন্যদল। এ সম্বন্ধে সুন্দর একটা প্রবাদ রয়েছে—আজো মালোয়া প্রান্তে উচ্চ-নীচের তুলনায় আমূল বৈসাদৃশ্য তুলে ধরবার জন্যে সবাই বলেঃ

“কাহান রাজা ভোজ ওর কাহান গাঙলী তেলেন—”

—রাজা ভোজ কত মহান্ মহৎ, আর কোথায় গাঙলী তেলেন।

প্রবাদ বান থেকে সত্যোদ্ধার করবার ভর প্রবাদবিশারদদের হাতে ছেড়ে দিয়ে, প্রতীচ্য গঙ্গা ও তেলগঙ্গা ভোজের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় পরাজিত হন কি, হন-নি অথবা গাঙলী তেলেন তমসাস্ফর রূপক কি না সে সমস্যা এড়িয়ে এগিয়ে চললাম।

হঠাৎ কানে গেল—সাইকেল সামালকে, যাটা হায়..... হাঁসয়ারীর দরকারই বটে। পাহাড়ী ঘাটের

পথ পাতালে ডালিয়ে গেছে সাই করে। ভাল রেকওয়ালার যাবদা সাইকেল হলেও এ পথে নামা ভীষণ দায়। যে কোন মূহুর্তে রেকসহ সাইকেলটি বিশ্বাসঘাতকতা করলেই খেয়েছে—একেবারে যমের সাথে সাক্ষাৎ জানাজানি হয়ে যাবে। যে দিকে দুঃচোখ যায়, অতলান্ত মৃত্যুগহবর তাঁথে তাঁথে তাণ্ডব নৃত্যে হাত-ছানি দিচ্ছে—“এসো, এসো, এসো কে দুঃসাহসী দুর্দান্ত; এসো গো মরণ কুঞ্জ;—এসো সজ্জিত চতুরঙ্গে.....। মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি আনন্দ! আর কি রূপ—!

ওই যে সীমাহীন, অতলান্ত মৃত্যুগহবর—অসীম গভীর, অসীম অন্ধকার—এর মতো অপূর্ণ রূপ আর তো কোথাও দেখি নাই। দুঃচারটে মরি, মরি, আহা, আহা—এর কটকটুই বা প্রকাশ হয়—মরণের জয়জয়োধবনি ফাঙ্গনে



জাহাজমহলের সম্মুখে সস্ত্রীক মাদলংকর (কেন্দ্রীয় পরিষদের ভূতপূর্ব সভাপতি)

কলোন্সাস—“মরণ রে তুহঁ মম শ্যাম সমান।”

না, না, হল না—

—চলিয়ে জী.....

চলতে ইচ্ছে করে না, নড়তে চায় না মন। ইচ্ছে করে ওই মৃত্যু গহবরের তলায় নেমে যাই মৃত্যুর মাখামাখিতে রক্ত-রঞ্জিত আশ্রুত মূর্তি-জয়ের নেশার শাগিত স্বাদ মেটাই।.....

আলমগীর গোট হয়ে রাস্তা আকাশে উঠতে শুরুর হল। শাঁ করে উঠে গেছে অনেকখানি। মাণ্ডুতে ঢুকবার বারটি তোরণ-দরজার মধ্যে আলমগীর গোটই সুগম ও শেষ সুনােমের সজ্জা। বহুদিনের অতীত ও নয়,—১৬৫৮ ও ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি কালের সাথে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ। দুঃশ বছরের সামান্য-বেশী। তখনও স্যার টমাস রো’র জাতিগুণ্ঠিত আভূমি কুণ্ঠিশ করে “যো হুজুরের” বিনীত দীনতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি—। এই মাণ্ডুতে বছরের পর বছর ধর্না দিয়ে কুণ্ঠিশ করে করে

কত ছলাকলার আশ্রয় নিয়ে; জাহাজমহলের পদরজ মাথায় তুলে বাদশার গ্রীচরণে পিন্ধ-উপঢ়েকনের বিনিময়ে সুরাটে মাত্র কুণ্ঠি স্থাপনের অনুমতি লাভ করেছে স্যার টমাস রো। বৃটিশ সাম্রাজ্যে তখনও সর্ব্ব অস্ত্র যায়। সার্বভৌম মোগল বাদশার আশ্রয়। কত মৃত্যুরে পার হয়ে এসেছে সেই কাল, যে কালে সোণার বাঙলা দেশে টাকার আট মণ চাল পাওয়া যেত—রাজ্যলোভে পুত্র পিতাকে যাবজীবন কারাগারে নিক্ষেপ করে সিংহাসনে বসত ভাইদের একে একে যমালয়ে পাঠিয়ে। ধর্মের গোড়ামিতে বিশ্বাসীদের অত্যাচারে পীড়নে পর্যুদস্ত করে বাদসা পেতেন পীরের খোঁচা। অতীতের খুঁজে নমস্কার। আরো কিছুদূর চড়াই উৎরে উপরে পাহাড়ের পরে সমতলস্থলেই মালোয়ার মোহিনী মাণ্ডুর দেখা পাই। “খোলো খোলো বধু অবগুঠন খোলো! চিরসুন্দর তোমার ঐ আঁখির পরশ ফেল”—উজ্জ্বল হাসি হেসে উঠলে মোহিনী। সে হাসির কবোক্তাপে কে’পে কে’পে উঠছে চিরসবুজ বিলবধ—খোরশানী ইমলি, দখিন হাওয়া উতলা হয়েছে ওদিকে দাম্ভিকগো—পথ-শ্রান্তি শ্রমশ্রান্তি নিমেঘে হরে নিয়েছে। একেই বলে ফাগুনভরা বসন্ত—খোঁদিকে দুঃচোখ যায়, রক্ত আঁবিরে নেয়ে উঠেছে অরণ্যানী—এত রক্ত পলাশ.....এত অজস্র, এত অপরিমিত, এত সমারোহ—মন বলছে; আজন্ম মাণ্ডুতে যদি কাটে!

গেস্ট হোস্টের রিতলে আসবাব-সজ্জিত সুন্দর একটি কক্ষে আবাস ঠিক করে দিয়েছে এখানকার কতৃপক্ষ। আহাৰ্য্য আসবে নীচের খানসামার কাছ থেকে। আলোও মিলেছে রাতের পর রাতের জন্যে। একেবারে রাজকীয় ব্যবস্থা।

চা চাইলেই চা, হোঁরকেন পালটে টেবিল ল্যাম্প হাজির—লেখার টেবিল, খানার টেবিল—কিছুরই অভাব নেই। ছোট্ট একটি বাথরুম—মায় কমমোড পর্যন্ত—যাকে বলে “From the Log Cabin to the White Hall” কোথা থেকে কোথায় এলাম—মেজাজ ঠিক রাখা দায়। ১৯৪৭-এর মার্চ মাসের এই ষষ্ঠ দিনটি রঙ-পঙ্খমী ফাগুনী পূর্ণিমার দিন। ভরা বসন্তের ডাগর-ডোগর চাঁদ—উজ্জ্বল পড়ছে জ্যোছনা—জলপ্রপাতের জল যেমন ফোঁস ফোঁস উছলে পড়ে। এ রাত্রে কে টেবিল-ল্যাম্পের তীর আলোয় চোখ ধাঁধাতে চায়? ওই যে কোমল চাঁদ—ওই যে রক্ত-পলাশ, ওই যে মিষ্টিগন্ধবহা স্নিগ্ধ-মধুর হাওয়া—ও “ডাকে রে আমায় ডাকে রে।”

বাইরে ছাদ-বারান্দায় চেয়ার-টেবিল পাতা—বহুদূর অনায়াসে চারদিক চোখ মেলে দেখা যায় এত সুন্দর ফাঁকা এ জায়গাটা। ইতিপূর্বেই একদল পরিদর্শকের সমাবেশ হয়েছে। আয়ত আঁখি মেলে সকলে চাঁদের আলো লেহন

\* ডক্টর ভোঁরয়ার এল-উইনের “Folksongs of chhattisgarh”—এর অনুবাদ থেকে—‘অনুবাদক’, বিষ্ণু দে।]

করছেন—গুণ গুণ করে সুর ভাঁজছেন এক ভদ্রমহিলা—সুরের অগ্নিকণায় অন্তর তার দশ হচ্চে—।

এ দলে রয়েছেন বম্বের রয়াল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স-এর মিঃ গোপাল আর পরাঞ্জপে এম এসসি, আই ই এস, জে পি আর আছেন ইন্দোর ডেল কলেজের একজন অধ্যাপক ও তার পরিবারবর্গ—এঁরা দল বেঁধে দেশের ঐতিহাসিক দ্রুতস্থানগুলো দর্শন করে ফিরছেন গ্রীষ্মাবকাশে।

মিঃ পরাঞ্জপে বৈজ্ঞানিক, নিরস বৈজ্ঞানিক। নিজের বিভাগে তিনি নিঃসন্দেহে পারদর্শী ও ওস্তাদ—সামাজিক বৈঠকী সম্মিলনে কিন্তু একেবারেই বেমানান। সারা সময় শুধু পারেন শুধুমুখে বসে থাকতে, মাঝে মাঝে খঁত খঁত করতে—মাড়ুর কিউরেটার শ্রীযুত বিশবনাথ শর্ম্মা ঠিক এর বিপরীত। তিনি অনর্গল গল্প করে চলেছেন। গল্পের ঘোড়াটা তার বগা ছিড়ে চেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে রাজকনোর মহাল ছেড়ে ছুটছে। গল্পের শেষে বিদায় চাইলে বৈঠকের তরফ থেকে দাবী উঠছে আরো গল্পের—রস-পিপাসা মন, গল্প চায়—শুধু গল্প, আর কিছু নয়—আপাতত।

আবার গল্প জোড়েন শর্ম্মাজী।

রাধা-কৃষ্ণের কোমল-প্রেমের লীলাকাহিনী। নই-যৌবনে শ্রীরাধিকার কৃষ্ণ-বাকুলতা,—।

বসন্ত বিকশিত বৃন্দাবন, চলার পথ যত ফুলে ছাওয়া, গন্ধে নেয়ে উঠেছে বনভূমি। দখিন হাওয়া হয়েছে উতলা—কদম্বের তলে টান পড়েছে রাইয়ের, হৃদয়নার জলে কৃষ্ণ-প্রেমের কলকাকলি—

শর্ম্মাজীরা কাহিনী বৈষ্ণব-কবির কবিতার ছন্দে মিলে গেছেঃ—

“জলদ বরণ কান্দু দলিত অঞ্জন জন্দু  
উদয় হয়েছে সুধাময়—

নয়ন চকোর মোর, পিতে করে উত্তরোল  
নিমেষে নিমিখ নাহি রয়।

সই দৌখিন্দু শ্যামের রূপ যাইতে জলে।”

শ্রীরাধিকার কৃষ্ণ-বিরহ, কৃষ্ণ চিন্তা, কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ জ্ঞান, কৃষ্ণ স্বপ্নঃ—

“মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা  
শুন শুন পরাণের সই।

স্বপন দৌখিন্দু যে শ্যামল চরণ দে  
তাহা বিন্দু আর কারু নই।”

আর—

—তকলিফ মাপ কিজিয়ে, আজ ‘হোলি’...

—সকলেই একসাথে অপ্রস্তুত হয়ে ওঠে..... ‘হোলি’র রাতে শর্ম্মাজীকে এত রাত পর্যন্ত আটকে রাখা অনুচিতই হয়েছে.....। ঘরে এতক্ষণে অনন্দবাসরে হয়তো বা চিরন্তন শ্রীরাধা “কাহারে কহিব দুঃখ.....” অন্তরে অন্তরে কাদছেন। একটা নীরব ভিরস্কারে সাধের বৈঠকটা



কপূর ট্যাক্সের প্যাভেলিয়ন—গিয়াসুদ্দিনের হারেম

চুরমার হয়ে গেল—শর্ম্মাজীই নন, বৈঠকে বিবাহিত পুরুষ আরো তো ছিলেন।

আজ রাতে কেন জানি ঘুমও নেই—রক্ত-পলাশবনে রূপের রঙীন তুফান লেগেছে যে!

সকাল সকাল আশেপাশের মহালগুলো দেখতে বেরিয়ে পড়ি। সবোমাত্র সূর্য উঠেছে। আলো চিকমিক করছে জাহাজ মহালের কার্নিসের ডগায় ডগায়। “জাহাজ মহাল”—মহলই শুধু নয় যেনো সাগরবুকে সতিসতিই সুসজ্জিত জাহাজ ভেসে রয়েছে। এর এমনই অবস্থান—দুপাশে বিশাল দুই সাগরতুল্য জলাশয়; সুমুখে মুক্ত সাগর, পেছনে কপূর সাগর—শান্ত জলে প্রতিবৎ প্রতীবিস্তৃত হয়েছে—ঝকঝকে প্রতীবিস্তৃত। কপূর সাগরের ওপারে “ওয়াটার-প্যালেস” জল আরসিতে লম্বলোলুপ মুখ দেখছে। অকস্মাৎ স্বপ্ন বলে ভ্রম হয়—‘এই স্বপ্নপদুরীতেই জন্মেছিলেন আলমগীরের সহোদরা রোশনারা!.....

চারদিক নিস্তব্ধ...নিজের সমাধিক্ষেত্রের মতো নীরব। থেকে থেকে পাখির ডানার মাতামাতি ও গানের গভীর ছন্দাবাণী যেখানে নিস্তব্ধতার বুক চিরে কুটিকুটি করছে.....এক-দিন সেখানেই সাত লক্ষ নরনারীর কলকোলাহল মুখরিত মহানগরীর প্রাসাদচড়া আকাশে পিঁচল ঘিরেছিল। পৃথিবীর দুর্ভেদ্যতম দুর্গ পাহারায় কতো সহস্র সহস্র সূনিপুণ সেনানী মোতায়েন—লক্ষ অশ্বরোহীর অশ্বক্ষুরে আকাশ-বাতাস মথিত প্রকম্পিত—অসংখ্য পদাতিকের পদভরে পৃথিবীর মাটি থরথর করে কাঁপত। পারমার, পাঠান, মোগল শাসকবর্গের সোনায় মোড়া রাজছত্র, শিরোপা সূর্যের আলোকে ঝিকমিক জ্বলজ্বল করতো। দৈত্যাকার হিন্দোলা মহলে দেশবিদেশের রাজদূতদের সুলতানের দর্শন কামনার অধীর প্রতীক্ষায় বসে থাকতে

দেখা যেত। কোথায় মিশর, কোথায় বা সমর-কন্দ সকলের সমাগমে সেকালে মান্ডু জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।.....

হঠাৎ মনে হল, এই যে প্রতি ইটখানা, প্রতিখানা পাথর এদের প্রত্যেকেরই মনোরম ইতিহাস অতীতের স্মৃতি বৃকে জড়িয়ে কত-কাল ধরে পড়ে আছে শ্মশান প্রেতের মতো। অতীতের প্রেতাত্মা, পাঠানের প্রেতাত্মা, ক্ষুধিত হাহাকারে আছাড়িপিছাড়ি খাচ্ছে। ওই যে পাঠান সুলতানের শোভাযাত্রা চলেছে—ভোগের কারাগারে বন্দিনী বালকবির জাফরাণী ঝালর তুলে আধখানি দেহ বাড়িয়ে লোলুপ দৃষ্টিতে লেহন করছে—। চলেছে প্রচণ্ড প্রতাপী প্রাদেশিক শাসনকর্তা, চলেছে অপদার্থ আমীর ওমরাহ, উমেদারী চাটুকারী সমারহে সেলাম-কারী বৈশাখিক বাণিজ্যবাসায়ী...। জীবনের গুরু গুরু গুঞ্জন, কর্মচাঞ্চল্যের চমৎকারিণী শব্দ, লক্ষ লক্ষ মোমাঁছির চাকে মধুকর বাস্তু হয়ে উঠেছে যেনো এক সাথে। এই সেই “হিন্দোলা মহল”—সুলতানের “অভিযাস-হল।”

শহরের সব চেয়ে সুন্দর ইমারত নিঃসন্দেহে জুম্মা বা জামি মসজিদ। পাঠান স্থাপত্যের একটি নিখুঁত ও চমৎকার নিদর্শন। জামি অর্থাৎ প্রধান। হোসেন সা এই প্রধান মসজিদ তৈরি করতে সুরু করেছিলেন এবং প্রায় সম্পন্ন করে এনেছিলেন। সেই আমলে প্রতি শতাব্দির নামাজে এই মসজিদে মাড়ুর প্রতিটি মুসলমানের সমাবেশ হত—স্বয়ং সুলতান এমনিই তাঁর বেগমরা পর্যন্ত সমাবেশে যোগ দিতেন। সুলতান সুলতানার মসজিদে প্রবেশের জন্যে পৃথক সোপানশ্রেণী আজো উত্তর দিকে বিদ্যমান—। সুলতানা বেগম-সাহেবারা সাধারণত স্বেচ্ছা প্রকোষ্ঠে আসত



বিধ্বস্ত বিজয়সম্ভট

গ্রহণ করতেন—এই কক্ষগাুলি মহাকালের করাল গ্রাস হেলায় তুচ্ছ করে বর্তমানেও দশকির তৃপ্তিবিধান করছে।

বিশিষ্ট ইংরেজ স্থপতিবিদ শিল্পবিদ্যারদ জেমস ফাগুসন “জামি মসজিদ” সম্বন্ধে বলেছেন—“যদিও এই মসজিদ খুব বেশি বৃহৎ নয়, কিন্তু বহির্দেহে ও সূক্ষ্ম কারুকর্মে এত অশ্বিত্য ও উৎকৃষ্ট যে এই প্রেণীর মনু-মেষ্টগুলির মধ্যে মর্যাদায় “জামি মসজিদ”ই প্রধান।”

মসজিদ-এর সংলগ্ন হোসেংগ সার সমাধি চিরসুন্দরের সোজ্জ্বলতম প্রতীক। সমাধিটি আকারে “তাজ” বা শের সার সমাধির চেয়ে অনেক ছোট—তবে কী খ্যাতিতে কী শিল্প-জ্যোতিতে এ চিরভাস্বর।.....

এই সুশোভন সমাধির মধ্যে প্রবেশ করলেই মনটা কেমন হয়ে যায়। বাইরে তখন খর সূর্যের প্রখর তাপ দাঁট দাঁট করে জ্বলছে—সেবত-পাথরের সমাধিটি রবিরশ্মিতে বিকীর্ণ করছে—আলো ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে। কিন্তু ভিতরটা যেমন শান্ত তেমন স্বপ্নালোকিত বিষাদময়। শেষবিশ্রামবেদীতে কোমল মৃদু আলো পরম স্নেহে দরদের প্রলেপ দিতে জালি জানলা দিয়ে অতি আন্তে আন্তে, অতি সন্তর্পণে কোমল, পদাঙ্গণ করছে—পাছে পায়ে মৃদু শব্দও দুঃসাহসী সুলতানের শেষ ঘুম ভেঙে যায় এই যেন আশংকা! এতো যে-সে সুলতান নয়—সুলতান হোসেংগ সা—যার আমল সকল দিক দিয়ে প্রখ্যাত। যার সময়ে দেশের সমাধি শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে—শিক্ষা প্রসারিত হয়েছে—সংস্কৃত সাহিত্য বিকাশ লাভ করেছে—পারমার রাজগণের সমকালীন কালিদাস, ভর্তৃ-হরির উত্তরাধিকারগণের ঐতিহ্যবাহকেরা মাশুতে সমাদরে আবার ফিরে এসেছেন

সুলতানের সহৃদয়তা ও নিঃসাম্প্রদায়িক হৃদ্যাক ব্যবহারে মৃদু হয়ে।

৮ই মার্চ, শনিবার, ৪৭। আজ খিরওয়ার্ডকর বিদায় নিয়ে চলে গেল। তার কলেজ করবার পড়া—। তবু সে সহজে যেতে পারে না—কোথায় যেনো টান পড়ে—করুণ তার আঁখি দুটি বলেঃ—“তোমার লাগিয়া রেখে যাই মোর শূভকামনার দান।”

দুর্দিন ধরে রঙলীলা দেখছি।

নিম্ন জাতির হিন্দুদের মধ্যে মন্ততার জোয়ার এসেছে। নাচগান হল্লা লেগেই আছে। মেয়েপুরুষ যত পারে তারও অতিরিক্ত পচাই তাড়ি গিলছে—। দলবেঁধে বিচিত্র সাজসজ্জা করে গণনৃত্য ও গণগীতিতে ভাসিয়ে দিচ্ছে কারারুদ্ধ আনন্দের প্রবাহটাকে। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, শান্তি নেই, ক্রান্তি নেই—আছে নৃত্য, আছে বাঁধভাঙা যৌবনের মদিরমত্ত নৃত্য, আছে বাঁধভাঙা যৌবনের মদিরমত্ত উন্মাদনা আছে খসিয়ে দেবার, ভাসিয়ে দেবার, ভেসে যাবার দেবার দুর্নিবার বাসনা। আর আছে সংঘবন্ধ জীবনের কামনা, মঙ্গলের কামনা, প্রাচুর্য প্রীতি প্রেম ও শান্তির কামনা। এদের রঙ লীলার উৎসব প্রাণহীন ব্রত উদ্‌যাপন—এর সগোষ্ঠ মোটেই নয়—ভগ্নলোকের নৈকান্ত আড়ষ্ট ধর্মনিষ্ঠানের মতো নিজীব নয়—আদি সমাজ-বোধ সহজাত সকলের কামনা-বাসনার মূর্ত-বিকাশ। আশ্চর্য—“আজবাদে কাল উৎসবান্তে এরা পেটে কী দেবে সেই চিরন্তন দুঃশিষ্টতা একেবারেই দূর করে দিয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনটা তুচ্ছ হয়ে গেছে অন্তত কয়েকটা দিনের জন্য—সকলে মিলে মজছে—সকলে মিলে ভুলেছে ব্যক্তিগত জীবন, জীবন তাই হল বিকশিত।

শর্মাজী মাঝে মাঝে আসেন। গল্প করেন। আজ তিনি বলেন—কেন্দ্রিয় এ্যাসেম্বলির

সভাপতি আসছেন, যদি কয়েকটা ফোঁটো নেন.....।

বিকেল নাগাত দেখি গেষ্ট হোস বাড়িপোছা সুন্দর হয়ে গেছে। মধ্যস্থলের প্রকাণ্ড হল ঘরটিতে কাপেট বিছানো হল—টেবিল ঢেকে গেল বরফশুষ্ক টেবিল কুথে—দরজা জানালায় জাফরানী ঝালর ঝলমল করে দুলাতে লাগল মৃদুমন্দ ফাঙ্গুনী বাতাসে। সন্ধ্যার মধ্যে বাসে এসে নামল মোটা মোটা বাস পেটরা, সোডার বাসকেট—মাজার চাকতি আটা আরদালী—আর বয় খানসামা। গেষ্ট হোসের জেন্সি বেড়ে গেল জলের গতিতে।

পরের দিন সকালে সপ্তাহী সভাপতি এলেন—দেওয়ানের মোটরে করে দেওয়ানের পাশে বসে। তাড়াতাড়িতে সংবাদ পেয়ে সবাই ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠলো—তাড়াতাড়ি ক্যামেরায় নতুন ফিল্ম চড়লাম। এক দুই তিন—তিনটে সূন্যাপ নিলাম.....। তখনও জানি না কম্পানী জুয়াচুরিতে এক দু নম্বর এমন কী তিন নম্বরের অধেকটা ফিল্মই ভেতরে নেই।

সভাপতি প্রশ্ন করলেন—বাড়ী কোথায়? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পূণ্যানামধন্য জেলার নাম করলাম।

সভাপতিঃ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে জানা নেই—খুলনার সংগে আমার সামান্য যে জানাশোনা যোগাযোগ সে হচ্ছে খুলনা-বাগেরহাট লাইট রেলওয়ের মধ্য দিয়ে—ওই লাইনে আমার কিছুর শেয়ার আছে।

অশ্চর্য, কংগ্রেস নির্বাচিত কেন্দ্রীয় এ্যাসেম্বলীর সভাপতি হলেও আমেদাবাদের খুনো ব্যবসায়ী ঠিকই আছেন, জাতিচ্যুত হন।

ছোট্ট একটা পাটীর বন্দোবস্ত হয়েছে গেষ্ট হোসে। রাউন্ডটেবিল ঘিরে আমরা সবাই বসেছি; গণভাস্কিকতা বজায় রয়েছে পুরোমাঠায়। টেবিলভরা ফলমূল.....কত রকমের ফল—আঙ্গুর, আপেল, কমলা কদলী—(এ দেখে কে বলতে পারবে দেশে দুর্ভিক্ষ)।

আপেলের রঙ দেখে লোভ হচ্ছে স্বয়ং সভাপতির পর্ষন্ত।

সভাপতির একটি বিশেষ গুণ আছে—মানুষকে জমিয়ে জমজমে আনাবল আনন্দ বিতরণ করা। চায়ে চুমুক দিতে দিতেই তিনি গল্প করে চলেছেন। বলছেনঃ

“আমরা আজ জনে জনে গিয়াসুদ্দীন বাদসা হয়ে বসেছি—যেখানে বসে আছি জানেন তো, এ স্থানটি যে সে স্থান নয়—গিয়াসুদ্দীন বাদসার খাস হারেম—তাতে আবার সর্বোচ্চ তালা, নিশ্চয়ই এখানে থাকতেন সবার সেরা রূপসীরা—বাদসা ছাড়া কারো কী এখানে ঢোকবার অধিকার ছিল—টোকে তো চুলোয় থাক চোক পড়লেও কোতল। কতগুলো রূপসী হারমে পুরেছিলেন তো, শর্মাজী? পনের হাজার। আর কত বছর বেঁচে ছিলেন?

অশীতি বছরেরও বেশী;—তখন কি মরডেন যদি না ছেলেতে বিষ দিত।

যাই বলুন, মাদুর জলহাওয়ার গুণ কী কম! স্বয়ং জাহাঙ্গীরও মৃত্যু হয়ে মজিছিলেন। মজে গেছিলেন সুদূরপাল্লার নরজাহান, “জগতের আলো”—মোহিনীমাণ্ডুর অরুণ রূপের আলোতে রূপ ঝালাতে এসেছিলেন বোধ হয়; কী বলেন।

এক ফাঁকে অটোগ্রাফ চেয়ে বসলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ইংরেজী না হিন্দীতে?

বললাম দুটোই।

কেন্দ্রীয় এ্যাসেম্বলীর সভাপতির পুরো নামটা—গোবিন্দ বাসুদেও মাভলান্‌কর।

যাবার বেলায় মাভলান্‌করজী স্মিতহাস্যে রহস্য করলেনঃ আমার কাছে ফোটা যদি না পাঠান, জানবো ফোটা ভাল হয়নি। সবতোতেই সহজ সরল স্বাভাবিক হাস্যরস এত সুন্দরভাবে পরিবেশন করা সত্যিই সামাজিক হবার পক্ষে একান্তই পরম প্রয়োজন। বড় নেতৃত্বের এ একটা বড় রকমের গুণ।

একটু বাদেই শর্মাজী গুণ গুণ করে উঠলেনঃ—

“চিত চান্দেদরী, মন মালোয়া—

হিয়া হিড়োতি মায়ে,

রন্ত-ভয়োর মে শেজ বিছাওয়া

শোয়া মাতুর মায়।”...

অর্থাৎ চান্দেদরী চিত্ত, মন মালোয়া, হৃদয় হচ্ছে আমাদের হিড়তি প্রদেশ। রণখন্ডের-এ আমার শয্যা পেতে মাতৃত্ব শয়ন করি।.....

—শর্মাজী, এ গানটি কার?

—রূপমতীর। শর্মাজী রূপমতীর কথায় হঠাৎ মুগ্ধ হয়ে উঠলেন। বলতে লাগলেনঃ রূপমতীর মতো সুগায়িকা সেকালে আর একটিও ছিলেন না। তার সুকণ্ঠে সুরের মায়াজলে জড়িয়ে পড়েছিলেন মাতুর শেষ পাঠান সুলতান বাজবাহাদুর। রূপমতী ছিলেন কবি-সংগীতজ্ঞ। নিজের গান কত গান রচনা করেছিলেন মালোয়ার ঘরে ঘরে আজো সে গান গুণ গুণ করছে দিনরাত। এ গানটি কখনকার জানেন; রূপমতীর গানের অব্যব পৃথক পৃথক সময় ও পরিবেশ ছিল—কি না। একদিন শত্রু পশুপতীতে নীল আকাশের চাঁদোয়ার তলে বসে চাঁদ চকোরী যেন—রূপমতীর গানের মাঝে বাজবাহাদুর বিষাদ কণ্ঠে বললেন—রূপমতী কত গানই তো সৃষ্টি করলে, গাইলে, শোনালে—আমার রাজ্যের সীমা নিয়ে কোন গান তো তোমার কণ্ঠে শুনতে পেলাম না। তৎক্ষণাৎ রূপমতী এই গানটি মৃদু মৃদু রচনা করে সুরের রাগে রাগিয়ে তুললেন অপূর্ব গরীমায়।.....

সেই দিনই দুপুর শেষে রূপমতীর “প্যাভিলিয়ন” প্রদর্শন করি।

এক কালে এ সৃশোভন গৃহই ছিল। কী

অপূর্ব অবস্থান—অনেকটা সমভূমি ছাড়িয়ে—বাজবাহাদুরের প্রাসাদ শীর্ষে মাতুর সর্বোচ্চ শিখরে রূপমতীর প্যাভিলিয়ন—দূর থেকে—শুনালোকে কোন উর্বশীর সৌন্দর্যপূরী বলে ভ্রম হয়। মনে হয় ব্যাবিলনের শুন্যোদ্যানের দ্বিতীয় সংস্করণ, অশ্বতীয়; পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য।

এখান থেকে দক্ষিণে বহু দূরে, বহু নিম্নে ঘনবন পরিবেশে প্রান্তরের মধ্য দিয়ে এক সীপল রেখায় নয়নাভিরাম নর্মদা নজরে আসে। রূপমতী ছিলেন নর্মদালোলুপ প্রেমিক। এই অলিন্দ পরে বন্ধ দোলা ভুখা নিয়ে চেয়ে থাকতেন পাহাড়ভাঙা দুঃসাহসী নর্মদার দিকে। বাজবাহাদুরকে তিনি দিয়েছিলেন অনেক—তার কাছ থেকে নিয়েছিলেনও বহু। কেবল প্রতাহ নর্মদা দর্শনই নয় সদ্যপ্রবাহিত নর্মদা সিনানের সুবন্দোবস্তের ব্যবস্থা বাজবাহাদুর রূপমতীর জন্যে করেছিলেন। অদূরে “রেওয়া-কুন্ড” এককালে স্বচ্ছ নর্মদাজলে ঝিকমিক করতো—কমলদলে ভোমরার বিহার—রাজহংসের হব্বালাপে মুগ্ধ ছিল। হাজার হাজার ফিট উপরে এই রেওয়াকুন্ডের সাথে নর্মদার নিম্নল যোগাযোগ ঘটিয়েছিলেন বাজবাহাদুর। এ যে কী ভগ্নস্বপ্ন সাধন সে ভাষায় প্রকাশের অতীত অসাধ্য সাধনের মূল্যে মনের মানুষ লাভ করেছিলেন বাজবাহাদুর—পেরেছিলেন মনের মতো করে রূপমতীকে।

রূপমতীর কাহিনী সত্যি সত্যিই রূপ-কথাকও হার মানায়। রূপমতী-বাজবাহাদুরের প্রেম পরাজিত করে তাজবিবি—সাজাহানের প্রেমকে।

শোনা যায় সাজাহানের আরো অনেক স্ত্রী ছিল—বাজবাহাদুর একান্তই একনিষ্ঠ, এদিক থেকে সকল সমালোচনার অতীত। কোন এক শতক্ষণে বাজবাহাদুর এই হিন্দুবালার মনকাড়া সংগীত শুনিয়েছিলেন—“প্রাণের ভিতর দিয়ে সে সংগীত মর্মে প্রবেশ করলে—অমনি তিনি প্রেম নিবেদন করলেন।

রূপমতী কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী—জীবনের এক নতুন সত্যের সন্ধান পেলে—সরলা নারীর সন্ধান—। মোহ নয়, “পশুরের বেদনামাদুরী”র মাদকতা নয়—মনের বলিষ্ঠ মিলন হল সুরবালার সংগে সুদীর্ঘশপীর। বাজবাহাদুরও ছিলেন সুগায়ক। এই মিলনের কোন খাদ ছিল না, ফাঁকি ছিল না—মনে মনে মজে ছিল মন। জীবনের শেষ মৃদুত পর্যন্ত প্রেম ছিল অটল। এই অটল প্রেমের পরিচয় রূপমতীর স্বরচিত গানের ছন্দে ছন্দে চিরভাস্বর, চিরসমুজ্জ্বল। সেই গান শুনুন তবেঃ

“ওর ধন যাঁচতা হায়-রী মেয়ে

তো ধন পিয়ারে কে কি প্রীত পুঁজি।

“অনেক যতন কর রাখো মন মে

তু প্রতীত কর দেখা হু—

—প্রিয়া কে না লাগে দৃষ্টি।

আপনে-কর রাখো জী কুঁজি

দিন দিন বাড়ি সবায়ো দুনো—

বাড়ি, ঘটো একে গুঁজি।

বাজবাহাদুর কে স্নেহপর পর

নিছাওয়ার করুণী জি ওর ধন।”

অর্থাৎঃ—

আর নারীরা যাঁচনা করে রক্তরাজী

আমার তো প্রাণ-প্রতিমের প্রেমই পুঁজি।

সেই তো মোর আনন্দের ধন;—

আমি সেরা যত্নে রাখি

গোপন করে হৃদয়-পুত্রে

প্রেম-সোহাগের চাবিকাঠি।

শ্রীমতী সব সুন্দরীদের চোখ কি লাগে?

আমার প্রিয় শৃঙ্খুই প্রিয়ার

নধর-নিবিড় পরশ মাঝে।

দিনে দিনে প্রেম যে বাড়ি তস্য সুদে—

বাড়তি রবে—। প্রেম পিয়াসা না

এক মাসা কর্মতি হবে।

কালের স্রোতে চলার পথে যাত্রী আমি

বাজবাহাদুর দৃংখ-সুখের জীবন-স্বামী।

এই গানের প্রসঙ্গে মনে পড়ছে রূপমতীর সংগীত প্রসিদ্ধি—যা তানসেনের খ্যাতি-সমকক্ষ। আবুল ফজল বলেছিলেন, তানসেনের মতো সংগীতজ্ঞ হাজার বছরের মধ্যে জন্মায়নি।..... সেই তানসেনের দীপক গেছে অন্তর্দাহ—তিল তিল মরণ আলিঙ্গনের চরম মৃদুত্বে মেঘমল্লার সংগীতে মেঘ কাঁদিয়ে আকাশের অনন্ত অমৃত, আশীষ বরিয়ে যে অপরাজিতা তাকে নবজীবন দান করেছিলেন বলে গল্প রচনা হয়েছে, সিনেমার পর্দা আলোকিত হয়েছে—সে আর কেউ নয়—সেই হচ্ছে সুদূর-জাগানিয়া রূপমতী।

প্রেমের দুরাশাঃ মৃত্যুতেও সে প্রেমাস্পদকে চোখের আড়াল করতে চায় না। প্রেমাস্পদের অদর্শন কোথাও যেন সহ্য হয় না। রূপমতীরও হয়েছিল তাই। আকবরের সেনাপতি আদম খাঁ সারগগপুরে বাজবাহাদুরকে পরাজিত করে সুলতানের সেরাচিহ্নও দখল নিয়ে রূপমতীকে আমীরী আয়োজন উৎসবে হস্তিপৃষ্ঠে হারেমে নিয়ে চললেন—হায় আদম খাঁ! কাল-কামনার মৃদু ছাই দিয়ে রূপমতীর বিষপানে দয়িতের নতুন দেশে করলেন চিরযাত্রা।.....মাতুর চিরবসন্ত সেই থেকে যে চিড় খেল—জগৎ-প্রখ্যাত শাদ-ই-আবাদ, “দি সিটি অফ জয়” জগৎজয়ী জাহাঙ্গীরের জোড়াতালিতে, “দিল্লীশ্বরো জগদীশ্বরোবা” আলমগীরের নবা সৃষ্টির সমারোহেও সে চিড় জোড়া লাগে নি। তাই সাত লক্ষ নরনারীর কল-কল্লোল উচ্ছৃত উচ্ছ্বাস উদ্গাম উদ্দীপ্ত মোহিনী মহানগরী আজ নিরানন্দ নিমজ্জিত নিজনি শ্মশান, বিগতকালের ঐতিহাসিক সমাধি সম্ভারস্তুপ—হোক সে হীরক-সোজ্জ্বল সহস্র স্মৃতিতে ভাস্বর।

# যাত্রিদল

## শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

দ্রুমচরিত্রাংশ অধ্যায়

আরও একটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। অধিকাংশ দেশসেবকেরা কারাগার হইতে বাহিরে আসিয়াছেন। কিন্তু আজ সত্যিকারের কোন আন্দোলন নাই, সারাদেশ স্বরাজ্য পার্টি আর “নো-চেঞ্জারের” দলাদলিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। স্বরাজ্য পার্টির নীতি অমিয়র ভাল লাগে নাই। কি হইবে কাউন্সিলে ঢুকিয়া? যে ইংরাজ সরকারের সহিত তাহারা কোন প্রকারের সহযোগিতা করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহাতে কি সেই নীতিকেই বিসর্জন দেওয়া হইল না? এতদিন ধরিয়া দেশসেবকদের মনে যে স্বাধীনতার প্রেরণা জাগিয়া উঠিয়াছে—কাউন্সিলে ঢুকিলে কি তাহাই ক্রমে ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে না? এমনি অনেক চিন্তা তাহার মনে আসিয়াছে। নিজে এই সমস্ত দলাদলিতে বিশেষ কোন অংশ গ্রহণ না করিয়া চরকা তাঁতি ও ধর্মগ্রন্থ লইয়া পাতা প্রতিবেশীর সুখে দুখে সাহায্য করিয়া দিন কাটাইতেছিলেন। সেই যে পাচীন খাষিরা ফেনন করিয়া তাঁহাদের আশ্রম-জীবন যাপন করিতেন তেমন করিয়া তিনি নিজের বসিয়া নিজের জীবনকে তৈরী করিতে লাগিলেন। নিজ হাতে ফুলের বাগান করিয়া—ছেন—সজ্জাবাগান করিয়াছেন, দুইটি গরু পুষ্টিয়াছেন, স্বহস্তে গো সেবা করেন। গীতার নিকাম ধর্ম অভ্যাস করেন। এমনি করিয়া দিন যায়। ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধী জেল হইতে বাহিরে আসিলেন—নো-চেঞ্জারেরা মনে করিল এইবার মহাত্মাজী নিশ্চয়ই স্বরাজ্যস্টদের নীতি সহ্য করিবেন না। মহাত্মাজী প্রথম প্রথম অবশ্য স্বরাজ্যস্টদের নীতির অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলেন কিন্তু ক্রিচ্ছদিনের ভিতরেই দেশের নাতীর টান কোন দিকে ব্যক্তিগত তাহার বিলম্ব হইল না। তিনি আদেশ করিলেন—যাহারা কাউন্সিলে ঢুকিতে চায় তিনি তাহাদের আর বাধা দিবেন না—তবে যাহারা পূর্বনীতির কোন পরিবর্তন চাহে না—তাহারা তাঁতি চরকা ও অন্যান্য গঠন-মূলক কাজ লইয়া দেশসেবা করিতে থাকুন। এমনি করিয়া উভয় কূল খানিকটা বজায় রহিল।

অজয় এবার ম্যাট্রিক দিবে। মন দিয়া লেখা-

পড়া করিয়া সে ইতিমধ্যে ভাল ছেলে বলিয়া ইস্কুলে নাম করিয়া ফেলিয়াছে। সেদিন কল্যাণী অজয়ের জামার পকেট হইতে টুক-টাকি কাগজপত্র বাহির করিয়া রাখিয়া জামাটি পরিষ্কার করিবার জন্য যাইতেছিল। এক পাশের পকেট হইতে একখানা খবরের কাগজ বাহির হইয়া পড়িল। কল্যাণী কাগজখানি খুলিয়া দেখিতে গেল। কাগজখানির নাম “শঙ্খ”। হঠাৎ এমন সময় অজয় ছুটিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিল—ওকি দেখছো মা।

কল্যাণী অজয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল—এ কি কাগজ রে? তোর পকেটে ছিল। অজয় কল্যাণীর আরও কাছে আগাইয়া আসিয়া গলা খাট করিয়া বলিল—ওখানা বিপ্লবীদের কাগজ মা! এই সংখ্যাটি গভর্নমেন্ট বাজেয়াপ্ত করেছে—আমি একজনের কাছ থেকে গোপনে সংগ্রহ করে এনেছি, আবার পড়ে তাকে ফেরৎ দিতে হবে। কাউকে বলো না যেন মা? ধরা পড়লে দুবছরের জেল হতে পারে! কল্যাণী কোন কথাই জবাব না দিয়া নির্বাক হইয়া অজয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। অজয় কল্যাণীর হাত হইতে কাগজখানা টানিয়া লইয়া পাতা উন্টাইয়া চলিল—এই দেখ মা, বর্ধমান ম্যাজিস্ট্রেট খুনের মামলার আসামী জগৎ-মোহনের ছবি। ফাঁসির পরে ছবি তোলা। গলায় দেখ মা ফাঁসির দড়ির দাগ দেখা যাচ্ছে। কাগজখানির এ সংখ্যাটির নাম জগৎমোহন সংখ্যা। কল্যাণী এতদূর পর্যন্ত কোন কথাই জবাব দেয় নাই। অজয় মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইতেই দেখিতে পাইল, তাহার মার দুই চোখ অশ্রুতে টলমল করিতেছে। ও কি মা, কি হয়েছে তোমার? এতদূর সেই অশ্রু বর বর করিয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। অজয় অবাধ হইয়া কতকণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল—কেন মা, কি করেছি আমি যে, তুমি এমনি করে কাঁদবে? কল্যাণী চোখ মুছিয়া বলিল কিন্তু এ সবলেনেই বৃষ্টি তাকে কে দিল অজয়—কেন তুই এই সব নিয়ে ঘাটখাটি করিস্—কে তোকে এই সব বৃষ্টি দেয় বলতো? অজয় মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল—তার নাম আমি তোমার কাছে বলতে পারবো না মা! কিন্তু অনায়াসে এতে কি শুনি? —“অনায়াস নয়? একশোবার অনায়াস।”—“হোক্-

অনায়াস দাও তুমি আমার কাগজ!” অজয় কাগজ-খানি লইবার জন্য হাত বাড়াইল কিন্তু কল্যাণী নিজের হাতের মৃদুতায় কাগজখানি শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিয়া বলিল—না এখন পাবি না। কাল ইস্কুলে যাবার সময় নিয়ে যাস্—যার কাগজ তাকে দিয়ে আসবি। অজয় ক্ষুদ্রমনে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কল্যাণী হাতের মৃদুতায় কাগজখানি তেমন করিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আজ বারে বারে তাহার সারা অন্তর শিহরিয়া উঠিতে লাগিল—অজয়ও শেষে এই সর্বনাশের নেশায় মাতিয়া উঠিল। এই ছেলের অদৃষ্টে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে না ঘটিবে তাহা কে জানে? তাহার পিতৃ পিতামহের রক্তের ধারা কি সে পাইবে না? তাহার সকল স্নেহ মমতা এক নিমিষে কাটিয়া কবে কোন বিপদ সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িবে কে জানে? দুঃস্বপ্নতনয়—ভরত, আশ্রমবাসিনী শকুন্তলার গর্ভে জন্মিলে কি হইবে—শৈশবেই সে সিংহাশ্বিনী ধরিয়া তাহার দাঁত গাঁথিয়া দেখিত। কল্যাণীর স্নেহাণুর ভিতর হইতে যে অজয়ের পূর্বপুরুষের রক্ত পাগল হইয়া নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছে! সকল কথা কল্যাণী অমিয়কে জানাইলেন। শুনিয়া অমিয় নিজেও বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এই সর্বনাশ হিংসার পথ শেষঘাট অজয় আগ্রহ করিবে না কি? সংস্কার পর তিনি অজয়ের পাশে বসিয়া তাহাকে সত্যগ্রহের শক্তি, অহিংসার শক্তি বুঝাইতে লাগিলেন। তুলনা দিলেন শ্রীচৈতন্য আর চাঁদ কাজীর কথা—মার খাইয়া জগাই মাধাইকে প্রেম দেওয়ার কথা, হরিদাসের বোঁঘাঘাতে শরীর জর জর হইয়াও হরিনাম না ভুলিবার কথা। বলিলেন, এই আশ্চর্যশক্তিই মহাত্মাজী আজ জাতিতে শিক্ষা দিতেছেন। এমনি করিয়াই ভারতবাসী শক্তি সঞ্চয় করিবে এবং এই পথেই স্বরাজ্য আসিবে। এই নিরস্ত্র জাতির যুক্তি ও নীতি কোনদিক দিয়াই যে হিংসার পথে যাওয়া উচিত নয় তাহা বিশেষ জোর দিয়া বলিয়া চলিলেন। এমনি করিয়া নানা যুক্তিতর্ক টানিয়া আনিয়া অজয়কে বুঝাইয়া অমিয় তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—আজ আমার কাছে কিন্তু তোর প্রতিজ্ঞা করতে হবে অজয়—আর কখনও এই সব কাগজপত্র পড়িবেন—এই সব দলের লোকের সংগে মিশিবেন। কিন্তু অজয় সেই যে প্রথম হইতে একেবারে নির্বাক হইয়া বসিয়াছিল, অমিয়র বারে বারে পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও একটা কথাও কহিল না। অবশেষে অমিয় রাগ করিয়া তাহার নিকট হইতে উঠিয়া গেলেন। পরের দিন ইস্কুলে যাইবার সময় সে একমনে এই সবই ভাবিতেছিল কেন সে বিপ্লবীদের বই কাগজ পড়িবে না—কেন তাহাদের সহিত

মিশিবে না? উল্লাসদার কলেজ বন্ধ হইলে যতদিন তিনি বাড়ি থাকেন অজয় সর্বদা তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে—কই তাহার চারিত্রে তো এতটুকু অন্যায় বা পাপ তো সে দেখিতে পায় নাই। উল্লাসদা বলেন সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া কোনদিনই তো কোন দেশ স্বাধীন হয় নাই। যাহা পৃথিবীর কোথাও কোনদিন সম্ভব হয় নাই—আমাদের দেশে কি সেই অসম্ভব জিনিসই সম্ভব হইবে? আর যদি এপথ অন্যায়ই হইবে তবে তাহার বাবা কেন এই পথের পথিক হইয়া—সেই সাত সমুদ্রের ভিতরের স্বাধীন বন্দী হইয়া আছেন? না, জাঠামণি ভুল করিয়াছেন—ভয় পাইয়াছেন। আর অহিংসা অসহযোগে যদি দেশ স্বাধীন হইবে মহাত্মা কেন আন্দোলন থামাইয়া গিলেন? এমনি করিয়া চুপ করিয়া তাহারা বাসিয়া থাকিবে কেন? দেশের কথা যখন সে উল্লাসদার কাছে শোনেন—তখন তাহার শরীরের রক্ত যে টপটপ করিয়া ফুটিতে থাকে। কিন্তু আশ্রিত তো তাহার বয়স হয় নাই—এখনও সে এই দলে মিশিতে পারে নাই। কবে তাহার সময় হইবে—কবে সে মাতৃত্ত্বিক পাশ করিয়া কলেজে ঢুকিবে কবে এই দলে মিশিবার সৌভাগ্য তাহার হইবে। বাবার কথা মনে করিয়া অজয়ের চোখের সম্মুখে যেন তাহার বাবার মূর্তি স্পষ্ট হইয়া আসিয়া উঠিল। তিনি সেই আন্দামানে কত না দুখে কত না কষ্টে দিন কাটাইতেছেন! ভুল তিনি করেন নাই অন্যায় তিনি করেন নাই। অজয় দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া তাহার বাবার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল যারা বলে তুমি ভুল পথে গিয়েছো—তারা তোমায় চিনতে পারেনি বাবা—আমি তোমায় বুঝেছি। তুমি এই আশীর্বাদ কর বাবা—তোমার অঞ্জুও শক্তিমান হোক, তোমার অঞ্জু দেশের জন্য বুক রক্ত ঢেলে দিক্। মায়ের অশ্রু, জাঠামণির অভিমানে—তাহার মন হইতে নিঃশেষে মিলাইয়া গেল।

### চতুঃচত্বারিংশ অধ্যায়

কয়েক বৎসর পরের কথা। অজয় বি এ পড়ে। কলিকাতার কোন নামকরা কলেজে সে ভর্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু কলেজ হোষ্টেল বা কোন মেসে সে থাকে না। কলিকাতার বাহিরে টালার একটি বড় রাস্তার ধারে আজ এক বৎসর ধরিয়া সে বাস করিতেছে। এখান হইতে এতটা পথ কোন দিন বা হাঁটিয়া কোন দিন বা ট্রামে বাসে গিয়া কলেজ করে। বড় রাস্তা হইতে হাত পঞ্চাশেক দূরে একটি দোতলা বাড়ী। নীচের তলায় ঠাসাঠাসি করিয়া সারা বৎসর পাটের গাউট কিম্বা ধনে মশুরী বোঝাইকরা থাকে—তাহারই এক অশ্বকার কোণ দিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে

উঠিতে হয়। উপরে ৫।৬ খানা ঘর—দুইখানা ঘর ভাড়া লইয়া এক উড়ে-ঠাকুর হোটেল করিয়াছে—বাকী চারি পাঁচখানা ঘরে কয়েকজন পাটের অফিসের কেরানী ও কয়েকজন ছোট খাট দালাল বাস করে। ইহারা সকাল সকাল আহার করিয়া বাহির হইয়া যায় আর অন্তত রাত্রি দশটার পূর্বে কেহ বাসায় ফিরিয়া আসে না। অজয় রাস্তার দিকের ঘরটি লইয়াছে। ঘরে সে একা থাকে। দরজা জানালা কম বলিয়া দোতলাটিও প্রায় নীচের তলার মতই অন্ধকার। অজয়ের ঘরের পাশে যে সরু একখানি বারান্দা আছে—তাহার উপর গিয়া দাঁড়াইলে তবে নীল আকাশ চোখে পড়ে—বাহিরের তাজা বাতাস আসিয়াও চোখে মুখে লাগে। ১৯২৮ সালের একদিন শীতের একেবারে শেষ বেলায় অজয় নিজের ঘরে বন্ধ হইয়া একমনে কি লিখিয়া চলিয়াছিল—কিছুক্ষণ ধরিয়া এমনি করিয়া লিখিয়া সে সমস্ত লেখাটি পড়িয়া যাইতে লাগিলঃ—

### কোন পথে?

হে ভারতের জাগ্রত যুবশক্তি, আজ তোমাদের সম্মুখে এই প্রশ্ন সমস্যা হইয়া দেখা দিয়াছে—কোথায় পথ? কোন পথ? ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর বঙ্গলার যুবশক্তি একবার ইহার মীমাংসা করিয়াছিল। শত সহস্র নিভীক প্রাণ সৈন্য, জীবন-মরণের প্রশ্ন ভুলিয়া—কর্তব্যের পায়ে অশ্বচল্য প্রাণ বিলাইয়া দিতে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। তাহাদের বক্ষ লক্ষ্য করিয়াই একদিন অত্যাচারীর বজ্র তাহার সমস্ত দাহিকাশক্তি লইয়া নামিয়া আসিয়াছিল। জাগ্রত যুবশক্তি—অকাতরে নিজেদের বুক পাতিয়া, সেই বজ্র গ্রহণ করিতে সৈন্য এতটুকু স্বেচ্ছা করে নাই। ফাঁসির মণ্ড, দীপান্তর, দীর্ঘ কারাবাস, ফিছাই তাহাদিগকে এতটুকু বিচলিত করিতে পারে নাই। তারপর ভারতের রাজনীতির বঙ্গমণ্ডে প্রবেশ করিলেন বাহারা—সোণার পাথরের বাটীর মত তাহাদের স্বরাজের অম্ভুত ব্যাখ্যা তাহারা সৈন্য দেশকে শুনাইলেন। বৃটিশ প্রভুদের মাথার উপরে রাখিয়া তাহারাও অধীনে স্বরাজ লাভ করিতে হইবে! তবু ভারত ভুলিল। দেশের লক্ষ লক্ষ যুবক সেই আন্দোলনেও আলোয়ার পিছনে অশ্বের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইল। কিন্তু অনিবার্য ফল তাহার ফলিতে বিলম্ব হইল না। সেই বার্থতায় কেহ হইলেন—সন্ন্যাসী—আজান্দ-লিখিত বন্দনের কটিবাসে দেহ আবৃত করিয়া ধর্মপথে সঞ্চল করিয়া সংসারবিমুক্ত হইয়া রহিলেন। আর একদল আবার গৃহবাসী হইয়া সংসারধর্মে মন দিয়া নিশ্চিন্ত আরামের কোলে আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু এমনি করিয়াই কি দেশের সকল আশা-ভরসা নিঃশেষিত হইয়া যাইবে? না তাহা কখনই হইবে না। যে অশ্ব ১৯০৫ সালের পর প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহাই আজ আবার দাবানলের

মতো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। হে ভারতের জাগ্রত যুবশক্তি—হে বঙ্গলার তরুণের দল তোমরা আজ বিভ্রান্ত হইও না। অহিংসা অসহযোগের মায়ামরীচিকায় আর ঘুরিয়া বেড়াইও না। দেশের রক্ত, যে রক্ত, রক্তচোষার দল নিঃশেষে পান করিয়া চলিতেছে, শিশুর মুখের মাতৃস্তন্য রক্তের পথ—বুড়ুফুড়ু অন্ন যাহারা কাড়িয়া লইয়াছে—দিনের পর দিন অত্যাচারে সারা দেশকে যাহারা জর্জরিত করিয়া তুলিয়াছে—আজ যে সেই শত্রুর সহিতই তোমার যুদ্ধ। হিংসা, অহিংসার কথা এখানে শব্দ অবান্তর নয়—চরম মর্থতা। হে বিপ্লবদল—আজ বাহারা কংগ্রেসের অধিবেশনে অসিয়াছে—তাঁহারা দেশের স্বাধীনতার আদর্শ যেন বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে দিও না। যে প্রস্তাবে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা নাই—এমন কোন প্রস্তাবই তোমরা মানিয়া লইও না। স্মরণ রাখিও, তোমাদিগকেই কংগ্রেসকে প্রকৃত বিপ্লবী দলে পরিণত করিতে হইবে—মিথ্যা অহিংসার মোহ হইতে মুক্ত করিতে হইবে। 'তোমরাই ডাক দিয়া যুবশক্তিকে বলিবেঃ—

"হে কুমার হাসামুখে তোমার ধনকে দাও টান  
অমন রণ

বক্ষের পঞ্জর ভেদি' অন্তরেতে হউক কম্পিত  
সুতীর স্বপন।

হে কিশোর তুলে লও, তোমার উদার জয়-ভেরী,  
করহ আহবান

আমরা দাঁড়া উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব,  
অপিব পরাণ।"

বাহিরের দিকে চাহিতেই কাহার অস্পষ্ট মূর্তি অজয়ের চোখে পড়িল। অজয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কে বিমলদা? বাহিরের বাসিটি ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিতে লাগিলেন—হারে আমিই, পরে অজয়ের তত্ত্বপাশের একপাশে চাপিয়া বসিয়া বলিলেন—তুমি অমন করে দাঁড়িয়ে রইনি কেন অজয়, বোস্। অজয় বসিলে তাহার কাগজ-পত্রের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—এই সম্য-দেলা চুপ করে বসে কি লিখিছিস রে।

অজয় বলিল—সেই যে বিজ্ঞাপনখানা লিখতে বলে পাঠিয়েছিলেন—সেইখানা শেষ করলাম। শুনবেন—শুনুন, বলিয়া অজয় লেখাটি আগাগোড়া পড়িয়া গেল। পড়া শেষ হইলে বিমলদা বলিলেন—বেশ হয়েছে। কাল সকালে প্রেসে দিয়ে আসিস—বলিস, দশ হাজার খেন ছাপে।

অজয় কাগজ কলম সব গোছাইয়া তুলিয়া রাখিতেছিল। বিমলদা বাতির আলোয় তাহার মুখখানা ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিলেন, তোর শরীর দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন অজয়? মুখে চোখে যে শূন্যকণ্ঠে উঠেছে। ভাল করে খাস্বে—উড়ে ঠাকুরটা মোটেই ভাল পাক করে না বন্ধু, না রে?

অজয় হাসিয়া বলিল—কে বলেছে এসব

বাজে কথা আপনাকে? কেন মিছে চিন্তা করেন?

বিমলদা ধীরে ধীরে অজয়ের মাথাটি নিজের কেলের ভিতরে টানিয়া লইয়া তাহার মাথার চুলের ভিতরে হাতের আঙুল ডুবাইয়া চুলগুলিকে বারে বারে এলো মেলো করিয়া দিতে দিতে বলিলেন—আমি সব ঠিক পাইয়ে—সব ঠিক পাই। তুই কত বড় ঘরের ছেলে—কত আদরের ছেলে। এই খরাপ জায়গায় থাকা—এই কদর্য আহার এসব তো অনাহারেরই সাক্ষ্য রে! পরে কিছুদ্ধক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া—একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন—কিন্তু কি করবি ভাই, এ দুঃখ যে সহিতেই হবে—এছাড়া যে আর পথ নাই। আর তুই তো শূদ্র একা নয়, অজয়—কত ছেলেকেই তো আমি এপথে টেনে এনেছি—সবাই তো এমনি কষ্টই সহ্য করছে—সবার দুঃখই যে আমার প্রাণে সদাসর্বদা বাজে রে। বিমলদা পুনরায় চুপ করিয়া আগের মতোই অজয়ের মাথার ভিতরে আঙুল ডুবাইয়া তাহার চুল লইয়া খেলা করিতে লাগিলেন। কিছুদ্ধক্ষণ পরে অজয় ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—আচ্ছা বিমলদা একটা কথা বলবো? বিমলদা বলিলেন—কিন্তু তোর অত সৎকাচ কিসের অজয়?—সৎকাচ নয়, আমার ভারী হাসি পায় আপনার এই সব ব্যবহার দেখে। ঠিক মেয়েদের মত খাওয়াপান নিয়ে বকেন—কোলে টেনে নিয়ে এমনি করে আদর করতে থাকেন—মনে হয় মা যেন পাঁচ বছরের ছেলেকে আদব করছে। ভাবি এত কোমল মন আপনার হ'লো কেমন করে? এত স্নেহ ভালবাসা এলো কোথেকে। কিন্তু আবার যখন অনারূপ আপনার, চোখের সামনে ফটে ওঠে, আপনার কীর্তিকলাপ যখন শূন্য, তখন মনে হয় সারা ভারতবর্ষে বৃষ্টি আপনার মত শক্ত লোক আর একটাও নাই।

বিমলদা হাসিয়া বলিলেন—আদর করবো না—কতটুকু বয়স তোর শূন্য? স্নেহ ভালবাসা নিয়েই তো সংসার রে!—নইলে এপথে আমরাই বা নামতে যাব কেন? আমরা দুঃখ-ভোগ করি এইজন্যই তো যে, পৃথিবী থেকে দুঃখ দৈন্য দূর হয়ে যাক—শূদ্র বাস্তব-বিশেষের নয়—সমস্ত মানুষই মানুষের মত বাঁবার স্বেযোগ পাক্। এই তো প্রেম, এই তো ভালবাসা। অজয় পুনরায় হাসিয়া বলিল—আর অন্য যে সব রোমাঞ্চকর কথা শোনা যায়—সে সব?—সে সব তো সত্যিকারের জিনিস নয় রে। মানুষ খুন করবার জন্য তো মানুষের সৃষ্টি নয়। এই যে দেশে দেশে আজ, নিপীড়িত মানব কঠোর উপরে পা দিয়ে—মানবরূপী অভ্যাচারী দানব দাঁড়িয়ে আছে গণকণ্ঠে আজ নীরব—মানুষ আজ শাসনে শোষণে পশুদে পরিণত—এতো ডারই জন্য

প্রয়োজন হয়েছে অজয়! নইলে যে মানুষকে মানুষ এত ভালবাসে—তারই রক্তপাত করতে চাইবে কেন? পৃথিবীব্যাপী আজ এই বিদ্রোহ! অসন্তোষ তুলে উঠেছে—আমাদের দেশ তো এ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না—যে আহ্বান আজ এসেছে তাকে উপেক্ষা করলে যে পাপ হবে। বহুদ্ধক্ষণ নীরব থাকবার পর অজয় পুনরায় বলিল—আচ্ছা বিমলদা, এত ভালবাসতে আপনি শিখলেন কোথা থেকে? বিমলদা হাসিয়া জবাব করিলেন—এও আমার সেই গুরুদেই দান অজয়!

কার? মিঃ মুখার্জির?

—হাঁ অজয়, সংগ আমি তাঁর বেশীদিন পাই নাই। এদেশ থেকে পালিয়ে যাবার বৎসর দুই আগে তাঁর সংগে হয় আমার দেখা। সেই থেকে আমার মাস্টারী ঘুটলো—সংসারে যেটুকু বন্ধন ছিল, তাও গেল—বেরিয়ে পড়লাম আমি এই পথে। অজয় বাধা দিয়া বলিল—মিঃ মুখার্জির কি এদেশ ছেড়ে না গিয়ে কোন উপায়ই ছিল না?

—না, কোন উপায়ই ছিল না ভাই। যারা তাঁর সহকর্মী, একান্ত বিশ্বাসী—কেউ গেল তারা ফাঁসিতে, কেউ গেল দ্বীপান্তরে—কেউ দীর্ঘকালের কারাবাসে। এনিকে তাঁর নিজের মাথাটির জন্য গভর্নমেন্ট হাজার হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে দিয়েছে। তবু তিনি এতটুকু ভীত হননি। এমনি করে সাত আটটি বৎসর ধরে আত্মগোপন করে, সারা ভারতবর্ষের নগরে নগরে সমিতির কাজ করে গিয়েছেন। কিন্তু এদিকে গোয়েন্দা-পুলিসে দেশ ছেয়ে গেল—গভর্নমেন্ট তাঁকে ধরবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো। বার দুই তো অতি অস্পের জন্য বেঁচে গেলেন। অবশেষে অনেক ভেবে—এদেশ ছেড়ে যাওয়াই স্থির করলেন। বিনায়ের দিন—আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন—বিমল বাঙলা দেশের সমস্ত ভার আমি তোমার উপরেই দিয়ে গেলাম। আমি একান্ত অধিকৃতের মত তাঁর দিকে কিছুদ্ধক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন—আমাকে?

—তিনি হেসে বলেন—হাঁ তোমাকেই।

আমি পুনরায় একান্ত সৎকাচের সংগে বললাম—এত বড় গুরুভার কি আমি বইতে পারবো?

তিনি গম্ভীর হয়ে বলেন—বিমল, দায়িত্ব এড়ানও একপ্রকার অপরাধ। এ ভার বইবার শক্তি যে তোমার আছে—সে আমি জানি। কিন্তু এ ভার গ্রহণ করতে হলে হতখানি আত্ম-তাগের প্রয়োজন—ততখানি দিতে কাপণ্য করলে তো চলবে না। জোর করে নিজেকে ছোট ভেবে দায়িত্ব অস্বীকার যে ভীরুতারই নামান্তর। আর একটি কথাও না বলে—তাঁর পায়ের ধূলা মাথায় তুলে নিলাম—তিনি আমার

মাথায় ডান হাতখানি রেখে মনে মনে আশীর্বাদ করতে লাগলেন।

—তিনি এখন কোথায় আছেন বিমলদা?

—রশিয়ায়। কিন্তু যেখানেই থাকুন, অজয়, স্থির জেনো—তিনি সেখানে বসেও দেশের কাজই করছেন। তাঁর মাতৃভূমিকে তিনি একটা দিনের জন্যও ভোলেননি।

রাগি বাড়িয়া চলিল।

কিছুদ্ধক্ষণ পরে বিমলদা বলিলেন—এবার উঠি, অজয়। অজয় তাঁহার কোল হইতে মাথা তুলিয়া লইয়া বলিল—আবার কবে আসবেন বিমলদা?

—তা কি ঠিক করে বলতে পারি রে। যখনই সময় পাই—আসবো।

অজয় মুখ ভার করিয়া বলিল—ইস্ সময় পেলেই আসবেন কি না? মনে করে দেখুন তো কতদিন পরে আজ এলেন?—এতো মিথো অনুযোগ ভাই। তুই কার সন্তান অজয় তাকি আমরা জানি নে? কত বড় ভরসা আমাদের তোর উপরে? বটগাছের বীজ ভাল জমিতে পড়লে—তা থেকে তো বটগাছই হয় রে! একদিনে সেও বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়ে—কত জীব জন্তুর আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। তোর উপরেও যে আমাদের সেই ভরসা ভাই। তাই তো যেখানেই থাকি, আমার মনের ভিতরে দুটি চোখ সদাসর্বদা সজাগ দৃষ্টি মেলে—তোর উপরেই চেয়ে থাকে। একথা সব সময় মনে রাখি অজয় যে, একদিন তুইও বড় হবি—বড় হয়ে নিজের পিতৃমুখ উজ্জ্বল করে তুলবি। লোকে বলবে উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান! কথা শেষ করিয়া বিমলদা পরম গর্বে আর একবার অজয়ের গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন। অজয় নত হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল।

#### পঞ্চচরিত্রাংশ অধ্যায়

কয়েকদিন পরে একদিন সকালবেলা অজয় ঘুম ভাঙিয়া তাহার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখিতে পাইল, রাস্তার উপরে একখানা রিক্সায় বিছানাপত্র চাপাইয়া তাহার জ্যাঠামণি সম্ভবত তাহারই বাসার ঠিকানাটি খুঁজিতেছেন, অজয় এক নিমিষে লাকাইয়া নীচে নামিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া হাত ধরিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নিজের ঘরে আনিয়া বসাইল। অমিয় কিন্তু কণ্ঠনাও করেন নাই যে, এমন বাড়িতে অবশেষে অজয় বাস করিবার স্থান নির্বাচন করিয়াছে।

তিনি সবিম্বস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—এই বাড়িতে তুই থাকিস্ অজয়! এই অশ্বকার ঘর—এই কদর্য জায়গা!

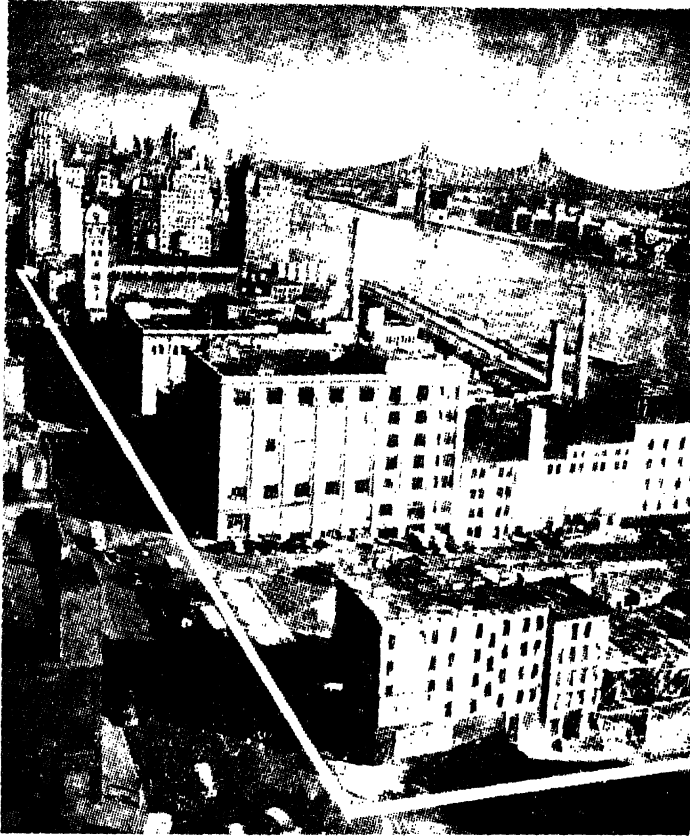
অজয় হাসিয়া বলিল—কেন, বেশতো নিরিবিলি, জ্যাঠামণি অমিয় বাধা দিয়া বলিলেন—না, না, এমন জায়গায় তুই কিছতেই থাকতে পারাবেন অজয়!

অজয় হাসিয়া বলিল—হাত মুখ ধুয়ে,

## সম্মিলিত রাষ্ট্রপঞ্জের নিজস্ব বাড়ি

ইউ-এন-ও অথবা সম্মিলিত রাষ্ট্রপঞ্জের নিজস্ব বাড়ি নেই। আজকাল সব কিছুর মতো বাড়ি ও জমির অভাব হয়েছে, সুবিধামতো বাড়ি

## এপার ওপার



সম্মিলিত রাষ্ট্রপঞ্জের নতুন বাড়ি বেখানে হবে সেই স্থানটি তীর দিয়ে দেখানো হয়েছে কিনতে পাওয়া যায় না, তৈরী করতে গেলে মাল মসলা পাওয়া যায় না। এ আবার বার তার বাড়ি নয়, ৫৬টি জাতির মিলিত হবার জন্য একটি বাড়ি চাই, যেখানে প্রত্যেক জাতির পৃথক অফিস ঘর চাই, মিটিং করবার হল চাই, কর্মিটি রুম, লাইব্রেরী ও অন্যান্য অফিস ঘর

যখন ৫৬টি জাতি মিলে এমন একটি বাড়ির সম্মান করতে পারলেন না এমন সময় তাঁদের বিপদ থেকে বাঁচালেন বিখ্যাত ধনকুবের রক-ফেলারের পুত্র জন ডি রকফেলার। তিনি নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটন নামক পল্লীতে সাড়ে আট লক্ষ ডলার মূল্যের একখণ্ড জমি ইউ-এন-ও'র বাড়ি নির্মাণ করবার জন্য উপহার দিয়েছেন।

বাড়ি তৈরী করবার প্রাথমিক কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। ৭০টি জাতির কার্যের উপযুক্ত করে এই বাড়ি তৈরী করা হবে। বাড়িতে অবশ্য থাকবার জায়গা কুলুবে না।

### চার্লস চ্যাপলিনের নতুন ছবি

“গোল্ড রাশ” পর্যন্ত চার্লস ছবি নিরমিত তৈরী হ'ত। তারপর কত বৎসর পরে

এল ‘সিটি লাইটস’। আরও কয়েক বছর পরে এল ‘মডার্ন টাইমস’; মডার্ন টাইমসের পর মনে হল আর বৃদ্ধি চার্লস ছবি নির্মাণ করবেন না, কিন্তু তাঁর শেষ চিত্র ‘হিটলারকে বাণ্য করে যা নির্মিত হয়েছে “দি গ্রেট ডিক্টেটর” আমাদের দেখবার সুযোগ হয়েছে। এ ছবি দেখান হয়েছে ১৯৪০ সালে। তারপর এই দীর্ঘ



নতুন ছবিতে চার্লস চ্যাপলিন

দিন পরে তার একখানি ছবি মুক্তিলাভ করেছে। নতুন ছবির নাম “মর্সিয়ে ভার্দু”। নতুন ছবিতে এক নতুন চার্লসকে দেখতে হবে। এতে নেই সেই দুঃখীজনের প্রতিনিধি ভবঘুরে চার্লস, সেই তাঁর সেই টুপী, ছড়ি ও জুতো। নতুন চার্লস অভিনয়ে সে সব তিনি বর্জন করেছেন।

মর্সিয়ে ভার্দু মধ্যবয়স্ক একটি ব্যাংকের কেরাণী, ফরাসী। মন্ডার বাজারে তার চকরী যায়। রুগুনো স্ত্রী ও অল্প বয়স্ক সন্তানকে কিভাবে প্রতিপালন করা যায়! অবশেষে ভার্দু এক নতুন কিন্তু দুঃসাহসিক পন্থা অবলম্বন করলো। সে ধনী বৃদ্ধিহীন মহিলাদের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করে, ক্রমে তাদের প্রণয়পাত্র হয়ে এবং বিবাহ করে সুযোগ মত তাদের খুন করতে লাগল। মারসার সময় যাতে তারা কষ্ট না পায় সেদিকে তার লক্ষ্য ছিল এবং সুকৌশলে দেহপুলে সে কোথায় সরিয়ে ফেলত। সে তাদের টাকা ইচ্ছামত ব্যয় করত। সে শিশু, অক্ষম, রুগন ও প্রাণীদের যত্ন করতো। একটি শিকার হয়ে গেলে এবং অপর একটি শিকার না জোটা পর্যন্ত সে তার আপন বাড়িতেই কাটাত। এই-রকম করে সে অল্প সময়ের সমাধান করেছিল। সে কেবলমাত্র একজন শিকারকে অব্যাহতি দিয়েছিল যখন সে জনতে পারল সে বিধবা, যুগ্ম তার স্বামী মারা গেছে। ধরা সে একদিন পড়ল যখন সেই এই কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিল, এবং তার নিজস্ব পরিবার সে যখন হারিয়েছিল, তখন!

এই হল মর্সিয়ে ভার্দুর কাহিনী; কিন্তু এর মধ্যে হারিসর খোরাক কোথায় আছে, আমরা তা দেখবার অপেক্ষায় রইলাম।

### বালিহারী সাহস!

যে লোক দাঁড়িয়ে বাঘ শিকার করে, সে লোক উঁচু বাড়ির ওপর থেকে নীচে চাইতে ভয় পায়, এমন লোকের সঙ্গে আমাদের অনেকেরই পরিচয় আছে। লন্ডন শহরে কোন একটি স্থানে টাইম বোমা পড়ে গ'ত হয়ে গিয়েছিল। সেই টাইম বোমাকে নিষ্ক্রিয় করে দেবার জন্য দু'জন লোককে পাঠানো হয়; যাদের টাইম-বোমা নিষ্ক্রিয় করাই হ'ল কাজ। তারা সেই গ'তে নেমেই কিন্তু হঠাৎ চমকে উঠে ভয় পেয়ে পালিয়ে এল। একজনের গায়ে একটি ই'বুর লাফিয়ে পড়েছিল।

যুদ্ধান্তে সর্বাধিনায়ক আইসেনহাওয়ার বিমানে করে দেশে ফিরছেন; তাঁর সঙ্গে একজন প্যারাসুট সাহায্যে অবতরণকারী সৈনিক ছিল। বিমান যতই এরাড্রোমের সন্নিকট হয়, ততই সেই সৈনিক ভয় পেতে থাকে। আইসেনহাওয়ার তার ভীতিগ্রস্ত চণ্ডলতা লক্ষ্য করে ‘তাকে প্রশ্ন করলেন। উত্তরে সে বললে যে, সে কখনও বিমানে করে জমিতে অবতরণ করেনি, এই প্রথম। এই কথা বলে’ সে ঘেন কাঁপতে লাগল।

### ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যার এপার-ওপারে শ্রীঅতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্থলে শ্রীঅনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হইবে।





[ ৪ ]

তারপরে কার্যক্রম স্থির হ'ল। রাতের মধ্যেই পাঁচটা গ্রামে পাঁচজন লোক খবর দিতে যাবে। শেষ রাতে বেরোবে সবাই। এক সাথে রওনা হয়ে, মিলিত হয়ে অভিযান চালাবার জন্য ঢাক পিটিয়ে সংকেত জানাবে সবাইকে। যাবে যত সব জোয়ান, যুবক সঙিতাল আর ধাঙেরেয়া। তারপর কাড়োল বিলে পুরুষানুক্রমে যে স্বস্তি তারা ভোগ করে এসেছে তা আজ এক কথায় কিছড়তেই নাকচ হবে না।

চলে গেল সবাই।

মংরার বৃক দ্রুত গুঠানামা করছিল, গলার রূপোর ভিত্তিও ঘন ঘন গুঠানামা করছিল তার সাথে। টলতে টলতে ঘরে ঢুকল সে।

ঝুমুরী অপেক্ষায় ছিল, মংরা ঘরে ঢুকতেই দরজাটা ভেঙিয়ে দিয়ে সে লতার মত জাঁড়িয়ে ধরল স্বামীকে।

অভিমাত্রী ছোট মেয়ের মত স্বামীর বৃকে মাথা ঠুকে সে বলল, "তু হামাক আজকাল ভুলা গিছিস—হাঁ"

"মংরা—"

বাইরে থেকে কে যেন ডাকল। গম্ভীর কণ্ঠে।

মংরা চমকে উঠল।

ঝুমুরী লাফ দিয়ে সরে দাঁড়াল, ভেজানো দরজা খুলতে খুলতে বলল, "হামার বাপ—"

"আঁ?"

"তুর শব্দুর রে বাপু"—

বাইরে বেরিয়ে গেল ঝুমুরী।

মংরা অবাক হল। ব্যাপার কি? রাসিক মাঝি তো অতি-প্রয়োজন ছাড়া কারো বাড়িতে যায় না। আজ প্রায় চার বছর ধরে বিয়ে করেছে সে, অথচ এর মধ্যে চার পাঁচবার ছাড়া শব্দুর তার বাড়িতে আসেনি। মাঝে মাঝে মংরা যায়, ঝুমুরীও যখন তখন যায়, কিন্তু ভাতো রাসিকের আত্মমর্যাদাবোধে চিড় ধরে না। উদ্ভ্রান্ত লোকের দেবতাদের মতই সে নিজের আভিজাত্য নিয়ে সবায় মাঝে থেকেও স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট হয়ে আছে। তবে? হঠাৎ মেয়ের কথা মনে পড়ে যাওয়ার কি বাৎসল্য-প্রেমের

জোয়ারে রাসিকের অন্তর এতই প্লাবিত হয়ে গেছে যে, তাকে ছুটে আসতে হল? উহু— তা কি করে হবে, তাই যদি হত তবে এতদিন, এই সুদীর্ঘ চার বছরেও সে রকম ব্যতিক্রম ঘটেনি কেন? তাহলে? সম্ভাব্যে কথাকাটা কাটি হওয়ার জন্য কি রাসিক লজ্জা পেয়েছে মনে, অনুতপ্ত হয়েছে? কিন্তু তাই বা কি করে হয়? কথা-কাটাকাটি তো গালিগালাজে পর্যবসিত হবার মত মারাত্মক হয়নি, তাছাড়া, লজ্জা বা অনুতাপ-বোধ—এ দুটো প্রতিক্রিয়া রাসিকের মধ্যে খুব কমই পরিলক্ষিত হয়েছে। সে যা করে তা খুব ভেবে চিন্তে করে এবং করবার পর তা কখনো অনায় বলে মনে করে না। কি ব্যাপার তাহলে? এমন অসময়ে রাসিক এল কেন? মংরা বিস্মিত হল, কোনো কারণ খুঁজে না পেয়ে ভেবে আকুল হল।

"ভিৎরে আয় বাবা"—ঝুমুরী সহাস্যে ডাকল।

"মংরা—মংরা আছেক্ রে বিটি?" দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করে রাসিক প্রশ্ন করল। "হয় আছেক্, কিন্তুক ভিৎরে আয়—"

"হুঁ—"

ধীরে ধীরে ভিতরে ঢুকল রাসিক, তাকাল ঘরের চারদিকে, তার নজর গিয়ে পড়ল ঘরের মাঝখানে দণ্ডায়মান মংরার দিকে। সে শব্দুরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এগিয়ে আসতে আসতে খেমে গিয়েছিল।

"চোঁপায়া দে"—মংরা স্তব্ধে বলল, তারপর অজস্র প্রশ্নভরা দুটো চোখ তুলে ধরল রাসিকের দিকে।

বসল রাসিক। তার ভগ্নগীতা কেমন যেন আড়ষ্ট ও ক্লান্ত। চিন্তাজর্জর মূখভঙ্গী। মাটির দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল সে। একটা স্তব্ধতা নেমে এল ঘরে।

"কি হইল বাবা—আঁ? কোনো কাম আছেক্ নাকি?" ঝুমুরী এই নিঃশব্দতাকে সহ্য করতে চাইল না।

রাসিক মাথা তুলে শূক্‌নো হাসি হাসল, "ভাল আছিছ্ তু?"

"হয়"—

"রাতের খানা খায়া লিছিস?"

"হয়"—

মংরা চুপ করে ছিল এতক্ষণ, পিতা পুত্রীর কথোপকথন শুনছিল ও লক্ষ্য করছিল আর ভেবে অবাক হচ্ছিল যে, তার খোঁজ করে, তার নাম করে ডেকে ঘরে এসে হঠাৎ শব্দুর এমন নিলিপ্ত অপরিচিতের মত ভাগ করছে কেন?

"দুই তিনদিন তুর মায়ের কাছে গেলু না ক্যানে বিটি?" রাসিক মাঝির কণ্ঠে যেন স্নেহের সমুদ্র উথলে উঠেছে, করুণ একটা কোমলতায় মুখ চোখ হঠাৎ নরম হয়ে এসেছে।

ঝুমুরী মাথা নাড়ল, কানের পার্শ্ববর্তী এক গুচ্ছ চুল ঠিক করতে করতে বলল, "হয়। কাইল যামু ফির"—

"ভালা—যাইস।"

"ভাত খাবু বাবা—আঁ? খানা দুডা"—লজ্জা ভগ্নগীতে অনুরোধ জানাল ঝুমুরী।

"না—খায়া লিছি মা।"

"তবে পচানি খা"—বাপকে একটু খুশী করার যেন হঠাৎ জিদ চেপে গেছে ঝুমুরীর। তার সদর বাপকে একটু খাতির করে, সেবা করে যেন সে কৃতকৃতার্থ হতে চায়।

দেখে জ্বলে গেল মংরা। ইস্, যেন আর কারো বাপ নেই দুনিয়ায়। অমন ভোঁতা, ভীরু লোকটার জন্য ঝুমুরীর এত গর্ববোধ হয় কি করে তা ভেবে পায় না সে। যত সব—। হঠাৎ সে বিরক্ত হয়ে উঠল। আচ্ছা, মংলবটা কি বৃড়োর? রাতের পহরে এসে মেয়ের সঙ্গে ভাত আর পচানির গল্প করাটা কি এমন গুরুতর কাজ ছিল যে আজ না এসে উপায় ছিল না রাসিকের!

সে দু'পা এগিয়ে গিয়ে শব্দুরের সামনে দাঁড়াল, বাজে কথার মাঝখানে সমাপ্ত-রেখা টেনে বলল, "তামাকে ডাকিছিল—ক্যানে?"

রাসিক ধীরে ধীরে তার দৃষ্টিটা মেয়ের দিক থেকে ফিরায়ে এনে জামাইয়ের দৃষ্টির সঙ্গে মেশাল, বলল, "একটা কথা কহমু"—

"কি—সিটা কি কথা?" কেমন যেন কঠিন শোনা মংরার কণ্ঠস্বর।

রাসিক দু'হাত এক করে চেপে ধরল, যেন নিজেকে সামলাতে চাইল, তারপর ধীরে ধীরে বলল, "তু হামার জামাই হয়। হামার সাথে দুখমনি করবু, হামাক্ বেইজ্জ করবু, মংরা?" সমস্ত ব্যাপারটা নিমেষে পরিষ্কার হয়ে গেল, মংরা বৃকতে পারল যে, কোন জ্বালায় আজ এত রাতে রাসিক মাঝি যেতে তার ঘরে এসেছে। কিন্তু তাই বলে উপায় কি?

নির্ভরকারভাবে সে বলল, "দুখমনি করমু, —তুকে বেইজ্জ করমু? ক্যানে? হামি কি পাগল নাকি?"

"তভে তু হামাক্ মানবু না ক্যানে?" রাসিকের ছোট ছোট চোখ দুটোতে আকুল একটা

প্রশ্ন, সে বলল, “তবে ক্যানে তু কাইল সভাইকে লিয়া মাছ মাইরতে যাব?”

মংরার চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল, একটুও ইতস্তত না করে সে বলল, “হামি তো কিছু অন্যায় করি নাই। তু ভুল করাছিস্ হামি তাক্ শূধু রা লিছি। হামি মরদের বাটা, বেইজ্জতী সহিম্ ক্যামনে? হক্ আদায় কইরতে চাইলে, মরদের মত বাইচতে চাইলে যদি তুর সাথে দুশ্মনী করা আর তুর বেইজ্জতী করা হয় তবে তো হামি লাচার”—

রাসিক স্থির হয়ে শুনল সব কথা, ললাটটা শূধু রেখায়িত হয়ে উঠল তার, দুটিটো অবনত হল, বিড় বিড় করে সে বলল, “ই রায় আর পালটাইবি না তু?”

“না”—

“যদি গোলমাল করে পুলিশ”—

“তাথে উরায় না হামি”—

“তবে ইটাই তুর শায়ে কথা হইল?”

“হয়”—

রাসিক উঠে দাঁড়াল, মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, “চললাম বিটি—রাত হচ্ছে খুব”—

কোনো উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে, একবারও কারো দিকে না তাকিয়ে দড় পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রাসিক মাঝি, বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওপরের দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটাকে চেপে ধরে মংরা হাসল। বাকি হাসি। নিজের নেতৃত্বকে অক্ষয় ও একক করার জন্য রাসিক মাঝি আজ নিজে যেচে এসেছিল, লজ্জার মাথা খেয়ে।

ঝুমরী এতক্ষণ নিঃশব্দে সব কথা শুনছিল, ভিতরকার রহস্যটা ধরতে পারল না, শূধু মোটা কথায় বুঝল যে, বিলে কাল মাছ ধরবে স্বামী তার দলবল নিয়ে আর তাতে বাপের ঘোর আপত্তি।

সে প্রশ্ন করল, “মাছ ধরবু কাইল—আঁ?”

“হাঁ”—

“সর্দারক্ মানলু নাই তু?”

“না”—মংরা মাথা নাড়ল, ঝুমরীর মুখের দিকে তাকিয়ে ধারালো হাসি হেসে বলল, “তুর বাপ রাসিক মাঝিকে মানলাম্ নাই, কিন্তুক্ তাই থিকা বড়া সর্দারের হুকুম্ মানলাম্ রে শব্দরার বিটি”—

কৌতূহল ঘনাল ঝুমরীর চোখে, “কে? সে মনিষ্টি কে?”

বাঘের থাবার মত শক্ত একটা হাত বুকের ওপর রেখে আগের মতই সহাস্যে বলল মংরা, “হামার দিল্ রে ঝুমরী—হামার দিল্।”

সেই বাঘের থাবার মত শক্ত হাতটার ওপর প্রতীক্ষায় অধীর ও উক ঠোঁট দুটোকে চেপে ধরল ঝুমরী। আয় বাপ, তার মানুশটা একটা মরদের মত মরদ বটে।

সেইদিনই সকাল থেকে জমিদার বাড়িতে একটু চাঞ্চল্য জেগেছিল। সহর থেকে খোদা সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব কয়েকজন পুলিশ ও চাকর নিয়ে এসে হাজির হয়েছিলেন। উদ্দেশ্য পাখী-শিকার।

মাস ছয়েক হল সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ সেন এ জেলায় এসেছেন। শিবেন্দ্রকুমার বিচক্ষণ লোক, যাঁদের দিয়ে তাঁর স্বার্থসিদ্ধি হবে, জমিদারী প্রতাপ রক্ষা করার জন্য যাঁদের সাহায্য তাঁর একান্ত প্রয়োজন তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে তিনি একটুও দেরী করেন না। মিঃ সেনের আগমনের পরই তিনি যেচে গিয়ে আলাপ করে এলেন, একটি পার্টি দিলেন তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য।

মিঃ সেনের বয়স চল্লিশ বিয়াল্লিশ হবে। শালগাছের মত লম্বা, সুন্দরশন আকৃতি, পুলিশের বড় সাহেব হবার উপযুক্ত বাস্তব আছে তাঁর। বেশ চৌকস লোক, কড়া হাতে কাজ চালান। কিন্তু মেজাজ কড়া হলেও জনপ্রিয় লোক তিনি। খেলাধুলা, শিকার, ভ্রমণ ভালবাসেন, এই বয়সেও ফুটবল, হকি খেলেন, ক্রীড়ামোদী যুবকদের দ্বারা চান্দা দিয়ে উৎসাহ দেন। সংসারে তিনি একা মানুস, সাত আট বছর আগে পত্নীবিয়োগ হয়েছে, তারপর আর দ্বিতীয়বার বিয়ে করেননি, সে বিষয়ে ঔৎসুক্যও দেখা যায় না। অফিস, খেলাধুলা, এই সবোতেই সারাদিন কেটে যায়। সন্ধ্যার পর আসেন অফিসার মহলের হোমিয়ার চেমেরারা। নাট্য দশটা পর্যন্ত গল্পগুজব চলে। তারপরে আহালাদি শেষ হলে যখন একক মুহূর্তগুলো তাঁকে ঘিরে ধরে তখন তিনি ইংরেজী ডিটেক্টিভ্ বই খুলে বসেন।

পার্টি দেবার পর থেকেই শিবেন্দ্রকুমারের সঙ্গে মিঃ সেনের ঘনিষ্ঠতা বেশ নির্বিড় হয়ে উঠল। পার্টিতে নানা বিলিভী ডিসের পর এল বরফে ডোবানো মদের বোতল। শিবেন্দ্রকুমার তাকালেন মিঃ সেনের দিকে। মিঃ সেন মৃদু হেসে বললেন, “আই ডোন্ট মাইন্ড—। কাঁচের গেলাসে মদ ঢালা হল, তিনি তা তুলে নিলেন, গেলাস ধরার কায়দা দেখে শিবেন্দ্রকুমার বুঝলেন যে পুলিশ সাহেব আনাড়ী নন। একটু বাদেই তিনি প্রমাণ পেয়ে নিশ্চিত হলেন। মিঃ সেন ছ পেগ হুইস্কী গিলে, শিবেন্দ্রকুমারের পিঠ চাপড়ে হেসে বললেন, “ইউ আর এ ফাইন ফেলা চৌধুরী—ইউ আর স্লেপলিড”—

সেই মিঃ সেনের হঠাৎ খেলায় হয়েছে যে তিনি কাড়াল বিলে শিকার করবেন। এই সময়টাতে নানা পাখীর সমাবেশ হয় বিলের ধারে। এর আগেও তিন চারবার শিকার করে গেছেন তিনি, শিবেন্দ্রকুমারের অতিথি হয়ে। শিকার জুটত আবার অনেক সময় তা জুটতও না, শিকারের চেয়েও শিকার-পর্বটাই তাঁর

কাছে বেশী উপভোগ্য। আরো উপভোগ্য জমিদার-বাড়ীর আত্মথ্যতা, গুরুভোজন আর দামী মদ। তাই দপ্তরের কাজ একটু কমে অসতাই মিঃ সেন আজ সকালে এসে হাজির হয়েছেন। রোদের তেজ একটু কম হতেই শিবেন্দ্রকুমার ও মিঃ সেন দলবল নিয়ে বেরোলেন। দল মানে জমিদার, পুলিশ সাহেব, নন্দ, দুজন পুলিশ ও সাহেবের চাকর রঘু। নন্দ ও রঘুর কাছে ফ্লাস্ক ও টিফিন কেরিয়ার, ব্যাগে বসবার কম্বল, সোডার বোতল, গেলাস ও দু'একটা মাগাজিন। ব্রাচেস পরিহিত শিবেন্দ্রকুমার ও মিঃ সেনের হাতে বন্দুক এবং কাছে বাইনোকুলার। বাঘ-শিকারের উপযুক্ত আয়োজন অথচ মারবেন তাঁরা পাখী।

জমিদার বাড়ি থেকে মাইল খানেক এগোলেই বিলের যে অংশটা সামনে পড়ে, সেখানটাতেই শিকার পাওয়া যায়। এখানে মাটি অনেকটা উঁচু তাই জল কম, তাছাড়া জলে টানও ধরেছে। বনকলমী, জলজ ঘাস, শাপলা আর পশমফুলে ভর্তি জায়গাটা। তাঁর মাঝে, বিলের ধারে ধারে পিকেল হতেই নানা পাখীরা ভীড় করে আসে সেখানে। পক্ষ-বিধ্বননের শাঁ শাঁ শব্দ শোনা যায়, শোনা যায়, নানা রকমের ডাক। বক, বুনো হাঁস, স্নাইপ সারস আর বনমোরগদেরই বেশী দেখা যায়। গ্রামগুলো জায়গাটা থেকে একটু দূরে। নিজনি, ফাঁকা জায়গায়, বিস্কুট বিলার মাঝে ও ধারে ধারে সাদা সাদা শাপলা ফুল আর পশমফুলের মতই মনে হয় বক আর, হাসগলোকে। ভারী অশুভ, ভারী রোমাঞ্চকর সে দৃশ্যটা।

বিলের ধারে গিয়ে যখন তাঁরা পেঁছলেন তখন পিকেল হয়ে গেছে, পাখীর মেলা তখন শূধু হয়ে গেছে। চিক চিক করছে বিলের জল। হাওয়া নেই, একটু গরম বোধ হয়। বিল থেকে একটা বাপের ওরঙ্গ মাঝে মাঝে ভেসে আসে। অখণ্ড নিজনি চারদিকে। অতি দূরে কয়েকটা রাখাল ছেলে গরু চরাচ্ছে, বিলের অপর প্রান্তে জলকাদার মধ্যে গা ছাড়িয়ে পড়ে আছে কয়েকটা মোষ।

শিবেন্দ্রকুমার একটা মস্ত বড় বটগাছের নীচে থামলেন, বললেন, “এখনি শিকার করবেন না জিরোবেন মিঃ সেন।”

মিঃ সেন হাসলেন, “সে কি মশাই, শে আরম্ভ হওয়ার আগেই ইন্টারভাল? উহু হাত গরম করে নিই—আসুন”—একটা চোখ টিপে তিনি আবার বললেন, “তবে একটু কাজ করা যেতে পারে চৌধুরী মশাই।”

“কি?”

“এক চুমুক খেয়ে নেওয়া যেতে পারে।”

“চা?”

“হাসালেন আপনি। না, চা নয়, বড় চা”— শিবেন্দ্রকুমার হো হো করে হেসে উঠলেন

“ওয়াডারফুল। ঠিক বলেছেন মিঃ সেন”—  
নন্দর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, “ফ্রাস্ক  
খোলা নন্দ”—

নন্দ ফ্রাস্ক খুলল, ব্যাগ থেকে বের করল  
গেলাস আর সোডার বোতল।

সিগারেট ধরিয়ে ধীরে ধীরে দুজনে  
তাদের গেলাস নিঃশেষ করলেন। চাকর ও  
পুলিশেরা সতৃষ্ণ ও সশ্রদ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে  
রইল।

“এবার?” শিবেন্দ্রকুমার প্রশ্ন করলেন।

মিঃ সেন হেসে উত্তর দিলেন, “ফরোয়ার্ড  
মার্চ”—

একটু বাদেই গুলীর আওয়াজ ধ্বনিত  
হল। গুড়ুম গুড়ুম। বিলের ওপর দিয়ে  
আওয়াজটা দিগন্তের দিকে গড়িয়ে গেল।  
পাখীর দল তাঁক্ষ কোলাহল তুলে, ডানা মেলে  
আকাশের গায়ে পাক খেতে লাগল। কিছু দূরে  
গিয়ে বসল, কিছু পাড়ি মারল অন্য কোনে  
নিরুপদ্রব এলাকার উদ্দেশ্যে। বাতাসে ভাসতে  
লাগল বারুদের গন্ধ, আর হালকা নীল ধোঁয়া।

পুলিশ দুজন ছুটে গেল বিলের মাঝে।  
ছুরা গুলীর ঘায়ে গোটা চার পাঁচ বুনো  
হাঁস জলকাদা আর কলমী-লতার ওপর লুটিয়ে  
পড়েছে রক্তাক্ত দেহে।

“পড়েছে কয়েকটা”—শিবেন্দ্রকুমার বললেন।

“হ্যাঁ, নট্ ব্যাড”—মিঃ সেন বললেন।

ঘণ্টাখানিক ধরে চলল তাদের শিকার-  
অভিযান। আরো কয়েকটা পাখী মারা পড়ল।  
কিন্তু পাখীর দল অদৃশ্য হল সেখান থেকে।  
মানুষ, বারুদের গন্ধ, গুলীর শব্দ আর লুপ্তিত  
পাখীদের দেখে বাকী সব পাখী বাতাসকে  
আলোড়িত করে আকাশের গায়ে গা ভাসিয়ে  
দিল।

পরিপ্রান্ত বোধ করলেন ওরা। কবল  
বিছিয়ে বসলেন শিবেন্দ্রকুমার, মিঃ সেন ও  
তাদের দল। টিফিন কোরয়ার থেকে খাবার  
বেরোল, বেরোল রঙিন পানীয়। তখন সম্ভা  
হতে আর দেরী নেই। ঢেউখেলানো মাঠের  
ওপর, বিলের জলের ওপর নেমেছে একটা  
গভীর প্রশান্তি, পশ্চিম দিগন্তে হেলে-পড়া  
সূর্যের চেহারা রক্তিম হয়ে উঠেছে।

মিঃ সেন তাকালেন চারদিকে। তাঁর ভালো  
লাগল দৃশ্যটা, কঠিন, শুকনো কতবোর বেঝা  
বহন করেও তাঁর রসকণ্ঠ শুকোয়নি। তিনি  
মুগ্ধ হয়ে গেলেন, তার দৃঢ় চোখে প্রশংসা  
ধ্বনিয়ে এল।

শিবেন্দ্রকুমারের দিকে তাকিয়ে তিনি  
বললেন, “আপনার দেশটি চমৎকার চৌধুরী  
মশাই, বিশেষ করে এই বিলটা সিমপলি  
ওয়াডারফুল”—

শিবেন্দ্রকুমার সোৎসাহে সায় দিয়ে হঠাৎ  
এক মুহূর্তেই অস্বাভাবিক নিশ্বেজ হয়ে পড়লেন,

“কিন্তু এই সুন্দর বিল নিয়ে কি বিপদে  
পড়েছে তা শুনছেন তো?”

“কি বিপদ?”

ফ্রাস্কের সাঁওতাল ধাতুর আর মুসল-  
মানেরা জোর করে বিলের মাছ মারার ফিকিরে  
আছে।”

মিঃ সেন হাসলেন, তাঁর ঝকঝকে দাঁত  
ঝিলিক মেয়ে উঠল, তিনি বললেন, “পলীজ  
ডোন্ট ওরি চৌধুরী মশাই, আপনাকে অমান্য  
করা তো আইন অমান্যের সামিল হবে এবং  
আমরা তা টলারেট করব না। জানোয়ারগুলোর  
যদি সে দুঃসাহস হয়, তবে থানার সাহায্য  
নেবেন। জংলীরা তাহলে এসব বুনো হাঁসের  
মতই মাছ ধরতে এসে জলের মধ্যে  
লুটিয়ে পড়বে।”

বাতাসে তখন দামী হুইস্কির তীব্র গন্ধটা  
ভেসে বেড়াচ্ছিল।

শেষরাতে রসিক মাঝি ধড়মড় করে উঠে  
বসল, খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে  
তাকাল। না, ভোর হয়নি, এখনো রাত আছে।  
সারারাত সে প্রায় না ঘুমিয়েই কাটিয়েছে, এই  
সময়টিতে বোরিয়ে পড়ার জন্য। সারারাত সে  
ছটফট করেছে, বিছানার ওপর এপাশ-ওপাশ  
করেছে একটা দুঃশ্চিন্তায়, একটা অস্তদীর্ঘী  
জ্বালায়।

বাইরে চাঁদ আছে বটে, কিন্তু ঘরের  
ভিতরটা অন্ধকারই বলা চলে। হাংড়ে হাংড়ে  
দেশলাই বের করল রসিক, ডিবেটা জ্বালাল।  
তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে মুখহাত ধুয়ে এল।

ঘরের ভিতর যখন সে গামছাটা কাঁধে  
ফেলাছিল তখন পুঁয়ার মার ঘুম ভাঙল। অবাক  
হয়ে তাকাবার চেষ্টা করল সে, নিদ্রা-জড়িত  
কণ্ঠে প্রশ্ন করল, “কি কইরছ জী-আঁ?”

রসিক এদিক-ওদিক তাকাল, কি যেন  
খুঁজছে সে, বলল, “ধামু-বাহার।”

“বাহার-কুনটে?” পুঁয়ার মা ধীরে ধীরে  
উঠে বসল।

ঘরের কোণ থেকে রসিক একটা ছোট লাঠি  
আর ছেঁড়া ছাতাটা তুলে নিল, টাকৈ গুঁজল  
চুটি, দেশলাই আর কিছু পয়সা, বোয়ের প্রশ্নের  
জবাব দিল না।

“কুনটে যাছ বা, জবাব দিছনা ক্যানে?”  
পুঁয়ার মা আহত কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

“কাম আছেক, যাচ্ছি সহরোৎ”—টেনে টেনে  
বলল রসিক।

“কখনি ফিরবু?”

“দুঃখুরবেলা”—

একবার ঘরের চারদিকে তাকিয়ে রসিক  
মাঝি বোরিয়ে পড়ল। প্রথমে আস্তে আস্তে  
চলতে লাগল সে, দেহে তখনো আলসা আছে।  
একটু হাটতেই তার শরীরটা গরম হয়ে উঠল,

শেষ-রাতের ঠান্ডা বাতাসে শরীরটা জড়িয়ে  
গেল, তাজা মনে হল, তখন তাড়াতাড়ি চলতে  
আরম্ভ করল। রাতের শেষ প্রহর। পশ্চিম-  
দিকে হেলে পড়েছে ন্বাদশীর চাঁদটা। মরা  
জ্যোৎস্নায় ধূসর স্বপ্নের মত অস্পষ্ট,  
কুহেলিকাময় মনে হচ্ছে সব কিছুকে। একটু  
আগেই শোয়ালো প্রহর ঘোষণা করে মাটির  
সমুদ্রের মত তরঙ্গায়িত বিসৃত ক্ষেতের ওপর  
দিয়ে দূর বনের দিকে চলে গেছে। এখন শুধু  
ঝিঝি পোকারা ডাকছে যতহীন ছন্দে।

দেশ লাগছিল আর বেশ জোরে জোরেই  
চলছিল রসিক মাঝি। কিন্তু হঠাৎ চমকে  
উঠল, যেন চাবুকের ঘা খেয়ে লাফিয়ে উঠল।  
বকের পালকের মত ধবধবে সাদা চুল-ভর্তি  
মাথা আর তালগাছের গুঁড়ির মতই মজবুত  
শরীরের নীচে তার রক্ত যেন অশান্ত সমুদ্রের  
মত উদ্দাম হয়ে উঠল। লাঠিটাকে বজ্রমুষ্টিতে  
চেপে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে, তাকাল  
পেছন ফিরে।

ঢাকের শব্দ ভেসে এল।

—কড়ুড়ু—ডুম—কড়ুড়ু—

সে শব্দ মুহূর্তকাল স্থির হয়ে শুনল  
রসিক মাঝি, তারপর আবার দ্রুতপদে চলতে  
আরম্ভ করল সে, নিঃশব্দে। কেবল তার ছোট  
ছোট চোখ দুটো জ্বলন্ত কাঠকয়লার মত  
জ্বলতে লাগল, ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল একটা  
বাঁকা ধারালো হাসি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই  
সে দূরে মিলিয়ে গেল।

শিরসি গ্রাম ঢাক বেজে উঠল। ঝিঝি  
পোকার ডাক যেন থেমে গেল, মরা জ্যোৎস্নার  
মায়াময় পরিবেশটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল আর  
নিঃশব্দ ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে তাঁর মত  
ছুটে গেল ঢাকের শব্দটা। —কড়ুড়ু—ডুম—  
—ড্যাং ড্যাং—কড়ুড়ু—

সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত গ্রাম থেকেও ঢাকের  
শব্দ শোনা গেল। ধানির প্রতিধ্বনির মত।  
যেন গ্রামটা সাড়া দিল, যেন বলল যে হ্যাঁ,  
আমরা জেগে আছি, রওনা দিচ্ছি, সবাইকে  
একথা জানিয়ে দিচ্ছি।

সেই শব্দ পেয়ে শিরসি গ্রামের ঢাক থেমে  
গেল। আর মরা জ্যোৎস্নার ধূসর আলোর  
মাঝে দেখা গেল একদল জোয়ান মানুষকে।  
একজন দুঃজন নয়, একশ—একশজন জোয়ান  
মানুষ। আঁকাবাঁকা আলের ওপর দিয়ে, উচ্চ-  
নীচু জমির মাঝখান দিয়ে, শক্ত শক্ত, কালো  
কালো, শিরাবহুল, পেশল পায়ের চাপে মাটির  
ঢেলা চূর্ণ করে ওরা এগিয়ে চলল। ওদের  
অনেকের হাতে লাঠি, অনেকের হাতে জাল,  
পলুই আর কোঁচ। চোখে ওদের বিলের স্বপ্ন,  
ওদের চাপা নাক দৃঢ়সংকল্পে ফুলে মোটা হয়ে

উঠেছে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে ওরা, পাখরের মত শক্ত বৃক ওদের আরো শক্ত, আরো কঠিন হয়ে উঠেছে। পায়ের নীচেকাব মাটির মাঝে আরো পদধ্বনি শোনে তারা—অদৃশ্য বহু মানুষের পদধ্বনি। সব গ্রামের সব লোকেরা যে আসবে না—এটা নিশ্চিত। রসিক মাঝিকে যারা মানে, যারা তার হুকুমকে অগ্রাহ্য করতে ভয় পায় তারা আসবে না। পান্ডী সাহেবও অনেককে ঠাণ্ডা করে দিয়েছেন। শতকরা ঘাট্টা লোকই হয়ত অনুপস্থিত থাকবে। তবু যারা আসবে, যারা রক্তের ডাকে সাড়া দেবে, সর্দারকে অমান্য করে ছুটে আসবে, তারা সংখ্যায় কম হবে না। নিমাইল, নিমডাঙ্গা, হরিশপুরা, বাঘারিয়া—সব জায়গাতেই ঢাক বেজেছে—কড়ুড়ুড়ু—ড্যাংডা ড্যাডাং—। সব জায়গা থেকেই জোরান লোকেরা সারি বেঁধে বেরিয়েছে। একের পর এক—শত শত মানুষ। কে বাধা দেবে, কে বাঁধতে করবে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে

শহর নয়, জমিদার-বাড়ীর ফটকের সামনে গিয়ে থামল রসিক মাঝি। পুয়ার মাকে সে মিথ্যে কথা বলোছিল। বেইমান, অকৃতজ্ঞ নয় রসিক, শিবেন্দ্রকুমারের কড়কড়ে নোটের প্রতিদান দিতে এল লোকটা।

জনাদন সিংকে ডেকে তুলল সে।

সিংহ রীতিমত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে বসল, “কি, কি মাংসিৎস রে ব্যাটা মোড়ল?” “জলদি-জলদি জমিদারবাবুকে খবর পাঠাও সিংজী—গোলমাল হৈছে।” উত্তেজিত-ভাবে বলল রসিক।

“কি গোলমাল রে মাঝি?”

“বিলোং মাছ মাইরভে সভাই—আইজ।”

“হাঁ?”

“হাঁ?”

“বৈঠ্ তু—খবর পঠাচ্ছি হামি”—

সিংজী ভিতরে গেল।

ভোরের আলো তখনো দেখা দেয়নি। রাতের গুরুভোজন ও অত্যধিক পানের ফলে গভীর ঘুম অচেতন হয়ে ছিলেন শিবেন্দ্রকুমার। কেউ ভরসা পেল না, জনাদন সিং-ই সাহস করে ডেকে তুলল মনিবকে।

আরক্ত চোখ মেলে ক্রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন শিবেন্দ্রকুমার, “কি, কি হয়েছে জনাদন, এটা?”

“বিলোং মাছ ধইরছে হুজুর—সাঁওতাল শালারা”—

আর বলতে হল না, লাফ দিয়ে উঠলেন শিবেন্দ্রকুমার, আলস্য ও ঘুম উড়ে গেল তাঁর, জামা পরতে পরতে তিনি প্রশ্ন করলেন, “কে খবর দিল?”

“রসিক মাঝি হুজুর—বাহার বৈসে আছে।”

“হুঁ”—

দ্রুতপদে বাইরে গেলেন তিনি।

রসিক মাঝি মাটি পর্যন্ত ঝুঁকে সেলাম জানাল।

শিবেন্দ্রকুমার জুকেপ করলেন না, প্রশ্ন করলেন, “বিলে মাছ ধরছে সবাই রসিক?”

“আজ্ঞা”—

“কত লোক হবে?”

“তা সব গাঁ থিকা কিছু, কিছু আইলেও এক হাজার মনিষ হবে।”—

“এক হাজার!”

“আজ্ঞা”—

“কতক্ষণ আগে রওনা হয়েছে তারা?”

“তা এক ঘণ্টা হইল। হামি যখন আইনু, উরাও তখন বাহার হইল।”

“আচ্ছা তুই বোস্।”

“আজ্ঞা”—

রসিকের ঠোঁটের কোণে একটা চাপা হাসির রেখা। শব্দ প্রতিদান নয়, শব্দ জমিদারের প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শনই নয়, আরো কিছু আছে তার আজকের আচরণের পেছনে। বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে সে, রসিক তা স্বীকার করে। কিন্তু তা ছাড়া উপায় ছিল কি? ছোকরাদের বাড়াবাড়ি আর সহ্য করতে পারছে না রসিক, দুঃসহ হয়ে উঠেছে তাদের ঔন্মত। বিশেষ করে মংরা তাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, ধীরে ধীরে তার সম্মানের সিংহাসনটাকে কেড়ে নিচ্ছে, অধিকার করে ফেলেছে। উপায় ছিল না রসিকের। খুব ভেবেচিন্তেই সে সংবাদটা জানাতে এসেছে, ঘরভেদী বিভীষণ সেজেছে। জানুক শিবেন্দ্রকুমার, যাক পুলিশ, গুলী চালাক, ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাক সাঁওতালেরা, উপলব্ধি করুক যে প্রবীণ সর্দারকে মানা উচিত, তার পাকা বৃদ্ধকে স্বীকার করা উচিত।

ওদিকে শিবেন্দ্রকুমার তখন মিঃ সেনকে ডেকে তুলেছেন।

“হোয়াট্‌স্‌ আপ্‌ মশাই—কি হল?”

“দ্রাবল—বিপদ হয়েছে মিঃ সেন। কিছু মনে করবেন না।”

মিঃ সেন হাসলেন, “থুঁলে বলুন না মশাই—ভূমিকা কেন?”

“বিলে হাজারখানিক সাঁওতাল এসেছে, জোর করে মাছ ধরবে।”

“বটে!”

“কি করা যাম্?”

“ঘাবড়ে গেছেন নাকি?”

“পাগল, ব্যাটারের সাহস দেখে জবলে উঠেছি”—

“দ্যাট্‌স্‌ অলরাইট, কিছু ভাববেন না। হাজারখানিক লোক? নেভার মাইন্ড। বুলেট্‌স্‌ আর এ স্ট্রগার পাটি।” দরজার সামনে গিয়ে মিঃ সেন একজন পুলিশকে ডাক দিলেন, “রামলগন সিং—”

“হুজুর”—

পরদা ঠেলে ভিতরে এসে সেলাম জানাল রামলগন সিং।

মিঃ সেন বললেন, “থানাতে যাও, জলদি। দারোগাবাবুকে বল যে সমস্ত পুলিশদের নিয়ে যেন এখনি আমার এখানে হাজির হয়—এখনি আর রাইফেল সমেত।”

“জী”—সেলাম জানিয়ে রামলগন সিং চলে গেল।

মিঃ সেন শিবেন্দ্রকুমারের দিকে তাকিয়ে সহাস্য বললেন, “পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে—কথাটা জানেন তো? ব্যাটারের তাই হয়েছে, কপালে দুঃখ-দুর্গতি আছে, ঠেকাবে কে?”

রসিক মাঝি তখন বাইরে চুপ করে বসে চুটি টানছিল। আত্মতৃপ্তির হাসি ছিল তার মুখে, নিজের বৃদ্ধি সম্বন্ধে গর্ব হিচ্ছিল তার। তবু কি একটা যেন খচ খচ করছিল তার মনের মধ্যে, তবু একটা ফ্যাকাশে ছায়া ঘনাচ্ছিল তার উন্মাদিত মুখমণ্ডলে আর চোরের মত তাকাচ্ছিল সে এদিক ওদিক। ভাবছিল রসিক। সে যা করেছে বেশ করেছে, তার কাজের যুক্তি আছে। কিন্তু তবু, যুক্তি থাকলেই কি সব কাজ সব সময় করা উচিত? বিবেক, রসিক মাঝির বিবেক মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার চেষ্টা করছিল।

হঠাৎ সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল, থুঁতু ফেলে, বিড়ি বিড়ি করে নিজেকেই যেন বলল সে, “যা কইরাছি ঠিক কইরাছি—হাঁ—ঠিক কাম কইরাছি হামি”—

নিজের বিবেকের গলা টিপে ধরল রসিক মাঝি। ঠিক, সে কোন অন্যায় করেনি, সে ঠিক কাজ করেছে। বাস্। (ক্রমশ)



[ ৪ ]

তারপরে কার্যক্রম স্থির হ'ল। রাতের মধ্যেই পাঁচটা গ্রামে পাঁচজন লোক খবর দিতে যাবে। শেষ রাতে বেরোবে সবাই। এক সাথে রওনা হয়ে, মিলিত হয়ে অভিযান চালাবার জন্য ঢাক পিটিয়ে সংকেত জানাবে সবাইকে। যাবে যত সব জোয়ান, যুবক সঙিতাল আর ধাঙেরেয়া। তারপর কাড়োল বিলে পুরুষানুক্রমে যে স্বস্তি তারা ভোগ করে এসেছে তা আজ এক কথায় কিছড়তেই নাকচ হবে না।

চলে গেল সবাই।

মংরার বৃক দ্রুত গুঠানামা করছিল, গলার রূপোর ভিত্তিও ঘন ঘন গুঠানামা করছিল তার সাথে। টলতে টলতে ঘরে ঢুকল সে।

ঝুমুরী অপেক্ষায় ছিল, মংরা ঘরে ঢুকতেই দরজাটা ভেঁজিয়ে দিয়ে সে লতার মত জাঁড়িয়ে ধরল স্বামীকে।

অভিমাত্রী ছোট মেয়ের মত স্বামীর বৃকে মাথা ঠুকে সে বলল, "তু হামাক আজকাল ভুলা গিছিস—হাঁ"

"মংরা—"

বাইরে থেকে কে যেন ডাকল। গম্ভীর কণ্ঠে।

মংরা চমকে উঠল।

ঝুমুরী লাফ দিয়ে সরে দাঁড়াল, ভেঁজানো দরজা খুলতে খুলতে বলল, "হামার বাপ—"

"আঁ?"

"তুর শব্দুর রে বাপু"—

বাইরে বেরিয়ে গেল ঝুমুরী।

মংরা অবাক হল। ব্যাপার কি? রাসিক মাঝি তো অতি-প্রয়োজন ছাড়া কারো বাড়িতে যায় না। আজ প্রায় চার বছর ধরে বিয়ে করেছে সে, অথচ এর মধ্যে চার পাঁচবার ছাড়া শব্দুর তার বাড়িতে আসেনি। মাঝে মাঝে মংরা যায়, ঝুমুরীও যখন তখন যায়, কিন্তু ভাতো রাসিকের আত্মমর্যাদাবোধে চিড় ধরে না। উদ্ভ্রান্ত লোকের দেবতাদের মতই সে নিজের আভিজাত্য নিয়ে সবায় মাঝে থেকেও স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট হয়ে আছে। তবে? হঠাৎ মেয়ের কথা মনে পড়ে যাওয়ার কি বাৎসল্য-প্রেমের

জোয়ারে রাসিকের অন্তর এতই প্লাবিত হয়ে গেছে যে, তাকে ছুটে আসতে হল? উহু— তা কি করে হবে, তাই যদি হত তবে এতদিন, এই সুদীর্ঘ চার বছরেও সে রকম ব্যতিক্রম ঘটেনি কেন? তাহলে? সম্ভাব্যে কথাকাটা কাটি হওয়ার জন্য কি রাসিক লজ্জা পেয়েছে মনে, অনুতপ্ত হয়েছে? কিন্তু তাই বা কি করে হয়? কথা-কাটাকাটি তো গালিগালাজে পর্যবসিত হবার মত মারাত্মক হয়নি, তাছাড়া, লজ্জা বা অনুতাপ-বোধ—এ দুটো প্রতিক্রিয়া রাসিকের মধ্যে খুব কমই পরিলক্ষিত হয়েছে। সে যা করে তা খুব ভেবে চিন্তে করে এবং করবার পর তা কখনো অনায় বলে মনে করে না। কি ব্যাপার তাহলে? এমন অসময়ে রাসিক এল কেন? মংরা বিস্মিত হল, কোনো কারণ খুঁজে না পেয়ে ভেবে আকুল হল।

"ভিৎরে আয় বাবা"—ঝুমুরী সহাস্যে ডাকল।

"মংরা—মংরা আছেক্ রে বিটি?" দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করে রাসিক প্রশ্ন করল। "হয় আছেক্, কিন্তুক ভিৎরে আয়—"

"হুঁ—"

ধীরে ধীরে ভিতরে ঢুকল রাসিক, তাকাল ঘরের চারদিকে, তার নজর গিয়ে পড়ল ঘরের মাঝখানে দণ্ডায়মান মংরার দিকে। সে শব্দুরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এগিয়ে আসতে আসতে থেমে গিয়েছিল।

"চোঁপায়া দে"—মংরা স্তব্ধে বলল, তারপর অজস্র প্রশ্নভরা দুটো চোখ তুলে ধরল রাসিকের দিকে।

বসল রাসিক। তার ভগ্নগীতা কেমন যেন আড়ষ্ট ও ক্লান্ত। চিন্তাজর্জর মূখভঙ্গী। মাটির দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল সে। একটা স্তব্ধতা নেমে এল ঘরে।

"কি হইল বাবা—আঁ? কোনো কাম আছেক্ নাকি?" ঝুমুরী এই নিঃশব্দতাকে সহ্য করতে চাইল না।

রাসিক মাথা তুলে শূকনো হাসি হাসল, "ভাল আছিছ্ তু?"

"হয়"—

"রাতের খানা খায়া লিছিস?"

"হয়"—

মংরা চুপ করে ছিল এতক্ষণ, পিতা পুত্রীর কথোপকথন শুনছিল ও লক্ষ্য করছিল আর ভেবে অবাক হচ্ছিল যে, তার খোঁজ করে, তার নাম করে ডেকে ঘরে এসে হঠাৎ শব্দুর এমন নিলিপ্ত অপরিচিতের মত ভাগ করছে কেন?

"দুই তিনদিন তুর মায়ের কাছে গেলু না ক্যানে বিটি?" রাসিক মাঝির কণ্ঠে যেন স্নেহের সমুদ্র উথলে উঠেছে, করুণ একটা কোমলতায় মুখ চোখ হঠাৎ নরম হয়ে এসেছে।

ঝুমুরী মাথা নাড়ল, কানের পার্শ্ববর্তী এক গুচ্ছ চুল ঠিক করতে করতে বলল, "হয়। কাইল যামু ফির"—

"ভালা—যাইস।"

"ভাত খাবু বাবা—আঁ? খানা দুডা"—লজ্জা ভগ্নগীতে অনুরোধ জানাল ঝুমুরী।

"না—খায়া লিছি মা।"

"তবে পচানি খা"—বাপকে একটু খুশী করার যেন হঠাৎ জিদ চেপে গেছে ঝুমুরীর। তার সদার বাপকে একটু খাতির করে, সেবা করে দেন সে কৃতকৃতার্থ হতে চায়।

দেখে জ্বলে গেল মংরা। ইস্, যেন আর কারো বাপ নেই দুনিয়ায়। অমন ভোঁতা, ভীরু লোকটার জন্য ঝুমুরীর এত গর্ববোধ হয় কি করে তা ভেবে পায় না সে। যত সব—। হঠাৎ সে বিরক্ত হয়ে উঠল। আচ্ছা, মংলবটা কি বৃড়োর? রাতের পহরে এসে মেয়ের সঙ্গে ভাত আর পচানির গল্প করাটা কি এমন গুরুতর কাজ ছিল যে আজ না এসে উপায় ছিল না রাসিকের!

সে দু'পা এগিয়ে গিয়ে শব্দুরের সামনে দাঁড়াল, বাজে কথার মাঝখানে সমাপ্ত-রেখা টেনে বলল, "তামাকে ডাকছিল—ক্যানে?"

রাসিক ধীরে ধীরে তার দৃষ্টিটা মেয়ের দিক থেকে ফিরায়ে এনে জামাইয়ের দৃষ্টির সঙ্গে মেশাল, বলল, "একটা কথা কহমু"—

"কি—সিটা কি কথা?" কেমন যেন কঠিন শোনা মংরার কণ্ঠস্বর।

রাসিক দু'হাত এক করে চেপে ধরল, যেন নিজেকে সামলাতে চাইল, তারপর ধীরে ধীরে বলল, "তু হামার জামাই হয়। হামার সাথে দুখমনি করবু, হামাক্ বেইজ্জ করবু, মংরা?"

সমস্ত ব্যাপারটা নিমেষে পরিষ্কার হয়ে গেল, মংরা বৃকতে পারল যে, কোন জ্বালায় আজ এত রাতে রাসিক মাঝি যেতে তার ঘরে এসেছে। কিন্তু তাই বলে উপায় কি?

নির্ভরকারভাবে সে বলল, "দুখমনি করমু, —তুকে বেইজ্জ করমু? ক্যানে? হামি কি পাগল নাকি?"

"তভে তু হামাক্ মানবু না ক্যানে?" রাসিকের ছোট ছোট চোখ দুটোতে আকুল একটা

প্রশ্ন, সে বলল, “তবে ক্যানে তু কাইল সভাইকে লিয়া মাছ মাইরতে যাব?”

মংরার চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল, একটুও ইতস্তত না করে সে বলল, “হামি তো কিছু অন্যায় করি নাই। তু ভুল করাছিস্ হামি তাক্ শূধু রা লিছি। হামি মরদের বাটা, বেইজ্জতী সহিম্ ক্যামনে? হক্ আদায় কইরতে চাইলে, মরদের মত বাইচতে চাইলে যদি তুর সাথে দুশ্মনী করা আর তুর বেইজ্জতী করা হয় তবে তো হামি লাচার”—

রাসিক স্থির হয়ে শুনল সব কথা, ললাটটা শূধু রেখায়িত হয়ে উঠল তার, দুটিটো অবনত হল, বিড় বিড় করে সে বলল, “ই রায় আর পালটাইবি না তু?”

“না”—

“যদি গোলমাল করে পুলিশ”—

“তাথে উরায় না হামি”—

“তবে ইটাই তুর শায়ে কথা হইল?”

“হয়”—

রাসিক উঠে দাঁড়াল, মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, “চললাম বিটি—রাত হচ্ছে খুব”—

কোনো উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে, একবারও কারো দিকে না তাকিয়ে দড় পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রাসিক মাঝি, বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওপরের দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটাকে চেপে ধরে মংরা হাসল। বাকি হাসি। নিজের নেতৃত্বকে অক্ষয় ও একক করার জন্য রাসিক মাঝি আজ নিজে যেচে এসেছিল, লজ্জার মাথা খেয়ে।

ঝুমরী এতক্ষণ নিঃশব্দে সব কথা শুনছিল, ভিতরকার রহস্যটা ধরতে পারল না, শূধু মোটা কথায় বুঝল যে, বিলে কাল মাছ ধরবে স্বামী তার দলবল নিয়ে আর তাতে বাপের ঘোর আপত্তি।

সে প্রশ্ন করল, “মাছ ধরবু কাইল—আঁ?”

“হাঁ”—

“সর্দারক্ মানলু নাই তু?”

“না”—মংরা মাথা নাড়ল, ঝুমরীর মুখের দিকে তাকিয়ে ধারালো হাসি হেসে বলল, “তুর বাপ রাসিক মাঝিকে মানলাম নাই, কিন্তুক্ তাই থিকা বড়া সর্দারের হুকুম মানলাম রে শব্দরার বিটি”—

কৌতূহল ঘনাল ঝুমরীর চোখে, “কে? সে মনিষ্টি কে?”

বাঘের থাবার মত শক্ত একটা হাত বুকের ওপর রেখে আগের মতই সহাস্যে বলল মংরা, “হামার দিল্ রে ঝুমরী—হামার দিল্।”

সেই বাঘের থাবার মত শক্ত হাতটার ওপর প্রতীক্ষায় অধীর ও উক ঠোঁট দুটোকে চেপে ধরল ঝুমরী। আয় বাপ, তার মানুশটা একটা মরদের মত মরদ বটে।

সেইদিনই সকাল থেকে জমিদার বাড়িতে একটু চাঞ্চল্য জেগেছিল। সহর থেকে খোদা সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব কয়েকজন পুলিশ ও চাকর নিয়ে এসে হাজির হয়েছিলেন। উদ্দেশ্য পাখী-শিকার।

মাস ছয়েক হল সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ সেন এ জেলায় এসেছেন। শিবেন্দ্রকুমার বিচক্ষণ লোক, যাঁদের দিয়ে তাঁর স্বার্থসিদ্ধি হবে, জমিদারী প্রতাপ রক্ষা করার জন্য যাঁদের সাহায্য তাঁর একান্ত প্রয়োজন তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে তিনি একটুও দেরী করেন না। মিঃ সেনের আগমনের পরই তিনি যেচে গিয়ে আলাপ করে এলেন, একটি পার্টি দিলেন তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য।

মিঃ সেনের বয়স চল্লিশ বিয়াল্লিশ হবে। শালগাছের মত লম্বা, সুন্দরশন আকৃতি, পুলিশের বড় সাহেব হবার উপযুক্ত বাস্তব আছে তাঁর। বেশ চৌকস লোক, কড়া হাতে কাজ চালান। কিন্তু মেজাজ কড়া হলেও জনপ্রিয় লোক তিনি। খেলাধুলা, শিকার, ভ্রমণ ভালবাসেন, এই বয়সেও ফুটবল, হকি খেলেন, ক্রীড়ামোদী যুবকদের দ্বারা চান্দা দিয়ে উৎসাহ দেন। সংসারে তিনি একা মানুস, সাত আট বছর আগে পত্নীবিয়োগ হয়েছে, তারপর আর দ্বিতীয়বার বিয়ে করেননি, সে বিষয়ে ঔৎসুক্যও দেখা যায় না। অফিস, খেলাধুলা, এই সবোতেই সারাদিন কেটে যায়। সন্ধ্যার পর আসেন অফিসার মহলের হোমিয়ার চেমেরারা। নাট্য দশটা পর্যন্ত গল্পগুজব চলে। তারপরে আহালাদি শেষ হলে যখন একক মুহূর্তগুলো তাঁকে ঘিরে ধরে তখন তিনি ইংরেজী ডিটেক্টিভ্ বই খুলে বসেন।

পার্টি দেবার পর থেকেই শিবেন্দ্রকুমারের সঙ্গে মিঃ সেনের ঘনিষ্ঠতা বেশ নির্বিড় হয়ে উঠল। পার্টিতে নানা বিলিভী ডিসের পর এল বরফে ডোবানো মদের বোতল। শিবেন্দ্রকুমার তাকালেন মিঃ সেনের দিকে। মিঃ সেন মৃদু হেসে বললেন, “আই ডোন্ট মাইন্ড—। কাঁচের গেলাসে মদ ঢালা হল, তিনি তা তুলে নিলেন, গেলাস ধরার কায়দা দেখে শিবেন্দ্রকুমার বুঝলেন যে পুলিশ সাহেব আনাড়ী নন। একটু বাদেই তিনি প্রমাণ পেয়ে নিশ্চিত হলেন। মিঃ সেন ছ পেগ হুইস্কী গিলে, শিবেন্দ্রকুমারের পিঠ চাপড়ে হেসে বললেন, “ইউ আর এ ফাইন ফেলা চৌধুরী—ইউ আর স্লেপলিড”—

সেই মিঃ সেনের হঠাৎ খেলায় হয়েছে যে তিনি কাড়াল বিলে শিকার করবেন। এই সময়টাতে নানা পাখীর সমাবেশ হয় বিলের ধারে। এর আগেও তিন চারবার শিকার করে গেছেন তিনি, শিবেন্দ্রকুমারের অতিথি হয়ে। শিকার জুটত আবার অনেক সময় তা জুটতও না, শিকারের চেয়েও শিকার-পর্বটাই তাঁর

কাছে বেশী উপভোগ্য। আরো উপভোগ্য জমিদার-বাড়ীর আত্মথ্যতা, গুরুভোজন আর দামী মদ। তাই দপ্তরের কাজ একটু কমে অসতাই মিঃ সেন আজ সকালে এসে হাজির হয়েছেন। রোদের তেজ একটু কম হতেই শিবেন্দ্রকুমার ও মিঃ সেন দলবল নিয়ে বেরোলেন। দল মানে জমিদার, পুলিশ সাহেব, নন্দ, দুজন পুলিশ ও সাহেবের চাকর রঘু। নন্দ ও রঘুর কাছে ফ্লাস্ক ও টিফিন কেরিয়ার, ব্যাগে বসবার কম্বল, সোডার বোতল, গেলাস ও দু'একটা মাগাজিন। ব্রাচেস পরিহিত শিবেন্দ্রকুমার ও মিঃ সেনের হাতে বন্দুক এবং কাছে বাইনোকুলার। বাঘ-শিকারের উপযুক্ত আয়োজন অথচ মারবেন তাঁরা পাখী।

জমিদার বাড়ি থেকে মাইল খানেক এগোলেই বিলের যে অংশটা সামনে পড়ে, সেখানটাতেই শিকার পাওয়া যায়। এখানে মাটি অনেকটা উঁচু তাই জল কম, তাছাড়া জলে টানও ধরেছে। বনকলমী, জলজ ঘাস, শাপলা আর পশমফুলে ভর্তি জায়গাটা। তাঁর মাঝে, বিলের ধারে ধারে পিকেল হতেই নানা পাখীরা ভীড় করে আসে সেখানে। পক্ষ-বিধ্বননের শাঁ শাঁ শব্দ শোনা যায়, শোনা যায়, নানা রকমের ডাক। বক, বুনো হাঁস, স্নাইপ সারস আর বনমোরগদেরই বেশী দেখা যায়। গ্রামগুলো জায়গাটা থেকে একটু দূরে। নিজনি, ফাঁকা জায়গায়, বিস্কুট বিলার মাঝে ও ধারে ধারে সাদা সাদা শাপলা ফুল আর পশমফুলের মতই মনে হয় বক আর, হাসগলোকে। ভারী অশুভ, ভারী রোমাঞ্চকর সে দৃশ্যটা।

বিলের ধারে গিয়ে যখন তাঁরা পেঁছলেন তখন পিকেল হয়ে গেছে, পাখীর মেলা তখন শূধু হয়ে গেছে। চিক চিক করছে বিলের জল। হাওয়া নেই, একটু গরম বোধ হয়। বিল থেকে একটা বাপের ওরঙ্গ মাঝে মাঝে ভেসে আসে। অখণ্ড নিজনি চারদিকে। অতি দূরে কয়েকটা রাখাল ছেলে গরু চরাচ্ছে, বিলের অপর প্রান্তে জলকাদার মধ্যে গা ছাড়িয়ে পড়ে আছে কয়েকটা মোষ।

শিবেন্দ্রকুমার একটা মস্ত বড় বটগাছের নীচে থামলেন, বললেন, “এখনি শিকার করবেন না জিরোবেন মিঃ সেন।”

মিঃ সেন হাসলেন, “সে কি মশাই, শে আরম্ভ হওয়ার আগেই ইন্টারভাল? উহু হাত গরম করে নিই—আসুন”—একটা চোখ টিপে তিনি আবার বললেন, “তবে একটু কাজ করা যেতে পারে চৌধুরী মশাই।”

“কি?”

“এক চুমুক খেয়ে নেওয়া যেতে পারে।”

“চা?”

“হাসালেন আপনি। না, চা নয়, বড় চা”— শিবেন্দ্রকুমার হো হো করে হেসে উঠলেন

“ওয়াডারফুল। ঠিক বলেছেন মিঃ সেন”—  
নন্দর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, “ফ্রাস্ক  
খোলা নন্দ”—

নন্দ ফ্রাস্ক খুলল, ব্যাগ থেকে বের করল  
গেলাস আর সোডার বোতল।

সিগারেট ধরিয়ে ধীরে ধীরে দুজনে  
তাদের গেলাস নিঃশেষ করলেন। চাকর ও  
পুলিশেরা সতৃষ্ণ ও সশ্রদ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে  
রইল।

“এবার?” শিবেন্দ্রকুমার প্রশ্ন করলেন।

মিঃ সেন হেসে উত্তর দিলেন, “ফরোয়ার্ড  
মার্চ”—

একটু বাদেই গুলীর আওয়াজ ধ্বনিত  
হল। গুড়ুম গুড়ুম। বিলের ওপর দিয়ে  
আওয়াজটা দিগন্তের দিকে গড়িয়ে গেল।  
পাখীর দল তাঁক্ষ কোলাহল তুলে, ডানা মেলে  
আকাশের গায়ে পাক খেতে লাগল। কিছু দূরে  
গিয়ে বসল, কিছু পাড়ি মারল অন্য কোনে  
নিরুপদ্রব এলাকার উদ্দেশ্যে। বাতাসে ভাসতে  
লাগল বারুদের গন্ধ, আর হালকা নীল ধোঁয়া।

পুলিশ দুজন ছুটে গেল বিলের মাঝে।  
ছুরা গুলীর ঘায়ে গোটা চার পাঁচ বুনো  
হাঁস জলকাদা আর কলমী-লতার ওপর লুটিয়ে  
পড়েছে রক্তাক্ত দেহে।

“পড়েছে কয়েকটা”—শিবেন্দ্রকুমার বললেন।

“হ্যাঁ, নট্ ব্যাড”—মিঃ সেন বললেন।

ঘণ্টাখানিক ধরে চলল তাদের শিকার-  
অভিযান। আরো কয়েকটা পাখী মারা পড়ল।  
কিন্তু পাখীর দল অদৃশ্য হল সেখান থেকে।  
মানুষ, বারুদের গন্ধ, গুলীর শব্দ আর লুপ্তিত  
পাখীদের দেখে বাকী সব পাখী বাতাসকে  
আলোড়িত করে আকাশের গায়ে গা ভাসিয়ে  
দিল।

পরিপ্রান্ত বোধ করলেন ওরা। কবল  
বিছিয়ে বসলেন শিবেন্দ্রকুমার, মিঃ সেন ও  
তাদের দল। টিফিন কোরয়ার থেকে খাবার  
বেরোল, বেরোল রঙিন পানীয়। তখন সম্মুখ  
হতে আর দেরী নেই। ঢেউখেলানো মাঠের  
ওপর, বিলের জলের ওপর নেমেছে একটা  
গভীর প্রশান্তি, পশ্চিম দিগন্তে হেলে-পড়া  
সূর্যের চেহারা রক্তিম হয়ে উঠেছে।

মিঃ সেন তাকালেন চারদিকে। তাঁর ভালো  
লাগল দৃশ্যটা, কঠিন, শুকনো কতবোর বেঝা  
বহন করেও তাঁর রসকণ্ঠ শুকোয়নি। তিনি  
মুগ্ধ হয়ে গেলেন, তার দৃঢ় চোখে প্রশংসা  
ধ্বনিয়ে এল।

শিবেন্দ্রকুমারের দিকে তাকিয়ে তিনি  
বললেন, “আপনার দেশটি চমৎকার চৌধুরী  
মশাই, বিশেষ করে এই বিলটা সিম্পলি  
ওয়াডারফুল”—

শিবেন্দ্রকুমার সোৎসাহে সায় দিয়ে হঠাৎ  
এক মুহূর্তেই অস্বাভাবিক নিশ্বেজ হয়ে পড়লেন,

“কিন্তু এই সুন্দর বিল নিয়ে কি বিপদে  
পড়েছে তা শুনছেন তো?”

“কি বিপদ?”

ফ্রাস্কের সাঁওতাল ধাতুর আর মুসল-  
মানেরা জোর করে বিলের মাছ মারার ফিকিরে  
আছে।”

মিঃ সেন হাসলেন, তাঁর ঝকঝকে দাঁত  
ঝিলিক মেয়ে উঠল, তিনি বললেন, “পলীজ  
ডোন্ট ওরি চৌধুরী মশাই, আপনাকে অমান্য  
করা তো আইন অমান্যের সামিল হবে এবং  
আমরা তা টলারেট করব না। জানোয়ারগুলোর  
যদি সে দুঃসাহস হয়, তবে থানার সাহায্য  
নেবেন। জংলীরা তাহলে এসব বুনো হাঁসের  
মতই মাছ ধরতে এসে জলের মধ্যে  
লুটিয়ে পড়বে।”

বাতাসে তখন দামী হুইস্কির তীব্র গন্ধটা  
ভেসে বেড়াচ্ছিল।

শেষরাতে রসিক মাঝি ধড়মড় করে উঠে  
বসল, খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে  
তাকাল। না, ভোর হয়নি, এখনো রাত আছে।  
সারারাত সে প্রায় না ঘুমিয়েই কাটিয়েছে, এই  
সময়টিতে বোরিয়ে পড়ার জন্য। সারারাত সে  
ছটফট করেছে, বিছানার ওপর এপাশ-ওপাশ  
করেছে একটা দুঃশ্চিন্তায়, একটা অস্তদীর্ঘী  
জ্বালায়।

বাইরে চাঁদ আছে বটে, কিন্তু ঘরের  
ভিতরটা অন্ধকারই বলা চলে। হাংড়ে হাংড়ে  
দেশলাই বের করল রসিক, ডিবেটা জ্বালাল।  
তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে মুখহাত ধুয়ে এল।

ঘরের ভিতর যখন সে গামছাটা কাঁধে  
ফেলছিল তখন পুয়ার মার ঘুম ভাঙল। অবাক  
হয়ে তাকাবার চেষ্টা করল সে, নিদ্রা-জড়িত  
কণ্ঠে প্রশ্ন করল, “কি কইরছ জী-আঁ?”

রসিক এদিক-ওদিক তাকাল, কি যেন  
খুঁজছে সে, বলল, “ধামু-বাহার।”

“বাহার-কুনটে?” পুয়ার মা ধীরে ধীরে  
উঠে বসল।

ঘরের কোণ থেকে রসিক একটা ছোট লাঠি  
আর ছেঁড়া ছাতাটা তুলে নিল, টাকৈ গম্ভীর  
চুটি, দেশলাই আর কিছু পয়সা, বোয়ের প্রশ্নের  
জবাব দিল না।

“কুনটে যাছ বা, জবাব দিছনা ক্যানে?”  
পুয়ার মা আহত কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

“কাম আছেক, যাচ্ছি সহরোৎ”—টেনে টেনে  
বলল রসিক।

“কখনি ফিরবু?”

“দুফুরবেলা”—

একবার ঘরের চারদিকে তাকিয়ে রসিক  
মাঝি বোরিয়ে পড়ল। প্রথমে আস্তে আস্তে  
চলতে লাগল সে, দেহে তখনো আলসা আছে।  
একটু হাটতেই তার শরীরটা গরম হয়ে উঠল,

শেষ-রাতের ঠান্ডা বাতাসে শরীরটা জড়িয়ে  
গেল, তাজা মনে হল, তখন তাড়াতাড়ি চলতে  
আরম্ভ করল। রাতের শেষ প্রহর। পশ্চিম-  
দিকে হেলে পড়েছে ম্বাদশীর চাঁদটা। মরা  
জ্যোৎস্নায় ধূসর স্বপ্নের মত অস্পষ্ট,  
কুহেলিকাময় মনে হচ্ছে সব কিছুকে। একটু  
আগেই শোয়ালো প্রহর ঘোষণা করে মাটির  
সমুদ্রের মত তরঙ্গায়িত বিসৃত ক্ষেতের ওপর  
দিয়ে দূর বনের দিকে চলে গেছে। এখন শুধু  
ঝিঝি পোকারা ডাকছে যতহীন ছন্দে।

দেশ লাগছিল আর বেশ জোরে জোরেই  
চলছিল রসিক মাঝি। কিন্তু হঠাৎ চমকে  
উঠল, যেন চাবুকের ঘা খেয়ে লাফিয়ে উঠল।  
বকের পালকের মত ধবধবে সাদা চুল-ভর্তি  
মাথা আর তালগাছের গুঁড়ির মতই মজবুত  
শরীরের নীচে তার রক্ত যেন অশান্ত সমুদ্রের  
মত উদ্দাম হয়ে উঠল। লাঠিটাকে বজ্রমুষ্টিতে  
চেপে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে, তাকাল  
পেছন ফিরে।

ঢাকের শব্দ ভেসে এল।

—কড়ুড়ু—ডুম—কড়ুড়ু—

সে শব্দ মুহূর্তকাল স্থির হয়ে শুনল  
রসিক মাঝি, তারপর আবার দ্রুতপদে চলতে  
আরম্ভ করল সে, নিঃশব্দে। কেবল তার ছোট  
ছোট চোখ দুটো জ্বলন্ত কাঠকয়লার মত  
জ্বলতে লাগল, ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল একটা  
বাঁকা ধারালো হাসি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই  
সে দূরে মিলিয়ে গেল।

শিরসি গ্রাম ঢাক বেজে উঠল। ঝিঝি  
পোকার ডাক যেন থেমে গেল, মরা জ্যোৎস্নার  
মায়াময় পরিবেশটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল আর  
নিঃশব্দ ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে তাঁর মত  
ছুটে গেল ঢাকের শব্দটা। —কড়ুড়ু—ডুম—  
—ড্যাং ড্যাং—কড়ুড়ু—

সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত গ্রাম থেকেও ঢাকের  
শব্দ শোনা গেল। ধানির প্রতিধ্বনির মত।  
যেন গ্রামটা সাড়া দিল, যেন বলল যে হ্যাঁ,  
আমরা জেগে আছি, রওনা দিচ্ছি, সবাইকে  
একথা জানিয়ে দিচ্ছি।

সেই শব্দ পেয়ে শিরসি গ্রামের ঢাক থেমে  
গেল। আর মরা জ্যোৎস্নার ধূসর আলোর  
মাঝে দেখা গেল একদল জোয়ান মানুষকে।  
একজন দুঃজন নয়, একশ—একশজন জোয়ান  
মানুষ। আঁকাবাঁকা আলের ওপর দিয়ে, উচ্চ-  
নীচু জমির মাঝখান দিয়ে, শক্ত শক্ত, কালো  
কালো, শিরাবহুল, পেশল পায়ের চাপে মাটির  
ঢেলা চূর্ণ করে ওরা এগিয়ে চলল। ওদের  
অনেকের হাতে লাঠি, অনেকের হাতে জাল,  
পলুই আর কোঁচ। চোখে ওদের বিলের স্বপ্ন,  
ওদের চাপা নাক দৃঢ়সংকল্পে ফুলে মোটা হয়ে

উঠেছে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে ওরা, পাখরের মত শক্ত বৃক ওদের আরো শক্ত, আরো কঠিন হয়ে উঠেছে। পায়ের নীচেকার মাটির মাঝে আরো পদধ্বনি শোনে তারা—অদৃশ্য বহু মানুষের পদধ্বনি। সব গ্রামের সব লোকেরা যে আসবে না—এটা নিশ্চিত। রসিক মাঝকে যারা মানে, যারা তার হুকুমকে অগ্রাহ্য করতে ভয় পায় তারা আসবে না। পান্ডী সাহেবও অনেককে ঠান্ডা করে দিয়েছেন। শতকরা ঘাট্টা লোকই হয়ত অনুপস্থিত থাকবে। তবু যারা আসবে, যারা রক্তের ডাকে সাড়া দেবে, সর্দারকে অমান্য করে ছুটে আসবে, তারা সংখ্যায় কম হবে না। নিমাইল, নিমডাঙ্গা, হরিশপুরা, বাঘারিয়া—সব জায়গাতেই ঢাক বেজেছে—কড়ুড়ুড়ু—ড্যাংডা ড্যাডাং—। সব জায়গা থেকেই জোরান লোকেরা সারি বেঁধে বেরিয়েছে। একের পর এক—শত শত মানুষ। কে বাধা দেবে, কে বাঁধতে করবে তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে

শহর নয়, জমিদার-বাড়ীর ফটকের সামনে গিয়ে থামল রসিক মাঝ। পুয়ার মাকে সে মিথ্যে কথা বলোছিল। বেইমান, অকৃতজ্ঞ নয় রসিক, শিবেন্দ্রকুমারের কড়কড়ে নোটের প্রতিদান দিতে এল লোকটা।

জনাদন সিংকে ডেকে তুলল সে।

সিংহ রীতিমত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে বসল, “কি, কি মাংসিৎস রে ব্যাটা মোড়ল?” “জলদি-জলদি জমিদারবাবুকে খবর পাঠাও সিংজী—গোলমাল হৈছে।” উত্তেজিত-ভাবে বলল রসিক।

“কি গোলমাল রে মাঝ?”

“বিলোং মাছ মাইরভে সভাই—আইজ।”

“হাঁ?”

“হাঁ?”

“বৈঠ্ তু—খবর পঠাচ্ছি হামি”—

সিংজী ভিতরে গেল।

ভোরের আলো তখনো দেখা দেয়নি। রাতের গুরুভোজন ও অত্যধিক পানের ফলে গভীর ঘুম অচেতন হয়ে ছিলেন শিবেন্দ্রকুমার। কেউ ভরসা পেল না, জনাদন সিং-ই সাহস করে ডেকে তুলল মনিবকে।

আরক্ত চোখ মেলে ক্রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন শিবেন্দ্রকুমার, “কি, কি হয়েছে জনাদন, এটি?”

“বিলোং মাছ ধইরছে হুজুর—সাঁওতাল শালারা”—

আর বলতে হল না, লাফ দিয়ে উঠলেন শিবেন্দ্রকুমার, আলস্য ও ঘুম উড়ে গেল তাঁর, জামা পরতে পরতে তিনি প্রশ্ন করলেন, “কে খবর দিল?”

“রসিক মাঝ হুজুর—বাহার বৈসে আছে।”

“হুঁ”—

দ্রুতপদে বাইরে গেলেন তিনি।

রসিক মাঝ মাটি পর্যন্ত ঝুঁকে সেলাম জানাল।

শিবেন্দ্রকুমার জুকেপ করলেন না, প্রশ্ন করলেন, “বিলে মাছ ধরছে সবাই রসিক?”

“আজ্ঞা”—

“কত লোক হবে?”

“তা সব গাঁ থিকা কিছু, কিছু আইলেও এক হাজার মনিষ হবে।”—

“এক হাজার!”

“আজ্ঞা”—

“কতক্ষণ আগে রওনা হয়েছে তারা?”

“তা এক ঘণ্টা হইল। হামি যখন আইনু, উরাও তখন বাহার হইল।”

“আচ্ছা তুই বোস্।”

“আজ্ঞা”—

রসিকের ঠোঁটের কোণে একটা চাপা হাসির রেখা। শব্দ প্রতিদান নয়, শব্দ জমিদারের প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শনই নয়, আরো কিছু আছে তার আজকের আচরণের পেছনে। বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে সে, রসিক তা স্বীকার করে। কিন্তু তা ছাড়া উপায় ছিল কি? ছোকরাদের বাড়াবাড়ি আর সহ্য করতে পারছে না রসিক, দুঃসহ হয়ে উঠেছে তাদের ঔন্মত। বিশেষ করে মংরা তাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে, ধীরে ধীরে তার সম্মানের সিংহাসনটাকে কেড়ে নিচ্ছে, অধিকার করে ফেলেছে। উপায় ছিল না রসিকের। খুব ভেবেচিন্তেই সে সংবাদটা জানাতে এসেছে, ঘরভেদী বিভীষণ সেজেছে। জানুক শিবেন্দ্রকুমার, যাক পুলিশ, গুলী চালাক, ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাক সাঁওতালেরা, উপলব্ধি করুক যে প্রবীণ সর্দারকে মানা উচিত, তার পাকা বুদ্ধিকে স্বীকার করা উচিত।

ওদিকে শিবেন্দ্রকুমার তখন মিঃ সেনকে ডেকে তুলেছেন।

“হোয়াট্‌স্‌ আপ্‌ মশাই—কি হল?”

“দ্রাবল—বিপদ হয়েছে মিঃ সেন। কিছু মনে করবেন না।”

মিঃ সেন হাসলেন, “থুঁলে বলুন না মশাই—ভূমিকা কেন?”

“বিলে হাজারখানিক সাঁওতাল এসেছে, জোর করে মাছ ধরবে।”

“বটে!”

“কি করা যাম্?”

“ঘাবড়ে গেছেন নাকি?”

“পাগল, ব্যাটারের সাহস দেখে জবলে উঠেছি”—

“দ্যাস্ট্‌ অলরাইট, কিছু ভাববেন না। হাজারখানিক লোক? নেভার মাইণ্ড। বুলেট্‌স্‌ আর এ স্ট্রগার পাটি।” দরজার সামনে গিয়ে মিঃ সেন একজন পুলিশকে ডাক দিলেন, “রামলগন সিং”—

“হুজুর”—

পরদা ঠেলে ভিতরে এসে সেলাম জানাল রামলগন সিং।

মিঃ সেন বললেন, “থানাতে যাও, জলদি। দারোগাবাবুকে বল যে সমস্ত পুলিশদের নিয়ে যেন এখনি আমার এখানে হাজির হয়—এখনি আর রাইফেল সমেত।”

“জী”—সেলাম জানিয়ে রামলগন সিং চলে গেল।

মিঃ সেন শিবেন্দ্রকুমারের দিকে তাকিয়ে সহাস্য বললেন, “পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে—কথাটা জানেন তো? ব্যাটারের তাই হয়েছে, কপালে দুঃখ-দুর্গতি আছে, ঠেকাবে কে?”

রসিক মাঝ তখন বাইরে চুপ করে বসে চুটি টানছিল। আত্মতৃপ্তির হাসি ছিল তার মুখে, নিজের বুদ্ধি সম্বন্ধে গর্ব হিচ্ছিল তার। তবু কি একটা যেন খচ খচ করছিল তার মনের মধ্যে, তবু একটা ফ্যাকাশে ছায়া ঘনাচ্ছিল তার উদ্ভাসিত মুখমণ্ডলে আর চোরের মত তাকাচ্ছিল সে এদিক ওদিক। ভাবছিল রসিক। সে যা করেছে বেশ করেছে, তার কাজের যুক্তি আছে। কিন্তু তবু, যুক্তি থাকলেই কি সব কাজ সব সময় করা উচিত? বিবেক, রসিক মাঝের বিবেক মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার চেষ্টা করছিল।

হঠাৎ সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল, থুঁতু ফেলে, বিড়ি বিড়ি করে নিজেকেই যেন বলল সে, “যা কইরাছি ঠিক কইরাছি—হাঁ—ঠিক কাম কইরাছি হামি”—

নিজের বিবেকের গলা টিপে ধরল রসিক মাঝ। ঠিক, সে কোন অন্যায় করেনি, সে ঠিক কাজ করেছে। বাস্‌। (ক্রমশ)



# গোলাম সৈনিকের চোখে স্বাধীনতা ফৌজ

★ শ্রীকৃষ্ণ কুমার পাল ★ ★

( ৯ )

'৪৪ সন অভিবাহিত হয়ে ৪৫ এসে গেল। শত্রুর পুনরাগ্রমণের কোন আভাসই পাওয়া গেল না। ফেব্রুয়ারী মাসে ঠিক হল আমরা বিমানে করে মাদ্রাসায় যাব। দিন কয়েক যেতে না যেতেই আমাদের সৈন্যগণ অপ্রত্যাশিতভাবে এগিয়ে যাওয়ায় আমাদের মাদ্রাসায় যাবার আবশ্যকতা রইল না। তখনই শুনতে পেলাম জাপানীদের ওপর চারিদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার একটা পরিকল্পনা রয়েছে এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের সিংগাপুরে পাঠান হবে।

আদেশ অনুযায়ী আমরা ইম্ফল ছেড়ে চাটগায়ে পৌঁছলাম। সেখানে দিন কয়েক থাকতে না থাকতেই জার্মানীর আত্মসমর্পণের খবর এল। জার্মানীর অপ্রত্যাশিত পতনের সাথে সাথেই আমাদের যুদ্ধ-পরিকল্পনা একটু বদলে গেল। আমরা চাটগা ছেড়ে রাঁচিতে গেলাম। সেখানে Re-organisation-এর পর আমরা সিংগাপুরে যাব এই সিদ্ধান্ত হল।

একে একে দুটি মাস রাঁচিতে কেটে গেল। জাপান এরই মাঝে মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে। রাঁচীতে বিজয় উৎসব হল। কারো কারো জানতে ইচ্ছে হতে পারে যে, এ উৎসবে আনন্দ কেমন হয়েছিল। এই প্রশ্নটির জবাব দিতে গেলে আমাদের বলতে হয় বিজয়ের অনুপাতে আনন্দের সাদাই পাই নি। আসলে মানব জাতির প্রকৃত শত্রু পরাজিত কিনা তা অনেকেই জানতে পারে নি। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ 'আণবিক বোমা'। প্রায় আড়াই লাখ মানব জীবন ও বহু নগরী ধ্বংস করে বিজয়ী মিত্রপক্ষ যখন আনন্দ উৎসবে মত্ত, তখন সাধারণ মানুষ অধঃপাতিত হয়ে ভাবছিল "এ কি! এ কি বিজয়? এ কি সভ্যতা?" এ বিজয়, এ সভ্যতা, সৃষ্টির জন্য—না ধ্বংসের ভাণ্ডবন্দ্য অভিনয় করার জন্য?" সামরিক বিভাগে থেকেও এ বিজয়ের দিনে আমি ছিলাম নীরব। এ বিজয়ে উল্লসিত হওয়ার আমার কিছুই ছিল না। যুদ্ধ থেমে গেলেও আমার ভারবাহী সৈনিক জীবনের অবসান হতে সময় লাগবে। তাই আনন্দাতিশয্যে মেতে উঠতে পারিনি।

শরণ অবসানে সিংগাপুরে আমার যাত্রা শুরু হল। রিগেডায়ার সাহেবের সেই ভবিষ্যৎ-বাণী মনে পড়ল। "আমি একদিন না একদিন

তোমাদের সিংগাপুর পাঠাই পাঠাব।" সত্যিই সিংগাপুরে চললাম। সিংগাপুরে যাবার কিছু আগে আমার ৭৮ দিন ছুটিতে যাবার কথা ছিল। কিন্তু যেতে পারিনি। বাড়িতে সবাই যখন আনন্দময়ী আগমনে আমার প্রতীক্ষা করছিলেন, ঠিক তখনই আমার তেপান্তর যাত্রার সংবাদ বাড়ি পৌঁছল। সাগরের বৃকে জাহাজে ভাসছিলাম, আর থেকে থেকে পূজার তিনটি দিনে কখন কি হয়েছে, তাই মনে পড়ছিল।

সিংগাপুরে যাবার আগে আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে একটি কথাও শুনিনি। তবে একদিন মাত্র অমৃতবাজার পত্রিকায় দেখেছিলাম 'Subhash Chandra Bose was not a mere puppet in the hands of the Japanese.'

এই নিয়ে একটি খবর ঘেরিয়েছে। শ্রদ্ধা এই মাত্র খবর পেয়েই আমি সিংগাপুরে চলে যাই। ভারতে থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে আর কিছুই জানতে পারিনি। সিংগাপুরে যাবার

প্রাকালে বেলুড়মঠে স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজের সাথে দেখা করে যাই। তিনি আশীর্বাদ জানিয়ে আমাকে বিদায় দিলেন।

সমস্ত সামরিক জীবনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিনি, সিংগাপুরে গিয়ে তার কিছুটা পেয়ে যাই। নিউটনের কথায়, সিংগাপুরের আগে আমি বেলুড়মঠের তীরে বসে শ্রদ্ধা উপলব্ধিই সংগ্রহ করছিলাম।

২২ অক্টোবর—১৯৪৫ সাল, আমি সিংগাপুরে পৌঁছলাম। ১১ অক্টোবর কলিকাতা থেকে রওয়ানা হই। বঙ্গ উপসাগর তখন 'মাইনে' ভর্তি ছিল বলে আমাদের খুব সতর্কতায় যেতে হয়েছিল এবং সেই জন্যই সিংগাপুরে পৌঁছতে ১১ দিন লেগেছিল। জাহাজ থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত খুব দেখেছি। পংকজবাবুর বায়না ছিল এ নিয়ে তাকে দুটো কবিতা লিখে পাঠাতে। কিন্তু লিখতে পারিনি। সমুদ্রের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত ডেকের যাত্রীদের মনে কোন ক্রিয়াই করতে পারেনি। সবাই যে চোখ দিয়ে এসব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে আমিও তাই দেখেছিলাম। আমার ভাব-সমুদ্রে এসব দৃশ্য কোন ঢেউই তুলতে পারল না।

বিদেশে বাঙালী মাঠেই 'স্বজন'। আমার মনে হয়, বিদেশে ভারতবাসী মাঠেই স্বজন। একথা বললে বোধ হয় কোন ভুল হবে না। সিংগাপুরে পৌঁছে ভারতীয়দের সাথে মেলামেশা করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগল। কিন্তু



নেতাজী কৃষ্ণ বাঙ্গীর রাণী বাহিনী পরিদর্শন

আশ্চর্য খািক পোষাকের ভয়ে আমাদের সাথে বড় কৈউ কথা বলতে চাইত না। যাক—দিন-কয়েক যেতে না যেতেই ওরা বুদ্ধিতে পারল আমাদেরও প্রাণ আছে, আমরাও ভারতমাতার সন্তান, পরাধীনতার গ্লানি আমরাও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি। সৌভাগ্যক্রমে ১৯৪০ সালে যারা বার্মায় ও মালয়ে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল, তাইহা তো আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেছিল। আমরাও যদি ঐ সময়ে ঐসব জায়গায় থাকতাম, তাহলে আমরাও আজাদী সৈনিক হয়ে যেতাম, এ বিশ্বাস ক্রমশ তাদের হল। সিংগাপুরের ভারতীয়দের সাথে আমাদের সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল।

আমাদের ডিপোতে বহু সিভিলিয়ান (ভারতীয় ও চীনা) কেরানী ও আদালতী নিয়োগ করা হল। আমাদের অফিসে একটি ইউ. পির আদালতী ছিল। তারই কাছ থেকে সবপ্রথম নেতাজী, আজাদ হিন্দ ফৌজ ও রাণী ঝাঁসী বাহিনীর খবর পাই। মালয়ে ভারতীয় মায়েই আজাদ হিন্দ সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আমার ঐ আদালতীটি আজাদী ফৌজের একটি বিশেষ পাণ্ডা ছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের কথা বলতে বলতে সে যেন উত্তেজিত হয়ে উঠত। কথা শুরুর করেছে তো একবার থেকে শব্দ বলেই যাচ্ছে। কথা বলতে বলতে তার চোখ-মুখ লাল হয়ে যেত। একটা যে নতুন জীবনী-শক্তির পরিচয় সে পেয়েছে, সেটা বুঝতে পারলাম।

একদিন রবিবার সকাল বেলা সিংগাপুর সিটিতে মন্দির দেখতে গিয়েছি। শিব আমার সাথী। মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারে একটি গোফওয়ালার দেশওয়ালীর সাথে দেখা হল। সে আমাদের দিকে তাকিয়ে কি দেখাচ্ছিল। শিবকে বললাম যে, এর কাছ থেকে কিছু খবর আদায় করা দরকার। আমি এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলাম—

“ভাইয়া, তুমি কিধার কা রেনেওয়ালার?”

“জী, ইউ পি-কা।”

“আচ্ছা, মেরি বাত শোনো। তুমি আজাদ হিন্দ ফৌজমে থে?”

“জী, না।”

“নেতাজী কা নাম নেই শোনো?”

“জী, না।”

আমাদের খািক পোষাক দেখে বেচারী কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না মনে হল। আমি তাই অন্য উপায় বের করে জিজ্ঞেস করলাম—

“তুমি কাঁসা হিন্দুস্থানী হো? আজাদ হিন্দ ফৌজ কা নাম নেই শুনতা, নেতাজী কা নাম বি নেই জানতা। ফির বলতা হায় হিন্দুস্থানী! তুমি কাঁসা হিন্দুস্থানী?”

ও চটে গিয়ে বলতে লাগল—

“তুমি কাঁসা হিন্দুস্থানী হো? গোলাম হো কর ইধার আগিয়া, সরম নেই আতা?”

৫



ঝাংসীর রাণী বাহিনী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে নেতাজী,

তুমি কো কিয়া পাতা? তুমি কো কিয়া মালুম? হাম নেতাজী কা সিপাহি থে। তামাম জিন্দেগীমে হাম ছেশ' ডলার কামায়া। এ ছেশ' ডলার ও মেরা জিন্দেগী কো—হিন্দুস্থানকা আজাদিকে লিয়ে নেতাজীকা পা-পর উৎসর্গ কর দিয়া। তুমি কো কিয়া পাতা? হামছে পুছতে হো—তুমি কাঁসা হিন্দুস্থানী হো?”

ওকে চটিয়ে আমাদের কাজ হল। ওর কাছ থেকে বহু খবর পেলাম। ওরা নেতাজীকে অবতার জ্ঞানে দেখত। নেতাজীর নেতৃত্বে ওদের অটুট বিশ্বাস ছিল। নেতাজী ছিলেন গরীব দুঃখী ও উৎপীড়িতদের পরম বন্ধু। তাইত আজাদ হিন্দ সরকারের সর্বাধিনায়ক হয়েও তিনি সাধারণ মানুষকেও ভুলেননি। গোয়ালারদের জন্য তিনি আলাদা একটি সংঘ করেন। এই গোয়ালারা নিজেদের সবস্ব বিক্রি করেও নেতাজীর মালা খরিদ করে ধনা হয়েছে। ঐ মালা খরিদের উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—আজাদ হিন্দ সরকারকে সাহায্য করা। এরকম ভুলনারিহীন আরো অনেক ঘটনাই দেশ-ওয়ালীটির কাছ থেকে শুনতে পেলাম। মনে হল—

“Who are these that work in silence, work hard, demanding nothing? Who are these that make you big by paying the blood and flesh of their own? one answer: They are none but the sufferers of the world.”

আর একদিন বাজারে যাচ্ছি, এমন সময় রাস্তায় একটি মাদ্রাজী বড়োকে দেখতে পেলাম। তার বৃকের ওপর সার্টের গায়ে নেতাজীর একখানা ফটো লাগান রয়েছে। শিব জিজ্ঞেস করল—“ভাইয়া, এ ক্যারা হায়?”

মাদ্রাজী বড়োটি ভাল হিন্দু জানত না। তাই আধভাংগা হিন্দিতে জবাব দিল—“নেতাজী

ঝাংডা হাম সিপাই।” অর্থাৎ নেতাজীর পতাকার নীচে আমি সিপাহী ছিলাম। বড়োর বয়স পঞ্চাশের কম হবে না। কিন্তু তার কথাবার্তা শুনে কে বলবে যে, সে বড়ো। আমাদের বহু যুবকের চেয়েও তার জীবনীশক্তি ছিল অধিক। তাইতো বড়ো বয়সেও নেতাজীর আহবানে সে জীবন উৎসর্গ করেছিল। অবাধ-বন্দ-বিনতা সবাই ঐ পাগল-করা ডাক, ঐ দেশমাতৃকার আহবান শুনতে পেরেছিল। ধনী অকাতরে দিয়েছে ধন, গরীব দিয়েছে প্রাণ। কেউ নীরব বসে রয়নি। বসে থাকতেও পারে না। কি ছেলে, কি মেয়ে, সবাই এগিয়ে এসেছিল আত্মোৎসর্গের মহাবাজে নিজেকে বলিদান দিয়ে ধনা হয়ে ওদের মর্মে মর্মে পেঁছাচ্ছিল নেতাজীর আহবান—

“Get up, we have no time to lose. Take up your arms. There in front of you is the road that our pioneer have built.”

মালয়ে ভারতীয়দের একতা দেখে বাঙলা দেশের কথা আমার খুব করে মনে পড়েছিল। এক বাঙলা দেশে কত ভিন্ন ভিন্ন মত নিয়ে কত ভিন্ন ভিন্ন দল গড়ে উঠেছে। আফসোস! বাঙলার বৃকে নেতার অভাব নেই—অভাব শব্দ অনুগত ভক্তের, অনুগত সৈনিকের। স্বাধীনতার ইতিহাসে আমাদের দান কম, একথা বলার মত ধৃষ্টতা আমার নেই। তবে আমি শব্দ বলতে চাই, ভিন্ন ভিন্ন মত ছেড়ে সমস্ত দেশ জুড়ে, আকাশ-বাতাস ভরে থাকবে শব্দ এক সুর, এক আহবান, “এগিয়ে চল।” পর্বতপ্রমাণ বাধাকে কেমন করে লঙ্ঘন করতে হয়, বিপদে কেমন করে ধৈর্য ধরতে হয়, প্রয়োজন হলে নেতাজীর আদেশে নিজেকে কেমন করে বলি দিতে হয়—তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আজাদ হিন্দ ফৌজ।

আমার মতে আসত দেশটাকে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা দিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ, সাম্প্রদায়িকতা এবং 'আমিই বেশী বুঝি' ভাবটা আর থাকত না। একদিকে যেমন আমাদের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার আবশ্যক, ঠিক তেমনি অন্যদিকে আমাদের ভেদাভেদকে পিষে দেওয়ার জন্য নেতারও আবশ্যক। আবার বলি, নেতা আমাদের আছেন, নেই শুধু অনুগত ভক্ত।

আর একটি ঘটনা বলছি। আজাদ হিন্দ ফৌজে যে 'জয় হিন্দ' বলে অভিবাদন জানান হত, সে আমাদের জানা ছিল না। একদিন একটি পাঞ্জাবী দোকানে ঢুকে আমি বললাম—“জয়রাম জী কী!” দোকানের মালিক আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বলল—“বাবুজী, এ হিন্দুস্থান নেহি। এ সিংগাপুরে হায়। ইদার 'জয়রাজ', নমস্কারম্, নমস্তে, গুডমরনিং' কুছ নেহি। সিরিপ 'জয় হিন্দ' বলনা চাইএ। আইনদাকে লিয়ে ইয়াদ রাখনা।”

আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললাম—“মাপ কিয়ে জী! হামারা মালুম নেই। আবেমে হাম হামেসা জয় হিন্দ বলেগা।”

আমাদের ডিপোতে যেসব ভারতীয় কেরানীরা (সিভিলিয়ান) কাজ করতেন, তাদের কাছ থেকে আইন এন এর বহু পুঁথিপত্রের খবর পেলাম। ওরাই প্রথম

“On to Delhi,” “Immortal Hind” Dawn of Freedom.” ইত্যাদি বই আমাদের এনে দেন। এসব বই শুধু পড়েই এসেছি, আনতে পারিনি। ওদের কাছে এই বইগুলো গীতার চেয়েও মূল্যবান। তাই ওরা একখানা বইও ছাড়তে চান নি।

( ৯ )

সিংগাপুরেও যে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন আছে, তা আমার জানা ছিল না। লাহোরে থাকতে তিন বন্ধু মিলে একদিন ঠাকুর প্রণাম করতে রামকৃষ্ণ মিশনে যাই। অবিশ্য স্বামী দেবশ মহারাজের সাক্ষাৎ লাভ করা আমার উদ্দেশ্যের অন্যতম ছিল। মিশনের ঠিকানা আমাদের কারো জানা নেই। একে একে চার-পাঁচজন ভদ্রলোককেই জিজ্ঞেস করলাম। কেউ বলতে পারলেন না মিশন কোথায়। শেষ পর্যন্ত হ্যাট, কোট ও টাই-পরা একজনকে জিজ্ঞেস করলাম—

“Excuse me, please, could you tell me where the Ramkrishna Mission is?”

জবাব এল—

“Which department he belongs to?” আমরা তো হেসেই খুঁন। ভারতীয় হয়েও রামকৃষ্ণ মিশনের নাম জানে না ভদ্রলোকটি। তখন মনে হয়েছিল—আমরা কি সেই দেশে যেখানে “Do you know Jesus Christ?” জিজ্ঞেস করলে, জবাব আসে “What is his number?” যাক, সিংগাপুরে আমার সে অবস্থা হয়নি। লাহোরে আরো হৃৎকট ঘটনা আমাকে অবাক করেছিল।



ব্রহ্ম রণাঙ্গনে নেতাজীর বক্তৃতা

এক ভদ্রলোক হিন্দু হয়েও স্বামী বিবেকানন্দের নাম জানেন না। অথচ তিনি শিক্ষিত, আধুনিক কৃতিসম্পন্ন।

সিংগাপুর রামকৃষ্ণ মিশনে শ্রীবৃন্দ মহারাজের সাক্ষাৎ পেলাম। তাঁর কাছে নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বিস্তারিত ইতিহাস শুনছি। নেতাজীই যে তাদের একমাত্র প্রকৃত নেতা, একথা মালয়প্রবাসী ভারতীয়গণ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। নেতাজীর তেজস্বিনী বক্তৃতা শুনবার জন্যে সামরিক ও বেসামরিক সবাই উন্মুখ। নেতাজীর বক্তৃতা চলছে—লোকে লোকারণা হয়ত এরই মাঝে বৃষ্টি এল। কিন্তু আশ্চর্য! ঐ ঝড়-বৃষ্টি তাদের কিছু করতে পারত না। বক্তৃতা শুনতেই হবে। নেতাজীর বক্তৃতা যে শুনছে, সেই পাগল হয়েছে। ওরা যখন শুনতেন—

“Nothing is eternal on earth. But self sacrifice for the cause of Righteousness, for the cause of innumerable innocent sufferers, keeps one's name eternally engraved not only on the walls of the history of one's worldly life but also on the walls of one's heavenly life.”

তখন কি কেউ আর অলস বসে থাকতে পারতেন। নেতাজীর বক্তৃতা ছিল মৃতসজীবনী সূচ্য। সবার ভেতর প্রাণ সঞ্চার করত। নেতাজী হয়ত ফুঁড়ের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, আর তখন তখনই যার যা আছে বিলিয়ে দিচ্ছে নেতাজীর নামে। সভায় উপস্থিত ভারতীয় রমণীগণ নিজের অলংকারপত্র অকাতরে দান করেছেন। মালয়প্রবাসী ভারতীয়দের দান জাতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনে স্বর্ণাঙ্কুরে লেখা থাকবে। ২৬ অক্টোবর, ১৯৪৩ সালে নেতাজী বলেছেন—

“I thank you for the 131¼ million dollars you have given me within 24 hours.”

নেতাজীর বক্তৃতাগুলো পুঁথিতাকারে দেখেছি। ওগুলো এতই উদ্দীপনাদায়ক, পড়তে পড়তে যেন একেবারে তন্ময় হয়ে যাওয়া যায়। নেতাজীর বক্তৃতা পড়ে মেকলের একটি কবিতা আমার মনে পড়েছিল—

“To everyman upon this earth  
Death cometh soon or late,  
But how men can die better  
Than facing fearful odds  
For the ashes of his father,  
And temple of his gods.”

অতি অল্প সময়ের ভেতর আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগঠিত ও সামরিক শিক্ষা দেখে যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ নিম্পন কমান্ডারগণ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বিশেষ করে রাণী ঝাঁসি বাহিনীর কীর্তি নিম্পনদের কাছে আশ্চর্য লাগত। ঝাঁসি বাহিনীর অনেক ফটো নিয়ে নাকি নিম্পন মেয়েদের উৎসাহ দেবার জন্য জাপানে প্রোপাগান্ডাও হয়েছে।

সিংগাপুরে দুইদিন মাস কেটে গেল। কিন্তু দেশের কোন খবর পাচ্ছি না। সিংগাপুরের পত্রিকাগুলোতে ভারতীয় কোন বিশেষ খবর পাওয়া যেত না। বহু কষ্টে অমৃতবাজারের এক-আধখানা সংখ্যা ১৫।২০ দিন পর পর পাওয়া যেত। তা থেকেই জানতে পেলাম, আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সৈনিকদের বিচার চলেছে। ভারত-মাতার বীর সন্তান শাহ নওয়াজ, ধীলন ও সাইগলের বিচারের খবর দৈনিক S. E. A. C.এ পাওয়া যেত। তবে খুব অল্প কথায়। তাঁদের বিচারের রায় বেরুবার দিনকয়েক আগে একদিন কর্নেল সাহেব আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—

“Look here, Havildar Pal, how do you think of the trial of the three I.N.A. officers?”

কর্নেল সাহেবের পাশেই আরো দু'জন ব্রিটিশ মেজর দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ আমাকে এরকম প্রশ্ন করার কোন মানে না বুঝে, আমি জিজ্ঞেস করলাম—

“Excuse me, Sir, why has this question been put to me?”

তিনি বললেন—

“I want to know your genuine opinion about this trial. At the same time you please tell me people in the line think of these officers.”

আমি আরক্টিম মখে জবাব দিলাম—

“If you ask my genuine opinion I must say that so far as these officers were fighting to free India from foreign yoke, each and every Indian does support them. We, the Indians from the Army, highly esteem these officers.”

কর্নেল সাহেব বললেন—

“Have you not heard of the atrocities done by these officers to those Indians who did not voluntarily join the I. N. A.?”

“Sorry, Sir, I have not heard of any such allegations so far.”

একজন মেজর সাহেব তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—

“Do you support Mr. Desai and

Pandit Nehru who are defending this trial?"

আমি জবাব দিলাম—

"Certainly I do, Sir, they are true sons and patriots of India."

মেজর সাহেব জিজ্ঞেস করলেন—

"How do you think of this trial?"

"When the B.N.A. trial could be dropped why not the I.N.A. trial too? India is a problem not only of the British but of the whole world you might have heard that the three British M.P.'s referring to India had said 'we are sitting on a volcano! They are right. The demonstrations of Calcutta and Bombay have proved their fear. In my opinion this trial should be dropped.'"

"Thank you Havildar Pal" for your genuine opinion."

বলে কর্নেল সাহেব আমাকে বিদায় দিলেন।

পাশের ঘর থেকে বন্ধুরা আমাদের কথা শুনতে পেয়েছিল। আমি বেরিয়ে আসার সাথে সাথে সবাই বলে উঠল—“সাবাস ভাই, তুমি যা বলেছ, সেই আমাদের মত।”

দিন কয়েক পর বৃকতে পারলাম, আমাদের ঐ মতামত আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার-গণের খিচরের রায়ে প্রতিক্রিয়া করেছে।

( ১০ )

জাপানের আত্মসমর্পণের পর জাপানী যুদ্ধবন্দী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দিগণকে কুলির কাজে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বীর শাহ নওয়াজ, ধীলন ও সাইগলের মৃত্তির পর আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দিগণের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হন। ওদের তখন আমাদের

সমান পরিমাণ রেশন দেওয়া হত। কুলির কাজও অনেকটা কমে যায়।

জাপানী যুদ্ধবন্দীদের দুরবস্থা দেখে খুবই করুণা হতো। ওদের দেখলেই মনে হয়, ভীষণ disciplined ঐ জাত। ওদের কাছে নেতাজী নাম করলেই সালাম দিয়ে বলত—“Terrible figure.” ওরা নেতাজীকে ‘চন্দ্র বোস’ বলে জানত। ওদের দেশে বোধ হয় নামের প্রথম দিকটা উচ্চারণ করে না। তাই রাসবিহারী বোসকেও ওরা ‘বিহারী বোস’ বলত। যে জাপানী গরিলার ভয়ে ইম্ফলে সবাই ছিলেন কম্পমান—এখন তারা ই আমাদের আজ্যবাহক। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস।

সিংগাপুরে চার মাস যেতে না যেতেই আমার শরীর ভীষণ খারাপ হয়ে পড়ল। সেখানে টাটকা শাক-সব্জী কিছুই পাওয়া যেত না। পাঁচ-ছয়টি মাস শুধু প্যাক-করা টিনের তরিতরকারি খেয়েছি। দেশে ফিরবার জন্যে মনটা অস্থির হয়ে উঠল। ছুটীও পেয়ে গেলাম।

ফেব্রুয়ারীতে ছুটীতে আসবার পথে আমাকে দশ-পনের দিন রেস্ট ক্যাম্পে থাকতে হয়েছিল। রেস্ট ক্যাম্পটি ক্রানারজর কাছে। সেখানে মিঃ সোদাক বলে এক মাদ্রাজী ভ্রলোকের সাথে পরিচয় হয়। তিনি হেলথ অফিসার। আই এন এর আমলে তিনি, তাঁর স্ত্রী ও তাঁর মেয়েরা বড় রকমের পাণ্ডা ছিলেন। তাঁর তিন মেয়ে। সব ছোটটির বয়স ৭।৮ বৎসর হবে। নাম সুপ্রিয়া। তিন বোনে মিলে পিয়ানো দিয়ে “জনগণমন অধিনায়ক জয়হে.....” গানটি আমাদের গেয়ে শুনাল। চমৎকার! রেস্ট ক্যাম্পে

সমাপ্ত।

যে কদিন ছিলাম প্রতিদিন বিকালবেলা গান শোনার লোভে ওদের বাসায় চলে যেতাম। ওদের মধ্যে “সুভাষাজি, সুভাষাজি.....” গানটিও শুনোছি। বেশ গেয়েছিল। যেন মন-প্রাণ দিয়ে গায়। মিঃ সোদাকের কাছ থেকে জানতে পেলাম আমি যে রেস্ট ক্যাম্পে ছিলাম, সেটা নাকি আই এন এ অফিসারদের ট্রেনিং ক্যাম্প ছিল। আমার সৌভাগ্য সিংগাপুর ছাড়ার পথে সেখানেই আমি অতিথি হলাম।

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬। সিংগাপুর থেকে রওয়ানা হয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারী বিকাল পাঁচটায় বোম্বে পৌঁছাই। বোম্বেতে তখন পুরোদমে নৌ সৈনিকের বিদ্রোহ চলছে। পর-দিন সকাল বেলা জাহাজ থেকে নামব, ঠিক এমন সময় ‘জয় হিন্দ’ ধ্বনি হতে থাকল। আমরা প্রায় দেড় হাজার ভারতীয় সৈনিক ‘জয় হিন্দ’ বলে তাদের অভিবাদন জানালাম। আমরা যে নতুন ভারতে অবতরণ করছি, এটা প্রত্যেকের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠল।

আমার অভিজ্ঞতার যবনিকা আর একটি-মাত্র কথা বলে এখানেই টানতে চাই। নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ দিল্লীর লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার জন্য লড়েছিলেন। কিন্তু দিল্লী তারা পৌঁছতে পারেননি। তাতে আফসোস করার কিছুই নেই। নেতাজীর কথায়—

“We regret nothing except our failure. We lost nothing except a length of our chains. We fear nothing except God Almighty. And unshakable is our faith in India's destiny.”

## ভারত স্বাধীন

সুধেন্দু গুহ

হে আমার স্বাধীন ভারত!

তোমার ললাটে দীপ্ত মহাসূর্য্য ঐ  
শহীদদের রুধিরাক্ত উদগ আশায়,  
অসংখ্য প্রাণের নিত্য কামনার রঙে,  
রক্তরাগ বিজয়-তিলক;

প্রায় দ্বি-শতাব্দী অবসানে,—  
প্রভুত্বের অসি আর মসির শাসন,  
পুঞ্জীভূত কলঙ্কের কালো ইতিহাস,

বত বাধা-বন্ধুরতা, অন্তরের অজস্র শ্লানিমা

মুক্তির শ্লাবনে গেল ভেসে;

জাতির জীবনে নব এসেছে জোয়ার,  
দিক্ হতে দিগন্তের মুখারিত তারই জয়গানে;

ভূ-ভারত নন্দিত তোমার পতাকা  
মুক্তির হিল্লোলে উধ্ব অম্বরে উড্ডীন,

ভারত স্বাধীন।



# রবীন্দ্র-কাব্য-জীবন-প্রবাহ

## কবি-স্মরণ-সংকলন

### সংকলয়িতার নিবেদন

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও তিরোভাব

—এই দুটি দিনই আমাদের সমভাবে পালনীয় ও স্মরণীয়। কি পশ্চিমে বৈশাখে, কি বাইশে শ্রাবণে কবির জন্মোৎসব বা কবির স্মৃতি-তর্পণ প্রস্থায় ও অনুরাগে, স্মৃতিচিহ্ন ও সংঘমে তাঁর দেশবাসীর অবশ্য করণীয়। কিন্তু প্রতি বৎসর এই দিন-দুটিকে ঘিরে নানা স্থানে যে-সব অনুষ্ঠান হয়, লক্ষ্য করে দৃষ্টি পেয়েছি, তাতে তাঁর সৃষ্টির মর্মকথাটি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, বহু বৃথা বাক্যের নিরর্থকতায় পড়ে যায় চাপা; প্রাতিষ্ঠানিক বাগাড়ম্বরে তাঁর বাণীমূর্তি হয়ে পড়ে নিঃপ্রভ। তাই অনেক সময় ভেবেছি, কেমন করে এ-সব অনুষ্ঠানে তাঁর কাব্য-জীবন-প্রবাহের মূল ধারাটি ধরে, তাঁর যে-সৃষ্টি, ক্রমপরিণতির মধ্য দিয়ে গিয়ে পৌঁছিয়েছে সৃষ্টির অতীতে, তার একটু পরিচয় দেওয়া যায়,—যাতে সার্থক হয় আমাদের স্মরণ, তাঁর সেই নিরন্তর প্রকাশের পথে, অন্তরের উপলব্ধিতে।

এই কথা মনে নিয়ে আমি এখানে রবীন্দ্রনাথের যে-কাব্যসৃষ্টি, তার অরুণোদয়ে ক্ষীণধারা নির্ঝর-উৎস থেকে, মধ্যাহ্নদিনে দুর্কলশ্রাবী খরনদীপ্রস্রোত বেয়ে, শান্তসমাহিত সন্ধ্যায় মহাসাগরসংগম পর্যন্ত, যে অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য নিয়ে পরম পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছে, তার একটু পরিচয়, আর তার একটু ব্যাখ্যা—কবির আপন মূখের কথাতেই—দেবার চেষ্টা করেছি। বলবার দরকারও মনে করছি না যে, তাঁর অখণ্ড কাব্য-জীবন-প্রবাহের এ-পরিচয় খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ। আমি শুধু কবি নিজে যে-কথা বলেছিলেন ‘রবীন্দ্র রচনাবলী’র ভূমিকায়—

“আমার লেখার ধারা আমার জীবনের ধারার সঙ্গে সঙ্গেই অবিচ্ছিন্ন এগিয়ে চলেছে।.....একটা ঐক্যের স্বাক্ষর তাদের সকলের মধ্যে অঙ্কিত হয়ে নিশ্চয়ই পরস্পরের আত্মীয়তার প্রমাণ দিতে থাকে”—সেই কথাটি মনে রেখে এই সংকলনটি করেছি। এ থেকে পশ্চিমে বৈশাখের বা বাইশে শ্রাবণের কোনো একটি অনুষ্ঠানেরও যদি সামান্য সহায়তা হয়, তাতেই আমার তৃপ্তি। ইতি ২২শে শ্রাবণ। ১৩৫৪।

—অমল হোম

দৃশ্য—

বলে রাখা ভাল যে, কবির দীর্ঘজীবনব্যাপী কাব্যপ্রবাহের মূল ধারাটিকে একটি দিনের মধ্যে ধরা হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হবে না। ঠিক এই অনুষ্ঠানপর্যায়টিকে সমগ্রভাবে রূপদান করতে গেলে যে সময়ের প্রয়োজন তা সুলভ না হলে, এখানে যা সংকলিত হলো, তা স্থান কাল অনুযায়ী সংক্ষেপিত করতেই হবে। সে-ভার রইলো অনুষ্ঠাতাদের হাতে। তাঁরা

তাঁদের অভিন্নচিহ্ন ও আয়োজনমতো এ পদ্ধতি পরিবর্তিত করে নেবেন। কবির কাব্যধারাগতির বোধসহায়তায় আমি যেখানে কোনো একটি কবোর বা তার কবিকৃত ব্যাখ্যার একাধিক উদাহরণ সমির্বেশিত করেছি, তাঁরা সেখানে সেটি অন্যায়সেই বর্জন করতে পারেন। তাতে তাঁর সৃষ্টির মূল ঐক্য-সূত্রটি ধরার পক্ষে অসুবিধা হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

—সংকলয়িতা।

### [ বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের অনুমোদনক্রমে ]

“নিজের সত্য পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতরকার মূল ঐক্যসূত্রটি ধরা পড়তে চায় না। বিধাতা যদি আমার আয়ু, দীর্ঘ না করতেন, তা হলে নিজের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করবার অবকাশ পেতাম না। নানা খানা করে নিজেকে দেখেছি, নানা কাজে প্রবর্তিত করেছি, ক্ষণে ক্ষণে তাতে আপনার অভিজ্ঞান আপনার কাছে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদীক্ষণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম, তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে,— সে আর কিছু নয়,—

আমি কবি মাত্র।”

২৫শে বৈশাখ। ১৩৩৮।

—২৩শে শ্রাবণের সংখ্যায় প্রকাশিত—  
 প্রথম ধারা—উন্মোচন। ঠেকশোরক। যৌবনস্বপ্ন ॥  
 ১। “প্রভাত-সংগীত”। ২। “কড়ি ও কোমল” ॥  
 —৩০শে শ্রাবণের সংখ্যায় প্রকাশিত—  
 দ্বিতীয় ধারা—৩। “মানসী”। ৪। “সোনার তরী” ॥  
 —৬ই ভাদ্রের সংখ্যায় প্রকাশিত—  
 তৃতীয় ধারা—৫। “চিত্রা”। ৬। “কম্পনা” ॥  
 —১৩ই ভাদ্রের সংখ্যায় প্রকাশিত—  
 চতুর্থ ধারা—৭। “কপিকা”। ৮। “নৈবেদ্য”। ৯। “স্মরণ” ॥  
 —এই সংখ্যায় প্রকাশিত—  
 পঞ্চম ধারা—১০। “উৎসর্গ” ॥

## উপক্রমণিকা

—রূপ, তোমার দারুণ দীপ্ত  
 এসেছে দুয়ার ভেদিয়া  
 বক্ষে বেজেছে বিদ্যুৎবাণ  
 স্বপ্নের জাল ছেদিয়া  
 জাবতেছলাম উঠি কি না উঠি,  
 তুমি তামস গেছে কি না ছুটি,  
 রূপ নয়ন মেলি কি না মেলি  
 তন্দ্রাজড়িমা মাজিয়া।  
 এমন সময় ঈশান, তোমার  
 বিষ্ণু উঠেছে বাজিয়া।  
 বাজে রে, গরাজ বাজে রে,  
 দংশ মেঘের রম্ভে রম্ভে  
 দীপ্তগগন-মাঝে রে।  
 চমকি জাগিয়া পূর্বভুবন  
 রক্তবদন লাজে রে ॥

ভৈরব, তুমি কী বেশে এসেছ,  
 ললাটে ফুসিছে নাগিনী;  
 রূপবীণায় এই কি বাজিল  
 সুপ্রভাতের রাগিনী?  
 মূগ্ধ কোকিল কই ডাকে ডালে  
 কই ফোটে ফুল বনের আড়ালে?  
 বহুকাল পরে হঠাৎ যেন রে  
 অমানিশা গেল ফাটিয়া;  
 তোমার খণ্ড অধার-মাঁহিষে  
 দুখানা করিল কাটিয়া।

বাথায় ভুবন ডরিছে;  
 নর নর করি রক্ত-আলোক  
 গগনে গগনে ঝরিছে;  
 কেহ বা জাগিয়া উঠিছে কাঁপিয়া,  
 কেহ বা স্বপনে ডরিছে ॥

তোমার শ্মশানকঙ্করদল  
 দীর্ঘ নিশায় ডুখার  
 শূন্য জগৎ লোহিয়া লোহিয়া  
 উঠিছে ফুকারি ফুকারি।  
 অতিথি তারা যে আমাদের ঘরে  
 করিছে নৃত্য প্রাণগণ-পরে,  
 খোলো খোলো দ্বার ওগো গৃহস্থ,  
 থেকে না থেকে না লুকায়—  
 ধার বাহা আছে আনো বাঁহ আনো  
 সব দিতে হবে চুকায়!

খুঁসায়ো না আর কেহ রে।  
 হৃদয়পিপড় ছিন্ন করিয়া  
 ডাঙ ডরিয়া দেহা রে।  
 ওরে দীপপ্রাণ, কী মোহের লাগি  
 রেখেছিল মিছে স্নেহ রে ॥

উদয়ের পথে শূন্য কার বাণী,  
 “ভয় নাই, ওরে ভয় নাই।  
 নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান  
 ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।”  
 হে রূপ, তব সংগীত আমি  
 কেমনে গাহিব কাঁহ দাও স্বামী,—  
 মরণনৃত্যে হৃদ মিলয়ে  
 হৃদমডমরু বাজাব;  
 ভীষণ দুখে ভালি ডরে লয়ে  
 তোমার অর্থী সাজাব!

এসেছে, প্রভাত এসেছে  
 তিমিরান্তক শিবশঙ্কর  
 কী অটহাস হেসেছে।  
 যে জাগিল, তার চিত্ত আজিকে  
 ভীম আনন্দে ভেসেছে ॥

জীবন সাঁপিয়া জীবনস্বপ্ন,  
 পেতে হবে তব পরিচয়,  
 তোমার ডম্কা হবে যে বাজতে  
 সকল শব্দা করি জয়।  
 ডালোই হয়েছে, ঝঞ্ঝার বায়ে  
 প্রলয়ের জটা পড়েছে ছড়িয়ে;  
 ডালোই হয়েছে, প্রভাত এসেছে  
 মেঘের সিংহবাহনে—  
 মিলনমঞ্জে অগ্নি জ্বালাবে  
 বস্ত্র শিখার দাহনে!

তিমিররাশি পোহায়ো  
 মহাসম্পদ তোমারে লাভিব  
 সব সম্পদ খোঁসায়ো,—  
 মৃত্যুর লব অমৃত করিয়া  
 তোমার চরণ ছোঁয়ায়ে ॥  
 —“সত্যায়িতা”। “সুপ্রভাত” ॥

## “উৎসর্গ”

॥ ১৩০৯-১৩১১ ॥

৭৫। পাঠ—

—“বাঁহরে বাহার সার্থকতা, বাঁহরে আসবার পূর্বে সে তাঁর  
 বেদনা অনুভব করে। বস্তুত এই বেদনাই জানায় যে, তাহাকে বাঁহরে  
 আসিতে হইবে। ইহাই গভীরবেদনা; এবং মৃত্যুবেদনারও নিঃসন্দেহ এই  
 তাৎপর্য। আমাদের সমস্ত প্রবৃত্তিরই সার্থকতা বাঁহরের জগতের সন্ধিতে  
 মিলনে। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই মিলন সম্পূর্ণ না হয়, আমাদের প্রবৃত্তি-  
 গুলি বাঁহরদ্বীপে হইয়া না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা আমাদের মধ্যে  
 নানা প্রকার পীড়ার সৃষ্টি করে। নিখিলের মধ্যে তাহারা বাঁহর হইয়া  
 আসিলেই সকল পীড়ার অবসান হয়। অতএব যখন আমরা পীড়া অনুভব  
 করি, তখন আমরা যেন না মনে করি, এই পীড়াই চরম। ইহা মৃত্যুর

একদিন যাহা বাহিরে আসিবার, তাহা বাহিরে আসিবে এবং  
অবসান হইবে।" (৮১)

### আবৃত্তি—

১  
—“কুণ্ডির ভিতরে কাঁদছে গন্ধ অগ্নি হয়ে  
কাঁদছে আপন মনে,  
কুসুমের দলে বন্ধ হয়ে  
করুণ কাতর স্বনে  
কাঁদছে সে—হায় হায়,  
বেলা যায়, বেলা যায় গো,  
ফাগুনের বেলা যায়।  
ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,  
কিছু নাই তোর ভাবনা—  
কুসুম ফুটিবে বাঁধন টুটিবে,  
পুরবে সকল কামনা।  
নিঃশেষ হয়ে যাবি ঘরে কুই  
ফাগুন তখনো যাবে না ॥

২  
কুণ্ডির ভিতর ফিরছে গন্ধ কিসের আশে  
ফিরছে আপন মাঝে,  
বাহিরেতে চায় আকুল শ্বাসে  
কী জানি কিসের কাজে।  
কাঁদছে সে—হায় হায়,  
কোথা আমি যাই, করে চাই গো  
না জানিয়া দিন যায়।  
ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই  
কিছু নাই তোর ভাবনা—  
দখিন-পবন ধ্বরে দিয়া কান  
জেনেছে রে তোর কামনা।  
আপনারে তোর না করিয়া ভোর  
দিন তোর চলে যাবে না ॥

৩  
কুণ্ডির ভিতরে আকুল গন্ধ ভাবিছে বাসে—  
ভাবিছে উপাসপারী—  
জীবন আমার কাহার পোষে  
এমন অর্থ-হারা।  
কাঁদছে সে—হায় হায়,  
কেন আমি কাঁদি, কেন আঁচ গো  
অর্থ না বুঝা যায়।  
ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,  
কিছু নাই তোর ভাবনা—  
যে-শব্দ প্রভাতে নকলের সাথে  
মিলিবি, পুরবে কামনা,  
আপন অর্থ সৈন্য বৃষ্টিবি,  
জনম ব্যর্থ যাবে না ॥ (৮২)

### ৭৭। সংগীত—

—“আমি চণ্ডল হে, আমি সুন্দরের পিয়াসী,  
দিন চলে যায়, আমি আনমনে তারি আশা চেয়ে থাকি ব্যতায়নে,  
ওগো, প্রাণে মনে আমি যে তাহার পরশ পাবার প্রয়াসী,  
আমি সুন্দরের পিয়াসী ॥  
ওগো সুন্দর, বিপুল সুন্দর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।  
মোর ডানা নাই, আঁচ এক ঠাই সে কথা যে যাই পাশরি ॥

(৮১) কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রাংশ।  
“রবীন্দ্রচন্দ্রাবলী”। দশম খণ্ড। গ্রন্থপরিচয় ॥

(৮২) “উৎসর্গ”। ৯। রবীন্দ্রচন্দ্রাবলী। দশম খণ্ড ॥ [“উৎসর্গ”  
কাব্য ১৩২১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইলেও ইহার অধিকাংশ  
কবিতাই ১৩০৯ হইতে ১৩১১ সনের মধ্যে রচিত ও মোহিত-  
চন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্য-গ্রন্থের অন্তর্গত বিভিন্ন ভাবের  
কবিতাসংগৃহের প্রবেশকরূপে রচিত হয়—সংকলনিত।]

—আমি উন্মনা হে, হে সুন্দর, আমি উন্মনা।  
রৌদ্রমাখানো অলস বেলায়, তরুণমুখে ছায়ার খেলায়,  
কী মুরতি ভব নীলাকাশশায়ী, নয়নে উঠে গো আভাস।  
হে সুন্দর, আমি উন্মনা।  
ওগো সুন্দর, বিপুল সুন্দর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।  
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার  
সে কথা যে যাই পাশরি ॥ (৮৩)

\* \* \*

### ৭৮। পাঠ—

—“আমাদের প্রতিদিনের এক-রঙা দুচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ ভয়ঙ্কর,  
তাহার জলজ্জটাকলাপ লইয়া দেখা দেয়। সেই ভয়ঙ্কর, প্রকৃতির মধ্যে  
একটা অপ্রত্যাশিত উপাত্ত,—মানুষের মধ্যে একটা অসাধারণ পাপ  
আকারে জাগিয়া উঠে। তখন কত সুখমিলনের জাল ল’ড’ড, কত  
হৃদয়ের সম্বন্ধ ছারখার হইয়া যায়। হে রক্ত, তোমার ললাটের যে  
ধ্বকধ্বক অশিশিখার সফলিঙ্গমাত্র অন্ধকার গহের প্রদীপ জ্বলিয়া  
উঠে,—সেই শিখাডেই লোকালয়ে সহস্রের হাহাধ্বনিতে নিশীথরাতে  
গহদাহ উপস্থিত হয়। হায় শব্দ, তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম  
পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষেপ্ত হইয়া উঠে। সংসারের  
উপরে প্রতিদিনের জড়হস্তক্ষেপে যে-একটা সামান্যতার একটানা আবরণ  
পাড়িয়া যায়, ভালোমন্দ দুয়েরই প্রবল আঘাতে তুমি তাহাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন  
করিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত  
ওরশিত করিয়া শক্তির নব নব জীলা ও সৃষ্টির নব নব মূর্তি প্রকাশ  
করিয়া তোলা। পাগল, তোমার এই রক্ত আনন্দে যোগ দিতে আমার  
ভীত হৃদয় যেন পুরস্কে না হয়। সংসারের রক্ত আকাশের মাঝখানে  
তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র যেন প্রজ্যোতিতে আমার অন্তরের  
অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলেন। নৃত্য করো, হে উন্মনা, নৃত্য  
করো। সেই নৃত্যের ঘর্ষণেবেগে আকাশের লক্ষ কোটি-যোজনব্যাপী  
উজ্জ্বলিত নীহারিকা বখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে—তখন আমার বক্ষের  
মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রক্তসংগীতের তাল কাটিয়া না যায়। হে  
মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয়  
হউক।

“আমাদের এই ব্যাপা দেবতার আবির্ভাব যে ক্ষণে ক্ষণে তাহা নহে—  
সৃষ্টির মধ্যে ইহার পাগলামি অহরহ লাগিয়াই আছে—আমরা ক্ষণে ক্ষণে  
তাহার পরিচয় পাই মাত্র। অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে,  
ভালোকে মন্দ উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অভাবনীয় মূল্যবান করিতেছে।  
যখন পরিচয় পাই, তখনই রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির  
প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়া উঠে। (৮৪)

### ৭৯। আবৃত্তি—

—“কহ মিলনের একি রীতি এই,  
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।  
তার সমারোহভার কিছু নেই,  
নেই কোনো মংগলাচরণ?  
তব পিণ্ডগলছবি মহাজট  
সে কি চূড়া করি বাঁধা হবে না?  
তব বিজয়োদ্ভূত মদুজপট  
সে কি আগে-পিছে কেহ ব’বে না?  
তব মশাল-আলোকে নদীতট  
আঁখি মেলিবে না রাগাবরণ?  
গ্রাসে কেঁপে উঠিবে না ধরাতল  
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন  
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।  
তঁার কতমতো ছিল আয়োজন  
ছিল কত শত উপকরণ।

(৮৩) “উৎসর্গ”। ৮। রবীন্দ্রচন্দ্রাবলী। পঞ্চদশ খণ্ড ॥ “গীত-  
বিতান”। ২য় সংস্করণ। ২য় খণ্ড। স্বরলিপির জন্য “গীত-  
লেখা”। ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য ॥

(৮৪) “বিচিত্র প্রবন্ধ”। “পাগল”। রবীন্দ্রচন্দ্রাবলী। পঞ্চম খণ্ড ॥

তার লটপট করে বাঘছাল  
তার বস রাই বহি গরজে,  
তার বেটন করি জটাভাল  
যত ভুজঙ্গদল তরজে।  
তার ববম্ববম্ বাজে গাল  
দোলে গলায় কপালাভরণ,  
তার বিষণ্ণে ফুকারি উঠে তান  
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

\* \* \*

তুমি চুরি করি কেন এসো চোর  
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।  
শুধু নীরবে কখন নিশি ভোর,  
শুধু অশ্রু-নিবল-ধরণ।  
তুমি উৎসব করো সাগরাত  
তব বিজয়শঙ্খ বাজায়,  
মোরো কেড়ে লও তুমি ধরি হাত  
নব রক্তবসনে সাজায়।  
তুমি কারে করিয়ো না দুঃপাত  
আমি নিজঃ লব তব শরণ  
যদি গোরবে মোরো লয়ে যাও  
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

যদি কাজে থাকি আমি গৃহনার  
ওগো মরণ, হে মোর মরণ;  
তুমি ভেঙে দিয়ো মোর সব কাজ  
কোরো সব লাজ অপহরণ।  
যদি স্বপনে মিটায় সব সাধ  
আমি শূন্যে থাকি স্মরণে,  
যদি হৃদয়ে জড়ায় অবসাদ  
থাকি আশ্রয়গুরু নয়নে,—  
তব শব্দে তোমার তুলো নাদ  
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ,  
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ,  
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥

আমি যাব যেথা তব তরী রয়  
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,  
যেথা অকল হইতে বারু বয়  
করি আধারের অনুসরণ।  
যদি দেখি ঘনঘোর মেঘোদয়  
দূর ঈশানের কোণে আকাশে,  
যদি বিদ্যুৎফণী জ্বালাময়  
তার উদ্যত ফণা বিকাশে,  
আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়  
আমি করিব নীরবে তরণ  
সেই মহাবরষার রাঙা জল  
ওগো মরণ, হে মোর মরণ॥ (৮৫)

## ৮০। সংগীত—

—“সর্ব খবতারে দহে তব স্রোদ-দাহ  
হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্তপানে চাহ॥  
দূর করো মহারদ্র, যাহা মৃগ, যাহা ক্ষুদ্র,  
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ॥  
দুঃখের মন্ধানবগে উঠিবে অমৃত,  
শংকা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত।  
তব দীপ্ত রৌদ্র ডেকে নিরুপিয়া গলিবে-যে,  
প্রস্তুত শৃংখলোমুক্ত ত্যাগের প্রবাহ॥” (৮৬)

## ৮১। পাঠ—

—“যেখানে কেবল প্রতাপের প্রকাশ, বলের বাহুল্য, সেখানে ভীত  
হওয়া, নত হওয়ার মতো আত্মবিস্ময়, অন্তর্বিমী ঈশ্বরের অবমাননা,

আর নাই। হে ভারতবর্ষ.....সমস্ত লাল্গনার উদ্দেশ্য তোমার মস্তককে  
অবিচলিত রাখো।.....তোমার আত্মার দিব্যতা উজ্জ্বলতা পরম-শক্তিমান  
কাছে এই সমস্ত তর্জন গর্জন, এই সমস্ত উচ্চপদের অতিমান, এই সমস্ত  
শাসন শোষণের আয়োজন-আড়ম্বর, তুচ্ছ ছেলেখেলামাত্র—ইহারা যদি  
বা তোমাকে পীড়া দেয়, তোমাকে যেন ক্ষুদ্র করিতে না পারে।.....  
অন্তঃকরণকে মৃত্ত রাখিও, ঋজু রাখিও, দীনতা স্বীকার করিও না,  
ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিও, নিজের প্রতি আস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিও।  
কারণ, নিশ্চয়ই জগতে তোমার একান্ত প্রয়োজন আছে, সেইজন্য বহু  
দুঃখেও তুমি বিনাশপ্রাপ্ত হও নাই।.....

“হে আমার স্বদেশ, মহাপবিত্রমালার পাদমূলে মহাসমুদ্রপরিবেষ্টিত  
তোমার আসন বিস্তীর্ণ রাখিও। এই আসনের সম্মুখে হিন্দু-মুসলমান  
খ্রীষ্টান বৌদ্ধ বিধাতার আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া বহুদিন হইতে প্রতীক্ষা  
করিতেছে। তোমার এই আসন তুমি যখন পুনর্বার একদিন গ্রহণ করিবে,  
তখন আমি নিশ্চয় জানি,—তোমার মস্তে কি জ্ঞানের, কি কর্মের, কি ধর্মের  
অনেক বিরোধ মীমাংসা হইয়া যাইবে এবং তোমার চরণপ্রান্তে আধুনিক  
নিষ্ঠুর পোলিটিক্যাল কালভুলগণের বিশেষণী বিবাক্ত দর্প পরিপ্রান্ত হইবে।  
তুমি চণ্ডল হইয়ো না, লুশ্ণ হইয়ো না, ভীত হইয়ো না—তুমি—

‘অজ্ঞানং বিশ্ব’ : আপনাকে জানো। এবং

‘উত্তীর্ণত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিরোধত

ক্ষুরস্যা ধারা নিশিতা দূরতয়া দুর্গম পথস্তং কবয়ো বদন্তি’।

“উঠ, জাগো, যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহাই পাইয়া প্রবৃক্ষ হও; যাহা যথার্থ  
পথ, তাহা ক্ষুরধার শাণিত দুর্গম দূরতয়া, কবিরা এইরূপ বলিয়া  
থাকেন।” (৮৭)

## ৮২। আবৃত্তি—

—“হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি  
দেখা দিলে আজ কী বেশে  
দেখিনু তোমারে পূর্ব গগনে,  
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।  
ললাট তোমার নীল নভতল  
বিস্মল আলোকে চির-উজ্জ্বল,  
নীরব-আশিষ-সম হিমাচল  
তব বরাভয় কর।  
সাগর তোমার পরশ চরণ  
পদধূলি সদা করিছে হরণ,  
জাহ্নবী তব হার-আভরণ  
দুলিছে বক্ষ-পর।  
হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে,  
হেরিনু আজিকে নিমেষে—  
মিলে গেছে, ওগো বিশ্বদেবতা,  
মোর সনাতন স্বদেশে।  
শুনিনু তোমার স্তবের মন্ত্র  
অতীতের তপোবনেতে  
অমর ঋষির হৃদয় ভেদিয়া  
ধ্বনিতেছে ত্রিভুবনেতে।

\* \* \*

হৃদয় খুলিয়া দাঁড়িনু বাহিরে  
শুনিনু আজিকে নিমেষে—  
অতীত হইতে উঠিছে, হে দেব  
তব গান মোর স্বদেশে।  
নয়ন মন্দিয়া শুনিনু, জানি না,  
কোন অনাগত বরষে  
তব মণ্ডলশঙ্খ তুলিয়া  
বাজায় ভারত হরষে।  
ভুবায়ে ধরার রণহুংকার  
ভেদি বণিকের ধনঝংকার  
মহাকাশতলে ওঠে ওংকার  
কোনো বাধা নাই মানি।

(৮৫) “উৎসর্গ”। “মরণ”॥

(৮৬) “গীত-বিতান”। ২য় সংস্করণ। ১ম খণ্ড। স্বরলিপির  
জন্য “তপতী” নাটকের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য॥

(৮৭) “রাজপ্রজা”। ‘রাজভক্তি’ (প্রবন্ধ-রচনাকাল : ১৩১২) রবীন্দ্র  
রচনাবলী। দশম খণ্ড॥



ভারতের শ্বেত হৃদিশতদলে  
সংগীতভানে শুনো উথলে  
অপূর্ব মহাবর্ণী।  
নয়ন মুদ্রিয়া ভাবীকাল-পানে  
চাহিন্দু, শুনিন্দু নিমেষে—  
তব মঙ্গল-বিজয়শব্দ  
বাঁজছে আমার স্বদেশে ॥” (৮৮)

### ৮৩। পাঠ—

—“আজ (নববর্ষে) পুরাতনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কারণ পুরাতনই চিরনবীনতার অক্ষয় ভান্ডার।.....নূতনত্বের মধ্যে চিরপুরাতনকে অনুভব করিলে তবেই অমের যৌবনসমুদ্রে আমাদের জীবন জীবন স্নান করিতে পায়।.....অদ্যকার নববর্ষে আমরা ভারতবর্ষের চিরপুরাতন হইতেই আমাদের নবীনতা গ্রহণ করিব। সারাহে যখন বিশ্রামের ঘণ্টা বাঁজবে, তখন তাহা বলিয়া পড়িবে না, তখন সেই অম্লানগোরব মাল্যখানি আশীর্বাদের সহিত আমাদের পুত্রের ললাটে বঁধিয়া দিয়া, তাহাকে নিভয়চিত্তে সর্বল হৃদয়ে বিজয়ের পথে প্রেরণ করিব। জয় হইবে, ভারতবর্ষেরই জয় হইবে। যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ, যাহা উদার, যাহা নির্বাক, তাহারই জয় হইবে। আমরা যাহারা ইংরেজ বলিতেছি, অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, অসফলন করিতেছি, আমরা বর্ষে বর্ষে—

‘মিলি মিলি যাওব সাগরলহরীসমান’।

তাহাতে নিশ্চিন্ত সমান্ত ভারতের ক্ষতি হইবে না। ডুম্‌মাছন মৌনী ভারত চতুঃপথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে। আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া পুরুকন্যাগণকে ফ্রক কোট পরাইয়া দিয়া বিদায় হইব, তখনো সে শান্তচিত্তে আমাদের পৌরদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা বার্থ হইবে না, তাহার এই সমস্যাসীর সম্মুখে করজোড়ে আসিয়া কহিবে,—‘পিতামহ, আমাদিগকে মন্ত্র দাও।’

“তিনি কহিবেন—‘ও হিত ব্রহ্ম’।

“তিনি কহিবেন—‘ভূমিব সূত্র ন্যস্পে সূত্রমস্মিত’।

“তিনি কহিবেন—‘আনন্দং ব্রহ্মণো বিশ্বান ন বিভেতি কদাচন’ ॥” (৮৯)

### ৮৪। সমবেত সংগীত—

—“হে ভারত, আজ নবীন বর্ষে  
শুন এ কবির গান।  
তোমার চরণে নবীন হর্ষে

এনেছি পূজার দান।

এনেছি মোদের দেহের শক্তি,  
এনেছি মোদের মনের ভক্তি,  
এনেছি মোদের ধর্মের মতি,  
এনেছি মোদের প্রাণ।

এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য  
তোমাতে করিতে দান।

\* \* \*

রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস  
তুমিই প্রাণের প্রিয়।

ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব  
তোমারি উত্তরীয়।

দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন  
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন

তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন  
তাই আমাদের দিয়ে

পরের সন্তা ফেলিয়া পরিব  
তোমারি উত্তরীয়।

দাও আমাদের অভয়মন্ত্র  
অশোকমন্ত্র তব।

দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র,  
দাও গো জীবন নব।

যে-জীবন ছিল তব তপোবনে,  
যে-জীবন ছিল তব রাজ্যসনে,

[৮৮] “উৎসর্গ”। ১৬।

[৮৯] “ভারতবর্ষ”। “নববর্ষ”। (প্রবন্ধ-রচনাকাল: ১৩০৮) রবীন্দ্র-রচনাবলী। চতুর্থ খণ্ড ॥

মন্ত্র দীপ্ত সে-মহাজীবনে  
চিত্র ভরিয়া লব।

মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ  
দাও সে মন্ত্র তব ॥ (৯০)

### ৮৫। পাঠ—

—“এতদিন আমরা মখে বলিয়া আসিয়াছি—‘জননী জন্মভূমি’ স্বর্ণাবর্ণ গরীয়সী—কিন্তু জন্মভূমির গরিমা যে কতখানি, তাহা আজ আমাদের কাছে যেমন করিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, তেমন কি পূর্বে আর কখনো হইয়াছিল?.....বাঙালির হৃদয়ে এক আবাত সন্মার করিতেই অমনি আমাদের যেন একটা তন্দ্রা ছুটিয়া গেল; অমনি আমরা মৃত্যুতরণ মখেই চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইলাম, বহু কোটি বাঙালির সম্মিলিত হৃদয়ের মাঝখানে আমাদের মাতৃভূমির মূর্তি বিরাজ করিতেছে। বাঙলাদেশে চিরদিন বাস করিয়াও বাঙলাদেশের এমন অখণ্ড স্বরূপ, আমরা আর কখনো দেখি নাই।.....ধন্য হইল এই ১৩১২ সাল, বাঙলাদেশের এমন শতচ্কেণে আমরা যে আজ জীবন ধারণ করিয়া আছি,— আমরা ধন্য হইলাম!” (৯১)

### ৮৬। সংগীত—

—“আজি বাঙলাদেশের হৃদয় হ’তে কখন আপনি,

তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হ’লে জননী

ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে

তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥

ডান হাতে তোর খল জবুলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ

দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাট-নেত্র আগুন-বরণ।

ওগো মা, তোমার কী মূর্তি আজি দেখি রে।

তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥

তোমার মন্ত্র-কেশের পূজ-মেঘে লুকাই অশনি,

তোমার আঁচল ঝলে আকাশ-তলে, রৌদ্র-বসনী!

ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে

তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥

আজি দুঃখের রাতে, সুখের স্রোতে, ভাসাও ধরণী

তোমার অভয়-বজ্রে হৃদয়মাঝে হৃদয়-হরণী।

ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে

তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ॥ (৯২)

### ৮৭। পাঠ—

—“আমার স্বদেশ, আমার চিরন্তন স্বদেশ, আমার পিতৃপিতামহের স্বদেশ, আমার সন্তানসন্তানতর স্বদেশ, আমার প্রাণদাতা শক্তিদাতা সম্পদদাতা স্বদেশ।.....যে-হস্তে ইহার স্পর্শ উপলব্ধি করিয়াছি.....সে-হস্ত মাতৃসেবার জন্য সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করিলাম। আজ আমরা প্রস্তুত হইয়াছি।.....যে-পথ কঠিন, যে-পথ কণ্টকসংকুল, সেই পথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি।.....যদি বিদ্রোহ চকিত হইতে থাকে, বজ্র ধ্বনিত হইয়া উঠে, তবে তোমরা ফিরিয়া না, ফিরিয়া না, দুর্যোগের রক্তচক্ষুকে ভয় করিয়া তোমাদের পৌরুষকে জগৎসমক্ষে অপমানিত করিয়া না। বাধার সম্ভাবনা জানিয়াই চলিতে হইবে, দুঃখকে স্বীকার করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে, অতি-বিবেচকদের ভীত পরামর্শে নিজেকে দুর্বল করিয়া না।” (৯৩)

### ৮৮। সংগীত—

—“আমাদের যাত্রা হ’লো সুদূর এখন ওগো কর্ণধার

তোমাতে করি নমস্কার।

এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরবো নাকো আর

তোমাতে করি নমস্কার ॥

আমরা দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি বিপদবাধা নাহি গণি

ওগো কর্ণধার—

এখন মাঠে বলি ভাসাই তরী, দাওগো করি পার।

তোমাতে করি নমস্কার ॥

এখন রইলো যারা আপন ঘরে, চাভো না পথ তাদের তরে

(৯০) “উৎসর্গ”। সংযোজন। ১৬। নূতন সংস্করণ। ১৩৫১ ॥

(৯১) “ভারতবর্ষ”। “বিজয়াসম্মিলন”। (প্রবন্ধ-রচনাকাল: ১৩১২)

রবীন্দ্ররচনাবলী। চতুর্থ খণ্ড ॥

(৯২) “গীতিবিতান”। ২য় সংস্করণ। ১ম খণ্ড ॥

(৯৩) “ভারতবর্ষ”। “বিজয়াসম্মিলন”।

ওগো কর্ণধার,  
যখন তোমার সময় এলো কাছে,  
তখন কে-বা কার?  
তোমারে করি নমস্কার।  
আমার কে-বা আপন, কে-বা পর,  
কোথায় বাহির কোথা বা ঘর  
ওগো কর্ণধার।  
আমরা নিয়োছি দাঁড়, তুলোছি পাল, তুমি এখন ধরো গো হাল,  
ওগো কর্ণধার।  
মোদের মরণ-বাঁচন চেউয়ের নাচন, ভাবনা কি বা তার,  
তোমারে করি নমস্কার॥ (৯৪)

### ৮৯। পাঠ—

—“আজ আমাদের হৃদয়কে একবার এই বাঙলাদেশের সর্বত্র প্রেরণ  
করো। উত্তরে হিমালয়ের পাদমূল হইতে দক্ষিণে তরঙ্গমুখর সমুদ্র-  
কূল পর্যন্ত, নদীজালজড়িত পূর্ব-সীমান্ত হইতে শৈলমালাবন্ধুর পশ্চিম-  
প্রান্ত পর্যন্ত চিত্তকে প্রসারিত করো। যে-চাঁচ চাষ করিয়া একক্ষে ঘরে  
ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো;—যে-রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠেগুহে  
এতক্ষণে ফিরাইয়া আনিয়াছে, তাহাকে সম্ভাষণ করো;—শঙ্খনৃ-বীর  
দেবালয়ে যে পূজার্থী আগত হইয়াছে, তাহাকে সম্ভাষণ করো;—  
অন্তঃসূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া যে-মুসলমান নমাজ পড়িয়া উঠিয়াছে,  
তাহাকে সম্ভাষণ করো। আজ সয়াহে গঙ্গার শাখা-প্রশাখা বাহিয়া,  
ব্রহ্মপুত্রের কূল-উপকূল দিয়া একবার বাঙলাদেশের পূর্বে পশ্চিমে আপন  
অন্তরের আলিঙ্গন বিস্তার করিয়া দাও;—আজ বাঙলাদেশের সমস্ত  
ছায়াতরুনিবিড় গ্রামগুলির উপরে যে শারদ-আকাশে একাদশীর চন্দ্রমা  
জ্যোৎস্নাধারা অজস্র ঢালিয়া দিয়াছে, সেই নিস্তম্ভ শ্চিরাচির সম্প্রদায়কে  
তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের “বন্দে মাতরম্” গীতধ্বনি এক প্রান্ত  
হইতে আরেক প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া।” (৯৫)

### ৯০। সংগীত—

—সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই দেশে  
সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালোবেসে  
জানিনে তোর ধন রতন, আছে কিনা রানীর মতন  
শুধু জানি আমার অংগ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে॥  
কোন বনেতে জানিনে ফুল, গন্ধে এমন করে আকুল  
কোন গগনে ওঠে রে চাঁদ, এমন হাসি হেসে।  
আঁখি মেলে তোমার আনা, প্রথম আমার চোখ জুড়ালে  
ঐ আনোতেই নয়ন রেখে, মৃদুবো নয়ন শেষে॥” (৯৬)

### ৯১। পাঠ—

“কত যুগ হইতে কত বিপ্লবের আবর্ত, কত উৎপীড়নের মন্ডন,  
এদেশের সিংহম্বারে কত বড় বড় রাজপ্রতাপের প্রবেশ ও প্রস্থানের মধ্য  
দিয়া ভারতবর্ষের পরিপূর্ণতা অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে।...ভয় করিব  
না, ক্ষুব্ধ হইব না,—ভারতবর্ষের যে পরম মহিমা সমস্ত কঠোর দুঃখ  
সংঘাতের মধ্যে বিশ্বকবির সৃজনানন্দকে বহন করিয়া ব্যক্ত হইয়া  
উঠিতেছে,—ভক্ত সাধকের প্রশান্ত ধ্যাননেত্রে তাহার অখণ্ড মূর্তি  
উপলব্ধি করিব।...নিশ্চয় জানিব, এই ভারতবর্ষে যুগযুগান্তরীয় মানব-  
চিত্তের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাবিগলিত হইয়াছে,—এইখানেই জ্ঞানের সহিত  
জ্ঞানের মন্ডন হইবে, জাতির সহিত জাতির মিলন ঘটিবে। বৈচিত্র্য  
এখানে অতান্ত জটিল, বিচ্ছেদ এখানে অতান্ত প্রবল, বিপরীতের সমাবেশ  
এখানে অতান্ত বিরোধসংকুল। এত বহুত্ব, এত বেদনা, এত সংঘাত  
কোনো দেশই এত দীর্ঘকাল বহন করিয়া বাঁচিতে পারিত না,—কিন্তু  
একটি অতি বৃহৎ, অতি মহৎ সমন্বয়ের পরম অভিপ্রায়ই এই সমস্ত  
একান্ত বিরুদ্ধতাকে ধারণ করিয়া আছে,—পরস্পরের আঘাতে কাহাকেও

উৎসাদিত হইতে দেয় নাই।...ভারতবর্ষে আমরা মিলিব এবং মিলাইব,—  
আমরা সেই দুঃসাধ্য সাধনা করিব,—যাহাতে শত্রুমিরভেদ লুপ্ত হইয়া  
যায়।...পৃথিবীর মধ্যে আর কোনো দেশেই এত বড়ো বৃহৎ  
রচনার আয়োজন হয় নাই,—এত জাতি, এত ধর্ম, এত শক্তি কোনো তীর্থ-  
স্থলেই একত্র হয় নাই,—একান্ত বিভ্রান্ততা ও বৈচিত্র্যকে প্রকাণ্ড সমন্বয়ে  
বাঁধিয়া তুলিয়া বিরোধের মধ্যেই মিলনের আদর্শকে পৃথিবীর মধ্যে জয়ী  
করিবার এমন সুস্পষ্ট আদেশ জগতের আর কোথাও ধ্বনিত হয় নাই।  
...শেখ ও কৃষ্ণ, মুসলমান ও খ্রীষ্টান, পূর্ব ও পশ্চিম...ভারতের পূর্ণা-  
ক্ষেত্রেই সকল বিরোধ ঘুটাইয়া এক হইবার জন্য শত শত শতাব্দী  
ধরিয়া অতি কঠোর সাধনা করিবে বলিয়াই, অতি সুদূরকালে এখানকার  
উপাশন, একের তত্ত্ব উপনিষদ এমন আশ্চর্য সরল জ্ঞানের সহিত  
প্রচার করিয়াছিল।” (৯৭)

—“ভারতবর্ষে যে কেহ আছে, যে কেহ আসিয়াছে, সকলকে লইয়াই  
আমরা সম্পূর্ণ হইব,—ভারতবর্ষে বিশ্বমানবের একটি প্রকাণ্ড সমস্যার  
মীমাংসা হইবে। সে-সমস্যা এই যে, পৃথিবীতে মানব বর্ণে, ভাষায়,  
স্বভাবে, আচরণে, ধর্মে বিভিন্ন,—নরদেবতা এই বিভিন্নকে লইয়াই বিরাট,—  
সেই বিভিন্নকে, সেই বিরাটকে আমরা ভারতবর্ষের মন্দিরে একাঙ্গ  
করিয়া দেখিব।” (৯৮)

### ৯২। সংগীত—

—“হে মোর চিত্ত পূর্ণার্থী জাগো রে ধীরে  
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।  
হেথায় দাঁড়য়ে দুঃবাহু, বাড়য়ে নীম নর-বেদতারে  
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দনা করি তাঁরে।

\* \* \* \*

“কেহ নাহি জানে বার আহবানে কত মানবের শায়া  
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে সমুদ্রে হল হারা।  
হেথায় আর্ঘ্য হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন  
শক-হুন্দল পাটান-মোগল এক দেহে হল লীন।  
পশ্চিম আজ খলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার,  
দ্বিবে আর নিরে, মিলাবে, মিলাবে, বাবে না ফিরে  
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

\* \* \* \*

“হেথা একদিন বিরামবিহীন মহাওঁকার ধ্বনি,  
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিলো রবনি।  
তপসাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া  
বিভেদ ভুলিল, জাগ্রয়ে তুলিল, একটি বিরাট হিয়া।  
সেই সাধনার, সে আরাধনার, যজ্ঞশালায় খোলা আজি স্মার  
হেথায় সবরে হবে মিলিবারে আনত শিরে,  
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥”

\* \* \* \*

“এস হে আর্ঘ্য, এস অনার্য, হিন্দু-মুসলমান  
এস এস আজ তুমি ইংরাজ, এস এস খ্রীষ্টান।  
এস গ্রাহবণ, শূচি করি মন, ধরো হাত সবাকার,  
এস হে পতিত করো অপনীত সব অপমানভার।  
মার অভিষেকে এস এস স্বরা, মংগলঘট হয়নি যে ভরা,  
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে  
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥” (৯৯)

(৯৭) “রাজা প্রজা”। “পথ ও পাত্থ্য”॥

(৯৮) “রাজা প্রজা”। “সমস্যা”॥ [দুইটি প্রবন্ধেরই রচনাকাল  
১৩১৫ বঙ্গাব্দ]

(৯৯) “গীতিবিতান”। ২য় সংস্করণ। প্রথম খণ্ড। স্বরলিপি  
“সংগীত গীতাজলি” দ্রষ্টব্য। [এই সংগীতটি দীর্ঘতর-  
রূপে, কবিতার আকারে প্রথম “প্রবাসী”তে পরে  
“গীতাজলি”তে প্রকাশিত হয়। ১৩১৭]

—আগামীবারে প্রকাশ্য—

১১। “ধেময়”। ১২। ১৩। ১৪। “গীতাজলি”। “গীতিমালা”। “গীতালি” ॥

# ববর-তীর্থ

## শ্রীধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

লাগলো। প্রশ্নটার সহজ ও সনাতন উত্তর এদের অনেকেই দিতে পারে—কিন্তু সাহস পায় না বলতে—

জানি এদের মুখ দিয়ে সেই এক কথাই বার হবে—উর্ধ্বতন কয়েক পুরুষ ধরে যে শিক্ষা আর যে পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর ছোঁয়া ওদের দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় ছায়ার মত ঘুরছে তাকে ওরা বেড়ে ফেলতে পারে না। বলবে লেখাপড়া শিখা ছাড়া চাকরীর জন্য—

সত্যি কথাই তো তাই—আমি নিজেকে আমার মত অনেকেই তো ঐ উত্তর শোনবার জন্যই কান খাড়া করে থাকি—যে দেশের লোক পশুর মত না খেতে পেলে শূদ্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধুকতেই জানে তারা কি বলবে। আমাদের মতই ওরাও একদিন এই স্কুলের পড়া শেষ করে, শেষ করবে পাঠ্য জীবনের সকল দায়িত্ব—হয়ত অর্থাভাবে—নয়ত উদাম হারিয়ে সম্প্রদায় মাঠ থেকে বাড়ি মূখ্যে গরু যেমন খোঁয়াড় ছাড়া জগতে আর কিছুই দেখে না এরা তেমনি কোন একটা খোঁয়াড়ে ৫০।৬০ টাকা মাইনেতে আজীবন বাঁধা পড়বে—ভুলে যাবে পিছনের অতীতকে, ভবিষ্যৎকে চোখের সামনে ঝাপসা অস্পষ্ট দেখবে! একদিন যথাসময়ে কলুর বলদের মতই চোখ বৃজে ঘানির ভার তুলে নেবে কাঁধে—কাচা বাচ্চা আসবে দলে দলে—অকালে বৃড়ে হয়ে বার্ষিক্য আর পণ্যবৃদ্ধকে নেবে স্বীকার করে—যে অন্ধকার আশেপাশের দৃষ্টিকে ম্লান করে দেয় সেই অন্ধকার নামবে চোখের সামনে—আলোর দিকে চোখ মেলে চাইতে পারবে না—কোনদিন জানতেও চেষ্টা করবে না নিজেদের পরিধির বাইরের সচেতনতাকে—কোন বর্ণীর হাংগামায় কত দেশ ছারখার হোলো—কত লোক না খেয়ে মরলো—কোন নাতিদর-চোঁগাসের আক্রমণে কত বোন-মা তাদের মান-ইজ্জৎ খোয়ালো—ওরা শূদ্র ঘড়ীর কাঁটার মত পাক দিয়ে দিয়ে ঘর থেকে ওঘরে ঘুরবে—এই হবে ওদের সারা জীবনের রুটীনে বাঁধা কাজ—

কিন্তু রুটীনে বাঁধা কাজ নয় কার—ওদের ছেড়ে নিজের কথাই ভাবতে বসলাম—নিজেও তো ঐ একই নালায় গড়াচ্ছি—কোন ব্যতিক্রম নেই, কোন অনুযোগ নেই—গতানুগতিকতার খাল বেয়ে অবজ্ঞার মত স্তূপ সাজাচ্ছি কতকগুলো জঞ্জালের। না আর নয় ভাঙতে হবে—জাগতে হবে—

আবার এগিয়ে চললাম—পড়ার বইয়ের পাতাকে অতিক্রম করে সমস্ত দেশকাল পেরিয়ে গেলাম—অনেক উর্ধ্ব চাইকার করে গলা ফাটিয়ে বললেও বোধ হয় সব কথা বলা হবে না। তবু বললাম—এভাবে চললে তো

পট-ক্ষেতের মাঝ দিয়ে আমি চলছি একা। লম্বা আর সরু সরু পাট গাছ মাটির রসে আর মানুষের কাণ্ডাল কামনায় মাটি ছেঁড়ে মাথা উঁচু করে আকাশের পানে উঠতে চায়। পিছনে নদী, একূল থেকে ওকূল অবাধ তার ভরা যৌবন। ঘোলা লাল জল—ছোট নদী কিন্তু গভীরতা কম নয়।

আলের দুপাশে ঘন সার দিয়ে পাট গাছ দাঁড়িয়ে। চারিদিকেই পাট গাছ—যেদিকে যতদূর চাও শূদ্র সবুজের বনায় সতেজতার সমারোহ আর তাইই মাঝ দিয়ে বোকা মানুষের সৃষ্ট খাপছাড়া আলের রেখা ভাগে ভাগে আলাদা জমি। তবু এই ব্যবধানেও ওরা পরস্পরকে কাছে টানে, বড় বড় গাছগুলো মাথা নুইয়ে নুইয়ে এ ওর সাথে মিশতে চায়, ভাব করে, মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চায়—ওদের মিলন সেতু। বড় বড় গাছ আমার মাথা ছাড়িয়ে আরও দূরহাত উঁচুতে উঠে আমাকে শিশু বানাতে চায়—আমি হারিয়ে যাই ওদের মাঝখানে।

সত্যিই নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয় ওখানে গেলে। জনমানবহীন নির্জন বোবা বলে একজন মানুষ একলা কত ছোট কত অসহায়। ক্ষেতের মাঝ দিয়ে যেতে যেতে ওপরে আকাশের দিকে চাই—এপার হতে ওপারের দিকচক্রবাল ছুঁয়ে রয়েছে সীমাহীন অনন্ত নীল আকাশ—উঁচুতে অনেক উঁচুতে যেখানে মানুষের কম্পনাও কোনদিন পৌঁছাবে না সেখানে বসে মানুষের পুঞ্জীভূত বেদনা একদিন হাতছান দিয়ে ডাকবে এই অসীম জনসমুদ্রের বৃন্দকে—ভরাতে চাইবে এই শূন্য পারাবারের সকল রিষ্টতাকে—

অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ যেন চমক ভাঙে। ওপারের খেয়া নৌকা আসছে এপারে যাত্রী নিয়ে। মাঝি চাঁৎকার করে ডাকছে ওপারে যাবার যারা আছে এসো—বলি ওপারে যাবার আর কেউ কি আছে? মাঝির তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ফাঁকা মাঠ আর উন্মুক্ত নদীতীরের ওপর দিয়ে কণপতে কণপতে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে—এবারে ফিরতে হয়।

আবার মনে পড়ে যায় ওপারের কথা—সেই কলহ কলংক বিজড়িত ঘণিত জীবনযাত্রা।

আজ হাটবার। অসংখ্য মানুষ পিপাড়ের মত সার দিয়ে চলেছে হাটে। চলার পথে যাত্রী ওরা। নদীর ধার দিয়ে সব চলেছে পণ্য মাথায় নিয়ে, ওদের কেউ বা ক্রেতা কেউ বিক্রেতা। সন্ধ্যা হাট—অনেকগুলো গ্রাম নিয়ে এই হাট দূরদূরান্তের থেকে মানুষ আসে হাট করতে। সারাদিন ধরে বেচাকেনা করে সন্ধ্যা নামলেই যে যার ঘরে ফিরে যায়—

কয়েকটা দিনের জন্য দিদিমাকে নিয়ে গেলাম দিদিমার দেশের বাড়িতে বেড়াতে, পূর্ববঙ্গের বর্ধমান গ্রাম। অর্ধশিক্ষিত ও আর্শিক্ষিত অনেক লোক নিয়ে এই গ্রাম। স্কুল পাঠশালা আছে, মেয়েদেরও আলাদা স্কুল খোলবার কথা হচ্ছে, কিন্তু সংস্কারের গন্ডি পেরিয়ে তা এগোতে সাহস করছে না।

ঠিক এই সময়ে আমাকে পেয়ে অনেকেই খুব খুশী হয়ে উঠলেন। বি এ পরীক্ষা দিয়ে সবে গিয়েছি তার ওপরে এদিকওদিক নানারকম সাময়িক পত্রিকায় কিছু কিছু লিখেও নাম করছি—স্কুল সেক্রেটারী এসে আমাকে ধরলেন স্কুলে একজন মাস্টার কম—আমাকেই তাঁদের চাই।

মাস্টারী জুটে গেল—ছেলেদের নিয়ে হেঁটে করে শিক্ষা দিতে লাগলাম। জীবনের অনেক দিক থেকে অনেক রকমে অবহেলা আর অনাদর পেয়েছি তাই এতখানি সত্যিকারের আন্তরিক ভালবাসা পেয়ে মহা উৎসাহে ছেলেদের গড়ে তোলবার ভার নিলাম। ক্রাশে বসে পাশের ঘরের সেই একঘেয়ে পড়নো শূন্যতাম—রিডিং পড়ে যাও—তুমি মানে বল—তুমি বানান কর—আর ব্যাসবাক্য বল—দেখলাম এভাবে শিক্ষা দিলে চলবে না। এই সব কচি জীবন—এদের নতুনভাবে জাগিয়ে তুলতে হবে—এদের ভিত্তি পাকা করে তুলতে হবে—এরাই হচ্ছে দেশের সত্যিকারের আশা আর আনন্দ—এরাই হোল জাতির মেরুদণ্ড।

বই বন্ধ রেখে প্রাথমিক রাজনীতির কিছু কিছু এদের শেখাতে লাগলাম। দেশের আজ কি অবস্থা তা সবপ্রথম এদের জানা দরকার। প্রশ্ন করলাম তোমরা লেখাপড়া শিখতে এসেছ কি উদ্দেশ্য নিয়ে—

সকলেই এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়া করতে

তোমরা বাঁচবে না—দেশকে বাঁচাতে পারবে না—দেশে আসছে বন্যা—আসছে মহামারী—তোমরা কি করতে পারো সেটা তোমরা ভেবে দেখবে না?

ছেলেরা অবাক হয়ে চেয়ে রইলো—যেন ভূতের গম্প শুনছে—

ওরা কি ভাববে—ওরাতো কোনা দিন খবরের কাগজটা খুলেও দেখেন দেশের সত্যিকারের অবস্থা কি। তবে ওরা কেমন করে ভাববে—কোন পরাধীন জাতি স্বাধীনতা আনলো কিসের বিনিময়ে, কোন দেশনোতা কিসের জন্য কাদের জন্য নিজের সব কিছু, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে ফাঁসীর দড়ি গলায় পড়লো—কোন ভাই-বোন কাদের জন্য চিরকাল জেলের অন্ধকারে—পথে মরলো—কাদের চোখ ফোটাতে গিয়ে কত ছেলে কত বাপমাকে—কেমনভাবে পথে বাসিয়ে দিয়ে গেল।

কিন্তু আমিই বা কতখানি ভাবতে পারি। আজ এদের মাস্টার হয়ে শিক্ষা দিতে এসে এদের কি শিক্ষা দেব—কতটুকু আমি জানি—নিজে কতটুকু শিক্ষা পেয়েছি—আমার দেহেও তো চাকরী করা বাপের রক্ত—সারা দুপুর বৃকের তলায় পাশবাঁশ দিয়ে বসুমতী পড়া মায়ের শিথিল বিলাসিতা, লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করা বন্ধুদের অনুপ্রেরণা। আমার তো জন্মদিনে যেখানে আমাকে মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে আজ আমার জন্মদিন আমি রত নিলাম আমার এই জগন্মাতার দুঃখ ঘোচাবো—সেখানে আমি কি করি—আমার জন্মে তো পাঁচ তরকারী ভাল ব্যঞ্জন তৈরী হয়, আমার জন্য একটু পাগেস রান্না হয়—তারপরে মা তাঁর আঁচল দিয়ে আমার ঘেমে নাওয়া লাল মুখখানাকে মুছিয়ে দিয়ে ভগবানের কাছে আমার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করেন—আর বলেন, বাছার আমার একটা ভাল চাকরী জুটিয়ে দাও—বাছাকে আমার চিরকাল পরাধীন থাকবার মন্ত্র শিখিয়ে দাও। অথচ আজ সেই আমার ওপরে ভার পড়েছে—ওদের শিক্ষা দিতে ওদের জাগতে ওদের মানুষ করে তুলতে।

ওদের কি করে মানুষ করে তুলব নিজেই তা ভেবে পাই না। আমি যেভাবে মানুষ হয়েছি না বড় বড় কথা বলে ওদের কচি মনকে জাগিয়ে তুলে দুদিনে ধুমকেতুর মত ক্ষণপ্রভার চমক লাগিয়ে?

জিজ্ঞাসা করলাম—তোমরা কেউ গান্ধী বা জহরলালের জীবনী পড়েছে?

সবাই চুপ করে রইল—

তবু জানি ওরাই জাতির ভবিষ্যৎ—ওরাই অনুসরণ করবার চেষ্টা করবে মনীষীদের পথকে—ওদের গড়ে তোলার ভার নিতে হবে দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণকে—ওরাই একদিন বাকিয়ে দেবে—কেমন করে কোন পথে চললে মানুষ মানুষের মত বাঁচতে পারবে—তারা কেন

ধরে থাকবে তাদের পূর্ব পুরুষদের অকৃতকার্যতার বার্থ কর্মফলকে দৃষ্টিত বন্ধ জলায় সর্ব-নেশে জলবিদ্যুতের মত অন্ধ সংস্কারকে কেন তারা প্রশ্রয় দেবে? তারা ই একদিন দেশের মানুষকে ভালবাসতে শিখবে তাদের মধ্যে কোনা দিন মিথ্যা ধর্ম আর জাতির ব্যবধান গড়ে উঠবে না—

কিন্তু চিন্তায় বাধা পড়ে এক সময়—সামনে যে সার সার ছেলের দল বসে বসে একান্ত তন্ময় হয়ে আমার কথা শোনে ওরা সকলেই তো আর আমার আশা আর আদর্শ নিয়ে বাঁচতে চায় না—এই সোঁদনেও ক্লাসে সামান্য একটা কথা নিয়ে কি তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল, কোন ছেলে এমনি তর্কের ছলে কাকে গাল দিয়েছিলো, তাই নিয়ে সারা স্কুল মাতামাতি হয়ে গেল—যে ছেলেটি গাল খেয়েছিলো সে ছিল আহমদ, সে সামান্য কথা নিয়ে তাদের সারা সম্প্রদায়কে টেনে এনে কি গোলামালটাই বাধিয়েছিলো—তবু আমার কেন তাদের ওপর এমনি ভরসা আনল আমি নিজেই বুঝতে পারি না—তবু ওদের বোঝাতে ছাড়ি না—জানি আজ পারি-পারিবারিক আবেষ্টনী আর আবহাওয়াই হচ্ছে আমাদের জাতীয় জীবনে নৈতিক উন্নতি ও অবনতির কারণ, জানি আজ এরাই ভাল শিক্ষা পেলে বড় হয়ে উঠতে পারবে, মানুষ বলে বাঁচতে পারবে। সমস্ত বাধা আর বিঘ্ন অতিক্রম করে ওরা দেশের মানুষকে ভালবাসতে শিখবে, ওদের মধ্যে মিথ্যা ধর্ম আর জাতির ব্যবধান গড়ে উঠবে না।

কিন্তু তবু কেন যেন সবসময় ওদের ঠিক রাখা যায় না আমার এত আশা আর এত কল্পনাকে ওরা বার্থ করে দিয়ে অবার সেই পুরানো ক্ষতের মত পুঁজ নিয়ে ওঠে ভাল যত বলতে বাই তত মন্দ হয়, একজনকে বোঝাতে গেলে অপর মনে করে যে, আমি তার বিরুদ্ধে কথা কইছি—তাই নিয়ে বোকা ছেলেরা বাপমার কাছে যারা গিয়ে নালিশ জানায়—তারা এসে আমাকে শাসিয়ে যান আমি চুপ করে থাকি, ভাবী এদের ভাল করব বললেই তো ভাল করা যায় না—এরা এত স্বার্থপর এত বোকা যে, বোঝে না কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ এমন সব সংসর্গ বা আবেষ্টনীতে এরা মানুষ হয়েছে যে কোনমতেই নিজের পরিধি ছেড়ে বাইরে অসতে পারে না। ওদের জিজ্ঞাসা করি—আচ্ছা তোমাদের কারুর কোন সহোদর ভাই যদি কানা কি কুর্খসিত হয় কিংবা যদি তার কোন রোগ থাকে তবে পার কি তোমরা তাকে দূরে ঠেলে দিতে—

সবাই ঘাড় নাড়ল—

তবে যদি নিজের স্বার্থের দিকে চেয়ে নিজের মন্দকেও ভাল ভাবতে শেখ তবে কেন পারবে না অপরের ভালকে ভাল বলে মেনে নিতে।

এবারে মনে হলো ধর্ম আর সমাজের বাঁধনকে অস্বীকার করে ওরা এবারে নিশ্চয়ই যেখানে শক্তি যেখানে মগল সেখানে সকলকে আহ্বান করবে—মিলিত শিক্ষার সাধকতা অপরকে শেখানো হতে এমনি করে ছেলেদের দেশের অবস্থা বোঝাতে গিয়ে কত কথাই যে বলে ফেলতাম কত দুর্বোধ্য ইঙ্গিতই যে ওদের করতাম তা বুঝতে পারতাম তখন যখন এক একদিন হেড মাস্টার মশায় দোরের কাছ দিয়ে যাবার সময় গলা বাড়িয়ে যেতেন। বুঝতাম আমার এ সব কথা আমার এই সব উদ্দেশ্য যদি সফল হয়, যদি স্কুলের ছেলেরা সত্যিই কোনা দিন জেগে ওঠে তবে ওঁদের এতকালের আঁকড়ে ধরা সংস্কার কেমন করে এদের কানা করে রাখবে! কেমন করে কয়োর ব্যাঙের গন্ডুষ মাত্র জ্ঞান নিয়ে ওঁরা বেঁচে থাকবেন—যদি দেশ সত্যিই জাগে—তবে সে আলো যে ওঁদেরও জাগাবে তা ওঁরা বুঝতে পারতেন না—বলতেন ওঁদের একটু আধটু পড়ার বই টইটু পড়বেন বুঝতেই তো পারছেন সামনেই ওঁদের পরীক্ষা—পরীক্ষা বলেই তো ওঁদের এখন থেকে তৈরী করছি—

যে পরীক্ষার জন্য তৈরী করছেন সে পরীক্ষা পরে—

আমার মনে হয় সেটাই আগে—কারণ জীবনকে সুন্দর করে দেখবার এবং দেখাবার পরীক্ষা আগে নয় আগে জীবনকে বাঁচাবার পরীক্ষা।

আপনার বড় বড় কথায় কি কোন কাজ হবে—

আপনাদের সাহায্য পেলে কথা ছেড়ে কাজ নামতে পারি—

এরপর বড়ো মাস্টার মশায় বেগে ক্লাসে চলে যান—আর আমি ফিরে আসি আবার সেই পুরানো পথে—কি পড়া আছে তোমাদের—

ছেলেরা বই ছেড়ে কাজে নামতে চায়—বই পড়তে চায় না বড় বড় কথা শুনতে চায় না—

এমনি করে দুদিনেই ছেলেদের খুব প্রিয় হয়ে উঠলাম। ছেলেদের নিয়ে এমনি করে একটা দল তৈরী করে ফেললাম। এই সব স্কুলের কিশোররাই হবে দেশের সত্যিকারের সাহসে আর আত্মত্যাগে দেশপ্রেমিক বীর—এরাই একদিন দেশকে স্বাধীন করে তুলবে।

স্কুলের ছুটির পর ওদের সকলকে এক জায়গায় ডাকতাম আর নানাভাবে উপদেশ দিতাম। ওদের বলতাম তোমরা এক সঙ্গে দল বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেশের লোকের সত্যিকারের অবস্থা দেখে এসো আর তাই দেখে কোথায় কাদের কি দরকার—কোথায় কারা কার ওপর অত্যাচার করছে—কোথায় কে কেন খেতে পাচ্ছে না—তাই নোট করে রাখো। আমার কথামত ওরা তাই করতো। বলতাম তোমরা অপরের ওপর নির্ভর না

করে নিজেরা যতটুকু পার করে যাও গঠনমূলক কাজ যাতে সাধারণের উপকার হবে—যা কিছু পুরানো অশ্ব সংস্কার—যা কিছু আমাদের এগিয়ে চলার পথে বাধা তাকে দূর করে গড়ে তোল নতুন মঙ্গলময় সমাজ ব্যবস্থা। কথা শেষ করে ছেলেরদের মুখের দিকে চাইতাম দেখতাম আনন্দে অর আশায়, উৎসাহে আর উদ্দীপনায় ওদের চোখ জ্বল জ্বল করছে—ওদের ওই চোখের দিকে চেয়ে আমি আমার দেশকে জাগতে দেখতাম—ভাবতে শিখতাম তার মুক্তি আসন্ন—

স্কুল ছুটির দিনে দুপুর বেলায় থাকতাম বাড়িতে—দেখতাম পাড়ার মেয়েরা আসত অনেকে নানা ছুতোয়—আমার সঙ্গে ভাব করত। কিন্তু পেত না আমার কাছে আসতে—তাই নানা ছুতোয় দিদিমার কাছে এসে তাঁকে জ্বালাতন করতো—অথচ দুদিন আগে আমিও যেচে যেচে সব বাড়িতে গিয়ে বলিছিলাম যে, মেয়েদের জন্য একটা সাধারণ স্কুল খুলতে যেখানে বয়স্কা মেয়েরা অনায়াসে পড়াশুনা করতে পারবে—তারের গৃহস্থালী অনেক কাজ শিখতে পারবে—সূচী-শিল্প—গান-বাজনা, রন্ধন-শিল্প এই সব হবে স্কুলের প্রধান পাঠ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়। কোন সাধারণ স্থানে স্কুলে আপত্তি থাকবে জানতাম, তাই কোন বাড়িতেই পাঠশালার মত কয়েকটি ছাত্রী প্রথমে নিয়ে তাঁরা কাজ আরম্ভ করবেন—গ্রামেই অনেক মহিলা আছেন, যারা শিক্ষিতা এবং নানারকম শিল্পকলায় পটু, তারা একাজে এগিয়ে আসবেন—সেখানে পুরুষদের থাকবে না কোন কর্তৃত্ব, কোন পরিচালনা। এমন অনেক বাড়ি আছে, যেখানে বড় বড় অনেক মেয়ে যারা না পারে নিজের নামটুকু লিখতে, না পারে দু'লাইন পড়তে অথচ ওরাই একদিন হবে মা—ছেলেকে কেমন করে গড়ে তুলবে মানুষের মত করে। এইসব মেয়েদের কেমন করে বিয়ে দেবে এদের বাপ-মা—এইসব প্রশ্ন করতে গেলে বাড়ির লোকেরা বলিছিলেন, তোমাদের বড় বেশী গরজ পড়েছে আমাদের মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে, তাদের বিয়ে দিতে। দিদিমা বা ঐরকম বড়দীরা নাক সিঁটকে উঠেছেন—অন্যান্য মেয়েরা নানারকম ঠাট্টা করেছেন চরিত্র নিয়ে নানা রকম টিপ্পনী কেটেছেন। বাধ্য হয়েই আমাকে ওর থেকে নিরস্ত হ'তে হচ্ছে।

হাটবারের দিনে যেতাম হাটে—ভালমানুষ ছিলাম—দরদস্তুর করতে পারতাম না, তাই যে যেভাবে পারতো ঠিকিয়ে নিতো। ওরা আমাকে বোকা ভাবত, আমি সব বুঝতাম, বুঝতাম দিদিমার দু'আনা পয়সা বেশী গেলে বিশেষ কোন ক্ষতি হবে না; কিন্তু এইসব অভাবী গরীবদের দল যদি দু'পয়সা পায় তো পাক। ছ'পয়সা দু'খ আমার কাছে দু'আনা চাইতো—আমার হাত হতে ওরা কাড়াকাড়ি করে ঘটি নিয়ে ইচ্ছামত ওজন দিয়ে ঘটি ভর্তি করতো।

কলাওয়ালা দু'ছড়া কলা আমার বাজারের থলির মধ্যে জোর করে গুঁজে দিয়ে যেত—জানতো দাম ওরা পাবেই—বেশীই পাবে।

বিকালের দিকে মাঠে যেতেন বেড়তে। বাড়ির পাশেই মাঠ—অজস্র উন্মুক্ত হাওয়া—আর মাঠের পাশেই পুকুর। পুকুরের পাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম, নদীর বানে ভাসা জল এসে ঝির ঝির করে পুকুরে পড়ছে—স্বচ্ছ ফটিক জল চুইয়ে চুইয়ে আবার কখন কখন ছল ছল শব্দ করে পুকুরে নামছে—অমনি করে ঐ একঘেয়ে ছল ছল করে জল পড়া শব্দতে ভাল লাগতো—যেন ঐ জল পড়ার শব্দের মধ্যে খুঁজে পেতাম আমাদের জীবন-যুদ্ধের চলার গান। আমাদের হারিয়ে যাওয়া রম্ম স্রোতকে দেখতাম চলমান ঐ জলধারার মাঝে সবল সক্রম অবস্থায় আমাদের চলার পথের সন্ধান পেতাম ঝির ঝির ঐ ক্ষীণ জল-স্রোতের মাঝে। বেশ ভাল লাগতো—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম আর দেখতাম একটা জলচোরা সাপকে বক-ধাম্বকের মত ঠিক ঐ স্রোতের মুখে বসে থাকতে একটা কি দুটো পুঁটিমাছ আসছে, অমনি টুপ করে ছোঁ দিয়ে ধরছে—সেটা খাওয়া হলে নতুন আশায় আবার মুখ তুলে অপেক্ষা করছে—এ যেন স্বাধীন শিকারীর পরাধীন শিকার খোঁজা—আবার ওদিকে দু'একটা বক সাদা লম্বা গলা নিয়ে অতি সন্তপণে এগিয়ে চলেছে—দু'চারটে ছেলে দোয়ার পেতে বসে আছে—কতক্ষণে চাটে মাছ হবে—দু'একটা কই মাছ পুকুর থেকে উজিয়ে আসছে নদীর পানে মহাআনন্দে ঝির ঝির করে জল ছিটাতে ছিটাতে মুক্তির আশায়—মধ্যে পথে ওদের সব আনন্দকে চূর্ণ করে অপেক্ষমান ছেলের দল টুপ টাপ করে ধরে ঘটির মধ্যে পুরছে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির এই স্নিগ্ধ শান্তরূপ দেখতে ভাল লাগে; কিন্তু দুঃখ হয় আমাদের মতই পরাধীনতার গ্লানি এদেরও জীবনকে পঙ্গু করছে—কেন ওরাও এত পরাধীন আমাদের দুঃখের প্রতিটি করুণ বাজনা যেন ওদের মধ্যে প্রতিভাত হতে দেখতে পাই। হতভাগ্য মানুষের দুয়ারে স্বাধীনতার কোন মূল্যই যেন নেই—ভাবিয়ে তোলে এই সব সমস্যা—

রাত্রির দিকে ঘুম আসতো না। চুপ করে শুয়ে থাকতাম নয়ত এপাশ-ওপাশ করতাম—ওপাশের বাড়িতেও আর এক দিদিমা আমারই মত প্রহর গুণেতেন সারারাত; বয়স খুব বেশী নয়—যৌবনের ঘোর কার্টেনি—অস্পন্দিত হলো স্বামী মারা গিয়েছেন।

দিনের বেলা দেখা হ'লে বলতেন—কি ভাই রাত্তিরে দাঁখি সারারাত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করত। ঘুম আসে না বুঝি—আমারও ঠিক তোমারই মত অবস্থা—পোড়া ঘুম কিছুতেই আর আসতে চায় না চোখে। কেন ঘুম আসে না বলতো পারো—মুচকে মুচকে হাসতে থাকেন

দিদিমা—অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মুখের দিকে—চোখে যেন কিসের ইঙ্গিত—

অবশ্য তোমার আর আমার কথা আলাদা। দেহের শান্তি না থাকলে কি আর মনের শান্তি থাকে—কুৎসিত কথার ভাণ্ড, আর তেমনি গা এলিয়ে দেওয়া ভাব—

অবাক হয়ে ভাবি, এই মানুষই একদিন আমাকে নিয়ে কত টিপ্পনী কেটেছিলেন। যখন মেয়েদের স্কুলের কথা বলতে গিয়েছিলাম—ঘরে ঘরে কত আইবুড়া বড় মেয়ে, যারা শিক্ষার অভাবে কেমন করে কানার মত দিন কাটায়—সূচী-শিল্প এবং আরও অন্যান্য গৃহস্থালী কাজ মেয়েরা শিখবে। মেয়েদের শিক্ষা মেয়েরাই দেবেন—তখন এই দিদিমাই তাতে বাধা দিয়েছিলেন; অগুণী চরিত্র নিয়ে নানারকম মন্তব্য করতে উঠি এগিয়ে এসেছিলেন প্রথমে অথচ আজকে তাঁর ছেলের বয়সী আমার সাথে এই কুৎসিত ইঙ্গিতপূর্ণ আলোচনায় বাধে না। চোখে-মুখে কেমন একটা ভাব—লজ্জা-সম্বোধিত কিছু নেই—সমাজের তলায় তলায় এ রকমের গুপ্ত-নাগা যে কত গ্রামকে কলুষিত করেছে—তার খোঁজ-খবর কে-ই বা রাখে। তবু ভাবি, কেন সমাজের আজ এই অবস্থা। কারা করলো এ রকম—পেটে থাকলো ক্ষিদে অথচ এদের জোর করে খেতে দেওয়া হবে না।

নানারকমে ঘা খাওয়া সম্ভবও আমি প্রাপণ পেয়ে এগিয়ে যাবার আয়োজন করছি। এমন সময় হঠাৎ আশেপাশের গ্রামে এলো বন্যা। দিনরাতের মধ্যে বিশ-পাঁচশতানা গ্রাম নিয়ে গেল ভাসিয়ে—মানুষের কামায় কাণ পাতা গেল না। স্বিগুণ উৎসাহ আর উত্তেজনা নিয়ে স্কুলের ছাত্রদের সাথে গেলাম বন্যাপ্রাণীদের সাহায্য করতে; কিন্তু সাহায্য করব বললেই করা যায় না। সাহায্য করতে গিয়ে দেখলাম, এটুকু সব শিশুদের মধ্যে আবার কত রকমের ধর্ম ও সামাজিক বাধার বাবধান। কেউ মুসলমান সে হিন্দুর বাড়িতে থাকবে না, খাবে না; কেউ হিন্দু সে মুসলমানদের ছোঁওয়া এড়িয়ে চলে জাত যাবার ভয়ে সব সময় শূন্যকো মুখে থাকে—ছাত্রেরাও নিজেরাও ঐ নালার জল—নানারকম ধর্ম আর সম্প্রদায় নিয়ে ব্যস্ত। যেখানে বন্যার জল হিন্দু-মুসলমান কিছুকে বিচার করে ক্ষতি করেনি, যেখানে বন্যা এলে রোগে শোকে আর অনাহারে হিন্দু-মুসলমান একই স্থানে, একই ভাবে মরে, সেখানে কেন এরা ধর্ম আর সম্প্রদায়ের গোড়ামি নিয়ে এভাবে থাকে—কেন এরা মানুষকে ভাই বলে ভাবতে পারে না—কঠিন আঘাত খেয়ে যেমন করে অতি আপনায় প্রিয়জনের কাছ থেকে সরে আসে, ঠিক তেমনি করে এইসব সূক্ষ্মার কিশোরদের কাছে আঘাত পেয়ে একটু একটু করে যেন সরে এলাম। ভেবে দেখলাম শিক্ষা না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের মুক্তি নেই—সত্যিকারের শিক্ষা কে দেবে—কেন মানুষের দুয়ারে মানুষেরই গড়া

এসব অনাচার যে মানুষ জীবনে শান্তি আনে, সেই আবার কেমন করে সৃষ্টি করে এই সব অশান্তি কেমন যেন মাথাটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে—ইচ্ছা হয় চলে আসি এই সব পণ্ডশ্রম ছেড়ে—

আরও কয়েকদিন থাকার পর ওখান থেকে চলে আসব ঠিক করলাম। যে কটাদিন থাকব ছেলেদের সাথে সাথেই ঘুরব যদি কিছু আশার ইঙ্গিত পাই তো ওদের মাঝখানেই পাবো। সেদিনে ওদের নিয়ে বেড়াতে বার হলাম নদীর ধারে। কানায় কানায় ভরা নদী—কুল ছাড়িয়ে উঠেছে ওর দাপাদাপি—নদীর পারে গিয়ে বসলাম সকলে মিলে। ওপরের খাড়া মাটি হাতে নদীর জলরেখা পর্যন্ত জায়গাটা ওপর থেকে নীচেয় চালু হয়ে নেমেছে—নদীর ধার দিয়ে গ্রাম গ্রামান্তরে যাবার পথ আর তারই ওধারে খানিকটা ফাঁকা মাঠ যেখানে সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে নদীর ধার থেকে অনেকটা দূর পর্যন্ত এই হাট চলে। ওদিকের ওপাশটায় নীলকর সাহেবদের অক্ষয় অট্ট স্মৃতিসৌধ নীলকুটি দিনেরবেলায়ও যেখানে শেয়াল আর সাপের মেলা বসে—

নদীর পারে যেখানে বসেছিলাম, সেখান থেকে ওপরের দিকে চাইলে শূন্য দু'একটা উড়ন্ত চিল দেখা যায় অনেক উঁচুতে—সামনে নদীর জল আবর্ত সৃষ্টি করছে—সেদিকে চাইলে জীবনের সব কিছু যেন কোথায় মিলিয়ে যায় একটু পাশেই উঁচু একটা মাটির ঢিবি আর তার ওপর সার সার কয়েকটা কবর। মাথার ওপর দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করে উড়ে গেল একখানা উড়োজাহাজ—আশেপাশের মাঝ-মাল্লারা এদিক-ওদিক ছুটোছুটি শুরু করলো—যেন ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখেছে—উড়োজাহাজটা ঢিবির ওপরের কবরগুলিকে কেন্দ্র করে কয়েকটা পাক খেয়ে চলে গেল। আমাদের পায়ের নীচেতেই এদিক-ওদিক দু'একখানা ইতস্তত ছড়ানো কঙ্কাল—চারিদিক থেকে অসহায় বোবা বাতাস যেন কানে কানে কি বলে গেল। ভাষাহীন খমখেমে গাম্ভীর্য যেন অটল মৌনীর মত সারা আকাশ-বাতাসকে ঘিরে রয়েছে। পাশের ছাত্রদের শূন্যল্যাম, এত কঙ্কাল কেন এখানে। তার উত্তরে ওরা যা বলল—শূন্য শূন্যে গেলাম।

এক হাটবারের দিন—রথযাত্রাও ছিল সঙ্গো। আশেপাশের গ্রাম থেকে অনেক লোক এসেছিল। বোচাকেনা করতে পরিপূর্ণ জমজমাট হাট নদীর ঘাটে সার সার বাঁধা মহাজনী নৌকা পণ্যবোঝা ভরা তার কুঠুরি—সবাই আপন আপন খেয়ালে বাস্তু। হঠাৎ ওপরের উড়ন্ত এক উড়োজাহাজ তার কলকল্লা বিগড়ে আছড় খেয়ে এসে পড়ল মহাজনী নৌকার ওপরে—নিমেষের মধ্যে নৌকা মানুষ আর নৌকা বোঝাই পণ্যবোঝাকে তছনছ করে দিয়ে হাটের একাংশ ভেদ করে, উড়ো জাহাজ সবগে ছুটে গিয়ে একটু দূরে থেমে গেল। নিমেষের মধ্যে জলের ওপর

রাশি রাশি বিধ্বস্ত পণ্য, ভাঙা-টুকরো নৌকার কাঠ, মানুষের রক্ত ভেজা ঘাস আর মাটি একাকার হয়ে গেল।

যারা হাটে এসেছিলো তাদের দেড়শো লোকের ইতস্তত ছড়ানো হাত, কারও পা, কারও বা মাথা—গড়াগড়ি যাচ্ছিলো। কারও মাথাটা দেহ ছেড়ে দূরে গিয়ে পড়েছে—গলার কাছে তাজা লাল রক্ত বরছে চোখ দুটো তখনও খোলা আর নিঃশব্দ—কারও মুখ চেনা যায় না একেবারে থেঁতলে পিষে গিয়েছে, নাকটা মূখের সঙ্গে সমান হয়ে গিয়েছে, কারও কানটা তখনও সামান্য একটু চামড়া লেগে মাথার সঙ্গে ঝুলছে—কারও পেট চিরে নাড়িভাঁড় সব বেরিয়ে পড়েছে—কারও মাজা থেকে ওপরের দেহটা আলাদা হয়ে গিয়েছে, শূন্য মেরুদণ্ডে একটু ঠেকে আছে—এদিক ওদিক এলোমেলো ছড়ানো মানুষের কাঁচা মাথা আর সেই সব মাথার খোলা চাহনি পাথরের মত কঙ্কালের স্তূপ—তাজা রক্তের দাগে জায়গায় জায়গায় মাটি ভিজ্ঞে—বাসের উপর রক্তের মোছা মোছা ছাপ—

শূন্যে শূন্যে শিউরে উঠছিলো সারা শরীর। এই সব গরীব আর নিরীহ চাষী-মজুর এদের ওপর কেন এত অভিশাপ—এরা সারাদিন খেতে দিনান্তে দু'মুঠো ভাতের জোগাড় করে হাসতে হাসতে বাড়ী ফেরে চিনির বলদের মত; এদের ওপরে এ অভিশাপ কেন। এরা সেদিনের দুর্ভিক্ষের জের আজও কাটিয়ে উঠতে পারেনি—যারা না খেয়ে মরেছে তারা মরেছে—যারা আছে তারাও সংখ্যায় নগণ্য—হয়ত কোনও ঘরে এক বিধবা মা আর তার রোগা একটা মেয়ে—মেয়েটাকে ঘরে শুইয়ে রেখে মা এসেছিলো বেচা বেচতে—উঠানের ওপরে লাগালো দু'একটা পুঁই কি লাউ গাছের নতুন ফল মনেও নতুন আশা বাঁচকার। ওই শাক আর লাউ বেচে নিয়ে যাবে তার মেয়ের জন্য পথ্য আর নিজের কিছু চাল তেল নুন—তাড়াতাড়ি ফিরতে চেয়েছিলো বাড়ীতে মেয়েকে একটু বালি করে দেবে—মেয়েটিও আশায় আশায় বিছানা ছেড়ে অতিকণ্টে এক একবার ঘাড় তুলে চাইছে পাথর পানে—এ বোধ হয় তার মা আসছে—কিন্তু সে হো জানতে পারেনি যে মা তার চিরকালের জন্য তাকে ছেড়ে গেল—আর কোন দিন ফিরে আসবে না সে। কোন মা তার মাস কয়েকের ছেলেকে রেখে গিয়েছে ঘরে চারটি কয়েত বেল আর পাকা চালতা নিয়ে গিয়েছে হাটে। একটা দু'পয়সা লাল কাগজের ফুল ছেলের চোখের সামনে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রেখে গিয়েছে—ছেলেটা খেলা করতে করতে ক্ষিদের এক সময় কেঁদে কেঁদে আগুনে চুষে ঘুমিয়ে পড়েছে কাত হয়ে, একখানা হাত বে-কায়দায় পিঠের নীচে দিয়ে অসহায় অবস্থায় ঘুমচ্ছে—সামান্য একটু দমকা

বাতাসে ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠছে মাকে স্বপ্ন দেখে ঐ তার মা আসছে। কিন্তু কাদের আত্যাচারে কেন ঐ নিরপরাধ নিষাপা শিশু আর কোনদিন তার মাকে ফিরে পাবে না—মায়ের আদর চিরতরে কারা তার সঙ্গে ফুরালো—এর উত্তর কোথাকার কোন সভা মানুষে দেবে।

শূন্য মা নয়, কত বাপ কত ভাই বোন—সব জমা হোলো একজায়গায়। যাদের চেনা গেল না, তাদের মৃতদেহগুলোকে এক জায়গায় ভেঙে করে জরালানি কাঠের মত জরালিয়ে দেওয়া হোলো—দাঁড় দাঁড় করে—ছোট কাঁচি ছেলের ছোট হাতের দাবি তার মাও ঐ জরালানির মত পুড়ে গেল—শূন্য মানুষই নয়, উড়োজাহাজের যন্ত্রপাতি যেগুলো ওরা নিয়ে যেতে পারলো না সেগুলোকে কামান খেতে উড়িয়ে গিয়ে গেল—নিরাপদ হবার জন্য। যারা ঘেরকমে পারলো ক্ষতিপূরণস্বরূপ ২০০।৩০০ টাকা নিয়ে এক একটা মানুষের জীবনের দর কষে ফেললো—বোচাকেনা হোলো হাটের মাঝে মানুষের জীবন নিয়ে—

ভাবতে ভাবতে উঁচু ঢিবিটার ওপর গিয়ে বসলাম। চারিদিক থেকে হু হু শব্দে উদাস বাতাস এলোমেলো বয়ে গেল—নীচে নদীর খল খল গম্ভীর শব্দ কানে আসতে লাগলো—সন্ধ্যা নেমে এলো—ঋষি পোকারা একটানা শব্দ সুরু করলো—নীলকুঠিতে শেয়ালগুলো সমস্তরে চাঁৎকার আরম্ভ করলো—চারিদিকের অন্ধকারে কেবলই যেন কাদের কান্না শূন্যে লাগলো—

আরো সরে গেলাম ঢিবির ওপরে—সার সার বারটা কবর—একটু করে মাটী দিয়ে উঁচু করা—প্রত্যেকটি কবরের গায়ে এক একটি কাঠের রুস। প্রথম ছটা কবরের মাথায় ছজন সামরিক অফিসারের নাম, পরের চারটি অজ্ঞাত পরিচয় আমেরিকান পাইলট—চারজনেরই কবর মাথায় শূন্য ইংরেজীতে লেখা—Underneath here lies all the arms, পরের দুটি কবর দুজন অজ্ঞাত পরিচয় ভারত-বাসীর—তাদের রুসের ওপরে লেখা—‘দয়ালু শীশুর শান্তিময় ক্রোড়ে শায়িত’—

সুদূর আমেরিকা হতে দেশসেবা করতে এসে ভারতের অজ্ঞাত পত্নীর মাটীর নীচে ঘুমিয়ে রইলো।

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্মের এতগুলো মানুষ এত কাছাকাছি চিরশান্তিতে চিরকাল এইখানে ঘুমিয়ে থাকবে—কই এরা তো ধর্ম আর সম্প্রদায় নিয়ে মাতামাতি করলো না—

তবে আমরা কেন এত দলাদলি আর হাংগামা নিয়ে আছি। মরণ যদি আমাদের সব ব্যবধান চুকিয়ে দেয় তবে সে মরণ তো আমাদের হাতের কাছেই। আজ যদি পৃথিবীর কলহকারী সব দলকে এই কবরের পাশে দেখতে পারতাম।

## দেশী সংবাদ

**২৫শে আগস্ট**—গণপরিষদের বাঙালার সদস্যবর্গ এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন : রাডক্লিফ বাটোয়ারা ম্যাকডোনাল্ড বাটোয়ারার মতই আপত্তিকর। আমাদের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন ধ্বংস করিবার যে উদ্দেশ্য ম্যাকডোনাল্ড বাটোয়ারায় ছিল, রাডক্লিফ বাটোয়ারায়ও তাহা রহিয়াছে। তাহারা বলেন, খুলনা ও পাবনা চট্টগ্রামকে পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক হইয়াছে।

হায়দরাবাদ রাজ্য কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট স্বামী রামানন্দ তীর্থ প্রচারিত হওয়ার ফলে হায়দরাবাদ রাজ্য কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটির সমস্ত ক্ষমতা সংগ্রাম কমিটির উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। হায়দরাবাদ রাজ্যে ভীষণ অরাজকতা চলিতেছে।

**২৬শে আগস্ট**—পাকিস্থানের অন্তর্গত শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা হইতে ব্যাপক অশান্তি ও অরাজকতা ক্রমশঃ বাড়িতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। আসামের গবর্নর নিম্নোক্ত অঞ্চলগুলি উপদ্রুত এলাকা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—(১) সমগ্র কাছাড় জেলা, (২) আসামের অন্তর্গত শ্রীহট্ট জেলার \*পাথারকাঁদি, রাডাবাড়ী, বদরপুর ও করিমগঞ্জ থানা।

মহাত্মা গান্ধী অদ্য বালিগঞ্জ লোক ময়দানে প্রাধান্তিক ভাষণে ইদানীং দেশবাসীর মধ্যে প্রাদেশিকতার যে সংস্কীর্ণতা দেখা দিতেছে তাহার উল্লেখ করেন। গান্ধীজী বলেন, সংবাদপত্র পাঠে জনা গেল যে, একদল অসমিয়া এইরূপ দাবী তুলিতেছেন যে, আসাম একান্তভাবে অসমিয়াদের। বিহার হইতেও বাঙালী বিবেচকের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। গান্ধীজী বলেন যে, প্রাদেশিকতার সংস্কীর্ণতা সর্বত্রোভাবে পরিহার করা কর্তব্য।

পশ্চিম বঙ্গ গবর্নমেন্টের প্রম ও বালিগঞ্জ সচিব ডাঃ সুরেশচন্দ্র বানার্জি এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, ক্রমশঃ শিপগুলিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার জন্য তাহাদের যে নীতি, তদনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ গবর্নমেন্ট বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান রূপ করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা ইলেকট্রিক সান্দাই কর্পোরেশনকে নোটিশ দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

অদ্য কলিকাতার হিন্দু, মুসলমান ও শিখের দুই মাইল দীর্ঘ এক শান্তি শোভাযাত্রা বাহির হয়।

হায়দরাবাদ রাজ্যের ওয়ারাঙ্গল জেলার হাসান-পতি গ্রামের আট হাজার লোকের খাদ্য রেশন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রামটিতে কংগ্রেসের সভাপতি আন্দোলন জোর চলিতেছে।

**২৭শে আগস্ট**—কলিকাতায় নিঃ ডাঃ ফরোয়ার্ড ব্লক ওয়াকিং কমিটির এক সভায় কংগ্রেসের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্তে করিয়া সর্ব-সম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পর্কে যে পরামর্শ কমিটি গঠিত হইয়াছিল, সেই কমিটি অদ্য ভারতীয় গণ-পরিষদে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। এই রিপোর্টে পৃথক নির্বাচনের বিলোপ সাধন, শ্রেণি নির্বাচনের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য নির্বাচন, যে সকল সম্প্রদায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলিয়া স্বীকৃত জনসংখ্যার অনুপাতে প্রথমে ১০ বৎসরের জন্য বিভিন্ন আইন সভায় তাহাদের জন্য আসন সংরক্ষণ এবং দশ বৎসরের জন্য এ্যাংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের নিম্নতম রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করার কথা বলা হইয়াছে। সর্বদর ব্রহ্মভাই প্যাটেল এই কমিটির সভাপতি।

কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ মেটিয়াবুরুজে

## সাম্প্রতিক সংবাদ

প্রাধান্তিক ভাষণে মহাত্মা গান্ধী শ্রমিক ও মালিক-গণের মধ্যে বিরুদ্ধ সম্পর্ক হওয়া উচিত, তাহা ব্যাখ্যা করেন। গান্ধীজী বলেন যে, তিনি মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে মিলন চাহেন। উভয়ের মধ্যে সহযোগিতার দ্বারা তাহারা আশ্চর্যজনক ফল লাভ করিতে পারেন।

যে সকল দেশীয় রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিয়াছে, সেগুলিতেও ১৮১৮ সালের বঙ্গীয় রাজবন্দী আইন (১৮১৮ সালের বেঙ্গল ট্রেট প্রিজনার রেগুলেশন) প্রবর্তনের জন্য গবর্নর জেনারেল এক আদেশ প্রদান করিয়াছেন। এই আইনের বলে "রাষ্ট্রের স্বার্থের খাতিরে" গবর্নমেন্ট যে কোন ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখিতে পারেন।

**২৮শে আগস্ট**—অদ্য মথুরার কিছুর পূর্বে কলিকাতা হইতে ৩৫ মাইল দূরে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের অন্তর্গত কোলাঘাট স্টেশনে মেদিনীপুর জেলা) এক ট্রেন দুর্ঘটনার ফলে ১৬ জন নিহত ও ১১৮ জন আহত হইয়াছে। ১৮নং আপ হাওড়া-পূর্বলিয়া টাটানগর প্যাসেঞ্জার কোলাঘাট স্টেশনে দাঁড়াইয়াছিল। ১৮নং আপ হাওড়া-নাগপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেন উপর যাইয়া পড়িয়া এই দুর্ঘটনা হয়। দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে তদন্ত করা হইতেছে।

নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিতজওহরলাল নেহরু প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, ঢাকায় খাদ্য সংকটের কলোছায়া দেখা দিয়াছে এবং আশঙ্কা করা হইতেছে যে, নগরীতে রেশনিং প্রথা শীঘ্রই ভাঙিয়া পড়িবে।

**২৯শে আগস্ট**—সমগ্র পশ্চিম পাজাবে সংখ্যা-লঘুদের বিরুদ্ধে অমানুষিক বর্বরতা অনুষ্ঠিত হইতেছে। ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীতে যে অগণিত আশ্রয়প্রার্থী আসিয়া পৌঁছিতেছে, তাহারা অমানুষিক নির্যাতন, অত্যাচার রক্তস্রোত, লুণ্ঠিতরাজ, গৃহদাহ ও স্ট্রীলকদের প্রতি নির্যাতনের বিবরণ প্রদান করিতেছে। তাহাদের একজন বলেন, শিয়ালকোট ১২ই আগস্ট হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। রাতে সমগ্র সহর প্রজ্বলিত হইতে থাকে। প্রাতঃকালে দেখা যায় যে, রাজপথগুলি মৃতদেহে আচ্ছাদিত। ১৬ই আগস্ট পর্যন্ত আগুন জ্বলিতে থাকে এবং ৩ হাজারেরও অধিক মৃতদেহ সর্বত্র পড়িয়া থাকে। শিয়ালকোটের বিখ্যাত দেওয়া সিং মন্দির এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত পরিণত হইয়াছে।

শিয়ালকোট হইতে ২৭ মাইল দূরে ওয়াজিরা-বাদে ১২ই আগস্ট অবর্ণনীয় নৃশংসতা অনুষ্ঠিত হয়। আহত ও অসিদ্ধশ্রম আশ্রয়প্রার্থীরা ট্রেণে ১৩ ঘণ্টার পথ জয়তেছে চলিয়া যাইতেছিল। প্রকাশ, ওয়াজিরাবাদ হইতে দুই মাইল দূরে ট্রেণটি থামাইয়া ৩টি বালিকা ব্যতীত অপর সমস্ত লোককে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হয়।

লাহোরে যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদের বৈঠকে স্থির হয় যে, ৩১শে আগস্ট মথুরায় হইতে পাজাব সীমান্ত বাহিনীকে ভাঙিয়া দেওয়া হইবে। ইহার পর হইতে উক্ত বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলগুলির ভার সরাসরিভাবে স্ব স্ব জোমিনিয়নের উপর ন্যস্ত হইবে। আরও স্থির হয় যে, বর্তমান সীমান্ত এলাকা বলিয়া গণ্য অঞ্চল নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারতীয়

যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থান জোমিনিয়ন স্ব স্ব এলাকার নতুন হেড কোয়ার্টার স্থাপন করিবে।

পশ্চিম বঙ্গের রাজস্ব সচিব শ্রীযুত কালীপদ মুখার্জি ঘোষণা করেন যে, বঙ্গ বিভাগের ফলে সম্প্রতি অতিরিক্ত লোকজন আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় কলিকাতা ও পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য সহরগুলো যে গুরুতর বাসগৃহ সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহা সমাধানকল্পে পশ্চিম বঙ্গ গবর্নমেন্ট একটি গৃহ দখল অর্ডিন্যান্স জারী করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

**৩০শে আগস্ট**—পূর্ব পাজাব গবর্নমেন্টের এক ইন্তাহারে বলা হইয়াছে যে, পশ্চিম পাজাবের—বিশেষ করিয়া শিয়ালকোট ও গুজরানওয়ালা জেলার সাম্প্রদায়িক পরিঘর্ষিতার আরও অবনতি হইয়াছে। অদ্য একদল অ-মুসলমান আশ্রয়প্রার্থী মুসলমান রক্ষার প্রহরাদীনে জলন্ধর সহরে পৌঁছিয়াছে। উক্ত দলে ১৮ জন নিহত ও ২৫ জন আহত ব্যক্তি আছে। ইহাতে সহরে বিশেষ উত্তেজনার ভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রকাশ, গুরুদাসপুরে মুসলমান জনতা একটি গ্রামে আক্রমণ চালায়।

পূর্ব পাজাবে আশ্রয়প্রার্থী প্রতিষ্ঠানকে অধিক-তর শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র সচিব সর্দার প্যাটেল আগামীকাল বিমান-যোগে জলন্ধর যাত্রা করিবেন। পশ্চিম পাজাব হইতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আশ্রয়প্রার্থীদের স্থানান্তরের জন্য সামরিক ও অ-সামরিক সমস্ত যানবাহন সামরিক কর্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে।

পাজাবের অবস্থা ক্রমশঃই অবনতির দিকে যাইতেছে দেখিয়া মহাত্মা গান্ধী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন এবং সেখানে যাওয়ার কথা গভীর-ভাবে চিন্তা করিতেছেন।

জনা গিয়াছে যে, নতুন করিয়া পশ্চিম বঙ্গ মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের জন্য বর্তমানে যে দশ জন মন্ত্রী আছেন তাহাদের তিন জন অন্য প্রধান মন্ত্রী ডাঃ ঘোষের নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করেন। তাহাদের নাম যথাক্রমে—শ্রীযুত যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, শ্রীযুত বিমলচন্দ্র সিংহ এবং শ্রীযুত রাখানাথ দাস। নবগঠিত মন্ত্রিমণ্ডলীতে সম্ভবতঃ নয় জন মন্ত্রী থাকিবেন এবং তন্মধ্যে প্রধান মন্ত্রীর বর্তমান রাজনৈতিক সেক্রেটারী শ্রীযুত অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী এবং ডায়মন্ডহারবারের বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবী শ্রীযুত চারুচন্দ্র ভাভারী নতুন মন্ত্রী নিযুক্ত হইতে পারেন।

**৩১শে আগস্ট**—লক্ষ্ণৌর সহরীয় প্রকাশ, পাজাব ও সীমান্ত প্রদেশ হইতে প্রায় দেড় লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী লক্ষ্ণৌ-এ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। প্রকাশ এই দেড় লক্ষ আশ্রয়-প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ৫০ হাজার সীমান্ত প্রদেশ হইতে এবং অবশিষ্ট এক লক্ষ পাজাব হইতে আসিয়াছে। উক্ত এক লক্ষের মধ্যে অধিকাংশই পশ্চিম পাজাবের লোক। এযাবৎ যুক্ত প্রাদেশিক গবর্নমেন্ট আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য প্রায় দুই লক্ষ ৮০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সহিত যে সাংবাদিক দল পাজাবের দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিভ্রমণ করিতেছেন, তাহাদের প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, কোন কোন স্থলে পুলিশ ও সৈন্যদল ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠনে যোগ দিয়াছে। শেখপুরায় দুই দিনে সহস্রাধিক লোক নিহত হইয়াছে। উহাদের অধিকাংশই পুলিশ ও সৈন্যের গুলীতে হইয়াছে।

নাগপুরে জনসভায় যে নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে, তাহা অমান্য করায় হিন্দু মহাসভার নেতা ডাঃ বি এস মুন্সে ও অপর ৮ জন হিন্দু মহাসভা কর্মী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

৩৬ ৫শ ৩৬

### নতুন পত্র

| বিষয়                                                 | লেখক | পৃষ্ঠা |
|-------------------------------------------------------|------|--------|
| মিক প্রসঙ্গ                                           | ...  | ...    |
| যতীন                                                  | ...  | ২৩৯    |
| জা গান্ধী—প্রমথ চৌধুরী                                | ...  | ২৪১    |
| আবশ্যক (গল্প) শ্রীকরণা বন্দ্যোপাধ্যায়                | ...  | ২৪৩    |
| ভিয়েট রাশিয়ার শিল্পকলা—শ্রীজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য | ...  | ২৪৫    |
| জিতের খাতা                                            | ...  | ২৪৬    |
| শ্রীমদ্-সংগীত-স্বরলিপি                                | ...  | ২৫১    |
| ঐদল (উপন্যাস) শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ                     | ...  | ২৫২    |
| খিবী সবার (উপন্যাস) শ্রীমবেন্দ্র ঘোষ                  | ...  | ২৫৩    |
| গলার কথা—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ                      | ...  | ২৫৮    |
| নবাব দারিহাজ                                          | ...  | ২৬৩    |
| পেট ব্যাক (গল্প) পেজো এ. ডি. এ্যালারকন্               | ...  | ...    |
| অনুবাদক—শ্রীমনোজ বসু                                  | ...  | ২৬৫    |
| শ্রীমদ্-কামা-জীবন-প্রবাহ শ্রীঅমল হোম                  | ...  | ২৭০    |
| পার ওপার                                              | ...  | ২৭৪    |
| কৃতক পরিচয়                                           | ...  | ২৭৫    |
| লোপুলা                                                | ...  | ২৭৬    |
| সোরাহীত (কবিতা)—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ                   | ...  | ২৭৭    |
| গয়গয়                                                | ...  | ২৮০    |
| প্ৰতীহক সংবাদ                                         | ...  | ২৮২    |

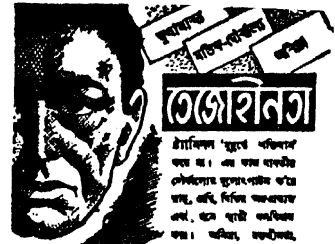
## ডায়াপেপসিন



ডায়াপেপসিন ও পেপসিন বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমিশ্রণ করিয়া ডায়াপেপসিন প্রস্তুত করা হইয়াছে। খাদ্য জীর্ণ করিতে ডায়াপেপসিন ও পেপসিন দুইটি প্রধান এবং অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। খাদ্যের সহিত চা চামচের এক চামচ পাইলে একটি বিশিষ্ট রাসায়নিক প্রক্রিয়া সৃষ্টি হয় যাহা খাদ্য জীর্ণ হইবার প্রথম অঙ্গণ। ইহার পর পাকস্থলীর কার্য অনেক লাভ হইয়া যায় এবং খাদ্যের সবটুকু সারাংশই শরীর গ্রহণ করে।

ইউনিয়ন ড্রাগ  
কলিকাতা

(১)



## তেজোহীনতা

ট্যানিকল 'হুগো' পিটার্স  
করেছে। এর সময় যখনই  
চৈতন্যের দুলালোপান ঘটে  
যায়, তখন, বিভিন্ন অলংকার  
এক, তখন যখনই কলিকাতা  
করে। অমিত্র, মল্লিক,...

অবস্থা, সুবিধাবিহীন, অত্যন্ত কষ্টকর  
করে। যখনই যখনই এক ট্রেন ও যখনই  
অলংকারের অলংকারের কলিকাতা কলিকাতা করে।  
ট্রেন যাত্রা ও ডেক জীবনের জেট আনন্দ  
করে—ট্রেনের দিগন্ত, নতুন দিগন্ত, একে কলিকাতা  
কলিকাতা কলিকাতা কলিকাতা কলিকাতা কলিকাতা  
কলিকাতা কলিকাতা কলিকাতা কলিকাতা কলিকাতা

## স্বাধীনতা

অমিত্র তেজ ও শক্তি সঙ্গের  
Dewan, J. Tan, Dewan...

## শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়ের

টিফটফটফট ও টিফটফট

পলিটিক্যাল 'স্যাটায়া', নজ্জা ও প্রবন্ধ

## তরুণের স্বপ্ন

সম্মোপযোগী রাজনৈতিক উপন্যাস  
১ম পর্ব—৩১০, ২য় পর্ব—২৫০

## চলতি নাটক-নভেল এজেন্সি

১৪৩, কলিকাতা, ১৪৩, কলিকাতা।

## এম্ব্রয়ডারী মেশিন

নতুন আবিষ্কৃত। কাপড়ের উপর  
সুতা দিয়া অতি সহজেই নানা  
প্রকার মনোরম ডিজাইনের ফুল ও  
দৃশ্যাদি তোলা যায়। মহিলা ও  
বালিকাদের খুব উপযোগী। চারিটি  
সুঁচ সহ পূর্ণাঙ্গ মেশিন—মূল্য  
৩, ডাক খরচা ১১০।

ডীন ব্রাদার্স; আলীগড়, নং ২২।

## পুরস্কার



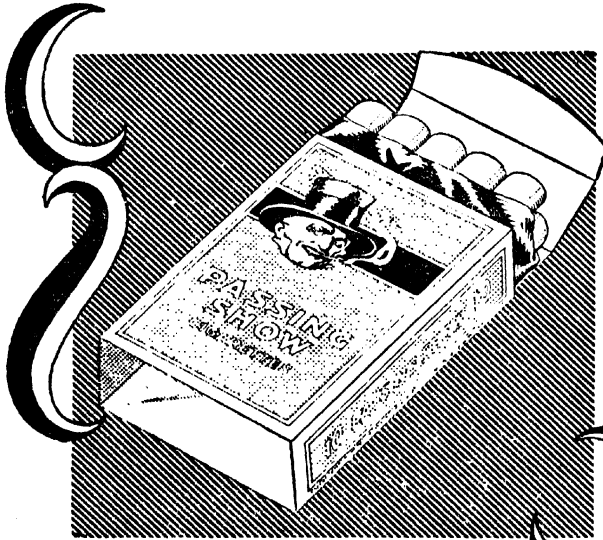
উচ্চ শ্রেণীর হাতঘড়ী  
চামড়ার ব্র্যাকেট  
প্রভৃতি পুরস্কার  
দেওয়া হইবে।  
নিয়মাবলীর জন্য  
পত্র লিখুন  
এন.পি. হাউস  
(পোষ্ট বক্স নং ১১৪৫৮)  
কলিকাতা



ধূমপানে শ্রান্তি  
নিবারণের আনন্দ  
উপভোগ করুন



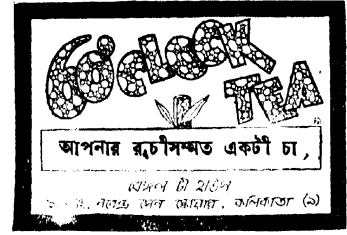
গ্রীষ্মের সময়ে ক্রান্তি অনুভব করিলে একটি  
“পাসিং শো” সিগারেট ধূমপান  
করিয়া ইহার স্নিগ্ধ ও শ্রান্তি নিবারক গুণাট  
পরীক্ষা করিয়া দেখুন।



**PASSING SHOW**

৩/০ আনায় ১০টি

PS/100



### শেষ সুযোগ!

নিয়ন্ত্রিত মূল্যের চাইতেও কম দামে এখনও  
পাওয়া যায়। যে-কোন মূল্যে ভবিষ্যতে কলম  
পাওয়া অসম্ভব হইবে; কেননা, ভারত সরকার  
বিদেশ হইতে আমদানী বাতিল করিয়াছেন।

| বিশ্ববিখ্যাত কলম                | নিয়ন্ত্রিত মূল্য | বিক্রয় মূল্য |
|---------------------------------|-------------------|---------------|
| গার্সির '৫১' গোল্ড ক্যাপ ...    | ৬৩.               | ৬১.           |
| এ '৫১' সিলভার ক্যাপ ...         | ৫০.               | ৪৮.           |
| এ রুড ডায়মন্ড ...              | ৩৭.               | ৩৬.           |
| শেফার্স গোল্ড ক্যাপ ক্রেডেট ... | ৬০.               | ৬১.           |
| এ সিলভার ক্যাপ স্টেনেল ...      | ৫০.               | ৫১.           |
| এ লাইফটাইম ডায়ালগ ...          | ৫০.               | ৫১.           |
| এ লাইফটাইম টেটসমান ...          | ৪২.               | ৪১.           |
| এ মিডিয়াম ...                  | ২৭.               | ২৬.           |
| এ জুনিয়ার ...                  | ২২.               | ২০.           |
| এভারশ্যাপ' স্ট্রীম লাইনার ...   | ১৮.               | ১৭.           |
| এ লাইফটাইম ...                  | ২৬.               | ২২.           |
| এ লাইফটাইম গোল্ড ক্যাপ ...      | ৪৫.               | ৩৬.           |
| সোয়ান সেন্স ফিলার ...          | ১৩৫.              | ১৩.           |
| এ সুপারিয়র রেগুলার ...         | ১৬.               | ১৪৫.          |
| ওয়ার্ডারমান নং ৫১৫ ...         | ২৪৫.              | ২৪.           |
| স্ট্রাটফোর্ড' রিডেন্সী ...      | ৭.                | ৬৫.           |
| এভারলাইট ...                    | ৬৫.               | ৫৫.           |

ইউ এস এ'র সস্তা মূল্যের বিভিন্ন কলম--  
অর্ডিনারী ৩৫, গোল্ড প্লেটেড নিবসহ ৫,  
সুপারিয়র ৭৫, সিলভ গোল্ড নিবসহ ৯,  
অক্সফোর্ড ক্রেডেট ১২, রেগুলার (টিউব-  
বিহীন) পেন ৫৫, সুপারিয়র ৭, টাকা।  
ডাক বায় অতিরিক্ত। সস্তা মূল্যের বিভিন্ন কলমের  
মধ্য হইতে ৬ বা ততোধিক কলম লইলে শতকরা  
১২৫ টাকা হারে কমিশন।

ইয়ং ইন্ডিয়া ওয়াচ কোং

পোস্ট বক্স ৬৭৪৪ (ডি/১), কলকাতা।

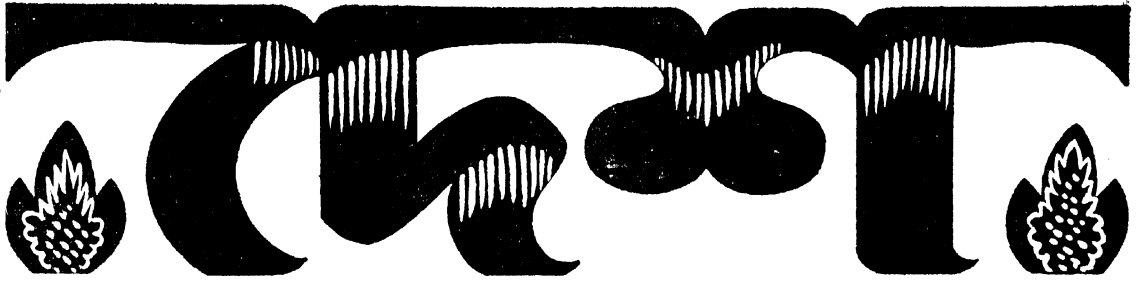
## পাকা ঢুল কাঁচা হয়

(Govt. Regd.)

কলপ ব্যবহার করিবেন না। আমাদের  
সুগন্ধিত সেন্ট্রাল মোহিনী তৈল ব্যবহার  
সাদা ঢুল পানরায় কাল হইবে এবং উহা ৬ বৎসর  
পর্যন্ত স্থায়ী হইবে। অল্প কয়েকগাছি ঢুল  
পাকিলে ২৫০ টাকা, উহা হইতে বেশী হইলে  
৩৫০ টাকা। আর মাথার সমস্ত ঢুল পাকিয়া সাদা  
হইলে ৫ টাকা মূল্যের তৈল প্রাপ্য করুন। বার্ষ  
প্রমাণিত হইলে স্বিগ্ধে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হইবে।

দর্শনরক্ষক গুণধালয়,

নং ৪৫, পোঃ কান্দীসরাই, গয়া।



সম্পাদক : শ্রীবিক্রমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

৮ চতুদশ বর্ষ।

শনিবার, ২৭শে ভাদ্র, ১৩৫৪ সাল।

Saturday, 13th September, 1947.

[৪৫শ সংখ্যা]

বীরের মৃত্যু

সমগ্র বাঙলা দেশে দুইজন বীর যুবকের মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হইয়াছে। শচীন্দ্রনাথ মিত্র এবং হুগলীর কংগ্রেস কর্মী স্মৃতিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত সাম্প্রদায়িক অশান্তিতে বীরের মৃত্যু বরণ করিয়া লইয়াছেন। শচীন্দ্রনাথের জীবন কর্মিয়া ছিল। ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি দেশের কাজে আত্মবিনিয়োগ করেন এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি অক্লান্তভাবে সেই রূত পালন করিয়া গিয়াছেন। বাঙলা দেশের ছাত্র সমাজকে তিনিই প্রথমে স্ফুটিত করেন বলা যায়, এবং স্বদেশের স্বাধীনতার তাগদায় আদেশ উদ্ভাষনে তরুণদিগকে তিনি সাধনপথ দর্শিত পরিচালিত করিয়াছেন। ১৬ই আগস্টের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সংশ্লিষ্ট অশান্তির পর হইতেই কলিকাতার জনসাধারণ ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল; বর্তমান বৎসরের ১৫ই আগস্ট সে আশঙ্কা দূর হয়; কিন্তু ১লা সেপ্টেম্বর আকস্মিক বিক্ষোভে সে আশঙ্কার পুনরায় সূচনা হইলে শচীন্দ্রনাথ সর্বাঙ্গিক বিপজ্জনক অঙ্গলের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ৩ জন সংগীসহ ছুটিয়া যান। বলা বাহুল্য, শচীন্দ্রনাথ ভয়ের নিকট আত্মসমর্পণ করেন নাই। জীবনে ভয় কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না; কংগ্রেসের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা তিনি সর্বত্র অকুতোভয়ে বহন করিয়াছেন। কিভাবে বীরের মৃত্যু বরণ করিতে হয়, শচীন্দ্রনাথ নিজের জীবন দিয়া তাহা দেখাইয়া গেলেন। শচীন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদ গান্ধীজীর নিকট পৌঁছিলে, তিনি এমন মৃত্যুকে অভিনন্দিত করেন এবং শচীন্দ্রনাথের সুযোগ্য সহধর্মিণী শ্রীমতী অংশুদেবীকে শোক করিতে নিষেধ করেন; বস্তুতঃ শচীন্দ্রনাথের মৃত্যু সাধারণ মানুষের ন্যায় নহে। তিনি মৃত্যুর ভিতর দিয়া অমৃতফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপ বীরের মৃত্যুতে শোক করিতে নাই; কিন্তু আমরা সে সত্যকে

সামগ্রিক

স্বীকার করিয়া লইয়াও সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিতেছি না। শচীন্দ্রনাথ এবং স্মৃতিশচন্দ্র এই বিজ্ঞান সেবনা জাতিকে প্রাণ সাধনায় প্রণোদিত করিবে এবং মৃত্যুর জয় করিতে আমাদের অন্তরে প্রেরণা সঞ্চার করিবে, ইহাই আমাদের একমাত্র সান্নিধ্য। শচীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস সাহিত্য সম্মেলন তাহার অমর কীর্তি ঘোষণা করিবে এবং স্বদেশ প্রেমের জ্বলন্ত আদর্শের প্রেরণায় এদেশের সকল স্বার্থ সংরক্ষিতা প্লেটিন বিদূরিত করিবে, ইহাই আমাদের ভরসা। দেশমাতৃকা শচীন্দ্রনাথ এবং স্মৃতিশচন্দ্রের ললাটে রক্ত তিলক পরাইয়া দিয়াছেন, সে তিলক লেখা চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে এবং যেরূপে কোন সন্দেহ নাই। শচীন্দ্রনাথ এবং স্মৃতিশচন্দ্রের ন্যায় বীর যুবকদের আয়তনের ভিতর দিয়াই প্রত্যেক দেশ এবং জাতির অক্লান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, এমন মৃত্যুঞ্জয়ী বীর সাধকদিগকে লাভ করিয়া দেশ এবং জাতি ধনা হয়। শচীন্দ্রনাথ ও স্মৃতিশচন্দ্রের ন্যায় সন্তান পাইয়া বঙ্গ-জননীও ধনা হইয়াছেন। এই সঙ্গে কলিকাতায় শান্তি প্রতিষ্ঠার মহান উদ্দেশ্যে অন্যতম আত্মদাতা বালক বীরেশ্বর ঘোষের কথাও আমরা ভুলিতে পারিতেছি না। তাহার আত্মীয়-স্বজনকে প্রবোধদানের ভাষা আমাদের নাই। তাঁহাদের শোক আজ সমস্ত জাতির শোকে পরিণত হইয়াছে। আমরা এই কথা বলিয়াই তাঁহাদিগকে সান্নিধ্য দিব। মহান আদর্শে আত্মদানের যে অনল শিখা ইহারা জ্বালাইয়া গেলেন, তাহা নিভিবে না, জাতির অগ্রগতির পথের অনর্থক দগ্ধ করিয়া সে আগুন অভিনব উদ্দীপনায় প্রজ্জ্বলিত থাকিবে।

ভবিষ্যতের নির্দেশ

কলিকাতায় শান্তি প্রতিষ্ঠার সুমহান রত উদ্ভাষন করিয়া মহাত্মা গান্ধী গত ৭ই সেপ্টেম্বর পাল্লাব যাত্রা করেন। তাগদায় জীবনের একটা ঐন্দ্রজালিক প্রভাব অবশ্যই আছে। তাহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। গান্ধীজীর চরিত্রের সেই অসামান্য ঔদার্যময় প্রভাব যে কলিকাতার শান্তি প্রতিষ্ঠার মূলে অব্যর্থভাবে কাজ করিয়াছে, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। গান্ধীজী বাঙলা দেশে তাগ করিবার পূর্বে আমাদিগকে ভবিষ্যতের কর্তব্যের প্রতি অবহিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই প্রকাশ করিয়াছেন যে, কলিকাতায় শান্তি যদি পুনরায় বিপর্যস্ত হয় এবং এখানে নরযাতক গুণ্ডাদের দৌরাভা দেখা দেয়, তবে প্রয়োপবেশনে দেহ তাগ করা ছাড়া তাঁহার পক্ষে অন্য কোন উপায় থাকিবে না। এরূপ ক্ষেত্রে কলিকাতার পৌরজনের উপর অতীত কর্তব্য আপতিত হইয়াছে। শহরে বর্তমান শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে; কিন্তু সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য আমাদিগকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। সমাজ জীবনের স্বাভাবিক প্রাণবৃত্তিকে পরাভূত করিয়া পশুপ্রবৃত্তি যদি একবার জাগিয়া উঠে, তবে সহজে তাহা নিঃশেষে সংহত হয় না। আমাদিগকে একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, কলিকাতায় এই সব দাণ্ডা শূদ্ধ আকস্মিক উন্মত্ততা হইতে ঘটে নাই; ইহার মূলে দূরভিত্তিক-পূর্ণ চক্রান্ত জাল ছিল। এই সব চক্রান্তকারী অনর্থক চক্রজালে সমগ্র শহরের শান্তি বিপর্যস্ত করিয়া নিজেদের পশু প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিয়াছে। ইহারা যে একেবারে নিরস্ত হইয়াছে, এরূপ কথা এখনও সাহসের সঙ্গে বলা যাইতেছে না। সুতরাং সমগ্র শহরের শূভবৃত্তিকে আজ জাগ্রত রাখিতে হইবে। এই এক বৎসরে আমরা

দেখিয়াছি শহরের কোন অংশের একটা সামান্য ঘটনাকে উপলব্ধি করিয়া অশান্তি ছড়াইয়া পড়ে; ইহাতে বোঝা যায় ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের যড়যন্ত্রকারীদের নিজেদের দল রহিয়াছে এবং ইংগিত পাইলে তাহারা একযোগে সাড়া দেয়। ভবিষ্যতে তাহারা যাহাতে এইভাবে অনর্থ সৃষ্টি না করিতে পারে, সেজন্য শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মীবৃন্দকে জাগ্রত থাকিতে হইবে এবং অনর্থক আতঙ্ক দূর করিয়া সমাজের নৈতিক চেতনাকে প্রখর রাখিতে হইবে। বিগত কয়েক সপ্তাহের ব্যাপারে এ সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, শহরের সাধারণ লোক অশান্তি ও উপদ্রব সমর্থন করে না এবং তাহারা এই অশান্তির জন্য দায়ীও নহে। জনগণের এই শুভবুদ্ধিকে বলিষ্ঠ কর্মপ্রেরণায় প্রণোদিত করিলে শহরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং গান্ধীজীর প্রতি আমাদের কর্তব্য সেই পথে প্রতিপালিত হইবে।

#### বাঙলার দায়িত্ব

গান্ধীজী কলিকাতায় শান্তি প্রতিষ্ঠার কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া নোয়াখালি যাইবেন, এইরূপ কথা ছিল; কিন্তু পাজাবের ব্যাপক অশান্তিতে অরাজকতার জন্য তাহার পূর্ব নির্ধারিত কর্মতালিকার পরিবর্তন সাধন করিতে হয়। গান্ধীজী পাজাবে পেণ্ডিচার পূর্বেই দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়। কিন্তু নোয়াখালির কথা গান্ধীজী বিস্মৃত হন নাই। তিনি পাজাব রওনা হইবার পূর্বে নোয়াখালির বিপন্ন জনগণের সাহায্য দান এবং পুনর্বাসিত কাজের দিকে পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, তাহার এই অনুরোধ সম্যকভাবে প্রতিপালিত হইবে এবং পূর্ব বা পশ্চিম বাঙলার কোন অঞ্চলেই সাম্প্রদায়িক অশান্তির বিভীষিকা সৃষ্টি হইবে না; বস্তুতঃ বাঙলা দেশ, বিশেষভাবে কলিকাতার শান্তির উপরই পাজাব এবং অন্যান্য স্থানের অবস্থা অনেকখানি নির্ভর করিতেছে, গান্ধীজীর ইহাই বিশ্বাস। এমন বিশ্বাস করিবার প্রকৃত কারণও রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, বর্তমান ভারতের সকল সমস্যার উপাদান সূত্রস্বরূপে বাঙলা দেশে, বিশেষ ভাবে কলিকাতা সহরে রহিয়াছে। শূদ্র তাহাই নয়, প্রাণপূর্ণ সংবেদনশীলতা বাঙালী জাতির সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাঙলা দেশে যদি কোন মহাদর্শের ভাব জাগ্রত হয়, তবে আত্মাত্মিক ঔদার্য এবং একান্ত সংবেদনশীল অবদানের পথে তাহা সমগ্র ভারতে সম্প্রসারিত হইয়া থাকে। ভাবভূমি এই বাঙলা; কিন্তু বৃহৎ আদর্শের মূলীভূত ভাবকে সমাজ-জীবনে কিরূপে প্রত্যাবল্লিত করিতে হয়, বাঙালী তাহাও জানে; বস্তুতঃ বাঙলার

সংস্কৃতিগত অবদানের সেই প্রত্যক্ষ প্রভাব সমগ্র ভারতের আত্মাভিযাত্রির মূলে অমোঘ-রূপে কাজ করিয়াছে। এই জনাই আমরা এই আশা করিতেছি যে, বাঙলার প্রাণকেন্দ্রকে মানবতার প্রখর বেদনায় স্পর্শ করিয়া গান্ধীজী যে ঐন্দ্রজালিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, পাজাব এবং দিল্লীর উপরও তাহার প্রভাব পরিলক্ষিত হইবে এবং ভারতের সর্বত্র শান্তি ফিরিয়া আসিবে।

#### পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষের ছায়া

চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালির বন্যা-পীড়িতদের দুর্দশার এখনও নিরসন ঘটে নাই। এ অঞ্চলের দশ লক্ষের অধিক নরনারী আজও বিপন্ন এবং নিরাশ্রয়। এই সংগে পূর্ববঙ্গের নানা-স্থান হইতে চাউলের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কোন কোন স্থানে এই মূল্য ২০ টাকা হইতে একেবারে ৫০ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছে এবং স্থানে স্থানে চাউল একেবারে দুস্প্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে এজন্য আশংকা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সিন্ধু ও পশ্চিম পাজাব হইতে যে পরিমাণ খাদ্যস্যা পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল, সাম্প্রদায়িক অশান্তি এবং রেলপথের অসুবিধার জন্য সে আশা সফল হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে, মোটামুটিভাবে সমগ্র ভারত বর্তমানে নিদারুণ খাদ্যসঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের সমস্যা আমাদের বিশেষভাবে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। বলা বাহুল্য, গ্রিশ চল্লিশ টাকা মণ দরে চাউল কিনিবার ক্ষমতা প্রদেশের অধিকাংশ লোকেরই নাই। ইহার মধোই অনেক স্থানের লোকেরা নানারূপে অথবা কুখাদ্য খাইয়া উদর পূরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহার ফলে নানারূপ ব্যাধি পীড়াতে বাঙলার পল্লী অঞ্চল অভিদ্রুত হইবে। ১৯৪০ সালের ব্যাপক দুর্ভিক্ষের স্মৃতি বাঙলার অন্তর হইতে এখনও বিলুপ্ত হয় নাই; পুনরায় যদি তেমন অন্নসংকট দেখা দেয়, তবে আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতার কোন মূল্য থাকিবে না। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা লাভের ফলে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-দুর্দশার যদি প্রতিকার সাধিত না হয়, তবে এ দেশের জনসাধারণের দৃষ্টিতে স্বাধীনতার কোন সার্থকতা থাকে না। আমরা আশা করি, পূর্ববঙ্গের গভর্নমেন্ট আসন্ন এই খাদ্য সংকটের প্রতীকারের জন্য সবপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

#### সমোগ্য নিয়োগ

ভারত বিভাগের ফলে আশ্রয়প্রার্থীদের সমস্যা বর্তমানে জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। পশ্চিম পাজাবেয় সহস্র সহস্র

নরনারী উপদ্রুত অঞ্চল হইতে ঘরবাড়ী ছাড়িয়া ভারতীয় যন্ত্ররাজ্যে আসিতেছে। ইহাদের খাদ্য এবং আবাসের সংস্থানের প্রশ্ন সামান্য নয়। এক দিল্লীতেই পশ্চিম পাজাব হইতে দুই লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী সমবেত হইয়াছে। ভারতীয় যন্ত্ররাজ্য গভর্নমেন্টের স্বাস্থ্য বিভাগের নেত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর সম্প্রতি এই সমস্যার আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, জগতের অন্য কোন দেশে এপর্যন্ত আশ্রয়প্রার্থীদের লইয়া এইরূপ ব্যাপক এবং জটিল প্রশ্ন দেখা দেয় নাই। সুখের বিষয়, ভারতীয় যন্ত্ররাজ্যের গভর্নমেন্ট এই সমস্যার সমাধানের জন্য তৎপরতার সংগে রত হইয়াছেন। এজন্য

#### রবীন্দ্র-সংগীত-স্বরলিপি

রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষার জন্য ঔৎসুক্য দেশে যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে বর্তমান অবস্থায় তদনুপাতিক স্রব্রতার সহিত স্বরলিপি-গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব নয় বলিয়া, বিশ্বভারতী বিভিন্ন সাময়িক পত্রে রবীন্দ্র-সংগীত-স্বরলিপি প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। বিশ্বভারতী কর্তৃক নিযুক্ত স্বরলিপি-সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া এই স্বরলিপিগুলি প্রকাশিত হইবে। —দেশ পরিচয়ও ভবিষ্যতে এইরূপ স্বরলিপি নিয়মিত প্রকাশিত হইবে। —গত ২৩শে শ্রাবণ সংখ্যায় ইতিপূর্বে একটি স্বরলিপি প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংখ্যায় ২৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। —সম্পাদক, দেশ।

তাঁহার একটি নূতন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলালের অনুরোধে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী যন্ত্ররাজ্যের মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্যরূপে এই বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শাসন-ব্যবস্থার অতি দুরূহ বিষয়েও শ্রীযুক্ত নিয়োগীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অবিসংবাদিত। তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তির পরিচালনাধীনে ভারত গভর্নমেন্টের এই বিভাগের কাজ সম্ভাবজনকরূপে অগ্রসর হইবে, সন্দেহই এই আশা করিবেন। আমরা শ্রীযুক্ত নিয়োগীর এই নব নিয়োগে তাঁহাকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

#### চোরাজারার দমনে দৃষ্টি

অসামরিক সরবরাহ বিভাগের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার উদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গের গভর্নমেন্ট মিঃ আবদুল্লাহর নেতৃত্বে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের প্রত্যেক জেলায় এই বিভাগের শাখা থাকিবে এবং ভারপ্রাপ্ত অফিসারগণ সতর্কতার সংগে সরবরাহ বিভাগের কাজে কোথায়ও কোন ত্রুটি ঘটিতেছে কিনা, দৃষ্টিতে প্রসন্ন পাইতেছে কিনা তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। পূর্ববঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলের এই ব্যবস্থা খুবই সমরোপযোগী হইয়াছে।

## বাঘা যতীন



যতীনন্দনাথ

কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে একদিন পাণ্ডবজনা ধ্বনিত হইয়াছিল। নরনারায়ণ কার্পণ্য-ক্লিষ্ট অর্জুনকে সম্বোধন করিয়া সমগ্র জগৎকে তাঁহার বীর্যময়ী বাণীতে অনুপ্রাণিত করিয়া বলিয়াছিলেন,—ওঠো, জাগো, দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। ধর্মবিশ্বের জন্য প্রস্তুত হও। হিংসা বা অহিংসা তোমার বিচারের বিষয় নয়। হিংসা ও অহিংসার উদ্দেশ্যে জগৎগুরু আমি, আমার কল্যাণমূর্তির অনুধ্যানে তৎপর হও, আমার নিদেশে মানব-কল্যাণের মহাবল্লভ আপনাকে উৎসর্গ কর। যুগ যুগ ধরিয়া ভারতের ধর্ম-স্থলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই আহ্বান স্পন্দন তুলিয়াছে; কিন্তু আত্ম নিবেদনের উদ্দাম ছন্দে তাহা বৈশ্বলিক আবর্ত তুলিতে পারে নাই। গীতার প্রাণময় পরম দেবতাকে হৃদয়ের রক্ত-পদ্ম অর্ঘ্য উপহার দিয়া সাধক ভক্ত পূজা করিতে পারে নাই, আগুন জ্বলিয়া উঠে নাই। ভারতের অন্তর শতদল পরমবলে প্রক্ষুটিত হইতে চাহিয়াছে, কিন্তু সনাতন-বেদনার প্রত্যক্ষ চেষ্টার অভাবে সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছে।

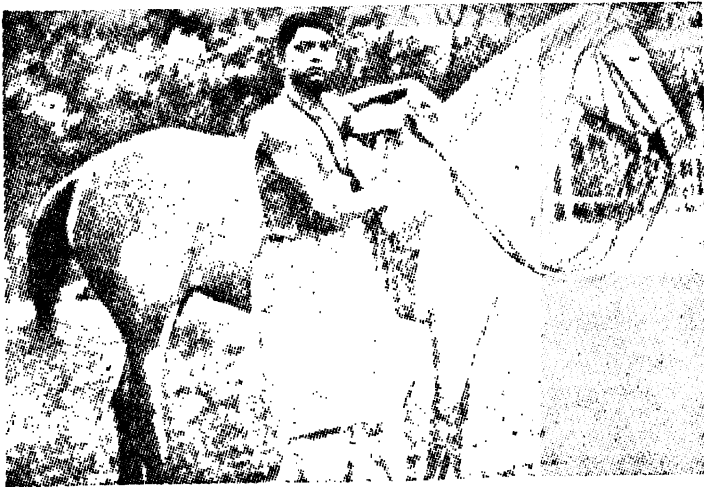
৩২ বৎসর পূর্বে কর্মযোগী যতীনন্দনাথের বীর্যময় আত্মদানের প্রবল এবং প্রখর মাধুর্যে ভারতের যুগোত্তর পরাধীনতাজনিত অবীর্য দংশীভূত হয়। এই মহাপুরুষের অন্তর বীণায় গীতার বীর্যময়ী বাণী সর্বভাগের উদারছন্দে ঝঙ্কার তোলে। যতীনন্দনাথ ভোলাগিরি মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীশ্রীমহাশয়

দেবের পার্যদগণের পূণ্য প্রভাব তাঁহার জীবনে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ তিনি লাভ করিয়াছিলেন। গুরুশক্তি তাঁহাকে অমৃতত্ব-সাধনার অগ্নিময় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে। যতীনন্দনাথ তাঁহার চারজন সংগীসহ বালেশ্বরের উপকণ্ঠবর্তী জঙ্গলে প্রবল ব্রিটিশ শক্তির সহিত সংগ্রামে আত্মদান করেন। তাঁহার সেই আত্মোৎসর্গের প্রোঞ্চদুল মহিমায় জগতের প্রবল সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশও স্তম্ভিত হয়। তাহারা বুদ্ধিতে পারে—ভারতের মানব জাগিয়াছে। এবার পালে সতাই বাঘ পড়িয়াছে।

যতীনন্দনাথ বীর ছিলেন; কিন্তু বীরত্বই তাঁহার জীবনের বড় কথা নয়। তিনি মানব-জীবনের মূলীভূত পরম সত্যের সম্মান পাইয়াছিলেন; জীবনকে আহুতি দিয়া কেমন করিয়া জীবনের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, সেই অধ্যাত্মতত্ত্ব তাঁহার অন্তরে উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। যতীনন্দনাথের বীরত্বের মূলীভূত প্রাণবন্ততার সেইখানেই ছিল প্রতিষ্ঠা। অব্যয় অমর্তে যে সনাতন সত্য বিধৃত রহিয়াছে, যতীনন্দনাথ জীবন দিয়া বাঙলার অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের সেই মৃত্যুঞ্জয়ী মহিমাকে উদ্দীপ্ত করেন। তাঁহার সাধনায় জাতি ভারতের আত্মার অনাহত ছন্দো-ময় ও আনন্দময় আহ্বান শ্রুতিতে পার্য এবং সেই আহ্বানের আত্মীয়তাময় অনুভূতিতে, নিজকে আহুতিদানের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠে।

এ উন্মাদনাকে কেহ রুদ্ধ করিতে পারে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বলবীর্যও যতীনন্দনাথের আত্মাহুতিতে উদ্দীপ্ত হোমানল শিখায় পরিশেষে দগ্ধ হইয়া যায়। পরানুগ্রহের দুর্বলতার উদ্দেশ্যে আত্মার এই পরম মহিমা সমগ্র জাতির স্বাধীনতার সাধনার গতিককে বৈশ্বলিক পথে প্রবর্তিত করে। নরনারায়ণের শব্দ সঘন হৃৎকার তুলিতে থাকে। যতীনন্দনাথ গীতার যজ্ঞধর্মকে ভারতের রাষ্ট্র-জীবনে জাগ্রত করেন।

যতীনন্দনাথ প্রকৃত কর্মযোগী ছিলেন। তাঁহার সহিত যিনি কোন দিন কোনভাবে সংশ্লিষ্ট হইতে সুযোগলাভ করিয়াছেন, তিনিই এই বীর্যময় পুরুষের ঔদার্যে মাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়াছেন। যতীনন্দনাথের জীবন একাধারে স্নেহে অত্যন্ত কোমল এবং কর্তব্য সাধনে বজ্রাঙ্গ কঠোর ছিল। সহিষ্ণুতা, ক্ষমা এবং তিতিক্ষার তিনি মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন। সমষ্টির স্বার্থ তাঁহাকে সর্বদা কর্মময় সাধনায় প্রবোধিত করিয়াছে; কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত স্বার্থহানির জন্য তিনি কোনদিন কাহারও উপর রুষ্ট হন নাই। নিন্দা এবং প্রশংসায় তিনি সমানভাবে অবিচলিত ছিলেন। সেবা এবং মানবপ্রেম তাঁহার সুদৃঢ় মনোবলকে মধ্যম করিয়াছিল। মানবোচিত গৃহস্বামী যতীনন্দনাথের জীবনে এমন সংগতিলাভ করিয়াছিল যে, যিনি তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট হইতেন তিনিই তাঁহার চরিত্র-মাধুর্যে আকৃষ্ট হইতেন। এইখানেই যতীনন্দনাথের চরিত্রে স্বাতন্ত্র্যতার বিকাশ লক্ষিত হয়। তাঁহার চরিত্র প্রেমের বলে প্রকাশক এবং স্নেহময় ছিল বলিয়াই সকলে সে চরিত্রের সংস্পর্শে মুগ্ধ



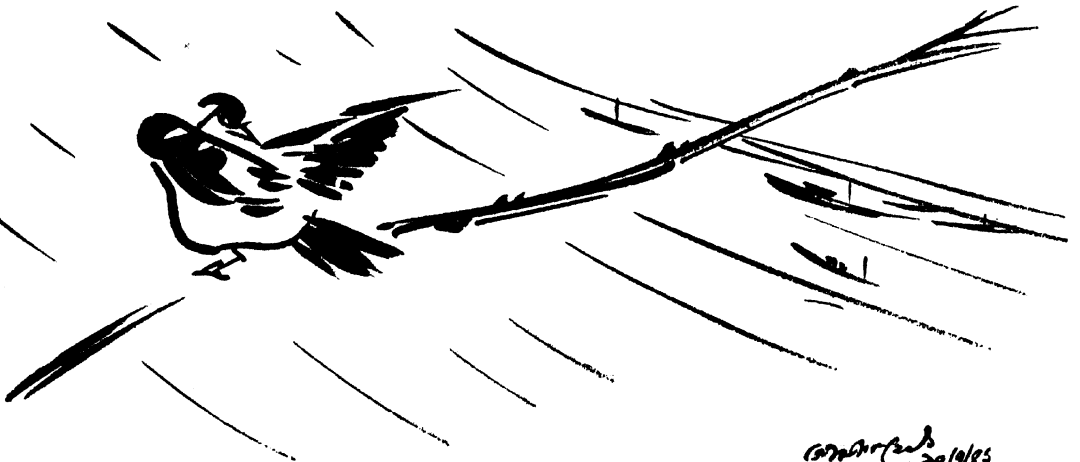
যতীনন্দনাথ ও তাঁহার ঘোড়া (১৫ বৎসর বয়সে)

হইতেন। তাঁহার বীৰ্যময় সাধনার ভিতর দিয়া রাজসিকতার একটা ভাব সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে; কিন্তু স্বাভিকতারই তাহা সঞ্চারীভাব। বস্তুত যতীন্দ্রনাথের অহংকারের মূলে ব্যক্তিগত কামনা বাসনার লেশমাত্র ছিল না; বহুতের সেবার প্রেরণাই তাহার মূলে ছিল। তাঁহার কর্মের মূলে প্রেমেরই তাপ ছিল। সমগ্রের জন্য এই তাপই, প্রকৃত সুখের ভিত্তি। যতীন্দ্রনাথ এই সুখের সূত্র নিজের অন্তরে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার জীবন ভাবময় ছিল এবং তিনি তাঁহার চরিত্রে একটা অনন্যসাধারণ প্রভাব লাভ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বের মূলে এই প্রভাবই কাজ করিয়াছে। নেতৃত্বের এমন ক্ষমতা সকলের থাকে না। যতীন্দ্রনাথ নেতৃত্ব করিবার সকল গুণ লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি জীবনদানে সাধনার মত প্রজ্ঞানময় সংগতি ভিতরে পাইয়াছিলেন, এইজন্যই অপরকেও জীবনদানে প্ররোচিত করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছেন। স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় বলিতেন, যতীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে যে আসিয়াছে, সেই সোনা হইয়াছে। যতীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যময় জীবনের সব কথা বলিবার সময় ইহা নয়; বিশেষত, সব খুঁটিনাটি ধরিয়া তাঁহার ন্যায় প্রাণবান পুরুষের জীবনের বৈশিষ্ট্য বিচার করা চলে না। মহাপ্রাণ যাঁহারা, তাঁহারা অখণ্ডভাবে প্রত্যক্ষ সংবেদনে আমাদের মনোজগতে জাগ্রত হইয়া থাকেন এবং অবিতর্ক মহিমায় আমাদের আকর্ষণ করেন। ইহারা জাতির নেতা, প্রাণময় এবং মনোময় এমন পুরুষদের ঔদার্যময় ইঙ্গিতেই জাতি সভ্যতার পথে পরিচালিত হয়। ইহারা উপদেশের স্তর অতিক্রম করিয়া সর্বভাগে জাতির আত্মার উদ্বেগধন সাধন করেন। এই হিসাবে যতীন্দ্রনাথ আমাদের গুরু। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামে যে যুবক

একদিন সরকারী আফিসে সাধারণ চাকুরিয়ার জীবন যাপন করিতেন, তাঁহার অন্তরে সর্বগ্রাসী বিপ্লবের বীজস্বরূপ বাহ্যিকণা কি ভাবে কাজ করিতেছিল, বাঙলা দেশের খুব কম লোকেই সে সন্ধান রাখিত। কিন্তু সর্বস্ব ভাগের দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধির আগুন স্তিমিত থাকিবার নয়, আধারকে দগ্ধ করিয়া সে আগুন ব্যাধি হইতে সমাধি মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। বাঙলার অগ্নিস্থলের প্রথম বিপ্লবী দল ধৃত এবং নির্বাসিত হইবার পর যতীন্দ্রনাথ তাঁহার কয়েকজন সংগী সহ বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মরণকে তুচ্ছ করিবার প্রেরণা যতীন্দ্রনাথের সাংগগণ জাতির অন্তরে জাগ্রত করিয়া তোলেন। সাম্রাজ্যবাদীদের গুপ্তচরদল এই দলের প্রচেষ্টায় সন্ত্রস্ত হয়। বাঙলার বৈপ্লবিক সাধনায় বীৰ্যময় আত্মদানের আবেগ বিভগ্নী খেলিতে থাকে। শোণিত উৎসর্গের আগ্রহপূর্ণ পরম সমারোহে জাতির অগ্রগতি চলিতে থাকে; এবং সমগ্র ভারতে তাঁহার প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস উথিত হয়। ঘটনার হিসাবে এই বেদনার সম্পূর্ণ বিচার করা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ যতীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার অনুগত কর্মীদের সাধনা ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনের মূলে স্থায়ীভাবে একটা বলিষ্ঠ শক্তি সঞ্চার করে। প্রকৃতপক্ষে এই ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়াই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পরবর্তী বিভিন্ন আন্দোলন শক্তিশাল্য করিতে সমর্থ হয়। অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, বাহ্যার কথাই ধরা যাউক না কেন, মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিবার শক্তি এবং অভয় সে সকলের শক্তিমূলেই কাজ করিয়াছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ আন্দোলন যতীন্দ্রনাথের সাধনায় অকুরিত বীজেরই অভিব্যক্তি। যতীন্দ্রনাথ অভীঃ মন্ত্রে জাতিকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। নাইলে কোন আন্দোলনই

সাধকতা লাভ করিতে পারিত না; রাজনীতির সময়োপযোগী চাতুর্য এবং নৈতিক সূক্ষ্ম বিচার সবই প্রাণশক্তির অভাবে সংকুচিত হইয়া পড়িত; শূদ্ধ কৌশলপূর্ণ বাক্যবিভূতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সুদীর্ঘকালের ভিত্তি টলাইতে পারিত না।

ভারত আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। বালেশ্বরে একদিন দুর্গম সমুদ্রের উপকূল ভাগে যতীন্দ্রনাথ জার্মানদের প্রেরিত অস্ত্রশস্ত্রের জন পতীক্ষায় ছিলেন। জার্মানদের অস্ত্রবাহী জাহাজ সেখানে পেঁচািতে পারে নাই। বাঙলার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্টের অধীনস্থ বাহিনীর সহিত সম্মুখ সংগ্রামে যতীন্দ্রনাথ গুলীর আঘাতে মারাত্মক ভাবে আহত হন, তাঁহার অন্যতম সংগী চিত্তপ্রিয় রায় আহত অবস্থায় নেতার অনুগামী হইয়া মৃত্যুতে বরণ করেন। নীরেন, মনোরঞ্জন এবং যতীশচন্দ্র বন্দী হন। এই হিসাবে যতীন্দ্রনাথের তৎকালীন পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। কিন্তু সাময়িক এই ব্যর্থতা বড় কথা নয়, প্রকৃতপক্ষে যতীন্দ্রনাথের সাধনা ব্যর্থ হয় নাই। জার্মানদের অস্ত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের উপর আঘাত হানিতে পারে নাই; কিন্তু যতীন্দ্রনাথের অমর আত্মোৎসর্গের অনলশিখায় তাহারা দগ্ধ হইয়াছে। বড়ি বাল্যায়ের তীরে প্রতীত পরাজয়ের ভিতর দিয়া যতীন্দ্রনাথ অপরাজেয় রহিয়া গিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা লাভে প্রকৃতপক্ষে যতীন্দ্রনাথ জয়যুক্ত হইয়াছেন। এ জয় শূদ্ধ রাজনীতিক সূত্র বা মতবাদের জয় নয়, এ জয় মৃত্যুর কৃষ্ণধূমে অবিশ্ব এবং অপরিচ্ছন্ন ও সিম্ধ জ্যোতির্ময় আত্মার জয়। আমরা আজ মৃত্যুর পরপারে আধিষ্ঠিত যতীন্দ্রনাথের সেই অমর আত্মার বন্দনা করিতেছি।



২০/৭/৫৩

# মহাত্মা গান্ধী

## প্রমত্ত জৈলী

নন-কো-অপারেশন সম্বন্ধে আমাদের ভিতর মতের অমিল থাকলেও, মহাত্মা গান্ধীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আজকের দিনে আমরা সবাই একমত। এ কথা যে অন্তত আমার মুখে শুধু কথার কথা নয়, তাই প্রমাণ করবার জন্য আমার মতে তাঁর মাহাত্ম্য যে কোথায় তা পরিষ্কার করে বলবার চেষ্টা করব।

মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রবল অসাধারণ। এই চরিত্র কথাটা নানা লোকে নানা অর্থে বোঝে। সুতরাং তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব কোথায়, সেইটেই হতে চেষ্টা করা।

ইংরাজিতে যাকে বলে asceticism, তার প্রতি আমার একটা সহজ শ্রদ্ধা আছে। কাব্য বসনকে আমি দেখবামাত্র উচ্চ আসন দিই। কিন্তু তাই বলে যিনি শারীরিক ক্রেশ সম্বন্ধে উদাসীন, আর যিনি শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বর্জন করেছেন, তাঁকেই আমি মহাপুরুষ বলতে প্রস্তুত নই। কেনে যে নই, তার উত্তর গীতার এই শ্লোকের পাবনে।

“বিষয়া বিবিন্ধতন্তে নিরাহারসা দেহিনঃ।

ব্রহ্মজ্ঞং ব্রহ্মোপাস্য পরং বৃট্টা নিবর্ততে॥

মহাত্মা আবার ধর্ম নেহের নয়, সুতরাং আমার কাছে মহাত্মা গান্ধীর মাহাত্ম্যের সঙ্গে উপাস্যাদির বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নেই। মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রে আমি এই কটি অসাধারণ গুণ দর্শিতে পাই। তিনি সম্পূর্ণ নিভীক; সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ; কথায় এবং কাজে তিনি সম্পূর্ণ অকপট এবং সম্পূর্ণ সংযত, তাঁহার নিভীকতা আর পরার্থপরতা সম্বন্ধে সকলেই একমত। সুতরাং এ বিষয়ে বেশী কিছু বলবার প্রয়োজন নেই। মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতার ভাষা যে কতদূর স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন, সকলে তা লক্ষ্য করেছেন কিনা জানিনে। এ ভাষায় কোন আড়ম্বর নেই, কোনও অলঙ্কার নেই, কোনও বাহুল্য নেই, কোনও অত্যাধিক নেই; তাঁর এ ভাষা যেমন সংযত তেমনি শক্তিশালী। এর কারণ ভাষায় তাঁর মনের নমনরূপ লোকের চোখের সূক্ষ্মত্ব তিনি ধরে দেন। তাঁর ভাষার শক্তি ও রূপের পিছনে আছে তাঁর চরিত্র। সম্পূর্ণ অকপট হতে পারলে মানুষের ভাষা যে কি অসাধারণ প্রসাদ-পূর্ণ লাভ করে, তার পরিচয় মহাত্মা গান্ধীর ভাষা, যদিচ সে ভাষা তাঁর মাতৃভাষা নয়, একটি বিদেশী ভাষা। আমি তাঁর ভাষার উল্লেখ

করলাম তাঁর চরিত্রের একটা গুণ দেখাবার জন্য। তাঁর বক্তৃতার সাহিত্যিক গুণের পরিচয় দেবার জন্য নয়। আমরা যাকে স্টাইল বলি, সেটা যে মনের গুণ, ভাষার গুণ নয়, মহাত্মা গান্ধীর ভাষা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নন-কো-অপারেশন ব্যাপারের প্রধান বল হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রবল। এ প্রোগ্রাম যদি অপর কেউ সৃষ্টি করতেন, তাহলে তার জন্ম মৃত্যু সে একই তারিখে হত, সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনই সন্দেহ নেই।

লৌকিক মনের উপর মহাত্মা গান্ধীর যে অলৌকিক প্রভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে, তাকে ঐন্দ্রজালিক বললে অত্যাধিক হয় না এবং একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় যে, এ ম্যাজিক হচ্ছে তাঁর চরিত্রবলের মন্ত্রশক্তি।

মহাত্মা গান্ধীর নিভীকতা ও পরার্থপরতা সম্বন্ধে আমার মনে কখনো তিলমাত্র সন্দেহ স্থান পায়নি। তবে তাঁর মুখের কথা যে, পুরোপুরি তাঁর মনের কথা, এ কিংবাস আমার বরাবর ছিল না। আমার মনে এ সন্দেহ পূর্বে হয়েছে যে, হয়ত তিনি তাঁর মনের কথা সম্পূর্ণ খুলে বলেন নি। রাজনীতির সঙ্গে কট-নীতির যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে ও নীতিতে উদ্দেশ্য যে তার উপায়কে পুত করে আবহমান কালের ইতিহাস তার প্রমাণ দেয়। অতএব পলিটিকশিয়ানদের কথা যে সম্পূর্ণ সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ মানুষের মনে সহজেই জন্মে। তারপর অসংখ্য নন-কো-অপারেশন ভণ্ডদের মুখে অগণাবার শুনিয়ে যে, একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, মহাত্মা গান্ধীর কথা সাদাভাবে বোঝা না বোঝারই সামিল এবং এইসব ভাষ্যকাররা তাঁর কথার নানা গঢ় ও কট অর্থ আমাকে শুনিয়েছেন।

আদালতে তাঁর বিচারের সময় তাঁর কথা ও তাঁর ব্যবহার আমার মন থেকে চিরদিনের জন্য সন্দেহ দূর করেছে। তাঁর কথা যে সম্পূর্ণ অকপট, এ বিচারক্ষেত্রেই তা প্রমাণ হয়ে গেছে। যেমন কোন কবির প্রতিভা, তাঁর রচিত নানা কাব্যের ভিতর কোনও একখানি বিশেষ কাব্য সম্পূর্ণ প্রক্ষুটিত হয়ে ওঠে, তেমনি উক্ত বিচারস্থলেই মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রের সৌন্দর্য ও শক্তি সম্পূর্ণ ব্যস্ত হয়েছে। নিভীকতায়, সরলতায়, সংযমে ও সৌজন্যে ও ক্ষেত্র তাঁর

আত্মোক্তি—আমার কাছে একটি work of art স্বরূপে গণ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটি মহাপুরুষের, সফ্রেটিসের, বিচারের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, আর সে বিবরণ আজ তিন হাজার বৎসর ধরে মানুষের মনকে মুগ্ধ ও তুষ্ট করে আসছে। মহাত্মা গান্ধীর বিচারের বিবরণ পড়ে আমার ঐ সফ্রেটিসের বিচারের কথাই মনে পড়ে। যে সকল গুণের সম্ভাবে সফ্রেটিসের আত্মোক্তি সাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছে, প্রায় সে সকল গুণেরই সাক্ষাৎ মহাত্মা গান্ধীর আত্মোক্তিতে পাওয়া যায়। সফ্রেটিসের apology বাস্তবায়ন অনুবাদ করবার আমার ইচ্ছা আছে। যদি কখনো সে অনুবাদ করতে সমর্থ হই, তাহলে বাঙলা পাঠকমাগ্রেই দেখতে পারেন যে, উভয়ের ভিতর একটা মস্ত আভ্যন্তরিক একতা আছে।

বর্তমানে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে মানুষের মস্তিষ্ক, কে কি করে, তাই দিয়ে আমরা যাচাই করি, কে কি সে বিষয়ে ততটা মন দিইনি। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতায় মনুষ্যের মাপকাঠি ছিল স্পষ্টতন্ত্র। আজকাল আমাদের আত্মচেষ্টার লক্ষ্য হচ্ছে to do আর সকালে ছিল to be এই দুই অবস্থা এক নয়।

অর্জুন গিজাসা করেছিলেন:—

“স্থিতপ্রজ্ঞস্য বা ভাষা সমাধিস্তস্য কেশব।

স্থিতধীঃ কিং প্রভাষতে কিমাসীত

ব্রজেত কিম্॥”

এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যা বলিতেছেন, তার দৃষ্টি চারটি কথা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি:—

“প্রজ্ঞাতি যদা কামান সর্বান পার্থ মনোগতান্।  
আত্মনোবাধ্যনা তুষ্টঃ স্থিত প্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥

দুঃখং যদনাশ্বিনমনাঃ সুখেন্দুং বিগতস্পহঃ।

বীতরাগ ভয়ক্ৰোধঃ স্থিতধীর্মনিরুদ্ধাচ্যতে॥

যঃ সর্বগ্রান্ভিস্নেহস্তত্ত্বং প্রাপ্য শূভাশুভম্  
নাভিনন্দতি ন শ্বেষিতি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥”

যে প্রতিষ্ঠিতপ্রজ্ঞ পুরুষের আদর্শ আমরা এতদিন শুধু সংস্কৃত পুস্তকেই পড়ে আসছি, মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রে সেই আদর্শের যতটা সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছে, অপর কারও চরিত্রে ততটা পাওয়া যায় নি।

এ-সব কথা বলবার উদ্দেশ্য এই প্রশ্ন: করা যে, মহাত্মা গান্ধী যে একজন আদর্শ পুরুষ একথা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করেও নন-কো-অপারেশনের প্রোগ্রাম কেবলমাত্র পলিটিক্যাল প্রোগ্রাম হিসেবে বিচার করার প্রবৃত্তি ও অধিকার আমাদের আছে।

এমন অনেক লোক দেখেছি, যারা মনে করেন যে, উক্ত প্রোগ্রাম রচনা করেছেন বলেই গান্ধী একজন মহাত্মা। অপরপক্ষে আমার মতে মহাত্মা গান্ধীর প্রোগ্রাম বলেই জনসাধারণের কাছে তার এত মাহাত্ম্য।

মহাত্মা গান্ধী যদি এর ঠিক উল্টো প্রোগ্রাম বার করতেন—অর্থাৎ non-violence-



এর বদলে তিনি যদি violence প্রচার করতেন, তাহলে জনসাধারণ তা প্রত্যাখ্যান করত, এমন কথা যদি কেউ মনে করেন, তাহলে তিনি স্থিতধী ব্যক্তির বশীকরণী শক্তি সম্বন্ধে নস্পূর্ণ অজ্ঞ।

‘যদ্যদ্যচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।  
ন যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥’

একথা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় যেমন সত্য ছিল, আজও তেমন সত্য রয়েছে। এক চুল এদিক ওদিক হয়নি।

আমার শেষ কথা এই যে, নন-কো-অপারেশন সম্বন্ধে আমাদের যে মতভেদ রয়েছে, তার প্রকাশ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ আমাদের চোখের সূক্ষ্মে রাখা উচিত, যদিচ আমরা জানি যে, তাঁর মত স্থিতধী হওয়া

আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা রাগশ্বেষ থেকে মুক্ত নই। আমরা নির্মমও নই, নিরহংকারও নই। উপরন্তু আমাদের মনে শান্তি নেই। আছে শুধু অশান্তি। তবু উক্ত আদর্শ চোখের সূক্ষ্মে রাখলে আমরা ভয়ে মিথ্যে কথা বলতে ঈষৎ সংকুচিত হব এবং কথায় অসংযম ও অসৌজন্য দেখাতে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হব।

—সবুজপত্র, ১৯২২

# অনাবশ্যক

## শ্রীকরনা বন্দ্যোপাধ্যায়

এক ছুটির প্রাতঃকালে বন্ধুবরের সহিত সাহিত্যালোচনা করিতেছিলাম। তর্কের বিষয়টা ছিল বিষয়বস্তুর শলীলতা বিচার। অশলীলতার মাপকাঠিতে দুই বন্ধুরই মাত্রাভেদ ঘটিতেছিল। তর্কটা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, সামনে ধুমায়িত দুই পেয়লা চা কখন নিধূর্ম হইয়া সরবতে পরিণত হইতেছে, কেহই খেয়াল করি নাই। আমি বলিতেছিলাম—

“আমাদের দেশের লেখকদের কি দোষ জানো? কটা লোকের পরিচয় আছে বলত সমাজের অন্তরমহলের সাথে? ঠিক সেই কারণেই তো আমাদের অশলীলতার চিত্র অত ক্রটিযুক্ত যাকে বলে ‘ভালগার’ হয়ে ওঠে, বেহেতু—”

“ওরে পাজী, উল্লুক, হারামজাদা”—

চমকিয়া দেখিলাম, সামনের বাড়ির তেতলার বন্ধ জানলাটা বহুদিন পরে আবার খুলিয়াছে। বন্ধু বিস্মিত হইয়া কহিলেন,

“ওটা কি ব্যাপার?” নির্বিকার চিন্তে কহিলাম, “ও কিছ্ না, অমন প্রায়ই হয়।” রসালো তর্কের মাঝখানে পার্শ্ববর্তী বৃক্ষের চাঁৎকারে অভ্যস্ত মনও ঈষৎ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পুনরায় পূর্ব বিষয়ে ফিরিয়া গেলাম, কিন্তু তর্ক জমিল না।

বন্ধু যেন কিছুটা অনামনস্ক হইলেন। তেতলার জানলার ধাক্কা তখনও সামলাইয়া উঠিতে পারেন নাই।

শুনতে পাস না শূরোরের বাচ্চারা, ডেকে ডেকে গলা ভেঙে গেল—

অতঃপর সম্ভবত জনৈক শূরোরের বাচ্চার সম্মান মেলাতেই জানলাটা সম্বন্ধে আবার বন্ধ হইয়া গেল।

বিদায় লইবার আগে বন্ধু মৃদুহাস্যে কহিলেন, “গল্পের প্লট খুঁজে বেড়াও চতুর্দিকে, অচ্য সামনে এমন একখানি উদাহরণ। ওকে কেন্দ্র করেই তো একটা সাইকোলজিক্যাল কেস্ খাড়া করে ফেলতে পারো। কল্পনাসাধিতর তো তোমার অভাব ঘটে নি?”

কথাটা মনে ধরিল। তা ছাড়া কল্পনা-দেবার উপরেও বেশী জুলুম খাটাইবার প্রয়োজন ঘটিবে না, কারণ নানা যোগসূত্রে পাশের বাড়ির ইতিহাস কিছুটা জানা ছিল, যদিও খাপছাড়াভাবে।

ভাবিতেছেন আমার গল্পের নায়ক বৃদ্ধ এক কটুভাবী, সত্তরোর্থ, বদমেজাজী বৃদ্ধ? মোটেই নহে। আমার গল্প হইবে এক নায়িকা-প্রধান উপাখ্যান। সুন্দরী, শিক্ষিতা, (অবশ্য পুরাতন আমলের) রসজ্ঞানসম্পন্ন এক নারী। যদিও বয়সিকা উত্তোলনকালে তাহার বয়স মাত্র আট, অষ্টাদশ নহে।

যে বংশে নিভাননী জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার অর্থের প্রতিপত্তি না থাকিলেও ছিল পাণ্ডিত্যের খ্যাতি। তাহার পিতামহ ছিলেন এক বিশেষ সংস্কৃতজ্ঞ। পিতা অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ও সাহিত্যানুরাগী। বংশের প্রথমা কন্যা হিসাবে সে ছিল পিতামহের নয়নপুন্দলী। শূভ্রকেশ, শূভ্রবেশ, সৌম্যমূর্তি প্রোঢ় নাতনীর এতটুকু অবহেলায় চণ্ডল হইয়া উঠিতেন। মা, ঠাকুমার রোষবচন উপেক্ষা করিয়া পিতামহের পক্ষচ্ছায়ে নিভাননী নিশ্চিন্তে বর্ধিত হইতে লাগিল। রামায়ণ তাহার ভাল লাগে না, সমবয়সীরা পুতুল খেলিতে ডাকিয়া ডাকিয়া ফিরিয়া যায়, নিভাননী তখন পিতামহের পাঠগৃহের এককোণে বসিয়া এক দুর্বোধ্য পুস্তকে দন্তফটনের ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছে।

ইহার পরই নিভাননীর বিবাহ-পর্ব। পিতামহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “দিদি, তুই কেমন বর চাস? ডাক্তার না উকিল, না মাস্টার”—নিভাননী পরমোৎসাহে কহিয়াছিল, “দাদা, এমন বর চাই যে অনেক অনেক জনৈক লেখাপড়া জানে, যে ম—সত বড় বিদ্বান।” পিতামহের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। কহিয়াছিলেন, “দিদি, একটি পাণ্ডা আমি জানি, যে খুব বিদ্বান, আর জলপানি পাওয়া ছেলে, কিন্তু সে যে তোর চেয়ে অনেক বড় হয়ে যাবে? তার চেয়ে—”

ষোড়শবর্ষীয়া নিভাননী বিজ্ঞের মত কহিয়াছিল, “তা হোক দাদা, আমিও তো বড় হয়েছি?”

অতঃপর নিভাননীর আবদারই রক্ষিত হইল। মা, ঠাকুমার ক্ষণি আপত্তি উপেক্ষা করিয়া একদা এক চন্দ্রলোকিত যামিনীতে ষোড়শবর্ষীয়া নিভাননীর সহিত ষোড়শবর্ষীয়া এক পণ্ডিত অধ্যাপকের মাল্য-বিনিময় ঘটিল।

তখন ইংরেজ শিক্ষার চরম উৎকর্ষের যুগ। কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ পিতামহের শিক্ষায় নিভাননী

এক অক্ষরও ইংরেজি শেখে নাই। বাসরঘরে সগন্ধ, গম্ভীরবদন লোকটিকে দোষিয়া একটু ভয় ভয় করিলেও নিভাননী মোটেই দমে নাই। স্ত্রী-আচার পর্ব শেষে নিজের বাসরকক্ষে ঘোমটা খুলিয়া সে প্রথম সম্ভাষণ করিল—

“আপনি আমার ইংরেজি শেখাবেন?” বরের মনে হয়ত তখন বিভ্রম প্রণয়-সম্ভাষণে মগ্ন চলিয়াছিল, হঠাৎ প্রশ্নটায় সব গুল্লাইয়া গেল। কহিয়াছিল, “বেশ তো, শিখো।” অতঃপর প্রতিশ্রুতি অন্তে নিভাননী পার্শ্ব-পরিবর্তন করিয়া পরম নিশ্চিন্তে পাশ বাগিল আঁকড়াইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

নিভাননীর জীবনের তৃতীয় পর্বে, সে তখন মা হইয়াছে। ছেলে হওয়ার পর পিতামহকে সে প্রথম চিঠিতে লিখিল, “দাদা, এতদিনে মনে হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে আমার নিজের জিনিস পেলাম।” উত্তরে পিতামহ ঈষৎ ভৎসনার সুরে লিখিয়াছিলেন, “দিদি, নিজের জিনিস নিয়ে অত মাথা ঘামিও না, ওটা যে স্বার্থপরতার লক্ষণ, আমি কি তোমায় সেই শিক্ষা দিয়েছি?” নাতনীর অন্তরে কোথায় একটা শূন্যতা রহিয়াছে, তিনি বুঝিতেন, কিন্তু সাহস করিয়া কোনওদিন তাহাকে জানিতে চাহেন নাই। মাঝে মাঝে মনে করিতেন, নিভাননী বৃদ্ধি তাহারই দোষে সূখী হইল না। অত বয়সের তফাৎ! হয়ত বিজ্ঞতার সহিত চাপল্যের মিলন ঘটিতে পারে না। নিভাননী অন্যান্য মেয়ের চেয়ে আলাদা সত্য, তবু বয়সের তো একটা চরিত্র আছে! ভাবিয়া তিনি অনুতাপে দগ্ধ হইতেন।

কিন্তু মাঝখানের ইতিহাস ছিল সম্পূর্ণ অনারকম। বিবাহের অল্প কিছুদিন পরেই নিভাননী বৃদ্ধি নিছক পাণ্ডিত্য লইয়া মনুষ্য-চরিত্র বিচার চলে না। অধ্যাপক, অনন্তলাল, পুস্তক-প্রণেতা অনন্তলালের সহিত মানুষ অনন্তলালের অনেক প্রভেদ। মানুষ অনন্তলালের ভিতরে নিভাননী বৃদ্ধি খুঁজিয়া বেড়াইল রসানুভূতি ও রূপসৃষ্টির আবেগ। কত দেশ-বিদেশের সাহিত্য-সাগরে নির্মল্জিত হইয়া বাহাকে নিত্য নূতন মণিমাণিক্যের সম্মান করিতে হয়, নিভাননী তাহার ভিতরে সত্যাকার সাহিত্যানুরাগের এতটুকু ব্যাপ্তও দেখিতে পাইল না। বৈষয়িক অনন্তলালের মনে বিষয়-আশয় ও অর্থগণের চিন্তাটাই প্রকাণ্ড স্থান জুড়িয়া আছে। সে বই লেখে অর্থগণের জন্য, অধ্যাপনাক্ষেত্রেও সে সুপ্রতিষ্ঠিত। কাব্যে তাহার আসক্তি নাই, অভাববোধও নাই। মোট কথা, পাণ্ডিত্যের গোরবে, বিষয়-আশয়ের চিন্তায়, ব্যক্তিগত গাম্ভীর্যে অনন্তলাল একটি সয়ংসম্পূর্ণ মানুষ, সাথে আছে কিছুটা সাক্ষ্যের পরিভূষিত। সৈদিক দিয়া বিচার করিলে অনন্তলাল লোক কিছু মন্দ ছিল নয়।



বদখেয়াল নাই, নেশাভাং করে না, আভাধারী নহে, নিয়মমাফিক, ঘড়িধরা রুটিন বাঁধা তাহার কাজ। শাড়ী, গহনা, দাসী-পরিচারক; কোনও দিক দিয়া নিভাননীকে সে কোনও কণ্ঠ দেয় নাই। তবু যদি নিভাননী নিজেকে অপরিভূক্ত মনে করে, সেটা কাহার দোষ? অবশ্য অনন্তলালের মনে এ সকল প্রশ্ন কোনও সমস্যার আকার ধারণ করে নাই।

ছেলের বয়স যখন তিন বৎসর, তখন নিভাননীর পিতামহের মৃত্যু হয়। মৃত্যুটা নিভাননীকে একদিন যেমন আঘাত করিল, অপরাধকে যেন মৃত্তির পথের সন্ধান দিয়া গেল। বিবাহিত জীবনটা এতদিন নিষ্করুণ বশ্বনের মত নিভাননীকে জড়াইয়া রাখিয়াছিল, শূদ্ধ পিতামহের মৃত্যু চাহিয়া সে একটি প্রতিবাদবাক্য উচ্চারণ করে নাই।

একদিন অনন্তলালকে কহিল, “তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।” সেদিন একটা মামলার জন্য অনন্তলালের কোর্টে যাইবার তাড়া ছিল। কহিল, “বলে ফেল।”

“এখানে না, ঘরে চল।”

ঘরে আসিয়া নিভাননী বিনা-ভূমিকায়, বিনা আড়ম্বরে কহিল, “দেখ, আমি তোমায় ভালবাসি না।”

অনন্তলাল হাসিল। কহিল, “তোমার মান-অভিমানের পালাটা”—

“না না, মান অভিমান নয়। তুমি আমায় ছেড়ে দাও।”

অনন্তলাল অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। কহিল, “তার মানে?” ভালবাসা লইয়া সে কোনওদিন মাথা ঘামায় নাই; আইনত বিবাহিত স্ত্রী স্বতঃই স্বামীকে ভালবাসবে। অনন্তলালের মনে হইল নিভাননীর এ নিছক নাট্যকোপনা। কতকগুলো ছাইপাশ নবেল গিলিয়া মস্তিষ্কে পোকা হইয়াছে। হয়তো বা রাত্রের সূপ্তঘোরে কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া এসব শোনা যাইতে পারে, কিন্তু এখন কোর্টের বেঞ্চে হইতেছে—

অসহিষ্ণু কণ্ঠে অনন্তলাল কহিল, “যা খুসী তুমি করো, দাঁড়াও, ফিরে এসে ফেলে দেবো তোমার ওই ছাইপাশ নবেলের রাশি”—

মামলায় জাঁতয়া অনন্তলালের মনটা সেদিন খুসীই ছিল। সকালে স্ত্রীর সহিত বচসার কথা তাহার মনেও ছিল না। এই মামলায় জেতা অর্থ এবার সে একটা বাড়ি তুলিতে পারিবে। শূদ্ধ একটা কেন, মনে মনে অনেক বাড়ি করিবার সংকল্প রাখে সে। আবার কালকেই দিল্লী ছুটিতে হইবে অধ্যাপক সম্মেলননীতে যোগ দিবার জন্য। তা ছাড়া প্রেস হইতে একগাদা প্রফের তাড়া আসিয়াছে, মধ্যাহ্নে জাগিয়া দেখিতে হইবে।

কিন্তু নিভাননীর সংকল্প অটল। মাত্র আঠারো বৎসর বয়সে বহুদিনের বিন্দ্র রজনী যাপনের ফলে নিভাননী একটি সত্য জীবনে

উপলব্ধি করিয়াছিল। এমন যান্ত্রিক কৃত্রিম বিবাহিত জীবন লইয়া ‘স র্বাচিতে পু’রবে না। স্বামী ও তাহার সংসার সম্পর্কে যে ঔদাসীন্য তিল তিল করিয়া মনের কোণে জমা হইতেছিল, সেটা যেন এতদিন পরে সম্পূর্ণ অবয়ব গ্রহণ করিয়া তাহাকে মরিয়া করিয়া তুলিল। স্পষ্ট ভাষায় যে কয়টি কথায় সে নিজেকে বাস্তব করিল, তাহা এইঃ

“দেখো, এতদিন বিয়ের পর দেখলাম তোমার জীবনের সাথে কিছুতেই নিজেকে জড়াতে পারলাম না। এই সংসার, এই ঘর-দুয়ার, দাসদাসী, এ তোমারই সব। এতে আমার কোনও লোভ নেই, অধিকারও নেই। এইভাবে তোমার স্ত্রী হয়ে জীবনযাপনে আমার আর প্রবৃত্তি নেই। তুমি আমায় ছেড়ে দাও, মুক্তি দাও।”

অনন্তলাল স্তম্ভ হইয়া শুনিতোছিল, কহিল—“কোথায় যেতে চাও?”

“কোথাও না; ভয় নেই, তোমাদের বংশে কলঙ্ক ছেকে আনবো না। এখানেই থাকবো, শূদ্ধ তোমার স্ত্রী হয়ে নয়।

ছোট্ট একটি ‘বেশ’ বলিয়া অনন্তলাল ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে নিভাননী কহিল—“দেখো তুমি আর একটা বিয়ে কর।”

অনন্তলাল হাসিল। কহিল—“আবার? আর ও ধার দিয়ে নয়।”

অতঃপর নিভাননী ঈষৎ সংশয়ভুক্ত কণ্ঠে বলিল—“আর এক কাজও করতে পারো।”

“কী?”

“এই বলছিলাম কি, খোকা তো বড় হয়েছে, সামলানো মৃষ্কিল, ওর জন্যে একটা কি রাখি যদি?”

“বাড়িতে তো চাকরবাকরের অভাব নেই!”

“স্নান, মানে তাকে দিয়ে তুমি তো আমার অভাবটা.....”

অনন্তলাল সহসা ঘুরিয়া দাঁড়াইল, কাঁপা গলায় কহিল, “কি, কি বলছে?”

চোখ দেখিয়া নিভাননীর ভয় হইল। তবু জোর করিয়া কহিল,—“দোষ কি এতে, এমন তো কতই হয়”—

“দোষ কী এতে, এমন তো কতই হয়”—

কথা শেষ হইল না, অনন্তলাল সহসা সামনের পেপারওয়েটেটা তুলিয়া সজোরে তাহার কপালে আঘাত করিল। কপাল ফাটিয়া রক্ত পড়িল। নিভাননী এতটুকু আগরাজও করিল না। রুদ্ধশ্বাসে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকাইয়া অনন্তলাল কহিল,

“তুমি কি পাথরে গড়া?” উত্তরে নিভাননীর দৃঢ়বন্ধ অধরে একটা স্নান হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

পরবর্তী অঙ্কের অনেকখানিই অজ্ঞাত। ঘটনাবাহুল্যও নাই বিশেষ। পাথরকোর

মধ্যে, সেইদিন হইতে ছেলেকে বৃকে করিয়া নিভাননী তেডলা হইতে দোডলায় নামিয়া আসিয়াছেন, আর ফিরেন নাই। অনন্তলালের জীবনে বাহ্যত কোনও ছেদ পড়ে নাই। অনেক জায়গায় অনেকগুলো বাড়ি উঠিয়াছে। বেশীর ভাগই চড়া দামে ভাড়া খাটে। কতী কার্যবসরে প্রায়ই কলিকাতার বাহিরে থাকিতে যান। বয়স যথেষ্ট হইয়াছে, ব্যাংকের অঙ্কের মাত্রাও স্থূল হইতে স্থূলতর হইয়াছে। স্বামী স্ত্রীতে মাঝে মাঝে বৈষয়িক কথাবার্তা হইয়া থাকে। বাহিরের লোকে কোনও বৈলক্ষণ্য বুঝিবে না। শূদ্ধ কতীর মেজাজটা দিন দিনই রুদ্ধ হইতে রুদ্ধতর হইতেছে। চাকরবাকরে হিমসিম খাইয়া গেল। নিভাননী এখনও অপূর্ব সুন্দরী, তাহার পার্শ্ব পলিতকেশ, হৃৎস্বাস্থ্য, রুদ্ধমেজাজী অনন্তলালকে আগের চেয়েও বেমানান দেখায়। শূভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়স্বজন আক্ষেপোক্তি করেন। বয়সের সঙ্গে নিভাননীর চেহারার যে শান্ত কোমলতার ছাপ পড়িয়াছে, সেটা বাস্তবিকই বিস্ময়ের উদ্রেক করে, ঐ রকম স্বামীর সহিত ঘর করিতে গেলে তো এতদিনে একটি একটি কবিতা মাথার চুলে পাক ধরা উচিত। কিন্তু অরাক কাণ্ড, সদাহাস্যময়ী নিভাননীর মুখের উপর কোথাও এতটুকু বিষাদের ছায়া পড়ে নাই।

তাহার পরের যবনিকা উঠিল একেবারে পুত্রের বিবাহের সময়।

অনেক খুঁজিয়া বাছিয়া নিভাননী পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন। ইচ্ছা ছিল একেবারে গরীব-ঘরের মেয়ে আনার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা ঘটিয়া ওঠে নাই। পণ লন নাই বটে, কিন্তু একমাত্র সন্তানকে বাপ-মায়ের যথাসাধ্য ঢালিয়া দিয়াছে। কতী অবশ্য বিশেষ খুসীর প্রকাশ দেখান নাই, আদায় পাওনা তাহার মনের মত একেবারেই হয় নাই। যাই হোক, নিভাননী ছেলের বিবাহের ভিতর দিয়া নিজের ভুলগুলো মিটাইবার চেষ্টা করিলেন প্রাণপণে। ছাশিশ বছরের ছেলে, বধু আনিয়াছেন উনিশ বছরের। আই-এ পাশ মেয়ে। চললে মুখখানি, দেখলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। হয়তো চোখ-ঝলসানো সুন্দরী নহে। কিন্তু সেই ভাল, সুন্দরীদের কপালে আবার সুখ-শান্তির কিঞ্চিৎ অভাবই ঘটয়া থাকে।

ছেলের বিবাহের ফুল-শয্যার রাতি। রাত অনেক হইয়াছে। কাজের বাড়ির কল-কোলাহল এই কিছুক্ষণ হইল মিটিয়াছে। নীচে কুকুরের দল ছেড়া পাতা ও মাটির গেলাস লইয়া সরবে সংগ্রাম করিতেছে। শ্রাবণের আকাশ ছাইয়া আধা-মেঘ, আধা-জ্যোৎস্না। কি ভাগ্য আজ কণ্ঠটা হয় নাই, বাঁচাইয়া দিয়াছে। শূইতে যাইবার আগে শয়ন ঘরের সংলগ্ন বারান্দাটায় কম্প্রান্ত নিভাননী আসিয়া দাঁড়াইলেন। উৎসব ক্রান্ত রজনীর বোধ করি একটা বাদ,

আছে। নিভাননী শূইতে যাইতে ভুলিয়া গেলেন। মনের দর্পণে অতীত জীবনটা সহসা যেন বার বার ছায়া ফেলিতে লাগিল। এমনি ফুলশয্যার রাত একদিন তাহার জীবনেও তো আসিয়াছিল। উনিশ বৎসর আগের দিনগুলি বিস্মৃতির অন্তরালে যাই যাই করিয়াও যাইতে চাহে না। সেটাও ছিল জ্যোৎস্না-ধোত মায়াময় এক রাত্রি। কিন্তু সে দিনের সহিত কি আজিকার দিনের কোনও তুলনা চলে?

স্বামীর কথা মনে পড়িল। বিবাহের মাত্র ছয় বৎসর তাহার দিন কাটিয়াছে স্বামীর ঘরনী হইয়া। শ্রম্ভা, ভক্তি, ভালবাসা, সব কয়টাই যখন একে একে দেউলিয়া হইয়া গেল, তখন মৃতি লওয়া ছাড়া কি গতি ছিল তাহার? অনন্তলাল অবশ্য তাহার উপরে জোর খাটাইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। এজনা তাঁহাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ।

একবার দৃষ্টি পড়িল অনন্তলালের ঘরের উপরে। বারান্দা হইতে তেতলার ঘরটার একটা জানালা শূদ্ধ চোখে পড়ে। ঘরে আলো দেখিয়া নিভাননী অবাক হইলেন। এত রাত অবধি তো অনন্তলাল আজকাল আগিয়া থাকেন না?

ব্যাপারটা সত্যি আশ্চর্য। বিবাহের দরূণ অনন্তলাল টাকা দিয়াই খালস হইয়াছেন, প্রয়োজনান্তরিত্ত একটি দায়িত্বের ভার লন নাই। ছেলের জনক হিসাবে হয়ত তাহার আরও কাজে হাত দেওয়া উচিত ছিল। লোকে এ লইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতে ছাড়ে নাই। কিন্তু নিভাননী ইহার বেশী এতটুকু আশা করেন নাই। ছেলের উপর দাবী অনন্তলালের কতটুকু? তিন বৎসর বয়স হইতে সে শূইতেই মাকে চিনিয়াছে, পিতার সহিত তাহার কোনও সংগ্রহই ছিল না। এটা যে নিভাননী ইচ্ছা করিয়া ঘটাইয়াছেন, ঠিক তাহা নহে, কিন্তু ব্যাপারটা কার্যত যাহা ঘটিল, তাহাতে ভেলে যে শূদ্ধ তাহার একার নয়, অনন্তলালেরও যে তাহার উপরে একটা দাবী থাকিবার কথা, এ কথাটা নেহাৎই চাপা পড়িয়া গেল। বাপ ও ছেলের দূরত্বটা অবশেষে স্থায়ী হইয়াই রহিল।

নিভাননী সহসা একটু অস্বস্তি বোধ করিলেন। অনুভূতি নহে, নিজের দিক দিয়া তাহার অনুভূতের এক ফোঁটা করণ নাই। তবে কি সত্যি তিনি স্বার্থপর? শূদ্ধ

নিজের ব্যক্তি, ভালবাসা ও মানসিক অশান্তিকে একদা বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন? মনে পড়িল পিতামহের কথা। “দিদি, এই কি তোমায় শিখিয়েছি এত দিন ধরে?” হয়তো তাহাই সত্য। তিনি সত্যই স্বার্থপর। অথবা কালের বাবধানে মনের তীক্ষ্ণ অনুভূতিগুলি ভোঁতা হইয়া গিয়া অকারণ দুর্বলতা প্রদর্শন দিতেছে।

অনন্তলালের ঘরে এখনও আলো নেভে নাই।

কেন কে জানে!

এবার শূইতে যাওয়া উচিত। কাল আবার ভোরে উঠিতে হইবে, উৎসবান্তে তো আর কাজকর্ম সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়া যায় না? কিন্তু শূইবার আগে অনন্তলালের খোঁজ লওয়া বোধ হয় কর্তব্য। বৃদ্ধ হইয়াছেন, চিরকালই তিনি নিয়মবাহী জীবনযাত্রার পক্ষপাতী; আগে বরং নানা কাজে বিষয় ঘটিত, এখন অবসরপ্রাপ্ত জীবনে সেটা ভাল করিয়াই অনুসরণ করেন। আজ হঠাৎ এত রাত জাগিবার তাহার নিশ্চয় প্রয়োজন নাই! টাকার হিসাব নিকাশ যদি বাকী থাকে, সে তো কাল করিলেও চলবে।

তেতলার সিঁড়ি বাহিয়া নিভাননী নিঃশব্দে উপরে উঠিয়া গেলেন। অনন্তলাল অবশ্য এত রাতে নিভাননীকে মেটেই প্রত্যাশা করেন নাই। ছেলের বিবাহের দরূণ টাকাকড়ি, আলোচনা ইত্যাদির প্রয়োজনে কিছুদিন ধরিয়া নিভাননীকে অনবরত এ ঘরে আসিতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু এত রাতে হঠাৎ কিসের প্রয়োজন হইতে পারে! কহিলেন, “তুমি? ঘুমোওনি এখনও?”

নিভাননী কহিলেন, “ঘুমোতেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু এত রাতে ঘরে আলো জ্বলছে দেখে ভাবলাম খোঁজ নিয়ে আসি।”

এটাও অভূতপূর্ব। বহু বহু বৎসর ধরিয়া নিভাননী অনন্তলালের কার্যকলাপের খোঁজ রাখা প্রয়োজন মনে করেন নাই।

নাকের উপর চশমাটা ঠিক করিয়া অনন্তলাল ধীরভাবে কহিলেন, “বেশী দেবী নেই, প্রুফটা শেষ করেই শূয়ে পড়।”

“এত রাতে প্রুফ? কেন কাল দেখলে ক্ষতি কি?”

অনন্তলাল কাগজের উপর হইতে চোখ তুলিলেন।

“কাল আমার ভোর ছটায় গাড়ি, দেখব কখন?”

নিভাননী চমকিয়া কহিলেন, “তুমি কালই আবার বেরোচ্ছ?”

ছোট্ট একটি “হ্যাঁ” বলিয়া অনন্তলাল প্রুফ দেখিতে লাগিলেন।

“কাল না গেলে হয় না?”

এবার বিস্ময়ের আতিশয্যে প্লাস পাওয়ারের চশমাটা খুলিয়া অনন্তলাল ভাল করিয়া নিভাননীর দিকে চাহিলেন। কহিলেন, “না, নেহাৎই দরকার। কিন্তু আজ হঠাৎ একথা কেন জিগোস করছ? দরকার আছে কোনও?”

“দরকার আর কি? এমনিই জানতে চাইলাম।”

অনন্তলাল ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া হাসিলেন। তারপর সহসা ঘুরিয়া বসিয়া কহিলেন,

“জানা নিভা, একদিন তোমার এই কথাটার জন্যে কান পেতে থাকতাম। চাইতাম তুমি আমায় যেতে বারণ করো। কত সময় অকারণেও বাইরে চলে গেছি, ইচ্ছে করে। অসময়ে খেয়েছি, কতদিন খাইনি। কিন্তু তুমি কিছই বলোনি, লক্ষ্যও করেনি হয়তো।”

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া মৃদুস্বরে আবার কহিলেন,

“আজ আর সেসবের প্রয়োজন হয় না, লাভও নেই। তুমি শূতে যাও।”

নিঃশব্দে উঠিয়া গেলেন। ঘরের সামনেই একফালি ছাত। ধূসর আলোয় আবছা রাতি। মাথার উপরে ছোট্ট চাঁদটা মেঘের আড়ালে পড়িয়াছে। ছাতের অপরপ্রান্তে আর একখানি ঘর। ঘরটাকে আজকাল গুদামঘরে পরিণত করা হইয়াছে। প্রকাণ্ড এক তাল মায়া। ঐ ঘরটায় খোকার জন্ম দিয়াছিলেন তিনি।

তিনি অনন্তলালকে ভালবাসিতে পারেন নাই। হয়তো দু'পক্ষেরই চেষ্টার ট্রটি ছিল। যৌবনের ভুল যৌবনেই শোধরাইতে হয়। অন্যতর পূর্ণ পাত্র দুইজনেই নিঃশেষে উপভুক্ত করিয়া শূন্য করিয়াছেন। একজন স্বাভাবিক অভিমান, আর একজন নীরব প্রতীক্ষার ফল। সেই অভিমান ও ফলভের উত্তাপ আজ মহাকালের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। নিরপেক্ষ দর্শকের মত তাহারা পড়িয়া আছেন দুইধারে।

নিভাননী আর একবার ছাতের অপরপ্রান্তে তালাবৃক্ষ ঘরটার দিকে তাকাইয়া নীচে নামিয়া আসিলেন। যে মধুমিলন তাহার জীবনে ঘটে নাই, তাহারই বিচ্ছেদ বেদনায় মনের ভিতরটা সক্রিয় হইয়া উঠিল।



# সোভিয়েট রাশিয়ার শিল্পকলা

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

(১)

আমাদের দেশে রাজা, জমিদার, সৌখীন ধনী ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অনুগ্রহ ব্যতীত শিল্পীদের জীবিকাজন একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। শূদ্ধ অন্ন-চিন্তার ধান্য বহু প্রতিভাবান শিল্পীকে দাসত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আজকাল অবশ্য সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদির আনুকূল্যে খানিকটা শিল্পকলার প্রসার হইতেছে। কিন্তু স্বদেশীয় সরকারের সাহায্য ব্যতীত জাতীয় জীবনের এই বিভাগের উন্নতি একেবারেই অসম্ভব।

রাশিয়ারও এক সময় এই দুর্দিন ছিল। রাশিয়ার ধনিক অভিজাত সম্প্রদায় বিলাসিতার উপকরণ হিসাবে নিজ নিজ প্রাসাদে বিখ্যাত শিল্পীদের কয়েকখানি চিত্র ও টাঙাইয়া রাখিতেন; কিন্তু চির-উপেক্ষিত কৃষক মজদুরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই জাতীয় মনোবৃত্তির আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। আজ আর শিল্পীকে অন্ন-সংস্থানের জন্য বিলাসীর দ্বারে দ্বারে গিয়া হাত পাতিতে হয় না। শিল্প শিক্ষা করাটা এখন আর বদখেয়াল বলিয়া পরিগণিত হয় না। গণ-সরকার এখন শিল্প-প্রতিভাবিশিষ্ট ছেলেদিগকে খুঁজিয়া বাহির করেন।

এমন এক সময় রাশিয়ায় ছিল, যখন অভিজাত সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট থিয়েটারের টিকিট বিক্রয় করা হইত না। আর আজ সোভিয়েট সরকারের বিপ্লবাত্মক শিল্প-নীতির ফলে ১৯৩৬—১৯৪০ এই পাঁচ বৎসরে সমগ্র রাশিয়ায় শিল্পকলা সম্পর্কে পাঁচ হাজার বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যেই এই পুস্তকগুলির বিভিন্ন সংস্করণে মোট ৩২,৫৪২,০০০ খণ্ড বিক্রয় হইয়াছে। ১৯৪০—৪১ সালে ৮৫০টি রংগমণ্ডে প্রায় আট কোটি দর্শকের সমাগম হইয়াছে।

১৯৪১ সালে সোভিয়েট সরকারের বাজেটে শিল্পকলার খাতে ২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের জন্য পুরস্কার (স্ট্যালিন প্রাইজ) হিসাবে কয়েক লক্ষ টাকা বরাদ্দ তো আছেই। এই বিরাট পরিবর্তনে বিস্ময়াহত হইতে হয়।

শিল্পকলা আজ সোভিয়েট জনসাধারণের অন্তরের নিভৃততম কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়াছে। লেনিনের ভাষায় “শিল্পকলা জনগণের

সম্পত্তি। ইহার শিকড় সর্বসাধারণের অন্তরে প্রবিষ্ট হউক, ইহাই কাম্য। শিল্পকলা সম্যক পরিষ্ফুট হইয়া জনগণ কর্তৃক আদৃত ও ভালবাসার জিনিস হইয়া উঠুক, ইহাই আমি চাই। জনগণের আবেগ, চিন্তাধারা ও ইচ্ছা এই তিন জিনিসকে শিল্পকলা যদি একত্রিত করিয়া উদ্বেগ্ন করিতে পারে, তবেই তাহার চরম সাধকতা।”

লেনিনের এই বাণী আজ সাধকতা লাভ করিয়াছে।

(২)

মহামতি পিটারের রাজত্বকাল হইতেই প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ার শিল্পকলার ইতিহাস আরম্ভ হয়। তৎপূর্বে মূর্তি নির্মাণ ব্যতীত রাশিয়ার অন্য কোন শিল্পের নিদর্শন আমরা পাই না। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ায় সর্বপ্রথম প্রতিকৃতি অঙ্কনের প্রথা প্রবর্তিত হয় এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে দৃশ্যাদি অঙ্কন আরম্ভ হয়। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ায় কতিপয় বিশিষ্ট শিল্পীর আবির্ভাব হইলেও রুশীয় শিল্প তখন ফরাসী ও বৃটিশ



বিপ্লব (কাঠ খোদাই)

শিল্পকে অনুসরণ করিয়া চলিত। রাশিয়ায় নিজস্ব শিল্পধারা প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবোত্তর যুগে আরম্ভ হয় এবং মাত্র কয়েক বৎসরে মধ্যেই তাহা পৃথিবীর লোকের বিস্ময় উৎপাদন করে।

একমাত্র সোভিয়েট ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই গভর্নমেন্টের কোন শিল্পনীতি নাই। কারণ অনেকেরই ধারণা এই যে সরকার যদি শিল্পনীতি নির্দেশ করিতে আসেন



দিবিসার বাগানে

তবে শিল্পীদের স্বাধীনতা লোপ পাইবে। কিন্তু সোভিয়েট সরকার শিল্পীদের স্বাধীনতায় কখনই হস্তক্ষেপ করেন না। তাঁহারা শুধু দেখা রাখেন যে, সোভিয়েট সরকার যেমন জনসাধারণের সমর্থনে প্রতিষ্ঠিত, তেমনি সোভিয়েট শিল্পও যেন জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করে। সমাজতান্ত্রিক নীতিতে জনগণকে উদ্ভুদ্ধ করিতে সোভিয়েট শিল্প সাহায্য করুক, সোভিয়েট সরকার ইহাই কামনা করেন।

১৯২৮ হইতে ১৯৪০ সাল এই তের বৎসর প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েট রাশিয়ার সংগঠনের ইতিহাস। এই সময়ের মধ্যেই সোভিয়েটের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিকে কার্যকরী করা হয়। এই সংগঠনের ব্যাপারে সোভিয়েট শিল্পীদের দান অপরিসীম। সব প্রকার ভাবালুতা পরিত্যাগ করিয়া সোভিয়েট শিল্প তখন একান্তভাবে বাস্তবমুখী হইয়া উঠে। সরকারী আদর্শকে শিল্পীরা চিত্রের সাহায্যে এবং লেখকরা লেখার মাধ্যমে জনগণের হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া দেয়। ইহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়াই স্ট্যালিন বলিয়াছিলেন—“engineers of the human soul” (মানব হৃদয়ের ভাস্কর)।

সোভিয়েটের তৎকালীন শিল্পকে অনেকে প্রচার শিল্প বলিয়া অবহেলা করিয়া থাকেন। কিন্তু যে শিল্প ১৮ কোটি মানুষকে এক নতুন জাতীয় মন্ত্রে উদ্ভুদ্ধ করিতে পারিয়াছে তাহাকে প্রচার-শিল্প বলিয়া অবহেলা করিলে চলবে কেন?

সোভিয়েটের এই ‘প্রচার শিল্পের’ অবদান যে কত ব্যাপক ও গভীর, তাহা গত মহাযুদ্ধের সময় দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। যুদ্ধের সময় অবশ্য বহু শিল্পীকে সৈনিকের কাজ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু সোভিয়েটের সমগ্র



একটি অবিচ্ছিন্নীয় সাক্ষাৎকার (তৈলচিত্র)

যুদ্ধনীতি সম্পর্কে জনসাধারণের মনে যাহাতে সুস্পষ্ট ধারণা থাকে, তজ্জন্য শিল্পীদেরকে অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। রেড আর্মি, স্টেট পাবলিসিং হাউস এবং টাস নিউজ এজেন্সী সোভিয়েটের সমস্ত শিল্পীকে তাহাদের অধীনে নিয়োগ করে। জনগণের নৈতিক বলকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে এই শিল্পীরা আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে এবং তাহাদের কৃতিত্ব এত বেশী যে, অন্য কোন বিভাগ ইহাদের সমকক্ষতা দাবী করিতে পারে না। একমাত্র আর্ট পাবলিসিং হাউস যুদ্ধকালে দুই কোটি প্রাচীরপত্র প্রচার করিয়াছিলেন। হাটে, মাঠে, প্রান্তরে, বনে, পর্বতে সর্বত্র প্রাচীরপত্রের সাহায্যে সোভিয়েট জনগণকে স্বদেশের

স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সর্বস্ব দান করিতে উদ্ভুদ্ধ করা হইত। ঐ প্রাচীরপত্রগুলি চমৎকারিতায় এত উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে যে, তাহারা আজ সাময়িক প্রয়োজনের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া বিশ্বকলা ভান্ডারে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে।

(৩)

এইবার আমরা সোভিয়েটের শিল্প-শিক্ষা সম্পর্কে মোটামুটিভাবে কিছু বলিব। সোভিয়েট শিক্ষাবিদদের ধারণা এই যে, প্রত্যেক শিশুর অন্তরেই শিল্পী আছে। প্রকৃত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করিলেই ঐ শিল্পীর আবির্ভাব হয়। এইজন্য সোভিয়েট শিশুদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিল্প একটি অবশ্য পণ্ডিতব্য বিষয়।

সাধারণত আট বৎসরের পূর্বে সোভিয়েট রাশিয়ায় ছেলেমেয়েদের শিক্ষা আরম্ভ হয় না। আট বৎসর হইতে ১৫ বৎসর পর্যন্ত সকলেই একরকম শিক্ষা পাইয়া থাকে। তার পরে গুণানুসারে বিশেষ বিশেষ বিভাগে ছাত্রদিগকে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। এই শিক্ষা তিন বৎসরকাল চলে।

যেসব শিক্ষার্থী প্রকৃতপক্ষেই শিল্পানুরাগী তাহাদিগকে ১৫ বৎসর বয়সের সময় শিল্প শিক্ষার স্কুলগুলিতে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। প্রতিভাশালী ছাত্রদের জন্য মস্কো, লেনিনগ্রাদ, টায়ুস এবং কিয়েভে বিরাট শিল্প শিক্ষালয় আছে। এই শিল্প-শিক্ষালয়গুলিতে কলা-বিদ্যার সঙ্গে অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয়ও পড়ান হইয়া থাকে। তবে তিন বৎসরের শেষ বৎসরটিতে তাহারা শুধুমাত্র শিল্পকলার যে বিভাগটি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হইতেছে, সেই বিষয়টিই পড়িয়া থাকে।



রূপ গরলাবাধিনী প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতেছে



ভলগানদীর তীরে

শিল্প-শিক্ষার প্রতি সোভিয়েট জেলে-মেয়েদের অনুরাগ ক্রমশ এত পরিবর্তিত হইতেছে যে, তাহাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা লইয়া সোভিয়েট সরকার সমস্যা পড়িয়াছেন। বর্তমানে শিল্প-শিক্ষার পরিবর্তিত দাবী মিটাইবার জন্য সোভিয়েট সরকার একদল দ্রাম্যমাণ শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহারা নির্দিষ্ট তারিখমত বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গিয়া শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আসেন। ১৯৪৩ সালে যখন সমস্ত রাশিয়া নাৎসী আক্রমণে ধবংস হইয়া যাইতেছিল, তখনও জনগণের শিল্প-শিক্ষার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য রাশিয়ার ৪০টি বিভিন্ন সহরে কলা-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইয়াছিল।

সমগ্র রাশিয়ার বিভিন্ন অংশের শিল্পীদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা এবং ভাবের আদান-প্রদানের জন্য শিল্পীদের ইউনিয়ন আছে। ১৯৪৩ সালে এই ইউনিয়নের সভা সংখ্যা ছিল প্রায় দুই লক্ষ। এই শিল্পী ইউনিয়নই প্রকৃতপক্ষে রাশিয়ার শিল্পনীতি নির্ধারণ করিয়া থাকেন। ইহাদের নির্ধারিত নীতি সেন্ট্রাল একাডেমী অব আর্টের নিকট বিবেচনার্থে যায় এবং উক্ত একাডেমী কর্তৃক অনুমোদিত হইলেই তাহা সরকারী অনুমোদন লাভ করে।

জনসাধারণের সঙ্গে শিল্পীদের যোগাযোগ রক্ষা করিবার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। বলা বাহুল্য, এই সকল প্রদর্শনীও সরকারী সাহায্যেই পরিচালিত হইয়া থাকে। এই সকল প্রদর্শনীতে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হইয়া থাকে এবং শিল্পীরা প্রদর্শনীতে প্রদত্ত চিত্রাদির মর্ম ম্যাজিক ল'ঠনের সাহায্যে জনগণের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ১৯৩২ সালে মস্কোতে রেড-স্কোয়ারে যে চিত্র-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়,

তাহাতে আড়াই লক্ষ চিত্র সংগৃহীত হইয়াছিল। পৃথিবীর ইহাই বৃহত্তম চিত্র প্রদর্শনীর রেকর্ড।

প্রাচীন চিত্রাদি সংরক্ষণের জন্য প্রায় প্রত্যেক শহরেই মিউজিয়াম আছে। বিশেষভাবে নিযুক্ত একদল শিল্পী আছেন, যাহারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রাচীন চিত্রাদি সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

কল-কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে যাহারা শিল্পানুরাগী, তাহাদের শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থাও সোভিয়েট সরকার করিয়াছেন। সাধারণত স্বেচ্ছাসেবক শিল্পীরাই ইহাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। একমাত্র মস্কো শহরেই এইরূপ ২৬০০ স্বেচ্ছাসেবক শিল্পী আছেন।

অর্থাৎ বর্তমানে সোভিয়েট রাশিয়ায়

শিল্পকলা জাতীয় জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আপন ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে।

(৪)

অন্যান্য দেশের মত সোভিয়েট রাশিয়াতেও প্রতিকৃতি, প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি ও ব্যঙ্গ-চিত্রাদি অঙ্কন চরম উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু জনগণকে উৎস্বুদ্ধ করিবার জন্য জাতীয় ভাবধারাদোতক প্রাচীর চিত্র অঙ্কন সোভিয়েট রাশিয়ার সম্পূর্ণ নিজস্ব শিল্প। এই শিল্পের সাহায্যেই প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েট জনসমাজকে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করা হইয়াছে, এই কথা বলিলে অতীতি করা হইবে না। বর্তমানে ব্যাপকভাবে স্বস্বসাধারণের মধ্যে শিল্প-প্রীতি একমাত্র সোভিয়েট ছাড়া অন্য কোন দেশেই দেখিতে পাওয়া যাইবে না। এই বিপ্লবাত্মক মনোবৃত্তির জন্য কৃতিত্ব কোন বিখ্যাত শিল্পী অথবা চিত্রকারের প্রাপ্য নহে। যে ভাবধারার ফলে ১৯১৭ সালে সমগ্র রাশিয়ায় গণ-বিপ্লব সম্ভব হইয়াছিল, সেই ভাবধারার প্রবর্তক নোভোভদের কর্মকুশলতা ও শিল্পানুরাগই এই শিল্প-বিপ্লবের জন্য কৃতিত্ব দাবী করিতে পারে।

মজদুর কৃষকরাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইউরোপের যেসব অভিজাত ব্যক্তি রাশিয়ার শিল্প ও সাহিত্য ধ্বংস হইয়া গেল বলিয়া আশংকা করিয়াছিলেন, তাহারা এই দুই ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়াকে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে দেখিয়া আশ্বস্ত না হইয়াছেন, তাহা বলা শক্ত।

আমরা এই প্রবন্ধে বিখ্যাত সোভিয়েট শিল্পীদের নাম অথবা তাহাদের অশ্বিক্ত চিত্রাদির উল্লেখ ইচ্ছাপূর্বকই করিলাম না। কারণ যে দেশে আজ প্রত্যেকেই শিল্পী, সেই দেশের মাত্র কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নামোল্লেখ বৃজ্জিয়া মনোবৃত্তির পরিচায়ক বলিয়া আমরা



শীতলেশ্বরের আগমন

মনে করি। সকলপ্রকার প্রণয়-স্বার্থকে বিলোপ করিয়া ব্যষ্টির বহুং সৃজনী প্রতিভাকে সমষ্টির মধ্যে বিলীন করিয়া দেওয়াই সোভিয়েট শিল্পীদের আদর্শ।

যুদ্ধের সময় যেমন দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত

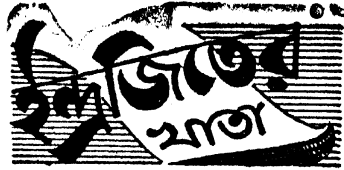
করিবার জন্য শিল্পীদের প্রয়োজন হইয়াছিল, শান্তির সময় দেশ পুনর্গঠনের কাজেও তাহাদের ঠিক তেমন প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে সকল বীর অম্লানবদনে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন,

তাহাদের শৌর্ষ, বীর্যের কাহিনী চিত্রিত করিয়া সোভিয়েট শ্রমিক সমাজকে দেশের পুনর্গঠন কাজে প্রয়োজন হইলে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করিতে অনুপ্রাণিত করা হইতেছে।

শিল্পের কি অপূর্ব মহিমা!

### মেজাজ

আমি মানুষটা যে বদমেজাজ, সে খবর আপনারা রাখেন কিনা, আমি জানিনে। কিন্তু বারী আমার নিত্য সহচর অর্থাৎ যাদের সঙ্গে আমাকে সারাক্ষণ সাম্প্রতিক রাজনীতি কিম্বা আধুনিক সাহিত্য নিয়ে তর্ক করতে হয় তাঁরা জানেন যে, আমার মেজাজ যখন-তখন বিগড়ে যায় এবং গোষ্ঠীসমূহের ইংকুল মাস্টারের মতো আমি তর্ক হেরে গেলেও তর্ক করতে ছাড়িনে। আর শব্দ কি তর্ক? এমনিতেই কারণে-অকারণে যখন-তখন আমার মেজাজ বিগড়ে যায়। চায়ে চিনি বেশী হলে (আজকাল অবশ্য এর উল্টোটাটাই হয়) মেজাজ খারাপ হয়, টিপ টিপ বিষ্টিতে মেজাজ খারাপ হয়, গদ্য-কবিতা পড়ে মেজাজ খারাপ হয়, তার উপরে নেতাদের স্টেটমেন্ট পড়লে তো কথাই নেই। এহেন জোড়ের সঙ্গে তর্ক করা বড় কঠিন ব্যাপার। অবশ্য আমার বন্ধুরাও এ বিষয়ে বড় আদর্শ ব্যক্তি নন। মেজাজ ঠিক রেখে তর্ক করা একটা বড় রকমের আর্ট। বাঙালী চারিদে এ গুণটি বড়ই বিরল। বাঙলা দেশ নব-ন্যায়ের দেশ অর্থাৎ কিনা তার্কিকের দেশ, আর তর্ক করা মানেই মেজাজ খারাপ করা। তাছাড়া বাঙালী জাতিটি ডিসপেপটিক জাত এবং ডিসপেপটিক লোক মাত্রই বদমেজাজ হইতে বাধ্য। আমি স্বয়ং তার দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথ বাঙালীকে ঠাট্টা করে বলেছেন—‘তেল ঢালা স্নিগ্ধ তনু’—দুঃখের বিষয়, সে রকম স্নিগ্ধ তনু বাঙালী এ যুগে বড় একটা দেখা যায় না। ঘি এবং তেলের বাজারে যে পরিমাণ ভেজাল চলছে, তাতে তনু মন প্রাণ সব অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ঘূতের বিকৃতির সঙ্গে যকৃতের বিকৃতি এবং তৎসঙ্গে বাঙালীর প্রকৃতিরও বিকৃতি ঘটেছে। তার ফলে এখন সমগ্র জাতিটি বদমেজাজী হয়ে উঠেছে। বললে বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনে—বাঙালীকে কিছদিন একটা ভেজালহীন ঘি, তেল খেতে দিন, কার্কারাহীন চাল আর তেঁতুলবিচিহীন আটা দিন দেখবো দুদিনে বাঙালীর মেজাজের যথেষ্ট উন্নতি হয়ে গেছে। খাদ্যের ভেতরে কিঞ্চিৎ পরিমাণ স্নেহ-জাতীয় পদার্থ না থাকলে মানুষের মনে স্নেহ দ্বারা মায়া আসবে কোথেকে? সুখের বিষয়,



আমাদের প্রধান মন্ত্রী গোড়াতেই balanced diet-এর আশ্বাস দিয়েছেন। Diet-এর balance রক্ষা হলেই মেজাজেরও balance রক্ষা হবে। চাই কি হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ পর্যন্ত থেমে যেতে পারে। হিন্দু-মুসলমানের মিলন কি শব্দ মূখের বাক্যে হবে? পেটের খাবো মিলন হলে তবেই সেটা টেকসই হবে। পেটে খেলে তবে ধর্মে সইবে, নইলে ধর্ম-বিরোধ কেউ থামাতে পারবে না।

অন্য প্রদেশের বেলায় যাই হোক বাঙলা দেশের হিন্দু-মুসলমান যে ভাই-ভাই, সে কি নতুন করে আজ বলতে হবে? শক হুন দল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন—বাঙলা দেশের মতো এটি এমন আর কোথায় হয়েছে? হিন্দু-মুসলমান আর কোথায় এক ভাষায় কথা বলে? আরে ভাই, এই যে মেজাজের কথা বলছি—এই শব্দটা এল কোথেকে? এটি তো আরবী শব্দ। আর মেজাজ মানে কি শব্দ? বদমেজাজ? মেজাজ বলতে বুঝি বাদশাহী মেজাজ। ছোট্ট একটি শব্দের মধ্যে কি বিরাত ব্যাপ্তি! এর একটি প্রতিশব্দ অন্য ভাষায় খুঁজে বের করুন তো। ইংরেজি temper অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত। ইংরেজরা temper হারায়, আমাদের মেজাজ কখনো হারায় না বা খোয়া যায় না। আমাদের মেজাজ খুঁশ হয়, মেজাজ শরীফ হয়। আর আমাদের মেজাজ একবার যদি বিগড়ায় তখন কাছে আসবু দেখি temper-হারানো ইংরেজ। দেখি কতক্ষণ টিকতে পারে? আমাদের মেজাজের ধাক্কায় temper তো temper ওদের empire পর্যন্ত ভেঙে গেল।

সত্যি বলতে কি মেজাজ শব্দটার একটা epic significance আছে। শব্দটা উচ্চারণ মাত্র আমার মন এক মুহূর্তে চলে যাচ্ছে নবাবী আমলে। চোখের সন্মুখে স্পষ্ট দেখছি—বাদশাহ, আমীর, ওমরাও, দাসী বাদী, অনেক অনেক বেগম, সুসজ্জিত হারেম আর

হরেক রকম রঙীন পানীয়। তাই বলে আশা করি, আমার চরিত্রের প্রতি আপনারা কটাক্ষ হানবেন না—বাদশাহী মেজাজ সময়ের স্রোতে বহুল পরিমাণে শোষিত হয়ে এসেছে। সময়ের সঙ্গে আমাদের মেজাজ গিয়েছে বদলে। ফলে আমার হারমে একটিমাত্র বেগম—আর গণতন্ত্রের যুগে দাসী বাদীর কথা না বলাই ভালো। বলতে গেলে দেশব্যাপী ধর্মঘট হবার আশঙ্কা আছে।

তবু মেজাজ কথাটার সঙ্গে একটা ক্লাসিক ঐশ্বর্য যুক্ত রয়েছে। বলতে পারি, আভিজাত্যের অন্য নাম মেজাজ। মেজাজের জোরেই রাজা সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারে, মদ্যপ মাতাল কর্পদকহীন হতে পারে—এমন কি, গরীব হাতী পর্যন্ত পুষতে পারে। এই আমার নিজের কথাই ধরুন না কেন। এই যে মাঝে মাঝে ‘দেশ’এর পাতা থেকে ইন্ট্রিজিং অদৃশ্য হচ্ছেন—কিছু মেজাজ তার অবশিষ্ট আছে বলেই তো। জানি এতে আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে, তার চাইতে বড় কথা অস্বপ্নচারণার সুবিধা থেকে বাঞ্ছিত হিচ্ছ—তবু আমার সর্বজনপ্রখ্যাত কুড়ৈমর মেজাজটি বজায় থাকছে তো! যদিচ অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক নই, তথাপি মেজাজের জোরে খানিকটা অভিজাত্য রক্ষা করবার চেষ্টা করছি।

আমি মেজাজকেই বলেছি আভিজাত্য। কিন্তু ফ্যাশনেবল পাড়ার যে আভিজাত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয়, সেটা আর সব জিনিসের মতো বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। সত্যিকারের যে মেজাজী আভিজাত্য সেটা নিউ মার্কেটে কিনবার সামগ্রীই নয়, অনেক পুরোনো আমলের জিনিস। মেজাজের সম্পর্ক হচ্ছে মগজের সঙ্গে। সেজন্যই জিনিসটা দামী। যাক, তবু কথা বাদ দিয়ে এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, এই গণতন্ত্রের যুগে মেজাজী আভিজাত্য চলবে কিনা। আমি বলি অলংবৎ চলবে। তার কারণ, গণতন্ত্র তো আভিজাত্যবিরোধী নয়—অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরোধী। ক্ষুদ্র অভিজাত-সমষ্টির বিনশ্টিতে আপনার সকল মানুষের মনে যেদিন আভিজাত্য বোধ সঞ্চারিত হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানুষ যখন আপন আপন মেজাজ মত চলতে পারবে, সেদিন যথার্থই সমাজের মেজাজ সুস্থ হবে, শান্ত হবে।



# যাত্রিদল

## শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

### ষষ্ঠ্যচারিংশ অধ্যায়

ই হারই এক বৎসর পরে আবার একদিন সম্ম্যাবেলা বিমলদা আর অজয়ের ভিতরে হইতেছিল। এবার লাহোর কংগ্রেসে বৃশি পক্ষশূন্য পূর্ণস্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ য়া গিয়াছে। এবং মহাত্মা গান্ধীকে আসন্ন মন্দোলন পরিচালনা করিবার সর্বপ্রকার চেষ্টা দেওয়া হইয়াছে। ২৬শে জানুয়ারীকে ধীনতা দিবস ঘোষণা করিয়া এবং এইদিনে ধীনতার সংক্ষপ্ত বাক্য পাঠ জাতীয় পতাকা জালন প্রভৃতি কার্যতালিকা প্রতিপালন রতে দেশবাসীকে অনুপ্রোথিত করা হইয়াছে। শ অপরূপ উৎসাহে এই অনুষ্ঠান পালন রয়াছে—কলিকাতার প্রতি গৃহে ও পার্কে তৎকালে প্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলিত য়াছিল। বিকালে প্রত্যেকটি পার্কে অসংখ্য নারী মিলিত হইয়া শোভাযাত্রা করিয়াছিল ধু কলিকাতাই নহে—সমস্ত ভারতবর্ষময় নারী বিপুল আগ্রহে এই দিনটির সমস্ত স্টিচী প্রতিপালন করিয়াছে। ইতিমধ্যেই ত্মা গান্ধীর লবণ আইন ভংগের জন্য ডাঙি ভিয়ান আরম্ভ হইয়াছে। ইতিপূর্বে বিস্মলবী মর্গগণের সহিত কংগ্রেসের যেটুকু আদর্শগত ভেদ ছিল—পূর্ণস্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ য়ায় এবং তাহারই উদ্দেশ্যে আন্দোলন ঘোষণা য় সে প্রভেদ দূর হইয়া গিয়াছে। বিস্মলবী মর্গগণও এই আন্দোলনে সর্বতোভাবে যোগ নের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—অবশ্য ইতিবেই ভবিষ্যতে কংগ্রেসের এমনি একটি রূপ পনা করিয়াই তাহার প্রায় প্রতি জেলায় গ্রেসে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন এবং সেই সমস্ত গ্রেস প্রতিষ্ঠানে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিতও রয়াছিলেন। অজয় এই আন্দোলনে যোগ বে স্থির হইয়াছে। উত্তর কলিকাতার একদল য়ছাসেবক লইয়া সে তমলুকে লবণ আইন গ করিতে যাইবে। এই সব বিষয়ে নানা উপ শ দিয়া বিমলদা আজ বিদায় লাইলেন। র কয়েকদিন পরে অজয় মা ও জ্যাঠামণির হত দেখা করিয়া যাইবার জন্য বাড়ি আসিয়া শিখত হইল। সম্ম্যাবেলা অজয় মায়ের ছে বসিয়া বলিল—তোমাকে কিন্তু মা নুই দিতে হবে।

কল্যাণী হাসিয়া বলিলেন—না চাইতেই

অনুমতি দিয়েছি, অঞ্জু! অজয় আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল—না চাইতেই দিয়েছ কি রকম?

—তোমার কথা কি আমি জানিনে বাবা! নইলে মা হয়েছি কেন বলতো? আর যদি নিষেধ করি তা হলেই কি তুই শুনবি—এবে তোদের রক্তের ধারা! তখন প্রসন্ন মনে কেন তোকে বিদায় দেব না বাবা! আমি অনেক ভেবেছি রে অনেক ভেবেই তোকে অনুমতি দিচ্ছি! অজয় মায়ের পারের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইয়া বলিল—সত্যি মা, তুমি এমনি করে চিনতে পার বলেই তো মা! কল্যাণী তাহাকে কোলের ভিতরে টানিয়া লইয়া বলিলেন—হয়েছে আর পাগলামো করিস্নে। অদূরে বারান্দায় মাদুরের উপরে অমিয় বসিয়াছিলেন। অজয় তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—মার অনুমতি পেয়েছি জ্যাঠামণি—এবার কিন্তু তোমার অনুমতি দিতে হবে। অমিয় হাসিয়া বলিলেন—নিজের মনের ভিতর থেকে যদি অনুমতি মেলে অঞ্জু, তার কাছে বাইরের আর সব মতামত যে মিছে! সেই অনুমতিই যদি তুই পেয়ে থাকিস্ন—আমি না বলবো কেমন করে?

—আপনি নিজে কি করবেন?

অমিয় বলিলেন—আমি তো কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি অঞ্জু!

—কিন্তু আপনি যদি জেলে যান, মা একা একা কেমন করে থাকবেন?

কল্যাণী হাসিয়া বলিলেন—মার কথা এতক্ষণে মনে পড়লো অঞ্জু!

অজয় বলিল—মনে অনেকক্ষণই পড়েছে মা, কিন্তু কিছুই তো ভেবে পাইনি!

অমিয় বলিলেন—আমিও তো আজ কয় দিন ধরে এই কথাটাই ভাবছি অঞ্জু—কি ব্যবস্থা করবো বুঝতে পারিনি। তোমার বিদ্যা বেঁচে থাকলে হয়তো ভাবতে হতো না। একা একা তো এই বাড়িতে থাকা সম্ভব হবে না। খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটিবার পর কল্যাণী পুনরায় হাসিয়া বলিলেন—তোমার অনুমতি চাওয়ার পালা তো শেষ হলো অঞ্জু! এবার আমি অনুমতি চাচ্ছি—তোমার জ্যাঠামণিকে জিজ্ঞাসা কর মেয়েরাও তো আজ দেশের কাজে নেমে পড়েছে। সেদিন বিভাবতী দেবী এসেছিলেন বেড়াতে—তিনি একুশসা

জেলে থেটেছেন—এবারও আন্দোলনে নামবেন। আমি কি তাঁরই সঙ্গে মিশে কিছু করতে পারিনে অঞ্জু! আমি তো তাকে কথা দিয়েছি—এখন তোদের সম্মতি পেলেই হয় বাবা। কেন মিথ্যে তোদের দৃষ্টিচলিত কারণ হয়ে থাকবো? অজয় মহা উৎসাহে খাড়া হইয়া বলিল—তুমি নামবে আন্দোলনে মা! খুব ভাল হয়—বেশ হয় মা। উঃ আমি বুক ফুলিয়ে বলতে পারবো আমার বাবা—আমার মা—আমার জ্যাঠামণি কেউ কম নয়—কেউ ছোট নয়।

কল্যাণী লজ্জিত হইয়া বলিলেন—তুই ধাম্ অঞ্জু, ভারী বাজে বাক্স।

অমিয় ধীরে ধীরে বলিলেন—এ কি তুমি সত্য বলছো বউমা? এ তোমার অভিমানের কথা নয় তো?

কল্যাণী জবাব দিল—না এ অভিমান নয়। দৃং অনেক পেয়েছি—কিন্তু তাই বলে অগেরিব তো কখনও অনুভব করিনি!

—তা হলে অনুমতি আমি দিচ্ছি বোমা—আমি আশীর্বাদ করছি। অজয় মহা উৎসাহে বলিয়া উঠিল—বেশ হলো জ্যাঠামণি—খুব ভাল হলো। হয়তো আর দুটি মাস পরে সবাই হবে জেলখানার অতিথি। আমার বাবা জ্যাঠামণি—মা কেউ বাদ থাকবে না। যে কোন লোকের কাছে আমরা বুক ফুলিয়ে বলতে পারবো—আমরা কেউ চুপ করে বসে থাকিনি—আমাদের যতটুকু ছিল—তার সবটুকুই দেশের জন্য আমরা নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছি।

কল্যাণী হাসিয়া বলিলেন—আবার! আশ্ব-প্রশংসায় পাপ হয় জানিস্ন?

অজয় লজ্জায় মায়ের কোলের ভিতরে নুখ লুকাইয়া—নিতান্ত কাঁচ ছেলের মতো তাহার দুই হাত দিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া রহিল।

### সপ্তচ্যারিংশ অধ্যায়

একুশজন সঙ্গী লইয়া সেদিন রাতি দশটার ট্রেনে অজয় হাওড়া স্টেশন হইতে তমলুকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। সঙ্গীদের সকলেই তাহার মত যুবক—সকলের চোখেই নূতন আশার আলোক—নূতন উৎসাহে পরিপূর্ণ। সারা রাতি জাগিয়া গাড়ীর ভিতরে সর্বক্ষণ স্বদেশী গান গাহিয়া, প্রতি স্টেশনে বন্দে মাতরম্, গান্ধীজী কি জয় ধনি করিয়া আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিতে লাগিল। পশ্চিমবঙ্গ স্টেশন হইতে বার চৌদ্দ মাইল পথ বাসে করিয়া গেলে তবে তমলুক সহরটি পাওয়া যাইবে। বাসের ভিতরেই বাইশটি প্রাণী অধীর আগ্রহে মাতিয়া উঠিল—কখন তাহারা তমলুকে পৌঁছাইবে! বাস যেখানে আসিয়া থামিল সেখান হইতে আধ মাইলখানেক হাটীয়া তবে তাহারা সত্যগ্রহ শিবিরে গিয়া পৌঁছিল। এই তমলুকই



প্রাচীন তাম্রলিপ্ত সহর পৌরাণিক যুগের কত প্রাচীন কাহিনী এই শহরের সাহিত্য যুক্ত তাহার ইতিহাস হয়তো কোন অশ্বকার তলে হারাইয়া গিয়াছে—কে আর আজ তাহার খবর রাখা! সত্যগ্রহ শিবিরটি একটি ভাঙা দোতারা অট্টালিকায় অবস্থিত। প্রকাশ্য বাড়ি চারিপাশে প্রাচীর। কতকাল ধরিয়া এমনি করিয়া পরিত্যক্ত হইয়া আছে কে জানে? ইহার প্রাচীন তাম্রলিপ্ত রাজবংশের প্রাসাদ। রাজবংশ আজ এই পুরাতন প্রাসাদের মতোই একটু দূরে একটা বাড়িতে এখনও কোনপ্রকারে টিকিয়া আছেন। সহরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—সহরটির ভিতরেও অসংখ্য পুষ্করিণী। সত্যগ্রহ শিবিরটির দক্ষিণে খানিকটা ফাঁকা মাঠ—এবং তাহার শেষ সীমা দিয়া পাশকুড়া তমলুকের চওড়া পথটি চলিয়া গিয়াছে। পূর্বদিকেও ফাঁকা মাঠ—এবং মাঠের মাঝে মাঝে অনেকগুলি পুষ্করিণী—প্রত্যেকটি পুষ্করিণীর চারিপাশ ঘিরিয়া শব্দ তালগাছের শ্রেণী। মাঠের চারিপাশ দিয়া বাবলা গাছ গ্রামের ভিতরে অসংখ্য নারিকেল ও তাল গাছ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই স্থানটির মাটি প্রায় সর্বত্রই কিছুটা লোনা। লোকে একটু চেষ্টা করিলেই এখানে তাহাদের দৈনন্দিনের প্রয়োজনীয় লবণ তৈরী করিয়া লইতে পারে। তাই এইরূপ কতকগুলি স্থান বিশেষ করিয়া বাড়িয়া লইয়া লবণ আইন অমান্যের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। অজয়দের আসিবার পূর্বেই প্রায় দেড়শ জন স্বেচ্ছাসেবক এখানে আসিয়া পেশীয়াছে। ইহারই অধীনে মফঃস্বলে দূরে দূরে আরও ৪৫টি কেন্দ্র ঠিক করা হইয়াছে। অজয়রা ক্যাম্পে পেশীয়া খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর মাঠের ভিতরের একটি পুকুরে গিয়া স্নান করিয়া আসিল। পুকুরটির জল পানের অনুপযুক্ত—লোনা। মুখে দিলে মুখে জ্বলিয়া যাইতে চায়। পরের দিন বিকাল পাঁচটায় এখান হইতে মাইলখানেক দূরে কোন গ্রামে লবণ আইন ভঙ্গ করা হইবে স্থির হইয়াছে এবং ঢোল দিয়া সর্বত্র ইহা ঘোষণা করিয়া সর্বসাধারণকে লবণ আইন অমান্যে যোগ দিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। ঠিক হইয়াছে সহরের ৫৭জন বিশিষ্ট মহিলাকর্মী লবণ তৈরী করিবেন এবং অজয় লবণ আইন ভঙ্গের সময় সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করিবে। দুইটি রাস্তার বাঁকে একটি পুষ্করিণী সেই পুষ্করিণীর পাশেই উন্নত কাটিয়া হাঁড়িতে লবণজল চড়াইয়া সিঁধ করা হইতে লাগিল। বহু পূর্বে হইতেই জন সমাগম আরম্ভ হইয়াছিল এবং ইতিমধ্যেই স্থানটি একেবারে ভরিয়া গিয়াছে। মনোমুগ্ধতা বন্দে মাতরম্ ধ্বনির মধ্যে অজয় বক্তৃতা দিতে উঠিল। লবণ তৈরী হইল কিছু বিস্তর হইল এবং বিপুল উত্তেজনার মধ্যে নির্বিঘ্নে সমস্ত অনুষ্ঠান শেষ হইল। অজয় এবং অন্যান্য কর্মীরা যখন সত্যগ্রহ শিবিরে ফিরিয়া আসিল তখন রাতি ৯টা

বাঁজিয়া গিয়াছে। ইহার একদিন পরে পুনরায় ঐস্থানে লবণ আইন ভঙ্গ হইবে সেদিনের সভায়ই তাহা ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। পরের দিনও আবার ঢোল দিয়া জানানো হইল। সেদিন সকাল বেলা অজয়রা জনকয়েক বসিয়া গল্প করিতেছিল এমন সময় একজন ভদ্রলোক আনিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ আরও দুইজন লোক আসিয়া ঢুকিল। একজনের মাথায় মস্তবড় একটা চাঙ্গারী এবং অন্যটির মাথায় মস্ত একটা পিতলের কলসী। তিনি লোক দুইটিকে পাশের একটি স্থান নির্দেশ করিয়া বলিলেন—রাখ সব এখানে নামিয়ে রাখ। অজয় বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল এসব কি? লোকটি হাদিয়া বলিলেন, আজ্ঞে এই সামান্য কিছু আপনাদের জন্যে নিয়ে এলাম। চাঙ্গারী ও কলসী নামাইলে দেখা গেল এক চাঙ্গারী মুড়ি ও অন্তত সের পাঁচ সাত তালের গুড় এবং কলসীটি ভরা এক কলসী দুধ। অজয় পুনরায় প্রশ্ন করিল—এত মুড়ি দুধ কি হবে?—আজ্ঞে, আপনাদের সেবার জন্যেই আনা। দয়া করে তুলে রাখুন। ঘরের টাটকা ভাজা মুড়ি নিজের গাছের তালের গুড়—দুধটাও নিজের বাড়িতেই ছিল—তাই ভাবনা যারা ঘরবাড়ি ছেড়ে দেশের জন্যে এত দুঃখকষ্ট ভোগ করতে এসেছেন দিয়ে আসি তাদের সেবার জন্য কিছু—জিনিসগুলো তবু একটা দিন সংলোকের সেবার লাগুক! বলিতে বলিতে ভদ্রলোক অজয়ের পাশে বসিয়া পড়িয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন—কাল আপনার বক্তৃতা শুনে একেবারে মেতে উঠেছিলাম মশায়—বয়স যদি থাকতো আপনাদের মতোই স্বদেশসেবার লেগে যেতাম। ভদ্রলোকের সত্যই বয়স হইয়াছে—মাথার চুলগুলো অধিকাংশই উঠিয়াছে পাকিয়া। গয়ে একটি বুক কাটা ফতুয়া পরনে একখানি একটু খাটা কাপড়—হাতে একখানি তেল পাকনো বাঁকা বাঁশের লাঠি। আকারে প্রকারে এই দেশীয় ভদ্রলোক বলিয়াই মনে হয়।

অজয় জিজ্ঞাসা করিল—আপনার নাম?

ভদ্রলোকটি বলিলেন—শ্রীগদাধর সেনাপতি।

একে গদাধর তাহাতে সেনাপতি নামটি শুনিয়াই দুই একটি ছেলের মদুহাসির রেখা মুখে ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু ভদ্রলোকের দৃষ্টি সেটুকু এড়াইল না। তিনিও হাসিয়া জবাব দিলেন—আজ্ঞে হাসবেন না আপনারা—সত্যিই এককালে আমাদের পূর্বপুরুষেরা সেনাপতিই ছিলেন—খুব মস্ত যোদ্ধা ছিলেন তাঁরা—সেকাল তো আর নাই—এখন আমাদের ঐ উপাধিটুকুই সার। ওটুকু এখনো ছাড়ান। তারপর অজয়ের দিকে পুনরায় ফিরিয়া বলিলেন—কাল আবার আইনভঙ্গ হবে তো—যাব আমিও। আমি মশায় ও পুলিশ ফোর্সের একটুও তোয়াক্কা করিনে। পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—আচ্ছা এখন উঠি—একদিন যদি আমাদের বাড়িতে

বেড়াতে যান—খুব খুশি হবে তাহলে। পরে পূর্বদিকের মাঠের প্রান্তসীমানায় অগল্গলী নির্দেশ করিয়া বলিলেন—ঐ যে তালগাছ ঘেরা পুকুর—ঐ আমাদের বাড়ি—কতটুকু আর পথ! পরে ভদ্রলোক আর এক প্রস্থ নমস্কার করিয়া বিদায় লইলেন। অজয় সঙ্গীদের লক্ষ্য করিয়া বলিল—ভদ্রলোক কিন্তু খুব অমায়িক। অন্য এজন বলিয়া উঠিল—একে সেনাপতি তায় গদাধর—পুলিশ ফোর্সের উনি একটুও ভয় করেন না। কারোক্ষেত্রে একটু পরীক্ষা করে দেখতে পারলে হতো।

পরের দিনও পূর্বাহুই সমস্ত মাঠ অসংখ্য জনসমাগমে একেবারে ভরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু অজয়রা যখন বড় রাস্তাটি হইতে মাঠের ভিতরে নামিতেছিল—তখন দেখিতে পাইল—উত্তর দিকের রাস্তা দিয়া মার্চ করিয়া বহুসংখ্য পুলিশ এইদিকেই আঁততেছে। পুলিশবাহিনীর পিছনে ছিল একখানা মোটর গাড়ি। শুনিতে পাওয়া গেল আজ স্বয়ং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আঁততেছেন। সন্ধ্যায় আজ যে ব্যাপার অতি সহজে নিষ্পন্ন হইবে না তাহা কাহারো অনুমান করিয়া লইতে বিলম্ব হইল না। নির্ধারিত সময়ে বন্দে মাতরম্ ধ্বনির মধ্যে মহিলারা লবণ তৈরী আরম্ভ করিলেন। ধান খামলে অজয় বক্তৃতা আরম্ভ করিল। কিন্তু মিনিট দশেক বক্তৃতা চলিতেই হঠাৎ জনতা যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। অজয় তাকিয়া দেখে কাভার কাভারে পুলিশ আসিয়া মাঠে ঢুকিতেছে এবং তাহাদেরই পিছনে অন্যান্য অফিসারসহ একজন ইউরোপীয়ান সম্ভবত ইন্সপেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট হইবেন। অজয়ের বক্তৃতা চলিতেই লাগিল। হঠাৎ পুলিশবাহিনী জনতার উপরে লাঠি চালাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। সমগ্র জনতা একেবারে ভীত চঞ্চল হইয়া সমস্ত মাঠময় একটা দারুণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিল। পুলিশ আগাইয়া আসিতেছে দেখিয়া অজয় বক্তৃতা থামাইয়া সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকগণকে মহিলাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইতে বলিল এবং নিজে তাহাদেরই একপাশে দাঁড়াইয়া বারে বারে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করিতে লাগিল। কয়েক মনোমুগ্ধতার পরে একটা প্রচণ্ড লাঠির আঘাত আসিয়া তাহার পিঠের উপরে পড়িল। তারপর আর একটি আর একটি এমনি অসংখ্য। তারপর কি হইল না হইল তাহার কোন ঘটনাই আর কিছুক্ষণ অজয়ের চোখে পড়িল না। পুলিশের দল এমনি করিয়া লাঠি কিল ঘাঘি নির্বিচারে তাহার উপরে চালিতে চালিতে তাহাকে টানিয়া একেবারে পুষ্করিণীর ধারে লইয়া গিয়া তাহারই ঢালু পাড়ের উপর হইতে ভিতরের দিকে গড়াইয়া দিল। অজয় গড়াইতে গড়াইতে একেবারে জলের ধারে গিয়া নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিল। এদিকে অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকগণকে রীতিমত প্রহার করিয়া কয়েক-

জনকে আশেপাশের রাস্তার ধারের নালার মধ্যে ও চষা ক্ষেতে টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। প্রায় ২০১২ জনকে হাতকড়া পরাইয়া কেম্পে দাড়ি বাঁধিয়া রাস্তার উপরে লইয়া দাড়ি করাইয়াছে। মহিলারা লবণের হাড়ির উপরে উপড় হইয়া পড়িয়া হাড়িগুলি রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদিগকে জোর করিয়া সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে—কাহাকে কাহাকেও অল্পবিস্তর আঘাতও করা হইয়াছে—নেই জলন্ত উনুনের হাড়িগুলি ভাগিয়া দিবার ফলে গরম জল হিট্‌কিয়া আসিয়া অনেকের হাত পা অনেকখানি করিয়া পুড়িয়া ফেস্কা উঠিয়া গিয়াছে। একপাশে একটি স্বেচ্ছাসেবক তখনও জাতীয় পতাকাটি ধরিয়া ছিল—জনকয়েক পুলিশ তাহার উপরে কিল ঘাষি চালাইয়া পতাকাটি কাড়িয়া লইবার উপক্রম করিতেই হঠাৎ একটি বৃন্দ দৌড়াইয়া আসিয়া নিজে বিপুল বিক্রমে পতাকাটি ছিনাইয়া লইয়া প্রাণপণে চাঁৎকার করিতে লাগিল বন্দে মাতরম্—বন্দে মাতরম্। অজয় ইতিমধ্যে খোড়াইতে খোড়াইতে কোনক্রমে পুকুরের পাড় বাঁহিয়া উপরে উঠিয়া আসিয়া বসিয়াছে। সে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল—বৃন্দ লোকটি আর কেহ নহে—সেই সকাল বেলার গদাধর সেনাপতি! সত্যি তো গদাধর তখন মিথ্যা আফালন করিয়া যান নাই—সত্যি তো এমনি করিয়া বিপদের ভিতরে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। কিন্তু সেনাপতি মহাশয়কেও অবিলম্বে ভূমিশ্রব্যা গ্রহণ করিতে হইল। তাঁহার পতাকা লইল ছিনাইয়া কিন্তু তবুও তাঁহার চাঁৎকার ধাঁধিল না। পুলিশ মারতে মারিতে তাঁহাকে রাস্তার দিকে টানিয়া লইয়া গেল। কিন্তু রাস্তার উপরে লইয়া গিয়াও গদাধরকে রেহাই দেওয়া হইল না—তেমনি নিদারুণ প্রহার চলিতেই লাগিল। এদিকে সমস্ত জনতা মাঠ ছাড়িয়া গেলোও রাস্তার আশেপাশে জনগণ চষা মাঠের ভিতরে ভিড় করিয়া কখনও আগাইয়া আসিয়াছিল কখনও পিছাইয়া যাইতেছিল, জনতা পুবেই খানিকটা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। গদাধর সেনাপতির উপরে এই অমানুষিক অত্যাচারে তাহাদের ভিতরে কিছু লোক একেবারে মরিয়া হইয়া চষা মাঠ হইতে ঢিল কুড়াইয়া লইয়া পুলিশের উদ্দেশ্যে ঢিল ছুড়িতে লাগিল। ইহাতে সেনাপতি মহাশয়ের উপর প্রহার আপাতত স্থগিত হইল বটে, কিন্তু পুলিশ কয়েকবার ফাঁকা গুলী চালাইল এবং দলে দলে লাঠি লইয়া মাঠে নামিয়া নির্বাচনে যাহাকে পাইল তাহাকেই প্রহার করিতে লাগিল। এমনি করিয়া যখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল তখন সমস্ত জনতা ক্রমে ক্রমে সরিয়া পড়িল। এদিকে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পুলিশদল ও বন্দিগণসহ থানার দিকে রওনা হইলেন। অজয়ের ভিতরে যাহারা অধিক আহত হইয়াছিল তাহাদের খানদুই

গরুর গাড়িতে চাপাইয়া অনেক রাতে তাহারা মহিলাকর্মীগণসহ ক্যাম্পে আসিয়া পৌঁছিল। রাতিতে খবর পাওয়া গেল—বন্দী স্বেচ্ছাসেবকগণকে বাসে উঠইয়া পাশকুড়ার দিকে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। কিন্তু অজয় ভাবিয়া পাইল না যে, যদি গ্রেপ্তার করবারই পুলিশের ইচ্ছা ছিল—তবে তাহাকে ছাড়িয়া অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকগণকে কেন গ্রেপ্তার করিল? সেই তো ছিল স্বেচ্ছাসেবকদের পরিচালক। বৃন্দ সেনাপতি মহাশয়কে যে বাসে করিয়া লইয়া যাওয়া হয় নাই—সে খবর অজয় জানিয়াছিল—অথচ তাহাকে মর্জিও দেওয়া হয় নাই। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব রাতিতেই মেনিনীপুরের দিকে চলিয়া গিয়াছেন—সে খবরও আসিয়াছে। কিন্তু গদাধর সেনাপতিকে এতদূর অবধি থানায় আটকাইয়া রাখিবার কি কারণ থাকিতে পারে অজয় বুঝিতে পারিল না—তাঁহার কথা ভাবিয়া সারারাত্রি অজয়ের দৃষ্টিচলিত্য অতিবাহিত হইল। অন্ধকার থাকিতেই অজয় শয্যাভাগ করিয়া অনা একজন স্বেচ্ছাসেবককে সঙ্গে লইয়া সেনাপতি মহাশয়ের খোঁজে বাহির হইল। থানায় যাইয়া কেমন করিয়া তাঁহার খোঁজ লইবে অজয় পথ চলিতে চলিতে সেই চিন্তাই করিতেছিল। থানার কাছাকাছি পৌঁছিতেই তাহার সংগীটি বলিয়া উঠিল—দেখুন তো অজয়না ঐ মাঠের ভিতরে পড়ে কে? অজয় চাহিয়া দেখিল সত্যি একটু দূরে চষা মাঠের ভিতরে কে একজন পড়িয়া আছে। অজয় ও তাহার সংগীটি দ্রুতপদে সৈনিক আগাইয়া যাইতেই বুঝিতে পারিল লোকটি আর কেহ নহে স্বয়ং সেনাপতি মহাশয়। অজয়কে দেখিয়াই তিনি দুই চোখের জল ছাড়িয়া দিলেন—তাঁহার নিকট হইতে যাহা শুনিতো পাওয়া গেল তাহার মর্ম এইরূপ—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকগণ থানা হইতে বিদায় লইবার পর সেনাপতি মহাশয়ের উপরে আর একপ্রশ্ন অমানুষিক প্রহার করা হয়। তাঁহার উপর এত বিরূপের কারণ এই যে, বিদেশী লোক এখানে আসিয়া যে এখানে গোলমোগের সৃষ্টি করিতেছে তাহা দমন করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না কিন্তু তিনি স্থানীয় লোক হইয়া কেন ইহাদের সহিত যোগ দিতে গেলেন। প্রহার করিয়া গভীর রাতে তাহাকে টানিয়া আনিয়া এই মাঠের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। সত্যি তাঁহার ায়ে ও সর্বশরীরে স্থানে স্থানে এমন ভীষণভাবে কুলিয়া উঠিয়াছিল যে তাঁহার পক্ষে হাঁটিয়া বাড়ি যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। অজয় ও তাঁহার সংগীতি কোনপ্রকারে তাহাকে বহন করিয়া বাড়িতে লইয়া গেল। বাড়ির মেয়েরা দারুণ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন এখন তাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া একেবারে সকলে মিলিয়া কান্না জুড়িয়া দিলেন। অজয় তাহাদিগকে

বুঝাইয়া গরম জল করিয়া সেনাপতি মহাশয়ের হাতে পায়ে সেক্ দিয়া খানিকটা স্নান করিয়া তুলিয়া তবে ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিল।

ইহার পর হইতে আপাতত কিছুদিনের জন্য তমলুকের লবণ আইন ভগ্ন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া অহিংসার মর্যাদা পূরণের রক্ষা করিতে পারে না—ফলে তাহাদিগকেই আবার বেপরোয়াভাবে পুলিশের প্রহার সহ্য করিতে হয়। সুতরাং স্থির হইল অজয়কে পনেরজন স্বেচ্ছাসেবক লইয়া দিন দুই বিশ্রাম করিয়া বিলাসপুর কেন্দ্রে নিয়া কাজ করিতে হইবে। অজয় এই ব্যবস্থাই মানিয়া লইল।.....

#### অষ্টচর্চাংশ অধ্যায়

যে স্বেচ্ছাসেবকগণকে পুলিশে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিল পনের দিন সন্ধ্যা নাগাদ তাহারা আবার ক্যাম্পে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাতে তাহাদিগকে পাশকুড়া হইতে হাওড়ার টিকেট করিয়া জোর করিয়া ট্রেনে তুলিয়া দেওয়া হয় এবং ২।১৫ টি স্টেশনে তাহাদিগের উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় কিন্তু ইহারই মধ্যে কোন এক ফাকে ছোট একটি স্টেশনে রাতির অন্ধকারে তাহারা বৃন্দ ঝাপ করিয়া ট্রেন হইতে নামিয়া পড়িয়া সারা রাত্রি ও সারাদিন ধরিয়া হাঁটিয়া পুনরায় ক্যাম্পে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ইহারই পনের দিন অজয় পনের জন স্বেচ্ছাসেবক লইয়া বিলাসপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। কুড়ি বাইশ মাইল বাসে করিয়া যাইয়া পরে সেখান হইতে ৮।১ মাইল হাঁটিয়া তবে বিলাসপুর পৌঁছিতে হইবে। অজয়রা বিলাসপুর ক্যাম্পে যখন পৌঁছিল তখন রাতি অনুমান আট নয়টা হইয়া গিয়াছে। একখানি খাড়ের ঘরে এখানে ক্যাম্প করা হইয়াছে। এ ঘরটিতে পূর্বে প্রাইনারী ইস্কুল হইত। সম্প্রতি গ্রামবাসীরা স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য ঘরখানি ছাড়িয়া দিয়া আপাততঃ ইস্কুলটি তুলিয়া লইয়াছে।

পরের দিন সকালে উঠিল অজয়রা কয়েকজন গ্রামখানা ঘুরিয়া দেখিতে বাহির হইল। গ্রামখানি সম্পন্ন পূর্ণাঙ্গ পরিপূর্ণ। প্রত্যেকখানি বাড়ী দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রায় প্রতি বাড়ীতেই দুইতিনটি করিয়া বড় বড় ধানের গোলা লাল মাটির দেওয়াল দেওয়া একতলা দোতলা টিনের ঘর—পুষ্কারিণী—এখানেও পুষ্কারিণীর ধারে অজন্ত তাল ও নারিকেল গাছ। গ্রামের সকলেই কৃষক। তাই বলিয়া নিরক্ষর চাষাও নয়—লিভার পলীহাষু ম্যালেরিয়া জীর্ণ চেহারাও নয়। গ্রামের স্বাস্থ্য ভাল। উচ্চ শিক্ষিত খুব কম হইলেও লোকগুলির প্রায় সকলেই প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত।

যাঁহারা একটু সম্পন্ন গৃহস্থ তাঁহারা লোক দিয়া কৃষিকার্য করান—বাঁহাদের অবস্থা তেমন ভাল নয়—তাঁহারা নিজে হাতে করিতেও শ্রমধা করেন না। ইহারা অধিকাংশই মাঁহিয়া সম্প্রদায়ের। লোকগুঁলির সরল ও উদার—গ্রামে ঢুকিয়া দুই একজনের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া অজর বিশেষ আনন্দ পাইল। মেদিনীপুর জেলার এই সম্প্রদায়টির জাতীয় আন্দোলনে যে দান কম নহে—অজর তাহা জানিত এবং এখানকারও অনেকে তাহা-দিগকে নানাপ্রকারে উৎসাহিত করিয়া তুলিত। সত্যই গ্রামটি দেখিয়া একটা অনির্বচনীয় আনন্দ লইয়া অজর ক্যাম্পে ফিরিয়া আসিল। ইহাই তো বাঙালি দেশের সত্যিকারের শস্যশ্যামলা পল্লীগাম। ধান্য এখানকার জমিতে প্রচুর ফলে—প্রতি বাড়ীতেই পাঁচ সাতটি করিয়া গাই—দুধের কিছুমাত্র অভাব নাই। প্রচুর নারিকেল, তালগুড়। আর চাই কি—এই তো যথেষ্ট। এখানকার অধিবাসীরা মাটি-মাকে ফেলিয়া রাখিয়া—বিশ্ববিদ্যায় হইতে দুইটি ডিগ্রী লইয়া গ্রীষ্ম চাক্ষুশ টাকার আশায় কলিকাতা মুখে উদ্ভ্রম্ভাসে ছুটিয়া যায় নাই। লেখাপড়া অল্প শিখিয়াছে বটে—কিন্তু নিজের দেশকে নিজের জমিকে নিজের মাকে তাহারা ঠিক চিনিয়া লইয়াছে। নানাপ্রকারে জমিতে খাটিয়া খাটাইয়া দিয়া ধনে লক্ষ্মীতে পরিপূর্ণ হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাতেছে। অজর মুগ্ধ হইল, এই না সত্যিকার বাঙালি দেশ!

সত্যগ্রহ শিবিরের কিছটা দূরেই কিছদিন হইতে একটি পুঁলিশ ক্যাম্প হইয়াছে। ইতিপূর্বে এখানকার স্বেচ্ছাসেবকগণ লবণ আইন ভঙ্গ করিয়াছে, কিন্তু পুঁলিশ কোন-প্রকার বাধা দেয় নাই। কিন্তু অজর এখানে আসায় পুঁলিশ ক্যাম্পে যেন একটা নতুন সাজা জাগিয়াছে। তাহারা এখানে নতুন পন্থা লইল—পরের দিন সন্ধ্যার পূর্বে অর্থাৎ ২০।২৫ জন লাঠিধারী পুঁলিশ সত্যগ্রহ শিবিরে হানা দিয়া জোর করিয়া সমস্ত সত্যগ্রহীদের ক্যাম্পের বাঁহর করিয়া দিয়া ক্যাম্পটি নিজেরা দখল করিয়া বাসিল। স্বেচ্ছাসেবকদের অনেকেই অল্প বিস্তর আহত হইয়াছে বটে, কিন্তু কিছই করিতে পারে নাই। অগত্যা নিজেরদের নিশ্চিত আবাসস্থানটি পুঁলিশের হস্তে সমর্পণ করিয়া সে রাতে তাহারা একটু দূরে চষা মাঠের ভিতর শূঁইয়া কাটাইয়া দিল। পরের দিন নিকটবর্তী পাড়া হইতে একটি ভদ্রলোক তাঁহার বাড়ীর কাছাকাছি একটি ফাঁকা জায়গায় মজুর লাগাইয়া একদিনের ভিতরেই হোগলার বড় একটি চলাঘর তৈয়ারী করিয়া স্বেচ্ছাসেবকদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অনেক পরামর্শের পর স্থির হইল

আপাততঃ কয়েক দিন লবণ আইন ভঙ্গ বন্ধ রাখিয়া অজর তাহাদের ক্যাম্পটি পুনরায় দখল করিতে চেষ্টা করিবে। দলে তাহারা এখন মোটে ২৫ জন। তাহারা ঠিক করিল প্রত্যহ দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকগণ ক্যাম্পটি দখল করিতে বাঁহবে। তাহারা সম্পূর্ণ অহিংস থাকিয়া জোর করিয়া ক্যাম্পে ঢুকিবে—পুঁলিশের প্রহার সহ্য করিবে কিন্তু ফিরাইয়া দিবে না। দিনের পর দিন এমনি করিলে পুঁলিশকে হয় তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে না হয় ক্যাম্পটি ছাড়িয়া যাইতে হইবে। এমনি করিয়া কয়েকদিন চলিবার পর একদিন সকাল বেলা কয়জন পুঁলিশ আসিয়া যে ভদ্রলোক তাহা-দিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন তাঁহাকে থানায় লইয়া গেল। সমস্ত দিন পরে সন্ধ্যাবেলা তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার প্রাণ নড়িবার শক্তি পর্যন্ত নাই। তিনি অজয়ের নিকট কাঁদিয়া পড়িলেন। পুঁলিশ কয়েকবার তাঁহার উপরে অসহ্য প্রহার করিয়াছে। সারাদিন বৈশাখের খর রোদ্রে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছে—স্নান হয় নাই—আহার হয় নাই। তিনি স্বেচ্ছাসেবকদের স্থান দিয়াছেন এই তাঁহার অপরাধ, তাঁহার উপরে আদেশ হইয়াছে—ভদ্রজই স্বেচ্ছাসেবকগণকে তাঁহার জায়গা হইতে উঠাইয়া দিতে হইবে—না হইলে আগামীকাল পুনরায় তাঁহাকে থানায় লইয়া গিয়া অদ্যকার ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইবে। ভদ্রলোক কাঁদিয়া ফেলিয়া জানাইলেন—এতগুলি ভদ্রসন্তানকে—স্বেচ্ছাসেবককে তিনি যে চলিয়া যাইতে বাঁহিবেন—তাহা তাঁহার অসাধ্য। তবে পুনরায় যদি তাঁহাকে থানায় লইয়া গিয়া এমনি করিয়া মারপিট করে তাহা হইলে তিনি বাঁচিবেন না। অজর ভদ্রলোকের অসহায় অবস্থা বঝিল। সুতরাং পুনরায় আবার সেই সন্ধ্যায়ই তাহাদিগকে টোল টোপুলা ঘাড়ে ফেলিয়া দূরে একটি মাঠের ভিতর গিয়া রাতি যাপনের স্থান ঠিক করিতে হইল। কিন্তু ইহার পর হইতে এমনি অবস্থা হইল যে, রাতি তাহারা বাহার জমির উপর বাস করিত তাহাকেই থানায় লইয়া গিয়া নিপীড়ন করিতে লাগিল। আধ মাইল খানেক দূরে একটি শ্মশান ঘাট ছিল—অবস্থা দেখিয়া অবশেষে ঠিক করিল তাহারা আর কাহারও জায়গায় থাকিবে না—শ্মশান তো কাহারও নিজের সম্পত্তি নয়—তাহারা এখান হইতে গিয়া শ্মশান ঘাটে গিয়াই রাতি যাপন করিবে। যে কথা সেই কাজ। পরের দিন বিকাল বেলা তাহাদের জিনিষপত্র লইয়া একেবারে শ্মশান ঘাটে আসিয়াই জুটিল। অনেকখানি স্থান জুড়িয়া বিস্তৃত একটি জলার ধারে এই শ্মশানটি অবস্থিত। ইহারই উত্তর পাশ দিয়া

একটি চওড়া রাস্তা আড়াআড়িভাবে বিলাস-পুন্দের ভিতর হইতে বাঁহর হইয়া এই জলাটির একেবারে ধার ঘেঁসিয়া সোজা পূর্ব-দিগের গ্রামগুলির পানে চলিয়া গিয়াছে। শ্মশান ঘাটের পাশে রাস্তার সংলগ্ন খানিকটা বাঁধান জায়গা সম্ভবত এখানে শবদাহকারীদের বিশ্রামের জন্য কোন দিন বিশ্রামাগার থাকিয়া থাকিবে। কিন্তু আজ আর সে ঘর নাই। তাহার মাটির পোতার খানিকটা অংশ আজও অবশিষ্ট রহিয়াছে। এই স্থানটিতে অজর আশ্রয় লইল। ইহার দক্ষিণে ৫।৬টি বাবলা গাছ স্থানটিকে ছায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে এবং ঠিক তাহার পরেই দুইটি তাল গাছ মুখোমুখি হইয়া অনেকদূর পর্যন্ত আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া এই জনমানবহীন প্রান্তরের ভিতর নিজেদের মহিমা ঘোষণা করিয়া সগোরবে দাঁড়িয়া আছে। গাছ দুইটির ডেগোর শীর্ষে শীর্ষে অসংখ্য বাবুই বাসা বাঁধিয়া বহুদিন হইতে তাহাদের উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। তালগাছের সম্মুখ ভাগ হইতে সোজা দক্ষিণ দিকে জলার ধার ঘেঁসিয়া ৪।৫ শত হাত লম্বা স্থানটিতে অশে পাশের অনেকগুলি গ্রামের মৃতদেহ সংকার করা হইয়া থাকে। এই বৈশাখ মাসেও জলাটি একেবারে শুকুইয়া যায় নাই। কচুরী ও কাদার মেশামেশি হইয়া তলার দিকে খানিকটা জল এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে। দিনের বেলায় রাখাল ছেলেরা এখানটায় গরু মহিষদের জল পান করাইয়া লয়—সুযোগমত ২।৪টি মাছও ধরে—কিন্তু রাতি বেলা বিশেষ দায় না ঠাকিলে ভুতের ভয়ে এদিকটায় কেহ মাড়াইতে চাহে না। সোদিন সন্ধ্যার পরে এই স্থানটিতেই একটি উনুন খুঁড়িয়া কড়াইতে দুধ গরম করিয়া দুধ মুড়ি ও তালের গুড় আহার করিয়া মহোৎসাহে যে বাহার কমল পাতিয়া শ্মশানঘাটের উন্মুক্ত আকাশতলে শূঁইয়া পড়িল। রাতি গভীর না হইতেই সংগীরা সকলে একে একে ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু অজরের চোখে ঘুম ছিল না। জ্যোৎস্না রাতি কিছু মাঝে মাঝে খণ্ড খণ্ড সাদা তরল মেঘ বারে বারে উড়িয়া আসিয়া জ্যোৎস্নাকে স্তান করিয়া দিতেছে। তাল গাছ দুইটির ঝুলিয়া পড়া শুকনা ডেগোয় বাতাস লাগিয়া সর সর করিয়া শব্দ হইতেছে—নাড়া পাইয়া মাঝে মাঝে বাসায় বাবুইগুলি কিচির মিচির করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে। জলের ভিতর কি একটি জলচর পাখী অশ্রুত গম্ভীর-ভাবে কুম্‌কুম্‌ শব্দ করিয়া ডাকিয়া চলিয়াছে। পূর্বে, উত্তরে, পশ্চিমে অনেকদূর পর্যন্ত জ্যোৎস্নালোকে দূরের গাছপালাগুলি কাল রেখার মত জাগিয়া উঠিতেছে। শূঁইয়া শূঁইয়াই অজর দুই চোখ মেলিয়া বহুকণ

পর্যন্ত এই দৃশ্যের দিকে তাকাইয়া রহিল।  
এমনি করিয়া চাহিয়া চাহিয়াই এক সময়ে  
তাহার দুই চোখ ভরিয়া ঘুম নামিয়া আসিল।  
কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিল ঠিক নাই, কিন্তু হঠাৎ  
এক সময়ে ঘুম তাহার ভাঙিয়া গেল।  
চাঁদ তখন পশ্চিম আকাশে নামিয়া পড়িয়াছে—  
জ্যোৎস্নালোক পূর্বের চেয়ে খানিকটা অস্পষ্ট  
হইয়া পড়িয়াছে। জলের ভিতর সেই পাখীটি  
তখনও থাকিয়া থাকিয়া তেমনি অদ্ভুতভাবেই  
ডাকিয়া উঠিতেছিল। পাখীটিকে ভারী  
বিশ্রী লাগিতেছিল অজয়ের। হঠাৎ শ্মশানের  
দিক হইতে যেন অফটম্বরে কাহারো কথা  
কহিয়া উঠিল। অজয় শিহরিয়া উঠিয়া  
সেই দিকে ফিরিয়া দেখে বাবলা গাছের ফাঁক  
দিয়া ও-পাশে যেন একটা আলোর রেখা ফুটিয়া  
উঠিয়াছে। ভয় ভয় করিতে লাগিল অজয়ের।  
সংগীরা তখনও সকলেই অঘোরে ঘুমাইয়া  
চলিয়াছে। ধীরে ধীরে আপনার শব্দ্যর উপরে  
চুপ করিয়া উঠিয়া বসিল সে। অস্পষ্ট কথার  
শব্দ তখনও ভাসিয়া আসিতেছিল। খানিকক্ষণ  
এমনি কাটিবার পর আলোটি যেন আগাইয়া  
আসিতে লাগিল। অজয় ভাল করিয়া চাহিয়া  
দেখে, জনকয়েক লোক একটা হ্যারিকেনের  
আলো লইয়া এই দিকেই আগাইয়া আসিতেছে।  
কয়েক মিনিটের মধ্যেই লোক কয়েকটি  
তাহাদের প্রায় কাছাকাছি আগাইয়া আসিল।  
অজয় প্রশ্ন করিল—কে? লোক কয়েকটি হঠাৎ  
যেন একেবারে চমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।  
কয়েক মুহূর্ত পরে সেখান হইতে প্রশ্ন  
আসিল—তোমরা কে?—আমরা সত্যগ্রহ  
ক্যাম্পের ভলান্টিয়ার। লোক কয়েকটি ভরসা  
পাইয়া ইতিমধ্যে আগাইয়া আসিয়াছে।  
অজয়ের হাত কয়েক দূরে আসিয়া দাঁড়াইয়া  
তাহাদের একজন প্রশ্ন করিল—আপনারা  
সারারাত্রি এই শ্মশানে শূন্যে আছেন নাকি?  
—হাঁ তাই তো আছি। —কেন আপনারদের  
ক্যাম্প কি হল? —পুলিশে দখল করে  
নিয়ন্ত্রে। —“গ্রামে আর কি কেউ একটা স্থান  
দেয় নি?” — দিয়েছিল। কিন্তু যে স্থান দেয়,  
পুলিশ তার উপরেই অত্যাচার করে—তাই শেষ  
সর্বসাধারণের সম্পত্তি এই শ্মশানে এসে আশ্রয়  
নিয়ন্ত্রে। কথা বলিতে বলিতে লোক কয়টি  
তাহাদের পাশে বসিয়া পড়িল। অজয় প্রশ্ন  
করিল—আপনারা এত রাতে কোথেকে এলেন?  
—ছোট একটা ছেলে মারা গিয়েছিল, তাকে  
শ্মশানে রেখে এলাম, কিন্তু এটা তো ভাল কথা  
নয়? অজয় জিজ্ঞাসা করিল—কি? —এই  
এমনি করে শ্মশানে শূন্যে থাকা। ভয় করে না  
আপনারদের? অজয় হাসিয়া জবাব দিল—  
দেখছেন তো আমরা পঁচিশটি প্রাণী—এত  
লোক একসঙ্গে আছি—ভয় করবে কেন। যে  
লোকটি কথা বলিতেছিলেন—তাহার বয়স  
হইয়াছে—তিনি মাথা নাড়িয়া বলিলেন—

উঃ হুঁ, সে একটা কথা নয়—ভয় পাবার সময়  
হলে একহাট লোকের ভিতরও ভয় পাওয়া  
যায়। আপনি ছেলেমানুষ বন্ধবেন না—আমার  
এই বয়েসে আমি অনেক দেখেছি। এটা একে  
শ্মশান, তার এদিক দিয়ে স্থানটির আবার  
একটি সন্ধানও আছে। অজয় বলিল—এছাড়া  
যে আমাদের অন্য উপায় নাই। লোকটি তাহার  
পাশের লোকটির সহিত কি যেন খানিকক্ষণ  
আলোচনা করিলেন। সকল কথা অজয়  
ভাল শুনতে পাইল না। পরে তিনি মুখ  
তুলিয়া বলিলেন—যাবেন আপনারা আমাদের  
গ্রামে। আমাদের বাড়ি চিংড়িপোতায়। এখান  
থেকে সোজা এই রাস্তা ধরে দুই মাইল যেতে  
হয়। আহা! বাসস্থানের বন্দোবস্ত আমরাই  
করব। —কিন্তু পুলিশের ভয় আছে যে—  
আপনাদের থানায় ধরে নিয়ে যাবে—অত্যাচার  
করবে। ভদ্রলোকটি বলিলেন—আমাদের ভিন্ন

থানা—তাছাড়া আমাদের গ্রামে বেশী কিছু  
করতে পুলিশ হয়ত সাহস নাও পেতে পারে।  
যদি কিছু করে, সেটুকু সহ্য করতে  
হবে। অজয় আশ্চর্য হইয়া গেল। এমনি  
করিয়া অযাচিতভাবে—কয়জন এত বড়  
সাহায্য করিতে পারে? ভদ্রলোকটি কহিলেন—  
সকালেই যাবেন তাহলে। আমাদের গ্রামের নাম  
চিংড়িপোতা—আমার নাম আদিত্যকুমার  
সামন্ত—নাম করলেই লোকে দেখিয়ে দেবে।  
অজয় স্বীকৃত হইল। —রাত্রি আর নাই—আজ  
এখন আমরা উঠি, বলিয়া ভদ্রলোকেরা বিদায়  
লইলেন। অজয়ের মনে মনে হাসি পাইল।  
ইতিপূর্বে একজন ছিলেন—সেনাপতি—  
তাহাদের সম্পর্কে আসিয়া তাহার লাঞ্ছনার  
শেষ ছিল না—আর ইনি হইতেছেন সামন্ত—  
ইহার কপালেই বা কি আছে—কে জানে।

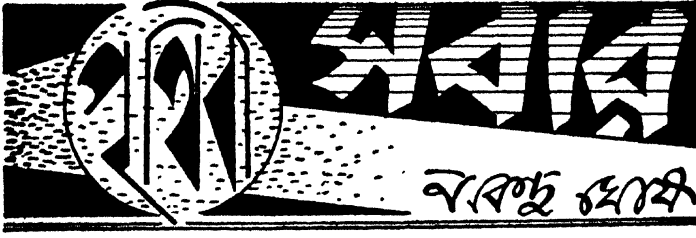
(রুমশ)



সদা জাতি দৃষ্টি  
সিদ্ধান্তে দ্রুত উপনীত হইতে  
সাহায্য করে। কিন্তু বিশ্বাসপ্রবণ  
ক্রেতাগণকে সহজেই অত্যাচারিত-  
যোগীতার কবলে ফেলা হইয়া থাকে, ফলে  
আসল জিনিষের পরিবর্তে নকল নিয়ে ঠকতে  
হয়। গুণ ও কার্যে “কণ্ডাবানল” সকল  
নিকট অহুসরণকে পরাজিত করিয়াছে। ইহাতে পাঁচড়া,  
ফোড়া, কাটা, পোড়া বা যে কোনও প্রকার ক্ষত নিকিত  
আরোগ্য হয়। সুতরাং এই মালিশযুক্ত এ্যান্টিসেপটিক  
কিনিবার সময় বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন  
যেন সামান্য নামান্তরে নিকট অহুসরণে প্রবৃত্তি না হয়।  
শুধু আসল ও বখের জন্তই দাম দিও।



এল, এম, শাহ গণপ্রতিনিধি গ্রুপ  
কোঃ লিঃ - ঢাকা  
গ্রাঃ ৩২ ই, ডাকঘর নং ১০৮, কলিকাতা



[ ৫ ]

প্রায় হাজার খানিক কালো মানুষেরা এসে বিলের ধারে থমকে দাঁড়াল। সূর্য উত্থানে ওঠেনি, পূর্বাকাশে শব্দ তার রক্তলিপি দেখা যাচ্ছে, হালকা কুয়াশার পাংলা একটা আবরণ বিস্তৃত বিলের ওপর ভোরের হাওয়ায় কাঁপছে। জল আর কাদা, বুনো ঘাস আর কচুরীপানা, বাষ্প আর শিশিরের ভিজে, নরম গন্ধ বুকের ভেতরটাতে নাড়া দিতে থাকে, সাড়া জাগায়। আর বিলের ধারে ধারে, জলের মধ্যে, ঘন ঘাস আর পানার ওপর, অজস্র বক এসে শিকারের লোভে বসেছে। সমাধিমণ্ডপ সাধুর মত তারা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হাজার খানিক লোক। শিরাসি, নিমইল, নিমডাঙ্গা, বাঘারিয়া আর হরিশপুত্রা থেকে এসেছে সীতলেশ্বরী অন্নর ধাঙে। আনারপুর আর কিস্টপুর থেকে এসেছে মুসলমানেরা। বেশীর ভাগই জোয়ান যুবক, তবে বড়ো এবং ছেলে-ছোকরারাও সংগে আছে।

থমকে দাঁড়াল মানুষগুলো। ক্ষণকালের জন্য পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর একটা বিকট, বন্য চীৎকারে নিজেদের উল্লাসকে ধ্বনিত করল।

“হো-ই-ই-ই-ই—বিলং নামেরে ভাই—ই-ই-ই”—মংরা চীৎকার করে বলল। দু’হাত মুখের দু’পাশে রেখে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে সে তাঁরবেগে জলের দিকে ছুটে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সেই হাজার খানিক কালো মানুষেরাও জলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

“হো-ই-ই-ই-ই”—অর্থহীন চীৎকারে ভোরের শান্ত আবহাওয়াটা কোথায় মিলিয়ে গেল। বকের দলের তপোভাঙ্গ হল, লম্বা লম্বা পাগুগুলো এয়েলেনের চাকব মত পেছন দিকে গুটিয়ে নিয়ে বাতাসে ডানা মেলে তারা দূরে গিয়ে বসল।

রক্তারুণ সূর্যদেব তখন পূর্বদিকের আকাশকে লাল করে তার হাসিমুখটি বের করল। দূরে কয়েকটা রাখাল ছেলেকে গরু-মেঘ নিয়ে আসতে দেখা গেল। ওদিকের গ্রাম থেকে মৎস্য-লোভী মানুষেরা আসতে লাগল।

হাজারটা মানুষের দুঃসাহস দেখার জন্য কৌতুহলী লোক ও ছেলেমেয়েরাও দৌড়ে আসতে লাগল।

ছেকা জালটা গুটোতে গুটোতে হাহা করে হেসে উঠল সোমা।

মংরা বন্ধুর দিকে তাকাল, “কি হৈল রে?”

“আরে শালা পলয়া গেল”—

“কি পলাল?”

“হুই শালার বোয়াল মাছ”—

ছেকা জাল ফেলছে কেউ, অনেকে গামছা দিয়েই ধরছে মাছ। পোলুই ডুবিয়ে ওপরকার মৃৎ দিয়ে জল আর কাদার মধ্যে হাঙাচ্ছে, মাছ লক্ষ্য করে কোঁচ নিক্ষেপ করছে, লাঠি মারছে, আবার অনেকে খালি হাতেই ধরবার চেষ্টা করছে। ছোট ছোট কয়েকটা হেলে মাছ ধরার নাম করে জলের মধ্যে ডুব দিচ্ছে, আবার হুস করে মাথা তুলে হিহি করে হাসছে আর নাক ঝাড়ছে।

“শালার মাছ কুথায় গ্যাল জী আঁ?” চোখ বড় বড় করে প্রশ্ন করল মাইনুদ্দিন—আনার-পুরের ছেলে।

মংরা হাসল তার কথা শুনে, বলল, “সিটা তো হামিও শূখাছি ভাই—কুথায় গ্যাল?”

“হাঃ হাঃ হাঃ”—প্রাণ খুলে হেসে উঠল মাইনুদ্দিন—আনারপুরের মুসলমান ছেলে।

উত্তেজিত কোলাহল আর হাসি, ছপ্ছপ্ছ ঝপাং চটাস—জলের শব্দ, আর মাছের লাফ। বিমথিত পক্ষ আর ঘোলা জলের তীব্র আশটে দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠল। পলাতক বকেরা শূন্য পাক খেয়ে খেয়ে সুবিধামত জায়গা পাবার চেষ্টা করতে লাগল আর তাঁক্ষ-কণ্ঠে চীৎকার করে তাদের অসন্তোষ জানাল। লোভী মানুষগুলো তাদের স্বার্থকে বিপন্ন করেছে, তাদের রাজ্যে হানা দিয়ে তাদের মুখের গ্রাসকে কেড়ে নিচ্ছে।

“ধইরাছি ধইরাছি মাছটাকে”—মংরা চীৎকার করে উঠল।

মংরার চীৎকারে টোমা এগিয়ে এল, “দেখি আহা, উ যে হামার শালা আছেক রে মংরা। দাঁড়া, ধইরাছি। দুহাই মা মেরী, মাছটো ব্যানে পলাম না গো দুহাই”—

প্রায় সাতসেরি একটা বোয়াল মাছকে দুজনে ডাঙায় টেনে তুলল।

“আর বাপ্ বড় মাছ যি রে!” মেঘু চোখ বড় বড় করে এগিয়ে আসছিল, পা পিছলে জলের মধ্যে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

শুকরা হেসে উঠল, “হাঃ হাঃ হাঃ—মর শালা, পানি খাইয়া মর”—

“সাপ!” কেটপুরের রহমৎ আলি চোঁচিয়ে উঠল।

কাছাকাছি যারা হিল তারা এগিয়ে আসতে আসতে জিজ্ঞেস করল, “কুনঠে, কুনঠে জী?”

“হুই দেখা যাচ্ছে, হুই যাচ্ছে—কলমীর ডাটার মত হুই যে”—উত্তেজিতভাবে দেখাল রহমৎ আলি, “শালা হামার শরীল ঘেবা চলা গেল”—

“হয়!”

“হয় ভাই—চলা গেল”—

“কুন সাপ্ ভাই!”—মংরা প্রশ্ন করল।

“গোহুমন্ মালদু দিছে”—জবাব দিল কেটপুরের রহমৎ।

“হাঁ?”

“হাঁ ভাই? হুই—হুই যাচ্ছে—”

মংরা হেসে উঠল, “হাঃ হাঃ হাঃ”—

“হাইস্ছ কানে হে?” অবাক হল কেটপুরের রহমৎ।

“আরে উটা যে বাণ মাছ মিঞা”—

“হাঁ?”

“হাঁ জী!”

“হাঃ হাঃ হাঃ”—যারা যারা শুনল ও দেখল ব্যাপারটা তারা প্রাণ খুলে হেসে উঠল, হেসে গাড়িয়ে পড়ল, ছেলেমানুষের মত জলের হিটে দিল কেটপুরের রহমতের গায়ে।

হঠাৎ সবার হাসি থেমে গেল। থেমে গেল সবার কোলাহল। মুহূর্তে বিলের বুকে মধ্যরাত্রির ভৌতিক স্তম্ভতা নেমে এল, হাজারটা মানুষের কণ্ঠ যেন মূক হয়ে গেল; কৌতুহলী জনতা নিজেদেরও অজ্ঞাতে এক পা করে পিছিয়ে গেল। সামনের দিকে তাকাল সবাই। বিলের যে অংশে তখনও বুক-জল বা মানুষ-ডোবা জল আছে, তার ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দ, প্রতর্গতভাবে তিনটে নৌকা ছুটে আসছে। হঠাৎ একটা নৌকা থেমে গেল, কিন্তু বাকী দুটো একইভাবে তাঁরের মত জল কেটে এগিয়ে আসতে লাগল। আর সেই দুটো নৌকার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল অনেকগুলো লাল পাগাড়ি। তাদের প্রত্যেকের হাতেই রাইফেল।

“হেই মংরা—হেই”—মংরাকে ঠেলা দিল সোমা।

কিন্তু মংরা সাড়া দিল না। সে সোজা তাকাল। ক্রমেই এগিয়ে আসছে নৌকা দুটো। সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে রাইফেলের নলগুলো।

লাল পাগড়িগুলোর রং এবার গাঢ় লাল মনে হচ্ছে। ভোরবেলাকার লাল সূর্যই যেন ঐ পাগড়িগুলোকে লাল করেছে, আর তাই করতে গিয়েই যেন রক্তশূন্য হয়ে সাদা হয়ে গেছে নিজে। মৃহুভের জন্য মংরার সমস্ত চেতনা যেন অসাড় হয়ে গেল। বন্দুক, গুলী করবে।

আরো কাছে এগিয়ে এল নৌকো দুটো।

হঠাৎ কেটে গেল সেই স্তম্ভিত, সম্মোহিত ভাব। দম্কা হাওয়ার মত কোলাহল ধ্বনিত হল, তরঙ্গের মত ছড়িয়ে পড়ল, তা হাজারটা মানুষের মধ্যে।

“পুলিস! পুলিস!”

“বন্দুক, আয় বাপ!”

জল ভেঙে বিশৃঙ্খলভাবে ওরা হুড়োহুড়ি আরম্ভ করে দিল। এতদিনকার অধিকার? ঈশ্বরের দোওয়া হলে যে মাছ জন্মায়, তাও কি কারো একার? পৃথিবীটার সঙ্গে আলো বাতাস আর জলকেও কি জমিদার আর রাজারা জয় করেছে। জমিদারের ডকা তাহলে মিথ্যে ভয় দেখায় নি। মাছ মারতে আসার সঙ্গেই বন্দুক এসে হাজির হয়েছে। তাদের মারবে। বটে! হঠাৎ যেন ওদের রোখ চেপে গেল। পুলিসদের দেখিয়ে দেখিয়ে মাছ মারার জন্য একটা অদম্য, বন্য আবেগ তাদের পাথরের মত শক্ত বুকুর নীচে ঘনিয়ে উঠল।

“মার, মাছ মার ভাই সব”—মংরা সোংসায়ে গর্জন করে উঠল হঠাৎ।

‘হোই-ই-ই-ই—মাছ মারো জী-ই-ই-ই’—

“মাছ মারো-হামাদের হক যি টা”—

চীৎকারের চেটে বাতাস কপে উঠল, কাণে তাল লাগবার উপক্রম হল।

নৌকো দুটো থেমে গেল।

একটার মধ্যে ছিলেন মিঃ সেন ও নন্দী গ্রামের দারোগা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিলেন পুলিস সাহেব।

অর্ধ-নন্দ সাঁওতাল, খাঙড় ও মুসলমানদের দিকে তাকিয়ে অনুকম্পার হাসি হানলেন মিঃ সেন। গুড হেভেনস্, এই সব জানোয়ারের মত মানুষগুলোকে তাদানো কি এমন কঠিন ব্যাপার যে, শিবেন্দ্রকুমার নার্ভাস হয়ে পড়েছেন।

তিনি চীৎকার করে বললেন, “এ্যাই এ্যাই—তোরা শোন”—

দারোগা ঘোষণা করল, “শোন—শহর থেকে আমাদের বড়সাহেব এসেছেন, তিনি কি বলেন শোন”—

কোলাহলটায় আবার একটা ছেদ পড়ল, অস্পষ্ট গুঞ্জে পর্যবসিত হল তা।

“বড়া সাহেব—তায় বাপ!”

কুনটা—কুন আদমিটা হে?”

“উই যি—উই যিরে বাপ!”—

মিঃ সেন সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, “শোন—তোরা বাড়ি ফিরে যা। এ বিলের

মাছ এ্যাম্পিন থেরেইস তোরা, জমিদার তোদের কিছু বলেন নি। কিন্তু এবার থেকে তার বিলের মাছ দরকার।”

“কিন্তুক হামাদেরো তো মাছ দরকার হুজুর”—মংরা নির্ভয়ে এগিয়ে এসে বলল, মিঃ সেনকে “আপনাদের সাথে তো হামাদের লড়াই লয়, আপনারা ফিরা যান হুজুর”—

“হয়—হামাদেরো তো দরকার হুজুর”—

“হামরা যে গরীব হুজুর”—

“ইটা হামাদের হক হুজুর”—

“ই হক হামরা ছাইব নাই”—

গর্জন করে উঠলেন মিঃ সেন, কোমরে কোলানো চামড়ার খাপ থেকে রিভলবারটাকে টেনে বের করে দোলাতে দোলাতে তিনি বললেন, “চোপ—চুপ করে কথা শোন আমার”—

দারোগাও গর্জন করল, “চোপ ব্যাটার—চোপ”—

মিঃ সেন বললেন, “কোন কথা শুনতে চাই না তোদের, বুঝলি? ভালমানুষ বলেই হুঁসিয়ার করে দিচ্ছি, সময় বিচ্ছিত তোদের। যা, বাড়ি ফিরে যা”—

মংরা যেন ক্ষেপে গেল, চীৎকার করে সবার দিকে তাকিয়ে বলল, “না, যাইস না ডুরা। যদি এক বাপের ব্যাটা হইস তো মাছ মাইরা তবে ফিরাব ঘরোং”—

“মাছ মার—মাছ মার ভাই”—সোমো বলল।

মংরার কথায় সবাই গরম হয়ে উঠল আবার, ‘হয় হামরা মাছ মারমুই তো—মারমুই’—

আবার জলের মধ্যে হুড়োহুড়ি করে মাছ ধরতে আরম্ভ করল সবাই। কোলাহল করে, ন্বিগুণ উৎসাহে ও উত্তেজনায়ে উত্তপ্ত হয়ে।

মিঃ সেন আবার গর্জন করলেন, “ফিরে যা বোকারা—ফিরে যা”—

কিন্তু কে তার কথা শুনবে? এখানে সেখানে চারদিকে ছড়িয়ে আছে লোকেরা। সবাই মাছ ধরার ব্যগ্গতায় পাগল। আইনের প্রতীকদের দেখে আইনভঙ্গের দুঃসাহসটা তাদের আরো দুর্বীর হয়ে উঠেছে।

“মার—মার—মাছ মার”—

মিঃ সেন বললেন, “ফায়ার”—

—গুড়ুম—গুড়ুম—গুড়ুম—

দশজন সশস্ত্র পুলিস। আর মিঃ সেন ও দারোগা সাহেবের রিভলবার। বারটা গুলী ছুটল, রাইফেল ও রিভলবারের নল বেয়ে ঘন, নীলাভ ধোঁয়া ছটকে শরোল, গুলীর ভারী শব্দ প্রতিধ্বনি তুলে গাড়িয়ে গেল দিগন্তের দিকে। বারুদের গন্ধ-মাখানো বাতাসকে আলোড়িত করে বকেরা সশব্দে উড়ে গেল, কৌতূহলী জনতা উধ্বংস হয়ে ছুটে পালাল, আর বিলের বুক থেকে তীব্র, তীক্ষ্ণ আত্নাদ ভোরের আকাশের দিকে কাঁপতে কাঁপতে উঠতে লাগল।

“আ—আ—আ—আ—

বিলের পঙ্কিল, ঘোলাটে জলে লাল রক্তের ধারা মিশিয়ে ছুটা জোয়ান মানুষ ঢলে পড়ল।

“আয় বাপ—গুলী ছুইড়াছ—পলা—”

“পলা—পলা”—

আবার গুলীর আওয়াজ হল। জলে রক্ত মিশিয়ে কয়েকটা মানুষ জলে ডুবে গেল। ভয়াবহ আত্নাদ আর কোলাহলে আকাশ-বাতাস ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

কঠিন ও স্থির দৃষ্টি মেলে পুলিসগুলো রাইফেল উঁচিয়ে লক্ষ্য করছে কালো মানুষ-গুলোকে—নিষ্ঠুর কাঠিন্যের সঙ্গে। জনতা পালাতে আরম্ভ করেছে।

“পলা—পলা”—জল ভেঙে ডাঙায় ওঠার জন্য সবাই ক্ষেপে গেছে।

অসহায় দৃষ্টি মেলে, পাগলের মত চীৎকার করে মংরা বলল, “পলাস নাই, পলাস নাই—মরনের বাচ্চা না ডুরা? পলাস ক্যানে?”

—গুড়ুম—গুড়ুম—গুড়ুম—

মংরার চীৎকারকে ব্যগ্গ করে রাইফেল গর্জে উঠল। ভারী পাথরের মত আরো কয়েকটা মানুষ জলের মধ্যে ডুবে গেল।

“পলাস নাই রে হারামীর দল—দাঁড়ি”—

ক্ষেপে গেছে, বুনো মোষের মত পাগল হয়ে গেছে মংরা। কিন্তু কে তার কথা শুনবে? সবাই তখন আত্ন চীৎকারে জল তোলপাড় করে ডাঙায় উঠছে, সোজা দৌড় মারছে ক্ষেতের দিকে। উধ্বংসবাসে। কি যেন ঘটল। মংরা আত্নবিশ্মত হয়ে গেল, সমস্ত চেতনা তার বারুদের ধোঁয়ার মত বাতাসে মিলিয়ে গেল যেন। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, বিহবল দুটো চোখ মেলে সে পলায়মান মানুষ-গুলোকে দেখতে লাগল।

আবার রাইফেলের গর্জন। আরো কয়েক-বার। টুপটাপ পড়ছে মানুষেরা, গাঢ় রক্তে জায়গায় জায়গায় লাল হয়ে উঠছে বিলের ঘোলাটে জল। জলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে, কাদার মধ্যে মৃদু থবড়ে পড়ছে জোয়ান লোকগুলো। বৃহৎ উঠছে জায়গায় জায়গায়। যারা গুলী খেয়েও মরেনি, তারা দম বন্ধ হয়ে জলের নীচে মরছে।

মাছ ফেলে পালাচ্ছে সবাই। ডাঙার ওপর, কাদার মধ্যে জ্যাস্ত মাছগুলো লাফাচ্ছে, চকচক করছে তাদের রূপোলী আঁশগুলো। যে মাছের জন্য দল বেঁধে এসেছিল, সেই মাছ ফেলেই পালাচ্ছে ওরা।

“পলায়া যাচ্ছে—পলায়া যাচ্ছে!” কামার সুরে বিড় বিড় করে বলল মংরা, তাকাল বিলের দিকে, তাকাল ডাঙার ওপরকার হতাহতের দিকে। দূরে একজন রাখাল মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। নিরীহ রাখাল ছেলে, তার নিষ্পাপ, কমনীয় মৃদুখটায় একটা গভীর যন্ত্রণা শব্দ হয়ে আছে। ছটফট করছে

একটা মোষ, বিলের বুকের নখর দুর্বা-ঘাসের লোভ তার একটু বাবেই মিটে যাবে। বড় বড় দুটো চোখ মেলে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে জানোয়ারটা।

ওরাও গুলী খেয়েছে।

আবার গুলী ছুটল। আবার আতর্নাদ শোনা গেল। আর এবার মংরার মুখ থেকেও একটা ক্ষীণ আতর্নাদ বেরিয়ে এল। তার ডান হাতের কনুইয়ের নীচের মাংস ভেদ করে গুলী চলে গেছে—দগদগে একটা রক্তাক্ত রেখা টেনে। গুলীটা বেরিয়ে যেতেই লাফিয়ে উঠল মংরা, একটা জ্বালাময় ও উত্তপ্ত যন্ত্রণা বোধ হল সেই ক্ষত স্থানে, ক্রমে সেটা অসহ্য হয়ে উঠল, গল গল করে রক্ত ছুটল সেখান থেকে। তবু নড়ল না মংরা, আতঙ্ক-বিহ্বল দৃষ্টি মেলে সে সামনের দিকেই হাঁ করে তাকিয়ে রইল। মরেছে, কত মানুষ মরেছে! কত জোয়ান মারা গেছে! আয় বাপ্—

হঠাৎ একটা হেঁচকা টানে মুখ ফিরাল মংরা।

“চল, ঘরোং চল”—সোমা আর টোমা বলল।

“কেন্তো মনিষ মারা গেল রে সোমা—কেন্তো”—

“চল, ঘরোং চল—জান বাঁচা”—ধমকে উঠল সোমা, মংরাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল।

নৌকো দুটো এবার এগোতে আরম্ভ করল। পুন্ডলি সাহেব কি যেন বললেন চোঁচিয়ে।

শুকনো ডাঙার ওপর দিয়ে ছুট দিল ওরা। উদ্ভ্রম্বাসে। টোমা ঠিকভাবে দৌড়োতে পারছিল না। মাঝে মাঝে সে থামতে লাগল। একটা বুলেট তার উরুর চামড়া ছুঁয়ে গেছে। রক্ত চুঁয়ে পড়ছে শুকনো, সাদা মাটির ওপর। গাঢ় লাল রক্ত। শুধু সোমার কিছন্ন হয়নি।

“কণ্ট হচ্ছে তুদের—আঁ?” সোমা জিজ্ঞেস করল।

“নাঃ, বেশী লয়, সহ্য লিমু”—টোমা হাসল।

মংরা কথা বলল না। তার গলা শুঁকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

খানিকটা দূরে গিয়েই থমকে দাঁড়ালো তারা। বিলটা সেখানে একটা বাক ফিরেছে। সেই বাকের সামনে অনেকগুলো আম-জাম-গাছের ছায়ায় পশ্চিমা গোয়ালারা বাথান করে থাকে। সেই সব গাছের আড়াল থেকেই দূরে দ-ডায়মান তৃতীয় নৌকোটকে দেখল ওরা। ছইয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন জমিদার শিবেন্দ্রকুমার চৌধুরী, দ-পাশে রাইফেলধারী পুন্ডলিশ ও জনার্দন সিং।

যেন সাপে কামড়াল, নির্মম্ব আকাশের বক থেকে যেন বাজ পড়ল তাদের মাথায়। পলাতকেরা দেখল যে জমিদারের পেছনে,

ছইয়ের ভেতরে, উবু হয়ে বসে আছে রসিক মাঝি, চোরের মত দেখছে এদিক ওদিক। জ্বল নয়। রসিক মাঝিকে তারা পারিস্কার দেখতে পেল।

মংরার চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল, দাঁতে দাঁতে ঘষে সে বলল, “বেইমান—বেইমান”—

সোমা তাকে ঠেলা দিল, বলল, “ঘরোং চল ক্যানে—উসব বাং পিছে করাভ”—

মংরা কেঁদে ফেলল, জোয়ান মানুষটার দুটোখ দিয়ে ভেতরকার আগুন তরল হয়ে বেরিয়ে এল, সে কম্পিতকণ্ঠে বলল, “কেতো মনিষ মরি গেল্, আয় বাপ্, কেন্তো জোয়ান মরি গেল্”—

সারা পথ রক্ত চুঁয়ে চুঁয়ে ওরা বাড়ী ফিরল।

বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল সবাই।

হঠাৎ সোমা একটা খবর দিল, আগুন আর জলে ভরা ছোট ছোট চোখ দুটোকে আকাশের দিকে তুলে সে বলল, “হামাদের দুটা সাথী মরি গিছে—দুটা”—

ভয়াতকণ্ঠে মংরা প্রশ্ন করল, “কারা—কারা মরি গেল্?”

“শুকরা আর মেঘ—হামাদের দুটা সাথী—দুটা”—

দাওয়ার ওপর বসে পড়ল মংরা, কোন কথা বলল না, থর থর করে কেঁপে উঠল তার বিশাল দেহটা, মুষ্টিবদ্ধ হাতে মাটির ওপর আঘাত করে বিড়বিড় করে সে বিলাপের সুরে বলতে লাগল, “দুটা সাথী—দুটা মরদ—মরি গেল্, মরি গেল্”—

কোনো সান্ধনাই দিল না সোমা। টোমাকে নিয়ে সে নিঃশব্দে সরে পড়ার জন্য পা বাড়াল।

“সোমা”—মংরা ডাকল।

“কি?”

“বেইমান বড়হাটার কথা কিন্তুক অখনি সভাইকে কহিস্ নাই”—

সোমা কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবল, কি যেন একটা অন্তর্স্বন্দে সে খুব ব্যাকুল হয়ে উঠল, তারপর হঠাৎ দ্রুতপদে টোমাকে নিয়ে চলে গেল।

যাবার আগে সে একবার বিকৃতকণ্ঠে বলল, “যাছি হামি, পরে আসমু—জখমে পটি লাগা তু”—

কোন জবাব দিলনা মংরা, নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল, “মরি গেল্—হামার দুটা জোয়ান সাথী মরি গেল্”—

বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের ক্ষতটা চেপে ধরে সে নিস্তত্ব হয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর দুর্বলকণ্ঠে ডাকল, “বুম্—বুম্—বুম্—

ছুটে এল বুম্—বুম্, “ফিরিছিস্ তু—ফিরিছিস্?”

হঠাৎ সে কাছে এসে থমকে দাঁড়াল, তার

দুটোখের তারায় গভীর শঙ্কা প্রকাশ পেল, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে সে বলল, “খুন পড়িছে, খুন! ক্যানে জী—ক্যানে?”

জবাব দিল না মংরা।

বুম্—বুম্ বলতে লাগল! “বুম্ বুম্ আওয়াজ শুনলম্—সভাই বলল কি বন্দকের আওয়াজ মালুম হচ্ছে। ক্যানে? জবাব দিছিস্ না ক্যানে জী?”

“পুন্ডলিশ—পুন্ডলিশ গুলী মারাছিল”—ক্লান্ত-কণ্ঠে সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে চুপ করল মংরা।

হঠাৎ যেন চমক ভাঙল বুম্—বুম্, “দেখি তুর জখমটা দেখি”—হাতটা সরাল মংরা।

“আয় বাপ্—অয় বাপ্”—আতর্নাদ করে উঠল বুম্—বুম্।

“চিল্লাস নাই বহু—চুপ করা থাক্”—

“কি করমু হামি—কি করমু?”

“একটা মলহম্ দে—সিই মলহম্—টা”—

“হা হা দিছি—দিছি”—

উঠে দাঁড়াল বুম্—বুম্, ছুটে ভিতরে গেল।

পরক্ষণেই এক ঘটি জল, জংলী গাছের শিকড় ও পাতার মলম ও কিছু ন্যাকড়া নিয়ে ফিরে এল। স্বামীর কাছে বসে পরম যত্নের সঙ্গে সে তার ক্ষত ধুয়ে দিল, মলম লাগিয়ে বেঁধে দিল, কেঁদে স্বামীকে বুকের দিকে টেনে বলল, “জান দিবার গেল্—ছিলা তু—ক্যানে, হামি কি তুর কেউ লয়?”

মংরা স্তবীর আকুলতার দিকে দৃষ্টি দিল না। শূন্যদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে সে বিড়বিড় করে বলল, “দুটা—হামার দুটা সাথী মরি গেল্—মরি গেল্”—

ছইয়ের নীচে রসিক মাঝি বাজপোড়া জানোয়ারের মত মাথা নীচু করে বসে ছিল। একি করল সে! একি করল। পাঁচটা গায়ের সাঁওতালেরা তার কথা মানে, সে ভেবেছিল যে তাদের সে ঠান্ডা রাখতে পারবে। এই ভরসাতেই কয়েকটা টাকার প্রলোভনকে সে মারাত্মক বলে ভাবেনি, হাত পেতে নিয়েছিল তা। প্রতিশ্রুতি মত জমিদারকে খবরও দিয়েছিল এই ভেবে যে ভয়ঙ্কর কিছু হবে না, পুন্ডলি এসে ধমক দিয়ে লাঠি তুললেই সবাই পাশিয়ে যাবে। কিন্তু কি হল? সত্যি সত্যি গুলী ছুটল। শুধুই গুলী ছুটল না, সে গুলীতে মানুষ মরল, বিলের জল রাঙা হয়ে উঠল। যারা মরল তাদের অনেককেই হয়ত সে চেনে, তাদের অনেকেই হয়ত সাঁওতাল, তার স্বজাতি। আর মরল তারি জন্য। সে খবর না দিলে তো জমিদার জানতে পারত না, জানলেও তার অগে সবার মাছ মারা শেষ হয়ে যেত। একি করল সে? যারা মরেছে তাদের মৃত্যু-কাতর আতর্নাদ সে শুনছে। ভীক্ষা, ভয়াবহ আতর্নাদ। তা শুনে গায়ের রক্ত যেন দইয়ের মত জমে গিয়েছিল,

ততনা অংশ হয়ে এসেছিল। একি করল সে?  
মানুষেরা মরুক, সাঁওতালেরা মরুক তা তো  
যায়নি সে।

“এয়াই রসিক মাঝি”—মিঃ সেন ফিরে  
এলেন জমিদারের নৌকায়। রসিকের সামনে  
রাড়িয়ে ডাকলেন তাকে।

“জী হুজুর”—সমস্রমে, ভয়াব্র চোখে  
উঠে দাঁড়াল রসিক মাঝি।

“তুই মোড়ল, তবু তো সাঁওতালেরা এসে  
মাছ মারল—এঁয়া?”

“জী—উরা ছেলমানুষ—হামাকে মানছে  
না।” রসিক মাঝি ভয়ে ভয়ে বলল।

“দূর ব্যাটা, তাহলে তুই আর মোড়ল  
শিবেন্দ্রকুমার এগিয়ে এলেন, বললেন,  
“মাঝি, তুই যে কাজ করেছিস এর আমি  
প্রশংসা করছি, কিন্তু একটা কথা—

“জী হুজুর?”

“যারা দল পাকিয়েছিল, অমান্য করেছিল  
তোকে—তাদের নাম ধাম বল্”—

রসিক মাঝি স্তম্ভিত হয়ে গেল। ব্যাপার  
কি? আরো জালে জড়াতে চাইছে তাকে! তাকে  
কুকুর বেড়াল বলে ভাবছে, ভাবছে কেনা  
গোলে মের মত! অনেক ক্ষতি করেছে সে  
লোকদের, আরো ক্ষতি করবে! লোকদের  
নাম ধাম বলে দেওয়া মনেই তো তাদের  
শ্রেষ্ঠার হওয়া। না, তা পারবে না রসিক, সে  
যা করেছে তা আর শোধরাবার নয়, তবে  
সে এখন থেকে হুঁসিয়ার হবে, লোকদের  
বাঁচাবার চেষ্টা করবে, নিজের পাপের  
প্রায়শ্চিত্ত করবে।

সে মাথা নাড়ল, মুখ তুলে বলল, “হামি  
তা পারম্ না হুজুর”—

“পারবি না মানে?” শিবেন্দ্রকুমার গর্জ  
উঠলেন।

“হাঁ, পারম্ না—হামি জানি না, পারম্  
ক্যানে?”

মিঃ সেন একটু ভেবে বললেন, “ওকে  
আপাতত ছেড়ে দেওয়া যাক, যা হোক পরে  
করা যাবে। লেট আস্ হিউমার দিস্ ম্যান—  
ও স্বেচ্ছায় যতটুকু বলে তাই ভালো।”

শিবেন্দ্রকুমার মাথা নাড়লেন। মিঃ সেন  
অফিসার হয়েও যখন বলছেন তখন তাঁর  
কথাটা নিশ্চয়ই মিথ্যা নয়।

পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের  
করে তিনি হেসে বললেন, “আচ্ছা মোড়ল,  
না বললে, আমরাই জেনে নেব। তুই এমনি  
ধবর দিলেই হবে। আচ্ছা নে, এই  
টাকাটা নে”—

রসিক মাঝি তিস্ত হাসি হাসল। আবার  
প্রলোভন।

“কিরে, নিবি না?”

“না হুজুর”—

“কেন রে ব্যাটা?”

“এতোগল্ ন্ মনিষ মরি গেল—আর  
নিমকহারামী করম্ না”—

“ব্যাটা বকধার্মিক সাজছিস! আচ্ছা যা,  
না নিবি!”—

মিঃ সেন হেসে উঠলেন, “দ্যাটস্ ফানি।  
অচ্ছা এবার ও যাক্ চৌধুরী। কাম্, এবার  
একটু গলা ভিজিয়ে নিই। আর চিন্তা কেন  
মশাই? প্রজারা এতে নিশ্চয়ই এবার বরফের  
মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে—কাম্”—

মিঃ সেন ও শিবেন্দ্রকুমার সরে গেলেন  
একপাশে। তাঁদের সেলাম জানিয়ে নৌকো  
থেকে নেমে গেল রসিক মাঝি। আচ্ছয়ের মত,  
ভূতগস্তের মত হঠাতে হাটতে সে বাড়ির  
দিকে ফিরে চলল। সোজা পথ দিয়ে নয়,  
অঞ্চলিকা ঘুরপথ দিয়ে, যাতে কেউ তাকে  
দেখতে না পায়। রসিক মাঝি হঠাৎ ভয়  
পেয়েছে। রাইফেলের গুলী, আঁর্তনাদ, রক্ত ও  
মৃত্যু তার মনকে নাড়া দিয়েছে প্রলয়ধ্বংস  
ভূকম্পনের মত।

স্তম্ভ হয়ে বসে ছিল সবাই। গাঁয়ের  
লোকেরা সবাই মংরার ওখানে এসে উঠানের  
ওপর মাথা নীচু করে বসে ছিল।

সাত আটটা গ্রামের লোক মারা গেছে—  
প্রায় চল্লিশ জন। আর অসংখ্য পণ্ডাশ জন।  
তাদের মধ্যে চল্লিশ জনকে গাঁয়ে ফিরিয়ে আনা  
হয়েছে, বাকী দশ জনকে পুলিশ শহরে নিয়ে  
গেছে। গাঁয়ের লোকেরাই তাদের বয়ে নিয়ে  
গেছে। আর যারা মারা গেছে তারা ওখানই  
পড়ে আছে—পুলিস লাস সরতে দেয়নি।  
রাতের বেলা যাবে সবাই—খুঁজে চুরি করে  
আমাব প্রিয়জনদের গুলীবিন্ধ, কদমাত  
মৃতদেহগুলোকে: এনে সংকার করবে।  
অনেককে হয়ত পাওয়াই যাবে না। বিস্তৃত  
বিলের মধ্যে কে কোথায় মরে পড়ে আছে কেউ  
কি ঠহর করতে পারে? তারা দুদিনেই ফুলে  
ভেসে উঠবে, বাতাসে ছড়াবে মহামারীর বিষ  
আর তীক্ষ্ণ-দন্ত শেরালেরা এসে ছিঁড়ে ছিঁড়ে  
যাবে তাদের গলিত মাংস। বাস্! এইসব হত  
ও আহতদের মধ্যে শিরিস গ্রামের এগারো  
জন মরেছে, সাতজন আহত হয়েছে।

কান্নার শব্দ ভেসে আসছিল। যারা  
মরেছে তাদের বাড়ি থেকে। কারো মা বাপ  
কাঁদছে, কারো বো ছেলে। পাক খেয়ে খেয়ে  
বিষবাপের মত খেয়ে আসছে সেই কান্নার  
শব্দ, দম বন্ধ করে ফেলছে।

সম্মা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। পূর্বদিকের  
আকাশটা ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সমস্ত  
পৃথিবী যৌবনবতী রূপসীর মত অপরূপ হয়ে  
উঠেছে। তবু অর্থহীন মনে হয়, কুৎসিৎ মনে

হয় সব কিছু। মাদকতায় আশ্রয় রাত নেমে  
এসেছে, পচানি খেয়ে মাদলে ঘা দেবার এই তো  
দময়। কিন্তু কে বাজাবে আজ? কারো হাতে  
আজ জোর নেই, কারো মনে আজ সন্দেহ নেই।  
এমন রাত—এমন রাতে নেশায় স্তিমিত চোখে,  
মাদলের ধ্বনিতে রক্তকে উত্তাল করে, নৃত্যরতা  
কালো প্রেয়সীর কটাক্ষ-মদির হাসি দেখে  
হয়ত জীবনটা রঙীন হয়ে উঠতে পারত।  
কিন্তু সবার চোখ আজ জ্যোতিহীন, নিশ্প্রভ,  
সবার চোখের সামনে আজ বহু জোয়ানের  
মৃতদেহ, লাল রক্তের নদী।

স্তম্ভ হয়ে বসে সবাই কান্না শুনছিল।

“চালিশটা মরদ মারি ফেললে, গুলী  
করা”—মদুকণ্ঠে বলে উঠল মংরা, “দুষ কি?  
কিছু লয়, বিলে মাছ ধরাছিল বলা। দুষ কি?  
কিছু লয়—হক আদায় করাছিল বলা। চালিশটা  
মনিষ মারি গেল্—খুঁনে খুঁনে সব লাল  
হয়া গেল্”—

গলাটা পরিষ্কার করার জন্য সে থামল,  
তাকাল সবর দিকে। কালো কালো বিমর্ষ  
মানুষগুলোর পেশল দেহ যেন প্রস্তর-  
খোদিত। তাদের কবচ বন্ধ, সঙ্গঠিত উরু,  
চওড়া কাঁজ, আর অজস্র পেশীসমৃদ্ধ  
পাঠদেশ যেন একটা উত্তেজনা খরখর করে  
কাঁপছে। তাদের শব্দ, কালো চোখে যেন  
দুবানল-দম্ব অরণ্যের রক্ত-দীপ্ত ধক্ ধক্  
করছে।

“শোধ লিম্ হাম্‌রা, ছাইডব নাই”—দাঁতে  
দাঁতে ঠক্ ঠক্ আওয়াজ হল সে মার, “যদি  
বাপের ব্যাটা হস্, তুরাও শোধ লিবি”—

সব বিমর্ষ, স্তম্ভ মানুষগুলো দম্‌কা  
হাওয়ার মত গর্জে উঠল, “লিম্, শোধ লিম্,  
হাম্‌রা”—

মংরা উত্তেজনা উঠে দাঁড়াল, গলম দিয়ে  
পটি-বাধা হাতটার কথা ভুলে গেল, দু’হাত  
নেড়ে বলল, “লে, শোধ লে। যদি মায়ের দুধ  
খায়াছিচ্ তভে বদলা লে। যাই যাই মরছে  
তাদিক দেখাছিল? খুঁনে দেখাছিল? তভে?  
বেকসুর মাইরবে ক্যানে? ক্যানে? কি দুষ  
করাছিল রাখালটো অউর ভইস্টো—আঁ?”

বুলে উঠল সবাই, বলল, “লিম্—শোধ  
লিম্”—

“হাঁ লে। ফির মাছ মরম্—ইবার যদি  
গুলী চালায় তো তাঁর চালাম্ হাম্‌রা,  
হামাদের বিষমাখা তাঁর উদের গুলীর থিকাও  
পাকী আছে”—

“হাঁ—শোধ লিম্”—

“কিন্তু ইবার সভাইকে য়াতি হবি, সভাইকে—  
হাজার হাজার জান দিবার গেলেই উদের হুঁস  
হভে, উরা তেখন বইকবে কি হামাদের মাইরা  
উরা শ্যাম কইরতে লারবে।”

“অউর ইবার তুরা পালাস নাই ভাইসব”—



সোমা বাত্পরুদ্ধকণ্ঠে বলল, “পলাবি ক্যানে বা? হামরা সাঁওতাল—শেরের বাচ্ছা আহি না? দিল ফুলায়া তাঁর মারমু, জান দিমু—কিন্তুক হামার আউর তুরদের সাথীর খনের শেষ লিমুই লিমু—হাঁ”—

চঞ্চল হয়ে বলল সবাই—“হাঁ, শোধ লিমুই লিমু”—

টোমা তাদের বাধা দিল, “কিন্তুক একটো বাৎ হচ্ছে কি?”

“সিটা কি?” মংরা তাকাল তার দিকে।

“এাই যি সভ ই তো বাতে নাই—নাঃ”—

খাড় নাড়ল টোমা।

“ক্যানে, ক্যানে রে বপু?”

“তুদের রসিক সন্দার যি মানা কইরভে—

দেখা লিস্”—

কিন্তুক মুখভঙ্গী করে সবাই মাথা নাড়ল,

“হয়—ঠিক বাৎ—ঠিক বাৎ”—

মংরা তাকাল সোমার দিকে। দুজনের চোখই মূহূর্তের জন্য বলসে উঠল। তারপর মংরা সব র দিকে নজর ফেরাল।

“সদার মানা কইরভে—আঁ? এতেগলেন সাঁওতালের জান, মনিষের জান কি উর কাছোং দামী লয়? সি দাম কি উশুল কইরভে নই বড়হা? আচ্ছা চল তুরা—চল হামার সাথে, আখরিবার পুছা লিমু আইজ।”

উঠে দাঁড়াল সবাই। তৎক্ষণাৎ। একটা হেস্‌তনেস্ত করার জন্য সবাই যেন হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে উঠল।

“হাঁ হাঁ, চল, চল”—

পেছন থেকে বৃন্দারী বাধা দিল, “বৈনা জিরা না ক্যানে তু? এঁ?”

মংরা বিরক্ত হল, ককর্শকণ্ঠে জবাব দিল, “পিছ ডাকিস্ নাইরে শব্দরার বিটি—তুর বাপের সঙ্গে বুঝাপড়া করার সঙ্গে যে”—

কালো কালো শক্ত পা তেলে এগিয়ে গেল ওরা। দাঁড়াল গিয়ে রসিক মাঝির বাড়ির প্রাঙ্গণে। মাঝির অস্থিতা স্বচ্ছল। হোঁরকেন জুলাছিল ভেতরের উঠানে। চোপায়ের ওপর বসে, চুটি টানতে টানতে, অন্ধকার মুখে কি খেন ভাবছিল রসিক মাঝি। সবাইকে আসতে দেখে চমকে উঠল সে, চম্পতপদে বাইরে এসে দাঁড়াল।

“কি চাইস্ তুরা?” চেখ দুটো তীক্ষ্ণ করে শ্রম প্রশ্ন করল।

“হামরা?” মংরা মাথা নাড়ল, “বুলহি। চলিশটা মরদ মরি গিলু—তা জানিস্? তু? হামাদের গায়ের ইগারটা মনিষ লশ হই গেলু—তার কি করবু বলু?”

রসিক নরম গলায় বলল, “হামি কি করমু রে জামই? হামি কি রিংরাজ সরকারের থিকাত বড়া হছি?”

“রিংরাজ তো জির্মিদারের সাথে। জির্মিদারকে কবু করু—উরাও সরা যাভে”—

বিবর হেসে রসিক বলল, “আউরো জান দিবু—সখ হচ্ছে জান দিবর? না”—মাথা নেড়ে রসিক বলল, “হামার সখ নাই, কথাটো মানু তুরা, জান তো সখা চিজু লয়।”

‘শোধ লিবি নাই তভে?’ এতেগলান জান।—

সব ই প্রশ্ন করল, “হাঁ, বুল, শোধ লিবু নাই।”

রসিক মাথা নেড়ে অনুনয়ের সুরে বলল, “না, তুদের মাথা ঠিক লাই। মানু বড়হর কথা আউর খনখারপী করিস্ নই”—

মংরা এক পা এগিয়ে এল, তুর তভে এাই শ্যাব কথা—আঁ?”

রসিক মাথা নাড়ল, “হাঁ”—মংরার ঔন্ধ্যতা তাকে মরিয়া করে তুলল। রাগের চোটে তার অপরাধবোধটা হঠাৎ তরল হয়ে আসতে লাগল। তাকে কিছুতেই মানবে না ওরা! বটে!

সবার দিকে তাকাল মংরা, বলল, “ফিরা চল।”

রসিকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে আবার বলল, “ইবার কামটা হামদের—সভাইকে বুলতে হবি বি ই বড়হোর মোড়হালি আউর চইলবে নাই—বুঝলু?”

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল সবাই। তারা বুঝেছে। রসিক সবাইয়ের বিরুদ্ধে এবার বিদ্বেহটাকে ব্যাপক করতে হবে।

সবার মাঝে চলতে চলতে সোমা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। কি খেন বলতে চাইছিল সে। মংরার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে, তাকে সরিয়ে নিয়ে গেল এক পাশে।

“মংরা—

“কি?”

“বুড়হাকে দিয়ে আউর চইলবে নাই—কিন্তুক সব কথা কি উদের বলবু না?”

“কুন কথা?”

“আইজকর কথা—বুড়হাই তো খবর দিলছিল”—

মংরার মুখ কঠিন হয়ে উঠল, মাথা নেড়ে সে বলল, “হয়”—

“আউর সিদিনকার কথা—জির্মিদারের ঠেঙে টাকা লিছিল যে বুড়াহাট”—এতদিনকার অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটল সোমার, যে খবরটা সে চেপে রেখেছিল তা আজ প্রকাশ করে ফেলল। কারিন সে বলেনি মংরাকে, বলতে চেয়েও পারেনি। হাজার হোক, সাঁওতালদের সদার রসিক মাঝি, তাছাড়া সে মংরার শব্দর। কথাটা বললে হয়ত বন্দুর মনে আঘাত লাগবে, লজ্জা পাবে মংরা। সেটা করার মত সাহস ছিল না তার। অচ-বলও উচিত, না বললে একজন বিশ্বসঘাতকের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আজকের রক্ত-কাণ্ড ঘটায় পর নৌকোর মাঝে রসিককে দেখে নিশ্চিত হয়ে সে বলার

সুযোগ খুঁজছিল কারণ তার দেবী করা উচিত নয়।

“টাকা লিছিল? কুনদিন? কি বুলহিস তু?” সিম্ময়ে হতবাক হয়ে তাকাল মংরা।

সোমা মবু হাসল, “ঠিক বুলহি মংরা। হামরা সিদিন জির্মিদার-বাড়ি গিলহিলাম সিদিন। তু হামাক পাঠালি না দেখার লাগা?”

“হয়—কিন্তুক তু তো ইকথা বুলিস নাই?”

অপরাধীর মত মাথা নাড়ল সোমা, “হয় বুলি নাই, কিন্তুক মিছা নয়। দেখলমু কি রসিক মাঝি জির্মিদারের ঠেঙে লম্বরী লোট লিভে”—

“হাঁ?”

“হাঁ।”

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল মংরা, চোখ দুটো জ্বলন্ত উঠল তার আর সেই জ্বলন্ত চোখের সামনে কি একটা ছবি দেখতে পেয়ে সে শিউরে উঠল। তাড়াতাড়ি সোমার একটা হাত চেপে ধরে যেন জরোত্তর কণ্ঠে বলল সে, “একটা দিন সবুদর কর সোমা—একটা দিন তারপর হামি ইয়ার বিচার করমু”—

এমনি সময়ে ফাদার ভেকবকে দূরে দেখা গেল। হনহন করে এগিয়ে এলেন তিনি। শব্দ পোষকে, কাঁচাপাকা দাঁড়িগোঁফে তাঁকে দেবদূতের মত মনে হচ্ছিল। মংরের দলকে দেখেই তিনি চলার বেগটা বাড়িয়ে দিলেন, কাছে এসে দাঁড়ালেন।

তারপরে প্রশান্ত হেসে বললেন, “পরম্পিতা তোমাদের মঙ্গল করুন—তারপর, কোথায় বাচ্ছ তোমরা?”

টোমা বিড়বিড় করে বলল, “চুলহাতে যাছি”—

“কি? কি বললে?”

“বুছ না”—

মংরা এগিয়ে এল, বলল, “ঘরোং যাছি বাবা”—

পাদ্রী সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন, টোমার দিকে একটা গম্ভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সবাইকে বললেন, “তোমাদের সঙ্গে দেখা করে ভালই হল। শোন—তোমাদের মঙ্গল চিন্তা করেই আমার দিন কাটে, তোমাদের সাহায্যের জন্যই আমার এখানে থাকা, আমার কিছু বলার আছে”—

মংরা নির্বিকারভাবে বলল, “কি বুলবেন বুলেন বাবা”—

পাদ্রী সাহেব করুণ মুখভঙ্গী করে বললেন, “আজ তোমরা যা করেছ তা আমি শুনছি—অকারণ প্রাণ দিয়েছ তোমরা, অনায়াস জেন করে ধংসের পথে এগিয়ে বাচ্ছ”—

“অনায়া? আচ্ছা বাবা”—

“কি?”

“দুনিয়ার মালিক কে?”

“পরম্পিতা ভগবান”—

“তভে? তভে ক্যানে জির্মিদার হামাদের

হুক্কে কাড়াইয়া লিছে?"

পাদ্রী সাহেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এইসব ইনফাইডেলরা তাঁর সঙ্গে তর্ক করছে?

তিনি বললেন, "রাজা আর ভূমিদার ভগবানের প্রতিনিধি—তাঁদের অমান্য করতে নেই। জোর করে এমন করাটা পাপ"—

মংরা হাসল, "আউর ভগমানের দুনিয়াকে লিজের ভাবাটো ভি পাপ পাদ্রী বাবা"—

"মংরা মাঝি!" বিস্ময়ে চোখ বড় হয়ে উঠল পাদ্রী জেকবের।

মংরা হেসে ঘুরে দাঁড়াল, বলল, "সেলাম বাবা—ঘরোয় যাছি হামরা—চল্বে, চল্বে সভাই"—

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ফাদার জেকব। ইনফাইডেল, জানোয়ার! এদের সঙ্গে কথা বলা নিরর্থক। রাসিক মারিকে গিয়ে বলতে হবে। হিংসায়, লোভে ওরা অন্ধ হয়ে গেছে, মানুষদের মৃত্যুর পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি তাঁর কর্তব্য থেকে জাট হবেন না, তিনি সর্বভাবে সংগ্রাম করবেন এর বিরুদ্ধে, বিচলিত হবেন না, নিরাশ হবেন না। এ সংগ্রাম যে অনায়াস ও হিংসার বিরুদ্ধে, লোভের বিরুদ্ধে। ওরা এগিয়ে গেল।

হঠাৎ টোমা ঘরে দাঁড়াল, মিলিটারী ভাষায় ডান হাতটা কপালে লাগিয়ে চোঁচিয়ে বলল, "গুড মারিং পাদ্রী বাবা—গুড মারিং"—

পাদ্রী সাহেবের চোখ জ্বলে উঠল। মনে মনে বললেন তিনি—ব্রুট! স্যাভেজ! ফুন্স! চাবুক খেলে যেমন মানুষ কেঁপে ওঠে তেমনি-ভাবে রাগের আঁতরণে কেঁপে উঠলেন তিনি। যেন নরকের একটা দৃশ্যকে এড়াতে চান এমনি ভাঙ্গা করে মংরাদের দিক থেকে মৃদুতা ঘুরিয়ে নিয়ে তিনি রাসিকের বাড়ির দিকে তাড়াতাড়ি চলতে আরম্ভ করলেন। অক্ষম আত্মরোধে জ্বলতে জ্বলতে তিনি হঠাৎ উদার হবার চেষ্টা করে মৃদুকণ্ঠে বললেন, "ওদের মার্জনা কর—পিতা, ওরা জানে না ওরা কি করছে।"

(ক্রমশঃ)

## বাংলার কথা

সিদ্দিকুল হুসাইন

গান্ধীজী কলিকাতায় আসিবার পূর্বেই কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার উগ্রতা শেষ হইয়া আসিয়াছিল। বিশেষ পশ্চিম বঙ্গে অতিরিক্ত সচিব সঙ্ঘ গঠিত হইবার পরে মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘ যে কলিকাতার লালবাগান, কল্যাণগান ও রজাবাজার প্রভৃতি মুসলমান বসতিতে মোট প্রায় ১০ হাজার লোককে "দাঙ্গাপাড়িত" বলিয়া বিনামূল্যে চাউল ও আটা দিয়া আসিতেছিলেন তাহা বন্ধ হওয়ায় বহু গৃহত্যাগীদের লোক নিরস্ত হওয়ায় কলিকাতায় স্বাভাবিক অবস্থা দ্রুত ফিরিয়া আসিতেছিল। তাহার পরে গান্ধীজীর আগমনে ও বঙ্গবিভাগের উত্তেজনার অবস্থার আরও উল্লাস পরিদর্শিত হইয়াছিল। গান্ধীজী যখন নোয়াখালিতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন,—তথ্য তাহার অহিংস নীতির অস্বীকারী হইবে। কিন্তু তথ্য সে নীতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই বিহারের অহিংসে তিনি বিহারে গমন করিয়া তথা হইতে দিল্লীতে গিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ পূর্বে প্রতিশ্রুতি অনুসারে পরীক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য তিনি নোয়াখালিতে যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন।

এই অবস্থায় যে কারণে তিনি অনশন আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ দৃষ্টির বিষয়। গত ১৫ই ভাদ্র—কলিকাতায় সুবৃষ্টি ও স্বাভাবিক অবস্থা না ঘটা পর্যন্ত তিনি অনশন ত্যাগ করিবেন না বলিয়া রাগি ৮টা ১৫ মিনিটের সময় প্রায়োপবেশনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি যে জল পান করিবেন তাহাতে কেবল লবণ ও সোডা-বাই-কার্ব দেওয়া হইবে। ঐদিন কলিকাতার নানা স্থানে হাঙ্গামা হয়। তার পূর্বদিন রাগি প্রায় ১০টার সময় কতকগুলি লোক ব্যাডেজ করা এক ব্যক্তিকে গান্ধীজীর নিকটে লইয়া যাইয়া বলে, সে মুসলমান কর্তৃক আক্রান্ত ও

আহত হইয়াছিল। ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তাহাকে পরীক্ষা করিয়া বলেন, তাহার দেহে ছুরিকঘাতের চিহ্ন ছিল না। তখন রাগি প্রায় ১০টা। গান্ধীজীর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। তিনি শয্যায় থাকেন। তখন আগন্তুকরা গৃহের দ্বার জানলা ভাঙিতে থাকে। গান্ধীজীর দুই পার্শ্বে যে দুইজন তদ্বী শয়ন করিয়াছিলেন, তাহারা বাহিরে যাইয়া উগ্র জনতাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহারা সে চেষ্টা ব্যর্থ করে—তবে তাহাদিগের কোন অনিষ্ট করে নাই। তখন গান্ধীজী বাহিরে হইয়া যত্ন করে জনতাকে শান্ত হইতে বলেন,—কিন্তু তাহাতেও ফল হয় না। একজন লিচালনা করে—দৌভাগ্যক্রমে কেহ আহত হয় নাই; ইচ্ছক নিকপ্ত হয় এবং একজন মুসলমান তাহাতে আহত হইলেন। পুলিশের যে দুইজন কর্মচারী তথায় ছিলেন, তাহারা কেন্দ্রপ বলপ্রয়োগ করেন নাই। পরে থানার পুলিশ কর্মচারী উপস্থিত হইলেন ও "টিয়ার গ্যাস" ব্যবহার করেন। আগন্তুকরা চলিয়া যায়।

সহীদ সুরাবদী ঘটনাস্থলে ছিলেন না,—পূর্বেই চলিয়া গিয়াছিলেন। গান্ধীজী বলিয়াছেন, তিনি পরদিন নোয়াখালি যাত্রার আয়োজন করিতে গিয়াছিলেন।

ইতঃপূর্বে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সক্রিয়ভাবে ভারতের রাজনীতিতে অসিবার পরে—কেহ কখন গান্ধীজীকে এইরূপ অপমান করে নাই। বাঙালয় এই সম্মানিত অতিথির এই অপমান বাঙালীমাত্রেই বিচলিত করিয়াছে।

শহরের অবস্থা স্বাভাবিক হওয়ায় এবং সকল দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি শহরের শান্তিরক্ষার জন্য প্রণয়ন করায় তিনি ১৮ই ভাদ্র রাগি ৯টা ১৫ মিনিটের সময় প্রায়োপবেশনে বিরত হওয়ায় সকলেই স্বাভাবিক শ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন।

সকলেই কাননা, কলিকাতায় এবং পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গে যেন শান্তি নষ্ট না হয় এবং পাপ্রাণেও শান্তি স্থাপিত হয়।

গান্ধীজীর প্রায়োপবেশন বর্জনের পরে কলিকাতায় হাঙ্গামার পুনরাবির্ভাবের নিদান-নির্ণয়-চেষ্টা অসম্ভব হইবে না। কারণ, নিদান নির্ণয়িত না হইলে রোগ দূর করিবার বিধান সম্ভব হইতে পারে না।

অশান্তির পুনরাবির্ভাব অতীকৃত হইলেও স্বাভাবিকভাবে অপ্রত্যাশিত বলা যায় না। কারণ, সহসা উত্তেজনায় অশান্তি দূর হইয়া গিয়াছিল—তাহার কারণ দূর হয় নাই। কারণ দূর করার প্রয়োজন ছিল।

দেখা গিয়াছে, কলিকাতার নূতন পুলিশ কমিশনারের অধীন পুলিশ এই অশান্তি-বিন্যাসের জন্য প্রস্তুত ছিল না। অথচ তাহাদিগের প্রস্তুত থাকার প্রয়োজন ছিল।

কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছিলেন, সুরাবদীবিঘোষিত "প্রত্যক্ষ সংগ্রামে" কলিকাতায় বহু বিহারী (হিন্দু) হতাহত হইয়াছিল; তাহাদিগের আত্মীয়-স্বজন সেজন্য বিবাদিত ও বিকল হইল—সেই অবস্থায় নোয়াখালীতে মুসলমান-দিগের অত্যাচারের, বিশেষ নারী লাঞ্ছনার সংবাদে তাহাদিগের ধৈর্যসীমা লঙ্ঘিত হয় এবং তাহারা বিহারে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করে। তাহার পরে বিহারের প্রধান সচিব শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বলেন, বিহারের প্রতিক্রিয়া সীমাস্ত প্রদেশে হাজারায় হয়। বর্তমানে পাপ্রাণে যে ব্যাপার ঘটিতেছে, তাহা নারকীয় উগ্রতায় ন্যূন

নোয়াখালির ব্যাপারকেও নিঃপ্রভ করিয়েছে। কলিকাতায় পাঞ্জাবী শিখের ও পাঞ্জাবী হিন্দুর সংখ্যা উপেক্ষণীয় নহে। ইহাদিগের কেহ কেহ “প্রত্যক্ষ সংগ্রাম”-কালেও স্বজন ও সম্পত্তি-হারা হইয়াছিল। পাঞ্জাবের সংবাদে ইহাদিগের যে মুসলমানদিগের প্রতি উগ্র হইবার সম্ভাবনা ছিল না, এমন মনে করা যায় না। হাঙ্গামা একবার আরম্ভ হইলে তাহাতে বাঙালী হিন্দুদিগের মধ্যে যাহারা হাঙ্গামায় স্বজন হারাইয়াছে, তাহাদিগেরও উত্তেজিত হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে। পশ্চিম বঙ্গের সচিব সঙ্ঘ যদি ইহা না বুঝিয়া থাকেন, তবে তাহা তাহাদিগের যে মানবচারিত্রের অভাব-দোষতক তাহা অযোগ্যতা পর্যায়ভুক্ত করা যায়। কলিকাতার পুলিশ কমিশনারেরও এ বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। বিশেষ “প্রত্যক্ষ সংগ্রাম”-কালে ইনি ২৪ পরগণায় পুলিশের প্রধান থাকিয়া অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার শিক্ষাও যদি তিনি লাভ করিতে না পারিয়া থাকেন, তবে তাহা একান্তই পরিতাপের বিষয়। পুলিশ সতর্ক থাকিলে, বোধ হয়, অশান্তি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা সম্ভব হইত।

পশ্চিম বঙ্গের সচিব সঙ্ঘও টুটীর পরিচয় প্রদান করেন নাই, এমন কথা বলা যায় না। কারণ, মাসাধিককাল “ছায়া” ও “কায়া”রূপে থাকিলেও সচিব সঙ্ঘ বাঙালার লোককে তাহাদিগের গঠনমূলক পরিকল্পনার পরিচয় দিতে পারেন নাই।

পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীরা যে শান্তিই চাহেন তাহার প্রমাণের অভাব নাই। শান্তি স্থাপনের চেষ্টায় যাহারা প্রাণ দিয়াছেন আমরা তাহাদিগের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি ও করিব। যাহারা সে চেষ্টা করিয়া কোনরূপ বিপদ বরণ করেন নাই তাহাদিগের গৌরব অপেক্ষা যাহারা প্রাণ দিয়াছেন, তাহাদিগের গৌরব অধিক বাতীত অল্প নহে। তাহাদিগের মধ্যে কলিকাতার সুপরিচিত কংগ্রেস-কর্মী-শচীন্দ্রনাথ মিত্র অন্যতর। গত ১লা সেপ্টেম্বর তিনি কয়জন সংগীকে লইয়া শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া আততায়ী কর্তৃক ছুরিকাঘাত ভোগ করেন। সেই আঘাতের ফলে ৩রা সেপ্টেম্বর হাসপাতালে তাহার জীবনান্ত হয়। আর একজন বালীর কংগ্রেসকর্মী স্মৃতিশ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনিও অনুরূপ অবস্থায় আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

শহরের শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু যাহা বলিয়াছেন, অনেকে তাহা সমর্থন করিবেন। তিনি বলেন, পুলিশে বা সেনাবলে তাহার বিশেষ আস্থা নাই। আমাদিগের বিনেশী শাসকগণ দীর্ঘকাল পুলিশকে যে শিক্ষা দিয়াছেন তাহাতে জনগণের কাজ

করিবার সময় তাহারা অযোগ্যতার পরিচয় প্রদান করে। তাহাদিগের পক্ষে সেই শিক্ষার প্রভাব হইতে অব্যাহতিলাভ সহজসাধ্য হইবে না।

শরৎচন্দ্র কলিকাতার তরুণ ও তরুণী-দিগকে রক্ষাবাহিনী গঠন করিতে আহ্বান করিয়াছেন। সে সকল বাহিনী কর্মীদের দ্বারাই পরিচালিত হইবে। শরৎচন্দ্র যে কয়মাস পূর্বেও এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা আমরা অবগত আছি। কিন্তু তখন সহীদ সুরাবর্দী-মহম্মদ আলী কোম্পানীর যে মুসলিম লীগ সচিব সঙ্ঘ কয়েম ছিল, তাহার পক্ষে এরূপ ব্যবস্থা সহ্য করা কখনই সম্ভব হইত না। সেই সচিব সঙ্ঘ পাঞ্জাবী পুলিশ আমদানী করিয়া কলিকাতায় যে অন্যায়ের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, তাহা কলিকাতার শান্তিকামী নরনারী সহজে বিস্মৃত

হইতে পারিবে না। আজ সেই সচিব সঙ্ঘের অবসান হইয়াছে। নতুন সচিব সঙ্ঘ কি শরৎচন্দ্রের প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার জন্য অগ্রসর হইবেন? ইহাতে লোককে স্বেচ্ছাশ্রমী করাও হইবে।

## চমকুৎসাহি

ভিজল “আই-কিওর” (রেজিঃ) চমকুৎসাহি এবং সর্বপ্রকার চমকুরোগের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ। বিনা অস্ত্রে ঘরে বসিয়া নিরাময় সুবর্ণ সুযোগ। গ্যারাণ্টী দিয়া আরোগ্য করা হয়। নিশ্চিত ও নিতরুণোৎসাহ বালিয়া পৃথিবীর সর্বত্র আদরণীয়। মূল্য প্রতি শিশি ০. টাকা, মাদ্রাস ৫০ আনা।

কমলা ওয়ার্কস (৮) পাঁচগোতা, বেঙ্গল।



# ঈশ্বর...

‘ঈশ্বর’ একান্তই বহুসংখ্যক

কিন্তু এর অপূর্ণ রূপ সৌন্দর্যের

বিভাজ্যে রচে মোহের ইন্দ্রজাল

এবং আনন্দ মর্ত্যের বিপজ্জনক

বিভাজ্য। অমূল্য বিত্ত পণ্য প্রবোধ

অত্যধিক অভাব হেতু যে সব কৃষি

ও নৃকল প্রশাধন সামগ্রী বাজারে

আত্মপ্রকাশ করেছে এসব ‘ঈশ্বর’ের

সারস্বতহীন ও প্রত্যাশামূলক। বিখ্যাত ‘হিমকল্যাণ’

এর বহু অধিকল ও অল্পল নকল বাজারে খরিদারগণকে

বিভ্রান্ত করেছে কিন্তু একই সাধারণতা অবলম্বন পূর্বক

সমস্ত দোকান ছড়ে খরিদ

করলেই প্রচারিত হবার

সম্ভাবনা কম। বর্তমানে

‘হিমকল্যাণ’ এর সরবরাহ

পূর্ণা পেন্স বেদী। ইহা

অননুগ্রহীয় ও অপরাধের

আয়ুর্কৌদীয় কেশপ্রদায়ী।



# হিমকল্যাণ

ডেব্রি বিশ্ববদ নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর

আয়ুর্কৌদীয়  
কেশপ্রদায়ী



হিমকল্যাণ ওয়ার্কস • কলিকাতা, কর্তৃক প্রচারিত



## কান্ট বাদক

পেড্রো এ ডি এলারকন্

[স্প্যানিশ-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক পেড্রো এ ডি এলারকন্ খৃঃ ১৮৩৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শব্দ সাহিত্যিক হিসাবেই সুনাম অর্জন করেন নি, দেশপ্রেমিক হিসেবেও লোকের মন জয় করেন। মরোক্কোর যুদ্ধে ইনি স্পেনের পক্ষ নিয়ে অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর লেখার প্রধান বিশেষত্বই হলো তাঁর অপরূপ বর্ণনা-ভঙ্গী। অল্প কথায় সূক্ষ্মশৈলী তিনি বহু তথ্যের সম্ভান দিয়ে দান। তাঁর ভাষাও সহজ, স্বকরে, অথচ মধুর। তাঁর বর্তমান গল্পটিতে হান্কা-পারবোশের মধ্য দিয়ে যে করণ সূত্রটি ফুটে উঠেছে, সহজেই তা মনকে আকর্ষণ করে। ইনি খৃঃ ১৮৯১ অব্দে পরলোকগমন করেন।]

(১)

এই গাছগুলির তলায় কিন্তু অত গরম নেই। ডন ব্যাসিলিও! এসো না, এখানে বসেই তোমার কনেট বাজাও, আর আমরা নাচি।”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডন ব্যাসিলিও, কনেট তোমাকে বাজাতেই হবে।”

“কনেটই যে কনেটটা দিয়ে এখন বাজনা শিখছে, সেটা নিয়ে এসো না দাদু!”

“না না, ওটা তেমন ভালো নয়। তুমি কি ওটা বাজাবে ডন ব্যাসিলিও?”

“না।”

“কেন?”

“কারণ, আমি বাজাবই না।”

“কিন্তু, কেন বাজাবে না শুন?”

“কারণ, আমি বাজাতেই জানি না।”

“কি বললে, বাজাতে জান না? তুমি কি আমাদের খুব বোকা পেয়েছ নাকি যে তোমার ঐ কথা আমরা বিশ্বাস করব?”

“আমার কি মনে হয় জানিস ভাই, দাদু চায়, আমরা তাকে বেশ একটু খোসামোদ করি।”

“ডন ব্যাসিলিও। তুমি যে তোমার সেনা-দলের প্রধান কনেট-বাজিয়ে ছিলে সে কি আমরা জানি না ভাব?”

“আর এও আমরা জানি যে, তোমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন আর কোন বাজিয়েই ছিল না সেখানে।”

“এমপার্টোরো যখন রাজা ছিলেন, তখন তোমার যে রাজবাড়িতে কনেট বাজানোর জন্যে ডাক পড়েছিল,—তাও আমরা জানি মশাই। বুঝলে?”

“তুমি তো এখন পেনসন খাচ্ছ, সেই বাজনার জন্যেই।”

“ডন ব্যাসিলিও। লক্ষ্মীটি! আমাদের প্রতি একটু সদয় হও।”

“দেখ, তোমরা যা বলছ সবই সত্য। কনেট আমি বাজাতাম। তোমাদের এ কথাও ঠিক যে, বেশ ভালই বাজাতাম আমি। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, বছর দুই আগে আমি একজনকে আমার কনেটটা উপহার দিয়ে দিই। লোকটা কনেট বাজানোর পরীক্ষা দিয়ে সব তখন পাশ করেছে। কিন্তু বড় গরীব। নিজের কনেট ছিল না তার। অথচ কনেট কেনার ক্ষমতাও তার নেই। তারপর থেকে আজ অবধি একদিনও আমি কনেট বাজাই নি।”

“সত্য, ভারী দুঃখের কথা!”

“তুমি দেখাছ শ্রিতীয় রোসাসিনি!”

“সে যাই হোক, আজ বিকলে তোমাকে বাজাতেই হবে, আমাদের জন্য।”

“কিন্তু কনেট যদি খুব ভালো না হয়, তাহলে এই ফাঁকা জায়গায় বাজিয়ে কোন লাভই হবে না।”

“দাদুভাই, আজ আমার জন্মদিন। সেকথা ভুললে চলবে না কিন্তু।”

“কি মজা। কি মজা। ঐ তো কনেট আসছে।”

“আচ্ছা, দাদুভাই! এখন তুমি বল, কি বাজাবে? কোন গংটা?”

“ওয়ার্ল্ড?”

“না, পোল্কা।”

“পোল্কা! দূর ভাই, ওটা বিচ্ছিন্ন। তার চাইতে ফন্ড্যাংগো-নাচের বাজনা তুমি বাজাও।”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভালো। ফন্ড্যাংগো আমাদের জাতীয় নাচ।”

“কিন্তু ভাই। আমি বড় দুঃখিত। আমার পক্ষে কনেট বাজানো আর কোনমতেই সম্ভব নয়।”

“ও কথা তুমি সব সময়ই বলো। ভারী বিনয় না? ওসব শুনছি না। এখন—”

“আমাদের ওভাবে নিরাশ করো না।”

“আমি তোমার ছোট নাতি। আমি বলছি। এ আমার অনুরোধ।”

“আমি তোমার ভাইব, আমিও অনুরোধ করছি।”

“দোহাই তোমাদের। ওভাবে আমায় বিরক্ত করো না। আমি তো বললামই,—আমি বাজাতে পারব না।”

“কিন্তু, কেন? কেন বাজাতে পারবে না?”

“কারণ, কি করে বাজাতে হয় সব ভুলে গিয়েছি আমি। আর প্রতিজ্ঞাও করেছি, কোন-দিন আর বাজাতে শিখব না।”

“প্রতিজ্ঞা করেছ। কার কাছে?”

“নিজের কাছে, পরলোকগত একটি আত্মার কাছে, আর আমার মেয়ে অর্থাৎ তোমাদের মায়ের কাছে।”

একথা শোনবার পর সমস্ত দলটি গম্ভীর হয়ে ওঠে। কেউ আর কথা বলে না। সব চুপচাপ।

বৃন্দ ডন ব্যাসিলিও তখন বলে—“কি করে যে আমি কনেট বাজাতে শিখেছিলাম, তা যদি তোমরা শুনতে।”

“বেশ তো তাই বলে না। আমরা শুনব সেই গল্প।” সাগ্রহে বলে ওঠে শিশুর দল। তারা সবাই তখন তাকে ঘিরে বসে।

“হ্যাঁ, সে এক গল্পই বটে।” জবাব দেয় ডন ব্যাসিলিও। “বড় অশ্রুত সেই গল্প। শোনো তোমরা। তারপর, তোমরাই বিচার করো, আমার পক্ষে কনেট বাজানো এখন আর সম্ভব কি না।”

গাছের নিচে সেই কৌতুহলী শ্রোতাদের সঙ্কথানে বসে, ব্যাসিলিও তখন বলে যায় তার ইতিহাস, কি করে সে কনেট বাজাতে শিখলো, কি করে নাম ছাড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে।

এরনি করেই একদিন বায়রের নাম মাজেপ্পা, এক অপরাহ্ন বেলায় আর একটি গাছের নিচে বসে দ্বাদশ লুইকে বলেছিল তার কাহিনী—তার ঘোড়ায় চড়বার রোমাঞ্চকর কাহিনী।

(২)

আসুন আমরা এখন ডন ব্যাসিলিওর মুখে তার গল্প শুন।

“ঠিক সতের বছর আগে, স্পেনের গৃহ-যুদ্ধ বেধে উঠলো।

“কার্লস আর ইসাবেল দুজনেই সিংহাসন দাবী করলেন। স্পেনের লোক দুভাগে বিভক্ত হলো। তার ফলে শত্রু হলো রক্তক্ষয়ী জাত-যুদ্ধ।

“আমার এক বন্ধু ছিল। নাম তার রেমোন গোমেজ। আমাদের দলের সে ছিল একজন লেক্টেন্যান্ট। ভারী সুন্দর চেহারা তার। অমন চমৎকার লোক আমি আর দেখি নি। ছেলেবেলা থেকেই আমাদের বন্ধু। এক-

সঙ্গেই খেলাধুলা করছি, একসঙ্গেই স্কুলে চড়েছি। যুদ্ধ বাধবার গোড়া থেকেই আমরা একসঙ্গে লড়েছি। দেশের স্বাধীনতার জন্য দাঁতনাই আমরা মরবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। স্বদেশের মুক্তির জন্য আমার চেয়ে, সকলের চেয়েই সে ছিল আগ্রহশীল।

“একদিন আমাদের কর্নেল খামথোলাই ধরনের একটা অশ্রুত আদেশ দিয়ে বসলেন রেমেনকে। রেমেন গেল খুব চটে। এই রকম করাই এই সব কর্নেল তাদের স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ নিয়ে বহু লোকের উন্নতির পথ রোধ করে দেন চিরদিনের জন্য। ঠিক যে কি হয়েছিল, আমি তা জানি না। কিন্তু এই ঘটনার ফলে স্বাধীনতাকামী এই লেফটেন্যান্ট তার সংগীদের দল ছেড়ে চলে গেল। তার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু যে, সেই আমাকেও সে ভাগ করে বিপক্ষ দলে গিয়ে যোগ দিল। তার অন্য কোন উদ্দেশ্য তখন ছিল না, শুধু সেই যুদ্ধে ঐ কর্নেলকে সে বধ করবে, এই ছিল তার ইচ্ছা। তার বিরুদ্ধে কেউ কোন অনায় করবে বা তাকে অপমানিত করবে, আর সে তা দাঁড়িয়ে সহ্য করবে—সে রকম লোকই ছিল না রেমেন।

“তাকে ভয় দেখিয়ে, অনুরোধ উপরোধ করেও আমি তার মত পরিবর্তন করতে পারি নি। সে তখন দৃঢ়সংকল্প। আমাদের দলের পোষাক ছেড়ে সে কার্লিস্টদের যুদ্ধসাজে সাজলো, মাথায় দিলো বিদ্রোহী দলের শিরস্ত্রাণ। অথচ এই বিপক্ষদের প্রতি তার কি জাতকোষ কি ঘণা, কি বিস্ময়। আমরা তাদের বলতাম, কুচক্রীদের যোদ্ধা। দেশকে তারা বিশৃঙ্খল করেছে, অস্বাভাবিকতা এনে দিয়েছে সর্বত্র।

“আমরা তখন যুবরাজের এলাকায়, শত্রুদের কাছ থেকে নমাইল দূরে। সোদিন রাতে রেমেন আমাদের কাছ থেকে চলে যাচ্ছে। সোদিন-কর আবহাওয়াও ছিল বড় খারাপ। বাইরে তখন বন-গন ঠান্ডা পাতাস। একটা আবহা মর্দন-হৃৎকার চতুর্দিকে। ঠিক পরের দিনই আবার যুদ্ধ।

প্রায় মাঝরাত্রে রেমেন এলো আমাদের শিবিরে। আমি তখন ঘুমোছিলাম। ধীরে ধীরে সে আমার ডাকলো—‘ব্যান্সিলিও!’

“কে?”

“‘আমি। বিদায় নিতে এসেছি।’ সে আমার হাত ধরলো।

“‘শোনো কাল তো আমরা আশা করছি যুদ্ধ বাধবে। ধরো, যদি যুদ্ধ বাধে, সেই যুদ্ধে যদি আমরা মিলিত হই—’

“‘তাতে আর কি হয়েছে? আমরা বন্ধুর মতই মিলিত হব।’

“‘না। প্রথমে আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করব বটে, কিন্তু পরক্ষণেই যুদ্ধ করব উভয়ের বিরুদ্ধে। কাল আমার ভাগ্যে নিশ্চিত মরণ। কারণ, কর্নেলকে বধ না করা পর্যন্ত কিছুতেই

আমি থামব না। তুমি কিন্তু বিপদের মধ্যে পড়ো না ব্যান্সিলিও। ও বীরস্বের কোনো মূল্য নেই।’

“কিন্তু জীবন? তারও কি দাম নেই?

“‘নিশ্চয়ই আছে।’ রেমেন বেশ জোরেই বলে ওঠে। ‘তোমাকে একদিন কর্নেল হতেই হবে। আমাদের পরিশ্রম একেবারে ব্যর্থ হই যাবে না। যাক, এখন আমি আর ও সব ভাবছি না। শুধু মনে হচ্ছে আমার ব্যক্তি সব শেষ!’

“‘আমি বলে উঠলাম—‘কি যা তা বলছ? কালকের যুদ্ধে আমরা বাঁচবই।’

“‘আচ্ছা, এসো, তাহলে একটা সময় ঠিক করা যাক। যুদ্ধের পর আমরা দুজনে গিরে সেখানে মিলিত হব।’

“কোথায়?”

“সে-ট নিকোলাসের সেই পুরানো গাঁজায়। রাত একটার সময়। কেমন? ধরো, আমাদের কেউ যদি সেখানে গিয়ে উপস্থিত না হই তাহলে ভাবব, সে মারা গেছে। তুমি রাজী তো?’

“বেশ তাই হবে। আমি রাজী।’

“আচ্ছা, আসি তাহলে। বিদায়।’

“বিদায়।’

“তারপর আমরা তখন নিবিড় আলিঙ্গনে বন্ধ হয়ে পরস্পরকে বিদায় দিলাম। অশ্রুধারের মধ্য দিয়ে রেমেন অদৃশ্য হয়ে গেল।”

( ৩ )

“যা ভেবেছিলাম তাই। পরদিন কার্লিস্টরা আমাদের আক্রমণ করলো। বিকেল তিনটে থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চললো লড়াই। দু’পক্ষেই অনেক হতাহত হলো। পিচটা নাগাদ রেমেনের নেতৃত্বে আলাভার সৈন্যরা আমাদের সঙ্গে বোরতর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো। আমার বন্ধুর পরনে তখন বিদ্রোহীদের রণসজ্জা, মাথায় কার্লিস্টদের শাদা টুপি।

“আমি আমার সৈন্যদের হুকুম দিলাম—‘গুলী চালাও, কামান দাগো।’ সে-ও ঠিক তার সৈন্যদের তাই হুকুম করলো। হাতাহাতি আমাদের যুদ্ধ হলো। অবশেষে আমাদের পক্ষ জয়লাভ করলো। রেমেন তখন তার অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে পিছনে হটে গিয়েছে। ইতিমধ্যে সেই আগের কর্নেলটিকে সে নিজের হাতে না মারতে পারলেও, গুলী করে তাকে নিচে ফেলে দিয়েছিল, কোনরকম দৃষ্টিপাত না করেই।

“ছটার সময় যুদ্ধের গতি ফিরলো আমাদের বিরুদ্ধে। আমার দলের একটা অংশ তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। শত্রুসেনা ঘিরে ফেলেছে আমাকে ও আমার দলের লোকদের। আমাদের তারা বন্দী করে নিয়ে চললো। যুদ্ধ বাধবার গোড়াতেই কার্লিস্টরা যে জায়গা দখল করে নেয়, সেই ছোট্ট শহরটিতে আমাদের নিয়ে গেল তারা। আমরা তখন স্থির ধারণা করে নিয়োছি

যে, এইবার আমাদের গুলী করে মারা হবে। কারণ, যুদ্ধবন্দীদের তখন কোন পক্ষই প্রাণ ধরে ছেড়ে দেয় না।”

( ৪ )

“কারাকক্ষে বসে শুনলাম—একটা বাজলো। রাত একটা। ঠিক ঐ সময় রেমেনের সঙ্গে আমার দেখা করবার কথা। আর এদিকে আমি শহরের জেলখানায় সংগীদের সঙ্গে বন্দী।

“প্রহরীদের একজনকে আমি রেমেনের কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

“‘ও! সে তো মস্ত বড় বীর। নিজের হাতে সে একজন কর্নেলকে বধ করেছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, যুদ্ধের শেষ দিকটার সে-ও আর বাঁচতে পারে নি।’

“কি করে তুমি এমনটা ভাবছ?”

“কারণ, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সে আর ফিরে আসেনি; তার দলের-ও কেউ জানে না তার কি হল।’

“সে-রাতি আমার যে কি ভাবে গেল, তা একমাত্র আমিই জানি।

“মনে মনে আমার একটা আশা কিন্তু তখনও ছিল। রেমেন নিশ্চয়ই এতক্ষণ সে-ট নিকোলাস গাঁজায় গিয়ে আমার অপেক্ষা করছে। তাই সে আর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরেনি এত রাতেও।

“ভাবলাম—‘আমাকে সেখানে দেখতে না পেয়ে, সে না জানি কত দুঃখই করবে। সে ভাববে আমি মরে গেছি। আর সত্যিই তো, আমি তখন মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়ে। আমরা ঠিক যেমন করে শত্রুসেনা হত্যা করি। কার্লিস্টরাও তেমনি করে যুদ্ধবন্দীদের গুলী করে মেরে ফেলে।

“ভোরবেলায় একজন ধর্মযাজক এলেন আমাদের বন্দীশিবিরে।

“আমার সংগীরা তখন ঘুমোচ্ছে।

“পাদরীকে দেখে আমি প্রশ্ন করলাম—‘আমাদের কি প্রাণ যাবে?’

“বেশ করণ এবং গম্ভীর গলায় তিনি জবাব দিলেন—‘হাঁ।’

“এখনই?”

“না। তিনঘণ্টা বাদে।’

“একটু পরেই তিনি সবাইকে ডেকে তুললেন। বন্দীশিবির তখন কামার রোলে, প্রার্থনার সুরে, অভিশাপ বর্ষণে মৃদুর হয়ে উঠলো।

( ৫ )

“মানুষ যখন মৃত্যু-সীমায় গিয়ে হাজির হয় তখন তার সেই চিন্তাই প্রবল হয়ে ওঠে। সব কিছু ভুলে গিয়ে মানুষ তখন মৃত্যুর কথাই ভাবে। মন থেকে কিছুতেই সে এ চিন্তা দূর করতে পারে না। এই চিন্তায় আমিও যেন পাগল হয়ে উঠি। নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে

আসতে চায়। আবেল তাবোল কি সব দেখতে থাকি চোখের সামনে। বন্ধুর কথা মনে জাগে। সে বেঁচে আছে অথবা মারা গেছে, কেই বা তার খোঁজ রাখে। নে কি আমার জন্যে এখনও সেই গীর্জায় অপেক্ষা করছে? কে জানে! বারে বারে তার মূখখানি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো। নিজের কথাও তখন ভুলে গেলাম। খালি মনে পড়তে লাগলো বন্ধুর কথা।

“কার্ল’স্টেরা আমার কাপ্টেনের-পোষাক খুলে নিয়ে, তাদেরই একজনের ছেঁড়া কোট-পাংলুন ছুঁড়ে দেয় আমার দিকে। একটা টুপিও দেয় মাথায় দেবার জন্যে।

• “আমাদের কুড়িজনকে এক সংগে মার্চ করিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বধ্যভূমিতে। সব সংগে আমরা একুশজন হিলাম। কিন্তু একজনকে ফাঁদা করা হয়। কারণ, সে ছিল একজন সংগীত-বিশারদ। কার্ল’স্টের দলে গাইয়ে-বাজিয়ের বড় অভাব। বিশেষ করে তাদের ব্যান্ডপাটি’তে তো বজিয়ে লোকের সংখ্যা খুবই কম। কাজেই তারা যাদের বন্দী করতো তাদের মধ্যে গীত-বাদ্য পারদর্শী কোন লোক পেলে তাকে আর হত্যা করতো না।”

এই কথা শুনে, ছেলেমেয়ের দল তখন আনন্দে চীৎকার করে বলে—“তুমি তাহলে ঐ ভাবেই বেঁচে গিয়েছ ডন! ব্যাসিলিও! আর একি বন্ধু! তুমি বাজাতে জান না? অথচ, বাজাতে পার বলিই তো তারা তোমাকে প্রাণে মারলি! তুমি যে সত্যিই একজন সংগীত বিশারদ!”

বৃদ্ধ ভাব দেয়—“না গো না। সংগীত শিখের আমি মোটেই কিছু জানতাম না।

“আচ্ছা, শোনো এবার গল্পটা। যারা আমাদের গুলী করবে, তারা সবই এসে হাজির হলো। সেনাদলের আর সকলেও এলো এই দৃশ্য দেখতে। আমরা তখন মৃত্যুকে বরণ করে নেবার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছি। সারির প্রথম দশজনের পরেই আমি। বৃদ্ধস্বাম, দশজনের পরেই আমার মরবার পালা। আমি তখন আমার স্ত্রী ও কন্যার কথা ভাবছি। ভাবছি তোমাদের কথা, তোমাদের ময়ের কথা। এই সময় গুলী শুরুর হলো। আমার চোখ ছিল বন্ধ। কাজেই বুঝতে পারলাম না, কে কে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে।

“আমি তখন গুলীর আওয়াজ গুণে চলেছি। কখন আমার পালা আসে। পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার পূর্বসম্বোধিত হইনি আমি একবার অনুভব করে যেতে চাই! কিন্তু আমার মাথা তখন ঘুরছে। সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গেলো। গুণতে ভুলে গেলাম।

“গুলীর সেই মর্মভেদী আওয়াজ চিরদিন আমার মনে পড়বে। এখনও যেন আমি স্পষ্ট শুনতে পারছি তা। আমার সেই মাথা ঘুলিয়ে

যাওয়ার কথাও যেন স্পষ্ট মনে করতে পারছি এখন। প্রত্যেক বারই আমি তখন ভাবছি—‘এইবার আমার পালা।’ কিন্তু তার পরেও গুলী চলে, অথচ আমি বেঁচে!

“শেষটায় আর সন্দেহ রইল না। কে যেন আমায় চেপে ধরলো, নিয়ে চললো তারপর। কোনো বাধা পেলাম না, বেদনাও বোধ করলাম না। কানের কাছে কারা যেন কথা বলছে। আমি আর ভাবতে না পেরে অজান হয়ে পড়ে গেলাম। তারপর আর মনে নেই। মনে হলো, আমি যেন গভীরঘুমে অচেতন। কিছুক্ষণ পরে ভাবলাম, আমি যেন স্বপ্ন দেখছি। প্রথম-বারের স্বপ্নে দেখলাম আমি গুলীবিন্ধ হয়ে মারা গেছি।

(৬)

“দ্বিতীয়বার স্বপ্ন দেখলাম কিন্তু উল্টো। আমার মনে হলো কারণহীন আমি একটা খাটিয়ায় শুয়ে। কিন্তু কিছুই দেখতে পারছিলাম না।

“চোখে হাত দিয়ে দেখলাম ব্যাডেজটা আছে কিনা। না নেই তো! আমি কি তবে মরে গেছি, না অন্ধ হয়ে গেছি? চোখে দেখতে পারছি না কেন তাহলে?

“না সে-সব কিছুই নয়। আসলে, ঘরটাই ছিল ঘটঘটে অন্ধকার।

“ঘটগর্দান শুনতে পেলাম। গীর্জার ঘটগর্দান।

“আমার মনে হলো তখন নটা বেজেছে। কিন্তু কি বার?

“আমার ওপর কি যেন ঝুঁক পড়লো। একটা ছায়া। ঘরের অন্ধকারের চেয়েও যেন কালো। ধীরে ধীরে ছায়াটি মানুষের মূর্তি ধারণ করলো।

“আমি বললাম—‘আর উনিশজনের কি হলো?’

“‘তাদের সবাকে গুলী করা হয়েছে।’

“আর আমাকে? আমি কি মরে গেছি? না, বেঁচে আছি এখনো?’

“সেই ছায়ামূর্তির দিকে আমি একটু এগিয়ে গেলাম। হঠাৎ আমার মূখ দিয়ে অস্পষ্ট-স্বরে উচ্চারিত হলো একটি নাম।

“কে! রেমন্?

“কি হলো? অমন করছো কেন?’ আমার বন্ধুর কণ্ঠস্বর যেন বোঁরয়ে এলো সেই ছায়া-মূর্তির ওলা থেকে।

“আমি তখন কাঁপছি। চীৎকার করে বললাম—‘রেমন্? আমি কি পরলোকে দাঁড়িয়ে কথা বলছি?’

“না।’ আমার সেই কণ্ঠস্বর।

“রেমন্! তুমি কি এখনো বেঁচে আছ?’

“হ্যাঁ! তাই তো মনে হচ্ছে।’

“আর আমি?’

“তুমিও।’

“কিন্তু, আমি কোথায়? এটা কি সেন্ট-নিকোলাসের গীর্জা, যেখানে আমাদের দেখা করবার কথা ছিল? আমি কি তবে বন্দী নই? অথবা, আমি যা দেখছি সবই কি স্বপ্ন?”

“না ব্যাসিলিও! তুমি মোটেই স্বপ্ন দেখছ না। শোনো—

(৭)

“তুমি তো জানই, কালকের ঐ বৃষ্টি আমি কর্ণেলকে বধ করেছি। প্রতিশোধ নিয়েছি আমি। রাগে আমি তখন জ্ঞান হারিয়েছিলাম। আমি তখন নিজের পূর্ব-সংগীদেরও মারতে ছুটেছি পর্যন্ত। কিন্তু রাতে আর যুদ্ধক্ষেত্রে কাউকেই পেলাম না।

“আকাশে যখন চাঁদ উঠলো, মনে পড়ল তোমার কথা। সেন্ট নিকোলাস গীর্জার দিকে তখন পা বাড়লাম। রাত তখন সবে দশটা। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি সেখানে। রাত একটার আমাদের সাদাং করবার কথা। কিন্তু তার আগের রাতে আমি ঘুমোতে পারিনি মোটেই। তাই, একটু পরেই গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘাড়ের শব্দে আমার ঘুম ভাঙলো।

“রাত একটা বাজার ঘটগর্দান হলো তখন।

“চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম ভালো করে। না, কেউ কোথাও নেই। আমি একা। ভাবলাম, তুমি তাহলে নিশ্চিত মারা গেছ। তবু আমি নিদারুণ উদ্বেগে আর উৎকণ্ঠায় তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

“ধীরে ধীরে দুটো বাজলো, তিনটে বাজলো, চারটে বাজলো। কি ভাবে যে তখন জেগে বসে আছি তোমার অপেক্ষায়, তুমি তা কল্পনাও করতে পারবে না। সে এক ভয়ঙ্কর জাগর-রাত্রি।

“ভোর হবার আগে পর্যন্ত তুমি যখন এলে না, তখন আর বুঝতে পারি রইলো না যে, তুমি মারা গেছ। তুমি আর আসবে না। আমি তখন গীর্জা হেড়ে শহরে ফিরে এলাম, যেখানে কার্ল’স্টেরা রয়েছে। আমি যখন তাদের ব্যারাকে প্রবেশ করি, সূর্য তখন উঠছে। সবাই ভেবেছিল আমি আগের দিনই মারা গেছি। তাই আমাকে ফিরে পেয়ে, তাদের আনন্দ যেন আর ধরে না সেনাপতিও আমাকে দেখতে লাগলেন সমস্ত দৃষ্টি মেলে। অন্যান্য খবরের সংগে শুনলাম, যে কুড়িজন বন্দীকে আজ সকালেই মারা হবে গুলী করে। একটা অশুদ্ধ সূচক পূর্বাভাস মনকে আচ্ছন্ন করে ফেললো।

“‘ভাবলাম, ব্যাসিলিও কি এ দলে আছে?’

“আমি তৎক্ষণাৎ বধ্যভূমিতে ছুটে গেলাম।

ঘাতকেরা তখন এসে গেছে। কয়েকটা গুলীর আওয়াজও আমি শুনলাম। আমি তখন বন্দীদের মূখ ভালো করে দেখবার চেষ্টা করছি। শেষটায় আমি দারুণ উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনার মুহূর্তে তোমাকে আবিষ্কার করে বসলাম।

তোমার পালা আসবার আগে, তখনও দু'জন বাকী। এখন কি করা যায়?

“পাগলের মত আমি সামনের দিকে ছুটে গেলাম। তোমাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে চাঁৎকার করে বলে উঠলাম—‘একে মারবেন না সেনাপতি, একে আপনি মারবেন না।’

“ঘাতকদের যিনি আদেশ দিচ্ছিলেন, সেই সেনাপতি আমাকে তার আগের দিন সন্ধ্যা থেকেই চিনতেন। আমার কথায় তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—‘কেন বল তো? ও কি কোনো সঙ্গীতজ্ঞ?’

“হ্যাঁ একটা পথ যেন খুঁজে পেলাম। অশ্বের কাছে এক বলক সূর্যালোক যেমন করে আশার বাতী বহন করে, ঠিক তেমনি করেই যেন এক বলক আশার আলো দেখতে পেলাম। এ সুযোগ নষ্ট হতে দেওয়া হবে না কিহুতেই। আমি তৎক্ষণাৎ চাঁৎকার করে বলে উঠলাম—‘হাঁ, সেনাপতি, এ সঙ্গীতজ্ঞই বটে। শূদ্র সঙ্গীতজ্ঞ কেন, এর মত ভালো বাজিয়ে সমস্ত রাজকীয় সেনাবাহিনীতে আর নেই। খুব উচ্চস্বরের শিল্পী এ।’

“এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি আমার পায়ের কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়লে। এখনো তোমার চেতনা সম্পূর্ণ ফিরে আসেনি।

“সেনাপতি জিজ্ঞাসা করলেন—‘কোন বাজনা ও বাজাতে পারে?’

“আর একটা ভাবনা। ব্যান্ডপার্টির দিকে আমার নজর পড়লো। মনে হলো তাদের সঙ্গে যেন কী একটা বাজনা নেই।

“একটু ভেবে বললাম—‘কনেট। কনেট বাজাতে ও একবারে ওস্তাদ, সেনাপতি।’

“ব্যান্ড মাস্টারের দিকে তাকিয়ে সেনাপতি তখন বললেন—‘আমাদের তো একজন কনেট-বাজিয়ের খুব দরকার। তাই না?’

“অধীর আগ্রহে আমি তখন জবাবের অপেক্ষা করছি।”

“ব্যান্ড মাস্টার বলে উঠল—‘হাঁ স্যার কনেট বাজিয়ে আমাদের খুবই দরকার।’

“তখন একটা সিগারেট ধরিয়ে বেশ শান্ত কণ্ঠেই সেই কালিস্ট সেনাপতি বললেন—‘এ লোকটাকে তাহলে নিয়ে যাও। আর সবাইকে গুলী করে মেরে ফেল।’

“কাজেই, তোমাকে তখন সঙ্গে করে এই শিবিরেই আবার নিয়ে এলাম।’

(৮)

“রেমন্ যখন ধামলো, আমি তখন খাটরী থেকে উঠে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুস্রব্ধ কণ্ঠে বললাম—‘বন্ধু! আমার জীবন তুমি বাঁচিয়েছ।’

“রেমন্ বললে—‘ঠিক বাঁচিয়েছি কিনা এখনো বলতে পারি না।’

“কেন! আবার কি হলো?’

“তুমি কি কনেট বাজাতে পার?’

“না।’

“তাহলে, তোমাকেও আর বাঁচাতে পারলাম না, সেই সঙ্গে আমাকেও বাঁচাতে পারব না আর।’

“তার কথায় আমি চমকে উঠলাম।

“কিছুক্ষণ পরে সে আবার বলল—‘তুমি কি বাজনার কিছুই জান না?’

“জানি সামান্য। ইশ্কুলে যা শিখেছিলাম।’

“সে তো খুবই সামান্য। বলতে গেলে কিছুই না একবারে। তারা যখন দেখবে আমরা তাদের প্রভাবগা করছি, তৎক্ষণি গুলী করবে। তাতে আর সন্দেহ নেই। ভেবে দেখ একবার অবস্থাটা। আর পনের দিনের মধ্যেই তারা সেনাদলের ব্যান্ডপার্টি সম্পূর্ণ করে ফেলবে। তুমি হবে তাদের দলেরই একজন। এসব ঠিক হয়ে গেছে।’

“পনের দিন পরেই?’

“হ্যাঁ। ঠিক পনেরদিন পরে। কিন্তু তুমি যখন বাজাতে পারবে না কোনমতেই, তখন আমাদের নির্বাণ গুলী করে মারা হবে; একথাও ঠিক।’

“আমি তখন লাফিয়ে উঠলাম।

“চাঁৎকার করে বললাম—‘গুলী? গুলী করবে? দাঁড়াও, দাঁড়াও। গুলীতে আমি মরতে চাই না, তোমাকেও মরতে চাই না। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ ভাই। এই পনের দিনের মধ্যেই আমি যে করে পারি বাজনা শিখব। কনেট আমি বাজাবই বাজাব। তুমি দেখে নিয়ো।’

“আমার প্রতিজ্ঞার কথা শুনে রেমন্ হেসে উঠলো হো হো করে।

(৯)

“গগেপার আর বেশি বাকী নেই। শোনো এবার।

“কাছের শহরেই একজন বাজনা শেখাবার মাস্টার খুঁজে পাওয়া গেল। আমি তখন সেনাপতিকে জানালুম যে, যদুশ্চ আমি আমার কনেটটা হারিয়ে ফেলেছি। কাজেই, এ কটা দিন ঐ মাস্টারের কনেটটা বাজিয়ে একটু তালিম দিয়ে নেওয়া যাক। তাতে করে আমার অভ্যাসটাও বেশ চোস্ত হয়ে উঠবে। রেমন্ আমার জামীন হলো। আমি পলাব না সে প্রতিশ্রুতি দিলো।.....আহা! সেই পনের দিন! দিন নেই, রাত নেই আমি সেই মাস্টারের কাছে একাগ্র মনে কনেট বাজনা শিখছি। এক মুহূর্তও নষ্ট হতে দিই না। এই পনের দিনের মধ্যেই ব্যান্ড পার্টিতে বাজাবার মত গৎ শিখে ফেললাম। একরকম ভালোই শিখলাম বলতে হবে।

“আমি জানি, তোমরা হয়তো এফুগি বলবে, কেন আমি সেই সুযোগে পালাইনি। কিন্তু আমি তা পারতাম না। কারণ, প্রথমত আমি যদু-বন্দী, দ্বিতীয়ত রেমন্ আমার

দায়িত্ব নিয়েছে। আমাকে ছেড়ে হুস অনায়াসেই পালাতে পারত; কিন্তু একা সে কিহুতেই বাবে না। কাজেই, পালানোটা আমাদের দু'জনের পক্ষেই বিপজ্জনক।

“আমার তখন কথা বলবার সময় নেই, খাবার সময় নেই, চিন্তা করবার সময় নেই পর্যন্ত। আমি কেবল বাজিয়েই চলছি। আমি যেন তখন পাগল হয়ে গেছি একবারে। বাজনা ছাড়া যেন আমার কোন চিন্তাই নেই।

“শিখব বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, শিখলামও। কথায় বলে না—ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়? এও হলো সেইরকম।

“আমি যদি বোবা হয়ে এইভাবে কথা বলবার চেষ্টা করতাম, তাহলে বোধ করি কথাও বলতে পারতাম; পক্ষাঘাতে পংগু হয়ে যদি এই রকম একান্ত চেঁচায় হাঁটতে শিখতাম, তাহলে আমার পক্ষে হাঁটাও শক্ত হতো না; অন্ধ হয়ে যদি এইভাবে একাগ্র মনে দেখবার চেষ্টা করতাম, তাহলে বোধ হয় দেখাতও পারতাম।... নিজের জীবন রক্ষা করতে হবে; তার চেয়েও বড় কথা, আমার বন্ধুকে বাঁচাতে হবে। এই ইচ্ছাই তখন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছিল।

“মনে মনে যা করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, করেও ছিলাম তা। কোন কিহু করতে হলে চাই মনের ঐকান্তিক ইচ্ছাশক্তি। নাতান্নাতনী! ভাইপো-ভাইবিরো আমার! একথা ভুলো না কোনদিন—ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আমি শিখব বলে ইচ্ছা করেছিলাম—তাই বার্থ হইনি।

“কিন্তু একথা ঠিক, আমি তখন পাগল হয়ে গিয়েছি।

“বাজনা ছাড়া আমি আর কোনো কিছুই ভাবতাম না। আমি যখন ব্যান্ডপার্টিতে যোগ দিলাম, তারা তখন আমাকে একটা নতুন কনেট কিনে দিল। আমার কাছে সেটা তখন আমার ছেলের সমান প্রিয়বস্তু। তিন বছরের মধ্যে আমি খুব কমই তাকে ফেলে রেখেছি না বাজিয়ে। সূরের পর্দা আর তার সংমিশ্রণের কৌশল নিয়ে আমি তখন এক নতুন জগতের সৃষ্টি করে চলেছি।

“সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা! সেই হলো আমার মূলমন্ত্র। কনেট বাজনা ছাড়া আমি আর কিছুই করতাম না তখন।

“শেষটায় অবিশ্যি আমি আর রেমন্ ফ্রান্সে পালিয়ে যাই। সেখানে ঐ কনেট বাজিয়েই আমি আমাদের জীবিকা নির্বাহ করতাম। আমিই যেন কনেট, কনেটই যেন আমার আত্মা। আমি যখন বাজাতাম, আমার মনে হতো সেই সূরে সূরে যেন আমার অন্তরের কথাই সঙ্গীত হয়ে ঝরে পড়তো। বাজাতে বাজাতে এতই ওস্তাদ হয়ে উঠলাম যে, যে-কোন ভাবকেই আমি ঐ কনেটের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে পারতাম।

হাসির সুরই বোলে, আর কান্নার সুরই বোলে; হতাশার সুরই হোক, আর আনন্দের রাগিণীই বল—সবই বাজাতে পারতাম আমি। কর্নেটের মধ্য দিয়ে আমি যেন গজেন করেও উঠতে পারতাম। যে-কোন পাখীর রব, যে-কোনো জন্তুর ডাক আমি নকল করতে পারতাম এ কর্নেটে। দলে দলে লোক আসতো শুনতে। আমরা প্রকাশ্যভাবে জলসা অনুষ্ঠানের আয়োজনও করছি। এমন কি বড় বড় গাইয়ে

বাজিয়েও শুনতে আসতেন আমার বাজনা, আমার বাজনার অদ্ভুত কৌশল।

“এইভাবে কেটে গেল দুটো বহর। তারপর, আমি আমার বন্ধুকে হারালাম। রেমন মারা গেল। আমি যাতে একলা বাজনা নিয়ে মেতে থাকতে পারি, সেজন্যই কি বন্ধু আমার, আমাকে একলা ফেলে রেখে পালিয়ে গেল।

“তার শব্দদেহের দিকে তাকাতেই, আমার সমস্ত পাগলামি যেন কোথায় মিলিয়ে গেল

এক মুহূর্তে। আমার চেতনা ফিরে এলো, আমি বাস্তব মানুসে রূপান্তরিত হলাম। কিন্তু এরপরে সেদিন সেই কর্নেটে নিয়ে আমার বাজাতে গেছি—সেদিন কোন সুরই বেরুলে না তাতে। একটা গণ্ড-ও আমি বাজাতে পারলাম না। বেমালদ সব ভুলে গেলাম একেবারে।

“এখন তোমরাই বোলে, আমাকে কি আর তোমাদের নাচের সঙ্গে কর্নেট বাজাতে বলবে?”

অনুবাদক—মনোজ্ঞ বন্দু

## মহাকবি শ্রীশ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর

### স্মৃতিরক্ষাকল্পে আবেশন

“শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত” প্রণেতা শ্রীশ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর নাম শিক্ষিত বাঙালিরই সুপরিচিত। “শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত” জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহের অন্যতম। একাধারে উচ্চশ্রেণীর কবিত্ব ও দার্শনিক তত্ত্বের সমন্বয় এই গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের নিকট এই গ্রন্থখানি বিশেষ করিয়া চির আদরণীয়। এই গ্রন্থের পঠন, পাঠন ও শ্রবণ তাঁহাদের নিত্য সাধনার অন্তর্গত। এই গ্রন্থখানি বঙ্গ ভাষার কঠোরের মর্যাদা স্বরূপ।

একাধারে চিরকুমার-মহাকবি ও পরমবৈষ্ণব শ্রীশ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর মহাপ্রভুর শ্রীবন্দনাবলী। যট গোস্বামীর সাক্ষাৎ শিষ্য। “শ্রীগোবিন্দ লীলামত” তাঁহার অন্যতম গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবত-গীতা যেরূপ উপনিষদসমূহের সার স্বরূপ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও সেইরূপ গোস্বামীর গ্রন্থসমূহের নির্মাস্বরূপ। শ্রীশ্রী কবিরাজ গোস্বামীর স্মৃতি বৈষ্ণব সমাজের নিকট অতি পবিত্র। তাঁহার স্মৃতি সর্বলিঙ্গ বস্তুমাত্রই বৈষ্ণব-গণের সাধারণ সম্পত্তি—পরম গৌরবের সামগ্রী।

মহামানবী কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ধমান জেলাসংগত কাটোয়া মহাকুমার অধীন ঝামটপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, এই গ্রামে তাঁহার বাসভূমিটা ও তৎপ্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহাদি অদ্যাপি বিদ্যমান। “কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীপাট” নামে এই স্থান পরিচিত। অত্যন্ত দুঃখের ও অনুতাপের বিষয় যে বাঙালার ও বিশেষত বাঙালীর এই পরম গৌরবের স্থান, সমগ্র বৈষ্ণব জগতের পবিত্র তীর্থ এই শ্রীপাট আজ অত্যন্ত উপেক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান। এই স্থানের শ্রীমন্দির আজ সংস্কারভাবে জীর্ণ, নির্মিত ব্যবস্থার অভাবে শ্রীবিগ্রহগণের সেবাও অত্যন্ত দুর্ভাগ্য, অতিথি ও ভক্ত সেবার কোন সুব্যবস্থা নাই।

শ্রীশ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর পূণ্য স্মৃতিরক্ষাকল্পে “নিখিল বঙ্গ কৃষ্ণদাস কবিরাজ সন্মিতি” নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং উহা ১৮৬০ সালের ২১ আইনানুসারে রেজিস্ট্রীকৃত হইয়াছে। এই সমিতির বাঁহারা কর্মকর্তা তাঁহার বৈষ্ণব ও সাহিত্য জগতে বিশেষ সুপরিচিত ও সম্মানিত। এই সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীপাট ঝামটপুরের সর্ববিধ সংস্কার সাধন একান্ত কর্তব্য, ইহাই আমাদের বিশিষ্ট

অভিমত। এক্ষণে আমাদের সান্দ্র্য নিবেদন ধর্ম-প্রাণ ভক্তগণ, দেশের সকল সাহিত্য প্রতিষ্ঠান, সুধিবৃন্দ ও সাধারণ জনসমাজ, এই সমিতির সহিত সহযোগিতা করিয়া যাতে বাঙালার এই পরম পবিত্র তীর্থের দীর্ঘমুখ অক্ষয় থাকে তদ্বিষয়ে সর্বপ্রকার যত্নবান হউন। শ্রীশ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর মহোদয়ের শ্রীপাটের ঔজ্জ্বল্য সাধনের জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। মহাপ্রাণ জনগণ যিনি যতটুকু সাহায্য করিবেন তাহা এই পুণ্যপীঠের সেবার ব্যয়ত হইবে। অতএব আমাদের নিবেদন, দেশবাসি-গণ যথাসাধ্য সাহায্যাদি সমিতির নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হউন। ইতি—বিনীত নিবেদক—শ্রীসিকিমোহন শর্ম্ম (বৈষ্ণবচাচ্য), অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী (প্রভুপাদ), মহারাজ শ্রীশ্রীচন্দ্র নন্দী (কোশমবাজার), রাজা শ্রীক্ষিত্তিন্দ্র দেব রায় মহাশয় (বাঁশবেড়িয়া), ডাঃ শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্যার যদুনাথ সরকার, স্যার বিজয়-প্রসাদ সিংহ রায়, স্যার হরিশঙ্কর পাল (ভূতপূর্ব মেয়র, কলিকাতা), ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ভাইস চ্যান্সেলার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), কুমার কান্তকরণ মল্লিক (কলুটোলা রাজবাটী), ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়; ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস; ডাঃ বানন্দদাস মুখোপাধ্যায়; শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী; শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ; শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী; শ্রীকুমারদত্ত মল্লিক; শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র (রায় বাহাদুর); ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত; শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার (আনন্দবাজার); শ্রীমণ্ডলকান্তি ঘোষ (অমৃত-বাজার); শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক, বসুদত্ত); শ্রীরামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়; ডাঃ যতীন্দ্র-বিমল চৌধুরী (অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ); ডাঃ রমা চৌধুরী, এম এ, পি এইচ ডি; শ্রীকালিদাস রায়, ক’বিশ্বখর; শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (সম্পাদক, স্ববাজার); শ্রীমাধবলাল সেন (ভারত); শ্রীসুরেন্দ্র-কুমার রায় চৌধুরী (সম্পাদক, বর্তমান); শ্রীরবীন্দ্র-নাথ গোস্বামী; ডাঃ পণ্ডান চট্টোপাধ্যায় (মেডিক্যাল কলেজ); ডাঃ মণীন্দ্রনাথ সরকার; ডাঃ খগেন্দ্র-ভূষণ ঘোষ; ডাঃ বি পি হিন্দে (ব্যাকট্রিওলজিস্ট, গবর্ণমেন্ট অফ বেঙ্গল); ডাঃ শচীকুমার চ্যাটার্জি, কেমিক্যাল একজার্মিনার (গবর্ণমেন্ট অফ বেঙ্গল); ডাঃ দৌরীন ঘোষ, ডাইরেক্টর অব সোসিয়াল হাই-জিন (গবর্ণমেন্ট অফ বেঙ্গল); কুমার বিমলচন্দ্র

সিংহ (পাইকপাড়া রাজবাটী); শ্রীকণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক, ভারতবর্ষ); শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী (সম্পাদক, সংহতি); ডাঃ পণ্ডান নিয়োগী (প্রিন্সিপাল, মহারাজ মণীন্দ্র কলেজ); কুমার মুরারীমোহন লাহা; শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়); শ্রীলীলাপ্রসাদ দত্ত (রৌটার্ড, কিপার অফ রেকর্ডস, গবর্ণমেন্ট অব বেঙ্গল); শ্রীনবমণীচন্দ্র রক্তবাসী; শ্রীমদ্রথমোহন বসু (সভাপতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ); শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক, যুগান্তর); শ্রীচণ্ডীচরণ স্মৃতি জ্যোতিভূষণ; শ্রীপঞ্চকুমার মল্লিক (সুরঙ্গপুর); শ্রীমহেন্দ্রনাথ জ্যোতিবাঁশ্ব; শ্রীসজনীকান্ত দাস (সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ); শ্রীকালীপদ তর্কচাচ্য (মহামহোপাধ্যায়); শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়; শ্রীনরেন্দ্র দেব; শ্রীসুধাংশু-কুমার রায় চৌধুরী; শ্রীসুবলকৃষ্ণ গোস্বামী; শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বেদতর্কতীর্থ ভাগবতাচার্য; শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদক, রবীন্দ্রসংসদ); শ্রীজ্যোতিচন্দ্র ঘোষ; শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ভূতপূর্ব মেয়র, কলিকাতা); শ্রীশিবানন্দ রহস্যচাচ্য; স্বামী যোগানন্দ; শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়; ডাঃ শম্ভুর সিংহ (হিন্দুস্থান ট্যাক্সাড); শ্রীহরিশাস্ত্রী দাস (হরিবোল কুটীর, নবমণীপ); শ্রীসরলচন্দ্র অঙ্গহেত্রী (পরিব্রাজক); শ্রীসদানন্দ সমাধী (যোগানন্দ মঠ); শ্রীমদ্রথনাথ ঘোষ; শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক, পুরাণ); শ্রীঅম্বলক্সে আরকট (অধ্যাপক); শ্রীজানকীনাথ ভট্টাচার্য (ভট্টপাড়া); শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট (পানিহাটী); শ্রীশ্রীনিবাস দাস (শ্রীধাম বন্দাবন); শ্রীপুলিনচন্দ্র দে (বরাহনগর পাটবাড়ী); শ্রীমণিমোহন মল্লিক (গোড়ায় বৈষ্ণব সন্মিলনী); শ্রীমদ্রজচন্দ্র সর্বাধিকারী (হিন্দু মহাসভা); শ্রীগুরুদাস সরকার (মোজিষ্ট্রিট, বহরমপুর); শ্রীবিক্রম সন্ন্যাসী; শ্রীপ্রকৃষ্ণকুমার শেঠ (সম্পাদক, জনপমোহন হারিস-সভা); শ্রীপুলিনহরিশ্রী হালদার (সম্পাদক, হাওড়া গোড়ায় বৈষ্ণব সন্মিলনী); শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য (সম্পাদক, গীতা কার্যালয়), শ্যামসুন্দর দত্ত (সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য লাইব্রেরী); শ্রীনটর দত্ত (বৈষ্ণব সভা); শ্রীরাধাপ্রসাদ নন্দী (সেন্ট জেভন্স লেন্সথ হরিসভা); শ্রীক্ষিত্তীকুমার ঘোষ (গৌর-গোবিন্দ মঠ); শ্রীকালীপদ ঘোষ (জমিদার)।

সাহায্যাদি প্রেরণের ঠিকানা—(১) শ্রীহরিশাস্ত্রী নন্দী, কোষাধ্যক্ষ, নিখিল বঙ্গ কৃষ্ণদাস কবিরাজ সন্মিতি, ১/০ এইচ ডি নন্দী এন্ড কোং ৫০।৬।৭, যমতলা শ্রীট, কলিকাতা। (২) শ্রীমলপাতি ঘোষ, মেডিক্যাল কলেজ ১নং কটেজ, কলিকাতা; (৩) শ্রীরাধারমণ দাস, ৬৬নং মন্ডলপাড়া লেন, কাশীপুর (২৪ পরগণা)।



# রবীন্দ্র-কাব্য-জীবন-প্রবাহ

## বিশিষ্ট-স্মরণ-সংকলন

### সংকলয়িতার নিবেদন

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও তিরোভাব

—এই দুটি-দিনই আমাদের সমভাবে পালনীয় ও স্মরণীয়। কি পশ্চিমে বৈশাখে, কি বাইশে শ্রাবণে কবির জন্মাষ্টমি বা কবির স্মৃতি-তপ্পণ প্রস্থায় ও অনুরাগে, স্মৃতিচিহ্ন ও সংগমে তাঁর দেশবাসীর অবশ্য করণীয়। কিন্তু প্রতি বৎসর এই দিন-দুটিকে ঘিরে নানা স্থানে যে-সব অনুষ্ঠান হয়, লক্ষ্য করে দেখে গেছি, তাতে তাঁর সৃষ্টির মর্মকথাটি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, বহু বৃথা বাক্যের নিরর্থকতায় পড়ে যায় চাপা; প্রাতিষ্ঠানিক বাগাড়ম্বরে তাঁর বাণীমূর্তি হয়ে পড়ে নিঃপ্রভ। তাই অনেক সময় ভেবেছি, কেমন করে এ-সব অনুষ্ঠানে তাঁর কাব্য-জীবন-প্রবাহের মূল ধারাটি ধরে, তাঁর যে-সৃষ্টি, কল্পপরিণতির মধ্য দিয়ে গিয়ে পৌঁছেয়েছে সৃষ্টির অতীতে, তার একটু পরিচয় দেওয়া যায়,—যাতে সার্থক হয় আমাদের স্মরণ, তাঁর সেই নিরন্তর প্রকাশের পথে, অন্তরের উপলব্ধিতে।

এই কথা মনে নিয়ে আমি এখানে রবীন্দ্রনাথের যে-কাব্যসৃষ্টি, তার অরুণোদয়ে ক্ষীণধারা নিব্বর-উৎস থেকে, মধ্যাহ্নদিনে দৃক-লম্বাবী খরনদীপ্তোত বেয়ে, শান্তসমাহিত সন্ধ্যায় মহাসাগরসংগম পর্যন্ত, যে অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য নিয়ে পরম পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছে, তাঁর একটু পরিচয়, আর তাঁর একটু ব্যাখ্যা—কবির আপন মূখের কথাতেই—দেবার চেষ্টা করেছি। বলবার দরকারও মনে করছি না যে, তাঁর অখণ্ড কাব্য-জীবন-প্রবাহের এ-পরিচয় খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ। আমি শুধু কবি নিজে যে-কথা বলেছিলেন ‘রবীন্দ্র রচনাবলী’র ভূমিকায়—

“আমার লেখার ধারা আমার জীবনের ধারার সঙ্গে সঙ্গেই অবিচ্ছিন্ন এগিয়ে চলেছে।.....একটা ঐক্যের স্বাক্ষর তাদের সকলের মধ্যে অঙ্কিত হয়ে নিশ্চয়ই পরম্পরের আত্মীয়তার প্রমাণ দিতে থাকে”

—সেই কথাটি মনে রেখে এই সংকলনটি করছি। এ থেকে পশ্চিমে বৈশাখের বা বাইশে শ্রাবণের কোনো একটি অনুষ্ঠানেরও যদি সামান্য সহায়তা হয়, তাতেই আমার তৃপ্তি। ইতি ২২শে শ্রাবণ। ১৩৫৪ ॥

—অমল হোম

দৃষ্ট—

বলে রাখা ভাল যে, কবির দীর্ঘজীবনব্যাপী কাব্যপ্রবাহের মূল ধারাটিকে একটি দিনের মধ্যে ধরা হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হবে না। সিক এই অনুষ্ঠানপদ্ধতিটিকে সমগ্রভাবে রূপদান করতে গেলে যে সময়ের প্রয়োজন তা স্ফুট না হলে, এখানে যা সংকলিত হোলো, তা স্থান কাল অনুযায়ী সংক্ষেপিত করতেই হবে। সে-ভার রইলো অনুষ্ঠাতাদের হাতে। তাঁরা

তাঁদের অভিরূচি ও আয়োজনমতো এ পদ্ধতি পরিবর্তিত করে নেবেন। কবির কাব্যধারাগতির বোধসহায়তায় আমি যেখানে কোনো একটি কাবের বা তার কাব্যকৃত ব্যাখ্যার একাধিক উদাহরণ সম্মিলিত করেছি, তাঁরা সেখানে সেটি অনামাসেই বর্জন করতে পারেন। তাতে তাঁর সৃষ্টির মূল ঐক্য-সূত্রটির ধারার পক্ষে অবিশিষ্ট হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

—সংকলয়িতা ॥

### [ বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের অনুমোদনক্রমে ]

“নিজের সত্য পরিচয় পাওয়া সহজ নয়। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতরকার মূল ঐক্যসূত্রটি ধরা পড়তে চায় না। বিধাতা যদি আমার আয়ু দীর্ঘ না করতেন, তা হলে নিজের সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করবার অবকাশ পেতাম না। নানা খানা করে নিজেকে দেখেছি, নানা কাজে প্রবর্তিত করেছি, ক্ষণে ক্ষণে তাতে আপনাতত্ত্বের অভিজ্ঞান আপনাতত্ত্বের কাছে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদীক্ষণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম, তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে,— সে আর কিছু নয়,—

আমি কবি মাত্র।”

২৫শে বৈশাখ। ১৩৩৮ ॥

—২৩শে শ্রাবণের সংখ্যায় প্রকাশিত—  
প্রথম ধারা—উন্মোচন। কৈশোরক। যৌবনবর্ষন ॥  
১। “প্রভাত-সংগীত”। ২। “কড়ি ও কোমল” ॥

—৩০শে শ্রাবণের সংখ্যায় প্রকাশিত—  
দ্বিতীয় ধারা—৩। “মানসী”। ৪। “সোনার তরী” ॥

—৬ই ভাদ্রের সংখ্যায় প্রকাশিত—  
তৃতীয় ধারা—৫। “চিরা”। ৬। “কম্পনা” ॥

—১৩ই ভাদ্রের সংখ্যায় প্রকাশিত—  
চতুর্থ ধারা—৭। “ক্ষণিকা”। ৮। “নৈবেদ্য”। ৯। “স্মরণ” ॥

—২০শে ভাদ্রের সংখ্যায় প্রকাশিত—  
পঞ্চম ধারা—১০। “উৎসর্গ” ॥

—এই সংখ্যায় প্রকাশিত—  
ষষ্ঠ ধারা—১১। “খেয়া”। ১২। “গীতাঞ্জলি”।

১৩। “গীতিমালা”। ১৪। “গীতালি” ॥

## উপক্রমণিকা

১

সেদিন কি তুমি এসেছিলে, ওগো  
সে কি তুমি, মোর সভাতে?  
হাতে ছিল তব বাঁশ  
অথবা অবাঙ্ক হাসি,  
সেদিন নাগদনে নেতে উঠেছিল  
মনরিহলে শোভাতে।  
সে কি তুমি, ওগো, তুমি এসেছিলে  
সেদিন নবীন প্রভাতে—  
নবযৌবন সভাতে?

২

সেদিন আমার মত কাজ ছিল  
সব কাজ তুমি ভুলালে।  
খেলিলে সে কোন খেলা,  
কোথ; কেটে গেল বেলা।  
চেউ দিয়ে দিয়ে হৃদয়ে আমার  
রক্তকমল দুলালে।  
পুলকিত নোর পরাগে তোমার  
বিলোল নরন বুলালে—  
সব কাজ মোর ভুলালে।

৩

তার পরে হায় জানিনে কখন,  
ঘুম এল মোর নরনে।  
উঠিন, কখন জেগে  
চেকেছে গগন মেঘে—  
তরতলে আছি একেলা পড়িয়া  
দলিত পত্র-শয়নে।  
তোমাতে আমাতে রত ছিল, যবে  
কাননে কুসুম-চয়নে  
ঘুম এল মোর নরনে।

৪

সেদিনের সভা ডেকে গেছে সব  
আজি ঝরঝর বাদরে।  
পথে নোক নাহি আর,  
রুদ্ধ করেছি দ্বার—  
একা আছে প্রাণ ভূতল-শরান  
আজিকার ভরা-ডানরে।  
তুমি কি দুরারে আঘাত করিলে—  
তোমাতে লব কি আদরে  
আজি ঝরঝর বাদরে।

৫

তুমি যে এসেছ ভ্রম্মলীন  
তাপসদ্বারিত ধরিয়া।

স্তিমিত নয়নভারা  
ঝলিছে অনলপারা,  
সিন্ধু তেনার জটাজুট হ’তে  
সলিল পড়িছে ঝরিয়া।  
বাহির হইতে ঝড়ের আধার  
আনিয়াছ সাথে করিয়া  
তাপসদ্বারিত ধরিয়া।

৬

নামি হে ভীষণ, মৌন, রিক্ত,  
এসো মোর ভাঙা আলয়ে।  
ললাটে তিলকরেখা  
যেন সে বহিঃলেখা,  
হস্তে তোমার লৌহদণ্ড  
ঝাজিছে লৌহবলয়ে।  
শূন্য কিরিয়া যেনো না, অর্থাৎ,  
সব ধন মোর না লয়ে।

এসো এসো ভাঙা আলয়ে ॥  
—“উৎসর্গ”। ৩৯। রবীন্দ্রচন্দ্রাবলী। দশম খণ্ড ॥

## “খেয়া”

॥ ১৩১৩ ॥

১৩। পাঠ—

—“হে রাজা, তুমি আমাদের দুঃখের রাজা। ইঠাৎ যখন অধরাহ্নে  
তোমার রথচক্রের বগ্নগজনে মেদিনী বলির পশুর হৃৎপিণ্ডের মতো কাঁপিয়া  
উঠে—তখন জীবনে তোমার সেই প্রচণ্ড আবির্ভাবের মহাক্ষণে যেন তোমার  
জয়ধ্বনি করিতে পারি—হে দুঃখের ধন, তোমাকে চাহি না—এমন কথা  
সেদিন যেন ভয়ে না বলি—সেদিন যেন মমার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তোমাকে  
ঘরে প্রবেশ করিতে না হয়,—যেন সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া সিংহাস্বর খলিয়া  
দিয়া তোমার উদ্দীপ্ত ললাটের দিকে দুই চক্ষু তুলিয়া রাখিতে পারি,—  
যে দারুণ, তুমিই আমার প্রিয়।” (১০০)

১৪। আবৃত্তি—

—“তখন রাত্রি আঁধার হ’ল  
মাগ হ’ল কাজ—  
আমরা মনে ভেবেছিলাম  
আসবে না কেউ আজ।

মোদের গ্রামে দুরার বত  
রুদ্ধ হ’ল রাতের মতো  
দু’ একজনে বলেছিল—  
“আসবে মহারাজ”

আমরা হেসে বলেছিলাম  
“আসবে না কেউ আজ”।

(১০০) “ধর্ম”। “দুঃখ”। “রবীন্দ্রচন্দ্রাবলী”। দ্বয়োদশ খণ্ড ॥

স্বারে যেন আঘাত হ'ল  
শূন্যেছিলেম সব,  
আমরা তখন বলেছিলাম  
'বাতাস বৃষ্টি হবে'।

নিবিড়ে প্রদীপ ঘরে ঘরে  
শূন্যেছিলেম আলসভরে  
দু-এক জনে বলেছিল—  
'দুত এল বা তবে'!

আমরা হেসে বলেছিলাম  
'বাতাস বৃষ্টি হবে'।

নিশীথ রাতে শোনা গেল  
কিসের যেন ধ্বনি।  
ঘুমের ঘোর ভেঙেছিলেম  
মেঘের গরজন।

ক্ষণে ক্ষণে চেতন করি  
কাঁপল ধরা ধরধারি  
দু-একজনে বলেছিল  
'চাকার ঝনঝনি'।  
ঘুমের ঘোরের কিহ মোরা  
'মেঘের গরজন'!

তখনো রাত আঁধার আছে,  
বেজে উঠল ভেরী,  
কে ফুকারে 'জাগো সবাই  
আর ক'রো না দেরি'।  
বন্ধপরে দু'হাত চেপে  
অমরা ভয়ে উঠি কে'পে  
দু-একজনে কহে কানে—  
'রাজার খুজা হেরি'।  
আমরা জেগে উঠে বলি  
'আর তবে নয় দেরি'।

কোথায় আলো, কোথায় মালা  
কোথায় আয়োজন।  
রাজা আমার দেশে এল  
কোথায় সিংহাসন।

হায় রে ভাগ্য, হায় রে লজ্জা,  
কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা,  
দু-একজনে কহে কানে  
বৃথা এ ক্রন্দন—  
রিজকরে শূন্যঘরে  
করো অভ্যর্থন'।

ওরে দুয়ার খুলে দে রে,  
বাজা শঙ্খ বাজা।  
গভীর রাতে এসেছে আজ  
আঁধার ঘরের রাজা!  
বন্ধ ডাকে শূন্যতলে,  
বিদ্রোহের ঝিলিক বলে  
ছিন্নশয়ন টেনে এনে  
আঙিনা তোর সাজা  
খড়ের সাথে হঠাৎ এল  
দুঃখরাতের রাজা॥(১০১)

## ৯৫। সংগীত—

—“যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙলো ঝড়ে,  
জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে।  
সব যে হয়ে গেল কালো নিরে গেল দীপের আলো,  
আকাশপানে হাত বাড়ালেম কাহার তরে॥  
অন্ধকারে রইনু পড়ে স্বপন মানি।  
ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা তাই কি জানি।  
সকাল বেলায় চেয়ে দেখি দাঁড়িয়ে আছ তুমি এ কি  
ঘর-ভরা মোর শূন্যতার বকের পরে”॥(১০২)

(১০১) “খেয়া”। ‘আগমন’। রবীন্দ্রচন্দ্রাবলী। দশম খণ্ড॥  
(১০২) “গীতিবিতান”। ২য় সংস্করণ। ১ম খণ্ড॥ স্বরলিপি  
জন্য ‘গীতলেখ’। ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য॥

## —“গীতাঞ্জলি”—“গীতিমালা”

॥ ১০১৭ ॥

॥ ১০২১ ॥

## —“গীতাঞ্জলি”—

॥ ১০২১ ॥

### ৯৬। পাঠ—

—“আমি, কি আদ্যার মধ্যে, কি বিশ্বের মধ্যে, বিস্ময়ের অন্ত  
দেখি না। আমি জড় নাম দিয়া, সসীম নাম দিয়া কোনো জিনিসকে  
এক পাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারি নাই। এই সীমার মধ্যেই, এই প্রত্যক্ষের  
মধ্যেই অনন্তের যে প্রকাশ, তাহাই আমার কাছে অসীম বিস্ময়াবহ”॥(১০৩)

—“ক্ষুদ্রকে লইয়াই বহু, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই  
মুক্তি। প্রেমের আলো যখনই পাই, তখনই সেখানে চোখ মেলি। সেখানেই  
দেখি, সীমার মধ্যেও সীমা নাই। .....আমার তো মনে হয়, আমার  
বাবারচনার এই একটিমাত্র পালা। সে-পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে,  
—সীমার মধ্যেই অসীমের সাঁহত মিলনসাধনের পালা। .....এই একটি  
মাত্র আইডিয়া অলঙ্কারে নানা বেশে আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে  
অধিকার করিয়া আছে।”॥(১০৪)

### ৯৭। সংগীত—

—“সীমার মাঝে অসীম, তুমি  
বাজাও আপন সুর  
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ  
তাই এত মধুর।  
কত বর্ণে কত গন্ধে  
কত গানে কত ছন্দে  
অরূপ, তোমার রূপের লীলায়  
জাগে হৃদয়পুর  
আমার মধ্যে তোমার শোভা  
এমন সুমধুর।

তোমায় আমায় মিলন হলে  
সকাল যায় খুলে—  
বিশ্ববাসগর চেউ খেলায়ে  
উঠে তখন দুলে।  
তোমার আলোয় নাই তো ছায়া,  
আমার মাঝে পায় সে কায়া,  
হয় সে আমার অপ্রজ্জলে  
সুন্দর বিধুর  
আমার মধ্যে তোমার শোভা  
এমন সুমধুর”॥(১০৫)

### ৯৮। সংগীত—

—হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ  
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।  
আমার নয়নে তোমার বিশ্ববর্ষাবি  
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,  
আমার মৃগ প্রবণে নীরব রহি  
শূন্যিয়া লইতে চাহ আপনার গান।

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ  
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।  
আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখান  
রচিয়া তুলেছে বিচিত্র এক বাণী।  
তার সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি  
জাগিয়ে তুলিলে আমার সকল গীতি,  
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে  
আমার মাঝারে নিজেই করিয়া দান।

(১০৩) “আত্মপরিচয়”। ১১ ॥ (১০৪) “জীবনস্মৃতি” ॥  
(১০৫) “গীতাঞ্জলি”। রবীন্দ্রচন্দ্রাবলী। একাদশ খণ্ড ॥ গীতিবিতান।  
১ম খণ্ড। স্বরলিপি জন্য “গীতলেখ”। ৪র্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য ॥

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ  
কী অমৃত তুমি চাই করিবারে পান।" (১০৬)

### ৯৯। পাঠ—

"জীবনমৃত্যুর রহস্য সম্বন্ধে আমরা যা ভাবি, আর যা বলি, তার মধ্যে অশ্বকর থেকে যায়, কেননা আমরা ওদের এক করে মিলিয়ে দেখতে পারিনে। আমরা ভাগ করে দেখি।.....জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে কোনো সত্যকার বাবধান নেই, উভয়ের মধ্যে বন্ধ নেই—আজ্ঞা অংশমাত্রকে একান্ত করে জানিছি ব'লেই সমগ্রের মধ্যে ভেদ দেখতে পাচ্ছি।.....অখণ্ড সত্যকে জীবন ও মৃত্যুকে কখনও বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। জীবনে আমরা যে সত্যকে পেয়ে আনন্দিত আছি, মৃত্যুতেও আমরা সেই সত্যকেই পাব। মৃত্যুতে পাব জীবনের পরিপূর্ণতা।" (১০৭)

### ১০০। আবৃত্তি—

—“ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা,  
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমাদের কথা।  
সারা জনম তোমার লাগি  
প্রতিদিন বে আছি জাগি,  
তোমার তরে বহে বেড়াই দৃষ্টি পথের ব্যথা।  
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমার কথা।  
যা পেয়েছি, যা হয়েছি, যা-কিছু মোর আশা,  
না জেনে যায় তোমার পানে সকল ভালোবাসা।  
মিলন হবে তোমার সাথে,  
একটি শূন্য দৃষ্টিপাতে,  
জীবনবধূ হবে তোমার নিত্য অনুগত;  
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমার কথা।" (১০৮)

### ১০১। সংগীত—

—“যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই  
যা দেখেছি বা পেয়েছি তুলনা তার নাই।  
এই জ্যোতিঃ সমুদ্র মাঝে যে শতদল-পদ্ম রাজে  
তারি মধু পান করেছি ধন্য আমি তাই  
যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।  
বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে,  
অপরূপে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে।  
পরশ যাঁরে বায় না করা সকল দেহে দিলেন ধরা  
এইখানে শেষ করেন যদি শেষ করে দিন তাই,  
যাবার বেলা এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই।" (১০৯)

### ১০২। পাঠ—

—“আমার রচনার মধ্যে যদি কোনো ধর্মতত্ত্ব থাকে তো, তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ,... যে-প্রেমের একদিকে শ্বেত, আর একদিকে অশ্বেত; একদিকে বিচ্ছেদ, আর একদিকে মিলন; একদিকে বন্ধন, আর একদিকে মুক্তি;—বার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে;— যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে.....যা মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও এককে পূজা করে।" (১১০)

### ১০৩। সংগীত—

—“অসীম ধন তো আছে তোমার  
তাঁহে সাধ না মেটে।  
নিতে চাও তা আমার হাতে  
কণায় কণায় বেঁটে।

- (১০৬) “গীতাঞ্জলি”। ১০১। “গীত-বিতান”। ১ম খণ্ড। স্বর-  
লিপি জন্য “গীতাঞ্জলি” ৪র্থ খণ্ড প্র’ ব্যা।  
(১০৭) “শান্তিনিকেতন”।  
(১০৮) “গীতাঞ্জলি”।  
(১০৯) “গীতাঞ্জলি”।  
(১১০) “আত্মপরিচয়”। ৩।

দিরে তোমার রতনমাণি  
আমায় করলে ধনী,  
এখন দ্বারে এসে ডাক  
রয়েছি দ্বার ঝুঁটে।  
আমায় তুমি করবে দাতা,  
আপনি ভিক্ষু হবে,  
বিশ্বভুবন মাতাল যে তাই  
হাসির কলরবে।  
তুমি রইবে না এরূপে  
নামবে ধূলাপথে  
যুগযুগান্ত আমার সাথে  
চলবে হেঁটে হেঁটে।" (১১১)

### ১০৪। সংগীত—

—“তোমায় আমায় মিলন হবে বলে  
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে  
ফুল্ল শ্যামল ধরা।  
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে  
রাত্রি জাগে জগৎ লয়ে কোলে  
উষা এসে পূর্ব-দুয়ার খোলে  
কদক ঠপ্পরা।  
চলচে ভেসে মিলন-আশা-ভরা  
অনাদি প্রোত বেয়ে।  
কত কালের কুসুম ওঠে ভরি  
বরণডালা ছেয়ে।  
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে  
যুগে যুগে বিশ্বভুবনতলে  
পরায় আমার বধূর বেশে চলে  
চিরস্বয়ংবরা।" (১১২)

### ১০৫। সংগীত—

—“অশ্বকরের উৎস হতে উৎসারিত আলো  
সেই তো তোমার আলো।  
সকল বন্ধ-বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো  
সেই তো তোমার ভালো।  
পথের ধূলায় বন্ধ পেতে রয়েছে যেই গেহ  
সেই তো তোমার গেহ।  
সমর-ঘাতে অমর করে রক্ত নিঠুর স্নেহ  
সেই তো তোমার স্নেহ।  
সব ফুরালে বাকি রয়ে অদৃশ্য যেই দান  
সেই তো তোমার দান।  
মৃত্যু আপন পাশে ভরি বহিছে যেই প্রাণ  
সেই তো তোমার প্রাণ।  
বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে তুমি  
সেই তো স্বর্গভূমি।  
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি  
সেই তো আমার তুমি।" (১১৩)

- (১১১) “গীতিমালা”। ৩৩। রবীন্দ্রচন্দাবলী। একাদশ খণ্ড।  
“গীতিবিতান”। ১ম খণ্ড। স্বরলিপি জন্য “গীতলেখ”।  
২য় খণ্ড দ্রুটব্য।  
(১১২) “গীতিমালা”। ৫২। “গীতিবিতান”। ১ম খণ্ড। স্বরলিপি  
—“গীতলেখ”। ৩য় খণ্ড।  
(১১৩) “গীতাঞ্জলি”। ৯১। রবীন্দ্রচন্দাবলী। একাদশ খণ্ড।  
গীতিবিতান। ১ম খণ্ড।

—আগামীবারে প্রকাশ্য—  
১৫। “বলাকা”।

## নিউজ প্রিন্ট কন্ট্রোল

যুদ্ধের পূর্বে দু'পয়সা অথবা চার পয়সায় বায়ো থেকে ষোলো পৃষ্ঠা খবরের কাগজ পাওয়া যেত কিন্তু এখন দামের কথা আলাদা, কাগজের পাতা বাড়ানি, ছয় থেকে বারো পৃষ্ঠা পর্যন্ত হয়। এর কারণ যথেষ্ট পরিমাণে নিউজ প্রিন্ট অর্থাৎ যে কাগজে খবরের কাগজ ছাপা হয় সেই কাগজ পাওয়া যাচ্ছে না। এই নিউজ প্রিন্টের জন্য আমাদের নির্ভর করতে হয় ক্যানাডা, ইউনাইটেড স্টেটস, নরওয়ে, সুইডেন ও ফিনল্যান্ডের ওপর। যুদ্ধের পূর্বে ভারতে নিউজ প্রিন্ট খরচ হত মোট ৪৫০০০ হাজার টন। ১৯৪১ সালের ১২ই এপ্রিল থেকে উলার বিনিময়ের সুবিধার জন্য নিউজপ্রিন্ট আমদানী নিয়ন্ত্রিত করা সূত্র হয়। এতে ছোট সংবাদ-পত্রগুলি খুব অসুবিধায় পড়ে যায়।

৩১শে মে ১৯৪১ সালে নিউজপ্রিন্ট কন্ট্রোল অর্ডার জারী হয়। এর দ্বারা সংবাদ-পত্রগুলির কোটা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। ১৯৪০ সালে সংবাদপত্রগুলি যেমন নিউজপ্রিন্ট ব্যয় করত তার ওপর ভিত্তি করে তাদের কোটা স্থির করে দেওয়া হয়। আরও ঠিক করে দেওয়া হয় যে, ১৯৪১-এর সেপ্টেম্বর মাস থেকে তারা তাদের কোটা অনুযায়ী কাগজ কিনতে পারবে। একটা সত্য ছিল; জাহাজ যদি না পাওয়া যায় তাহলে কোটা কমিয়ে দেওয়া হবে। ১৯৪০ সালে জাহাজের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে, কোটা কমিয়ে এক-তৃতীয়াংশ করে দেওয়া হয় এবং কাগজের বরাদ্দ বোধে দেওয়া হয়, তাছাড়া নতুন কাগজ প্রকাশ করার অনুমতি একরকম বন্ধ করে দেওয়া হয়। সংবাদপত্রের মূল্যও বোধে দেওয়া হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে নিউজপ্রিন্ট আমদানী আরও কমে যায়। তার প্রধান কারণ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণ আদেশ প্রত্যাহার। ফলে সকলেই বিশেষ করে ক্যানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই নিউজপ্রিন্ট পাঠাতে লাগল। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ে। এই অবস্থা কাটিয়ে তোলবার জন্য ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজপেপার সোসাইটি বিদেশে দু'জন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন, শ্রীদেবদাস গান্ধী (হিন্দুস্থান টাইমস) এবং শ্রীরামনাথ গোয়েঙ্কা (দিনমণি ইত্যাদি)। তারা ইংল্যান্ড, উত্তর আমেরিকা এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়া ভ্রমণ করেন এবং ৩২,০০০ হাজার টন নিউজপ্রিন্ট ভারতের জন্য ভ্রমণ করতে সমর্থ হন। বর্তমান বৎসরের এপ্রিল মাসে অবস্থার উন্নতি হয়, কোটা রীতি তুলে দেওয়া হয়, নিয়ন্ত্রণাংশও কিছু শিথিল করা হয়। কেবলমাত্র নিউজপ্রিন্টের উচ্চতম দর ও পৃষ্ঠাসংখ্যার আদেশ বলবৎ রইল। কিন্তু ভারতে নিউজপ্রিন্টের

## এপার ওপার

আমদানী বৃদ্ধি পাচ্ছে না; মোট প্রয়োজনের মাত্র এক চতুর্থাংশ আমদানী হচ্ছে। ঘাটতি পূরণ করতে হলে ভারতে নিউজপ্রিন্ট প্রস্তুত করতে হবে; কিন্তু ঠিক উপযুক্ত কাঁচামালের অভাব আছে এবং তার থেকেও বড় অভাব প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির এবং তা পাওয়া গেলেও তাদের অসম্ভব মূল্য। তবে কাশ্মীর ও টেহরী-গাড়ওয়াল রাজ্যে প্রাপ্ত কয়েকপ্রকার দেবদারু গাছ দেবদারু ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ঐ গাছের মন্ড থেকে নিউজপ্রিন্ট তৈরী হতে পারে। এই উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রদেশে একটি প্রতিষ্ঠানও গঠিত হয়েছে। হায়দ্রাবাদের একটি কাগজকল স্থানীয় গাছের মন্ড থেকে নিউজপ্রিন্ট তৈরী করার চেষ্টা করছেন। বিশেষজ্ঞগণ মুনজ ও সাবাই ঘাস এবং অন্যান্য গাছের মন্ড থেকে নিউজপ্রিন্ট তৈরী করার চেষ্টা করছেন।

### অ্যালেক ও এরিক বেডসার

গত বৎসর ভারতীয় দল যখন ইংল্যান্ডে ক্রিকেট খেলতে গিয়েছিল তখন বেডসার নামে একজন নবীন বোলার ভারতীয় দলকে যথেষ্ট বেগ দিয়েছিল। সেই নবীন খেলোয়াড়ের নামক অ্যালেক বেডসার। তিনি সারে দলভুক্ত। কিন্তু অ্যালেকের একজন যমজ ভাই আছে, তার নাম এরিক। এদের বয়স উনিশ, লম্বায় দু'জনেই ৬ ফিট ৩ ইঞ্চি, দু'জনেরই ওজন ১৫ স্টোন ৭ পাউন্ড। দু'জনে শূঁধেই যমজ নয় সাদৃশ্যও খুব বেশী, কে কখন খেলছে ধরাই মুশকিল, তবে দু'জনের বল করার রীতি

দূরকম। অ্যালেক বল দেয় ফাস্ট-মিডিয়াম আর এরিক শ্লো-অফ ব্রেক। আগে দু'জনেই একই রীতিতে বল দিত কিন্তু একই ক্লাবের একই রকম দু'জন বোলারের দরকার ছিল না অথচ তারা একই ক্লাবে থাকতে চায়, অতএব একজনকে বল দেবার রীতি বদলাতে হ'ল। অ্যালেক ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ম্যাচে ১১টি উইকেট নিয়েছিল তার জন্য সে মাত্র ১৪৫টি রান দিয়েছিল। অ্যালেক ইংল্যান্ড দলের মনোনীত হয়ে অস্ট্রেলিয়া খেলতে গিয়েছিল কিন্তু এরিক মনোনীত হয়নি, তবে খেলা দেখবার জন্য একজন ধনী ব্যক্তি তার অস্ট্রেলিয়া যাবার সব খরচ বহন করেছিলেন।

### রাজধানীর ভূতাম্‌ডলী

দিল্লী আমাদের রাজধানী। সেখানকার অনেক ব্যাপার ও ব্যবস্থা আমাদের থেকে স্বতন্ত্র অথবা অভিনব। সৈদন দিল্লীর মজদুর পার্কে "ডোমিস্টিক সার্ভেণ্টস্‌ ইউনিয়ন" তাদের অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুগোলাল শর্মা সভাপতিত্বে এক সভা করেছিল। তাদের যে সব মনিবেরা স্বাধীনতা দিবসে ছুটি দিনেই তাদের নিষ্পত্তি করে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। যে সমস্ত মনিবেরা উৎসবে যোগদান করার জন্য ভূতাদের বরখাস্ত করেছেন তাঁদের মনোভাবের নিন্দা করা হয়। যাতে গরীব ভূতাদের অভাব অভিযোগের প্রতি সরকার দৃষ্টি রাখেন এরূপ দাবী জানিয়েও প্রস্তাব গৃহীত হয়।

### শেয়ানে শেয়ানে

ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট বাহাদুর লর্ড হ্যালিফাক্স তখন আমেরিকায় ব্রিটিশ রাজ-দূত। একদা তিনি মার্কিন-ব্রিটিশ মৈত্রীবন্ধন বিষয়ে আয়োজা নামক প্রদেশে বক্তৃতা দিতে



যমজ ক্রিকেট খেলোয়াড় অ্যালেক (বামে) ও এরিক (দক্ষিণে) বেডসার। অ্যালেক ভারতীয়দের বিরুদ্ধে টেস্টম্যাচ খেলেছিল।

গিয়েছিলেন। জটনক চাষীর সেই বৃত্ততা ভাল লাগে এবং লর্ড হ্যালিফাক্সকে ধনাবাদ জানিয়ে বলেন: “এতদিন আমরা ইংরাজদের ভয় করতুম, আমাদের ধারণা ছিল তারা আমাদের চেয়েও চতুর কিন্তু এখন আপনার কথা শুনে বুঝতে পারছি তা নয়।”

### সদর্পে অজিত সিং

স্বাধীন ভারত স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম যে বিশিষ্ট সৈনিককে চিরজীবনের মতো স্বাধীনতা দিল তার নাম সদর্পে অজিত সিং। ১৬ই আগস্ট ডালহৌসী পাহাড়ে তার মৃত্যু হয়েছে। অল্পদিন হ'ল তিনি ৩৬ বৎসর নির্বাসনে থাকবার পর দেশে ফিরেছিলেন। ভগৎ সিংএর তিনি কাকা। ১৮৭৯ সালে লুধিয়ানার একটি

গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। লালা লাজপৎ রায়ের তিনি ঘনিষ্ঠ সহকারী ছিলেন। লালাজীর সঙ্গে তিনি মন্ডালায় জেলে একত্রে ছিলেন। ১৯০৭ সালে তাঁর ব্যবস্জীবন স্বাধীনতার আদেশ হয়; কিন্তু ১৯১১ সালে তিনি লালাজীর সঙ্গে আমেরিকায় পাঠিয়ে যান। তাঁর দেশপ্রেম দেখে বাল গঙ্গাধর তিলক মন্তব্য করেছিলেন যে, স্বাধীন ভারতের প্রথম সভাপতি হবে অজিত সিং। “পাগড়ি সাম্‌হাল ওই জাটো” এই উদ্‌দীপনাপূর্ণ গানখানি তিনি দেশ ত্যাগ করবার পূর্বে পাঞ্জাবকে দিয়ে গিয়েছিলেন।

আমেরিকায় পৌঁছে তিনি কালিফোর্নিয়ায় শিখদের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বাতী পৌঁছে দেন এবং পরে বিখ্যাত গদর দল

তৈরী করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তিনি আমেরিকা থেকে ব্রেজিলে আসেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রোমে আসেন ১৯৪০ সালে। রোমে তিনি ছিলেন মুসোলিনীর অতিথিরূপে। রোম রেডিও থেকে যে হিন্দুস্থানী অনুষ্ঠান প্রচারিত হ'ত, তার উদ্বোধ্য তিনিই। পরে তিনি ইকবাল সইদাই-এর সঙ্গে এক ‘স্বাধীন ভারত’ আন্দোলন চালাতে আরম্ভ করেন এবং “আজাদ হিন্দুস্থান লস্কর” দল গঠন করেন। ১৯৪২ সালের গোড়ায় তাঁর সঙ্গে রোমে নেতাজীর সাক্ষাৎ হয়। মিলান শহরে তিনি ইংরাজ হস্তে বন্দী হ'ন। বন্দী অবস্থায় থাকবার সময় তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। ভারতে মধ্যবর্তী শাসনপরিষদ গঠিত হবার পর তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

## পুস্তক পরিচয়

বর্ষা ও সমরদক্ষতা, মার্শাল জুকভ, টীমাশাফকা এবং রুশ বাহিনীর অধিনায়ক ভরোশিলভ ও অপরাপর সেনানীগণের অকুতোভয়তা, ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং আদর্শনিষ্ঠা। সোভিয়েট নরনারীগণের অসীম আদর্শনিষ্ঠা, কর্মতৎপরতা এবং স্বদেশ প্রেম সোভিয়েট বাহিনীর রণজয়ের অন্যতম কারণ। পুস্তকের বিষয়বস্তু ও ভাষা গ্রন্থকারের সুযোগ্য হস্তে অপরূপভাবে রূপায়িত হইয়া সর্বশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছে। বাঙ্গালী পাঠক সমাজে ইহার আদর হইবে। ১৬৪১৪৭

নব করোলা—ভাদ্র সংখ্যা, ১৩৫৪। সম্পাদক—গ্রীষ্মাবিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রীষ্মগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীকমারকৃষ্ণ বসু। কার্যালয়—১১সি, বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য সাতক ৪৫০, প্রতি সংখ্যা সাত আনা। কৃতী সাহিত্যিকদের সম্পাদনায় প্রকাশিত মাসিক পত্র নব করোলার এই সংখ্যাটি বহু গদ্যপদ্য রচনায় সমৃদ্ধ। আমরা এই পত্রখানার গ্রীষ্ম ও দীর্ঘজীবন কামনা করি। ১৬৬১৪৭

MILLIONS—সচিত্র ইংরাজ পাক্ষিক পত্রিকা। কার্যালয় ১২, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য প্রতি সংখ্যা তিন আনা মাত্র।

মিলিয়নস্ ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিল। গদ্যসাধারণের জন্য প্রকাশিত এই নতুন ধরণের পত্রের প্রথম সংখ্যাটি রচনাগোঁরবে ও চিত্রসম্ভারে সমৃদ্ধ। ডাঃ রাম-মনোহর লোহিয়া, রাজকুমারী অমৃত কাউর, ডাঃ অমিয় চক্রবর্তীর প্রবন্ধ এবং অন্যান্য রচনায় এই সংখ্যাটি বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছে। আমরা এই নতুন সহযোগীর সম্ভাষণ ও দীর্ঘজীবন কামনা করি। ১৫৯১৪৭

উত্তর কাল—শ্রাবণ ১৩৫৪। সম্পাদক—শ্রীনন্দ মুখোপাধ্যায়। কার্যালয়—১৩সি, ফরডাইস লেন, কলিকাতা। মূল্য বার্ষিক তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা চারি আনা।

আমরা ‘উত্তর কাল’ প্রথম বর্ষের প্রথম (শ্রাবণ) সংখ্যা সমালোচনার্থ পাইয়া প্রীত হইলাম। পত্রখানা আকারে ছোট হইলেও মূল্যবান রচনাবলীতে সমৃদ্ধ। বিশেষ করিয়া উহার সম্পাদকীয় মন্তব্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। উত্তর কাল প্রকৃতই উত্তম

কালের চিত্তাধারার প্রতিবন্ধি হিসাবে আপনার স্থান করিয়া লইতে সক্ষম হউক, ইহাই আমাদের কামনা। ১৪৬১৪৭

স্বাধীন ভারত—মধ্য কলিকাতা কংগ্রেস সাহিত্য সম্বন্ধে পক্ষ হইতে সঙ্কলিত। মূল্য চারি আনা। ১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্ত দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত এই পুস্তিকায়ানি পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। ইহাতে স্বাধীনতা সম্পর্কিত কয়েকটি গদ্যপদ্য রচনায় ঐ দিবসটিকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হইয়াছে। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ প্রভৃতির রচনায় পুস্তিকাটি সমৃদ্ধ। ১৪৭১৪৭

বৃটিশ ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত করিল কেন?—গ্রীষ্মকম্বর চৌধুরী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—ইউনি-ভার্সাল পাবলিশার্স। ২২১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ও অন্যান্য পুস্তকালয়। মূল্য আট আনা।

“বৃটিশ ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত করিল কেন” এবং “কলিকাতার ভবিষ্যৎ” দীর্ঘক দৃষ্টি প্রবন্ধ পুস্তিকাকারে গ্রন্থিত। ১৫৩১৪৭

## সাহিত্য সংবাদ

শহীদ ক্ষুদ্রদ্রাম স্মৃতি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা—কিশোর সম্বন্ধে পক্ষ হইতে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হইতেছে। নিম্নোক্ত বিষয় দুইটির মধ্য হইতে যে কোন একটি বিষয়ে লিখিতে হইবে।—(১) রবীন্দ্র কাব্যে শিশু; (২) শরণ সাহিত্যে পুঙ্খভিত্তি। প্রথম পুরস্কার ৫, মূল্যের পুস্তক। ইহা কেবল মাত্র স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট। (১) রবীন্দ্র কাব্যে স্বাধীনতার বাণী; (২) স্বাধীনতা বনাম প্রাদেশিকতা। উপরোক্ত বিষয় দুইটির মধ্যে যে কোন একটিতে লিখিতে হইবে। ইহাতে সকলেই যোগদান করিতে পারিবেন। ১ম পুরস্কার ৬ ও ২য় পুরস্কার ৪, মূল্যের পুস্তক। কোন প্রবেশমূল্য নাই। ১০ মূল্যের স্ট্যাম্প সহ ফুলস্কেপ চারি পৃষ্ঠার মধ্যে পাঠাইতে হইবে। সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। শেষ তারিখ ৩০।১৪৭। ফলাফল অক্টোবরের ১ম সপ্তাহে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে। নিম্নোক্ত ঠিকানায় প্রবন্ধ প্রেরণ করুনঃ—সম্পাদক—কিশোর সম্বন্ধ, বড়গাছিয়া, নালিকুল—পোঃ, হুগলী—জেলা।

রুশ-জার্মান সংগ্রাম—বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক এ. মুখার্জি এন্ড কোং, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য—১০, টাকা।

৫১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই সচিত্র সুবহু পুস্তকখানা গত রুশ-জার্মান যুদ্ধের একখানি ধারাবাহিক নির্ভরযোগ্য ইতিহাস। গ্রন্থকার একজন ব্যাভ্যন্তরীণ সাংবাদিক এবং যুদ্ধপূর্ব ইউরোপের রাজনৈতিক ঘটনা পরপর প্রথমাবধিই তিনি কটনৈতিক ও সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া অনুধাবন করিয়াছেন। যুদ্ধসম্পর্কিত কালীন দৈনন্দিন সেনা ও প্রধান ঘটনাই তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কোনও প্রামাণ্য গ্রন্থ এ যাবৎ অপর কোনও ভাষায় রচিত হইয়াছে কিনা তাহা আমরা অবগত নহি। তবে বাঙ্গলা ভাষায় ইহাই যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিশেষতঃ রুশ-জার্মান যুদ্ধের প্রথম ইতিহাস—এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

গ্রন্থখানি ছয়টি পর্বে সম্পূর্ণ। প্রথম পর্বে ১৩৫৯—৪১ সালের ঐতিহাসিক সংগ্রাম—লালসোজ ও নাৎসী বাহিনীর রণনৈতিক সমাবেশ ও সামরিক প্রস্তুতি। দ্বিতীয় পর্বে ১৯৪১ সালের গ্রীষ্ম-ভিমান, ৬০ ডিগ্রিভন সৈন্য নিয়া জার্মানীর মস্কো অভিযান। তৃতীয় পর্বে ১৯৪১—৪২এর শীতাবিমান, সুপ্রিম কমান্ডার পদে হের হিটলার, জার্মানীর ‘সজার্ম’ আত্মরক্ষা ব্যুহ এবং রাশিয়ার ‘স্কী ব্যাটালিয়ান’ লেনিনগ্রাদ রণাঙ্গন এবং নাৎসী বাহিনীর কায়ক্রেপে পরিণাম। চতুর্থ পর্বে ১৯৪২ সালে পুনরায় গ্রীষ্মাবিমান, স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধ, অজয় স্ট্যালিনগ্রাদে ধারকোভ রুশ বাহিনীর আক্রমণ আরম্ভ। পঞ্চম পর্বে ১৯৪২—৪৩এ হিটলারের পুনরায় শীতাবিমান। লালসোজের পাল্টা আক্রমণ, স্ট্যালিনগ্রাদে ফলস্কা, জার্মান বাহিনীর আত্মসমর্পণ, ইতিহাসের গতি পরিবর্তন। উপসংহারে ১৯৪৩—৪৫ এর সোভিয়েট অভিযান, স্ট্যালিনগ্রাদ হইতে বার্লিন; জার্মানীর বিপর্যয়, ধারকোভ, কিয়েভ, বার্লিন, বেলগার ও পোলান্ডের মুক্তি, বার্লিনের পতন। শেষ অঙ্কে বার্লিন অধিকার, হিটলারের আত্মহত্যা, আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর ও ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের অবসান।

ইহাতে একদিক যেমন আছে জার্মান রণনায়কগণের অপূর্ণ সংগঠন শক্তি, আঘাত হানিবার অসীম দক্ষতা ও কৌশল, অপরদিকে আছে সোভিয়েট নায়ক মঃ স্ট্যালিনের অসামান্য বিচার-

## ফুটবল

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা আগামী ১২ই সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ হইবে ইহাই ছিল সকলের ধারণা। হঠাৎ ১লা সেপ্টেম্বর হইতে পুনরায় কলিকাতায় অশান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি হওয়ায় অনেকেই হতাশ হইয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন “শীল্ড খেলা আর হইবে না”। আমরা কিন্তু এইরূপ আশংকা করার কোনই কারণ দেখি না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কলিকাতায় অস্বাভাবিক অবস্থা বিদূরিত হইবে। যুব সমাজ, ছাত্র সমাজ, খেলোয়াড় মহল, কেহই এই অশান্তিপূর্ণ অবস্থা সমর্থন করে না। দীর্ঘ এক বৎসর এই মহানগরীর উপর দিয়া যে অশান্তিপূর্ণ ঝড় বহিয়া গিয়াছে, তাহার প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে সকলকেই দুঃসহ দুঃখ ও দুর্দশা ভোগ করিতে হইয়াছে। সেই দুঃখ, ক্ষতি, কষ্টের পর একবার যখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তখন তাহা বিনষ্ট হইতে দিতে পারা যায় না। সুতরাং শীল্ড ফুটবল খেলা নিষ্পত্তিভাবে মাঠে হইবে এই বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

## টেনিস

আমেরিকান টেনিস খেলোয়াড়গণ পুনরায় প্রেষণ্ড প্রমাণিত করিয়া ডেভিস কাপ বিজয়ী হইয়াছে। গত বৎসর অস্ট্রেলিয়ায় আমেরিকান টেনিস দল প্রত্যেক খেলায় অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়গণকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়া ডেভিস কাপটি দেশে বহন করিয়া আনিতে অনেকেই জোর গলায় প্রচার করিয়াছিলেন অস্ট্রেলিয়া আগামী বৎসরে হৃতগৌরব পুনরোধকার করবে।” কিন্তু ফরেষ্ট হিল মাঠে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার শেষ মীমাংসার খেলায় অস্ট্রেলিয়া দল আমেরিকান দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সেইরূপ কোন পরিণতি দিতে পারে নাই। আমেরিকার জ্যাক ক্রামার ও টেড সোডারকে (আমেরিকা) পরাজিত করিয়া অস্ট্রেলিয়া খেলোয়াড় রমউইচ ও ডিলী পেলসকে পরাজিত করিয়া কাপ বিজয়ী হইয়াছেন। একমাত্র ডাবলস খেলায় অস্ট্রেলিয়া দলের রমউইচ ও কানিন লং, আমেরিকান খেলোয়াড় জ্যাক ক্রামার ও টেড সোডারকে পরাজিত করিয়াছেন। গত বৎসর অপেক্ষা এই একটি খেলায় অস্ট্রেলিয়া দল কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

১৯০০ সাল হইতে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আমেরিকা ১৩ বার ও অস্ট্রেলিয়া ৭ বার কাপ বিজয়ী হইয়াছেন। আমেরিকা দল পুনরায় কাপ বিজয়ী হইয়া ১৪ বার কাপ লাভের সম্মান লাভ করিল। আমেরিকান খেলোয়াড়দের এই কৃতিত্ব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। ভারত কবে এই গৌরবের অধিকারী হইবে এবং তাহার জন্য নিখিল ভারত টেনিস সংঘ কি ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহাই আমাদের জানিতে ইচ্ছা করে।

খেলার ফলাফল :-

## সিঙ্গলস

জ্যাক ক্রামার (আমেরিকা) ৬-২, ৬-১, ৬-২ গেমে ডিলী পেলসকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

সোডার (আমেরিকা) ৬-৪, ৫-৭, ৬-৩, ৬-৪ গেমে জন রমউইচকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

# খেলাধুলা

জ্যাক ক্রামার (আমেরিকা) ৬-৩, ৬-২, ৬-২ গেমে জন রমউইচকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

সোডার (আমেরিকা) ৬-৩, ৪-৬, ৪-৬, ৪-১১ ১০-৮ গেমে ডিলী পেলসকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

## ডাবলস

জন রমউইচ ও কানিন লং (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ২-৬, ৬-২, ৬-৪ গেমে জ্যাক ক্রামার ও টেড সোডারকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

## ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণকারী ভারতীয় দলের বিভিন্ন খেলোয়াড়কে লইয়া ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড যে সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন তাহার একরূপ সমাধান হইয়াছে। অধিকাংশ খেলোয়াড়ই যাইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ইন্দোরে মহারাজা শেষ পর্যন্ত কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতির বিশেষ অনুরোধে মুস্তাক আলীক দলের সহিত যাইবার অনুমতি দিয়াছেন। অমরনাথ, সি এস নাইডু, কিয়েণচাঁদ প্রভৃতি সকলেই দলের সহিত যাইতেছেন। একমাত্র দলের অধিনায়ক বিজয় মাচেস্টেট যাইতে পারিবেন কি না তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে কন্ট্রোল বোর্ডের সম্পাদক সম্প্রতি যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, তিনি বিজয় মাচেস্টেটকেও দলের সহিত লইতে সক্ষম হইবেন। বিজয় মাচেস্টেটের অসুখ যে গুরুতর নহে ইহা আমরা প্রথমেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। বৈজ্ঞানিক যুগে বাস করিয়া হঠাৎ তাহার হাকিমী প্রীতাই আমাদের একটু অশঙ্ক লাগিয়াছিল। নেহাৎ মনকষাকবির ব্যাপার ইহার মধ্যে জড়িত বলিয়াই আমাদের আশংকা হয়। হয়তো বা এই ধারণা ভুল হইতে পারে। তাহা হইলেও আমাদের বিশ্বাস আছে বিজয় মাচেস্টেট দলকে শক্তিশালী অবস্থায় অস্ট্রেলিয়া প্রেরণ করিতে পারিবেন না। দলের অর্ধেক শক্তি বলিতে তিনিই। সুতরাং তিনি দলের সহিত না থাকিলে অস্ট্রেলিয়ার কোন খেলাতেই ভারতীয় দল বিজয়ী হওয়া দূরের কথা শোচনীয় পরাজয় হইতে অব্যাহতি পাইবেন না।

ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়া অভিমুখে বিমানে যাত্রা করিবেন ইহাই স্থির হইয়াছে। খেলোয়াড়দের আসবাবপত্র বোম্বাই হইতে জাহাজে প্রেরিত হইবে। ঐ জাহাজ ২৯শে সেপ্টেম্বর বোম্বাই ত্যাগ করিবে। পূর্বের ব্যবস্থা বাতিল করা হইয়াছে—কেবলমাত্র নির্দিষ্ট জাহাজখানি ঠিক সময় কলম্বোতে পৌঁছাবে না বলিয়াই সকল খেলোয়াড়কে একটি বিমানে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। যদি সম্ভব না হয় বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন বিমানে প্রেরণ করা হইবে। খেলোয়াড়গণ সম্ভবত কলিকাতা হইতেই যাত্রা করিবেন। খেলোয়াড়রা ঠিক কবে যাত্রা করিবেন এখনও ঠিক হয় নাই। ইতিমধ্যে ৮ই সেপ্টেম্বর পুনরুত্থ কন্ট্রোল বোর্ডের এক বিশেষ সভা হইয়া গিয়াছে। ঐ সভায় মাচেস্টেটের না যাওয়া স্থির হইয়াছে। ভারতীয় ক্রিকেট দল সর্বপ্রথম

অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ করিতে যাইতেছে—শক্তিশালী দল প্রেরিত হউক ইহাই সকলের কাম।

## মুষ্টিযুদ্ধ

বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় মুষ্টি-যুদ্ধ দল প্রেরিত হইবে এই সংবাদ প্রচারিত হইলে বোম্বাই, নাগপুর প্রভৃতি স্থানের কতিপয় মুষ্টি-যুদ্ধ প্রবর্তককে নিখিল ভারত অলিম্পিক ট্রায়াল মুষ্টিযুদ্ধ অনুষ্ঠানের জন্য একটু ব্যস্ত হইতে দেখা গিয়াছিল। ইহার পর তিন মাস অতীত হইয়াছে, ইহাদের প্রচেষ্টা কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হইল তাহার কোন সংবাদই এই পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। কিছদিন পূর্বে বাজলার কতকগুলি মুষ্টিযুদ্ধ পরিচালককে নিখিল ভারত মুষ্টিযুদ্ধ ফেডারেশন গঠনের উদ্দেশ্য লইয়া অনেক কিছু আলোচনা করিতে দেখা গিয়াছিল। তাহারও সম্প্রতি নীরব। ইহা হইতে কি আমাদের বুঝিতে হইবে যে, মুষ্টিযুদ্ধ বিষয়ে ভারতীয় মুষ্টিযোদ্ধাগণ সন্মান অর্জন করে ইহা কি কাহারও আন্তরিক কামনা নহে? যদি তাহাই হইত, তবে আলোচনা আলোচনা করিয়া কখনই ইহারা নীরব থাকিতে পারিতেন না। বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠান আগামী বৎসরের জুলাই মাসে হইবে। এই বৎসর শেষ হইতে চলিল। ইহার মধ্যে যদি নিখিল ভারত মুষ্টিযুদ্ধ ফেডারেশন গঠিত না হয়, তবে কবে হইবে? ভারতীয় মুষ্টিযোদ্ধা দলই বা কাহারো নির্বাচন করিবে ও অনুষ্ঠানে প্রেরণ করিবে?

## সন্তরণ

নিখিল ভারত সন্তরণ পরিচালনার গণ্ডগোল মিটে নাই। শূন্যিমা আমরা কোনরূপ আশ্চর্য হই নাই। তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ বাহাদের সন্তরণ পরিচালনার সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। এইরূপ দল যতক্ষণ না এই মিটমাটের জন্য অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন ততদিন কিছই হইবে না। তাহা ছাড়া ভারতের সকল সীতারঙ্গ ও একত্র হইয়া তীব্র আন্দোলন করার প্রয়োজন আছে। তাহারাই প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্তবয়স্ক, তাহারাই যদি বিদ্রোহ ঘোষণা করে, পরিচালকদের বাধ্য হইয়া মিটমাট করিতে হইবে। ভারতীয় সীতারঙ্গের সে সুদৃষ্টি ও জ্ঞান কবে হইবে জানি না?

হুস্বর্ণ কাম্বীরের পৃথিবীবিখ্যাত ওলার হুস্বর্ণ খাঁটি

## পান্নানন্দ

প্রকৃতির প্রেষ্ঠ দান এবং যাবতীয় চক্ষুরোগের স্বভাবজ মহৌষধ। ড্রাম শিশি ২। ৩ শিশি ৫।। ৬ শিশি ১১। ডাক মাশুল পৃথক।

ডজন—২২ টাকা। মাশুলে ঈ।

ডি, পি, মুখার্জী এন্ড কোঃ

৪৬-এ-৩৪, শিবপুর রোড, শিবপুর, হাওড়া (বেঙ্গল)

আই. এন. দাস (আর্টিস্ট)

কটো এনলাজ'মেণ্ট, ওয়াটার কলার ও অয়েল পোর্টং কার্বে সুন্দর, চার্ট, স্টাম্প, অদর্শ সাক্ষ্য করুন বা পত্র লিখুন। ৩৫নং প্রেমচাঁদ বড়াল খাঁট, কলিকাতা।

# সংসারাতীত

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

ভাবিয়াছিলাম  
তব বক্ষে আজ মোর নাম  
রেখে যাব চিরদিন তরে,  
এ জীবন ভরে  
ধরনিবে তোমার কাণে কাণে  
ছন্দে গানে  
আমার এ নাম; তব রসত আঁখি  
থাকি' থাকি'  
উঠিবে চঞ্চল হ'য়ে তিমিরের তলে'  
চকিতে রহস্যভরা পলে  
দেখিবে ক্ষণিকা  
মম নামে জ্বালা দীপশিখা।

সেই লপন যদি নাই এলো,  
আকুল চৈতালি স্বপ্ন যদি বা মিলালো,  
বসন্ত মঞ্জরী সাথে  
রক্তিম হৃদয়ে রচা পাতে  
এ পত্রটি পাঠাইনু তোমার উৎসবে—  
পড়ো ইহা নিঃশব্দের স্বপ্ন তব ভগ্ন হবে যবে।

লিখিলাম,—  
এ মূহুর্তে এই লিখিলাম  
তব মনে ঠাই;  
সদাই  
যাহা করিয়াছি দন গাহিয়াছি নিজে  
আমারি চোখের জলে ভিজি,  
সে যে আজ তোমার বিপনে  
আকম্পিত তুণে  
অজি জাগি' আকুল চঞ্চল,  
তব প্রেম-পয়স অঞ্চল  
এই মোরে স্মরে  
অশ্রান্ত মর্মরে।

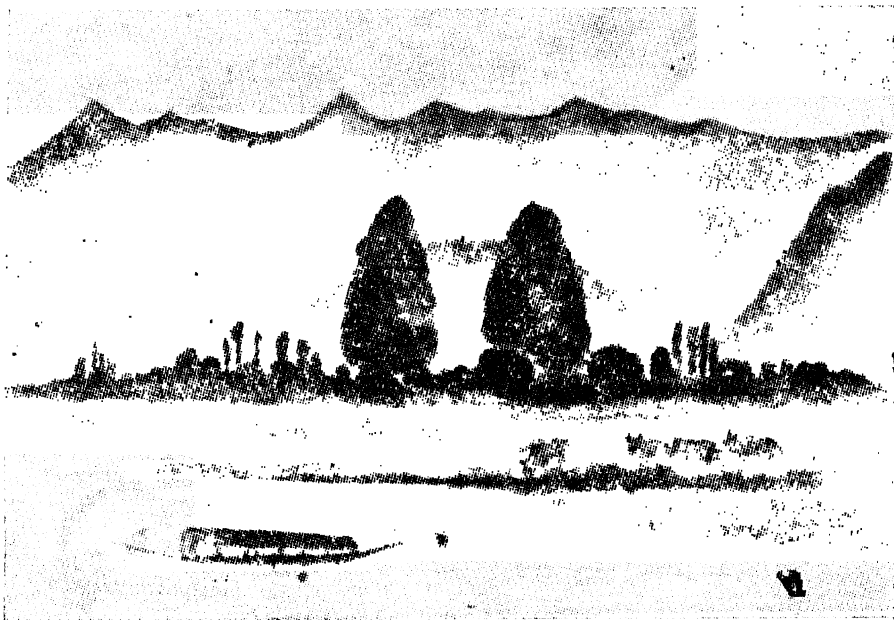
আমি কিন্তু হেথা আর নাই,  
মোরে ঠাই,  
দিয়াছে যে নিখিলে বিধাতা  
কণ্টকিত ধূলিশয্যা পাতা।  
যা পেয়েছি আমার হৃদয়ে  
উৎকণ্ঠিত হ'য়ে  
সব দিছি তব হাতে তুলি';  
মোর লাগি' ধূলি  
রেখেছি দেবতা,  
আমি কি কখনো তা'  
ভয়ে ভুলে গুজিবারে পারি?  
অমারে যে দিতে হবে পাড়ি  
কালবৈশাখীতে,  
বসন্তের দোলা দেওয়া গীতে  
দক্ষিণ পবনে  
সুখ সুপ্তি অলস স্বপনে

কি হবে আমার  
প্রণয়ের কুসুমিত ভার?  
আছে জাগি' বৈশাখের তীর জ্বালা;  
দীপ্ত ভয়ংকর;  
মিলনের ছায়াঘেরা ঘর—  
সেথা হ'তে এসেছি বাহিরে  
সামান্যের ভীড়ে,  
গেছি ভুলে আনন্দের হাসি,  
পরেছি যাচিয়া গলে অশান্তির ফাঁসি,  
কর্মময় শ্রান্তিপূর্ণ আমার জীবন  
কোন স্তম্ভ ক্ষণ  
নিঃশব্দে ছাড়ায়ে গেছে প্রেমের প্রভাতে  
আজি এই বিচ্ছেদের রাতে।

ডাকিয়োনা,—‘পাশ্ব, ফিরে চাও’—  
অতিথি তোমার দূরে হইল উধাও  
মর্তিতে দুঃখের সাথে রণে।  
দৈন্য হেই ক্ষণে  
দেহে মনে সংসারেতে হতাশার শ্বাস  
রেখে যাবে, ধূলিলিপ্তবাস,  
ভাল লাগিবেনা কিছু আর,  
সেই ক্ষণে নব হবে বৃথা এ সংসার;  
বিরলে ভাবিব এ জগৎ  
কত দীর্ঘ কণ্টকিত পথ  
আশা ছায়াহীন,—  
যাতনা সহিতে হবে রুদ্ধ ওষ্ঠে  
দুঃস্ত উদাসীন,  
বক্ষে ক্ষুধানল ল'য়ে বজ্রক্ষুধ রাত্রে  
এ অচেনা  
পথপ্রান্তে লুটাইবে; কেহ থাকিবেনা  
স্নেহে প্রেমে শূন্যহিতে তুচ্ছ মোর নাম।  
—এই লিখিলাম।

কোথা দূরে তব সিন্ধু মিলন আগার?  
এ হৃদয়—এত শূন্য শূন্য পত্রভার,  
এই দিল অমারে দেবতা;  
যাহা দিলে আমি কিন্তু বিনিময়ে তা'  
দিতে নাই পারিব তোমারে।  
কত সূত্রে যারে  
ফুল দিয়ে সাজায়েছি আজ পূর্ণিমায়  
ক'টা দিয়ে সাজাব তোমায়?  
আমার এ ভরা দুঃখ কর্মের পশরা  
সর্বসুখহারা  
রহিল আমারি; তোমার নিকুঞ্জে  
ঘন পদ্প পুঞ্জে  
যে সৌরভ তার নাঝে স্মরো এ নিষ্ফলে,  
আপনি তা' হলে  
মোর সাথে দেখা হবে সুখে বার বার  
সংসারের সীমার ওপার।





## নতুন ছবির পরিচয়

অলকানন্দা—রূপাঞ্জলি পিকচার্সের প্রথম চিত্র। কাহিনী ও সংলাপঃ মন্থা রায়; চিত্ররূপঃ দেবকী বোস; পরিচালনাঃ রতন চ্যাটার্জি; সঙ্গীতঃ ধীরেন মিত্র। বিভিন্ন ভূমিকায়ঃ অহীন্দ্র চৌধুরী, পরেশ ব্যানার্জি, প্রদীপকুমার, প্রমীলা ত্রিবেদী, পূর্ণিমা, সুপ্রভা মুখার্জি, ইন্দু মুখার্জি, রবি রায় প্রভৃতি।

আলাচ্য চিত্রটি কলিকাতার তিনটি চিত্র গৃহে একযোগে প্রদর্শিত হচ্ছে। চিত্রখানি দেখে প্রথমেই মনে হল যে চিত্রকাহিনীতে সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। কিন্তু যেকোন কারণেই হোক সে সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণরূপে বাস্তবে রূপান্তরিত করার চেষ্টা হয়নি। সে চেষ্টা করা হলে এ ছবিখানি নিছক কৌতুক চিত্রে পর্যবসিত না হয়ে আমাদের সমাজ-জীবনের পথ প্রদর্শক একটি প্রগতিশীল জাতীয় চিত্রে পরিণত হতে পারত। সাহিত্যিক মদঙ্গ রায়ের অন্তর্ধানকে কেন্দ্র করে যে রোমাঞ্চের কৌতুক কাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে শিল্প-এর পটভূমিকায়, তাকে অতি সহজেই ভিন্নরূপ দেওয়া সম্ভব ছিল। সাহিত্যিক মদঙ্গ রায় যাদের জীবন নিয়ে উপন্যাস লিখতেন, তাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যেই তিনি করেছিলেন নিরুদ্দেশ যাত্রা। শিল্প-এর অলকানন্দা হোটেলের বহু বিচিত্র অধিবাসীদের কৌতুককর কার্যকলাপ ও তাদের মধ্যে মদঙ্গ রায় ও মানস রক্ষিতকে নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কৌতুক কাহিনীকে প্রাধান্য না দিয়ে যদি মদঙ্গ রায়ের নিরুদ্দেশ যাত্রার লক্ষ্য নির্ণায়িত, অকলিত মনুষ্য সমাজের বাস্তব জীবন-যাত্রাকে ছবিতে ফুটিয়ে তোলা হত তবেই ছবিটি ঐতিহাসিক হতো এবং চিত্রকাহিনীতে পূর্বাপর সামঞ্জস্য ও বজায় থাকত বলে মনে হয়। মদঙ্গের বিষয় এদের কথা কাহিনীতে একবারেই অবজ্ঞাত থেকে গেছে—প্রধান হয়ে উঠেছে লঘু হাস্য-কৌতুক। এমন কি যে স্বদেশপ্রেমিক ইঞ্জিনীয়ার আনন্দময় বসুর সকল স্বপ্নের কেন্দ্র ছিল অলকানন্দা এবং যিনি সর্বক্ষণ অশরীরী ছায়ার মত চিত্রের পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান, লঘু কৌতুকের চাপে তাঁর করুণ কাহিনীও ফুটে ওঠার অবকাশ পায়নি।

উপরে চিত্র কাহিনীর যে চূড়ান্ত কথা উল্লেখ করা হল তারই ফলে ছবিতে পূর্বাপর সামঞ্জস্যের অভাব। চিত্রের প্রদর্শনশে ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের দেশপ্রেমোদ্দীপক দৃশ্যে আদর্শবাদী ধনী ইঞ্জিনীয়ার আনন্দময় বসুর কারাবরণ দর্শকদের মনে নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত এনে দেয়। দর্শকমন প্রস্তুত হয়ে ওঠে জাতি ও দেশ-গঠনমূলক কোন নতুন কাহিনীর



রহস্যোদ্ঘাটনের জন্যে। কিন্তু তারপরেই গল্পের গতি এমনভাবে মোড় ফেরে যে, তাতে দর্শক-মন কিছটা পীড়া না পেয়ে পারে না। এই আকস্মিক ধাক্কার তাল সামলাবার পর দেখা যায় যে, ২০ বছর পরে পুনরায় যে কাহিনীর আবরণ উন্মোচন করা হচ্ছে তা নিছক কৌতুক কাহিনী। প্রথমাংশের কাহিনীর সঙ্গে তার যোগসূত্র থেকেও যেন নেই। দ্বিতীয়াংশে চিত্রটি সর্বপ্রকার উদ্দেশ্যবিবর্জিত নিছক কৌতুকচিত্র। তার চরম পরিণতিও তাই কমেউতে। অবশ্য অলকানন্দাকে এভাবে বিচার না করে যদি আমরা নিছক কৌতুক নাট্যরূপে গ্রহণ করি তবে স্বীকার করতে হয় যে এর মধ্যে যথেষ্ট আনন্দের খোরাক কাহিনীকার এবং চিত্র-পরিচালক পরিবেশন করেছে পেরেছেন। এদিক থেকে চিত্র-কাহিনী ও চিত্র-পরিচালনা বিশেষ প্রশংসার দাবী করতে পারে। গল্পাংশের যে চূড়ান্ত উপরে উল্লেখ করা হল তা বাদ দিলে গল্পটি সুলিখিত এবং এতদ্যে প্রশংসার কাহিনীকার মন্থা রায়। পরিচালক রতন চ্যাটার্জির এটি প্রথম পরিচালিত চিত্র হলেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

ছবিটির একাধিক স্থানে অস্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতা চোখে পড়ল। যেমন ধরুন তিন বৎসর পরে আনন্দময়ের জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফেরার মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যুশয্যা শায়িতা তাঁর স্বাী অলকার মৃত্যুর দৃশ্য। তারপর তাঁর চিতাশ্মি পশ্চাতে ফেলে নিঃশ্ব ও গৃহহীন আনন্দময় যখন তাঁর শিশুকন্যাকে বুকে জড়িয়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে, তখন বাউল সঙ্গীতের অবতারণা 'দেবদাস'-গান্ধী ও পরিচালকের ঐতিহ্য-প্রীতি স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়া কাহিনীটি অব্যাহত গতিতে আগ্রসর হয়েছে এবং বিশেষ কোথাও একঘেয়েমিও নেই। অলকানন্দার আর একটি টেকনিক আমার ভাল লাগলো। দ্বিধাগ্রস্ত জাল মদঙ্গ রায়ের মানসিক স্বন্দ ফুটিয়ে তোলার জন্যে যে ক্ষণিকের কণ্ঠস্বর প্রয়োগ করা হয়েছে আমি তারই কথা বলছি। জাল মদঙ্গ রায়ের ভূমিকায় পরেশ ব্যানার্জি যেমন সুন্দর অভিব্যক্তিপূর্ণ অভিনয় করেছেন তেমনি তিনি তাঁর ভূমিকার অন্তর্স্থ ফুটিয়ে তোলার জন্যে এই টেকনিকটিরও পূর্ণ সম্ভাবহার করেছেন। আধুনিক নাট্যকার-দের মধ্যে মার্কিন নাট্যকার ইউজিন ও'নীল

অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে তাঁর নাটকে এই এই টেকনিকটি প্রয়োগ করেছেন। অলকানন্দা দেখে আর একটি বিষয়েও আশার সঞ্চার হল— সে হল মদঙ্গ রায়ের ভূমিকায় প্রদীপকুমার নামক একজন তরুণ অভিনেতার আবির্ভাব। বাঙলার চিত্রজগতে ভবিষ্যতে বড় হতে পারেন এরূপ অভিনেতা অভিনেত্রীর একান্ত অভাব। প্রদীপকুমারের অভিনয় দেখে মনে হল যে সুযোগ পেলে ইনি অভিনেতারূপে বাঙলার চিত্রজগতে সুনাম অর্জন করতে পারবেন। তিনি দীর্ঘকায় এবং সুদর্শন—তাঁর অভিনয় ও বাচনভাষাতে স্বচ্ছ সাবলীলতা ও আভিজাত্যের ছাপ আছে। অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে পূর্ণিমা, সুপ্রভা মুখো-পাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, ইন্দু মুখোপাধ্যায় এবং আশু বোসের অভিনয় বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। সঙ্গীত পরিচালনার জন্যে ধীরেন মিত্রকে কৃতিত্ব দেওয়া চলে। ২।১ খনি কণ্ঠ-সঙ্গীত সুগীত—বিশেষ প্রশংসার দাবী করতে পারে এই বই-এর আরহ-সঙ্গীত। চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণ কার্য মোটামুটি ভাল।

রামপ্রসাদ—খ্রীস্বেংশু-মোহন ভট্টাচার্যের প্রযোজনায় বেঙ্গল ফিল্মসের চিত্র নিবেদন বাঙলার সর্বজনবিদিত ভক্তিমূলক কাহিনী 'রামপ্রসাদ' একযোগে কলিকাতার তিনটি চিত্র-গৃহে মুক্তিলাভ করেছে। কাহিনী ও সংলাপ রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও দেবনারায়ণ গুপ্ত। চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত ও বিনয় সেন। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সাবিত্রী, নিভাননী, শিশুবালা, অজন্তা কর, সুজিত চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী প্রভৃতি।

রামপ্রসাদের কাহিনী এদেশে প্রায় কারও অজানা নেই। শক্তির উপাসক সাধক রামপ্রসাদ প্রকৃত ধার্মিক ছিলেন বলেই তাঁর ধর্মমতে কোন গোঁড়ামি ছিল না। তাই তিনি সমাজ পরিভ্রান্ত তাঁতির মেয়ে লক্ষ্মীর মায়ের সংকার করতে যেতে একটুও কুণ্ঠিত হন নি। এবং এই কারণেই অত্যাচারিত প্রজারা জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁড়িবার জন্যে তাঁর কাছ থেকে সংসাহস পেয়েছিল ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হয়েছিল। পরাহিত ত্যাগই জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম—দেশের এবং দেশের জন্যে আত্মহুতি দিয়ে রামপ্রসাদ আমাদের সেই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন।

আজকের যুগপরিবর্তনের সংকটকালে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যে আত্মত্যাগের এই মহান দৃষ্টান্ত জনগণের কাছে তুলে ধরে বেঙ্গল ফিল্মসের কতৃপক্ষ ধনাবাদাজন হয়েছেন। রামপ্রসাদ ধর্মানুরাগী নরনারী ছাড়াও অন্যান্য সকলের মনে প্রেরণা জোগাবে।

কেননা চিত্রকাহিনীতে রামপ্রসাদের সমাজ কল্যাণমূলক বিষয়ের উপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। রামপ্রসাদের মূল ভূমিকায় নবাগত সুজিত চক্রবর্তীর অভিনয় আশাপ্রদ নয়। সর্বাঙ্গীণ ভূমিকায় সাবিত্রীর অভিনয়ও আশানুরূপ নয়। আশু বোস ও ইন্দু মুখোপাধ্যায় প্রচুর পরিমাণে হাসির খোরাক জুগিয়েছেন। নিভাননী, শিশুবালা, উষাবতী প্রভৃতি মন্দ অভিনয় করেন নি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছেন তিনি আমাদের একেবারে হতাশ করেছেন। তিনি সিনেমায় অভিনয় করছিলেন না সখের যাত্রাদলে অভিনয় করছিলেন—সেটা বৃক্ষে ওঠা ভার। তরুণ চিত্র-পরিচালক দেবনারায়ণ গদ্বস্ত ও বিনয় সেন তাঁদের প্রথম চিত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যদিও সামগ্রিকভাবে রামপ্রসাদে কারও অভিনয় উচ্চাঙ্গের হয় নি—তবু সব-কিছু মিলিয়ে রামপ্রসাদ দর্শক সমাজকে আনন্দ দিতে পারবে বলে আমরা আশা করি।

### স্টুডিও সংবাদ

পরিচালক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. জি. পিকচার্সের হয়ে তাঁদের প্রথম চিত্র নির্মাণে হাত দিয়েছেন বলে প্রকাশ। এই চিত্রখানির নাম হল “বিশ বছর আগে”। নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্যের এই নামীয় নাটকের চিত্ররূপ এটি।

\* \* \*

তরুণ পরিচালক অশোক সরকারের পরিচালনায় ‘শেষ কোথায়’ চিত্রের কাজ নানা কারণে এতদিন বন্ধ ছিল। প্রকাশ যে, সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই বেঙ্গল ন্যাশনাল স্টুডিওতে এই ছবির কাজ নিয়মিতভাবে আরম্ভ হবে।

\* \* \*

বীণা ফিল্মস্ কর্পোরেশন নামক একটি নতুন চিত্র-প্রতিষ্ঠান ভারতের মুম্বই সংগ্রামের সৈনিকদের জীবন কাহিনীকে ভিত্তি করে একখানি চিত্র-নির্মাণ করবেন বলে প্রকাশ। চিত্রকাহিনী রচনা করছেন ‘সাহারা’ ও ‘বিপ্লবী মানব’ নামক চিত্রের কাহিনীকার। পরিচালনাব্যতীকার উপর অর্পিত হবে তা এখনও স্থির হয় নি।

### নানা কথা

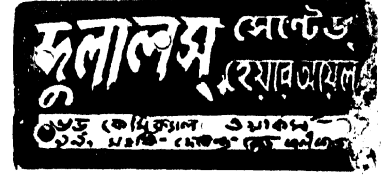
কলকাতার বোর্ডিং স্ট্রীটে ওরিয়েণ্ট নামে একটি নতুন প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত হয়েছে। ১৩ই সেপ্টেম্বর প্রকাশ পিকচার্সের ঐতিহাসিক চিত্র ‘বিক্রমোত্তী’ দিয়ে এই চিত্রগৃহটির উদ্ভোধন হবে বলে প্রকাশ।

\* \* \*

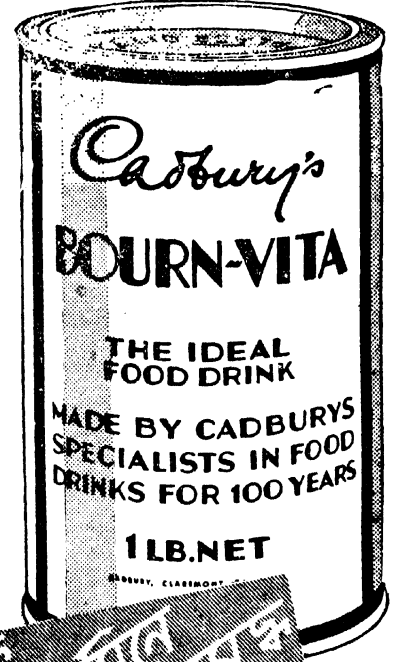
বোম্বাই-র একটি চর্চাকৃত পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতীয় চিত্রজগতে সৌন্দর্যের রাণীরূপে প্রসিদ্ধা চিত্রাভিনেত্রী নাসিম চিত্রজগৎ থেকে অবসর গ্রহণের কথা ভাবছেন।

মার্কিন চিত্রাভিনেত্রী বেটি গ্র্যাবল ১৯৪৬ সালে মার্কিন নারীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক অর্থ উপার্জন করেছেন বলে প্রকাশ। এই সালে বেটি গ্র্যাবল মোট ২ লক্ষ ৮ হাজার ডলার রোজগার করেছিলেন।

৫০০



স্বাদ  
ভালো হলে  
সবই  
ভালো !



বোর্নভিটার স্মিষ্ট চকোলেটের গন্ধ ছেলে-বুড়ো সকলেরই প্রিয়। তা ছাড়া বোর্নভিটায় যে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন আছে তা হাড়ের পুষ্টিসাধন করে আর অটুট স্বাস্থ্য ও অফুরন্ত কর্মোৎসাহ আনে।

ক্যাডবেরির

বোর্ন-ভিটা

ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন সমৃদ্ধ

ক্যাডবেরির বোর্নভিটা

যদি ঠিকমতো না পান তবে আমাদের লিখুন :  
ক্যাডবেরি-ফ্রাই (এক্সপোর্ট) লিঃ, (ডিপার্টমেন্ট ২১) পোস্ট বক্স ১৪১৭-বোম্বাই